নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনী

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনী

শায়খপড বই

শায়খপড বুকস, ২০২৫ দ্বারা প্রকাশিত

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনী

চতুর্থ সংস্করণ। ২৫ মার্চ, ২০২৫।

শায়খপড বুকস কর্তৃক লিখিত।

সুচিপত্র

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

কম্পাইলারের নোটস

ভূমিকা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনী

মক্কার বরকতময় জীবন

- এতিমদের সম্মান জানানো
- সত্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা
- একটি শুভ দিন
- আধ্যাত্মিক শুদ্ধিকরণ
- ঐশ্বরিক নির্দেশিত লালন-পালন
- মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করা
- আল ফুদুলের চুক্তি
- নোবেল মার্চেন্ট
- একটি সৎ জীবনযাপন
- খাদিজা (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ
- কাবা পুনর্নির্মাণ
- শেষ নবী (সা.)-এর আগমনের পূর্বাভাস
  - অন্ধ আনুগত্য
  - মহৎ গুণাবলী
- হেরা গুহায় নির্জনতা

নবুওয়তের মিশন শুরু

প্রথম প্রত্যাদেশ
- আন্তরিকতা এবং জ্ঞান
- স্বাভাবিক ভয় এবং উদ্বেগ
- আন্তরিকতা এবং মহৎ চরিত্র
- অসুবিধার সতর্কীকরণ

বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া
পদ্ধতিগত পদ্ধতি
প্রথম বিশ্বাসীরা
অন্যদের বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করা
সুখের চাবিকাঠি
জ্ঞান শোনা
জ্ঞানের জন্য সমাবেশ
ইসলামের প্রতি জনসাধারণের আহ্বান
সত্যের উপর অবিচল
সত্য গ্রহণ করা এবং তার উপর দৃঢ় থাকা
মন্দের মুখে ধৈর্য
ইচ্ছার পূজা করা
শাস্তি বিলম্বিত করা এবং প্রার্থনা
সত্যের সন্ধানে
ব্যবসায় ন্যায়বিচার
একটি বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য
বোকা অনুরোধ
ঐশ্বরিক নৈকট্য
বিশ্বাসের উপর অবিচল
কুরআনের সাথে আপস করা
পুনরুত্থান
উপহার বা দাতা
নিয়ন্ত্রক নয়

অবকাশ বা ধ্বংস
বিভিন্ন সময়ের মুখোমুখি হওয়া
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সেবা করা
অবিচল সাহসিকতা
মক্কায় মুমিনদের উপর নির্যাতন
- মন্দ কাজের আদেশ এবং সৎ কাজে নিষেধ করা
- কঠিন পরীক্ষা
- ছাড় প্রদান
- দুর্বলদের সাহায্য করা
- বিশ্বাস প্রথমে আসে
- পরীক্ষার উপসংহার
- মহিলাদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড

জেদ
মন্দ পরিকল্পনার চক্রান্ত
ইতিবাচকভাবে উপলব্ধি করা
নিরপেক্ষ থাকুন
অন্যদের বিভ্রান্ত করা
ইভিল কমান্ডিং
বিভ্রান্তিকর বন্ধুরা
বিশ্ব প্রতিযোগিতা
সহনশীলতা
একটি দীর্ঘস্থায়ী চ্যালেঞ্জ
কর্তৃত্ব এবং সম্পদের লোভ
সত্যের প্রতি আন্তরিক
ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া
ইথিওপিয়ায় প্রথম অভিবাসন
- সহানুভূতি অনুভব করা
- বিশ্বাসের জন্য ত্যাগ স্বীকার

ইথিওপিয়ার বিশ্বাসীদের জন্য সমস্যা
  - নেতিবাচকতা এবং মিথ্যা বিশ্বাস সংশোধন
  - কল্যাণের আহ্বান

ঐশ্বরিক সুরক্ষা
কৃতজ্ঞতার একটি শিক্ষা
সঠিক পথ
সত্যকে রক্ষা করা
অজ্ঞতা এবং তার মানুষ
উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন
  - ইসলামের শক্তিশালীকরণ
  - সত্যের উপর কাজ করা
  - ভিন্ন পথ বেছে নেওয়া
  - নিজেকে রক্ষা করা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অভিভাবকত্ব
ইথিওপিয়ায় আরেকটি অভিবাসন
মন্দ পরিকল্পনার ফলাফল
সামাজিক বয়কট
বন্ধুরা
যুক্তি
মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সহযোগিতা
সবার জন্য ইসলাম
সদয় ও কোমল প্রচার
মক্কায় দুর্ভিক্ষ
সেরা কোম্পানি
সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা
হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চাচা আবু তালিবের মৃত্যু
হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর স্ত্রী খাদিজা (রাঃ) এর মৃত্যু
  - পুরনো বন্ধন ধরে রাখা

- দ্য গার্ডিয়ান

তাইফ ভ্রমণ
- ব্যক্তিগত কথোপকথন
- ঐশ্বরিক বিধান গ্রহণ করা
- ইতিবাচকতা
- ক্ষমা এবং উপেক্ষা
- বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া

স্বর্গীয় যাত্রা
- সর্বশক্তিমান
- নিশ্চিততার জন্য প্রচেষ্টা করা
- সর্বোচ্চ পদমর্যাদা
- গ্রেটদের কোম্পানি
- জীবন একটি আয়না
- আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সমাধান করা
- ফরজ নামাজ
- আবু বক্কর (রা.) - সত্যের সমর্থক

বিভিন্ন উপজাতির কাছে ইসলাম প্রচার
- মৃদু অধ্যবসায়
- একটি ভালো উদ্দেশ্য
- পথভ্রষ্ট সাহাবীরা
- মদীনার সাহায্যকারীরা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন

সাহায্যকারীদের প্রথম শপথ (রা.)

মদিনায় ইসলামের প্রসার
- ভালো ছড়িয়ে পড়া
- ভদ্রভাবে পরামর্শ দেওয়া

নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে চলা

সাহায্যকারীদের দ্বিতীয় শপথ (রা.)
- আল্লাহর জন্য ঐক্যবদ্ধ (SWT)

তোমার তত্ত্বাবধানে
চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা
সাহাবীদের (রাঃ) মদিনায় হিজরত
মানুষের প্রতি আন্তরিকতা
নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত
মাইগ্রেটের অনুমতি
একটি দুষ্ট সমাবেশ
সমর্থনকারী দাবি
একটি উপায় আউট
ট্রাস্ট পরিশোধ করা
স্বাধীনতার জন্য প্রচেষ্টা
সত্যের প্রতি আনুগত্য
সত্য ভালবাসা
সেরা সঙ্গী
সঠিকভাবে বিশ্বাস করা
সেরা স্থান
মদিনার বরকতময় জীবন
মাইগ্রেশনের পর প্রথম বছর
মদিনায় মসজিদে নববী নির্মাণ
একটি সুন্দর উত্তরাধিকার
উদাহরণ দ্বারা পরিচালিত
ঈর্ষার প্রভাব
সঠিকভাবে ব্যবসা করা
মহান ত্যাগ
ভালোবাসার চিহ্ন
সঠিক পথ অনুসরণ করা
স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্য

- সম্পূর্ণ জমা দিন
- পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা
- ফাইন মিত্রগণ
- মদিনায় প্রথম জুমার খুতবা
- পৃথিবীর সেরা স্থান
- নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর অ্যাপার্টমেন্ট
- নামাযের আযান
- সদয় আচরণ
- সাহায্যকারী এবং অভিবাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব (RA)
- কৃতজ্ঞতার দুটি অংশ
- উদারতা এবং বিধান
- প্রকৃত জ্ঞান
- মদিনার মুনাফিকরা
  - দ্বিমুখী
  - অনৈক্য সৃষ্টি করা
- ঐশ্বরিক অভিভাবকত্ব
- ভালো ব্যবসার গুরুত্ব
- যুদ্ধের অনুমতি

অভিবাসনের পর দ্বিতীয় বছর

- প্রার্থনার দিক পরিবর্তন
  - সর্বদা মহান আল্লাহর মুখোমুখি থাকা
  - প্রার্থনার দিকনির্দেশনা
  - ভালো প্রচেষ্টা এবং বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা
  - বেঞ্চের লোকেরা
  - অন্যদের পথভ্রষ্ট করা
- রোজার ফরজতা
- বাধ্যতামূলক দানশীলতা

- একটি খারাপ উদ্দেশ্য
দুর্নীতি বন্ধ করা
বদরের যুদ্ধ
- নম্রতার মধ্যেই মহত্ত্ব নিহিত
- পিতামাতাকে সম্মান করা
- ধর্মপরায়ণতার মধ্যেই আভিজাত্য নিহিত
- পরামর্শ চাওয়া
- মন্দ চক্রান্তের সমাপ্তি
- ভালো পরামর্শ গ্রহণ করা
- নেতাদের প্রতি আন্তরিকতা
- ভাগ্যে কল্যাণ
- ঐশ্বরিক আশীর্বাদ এবং সমর্থন
- সত্যিকারের আশা
- ন্যায়পরায়ণ আচরণ
- আন্তরিকভাবে পরামর্শ দেওয়া
- প্রতিশ্রুতি পালন করা
- দ্বৈত
- সাহসিকতা
- স্বর্গ থেকে সাহায্য
- একজন খারাপ সঙ্গী
- পরকালকে উপলব্ধি করা
- বিশ্বাসে আপোষহীন
- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি ঘৃণা
- কর্মের পরিণতি
- পরকাল অন্বেষণ করা
- ঐশ্বরিক সিদ্ধান্ত
- সর্বোত্তম আচরণ
বদরের যুদ্ধের পর

একটি করুণাময় কাজ
একটি ন্যায্য শাস্তি
ভদ্রতা প্রদর্শন করা
হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর উত্তরাধিকার
নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা
সংবাদ প্রচার
মহৎ চরিত্র
দুর্বলতা ছাড়া কোমলতা
কোনও অগ্রাধিকারমূলক চিকিৎসা নেই
ভালো হওয়া
শিক্ষার গুরুত্ব
কিভাবে জিতবেন
দ্বিতীয় সম্ভাবনা
দ্বিমুখী আচরণ
ন্যায়পরায়ণ থাকা
বন্ধন ভাঙা
আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ (সাঃ) কে বিয়ে করেন
একটি বিজ্ঞ প্রস্তাব
সরল জীবনযাপন
অভিবাসনের পর ৩ য় বছর
সঠিকভাবে উপস্থাপন করা
প্রতিশোধ নেওয়া
ইসলামে আভিজাত্য
বনু কাইনুকা
খারাপ পরামর্শ
রাষ্ট্রদ্রোহের শাস্তি
কথোপকথন গোপন রাখা

যা যা যায় তাই আসে
উহুদের যুদ্ধ
- একটি খারাপ কথোপকথন
- মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা
- কথোপকথন পাহারা দেওয়া
- কোর্সে থাকা
- উপায় ব্যবহার এবং আল্লাহর উপর ভরসা করা
- উপযুক্ত সঙ্গী নির্বাচন করা
- সব কথা, কোনও পদক্ষেপ নেই
- নিশ্চিত বিশ্বাস
- বিশ্বাসের উপর দৃঢ় থাকা
- উহুদে একটি অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতা
- কাপুরুষতা এড়িয়ে চলা
- রক্তের চেয়েও শক্তিশালী
- পরকাল বিশ্বজুড়ে
- সর্বদা আন্তরিক
- সকল পরিস্থিতিতে ধন্য
- মিশন অব্যাহত রাখা
- সকল অসুবিধা
- মানুষের জন্য উদ্বেগ
- সকলের জন্য নির্দেশনা কামনা করা
- সত্য গ্রহণ এবং মেনে চলা
- উপেক্ষা এবং সদিচ্ছা
- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছ থেকে প্রতিদান লাভ
- দুর্দশায় সাহায্য
- মহিলাদের জন্য মানদণ্ড
- অসুবিধা এবং কষ্টের মুখোমুখি হওয়া
- সর্বস্ব ত্যাগ করা

বিশ্বাসের আহ্বানে সাড়া দেওয়া
অল্পের জন্য অনেক
রাগের উপর কর্তৃত্ব
একটি অঙ্গীকার পূর্ণ হয়েছে
কুরআনের জ্ঞান
যখন অন্যরা চলে যায়
ইতিবাচক মনোভাব
শোকের সময়
অসুবিধার মধ্যে আনুগত্য
বিভাগ সৃষ্টিকারী
উহুদের যুদ্ধের জ্ঞানগর্ভ দিকগুলো
করুণা দেখানো
দুটি জিহ্বা
বিশ্বাসের উপর দৃঢ়তা
ধর্মভীরুতা অনুসন্ধান করুন
অভিবাসনের পর চতুর্থ বছর

দৃঢ়তার সাথে কষ্টের মুখোমুখি হওয়া
ভালোবাসার প্রমাণ
উপেক্ষা করা এবং ক্ষমাশীল
অসুবিধার মধ্যে দৃঢ়তা
বনু নাদির
অঙ্গীকার ভঙ্গ
সত্য ন্যায়বিচার
ইভিল সাপোর্ট
ত্যাগ করা প্রতিশোধ
বিশ্বাসে কোন জোরজবরদস্তি নেই
চরম উদারতা

অন্ধ অনুকরণ এবং ভ্রম
মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ
জুয়া নিষিদ্ধকরণ
পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতা
সুন্দর চরিত্র
বৃদ্ধি বা ক্ষতি
সহজে অসুবিধা
দ্বিতীয় বদর
প্রিয়জন হারানো
অভিবাসনের ৫ম বছর
নেতাদের প্রতি শুভকামনা
আহযাবের যুদ্ধ
একজন সত্যিকারের নেতা
প্রচেষ্টা পুরষ্কারের দিকে নিয়ে যায়
প্রচেষ্টায় দুর্বলতা
বাস্তব জীবন
ধৈর্যের সাথে কৃতজ্ঞতা
পরীক্ষার ফলাফল
অন্যদের জন্য উদ্বেগ
আমাদের একজন
দৃঢ় বিশ্বাস
বিজ্ঞতার সাথে বন্ধু নির্বাচন করা
বন্ধু এবং বিশ্বাস
সন্দেহজনক হওয়া
সকল অবস্থাতেই অবিচল
জনগণের জন্য উদ্বেগ
অবিচল আনুগত্য

ভালো ব্যবসা পরিচালনা করা
দুষ্ট পরিকল্পনা ব্যর্থ
সাহস এবং অটলতা
অসুবিধা এবং সহজতা
বিশ্বাসঘাতকতার মানসিকতা
একটি প্রস্থান
বনু কুরাইজা
পরিণতির মুখোমুখি হওয়া
সঠিক বিচার করা
সেরা মানুষ
সত্যকে অস্বীকার করা
সত্যকে মেনে চলুন
সমালোচকদের ভয় পাওয়া
বিশ্বাসঘাতকতা
অন্ধ আনুগত্য এবং অনুকরণ
আনন্দদায়ক মানুষ
বাগান বা গর্ত
রাষ্ট্রদ্রোহের শাস্তি – ২
মন্দ উদ্দেশ্য
হযরত মুহাম্মদ (সা.) জয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-কে বিবাহ করেন
ভিত্তিহীন রীতিনীতি ত্যাগ করা
অন্যদের সাথে দেখা করা
অভিবাসনের পর ষষ্ঠ বছর
করুণা ও দয়া দেখানো
কপটরা অনৈক্যের জন্য সংগ্রাম করে
বিশ্বাসের বন্ধন
অনৈক্য সৃষ্টি করা

আগুনের দুটি জিহ্বা
ঈর্ষা এবং ঘৃণা
বিশ্বাসকে উৎকৃষ্ট করে তোলা
ভালো চিকিৎসা
মহানবী (সাঃ) এর আনুগত্য
নিজের উপকার করো
নবী মুহাম্মদ (সাঃ) জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রাঃ) কে বিয়ে করেন
হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর অপবাদ
একটি প্রকাশ্য অপবাদ
ইতিবাচক চিন্তা করা
ভালো আচরণ
অন্যদের সান্ত্বনা দেওয়া
গুজব ছড়ানো
ঐক্যকে কলুষিত করছে
তোমার কাজে মন দাও
সমস্যা ভাগ করে নেওয়া
রাগ নিয়ন্ত্রণ করা
ধৈর্য পুরস্কারের দিকে পরিচালিত করে
লেট থিংস গো
অন্যদের প্রতি অনুভূতি
হুদাইবিয়ার চুক্তি
আসল তীর্থযাত্রা
নিরপেক্ষ থাকা
এগিয়ে টিপুন
নামাজের গুরুত্ব
অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া
ভালো জিনিস গ্রহণ করা
ধার্মিকতার জন্য পরীক্ষিত

শুভেচ্ছা
বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ
সত্যিকারের ভালোবাসা দেখানো
নমনীয় হওয়া
তাড়াহুড়ো করে আচরণ করা এড়িয়ে চলুন
নেতাদের প্রতি আন্তরিক হওয়া
সরল পথ মেনে চলুন
রিদওয়ানের বাইয়াত
দাসত্বের শপথ
খবর যাচাই করা হচ্ছে
সত্যিকারের ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা
মহিমা অসুবিধার মধ্যেই নিহিত
সন্দেহের মধ্যে দৃঢ় থাকা
পরামর্শ চাওয়া
একটি স্পষ্ট বিজয়
দুষ্ট চক্রান্ত ব্যর্থ হয়
বিদেশী দেশগুলিকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া
সহজ এবং ভদ্র বক্তৃতা
মন্দের পরিণতি
অভিবাসনের ৭ ম বছর
খায়বারের যুদ্ধ
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভালোবাসা অর্জন
অন্যদের পথ দেখানো
উদ্দেশ্যের প্রভাব
তুমি যা দাও, তাই পাও
বিশ্বাসঘাতকতা এড়ানো
ন্যায়বিচার ধরে রাখুন

- খারাপ উপাদান অপসারণ
    - করুণাময় হওয়া
    - বেআইনি ব্যবহার
    - তোমার উত্তরাধিকার
    - সম্পর্ক উন্নত করা
    - অভিবাসীরা
  - লিঙ্গ বৈষম্য নেই
  - ইতিবাচকভাবে বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করা
  - বিশ্বাসের উপর কাজ করা
  - আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই
  - বিলম্বিত সফর (উমরা)
    - প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ত
    - দুর্বলতা ছাড়া নম্রতা
    - দয়া পছন্দনীয়
    - নবীর বিবাহ
    - নারীদের সম্মান জানানো

অভিবাসনের পর ৮ ম বছর

  - জীবনে শূন্যতা
  - মুতার যুদ্ধ
    - সঠিক ধারণা
    - অনুসরণ করাই সেরা
    - বিশ্বাসে শক্তি
    - উজ্জ্বল কৌশলবিদ
    - অন্যদের সান্ত্বনা দেওয়া
    - অন্যদের জন্য শোক
    - নেতাদের সম্মান করা
  - রোমান সাম্রাজ্য

- মিথ্যা বলতে লজ্জা লাগে
- নবুওয়তের প্রমাণ
- সত্যের সাথে আপোষ করা
- শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত

ধু আল সালালসিলের অভিযান
- ঐক্য সন্ধান করুন
- সন্দেহের সুবিধা

মক্কা বিজয়
- চুক্তি রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়া
- বিষয়গুলো নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা
- বাধ্যতা প্রথমে আসে
- ইসলামের প্রতি আন্তরিকতা প্রথমে
- গোপন কথোপকথন
- অন্যদের করুণার সাথে দেখা
- অন্যদের প্রতি করুণা দেখানো
- অনুসরণের মধ্যেই শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত
- শ্রেষ্ঠত্ব চেহারায় নয়
- জনগণের প্রতি আন্তরিকতা
- প্রতিশোধ নয়, অভয়ারণ্য
- ইসলাম হলো আন্তরিক আনুগত্য
- অবাধ্যতা ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করে
- ঘর মুক্ত করা
- নম্রতার শিখর
- জিনিস সহজ করুন
- বিচারের মুখোমুখি
- ক্ষমা করা এবং এগিয়ে যাওয়া
- শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাফল্য
- ইসলাম হলো ভদ্রতা

ইসলামী শিক্ষা মেনে চলুন
প্রকৃত আভিজাত্য
ইসলামে বর্ণবাদ নেই
ক্ষমাশীলতা উন্নতির দিকে নিয়ে যায়
নারীর অঙ্গীকার
নবুওয়তের বন্ধুরা
জনসাধারণের প্রতি আন্তরিকতা
সবার জন্য ন্যায়বিচার
প্রচেষ্টা এবং সৎ উদ্দেশ্য
শেষের ইঙ্গিত
হুনাইনের যুদ্ধ
দুর্নীতি দূরীকরণ
ইসলামের পবিত্রতা বজায় রাখুন
বাধ্যতায় বিজয়
ন্যায্য হওয়া
তাইফ অবরোধ
অপমানজনক দাসত্ব থেকে মুক্তি
দ্বিমুখী হওয়ার বিপদ
নমনীয়তা এবং দ্বিতীয় সুযোগ
চরম দয়া
হুনাইনের যুদ্ধের লুণ্ঠন
বেআইনি কাজ এড়িয়ে চলা
তুমি কি চাও?
স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করুন
সমস্যাগুলো ছোট করো
ভবিষ্যতের বিদ্রোহীরা
আত্মীয়স্বজনের প্রতি দয়া
ভালো করছি

- মন্দের বিরুদ্ধে ভালো
- একটি সফল তীর্থযাত্রা
- বিপদের মুখোমুখি
- একটি সরল জীবন

অভিবাসনের পর নবম বছর

- হালাল মেনে চলা
- তাবুকের যুদ্ধ
  - সহজে এবং অসুবিধায় আনুগত্য
  - আশীর্বাদ ব্যবহার করা
  - খারাপ অজুহাত
  - অন্যদের বোকা বানানো
  - রাষ্ট্রদ্রোহের শাস্তি
  - দরকারী সম্পদ
  - সম্পদ এবং সুযোগ
  - পথনির্দেশনার পুরস্কার
  - উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ
  - অনেক কথা, সামান্য কাজ
  - ঝামেলা সৃষ্টিকারীরা
  - বিশ্বাসকে উপহাস করা
  - পরিপূর্ণতার কোন দাবি নেই
  - ইসলামে শ্রেষ্ঠত্ব
  - একজন অপরিচিত ব্যক্তি
  - সত্যের প্রতি অন্ধ
  - ধৈর্য এবং সন্তুষ্টি
  - পর্যবেক্ষক থাকা
  - কালজয়ী অলৌকিক ঘটনা
  - আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালার) প্রতি রাগান্বিত

তাবুকে নবীর খুতবা
একটি পবিত্র কবর
আনুগত্যেই বিজয়।
মন্দের বিরুদ্ধে ক্ষমা
ক্ষতির জন্য মসজিদ
তোমার উপায় ব্যবহার করো
ভদ্র আচরণই সবচেয়ে ভালো
রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্য
প্রান্তে আনুগত্য
সত্য সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়
গড় অনুযায়ী সুষম ব্যয়
ক্ষমা লাভ করা
শোকাহত
থাকীফ উপজাতি
আপোষ ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়
নামাজ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়
একটি নিরাপদ বাড়ি এবং সমাজ
সুদ এড়িয়ে চলা
মন্দের মা
আপস ছাড়াই নমনীয়তা
সত্যিকারের ভালো
একজন ভালো নেতা
জিনিসগুলি সহজ করুন
করুণার আশায়
ক্ষমা করো এবং ভুলে যাও
জিনিসপত্র ছেড়ে যাওয়া
মুনাফিকদের সর্দারের মৃত্যু
অধ্যবসায়

- সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন
- করুণা সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে

পবিত্র তীর্থযাত্রা পবিত্র করা
দারিদ্র্যকে ভয় পেও না
ভালো অতিথি হোন
দুটি ধন্য গুণ
মুসাইলিমা, মিথ্যাবাদী
সত্যিকারের সৌন্দর্য
খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল মদিনা পরিদর্শন করেছে

- সর্বোচ্চ মর্যাদা
- স্পষ্ট সত্য
- বিশ্বের দাসরা

বিশ্বাসযোগ্য
অশুভ পরিকল্পনা উল্টোপাল্টা
মহৎ চরিত্র জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়
নম্রতার মধ্যে প্রকৃত সম্মান
মুসলমানদের অধিকার
জিনিসপত্র ছেড়ে দেওয়া
নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা
স্বাধীন
আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা
মধ্যস্থতা
জীবনের সকল ক্ষেত্রে সততা
খ্রীষ্ট-বিরোধীর গল্প
নিজেকে পছন্দ করা
যেখানে মহত্ত্ব নিহিত
সত্য ভক্তি
সত্য বিশ্বাস

- শান্তির শুভেচ্ছা
- নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর স্ত্রীদের উপর প্রদত্ত পছন্দ

অভিবাসনের পর দশম বছর

- উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা
- শত্রুদের পরাস্ত করা
- ইয়েমেনে গভর্নরদের প্রেরণ
  - আপনার কর্তৃত্বের অধীনে
  - আরাম এবং সুখবর
  - ভালো কাজে সাহায্য করুন
  - অন্ধকার এড়িয়ে চলুন
  - নবীর সাহচর্য
  - নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সবচেয়ে কাছের
  - আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) এবং মানুষের সাথে আচরণ
  - বিলাসবহুল জীবন
  - জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার
  - সকল কিছু থেকে পুরষ্কার অর্জন
- ইয়েমেনে একটি অভিযান
  - ন্যায্য হও
  - সেরা হও
  - নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে কষ্ট দেওয়া
  - সত্য হওয়া
  - আস্থা প্রদর্শন
  - পদক্ষেপগুলিকে ইতিবাচকভাবে বিচার করা
- বিদায়ী পবিত্র তীর্থযাত্রা
  - কর্মে আন্তরিকতা
  - পবিত্র কি?
  - আরাফাতে খুতবা

তাকওয়া কী?
সঠিক পথ
প্রলোভন নিয়ন্ত্রণ করা
সহজতার ধর্ম
সত্যিকারের ত্যাগ
ভালোবাসা কর্মের মধ্যেই থাকে
কোন ক্ষতি করো না
অন্যদের সাহায্য করা
মিনায় খুতবা
গাদীরে খুমে খুতবা
বক্তৃতা রক্ষা করা
অভিবাসনের পর ১১ [তম বছর]
নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর শেষ অসুস্থতা
অন্যদের স্মরণ করা
বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরো
চিরন্তনকে প্রাধান্য দেওয়া
উহুদ যিয়ারত করা এবং খুতবা দেওয়া
স্বাচ্ছন্দ্য ও কষ্টের মধ্যে অধিকার পূরণ করুন
আনুগত্যের মধ্যেই আভিজাত্য নিহিত
নেতৃত্ব দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা এড়িয়ে চলুন
শেষ ধর্মোপদেশ
ছাঁচনির্মাণ জীবন
একজন ব্যবহারিক রোল মডেল
সকল যন্ত্রণা
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা
সহজভাবে জীবনযাপন করা
সৌন্দর্যায়ন

- ঐশ্বরিক প্রেম
- চূড়ান্ত পরামর্শ
- নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যু
  - আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি ভক্তি
  - একটি ইতিবাচক মনোভাব
- হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর আবু বকর (রাঃ) এর ভাষণ
  - বাধ্য থাকা
- আবু বকর (রাঃ) - প্রথম খলিফা
  - সত্যকে সমর্থন করা
- নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর দাফন
- ঐক্য
- আবু বকর (রাঃ) এর প্রথম খুতবা
- আরও প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করা
- হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর একটি সুন্দর বর্ণনা

উপসংহার

ভালো চরিত্রের উপর ৫০০ টিরও বেশি বিনামূল্যের ই-বুক

অন্যান্য শায়খপড মিডিয়া

স্বীকৃতি

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, যিনি আমাদের এই খণ্ডটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক, যাঁর পথ আল্লাহ মানবজাতির মুক্তির জন্য বেছে নিয়েছেন।

আমরা সমগ্র শায়খপড পরিবারের প্রতি, বিশেষ করে আমাদের ছোট্ট তারকা ইউসুফের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ শায়খপড বইয়ের উন্নয়নে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিতপ্রাণ সহায়তা শায়খপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করুন এবং এই কিতাবের প্রতিটি অক্ষর তাঁর মহিমান্বিত দরবারে কবুল করুন এবং শেষ দিবসে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ দিন।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং অফুরন্ত দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর, তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ এবং সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

কম্পাইলারের নোটস

আমরা এই খণ্ডে ন্যায়বিচার করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি, তবে যদি কোনও ত্রুটি পাওয়া যায় তবে সংকলক ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে তার জন্য দায়ী থাকবেন।

এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় আমরা ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনাকে মেনে নিই। আমরা হয়তো অসচেতনভাবে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তা সাদরে গৃহীত হবে। ShaykhPod.Books@gmail.com ঠিকানায় গঠনমূলক পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ভূমিকা

এটা সর্বজনস্বীকৃত যে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলে মানসিক প্রশান্তি আসে। মহান আল্লাহ তায়ালা নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যক্তিত্বের মধ্যে সমস্ত ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য স্থাপন করেছেন। সূরা আল-কালাম, আয়াত ৪:

"আর সত্যিই, তুমি মহান নৈতিক চরিত্রের অধিকারী।"

অতএব, এই বইটিতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনের অনেক ঘটনা আলোচনা করা হবে, যাতে কেউ তাঁর ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি শিখতে এবং গ্রহণ করতে পারে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে।

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলে মানসিক শান্তি আসে।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনী

মক্কার বরকতময় জীবন

এতিমদের সম্মান জানানো

মহানবী (সাঃ) এর মাতা আমিনা বিনতে ওয়াহাব যখন গর্ভবতী ছিলেন, তখন তাঁর পিতা আবদুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব মারা যান। অতএব, মহানবী (সাঃ) পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের আগেই এতিম হয়ে গিয়েছিলেন। সিরাত ইবনে হিশামের ২০ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এতিম ছিলেন, এই সত্যটিই মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত যে তারা সকল এতিমকে তাদের সামর্থ্য অনুসারে সম্মান ও সাহায্য করতে পারে।

ইসলামী শিক্ষায় প্রায়ই এতিমদের কথা উল্লেখ করা হয় কারণ তারা তাদের সামাজিক দুর্বলতার কারণে প্রায়শই তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত নিশ্চিত করা যে তারা সমাজে সামাজিকভাবে দুর্বল বলে বিবেচিত ব্যক্তিদের, যেমন এতিম এবং বিধবাদের, তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করবে। আজকের যুগে এতিম এবং বিধবাদের ভরণপোষণ অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছে কারণ কেউ কয়েক মিনিটের মধ্যেই এটি অনলাইনে

সেট আপ করতে পারে। এবং ভরণপোষণের পরিমাণ প্রায়শই তাদের মাসিক ফোন বিলের চেয়ে কম। অতএব, মুসলমানদের ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটিকে উপেক্ষা করা উচিত নয় কারণ এটি উভয় জগতে মহান আল্লাহর নিরন্তর সহায়তার দিকে পরিচালিত করে। সহিহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এতিমের যত্ন নেবে সে জান্নাতে তার নৈকট্য লাভ করবে। সহিহ বুখারির ৬০০৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে, যে ব্যক্তি বিধবার মতো অভাবীদের যত্ন নেবে, তাকে সেই ব্যক্তির সমান সওয়াব দেওয়া হবে যে সারা রাত নামাজ পড়ে এবং প্রতিদিন রোজা রাখে। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত ৬০০৬ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । অতএব, যে ব্যক্তি নফল রাতের নামাজ এবং নফল রোজার মতো নফল কাজ করতে কষ্ট পান, তার উচিত এই হাদিসের উপর আমল করা যাতে ন্যূনতম প্রচেষ্টায় এই সওয়াব অর্জন করা যায়।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের কাছে যা কিছু আছে, যেমন সম্পদ, তা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঋণ হিসেবে দিয়েছেন, উপহার হিসেবে নয়। ঋণ অবশ্যই তার মালিককে পরিশোধ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের উপায় হলো তাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করা। অতএব, যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করে সে কেবল আল্লাহর প্রতি তাদের ঋণ পরিশোধ করছে। যখন কেউ এটি মনে রাখে, তখন তারা এমন আচরণ করতে বাধা পাবে যেন তারা আল্লাহ তাআলা বা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করছে। বাস্তবে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পার্থিব আশীর্বাদ দান করে এবং অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করে অসংখ্য সওয়াব অর্জনের সুযোগ দিয়ে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। উপরন্তু, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তাদের সাহায্য গ্রহণ করে দাতার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যদি প্রতিটি অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি অন্যদের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে ঐশী শিক্ষায় উল্লিখিত সওয়াব কীভাবে পাবে? এই বিষয়গুলি মনে রাখলে ভুল মনোভাব গ্রহণ করে তাদের সওয়াব নষ্ট করা থেকে রক্ষা পাবে।

পরিশেষে, অভাবীদের সাহায্য করার অর্থ হল একজন ব্যক্তির যেকোনো বৈধ চাহিদা পূরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক চাহিদা। অতএব, কোনও মুসলিম, তার যত কম সম্পদই থাকুক না কেন, অভাবীদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে নিজেকে অজুহাত দিতে পারে না।

সত্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা

আহলে কিতাবদের মধ্যেকার পণ্ডিতরা, ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন এবং পবিত্র কুরআন সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন, কারণ তাদের ঐশী গ্রন্থে উভয়েরই আলোচনা করা হয়েছে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

তাদের অনেকেই বংশ পরম্পরায় মদীনায় বসবাস করতেন কারণ তারা নিশ্চিত ছিলেন যে, এই শহরেই শেষ নবী (সা.) হিজরত করবেন।

যে রাতে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) জন্মগ্রহণ করেন, সেই রাতে হাসান বিন সাবিত (রাঃ) মদিনায় বসবাসকারী আট বছর বয়সী এক বালক ছিলেন। সেই রাতে, একজন জ্ঞানী ইহুদি চিৎকার করে লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঘোষণা করে যে, সেই রাতেই শেষ নবী (সাঃ) এর জন্ম হবে। ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ) এর জীবনী", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫২-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও তারা স্পষ্টভাবে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এবং পবিত্র কুরআনকে চিনতে পেরেছিল, তবুও তাদের অনেকেই নেতৃত্ব এবং সম্পদের মতো পার্থিব লাভের প্রতি ভালোবাসা থেকে ইসলাম ত্যাগ করেছিল, যা তারা প্রদত্ত ঐশ্বরিক শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে অর্জন করেছিল।

সুনানে ইবনে মাজাহের ২৫৩ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি পণ্ডিতদের কাছে নিজেকে দেখানোর জন্য, অন্যদের সাথে তর্ক করার জন্য অথবা নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে, সে জাহান্নামে যাবে।

যদিও পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই সকল কল্যাণের ভিত্তি হলো জ্ঞান, তবুও মুসলমানদের বুঝতে হবে যে জ্ঞান তখনই তাদের উপকার করবে যখন তারা প্রথমে তাদের নিয়ত সংশোধন করবে। অর্থাৎ, তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করে। অন্য সকল কারণ কেবল পুরস্কার হারাতে পারে এমনকি শাস্তিও বয়ে আনবে যদি একজন মুসলিম আন্তরিকভাবে তওবা না করে।

বাস্তবে, জ্ঞান হলো বৃষ্টির পানির মতো যা বিভিন্ন ধরণের গাছের উপর পড়ে। কিছু গাছ এই পানি দিয়ে জন্মায় অন্যদের উপকার করার জন্য, যেমন একটি ফলের গাছ। অন্যদিকে, অন্যান্য গাছ এই পানি দিয়ে জন্মায় এবং অন্যদের জন্য বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। যদিও বৃষ্টির পানি উভয় ক্ষেত্রেই একই, তবুও ফলাফল খুব আলাদা। একইভাবে, ধর্মীয় জ্ঞান মানুষের জন্য একই, কিন্তু যদি কেউ ভুল উদ্দেশ্য গ্রহণ করে তবে তা তাদের ধ্বংসের উপায় হয়ে উঠবে। বিপরীতে, যদি কেউ সঠিক উদ্দেশ্য গ্রহণ করে তবে তা তাদের মুক্তির উপায় হয়ে উঠবে।

তাই মুসলমানদের সকল বিষয়ে তাদের নিয়ত সংশোধন করা উচিত, কারণ এর ভিত্তিতেই তাদের বিচার করা হবে। সহীহ বুখারী, ১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এবং তাদের মনে রাখা উচিত যে জাহান্নামে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হবেন একজন পণ্ডিত যিনি কেবল অন্যদের দেখানোর জন্য জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সহীহ মুসলিম, ৪৯২৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এছাড়াও, জ্ঞানের উপর আমল করার সাথে সৎ উদ্দেশ্যকে যুক্ত করতে হবে, কারণ কর্ম ছাড়া জ্ঞান উপকারী জ্ঞান নয়, এটি কেবল তথ্য। জ্ঞানের উপর আমল না করা একজন ডাক্তারের মতো, যে মানুষের চিকিৎসার জন্য তার চিকিৎসা জ্ঞান প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়। ঠিক যেমন তারা নিজের বা অন্যদের উপকার করে না, তেমনি একজন মুসলিমেরও উপকার হয় না যার কাছে ইসলামী জ্ঞান আছে এবং তা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যক্তিকে জ্ঞানের বই বহনকারী গাধার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সূরা ৬২ আল জুমু'আ, আয়াত ৫:

"...এবং তারপর তা গ্রহণ না করা (তাদের জ্ঞান অনুসারে কাজ না করা) হল সেই গাধার মতো যে [বইয়ের] বই বহন করে..."

এছাড়াও, যে ব্যক্তি বৈধ কারণ ছাড়া জ্ঞান গোপন করবে, তাকে বিচারের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৪৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, মুসলমানদের তাদের উপার্জিত উপকারী জ্ঞান অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়া উচিত। এটি না করা নিছক বোকামি কারণ এটি এমন একটি সৎকর্ম যা একজন মুসলিমের মৃত্যুর পরেও উপকারে আসবে। সুনান ইবনে মাজাহ, ২৪১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যারা জ্ঞান জমা করে রেখেছিল তাদের ইতিহাস ভুলে গেছে কিন্তু যারা তা অন্যদের সাথে ভাগ করে নিয়েছিল তারা মানবজাতির পণ্ডিত এবং শিক্ষক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

পরিশেষে, জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য বিতর্কে অন্যদের পরাজিত করা নয়। একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো দৃঢ় প্রমাণ সহকারে অন্যদের কাছে সত্য সঠিকভাবে উপস্থাপন করা। তর্ক-বিতর্ক এবং বিতর্কের মাধ্যমে মানুষকে সত্য গ্রহণে বাধ্য করার দায়িত্ব তাদের দেওয়া হয়নি। এই মনোভাব মানুষকে কেবল সত্য থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়। পরিবর্তে, তর্ক না করে মানুষকে সত্য ব্যাখ্যা করা উচিত এবং নিজেরাই সেই সত্যের উপর কাজ করে এই সত্যটি দেখানো উচিত। ধার্মিক পূর্বসূরীরা এভাবেই আচরণ করতেন এবং এই পদ্ধতি অন্যদের সত্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকর।

অধিকন্তু, এই ঘটনা মুসলমানদেরকে পার্থিব লাভের জন্য প্রদত্ত ঐশ্বরিক শিক্ষার সাথে আপস না করার শিক্ষা দেয়। এই আপসটিতে ঐশ্বরিক শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করা বা তাদের ইচ্ছানুযায়ী কোন শিক্ষা অনুসরণ করা উচিত এবং কোনটি উপেক্ষা করা উচিত তা বেছে নেওয়া অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। একজন মুসলিমের ইসলামকে এমন একটি পোশাকের মতো ব্যবহার করা উচিত নয় যা তারা যখন খুশি পরতে এবং খুলে ফেলতে পারে। যে ব্যক্তি এইভাবে কাজ করে সে কেবল

তার ইচ্ছামত উপাসনা করে, যদিও তাকে বোকা বানানো হতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করছে এবং উপাসনা করছে। অধ্যায় ২৫ আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

যে ব্যক্তি এই ধরণের আচরণ করে, সে নিঃসন্দেহে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করতে ব্যর্থ হবে। এটি তাদের মানসিক ও শারীরিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অর্জনে বাধা দেবে, যার ফলে তারা এই পৃথিবী বা পরকালেও মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা পাবে, এমনকি যদি তারা আনন্দের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে। যারা এই ধরণের আচরণ করে তাদের দেখলে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ৯ম অধ্যায়, তওবা, ৮২ নং আয়াতে:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন

তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

অতএব, একজন ব্যক্তির অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তার উপর আমল করা উচিত, এমনকি যদি তা তার ইচ্ছার বিপরীত হয়। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন তিনিও ভালো থাকবেন। কারণ একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার জ্ঞান কখনই এই ফলাফল অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে না, যদিও সমস্ত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তাদের জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার কারণে সকল ধরণের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের হাদীসের আকারে মানবজাতিকে এটি দান করেছেন, তাঁর উপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ লক্ষ্য করে যে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এবং যারা তা করে না।

একটি শুভ দিন

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) প্রায়শই সোমবার রোজা রাখতেন। যখন তাঁকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, এই দিনেই তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং যেদিন তাঁর উপর প্রথম ঐশী ওহী নাজিল হয়েছিল। সহীহ মুসলিম, ২৭৫০ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্ম উদযাপন করা উচিত, তাঁর ঐতিহ্য অনুসারে, যা হল সোমবার রোজা রাখা।

সুনানে আন নাসায়ীর ২২১৯ নম্বর হাদিসে পাওয়া গেছে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, রোজা ছাড়া মানুষের সকল সৎকর্ম কেবল তাদের নিজেদের জন্য, কারণ এটি মহান আল্লাহর জন্য এবং তিনি সরাসরি এর প্রতিদান দেবেন।

এই হাদিসটি রোজার অনন্যতা নির্দেশ করে। এটিকে এভাবে বর্ণনা করার একটি কারণ হল, অন্যান্য সমস্ত নেক আমল মানুষের কাছে দৃশ্যমান, যেমন নামাজ, অথবা সেগুলো মানুষের মধ্যে হয়, যেমন গোপন দান। অন্যদিকে, রোজা একটি অনন্য নেক আমল, কারণ অন্যরা কেবল সেগুলো দেখেই জানতে পারে না যে কেউ রোজা রাখছে।

অধিকন্তু, রোজা একটি সৎকর্ম যা মানুষের প্রতিটি দিকের উপর তালা ঝুলিয়ে দেয়। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সঠিকভাবে রোজা রাখে সে মৌখিক এবং শারীরিক পাপ থেকে বিরত থাকবে, যেমন অবৈধ জিনিস দেখা এবং শোনা। এটি নামাজের মাধ্যমেও অর্জন করা হয় তবে নামাজ কেবল অল্প সময়ের জন্য করা হয় এবং অন্যদের কাছে দৃশ্যমান হয়, অন্যদিকে, রোজা সারা দিন ধরে থাকে এবং অন্যদের কাছে অদৃশ্য থাকে। সূরা আল আনকাবুত, আয়াত ৪৫:

"...প্রকৃতপক্ষে, নামাজ অশ্লীলতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

নিচের আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি বৈধ কারণ ছাড়া ফরজ রোজা পূর্ণ করে না সে প্রকৃত মুমিন হবে না, কারণ এ দুটির মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৮৩:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযীতে ৭২৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করে বলেছেন যে, যদি কোন মুসলিম বৈধ কারণ ছাড়া একটিও ফরজ রোজা পালন না করে, তাহলে সে তার হারানো সওয়াব এবং বরকতের ক্ষতিপূরণ করতে পারবে না, এমনকি যদি সে সারা জীবন প্রতিদিন রোজা রাখে।

উপরন্তু, পূর্বে উদ্ধৃত আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রোজা সঠিকভাবে তাকওয়ার দিকে পরিচালিত করে। অর্থাৎ, কেবল দিনের বেলায় অভুক্ত থাকার ফলে তাকওয়ার দিকে পরিচালিত হয় না কিন্তু রোজার সময় পাপ থেকে বিরত থাকা এবং সৎকর্ম করার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া তাকওয়ার দিকে পরিচালিত করে। এই কারণেই জামে আত তিরমিযীতে ৭০৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যদি কেউ মিথ্যা কথা বলা এবং কাজ করা থেকে বিরত না থাকে তবে রোজার কোনও তাৎপর্য থাকবে না। সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৬৯০ নম্বরে পাওয়া অনুরূপ একটি হাদিস সতর্ক করে যে, কিছু রোজাদার ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই পান না। যখন কেউ রোজা রাখার সময় মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের ক্ষেত্রে আরও সচেতন এবং সতর্ক হয়ে ওঠে, তখন এই অভ্যাসটি অবশেষে তাদের উপর প্রভাব ফেলবে, যার ফলে তারা রোজা না থাকলেও একই রকম আচরণ করবে। এটি আসলে প্রকৃত তাকওয়া।

পূর্বে উদ্ধৃত আয়াতে উল্লেখিত ধার্মিকতা রোজার সাথে সম্পর্কিত, কারণ রোজা মানুষের মন্দ কামনা-বাসনা এবং আবেগকে হ্রাস করে। এটি অহংকার এবং পাপের উৎসাহকে বাধা দেয়। কারণ রোজা পেটের ক্ষুধা এবং দৈহিক কামনা-বাসনাকে বাধা দেয়। এই দুটি জিনিস অনেক পাপের দিকে পরিচালিত করে। উপরন্তু, এই দুটি জিনিসের আকাঙ্ক্ষা অন্যান্য অবৈধ জিনিসের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি। তাই যে কেউ রোজার মাধ্যমে এগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তার দুর্বল মন্দ ইচ্ছাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে। এটি প্রকৃত ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে।

যেমনটি আগে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, রোজার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। রোজার প্রথম এবং সর্বনিম্ন স্তর হল এমন জিনিস থেকে বিরত থাকা যা রোজা ভঙ্গ করে, যেমন খাবার। পরবর্তী স্তর হল পাপ থেকে বিরত থাকা যা রোজার ক্ষতি করে এবং রোজার সওয়াব হ্রাস করে, যেমন মিথ্যা বলা। সুনানে আন নাসায়ীর ২২৩৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে। রোজা হল

শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে জড়িত করে এমন একটি স্তর। এটি হল যখন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ পাপ থেকে রোজা রাখে, যেমন চোখ হারাম জিনিসের দিকে তাকানো থেকে, কান হারাম জিনিসের কথা শোনা থেকে ইত্যাদি। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ রোজা না থাকা সত্ত্বেও এইভাবে আচরণ করে। পরিশেষে, রোজার সর্বোচ্চ স্তর হল এমন সমস্ত জিনিস থেকে বিরত থাকা যা মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত নয়, অর্থাৎ, ব্যক্তি তাকে প্রদত্ত সমস্ত নিয়ামত, যেমন তাদের সময়, পাপ বা নিরর্থক উপায়ে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে।

একজন মুসলিমের উচিত তাদের দেহ যেমন বাহ্যিকভাবে রোজা রাখে, তেমনি পাপ বা নিরর্থক চিন্তাভাবনা থেকে বিরত থাকা। তাদের নিজেদের ইচ্ছার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের পরিকল্পনায় অটল থাকা এবং কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এছাড়াও, তাদের অন্তরে আল্লাহর তাকদীরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত, বরং ভাগ্য এবং তা যা-ই আনুক না কেন, আল্লাহকে জেনে রাখা উচিত যে, তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কেবল সর্বোত্তমটিই বেছে নেন, এমনকি যদি তারা এই পছন্দগুলির পিছনের প্রজ্ঞা বুঝতে না পারে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

পরিশেষে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের রোজা গোপন রেখে সর্বোচ্চ সওয়াবের লক্ষ্য রাখা এবং যদি তা এড়ানো সম্ভব হয় তবে অন্যদের না জানানো, কারণ অপ্রয়োজনীয়ভাবে অন্যদের জানানোর ফলে সওয়াব নষ্ট হয় কারণ এটি লোক দেখানোর একটি দিক।

এছাড়াও, আলোচ্য মূল হাদিসটি ইসলামের অভ্যন্তরে নতুন কিছু করার পরিবর্তে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। যে ব্যক্তি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্ম উদযাপন করতে চায়, তার উচিত সোমবার রোজা রাখা এবং পবিত্র কুরআন এবং তাঁর জন্ম উদযাপন বা অন্য কিছু উদযাপনের ক্ষেত্রে তাঁর ঐতিহ্যের বাইরে থাকা অভ্যাসগুলি গ্রহণ করা এড়িয়ে চলা। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি আমল করা হয়, এমনকি যদি তা সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে, তবুও তারা নির্দেশনার দুটি উৎসের উপর তত কম আমল করবে: পবিত্র কুরআন এবং নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য, যা পরবর্তীতে পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বর হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনও বিষয় যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা আল্লাহ তাআলা প্রত্যাখ্যান করবেন। প্রকৃতপক্ষে, নিম্নলিখিত আয়াতটি বিশেষভাবে তখনই অবতীর্ণ হয়েছিল যখন একদল সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, যারা পূর্বে ইহুদি বা খ্রিস্টান ছিলেন, তাদের পূর্বের ধর্মের শিক্ষার উপর আমল চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন যা ইসলামী শিক্ষার বিরোধিতা করে না। এটি তাফসির আল কুরতুবী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৩১-এ আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

অধিকন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করা হবে, তত বেশি তারা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক জিনিসগুলিতে কাজ করতে শুরু করবে। এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে বিপথগামী করে। উদাহরণস্বরূপ, সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ

দেওয়া হবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর কাজ করার অভ্যাস রাখে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পড়ে যাবে এবং এমন আধ্যাত্মিক অনুশীলন করতে শুরু করবে যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে এমন জিনিস বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণী তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান নির্দেশনার দুটি উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বিভ্রান্তিকর অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফর, যেমন কালো জাদু অনুশীলন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 102:

"...সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

তাই একজন মুসলিম অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রয়েছে। এই কারণেই ধর্মীয় উদ্ভাবনগুলিতে কাজ করা যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

আধ্যাত্মিক শুদ্ধিকরণ

যখন মহানবী (সাঃ) দুই বছর বয়সে তাঁর পালিত মা হালিমা বিনতে ধুয়াইবের তত্ত্বাবধানে ছিলেন, তখন সাদা পোশাক পরা দুই ব্যক্তি তুষারে ভরা সোনার পাত্র নিয়ে তাঁর কাছে আসেন। তারা তাঁকে ধরে নিয়ে তাঁর বুক চিরে ফেলেন। তারা তাঁর হৃদপিণ্ড বের করে, ছিঁড়ে ফেলেন এবং সেখান থেকে একটি কালো জমাট বাঁধা অংশ বের করে ফেলে দেন। এরপর তারা সেই তুষার দিয়ে তাঁর হৃদপিণ্ড এবং বুক ধুয়ে ফেলেন যতক্ষণ না তারা সেগুলো সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে ফেলেন। সিরাত ইবনে হিশামের ২৩-২৪ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের অবশ্যই তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় এবং তাদের যত্নাধীন ব্যক্তিদের, যেমন তাদের সন্তানদের, আধ্যাত্মিক হৃদয়কে পরিষ্কার করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। এটি ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।

সহীহ বুখারীর ৫২ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যদি কারো আধ্যাত্মিক হৃদয় সুস্থ থাকে, তাহলে পুরো শরীর সুস্থ হয়ে ওঠে, কিন্তু যদি তার আধ্যাত্মিক হৃদয় কলুষিত হয়, তাহলে পুরো শরীর কলুষিত হয়ে যায়।

প্রথমত, এই হাদিসটি সেই মূর্খ বিশ্বাসকে খণ্ডন করে যেখানে কেউ দাবি করে যে তার কথাবার্তা এবং কাজ খারাপ হলেও তার হৃদয় পবিত্র। কারণ ভেতরে যা আছে তা অবশেষে বাইরের দিকে প্রকাশিত হবে।

আধ্যাত্মিক হৃদয়ের পরিশুদ্ধি তখনই সম্ভব যখন কেউ নিজের থেকে খারাপ বৈশিষ্ট্য দূর করে এবং ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত ভালো বৈশিষ্ট্য দ্বারা সেগুলিকে প্রতিস্থাপন করে। এটি তখনই সম্ভব যখন কেউ ইসলামী শিক্ষা শেখে এবং তার উপর আমল করে যাতে তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহর আদেশ পালন করতে পারে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকতে পারে এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে পারে। এইভাবে আচরণ করলে একটি বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক হৃদয় তৈরি হবে। এই পরিশুদ্ধি তখন শরীরের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রতিফলিত হবে, যেমন একজনের জিহ্বা এবং চোখ। অর্থাৎ, তারা কেবল তাদের আশীর্বাদগুলি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যবহার করবে। সহিহ বুখারী, ৬৫০২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এটি আসলে একটি নিদর্শন যা মহান আল্লাহর তাঁর সৎ বান্দার প্রতি ভালোবাসার ইঙ্গিত দেয়।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই পবিত্রতা সকল পার্থিব সমস্যা সফলভাবে অতিক্রম করবে যাতে তারা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎ কর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অন্যদিকে, যখন কেউ ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করা ছেড়ে দেয়, তখন সে সমাজ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সংস্কৃতি এবং ফ্যাশন দ্বারা

প্রচারিত খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করবে। এই খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ এবং অসুবিধা দেখা দেবে। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

এবং ২৬তম অধ্যায় আশ শু'আরা, আয়াত ৮৮-৮৯:

"যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কারো কোন উপকারে আসবে না। কেবল সেই ব্যক্তিই লাভবান হবে যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।"

ঐশ্বরিক নির্দেশিত লালন-পালন

শৈশবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বদা মহান আল্লাহর আশ্রয়ে ছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে জাহেলিয়াতের যুগে অর্থাৎ ইসলামের পূর্ববর্তী সময়ে প্রচলিত সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর জন্মের আগেই তাঁর পিতা মারা যান এবং তাঁর মাতা মারা যান যখন তিনি মাত্র ছয় বছর বয়সে শিশু ছিলেন। এরপর তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে লালন-পালন করেন, যিনি কয়েক বছর পরে মৃত্যুবরণ করেন, যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আট বছর বয়সে ছিলেন। অবশেষে তাঁর চাচা আবু তালিব বিন আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে লালন-পালন করেন।

যখন মহানবী (সাঃ) পরিণত বয়সে উপনীত হন, তখন তিনি ছিলেন তাঁর উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি, চরিত্র ও সুনামের দিক থেকে সর্বোত্তম, প্রতিবেশীদের মধ্যে সর্বোত্তম, সবচেয়ে বিচক্ষণ, কথাবার্তায় সবচেয়ে সৎ এবং সবচেয়ে বিশ্বস্ত। তিনি অনৈতিকতা এবং অন্যান্য খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। এই কারণে তিনি মক্কার লোকদের মধ্যে আল আমিন, বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "দ্য লাইফ অফ দ্য প্রফেট", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৮, ১৭৩ এবং ১৮০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর এই ঐশ্বরিক সুরক্ষা, যত্ন এবং লালন-পালন থেকে সকল মুসলমানের জন্য তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের সাথে সঠিকভাবে আচরণ এবং লালন-পালন করার একটি শিক্ষা পাওয়া যায়।

সহীহ বুখারীতে ২৪০৯ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি ব্যক্তি একজন অভিভাবক এবং তাই তার তত্ত্বাবধানে থাকা জিনিসপত্রের জন্য দায়ী।

একজন মুসলিমের সবচেয়ে বড় রক্ষাকর্তা হলো তার ঈমান। অতএব, তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে এর দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

এই অভিভাবকত্বের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ, যার মধ্যে রয়েছে বাহ্যিক জিনিস, যেমন সম্পদ, এবং অভ্যন্তরীণ জিনিস, যেমন দেহ। একজন মুসলিমকে ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতিতে এই জিনিসগুলি ব্যবহার করে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিমের উচিত কেবল হালাল জিনিস দেখার জন্য চোখ ব্যবহার করা, কেবল হালাল ও কল্যাণকর কথা বলা এবং তাদের সম্পদ কল্যাণকর ও পুণ্যময় উপায়ে ব্যবহার করা।

এই অভিভাবকত্ব তার জীবনের অন্যান্যদের, যেমন আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একজন মুসলিমকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার পূরণ করে, যেমন তাদের ভরণপোষণ করা এবং সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশেষ করে পার্থিব বিষয়গুলিতে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের তাদের সাথে সদয় আচরণ করা উচিত এই আশায় যে তারা আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হবে। এই অভিভাবকত্বের মধ্যে একজনের সন্তানরাও অন্তর্ভুক্ত। একজন মুসলিমকে উদাহরণ দিয়ে তাদের নেতৃত্ব দিতে হবে, কারণ এটি শিশুদের পরিচালনার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তাদের অবশ্যই

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, কার্যত যেমন মহান আল্লাহকে মেনে চলতে হবে এবং তাদের সন্তানদেরও একই কাজ করতে শেখাতে হবে। এর মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা।

পরিশেষে, এই হাদিস অনুসারে, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু দায়িত্ব রয়েছে যা তাদের উপর অর্পিত হয়েছে। তাই তাদের উচিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান অর্জন করা এবং তা পালনের জন্য কাজ করা, কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ, এবং তাই বিচারের দিনে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৩৪:

"...এবং [প্রত্যেক] অঙ্গীকার পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সর্বদা [যার বিষয়ে] জিজ্ঞাসা করা হবে।"

নিজের যত্নে থাকা ব্যক্তিদের সঠিকভাবে লালন-পালনের গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে , যেখানে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছিলেন যে, একজন পিতামাতা তাদের সন্তানকে সবচেয়ে পুণ্যময় উপহার যা দিতে পারেন তা হল তাদের ভালো চরিত্র শেখানো।

এই হাদিসটি মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে তারা তাদের আত্মীয়স্বজন, যেমন তাদের সন্তানদের, সম্পদ ও সম্পত্তি অর্জন এবং তাদের কাছে হস্তান্তরের চেয়ে তাদের ঈমানের প্রতি বেশি যত্নবান হবে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, পার্থিব উত্তরাধিকার আসে এবং যায়। কত ধনী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন কেবল তাদের মৃত্যুর পরপরই ভেঙে ফেলা এবং ভুলে যাওয়ার জন্য? এই উত্তরাধিকারের কিছু চিহ্ন কেবল মানুষকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার

জন্য সতর্ক করার জন্য টিকে থাকে। এর একটি উদাহরণ হল ফেরাউনের মহান সাম্রাজ্য। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম তাদের সন্তানদের সাম্রাজ্য গড়ে তোলা এবং প্রচুর সম্পদ ও সম্পত্তি অর্জন করার বিষয়ে এতটাই উদ্বিগ্ন যে তারা তাদেরকে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য শেখানো অবহেলা করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং সৃষ্টির প্রতি সদাচারণ। একজন মুসলিমকে এই ভেবে বোকা বানানো উচিত নয় যে তাদের সন্তানদের ভালো আচরণ শেখানোর জন্য তাদের প্রচুর সময় আছে, কারণ তাদের মৃত্যুর মুহূর্ত অজানা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তাছাড়া, যখন বাচ্চারা বড় হয়ে ওঠে এবং তাদের পথে অটল হয়, তখন তাদের ভালো আচরণ শেখানো অত্যন্ত কঠিন। যদি কেউ তাদের সন্তানকে ভালো আচরণ শেখাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা উভয় জগতেই তাদের জন্য কেবল চাপের কারণ হবে।

একজন বাবা-মা তাদের সন্তানকে উত্তম আচরণ শেখানোর সর্বোত্তম উপায় হল উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেওয়া। তাদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা শিখতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে এবং তাদের সন্তানের জন্য অনুসরণীয় একটি বাস্তব আদর্শ হয়ে উঠতে হবে।

আজ সেই দিন যখন একজন মুসলিমের উচিত তাদের সন্তান এবং আত্মীয়স্বজনদের জন্য তারা যে উপহার দিতে চায় তা নিয়ে সত্যিকার অর্থে চিন্তা করা। এভাবেই একজন মুসলিম পরকালের জন্য কল্যাণ প্রেরণ করে এবং পিছনেও কল্যাণ রেখে যায়, যেমন একজন সৎ সন্তান তাদের মৃত পিতামাতার জন্য প্রার্থনা করে, যা তাদের উপকার করে। জামে আত তিরমিযী, ১৩৭৬ নম্বরে

প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, যে ব্যক্তি এভাবে কল্যাণ দ্বারা বেষ্টিত থাকবে, তাকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন।

মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করা

যখন মহানবী (সাঃ) ১২ বছর বয়সে তাঁর চাচা আবু তালিবের সাথে সিরিয়ায় ব্যবসায়িক সফরে যান। পথে তাদের সাথে বাহিরা নামক এক সন্ন্যাসীর দেখা হয়। সন্ন্যাসী তাদের আতিথ্য করেন এবং মন্তব্য করেন যে মহানবী (সাঃ) সকল মানুষের প্রভু এবং শেষ নবী, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তিনি পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থে উল্লিখিত তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। বাহিরা মহানবী (সাঃ) এর সাথে আলোচনা করেন, যা তাঁর ভাগ্যকে আরও প্রমাণ করে। এই কথোপকথনের সময় মহানবী (সাঃ) মন্তব্য করেন যে তিনি আরবের অমুসলিমরা যাদের পূজা করত, লাত এবং উজ্জা, দুটি বিখ্যাত মূর্তি ছাড়া আর কিছুই ঘৃণা করেন না। ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৪-১৭৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর বাহিরা আবু তালিবকে পরামর্শ দেন যে তিনি যেন নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে মক্কায় ফেরত পাঠান এবং তাঁকে সিরিয়ায় আর নিয়ে না যান, কারণ ইহুদি পণ্ডিতরা তাঁকে চিনতে পারবেন এবং ফলস্বরূপ তারা ইসলামের আগমনের সাথে সাথে তাদের মর্যাদা ও সম্পদ হারানোর ভয়ে তাঁর ক্ষতি করতে পারেন। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার", পৃষ্ঠা ৬০-৬১ এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এত অল্প বয়সেও মহানবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সম্প্রদায়ের অন্ধ অনুকরণে মানুষের তৈরি, প্রাণহীন এবং শক্তিহীন মূর্তি পূজা প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণই হলো সত্য প্রত্যাখ্যানের একটি প্রধান কারণ। একজন ব্যক্তির উচিত তাদের সাধারণ জ্ঞানকে কাজে লাগানো এবং প্রমাণ ও স্পষ্ট নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে জীবনযাপনের পথ বেছে নেওয়া এবং পশুর মতো অন্ধভাবে অন্যদের অনুকরণ করা উচিত নয়। এমনকি ইসলামেও অন্ধ অনুকরণ অপছন্দনীয়।

সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪০৪৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যদের, যেমন নিজের পরিবারের, অন্ধভাবে অনুকরণ না করার গুরুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে, ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল না করে যাতে কেউ অন্ধ অনুকরণকে অতিক্রম করে এবং মহান আল্লাহকে আনুগত্য করে, একই সাথে তাঁর প্রভুত্ব এবং তাদের নিজস্ব দাসত্বকে সত্যিকার অর্থে স্বীকৃতি দেয়। এটিই আসলে মানবজাতির উদ্দেশ্য। অধ্যায় ৫১ আয ধরিয়াত, আয়াত ৫৬:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।"

কীভাবে কেউ সত্যিকার অর্থে এমন কাউকে উপাসনা করতে পারে যাকে সে চিনতেও পারে না? শিশুদের জন্য অন্ধ অনুকরণ গ্রহণযোগ্য কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের অবশ্যই জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সত্যিকার অর্থে বুঝতে হবে এবং ধার্মিক পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। অজ্ঞতাই হল সেই কারণ যে কারণে মুসলিমরা তাদের বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালন করে তারা এখনও মহান আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। এই স্বীকৃতি একজন মুসলিমকে কেবল পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সময় নয়, সারা দিন আল্লাহর একজন প্রকৃত বান্দা হিসেবে আচরণ করতে সাহায্য করে। এর মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার

দিকে পরিচালিত করে যা ফলস্বরূপ উভয় জগতেই মন এবং দেহের শান্তির দিকে পরিচালিত করে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎ কর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

কেবলমাত্র এর মাধ্যমেই মুসলমানরা মহান আল্লাহর প্রকৃত দাসত্ব পালন করতে পারবে। আর এটিই হলো সেই অস্ত্র যা একজন মুসলিম তার জীবনে সম্মুখীন হওয়া সকল সমস্যার সমাধান করে। যদি তারা এটি না পায়, তাহলে তারা প্রতিদান না পেয়ে সমস্যার সম্মুখীন হবে। বস্তুত, এটি উভয় জগতেই কেবল আরও সমস্যার সৃষ্টি করবে। অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে ফরজ কর্তব্য পালন করলে ফরজ পূর্ণ হতে পারে কিন্তু উভয় জগতেই মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য এটি প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে নিরাপদে পরিচালিত করবে না। বস্তুত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, অন্ধ অনুকরণ একজনকে অবশেষে তাদের ফরজ কর্তব্য পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবে। এই মুসলিম কেবল কঠিন সময়েই তাদের কর্তব্য পালন করবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে অথবা বিপরীতভাবে।

পরিশেষে, আমাদের বুঝতে হবে যে ইসলামে অন্ধ অনুকরণ অগ্রহণযোগ্য, কারণ প্রতিটি মুসলিমকে স্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতে হবে এবং তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানতে হবে, যাতে তারা প্রতিটি মুহূর্ত এবং নিঃশ্বাসে তা পূরণ করতে পারে। অন্ধ অনুকরণ একজনকে মুসলিম থাকতে পারে কিন্তু এটি প্রতিটি পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর দৃঢ় রাখতে পারবে না এবং ফলস্বরূপ তারা এই পৃথিবীতে মানসিক ও শারীরিক শান্তি পাবে না। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে এক দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন]..."

এবং ১২ নম্বর অধ্যায় ইউসুফ, ১০৮ নম্বর আয়াত:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

এই ঘটনার শেষ অংশে, যেখানে বাহিরা আবু তালিবকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে মক্কায় ফেরত পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন, কারণ আহলে কিতাবদের পণ্ডিতরা ভয় পেয়েছিলেন যে তারা ইসলামের আগমনের সাথে সাথে তাদের মর্যাদা এবং সম্পদ হারাবে, এই ভয়ে, তিনি তাকে মক্কায় ফিরিয়ে আনতে পারেন। এটি পার্থিব জিনিসগুলিকে, যেমন সম্পদকে, অতিরিক্ত ভালোবাসা এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন মুসলিমের ভূমিকা হল পার্থিব জিনিসগুলিকে, যেমন সম্পদকে, পরিত্যাগ করা নয়। তাদের ভূমিকা হল তাদের প্রদত্ত প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদকে একটি হাতিয়ার হিসেবে দেখা যা তাদের উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জনে সহায়তা করবে। এটি তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিক উপায়ে এটি ব্যবহার করবে। যে ব্যক্তি এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ভুলে যায় সে সহজেই তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে এবং তারা তাদের পার্থিব জিনিসপত্র জমা করার এবং ধরে রাখার জন্য বড় পদক্ষেপ নেবে, এমনকি এর ফলে তাদের আল্লাহকে অমান্য করতে হবে, যেমন অন্যদের ক্ষতি করা। এটি উভয় জগতে তাদের জন্য কেবল চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলার দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

অতএব, একজন মুসলিমের কখনই এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তাদের প্রদত্ত প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদই উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জনে সহায়তা করার একটি হাতিয়ার মাত্র।

আল ফুদুলের চুক্তি

এই চুক্তিটি ছিল এমন একটি চুক্তি যে মক্কার কেউ অন্য কারো উপর, বিশেষ করে বিদেশীর উপর অন্যায্য সুবিধা গ্রহণ করবে না। এই চুক্তিটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কায় নবুওয়াত ঘোষণা করার ২০ বছর আগে সম্পাদিত হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই মহান চুক্তিতে অংশ নিয়েছিলেন এবং নবুওয়াত ঘোষণার পর, তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি এখনও এই চুক্তিটি বজায় রাখবেন। ইমাম ইবনে কাথিরের "দ্য লাইফ অফ দ্য প্রফেট", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৬-এ এটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনা মুসলমানদেরকে সমাজের জন্য কল্যাণকর এবং কল্যাণকর কাজে অংশগ্রহণ করতে শেখায়, তা সে যাই হোক না কেন। ধার্মিক পূর্বসূরীদের মৃত্যুর পর থেকে মুসলিম জাতির শক্তি নাটকীয়ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এটা যুক্তিসঙ্গত যে একটি গোষ্ঠীতে লোক সংখ্যা যত বেশি হবে, সেই গোষ্ঠী তত শক্তিশালী হবে, তবুও মুসলমানরা কোনও না কোনওভাবে এই যুক্তিকে অস্বীকার করেছে। মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মুসলিম জাতির শক্তি কেবল হ্রাস পেয়েছে। এটি হওয়ার একটি প্রধান কারণ পবিত্র কুরআনের ৫ম সূরা আল মায়িদা, আয়াত ২ এর সাথে সম্পর্কিত:

"... আর সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

মহান আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন ভালো কাজে একে অপরকে সাহায্য করে এবং খারাপ কাজে একে অপরকে

সাহায্য না করে। এই নির্দেশই নেককার পূর্বসূরীগণ পালন করেছিলেন কিন্তু অনেক মুসলিম তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অনেক মুসলিম এখন দেখেন কে কোন কাজ করছে, তারা কি করছে তা দেখার পরিবর্তে। যদি সেই ব্যক্তি তাদের সাথে সম্পর্কিত হয়, যেমন কোন আত্মীয়, তাহলে তারা তাকে সমর্থন করে, এমনকি যদি জিনিসটি ভালো না হয়। একইভাবে, যদি সেই ব্যক্তির সাথে তাদের কোন সম্পর্ক না থাকে, তাহলে তারা তাকে সমর্থন করা থেকে বিরত থাকে, এমনকি যদি জিনিসটি ভালো হয়। এই মনোভাব নেককার পূর্বসূরীগণের ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে। তারা অন্যদের ভালো কাজে সাহায্য করত, তা নির্বিশেষে যারাই করুক না কেন। প্রকৃতপক্ষে, তারা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের উপর এতটাই নির্ভরশীল ছিল যে, তারা এমন কাউকেও সমর্থন করত যাদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল না যতক্ষণ না এটি একটি ভালো কাজ ছিল।

এর সাথে যুক্ত আরেকটি বিষয় হল, অনেক মুসলিম একে অপরকে ভালো কাজে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা যাকে সমর্থন করছে সে তাদের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে। এই অবস্থা এমনকি পণ্ডিত এবং ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও প্রভাবিত করেছে। তারা অন্যদের ভালো কাজে সাহায্য না করার জন্য নানা অজুহাত তৈরি করে কারণ তাদের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই এবং তারা ভয় পায় যে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ভুলে যাবে এবং তারা যাদের সাহায্য করে তারা সমাজে আরও সম্মান পাবে। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল কারণ সত্যটি পর্যবেক্ষণ করার জন্য কেবল ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কারো উদ্দেশ্য আল্লাহকে খুশি করা, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যদের ভালো কাজে সহায়তা করলে সমাজের মধ্যে তাদের সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ, মহান, মানুষের হৃদয় তাদের দিকে ফিরিয়ে দেবেন, এমনকি যদি তাদের সমর্থন অন্য কোনও সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির জন্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এই পৃথিবী থেকে চলে যান, তখন উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) সহজেই খিলাফতের জন্য চ্যালেঞ্জ জানাতে পারতেন এবং তার পক্ষে প্রচুর সমর্থন পেতেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে সঠিক কাজটি হল আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে মনোনীত করা। উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-কে, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, অন্য কাউকে সমর্থন করলে সমাজ তাঁকে ভুলে যাবে বলে চিন্তিত ছিলেন না। বরং তিনি পূর্বে উল্লিখিত আয়াতের আদেশ পালন

করেছিলেন এবং যা সঠিক তা সমর্থন করেছিলেন। সহীহ বুখারীতে ৩৬৬৭ এবং ৩৬৬৮ নম্বরে প্রাপ্ত হাদিসগুলিতে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এই কাজের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর সম্মান ও সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। যারা ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে অবগত আছেন তাদের কাছে এটি স্পষ্ট।

মুসলমানদের এই বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত, তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করা উচিত এবং অন্যদের কল্যাণে সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত, তা কে করছে তা বিবেচনা না করেই। তাদের সমর্থনের ফলে সমাজে তাদের ভুলে যাওয়া হবে এই ভয়ে পিছপা হওয়া উচিত নয়। যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তারা ইহকাল ও পরকাল উভয় জায়গাতেই কখনও ভুলে যাবে না। প্রকৃতপক্ষে, তাদের সম্মান ও সম্মান উভয় জায়গাতেই বৃদ্ধি পাবে।

এছাড়াও, আলোচিত মূল ঘটনাটি মুসলমানদের তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার গুরুত্ব শেখায়।

সহীহ বুখারীতে ২৭৪৯ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মুনাফিকির একটি দিক।

একজন মুসলিমের সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি হলো মহান আল্লাহর সাথে, যা হলো আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। মানুষের সাথে করা অন্যান্য সমস্ত প্রতিশ্রুতিও অবশ্যই পালন করতে হবে যদি না কারও কাছে একটি বৈধ অজুহাত থাকে, বিশেষ করে যেগুলি একজন

পিতামাতা সন্তানদের সাথে করেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা কেবল শিশুদের খারাপ চরিত্র শেখায় এবং তাদের বিশ্বাস করতে উৎসাহিত করে যে প্রতারণা করা একটি গ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সহিহ বুখারির ২২২৭ নম্বর হাদিসে, আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে তিনি তার বিরুদ্ধে থাকবেন যে তাঁর নামে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তারপর কোনও বৈধ অজুহাত ছাড়াই তা ভঙ্গ করে। বিচারের দিন যার বিরুদ্ধে আল্লাহকে রাখা হয় সে কীভাবে সফল হতে পারে?

পরিশেষে, আলোচিত মূল ঘটনাটি মুসলমানদের অভাবীদের সাহায্য করার গুরুত্ব শেখায়।

সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন।

এ থেকে বোঝা যায় যে, একজন মুসলিম যেভাবে আচরণ করে, মহান আল্লাহ তার সাথেও সেভাবেই আচরণ করেন। ইসলামের শিক্ষার মধ্যে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ১৫২:

"অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব..."

জামে আত তিরমিযী, ১৯২৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে আরেকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদের প্রতি দয়া করে, সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে দয়া লাভ করবে।

দুঃখ-কষ্ট হলো এমন কিছু যা কাউকে উদ্বেগ ও কষ্টের মধ্যে ফেলে। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যের জন্য, পার্থিব হোক বা ধর্মীয়, এই দুঃখ-কষ্ট লাঘব করে, তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা কঠিন পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করবেন। অনেক হাদিসে এটি বিভিন্নভাবে নির্দেশিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জামে আত-তিরমিযী, ২৪৪৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত মুসলিমকে খাবার খাওয়াবে, তাকে কিয়ামতের দিন জান্নাতের ফল খাওয়ানো হবে। আর যে ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত মুসলিমকে পানি পান করাবে, তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা জান্নাতের পানি পান করাবেন।

যেহেতু পরকালের কষ্ট দুনিয়ার কষ্টের তুলনায় অনেক বেশি, তাই একজন মুসলিমের জন্য এই পুরস্কার আটকে থাকে যতক্ষণ না তারা আখেরাতে পৌঁছায়। এটি আরও ইঙ্গিত করে যে একজন মুসলিমের উচিত সর্বদা দুনিয়ার কষ্টের চেয়ে বিচার দিনের কষ্টের প্রতি বেশি মনোযোগী হওয়া। সর্বদা মনে রাখা উচিত যে দুনিয়ার কষ্ট সবসময় ক্ষণস্থায়ী, কম তীব্র এবং আখেরাতের কষ্টের তুলনায় কম সুদূরপ্রসারী হবে। এই উপলব্ধি নিশ্চিত করবে যে তারা আখেরাতের কষ্ট এড়াতে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যে কঠোর পরিশ্রম করবে।

আলোচ্য মূল হাদিসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিম অন্যদের সাহায্য করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করে যাবেন। একজন মুসলিমকে বুঝতে হবে যে, যখন তারা কোন কিছুর জন্য চেষ্টা করে অথবা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা কোন নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন

করার জন্য সাহায্য পায়, তখন ফলাফল সফল হতে পারে অথবা ব্যর্থতায় শেষ হতে পারে। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলা কাউকে কোন কিছুতে সাহায্য করেন, তখন একটি সফল ফলাফল নিশ্চিত হয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ধর্মীয় এবং বৈধ পার্থিব উভয় ক্ষেত্রেই যখন কেউ অন্যকে সাহায্য করে, তখন এই ঐশ্বরিক সাহায্য পাওয়া যায়। উপরন্তু, যদি একজন মুসলিম এই প্রতিদান কামনা করে, তাহলে তাকে অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সাহায্য করতে হবে। এর অর্থ হলো, যাদের সাহায্য করা হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার কোন আশা, আশা বা চাওয়া উচিত নয়।

তাই মুসলমানদের উচিত, নিজেদের স্বার্থে, সকল ভালো কাজে অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করা যাতে তারা উভয় জগতেই মহান আল্লাহর সাহায্য লাভ করতে পারে।

নোবেল মার্চেন্ট

খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট, ইসলামের আগমনের আগে এবং তার পরেও মক্কায় একজন উচ্চ মর্যাদা ও সম্পদের অধিকারী ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি দূরবর্তী দেশে তার পণ্য ব্যবসার জন্য লোক নিয়োগ করতেন। নবুওয়াতের ঘোষণা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তার বিবাহের আগে, তিনি মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ত স্বভাব এবং মহৎ চরিত্রের কথা শুনেছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে তিনি সিরিয়ায় তার পণ্য তার পক্ষ থেকে ব্যবসা করবেন। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) সম্মত হন এবং সিরিয়ায় অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সততার সাথে তার পণ্য ব্যবসা করেন এবং এই ব্যবসায়িক উদ্যোগ থেকে তিনি প্রচুর লাভবান হন। এই ঘটনাটি ইমাম ইবনে কাসিরের, দ্য লাইফ অফ দ্য প্রফেট, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৯-১৯০-এ বর্ণিত হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলাম জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ভালো চরিত্রের শিক্ষা দেয়। এই ঘটনাটি স্পষ্টভাবে সকল ব্যবসায়িক লেনদেনে সৎ ও আন্তরিক থাকার গুরুত্ব প্রদর্শন করে। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে ইবনে মাজাহের ২১৪৬ নম্বর হাদিসে মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদের অনৈতিক মানুষ হিসেবে উত্থিত করা হবে, তবে তারা ছাড়া যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, সৎকর্ম করে এবং সত্য কথা বলে।

এই হাদিসটি ব্যবসায়িক লেনদেনে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য প্রযোজ্য। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে আল্লাহকে ভয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, অন্যদের সাথে

সেভাবেই আচরণ করা উচিত যেভাবে সে মানুষের কাছ থেকে আচরণ পেতে চায়।

ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের কথাবার্তায় সৎ থাকা এবং লেনদেনের সমস্ত বিবরণ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে প্রকাশ করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদিস, সংখ্যা ২০৭৯, সতর্ক করে যে, যখন মুসলিমরা আর্থিক লেনদেনে জিনিসপত্র, যেমন তাদের পণ্যের ত্রুটি, গোপন করে, তখন এর ফলে বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

সৎকর্ম করার মধ্যে রয়েছে অন্যদের সাথে প্রতারণা করা থেকে বিরত থাকা, যাতে তারা অতিরিক্ত মূল্যে জিনিসপত্র কিনে প্রতারণা না করে। একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের সাথে সেই আচরণ করা যা সে অর্থপূর্ণভাবে চায়, সততা এবং সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে। একজন মুসলিম যেমন আর্থিক বিষয়ে দুর্ব্যবহার পছন্দ করেন না, তেমনি তাদেরও অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করা উচিত নয়।

সৎকর্ম করার মধ্যে রয়েছে ইসলাম এবং দেশের আইনে আলোচিত অবৈধ অনুশীলন এড়িয়ে চলা। যদি কেউ তাদের দেশের ব্যবসায়িক আইন নিয়ে সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে তাদের সেখানে ব্যবসা করা উচিত নয়।

অধিকন্তু, সৎকর্ম করার মধ্যে রয়েছে নিজের ব্যবসায়িক সাফল্যকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তাদের ব্যবসা এবং সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য আরাম এবং শান্তির উৎস হয়ে উঠবে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

কিন্তু যারা তাদের ব্যবসায়িক সাফল্যের অপব্যবহার করে তারা দেখতে পাবে যে এটি তাদের চাপ এবং দুর্দশার উৎস হয়ে ওঠে, কারণ তারা মহান আল্লাহকে ভুলে গেছে, যিনি তাদের সাফল্য দিয়েছেন। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন] এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।"

যারা ব্যবসা পরিচালনা করেন তাদের সর্বদা মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা উচিত কারণ এটি অনৈতিকতার দিকে পরিচালিত করে এবং অমরত্ব জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে এবং তার উপর কাজ করতে থাকবে যতক্ষণ না তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা একজন মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন। জামে আত তিরমিযী, ১৯৭১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এছাড়াও, আলোচ্য মূল ঘটনাটি ভালো চরিত্র গ্রহণের গুরুত্বকেও নির্দেশ করে কারণ এটি ভালো মানুষ এবং ভালো জিনিসকে জীবনে আকর্ষণ করে, যেমন ভালো ব্যবসার সুযোগ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে তার ভবিষ্যৎ স্ত্রীর সাথে

পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যিনি পরবর্তীতে তার ভালো চরিত্রের কারণে মানুষের মধ্যে তার জন্য শক্তি এবং উৎসাহের এক অতুলনীয় উৎস হয়ে ওঠেন। সত্য হল, মানুষ তাদের নিজস্ব চরিত্র অনুসারে মানুষকে তাদের জীবনে আকৃষ্ট করবে। ইতিবাচক চরিত্র ভালো মানুষকে নিজের জীবনে আকৃষ্ট করবে এবং নেতিবাচক চরিত্র খারাপ মানুষকে নিজের জীবনে আকৃষ্ট করবে। সমাজের উপর চিন্তা করলে এটি স্পষ্ট হয়, কারণ এটি স্পষ্ট যে ভালো মানুষ একসাথে থাকে এবং খারাপ মানুষ একসাথে থাকে। খারাপ মানুষ যাদের জীবনে খারাপ চরিত্র আছে তারা কেবল তাদের চাপের কারণ হবে, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। অতএব, যে ব্যক্তি তাদের জীবনে ভালো মানুষ, যেমন একজন ভালো জীবনসঙ্গী এবং বন্ধুবান্ধব, যারা তাদের মানসিক শান্তি বৃদ্ধি করে, তাদের ভালো চরিত্র গ্রহণ করা উচিত।

একটি সৎ জীবনযাপন

সহীহ বুখারীতে ২২৬২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী (সাঃ) নিশ্চিত করেছেন যে, আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত প্রত্যেক নবী (সাঃ) তাদের পবিত্র জীবনের এক পর্যায়ে একজন ভেড়ার রাখাল ছিলেন। আর নবুওয়াত ঘোষণার আগে, মহানবী (সাঃ) মক্কার কিছু লোকের দ্বারা রাখাল হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।

সহীহ বুখারীতে ২০৭২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, কেউ নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম কিছু খায়নি।

মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, অলসতাকে আল্লাহর উপর ভরসা করার সাথে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম বৈধ পেশা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সামাজিক সুবিধা গ্রহণ করে এবং মসজিদে বাস করে দাবি করে যে তারা তাদের ভরণপোষণের জন্য মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে। এটি মোটেও মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা নয়। এটি কেবল অলসতা যা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে। সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর উপর প্রকৃত আস্থা হল ইসলামের শিক্ষা অনুসারে বৈধ সম্পদ অর্জনের জন্য আল্লাহ একজন ব্যক্তিকে যে উপায়গুলি দিয়েছেন, যেমন তাদের শারীরিক শক্তি, ব্যবহার করা এবং তারপর বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ এই উপায়গুলির মাধ্যমে তাকে বৈধ সম্পদ প্রদান করবেন। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার উদ্দেশ্য হল, তাঁর সৃষ্ট উপায়গুলি ব্যবহার করা ছেড়ে দেওয়া নয়, কারণ এটি তাদের অকেজো করে দেবে এবং আল্লাহ অকেজো জিনিস সৃষ্টি করেন না। আল্লাহর উপর ভরসা করার উদ্দেশ্য হলো সন্দেহজনক বা অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন থেকে বিরত রাখা, কারণ একজন মুসলিমের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের রিজিক, যার মধ্যে সম্পদও অন্তর্ভুক্ত, আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছরেরও বেশি আগে তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে

এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এই বন্টন কোনও অবস্থাতেই পরিবর্তিত হতে পারে না। একজন মুসলিমের কর্তব্য হল বৈধ উপায়ে তা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা, যা পবিত্র নবীগণের (সাঃ) ঐতিহ্য। সহীহ বুখারী, ২০৭২ নম্বর হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে। আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত উপায় ব্যবহার করা, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার একটি দিক, কারণ তিনি তাদেরকে এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত অলসতা প্রদর্শন না করা, যখন তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টা এবং আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এবং প্রদত্ত উপায়ের মাধ্যমে বৈধ সম্পদ অর্জনের উপায় থাকে তখন সামাজিক সুবিধা গ্রহণ করে।

পরিশেষে, মূল হাদিসটি বোঝা এবং তার উপর আমল করা একজনকে অন্যদের, যেমন সরকার বা আত্মীয়স্বজনের উপর নির্ভর করার থেকে স্বাধীন হতে উৎসাহিত করে। পরিবর্তে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত উপায়গুলি ব্যবহার করা উচিত এবং সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের বরাদ্দকৃত বৈধ রিযিক তাদের কাছে পৌঁছাবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একমাত্র মহান আল্লাহর উপর আস্থা রাখবে।

এছাড়াও, আলোচ্য মূল ঘটনাটি মুসলিমদেরকে এমন আইনসম্মত পেশা থেকে বিরত থাকতে শেখায় যা সমাজ অবজ্ঞা করতে পারে। একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো তাদের চাহিদা এবং দায়িত্ব পূরণের জন্য বৈধ জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করা। তাই, সমাজ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন বা সংস্কৃতির মতামত দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়, যতক্ষণ না এই মহৎ লক্ষ্য পূরণ হয়। ইসলাম সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমতা শিক্ষা দেয়। অতএব, শুধুমাত্র চাকরির কারণেই একজন ব্যক্তিকে ইসলামের দৃষ্টিতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী বলে মনে করা হয় না। ইসলামের দৃষ্টিতে কার মর্যাদা উচ্চতর, তাকওয়া, তা নির্ধারণ করে। অর্থাত, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে, সে যত বেশি তার প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করবে, তত বেশি তার মর্যাদা থাকবে। লিঙ্গ , জাতিগততা বা

চাকরির মতো অন্যান্য সকল মানদণ্ডের এই ক্ষেত্রে কোন মূল্য নেই। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের প্রদত্ত সম্পদ ব্যবহার করে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে যাতে তারা তাদের বৈধ জীবিকা অর্জনের জন্য একটি ভালো বৈধ চাকরি পেতে পারে এবং মানুষের সমালোচনার সাথে বিরক্ত না হয়।

খাদিজা (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ

নবুওয়াত ঘোষণার আগে, খাদিজা (রাঃ) যখন মহানবী (সাঃ)-এর মহৎ চরিত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তিনি প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন কারণ তিনি নিজে একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মহৎ, অত্যন্ত সম্মানিত এবং বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯০-এ এটি বর্ণিত হয়েছে।

এই ঘটনাটি স্পষ্ট করে যে মুসলমানদের তাদের ভালো চরিত্রের ভিত্তিতে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা উচিত। সহীহ বুখারীতে ৫০৯০ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তিকে চারটি কারণে বিবাহ করা হয়: তার সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য অথবা তার ধার্মিকতার জন্য। তিনি এই সতর্ক করে শেষ করেছেন যে, একজন ব্যক্তির তাকওয়ার জন্য বিবাহ করা উচিত, অন্যথায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এই হাদিসে উল্লেখিত প্রথম তিনটি জিনিস খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং অসম্পূর্ণ। এগুলো হয়তো কাউকে ক্ষণস্থায়ী সুখ দিতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই জিনিসগুলো তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে কারণ এগুলো বস্তুগত জগতের সাথে যুক্ত, চূড়ান্ত এবং স্থায়ী সাফল্য প্রদানকারী জিনিসের সাথে নয়, অর্থাৎ বিশ্বাসের সাথে। সম্পদ সুখ বয়ে আনে না তা বোঝার জন্য কেবল ধনী এবং বিখ্যাতদের পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, ধনীরা পৃথিবীর সবচেয়ে অসন্তুষ্ট এবং অসুখী মানুষ। বংশের জন্য কাউকে বিয়ে করা বোকামি কারণ এটি নিশ্চিত করে না যে ব্যক্তিটি একজন ভালো জীবনসঙ্গী হবে। প্রকৃতপক্ষে, যদি বিবাহ সফল না হয়, তবে এটি বিয়ের আগে দুটি পরিবারের মধ্যে যে পারিবারিক বন্ধন ছিল তা ধ্বংস করে দেয়। শুধুমাত্র সৌন্দর্যের জন্য, অর্থাৎ ভালোবাসার জন্য বিয়ে করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কারণ এটি একটি অস্থির

আবেগ যা সময়ের সাথে সাথে এবং মেজাজের সাথে পরিবর্তিত হয়। প্রেমে ডুবে থাকা কত দম্পতি একে অপরকে ঘৃণা করতে শুরু করে?

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে একজন দরিদ্র জীবনসঙ্গী খুঁজে বের করা উচিত, যেমনটি এমন কাউকে বিয়ে করা গুরুত্বপূর্ণ যে আর্থিকভাবে পরিবারকে সাহায্য করতে পারে। এর অর্থ এইও নয় যে একজনের তার জীবনসঙ্গীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়, কারণ এটি একটি সুস্থ বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তবে এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে এই জিনিসগুলি কোনও ব্যক্তির বিবাহের প্রধান বা চূড়ান্ত কারণ হওয়া উচিত নয়। একজন মুসলিমের একজন স্ত্রীর মধ্যে যে প্রধান এবং চূড়ান্ত গুণটি সন্ধান করা উচিত তা হল ধার্মিকতা। এটি তখনই ঘটে যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। সহজ কথায়, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভয় করে, সে সুখ এবং অসুবিধা উভয় সময়েই তার স্ত্রীর সাথে ভাল আচরণ করবে। অন্যদিকে, যারা ধর্মহীন তারা যখনই মন খারাপ করবে তখনই তার স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মুসলমানদের মধ্যে পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ার এটি একটি প্রধান কারণ। এবং এমনকি যখন তারা তাদের স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তখনও তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে তাদের অধিকার পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, যা দূর করতে ধার্মিকতা সাহায্য করে। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ২৮:

"... আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল তারাই ভয় করে, যারা জ্ঞানী..."

পরিশেষে, ধার্মিক ব্যক্তি সর্বদা অন্যদের অধিকার পূরণের ব্যাপারে বেশি চিন্তিত থাকে, যেমন তাদের স্ত্রী, তার চেয়ে তারা মানুষের অধিকার পূরণের ব্যাপারে বেশি চিন্তিত। কারণ তারা বোঝে যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে

তারা মানুষের অধিকার পূরণ করেছে কিনা। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন না যে মানুষ তাদের অধিকার পূরণ করেছে কিনা, কারণ এটি তখনই মোকাবেলা করা হবে যখন আল্লাহ অন্যদের প্রশ্ন করবেন, যখন তিনি তাদের প্রশ্ন করবেন না। অন্যদিকে, দুষ্ট মুসলিম কেবল তাদের অধিকার সম্পর্কেই চিন্তিত থাকবে, সেই অধিকারগুলি যা তারা সমাজ, সংস্কৃতি, ফ্যাশন এবং তাদের কল্পনা থেকে নিয়েছে, ইসলাম থেকে নয়। ফলস্বরূপ, তারা কখনই তাদের স্ত্রীর প্রতি সত্যিকার অর্থে সন্তুষ্ট হবে না, এমনকি যদি তাদের স্ত্রী ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার পূরণ করে। এই কারণেই ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং বিবাহবিচ্ছেদ এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

পরিশেষে, যদি কোন মুসলিম বিয়ে করতে চায়, তাহলে তাকে প্রথমে এর সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যেমন তাদের স্ত্রীর উপর তাদের কী অধিকার, তাদের স্ত্রীর উপর তাদের কী অধিকার এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের স্ত্রীর সাথে কীভাবে সঠিকভাবে আচরণ করতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত, এই বিষয়ে অজ্ঞতা অনেক বিতর্ক এবং বিবাহবিচ্ছেদের দিকে পরিচালিত করে কারণ লোকেরা এমন কিছু দাবি করে যা তাদের স্ত্রী পূরণ করতে বাধ্য নয়। অতএব, জ্ঞান, যা ধার্মিকতার মূল, একটি সুস্থ ও সফল বিবাহের ভিত্তি।

কাবা পুনর্নির্মাণ

নবুওয়াত ঘোষণার পূর্বে, আল্লাহর ঘর, মহিমান্বিত কাবা, ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাই মক্কার লোকেরা এটি পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। মক্কার অমুসলিমদের নেতারা কেবল সৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদ কাবা পুনর্নির্মাণে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন, এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য। সিরাত ইবনে হিশামের ২৯ পৃষ্ঠায় এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যখন কালো পাথরটিকে তার স্থানে তুলে নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল, তখন তারা একটি গুরুতর এবং সম্ভাব্য সহিংস বিবাদে জড়িয়ে পড়েন, কে এটি স্থাপন করবে তা নিয়ে। তারা সকলেই একমত হয়েছিলেন যে তারা কাবার চারপাশের পবিত্র স্থানে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তিকে সিদ্ধান্ত নিতে দেবেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন এই ব্যক্তি এবং যেহেতু তারা সকলেই তাঁকে বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তাই তারা তাঁর পরামর্শ মেনে নিতে পেরে খুশি হন। তিনি কালো পাথরটিকে একটি কাপড়ের মাঝখানে রাখার পরামর্শ দেন এবং স্থানীয় গোত্রের নেতাদের প্রত্যেককে কাপড়ের একটি কোণ ধরতে নির্দেশ দেন। এরপর তারা কালো পাথরটি উপরে তুলে নেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পাথরটি তুলে নেন এবং এটি স্থাপন করেন। এই ঘটনাটি ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯৭-১৯৮-এ আলোচনা করা হয়েছে।

যদি মুশরিকরা কেবল ভালো জিনিস ব্যবহারের গুরুত্ব বুঝতে পারত, তাহলে মুসলমানদের আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে যাতে তারা কেবল হালাল জিনিসই উপার্জন এবং ব্যবহার করতে পারে।

আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের পথে একটি বড় বাধা হলো অবৈধ সম্পদ উপার্জন এবং ব্যবহার করা। এটি একটি মহাপাপ এবং যেকোনো মূল্যে এড়িয়ে চলতে হবে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদিস থেকে স্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা এমন কোনও নেক আমল গ্রহণ করেন না যার ভিত্তি হারাম। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি অবৈধ সম্পদ উপার্জন করে এবং পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য তা ব্যবহার করে, সে দেখতে পাবে যে সে তার সময় নষ্ট করেছে এবং পাপ ছাড়া তার কিছুই লাভ হয়নি। এই মনোভাব আল্লাহ তাআলার ভয় ধারণের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে। তিনি কেবল তাদের কাছ থেকে জিনিস গ্রহণ করেন যারা তাঁকে ভয় করে। সূরা ৫ আল মায়িদা, আয়াত ২৭:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহ কেবল সৎকর্মশীলদের [যারা তাঁকে ভয় করে] কাছ থেকে গ্রহণ করেন।"

সহীহ বুখারীতে (১৪১০) পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে দিয়েছে যে, মহান আল্লাহ কেবল সেই হালাল সম্পদই গ্রহণ করেন যা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিমে (২৩৪৬) পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, অবৈধ সম্পদ উপার্জনকারী এবং ব্যবহারকারীর দোয়াও আল্লাহ তাআলা প্রত্যাখ্যান করেন।

বাস্তবে, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য একজন ব্যক্তির কেবল সামান্য কিছুরই প্রয়োজন। ধার্মিক পূর্বসূরীদের কাছ থেকে এটা স্পষ্ট যে, অযৌক্তিকতা থেকে দূরে থাকা, মধ্যপন্থী জীবনযাপনের মাধ্যমে অবৈধ বা সন্দেহজনক সম্পদ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা সম্ভব। এটা স্পষ্ট যে, কেউ কেবল তার অপ্রয়োজনীয় আকাঙ্ক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষার কারণেই অবৈধ সম্পদের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

অধিকন্তু, কালো পাথর স্থাপনের ঘটনাটি মুসলিমদের মধ্যে কলহ ও মতবিরোধ দূর করার লক্ষ্যে ইতিবাচক মনোভাব গ্রহণের গুরুত্বকে নির্দেশ করে । প্রকৃতপক্ষে, এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি পবিত্র কুরআনের ৪র্থ সূরা আন নিসার ১১৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনের বেশিরভাগের মধ্যেই কোন কল্যাণ নেই, তবে যারা দান-খয়রাতের নির্দেশ দেয়, সৎকর্মের নির্দেশ দেয় অথবা মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ কাজ করে, আমি তাকে বিরাট প্রতিদান দেব।"

মানুষের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের অর্থ হলো অন্যদের সাথে গঠনমূলক মানসিকতার সাথে কথোপকথন করা যা মানুষকে ইতিবাচকভাবে একত্রিত করে, বরং এমন ধ্বংসাত্মক মানসিকতা ধারণ করে যা সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। যদি কেউ মানুষকে ভালোবাসার মাধ্যমে একত্রিত করতে না পারে, তাহলে তার সর্বনিম্ন কাজ হলো তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা নয়। এমনকি যদি এটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, তাহলে এটি একটি সৎকর্ম হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। সহিহ বুখারী, ২৫১৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আবু দাউদের ৪৯১৯ নম্বর একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুই বিরোধী মুসলিমের মধ্যে পুনর্মিলন করা নফল নামাজ এবং রোজার চেয়েও উত্তম। সমাজের মধ্যে পাওয়া প্রতিটি ভালো জিনিসই ছিল স্কুল, হাসপাতাল এবং মসজিদ নির্মাণের মতো এই ধার্মিক মনোভাবের ফল।

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিম কেবল তখনই এই আয়াতে উল্লেখিত মহান প্রতিদান পাবে যখন সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সৎকর্ম করবে। কেবল তাদের শারীরিক কর্মের ভিত্তিতে নয়, তাদের নিয়তের ভিত্তিতে পুরস্কৃত করা হবে। সহীহ বুখারী, ১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কপট মুসলিমরা দেখতে পাবে যে বিচারের দিন তাদের বলা হবে যে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরষ্কার পেতে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

এছাড়াও, কালো পাথর স্থাপনের ঘটনাটি সমাজের মধ্যে ঐক্যের দিকে পরিচালিত করে এমন ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করার গুরুত্বকে নির্দেশ করে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪১ নম্বর হাদিসে সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রথমে মুসলমানদের একে অপরকে হিংসা না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

যখন একজন ব্যক্তি অন্য কারোর অর্থপূর্ণ আশীর্বাদ পেতে চায়, তখন সে চায় মালিক যেন সেই আশীর্বাদ হারিয়ে ফেলুক। এবং এর সাথে এই বিষয়টিও জড়িত যে, মালিককে তার পরিবর্তে মহান আল্লাহ তাআলা আশীর্বাদ দিয়েছেন। কেউ কেউ কেবল এটি তাদের হৃদয়ে প্রকাশ করতে চান, তাদের কর্ম বা কথার মাধ্যমে তা প্রকাশ না করে। যদি তারা তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি অপছন্দ করে, তাহলে আশা করা যায় যে তাদের হিংসার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। কেউ কেউ তাদের কথা এবং কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে আশীর্বাদ

কেড়ে নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, যা নিঃসন্দেহে একটি পাপ। সবচেয়ে খারাপ ধরণ হল যখন একজন ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, এমনকি ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি আশীর্বাদ না পেলেও।

হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তার অনুভূতির উপর নির্ভর করে না, তার অনুভূতি অপছন্দ করে এবং পরিবর্তে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে যাতে মালিক তার আশীর্বাদ হারাতে না পারে। যদিও এই ধরণের হিংসা পাপ নয় তবুও এটি অপছন্দনীয় যদি হিংসা পার্থিব আশীর্বাদের উপর হয় এবং কেবল ধর্মীয় আশীর্বাদের সাথে জড়িত থাকলে প্রশংসনীয় হয়। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিমের ১৮৯৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল যখন একজন ব্যক্তি এমন ব্যক্তির প্রতি হিংসা করে যে হালাল সম্পদ অর্জন করে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যয় করে। দ্বিতীয়টি হল যখন একজন ব্যক্তি এমন ব্যক্তির প্রতি হিংসা করে যে তার জ্ঞান এবং জ্ঞানকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করে এবং অন্যদের তা শিক্ষা দেয়।

পূর্বে উল্লেখিত খারাপ ধরণের হিংসা, সরাসরি আল্লাহর পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন আল্লাহ, তার পরিবর্তে অন্য কাউকে একটি বিশেষ আশীর্বাদ প্রদান করে ভুল করেছেন। এই কারণেই এটি একটি মহাপাপ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক সতর্ক করা হয়েছে যে, সুনানে আবু দাউদের ৪৯০৩ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, হিংসা নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয় ঠিক যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

একজন ঈর্ষাপরায়ণ মুসলিমকে জামে আত তিরমিযী, ২৫১৫ নম্বরে বর্ণিত হাদিসের উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি পরামর্শ দেয় যে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে,

অন্যদের জন্য তাই ভালোবাসে। তাই একজন ঈর্ষাপরায়ণ মুসলিমের উচিত, ঈর্ষা করা ব্যক্তির প্রতি ভালো চরিত্র এবং দয়া প্রদর্শন করে তার হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তার ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তার জন্য প্রার্থনা করা যতক্ষণ না তার ঈর্ষা তার জন্য ভালোবাসায় পরিণত হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, তাদের ঈর্ষা করা ব্যক্তির অধিকার পূরণ করা চালিয়ে যাওয়া উচিত। তাদের ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করা উচিত যাতে তারা বুঝতে পারে যে, মহান আল্লাহ প্রতিটি ব্যক্তিকে সর্বোত্তম জিনিস দান করেন এবং যদি তাদের কোন বিশেষ পার্থিব নিয়ামত না দেওয়া হয়, তাহলে এর অর্থ হল এটি না থাকাই তাদের জন্য ভালো। সূরা ২ আল বাকারাহ, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে আরেকটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলিমদের একে অপরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এর অর্থ হলো, আল্লাহ যদি কোন কিছু অপছন্দ করেন, তবেই কেবল তা অপছন্দ করা উচিত। সুনানে আবু দাউদের ৪৬৮১ নম্বর হাদিসে ঈমান পূর্ণ করার একটি দিক হিসেবে এটি বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী জিনিস বা মানুষ অপছন্দ করা উচিত নয়। যদি কেউ অন্য কাউকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী অপছন্দ করে, তাহলে তাদের কথা বা কাজে কখনোই এর প্রভাব পড়তে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি পাপ। একজন মুসলিমের উচিত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, সম্মান ও সদয়তার সাথে অন্যের সাথে আচরণ করে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা। একজন মুসলিমের মনে রাখা উচিত যে, অন্যরা যেমন নিখুঁত নয়, তেমনই তারাও নিখুঁত নয়। এবং যদি অন্যদের মধ্যে খারাপ গুণাবলী থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে তাদেরও ভালো গুণাবলী থাকবে। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের তাদের খারাপ গুণাবলী ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত, কিন্তু তাদের ভালো গুণাবলীকে ভালোবাসতে হবে। একজন মুসলিমের অবশ্যই পাপ অপছন্দ

করা উচিত, কিন্তু ব্যক্তিকে নয়, কারণ একজন ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহর কাছে তওবা করতে পারে। তাদের অবশ্যই ইসলামের সীমানার মধ্যে পাপের প্রতি তাদের অপছন্দ প্রদর্শন করতে হবে। তাদের উচিত মন্দ কাজের বিরুদ্ধে অন্যদেরকে নম্রভাবে উপদেশ দেওয়া, কারণ কঠোর আচরণ প্রায়শই মহান আল্লাহর দিকে ফিরে আসা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়।

এই বিষয়ে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। যে মুসলিম কোন নির্দিষ্ট আলেমকে অনুসরণ করে এবং একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের সমর্থক, তার উচিত একজন ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তার আলেম সর্বদা সঠিক, এবং সেই সাথে যারা তাদের আলেমের মতামতের বিরোধিতা করে তাদের ঘৃণা করা উচিত নয়। এই আচরণ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আলেমদের মধ্যে বৈধ মতপার্থক্য থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত একজন নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণকারী মুসলিমের উচিত এটিকে সম্মান করা এবং অন্যদের অপছন্দ করা নয় যারা তাদের অনুসরণকারী আলেমের বিশ্বাসের সাথে ভিন্ন।

আলোচ্য মূল হাদিসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, মুসলিমদের একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। এর অর্থ হলো, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের পার্থিব বিষয় নিয়ে অন্য মুসলিমদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় এবং তাদের সমর্থন করতে অস্বীকার করা উচিত নয়। সহিহ বুখারির ৬০৭৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, একজন মুসলিমের জন্য পার্থিব বিষয় নিয়ে অন্য মুসলিমের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা অবৈধ। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি পার্থিব বিষয় নিয়ে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকে সেই ব্যক্তির মতো বিবেচনা করা হয় যে অন্য মুসলিমকে হত্যা করেছে। সুনানে আবু দাউদের ৪৯১৫ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা কেবল ঈমানের ক্ষেত্রেই বৈধ। তবুও একজন মুসলিমের উচিত অন্য মুসলিমকে আন্তরিকভাবে তওবা করার পরামর্শ দেওয়া এবং কেবল তখনই তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা যদি তারা উন্নতির জন্য

পরিবর্তন করতে অস্বীকৃতি জানায়। যখন তাদের অনুরোধ করা হয় তখন তাদের বৈধ বিষয়গুলিতে তাদের সমর্থন করা উচিত, কারণ এই দয়ার কাজ তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে তওবা করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আলোচ্য মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলিমদের একে অপরের ভাইয়ের মতো থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি কেবল তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন তারা এই হাদিসে দেওয়া পূর্ববর্তী উপদেশ মেনে চলে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্য মুসলিমদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করে, যেমন ভালো কাজে অন্যদের সাহায্য করা এবং মন্দ কাজ থেকে সতর্ক করা। ৫ম সূরা আল মায়িদা, আয়াত ২:

"...এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

সহীহ বুখারীতে ১২৪০ নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে যে, একজন মুসলিমের উচিত অন্য মুসলিমদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলো পূরণ করা: ইসলামিক সালামের জবাব দেওয়া, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তাদের জানাজায় অংশ নেওয়া এবং হাঁচি দেওয়া ব্যক্তিকে আল্লাহর প্রশংসা করার জবাব দেওয়া। একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যান্য মানুষের, বিশেষ করে অন্যান্য মুসলিমদের, তাদের উপর যে অধিকার রয়েছে তা শিখতে হবে এবং পূরণ করতে হবে, কারণ বিচারের দিন প্রতিটি ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তারা অন্য মানুষের অধিকার পূরণ করেছে কিনা। অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা মানুষের কাছ থেকে আচরণ পেতে চায়।

আলোচ্য মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুসলিমের অন্য মুসলিমের সাথে অন্যায় করা, তাকে ত্যাগ করা বা ঘৃণা করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি যে পাপ করে তা ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপীকে এমনভাবে ঘৃণা করা উচিত নয় যে তারা যেকোনো সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে।

সুনানে আবু দাউদের ৪৮৮৪ নম্বর হাদিসে মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্য মুসলিমকে অপমান করে, আল্লাহ তাকে অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে অপমান থেকে রক্ষা করবে, আল্লাহ তাকে হেফাজত করবেন।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে উল্লেখিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি যখন কেউ অহংকার গ্রহণ করে তখন বিকশিত হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিস অনুসারে, অহংকার হল যখন কেউ অন্যদের অবজ্ঞার চোখে দেখে। অহংকারী ব্যক্তি নিজেকে নিখুঁত মনে করে এবং অন্যদের অসম্পূর্ণ মনে করে। এটি তাকে অন্যদের অধিকার পূরণ করতে বাধা দেয় এবং অন্যদের অপছন্দ করতে উৎসাহিত করে। এবং অহংকার একজনকে সত্য উপস্থাপন করা হলে তা প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করে, কারণ এটি তাদের কাছ থেকে আসেনি এবং তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত আরেকটি বিষয় হলো, প্রকৃত তাকওয়া মানুষের শারীরিক চেহারা, যেমন ইসলামী পোশাক পরিধানের মধ্যে নয়, বরং এটি একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। এই অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বাহ্যিকভাবে আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এটি নিশ্চিত করে যে কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। এই কারণেই সহীহ মুসলিমের

৪০৯৪ নম্বর হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, যখন আধ্যাত্মিক হৃদয় পবিত্র হয়, তখন পুরো শরীর পবিত্র হয়ে যায় কিন্তু যখন আধ্যাত্মিক হৃদয় কলুষিত হয়, তখন পুরো শরীর কলুষিত হয়ে যায়। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ বাহ্যিক চেহারা, যেমন সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের উদ্দেশ্য এবং কর্ম বিবেচনা করেন। সহীহ মুসলিমের ৬৫৪২ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, একজন মুসলিমকে ইসলামের শিক্ষা শেখার এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং সৃষ্টির সাথে তাদের যোগাযোগের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য মূল হাদিসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, একজন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমকে ঘৃণা করা পাপ। এই ঘৃণা পার্থিব জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের অপছন্দ না করা। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা এবং ঘৃণা করা, নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। সুনানে আবু দাউদের ৪৬৮১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তবুও, একজন মুসলিমকে অবশ্যই সকল ক্ষেত্রেই অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে এবং কেবল তাদের পাপকেই ঘৃণা করতে হবে, প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে। উপরন্তু, তাদের অপছন্দ কখনই তাদেরকে ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে না, কারণ এটি প্রমাণ করবে যে তাদের ঘৃণা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। পার্থিব কারণে অন্যদের ঘৃণা করার মূল কারণ হল অহংকার। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এক অণু পরিমাণ অহংকার একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহিহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মূল হাদিসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, একজন মুসলিমের জীবন, সম্পত্তি এবং সম্মান সবকিছুই পবিত্র। একজন মুসলিমের উচিত এই

অধিকারগুলির কোনওটিই লঙ্ঘন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসায়ী, ৪৯৯৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুসলিম হতে পারে না যতক্ষণ না সে অমুসলিম সহ অন্যদের ক্ষতিকর কথাবার্তা এবং কাজ থেকে রক্ষা করে। আর একজন প্রকৃত মুমিন হলেন সেই ব্যক্তি যিনি অন্যদের জীবন ও সম্পত্তি থেকে তাদের মন্দ কাজ দূরে রাখেন। যে ব্যক্তি এই অধিকার লঙ্ঘন করে তাকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তার শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেন। যদি তারা তা না করে, তাহলে বিচারের দিন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে অত্যাচারীর সৎকর্ম ভুক্তভোগীকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে ভুক্তভোগীর পাপ ভুক্তভোগীকে দেওয়া হবে। এর ফলে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহিহ মুসলিমে, ৬৫৭৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই সতর্কীকরণ করা হয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের সাথে ঠিক সেই আচরণ করা যেমন সে চায় অন্যরা তার সাথে করুক। এটি একজন ব্যক্তির জন্য অনেক আশীর্বাদ বয়ে আনবে এবং তাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করবে।

শেষ নবী (সা.)- এর আগমনের পূর্বাভাস

নবুওয়াত ঘোষণার আগে, ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মের পণ্ডিতরা, যারা মূলত মদিনায় বসবাস করতেন, তারা সকলেই শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন, যেমনটি তাদের ঐশী কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আল-আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

উদাহরণস্বরূপ, মদিনায় ইউশা নামে একজন ইহুদি পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রায়শই ঘোষণা করতেন যে আরবের জনগণের কাছে শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেরণের সময় নিকটবর্তী। তিনি মানুষকে এই শেষ নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আহ্বান জানাতেন, যদি তারা তাঁর সময়কাল ধরে বেঁচে থাকে এবং তাঁর আহ্বান প্রত্যক্ষ করে। যখন হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়াত ঘোষণা করেন, তখন ইউশা সেইসব লোকদেরই চূড়ান্ত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাঁকে গ্রহণ

করেছিলেন এবং মুসলিম হয়েছিলেন কিন্তু ইউশা নিজেই হিংসা ও দুষ্টতার কারণে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই ঘটনাটি ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২১২-এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

হিংসা একটি মহাপাপ যা যেকোনো মূল্যে এড়িয়ে চলতে হবে। এটি একটি মহাপাপ কারণ হিংসুক সরাসরি আল্লাহর পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করে। তারা এমন আচরণ করে যেন আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে একটি বিশেষ আশীর্বাদ প্রদান করে ভুল করেছেন। যে ব্যক্তি তাদের হিংসাকে তাদের ঈর্ষা করা ব্যক্তির বিরুদ্ধে মৌখিক ও শারীরিকভাবে লড়াই করতে দেয়, সে কেবল তাদের নিজস্ব সৎকর্মই ধ্বংস করবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪২১০ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। বৈধ হিংসা হল যখন কেউ অন্য কারো অনুরূপ আশীর্বাদ পেতে চায়, যাতে অন্য কেউ তার প্রদত্ত জিনিসটি না হারায়। যদিও এই ধরণের হিংসা বৈধ, তবুও এটি কেবল ধর্মীয় বিষয়ে প্রশংসনীয় এবং পার্থিব বিষয়ে নিন্দনীয়। উদাহরণস্বরূপ, সহিহ মুসলিম, ১৮৯৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দুটি বৈধ ও প্রশংসনীয় ঈর্ষার পরামর্শ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি তাদের জ্ঞান সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যদের তা শেখায়, তাকে ঈর্ষা করা যেতে পারে। অন্য যে ব্যক্তিকে ঈর্ষা করা যেতে পারে সে হল সেই ব্যক্তি যে হালাল সম্পদ অর্জন করে এবং তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে।

হিংসা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি একটি মহাপাপ যা মহান আল্লাহর বণ্টনের পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করে। তাদের বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার জন্য যা সর্বোত্তম তাই দান করেন। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, অন্যদের প্রতি ঈর্ষা করার পরিবর্তে, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এটি উভয় জগতে আরও আশীর্বাদ, মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"... যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাদের [অনুগ্রহে] বৃদ্ধি করব..."

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অন্যদিকে, অন্যদের হিংসা করলে কেবল মহান আল্লাহর আনুগত্য ভুলে যেতে হবে, যা উভয় জগতেই বিপদ ডেকে আনবে। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

যে মুসলিমের উপর ঈর্ষা করা হয় তাকে অবশ্যই তার ঈর্ষাকারীর মৌখিক ও শারীরিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ধৈর্য ধরতে হবে এবং কেবল ইসলামের সীমানার মধ্যেই আত্মরক্ষা করতে হবে। ধৈর্যের অর্থ হলো নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা, যার অর্থ হলো পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত নিয়ামতগুলো ব্যবহার করা। এভাবেই একজন ব্যক্তি তার ঈর্ষাকারী থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। সূরা ১১৩ আল ফালাক, আয়াত ১ এবং ৫:

"বলুন, "আমি প্রভাতের প্রভুর আশ্রয় প্রার্থনা করছি...এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"

তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে তাদের হিংসুকদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়, কারণ মহান আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে কাজ করেন, মানুষের সীমিত চিন্তাভাবনা অনুসারে নয়।

এছাড়াও, ইহুদি ও খ্রিস্টান পণ্ডিতরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ তিনি ছিলেন নবী ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর, তাদের মতো নবী ইসহাকের বংশধর না হয়ে। যদিও এটি ইসলাম প্রত্যাখ্যান করার একটি বোকামিপূর্ণ কারণ ছিল, কিন্তু বাস্তবে তারা মনে করেছিলেন যে শেষ নবী (সাঃ)- তাদেরকে অত্যন্ত সম্মানিত করবেন এবং ভ্রাতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে মানবজাতির নেতা হিসেবে নিযুক্ত করবেন। তাদের বিশ্বাস অনুসারে, এই নেতৃত্ব তাদের সামাজিক মর্যাদা এবং সম্পদ বৃদ্ধি করবে। কিন্তু যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-তাদের সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতি চরম ভালোবাসার কারণে আল্লাহ তাআলার প্রতি তাদের স্পষ্ট অবাধ্যতার গঠনমূলক সমালোচনা করেছিলেন, তখন তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এবং ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অধিকন্তু, আহলে কিতাবরা, বিশেষ করে ইহুদিরা, বংশের প্রতি ভালোবাসায় আচ্ছন্ন ছিল, যা তাদের ঈমানের কেন্দ্রীয় দিক, তাই তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে গ্রহণ বা অনুসরণ করতে পারত না, কারণ তিনি ভিন্ন বংশ থেকে এসেছিলেন। তারা এমন কাউকে গ্রহণ এবং অনুসরণ করতে পারত যা তাদের বংশের নয়, কারণ এটি তাদের বংশের কারণে মানবজাতির উপর তাদের যে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করেছিল তা দূর করবে, যা তারা তৈরি করেছিল।

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত এই বর্ণবাদী মনোভাব এড়িয়ে চলা কারণ এটি ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে। সূরা ৪৯, আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি যত বেশি আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে, তার প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করে, সে তত বেশি উন্নত হয়। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যেহেতু তার নিয়ত এবং অনেক কাজ গোপন থাকে, তাই একমাত্র আল্লাহ তাআলাই পূর্ণভাবে জানেন যে কে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে। অতএব, কেউ কখনোই নিজেকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে ধরে নেবে না, এমনকি যদি তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম আহলে কিতাবের পথ অনুসরণ করে এমন আচরণ করে যেন ইসলাম তাদের জাতি এবং জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত। তারা বিভিন্ন জাতি এবং পটভূমির অন্যান্য মুসলিমদেরকে তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করে। ইসলাম স্পষ্ট করে দেয় যে এটি একটি অজ্ঞতাপূর্ণ মনোভাব কারণ জাতিগত, লিঙ্গ বা বর্ণের মতো কোনও পার্থিব জিনিস যা মানুষকে একে অপরের থেকে আলাদা করে, তা আল্লাহর দৃষ্টিতে তাদের মর্যাদার উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে না।

অন্ধ আনুগত্য

ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মের কিছু পণ্ডিত খোলাখুলিভাবে স্বীকার করতেন যে তাদের ঐশী গ্রন্থে শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উল্লেখিত নিদর্শনগুলি হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে মিলে যায়। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [অর্থাৎ, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাদের একদল সত্যকে গোপন করে, যদিও তারা তা জানে।"

কিন্তু কেউ কেউ কেবল তাদের জাতির প্রতি অন্ধ আনুগত্যের কারণে তাঁকে এবং ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যারা একগুঁয়েভাবে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে প্রত্যাখ্যান করেছিল, হিংসা ও শত্রুতার বশবর্তী হয়ে। উদাহরণস্বরূপ, আবদুল্লাহ বিন সুরিয়া নামে একজন ইহুদি পণ্ডিত একবার নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে বসেছিলেন, যখন তিনি মদিনায় হিজরত করেছিলেন এবং স্বীকার করেছিলেন যে তিনিই শেষ নবী, তাঁর উপর আশীর্বাদ ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, কারণ তাঁর নিদর্শন এবং বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের ঐশী ধর্মগ্রন্থগুলিতে স্পষ্ট ছিল। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি সত্য জানা সত্ত্বেও কেন ইসলাম গ্রহণ করেননি, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর জাতির সাথে মতবিরোধ করতে অপছন্দ করেন এবং আরও যোগ করেছেন যে যদি তাঁর জাতির লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তিনিও করবেন। এই ঘটনাটি ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩৪-এ লিপিবদ্ধ আছে।

অন্যদের প্রতি আনুগত্যের বশবর্তী হয়ে অন্ধভাবে অনুসরণ করা অত্যন্ত সমালোচিত মনোভাব, কারণ মহান আল্লাহ মানুষকে সাধারণ জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাই পশুর মতো আচরণ করা উচিত নয়। অন্যান্য ধর্ম এবং জীবনধারার বিপরীতে, ইসলাম মানুষকে ইসলামের সত্যতা নির্ণয় করতে এবং তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্যকে চিনতে তাদের সাধারণ জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করার আহ্বান জানায়। সূরা ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

এবং ৩৪তম অধ্যায় সাবা, ৪৬তম আয়াত:

"বলুন, "আমি তোমাদেরকে কেবল একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি - তোমরা আল্লাহর জন্য জোড়ায় জোড়ায় এবং এককভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, তারপর চিন্তা করো।" তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন পাগলামি নেই। তিনি কেবল তোমাদেরকে কঠোর শাস্তির পূর্বে সতর্ককারী।"

অতএব, একজন ব্যক্তির উচিত অন্যদের প্রতি আনুগত্যের কারণে অন্ধভাবে অনুসরণ করা এড়িয়ে চলা কারণ এটি একজন মুসলিমের মনোভাবের পরিপন্থী। একজন ব্যক্তির অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য শিখতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে, এমনকি যদি এটি অন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করেও হয়, কারণ এটিই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অন্যদিকে, সমাজ, সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করলে কেবল তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত হবে, যা একজনকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে বাধাগ্রস্ত করবে। এটি একজনকে মানসিক শান্তি অর্জনে বাধাগ্রস্ত করবে, এমনকি যদি তারা আনন্দের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে। অধ্যায় ৯, তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন

তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

অধিকন্তু, যেহেতু মানুষদের খুশি করা কঠিন এবং প্রায়শই অকৃতজ্ঞ হয়, তাই যে ব্যক্তি তাদের প্রতি আনুগত্যের কারণে অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করে, সে তাদের কাছ থেকে তাদের সন্তুষ্টি বা কোনও প্রশংসা পাবে না। এর ফলে কেবল তিক্ততা তৈরি হবে, যা তাকে মানসিক শান্তি গ্রহণ করতে বাধা দেবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে খুশি করার লক্ষ্য রাখে, সে সহজেই তা অর্জন করবে, কারণ তিনি খুব বেশি কিছু চান না এবং তিনি মানুষের কাছে যা কিছু করতে বলেন তা তাদের উপকার করে এবং পরিণামে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অধিকন্তু, মহান আল্লাহ এই ব্যক্তিকে মানুষের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব থেকে রক্ষা করবেন, এমনকি যদি এই সুরক্ষা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়।

মহৎ গুণাবলী

ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মের কিছু পণ্ডিত খোলাখুলিভাবে স্বীকার করতেন যে তাদের ঐশী গ্রন্থে শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উল্লেখিত নিদর্শনগুলি হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে মিলে যায়। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [অর্থাৎ, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাদের একদল সত্যকে গোপন করে, যদিও তারা তা জানে।"

কিন্তু কেউ কেউ কেবল হিংসা ও শত্রুতার বশবর্তী হয়ে তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের কারণে তাঁকে এবং ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যারা একগুঁয়েভাবে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.) কে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

তাওরাতে উল্লেখিত নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কিছু গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য, যা আহলে কিতাবদের পণ্ডিতরা গোপন রেখেছিলেন, তা সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত ২১২৫ নম্বর হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। এতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে মানবজাতির জন্য সাক্ষী, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল।

যেহেতু মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষের উপর একজন সাক্ষী, তাই এর অর্থ হল তিনি বিচারের দিনে তাদের পক্ষে অথবা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন। দুঃখের বিষয় হল, মুসলিমরা প্রায়শই ইসলামী শিক্ষার কথা উল্লেখ করতে পারদর্শী, যেখানে আলোচনা করা হয়েছে যে বিচারের দিন এটি কীভাবে মুসলমানদের পক্ষে সুপারিশ করবে, কিন্তু প্রায়শই উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয় যে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দেবেন। অধ্যায় ২৫ আল ফুরকান, আয়াত ৩০:

"আর রাসূল বললেন, হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছে।"

এটি মুসলিমদের বোঝায়, পবিত্র কুরআন গ্রহণ করার পরই কেবল তা পরিত্যাগ করা যায়। যেহেতু কিয়ামতের দিন একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাক্ষ্য একটি গুরুতর বিষয়, তাই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য শিখে এবং তার উপর আমল করে এই পরিণতি এড়াতে চেষ্টা করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে কিয়ামতের দিন তাদের পক্ষ থেকে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছ থেকে সাক্ষ্য গ্রহণের যোগ্য। অন্যদিকে, যে অলস ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মান্য করতে ব্যর্থ হয়, সে হয়তো বিচারের দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

উপরন্তু, আলোচ্য মূল হাদিসে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষকে সুসংবাদ এবং সতর্কীকরণ প্রদান করেন। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সুসংবাদ এবং সতর্কীকরণ উভয়ই কেবল সেই ব্যক্তির জন্য উপকারী হবে যিনি এগুলো অনুসরণ করেন। যে ব্যক্তি তার ডাক্তারের দেওয়া সতর্কীকরণ এবং পরামর্শ অনুসরণ না করে, তার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য

খারাপ হবে এবং যে ব্যক্তি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শ এবং সতর্কীকরণ উপেক্ষা করে, তারও স্বাস্থ্য খারাপ হবে।

আলোচ্য মূল হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিরক্ষরদের উপর রক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মিশন আরব উপদ্বীপে শুরু হয়েছিল এবং সেই সময় আরবরা আরবি ভাষায় পারদর্শী ছিল কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা পড়তে বা লিখতে পারত না, এবং সেই সময়ের অন্যান্য সমাজের মতো তারা পার্থিব বিষয়ে শিক্ষিতও ছিল না। ৬২ সূরা আল জুমু'আহ, আয়াত ২:

"তিনিই নিরক্ষর [আরবদের] মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন..."

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পবিত্র কুরআনের প্রাথমিক পাঠকেরা ছিলেন অশিক্ষিত মানুষ, পণ্ডিত নন। অতএব, কাউকে এই বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা বোঝার জন্য কেবল পণ্ডিতদের জন্যই তা অধ্যয়ন করা। এটি একটি বিভ্রান্তিকর মনোভাব যা পূর্ববর্তী জাতিগুলি সাধারণ জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গ্রহণ করেছিল। বরং ইসলাম মানুষকে ইসলামের শিক্ষা নিজেরাই শিখতে উৎসাহিত করে যাতে তারা এর সত্যতা বুঝতে পারে এবং অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ না করে অন্তর্দৃষ্টির সাথে তা অনুসরণ করতে পারে। সূরা ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

এবং ৩৪তম অধ্যায় সাবা, ৪৬তম আয়াত:

"বলুন, "আমি তোমাদেরকে কেবল একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি - তোমরা আল্লাহর জন্য জোড়ায় জোড়ায় এবং এককভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, তারপর চিন্তা করো।" তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন পাগলামি নেই। তিনি কেবল তোমাদেরকে কঠোর শাস্তির পূর্বে সতর্ককারী।"

অতএব, অন্ধ অনুকরণ এড়িয়ে চলতে হবে এবং ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা তাদের ঈমানকে শক্তিশালী করতে পারে, যা প্রতিটি পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে নিশ্চিত করবে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা। এর ফলে মানসিক ও শারীরিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা তৈরি হয় এবং পরিণামে মানসিক শান্তি লাভ হয়। অন্যদিকে, যারা ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তারা দুর্বল ঈমান গ্রহণ করবে, যা তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে বাধা দেবে, বিশেষ করে কঠিন সময়ে। এটি তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে। এটি একটি প্রধান কারণ যে অনেক মুসলিম যারা ইসলামের মৌলিক এবং ন্যূনতম বাধ্যতামূলক কর্তব্যগুলি পালন করে তারা ইসলামিক শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে মানসিক শান্তি অর্জনে ব্যর্থ হয় কারণ তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে কীভাবে ব্যবহার করবেন তা জানেন না।

আলোচ্য মূল হাদিসটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এটি নির্দেশ করে যে, একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ মর্যাদায় পৌঁছাতে পারে, অর্থাৎ আল্লাহর একজন আন্তরিক বান্দা। যদি এর চেয়ে বড় মর্যাদা থাকত, তাহলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এর মাধ্যমে উল্লেখ করতেন। অনেক হাদিসে এটি উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন সহীহ মুসলিমের ৮৫১ নম্বর হাদিসে, যেখানে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নবুয়ত ঘোষণার আগে নিজেকে আল্লাহর বান্দা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এটি সকল মুসলমানের জন্য একটি স্পষ্ট শিক্ষা যে, যদি তারা চূড়ান্ত সাফল্য এবং উভয় জগতের সর্বোচ্চ মর্যাদা পেতে চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হতে হবে। এটি কেবলমাত্র আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা, অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই অর্জন করা সম্ভব। অন্য কোন উপায়ে দাসত্ব অর্জন করা সম্ভব নয়। ৩য় অধ্যায় আলী ইমরান, আয়াত ৩১:

"[নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

আলোচ্য মূল হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে একটি উপাধি দেওয়া হয়েছে যার অর্থ হলো যিনি মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখেন।

আল্লাহর উপর ভরসা করার অর্থ হলো, শারীরিক শক্তির মতো প্রদত্ত সম্পদকে ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রেই সঠিক উপায়ে ব্যবহার করা, যেমন জীবিকা অর্জন করা, এবং তারপর বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাদের জন্য যা কিছু পছন্দ করেন তা

তাদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি তারা তাঁর পছন্দের পিছনের হিকমত বুঝতে নাও পারে। উদাহরণস্বরূপ, অসুস্থ ব্যক্তির উচিত ইসলামের শিক্ষা অনুসারে আল্লাহ তাদের প্রদত্ত সম্পদ, যেমন ঔষধ, ব্যবহার করা এবং তারপর বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাদের জন্য যা কিছু পছন্দ করেন, তা অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করুক বা না করুক, তা তাদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি তারা তাঁর পছন্দের হিকমত বুঝতে না পারে। আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ পরিত্যাগ করা, আল্লাহর উপর ভরসা করার শর্ত নয়। এমনকি তাদের সম্পদের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করা উচিত নয় এবং পরিবর্তে এমন ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত যেখানে তারা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত সম্পদ ব্যবহার করে এবং বিশ্বাস করা উচিত যে, আল্লাহ প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেবেন।

আলোচ্য মূল হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) অভদ্র, কঠোর বা বাজারে শোরগোলকারী নন। এবং যারা তাঁর সাথে খারাপ ব্যবহার করে তিনি তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেন না, বরং তিনি তাদের সাথে ক্ষমা ও দয়ার সাথে আচরণ করেন।

এই বর্ণনাটি নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর স্ত্রী, মুমিনদের মা, আয়েশা বিনতে আবু বক্কর (রাঃ)-এর বর্ণনার সাথে মিলে যায়, যা জামে আত তিরমিযী, ২০১৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি অশ্লীল বা উচ্চকণ্ঠ ছিলেন না। তিনি কখনও মন্দের উত্তর মন্দ দিয়ে দিতেন না এবং পরিবর্তে অন্যদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করতেন এবং উপেক্ষা করতেন।

প্রথমত, সকল মুসলমানকে বুঝতে হবে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মহৎ বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা তাদের উপর কর্তব্য। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"[নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

এবং ৩৩তম অধ্যায় আল আহযাব, আয়াত ২১:

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে একটি চমৎকার আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"

ইমাম বুখারীর "আদাবুল মুফরাদ", ৪৬৪ নম্বর হাদিস অনুসারে, একজন মুসলিমের কখনই অশ্লীল আচরণ বা কথা বলা উচিত নয় কারণ এটি আল্লাহ তাআলার কাছে ঘৃণ্য। এই ধরণের আচরণ করা খারাপ চরিত্রের মূল কথা। এবং জামে আত তিরমিযী, ২০০৩ নম্বর হাদিস অনুসারে, যেহেতু ভালো চরিত্র বিচারের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে, তাই যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন অশ্লীল ব্যক্তি হিসেবে পৌঁছাবে তার মন্দ পরিণতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। এছাড়াও, যার কথাবার্তা অশ্লীল তার জাহান্নামে প্রবেশের সম্ভাবনা অনেক বেশি কারণ বিচারের দিন কেবল একটি অশ্লীল কথাই জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারে। জামে আত তিরমিযী, ২৩১৪ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, প্রকৃত ঈমান এবং অশ্লীলতা কখনও একটি হৃদয়ে একত্রিত হতে পারে না।

একজন মুসলিমের উচ্চকণ্ঠে কথা বলা উচিত নয় কারণ এর ফলে অন্যদের কাছ থেকে, বিশেষ করে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে সম্মান নষ্ট হয়। উচ্চকণ্ঠে কথা বলা ব্যক্তিরা প্রায়শই আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে এবং সহজেই অন্যদের ভয় দেখাতে পারে যা একজন প্রকৃত মুসলিমের আচরণের পরিপন্থী। একজন মুসলিমকে অন্যদের সাথে কথা বলার সময় ভদ্র এবং সদয় হতে হবে কারণ এটি ইসলামের প্রকৃত এবং শান্তিপূর্ণ প্রকৃতি প্রদর্শন করে। সুরা ৩১ লুকমান, আয়াত ১৯:

"... আর তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করো; নিশ্চয়ই, সবচেয়ে অপ্রীতিকর শব্দ হল গাধার কণ্ঠস্বর।"

পরিশেষে, একজন মুসলিমকে বুঝতে হবে যে মানুষ যেহেতু নিখুঁত নয়, তাই তারা ভুল করতে বাধ্য। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে ক্ষমা পেতে চায়, তেমনি তার উচিত অন্যদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, একজন ব্যক্তি অন্যদের সাথে যেভাবে আচরণ করে, মহান আল্লাহ তায়ালাও তার সাথে তেমনই আচরণ করবেন। অন্যদের ক্ষমা না করে বরং মহান আল্লাহর ক্ষমা আশা করা বোকামি। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ২২:

"...এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন..."

আলোচ্য মূল হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে মৃত্যু দেবেন না যতক্ষণ না তিনি কুটিল লোকদেরকে এই ঈমানের

সাক্ষ্য গ্রহণ করান যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাস্য নেই। ঈমানের সাক্ষ্যের মাধ্যমে অন্ধ চোখ, বধির কান এবং আবৃত হৃদয় খুলে যাবে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনেক হাদিস রয়েছে, যা মানবজাতিকে উপদেশ দেয় যে, যে কেউ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাসনার যোগ্য নয় এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-ই আল্লাহর বান্দা ও শেষ রাসূল, সে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে। সহীহ বুখারী, ১২৮ নম্বরে এরকম একটি উদাহরণ পাওয়া যায়।

এই হাদিসগুলোর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে মারা যাবে, সে হয় জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে, অথবা তারা তাদের পাপের পরিমাণ পর্যন্ত জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত ৭৫১০ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যারা জাহান্নামে প্রবেশ না করেই জান্নাতে প্রবেশ করতে চান তাদের কেবল মৌখিকভাবে ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাস ঘোষণা করা উচিত নয়, বরং তাদের অবশ্যই এর শর্তাবলী এবং বাধ্যবাধকতাগুলিও পূরণ করতে হবে। ঈমানের সাক্ষ্য নিঃসন্দেহে জান্নাতের চাবি কিন্তু একটি নির্দিষ্ট দরজা খোলার জন্য একটি চাবির দাঁতের প্রয়োজন হয়। জান্নাতের চাবির দাঁত হল এর বাধ্যবাধকতা এবং কর্তব্য। এর অর্থ ছাড়া, দাঁত ছাড়া চাবি জান্নাতের দরজা খুলবে না। এটি অনেক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যা নির্দেশ করে যে জান্নাতে প্রবেশের জন্য ইসলামের শর্তাবলী এবং কর্তব্যগুলি পূরণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, সহিহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস, সংখ্যা 1397, ইঙ্গিত করে যে সাক্ষ্যকে ইসলামের স্তম্ভগুলির আকারে কর্ম দ্বারা সমর্থন করা উচিত, যেমন ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠা করা।

সাক্ষ্যের প্রথম অংশ, অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাস্য নয়, এর অর্থ হল, মহান আল্লাহই একমাত্র সত্তা যার আনুগত্য করতে হবে এবং কখনও অবাধ্য হতে হবে না। যখন কেউ আল্লাহকে তাদের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে, তখন তাদের এমন কিছু মেনে চলা উচিত নয় যা তাঁর অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে কারণ আল্লাহই একমাত্র তাদের প্রভু এবং তারা কেবল তাঁর দাস। কিন্তু যে মুহূর্তে কেউ এমন কিছু মেনে নেয় যা আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে, তখন তারা তাঁর একত্ববাদের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে কলুষিত করে, যা ৪৫ সূরা আল জাসিয়াহ, আয়াত ২৩ এ নির্দেশিত হয়েছে:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার [নিজের] কামনা-বাসনাকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে..."

পবিত্র কুরআন মুসলমানদের সতর্ক করে দিয়েছে যে, যে কেউ পাপ করে সে আসলে শয়তানের উপাসনা করছে কারণ তারা আল্লাহর আনুগত্যের চেয়ে শয়তানের আনুগত্য করেছে। সূরা ৩৬ ইয়াসীন, আয়াত ৬০:

"হে আদম সন্তান, আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের উপাসনা করো না, কারণ সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু।"

যে সকল মুসলিম তাদের কামনা-বাসনা, অন্যের আকাঙ্ক্ষা এবং শয়তানের আদেশ প্রত্যাখ্যান করে এবং কেবল মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তারা

প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ তায়ালাকে তাদের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই মুসলিমদের উভয় জগতেই মহান আল্লাহ তায়ালার সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এই মুসলিমরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে আন্তরিক কর্মের মাধ্যমে তাদের মৌখিক এবং অভ্যন্তরীণ দাবিকে সমর্থন করে ইসলামের সাক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। যখন কেউ তাঁর হাদীস অনুসারে কাজ করে, তখন তারা সাক্ষ্যের দ্বিতীয় দিকটি পূরণ করে, অর্থাৎ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন আল্লাহর বান্দা এবং শেষ রাসূল। সহীহ বুখারী, ১২৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই মুসলিমদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি পরামর্শ দেয় যে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।

যে ব্যক্তি মুখে ইসলাম ঘোষণা করে এবং অন্তরে তা গ্রহণ করে, সে নিঃসন্দেহে একজন মুসলিম, কিন্তু মহান আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি তার প্রকৃত আন্তরিক বিশ্বাস তার পাপের কারণে হ্রাস পায়।

সাক্ষ্যের উপর সত্যিকার অর্থে আমল করার একটি দিক হল মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসা। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদের ৪৬৮১ নম্বর হাদিসে এই ইঙ্গিত দিয়েছেন। এটি পরামর্শ দেয় যে এটি একজনের ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি তখনই হয় যখন কেউ আল্লাহ যা ভালোবাসেন তা ভালোবাসেন এবং তিনি যা ঘৃণা করেন তা ঘৃণা করেন। যেহেতু এটি ছিল মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য, তাই সুনানে ইবনে মাজাহের ২৩৩৩ নম্বর হাদিস অনুসারে, মুসলিমদের তাঁর অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৩য় অধ্যায় আলী ইমরান, আয়াত ৩১:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

ইসলামী শিক্ষা থেকে এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহ যা ঘৃণা করেন তা ভালোবাসা এবং আল্লাহ যা ভালোবাসেন তা অপছন্দ করা একজন ব্যক্তির নিজের ইচ্ছার অনুসরণ এবং আল্লাহর উপর তার আনুগত্য করার স্পষ্ট ইঙ্গিত। এই মনোভাব আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাসকে হ্রাস করে। নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্ট করে যে এই মানসিকতা গ্রহণ করা ইসলামের সাক্ষ্যের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস থেকে বিচ্যুতি। ৯ম অধ্যায়, আয়াত ২৪:

“বলুন, [হে মুহাম্মদ], “যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়স্বজন, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যার পতনের আশঙ্কা তোমরা করো এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমাদের পছন্দ, আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে তোমাদের কাছে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর আদেশ কার্যকর করেন। আর আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।”

যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুযায়ী মহান আল্লাহর ইবাদত করে, সে প্রান্তে থেকেও তাঁর ইবাদত করে। অর্থাৎ, যখন তারা স্বাচ্ছন্দ্যের মুখোমুখি হয় তখন তারা খুশি হয় কিন্তু যখন তারা কষ্টের মুখোমুখি হয় তখন তারা রাগের বশে তাঁর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সূরা আল হজ্জ, আয়াত ১১:

"আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে আল্লাহর ইবাদত করে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে। যদি তাকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে, তবে সে তাতে আশ্বস্ত হয়; আর যদি কোন পরীক্ষা তাকে স্পর্শ করে, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসের দিকে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটাই স্পষ্ট ক্ষতি।"

সহীহ বুখারীতে ৬৫০২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মুসলমানদেরকে সঠিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন এবং ঈমানের সাক্ষ্যের উপর আমল করার বিষয়টি জানানো হয়েছে, যা পরকালে জাহান্নামের আগুনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। প্রথমে সকল শর্ত ও শিষ্টাচার পালনের মাধ্যমে ফরজ কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। তারপর স্বেচ্ছামূলক সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে এর সাথে যুক্ত করতে হবে, যার মধ্যে সর্বোত্তম হলো মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য। এটি আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার দিকে পরিচালিত করে এবং আল্লাহকে তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে এমনভাবে ক্ষমতায়িত করে যাতে তারা কেবল তাঁরই আনুগত্য করে। এই সত্য ও আন্তরিক আনুগত্য হল ঈমানের সাক্ষ্যের পরিপূর্ণতা। এটি হল সুস্থ হৃদয় যার মধ্যে কেবল আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা রয়েছে এবং পার্থিব কামনা-বাসনা এবং বস্তুগত জগতের ভালোবাসা থেকে মুক্ত। ২৬ নম্বর অধ্যায় আশ শু'আরা, আয়াত ৮৮-৮৯:

"যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কারো কোন উপকারে আসবে না। কেবল সেই ব্যক্তিই লাভবান হবে যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলিম পাপ থেকে মুক্ত হন, বরং এর অর্থ হল যখনই তারা খুব কমই পাপ করে তখনই তারা আন্তরিকভাবে তওবা করে।

পরিশেষে, মুসলমানদের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে তারা কেবল অভ্যন্তরীণ ও মৌখিকভাবে ইসলামের সাক্ষ্য ঘোষণা করবে না বরং তাদের কর্মেও তা প্রদর্শন করবে কারণ এটিই এই পৃথিবীতে প্রকৃত সাফল্য অর্জনের এবং পরকালের শাস্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায়।

হেরা গুহায় নির্জনতা

মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ওহীর প্রথম ইঙ্গিত সত্য স্বপ্নের আকারে এসেছিল। তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা সত্যই প্রমাণিত হয়েছিল। এরপর নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একাকীত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি মক্কার কাছে হেরা গুহায় একাকী সময় কাটাতেন, যেখানে তিনি ইবাদতের মাধ্যমে ধর্মীয় পবিত্রতা অর্জনের চেষ্টা করতেন। সহীহ মুসলিমের ৪০৩ নম্বর হাদিসে এটি লিপিবদ্ধ আছে।

কিছু পণ্ডিতের মতে, প্রথম ওহী নাজিলের পূর্বে, এই সময়ে মহানবী (সা.) যে ধর্মীয় ইবাদত করেছিলেন, তা ছিল প্রতিফলন। আসমান ও জমিনের সৃষ্টির উপর এই প্রতিফলন ইসলামের সত্যতা স্বীকৃতির একটি শক্তিশালী উপায়। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১৯:

"... আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির প্রতি চিন্তা করো, [বলে], "হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি এগুলোকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করোনি; তুমি [এরকম কিছুর উপরে] পবিত্র; তাহলে আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।"

যে ব্যক্তি খোলা মনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে, সে নিঃসন্দেহে এক ঈশ্বর, মহিমান্বিত আল্লাহ, এর অস্তিত্ব এবং বিচার দিবসের আগমনের কথাই বলবে। যদি একজন নির্মাতা ছাড়া একটি ভবন সঠিকভাবে তৈরি করা সম্ভব না হয়, তাহলে একজন স্রষ্টা ছাড়া আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে নিখুঁত ব্যবস্থা কীভাবে তৈরি হতে পারে? যেমন সূর্য থেকে পৃথিবীর নিখুঁত দূরত্ব, সমুদ্রের নিখুঁত ঘনত্ব , যা সমুদ্রের জীবনকে তাদের মধ্যে বিকশিত হতে

দেয় যখন বিশাল জাহাজগুলি তাদের উপরে চলাচল করে, পৃথিবীর নিখুঁত গঠন, যা দুর্বল উদ্ভিদগুলিকে এর থেকে বেড়ে উঠতে দেয় যখন বিশাল ভবনগুলি তার উপর নির্মিত হতে পারে এবং জলচক্রের নিখুঁত ব্যবস্থা যা সৃষ্টিকে বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার জল সরবরাহ করে। এলোমেলো কিছু কখনও এত নিখুঁত ব্যবস্থার দিকে পরিচালিত করতে পারে না। যদি তারা একাধিক ঈশ্বর হত, তাহলে প্রতিটি ঈশ্বর ভিন্ন কিছু কামনা করতেন, যা সৃষ্টির জন্য বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করত। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 22:

"যদি তাদের মধ্যে [অর্থাৎ, আসমান ও জমিনের] আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত..."

যেহেতু এটি স্পষ্টতই সত্য নয়, তাই এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে তারা কেবল এক ঈশ্বর, মহান আল্লাহ হতে পারেন। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যে নিখুঁত ব্যবস্থা রয়েছে, যার মধ্যে কিছু আগে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে ভারসাম্যপূর্ণ যাতে সৃষ্টি তাদের থেকে উপকৃত হয়। সৃষ্টির মধ্যে এখন পর্যন্ত যে প্রধান জিনিসটি ভারসাম্যহীন রয়ে গেছে তা হল মানুষের কর্ম। সৎকর্মকারী এই পৃথিবীতে তাদের পূর্ণ প্রতিদান পায় না এবং মন্দকর্মকারীও তাদের পূর্ণ শাস্তি পায় না। এটা মেনে নেওয়া অযৌক্তিক যে যিনি মহাবিশ্বের মধ্যে অসংখ্য সুষম ব্যবস্থা তৈরি করেছেন তিনি মানুষের কর্মকে ভারসাম্যহীন রাখবেন। অতএব, এমন একটি দিন অবশ্যই আসবে যখন মানবজাতির কর্মকাণ্ড ভারসাম্যপূর্ণ হবে, অর্থাৎ বিচার দিবস। অধিকন্তু, সত্য হল বিচার দিবস ছাড়া, এই পৃথিবীতে জীবন অর্থহীন কারণ এর সবকিছুই অসম্পূর্ণ এবং কেউ যা-ই লাভ করুক না কেন, সময়ের সাথে সাথে বা মৃত্যুর মাধ্যমে তারা অবশেষে এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অতএব, বিচার দিবস এবং পরকাল ছাড়া এই পৃথিবীতে অস্তিত্ব অর্থহীন এবং অর্থহীন হবে, কারণ কারও উচ্চতর, নিখুঁত এবং স্থায়ী লক্ষ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা থাকবে না।

অধিকন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক গৃহীত নির্জনতা ইঙ্গিত দেয় যে মুসলমানদের তাদের অপ্রয়োজনীয় সামাজিকীকরণও কমানো উচিত যাতে তারা আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করতে পারে।

জামে আত তিরমিযী, ২৪০৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নাজাত লাভের উপদেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে একটি হলো, একজন ব্যক্তির অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়া উচিত নয়। এই আচরণের ফলে সময় নষ্ট হয় এবং মৌখিক ও শারীরিক পাপও হয়। যদি কেউ সত্যিকার অর্থে এবং আন্তরিকভাবে চিন্তা করে, তাহলে সে বুঝতে পারবে যে তার বেশিরভাগ পাপ এবং সমস্যা অন্যদের সাথে অপ্রয়োজনে মেলামেশার কারণেই হয়েছিল। এর অর্থ এই নয় যে এটি সর্বদা অন্যদের দোষ ছিল, বরং এর অর্থ হল যদি কেউ অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হয়, তাহলে সে কম পাপ করবে এবং কম সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হবে। এর ফলে তার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই উপকারী জ্ঞান, যেমন ইসলামী জ্ঞান, শেখার এবং তার উপর কাজ করার সময়ও মুক্ত হবে। অপ্রয়োজনে মেলামেশা সময়ের অনন্য আশীর্বাদ নষ্ট করে, যা চলে যাওয়ার পর আর ফিরে আসে না। যারা অনর্থক এবং পাপপূর্ণ কাজে তাদের সময় নষ্ট করে, তারা এই পৃথিবীতে চাপের সম্মুখীন হবে এবং বিচারের দিনে একটি বিরাট অনুশোচনার সম্মুখীন হবে, বিশেষ করে যখন তারা তাদের সময় সঠিকভাবে ব্যবহারকারীদের প্রতিদান দেখতে পাবে। অধিকন্তু, অপ্রয়োজনীয়ভাবে সামাজিকীকরণ একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে বাধাগ্রস্ত করে। এটি আত্ম-চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকেও বাধাগ্রস্ত করে। জীবনে সঠিক পথে এগোচ্ছে কিনা এবং তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য এটি প্রয়োজন। আত্ম-চিন্তার অভাব লক্ষ্যহীন জীবনের দিকে পরিচালিত করে যার ফলে একজন ব্যক্তির পার্থিব বা ধর্মীয় জীবনে কোনও দৃঢ় দিকনির্দেশনা থাকে না। অতিরিক্ত সামাজিকীকরণ একজনকে মানুষের উপর নির্ভরশীল এবং সংযুক্ত হতে উৎসাহিত করে এবং এটি সর্বদা মানসিক, মানসিক এবং সামাজিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করে, কারণ একজনের সমগ্র জীবন, তাদের সুখ-দুঃখ, সবকিছুই মানুষ এবং তাদের সম্পর্কের চারপাশে আবর্তিত হয়।

প্রয়োজনে সামাজিকীকরণের মাধ্যমেই কেবল নিজেকে এই সমস্ত নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

অধিকন্তু, অতিরিক্ত সামাজিকীকরণ একজন ব্যক্তিকে তার জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে বাধা দেয়। যদিও মহান আল্লাহকে ভয় করে এমন কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া ভালো, কারণ অন্যরা অন্য কারও মুখোমুখি হওয়া সমস্যার পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না, তবুও সমস্যার মুখোমুখি ব্যক্তিকে অবশ্যই লোকেদের কাছ থেকে সময় বের করে নিতে হবে যাতে তারা তাদের সমস্যাটি সাবধানতার সাথে চিন্তা করে এবং বিভিন্ন ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ফলাফলগুলি বিবেচনা করতে পারে যাতে তারা পরিষ্কার মন দিয়ে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অতিরিক্ত সামাজিকীকরণ এই প্রক্রিয়াটিকে বাধাগ্রস্ত করে এবং প্রায়শই ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করে, যা কেবল তাদের চাপ এবং অনুশোচনা বৃদ্ধি করে।

নবুওয়তের মিশন শুরু

প্রথম প্রত্যাদেশ

আন্তরিকতা এবং জ্ঞান

সহীহ মুসলিমের ৪০৩ নম্বর হাদিসে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর প্রথম ওহী নাজিলের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তিনি যখন হেরা গুহায় ছিলেন, তখন ফেরেশতা জিবরাঈল (সাঃ) তাঁর কাছে এসে প্রথম শব্দটি নাজিল করেন, যার নাম ছিল "পড়ো"। কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উত্তরে বলেন যে তিনি নিরক্ষর। যখন এই আদান-প্রদান কয়েকবার ঘটে, তখন ফেরেশতা জিবরাঈল (সাঃ) তাঁকে ৯৬ সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত পাঠ করে শোনান এবং চলে যান:

"পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে আঁকড়ে থাকা পদার্থ থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ো, আর তোমার প্রভু সর্বশ্রেষ্ঠ। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে এমন কিছু শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।"

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিরক্ষর থাকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ তিনি যদি জ্ঞানী এবং শিক্ষিত হতেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব থেকে চুরির অভিযোগ আনা হত। অন্য কথায়, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যে নিরক্ষর থাকা সত্ত্বেও এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব অধ্যয়ন না করা সত্ত্বেও সত্য ঐতিহাসিক বিবরণ

এবং উপকারী শিক্ষা পাঠ করছিলেন, যা মক্কার অমুসলিমরা পুরোপুরি জানত, তা তাঁর নবুওয়াতের একটি স্পষ্ট লক্ষণ ছিল।

অধিকন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ প্রথম আয়াতটি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার গুরুত্ব নির্দেশ করে। এর অর্থ হল, একজন মুসলিমের সর্বদা মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা এবং কথা বলা উচিত।

সহীহ মুসলিমের ১৯৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, ইসলাম হলো মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা বলতে কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর প্রদত্ত সকল আদেশ ও নিষেধ পালন করাকে বোঝায়। সহীহ বুখারী, ১ নম্বর হাদিসে যেমনটি নিশ্চিত করা হয়েছে, সবকিছুর বিচার তাদের নিয়ত দ্বারা করা হবে। সুতরাং যদি কেউ সৎকর্ম করার সময় মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, তাহলে তারা এই পৃথিবীতে বা পরকালে কোন প্রতিদান পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বর হাদিস অনুসারে, যারা অসাধু কাজ করেছে তাদের বিচারের দিন তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইতে বলা হবে যাদের জন্য তারা কাজ করেছে, যা সম্ভব হবে না। ৯৮ আল বাইয়্যিনাহ, আয়াত ৫।

"আর তাদেরকে কেবল আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তাঁর প্রতি খাঁটি মনোভাব পোষণ করে....."

যদি কেউ মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালনে শিথিলতা দেখায়, তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের উচিত আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া এবং সেগুলি পালনের জন্য সংগ্রাম করা। মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ কখনও কাউকে এমন কর্তব্যের বোঝা চাপান না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮৬।

"আল্লাহ কোন আত্মার উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন বোঝা চাপান না..."

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হলো, নিজের এবং অন্যদের সন্তুষ্টির চেয়ে তাঁর সন্তুষ্টিকে সর্বদা প্রাধান্য দেওয়া। একজন মুসলিমের উচিত সর্বদা সেইসব কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। অন্যদের ভালোবাসা এবং তাদের পাপকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা করা উচিত, নিজের ইচ্ছার জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে বা পাপে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তখন তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি এই মানসিকতা গ্রহণ করে সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে। সুনান আবু দাউদের ৪৬৮১ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক হল, এই বিশ্বাস রাখা যে তাঁর সিদ্ধান্ত এবং পছন্দগুলি সংশ্লিষ্ট মানুষের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি তাঁর সিদ্ধান্তের পিছনের প্রজ্ঞা মানুষের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হুকুমে সন্তুষ্ট থাকা এবং নিজের ইচ্ছার সাথে বিরোধী হুকুমে বিরক্ত হওয়া আল্লাহর প্রতি স্পষ্ট অকৃতজ্ঞতা। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে তার আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে, সে প্রকৃতই আন্তরিক।

এছাড়াও, আলোচিত মূল ঘটনাটিও কার্যকর জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার গুরুত্ব নির্দেশ করে কারণ তাঁর উপর অবতীর্ণ প্রথম আয়াতগুলিতে শিক্ষা এবং জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় ৯৬ আল-আলাক, আয়াত ১-৫:

"পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে আঁকড়ে থাকা পদার্থ থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ো, আর তোমার প্রভু সর্বশ্রেষ্ঠ। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে এমন কিছু শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।"

জামে আত তিরমিযী, ২৬৪৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তাআলা কাউকে কল্যাণ দান করতে চান, তখন তিনি তাদেরকে ইসলামী জ্ঞান দান করেন।

নিঃসন্দেহে, প্রতিটি মুসলিম তাদের ঈমানের শক্তি নির্বিশেষে উভয় জাহানের কল্যাণ কামনা করে। যদিও অনেক মুসলিম ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তারা যে কল্যাণ কামনা করে তা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব, সাহচর্য এবং তাদের কর্মজীবনের মধ্যে নিহিত, এই হাদিসটি স্পষ্ট করে দেয় যে প্রকৃত স্থায়ী কল্যাণ নিহিত রয়েছে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মধ্যে। এটি লক্ষণীয় যে, ধর্মীয় জ্ঞানের একটি শাখা হল কার্যকর পার্থিব জ্ঞান যার মাধ্যমে মানুষ তাদের এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য বৈধ রিযিক অর্জন করে। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ভালো কোথায় তা নির্দেশ করেছেন, তবুও এটি দুঃখের বিষয় যে অনেক মুসলিম এটিকে খুব বেশি মূল্য দেয় না। তারা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তাদের বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালনের জন্য কেবলমাত্র ন্যূনতম ইসলামী জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে এবং আরও বেশি অর্জন এবং তার উপর আমল করতে ব্যর্থ হয়, যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য। পরিবর্তে তারা তাদের প্রচেষ্টাকে পার্থিব জিনিসের জন্য উৎসর্গ করে, বিশ্বাস করে যে প্রকৃত কল্যাণ সেখানেই পাওয়া যায়। অনেক মুসলিমই বুঝতে পারে না যে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একটি আয়াত বা হাদিস শেখার জন্য পূর্বসূরীদের সপ্তাহের পর সপ্তাহ ভ্রমণ করতে হতো, অথচ আজকাল কেউ ঘর থেকে বের না হয়েই ইসলামিক শিক্ষা অর্জন করতে পারে। তবুও, অনেকেই আধুনিক মুসলিমদের উপর প্রদত্ত এই আশীর্বাদ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম করুণার বশবর্তী হয়ে তাঁর নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে কেবল প্রকৃত ভালো কথাই তুলে ধরেননি, বরং তিনি এই ভালো কথাটিও মানুষের আঙুলের ডগায় স্থাপন করেছেন।

একজন মুসলিমকে এই বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে ইসলামী জ্ঞান কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান কীভাবে পালন করতে হয় এবং কোনটি অবৈধ ও হালাল তা ব্যাখ্যা করে। বাস্তবে, এটি মানুষকে সঠিক মনোভাব এবং আচরণ কীভাবে গ্রহণ করতে হয় তা শেখায় যাতে তারা তাদের প্রদত্ত সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে যাতে তারা উভয় জগতে নিজেদের এবং অন্যদের উপকার করতে পারে এবং উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে। মানবজাতিকে এই শিক্ষা একমাত্র তিনিই দিতে পারেন যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং জানেন, অর্থাৎ, মহান আল্লাহ। অতএব,

ধর্মীয় জ্ঞানের চেয়ে পার্থিব জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

মহান আল্লাহ মানবজাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, একটি চিরস্থায়ী সমাহিত ধন কোথায় অবস্থিত, যা উভয় জগতে তাদের সম্মুখীন হতে পারে এমন সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা কেবল তখনই এই কল্যাণ লাভ করবে যখন তারা এটি অর্জন এবং তার উপর আমল করার জন্য সংগ্রাম করবে। এর ফলে উভয় জগতেই শান্তি এবং সাফল্য আসবে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎ কর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

পরিশেষে, আলোচ্য মূল ঘটনাটিও নির্দেশ করে যে, মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একজন ব্যক্তির যা কিছু আছে তা তিনি ছাড়া অন্য কেউ সৃষ্টি করেছেন এবং দান করেছেন। অতএব, তাঁর আদেশ অনুসারে যা দান করা হয়েছে তা ব্যবহার করাই ন্যায্য। সূরা ৯৬ আল-আলাক, আয়াত ১-৫:

"পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে আঁকড়ে থাকা পদার্থ থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ো, আর তোমার প্রভু সর্বশ্রেষ্ঠ। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে এমন কিছু শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।"

নিয়ত অনুযায়ী কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হলো সর্বদা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করা। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্য কারণে কাজ করে সে মহান আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে প্রতিদান পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। জিহ্বা দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হলো ভালো কথা বলা অথবা নীরব থাকা। আর নিজের কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হলো পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা। কৃতজ্ঞ ব্যক্তি উভয় জাহানেই আরও বেশি আশীর্বাদ, রহমত এবং ক্ষমা লাভ করবে। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"... যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাদের [অনুগ্রহে] বৃদ্ধি করব..."

অধিকন্তু, যে ব্যক্তি এইভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা লাভ করবে, যা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, একজন ব্যক্তির উচিত নিজের জন্য মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করা, কারণ এটি উভয় জগতেই তাদের কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে, ঠিক যেমন একজন রোগী যখন তার ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং তা মেনে চলে, জেনে যে এটি তার জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাকে তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়।

স্বাভাবিক ভয় এবং উদ্বেগ

সহীহ মুসলিমের ৪০৩ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রথম ঐশ্বরিক ওহী নাজিলের পর, মহানবী (সা.) তাঁর ঘরে এবং স্ত্রীর কাছে ফিরে আসেন, যখন তাঁর হৃদয় ধড়ফড় করছিল। তিনি তাঁর স্ত্রীকে তাঁর উদ্বেগ এবং ভয়ের কারণে একটি কম্বল দিয়ে ঢেকে দিতে বলেন।

এই ঘটনাটি ইঙ্গিত দেয় যে, কঠিন সময়ে দুঃখের মতো বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে সীমার মধ্যে আবেগপ্রবণ হওয়া গ্রহণযোগ্য। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্বাভাবিক ও স্বাভাবিকভাবেই প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন এবং আল্লাহ তাআলা তাকে সমালোচনা করেননি, কারণ আবেগ প্রদর্শন মানুষের একটি অংশ। যতক্ষণ আবেগ ইসলামের সীমার মধ্যে থাকে ততক্ষণ তা প্রদর্শন করা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য। কেউই আশা করে না যে একজন মুসলিম কঠিন পরিস্থিতিতে রোবটের মতো আচরণ করবে। প্রতিটি পরিস্থিতিতে, একজন মুসলিমের উচিত এমন একটি ভারসাম্য বজায় রাখা যার মাধ্যমে তারা ইসলামের সীমা অতিক্রম না করে তাদের আবেগের মাধ্যমে তাদের উত্তেজনা মুক্ত করে। এটি ৫৭তম সূরা আল হাদিদের ২৩ নম্বর আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"যাতে তুমি যা হারিয়ে ফেলেছ তার জন্য হতাশ না হও এবং তিনি যা দিয়েছেন তার জন্য [গর্বে] উল্লাস না করো। আর আল্লাহ সকল আত্মপ্রবঞ্চিত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"

এই আয়াতটি কাউকে দুঃখিত বা সুখী হতে নিষেধ করে না। তবে এটি এই দুটি আবেগের ক্ষেত্রে চরম না হওয়ার পরামর্শ দেয়, যথা শোক এবং উল্লাস, যা উভয়ই পাপের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

একজন মুসলিমের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে যতক্ষণ তারা এই সীমার মধ্যে থাকবে ততক্ষণ তারা সকল অসুবিধা সফলভাবে অতিক্রম করবে, উভয় জগতেই পুরষ্কার এবং আশীর্বাদ অর্জন করবে। এই মহান ঘটনার শেষে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে যেখানে মহান আল্লাহ তাঁর আনুগত্যকারীকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। এই নিরাপত্তা স্বল্পমেয়াদীভাবে একজন মুসলিমের কাছে স্পষ্ট নাও হতে পারে তবে অবশেষে এটি তাদের কাছে এই পৃথিবীতে বা পরকালে প্রকাশিত হবে।

আন্তরিকতা এবং মহৎ চরিত্র

সহীহ মুসলিমের ৪০৩ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রথম ঐশী ওহী নাযিলের পর, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ঘরে এবং স্ত্রীর কাছে ফিরে আসেন, যখন তাঁর হৃদয় ধড়ফড় করছিল। তিনি তাঁর স্ত্রীকে উদ্বেগ এবং ভয়ের কারণে একটি কম্বল দিয়ে ঢেকে দিতে বলেছিলেন। ফেরেশতা জিবরাঈল (সাঃ) এর সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি তাঁর স্ত্রীর কাছে বর্ণনা করার পর, তিনি তাঁর মানসিক চাপের মুহূর্তে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি সত্যের উপর আস্থা রেখে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কিছু পবিত্র বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে এই অর্জন করেছিলেন, যাতে তাঁকে আশ্বস্ত করা যায় যে তাঁর ভয়ের কিছু নেই।

এর দ্বারাও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মুসলমানদের জন্য অন্যদের প্রতি এই আন্তরিকতা প্রদর্শন করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ঈমানের অংশ। সহীহ মুসলিমের ১৯৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, ইসলাম হলো জনসাধারণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বাবস্থায় তাদের জন্য মঙ্গল কামনা করা এবং নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা। এর মধ্যে রয়েছে অন্যদের ভালো করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, সর্বদা অন্যদের প্রতি করুণাশীল ও সদয় হওয়া। সহীহ মুসলিমের ১৭০ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিসের মাধ্যমে এর সারসংক্ষেপ করা যায়। এটি সতর্ক করে যে, কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা কামনা করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে সহীহ বুখারীর ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এই দায়িত্বকে ফরজ নামাজ

প্রতিষ্ঠা এবং ফরজ দান করার পরেই রেখেছেন। এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব বোঝা যায় কারণ এটিকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্বের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ হলো, যখন তারা সুখী হয় তখন খুশি হওয়া এবং যখন তারা দুঃখিত হয় তখন দুঃখিত হওয়া, যতক্ষণ না তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। উচ্চ স্তরের আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্যদের জীবনকে উন্নত করার জন্য চরম সীমা অতিক্রম করা, এমনকি যদি এটি তাদের নিজেদেরকে অসুবিধার মধ্যে ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ অভাবীদের জন্য সম্পদ দান করার জন্য কিছু জিনিসপত্র ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। সর্বদা কল্যাণের জন্য মানুষকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের একটি বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় ১৭ আল ইসরা, আয়াত ৫৩:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়..."

মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি উপায় হল অন্যদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং তাদের পাপের বিরুদ্ধে গোপনে উপদেশ দেওয়া। যে ব্যক্তি এইভাবে কাজ করে, আল্লাহ তার পাপ ঢেকে রাখবেন। জামে আত তিরমিযী, ১৪২৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব অন্যদের ধর্মের দিকগুলি এবং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া এবং শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে তাদের পার্থিব এবং ধর্মীয় জীবন উভয়ই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যদের অপবাদ থেকে তাদের সমর্থন করে। অন্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ প্রাণীই এইরকম আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজ পরিবর্তন করতে না পারে, তবুও তারা তাদের জীবনের

লোকদের, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, অন্যদের সাথে সেই আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় লোকেরা তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় ২৮ আল কাসাস, আয়াত ৭৭:

"... আর তুমিও ভালো কাজ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি ভালো করেছেন..."

অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক হল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য তাদের সাহায্য করা। মানুষের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা কামনা করা উচিত নয়, কারণ এটি তার সওয়াব নষ্ট করে এবং আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি স্পষ্ট অকৃতজ্ঞতা।

আলোচ্য মূল ঘটনাটি আরও ইঙ্গিত দেয় যে, যে ব্যক্তি মহৎ চরিত্র গ্রহণ করে, সে সর্বদা মহান আল্লাহর কাছে সম্মানিত হবে, এমনকি যদি সে পরীক্ষা ও পরীক্ষার সম্মুখীনও হয়।

মহৎ চরিত্র গ্রহণের মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি শেখা এবং গ্রহণ করা, যেমন উদারতা, কৃতজ্ঞতা এবং ধৈর্য এবং এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন অহংকার, লোভ এবং হিংসা এড়ানো। অতএব, মহৎ চরিত্র একজনকে এমন বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে যা তাকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে সহায়তা করবে, যা ফলস্বরূপ মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। উপরন্তু, মহৎ চরিত্র নিশ্চিত করবে যে ব্যক্তি তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করবে, যা ইসলামী শিক্ষা

অনুসারে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এটি একজনকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা গ্রহণে সহায়তা করবে যা ফলস্বরূপ উভয় জগতে মন এবং দেহের শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। অন্যদিকে, খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করলে কেবল তার মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার মধ্যে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হবে। এবং এই ভারসাম্যহীনতা বৃদ্ধি পাবে যখন তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলির অপব্যবহার করবে। এই সত্যটি স্পষ্ট হয় যখন কেউ ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং যারা নেই তাদের পর্যবেক্ষণ করে। উপরন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ, একাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয় নিয়ন্ত্রণ করেন, মনের শান্তির আবাসস্থল, তাই তিনিই সিদ্ধান্ত নেন কে এটি পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে, যার মূলে রয়েছে ভালো গুণাবলী গ্রহণ। তাই একজন ব্যক্তির নিজের স্বার্থে ভালো গুণাবলী গ্রহণ করার চেষ্টা করা উচিত, এমনকি যদি তা তার আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করেও, কারণ এটিই কেবল মানসিক প্রশান্তি এনে দেয়।

আলোচ্য মূল ঘটনায় উল্লেখিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) খাদিজা (রাঃ)-এর প্রথম বরকতময় বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি সর্বদা আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখতেন।

ইসলাম সর্বদা সর্বাত্মক উপদেশ দেয়। এই ক্ষেত্রে, ইসলাম প্রায়শই আত্মীয়স্বজনের সাথে সদয় আচরণের উপর জোর দেয়, কারণ কেবলমাত্র এই

একটি উপদেশের উপর আমল করলেই সমাজে সমৃদ্ধি, শান্তি এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে। যদি প্রতিটি ব্যক্তি তাদের আত্মীয়স্বজনের সাথে সদয় আচরণ করত, তাহলে বাইরের কোনও উৎস থেকে অন্য কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হত না। এর ফলে প্রতিটি পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সাথে সদয় আচরণ নিশ্চিত করা যেত, যার ফলস্বরূপ সমগ্র সমাজের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

ইসলামে প্রশংসনীয় যেকোনো কাজে আত্মীয়স্বজনদের সাহায্য করা উচিত এবং নিন্দনীয় যেকোনো বিষয়ে তাদের সতর্ক করা উচিত। ৫ম অধ্যায় আল মায়িদাহ, আয়াত ২:

"...এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

দুঃখের বিষয় হল, আজকাল অনেক মুসলিম এই উপদেশ উপেক্ষা করে এবং তাদের সাথে তাদের সম্পর্ক অনুসারে অন্যদের সাহায্য করে, তারা যে জিনিসে তাদের সাহায্য করছে তা ভালো হোক বা খারাপ, তা নির্বিশেষে। একজন মুসলিমের অবশ্যই ৮৩ নম্বর আয়াতের ক্রম মেনে চলতে হবে এবং কেবলমাত্র তাদের আত্মীয়দের এমন কিছুতে সাহায্য করতে হবে যা সরাসরি আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের সাথে সম্পর্কিত। সূরা ২ আল বাকারা, ৮৩:

"... *আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত করো না; এবং পিতামাতা এবং আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করো..."*

আত্মীয়স্বজনদের তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক সহায়তা। এটি তখনই সবচেয়ে ভালোভাবে অর্জন করা যায় যখন কেউ অন্যদের সাথে সেভাবেই আচরণ করে যেমন সে চায় অন্যরা তাদের সাথে আচরণ করুক। আবার, মানুষের দ্বারা নির্ধারিত ভালো আত্মীয়ের মান এবং সংজ্ঞা সম্পর্কে খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাদের মান এবং সংজ্ঞা প্রায়শই ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত সংজ্ঞা এবং মানদণ্ডের বিপরীত। পরিবর্তে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুসারে আত্মীয়স্বজনের অধিকার পূরণ করতে হবে, তা নির্বিশেষে আত্মীয়স্বজনরা তাদের ভালো আত্মীয় বলে মনে করুক বা না করুক। পরিশেষে, একজন মুসলিমের কখনও পার্থিব কারণে তাদের আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয়, যেমনটি সহিহ বুখারির ৫৯৮৪ নম্বর হাদিসে হুঁশিয়ার করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি পার্থিব কারণে তাদের আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তাছাড়া, যদিও একজন মুসলিম ধর্মীয় কারণে তার আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে, তবুও তার আত্মীয়কে ভালো কাজে সাহায্য করে এবং খারাপ কাজে সতর্ক করে তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখাই উত্তম, কারণ এটি তার আত্মীয়কে তাদের ভুল পথে চালিত হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করতে পারে।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরবর্তী বরকতময় বৈশিষ্ট্য, যা খাদিজা (রাঃ) উল্লেখ করেছেন, আলোচ্য মূল ঘটনা ছিল যে, তিনি সর্বদা সত্য কথা বলতেন।

কথাবার্তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল মন্দ কথা যা যেকোনো মূল্যে এড়িয়ে চলা উচিত। দ্বিতীয়টি হল ভালো কথা যা উপযুক্ত সময়ে বলা উচিত। শেষ শ্রেণীর কথা হল অসার কথা। এই ধরণের কথাকে পাপ বা সৎ কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, তবে যেহেতু এই ধরণের কথা মন্দ কথার দিকে পরিচালিত করে, তাই এটি এড়িয়ে চলাই ভালো। উপরন্তু, অসার কথাবার্তা বিচারের দিন

একজন ব্যক্তির জন্য অনুশোচনার কারণ হবে যখন সে অনর্থক কথায় তাদের সময় এবং সুযোগ নষ্ট করতে দেখে। অতএব, একজন মুসলিমকে হয় ভালো কথা বলতে হবে, নয়তো চুপ থাকতে হবে। সহীহ মুসলিমের ১৭৬ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু, জামে আত তিরমিযী, ১৯৭১ নম্বর হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে এবং তার উপর আমল করে, সে আল্লাহ তাআলার কাছে একজন মহান সত্যবাদী ব্যক্তি হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে এবং তার উপর আমল করে, সে আল্লাহ তাআলার কাছে একজন মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে। এই পৃথিবীতে এবং বিচারের দিনে আল্লাহ কর্তৃক যে ব্যক্তিকে মহামিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তার পরিণতি কী হবে, তা নির্ধারণ করার জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতপক্ষে, একই হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে মিথ্যা পাপের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

আলোচ্য মূল ঘটনায় উল্লেখিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরবর্তী বরকতময় বৈশিষ্ট্য হল , তিনি সর্বদা অভাবগ্রস্ত এবং সমস্যাগ্রস্তদের সাহায্য করতেন।

ইসলামী শিক্ষায় প্রায়শই অভাবীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কারণ তারা তাদের সামাজিক দুর্বলতার কারণে প্রায়শই তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত নিশ্চিত করা যে তারা সমাজে সামাজিকভাবে দুর্বল বলে বিবেচিত, যেমন এতিম এবং বিধবাদের, তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করা। এতিম এবং বিধবাদের ভরণপোষণ আজকের যুগে অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছে কারণ এটি অনলাইনে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেট আপ করা যায়। এবং ভরণপোষণের পরিমাণ প্রায়শই তাদের মাসিক ফোন বিলের চেয়েও কম। অতএব, মুসলমানদের ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটিকে উপেক্ষা করা উচিত নয় কারণ এটি উভয় জগতে মহান আল্লাহর নিরন্তর সহায়তার দিকে পরিচালিত করে। সহিহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি

এতিমের যত্ন নেবে সে জান্নাতে তার নৈকট্য লাভ করবে। সহিহ বুখারির ৬০০৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে, যে ব্যক্তি অভাবীদের, যেমন বিধবার যত্ন নেবে, তাকে সেই ব্যক্তির সমান সওয়াব দেওয়া হবে যে সারা রাত নামাজ পড়ে এবং প্রতিদিন রোজা রাখে। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত ৬০০৬ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । অতএব, যে ব্যক্তি নফল রাতের নামাজ এবং নফল রোজার মতো নফল কাজ করতে কষ্ট পান, তার উচিত এই হাদিসের উপর আমল করা যাতে ন্যূনতম প্রচেষ্টায় এই সওয়াব অর্জন করা যায়।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের কাছে যা কিছু আছে, যেমন সম্পদ, তা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঋণ হিসেবে দিয়েছেন, উপহার হিসেবে নয়। ঋণ অবশ্যই তার মালিককে পরিশোধ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের উপায় হলো তাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করা। অতএব, যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করে সে কেবল আল্লাহর প্রতি তাদের ঋণ পরিশোধ করছে। যখন কেউ এটি মনে রাখে, তখন তারা এমন আচরণ করতে বাধা পাবে যেন তারা আল্লাহ তাআলা বা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করছে। বাস্তবে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পার্থিব আশীর্বাদ দান করে এবং অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করে অসংখ্য সওয়াব অর্জনের সুযোগ দিয়ে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তাদের সাহায্য গ্রহণ করে দাতার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যদি প্রতিটি অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি অন্যদের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে ঐশী শিক্ষায় উল্লিখিত সওয়াব কীভাবে পাবে? এই বিষয়গুলি মনে রাখলে ভুল মনোভাব গ্রহণ করে তাদের সওয়াব নষ্ট করা থেকে রক্ষা পাবে।

পরিশেষে, অভাবীদের সাহায্য করার অর্থ হল একজন ব্যক্তির যেকোনো বৈধ চাহিদা পূরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক চাহিদা। অতএব, কোনও মুসলিম, তার যত কম সম্পদই থাকুক না কেন, অভাবীদের সাহায্য করা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না।

পরিশেষে, সুনান ইবনে মাজাহ, ১৬০১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি শোকাহত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেয়, তাকে বিচারের দিন সম্মানের পোশাক পরানো হবে।

যেহেতু সকল সমস্যার মুখোমুখি হওয়া নিশ্চিত, তাই এটি একটি মহান সওয়াব অর্জনের একটি অত্যন্ত সহজ উপায় যার জন্য খুব বেশি সময়, শক্তি বা অর্থের প্রয়োজন হয় না। এর মধ্যে রয়েছে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী, যেমন মানসিক, আর্থিক এবং শারীরিক সহায়তা, কষ্টের মুখোমুখি পরিবারকে সাহায্য করার চেষ্টা করা। একজন মুসলিমের উচিত কঠিন সময়ে ধৈর্য ধারণ করতে এবং পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদিস স্মরণ করিয়ে দেওয়া, যেখানে ধৈর্য ধরার গুরুত্ব এবং মহান প্রতিদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের ইতিবাচক কথা বলা উচিত, তাদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে, জিনিসগুলি কেবল একটি ভালো কারণেই ঘটে, এমনকি যদি লোকেরা এর পিছনের প্রজ্ঞা বুঝতে ব্যর্থ হয়। বাস্তবে, এই সৎকর্মটি করার জন্য একজন ব্যক্তির পণ্ডিত হওয়া উচিত নয় কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অসুবিধার মুখোমুখি ব্যক্তিকে ভালো বোধ করার জন্য কয়েকটি সদয় কথা যথেষ্ট। এবং কিছু ক্ষেত্রে কেবল শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকাই তাদের সমর্থনের অনুভূতি প্রদানের জন্য যথেষ্ট, এমনকি যদি কোনও শব্দও না বলা হয়।

পরিশেষে, এই সৎকর্ম সম্পাদনের সময় মুসলমানদের নিয়ত সংশোধন করা গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ, এটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা উচিত, এবং অন্যদের, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে লোক দেখানোর জন্য করা উচিত নয়, অথবা যদি তারা এটি করতে ব্যর্থ হয় তবে অন্যদের দ্বারা সমালোচিত হওয়ার ভয়ে এটি করা উচিত নয়। যারা অন্যদের জন্য কাজ করে, তাদের বিচারের দিন বলা হবে যে

তারা তাদের সেই কাজের প্রতিদান পাবে যা তারা করতে পারে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

অসুবিধার সতর্কীকরণ

সহীহ মুসলিমের ৪০৩ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রথম ঐশী ওহী নাযিলের পর, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বাড়িতে ফিরে আসেন এবং ফেরেশতা জিবরাঈল (আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি তাঁর স্ত্রী খাদিজা (আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে বর্ণনা করেন। এরপর তিনি তাঁকে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফালের কাছে নিয়ে যান, যিনি একজন খ্রিস্টান ছিলেন এবং পূর্ববর্তী ঐশী কিতাব অধ্যয়ন করেছিলেন। যখন তাঁকে ঘটনাটি জানানো হয়, তখন তিনি নিশ্চিত করেন যে, ইনিই ফেরেশতা জিবরাঈল (আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সতর্ক করে দেন যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁর প্রতি শত্রু হয়ে উঠবে কারণ তিনি তাদের কাছে যে বার্তা নিয়ে আসবেন, অর্থাৎ ইসলামের বার্তা।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, সাধারণত যখন কেউ এমন একটি পথ বেছে নেয় যা অন্যদের পথ থেকে ভিন্ন, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব, তখন তারা তাদের কাছ থেকে সমালোচনা এবং প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ সমালোচনা আসে একজন ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে। উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন মুসলিম ইসলামের শিক্ষার উপর আরও বেশি মনোযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং যদি এটি এমন কিছু হয় যা তাদের পরিবার নিজেরাই অনুসরণ করে না, তাহলে তারা তাদের কাছ থেকে সমালোচনার মুখোমুখি হবে। যারা তাদের বিশ্বাস করেছিল যে তাদের পথে তাদের সমর্থন করবে তারা তাদের দ্বারা তাদেরকে বোকা এবং চরমপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করবে। মুসলমানদের জন্য তাদের নির্বাচিত বৈধ পথে অবিচল থাকা এবং মহান আল্লাহর সাহায্যের উপর আস্থা রাখা গুরুত্বপূর্ণ, আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, যাতে এই অসুবিধাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে।

এটি মানুষের মধ্যে একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া কারণ যখন একজন ব্যক্তি অন্যদের থেকে জীবনে ভিন্ন পথ বেছে নেয়, তখন তাদের মনে হয় যে তার পথ খারাপ বা মন্দ এবং এই কারণেই ব্যক্তিটি ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছে। যদিও ব্যক্তি এটি বিশ্বাস করে না বরং কেবল ভিন্ন পথ বেছে নেয় এই বিশ্বাস করে যে এটি তাদের জন্য ভালো, তবুও তারা সমালোচনার সম্মুখীন হবে। একই কারণে সমস্ত নবী (সাঃ) তাদের সম্প্রদায়ের দ্বারা সমালোচিত হয়েছিলেন কারণ তারা অন্যদেরকে একটি ভিন্ন ভালো পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে অন্যদেরকে একটি ভিন্ন ভালো পথের দিকে আহ্বান করেছিলেন।

পরিশেষে, যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনের পথ বৈধ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের অবিচল থাকা উচিত এবং অন্যদের সমালোচনার দ্বারা বিচলিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তাদের তাদের পরিস্থিতি এবং চরিত্র উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের বৈধ পছন্দ অনুসরণ করা থেকে তাদের বিরত থাকা উচিত নয়।

একজন মুসলিমের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে দুই ধরণের মানুষ থাকে। প্রথম ধরণের মানুষ সঠিক পথে পরিচালিত হয় কারণ তাদের সমালোচনা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত সমালোচনা এবং উপদেশের উপর ভিত্তি করে করা হয়। এই ধরণের মানুষ সর্বদা গঠনমূলক হবে এবং উভয় জগতেই মহান আল্লাহর আশীর্বাদ এবং সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত করবে। এই ধরণের মানুষ অন্যদের অতিরিক্ত বা অবমূল্যায়ন করা থেকেও বিরত থাকবে। অন্যদের অতিরিক্ত প্রশংসা তাদের গর্বিত এবং অহংকারী করে তুলতে পারে। অপরের প্রশংসা কম করা তাদের অলস করে তুলতে পারে এবং তাদের সৎকর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে। এই প্রতিক্রিয়া প্রায়শই শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে প্রশংসা করা অন্যদের পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই আরও কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করবে এবং এটি তাদের অহংকারী হওয়া থেকে বিরত রাখবে। অতএব, এই ব্যক্তির প্রশংসা এবং

গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণ করা উচিত এবং তার উপর কাজ করা উচিত, এমনকি যদি কোনও অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকেও আসে।

দ্বিতীয় ধরণের ব্যক্তিরা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার ভিত্তিতে সমালোচনা করে। এই সমালোচনা বেশিরভাগই গঠনমূলক নয় এবং কেবল তাদের খারাপ মেজাজ এবং মনোভাব প্রকাশ করে। এই ব্যক্তিরা প্রায়শই তাদের নিজস্ব ইচ্ছার ভিত্তিতে কাজ করার সময় অন্যদের অতিরিক্ত প্রশংসা করে। এই দুটির নেতিবাচক প্রভাবগুলি আগে উল্লেখ করা হয়েছিল। অতএব, এই ব্যক্তির সমালোচনা এবং প্রশংসা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা উচিত, এমনকি যদি তা কোনও প্রিয়জনের কাছ থেকে আসে কারণ এটি কেবল সমালোচনার ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়ভাবে দুঃখিত এবং প্রশংসার ক্ষেত্রে অহংকারী হয়ে ওঠে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যে ব্যক্তি অন্যদের অতিরিক্ত প্রশংসা করে, সে প্রায়শই তাদেরও অতিরিক্ত সমালোচনা করে। একজন ব্যক্তির সর্বদা যে নিয়মটি অনুসরণ করা উচিত তা হল, তাকে কেবল ইসলামের শিক্ষার ভিত্তিতে সমালোচনা এবং প্রশংসা গ্রহণ করতে হবে। অন্য সমস্ত বিষয় উপেক্ষা করা উচিত এবং ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া উচিত নয়।

বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া

এরপর নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর আরও ঐশ্বরিক ওহী নাযিল হওয়া কিছুক্ষণের জন্য বিলম্বিত হয়। তারপর একবার যখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কায় হাঁটছিলেন, তখন তিনি আকাশের দিকে তাকালেন এবং ফেরেশতা জিবরাঈল (সাঃ) কে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একটি চেয়ারে বসে থাকতে দেখলেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন এবং তার পরিবারকে তাকে একটি কম্বল দিয়ে ঢেকে দিতে বললেন। এরপর আল্লাহ, মহান, তাঁর উপর পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াত নাযিল করলেন: সূরা ৭৪ আল-মুদ্দাছ্ছির, আয়াত ১-৫:

"হে তুমি, যে নিজেকে [কাপড় দিয়ে] আবৃত করে রাখো! উঠো এবং সতর্ক করো। তোমার প্রভুর মহিমা ঘোষণা করো। তোমার পোশাক পবিত্র করো। আর অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো।"

সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত ৩২৩৮ নম্বর হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও ইসলামের বার্তা প্রচারের আগে অনেক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা আবশ্যক, এই আয়াতগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি নির্দেশ করে, তা হল, উদাহরণ দ্বারা নেতৃত্ব দেওয়া।

যারা ইসলামের বাণী প্রচার করেন তাদের প্রথমে তাদের জ্ঞানের উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলামী জ্ঞানের সমাবেশে যোগদানের জন্য দিনের পর দিন ভ্রমণ করতে হত কিন্তু এখন অনলাইনে অসংখ্য বক্তৃতা পাওয়া যায়। তবুও, ধার্মিক পূর্বসূরীদের মৃত্যুর পর থেকে সঠিক পথ সম্পর্কে অজ্ঞতা কেবল বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ হল কেউ কেউ পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিস মুখস্থ করে জ্ঞান অর্জন করেছেন, কিন্তু তাদের চরিত্র শুদ্ধ করার জন্য সেগুলি ব্যবহার করেননি। অর্থাত, তারা তাদের জ্ঞানের উপর আমল করেননি। যারা এই ধরনের কাজ করেন তারা তাদের পরামর্শের মাধ্যমে অন্যদের হৃদয়কে প্রভাবিত করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবেন। কিছু বক্তৃতাকারী সংবাদ বুলেটিনগুলির মতো যা কেবল তথ্য প্রদান করে না বরং অন্যদের কাজ করতে উৎসাহিত করে, যার ফলে তাদের ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে অন্যদের পথ দেখানোর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। অমুসলিমরা মূলত একজন সফল মুসলিমের ব্যবহারিক উদাহরণ পর্যবেক্ষণ করার পরিবর্তে ইসলাম সম্পর্কে তাদের নিজস্ব গবেষণার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করছে। যারা ইসলাম প্রচার করতে চান তাদের জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের চরিত্র শুদ্ধ করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য বিষয় হলো তোমরা এমন কথা বলো যা তোমরা করো না।"

যখন কেউ এইভাবে কাজ করে, তখন সামান্য সঠিক জ্ঞান তার নিজের এবং অন্যদের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। অন্যদিকে, যারা এই সঠিক মনোভাব প্রত্যাখ্যান করে তারা আরও জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে কিন্তু এর কারও উপর কোনও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে না। পবিত্র কুরআনে এই ধরণের ব্যক্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সূরা আল জুমু'আহ, আয়াত ৫:

"...এবং তারপর তা গ্রহণ করেননি (তাদের জ্ঞান অনুসারে কাজ করেননি)" "এটা একটা গাধার মতো যে অনেক বই বহন করে..."

পদ্ধতিগত পদ্ধতি

যখন ২৬তম সূরা আশ শু'আরার ২১৪তম আয়াত নাজিল হয়:

"আর তোমার নিকটতম আত্মীয়দের সতর্ক করো।"

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কার সাফা পাহাড়ে আরোহণ করেন এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনদের তাঁর চারপাশে জড়ো করেন। তিনি প্রথমে তাদের তাঁর বিশ্বস্ত ও সৎ স্বভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তাদের জিজ্ঞাসা করেন যে, যদি তিনি বলেন যে উপত্যকায় এক অশ্বারোহী বাহিনী তাদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছে, তাহলে তারা কি তাঁর কথা বিশ্বাস করবে? তারা সকলেই ইতিবাচক উত্তর দেন এবং তাঁর সৎ স্বভাব প্রকাশ করেন। এরপর তিনি তাদেরকে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং ইসলামের দিকে আহ্বান জানান। এরপর তাঁর অমুসলিম চাচা আবু লাহাব তাকে অভিশাপ দেন। এর জবাবে, আল্লাহ তাআলা আল-মাসাদের ১১১ নম্বর সূরা, ১-৫ আয়াত নাযিল করেন:

"আবু লাহাবের হাত ধ্বংস হোক, সে ধ্বংস হোক। তার সম্পদ এবং সে যা অর্জন করেছে তা তার কোন কাজে আসবে না। সে জ্বলন্ত আগুনে পুড়বে। আর তার স্ত্রীও - কাঠের বাহক। তার গলায় থাকবে [পাকানো] তন্তুর রশি।"

এই ঘটনাটি সহীহ বুখারীতে ৪৭৭০ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে ইসলামের বাণী প্রচার শুরু করার পরামর্শ দিচ্ছেন । এটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইসলামের বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে । আত্মীয়স্বজনদের সাথে শুরু করা উচিত এবং তারপর সমাজের অন্যান্য সদস্যদের কাছে এগিয়ে যাওয়া উচিত। একজন ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ বন্ধন এবং আত্মীয়স্বজনের সাথে পরিচিতির কারণে, অপরিচিতদের পরামর্শ দেওয়ার চেয়ে তাদের পরামর্শ দেওয়ার প্রভাব বেশি পড়বে। প্রকৃতপক্ষে, যদি প্রতিটি ব্যক্তি তাদের নিজস্ব আত্মীয়দের পরামর্শ দেওয়ার উপর মনোনিবেশ করে, আত্মীয়স্বজনদের কেবল কয়েকটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হত। ২৬শে অধ্যায় আশ শু'আরা, আয়াত ২১৪:

" আর তোমার নিকটতম আত্মীয়দের সতর্ক করো।"

এই পদক্ষেপের পর পবিত্র কুরআন মানুষকে ছড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেয় তাদের স্থানীয় সমাজে ইসলামের বাণী। অধ্যায় 42 আশ শুরা, আয়াত 7:

" আর এভাবেই আমি তোমার প্রতি আরবি কুরআন নাযিল করেছি যাতে তুমি জনপদের মাতা [অর্থাৎ মক্কা] এবং তার আশেপাশের লোকদের সতর্ক করতে পারো..."

চূড়ান্ত পদক্ষেপ হলো জাতীয় পর্যায়ে মানবজাতিকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা। ৩৪তম সূরা সাবা, আয়াত ২৮:

" আর আমি আপনাকে মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবেই প্রেরণ করেছি..."

আল্লাহ তাআলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে এই ধীরে ধীরে প্রক্রিয়াটি গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই , এই কাজটি সম্পন্নকারী প্রতিটি মুসলিমেরও এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করা উচিত ।

আলোচ্য মূল ঘটনাটি বিশ্বস্ত হওয়ার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে, বিশেষ করে যখন কেউ ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে চায়।

ইসলামের বাণী সঠিকভাবে প্রচারের জন্য একজনকে অবশ্যই বিশ্বস্ত হতে হবে। পবিত্র কুরআনে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীগণ (সাঃ) কীভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে তারা বিশ্বস্ত এবং কেবল অন্যদের কল্যাণ কামনা করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, সূরা আশ শু'আরা, আয়াত ১৬১-১৬২:

"যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না? নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল।"

যখন মহানবী (সাঃ) নবুওয়ত ঘোষণা করেন, তখন সকলেই একমত হন যে তিনি বিশ্বস্ত, যদিও অনেকেই তাদের নিজের কথা থেকে সরে এসে তাঁকে অস্বীকার করে। এটি তাফসীর ইবনে কাসির, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৬২২-৬২৩ - এ উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে, আলোচ্য মূল ঘটনাটি মুসলমানদেরকে মানুষের সাথে ভদ্র ও ধৈর্যশীল আচরণের গুরুত্ব শেখায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তার চাচার কথার উত্তর দেননি বরং তার অশ্লীল আচরণকে উপেক্ষা করেছেন। একজন মুসলিমের আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার রয়েছে, বিশেষ করে শারীরিক ক্ষতির ক্ষেত্রে, তবে তা করার সময় তাদের অশ্লীল আচরণ করা উচিত নয়। সর্বদা, তাদের অন্যদের সাথে সম্মানজনক ও সদয়ভাবে কথা বলা এবং আচরণ করা উচিত এবং তাদের রাগকে তাদের কথা ও কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে দেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। একটি চমৎকার উপায় হল রাগ ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত চুপ থাকা এবং নিরপেক্ষ শারীরিক অবস্থান গ্রহণ করা যাতে তারা রাগকারীর বিরুদ্ধে শারীরিকভাবে প্রতিশোধ না নেয়।

প্রথম বিশ্বাসীরা

এটা সর্বজনবিদিত যে আবু বকর ইবনে আবু কুহাফা (রা.) ছিলেন প্রথম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যিনি নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ইসলামের দাওয়াত বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন, যেখানে অন্য সকল পুরুষই বিভিন্ন মাত্রার দ্বিধা দেখিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "আবু বকর আস সিদ্দীকের জীবনী", পৃষ্ঠা ৫১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে এবং সহীহ বুখারী, ৩৬৬১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আবু বকর (রাঃ) ইসলামের সত্যতা সহজেই গ্রহণ করার একটি কারণ হল, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তার ইতিমধ্যেই গভীর বন্ধুত্ব ছিল। অতএব, আবু বকর (রাঃ) ইসলামের দাওয়াতের পূর্বেই নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিখুঁত চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞানের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যদিও মক্কার অমুসলিমরা একই জিনিস পালন করেছিল তবুও তারা একগুঁয়েভাবে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছিল।

উপরন্তু, তিনি সত্যবাদী মানুষ হিসেবে সত্যকে সহজেই গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ, ইসলামের পূর্বে তিনি সত্যবাদিতার বৈশিষ্ট্যগুলি অনুসন্ধান করেছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন এবং গ্রহণ করেছিলেন। অতএব, যখন ইসলামের সত্য তাঁর সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল, তখন তিনি বিনা দ্বিধায় তা গ্রহণ করেছিলেন।

যেহেতু আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঘরে লালিত-পালিত হয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁর সকল কাজে সত্যবাদিতা অবলম্বন

করেছিলেন। যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নবী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল, তখন তিনি আলী (রাঃ)-কে ইসলামের দিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আলী (রাঃ)-এর উত্তরে বলেছিলেন যে তিনি প্রথমে তাঁর পিতা আবু তালিবের সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করতে চান। কিন্তু পরের দিন, পিতার সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা না করেই তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ১০ বছর। এভাবে তিনি ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম শিশু হয়ে ওঠেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রাঃ)-এর, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

অধিকন্তু, খাদিজা (রাঃ) তাঁর স্বামী, মহানবী (সাঃ) এর আহ্বান বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম মহিলা হন।

যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ) ছিলেন মহানবী (সাঃ)-এর একজন মুক্ত দাস। ইসলামের আবির্ভাবের সময় তিনি শিশু ছিলেন এবং যখন তাঁর সামনে সত্য উপস্থাপন করা হয়েছিল তখন তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। এভাবে তিনি প্রথম মুক্ত দাস হিসেবে ইসলামে প্রবেশ করেন।

সকল সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের মধ্যে থাকা শিশুরাও বুঝতে পেরেছিলেন যে মানুষের তৈরি এবং প্রাণহীন মূর্তি উপাসনার যোগ্য নয় এবং তাই ইসলাম এবং এক ঈশ্বরের ধারণা গ্রহণ করেছিলেন। উপরন্তু, যদিও তারা সরাসরি তাদের সমাজের সামাজিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল যা স্পষ্টতই তাদের জন্য সমস্যার কারণ হবে, তবুও তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাদের জীবনযাত্রায় অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ করা যা তাদের জন্য কেবল চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে তা অর্থহীন। দুঃখের বিষয় হল, এই সত্যটি প্রায়শই বেশিরভাগ লোক উপেক্ষা করে, যারা পশুর মতো আচরণ করতে বেশি আগ্রহী যারা অন্ধভাবে সোশ্যাল মিডিয়া ট্রেন্ড, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি

অনুসরণ করে, যদিও এটি কেবল মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের খারাপ দিকে পরিচালিত করে। এই ফলাফলটি বেশ স্পষ্ট হয় যখন কেউ এইভাবে আচরণ করে তাদের পর্যবেক্ষণ করে। উপরন্তু, এই সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, বুঝতে পেরেছিলেন যে এক প্রভুর আনুগত্য করা সমাজ, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতো একাধিক প্রভুর আনুগত্য করার চেয়ে অনেক উত্তম। এটা সাধারণ জ্ঞান যে যখন কেউ একজন প্রভু, মহান আল্লাহ, যিনি কেবল তাদের জন্য যা মঙ্গলজনক তা নির্ধারণ করেন, তখন এটি ভাল মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে পরিচালিত করবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি একাধিক প্রভুর আনুগত্য করে, তাকে এত ভিন্ন ভিন্ন দিকে টেনে নেওয়া হবে যে সে কখনই মনের শান্তি অর্জন করতে পারবে না। এটি এমন একজন কর্মচারীর মতো যার একজন করুণাময় ব্যবস্থাপক রয়েছে এবং এমন একজন কর্মচারীর মতো যার একাধিক ব্যবস্থাপক রয়েছে যারা তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন জিনিস দাবি করে। সূরা আয-যুমার, আয়াত ২৯:

"আল্লাহ একটি উদাহরণ পেশ করছেন: এক ব্যক্তির মালিকানা ঝগড়াটে অংশীদারদের হাতে এবং অন্য ব্যক্তির মালিকানা কেবল একজন ব্যক্তির - তারা কি তুলনায় সমান? আল্লাহর প্রশংসা! কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।"

অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির আনুগত্য এবং অনুসরণ এড়িয়ে চলতে হবে, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থীও হয়, বরং আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করতে হবে, যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারে, যা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। এই আনুগত্যের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। তাদের অবশ্যই একজন জ্ঞানী রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত থাকে। ঠিক যেমন ডাক্তার সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে জানেন, ঠিক

তেমনি একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা জানেন কিভাবে একজন ব্যক্তি উভয় জগতেই মানসিক এবং শারীরিক শান্তি অর্জন করতে পারে।

অন্যদের বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করা

ইসলাম গ্রহণের পর, আবু বকর (রাঃ) অন্যদের সত্যের দিকে আহ্বান করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এই ব্যক্তিরা পরবর্তীতে মহানবী (সাঃ) এর বিশিষ্ট ও জ্যেষ্ঠ সাহাবী হয়ে ওঠেন। এই ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন: যুবায়ের বিন আওয়াম, উসমান ইবনে আফফান, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াকাস, আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এবং আরও অনেকে, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "আবু বকর আস সিদ্দীকের জীবনী", পৃষ্ঠা ৫৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা লুকমানের ৩১ নম্বর সূরার ১৫ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"...এবং তাদের পথ অনুসরণ করো যারা আমার দিকে ফিরে আসে..."

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৩১:১৫, পৃষ্ঠা ১২৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বকর (রাঃ) যেভাবে এই মহান কাজটি অর্জন করেছিলেন, তার মধ্যে একটি হল উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়া। যখন অন্যরা কেবল তার মুখে নয় বরং

তার চরিত্র ও কর্মে ইসলামের লক্ষণগুলি লক্ষ্য করেছিল, তখন তা তাদের সত্য গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছিল।

সকল মুসলিমের জন্য, বিশেষ করে বাবা-মায়ের জন্য, তারা অন্যদের যা উপদেশ দেয়, তা মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটা স্পষ্ট যে, যারা তাদের প্রচারিত উপদেশ অনুসারে কাজ করেছিল, তারা অন্যদের উপর তাদের তুলনায় অনেক বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল যারা উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেয়নি। এর সর্বোত্তম উদাহরণ হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যিনি কেবল তাঁর প্রচারিত উপদেশই পালন করেননি বরং অন্যদের তুলনায় সেই শিক্ষাগুলো আরও কঠোরভাবে মেনে চলেছিলেন। শুধুমাত্র এই মনোভাবের মাধ্যমেই মুসলিমরা, বিশেষ করে বাবা-মা অন্যদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মা তার সন্তানদের মিথ্যা না বলার জন্য সতর্ক করেন কারণ এটি একটি পাপ কিন্তু প্রায়শই তাদের সামনে মিথ্যা বলে, তবে তার সন্তানরা তার উপদেশ অনুসারে কাজ করার সম্ভাবনা কম। একজন ব্যক্তির কর্ম সবসময় তাদের কথার চেয়ে অন্যদের উপর বেশি প্রভাব ফেলবে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে একজনকে নিখুঁত হতে হবে। এর অর্থ হল অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে তাদের নিজের উপদেশ অনুসারে কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা উচিত। পবিত্র কুরআন নিম্নলিখিত আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মহান আল্লাহ এই আচরণকে ঘৃণা করেন। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারীতে ৩২৬৭ নম্বর হাদিসে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ দেয় কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকে এবং মন্দকাজ থেকে নিষেধ করে এবং তারপর নিজে তা অনুসরণ করে, তাকে জাহান্নামে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। সূরা আস সাফ, আয়াত ৩:

"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য বিষয় হলো তোমরা এমন কথা বলো যা তোমরা করো না।"

তাই সকল মুসলমানের জন্য তাদের উপদেশ অনুসারে নিজে কাজ করার চেষ্টা করা এবং অন্যদেরও তা করার পরামর্শ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়া হল সমস্ত পবিত্র নবী (সাঃ) এর ঐতিহ্য এবং অন্যদের ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার সর্বোত্তম উপায়।

সুখের চাবিকাঠি

যদিও ইসলাম গ্রহণকারীদের অনেকেই সমাজের নিম্ন শ্রেণীর, যেমন দাস হিসেবে বিবেচিত হত, তবুও সমাজের অনেক বিশিষ্ট ও সম্মানিত সদস্যও ইসলামের ঐশ্বরিক বার্তা গ্রহণ করেছিলেন, যেমন: আবু বকর, যুবায়ের ইবনে আওয়াম, উসমান ইবনে আফফান, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াকাস, আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, সা'ঈদ ইবনে যায়েদ, আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ, আলী ইবনে আবু তালিব, জাফর ইবনে আবু তালিব এবং আরও অনেকে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। কিন্তু যখন সমাজের এই বিশিষ্ট সদস্যরা ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তারা মক্কায় তাদের একসময়ের সম্মান ও মর্যাদা হারিয়ে ফেললেন। এই কারণেই বেশিরভাগ ইসলামী ঐতিহাসিক বলেছেন যে প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারী বেশিরভাগ লোককে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, নবী (সাঃ) এর নোবেল লাইফ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬১-১৬৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি মানুষ ও সমাজের সন্তুষ্টির চেয়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধানের গুরুত্ব নির্দেশ করে। যদি এই সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, মানুষের সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করতেন, তাহলে তারা কখনও ইসলাম গ্রহণ করতেন না।

অনেক মানুষ অন্য মানুষের নিয়ম এবং আকাঙ্ক্ষা অনুসারে তাদের সুখের মান নির্ধারণ করে। এই মানসিকতার সমস্যা হল যে, মানুষের আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে মানুষ দুঃখী বা সুখী হবে। যদি তারা এই মনোভাব ধরে রাখে, তাহলে তারা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যেখানে তারা ভালোবাসবে, ঘৃণা করবে, দেবে, ত্যাগ করবে এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে কাজ করবে। এই মনোভাব

কেবল মানুষের জীবনে সামগ্রিক দুঃখের দিকে পরিচালিত করবে কারণ অন্যদের সত্যিকার অর্থে খুশি করা অসম্ভব। মানুষ মহান আল্লাহ্‌র উপর সন্তুষ্ট নয়, যখন তিনি তাদের অসংখ্য আশীর্বাদ দান করেছেন, তখন তারা কীভাবে এমন লোকদের উপর সন্তুষ্ট হতে পারে যারা তাদের সহজাতভাবে কিছুই দেয়নি? তাই সর্বদা অন্যদের খুশি করার লক্ষ্যে জীবনযাপন করলে কেবল দুঃখই আসবে।

অধিকন্তু, যেহেতু মানুষ সাধারণত অকৃতজ্ঞ, তাই যারা অন্যদের খুশি করার চেষ্টা করে তারা অন্যদের কাছ থেকে প্রকৃত প্রশংসা পাবে না এবং এটি তাদের তিক্ততা এবং দুঃখকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। অন্যদিকে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, একজন ব্যক্তির প্রতিটি সৎ উদ্দেশ্য, কথা এবং কাজের প্রশংসা করেন যা তাকে খুশি করার জন্য করা হয়। ব্যক্তি তার ছোট ছোট ভালো কাজ ভুলে যেতে পারে কিন্তু আল্লাহ, মহিমান্বিত, তা করবেন না এবং পরিবর্তে তিনি উভয় জগতেই তাদের বহুগুণ পুরস্কৃত করবেন। উদাহরণস্বরূপ, জামে আত তিরমিযী , 661 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যখন কেউ তার বৈধ উপার্জন থেকে একটি খেজুর ফল, যেমন একটি সামান্য পরিমাণ দান করে, তখন আল্লাহ, মহিমান্বিত, তাকে একটি পাহাড়ের সমান পুরষ্কার দান করবেন। একজন ব্যক্তি কখনও মানুষের কাছ থেকে তার প্রচেষ্টার জন্য এই ধরণের প্রশংসা এবং স্বীকৃতি পাবে না।

তাই একজন মুসলিমের উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা, যা সহজেই পাওয়া যায়। এই ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসবে, ঘৃণা করবে, দান করবে এবং ত্যাগ করবে, যা তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। সুনানে আবু দাউদের ৪৬৮১ নম্বর একটি বইয়ে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধরা। এটি উভয় জগতেই প্রকৃত সুখের দিকে পরিচালিত করবে এবং তাই এটি সুখের চাবিকাঠি।

জ্ঞান শোনা

ঐশী ওহী লাভের প্রাথমিক যুগে, ঐশী ওহী গ্রহণের আগ্রহের কারণে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জিবরাঈল (আঃ) এর সাথে তেলাওয়াতের মাধ্যমে যোগ দিতেন। এরপর মহান আল্লাহ তাকে ওহী মনোযোগ সহকারে শোনার নির্দেশ দেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি এটি তার হৃদয়ে সংরক্ষণ করবেন এবং পরবর্তীতে তাকে তা বুঝতে, আমল করতে এবং অন্যদের কাছে তা ঘোষণা করতে সক্ষম করবেন। সূরা ৭৫ আল-ক্বিয়ামাহ, আয়াত ১৬-১৯:

"[নবী মুহাম্মদ, সা.], তুমি কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য তোমার জিহ্বাকে তাড়াহুড়ো করো না। নিশ্চয়ই এর সংগ্রহ এবং তেলাওয়াত আমাদের দায়িত্ব। যখন আমি তা পাঠ করি, তখন তুমি এর তেলাওয়াত অনুসরণ করো। তারপর এর ব্যাখ্যা আমাদের দায়িত্ব।"

সুনানে আন নাসায়ী, ৯৩৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনা থেকে শেখার মতো একটি শিক্ষা হলো, একজন মুসলিমের উচিত ইসলামী জ্ঞান সঠিকভাবে শোনা যাতে তারা তা অনুসরণ করতে উৎসাহিত হয়।

মহান আল্লাহর কালাম সঠিকভাবে শোনাই হল একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে কেউ এর শিক্ষা সঠিকভাবে মেনে চলতে পারে। শ্রবণ এবং শ্রবণের মধ্যে পার্থক্য বোঝা

গুরুত্বপূর্ণ। শ্রবণ বলতে কেবল নিজের মন দিয়ে শব্দ স্বীকার করা বোঝায়, এমনকি যদি তারা শব্দ বুঝতে না পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি অনেক দূর থেকে কাউকে চিৎকার করতে শুনতে পারেন কিন্তু তারা কী বলছেন তা বুঝতে পারবেন না। অন্যদিকে, শ্রবণ বলতে একটি শব্দ শোনা এবং তা বোঝা বোঝা বোঝায় যাতে একজনের আচরণ পরিবর্তন হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট মৌখিক নির্দেশনা দিচ্ছেন যিনি নির্দেশাবলী শোনা এবং বোঝার পরে যথাযথভাবে সাড়া দেন।

মুসলমানদের উচিত আল্লাহর বাণী শোনা এবং তা বোঝার চেষ্টা করা যাতে এটি তাদের আচরণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম পবিত্র কুরআনের প্রতি এই নীতি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে কারণ তারা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শুনতে ভালো, কিন্তু সঠিকভাবে তা শুনতে ব্যর্থ হয়েছে যার মধ্যে এর শিক্ষা বোঝা এবং তার উপর আমল করা জড়িত। উপরন্তু, পবিত্র কুরআন বোঝা এবং তার উপর আমল করা কেবল তখনই সম্ভব যখন কেউ এটি এমন একটি ভাষায় শোনে এবং অধ্যয়ন করে যা তারা বোঝে।

পরিশেষে, কেবল মহান আল্লাহর বাণী শোনাই সাফল্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়, বরং তা সত্যিকার অর্থে শোনার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত।

জ্ঞানের জন্য সমাবেশ

ইসলামের দাওয়াত গোপনে বিভিন্ন ঘরে পৌঁছানোর সাথে সাথে মক্কার অমুসলিমদের নেতাদের কাছ থেকে হুমকি ও বিপদ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু এই বিপজ্জনক সময়েও মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের সাথে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একত্রিত হতে থাকেন। আল আরকামের ঘরকে তাদের গোপন মিলনস্থল হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর (সা.) নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৭-১৬৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এমনকি মহা বিপদের মুখেও সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, ইসলামী জ্ঞান অন্বেষণ এবং তার উপর আমল অব্যাহত রেখেছিলেন। এটা দুঃখের বিষয় যে আজ অনেক মুসলমানের কাছে এই জ্ঞান সহজ এবং নিরাপদে পাওয়া যায় কিন্তু তারা খুব কমই এতে মনোযোগ দেয়।

সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে কেউ জ্ঞান অন্বেষণের পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।

এটি জ্ঞান অর্জনের জন্য একজন ব্যক্তি যে শারীরিক পথ বেছে নেন, যেমন বক্তৃতা এবং ক্লাসে যোগদান, এবং এমন একটি পথ যেখানে কেউ শারীরিক ভ্রমণ ছাড়াই জ্ঞান অর্জন করেন। এটি জ্ঞানের সকল রূপকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন জ্ঞান সম্পর্কে শোনা, পড়া, অধ্যয়ন করা এবং লেখা। জান্নাতের পথে অনেক বাধা রয়েছে যা একজন মুসলিমকে সেখানে পৌঁছাতে বাধা দেয়। যে

ব্যক্তি সেগুলি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং কীভাবে সেগুলি অতিক্রম করতে হয় কেবল সে নিরাপদে জান্নাতে পৌঁছাতে পারে। এছাড়াও, এটি সহজেই বোঝা যায় যে একজন ব্যক্তি এই পৃথিবীর কোনও শহরে তার অবস্থান এবং সেখানে যাওয়ার পথ না জেনে পৌঁছাতে পারে না। একইভাবে, জান্নাত সম্পর্কে এই বিষয়গুলি না জেনে পাওয়া যায়, যেমন সেখানে যাওয়ার পথ।

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, একজন মুসলিমের জ্ঞান অন্বেষণ এবং তার উপর আমল করার উদ্দেশ্য অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। যে ব্যক্তি জাগতিক কারণে, যেমন লোক দেখানোর জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করে, যদি তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়, তাহলে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। সুনান ইবনে মাজাহের ২৫৩ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

অধিকন্তু, একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের জ্ঞানের উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে কারণ কর্ম ছাড়া জ্ঞানের কোন মূল্য বা উপকার হয় না। এটি এমন ব্যক্তির মতো যার কাছে নিরাপত্তার পথ সম্পর্কে জ্ঞান আছে কিন্তু সে তা গ্রহণ করে না এবং পরিবর্তে বিপদে ভরা অঞ্চলে থাকে। এই কারণেই জ্ঞানকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর আমল করে, যা তাকওয়ার দিকে পরিচালিত করে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়টি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর আমল করতে ব্যর্থ হয়। এই ধরণের ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি করবে না, বরং এটি কেবল তাদের অহংকার বৃদ্ধি করবে এই বিশ্বাসে যে তারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ, যদিও তারা গাধার মতো যারা বই বহন করে যা এর কোন উপকার করে না। সূরা আল জুমু'আহ, আয়াত ৫:

"...এবং তারপর তা গ্রহণ না করা (তাদের জ্ঞান অনুসারে কাজ না করা) হল সেই গাধার মতো যে [বইয়ের] বই বহন করে..."

উপরন্তু, আলোচ্য মূল ঘটনাটি স্পষ্ট করে যে সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, বুঝতে পেরেছিলেন যে কেবল ইসলাম গ্রহণ করা যথেষ্ট নয়। তারা জানতেন যে তাদের ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জনের জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। দুঃখের বিষয় হল, এটি আরেকটি বাস্তবতা যা প্রায়শই মুসলমানরা উপেক্ষা করে। অনেক মুসলমান মনে করেন যে তাদের জিহ্বা দিয়ে ঈমান ঘোষণা করা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট। এটি একটি প্রধান কারণ যে মুসলিমরা ন্যূনতম বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে তারা ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয় বলে তারা মানসিক শান্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হয়।

অধিকন্তু, অজ্ঞতা কেবল ইসলামের প্রতি দুর্বল ঈমান গ্রহণের দিকে পরিচালিত করে। যার ঈমান দুর্বল সে প্রতিটি পরিস্থিতিতে, যেমন কঠিন সময়ে, মহান আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থাকবে না। তাই তাদের আচরণ তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে কারণ তারা মাঝে মাঝে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে। এটি এমন একজন রোগীর মতো যে মাঝে মাঝে তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ অনুসরণ করে। এটা স্পষ্ট যে এই রোগী তাদের মনোভাবের কারণে ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য পাবে না। অতএব, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে শেখানো ইসলামের স্পষ্ট প্রমাণ শেখার এবং সে অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করে সাহাবীদের (রাঃ) পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, যাতে তারা দৃঢ় ঈমান অর্জন করতে পারে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থাকবে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য আসে। এটি এমন একজন রোগীর মতো যে তার ডাক্তারের সমস্ত নির্দেশ অনুসরণ করে এবং এর ফলে ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করে।

ইসলামের প্রতি জনসাধারণের আহ্বান

যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সংখ্যা প্রায় ৩৮ জনে পৌঁছে গেল, তখন আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্যদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার এবং দাওয়াত দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করলেন। যখন এই বিষয়ে একমত হলেন, তখন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ আল্লাহর ঘর কাবার চারপাশের পবিত্র স্থানে প্রবেশ করলেন। আবু বকর (রাঃ) উঠে মসজিদে ও আশেপাশে উপস্থিত সকলকে ভাষণ দিলেন, আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পাশে বসে রইলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রকাশ্যে আল্লাহ ও তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রহণ করার জন্য মানুষকে আহ্বান জানালেন। মক্কার অমুসলিমরা যখন তাঁর দাওয়াত শুনল, তখন তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং মসজিদে তাদের এবং সাহাবীদের মধ্যে হিংসাত্মক লড়াই শুরু হয়ে গেল। আবু বকর (রাঃ) গুরুতর আহত হয়েছিলেন। তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তার জ্ঞান ফিরে আসে এবং তিনি মহানবী (সা.)-এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। এই ঘটনাটি ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৯-৩২০-এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

যখনই কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার বা আরও অধ্যয়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাকে তার চারপাশের লোকদের কাছ থেকে, বিশেষ করে তার নিজের আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে সমালোচনা এবং বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়। তাই একজন মুসলিমকে তার মুখের সমালোচনা দেখে হতাশ না হয়ে ইসলাম শেখার এবং তার উপর আমল করার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় থাকতে হবে। এই সমালোচনা কাটিয়ে ওঠা এমন একটি পরীক্ষা যার মধ্য দিয়ে বেশিরভাগ মানুষকেই তার সংকল্প প্রমাণ করতে হয়। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি সংগ্রাম এবং ত্যাগ ছাড়া ডিগ্রি অর্জনের মতো পার্থিব সাফল্য অর্জন করতে পারে না, তেমনি ইসলামী জ্ঞান শেখার সংগ্রাম এবং ত্যাগ ছাড়া একজন ব্যক্তি উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে না। মানুষের সমালোচনা কেবল

তখনই গ্রহণ করা উচিত যখন তা ইসলামের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাই গঠনমূলক। অন্য সমস্ত সমালোচনা উপেক্ষা করা উচিত অন্যথায় একজন ব্যক্তি ক্রমাগত দুঃখ অনুভব করবেন। উপরন্তু, অন্যরা ইসলাম শেখার এবং তার উপর আমল করার সুবিধা দেখতে না পারা মানে এই নয় যে তাদের খুশি করার জন্য এটি করা এড়ানো উচিত। পরিবর্তে, একজন ব্যক্তিকে তার নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিতে হবে, কারণ উভয় জগতেই তাকে প্রতিটি উদ্দেশ্য, কথা এবং কাজের জন্য দায়ী করা হবে এবং যদি তারা তাদের সমালোচনার কারণে ইসলামী শিক্ষাকে উপেক্ষা করে তবে তারা অন্যদের উপর দোষ চাপাতে পারবে না। অধ্যায় 30 আর রুম, আয়াত 60:

"সুতরাং ধৈর্য ধরো। নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। এবং যারা [ঈমানের] ব্যাপারে নিশ্চিত নয়, তারা যেন তোমাকে বিরক্ত না করে।"

সত্যের উপর অবিচল

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দিনরাত গোপনে এবং প্রকাশ্যে মানুষকে আল্লাহর উপর ঈমান আনার আহ্বান জানিয়ে গেছেন, কেউই তাঁকে বাধা দিতে, নিরুৎসাহিত করতে বা বাধা দিতে সক্ষম হয়নি। তিনি সর্বত্র মানুষের সাথে তাদের উৎসব, সভা-সমাবেশ, মেলা এবং তীর্থস্থানে যেতেন। তিনি যাকেই দেখতেন, স্বাধীন বা দাস, দুর্বল বা শক্তিশালী, ধনী বা দরিদ্র, তিনি ইসলামের দিকে আহ্বান করতেন; যতদূর তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন, সকলেই সমান এবং সমান ছিলেন। শারীরিক এবং মৌখিক নির্যাতনের মুখেও তিনি দুর্বলতা বা হতাশা ছাড়াই তাঁর মিশন চালিয়ে যান। এটি ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৩৪-এ লিপিবদ্ধ আছে।

অনেকবার মক্কার অমুসলিমরা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে তাঁর মিশন বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করেছিল কিন্তু তিনি কখনও হাল ছাড়েননি। একবার তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে মক্কার অমুসলিমদের নেতারা যদি তাঁর ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র রাখেন, তবুও তিনি কখনও ইসলামের দাওয়াত ত্যাগ করবেন না, এমনকি যদি তা তাঁর মৃত্যুর কারণও হয়। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে কোনও পার্থিব প্রভাব বা অনুগ্রহ তাঁকে তাঁর মিশন সম্পন্ন করতে বাধা দিতে পারবে না। সিরাত ইবনে হিশামের ৪৪ পৃষ্ঠায় এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলিমদের জন্য ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকা গুরুত্বপূর্ণ। সহীহ মুসলিমের ১৫৯ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে তাদের বিশ্বাস ঘোষণা করার এবং তারপরে তার উপর অবিচল থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হলো, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যে সংগ্রাম করা। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোজা এবং মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহ, মহানের মধ্যে এবং অন্যদের সাথে সম্পর্কিত। একজন মুসলিমকে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে, সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

পরিশেষে, এর মধ্যে রয়েছে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসারে এই দিকগুলি পূরণ করা। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

দৃঢ়তার মধ্যে উভয় ধরণের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান প্রকার হল যখন কেউ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা করে। গৌণ প্রকার হল

যখন কেউ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুর জন্য ভালো কাজ করে, যেমন লোক দেখানো। সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৮৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, দৃঢ়তার একটি দিক হল সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা এবং কখন এবং কোন ইসলামী শিক্ষা কেউ তার ইচ্ছানুযায়ী অনুসরণ করবে তা থেকে বিরত থাকা।

দৃঢ়তার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, নিজের বা অন্যদের আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পরিবর্তে। যদি কোন মুসলিম নিজেকে বা অন্যদের খুশি করে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়, তাহলে তার জানা উচিত যে তার ইচ্ছা বা মানুষ কেউই তাকে আল্লাহ তাআলার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল, সে যদি এই সুরক্ষা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়, তবুও তিনি তাকে সবকিছু থেকে রক্ষা করবেন।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস দ্বারা নির্ধারিত পথ অনুসরণ করা এবং এমন পথ গ্রহণ না করা যা এই পথ থেকে বিচ্যুত হয়। যে ব্যক্তি এই পথ গ্রহণ করার চেষ্টা করবে তার আর কোনও কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটি তাদের ঈমানে অবিচল রাখার জন্য যথেষ্ট। ৪র্থ সূরা আন নিসা, আয়াত ৫৯:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী..."

এই আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অবিচল থাকার একটি দিক হল এমন কারো আনুগত্য করা যার আদেশ ও উপদেশ আল্লাহ, মহানবী (সাঃ) এবং মহানবী (সাঃ) এর আন্তরিক আনুগত্যের উপর নিহিত।

যেহেতু মানুষ নিখুঁত নয়, তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। তাই ঈমানের ক্ষেত্রে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে, বরং এর অর্থ হল তাদের অবশ্যই পূর্বে বর্ণিত মহান আল্লাহর আনুগত্য কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে এবং পাপ করলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 সূরা ফুসসিলাতের 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"...তাই তোমরা তাঁর দিকে সোজা পথ অবলম্বন করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো..."

জামে আত তিরমিযী, ১৯৮৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থিত, যেখানে মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে সংঘটিত (ছোট) পাপ মোচন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই ২, হাদিস নম্বর ৩৭-এ প্রাপ্ত আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) মুসলমানদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা এটি নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবে না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল তাদের নিয়ত এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে প্রদত্ত সম্ভাবনাকে আল্লাহ, মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে পূরণ করা। তাদের পরিপূর্ণতা অর্জনের আদেশ দেওয়া হয়নি কারণ এটি সম্ভব নয়।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ তার আধ্যাত্মিক হৃদয়কে প্রথমে পবিত্র না করে শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৮৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কেবল তখনই বিশুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় পবিত্র থাকে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসের শিক্ষা অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই হৃদয়ের বিশুদ্ধতা অর্জন করা সম্ভব।

অবিচল আনুগত্যের জন্য জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করে। জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ না করে মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, ২৪০৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, যদি মহান আল্লাহর আনুগত্যে কোন ত্রুটি দেখা দেয়, তাহলে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তওবা করা উচিত এবং মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। সূরা আল আহকাফ, আয়াত ১৩:

"নিশ্চয়ই যারা বলেছে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ," অতঃপর সৎপথে অবিচল রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

এছাড়াও, আলোচিত মূল ঘটনাটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্বকেও নির্দেশ করে, কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সকল মানুষকে কোনও বৈষম্য বা পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই ইসলামের দিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪৩ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক রূপ বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের অভ্যন্তরীণ নিয়ত এবং শারীরিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন।

প্রথমত, যে কোন কাজ করার সময় একজন মুসলিমের সর্বদা তাদের নিয়ত সংশোধন করা উচিত কারণ মহান আল্লাহ কেবল তখনই তাদের পুরষ্কৃত করবেন যখন তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎকর্ম করবে। যারা অন্য মানুষ এবং জিনিসের জন্য কাজ করবে, তাদেরকে বিচারের দিন তাদের কাছ থেকে তাদের পুরষ্কার পেতে বলা হবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদিসটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। জাতিগত বা সম্পদের মতো পার্থিব বিষয়ের কারণে একজন ব্যক্তি অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। যদিও অনেক মুসলিম সামাজিক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মতো এই বাধাগুলি তৈরি করেছে, যার ফলে তারা বিশ্বাস করে যে কিছু লোক অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, ইসলাম স্পষ্টভাবে এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে, এই ক্ষেত্রে, ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। একমাত্র জিনিস যা একজন মুসলিমকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাদের ধার্মিকতা, তারা কতটা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

উপরন্তু, আলোচ্য মূল হাদিসটি এও নির্দেশ করে যে, নারীদের পুরুষদের তুলনায় পৃথিবীতে তাদের অবস্থান নিয়ে বিতর্ক এবং তর্ক-বিতর্ক করে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বরং, তাদের বুঝতে হবে যে শ্রেষ্ঠত্ব পুরুষদের অনুকরণ বা তাদের ছাড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে নিহিত নয়। এটি কেবল আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে নিহিত।

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর এবং মানুষের অধিকার পূরণে নিজেকে ব্যস্ত রাখা এবং এই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তাদের যা আছে বা যার মালিকানা আছে তা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে মুসলিমের মধ্যে সৎকর্মের অভাব রয়েছে অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য নেই, তার বংশের কারণে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে না। বাস্তবে, এটি সম্পদ, জাতিগততা, লিঙ্গ বা সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং বর্ণের মতো সমস্ত পার্থিব জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পরিশেষে, ইসলাম যেমন মানুষকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে বিচার করে, তেমনি মানুষেরও উচিত। তাদের উচিত অন্যদেরকে তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করা বা পার্থিব মানদণ্ডের ভিত্তিতে অন্যদেরকে নিকৃষ্ট মনে করা নয়, কারণ এটি প্রায়শই অহংকার এবং অন্যদের অধিকার পূরণে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করে, যা উভয় জগতেই বিপর্যয়ের দিকে পরিচালিত করে।

একজন ব্যক্তির আসল মর্যাদা লুকানো থাকে, যেমন তার উদ্দেশ্য মানুষের কাছ থেকে লুকানো থাকে, এমনকি যদি তারা তাদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে পারে। অতএব, অন্যদের অবজ্ঞা করা বোকামি, কারণ তারা তাদের চেয়ে উচ্চতর হতে পারে।

সত্য গ্রহণ করা এবং তার উপর দৃঢ় থাকা

যদিও মহানবী (সাঃ) এর অধিকাংশ আত্মীয়স্বজন তাঁর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন, তবুও তাঁর চাচা আবু তালিব তাঁর চমৎকার গুণাবলীর জন্য তাঁকে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মহানবী (সাঃ) এর সাথে পরম করুণা ও দয়ার সাথে আচরণ করেছিলেন এবং তাঁকে সমর্থন ও সুরক্ষা দিয়েছিলেন। এই কাজে তিনি তাঁর নিজের সম্প্রদায় এবং ধর্মের বিরোধিতা করেছিলেন। যদিও আবু তালিব মহানবী (সাঃ) এর প্রতি তাঁর গোত্রীয় সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন এবং তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, তবুও তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি অযৌক্তিক আনুগত্যের কারণে কখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি, যদিও তিনি জানতেন যে ইসলামই সত্য। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৩৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য মানুষকে খুশি করা নয়। যে ব্যক্তি মানুষকে খুশি করার জন্য বেঁচে থাকে সে কখনই মনের শান্তি পাবে না, কারণ অন্যদের খুশি করার জন্য তাদের নিজস্ব সুখের পরিপন্থী কাজ করার আশা করা হয়। এবং যেহেতু মানুষ সাধারণত অকৃতজ্ঞ, তাই এই ব্যক্তি অন্যদের প্রশংসাও পাবে না। ফলস্বরূপ, তারা তিক্ত এবং দুঃখিত হয়ে উঠবে। এটি তাদের মনের শান্তি পেতে আরও বাধা দেবে। উপরন্তু, যেহেতু তারা মানুষকে খুশি করার জন্য কাজ করেছে, তাই তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে কোনও প্রতিদান পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এটি উভয় জগতে কেবল মানুষের দুঃখই বৃদ্ধি করবে। পরিবর্তে, একজন ব্যক্তিকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মানুষের অধিকার পূরণের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে এবং সর্বদা আল্লাহকে খুশি করার লক্ষ্য রাখতে হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ মানুষের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন, তিনি উভয় জগতেই তাদের উত্তম প্রতিদান দেবেন। এই প্রতিদান এবং করুণা তাদের মানসিক শান্তি পেতে সহায়তা করবে। উপরন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি মানুষকে প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহারের মধ্যে নিহিত, তাই ইসলামের

শিক্ষা অনুসারে, এটি তাদের মানসিক প্রশান্তি আরও বৃদ্ধি করবে, কারণ এইভাবে আচরণ করলে মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ভারসাম্য বজায় থাকবে। কারণ ইসলাম মানুষকে তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিক স্থানে স্থাপন করতে শেখায় যাতে তারা মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। এটি সংগঠিত বইয়ের লাইব্রেরির মতো। একটি নির্দিষ্ট বই খুঁজে পেতে ন্যূনতম প্রচেষ্টা এবং চাপ লাগে। অন্যদিকে, অসংগঠিত বইয়ের লাইব্রেরি যখন একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট বই খুঁজে পেতে চান তখন তাকে প্রচুর চাপের সম্মুখীন করে। একইভাবে, যখন কেউ তাদের প্রদত্ত জিনিসের অপব্যবহার করে এবং তাদের জীবনে মানুষকে ভুল জায়গায় রাখে, তখন এটি উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না। অতএব, একজন ব্যক্তির সর্বদা তার সমস্ত কর্মকাণ্ডে মহান আল্লাহকে খুশি করার লক্ষ্য রাখা উচিত, কারণ এটি উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জনের একমাত্র উপায়। এর একটি ইতিবাচক লক্ষণ হল যে একজন ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে কোনও কৃতজ্ঞতা বা প্রশংসা খোঁজেন না বা আশা করেন না।

মন্দের মুখে ধৈর্য

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করার জন্য প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করতেন। কিন্তু যারা তাঁর বিরোধিতা করেছিল, যেমন তাঁর চাচা আবু লাহাব, ইসলামের বার্তা ছড়িয়ে পড়া রোধ করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, যুল মাজাজের মেলার সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতেন। তাঁর চাচা আবু লাহাব যেখানেই যেতেন, তাঁর পিছনে পিছনে যেতেন এবং তাঁকে মিথ্যা কথা বলতেন এবং গালি দিতেন। এই ঘটনাটি ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৩৫-এ লিপিবদ্ধ আছে।

এই ঘটনাটি দেখায় যে, যখনই কেউ ভালো কাজ করার চেষ্টা করে, তখন ধৈর্য ধারণের গুরুত্ব কত। যখনই কেউ অন্যদের ইসলামের দিকে আহ্বান করে, ভালোর আদেশ দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, তখনই তারা অনেকের গাফিল জীবনযাত্রাকে চ্যালেঞ্জ জানাবে , যা তাদেরকে যেভাবেই হোক সত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে অনুপ্রাণিত করবে । পূর্ববর্তী সমস্ত জাতি তাদের পবিত্র নবীদের (সাঃ) প্রত্যাখ্যান করার প্রধান কারণ ছিল এই কারণেই। তারা তাদের জীবনধারা এবং বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করতে পারেনি এবং তাদের রক্ষার জন্য আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল । মহিমান্বিত, এবং তাদের পবিত্র নবী , সা. যখন কেউ এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে, তখন তাকে অবশ্যই অন্যদের দ্বারা সৃষ্ট অনেক কষ্টের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত থাকতে হবে , এমনকি তাদের নিজস্ব আত্মীয়স্বজনদের দ্বারাও। পবিত্র নবীগণ , সা. তাদের উপর বর্ষিত হোক, তারা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় , মহিমান্বিত, তবুও তারা অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তাদের জাতি থেকে। কেবল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদিস অধ্যয়ন করা প্রয়োজন , শান্তি এবং এই সত্যটি পালন করার জন্য তাঁর উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর উপর দরুদ বর্ষিত হোক, একবার একটি হাদিসে ঘোষণা করা হয়েছে জামে

আত তিরমিযী, ২৪৭২ নম্বরে পাওয়া যায় যে , সৃষ্টির কেউই আল্লাহর পথে নির্যাতিত হয়নি , তার চেয়েও বেশি , উচ্চ ।

এই ধরণের ক্ষেত্রে অন্যদের খারাপ মনোভাবের প্রতি ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া শিক্ষিত, শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত এবং কোমল। এর একটি উদাহরণ ১৯তম অধ্যায় মরিয়ম , ৪৬-৪৭ আয়াতে পাওয়া যায় :

"[তার পিতা] বললেন, "হে ইব্রাহিম, তুমি কি আমার উপাস্যদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা করো না? যদি তুমি বিরত না হও, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে পাথর ছুঁড়ে মারব, অতএব আমাকে দীর্ঘকাল দূরে রাখো।" [ইব্রাহিম] বললেন, "তোমার উপর শান্তি [অর্থাৎ, নিরাপত্তা] বর্ষিত হোক। আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।"

এখানে মহানবী ইব্রাহিম (আঃ)-এর সদয় ও শ্রদ্ধাশীল জবাব , শান্তি বর্ষিত হোক। তার উপর, তার বড়দের কঠোর মনোভাবের জন্য আলোচনা করা হয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই , একজন ব্যক্তির অবশ্যই একটি চরিত্রগত ত্রুটি থাকতে হবে যদি সে দাবি করে যে সে সকলের সাথে মিলেমিশে থাকে। সমাজের সদস্যদের মধ্যে পার্থক্যের কারণে একজন ব্যক্তি কখনই সকলের সাথে মিলেমিশে থাকতে পারে না। তারা সর্বদা এক বা একাধিক ব্যক্তি থাকবে যারা ভিন্নমত পোষণ করবে। তাদের মানসিকতা, জীবনধারা এবং পরামর্শের সাথে। এই বৈচিত্র্য উত্তেজনা এবং মাঝে মাঝে সমস্যার সৃষ্টি করবে। কিন্তু যদি একজন ব্যক্তি সকলের পছন্দ হয় তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি প্রমাণ করে যে তারা দ্বিমুখী হয়ে মুনাফিকদের

মানসিকতা গ্রহণ করেছে। যদি পবিত্র নবীগণ , শান্তি তাদের উপর বর্ষিত হোক, সকলের কাছে প্রিয় ছিল না একজন সাধারণ মানুষ কিভাবে পারে? এই মর্যাদা অর্জন করেছেন? এই কারণেই আমাদের প্রচারণায় বিশ্বাস করা উচিত নয় কারণ এইভাবে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হওয়া দলটি হলেন পবিত্র নবী (সা.)-এর উপর। তাদের উপর বর্ষিত হোক। সুনান ইবনে মাজাহ, ৪০২৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, একবার এক নির্লজ্জ মহিলা হযরত মুসা (আঃ) -এর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পর্কের মিথ্যা অভিযোগ এনেছিলেন। আল্লাহর শত্রু , মুসা (আঃ)-এর দ্বারা তিনি তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করতে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। মহিমান্বিত , কুরান। যখন সে অভিযোগ করেছিল পবিত্র নবী মুসা (আঃ) এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এক ধর্মীয় সমাবেশে প্রকাশ্যে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। যখন তিনি তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন , তখন তিনি তৎক্ষণাৎ তার অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেন এবং সত্য স্বীকার করেন। ফলস্বরূপ, আল্লাহ , মহিমান্বিত, ধ্বংসপ্রাপ্ত কোরাউনকে পৃথিবীকে তাকে এবং তার বিশাল ভাণ্ডারকে গ্রাস করার নির্দেশ দিয়ে। এই ঘটনাটি ইমাম যাহাবীর "দ্য মেজর সিনস", পৃষ্ঠা ১৬৬-১৬৭ - এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অধ্যায় ২৮ আল কাসাস, আয়াত ৮১:

" এবং আমরা তাকে এবং তার ঘরকে মাটিতে গ্রাস করেছিলাম..."

পবিত্র নবীগণ , শান্তি তাদের উপর অনেকবার অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তাদের লক্ষ্যে অবিচল ছিল যতক্ষণ না তাদের আল্লাহ তায়ালা বিজয় দান করেন। মহিমান্বিত। যখন মহান আল্লাহ, যিনি এমন ব্যক্তিকে সাহায্য করার মতো কাজ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন যিনি সমগ্র সৃষ্টির সাথে বিশ্বাসের সত্য বাণী ছড়িয়ে দেয় তাকে থামাতে পারবে না।

মুসলমানদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, ইসলাম প্রচারের সময় তাদেরও কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। ইসলামের। অতএব , তাদের অবশ্যই পবিত্র নবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে , শান্তি তাদের উপর বর্ষিত হোক, কষ্টের মুখে অবিচল থেকে । সাহাবীদের মনোভাব ছিল এটাই , আল্লাহ! তাদের উপর এবং সৎকর্মশীল পূর্বসূরীদের উপর সন্তুষ্ট থাকো। যদি কেউ পরকালে তাদের সাথে যোগ দিতে চায়, তাহলে তাদেরও এই মনোভাব গ্রহণ করতে হবে।

তাছাড়া, আলোচ্য মূল ঘটনায় আবু লাহাবের প্রদর্শিত মনোভাব ভণ্ডামির একটি দিক যা মুসলমানদের অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে।

এই ধরণের ব্যক্তি সমাজে দুর্নীতি ছড়িয়ে দেয়। এই নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যটি পারিবারিক ইউনিট থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক স্তরে শেষ পর্যন্ত সকল সামাজিক স্তরকে প্রভাবিত করে। এই ধরণের ব্যক্তি ভালোর জন্য একত্রিত হতে দেখতে অপছন্দ করে কারণ এর ফলে অন্যদের পার্থিব মর্যাদা তাদের নিজস্বতার চেয়েও বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি তাদের গীবত এবং অপবাদের দিকে পরিচালিত করে যাতে মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে চলে যায়। তাদের মন্দ মনোভাব তাদের নিজস্ব আত্মীয়তার বন্ধন ধ্বংস করে এবং যখন তারা অন্য পরিবারগুলিকে সুখী দেখে তখন তাদের সুখও নষ্ট করে। তারা দোষ খুঁজে বের করে যারা তাদের সামাজিক মর্যাদাকে টেনে নামানোর জন্য অন্যদের ভুল উন্মোচন করার জন্য তাদের সময় ব্যয় করে। তারাই প্রথম ব্যক্তি যারা অন্যদের সম্পর্কে গুজব শুরু করে এবং যখন ভালো কথা বলা হয় তখন বধির আচরণ করে। শান্তি এবং নীরবতা তাদের বিরক্ত করে তাই তারা নিজেদের বিনোদনের জন্য সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করে। তারা সুনান ইবনে মাজাহ, 2546 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি মনে রাখতে ব্যর্থ হয়। এটি পরামর্শ দেয় যে যে কেউ অন্যের দোষ ঢেকে রাখে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, তার দোষ ঢেকে রাখবেন। কিন্তু যে কেউ অন্যের দোষ খুঁজে বের

করে এবং উন্মোচন করে, আল্লাহ, মহিমান্বিত , মানুষের কাছে তাদের দোষ প্রকাশ করবেন। তাই বাস্তবে, এই ধরণের ব্যক্তিরা কেবল তাদের নিজেদের দোষ সমাজের কাছে প্রকাশ করছে, যদিও তারা বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের দোষ প্রকাশ করছে।

ইচ্ছার পূজা করা

মক্কার অমুসলিমরা তাদের জীবন নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে কাটিয়েছিল, এবং তারা পুরোপুরি জানত যে তিনি মিথ্যাবাদী বা পাগল নন। যেহেতু তারা আরবি ভাষার উপর দক্ষ ছিল, তাই তারা পুরোপুরি জানত যে পবিত্র কুরআন কোন মানুষ বা জিনের বাণী নয়।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যে নিরক্ষর থাকা সত্ত্বেও এবং পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবগুলি অধ্যয়ন না করেও সত্য ঐতিহাসিক ঘটনা এবং উপকারী শিক্ষা পাঠ করছিলেন, যা মক্কার অমুসলিমরা পুরোপুরি জানত, এটাই তাঁর নবুওয়াতের স্পষ্ট লক্ষণ ছিল।

অধিকন্তু, যেহেতু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কার অমুসলিমদের মধ্যে তাঁর সমগ্র জীবন কাটিয়েছিলেন, তাই তাঁর নবুয়তের ঘোষণার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট ছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন মক্কার অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তখন তিনি তাদের মধ্যে তাঁর ৪০ বছর সময়কে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন যে তিনি সত্য কথা বলছেন। এই প্রমাণ অমুসলিমরাও অস্বীকার করতে পারত না। সহীহ বুখারীতে ৪৫৫৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ আছে। শুধুমাত্র কিছু লোকের অহংকারই তাদেরকে সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধা দিয়েছিল। অধ্যায় ১০ ইউনুস, আয়াত ১৬:

"... কারণ আমি এর আগে তোমাদের মধ্যে এক জীবনকাল কাটিয়েছি। তাহলে কি তোমরা বুঝতে পারবে না?"

যদিও মক্কার অমুসলিমরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং পবিত্র কুরআনের সত্যবাদিতার প্রতি নিশ্চিত ছিল, তবুও তাদের অনেকেই ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাদের ধর্মে অবিচল ছিল।

সত্য হলো, প্রতিটি মিথ্যা দেবতাদের উপাসক কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছার পূজা করে। তাদের দেবতারা তাদের পূজা করা আকাঙ্ক্ষার একটি শারীরিক প্রকাশ মাত্র। এটি স্পষ্ট কারণ যে ব্যক্তি মূর্তির আকারে একটি দেবতার উপাসনা করে সে জানে যে প্রাণহীন মূর্তি তাদের একটি নির্দিষ্ট উপায়ে জীবনযাপন করার নির্দেশ দিতে পারে না, তাই উপাসক নিজেই সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা কীভাবে তাদের প্রাণহীন মূর্তি তাদের জীবনযাপন করতে চাইবে। এবং এই আচরণবিধি কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে। অতএব, তাদের আকাঙ্ক্ষার উপাসনা তাদের উপাসনার মূল। প্রভাবশালী এবং ধনী ব্যক্তিরা এই মানসিকতায় আরও ডুবে আছেন কারণ তারা জানেন যে সত্য অর্থ, ইসলাম গ্রহণ করা তাদের একটি নির্দিষ্ট আচরণবিধি অনুসারে জীবনযাপন করতে বাধ্য করবে যা তাদের বিভ্রান্তিকর ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করা থেকে বিরত রাখবে। তারা অন্যদের তাদের অনুসরণ করার পরামর্শ দেয় কারণ তারা তাদের প্রভাব এবং কর্তৃত্ব হারাতে চায় না। ইতিহাসে দেখা গেছে যে তারাই প্রথম পবিত্র নবীদের প্রত্যাখ্যান এবং বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলাম সঠিক বা ভুল ধর্ম হওয়ার সাথে এই মনোভাবের কোনও সম্পর্ক নেই, এটি কেবল নিজের ইচ্ছা পূরণের বিষয়ে। এই আধুনিক যুগে, যেসব মূর্তি একজন ব্যক্তিকে তার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করতে সাহায্য করে, সেগুলো হলো সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি। অতএব, এই জিনিসগুলি মেনে চলা এবং অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছার পূজা করতে বাধ্য করবে, এমনকি যদি তারা মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাসের দাবি করে। সূরা ২৫ আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

যদি কোন ব্যক্তি উভয় জগতেই মানসিক শান্তি কামনা করে, তাহলে তাকে অবশ্যই এমন একটি প্রাণীর স্তরে উঠতে হবে যা কেবল তার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে। পরিবর্তে তাকে ইসলামী শিক্ষা শিখতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে যাতে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। আধুনিক বিশ্বের মূর্তিরা কখনই তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে না, কারণ এটি তাদের সম্পদ অর্জন এবং মানুষের উপর প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যের বিরোধিতা করবে। ফলস্বরূপ, যারা এই মূর্তিগুলির অনুসরণ করে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলির অপব্যবহার করবে, যা তাদের মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেবে, এমনকি যদি তারা আনন্দের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে। অধ্যায় 9 তওবা, আয়াত 82:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন

তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

শাস্তি বিলম্বিত করা এবং প্রার্থনা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর অমুসলিম চাচা আবু জাহল একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, যদি তিনি মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে কাবার কাছে নামাজ পড়তে দেখেন, তাহলে তিনি সিজদা অবস্থায় তাঁর ঘাড় মাড়িয়ে ফেলতেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যখন নামাজ পড়তে শুরু করেন, তখন আবু জাহল তার মন্দ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তার কাছে আসে কিন্তু সে দ্রুত পালিয়ে যায়, সিংহের ভয়ে গাধার মতো। যখন তাকে তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন সে উত্তর দেয় যে, সে আগুনের একটি খন্দক দেখতে পেয়েছে, যা তার এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাঝখানে দেখা দিয়েছে, যা ভয়ঙ্কর এবং ডানা ভরা। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) পরে মন্তব্য করেছিলেন যে, যদি আবু জাহল তার মন্দ পরিকল্পনা চালিয়ে যায়, তাহলে ফেরেশতারা তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলত। এরপর আল্লাহ তাআলা নিম্নলিখিত আয়াতগুলো নাজিল করলেন, যেখানে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নামাজ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সূরা ৯৬, আল-আলাক, আয়াত ৬-১৯:

"না! [কিন্তু] মানুষ সীমালঙ্ঘন করে। কারণ সে নিজেকে অধরা দেখে। নিশ্চয়ই, তোমার প্রভুর কাছেই প্রত্যাবর্তন। তুমি কি তাকে দেখেছো যে নিষেধ করে। একজন বান্দা যখন নামায পড়ে? তুমি কি দেখেছো সে কি সৎ পথে আছে? নাকি সৎকর্মের নির্দেশ দেয়? তুমি কি দেখেছো যদি সে অস্বীকার করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়? সে কি জানে না যে আল্লাহ দেখেন? না! যদি সে বিরত না হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই তাকে কপালের চুল ধরে টেনে নিয়ে যাব। মিথ্যাবাদী, পাপী। তারপর সে তার সহযোগীদের ডাকুক। আমরা জাহান্নামের ফেরেশতাদের ডাকবো। না! তার কথা মান্য করো না। বরং সেজদা করো এবং [আল্লাহর] কাছে এসো।"

সহীহ মুসলিমের ৭০৬৫ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনার সময় আল্লাহ তাআলা আবু জাহলকে ধ্বংস করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তাকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য তাঁর শাস্তি স্থগিত রেখেছিলেন।

মহান আল্লাহ, যিনি শাস্তির যোগ্য, তাকে দয়া করে শাস্তি দিতে তাড়াহুড়ো করেন না। বরং তিনি তাদেরকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার এবং তাদের আচরণ সংশোধন করার সুযোগ দেন। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৬১:

" আর যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের অন্যায়ের জন্য দোষারোপ করতেন, তাহলে তিনি পৃথিবীতে (অর্থাৎ, পৃথিবীতে) কোন প্রাণীকেই ছেড়ে দিতেন না, কিন্তু তিনি তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিলম্বিত করেন। যখন তাদের সময় এসে যাবে, তখন তারা এক মুহূর্তও পিছিয়ে থাকবে না এবং এগিয়েও যাবে না।"

যে মুসলিম এই বিষয়টি বোঝে সে কখনোই মহান আল্লাহর রহমতের উপর আশা ত্যাগ করবে না, বরং সীমা অতিক্রম করবে না এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করবে না এই বিশ্বাসে যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে কখনও শাস্তি দেবেন না। তারা বোঝে যে শাস্তি কেবল বিলম্বিত হয়, পরিত্যাগ করা হয় না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। তাই এই ঐশ্বরিক গুণ একজন মুসলিমের মধ্যে আশা এবং ভয় তৈরি করে। একজন মুসলিমের উচিত এই বিলম্বকে তওবা করার এবং সৎকর্মের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা।

একজন মুসলিমের উচিত এই ঐশ্বরিক গুণাবলীর উপর নির্ভর করে মানুষের প্রতি নম্র হওয়া, বিশেষ করে যখন তারা খারাপ চরিত্র প্রদর্শন করে। তাদের উচিত অন্যদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা, ঠিক যেমন তারা চায় যে মহান আল্লাহ তাদের গাফিলতির সময় তাদের প্রতি নম্র হন। কিন্তু একই সাথে তাদের নিজেদের খারাপ বৈশিষ্ট্যের প্রতিও নম্র হওয়া উচিত নয়, কারণ তারা জানে যে পাপের শাস্তি স্থায়ীভাবে ত্যাগ করা হয় যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। তাদের উচিত মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে মন্দের জবাব ভালো দিয়ে দিয়ে নম্রতা প্রদর্শন করা। সূরা ফুসসিলাত, আয়াত 34:

"আর ভালো কাজ ও মন্দ সমান নয়। [মন্দ কাজ] প্রতিহত করো সেই [কাজ] দ্বারা যা উত্তম; তাহলে যার সাথে তোমার শত্রুতা আছে সে [একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হয়ে যাবে।"

উপরন্তু, আলোচ্য মূল ঘটনা থেকে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই ধরণের বিপদ ও সহিংসতার মুখোমুখি হয়েও, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করার আগেও কখনও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা ত্যাগ করেননি। অতএব, এটি নামায প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

জামে আত তিরমিযী, ২৬১৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো ফরজ নামাজ ত্যাগ করা।

আজকের যুগে এটা খুবই সাধারণ হয়ে উঠেছে। অনেকেই তুচ্ছ কারণে তাদের ফরজ নামাজ ছেড়ে দেয়, যার সবগুলোই নিঃসন্দেহে বাতিল। যদি যুদ্ধে লিপ্ত ব্যক্তির উপর থেকে নামাজের ফরজ তুলে না নেওয়া হয়, তাহলে অন্য কারো উপর থেকে কিভাবে তা তুলে নেওয়া যাবে? ৪র্থ অধ্যায় আন-নিসা, আয়াত ১০২:

"আর যখন তুমি [অর্থাৎ, সেনাবাহিনীর অধিনায়ক] তাদের মধ্যে থাকো এবং তাদের নামাজে ইমামতি করো, তখন তাদের একটি দল যেন তোমার সাথে [নামাজে] দাঁড়ায় এবং তারা যেন তাদের অস্ত্র বহন করে। আর যখন তারা সিজদা করে, তখন যেন তারা তোমার পিছনে থাকে এবং অন্য দল যারা [এখনও] নামাজ পড়েনি তাদের এগিয়ে নিয়ে আসে এবং তারা যেন তোমার সাথে নামাজ পড়ে, সাবধানতা অবলম্বন করে এবং তাদের অস্ত্র বহন করে..."

মুসাফির বা অসুস্থ উভয়কেই তাদের ফরজ নামাজ আদায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় না। মুসাফিরদের উপর বোঝা কমানোর জন্য কিছু ফরজ নামাজে চক্রের সংখ্যা কমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে তা আদায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। ৪র্থ সূরা আন-নিসা, আয়াত ১০১:

"আর যখন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো, তখন নামায সংক্ষিপ্ত করার ক্ষেত্রে তোমাদের কোন দোষ নেই.."

অসুস্থদের পানির সংস্পর্শে আসার ফলে যদি তাদের ক্ষতি হয়, তাহলে শুকনো অযু করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সূরা ৫, আল মায়িদা, আয়াত ৬:

"...কিন্তু যদি তোমরা অসুস্থ হও, অথবা সফরে থাকো, অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে, অথবা তোমরা নারীদের সাথে যোগাযোগ করে পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি ব্যবহার করো এবং তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মুছে ফেলো..."

এছাড়াও, অসুস্থ ব্যক্তিরা তাদের জন্য সহজে ফরজ নামাজ আদায় করতে পারেন। অর্থাৎ, যদি তারা দাঁড়াতে না পারে তবে তাদের বসতে দেওয়া হবে এবং যদি তারা বসতে না পারে তবে তারা শুয়ে ফরজ নামাজ আদায় করতে পারবে। জামে আত তিরমিযীর ৩৭২ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু আবারও, অসুস্থ ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয় না যদি না তারা মানসিকভাবে অসুস্থ হয় যা তাদের নামাজের ফরজ বুঝতে বাধা দেয়।

আরেকটি প্রধান সমস্যা হলো, কিছু মুসলিম তাদের ফরজ নামাজ বিলম্বিত করে এবং সঠিক সময়ের চেয়ে বেশি সময় ধরে আদায় করে। এটি স্পষ্টতই পবিত্র কুরআনের বিরোধিতা করে কারণ মুমিনদেরকে তারা বলে বর্ণনা করা হয়েছে যারা তাদের ফরজ নামাজ সময়মতো আদায় করে। ৪র্থ সূরা আন নিসা, আয়াত ১০৩:

"...নিশ্চয়ই, নামাজ মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফরজ করা হয়েছে।"

অনেকে বিশ্বাস করেন যে পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি তাদের কথা বলে যারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে তাদের ফরজ নামাজ বিলম্বিত করে। এটি

তাফসীরে ইবনে কাসির, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৬০৩-৬০৪-এ আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় ১০৭ আল মা'উন, আয়াত ৪-৫:

"অতএব দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নামাজ পড়ে। [কিন্তু] যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে গাফিল।"

এখানে মহান আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে তাদের অভিশাপ দিয়েছেন যারা এই খারাপ স্বভাব গ্রহণ করেছে। যদি তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে, তাহলে কীভাবে তারা এই পৃথিবীতে বা পরকালে সাফল্য পাবে?

সুনানে আন নাসায়ীর ৫১২ নম্বর হাদিসে মহানবী (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, ফরজ নামাজ অকারণে বিলম্বিত করা মুনাফিকির লক্ষণ। পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে যে, মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করবে তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো ফরজ নামাজ কায়াম না করা। ৭৪ সূরা আল-মুদ্দাছসির, আয়াত ৪২-৪৩:

"[এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে], "কিসে তোমাদের সাকারে প্রবেশ করানো হয়েছিল?" তারা বলবে, "আমরা নামাজ পড়তাম না।"

ফরজ নামাজ ত্যাগ করা এতটাই গুরুতর পাপ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৬২১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, যে কেউ এই পাপ করবে সে ইসলামে কুফরী করল।

তাছাড়া, অন্য কোন নেক আমল একজন মুসলিমের জন্য উপকারী হবে না যতক্ষণ না তার ফরজ নামাজ কায়েম হয়। সহীহ বুখারীতে পাওয়া ৫৫৩ নম্বর হাদিসে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি কেউ দুপুরের ফরজ নামাজ ত্যাগ করে, তাহলে তার নেক আমল ধ্বংস হয়। যদি এই অবস্থায় একটি ফরজ নামাজ ত্যাগ করার হয়, তাহলে কি কেউ কল্পনা করতে পারে যে, সবগুলো ত্যাগ করার শাস্তি কী হতে পারে?

সহীহ মুসলিমের ২৫২ নম্বর হাদিসে সঠিক সময়ে ফরজ নামাজ আদায় করাকে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমলের মধ্যে একটি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, ফরজ নামাজ সময়ের চেয়ে বিলম্বিত করা বা সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজগুলির মধ্যে একটি।

সকল বয়স্কদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য যে তারা তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা শিশুদের ছোটবেলা থেকেই ফরজ নামাজ পড়তে উৎসাহিত করে, যাতে তারা আইনত বাধ্যতামূলক হওয়ার আগেই তা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। যারা প্রাপ্তবয়স্করা এটি বিলম্বিত করে এবং শিশুদের বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তারা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে। যেসব শিশুদের উপর ফরজ নামাজ ফরজ হওয়ার পরই ফরজ নামাজ আদায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছিল, তারা খুব কমই তা দ্রুত আদায় করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে তাদের বছরের পর বছর সময় লাগে। এবং এর জন্য দায় পরিবারের বয়স্কদের, বিশেষ করে পিতামাতার। এই কারণেই নবী মুহাম্মদ (সা.) সুনানে আবু দাউদের ৪৯৫ নম্বর হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, পরিবারগুলি তাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে ফরজ নামাজ পড়তে উৎসাহিত করে।

অনেক মুসলিমের আরেকটি প্রধান সমস্যা হলো, তারা হয়তো ফরজ নামাজ আদায় করে কিন্তু সঠিকভাবে আদায় করতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ, অনেকেই নামাজের ধাপগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করে না এবং তাড়াহুড়ো করে তা সম্পন্ন করে। বাস্তবে, সহীহ বুখারির ৭৫৭ নম্বর হাদিসে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এভাবে নামাজ পড়ে সে মোটেও নামাজ পড়েনি। অর্থাৎ, তাকে নামাজ পড়া ব্যক্তি হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি এবং তাই তার ফরজ আদায় করা হয়নি। জামে আত তিরমিযির ২৬৫ নম্বর হাদিসে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি নামাজের প্রতিটি অবস্থানে স্থির থাকে না তার নামাজ কবুল হয় না।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সালাতে সঠিকভাবে রুকু বা সিজদা না করা ব্যক্তিকে সবচেয়ে খারাপ চোর হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মুওয়াত্তা মালিকের বই নম্বর ৯, হাদিস নম্বর ৭৫-এ প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম যারা দশকের পর দশক ধরে এই ধরণের ফরজ এবং নফল নামাজ আদায় করে আসছেন, তারা দেখতে পাবেন যে তাদের কেউই তাদের ফরজ আদায় করেনি এবং তাই তাদের সাথে এমন আচরণ করা হবে যারা তাদের ফরজ আদায় করেনি। সুনান আন নাসায়ীর ১৩১৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ৪৩:

"...এবং যারা [ইবাদত ও আনুগত্যে] রুকু করে তাদের সাথে রুকু করো।"

প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদিসের কারণে, কিছু নির্ভরযোগ্য আলেম মুসলিম পুরুষদের উপর এটিকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আবু দাউদের ৫৫০ নম্বর হাদিসে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, যারা মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ আদায় করবে না, তাদেরকে সাহাবীগণ (রাঃ) মুনাফিক বলে মনে করতেন। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এমনকি এমন লোকদের ঘর পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন যারা বৈধ ওজর ছাড়া জামাতের সাথে ফরজ নামাজ আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সহিহ মুসলিমের ১৪৮২ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যারা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার অবস্থানে আছেন তাদের তা করা উচিত। তাদের নিজেদেরকে বোকা বানানো উচিত নয় যে তারা তাদের পরিবারের সাথে ঘরের কাজে সাহায্য করার মতো অন্যান্য সৎকর্ম করছে। যদিও সহীহ বুখারী, ৬৭৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এটি মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একটি ঐতিহ্য, কিন্তু নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর ঐতিহ্যের গুরুত্ব পুনর্বিন্যাস করা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে কেউ এটি করে সে তার ঐতিহ্য অনুসরণ করছে না, বরং তারা কেবল নিজের ইচ্ছা অনুসরণ করছে, এমনকি যদি তারা কোনও সৎকর্মও করে। প্রকৃতপক্ষে, এই একই হাদিসটি উপদেশ দিয়ে শেষ হয় যে, যখন ফরজ নামাজের সময় হত, তখন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মসজিদে যাওয়া উচিত ছিল।

অধিকন্তু, পবিত্র কুরআনে ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার কথা প্রায়শই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে কারণ এটি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক প্রমাণ। এছাড়াও, যেহেতু প্রতিদিনের নামাজগুলি বিস্তৃত, তাই এগুলি বিচার দিনের ধ্রুবক স্মারক এবং এর জন্য কার্যত প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করে, কারণ ফরজ নামাজের প্রতিটি স্তর বিচার দিনের সাথে সম্পর্কিত। যখন কেউ সঠিক অবস্থানে দাঁড়াবে, তখন বিচারের দিন সে এভাবেই মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। সূরা ৮৩ আল মুতাফিফিন, আয়াত ৪-৬:

" তারা কি ভাবে না যে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে? এক মহাদিনের জন্য, যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে?"

যখন তারা রুকু করে, তখন এটি তাদের সেই অনেক লোকের কথা মনে করিয়ে দেয় যারা পৃথিবীতে তাদের জীবদ্দশায় মহান আল্লাহর কাছে রুকু না করার জন্য বিচারের দিনে সমালোচিত হবে। সূরা ৭৭ আল মুরসালাত, আয়াত ৪৮:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'নামাজে রুকু করো', তখন তারা রুকু করে না।"

এই সমালোচনার মধ্যে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ না করাও অন্তর্ভুক্ত। যখন কেউ নামাজে সিজদা করে, তখন এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিচারের দিনে মানুষকে মহান আল্লাহর কাছে সিজদা করার জন্য কীভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য করার জন্য সঠিকভাবে সিজদা করেনি, তারা বিচারের দিনে এটি করতে সক্ষম হবে না। সূরা ৬৮ আল-কালাম, আয়াত ৪২-৪৩:

"যেদিন পরিস্থিতি কঠিন হবে, সেদিন তাদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের চোখ অবনত হবে, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। আর তাদেরকে সুস্থ অবস্থায় সিজদা করার জন্য ডাকা হত।"

যখন কেউ নামাযে হাঁটু গেড়ে বসে, তখন এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে কিয়ামতের দিন তারা কীভাবে তাদের চূড়ান্ত বিচারের ভয়ে আল্লাহর সামনে এই অবস্থানে বসে থাকবে। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২৮:

"আর তুমি প্রত্যেক জাতিকে [ভয়ে] নতজানু দেখবে। প্রত্যেক জাতিকে তার আমলনামার দিকে ডাকা হবে [এবং বলা হবে], "আজ তোমাদেরকে তোমাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।"

যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে নামাজ পড়বে, সে তার নামাজ সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবে। এর ফলে তারা নামাজের মাঝখানে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে। সূরা ২৯, আল আনকাবুত, আয়াত ৪৫:

"...প্রকৃতপক্ষে, নামাজ অশ্লীলতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা, যা তাঁর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

সত্যের সন্ধানে

আবু যার গাফারী (রাঃ) ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি ইসলাম গ্রহণের আগেও মূর্তি পূজা করতেন না এবং এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। ইসলাম সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি গোপনে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে দেখা করার ইচ্ছায় মক্কায় প্রবেশ করেন, কারণ তিনি মক্কার অমুসলিমদের ইসলামের প্রতি ঘৃণা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। আলী ইবনে আবু তালিব আবু যার (রাঃ) এর সাথে দেখা করেন এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি তাঁর এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মধ্যে একটি গোপন বৈঠক স্থাপনে সহায়তা করেন। ফলস্বরূপ, আবু যার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। এটি ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭১-৭২-এ আলোচনা করা হয়েছে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে জীবনে সঠিক নির্দেশনা চায়, এমনকি যদি তা তার আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয়, তবুও তাকে মহান আল্লাহ তাআলা সত্যের দিকে পরিচালিত করবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল এই পৃথিবীতেই তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায়, সে ইসলাম গ্রহণ করলেও সঠিক নির্দেশনা পাবে না। প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক নির্দেশনা যাতে উভয় জগতে মানসিক শান্তি পাওয়া যায়, তা অত্যন্ত মূল্যবান আশীর্বাদ যা ত্যাগ ও সংগ্রাম ছাড়া পাওয়া যায় না। যেভাবে একজন ব্যক্তি সংগ্রাম ও ত্যাগ ছাড়া পার্থিব সাফল্য অর্জন করতে পারে না, যেমন একজন ডাক্তার হওয়া, তেমনি একজন ব্যক্তিও সঠিক নির্দেশনা পেতে পারে না যাতে সে উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে যতক্ষণ না সে সংগ্রাম, ত্যাগ ও তাদের আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে। এটি ঠিক একজন রোগীর মতো যিনি তার ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে তাদের আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেন, যদিও তাকে তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়। যেভাবে এই রোগীর মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য ভালো হবে, সেইভাবে যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে তাদের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে। সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, এই সত্যটি বুঝতে পেরেছিলেন এবং ফলস্বরূপ ইসলামী শিক্ষা

শেখার এবং তার উপর আমল করার জন্য অনেক ঝুঁকি নিয়েছিলেন। মানুষের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, বর্তমান যুগে ইসলামী শিক্ষা শেখার এবং তার উপর আমল করার জন্য তাদের এই ধরণের ঝুঁকি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করতে পারে।

এছাড়াও, আলোচিত মূল ঘটনাটি অন্যদের ভালো কাজের দিকে পরিচালিত করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে।

জামে আত তিরমিযী, ২৬৭৪ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে ভালো কিছুর দিকে পরিচালিত করে, সে তাদের উপদেশ অনুসারে কাজ করা লোকদের সমান সওয়াব পাবে। আর যারা অন্যদের পাপের দিকে পরিচালিত করে, তাদের উপর এমনভাবে জবাবদিহি করা হবে যেন তারা পাপ করেছে।

অন্যদের উপদেশ ও নির্দেশনা দেওয়ার সময় মুসলমানদের সতর্ক থাকা গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুসলিমের উচিত কেবল ভালো কাজেই অন্যদের উপদেশ দেওয়া যাতে তারা এর প্রতিদান পায় এবং আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হওয়ার উপদেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকা। কেউ যদি কেবল এই দাবি করে যে সে অন্যদের পাপের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, এমনকি যদি সে নিজে পাপ নাও করে, তাহলেও বিচার দিবসে শাস্তি থেকে বাঁচবে না। মহান আল্লাহ, পথপ্রদর্শক এবং অনুসারী উভয়কেই তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করবেন। অতএব, মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে কেবল সেই কাজ করার পরামর্শ দেওয়া যা তারা নিজেরাই করত। যদি তারা তাদের আমলনামায় কোন কাজ লিপিবদ্ধ করা অপছন্দ করে, তাহলে তাদের অন্যদের সেই কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়।

এই ইসলামী নীতির কারণে, মুসলমানদের উচিত অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা নিশ্চিত করা, কারণ অন্যদের ভুল উপদেশ দিলে তারা সহজেই তাদের পাপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

উপরন্তু, এই নীতিটি মুসলমানদের জন্য সম্পদের মতো সামর্থ্যের অভাবে নিজেরা যে কাজ করতে পারে না তার জন্য সওয়াব অর্জনের একটি অত্যন্ত সহজ উপায়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি আর্থিকভাবে দান করতে সক্ষম নয়, সে অন্যদেরকেও তা করতে উৎসাহিত করতে পারে এবং এর ফলে তারা দানকারীর মতোই সওয়াব পাবে।

অধিকন্তু, মৃত্যুর পরেও মানুষের সৎকর্মের বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য এই ইসলামী নীতি একটি চমৎকার উপায়। যত বেশি মানুষ অন্যদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত করবে, তত বেশি তাদের সৎকর্ম বৃদ্ধি পাবে। এই উত্তরাধিকার সম্পর্কে একজন মুসলিমকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে, কারণ সম্পত্তির সাম্রাজ্যের মতো অন্যান্য সমস্ত উত্তরাধিকার আসবে এবং যাবে, এবং মৃত্যুর পরে তা তাদের কোনও কাজে আসবে না। যদি কিছু থাকে, তবে তাদের সাম্রাজ্য উপার্জন এবং জমা করার জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে, যখন তাদের উত্তরাধিকারীরা মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সাম্রাজ্য উপভোগ করবে।

ব্যবসায় ন্যায়বিচার

এক ব্যক্তি একবার মক্কায় কিছু উট নিয়ে এসেছিল, যা সে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চাচা আবু জাহেলের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। কিন্তু আবু জাহেল সেগুলোর দাম দিতে দেরি করে। যখন লোকটি মক্কাবাসীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, কারণ সে শহরে অপরিচিত ছিল, তখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে সাহায্য করেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) লোকটিকে আবু জাহেলের বাড়িতে নিয়ে যান, তার দরজায় কড়া নাড়েন এবং যখন তিনি সাড়া দেন, তখন তিনি তাকে নির্দেশ দেন যে তার পাওনা পরিশোধ করে দাও। অত্যন্ত ভয়ের সাথে আবু জাহেল দ্রুত তার ঘরে ঢুকে টাকা নিয়ে ফিরে আসেন এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ধন্যবাদ জানিয়ে লোকটি চলে যায়। পরে আবু জাহেল লোকদের জানায় যে ঘটনার সময় তার হৃদয় ভয়ে ভরা ছিল এবং যখন সে দরজা খুলল, তখন সে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পাশে একটি বিপজ্জনক এবং রাগান্বিত ঘোড়ার উট দেখতে পেল এবং সে ভয় পেয়ে গেল যে প্রাণীটি তাকে খেয়ে ফেলবে, তাই সে লোকটিকে তার পাওনা পরিশোধ করে দিল। এই ঘটনাটি ইমাম ইবনে কাথিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪০-৩৪১-এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি মন্দ অভ্যাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার গুরুত্ব প্রদর্শন করে।

সুনানে আবু দাউদের ৪৩৪০ নম্বর হাদিসে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মন্দ কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার গুরুত্ব সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন। এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, সকল মুসলমানের উপর তাদের শক্তি এবং সামর্থ্য অনুসারে সকল ধরণের মন্দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা কর্তব্য। এই হাদিসে উল্লেখিত সর্বনিম্ন স্তর হল অন্তর দিয়ে মন্দকে প্রত্যাখ্যান করা।

এ থেকে বোঝা যায় যে, অভ্যন্তরীণভাবে মন্দ কাজকে অনুমোদন করা নিষিদ্ধ জিনিসগুলির মধ্যে সবচেয়ে জঘন্যতম। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আবু দাউদের ৪৩৪৫ নম্বর হাদিসে মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি মন্দ কাজের সময় উপস্থিত থাকে এবং তা নিন্দা করে, সে যেন সেই ব্যক্তির মতো যে উপস্থিত ছিল না। কিন্তু যে ব্যক্তি অনুপস্থিত ছিল এবং মন্দ কাজের অনুমোদন করেছিল, সে যেন সেই ব্যক্তির মতো যে মন্দ কাজের সময় উপস্থিত ছিল এবং নীরব ছিল।

আলোচ্য মূল হাদিসে বর্ণিত মন্দ কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রথম দুটি দিক হলো শারীরিক কর্মকাণ্ড এবং কথাবার্তার মাধ্যমে। এটি কেবলমাত্র একজন মুসলিমের উপর কর্তব্য যার তা করার শক্তি আছে, উদাহরণস্বরূপ, তাদের কাজ বা কথার দ্বারা তাদের কোন ক্ষতি হবে না।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, নিজের হাতে মন্দ কাজের প্রতিবাদ করা মানে যুদ্ধ নয়। এটি অন্যের মন্দ কাজ সংশোধন করা, যেমন কারো অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া যা বেআইনিভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এখনও তা করার মতো অবস্থানে আছে, সে তা করা থেকে বিরত থাকে, তাকে সুনান আবু দাউদের ৪৩৩৮ নম্বর হাদিসে শাস্তির বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, ২১৯১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদের উপদেশ দিয়েছেন যে, সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে তাদের সৃষ্টিকে ভয় করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি সৃষ্টির ভয়কে মন্দ কাজের প্রতি আপত্তি জানাতে বাধা দেয় তাকে এমন ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যে নিজেকে ঘৃণা করে এবং বিচারের দিনে মহান আল্লাহ তাকে সমালোচিত করবেন। সুনানে ইবনে

মাজাহ, ৪০০৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি লক্ষণীয় যে, এটি সেই ব্যক্তির কথা নয় যে ক্ষতির ভয়ে চুপ থাকে কারণ এটি একটি গ্রহণযোগ্য অজুহাত। বরং এটি সেই ব্যক্তির কথা বলে যে মানুষের দৃষ্টিতে যে মর্যাদা রয়েছে তার কারণে চুপ থাকে, যদিও তারা যদি ঘটছে সেই মন্দের বিরুদ্ধে কথা বলে তবে তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

সুনানে আবু দাউদের ৪৩৪১ নম্বর হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যখন অন্যরা তাদের লোভের আনুগত্য করে, তাদের ভুল মতামত ও আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করে এবং পরকালের চেয়ে বস্তুগত জগৎকে প্রাধান্য দেয়, তখন একজন ব্যক্তি তাদের কাজ ও কথার মাধ্যমে মন্দ কাজের প্রতিবাদ করা ত্যাগ করতে পারে। এই সময় এসে গেছে বলে সিদ্ধান্ত নিতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না। ৫ম অধ্যায় আল মায়িদা, আয়াত ১০৫।

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিজেদের উপরই [দায়িত্ব]। যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না যখন তোমরা সৎ পথে চলে যাবে..."

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের উপর নির্ভরশীলদের প্রতি এই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করা, কারণ এটি তাদের উপর একটি কর্তব্য, সুনান আবু দাউদের ২৯২৮ নম্বর হাদিস অনুসারে, এবং যাদের থেকে তারা শারীরিক ও মৌখিকভাবে নিরাপদ বোধ করে, তাদের প্রতি, কারণ এটিই সর্বোত্তম মনোভাব।

আলোচ্য মূল হাদিসে স্পষ্টতই মন্দ বিষয়ের প্রতি আপত্তি জানানোর কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এটি মুসলমানদেরকে অন্যদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করার অনুমতি দেয় না যাতে তারা আপত্তি করার জন্য মন্দ বিষয় খুঁজে পায়। গুপ্তচরবৃত্তি এবং এর সাথে সম্পর্কিত যেকোনো কিছু নিষিদ্ধ। সূরা আল হুজুরাত, আয়াত ১২:

"হে ঈমানদারগণ...গোয়েন্দাগিরি করো না..."

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিমকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মন্দ কাজের প্রতিবাদ করতে হবে, তাদের ইচ্ছা অনুসারে নয়। একজন মুসলিম হয়তো বিশ্বাস করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করছে, যদিও তারা তা করে না। এটি তখন প্রমাণিত হয় যখন তারা এমনভাবে মন্দ কাজের প্রতিবাদ করে যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। প্রকৃতপক্ষে, এই নেতিবাচক মনোভাবের কারণে যাকে সৎ কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় তা পাপে পরিণত হতে পারে।

একজন মুসলিমের উচিত পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে মন্দ কাজের বিরুদ্ধে নম্রভাবে প্রতিবাদ করা, বিশেষ করে গোপনে। ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল না করে এটি অর্জন করা সম্ভব নয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির বিপরীতটি মানুষকে কেবল আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে এবং অন্যদের রাগানোর ফলে আরও পাপের দিকে পরিচালিত করতে পারে। পরিশেষে, সঠিক সময়ে মন্দ কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত, কারণ ভুল সময়ে, যেমন যখন তারা রাগান্বিত থাকে, তখন গঠনমূলকভাবে সমালোচনা করা তাদের ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা কম।

উপরন্তু, আলোচিত মূল ঘটনাটি ইঙ্গিত দেয় যে ব্যবসায়িক লেনদেন ন্যায্য ও সৎভাবে পরিচালনা না করা একজন মুসলিমের চরিত্র নয়। সুনানে ইবনে মাজাহের ২১৪৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, কেয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা অনৈতিক লোক হিসেবে উত্থিত হবে, তবে তারা ব্যতীত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, সৎকর্ম করে এবং সত্য কথা বলে।

এই হাদিসটি ব্যবসায়িক লেনদেনে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য প্রযোজ্য। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে আল্লাহকে ভয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, অন্যদের সাথে সেভাবেই আচরণ করা উচিত যেভাবে সে মানুষের কাছ থেকে আচরণ পেতে চায়।

ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের কথাবার্তায় সৎ থাকা এবং লেনদেনের সমস্ত বিবরণ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে প্রকাশ করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদিস, সংখ্যা ২০৭৯, সতর্ক করে যে, যখন মুসলিমরা আর্থিক লেনদেনে জিনিসপত্র, যেমন তাদের পণ্যের ত্রুটি, গোপন করে, তখন এর ফলে বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

সৎকর্ম করার মধ্যে রয়েছে অন্যদের সাথে প্রতারণা করা থেকে বিরত থাকা, যাতে তারা অতিরিক্ত মূল্যে জিনিসপত্র কিনে প্রতারণা না করে। একজন মুসলিমের

উচিত অন্যদের সাথে সেই আচরণ করা যা সে অর্থপূর্ণভাবে চায়, সততা এবং সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে। একজন মুসলিম যেমন আর্থিক বিষয়ে দুর্ব্যবহার পছন্দ করেন না, তেমনি তাদেরও অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করা উচিত নয়।

সৎকর্ম করার মধ্যে রয়েছে ইসলাম এবং দেশের আইনে আলোচিত অবৈধ অনুশীলন এড়িয়ে চলা। যদি কেউ তাদের দেশের ব্যবসায়িক আইন নিয়ে সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে তাদের সেখানে ব্যবসা করা উচিত নয়।

অধিকন্তু, সৎকর্ম করার মধ্যে রয়েছে নিজের ব্যবসায়িক সাফল্যকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তাদের ব্যবসা এবং সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য আরাম এবং শান্তির উৎস হয়ে উঠবে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

কিন্তু যারা তাদের ব্যবসায়িক সাফল্যের অপব্যবহার করে তারা দেখতে পাবে যে এটি তাদের চাপ এবং দুর্দশার উৎস হয়ে ওঠে, কারণ তারা মহান আল্লাহকে ভুলে গেছে, যিনি তাদের সাফল্য দিয়েছেন। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন] এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।"

যারা ব্যবসা পরিচালনা করেন তাদের সর্বদা মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা উচিত কারণ এটি অনৈতিকতার দিকে পরিচালিত করে এবং অমরত্ব জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে এবং তার উপর কাজ করতে থাকবে যতক্ষণ না তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা একজন মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন। জামে আত তিরমিযী, ১৯৭১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

পরিশেষে, আলোচ্য মূল ঘটনাটি ইঙ্গিত করে যে, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করার গুরুত্ব কত। যেহেতু প্রতিটি আশীর্বাদই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক ঋণ হিসেবে দান করা হয়েছে, তাই পার্থিব ঋণের মতোই তা পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় ব্যক্তি উভয় জাহানে শাস্তির সম্মুখীন হবে। এই ঋণ তখনই পরিশোধ করা হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৫৪:

"হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদের যা রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করো, সেই দিন আসার আগে, যেদিন কোন বিনিময় [অর্থাৎ মুক্তিপণ], কোন বন্ধুত্ব এবং কোন সুপারিশ থাকবে না। আর কাফেররা তো জালেম।"

এই ঋণ পরিশোধের একটি দিক হল নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করা, যেমন শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক সহায়তা। অতএব, অন্যদের সাহায্য

করার সময় কেউ যেন কখনও এটা না ভাবে যে তারা অন্যদের প্রতি অনুগ্রহ করছে। বাস্তবে, একজন ব্যক্তি কেবল নিজের প্রতিই অনুগ্রহ করে, কারণ সে মহান আল্লাহর কাছে ঋণ পরিশোধ করছে। সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৭:

"যদি তোমরা ভালো করো, তাহলে নিজেদের জন্যই ভালো করো; আর যদি মন্দ করো, তাহলে তাদের [অর্থাৎ নিজেদের] জন্যই ভালো করো..."

এছাড়াও, এই ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অসংখ্য সওয়াব লাভ করেন। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সাহায্য করে, সে আল্লাহর নিরন্তর সাহায্য লাভ করবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্য লাভ করে, সে তার মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতি সফলভাবে অতিক্রম করবে যাতে সে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে। এই হাদিসটিই পরামর্শ দেয় যে, যে ব্যক্তি একজন মুসলিমের দুঃখ-কষ্ট দূর করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যেহেতু কিয়ামতের দিনের দুঃখ-কষ্ট এই পৃথিবীতে যে কোনও দুঃখ-কষ্টের চেয়েও বেশি, তাই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার যা প্রত্যেকেরই পাওয়ার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

একটি বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য

একবার মক্কার অমুসলিমদের নেতারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে তাঁর কাঙ্ক্ষিত সমস্ত সম্পদ দান করেছিলেন। তারা তাঁকে তাদের গোত্রীয় নেতা এমনকি তাদের রাজা করারও প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে কেবল ইসলাম প্রচার ত্যাগ করতে হয়েছিল। কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন যে ইসলামের বার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পদ, সম্মান বা সার্বভৌমত্ব অর্জনের জন্য ছিল না। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর শেষ নবী হিসেবে তাঁর মিশন পূরণ করা, যাতে তিনি তাঁকে খুশি করতে পারেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীজীর জীবন", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৭-৩৪৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনা থেকে একজন মুসলিম ইসলামের জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার সময় পার্থিব জিনিসের আকাঙ্ক্ষা না করার গুরুত্ব শিখতে পারে।

সুনানে ইবনে মাজাহের ২৫৩ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি পণ্ডিতদের কাছে নিজেকে দেখানোর জন্য, অন্যদের সাথে তর্ক করার জন্য অথবা নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে, সে জাহান্নামে যাবে।

যদিও পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই সকল কল্যাণের ভিত্তি হলো জ্ঞান, তবুও মুসলমানদের বুঝতে হবে যে জ্ঞান তখনই তাদের উপকার করবে যখন তারা প্রথমে তাদের নিয়ত সংশোধন করবে। অর্থাৎ, তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করে। অন্য সকল কারণ

কেবল পুরস্কার হারাতে পারে এমনকি শাস্তিও বয়ে আনবে যদি একজন মুসলিম আন্তরিকভাবে তওবা না করে।

বাস্তবে, জ্ঞান হলো বৃষ্টির পানির মতো যা বিভিন্ন ধরণের গাছের উপর পড়ে। কিছু গাছ এই পানি দিয়ে জন্মায় অন্যদের উপকার করার জন্য, যেমন একটি ফলের গাছ। অন্যদিকে, অন্যান্য গাছ এই পানি দিয়ে জন্মায় এবং অন্যদের জন্য বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। যদিও বৃষ্টির পানি উভয় ক্ষেত্রেই একই, তবুও ফলাফল খুব আলাদা। একইভাবে, ধর্মীয় জ্ঞান মানুষের জন্য একই, কিন্তু যদি কেউ ভুল উদ্দেশ্য গ্রহণ করে তবে তা তাদের ধ্বংসের উপায় হয়ে উঠবে। বিপরীতে, যদি কেউ সঠিক উদ্দেশ্য গ্রহণ করে তবে তা তাদের মুক্তির উপায় হয়ে উঠবে।

তাই মুসলমানদের সকল বিষয়ে তাদের নিয়ত সংশোধন করা উচিত, কারণ এর ভিত্তিতেই তাদের বিচার করা হবে। সহীহ বুখারী, ১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এবং তাদের মনে রাখা উচিত যে জাহান্নামে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হবেন একজন পণ্ডিত যিনি কেবল অন্যদের দেখানোর জন্য জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সহীহ মুসলিম, ৪৯২৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এছাড়াও, জ্ঞানের উপর আমল করার সাথে সৎ উদ্দেশ্যকে যুক্ত করতে হবে, কারণ কর্ম ছাড়া জ্ঞান উপকারী জ্ঞান নয়, এটি কেবল তথ্য। জ্ঞানের উপর আমল না করা একজন ডাক্তারের মতো, যে মানুষের চিকিৎসার জন্য তার চিকিৎসা জ্ঞান প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়। ঠিক যেমন তারা নিজের বা অন্যদের উপকার করে না, তেমনি একজন মুসলিমেরও উপকার হয় না যার কাছে ইসলামী জ্ঞান আছে এবং তা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যক্তিকে জ্ঞানের বই বহনকারী গাধার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সূরা ৬২ আল জুমু'আ, আয়াত ৫:

"...এবং তারপর তা গ্রহণ না করা (তাদের জ্ঞান অনুসারে কাজ না করা) হল সেই গাধার মতো যে [বইয়ের] বই বহন করে..."

এছাড়াও, যে ব্যক্তি বৈধ কারণ ছাড়া জ্ঞান গোপন করবে, তাকে বিচারের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৪৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, মুসলমানদের তাদের উপার্জিত উপকারী জ্ঞান অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়া উচিত। এটি না করা নিছক বোকামি কারণ এটি এমন একটি সৎকর্ম যা একজন মুসলিমের মৃত্যুর পরেও উপকারে আসবে। সুনান ইবনে মাজাহ, ২৪১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যারা জ্ঞান জমা করে রেখেছিল তাদের ইতিহাস ভুলে গেছে কিন্তু যারা তা অন্যদের সাথে ভাগ করে নিয়েছিল তারা মানবজাতির পণ্ডিত এবং শিক্ষক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

পরিশেষে, জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য বিতর্কে অন্যদের পরাজিত করা নয়। একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো দৃঢ় প্রমাণ সহকারে অন্যদের কাছে সত্য সঠিকভাবে উপস্থাপন করা। তর্ক-বিতর্ক এবং বিতর্কের মাধ্যমে মানুষকে সত্য গ্রহণে বাধ্য করার দায়িত্ব তাদের দেওয়া হয়নি। এই মনোভাব মানুষকে কেবল সত্য থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়। পরিবর্তে, তর্ক না করে মানুষকে সত্য ব্যাখ্যা করা উচিত এবং নিজেরাই সেই সত্যের উপর কাজ করে এই সত্যটি দেখানো উচিত। ধার্মিক পূর্বসূরীরা এভাবেই আচরণ করতেন এবং এই পদ্ধতি অন্যদের সত্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকর।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে, যাতে তারা উভয় জগতেই সওয়াব এবং আশীর্বাদ লাভ করতে পারে। যে ব্যক্তি অন্যের স্বার্থে কাজ করে সে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে কোন সওয়াব পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এছাড়াও, যে ব্যক্তি মানুষকে খুশি করার জন্য কাজ করে সে দেখতে পাবে যে সে কখনই এটি অর্জন করতে পারবে না, কারণ তার জীবনের সকল মানুষকে খুশি করা সম্ভব নয়। উপরন্তু, যেহেতু মানুষ সাধারণত অকৃতজ্ঞ, তাই তারা তাদের কর্মের প্রশংসা করবে না এবং ফলস্বরূপ তারা তিক্ত এবং দুঃখিত হবে। এটি তাদের মানুষের অধিকার পূরণে বাধা দেবে, যা ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এবং এটি তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে। অতএব, মুসলমানদের জন্য তাদের নিয়ত সংশোধন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা কেবল আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে, যা উভয় জগতেই রহমত এবং পুরষ্কারের দিকে পরিচালিত করে।

বোকা অনুরোধ

মানুষকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্য, মক্কার অমুসলিমরা বোকা বোকা অনুরোধ করেছিল, যার মধ্যে কিছু পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে, যেমন একজন ফেরেশতাকে তাদের সামনে প্রকাশ্যে উপস্থিত হওয়ার এবং তিনি যে মহান আল্লাহর পবিত্র নবী তা যাচাই করার জন্য অনুরোধ করা। এটি ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৮-৩৪৯-এ আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় ১৫ আল হিজর, আয়াত ৭:

"যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও, তাহলে কেন তুমি আমাদের কাছে ফেরেশতাদের আনছো না?"

অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস ঈমানের একটি মূল উপাদান এবং তা ছাড়া ঈমানের মূল্য হারায়। যদি অদৃশ্য জিনিসগুলি, যেমন ফেরেশতা, এই পৃথিবীতে মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হত, তাহলে তাদের ঈমানের মান হ্রাস পেত। কিন্তু তবুও, এই অদৃশ্য উপাদানগুলি আসমান ও জমিনের মধ্যে অনেক প্রমাণ এবং সূচক দ্বারা সমর্থিত। উদাহরণস্বরূপ, একটি চিত্রকলার উপস্থিতি একজন চিত্রকরকে নির্দেশ করে। সৃষ্টির উপস্থিতি একজন স্রষ্টাকে নির্দেশ করে, বিশেষ করে যখন সৃষ্টি নিখুঁতভাবে সৃষ্ট হয়। এছাড়াও, এমন অসংখ্য পার্থিব জিনিস রয়েছে যেখানে একজন ব্যক্তি সেগুলি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় তবুও তারা অভিযোগ না করেই সেগুলি ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, অসংখ্য মানুষ মানবদেহে ওষুধ কীভাবে কাজ করে তা না বুঝে বা না বুঝেই ওষুধ সেবন করে। যদিও ইসলামের মাধ্যমে মানবজাতিকে প্রদত্ত আচরণবিধি সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ এবং সাধারণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে, তবুও ইসলামের কিছু অন্যান্য দিক অদৃশ্য জিনিসের উপর ভিত্তি করে, কারণ এটি ঈমানের মূল্য দেয়। এই কারণেই যে ব্যক্তি অদৃশ্য উপাদানগুলি, যেমন ফেরেশতাদের, প্রত্যক্ষ করে, তার ঈমানের দাবি আল্লাহ, মহিমান্বিতভাবে

গ্রহণ করবেন না, কারণ এই অদৃশ্য জিনিসগুলিতে বিশ্বাস করা যখন তারা সাক্ষী হয় তখন বিশেষ কিছু নয়।

মানুষের পরীক্ষা হলো তারা বাস্তবতাকে গ্রহণ করে কিনা, যদিও তারা তাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সরাসরি তা উপলব্ধি করতে পারে না এবং তা গ্রহণ করার পর, তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলে কিনা, যদিও তাদের অবাধ্য হওয়ার শক্তি এবং ক্ষমতা রয়েছে। নবীদের প্রেরণে এবং ঐশী গ্রন্থ অবতীর্ণ করার সময়, মহান আল্লাহ সর্বদা মানুষের বিচার ক্ষমতা এবং তাঁর প্রতি তাদের আনুগত্য পরীক্ষা করার সুযোগ রেখে গেছেন। তিনি কখনও বাস্তবতাকে এতটা প্রকাশ করেননি যে মানুষ অনিবার্যভাবে তা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। কারণ যদি তা করা হয় তবে কিছুই পরীক্ষা করার বাকি থাকবে না এবং মানুষের সাফল্য বা ব্যর্থতার ধারণাই অর্থহীন হয়ে পড়বে। অতএব, এই আয়াতটি নির্দেশ করে যে, মানুষের উচিত আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাদের তাদের সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়। যদি তা ঘটে তবে এটি সবকিছুর সমাপ্তি চিহ্নিত করবে এবং মানুষের জন্য কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনও সুযোগ অবশিষ্ট থাকবে না। বিশ্বাস করা এবং আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলা কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত মূল্যবান যতক্ষণ বাস্তবতাকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যাতে এর প্রত্যাখ্যান সম্ভব হয়। যদি সত্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হত এবং মানুষ যদি মহাবিশ্ব ও পরকালের অদৃশ্য উপাদানগুলি দেখতে পেত, তাহলে তাদের বিশ্বাস ও আনুগত্যের কোনও মূল্য থাকত না। যদি এই সমস্ত জিনিসগুলি দৃশ্যমান হত, এমনকি সবচেয়ে জেদী অবিশ্বাসী এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট পাপীও অবিশ্বাস বা অবাধ্য হত না। বিশ্বাস ও আনুগত্য গ্রহণের মূল্য কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবতার উপর একটি আবরণ থাকবে। যে মুহূর্তটি বাস্তবতা সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হবে, সেই মুহূর্তটি মানুষকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রদত্ত সময় এবং তাদের পরীক্ষার সময়কালের সমাপ্তি চিহ্নিত করবে। এই মুহূর্তটি হল বিচারের দিন।

অধিকন্তু, যে মুসলিম সত্যিকার অর্থে অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, যেমন জান্নাত, যদিও তারা তা প্রত্যক্ষ করেনি, তাদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের জীবনে যা কিছু ঘটে, তা তাদের কাছে আনন্দদায়ক হোক বা না হোক, একটি ভাল কারণেই ঘটে, এমনকি যদি সেই কারণ তাদের কাছে অদৃশ্য হয়। তাই যেভাবে কেউ এই অদৃশ্য বিষয়গুলিতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, তাদেরও মহান আল্লাহর বিজ্ঞ পছন্দগুলিতে বিশ্বাস করা উচিত, যা অদৃশ্য। এটি তাদের ধৈর্যের দিকে উৎসাহিত করবে এবং তাদের অগণিত পুরষ্কারের দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় 39 আয-যুমার, আয়াত 10:

"...ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান বিনা হিসাব [অর্থাৎ, সীমা] দেওয়া হবে।"

মক্কার অমুসলিমরা এমনকি এটাও অদ্ভুত মনে করেছিল যে, মহান আল্লাহ একজন মানুষকে ফেরেশতাদের পরিবর্তে নবী হিসেবে পাঠাবেন।

যেহেতু একজন নবী, সাঃ, মানুষের কাছে প্রেরিত হন, তাই ফেরেশতাদের মতো অন্য কিছু হিসেবে তাদের পাঠানোর কোনও মানে হয় না। একজন নবী, সাঃ, এর কাজ হলো মানুষকে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কীভাবে আচরণ করতে হবে তার একটি বাস্তব উদাহরণ অর্জন করা। একজন ফেরেশতা মানুষের অনুভূতি, যেমন ক্লান্তি, অনুভব করেন না, তাই মানুষ তাদের ফেরেশতা নবী, সাঃ এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না এবং এটি তাদেরকে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর সামনে একটি অজুহাত দেবে।

অতএব, কেন অমুসলিমরা অবাক হয়েছিল যে একজন মানুষকে অন্য মানুষকে সতর্ক করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল? একইভাবে, মানবজাতিকে পথ

দেখানোর জন্য একজন পবিত্র নবী, সা., নিযুক্ত করার মধ্যে কি অদ্ভুত কিছু আছে? কারণ যদি মানুষ বিভ্রান্তিতে ডুবে থাকে এবং সত্য থেকে অজ্ঞ থাকে, তাহলে সত্যিই অদ্ভুত কী: তাদের স্রষ্টা এবং প্রভু তাদের পথ দেখানোর ব্যবস্থা করবেন অথবা তাদেরকে পথ দেখানোর জন্য ব্যবস্থা করবেন অথবা তাদেরকে পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তিতে চলতে দেবেন? আর যদি ঐশ্বরিক নির্দেশনা মানুষের জন্য উপলব্ধ করা হয়, তাহলে কি এটা যুক্তিসঙ্গত নয় যে যারা তা গ্রহণ করে এবং অনুসরণ করে, যারা তা প্রত্যাখ্যান করে, তাদের চেয়ে তারাই মহান আল্লাহর কাছে সম্মানিত হওয়ার যোগ্য? যারা এতে তাদের বিস্ময় প্রকাশ করে তাদের আচরণ আসলে আশ্চর্যজনক।

ঐশ্বরিক নৈকট্য

যখন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) দুই বা তিন দিন ধরে ঐশী প্রত্যাদেশ পাননি, তখন একজন অমুসলিম সম্ভ্রান্ত মহিলা ঘোষণা করেন যে তাকে পরিত্যক্ত করা হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে, মহান আল্লাহ ৯৩ সূরা আদ দুহা, আয়াত ১-৩ নাযিল করেন:

"শপথ সকালের আলোর। আর [শপথ] রাতের যখন তা অন্ধকারে ঢেকে যায়। তোমার প্রতিপালক তোমাকে ছেড়ে যাননি এবং [তোমাকে] ঘৃণা করেননি।"

সহীহ বুখারী, ৪৯৫০ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ কিভাবে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে পরিত্যাগ করতে পারেন, যখন তিনি সর্বদা তাঁকে স্মরণ করতেন? সহীহ বুখারীতে ৭৪০৫ নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ ঐশী হাদিসে, মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁকে স্মরণ করে তিনি তাদের সাথেই থাকেন।

মানসিক সমস্যা এবং ব্যাধি, যেমন বিষণ্নতা, বৃদ্ধির সাথে সাথে, মুসলমানদের জন্য এই ঘোষণার গুরুত্ব বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন ব্যক্তি যখন সর্বদা এমন কাউকে ঘিরে থাকেন এবং তাকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসেন, তখন তার মানসিক সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। যদি এটি একজন ব্যক্তির জন্য সত্য হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে এটি মহান আল্লাহর জন্য আরও উপযুক্ত, যিনি তাঁর

স্মরণকারীর সাথে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শুধুমাত্র এই ঘোষণার উপর আমল করলেই হতাশার মতো মানসিক সমস্যা দূর হবে। এই কারণেই অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা বা অন্যদের মধ্যে থাকা ধার্মিক পূর্বসূরীদের মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলেনি কারণ তারা সর্বদা মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে ছিলেন। এটা স্পষ্ট যে যখন কেউ মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে, তখন তারা সমস্ত বাধা এবং অসুবিধা সফলভাবে অতিক্রম করে, যতক্ষণ না তারা পরকালে তাঁর নৈকট্য অর্জন করে।

অধিকন্তু, তাঁর অসীম করুণার কারণে, মহান আল্লাহ এই ঘোষণাকে কোনওভাবেই সীমাবদ্ধ করেননি। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ঘোষণা করেননি যে তিনি কেবল সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন অথবা যারা নির্দিষ্ট সৎকর্ম করে তাদের সাথেই আছেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি প্রতিটি মুসলিমকে তাদের ঈমানের শক্তি বা তারা যতই পাপ করুক না কেন, বেষ্টন করেছেন। অতএব, একজন মুসলিমের কখনই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তবে এই হাদিসে উল্লেখিত শর্তটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, মহান আল্লাহকে স্মরণ করা। এই স্মরণের মধ্যে নিজের নিয়ত সংশোধন করা অন্তর্ভুক্ত যাতে তারা কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে এবং তাই মানুষের কাছ থেকে কোনও কৃতজ্ঞতা আশা বা আশা না করে। জিহ্বা দিয়ে স্মরণের মধ্যে রয়েছে ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা। এবং স্মরণের সর্বোচ্চ স্তর হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। এটিই মহান আল্লাহর প্রকৃত স্মরণ। যে ব্যক্তি এই ধরণের আচরণ করবে, সে মহান আল্লাহর সাহচর্য এবং সাহায্য লাভ করবে।

সহজ কথায়, যে ব্যক্তি যত বেশি আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে, তত বেশি সে তার সাহচর্য পাবে। যে যা দান করবে, তাই সে পাবে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিমের কখনোই পার্থিব মানদণ্ড অনুসারে বিচার করা উচিত নয় যে তাদের উপর আল্লাহর সমর্থন আছে কিনা। উদাহরণস্বরূপ, কেবল তারা কোনও সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বলেই এর অর্থ এই নয় যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে পরিত্যাগ করেছেন। আর স্বাচ্ছন্দ্যের সময় ভোগ করার অর্থ এই নয় যে, তাদের উপর আল্লাহর সমর্থন আছে। সূরা ৮৯ আল ফজর, আয়াত ১৫-২০:

“আর মানুষ, যখন তার প্রভু তাকে পরীক্ষা করেন এবং [এইভাবে] তাকে দান করেন এবং অনুগ্রহ করেন, তখন সে বলে, "আমার প্রভু আমাকে সম্মানিত করেছেন।" কিন্তু যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার রিজিক সীমিত করেন, তখন সে বলে, "আমার প্রভু আমাকে অপমানিত করেছেন।" না! কিন্তু তোমরা এতিমকে সম্মান করো না। এবং তোমরা একে অপরকে দরিদ্রদের খাওয়ানোর জন্য উৎসাহিত করো না। এবং তোমরা উত্তরাধিকার সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলো। এবং তোমরা ধন-সম্পদকে অগাধ ভালোবাসায় ভালোবাসো।”

বাস্তবে, কষ্ট এবং স্বাচ্ছন্দ্য উভয়ই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা মাত্র। পরীক্ষা হলো তারা কি স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং কঠিন সময়ে ধৈর্য ধারণ করবে। নিয়তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ কেবল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা। কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ ভালো কথা বলা অথবা নীরব থাকা। আর কাজের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে খুশি করার জন্য যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা। উপরোক্ত আয়াতগুলিতে এটি নির্দেশিত হয়েছে। অধিকন্তু, ধৈর্য প্রকাশের অর্থ হলো নিজের কথা বা কাজে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা, বিশ্বাস করা যে তিনি কেবল তাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক পথে কাজ করে, সে মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থন এবং করুণা লাভ করবে, যা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ৫ম সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত ১৫-১৬:

"... তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নূর এবং একটি স্পষ্ট কিতাব এসেছে। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টির অনুসারীদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং তাঁর অনুমতিক্রমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"

বিশ্বাসের উপর অবিচল

মক্কার অমুসলিমদের একজন নেতা হারিস বিন উসমান একবার মহানবী (সা.)-কে বলেছিলেন যে, অমুসলিমদের নেতারা জানতেন যে তিনি ইসলাম সম্পর্কে সত্যবাদী, কিন্তু তারা ভয় পেয়েছিলেন যে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে বাকি অমুসলিম আরবরা তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। এই প্রসঙ্গে, আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-কাসাসের ৫৭ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"আর তারা বলে, "আমরা যদি তোমার সাথে হেদায়েতের অনুসরণ করি, তাহলে আমাদের দেশ থেকে উচ্ছেদ করা হবে।" আমরা কি তাদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল স্থাপন করিনি যেখানে আমাদের পক্ষ থেকে রিযিক হিসেবে সকল কিছুর ফলমূল আনা হয়? কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।"

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ২৮:৫৭, পৃষ্ঠা ১২৩-১২৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটি কোনও বৈধ অজুহাত ছিল না কারণ সেই সময়ে সমগ্র আরব উপদ্বীপ মক্কাবাসীদের অত্যন্ত সম্মান করত কারণ তারা আল্লাহর ঘর কাবার রক্ষক ছিল, যা অজ্ঞতার যুগেও অত্যন্ত সম্মানিত ছিল। যদিও তাদের অজুহাত কিছুটা সত্য ছিল, তবুও ঈমানের দাবি হল কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও সত্যের উপর অটল থাকা, ঠিক যেমনটি মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রা.)-এর উপর বর্ষিত হোক। অধিকন্তু, যদি মহান আল্লাহ তাদেরকে মূর্তিপূজায় নিমজ্জিত অবস্থায় নিরাপত্তা এবং রিযিক দান করতেন, তবে তারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য

করার পর তিনি কেন এই আশীর্বাদগুলি কেড়ে নেবেন? অধ্যায় ১০৬, আয়াত ১-৪:

"কুরাইশদের অভ্যস্ত নিরাপত্তার জন্য। শীত ও গ্রীষ্মের কাফেলায় তাদের অভ্যস্ত নিরাপত্তার জন্য। তারা যেন এই ঘরের প্রভুর উপাসনা করে। যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে আহার দিয়েছেন এবং ভয় থেকে নিরাপদ করেছেন।"

তাছাড়া, আরব উপদ্বীপের গোত্রগুলোর অন্তর্গত মক্কার উপাসনা করা মূর্তিগুলো অপসারণের মাধ্যমে তারা যে ক্ষমতা, সামাজিক প্রভাব এবং সম্পদ হারাতো, তার ক্ষতিপূরণ আল্লাহ তাআলা দিতেন। যদি তারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করত, তাহলে তিনি তাদেরকে আরও বেশি ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং সম্পদ দান করতেন, ঠিক যেমনটি তিনি সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, তাদেরকে দিয়েছিলেন। ২৪তম অধ্যায় আন নূর, আয়াত ৫৫:

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে শাসক হিসেবে দান করবেন, যেমন তিনি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে শাসক হিসেবে দান করেছিলেন এবং অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের ভয় ও নিরাপত্তার পরিবর্তে তাদের জন্য পরিবর্তন করবেন, কারণ তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা কুফরী করবে, তারাই পাপাচারী।”

অতএব, যদি মুসলিমরা দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে, তাহলে তাদের অবশ্যই এমন সমস্ত অজুহাত ত্যাগ করতে হবে যা তাদেরকে আন্তরিকভাবে

মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা দেয়। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। সাহাবীদের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মনোভাব ছিল এই, যারা তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ তারা শ্রেষ্ঠত্ব, মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য লাভ করেছিলেন। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৩৯:

"সুতরাং তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, যদি তোমরা [সত্যিকারের] মুমিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।"

কুরআনের সাথে আপস করা

মক্কার অমুসলিমদের নেতারা একবার মহানবী (সা.)-কে পবিত্র কুরআন সম্পাদনা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন যাতে তারা সকলেই এর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং এর উপর ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। এই প্রসঙ্গে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা ইউনুস, আয়াত ১৫ নাযিল করেন:

"আর যখন তাদের কাছে আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা করে না তারা বলে, "এটি ছাড়া অন্য কোন কুরআন নিয়ে এসো অথবা এটি পরিবর্তন করো।" বলো, "আমার নিজের ইচ্ছায় এটি পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়। আমি কেবল সেই নির্দেশের অনুসরণ করি যা আমার কাছে আসে। আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি এক মহাদিবসের শাস্তির ভয় করি।"

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ১০:১৫, পৃষ্ঠা ৯৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

একজন মুসলিম যখন ইচ্ছাকৃতভাবে পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ উপেক্ষা করে যা তাদের ইচ্ছার সাথে সাংঘর্ষিক এবং অন্য অংশগুলি যা তাদের ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা গ্রহণ করে, তখন এই ধরণের আচরণ করতে পারে। এই মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এইভাবে একটি ঐশ্বরিক গ্রন্থকে কুফর হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং উভয় জগতেই শাস্তির দিকে পরিচালিত করে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ৮৪-৮৫:

“আর [স্মরণ করো] যখন আমরা তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, “তোমরা [একে অপরের] রক্তপাত করো না এবং একে অপরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিও না।” তারপর তোমরা সাক্ষী থাকা অবস্থায় স্বীকার করেছ। তারপর, তোমরাই তারা যারা একে অপরকে হত্যা করছো এবং তোমাদের একদল লোককে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছিলে, পাপ ও সীমালঙ্ঘনে তাদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করছিলে। আর যদি তারা তোমাদের কাছে বন্দী হয়ে আসে, তবে তোমরা তাদের মুক্তি দিয়ে মুক্তি দাও, যদিও তাদের বের করে দেওয়া তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশে অবিশ্বাস করো? তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা এমন করে তাদের শাস্তি পার্থিব জীবনে অপমান ছাড়া আর কী হতে পারে? এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে ফিরিয়ে পাঠানো হবে। তোমরা যা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন।”

যেহেতু মহান আল্লাহর রীতি পরিবর্তিত হয় না, তাই পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থের সাথে এইভাবে আচরণকারীদের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ফলাফল পবিত্র কুরআনের সাথে এইভাবে আচরণকারী মুসলমানদেরও একই পরিণতি দেওয়া হবে। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ৪৩:

"...কিন্তু তুমি কখনো আল্লাহর পথে কোন পরিবর্তন পাবে না, এবং তুমি কখনো আল্লাহর পথে কোন পরিবর্তন পাবে না।"

অতএব, একজন মুসলিমকে পবিত্র কুরআনের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে, অন্যথায় তাদের উভয় জগতেই তাদের অবাধ্যতার পরিণতি ভোগ করতে হবে।

ইমাম মুনজারীর "সচেতনতা ও উপলব্ধি", ৩০ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, পবিত্র কুরআন বিচার দিবসে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে জীবদ্দশায় এটি অনুসরণ করবে তাদের বিচার দিবসে এটি জান্নাতে নিয়ে যাবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে জীবদ্দশায় এটিকে অবহেলা করবে তারা দেখবে যে এটি তাদেরকে বিচার দিবসে জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি পথনির্দেশনার গ্রন্থ। এটি কেবল তেলাওয়াতের গ্রন্থ নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সকল দিক পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে যাতে এটি উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম দিকটি হল এটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিতভাবে তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয় দিকটি হল একজন নির্ভরযোগ্য আলেমের মাধ্যমে এটি বোঝা। এবং শেষ দিকটি হল মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসারে এর শিক্ষার উপর আমল করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা পবিত্র কুরআনের উপর সঠিকভাবে আমল করবে, কারণ মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনই পবিত্র কুরআনের ব্যবহারিক বাস্তবায়ন। যারা এইভাবে আচরণ করে তারাই পৃথিবীর প্রতিটি কঠিন সময়ে সঠিক পথনির্দেশনা এবং কিয়ামতের দিনে এর সুপারিশের সুসংবাদ পায়। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎ কর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

কিন্তু মূল হাদিস অনুসারে, পবিত্র কুরআন কেবল তাদের জন্য পথনির্দেশনা এবং রহমত যারা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে এর দিকগুলি সঠিকভাবে পালন করে। কিন্তু যারা এটিকে বুঝতে এবং তার উপর আমল করতে অস্বীকৃতি জানায় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে এর ভুল ব্যাখ্যা করে এবং পরিবর্তে তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, তারা বিচারের দিনে এই সঠিক পথনির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। সূরা ত্বাহা, আয়াত ১২৪:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন] এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।"

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময়, একজন মুসলিমের কেবল এই উদ্দেশ্যেই এটি ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থাৎ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি তেলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে একটি হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, যা কোনও সমস্যার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং সমস্যা সমাধানের পরে আবার একটি হাতিয়ার বাক্সে রাখা হয়। পবিত্র কুরআনের মূল কাজ হল পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য এই পৃথিবীর কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পথ দেখানো। পবিত্র কুরআন বোঝা এবং তার উপর আমল না করে এই উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব নয়। অন্ধ তেলাওয়াত যথেষ্ট নয়। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং কেবল নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলিমের আচরণের বিরোধিতা করে। এটি এমন ব্যক্তির মতো যে অনেক ধরণের জিনিসপত্র সহ একটি গাড়ি কিনে কিন্তু এটি

চালানো যায় না, যা একটি গাড়ির মূল উদ্দেশ্য। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তি কেবল বোকা। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু এটি জালেমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।"

পুনরুত্থান

অমুসলিমদের একজন নেতা, উবাই বিন খালাফ, একবার তার হাতে একটি পচনশীল হাড় ধরে ইসলামের এই দাবিকে উপহাস করেছিলেন যে, মহান আল্লাহ মৃতদের পুনরুত্থিত করবেন, তাদের হাড় পচে মাটিতে পরিণত হওয়ার পর। এই প্রসঙ্গে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, মরিয়ম সূরা ১৯, আয়াত ৬৬ নাযিল করেন:

"আর মানুষ [অবিশ্বাসী] বলে, "আমি মারা গেলে কি আমাকে জীবিত অবস্থায় বের করা হবে?"

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ১৯:৬৬, পৃষ্ঠা ১১০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যখন মহান আল্লাহ মানবজাতিকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, তখন ধুলো ও হাড় থেকে তাদের পুনরুত্থিত করা তাঁর পক্ষে সহজ হবে, যদিও উভয়ই তাঁর পক্ষে সহজ।

যুক্তিসঙ্গতভাবে বলতে গেলে, বিচার দিবস এমন একটি জিনিস যা অবশ্যই ঘটবে। কেউ যদি মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করে তবে সে ভারসাম্যের অনেক উদাহরণ দেখতে পাবে। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবী সূর্য থেকে একটি নিখুঁত এবং সুষম দূরত্বে অবস্থিত। পৃথিবী যদি সূর্যের একটু কাছে বা আরও দূরে থাকত তবে এটি বসবাসের অযোগ্য হত। একইভাবে, জলচক্র, যার মধ্যে সমুদ্র থেকে বায়ুমণ্ডলে জলের

বাষ্পীভবন জড়িত যা পরে বৃষ্টিপাতের জন্য ঘনীভূত হয়, পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ যাতে সৃষ্টি পৃথিবীতে বসবাস চালিয়ে যেতে পারে। ভূমি একটি সুষম উপায়ে তৈরি করা হয়েছিল যাতে দুর্বল শাখা এবং বীজের অঙ্কুরগুলি সৃষ্টির জন্য ফসল সরবরাহ করার জন্য এর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে পারে তবে একই ভূমি তার উপরে নির্মিত ভারী ভবনগুলি সহ্য করার জন্য যথেষ্ট শক্ত। এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যা কেবল স্পষ্টভাবে একজন স্রষ্টাকেই নির্দেশ করে না, ভারসাম্যকেও নির্দেশ করে। তবে এই পৃথিবীতে একটি প্রধান জিনিস রয়েছে যা স্পষ্টভাবে ভারসাম্যহীন, তা হল মানবজাতির কর্মকাণ্ড। প্রায়শই অত্যাচারী এবং অত্যাচারী মানুষদের দেখা যায় যারা এই পৃথিবীতে শাস্তি থেকে বাঁচে। বিপরীতে, এমন অসংখ্য মানুষ আছে যারা অন্যদের দ্বারা নিপীড়িত হয় এবং অন্যান্য সমস্যার সম্মুখীন হয় কিন্তু তাদের ধৈর্যের জন্য তাদের পূর্ণ পুরস্কার পায় না। অনেক মুসলিম যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে, তারা প্রায়শই এই পৃথিবীতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং পুরস্কারের সামান্য অংশ পায়, অন্যদিকে যারা প্রকাশ্যে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়, তারা এই পৃথিবীর বিলাসিতা উপভোগ করে এবং কেবল কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়। ঠিক যেমন আল্লাহ তাআলা তাঁর সমস্ত সৃষ্টিতে একটি ভারসাম্য স্থাপন করেছেন, তেমনি কর্মের পুরস্কার এবং শাস্তিরও ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। কিন্তু স্পষ্টতই এটি এই পৃথিবীতে ঘটে না, তাই এটি অন্য সময়ে, অর্থাৎ প্রতিদান দিবসে ঘটতে হবে
।

মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতেই পূর্ণ পুরষ্কার এবং শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু এই পৃথিবীতে পূর্ণ শাস্তি না দেওয়ার পেছনের একটি প্রজ্ঞা হল, মহান আল্লাহ তাদেরকে সুযোগের পর সুযোগ দিয়ে থাকেন যাতে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং তাদের আচরণ সংশোধন করে। তিনি এই পৃথিবীতে মুসলিমদের পূর্ণ পুরষ্কার দেন না কারণ এই পৃথিবী জান্নাত নয়। উপরন্তু, অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস করা, অর্থাৎ পরকালে একজন মুসলিমের জন্য অপেক্ষা করা পূর্ণ পুরষ্কার, ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্যের উপর বিশ্বাসই ঈমানকে বিশেষ করে তোলে। এমন কিছুতে বিশ্বাস করা যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়, যেমন এই পৃথিবীতে পূর্ণ পুরষ্কার পাওয়া, এত বিশেষ হবে না।

পূর্ণ শাস্তির ভয় এবং পরকালে পূর্ণ প্রতিদান পাওয়ার আশা একজনকে পাপ থেকে বিরত থাকতে এবং সৎকর্ম করতে উৎসাহিত করবে।

এই বস্তুগত জগতের প্রতিফল দিবস শুরু হতে হলে অবশ্যই শেষ হতে হবে। কারণ শাস্তি এবং পুরস্কার কেবল তখনই দেওয়া যেতে পারে যখন প্রত্যেকের কর্ম শেষ হয়ে যায়। অতএব, মানুষের কর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিফল দিবস সংঘটিত হতে পারে না। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, বস্তুগত জগতের অবশ্যই শেষ হতে হবে, শীঘ্র হোক বা কাল।

তাছাড়া, কিয়ামতের দিন মানুষের পুনরুত্থানের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা একটি অদ্ভুত দাবি, যখন দিন, মাস এবং বছর জুড়ে পুনরুত্থানের অনেক উদাহরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ বৃষ্টি ব্যবহার করে একটি মৃত অনুর্বর ভূমিকে জীবন দান করেন এবং সৃষ্টির জন্য একটি মৃত বীজকে জীবন্ত করে তোলেন। একইভাবে, মহান আল্লাহ, মানুষ নামক মৃত বীজকে, যাকে মাটিতে সমাহিত করা হয়, জীবন দান করতে পারেন এবং করবেন, যেমন মৃত বীজ থেকে জীবিত হয়ে ওঠে। ঋতু পরিবর্তন স্পষ্টভাবে পুনরুত্থানকে দেখায়। উদাহরণস্বরূপ, শীতকালে, গাছের পাতা মারা যায় এবং ঝরে পড়ে এবং গাছটি প্রাণহীন দেখায়। কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে, পাতাগুলি আবার গজায় এবং গাছটি প্রাণে পূর্ণ দেখায়। সমস্ত প্রাণীর ঘুম জাগ্রত চক্র পুনরুত্থানের আরেকটি উদাহরণ। ঘুম মৃত্যুর বোন, কারণ ঘুমন্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গুলি কেটে ফেলা হয়। মহান আল্লাহ, তারপর একজন ব্যক্তির আত্মা তাদের কাছে ফিরিয়ে দেন যদি তারা বেঁচে থাকার জন্য নির্ধারিত হয় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিকে আবার জীবন দান করে। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 42:

"আল্লাহ মানুষের আত্মা তাদের মৃত্যুর সময় কবজ করেন এবং যারা মারা যায় না তাদের নিদ্রাকালে কবজ করেন। অতঃপর যাদের মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদের তিনি ধরে রাখেন এবং অন্যদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

এই এবং আরও অনেক উদাহরণের উপর চিন্তা করলে বিচারের দিনে চূড়ান্ত পুনরুত্থানের সম্ভাবনা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত পায়।

উপহার বা দাতা

মানুষকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্য মক্কার অমুসলিমরা বোকা বোকা অনুরোধ করেছিল। এমনকি তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অনুরোধ করেছিল যে, তিনি যেন আল্লাহ তায়ালার কাছে বাগান, দুর্গ এবং সোনা ও রূপার ভান্ডার দান করেন যাতে তাঁর চাহিদা পূরণ হয়। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন যে, তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছে এই ধরনের পার্থিব জিনিসপত্র চাইবেন না, কারণ এটি তাঁর মিশনের অংশ ছিল না। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৮-৩৪৯-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, অন্যান্য ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের মতো, ইসলাম এমন কোনও ধর্ম নয় যার উদ্দেশ্য একজন ব্যক্তিকে সম্পদ এবং কর্তৃত্বের মতো পার্থিব জিনিস অর্জনে সহায়তা করা। বরং, ইসলাম উভয় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ অর্জনে সহায়তা করে, যা হল মনের শান্তি। ইসলামী শিক্ষা অনুসারে, যখন কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে তখন এটি পাওয়া যায়। এর ফলে একজন ব্যক্তি তার জীবনের মধ্যে সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেয় এবং একজনকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে সাহায্য করে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। ইসলাম সম্পদ, পরিবার বা কর্তৃত্বের মতো পার্থিব জিনিস অর্জনের মুদ্রা নয়। এটি মুসলমানদের এই বস্তুগত জগতের বাইরে উচ্চতর লক্ষ্য রাখতে শেখায় যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। উপরন্তু, যেহেতু মানুষের জ্ঞানের অভাব রয়েছে এবং তারা অত্যন্ত অদূরদর্শী, তাই তারা জানে না তাদের জন্য কী ভালো। অধ্যায় ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, ইসলাম মানুষকে এই পৃথিবীতে সাধারণ কল্যাণ প্রার্থনা করতে এবং নির্দিষ্ট পার্থিব জিনিসপত্র চাওয়া থেকে বিরত থাকতে শেখায়। যে ব্যক্তি কেবল তার ঈমানের মাধ্যমে পার্থিব জিনিসপত্রের জন্য লক্ষ্য রাখে, সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারবে না। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০০-২০১:

"... আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দুনিয়াতে দান করুন", আর আখেরাতে তার কোন অংশ থাকবে না। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।"

ইসলামকে পার্থিব জিনিসপত্র, যেমন সন্তান এবং ভিসা অর্জনের জন্য মুদ্রা হিসেবে বিবেচনা করা, মুসলিমদের মৌলিক বাধ্যবাধকতা পূরণ করার পরেও মানসিক শান্তি অর্জন না করার একটি প্রধান কারণ, কারণ তারা ইসলামের শিক্ষার অপব্যবহার করে। ইসলামের শিক্ষার অপব্যবহার কেবল তাদেরকে প্রদত্ত পার্থিব আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করে, যা তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেয়। এবং তাদের মানসিক চাপ, দুঃখ এবং উদ্বেগ কেবল তখনই বৃদ্ধি পায় যখন তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত পার্থিব জিনিসপত্র না পায়। অধ্যায় ২২ আল হজ্জ, আয়াত ১১:

"আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে আল্লাহর ইবাদত করে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে। যদি তাকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে, তবে সে তাতে আশ্বস্ত হয়; আর যদি কোন পরীক্ষা তাকে স্পর্শ করে, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসের দিকে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটাই স্পষ্ট ক্ষতি।"

অতএব, ইসলামের উদ্দেশ্য এবং তাদের নিজস্ব অজ্ঞতা বুঝতে হবে এবং নির্দিষ্ট পার্থিব জিনিসের দিকে লক্ষ্য রাখার পরিবর্তে উভয় জগতেই মানসিক শান্তির লক্ষ্য রাখতে হবে, যা প্রায়শই উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলার দিকে পরিচালিত করে।

নিয়ন্ত্রক নয়

মক্কার অমুসলিমদের নেতারা প্রায়শই নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে বিতর্ক করতেন, যাতে অন্যরা ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। এই কথোপকথনের সময় নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের সত্য গ্রহণের জন্য সবচেয়ে বেশি আগ্রহী হতেন। কিন্তু প্রায়শই তারা তাকে কেবল বিচ্ছিন্ন ও অপমানিত করতেন, যার ফলে তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণে রাজি না করায় দুঃখিত ও অনুতপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যেতেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৮-৩৪৯-এ এরকম একটি ঘটনা আলোচনা করা হয়েছে।

অন্যদের উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমানদের কর্তব্য হলো অন্যদেরকে ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। কিন্তু একজন মুসলিমের এমন আচরণ করা উচিত নয় যেন তারা অন্যদের উপর নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে নিয়োজিত। এই মনোভাব কেবল রাগ এবং তিক্ততার দিকেই পরিচালিত করে, বিশেষ করে যখন অন্যরা তাদের উপদেশ অনুসরণ করে না। অন্যদের উপদেশ দিয়ে মুসলমানদের কর্তব্য পালন করাই সর্বোত্তম, তবে তাদের উপদেশের ফলাফলের উপর চাপ দেওয়া উচিত নয়, ব্যক্তি তাদের উপদেশ অনুযায়ী কাজ করুক বা না করুক। যদি মহান আল্লাহ মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক, অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় ফলাফলের উপর চাপ না দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন, তাহলে কীভাবে একজন মুসলিম এমন দাবি করতে পারে বা আচরণ করতে পারে যেন তারা অন্যদের উপর নিয়োজিত। সূরা ৮৮ আল গাশিয়াহ, আয়াত ২১-২২:

"সুতরাং স্মরণ করিয়ে দাও, তুমি কেবল স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। তুমি তাদের উপর নিয়ন্ত্রক নও।"

যে মুসলিম নিয়ন্ত্রক হিসেবে আচরণ করে, সে যখন অন্যদের উপদেশ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় তখন কেবল তিক্ত হয়ে ওঠে না বরং অন্যদের উপদেশ দেওয়া ছেড়ে দিতে পারে, যা তাদের সামর্থ্য অনুসারে সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য।

অধিকন্তু, এই মনোভাব মুসলমানদের নিজেদের এবং তাদের নিজস্ব কর্তব্যগুলিকে অবহেলা করার কারণ করবে কারণ তারা অন্যদের কর্তব্য নিয়ে নিজেদের নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকবে। অতএব, মুসলমানদের উচিত সৎকাজের আদেশ এবং মন্দকাজের নিষেধে দৃঢ় থাকা, তবে তাদের উপদেশের ফলাফল সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ এবং চিন্তা করা থেকে বিরত থাকা।

অবকাশ বা ধ্বংস

মক্কার অমুসলিমরা একবার নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে অনুরোধ করেছিল যে, মক্কার একটি পাহাড়, সাফা পাহাড়কে তাদের জন্য সোনায় পরিণত করুন এবং অন্যান্য পাহাড়গুলিকে সরিয়ে দিন যাতে তারা ফসল ফলাতে পারে। মহান আল্লাহ তাঁকে বলেছিলেন যে, তাদের বোকামিপূর্ণ অনুরোধ উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তায়, নাকি তিনি চাইলে আল্লাহ তাদের অনুরোধ পূরণ করবেন। কিন্তু এরপর যদি তারা ইসলামে অবিশ্বাস করে, তাহলে তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে ঠিক যেমন পূর্ববর্তী জাতিগুলি তাদের অনুরোধকৃত নির্দিষ্ট অলৌকিক ঘটনা প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের অবকাশ দিতে এবং তাদের বোকামিপূর্ণ অনুরোধ উপেক্ষা করতে বেছে নিয়েছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে তারা পরেও অবিশ্বাস করবে। এরপর আল্লাহ পবিত্র কুরআনের ১৭ নম্বর সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৫৯ নাযিল করেন:

"আর আমাদের নিদর্শন প্রেরণে আর কোন বাধা নেই, কেবল এই কারণে যে পূর্ববর্তীরা সেগুলোকে অস্বীকার করেছিল। আর আমরা সামূদকে উটনী দিয়েছিলাম একটি স্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে, কিন্তু তারা তার উপর জুলুম করেছিল। আর আমরা নিদর্শন প্রেরণ করি না কেবল সতর্কীকরণের জন্য।"

ইমাম আল ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ১৭:৫৯, পৃষ্ঠা ১০৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ, যিনি শাস্তির যোগ্য, তাকে দয়া করে শাস্তি দিতে তাড়াহুড়ো করেন না। বরং তিনি তাদেরকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার এবং তাদের আচরণ সংশোধন করার সুযোগ দেন। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৬১:

" আর যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের অন্যায়ের জন্য দোষারোপ করতেন, তাহলে তিনি পৃথিবীতে (অর্থাৎ, পৃথিবীতে) কোন প্রাণীকেই ছেড়ে দিতেন না, কিন্তু তিনি তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিলম্বিত করেন। যখন তাদের সময় এসে যাবে, তখন তারা এক মুহূর্তও পিছিয়ে থাকবে না এবং এগিয়েও যাবে না।"

যে মুসলিম এই কথাটি বোঝে সে কখনোই মহান আল্লাহর রহমতের উপর আশা ত্যাগ করবে না, বরং সীমা অতিক্রম করবে না এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করবে না এই বিশ্বাসে যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে কখনও শাস্তি দেবেন না। তারা বোঝে যে শাস্তি কেবল বিলম্বিত হয়, পরিত্যাগ করা হয় না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। তাই এই ঐশ্বরিক নাম একজন মুসলিমের মধ্যে আশা এবং ভয় তৈরি করে। একজন মুসলিমের এই বিলম্বকে তওবা করার এবং সৎকর্মের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা উচিত।

একজন মুসলিমের উচিত এই ঐশী নাম অনুসারে কাজ করা, বিশেষ করে যখন তারা খারাপ চরিত্র প্রদর্শন করে। তাদের উচিত অন্যদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা, ঠিক যেমন তারা চায় যে মহান আল্লাহ তাদের গাফিলতির মুহূর্তগুলিতে তাদের প্রতি নম্র হন। কিন্তু একই সাথে তাদের নিজেদের খারাপ বৈশিষ্ট্যের প্রতিও নম্র হওয়া উচিত নয়, কারণ তারা জানে যে পাপের শাস্তি স্থায়ীভাবে পরিত্যাগ করা হয় যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। তাদের উচিত মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে মন্দের জবাব ভালো দিয়ে দিয়ে নম্রতায় অবিচল থাকা। সূরা ৪১ ফুসসিলাত, আয়াত ৩৪:

"আর ভালো কাজ ও মন্দ সমান নয়। [মন্দ কাজ] প্রতিহত করো সেই [কাজ] দ্বারা যা উত্তম; তাহলে যার সাথে তোমার শত্রুতা আছে সে [একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হয়ে যাবে।"

উপরন্তু, আলোচ্য মূল ঘটনাটি এই বিষয়টিও বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে, মহান আল্লাহ সৃষ্টির সাথে যে আচরণ করেন তা কখনও পরিবর্তিত হয়নি এবং কখনও পরিবর্তিত হবে না। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, মহান আল্লাহ সর্বদা তাদের আশীর্বাদ করেছেন যারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করেছেন, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং যারা ক্রমাগত তাঁর অবাধ্যতা করেছে তাদের শাস্তি দিয়েছেন এবং এই পদ্ধতি কখনও পরিবর্তিত হবে না। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম এই ভ্রান্ত বিশ্বাস গ্রহণ করেছে যে, যেহেতু তারা পবিত্র নবী মুহাম্মদের উম্মত, তাই মহান আল্লাহর নিয়ম ও ঐতিহ্য তাদের জন্য পরিবর্তিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, তারা যদি তাঁর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, তবুও তিনি তাদের এই পৃথিবীতে বা পরকালে শাস্তি দেবেন না। এটি ছিল পূর্ববর্তী জাতিগুলির দ্বারা গৃহীত একই বোকা বিশ্বাস যার পবিত্র কুরআনে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। সূরা ৫ আল মায়িদা, আয়াত ১৮:

"কিন্তু ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, "আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়জন।" বলুন, "তাহলে তিনি তোমাদের পাপের জন্য কেন শাস্তি দেন?" বরং তোমরা তাঁর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন..."

আল্লাহ্, মহান, সৃষ্টির সাথে যে আচরণ করেন, তা জাতি থেকে জাতিতে পরিবর্তিত হয়, এই বিশ্বাস করলে বোঝা যাবে যে, আল্লাহ্, মহান অন্যায্য এবং

অবিচারী, যা অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং অবিশ্বাসের কাজ। অতএব, এই বোকা মনোভাব গ্রহণ করা এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি কেবল অলস মনোভাব গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর অবাধ্যতা চালিয়ে যায়, যদিও বিশ্বাস করে যে তিনি তাদের এই পৃথিবীতে বা পরকালে শাস্তি দেবেন না। যদিও আল্লাহ্, মহান, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, তবুও, মানুষের সাথে তার আচরণের ধরণ এবং তার ঐতিহ্য কখনও পরিবর্তিত হয়নি এবং কখনও হবেও না। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ৪৩:

"[কারণ] পৃথিবীতে অহংকার এবং মন্দ চক্রান্ত; কিন্তু মন্দ চক্রান্ত কেবল তার নিজস্ব লোকদেরই ঘিরে রাখে। তাহলে তারা কি পূর্ববর্তীদের পদ্ধতি [অর্থাৎ ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করছে? কিন্তু তুমি আল্লাহর পদ্ধতিতে [অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে] কখনও কোন পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহর পদ্ধতিতেও কখনও কোন পরিবর্তন পাবে না।"

বিভিন্ন সময়ের মুখোমুখি হওয়া

জামে আত তিরমিযী, ২৩৪৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার ঘোষণা করেছিলেন যে, মহান আল্লাহ তাঁর জন্য মক্কা উপত্যকাকে সোনায় পরিণত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উত্তরে বলেছিলেন যে, তিনি একদিন খেতে চান যাতে তিনি মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারেন এবং পরের দিন ক্ষুধার্ত থাকতে চান যাতে তিনি মহান আল্লাহর প্রতি ধৈর্য ও বিনয় প্রদর্শন করতে পারেন।

যেহেতু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য আদর্শ ছিলেন, তাই তাঁকে স্বাচ্ছন্দ্য এবং অসুবিধা উভয় সময়ই ভোগ করতে হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি তাঁর উপর ঈমান এনেছে বলে দাবি করে তাকে স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার সময়ই তার আচরণ গ্রহণ করতে হবে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। নিয়তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করা। কারো কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ ভালো কথা বলা অথবা নীরব থাকা। আর কারো কাজের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা। অধিকন্তু, কঠিন সময় তাদের ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে। ধৈর্য প্রকাশের অর্থ হলো নিজের কথা বা কাজে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা, বিশ্বাস করা যে তিনি কেবল তার জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

যে ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক পথে কাজ করে, সে মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থন এবং করুণা লাভ করবে, যার ফলে উভয় জগতেই মানসিক প্রশান্তি লাভ হবে। সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও, আলোচ্য মূল ঘটনাটি ইঙ্গিত করে যে, মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য পার্থিব বিলাসিতা জমানো এবং উপভোগ করা নয়। পরিবর্তে, একজন মুসলিমকে একটি সরল জীবনধারা গ্রহণ করতে হবে যেখানে তারা তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করার চেষ্টা করবে এবং অপচয় এড়িয়ে চলবে। একটি সরল জীবনযাপন একজনকে মানসিক শান্তি অর্জনে সহায়তা করবে। কারণ, মানুষ যত বেশি পার্থিব জিনিসের জন্য চেষ্টা করবে, যেমন সম্পদ, তত বেশি তারা চাপের সম্মুখীন হবে এবং ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর কাজ করা থেকে তত বেশি বিচ্যুত হবে। এটি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে বাধা দেবে, যা তাদের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ করতে বাধা দেবে এবং এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিক স্থানে স্থাপন করতে বাধা দেবে। এই জিনিসগুলি শেষ পর্যন্ত তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে। এটিই একটি কারণ যার জন্য মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনান ইবনে মাজাহ, ৪১১৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে পরামর্শ দিয়েছেন যে, সরলতা ঈমানের একটি অংশ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সেবা করা

মক্কার অমুসলিমদের নেতারা তাদের দুজন লোককে মদিনার ইহুদি পণ্ডিতদের সাথে দেখা করতে পাঠান, যাতে তারা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কারণ তারাই ছিলেন পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থের অধিকারী এবং তাই এই বিষয়ে আরও জ্ঞানী। ইহুদি পণ্ডিতরা তাদের তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য বলেছিলেন। যেহেতু মক্কার লোকেরা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে চিনত, তাই তিনি পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থগুলি মোটেও অধ্যয়ন করতেন না, তাই তিনি কেবল তখনই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারতেন যদি তিনি একজন নবী হতেন। তিনটি প্রশ্ন ছিল গুহার অধিবাসীদের সম্পর্কে, পূর্ব ও পশ্চিমে ভ্রমণকারী রাজা এবং তিনি কীসের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং অবশেষে মানব আত্মা সম্পর্কে। যখন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি পরের দিন উত্তর দেবেন কিন্তু যদি আল্লাহ চান তবে বাক্যাংশটি বাদ দিয়েছিলেন। এই প্রশ্নের উত্তর পনের দিন পরে পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই ঘটনাটি ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৫০-৩৫২-এ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে বিলম্ব করা আসলে মহানবী (সা.)-এর সত্যবাদিতার একটি স্পষ্ট লক্ষণ ছিল, কারণ একজন মিথ্যাবাদী মানুষকে বোকা বানানোর এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা পূরণ করার জন্য সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দিত।

উপরন্তু, এই বিলম্ব ইসলাম সম্পর্কে বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতাকেও নির্দেশ করে। ইসলাম মানবজাতিকে তাদের উপকারের জন্য দান করা হয়েছিল যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। ইসলাম মানুষের

কাছ থেকে কোন উপকার লাভ করে না কারণ এটি সরাসরি মহান আল্লাহর কাছ থেকে তার সম্মান এবং শক্তি লাভ করে। সূরা ৬১ আস সাফ, আয়াত ৮:

"তারা তাদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতা দেবেন, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।"

অতএব, ইসলাম মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে না, যেমন মক্কার অমুসলিমরা যারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে পরীক্ষা করতে চেয়েছিল, যদিও তারা ইতিমধ্যেই তাঁর সত্যবাদিতার প্রতি নিশ্চিত ছিল। মক্কার অমুসলিমরা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে নবুওয়াত ঘোষণা করার ৪০ বছর আগে থেকে চিনত এবং পূর্ণভাবে বিশ্বাস করত যে তিনি কেবল বিশ্বস্ত এবং সৎ। তারা আরবি ভাষার উপর দক্ষ ছিল এবং পুরোপুরি জানত যে পবিত্র কুরআন কোনও সৃষ্টি থেকে আসেনি। অধ্যায় ১০ ইউনুস, আয়াত ১৬:

"...কারণ আমি এর আগে তোমাদের মধ্যে এক জীবনকাল কাটিয়েছি। তাহলে কি তোমরা বুঝতে পারবে না?"

অধিকন্তু, মহানবী (সাঃ) যে নিরক্ষর থাকা সত্ত্বেও এবং পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন না করেও সত্যবাদী ঐতিহাসিক বিবরণ এবং উপকারী শিক্ষা পাঠ করছিলেন, যা মক্কার অমুসলিমরা পুরোপুরি জানত, তা তাঁর নবুওয়াত এবং ইসলামের সত্যতার স্পষ্ট লক্ষণ ছিল।

অতএব, তাদের প্রশ্নের উত্তর বিলম্বিত হয়েছিল কারণ মহান আল্লাহ মানুষের সময়সূচী এবং ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করেন না।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামকে পার্থিব জিনিসপত্রের সন্ধানের জন্য মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এর কাজ মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং ইচ্ছা পূরণ করা নয়। বরং মুসলমানদের অবশ্যই আল্লাহ, মহান আল্লাহর সেবা করা উচিত এবং ফলস্বরূপ তারা যখন তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করবে তখন তারা মানসিক শান্তি পাবে। কারণ ইসলাম মানবজাতিকে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শেখায় যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারে এবং এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিক স্থানে কীভাবে স্থাপন করতে শেখায়। এই দুটি জিনিসই মনের শান্তির দিকে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন ইসলাম তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং ইচ্ছা পূরণ করে, সে এই মানসিক শান্তি পাবে না এবং পরিবর্তে তার আচরণ উভয় জগতেই কেবল চাপ, উদ্বেগ এবং ঝামেলার কারণ হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহান আল্লাহর সেবা করে এবং মনের শান্তি অর্জনে সন্তুষ্ট নয়, সে অন্য কোথাও তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করতে পারে, কারণ আল্লাহ, মহান, এবং ইসলামের এগুলোর কোন প্রয়োজন নেই। অধ্যায় ১৮ আল কাহফ, আয়াত ২৯:

"আর বলো, "সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, অতএব যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক; আর যার ইচ্ছা কুফরী করুক।"...

অবিচল সাহসিকতা

আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, আবু বকর (রাঃ) ছিলেন সবচেয়ে সাহসী। মক্কার অমুসলিমরা একবার মহানবী (সাঃ) কে শারীরিকভাবে আক্রমণ করেছিল, আর আবু বকর (রাঃ) তাদের একজনকে আঘাত করে, আরেকজনকে আটকে রেখে এবং আরেকজনকে মাটিতে ফেলে তাকে রক্ষা করেছিলেন। ইমাম সুয়ূতী, তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা ১৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি ইসলামের শিক্ষা এবং নিজের শক্তি অনুসারে মন্দ কাজ এবং অভ্যাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। আবু বকর (রাঃ) যেমন দেখিয়েছেন, মন্দ কাজের সর্বোচ্চ স্তর হল যখন কেউ তার কর্মের মাধ্যমে মন্দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে মন্দ কাজ বন্ধ করার জন্য সহিংসতার দিকে ঝুঁকতে হবে। একজন মুসলিমকে সহিংসতার বিরুদ্ধে নিজেকে এবং অন্যদের রক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাদের এটি শুরু করা উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের অন্যদের দ্বারা করা ভুল সংশোধন করার জন্য তাদের শারীরিক শক্তি ব্যবহার করা উচিত। যদি কেউ শারীরিকভাবে মন্দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে না পারে, তবে তাদের মৌখিকভাবে এর প্রতিবাদ করা উচিত। আবার, এটি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে করা উচিত, যার মাধ্যমে একজনকে অশ্লীল ভাষা এড়িয়ে চলতে হবে যা কেবল অন্যায়কারীর খারাপ আচরণকে বাড়িয়ে তুলবে। পরিবর্তে, একজনকে শিষ্টাচার, শ্রদ্ধা এবং স্পষ্ট প্রমাণ সহ অন্যদের মন্দের বিরুদ্ধে মৌখিকভাবে প্রতিবাদ করতে হবে যাতে সমাজ স্পষ্টভাবে অন্যায়কারী এবং যে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে তার মধ্যে পার্থক্য দেখতে পায়। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম প্রায়শই এটিকে উপেক্ষা করে এবং ফলস্বরূপ, সমাজ অন্যায়কারী এবং তাদের আচরণের বিরুদ্ধে আপত্তিকারীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, কারণ যারা মন্দের বিরুদ্ধে আপত্তি করছে তাদের খারাপ আচরণ এবং কথাবার্তা। মন্দের বিরুদ্ধে আপত্তি করার সর্বনিম্ন স্তর হল অন্তরে এটিকে ঘৃণা করা। যে ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি ক্ষতির

আশঙ্কা করেন এবং মৌখিক বা শারীরিকভাবে মন্দের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে পারেন না, তখন তাদের অন্তত অন্তরে মন্দের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে হবে। এই বিভিন্ন স্তরগুলি সুনান আবু দাউদে, 4340 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে।

মক্কায় মুমিনদের উপর নির্যাতন

মন্দ কাজের আদেশ এবং সৎ কাজে নিষেধ করা

অমুসলিম নেতা আবু জাহলই মক্কার অমুসলিমদের সাহাবীদের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আক্রমণ করার জন্য উস্কে দিয়েছিলেন। যখন তিনি একজন মর্যাদাপূর্ণ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির কথা শুনতেন যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি তাকে সমালোচনা করতেন, অপমান করতেন এবং তাদের পূর্বপুরুষদের সঠিক নির্দেশিত রীতিনীতি পরিত্যাগ করার জন্য অভিযুক্ত করতেন। তিনি সমাজে তাদের মূল্য হ্রাস করার চেষ্টা করতেন, তাদের মতামতের সমালোচনা করতেন এবং তাদের সুনাম নষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করতেন। যদি সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একজন ব্যবসায়ী হতেন, তাহলে তিনি অন্যদের তাদের সাথে ব্যবসা বর্জন করতে উৎসাহিত করতেন। যদি সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সামাজিকভাবে দুর্বল হতেন, তাহলে আবু জাহল তাদের শারীরিক নির্যাতন করতেন এবং অন্যদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করতেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৫৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এই খারাপ মানসিকতা গ্রহণ না করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি আসলে ভণ্ডামির একটি দিক। এই ব্যক্তি কেবল নিজেরাই খারাপ কাজ করে না এবং সৎ কাজ থেকে বিরত থাকে না বরং অন্যদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করে। তারা চায় অন্যরাও তাদের মতো একই নৌকায় থাকুক যাতে তারা তাদের খারাপ চরিত্রে কিছুটা সান্ত্বনা পায়। তারা কেবল নিজেকে ডুবিয়ে দেয় না বরং অন্যদেরও তাদের সাথে ডুবিয়ে দেয়। মুসলমানদের জানা উচিত যে, তাদের দাওয়াতের কারণে যারা পাপ করে তাদের প্রত্যেকের জন্য একজন ব্যক্তিকে জবাবদিহি করতে হবে। এই ব্যক্তির সাথে এমন আচরণ করা হবে যেন তারা পাপ করেছে যদিও তারা কেবল অন্যদেরকেই এর দিকে আহ্বান করেছিল।

সুনানে ইবনে মাজাহ, ২০৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এই কারণেই কেউ কেউ বলেছেন যে, ধন্য সেই ব্যক্তি যার মন্দতা তাদের সাথেই মারা যায় কারণ তাদের পাপ বৃদ্ধি পাবে যদি অন্যরা তাদের মন্দ পরামর্শ অনুসারে কাজ করে যদিও তারা আর বেঁচে নেই।

অধিকন্তু, একজন মুসলিমকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেককে তাদের মন্দ কর্মের পরিণতি এই পৃথিবীতে এবং পরকালে ভোগ করতে হবে, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ৪৩:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজস্ব লোকদের ছাড়া আর কাউকে ঘিরে রাখে না। তাহলে তারা কি পূর্ববর্তী লোকদের পথ [অর্থাৎ, ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করছে?..."

এই পৃথিবীতে, একজন ব্যক্তির কাছে থাকা জিনিসপত্র, যেমন সম্পদ এবং পরিবার, তার জন্য মানসিক চাপ, দুর্দশা এবং ঝামেলার উৎস হয়ে ওঠে। এই ব্যক্তি বিনোদনের মুহূর্ত উপভোগ করলেও এবং পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করলেও মানসিক শান্তি থেকে বঞ্চিত হবে। এছাড়াও, এই ব্যক্তি বুঝতে পারবে না কেন তারা মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যায় ভুগছে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের জীবনের কয়েকজন ভালো মানুষ, যেমন তাদের স্ত্রী, তাদের দোষারোপ করবে। তারা তখন এই জিনিস এবং মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, যা কেবল তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাবে। কিছু ক্ষেত্রে, তাদের চাপ, হতাশা এবং মাদকাসক্তি তাদের আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিতে পারে। কিন্তু পরকালে তাদের জন্য যা অপেক্ষা করছে তা আরও খারাপ, যদি তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয় এবং এমন খারাপ চরিত্র গ্রহণ থেকে বিরত না থাকে যার মাধ্যমে তারা সমাজের মধ্যে দুর্নীতি, শত্রুতা এবং মন্দ ছড়িয়ে দেয়। মনে রাখতে হবে যে তারা যদি সমাজের মধ্যে ভালো ছড়িয়ে দিতে না পারে, তবে তারা যা করতে পারে তা হল সমাজের মধ্যে মন্দ ছড়িয়ে দেওয়া।

কঠিন পরীক্ষা

মক্কার অমুসলিমদের আগ্রাসন যখন বৃদ্ধি পেল, তখন তারা অসহায় ও সামাজিকভাবে দুর্বল সাহাবীদের উপর আক্রমণ শুরু করল, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। তারা তাদেরকে বন্দী করল, মৌখিক ও শারীরিক নির্যাতন করল, তাদের খাদ্য ও পানি থেকে বঞ্চিত করল এবং চরম নির্যাতনের শিকার হল। উদাহরণস্বরূপ, বিলাল বিন রাবাহ, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, মক্কার একজন অমুসলিম উমাইয়া বিন খালাফের দাস ছিলেন। উমাইয়া বিলালকে, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাকে জ্বলন্ত বালির উপর শুইয়ে দিতে বাধ্য করত এবং তারপর তার বুকে একটি বিশাল পাথর রাখত যাতে তাকে ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু বিলাল, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, ইসলামের উপর অটল ছিলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৫৬-৩৫৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে নবীগণের (সাঃ) মতো ভয়াবহ পরীক্ষার মুখোমুখি হতে বলেন না। মহান আল্লাহও মুসলিমদেরকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবীদের মতো পরীক্ষা ও অসুবিধার মুখোমুখি হতে বাধ্য করেন না। তারা তাদের সম্পদ, ঘরবাড়ি, পরিবার এবং জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বরং, মহান আল্লাহ মুসলমানদের উপর কিছু বাধ্যতামূলক কর্তব্য অর্পণ করেছেন এবং তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেছেন যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি লাভ করতে পারে। যদি কেউ মনের শান্তি এবং পরকালে জান্নাতের মাহাত্ম্যের গুরুত্ব সম্পর্কে চিন্তা করে, তাহলে তারা বুঝতে পারবে যে তাদের যে ত্যাগ স্বীকার করতে উৎসাহিত করা হয়েছে তা প্রতিশ্রুত পুরস্কারের তুলনায় খুবই নগণ্য। অতএব, মুসলমানদের এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের সাথে আত্মসমর্পণ করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে, ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে এবং তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদকে তাঁর পছন্দনীয় উপায়ে ব্যবহার করে।

তাছাড়া, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা ত্যাগ ও সংগ্রামের দাবি রাখে। যেমন একজন ব্যক্তি ত্যাগ ও সংগ্রাম ছাড়া পার্থিব সাফল্য অর্জন করতে পারে না, যেমন একজন ডাক্তার হওয়া, তেমনি সংগ্রামের মাধ্যমে উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। অতএব, একজনকে বুঝতে হবে যে ইসলাম গ্রহণ এবং তার উপর আমল করা এমন একটি ছুটির দিন নয় যেখানে কেউ বিশ্রাম নিতে পারে এবং মহান আল্লাহর সেবা পেতে পারে। ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো নয় যেখানে সংগ্রাম ও ত্যাগ ছাড়াই সাফল্যের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এই পৃথিবী জান্নাত নয়, তাই একজন ব্যক্তির উচিত কেবল মৌখিকভাবে ইসলামে ঈমান ঘোষণা করার কারণে সকল ধরণের পরীক্ষা, চাপ এবং অসুবিধা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা করে এমন আচরণ করা উচিত নয়। মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত ঈমান এবং আনুগত্য তখনই প্রকাশিত হয় যখন কেউ বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, যেমন স্বাচ্ছন্দ্য এবং অসুবিধার সময় এবং মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে। অতএব, ইসলামের শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করে, প্রতিটি পরিস্থিতিতে, আল্লাহ তাআলার আনুগত্য অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে তারা তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণা প্রমাণ করতে পারে এবং মনের শান্তি অর্জন করতে পারে যা ইসলাম তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় যারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করে। যে ব্যক্তি প্রচেষ্টা ছাড়াই দুনিয়া ও আখেরাতে জান্নাত কামনা করে সে একটি কল্পনার জগতে বাস করছে এবং তাই তাদের উচিত হয় তাদের মনোভাব সংশোধন করা, নয়তো অন্য কোথাও তাদের কল্পনা পূরণ করার চেষ্টা করা কারণ তারা ইসলামের মাধ্যমে তাদের বোকামিপূর্ণ ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে না। অধ্যায় ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ২-৩:

"মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না? কিন্তু আমরা অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি, আর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা মিথ্যাবাদী।"

ছাড় প্রদান

ইসলাম গ্রহণের পর, আম্মার বিন ইয়াসির, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন, তার মালিক কর্তৃক নির্যাতিত ও নির্যাতনের শিকার হন। তাকে এতটাই নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল যে, নিজেকে এ থেকে বাঁচানোর জন্য তাকে অবিশ্বাসের কথা বলতে বাধ্য করা হয়েছিল। যখন তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে ঘটনাটি অবহিত করেন, তখন তিনি তাকে তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। যখন আম্মার (সাঃ) নিশ্চিত করেন যে তার আধ্যাত্মিক হৃদয় ঈমানের উপর দৃঢ়, তখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে বলেন যে, যদি তার জীবন রক্ষা করার অর্থ হয়, তাহলে তার কাজগুলো পুনরাবৃত্তি করতে। তার সম্পর্কেই সূরা আন নাহলের ১০৬ নম্বর আয়াত নাজিল হয়েছিল:

"যে ব্যক্তি ঈমানের পর আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে, সে ব্যক্তি ব্যতীত যার অন্তর ঈমানে স্থির থাকা সত্ত্বেও তাকে জোর করে ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু যারা [ইচ্ছায়] কুফরের জন্য তাদের বক্ষ উন্মুক্ত করে, তাদের উপর আল্লাহর গজব এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।"

ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর (সা.) মহানবী (সা.)-এর নোবেল লাইফ" বইয়ের ১ম খণ্ডের ৩৯৯-৪০১ পৃষ্ঠায় এ বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

তাঁর আদর্শের মাধ্যমে, মহান আল্লাহ, একই রকম কষ্টের সম্মুখীন মানুষদের জন্য সহজতা এবং ছাড় প্রদান করেছেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি ইসলামের সহজ প্রকৃতির ইঙ্গিত দেয়।

সহীহ বুখারীর ৩৯ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, ধর্ম সহজ এবং সরল। এবং একজন মুসলিমের উচিত নিজের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো নয়, কারণ তারা এর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না।

এর অর্থ হলো, একজন মুসলিমের সর্বদা একটি সরল ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনযাপন করা উচিত। ইসলাম মুসলমানদেরকে সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য নিজেদের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার দাবি করে না। বরং এটি আসলে সরলতা শেখায়, যা ইমাম বুখারীর "আদাবুল মুফরাদ", ২৮৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ধর্ম। একজন মুসলিমের প্রথমে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, যা নিঃসন্দেহে তাদের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে কারণ আল্লাহ, একজন মুসলিমকে তার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি বোঝা দেন না। পবিত্র কুরআনের ২য় সূরা আল বাকারার ২৮৬ নম্বর আয়াতে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে:

"আল্লাহ কোন আত্মার উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন বোঝা চাপান না..."

এরপর, তাদের উচিত তাদের দিনের কিছুটা সময় ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়নের জন্য বের করা যাতে তারা তাদের শক্তি অনুসারে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের উপর আমল করতে পারে। সহিহ বুখারী, ৬৫০২ নম্বরে পাওয়া হাদিস অনুসারে, এটি আল্লাহর ভালোবাসা আকর্ষণ করে।

যদি কোন মুসলিম এই আচরণে অটল থাকে, তাহলে তাদের উপর এমন রহমত বর্ষিত হবে যে তারা আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবে এবং অতিরিক্ত, অপচয় বা অপচয় ছাড়াই এই পৃথিবীর বৈধ আনন্দ উপভোগ করার জন্য সময় বের করবে।

এভাবেই একজন মুসলিম নিজের জন্য সবকিছু সহজ করে তোলে। আর যদি তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি থাকে, যেমন সন্তান, তাহলে তাদেরও একই শিক্ষা দেওয়া উচিত, যার ফলে তাদের জন্যও সবকিছু সহজ হয়ে যায়। নিজের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করা জিনিসগুলিকে কঠিন করে তোলে এবং একজনকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে বাধ্য করতে পারে। আর অতিরিক্ত শিথিলতা জিনিসগুলিকে কঠিন করে তুলবে কারণ অলসতার কারণে উভয় জগতেই মহান আল্লাহর রহমত থেকে মানুষ বঞ্চিত হবে। অতএব, ভারসাম্য বজায় রাখা সর্বোত্তম, যা ইসলাম সর্বদা উৎসাহিত করে।

যেহেতু ইসলাম সহজ, তাই হালাল ও অবৈধ উভয়ই স্পষ্ট, বোধগম্য এবং মেনে চলা সহজ। অতএব, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীসের উপর ভিত্তি করে নয় এমন ধর্মীয় জ্ঞান গবেষণা এবং কাজ করে নিজের বা তাদের উপর নির্ভরশীলদের জন্য বিষয়গুলিকে জটিল করা উচিত নয়। যখন কেউ এই দুটি উৎস কঠোরভাবে মেনে চলে, তখন তারা ইসলামকে বুঝতে এবং বাস্তবায়ন করতে সহজ পাবে।

পরিশেষে, সম্প্রসারিতভাবে, একজন ব্যক্তির উচিত তাদের পার্থিব জীবনকে সরল রাখার চেষ্টা করা। এটি তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ তার চাহিদা এবং দায়িত্ব অনুসারে বৈধ সম্পদের মতো বস্তুগত জগতের জন্য প্রচেষ্টা করে এবং অপচয় এবং অপচয় এড়িয়ে চলে। যত বেশি কেউ এটি মেনে চলবে, তার পার্থিব জীবন তত বেশি স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে। যখন এটি তাদের সরল ধর্মের সাথে

মিলিত হবে, তখন এটি মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতেই সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে।

দুর্বলদের সাহায্য করা

যখন সামাজিকভাবে দুর্বল সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, মক্কার অমুসলিমদের দ্বারা প্রচণ্ড নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন, তখন আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ইসলাম গ্রহণকারী পুরুষ ও মহিলা দাসীদের, যেমন বিলাল (রাঃ) কে ক্রয় করে মুক্ত করে তাদের সাহায্য করেছিলেন। সহীহ বুখারীতে ৩৭৫৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও, পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতগুলি তাঁর সৎকর্মের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল। ৯২ সূরা আল-লাইল, আয়াত ৫-৭:

"যে ব্যক্তি দান করে এবং আল্লাহকে ভয় করে। এবং সর্বোত্তম [পুরস্কার] বিশ্বাস করে। আমরা তাকে সহজ করে দেব।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৫৭-৩৫৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন।

এ থেকে বোঝা যায় যে, একজন মুসলিম যেভাবে আচরণ করে, মহান আল্লাহ তার সাথেও সেভাবেই আচরণ করেন। ইসলামের শিক্ষার মধ্যে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ১৫২:

"অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব..."

জামে আত তিরমিযী, ১৯২৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে আরেকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদের প্রতি দয়া করে, সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে দয়া লাভ করবে।

দুঃখ-কষ্ট হলো এমন কিছু যা কাউকে উদ্বেগ ও কষ্টের মধ্যে ফেলে। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যের জন্য, পার্থিব হোক বা ধর্মীয়, এই দুঃখ-কষ্ট লাঘব করে, তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা কঠিন পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করবেন। অনেক হাদিসে এটি বিভিন্নভাবে নির্দেশিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জামে আত-তিরমিযী, ২৪৪৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত মুসলিমকে খাবার খাওয়াবে, তাকে কিয়ামতের দিন জান্নাতের ফল খাওয়ানো হবে। আর যে ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত মুসলিমকে পানি পান করাবে, তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা জান্নাতের পানি পান করাবেন।

যেহেতু পরকালের কষ্ট দুনিয়ার কষ্টের তুলনায় অনেক বেশি, তাই একজন মুসলিমের জন্য এই পুরস্কার আটকে থাকে যতক্ষণ না তারা আখেরাতে পৌঁছায়। এটি আরও ইঙ্গিত করে যে একজন মুসলিমের উচিত সর্বদা দুনিয়ার কষ্টের চেয়ে বিচার দিনের কষ্টের প্রতি বেশি মনোযোগী হওয়া। সর্বদা মনে রাখা উচিত যে

দুনিয়ার কষ্ট সবসময় ক্ষণস্থায়ী, কম তীব্র এবং আখেরাতের কষ্টের তুলনায় কম সুদূরপ্রসারী হবে। এই উপলব্ধি নিশ্চিত করবে যে তারা আখেরাতের কষ্ট এড়াতে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যে কঠোর পরিশ্রম করবে।

আলোচ্য মূল হাদিসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিম অন্যদের সাহায্য করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করে যাবেন। একজন মুসলিমকে বুঝতে হবে যে, যখন তারা কোন কিছুর জন্য চেষ্টা করে অথবা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা কোন নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য সাহায্য পায়, তখন ফলাফল সফল হতে পারে অথবা ব্যর্থতায় শেষ হতে পারে। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলা কাউকে কোন কিছুতে সাহায্য করেন, তখন একটি সফল ফলাফল নিশ্চিত হয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ধর্মীয় এবং বৈধ পার্থিব উভয় ক্ষেত্রেই যখন কেউ অন্যকে সাহায্য করে, তখন এই ঐশ্বরিক সাহায্য পাওয়া যায়। উপরন্তু, একজন মুসলিম যদি এই প্রতিদান কামনা করে, তাহলে তাকে অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সাহায্য করতে হবে। এর অর্থ হলো, যাদের সাহায্য করা হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার কোন আশা, আশা বা চাওয়া উচিত নয়।

তাই মুসলমানদের উচিত, নিজেদের স্বার্থে, সকল ভালো কাজে অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করা যাতে তারা উভয় জগতেই মহান আল্লাহর সাহায্য লাভ করতে পারে।

এছাড়াও, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, অন্যান্য ধরণের দাসত্বও রয়েছে যার মধ্যে মুসলমানদের তাদের সাহায্য করা উচিত, যেমন ঋণের মাধ্যমে আর্থিক দাসত্ব। এর মধ্যে রয়েছে অন্যদের ঋণ পরিশোধে সাহায্য করা অথবা যখন একজন মুসলিম অন্যের কাছ থেকে ঋণী থাকে তখন জিনিসপত্র সহজ করা। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঋণ পরিশোধ করে, তাকে আল্লাহ

উভয় জগতেই মুক্তি দেবেন। সুনান ইবনে মাজাহের ২২৫ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বাস প্রথমে আসে

যখন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তার অমুসলিম মা প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি যতক্ষণ না তার ঈমান ত্যাগ করেন, ততক্ষণ তিনি কিছু খাবেন না বা পান করবেন না। সা'দ (রা.) তার মায়ের প্রতি অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন, তবুও তার প্রতি তার ভালোবাসা এবং যত্ন তাকে তার ঈমানের সাথে আপোষ করতে বাধ্য করেনি। কিছু দিন পর, তিনি তাকে সতর্ক করে দেন যে, যদি সে ১০০ বার মারা যায় তবুও সে তার ঈমান ত্যাগ করবে না। যখন সে তার দৃঢ় চরিত্র লক্ষ্য করে, তখন সে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে। আল্লাহ, মহিমান্বিত, এরপর ২৯ সূরা আল আনকাবুতের ৮ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"আর আমরা মানুষকে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করতে বাধ্য করে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তাদের আনুগত্য করো না। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবহিত করব।"

ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভু (সাঃ) এর নোবেল লাইফ" বইয়ের ১ম খণ্ডের ৪০২ পৃষ্ঠায় এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলাম মুসলমানদের শিক্ষা দেয় যে, বস্তুজগৎ থেকে কিছু লাভের জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে কখনও আপস করা উচিত নয়। অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ১৩৫:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদান করো, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়..."

যেহেতু বস্তুজগৎ ক্ষণস্থায়ী, তাই এখান থেকে যা কিছু লাভ হবে তা অবশেষে বিলীন হয়ে যাবে এবং পরকালে তাদের কর্ম ও মনোভাবের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে। অন্যদিকে, ঈমান হলো সেই মূল্যবান রত্ন যা একজন মুসলিমকে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নিরাপদে পরিচালিত করে। অতএব, ক্ষণস্থায়ী জিনিসের জন্য অধিকতর কল্যাণকর এবং স্থায়ী জিনিসের সাথে আপস করা স্পষ্ট বোকামি।

অনেক মানুষ, বিশেষ করে নারীরা, তাদের জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত দেখতে পাবেন যেখানে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপোষ করা উচিত কিনা তা বেছে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ক্ষেত্রে একজন মুসলিম মহিলা বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি যদি তার স্কার্ফ খুলে নির্দিষ্ট পোশাক পরেন তবে তিনি কর্মক্ষেত্রে আরও সম্মানিত হবেন এবং এমনকি আরও দ্রুত কর্পোরেট সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারবেন। একইভাবে, কর্পোরেট জগতে কাজের সময় পরে সহকর্মীদের সাথে মেলামেশা করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই একজন মুসলিম হয়তো কাজের পরে কোনও পাব বা ক্লাবে আমন্ত্রিত হতে পারেন।

এইরকম সময়ে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে চূড়ান্ত বিজয় এবং সাফল্য কেবল তাদেরই লাভ হবে যারা ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকবে। যারা এইভাবে কাজ করবে তাদের পার্থিব এবং ধর্মীয় সাফল্য দেওয়া হবে। তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাদের পার্থিব সাফল্য তাদের জন্য বোঝা হয়ে উঠবে না। প্রকৃতপক্ষে,

এটি মহান আল্লাহর কাছে মানবজাতির মধ্যে তাদের মর্যাদা এবং স্মরণ বৃদ্ধির একটি উপায় হয়ে উঠবে। এর উদাহরণ হল ইসলামের সঠিক নির্দেশিত খলিফারা। তারা তাদের ঈমানের সাথে আপস করেননি এবং বরং তাদের জীবনকাল ধরে অবিচল ছিলেন এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদেরকে একটি পার্থিব এবং ধর্মীয় সাম্রাজ্য দান করেছিলেন।

সাফল্যের অন্য সকল রূপ খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং আজ হোক কাল হোক, এগুলো এর ধারকদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কেবল সেইসব সেলিব্রিটিদের লক্ষ্য করা উচিত যারা খ্যাতি এবং ভাগ্য অর্জনের জন্য তাদের আদর্শ এবং বিশ্বাসের সাথে আপোষ করেছিলেন, কারণ এই বিষয়গুলি তাদের দুঃখ, উদ্বেগ, বিষণ্নতা, মাদকাসক্তি এমনকি আত্মহত্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এছাড়াও, আলোচ্য মূল ঘটনাটি মুসলমানদেরকে মানুষের সন্তুষ্টির চেয়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার গুরুত্ব শেখায়। আমাদের বুঝতে হবে যে, তাদের বিভিন্ন ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষার কারণে তাদের জীবনে মানুষকে খুশি করা সম্ভব নয়। ফলস্বরূপ, কেউ যতই চেষ্টা করুক না কেন, তারা তাদের জীবনে সবাইকে খুশি করতে পারবে না। উপরন্তু, যেহেতু মানুষ সাধারণত অকৃতজ্ঞ, তাই তারা তাদের খুশি করার জন্য যে ব্যক্তি চেষ্টা করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না। এর ফলে এই ব্যক্তি কেবল তিক্ত এবং দুঃখিত হবে, যা তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে। অধিকন্তু, যে ব্যক্তি মানুষকে খুশি করার চেষ্টা করে সে সহজেই ইসলামের শিক্ষা উপেক্ষা করবে। ফলস্বরূপ তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হবে এবং তারা তাদের জীবনের সকলকে এবং সবকিছুকে সঠিক স্থানে স্থাপন করতে ব্যর্থ হবে। এই দুটি জিনিসই তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে। অতএব, যে ব্যক্তি উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে চায়, তার উচিত প্রতিটি পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহকে খুশি করার লক্ষ্য রাখা, কারণ এটিই তাকে প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে এবং তাদের জীবনের সকলকে এবং সবকিছুকে সঠিক স্থানে খুশি করতে উৎসাহিত করবে যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ

মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

পরীক্ষার উপসংহার

ইসলাম গ্রহণের পর, খাব্বাব বিন আরাত (রাঃ) মক্কার অমুসলিমদের দ্বারা নির্যাতিত ও নির্যাতনের শিকার হন। উদাহরণস্বরূপ, তারা আগুন জ্বালাত এবং তাকে তার উপর শুইয়ে দিতে বাধ্য করত। খাব্বাব (রাঃ) তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, তিনি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের উপর অটল ছিলেন। তিনি একবার মহানবী (সাঃ) এর কাছে তাঁর এবং অন্যান্যদের উপর যে ভয়াবহ শারীরিক নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার অভিযোগ করেছিলেন এবং তাঁকে আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু মহানবী (সাঃ) পূর্ববর্তী জাতির বিশ্বাসীদের যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার কথা উল্লেখ করে তাকে ধৈর্য ধরতে উৎসাহিত করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, পূর্ববর্তী বিশ্বাসীদের এমনভাবে নির্যাতন করা হত যে তাদের ত্বকের উপর দিয়ে একটি ধাতব চিরুনি দিয়ে হাড় ছিঁড়ে ফেলা হত, তবুও তারা আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করত না। অন্যদের মাথায় করাত লাগানো হত এবং এটি তাদের শরীরকে দুটি ভাগে বিভক্ত করত, তবুও তারা আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করত না। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে বিজয় দান করবেন। সহীহ বুখারীতে ৩৮৫২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি উল্লেখ করা হয়েছে।

যদিও নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর যুগে, সৃষ্টির শুরু থেকেই, বিশেষ করে তাঁর উপর শান্তি ও শান্তি বর্ষিত হোক, মুমিনদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রভাব পড়েছে, তবুও মনে হয় আধুনিক যুগের পরীক্ষা মুসলিমদের জন্য আরও বেশি অসুবিধা ও অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, নেককার পূর্বসূরীরা যে পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন তা উভয় জগতেই তাদের সম্মানের দিকে পরিচালিত করেছিল। পরীক্ষার ফলাফল এবং ফলাফলের এই পার্থক্যের মূল কারণ হল, যখন নেককার পূর্বসূরীরা আসলে পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন, তখন আধুনিক যুগের মুসলমানদের তুলনায় তারা আরও বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, যা সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪০২৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে,

তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করে তাদের পরীক্ষা ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এর ফলে তারা নিরাপদে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং উভয় জগতেই মহান আল্লাহর কাছ থেকে মহান সম্মান ও আশীর্বাদ পেয়েছে। অন্যদিকে, এই যুগের অনেক মুসলিম পরীক্ষার সম্মুখীন হলেও আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকে না। তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে, পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সাফল্য এবং সম্মান কেবল তাদেরই দেওয়া হয় যারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকে, অন্যদিকে, অবাধ্যতা কেবল অপমানের দিকেই পরিচালিত করে। অতএব, মুসলমানদের এমন এক প্রান্তে আল্লাহকে উপাসনা করা উচিত নয় যেখানে তারা কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের সময় তাঁর আনুগত্য করে এবং কঠিন সময়ে ক্রুদ্ধ ও অবাধ্য হয়ে তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এটি প্রকৃত দাসত্ব বা মহান আল্লাহর আনুগত্য নয়। সহজ কথায়, কোন কাজই দীর্ঘমেয়াদে মুসলমানদের সাহায্য করবে না যদি না তা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। অবাধ্যতা কেবল এক অসুবিধা থেকে অন্য অসুবিধায়, এক অপমানের দিকে অন্য অসুবিধায় নিয়ে যাবে। অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ১৪৭:

"যদি তোমরা কৃতজ্ঞ থাকো এবং ঈমান আনো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দিয়ে কী করবেন?"...

এছাড়াও, আলোচ্য মূল ঘটনাটি মানুষকে শেখায় যে, কীভাবে সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার সময় তাদের ধৈর্য বৃদ্ধি করতে হয়। তাদের উচিত তাদের কষ্টকে বিশ্বজুড়ে অন্যদের মুখোমুখি হওয়া এবং বর্তমানে যে বৃহত্তর সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তার সাথে তুলনা করা। এতে তারা যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তা কম দেখাবে এবং ফলস্বরূপ তারা ধৈর্যের সাথে তা মোকাবেলা করার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। ধৈর্যের অর্থ হলো নিজের কথা ও কাজে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা, একই সাথে বিশ্বাস করা যে তিনি কেবল তাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি তা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

এছাড়াও, একজন ব্যক্তির সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন, তা আরও খারাপ হতে পারে। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে এটি উপলব্ধি করে, সে তার কঠিন সময়েও মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। নিয়তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ কেবল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা। কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা। আর কর্মে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত অনুগ্রহগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা আল্লাহকে খুশি করে।

পরিশেষে, যদিও সঠিক মনোভাব বাস্তবায়নের তুলনায় সঠিক মনোভাব সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া সহজ, তবুও এটি ভালো উপদেশের সত্যতা পরিবর্তন করে না এবং তাই এই কারণে ভালো উপদেশকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়।

মহিলাদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড

ইসলামের প্রথম শহীদ ছিলেন একজন মহিলা, সুমাইয়া বিনতে খাব্বাত, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন। মক্কার অমুসলিম নেতারা তাকে প্রচণ্ড নির্যাতন করেছিলেন কিন্তু ইসলাম ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং ফলস্বরূপ তিনি শহীদ হন। ইমাম ইবনে কাথিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৫৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সবচেয়ে সম্মানিত এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন সেই ব্যক্তি যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া রয়েছে। সূরা ৪৯, আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"... নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এটা তখনই হয় যখন কেউ মহান আল্লাহর আদেশ পালন করার চেষ্টা করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। দুর্ভাগ্যবশত, শয়তান অনেক নারীকে পুরুষের তুলনায় নারীর মর্যাদা নিয়ে বিতর্ক করতে প্ররোচিত করেছে। যদিও ইসলাম নারীদের এমন সম্মান দান করেছে যা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা বিশ্বাস কখনও দেয়নি, যেমন জান্নাত, যা পরম সুখ, নারীর পায়ের নীচে, অর্থাৎ তার মায়ের, স্থাপন করা। সুনানে আন নাসায়ীর ৩১০৬ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়। জামে আত তিরমিযীর ৩৮৯৫ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, সর্বোত্তম পুরুষ হলেন সেই ব্যক্তি যিনি তার স্ত্রীর সাথে সর্বোত্তম আচরণ করেন। আরও অসংখ্য উদাহরণ

রয়েছে। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, নারীদের নিজেদের পুরুষদের সাথে তুলনা করার ব্যাপারে মাথা ঘামানো উচিত নয় কারণ এটি আল্লাহ তাআলা চান না। বরং , নারীদের তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করা উচিত এবং যদি তারা তা অর্জন করে তবে তারা তাদের চেয়ে কম ধার্মিকতার অধিকারী প্রতিটি পুরুষ বা মহিলার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে। এটিই হলো সেই মানদণ্ড যা কে কার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তা পৃথক করে। এবং এই আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে এটি কেবল পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখলে দেখা যাবে যে মহান মুসলিম মহিলারা পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করার পরিবর্তে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ তারা বেশিরভাগ পুরুষ ও মহিলাদের চেয়ে উন্নত হয়েছিলেন। এমনকি যদি মুসলিম মহিলাদের তাদের স্বপ্নের সমস্ত অধিকার দেওয়া হয়, তবুও তারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ হবে না যতক্ষণ না তারা ধার্মিকতা গ্রহণ করে। সংবাদ এবং যারা তাদের ইচ্ছামত আচরণ করে তা পর্যবেক্ষণ করলে এটি বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং পরকালে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অতএব, যদি কোনও মুসলিম অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ হতে চায় তবে তাদের তা তর্ক-বিতর্ক এবং বিতর্কে নয়, ধার্মিকতার মাধ্যমে তা অনুসন্ধান করা উচিত।

এছাড়াও, আলোচ্য মূল ঘটনাটি ঈমানের মূল্য বোঝা এবং যেকোনো মূল্যে তা জীবনে বাস্তবায়নের গুরুত্ব নির্দেশ করে। সুমাইয়া বিনতে খাব্বাত (রাঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে ঈমান ছাড়া জীবনের কোন অর্থ বা মূল্য নেই কারণ এটি এই পৃথিবীতে বা পরকালে কখনও মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে না। ঈমান মানুষকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শেখায় যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারে এবং এটি শেখায় যে কীভাবে তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিক স্থানে স্থাপন করতে হয় এবং পরকালে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করতে হয়, তাই ঈমানকে বাস্তবায়িত করা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, ঈমান ছাড়া জীবনযাপন, যার ফলে কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে এবং পরকালে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত না হয়, উভয় জগতেই কেবল চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে, এমনকি যদি তারা মজার মুহূর্তগুলিও উপভোগ করে। এই সত্যের কারণেই তিনি ঈমান ছাড়া বেঁচে থাকার চেয়ে নিহত হওয়াকে বেশি

পছন্দ করেছিলেন, কারণ এইভাবে নিহত হওয়ার ফলে পরকালে জান্নাত এবং এই পৃথিবীতে সম্মানজনক উত্তরাধিকার লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। এবং এটি এই পৃথিবীতে শান্তিহীন জীবনের চেয়ে ভালো ছিল যা পরকালে সমস্যা সৃষ্টি করে। অতএব, এই গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতাটি শিখতে হবে এবং ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে, এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে, কারণ এটি উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জনের একমাত্র উপায়। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত থাকে। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তার উপর আমল করেন, তিনিও ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন। কারণ একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, যদিও এত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তার জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার কারণে সকল ধরণের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালারই এই জ্ঞান আছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসের মাধ্যমে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি কে ব্যবহার করে এবং যারা তা করে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝে না এবং তাই তাদের ডাক্তারকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ইসলামের শিক্ষাগুলি নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকৃতি দেবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষা গ্রহণের সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

জেদ

যদিও অনেক অমুসলিম নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যবাদিতা বুঝতেন এবং বিশ্বাস করতেন, তবুও তারা একগুঁয়েমি এবং হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তীব্রভাবে বিরোধিতা করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, মক্কার একজন অমুসলিম নেতা ওয়ালিদ বিন মুগিরা একবার নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছ থেকে পবিত্র কুরআন শুনেছিলেন এবং এতে স্পষ্টভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। যেহেতু তিনি আরবি কবিতায় পারদর্শী ছিলেন, তাই তিনি জানতেন যে পবিত্র কুরআন কবিতা নয় বরং এটি বিশেষ এবং অনন্য। তিনি এমনকি স্বীকার করেছিলেন যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন এবং তিনি অন্য যে কারও চেয়ে উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক উচ্চতা অর্জন করেছিলেন। তিনি মক্কার আরেক অমুসলিম নেতা আবু জাহলের কাছে একান্তে এই কথা স্বীকার করেছিলেন। আবু জাহল জোর দিয়ে বলেছিলেন যে ওয়ালিদ বিন মুগিরা প্রকাশ্যে ইসলাম এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি জাদুর নিন্দা করুক। সত্য স্বীকার করার পরিবর্তে, তার একগুঁয়েমি এবং হিংসা তাকে প্রকাশ্যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর জাদুর অভিযোগ আনতে উৎসাহিত করেছিল। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-মুদ্দাসিরের ৭৪ নম্বর আয়াত, ১১-২৪ নাযিল করেছেন:

"যাকে আমি সৃষ্টি করেছি তাকেই আমার হাতে ছেড়ে দাও। আর যাকে আমি প্রচুর সম্পদ দান করেছি। আর তার সাথে উপস্থিত সন্তান-সন্ততিও। আর তার সামনে সবকিছু ছড়িয়ে দাও, আরাম দাও। তারপর সে চায় যে আমি আরও বেশি করি। না! সে আমাদের আয়াতের প্রতি একগুঁয়ে। আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়ে ঢেকে দেব। নিশ্চয়ই, সে চিন্তা করেছে এবং পরিকল্পনা করেছে। তাই সে ধ্বংস হোক

[যেভাবে] সে পরিকল্পনা করেছে। তারপর ধ্বংস হোক [যেভাবে] সে পরিকল্পনা করেছে। তারপর সে [আবার] চিন্তা করেছে। তারপর সে ভ্রু কুঁচকেছে এবং ভ্রু কুঁচকেছে। তারপর সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং অহংকার করেছে। এবং বলেছে, "এটা [অন্যদের কাছ থেকে অনুকরণ করা জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।"

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৭৪:১১-২৪, পৃষ্ঠা ১৬০-১৬১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

কেউ কেউ পার্থিব বিষয়ে একগুঁয়েমি অবলম্বন করে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের চরিত্রের উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে না। বরং, তারা তাদের মনোভাবের উপর অবিচল থাকে এই বিশ্বাস করে যে এটি তাদের মহান শক্তি এবং প্রজ্ঞার লক্ষণ। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অবিচলতা একটি প্রশংসনীয় মনোভাব কিন্তু বেশিরভাগ পার্থিব বিষয়ে এটিকে কেবল একগুঁয়েমি বলা হয়, যা নিন্দনীয়।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে যদি তারা তাদের মনোভাব পরিবর্তন করে তবে এটি দুর্বলতা প্রদর্শন করে অথবা এটি দেখায় যে তারা তাদের দোষ স্বীকার করছে এবং এই কারণে তারা একগুঁয়েভাবে উন্নতির জন্য পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়। প্রাপ্তবয়স্করা অপরিণত শিশুদের মতো আচরণ করে, তারা বিশ্বাস করে যে যদি তারা তাদের আচরণ পরিবর্তন করে তবে এর অর্থ হল তারা হেরে গেছে, অন্যদিকে যারা তাদের মনোভাবের উপর অটল থাকে তারা জিতেছে। এটি কেবল শিশুসুলভ।

বাস্তবে, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয়ে অবিচল থাকবেন কিন্তু পার্থিব বিষয়ে তারা তাদের জীবনকে সহজ করার জন্য যতক্ষণ না পাপ না হয় ততক্ষণ

তাদের মনোভাব পরিবর্তন করবেন। তাই নিজের জীবনকে উন্নত করার জন্য পরিবর্তন করা দুর্বলতার লক্ষণ নয়, বরং এটি বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।

অনেক ক্ষেত্রেই, একজন ব্যক্তি তার মনোভাব পরিবর্তন করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তার জীবনের অন্যদের কাছ থেকে, যেমন তার আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে, তাদের পরিবর্তন আশা করে। কিন্তু প্রায়শই যা ঘটে তা হল একগুঁয়েমির কারণে সবাই একই অবস্থায় থাকে যা কেবল নিয়মিত মতবিরোধ এবং তর্কের দিকে পরিচালিত করে। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বোঝেন যে যদি তার চারপাশের লোকেরা তাদের উন্নতির জন্য পরিবর্তন না করে যা তাদের উচিত ছিল। এই পরিবর্তন তাদের জীবনের মান এবং অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্কের উন্নতি করবে যা মানুষের সাথে বৃত্তাকার তর্ক করার চেয়ে অনেক ভালো। এই ইতিবাচক মনোভাব অবশেষে অন্যদের তাদের সম্মান করতে বাধ্য করবে কারণ একজনের চরিত্রকে আরও ভালো করার জন্য প্রকৃত শক্তির প্রয়োজন হয়।

যারা একগুঁয়ে থাকে তারা সবসময় এমন কিছু খুঁজে পাবে যা তাদের জীবন থেকে শান্তি কেড়ে নেবে। এর ফলে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে, যেমন তাদের মানসিক স্বাস্থ্যে আরও সমস্যা দেখা দেবে। কিন্তু যারা মানিয়ে নেয় এবং উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে, তারা সর্বদা শান্তির এক স্তর থেকে অন্য স্তরে চলে যাবে। যদি কেউ এই শান্তি অর্জন করে, তাহলে কি অন্যরা বিশ্বাস করে যে তারা কেবল ভুল ছিল বলেই তারা বদলেছে, তাতে কি সত্যিই কিছু আসে যায়?

পরিশেষে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীসের উপর অবিচল থাকা প্রশংসনীয়। কিন্তু পার্থিব বিষয়গুলিতে এবং যেখানে কোনও পাপ করা হয়নি, সেখানে একজন ব্যক্তির উচিত তাদের মনোভাব পরিবর্তন করা এবং মানিয়ে নেওয়া শেখা যাতে তারা এই পৃথিবীতে কিছুটা শান্তি খুঁজে পায়।

উপরন্তু, এই ঘটনাটি হিংসার মতো কবীরা পাপ থেকে বিরত থাকার গুরুত্ব তুলে ধরে। সুনানে ইবনে মাজাহের ৪২১০ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, হিংসা নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয় ঠিক যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

হিংসা একটি গুরুতর এবং কবীরা পাপ কারণ হিংসুকের সমস্যা অন্য ব্যক্তির সাথে নয়। বাস্তবে, তাদের সমস্যা মহান আল্লাহর সাথে, কারণ তিনিই সেই আশীর্বাদ দান করেছেন যা ঈর্ষা করা হয়। সুতরাং একজন ব্যক্তির হিংসা কেবল মহান আল্লাহর বরাদ্দ এবং পছন্দের প্রতি তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। তারা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য একজনকে একটি বিশেষ আশীর্বাদ বরাদ্দ করে ভুল করেছেন।

কেউ কেউ ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির কাছ থেকে বরকত কেড়ে নেওয়ার জন্য তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালায়, যা নিঃসন্দেহে একটি পাপ। সবচেয়ে খারাপ ধরণ হল যখন ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে বরকত কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, এমনকি যদি ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি নিজে বরকত নাও পায়। ঈর্ষা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতি অনুসারে কাজ না করে, তাদের অনুভূতি অপছন্দ করে এবং মালিকের আশীর্বাদ না হারানো পর্যন্ত অনুরূপ বরকত পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই ধরণের বরকত পাপ নয়, তবে যদি ঈর্ষা পার্থিব আশীর্বাদের উপর হয় এবং যদি ধর্মীয় আশীর্বাদের উপর হয় তবে প্রশংসনীয় হয় তবে এটি অপছন্দনীয়। উদাহরণস্বরূপ, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সহিহ মুসলিমের ১৮৯৬ নম্বর হাদিসে প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথম ব্যক্তি যিনি বৈধভাবে ঈর্ষা করতে পারেন তিনি হলেন যিনি হালালভাবে ঈর্ষা করতে পারেন এবং আল্লাহকে খুশি করার জন্য হালাল সম্পদ অর্জন করেন এবং ব্যয় করেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি বৈধভাবে ঈর্ষা করতে পারেন তিনি হলেন যিনি তাদের জ্ঞানকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করেন এবং অন্যদের তা শিক্ষা দেন।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলিমের উচিত ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির প্রতি ভালো চরিত্র এবং দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করা, যতক্ষণ না তাদের ঈর্ষা তাদের প্রতি ভালোবাসায় পরিণত হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, তাদের ঈর্ষা কখনই অন্যের অধিকার পূরণে বাধা হতে দেওয়া উচিত নয়।

একজন মুসলিমের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, মহান আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে সর্বদা নিয়ামত বণ্টন করেন। অর্থাৎ, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার জন্য যা সর্বোত্তম তাই দেন। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, অন্যদের প্রতি ঈর্ষা করার পরিবর্তে, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজে লাগানোর জন্য নিজেকে ব্যস্ত রাখা উচিত। এর ফলে নিয়ামত বৃদ্ধি পাবে, কারণ এই মনোভাব মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"আর [স্মরণ করো] যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের [নেয়ামত] বৃদ্ধি করব..."

উপরন্তু, এটি মনের শান্তির দিকে পরিচালিত করবে, যা একগুঁয়ে ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি কখনও পায় না। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎ কর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অবশেষে, ওয়ালিদ বিন মুগিরাকে তার বন্ধু আবু জাহল ইসলামের বিরোধিতা করতে উৎসাহিত করেছিল , এই ঘটনাটি ভালো সঙ্গী গ্রহণের গুরুত্ব নির্দেশ করে। এটা স্পষ্ট যে একজন ব্যক্তি তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়, এই প্রভাব স্পষ্ট বা সূক্ষ্ম, ইতিবাচক বা নেতিবাচক যাই হোক না কেন। সুনানে আবু দাউদের ৪৮৩৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে । অতএব, ইসলাম সর্বদা মুসলমানদের ভালো সঙ্গী গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে যাতে তারা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়। ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হওয়া সর্বদা একজন ব্যক্তিকে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে সহায়তা করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে, যার ফলে মানসিক শান্তি আসবে। অন্যদিকে, নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হওয়া সর্বদা একজন ব্যক্তিকে জীবনে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলির অপব্যবহার। এটি কেবল চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে, যেমন পাপ, অপরাধ এবং কারাবাস। অতএব, একজনকে ভালো সঙ্গী গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে এবং তাদের আত্মীয়স্বজন, যেমন তাদের সন্তানদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করতে হবে।

মন্দ পরিকল্পনার চক্রান্ত

মক্কার একজন অমুসলিম নেতা, ওয়ালিদ বিন মুগিরা, পবিত্র হজ্জের সময় অন্যান্য অমুসলিম নেতাদের সাথে বৈঠক করেছিলেন। ইসলামের আগমনের আগেও পবিত্র হজ্জের অস্তিত্ব ছিল কিন্তু হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সঠিক রীতিনীতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। ওয়ালিদ বিন মুগিরা অন্যান্য নেতাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে পবিত্র হজ্জের কারণে শীঘ্রই অনেক লোক মক্কায় প্রবেশ করবে এবং তারা ইসলামের বার্তা পাবে, তাই তাদের সর্বসম্মতভাবে একমত হতে হবে যে তারা পবিত্র হজ্জ সম্পর্কে কী বলবেন, যাতে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে না পারে। কেউ পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তাদের উচিত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে একজন গণক হিসেবে আখ্যায়িত করা। কিন্তু ওয়ালিদ উত্তর দিয়েছিলেন যে এটা স্পষ্ট যে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম গণক ছিলেন না কারণ তাঁর মধ্যে কোনও পাগলাটে বৈশিষ্ট্য ছিল না তাই লোকেরা এটি গ্রহণ করবে না। অন্য একজন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তাদের উচিত লোকদের বলা যে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম পাগল এবং মন্দ আত্মায় আচ্ছন্ন ছিলেন। কিন্তু ওয়ালিদ উত্তর দিলেন যে এটা স্পষ্ট যে এটা সত্য নয় কারণ এই লক্ষণগুলি তার মধ্যে স্পষ্ট ছিল না। অবশেষে, কেউ একজন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে কবি হিসেবে চিহ্নিত করার পরামর্শ দিলেন যাতে লোকেরা তাঁর কথায় মনোযোগ না দেয়। কিন্তু আবার ওয়ালিদ উত্তর দিলেন যে এটা স্পষ্ট যে পবিত্র কুরআন বা তাঁর বক্তৃতা কবিতা নয় কারণ আরবরা কবিতার উপর দক্ষ ছিল। ওয়ালিদ সকলকে দাবি করার পরামর্শ দিলেন যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একজন যাদুকর ছিলেন যিনি মানুষ এবং তাদের ধর্মের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এবং পরিবারের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এই পরিকল্পনায় সম্মত হওয়ার পর তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং পবিত্র হজ্জের জন্য মক্কায় মানুষের ঢল নামার জন্য অপেক্ষা করে এবং তাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে কথা না বলার জন্য সতর্ক করে। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের কখনোই কোন খারাপ কাজ করার চক্রান্ত করা উচিত নয় কারণ এটি সর্বদা, এক বা অন্যভাবে, তাদের উপরই আঘাত হানে। এমনকি যদি এই পরিণতিগুলি পরবর্তী জগতে বিলম্বিত হয় তবে তারা অবশেষে এর মুখোমুখি হবে। উদাহরণস্বরূপ, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন যেমন তারা তাদের পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং স্নেহ কামনা করেছিলেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তাদের চক্রান্ত তাদেরকে তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১৮:

"এবং তারা তার জামার উপর মিথ্যা রক্ত আনল। [ইয়াকুব] বলল, "বরং তোমাদের আত্মা তোমাদেরকে কিছু একটার প্রতি প্ররোচিত করেছে, তাই ধৈর্যই সবচেয়ে উপযুক্ত..."

যে যত বেশি মন্দ চক্রান্ত করবে, আল্লাহ তাআলা তত বেশি তাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। এমনকি যদি তারা বাহ্যিকভাবে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে, তবুও আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য উভয় জগতে অভিশাপ হিসেবে তাদের আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটিকেই পরিণত করবেন, যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ৪৩:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজস্ব লোকদের ছাড়া আর কাউকে ঘিরে রাখে না। তাহলে তারা কি পূর্ববর্তী লোকদের পথ [অর্থাৎ, ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করছে?..."

উপরন্তু, এই ঘটনাটি মন্দের জন্য নয়, বরং ভালোর জন্য অন্যদের সাথে একত্রিত হওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। এটি ৪র্থ সূরা আন নিসার ১১৪ নম্বর আয়াতের সাথে সম্পর্কিত:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনের বেশিরভাগের মধ্যেই কোন কল্যাণ নেই, তবে যারা দান-খয়রাতের নির্দেশ দেয়, সৎকর্মের নির্দেশ দেয় অথবা মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ কাজ করে, আমি তাকে বিরাট প্রতিদান দেব।"

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ব্যাখ্যা করেছেন যে, অন্যদের সাথে কথা বলার সময় মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত যাতে তারা নিজেদের এবং অন্যদের জন্য কল্যাণকর হয়। প্রথমত, যখন মুসলমানরা একত্রিত হয় তখন তাদের আলোচনা করা উচিত যে কীভাবে অন্যদের উপকার করা যায়, যার মধ্যে রয়েছে সম্পদ এবং শারীরিক সাহায্যের আকারে দান। যদি কোন মুসলিম কোন অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করার অবস্থানে না থাকে, তাহলে এটি তাদের সাহায্য করার সমান সওয়াব অর্জনের একটি চমৎকার উপায়। সহীহ মুসলিমের ৬৮০০ নম্বর হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্য কাউকে ভালো কাজের জন্য অনুপ্রাণিত করে, সে যেন নিজে ভালো কাজ করেছে, সেও সেভাবেই পুরস্কৃত হবে। যদি কেউ কাউকে কষ্টে সাহায্য করতে না পারে বা অন্যকে এই কাজটি সম্পন্ন করতে অনুপ্রাণিত করতে না পারে, তাহলে অন্তত অন্যদের অভাবী ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করতে পারে। অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা ফেরেশতাদের প্রার্থনাকারীর জন্য প্রার্থনা করতে বাধ্য করে। সুনানে আবু দাউদের ১৫৩৪ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই মানসিকতা দলটিকে অভাবী ব্যক্তির সাথে দেখা করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে যা তাদের মানসিক সমর্থন প্রদান করে। এর একটি শক্তিশালী মানসিক প্রভাব রয়েছে এবং তাদের কষ্ট মোকাবেলা করার সময় তাদের একটি নতুন শক্তি প্রদান করে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যখন কেউ একজন অভাবী ব্যক্তির পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে, তখন তার উদ্দেশ্য

অবশ্যই তাদের প্রয়োজনের সময় সাহায্য করা। এটি কখনই সময় নষ্ট করা এবং তাদের উপহাসের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা উচিত নয়।

দ্বিতীয়ত, আশীর্বাদ লাভের উপায় হলো, যখন কেউ এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে যা ইহকাল বা পরকালে কারো জন্য কল্যাণকর হবে। এর মধ্যে রয়েছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যদেরকে সৎকাজ করার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া।

এই আয়াতে উল্লেখিত তৃতীয় দিকটি হল অন্যদের সাথে গঠনমূলক মানসিকতার সাথে কথোপকথন করা যা মানুষকে ইতিবাচকভাবে একত্রিত করে, বরং ধ্বংসাত্মক মানসিকতা ধারণ করে যা সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। যদি কোনও ব্যক্তি মানুষকে প্রেমময় উপায়ে একত্রিত করতে না পারে তবে তার ন্যূনতম কাজ হল তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা নয়। এমনকি যখন এটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় তখন এটি একটি সৎকর্ম হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। সহিহ বুখারীতে ২৫১৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আবু দাউদের ৪৯১৯ নম্বর একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুই বিরোধী মুসলিমের মধ্যে পুনর্মিলন করা নফল নামাজ এবং রোজার চেয়েও উত্তম। সমাজের মধ্যে পাওয়া প্রতিটি ভালো জিনিসই ছিল স্কুল, হাসপাতাল এবং মসজিদ নির্মাণের মতো এই ধার্মিক মনোভাবের ফল।

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিম কেবল তখনই এই আয়াতে উল্লেখিত মহান প্রতিদান পাবে যখন সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সৎকর্ম করবে । কেবল তাদের শারীরিক কর্মের ভিত্তিতে নয়, তাদের নিয়তের ভিত্তিতে পুরস্কৃত করা হবে। সহীহ বুখারী, ১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কপট মুসলিমরা দেখতে পাবে যে বিচারের দিন তাদের বলা হবে যে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরষ্কার পেতে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

এছাড়াও, আলোচ্য মূল ঘটনাটি এই বিষয়টিও বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে, যখনই কেউ সমাজের মধ্যে ভালোর প্রসার ঘটাতে চায়, যেমন মহানবী মুহাম্মদ (সা.) করেছিলেন, তখন সেই সমাজের সদস্যরা যারা এই ভালোর প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে লাভবান হবে, তারা তাদের তা করা থেকে বিরত রাখার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাবে। এর ফলে একজন ব্যক্তিকে ভালো কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। পরিবর্তে, একজন মুসলিমকে তার সমাজের মধ্যে যতটা সম্ভব ভালোর প্রসার ঘটানোর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং যারা তাদের বিরোধিতা করে তাদের উপেক্ষা করতে হবে। যদিও একজন মুসলিমের নিজেকে রক্ষা করার অধিকার আছে, তবুও তাদের মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে দেওয়া উচিত নয়, যেমন তাদের সম্পর্কে খারাপ গুজব ছড়ানো লোকদের সম্পর্কে খারাপ গুজব ছড়ানো। পরিবর্তে, তাদের তাদের শক্তি অনুসারে সমাজের মধ্যে ভালোর প্রসারে দৃঢ় থাকতে হবে এবং যারা তাদের বিরোধিতা করে তাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য এবং সমাজের মধ্যে ভালোর প্রসারের জন্য মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক মানুষ সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্টের মাধ্যমে সঠিক ইসলামী শিক্ষার প্রসার রোধ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করে এবং ফলস্বরূপ, অনেক মুসলিম তাদের মিডিয়া কন্টেন্টকে চ্যালেঞ্জ করে এমন মিডিয়া কন্টেন্ট তৈরি করে তাদের বিরোধিতা করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করে। এটি কেবল ইসলামের সঠিক শিক্ষা প্রচার এবং বর্তমান যুগে মুসলমানরা যে মৌলিক সমস্যাগুলির মুখোমুখি হচ্ছে তা মোকাবেলা থেকে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত ইসলামের সঠিক শিক্ষা প্রচার এবং মুসলমানরা যে মৌলিক সমস্যাগুলির মুখোমুখি হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করার

উপর মনোনিবেশ করা এবং ইসলাম বিরোধীদের মিডিয়া কন্টেন্টের বিরোধিতা এবং সমালোচনা করে এমন সামগ্রী তৈরিতে তাদের শক্তি এবং সময় নষ্ট করা এড়িয়ে চলা।

ইতিবাচকভাবে উপলব্ধি করা

যখন মহানবী (সাঃ) এর পুত্ররা ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর একমাত্র কন্যা সন্তান রয়ে যায়, তখন মক্কার অমুসলিম নেতারা তাঁকে অপমান করে দাবি করেন যে তাঁর বংশধারা কেটে ফেলা হয়েছে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নাম ভুলে যাবে। ফলস্বরূপ, আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা ১০৮, আল-কাওসার, আয়াত ১-৩ নাযিল করেন:

"নিশ্চয়ই, আমরা তোমাকে প্রচুর কল্যাণ দান করেছি। অতএব, তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ো এবং কুরবানী করো। নিশ্চয়ই তোমার শত্রুই ধ্বংসপ্রাপ্ত।"

ইমাম আল ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ১০৮:১-৩, পৃষ্ঠা ১৬৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই আয়াতগুলো মুসলমানদেরকে সর্বদা পরিস্থিতিকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখার শিক্ষা দেয় কারণ মহান আল্লাহ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর পুত্রদের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেননি। বরং তিনি তাঁকে প্রদত্ত অন্যান্য অসংখ্য আশীর্বাদের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন। নিয়তে কৃতজ্ঞতা বলতে কেবল আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা বোঝায়। কথায় কৃতজ্ঞতা বলতে ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা বোঝায়। আর কর্মে কৃতজ্ঞতা বলতে পবিত্র কুরআন এবং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত আশীর্বাদগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করা বোঝায় যা আল্লাহকে খুশি করে।

মুসলমানদের জন্য ইতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি তাদের অসুবিধা মোকাবেলায় সাহায্য করার একটি দুর্দান্ত হাতিয়ার যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে পারে। যখনই কোনও ব্যক্তি সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তাদের সর্বদা একটি সত্য বুঝতে হবে যে অসুবিধাটি আরও খারাপ হতে পারত। যদি এটি একটি পার্থিব সমস্যা হত তবে তাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে এটি তাদের ঈমানকে প্রভাবিত করে এমন কোনও দুর্দশা ছিল না। অসুবিধার সাথে আসা তাৎক্ষণিক দুঃখের উপর চিন্তা করার পরিবর্তে, তাদের শেষ এবং সেই পুরস্কারের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য প্রদর্শনকারীদের জন্য অপেক্ষা করছে। যখন কোনও ব্যক্তি কিছু আশীর্বাদ হারায় তখন তাদের এখনও থাকা অগণিত আশীর্বাদগুলি স্মরণ করা উচিত। প্রতিটি আশীর্বাদের মধ্যে, একজন মুসলিমের পবিত্র কুরআনের আয়াতটি মনে রাখা উচিত যা মুসলমানদের মনে করিয়ে দেয় যে এমন অনেক গোপন জ্ঞান রয়েছে যা তারা পর্যবেক্ষণ করেনি এমন অসুবিধা এবং পরীক্ষাগুলির মধ্যে। অতএব, তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে তা তাদের কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির চেয়ে ভাল। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

একজন মুসলিমের উচিত এইসব তথ্য এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে চিন্তা করা যাতে তারা একটি ইতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করতে পারে যা এমনভাবে সমস্যার মোকাবেলা করার একটি মূল উপাদান যা উভয় জগতেই অসংখ্য আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। মনে রাখবেন, পেয়ালাটি অর্ধেক খালি নয় বরং অর্ধেক পূর্ণ।

এছাড়াও, আলোচ্য ঘটনাটি মানুষকে কঠিন সময়েও মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের লক্ষ্যে অটল থাকতে শেখায়। একজন ব্যক্তির উচিত তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখা এবং তাদের সম্মুখীন হওয়া কোনও সমস্যার কারণে এটি ভুলে যাওয়া উচিত নয়। যখন কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যের উপর মনোনিবেশ করে, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করে, তখন এটি তাদের ধৈর্যের সাথে তাদের সম্মুখীন হওয়া অসুবিধা মোকাবেলায় সহায়তা করবে। ধৈর্যের অর্থ হল নিজের কথা বা কাজে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা, বিশ্বাস করা যে তিনি কেবল তাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। অন্যদিকে, কোনও অসুবিধার কারণে কারও উদ্দেশ্য ভুলে গেলে তারা সহজেই জীবনের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে। এটি কেবল তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে। এর ফলে উভয় জগতেই আরও চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধা দেখা দেবে।

নিরপেক্ষ থাকুন

মক্কার একজন অমুসলিম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উতবা বিন রাবীয়া একবার মহানবী (সাঃ)-এর কাছে তাঁর মিশনের সাথে আপোষ করার কথা বলেছিলেন। এর জবাবে, মহানবী (সাঃ) তাঁকে পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত পাঠ করে শোনান। উতবা এরপর মক্কার অমুসলিম নেতাদের কাছে ফিরে আসেন এবং তিনি যা শুনেছিলেন তাতে স্পষ্টতই প্রভাবিত হন। তিনি তাদের বলেন যে পবিত্র কুরআন অনন্য, এটি কবিতা বা যাদু নয়। এরপর তিনি তাদেরকে মহানবী (সাঃ)-এর কাছ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন এবং তাঁর ব্যবসা থেকে দূরে থাকেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে পবিত্র কুরআন সমগ্র আরবকে প্রভাবিত করবে। তিনি আরও বলেন যে, যদি আরবের অন্যান্য অমুসলিমরা ইসলামকে ধ্বংস করে দেয় তবে তাদের সমস্যার সমাধান হবে, কিন্তু যদি মহানবী (সাঃ)-এর আধিপত্য বিস্তার হয় তবে তারা তাঁর সাথে এতে অংশীদার হবে, কারণ তারা তাঁর আত্মীয়স্বজন ছিলেন যারা তাঁকে এবং তাঁর মিশনের ক্ষতি করা থেকে বিরত ছিলেন। কিন্তু মক্কার অমুসলিম নেতারা তাঁর পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেন। ইবনে কাথিরের "প্রভুর জীবন" বইয়ের ১ম খণ্ডের ৩৬৫-৩৬৬ পৃষ্ঠায় এটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উতবার পরামর্শ অন্যদের প্রতি নিরপেক্ষ থাকার গুরুত্ব নির্দেশ করে, বিশেষ করে যদি কেউ অন্যদের ভালো কাজে সাহায্য করতে না চায়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানরা প্রায়শই দাবি করে যে তারা তাদের পার্থিব কাজে ব্যস্ত থাকায়, বিশেষ করে মানুষের সাথে সম্পর্কিত স্বেচ্ছাসেবী সৎকর্ম, যেমন কাউকে শারীরিকভাবে সাহায্য করা, করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। যদিও মুসলমানদের যথাসম্ভব স্বেচ্ছাসেবী সৎকর্ম সম্পাদন করার চেষ্টা করা উচিত যাতে উভয় জগতেই তাদের উপকার হয়, অন্যদিকে, তাদের পার্থিব কার্যকলাপ কেবল এই পৃথিবীতেই তাদের উপকার করবে, তবুও এই

মুসলমানদের অন্তত অন্যদের প্রতি নিরপেক্ষ মনোভাব অবলম্বন করা উচিত। এর অর্থ হল, যদি একজন মুসলিম অন্যদের সাহায্য করতে না পারে তবে তাদের তাদের বৈধ এবং ভালো কাজে বাধা দেওয়া উচিত নয়। যদি তারা অন্যদের খুশি করতে না পারে তবে তাদের দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। যদি তারা অন্যদের হাসাতে না পারে তবে তাদের কাঁদানো উচিত নয়। এটি অসংখ্য পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক মুসলিম অন্যদের প্রতি ভালো করতে পারে, যেমন তাদের মানসিক সহায়তা প্রদান করা, কিন্তু একই সাথে তারা মানুষের প্রতি নেতিবাচক আচরণ করে তাদের ভালো কাজগুলিকে ধ্বংস করে। এটি লক্ষণীয় যে, যদি একজন মুসলিম অন্যদের প্রতি অতিরিক্ত নেতিবাচক আচরণ করে তবে বিচারের দিনে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহিহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। নিরপেক্ষ মানসিকতা থাকা আসলে একটি ভালো কাজ, যখন তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। সহিহ মুসলিমের ২৫০ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, জামে আত তিরমিযী, ২৫১৫ নম্বরে বর্ণিত হাদিস অনুসারে, অন্যদের সাথে ইতিবাচক আচরণ করাই সর্বোত্তম, যা একজন প্রকৃত মুমিনের লক্ষণ। কিন্তু যদি তারা এটি করতে না পারে তবে তাদের অন্তত অন্যদের সাথে নিরপেক্ষ আচরণ করা উচিত। কারণ অন্যদের সাথে নেতিবাচক আচরণ করা একজনের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

এছাড়াও, আলোচ্য মূল ঘটনাটি তাড়াহুড়ো করে আচরণ করা এড়িয়ে চলার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। তাড়াহুড়ো পাপ, অপরাধ এবং তর্ক-বিতর্কের একটি প্রধান কারণ। কারণ তাড়াহুড়ো করলে পরিস্থিতির প্রতি আবেগ অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেখাতে হয়, যা সহজেই ভুল পছন্দ, কথা এবং কাজের দিকে পরিচালিত করে, প্রমাণ, যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করার পরিবর্তে। এই কারণেই জামে আত তিরমিযী, ২০১২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, সবকিছু চিন্তা করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর তাড়াহুড়ো করে আচরণ করা শয়তানের পক্ষ থেকে। অতএব,

একজন ব্যক্তির উচিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে চিন্তা করে ধৈর্যের সাথে প্রতিটি পরিস্থিতি মোকাবেলা করার চেষ্টা করা এবং তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলা কারণ এটি প্রায়শই উভয় জাহানে অনুশোচনার কারণ হয়।

অন্যদের বিভ্রান্ত করা

মক্কার অমুসলিমদের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, নাদর বিন হারিস, এমন মহিলা গায়িকাদের ক্রয় করতেন যারা তাদের মনোমুগ্ধকর গানের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত শোনা এবং গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখত। এই প্রসঙ্গে, আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, সূরা লুকমান, আয়াত 6 নাযিল করেন:

"আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য কথার তামাশা ক্রয় করে এবং তাকে উপহাস হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।"

ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার", পৃষ্ঠা ৯১-এ এটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, ২৬৭৪ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে ভালো কিছুর দিকে পরিচালিত করে, সে তাদের উপদেশ অনুসারে কাজ করা লোকদের সমান সওয়াব পাবে। আর যারা অন্যদের পাপের দিকে পরিচালিত করে, তাদের উপর এমনভাবে জবাবদিহি করা হবে যেন তারা পাপ করেছে।

অন্যদের উপদেশ ও নির্দেশনা দেওয়ার সময় মুসলমানদের সতর্ক থাকা গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুসলিমের উচিত কেবল ভালো কাজেই অন্যদের উপদেশ

দেওয়া যাতে তারা এর প্রতিদান পায় এবং আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হওয়ার উপদেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকা। কেউ যদি কেবল এই দাবি করে যে সে অন্যদের পাপের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, এমনকি যদি সে নিজে পাপ নাও করে, তাহলেও বিচার দিবসে শাস্তি থেকে বাঁচবে না। মহান আল্লাহ, পথপ্রদর্শক এবং অনুসারী উভয়কেই তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করবেন। অতএব, মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে কেবল সেই কাজ করার পরামর্শ দেওয়া যা তারা নিজেরাই করত। যদি তারা তাদের আমলনামায় কোন কাজ লিপিবদ্ধ করা অপছন্দ করে, তাহলে তাদের অন্যদের সেই কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়।

এই ইসলামী নীতির কারণে, মুসলমানদের উচিত অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা নিশ্চিত করা, কারণ অন্যদের ভুল উপদেশ দিলে তারা সহজেই তাদের পাপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

উপরন্তু, এই নীতিটি মুসলমানদের জন্য সম্পদের মতো সামর্থ্যের অভাবে নিজেরা যে কাজ করতে পারে না তার জন্য সওয়াব অর্জনের একটি অত্যন্ত সহজ উপায়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি আর্থিকভাবে দান করতে সক্ষম নয়, সে অন্যদেরকেও তা করতে উৎসাহিত করতে পারে এবং এর ফলে তারা দানকারীর মতোই সওয়াব পাবে।

অধিকন্তু, মৃত্যুর পরেও মানুষের সৎকর্মের বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য এই ইসলামী নীতি একটি চমৎকার উপায়। যত বেশি মানুষ অন্যদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত করবে, তত বেশি তাদের সৎকর্ম বৃদ্ধি পাবে। এই উত্তরাধিকার সম্পর্কে একজন মুসলিমকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে, কারণ সম্পত্তির সাম্রাজ্যের মতো অন্যান্য সমস্ত উত্তরাধিকার আসবে এবং যাবে, এবং মৃত্যুর পরে তা তাদের কোনও কাজে আসবে না। যদি কিছু থাকে, তবে তাদের সাম্রাজ্য

উপার্জন এবং জমা করার জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে, যখন তাদের উত্তরাধিকারীরা মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সাম্রাজ্য উপভোগ করবে।

ঘটনাটি মুসলিমদের আরও শিক্ষা দেয় যে, বিনোদন শিল্পের মতো ইসলাম থেকে অন্যদের বিভ্রান্ত করে যারা উপকৃত হয়, তারা এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করবে। এই বিক্ষেপ কাটিয়ে ওঠার জন্য, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই সেই কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করা উচিত কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যে জিনিসগুলিতে তারা জড়িত হতে চায় তার সুবিধা এবং ক্ষতি বিবেচনা করতে হবে। যদি ক্ষতিগুলি সুবিধার চেয়ে বেশি হয়, তবে তাদের তা থেকে বিরত থাকা উচিত। এই ক্ষতিগুলির মধ্যে সময়, শক্তি এবং সম্পদের মতো সম্পদের অপচয় অন্তর্ভুক্ত। এবং এই ক্ষতিগুলির মধ্যে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলির পাশাপাশি পাপপূর্ণ জিনিসও অন্তর্ভুক্ত। অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিকে পাপ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় না তবে যেহেতু তারা একজনকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পরিচালিত করে না, অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে না। উপরন্তু, অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সম্পদের অপচয় হিসাবে, যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে লিপ্ত হয় সে বিচারের দিনে খালি হাতে থাকবে এবং অনুশোচনায় পূর্ণ থাকবে, বিশেষ করে যখন অন্যরা অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে এবং পরিবর্তে তাদের সম্পদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে ভালো কাজ করে। যখন কেউ এইভাবে কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করবে কিনা তা মূল্যায়ন করে, তখন তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

ইভিল কমান্ডিং

মক্কার অমুসলিমদের নেতারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), তাঁর সাহাবীগণ (সাঃ) এবং ইসলামের ক্ষতি করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অমুসলিম চাচা আবু লাহাব ছিলেন বিশেষভাবে দুষ্ট। তিনি একবার তার দুই পুত্রকে তাদের স্ত্রী, রুকাইয়া এবং উম্মে কুলসুম (সাঃ) কে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দুই কন্যা। আবু লাহাব কেবল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ক্ষতি করার জন্য তার দুই পুত্রের বিবাহ বিঘ্নিত এবং নষ্ট করে দিয়েছিলেন। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ৯৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ভণ্ডামির একটি অংশ হলো, একজন ব্যক্তি কেবল নিজে খারাপ কাজ করে না এবং সৎ কাজ থেকে বিরত থাকে না বরং অন্যদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করে। তারা চায় অন্যরাও তাদের মতো একই নৌকায় থাকুক যাতে তারা তাদের খারাপ চরিত্রে কিছুটা সান্ত্বনা পায়। তারা কেবল নিজেকে ডুবিয়ে দেয় না বরং তাদের সাথে অন্যদেরও ডুবিয়ে দেয়। মুসলমানদের জানা উচিত যে, একজন ব্যক্তি তার আহ্বানের কারণে পাপ করলে অন্য প্রতিটি ব্যক্তির জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এই ব্যক্তির সাথে এমন আচরণ করা হবে যেন সে পাপ করেছে যদিও সে কেবল অন্যদেরকেই এর দিকে আহ্বান করেছিল। সুনানে ইবনে মাজাহ, ২০৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে । এই কারণেই কেউ কেউ বলেছেন যে, ধন্য সেই ব্যক্তি যার পাপ তাদের সাথে মারা যায় কারণ অন্যরা যদি তাদের খারাপ পরামর্শ অনুসারে কাজ করে তবে তাদের পাপ বৃদ্ধি পাবে যদিও তারা আর বেঁচে নেই।

আত্মীয়স্বজনের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের কারণে ভুল আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে শেখায়। একজন মুসলিমের কর্তব্য হল তাদের আশেপাশের লোকদের

আনুগত্য করা নয়, কারণ এটি সর্বদা পাপ ও অপরাধের দিকে পরিচালিত করে। একজন মুসলিমের কর্তব্য হল আন্তরিকভাবে আল্লাহকে আনুগত্য করা এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আশেপাশের লোকদের অধিকার পূরণ করা। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে, তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। যে ব্যক্তি এই উপলব্ধি গ্রহণ করে সে সর্বদা কাজ করার আগে মানুষের পরামর্শকে ইসলামের শিক্ষার সাথে তুলনা করবে। এটি তাদের ভুল পছন্দ করা থেকে বিরত রাখবে। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে আনুগত্য করে, সে অন্যদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে তাকে রক্ষা করবে, যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে অবাধ্য করে মানুষের আনুগত্য করে, সে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৬৬-১৬৭:

" [এবং তাদের বিবেচনা করা উচিত] যখন যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা তাদের অনুসারীদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, এবং তারা [সকলেই] শাস্তি দেখতে পাবে এবং তাদের থেকে [সম্পর্কের] বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, "হায়! আমাদের যদি [পার্থিব জীবনে] আবার ফিরে আসা হত, তাহলে আমরাও তাদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলতাম যেমন তারা আমাদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছে।" এভাবে আল্লাহ তাদের কর্মকাণ্ড তাদের উপর অনুশোচনা হিসেবে দেখাবেন। এবং তারা কখনও আগুন থেকে বের হবে না।"

বিভ্রান্তিকর বন্ধুরা

একবার মক্কার তিনজন অমুসলিম ব্যক্তি, আবু জাহল, আবু সুফিয়ান এবং আখনাস বিন শারীক, গোপনে রাত কাটিয়ে মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শুনছিলেন। এমনকি তারা একে অপরের কাছ থেকে লুকিয়ে ছিলেন এবং ভোরবেলা যখন তারা তাদের বাড়ির দিকে রওনা হলেন তখনই বুঝতে পারলেন যে অন্যরা কী করেছে। তারা একে অপরকে তিরস্কার করেছিলেন এবং একে অপরকে তাদের কর্মকাণ্ড পুনরাবৃত্তি না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কারণ এতে কেবল ইসলামই সত্য বলে ধারণা তৈরি হবে। কিন্তু তাদের কেউই তাদের পরামর্শে অটল ছিলেন না এবং পরের রাতে এবং তার পরের রাতেও একই কাজ করেছিলেন। তৃতীয় রাতে, তারা আবার একে অপরের সমালোচনা করেছিলেন এবং একে অপরকে তাদের আচরণ পুনরাবৃত্তি না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এটি ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬৬-৩৬৭-এ লিপিবদ্ধ আছে।

যদি তারা একে অপরের এত খারাপ সঙ্গী না হতো, তাহলে হয়তো তারা সত্যকে তখনই গ্রহণ করতো। অতএব, এটি খারাপ সঙ্গী এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

মুসলমানদের মনে রাখা উচিত যে, প্রকৃত ভালোবাসার একটি প্রধান লক্ষণ হলো যখন কেউ তার প্রিয়জনকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কারণ আনুগত্য ইহকাল ও পরকালে সাফল্য ও নিরাপত্তার দিকে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি কারো জন্য নিরাপত্তা ও সাফল্য কামনা করে না, সে কখনোই তাকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসতে পারে না, সে যাই দাবি করুক বা অন্য ব্যক্তির সাথে কেমন আচরণ করুক না কেন।

একজন ব্যক্তি যখন তার প্রিয়জনকে চাকরির মতো পার্থিব সাফল্য লাভ করে, তখন ঠিক যেমন খুশি হয়, তেমনি সেও তার প্রিয়জনকে আখেরাতে সাফল্য লাভ করতে চায়। যদি একজন ব্যক্তি অন্যের নিরাপত্তা ও সাফল্য লাভের বিষয়ে চিন্তা না করে, বিশেষ করে পরকালে, তাহলে সে তাকে ভালোবাসে না।

একজন প্রকৃত প্রেমিক তার প্রিয়জনকে এই পৃথিবীতে বা পরকালে কষ্ট এবং শাস্তির সম্মুখীন হতে দেখা এবং জানা সহ্য করতে পারে না। এটি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই এড়ানো সম্ভব। অতএব, তারা সর্বদা তাদের প্রিয়জনকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করবে। যদি কেউ অন্যকে আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে নিজের স্বার্থ বা অন্যের স্বার্থের দিকে পরিচালিত করে, তাহলে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে না। এটি বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়স্বজনের মতো সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত মূল্যায়ন করা যে তাদের জীবনের বিষয়গুলি তাদেরকে মহান আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে কিনা। যদি তারা তা করে তবে এটি তাদের প্রতি তাদের ভালোবাসার স্পষ্ট লক্ষণ। যদি তারা তা না করে তবে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাদেরকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে না। অধ্যায় ৪৩ আয যুখরুফ, আয়াত ৬৭:

"সেদিন ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হবে, কেবল সৎকর্মশীলরা ছাড়া।"

আলোচ্য মূল ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের শক্তিরও ইঙ্গিত দেয়। মক্কার তিন অমুসলিম নেতা বারবার এবং গোপনে পবিত্র কুরআন শুনেছিলেন এবং এতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। একজন মুসলিমের পবিত্র কুরআনের আশ্চর্যজনক এবং অলৌকিক গুণাবলী উপলব্ধি করার দায়িত্ব বেশি। কিন্তু এটি তখনই সম্ভব যখন কেউ পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে, কেবল এমন ভাষায় তেলাওয়াত করার পরিবর্তে যা তারা বোঝে না। যে ব্যক্তি এটি বোঝার চেষ্টা করে সে পবিত্র কুরআনের আশ্চর্যজনক এবং অলৌকিক গুণাবলী এবং এতে আলোচিত ইসলামের স্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে তার ঈমানকে শক্তিশালী করবে। দৃঢ় ঈমান তাদেরকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে, যার মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত, মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকতে উৎসাহিত করবে। এর ফলে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা এবং পরিণামে মানসিক শান্তি আসবে। কিন্তু এই ফলাফলের মূল হলো পবিত্র কুরআন বোঝা এবং তার উপর আমল করা। অধ্যায় ৫ আল মায়িদা, আয়াত ১৫-১৬:

"...তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নূর এবং একটি স্পষ্ট কিতাব এসেছে। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টির অনুসারীদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং তাঁর অনুমতিক্রমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"

বিশ্ব প্রতিযোগিতা

মক্কার অমুসলিম নেতা এবং মহানবী (সাঃ) এর চাচা আবু জাহলকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, মহানবী (সাঃ) এবং পবিত্র কুরআন সম্পর্কে তার সৎ মতামত কী? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি জানেন যে ইসলামই সত্য, কিন্তু মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁর গোত্র এবং মহানবী (সাঃ) এর গোত্র সর্বদা সামাজিক মর্যাদার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তারা দরিদ্রদের খাওয়ানো, মানুষকে সাহায্য করা, দান করা এবং অন্যান্য সামাজিক কাজে প্রতিযোগিতা করত। কিন্তু যখন মহানবী (সাঃ) নবুওয়াত ঘোষণা করেন, তখন তাঁর নিজস্ব গোত্র এর সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারেনি। তাই এই পার্থিব প্রতিযোগিতার কারণে তিনি কখনও মহানবী (সাঃ) এর নবুওয়াত গ্রহণ না করার শপথ নেন, যদিও তিনি জানতেন যে তিনি সত্য বলছেন। এটি ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬৭-এ লিপিবদ্ধ আছে।

এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা আল-আন'আমের ৩৩ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"আমরা জানি যে তারা যা বলে তাতে তুমি দুঃখিত। আর অবশ্যই, তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং জালেমরা আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।"

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৬:৩৩, পৃষ্ঠা ৭৫-৭৬-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি পার্থিব প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সতর্ক করে কারণ এটি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং হিংসার মতো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অবাধ্য হতে উৎসাহিত করতে পারে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৯৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী (সা.) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তিনি মুসলিম জাতির জন্য দারিদ্র্যের ভয় করেন না। বরং তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে পার্থিব আশীর্বাদ তাদের জন্য সহজে প্রাপ্ত এবং প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করবে এবং ফলস্বরূপ, এটি তাদের ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করবে, যেমন এই প্রতিযোগিতা পূর্ববর্তী জাতিগুলিকে ধ্বংস করেছিল।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এটি কেবল সম্পদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। বরং এই সতর্কীকরণ মানুষের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার সকল দিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব এবং জীবনের সামাজিক দিক যেমন পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং ক্যারিয়ারের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে পারে। যখনই কেউ তাদের চাহিদার বাইরে এই জিনিসগুলি অনুসরণ করে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার লক্ষ্য রাখে, এমনকি যদি সেগুলি বৈধ হয়, তখন এটি তাদের আখেরাতের জন্য কার্যত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখবে, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। এটি তাদের খারাপ চরিত্রের দিকে পরিচালিত করবে, যেমন অপচয় এবং অপচয় করা, এমনকি এই জিনিসগুলি অর্জনের জন্য তাদের পাপের দিকেও নিয়ে যেতে পারে। এগুলি অর্জনে ব্যর্থতা অধৈর্যতা এবং মহান আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা এবং অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করতে পারে। অন্যদের সাথে পার্থিব আশীর্বাদের জন্য প্রতিযোগিতা তাদেরকে অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে পরিচালিত করবে, যেমন হিংসা, বিদ্বেষ এবং শত্রুতা, যা অনৈক্য, অকৃতজ্ঞতা এবং অন্যদের অধিকার পূরণে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করে। এই প্রতিযোগিতা এমনকি অন্যদের ক্ষতি করতে পারে।

এটি উভয় জগতেই কেবল ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, এমনকি যদি এটি এই পৃথিবীর কোনও ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট নাও হয়।

এটা স্পষ্ট যে এই পার্থিব আকাঙ্ক্ষাগুলি অনেক মুসলমানের উপর কর্তৃত্ব করেছে কারণ তারা আনন্দের সাথে মধ্যরাতে ঘুম থেকে উঠে সম্পদের মতো পার্থিব আশীর্বাদ অর্জন করত, অথবা ছুটিতে যেত, কিন্তু যখন তাদেরকে নফল রাতের নামাজ পড়তে বা জামাতের সাথে মসজিদে সকালের ফরজ নামাজ পড়তে বলা হত, তখন তারা তা করতে ব্যর্থ হত।

এই জিনিসগুলি অর্জনে কোন ক্ষতি নেই যতক্ষণ না এগুলো বৈধ এবং মানুষের এবং তার উপর নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য আবশ্যক। কিন্তু যখন কেউ এর বাইরে যায়, তখন সে তার পরকালের ক্ষতির জন্য এগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কারণ এটি তাকে আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে। যত বেশি কেউ তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা অনুসরণ করবে, ততই সে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য কম চেষ্টা করবে, কারণ একজন ব্যক্তি তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে হয় আল্লাহ, মহিমান্বিতকে খুশি করার জন্য ব্যবহার করতে পারে, অথবা তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসারে। এটি আলোচিত মূল হাদিসে সতর্ক করা ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করবে। একটি ধ্বংস যা এই পৃথিবীতে চাপ এবং উদ্বেগ দিয়ে শুরু হয় এবং পরকালে চরম অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 20 ত্বাহা, আয়াত 124:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন] এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।"

আলোচ্য মূল ঘটনাটি হিংসা এড়িয়ে চলার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। হিংসা একটি মহাপাপ কারণ এটি সরাসরি আল্লাহ তাআলার, ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিকে না দিয়ে, অন্য কাউকে একটি নির্দিষ্ট আশীর্বাদ প্রদানের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে। একজন ব্যক্তির অবশ্যই তাদের ঈর্ষা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং এটি তাদের কথা ও কাজে প্রভাব ফেলতে বাধা দিতে হবে এবং পরিবর্তে যার সাথে তারা ঈর্ষা করে তার অধিকার পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে তাদের ঈর্ষার নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে। উপরন্তু, ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিকে মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ, প্রতিটি ব্যক্তিকে যা তার জন্য সর্বোত্তম তা দান করেন, এমনকি যদি তা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। অতএব, প্রতিটি ব্যক্তির উচিত তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করা যাতে তারা অন্য লোকেদের কী দেওয়া হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ না করে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। অধ্যায় 42 আশ শুরা, আয়াত 27:

"আর যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য অতিরিক্ত রিযিক বর্ধিত করতেন, তাহলে তারা পৃথিবীতে অত্যাচার করত। কিন্তু তিনি যতটা ইচ্ছা ততটা নাযিল করেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবগত এবং দ্রষ্টা।"

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

তা না করলে কেবল একজন ব্যক্তিকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হবে, যা তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা সৃষ্টি করবে। অতএব, যদি তারা মানসিক শান্তি অর্জন করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই হিংসার নেতিবাচক প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

সহনশীলতা

মহানবী (সাঃ)-এর অমুসলিম চাচা আবু জাহল একবার প্রকাশ্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, যদি ইসলাম তাঁর পক্ষ থেকে সত্য হয়, তাহলে তিনি যেন তাদের উপর পাথর বর্ষণ করেন অথবা তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আনেন। এই প্রসঙ্গে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা আনফালের ৮ম সূরা, আয়াত ৩২-৩৩ নাযিল করেন:

"আর [স্মরণ করো] যখন তারা বলেছিল, "হে আল্লাহ, যদি এটা তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তাহলে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো অথবা আমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নাও।" কিন্তু আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না [অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধ্বংস] যতক্ষণ তুমি, [নবী মুহাম্মদ, সা.] তাদের মধ্যে থাকবে, এবং আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে।"

সহীহ বুখারী, ৪৬৪৯ নং-এ প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইসলামের একটি নীতি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহর শাস্তি মানুষের কাছে সবসময় স্পষ্ট হয় না, যেমন আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করা। প্রায়শই শাস্তি এত সূক্ষ্ম হয় যে অন্যায়কারী এমনকি বুঝতেও কষ্ট পায় যে তাদের অবিরাম অবাধ্যতার জন্য তারা শাস্তি পাচ্ছে। এর একটি উদাহরণ হল মানসিক এবং মানসিক সমস্যা যেমন চাপ এবং উদ্বেগের মুখোমুখি হওয়া, যা স্বাভাবিক সীমার বাইরে এবং এর ফলে বিষণ্ণতা, মাদকাসক্তি এবং আত্মহত্যার প্রবণতার মতো গুরুতর মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। এটি তখন ঘটে যখন একজনকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করা হয় এবং

ফলস্বরূপ তারা এর ধারকদের জন্য চাপের উৎস হয়ে ওঠে, এমনকি তারা মজার মুহূর্তগুলিও উপভোগ করে। ধনী এবং বিখ্যাতদের পর্যবেক্ষণ করলে এই ফলাফলটি বেশ স্পষ্ট হয়। অধ্যায় 9 তওবার আয়াত 82:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

অধিকন্তু, একটি একগুঁয়ে ও দুষ্ট জাতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া, আল্লাহর বাণী সম্পূর্ণরূপে পৌঁছানোর আগে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার জাতি ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়ার আগে, মহান আল্লাহর রীতির পরিপন্থী।

মহান আল্লাহ তায়ালা, যার শাস্তি প্রাপ্য, তাকে দয়া করে শাস্তি দিতে তাড়াহুড়ো করেন না। বরং তিনি তাদেরকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার এবং তাদের আচরণ সংশোধন করার সুযোগ দেন। যে মুসলিম এটি বোঝে সে কখনও আল্লাহর রহমতের উপর আশা ছেড়ে দেবে না, বরং সীমা অতিক্রম করবে না এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করবে না এই বিশ্বাসে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা কখনও তাদের শাস্তি দেবেন না। তারা বোঝে যে শাস্তি কেবল বিলম্বিত হয়, পরিত্যাগ করা হয় না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। তাই এই ঐশ্বরিক গুণ একজন মুসলিমের মধ্যে আশা এবং ভয় তৈরি করে। একজন মুসলিমের উচিত এই বিলম্বকে তওবা করার এবং সৎকর্মের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা।

একজন মুসলিমের উচিত এই ঐশ্বরিক গুণাবলীর উপর নির্ভর করে মানুষের প্রতি নম্র হওয়া, বিশেষ করে যখন তারা খারাপ চরিত্র প্রদর্শন করে। তাদের উচিত অন্যদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা, ঠিক যেমন তারা চায় যে মহান আল্লাহ তাদের গাফিলতির সময় তাদের প্রতি নম্র হন। কিন্তু একই সাথে তাদের নিজেদের খারাপ বৈশিষ্ট্যের প্রতিও নম্র হওয়া উচিত নয়, কারণ তারা জানে যে পাপের শাস্তি স্থায়ীভাবে পরিত্যাগ করা হয় যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। তাদের উচিত মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে মন্দের জবাব ভালো দিয়ে দিয়ে নম্রতা প্রদর্শন করা। সূরা ফুসসিলাত, আয়াত 34:

"আর ভালো কাজ ও মন্দ সমান নয়। [মন্দ কাজ] প্রতিহত করো সেই [কাজ] দ্বারা যা উত্তম; তাহলে যার সাথে তোমার শত্রুতা আছে সে [একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হয়ে যাবে।"

একটি দীর্ঘস্থায়ী চ্যালেঞ্জ

মক্কার অমুসলিমরা তাদের জীবন নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে কাটিয়েছিল এবং তারা পুরোপুরি জানত যে তিনি মিথ্যাবাদী বা পাগল নন। যেহেতু তারা আরবি ভাষার উপর দক্ষ ছিল, তাই তারা পুরোপুরি জানত যে পবিত্র কুরআন কোন মানুষ বা জিনের কথা নয়। কিন্তু তারা এই সত্য প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে পারেনি কারণ ইসলাম গ্রহণের ফলে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত হবে এবং তাই তারা দাবি করেছিল যে এর লেখক হয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর, অথবা অন্য কেউ। মহান আল্লাহ একাধিকবার তাদের কাছে পবিত্র কুরআনের অনুরূপ কিছু তৈরি করার চ্যালেঞ্জ উত্থাপন করেছিলেন। তারা যতই চেষ্টা করুক না কেন, তারা কখনও তা করতে পারেনি, আর কেউ পারবেও না। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩:

"আর যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বিশেষ বান্দার উপর নাযিল করেছি, তাহলে তোমরা এর মতো একটি সূরা নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

পবিত্র কুরআনে অসংখ্য গুণাবলী রয়েছে যা একে অন্য যেকোনো জাগতিক গ্রন্থ থেকে পৃথক করে। পবিত্র কুরআনের এই দিকটি এতটাই তীব্র যে এটিকে অসংখ্য জীবদ্দশায় ব্যাখ্যা বা আলোচনা করাও সম্ভব নয়। তবে এই গুণাবলীর কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হবে। প্রথমত, পবিত্র কুরআনে, মহান আল্লাহ সমগ্র বিশ্বজগতের (শুধু মানুষদের নয়) প্রতি একটি উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ দান করেছেন এবং শুধুমাত্র এই ঐশ্বরিক ওহী নাজিলের সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রতি নয় বরং শেষ যুগ পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টির প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ দান করেছেন। চ্যালেঞ্জ হল, যদি মানুষ বিশ্বাস করে যে পবিত্র কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ঐশ্বরিক ওহী

নয়, তাহলে তাদের এমন একটি সূরা তৈরি করা উচিত যা পবিত্র কুরআনের একটি সূরার সাথে তুলনা করতে পারে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৩:

"আর যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বিশেষ বান্দার উপর নাযিল করেছি, তাহলে তোমরা এর মতো একটি সূরা নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

সমগ্র গ্রহে এমন কোন গ্রন্থ নেই যা এই ধরণের প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ দিতে পারে এবং দিয়েছে। কিন্তু ১৪০০ বছরেরও বেশি আগে পবিত্র কুরআন সমগ্র বিশ্বকে এই চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত অমুসলিমরা এই চ্যালেঞ্জে জয়ী হয়নি এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায়ও তা কখনো হবে না।

পবিত্র কুরআনের আরেকটি গুণ হলো, এতে ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু এই বিবৃতিগুলোর মধ্যে আরও আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, সেই সময়ে ফলাফল অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ৪৮তম সূরা আল ফাতহ, আয়াত ২৮:

"তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মকে অন্য সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করতে এবং সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।"

যখন এই আয়াতটি নাজিল হয়েছিল তখন সমগ্র মক্কা শহর ইসলাম ধর্মে পরিণত হয়েছিল। তাই দুর্ভাগ্যবশত মক্কাবাসীরা যখন এই আয়াতটি শুনল, তখন তারা

বিশ্বাস করেছিল যে ইসলাম খুব দুর্বল এবং তাই তারা বেশিদিন টিকে থাকবে না এবং অবশ্যই মক্কার সীমানা ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে না। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই মহান আল্লাহ এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন।

পবিত্র কুরআন কীভাবে ভবিষ্যতের একটি ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যা সেই সময়ে অকল্পনীয় ছিল, তার আরেকটি উদাহরণ সূরা আর রুমের 30 নম্বর আয়াতে পাওয়া যায়:

"রোমানরা পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী ভূমিতে এবং তাদের পরাজয়ের পর তারা শীঘ্রই জয়লাভ করবে। কয়েক বছরের মধ্যেই।" "আল্লাহর নির্দেশ কেবল পূর্বে এবং পরে। আর সেদিন মুমিনরা আনন্দ করবে। আল্লাহর সাহায্যে তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। আর তিনি পরাক্রমশালী, করুণাময়।"

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতগুলি এমন এক সময়ে নাজিল হয়েছিল যখন রোমানরা (খ্রিস্টানরা) পারস্যদের (অগ্নিপূজক) সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। অনেক প্রামাণিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ দ্বারা এই যুদ্ধের সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই বিশেষ সময়ে পারস্যরা যুদ্ধে জয়লাভের দ্বারপ্রান্তে ছিল। এক পর্যায়ে রোম নিজেই পারস্যদের দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ বলেছিলেন যে রোমানরা অবশেষে বিজয়ী হয়ে রাজত্ব করবে। মক্কার অমুসলিমরা যারা নিজেরাই মূর্তিপূজক ছিল তারা পারস্যদের পক্ষে ছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে একমত হয়েছিল যে রোমানদের জয় অসম্ভব। কিন্তু মহান আল্লাহ সর্বদা এই আয়াতগুলিকে সত্য প্রমাণ করেছিলেন এবং রোমানদের বিজয় দিয়েছিলেন।

বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছে আবেদনময়ী একটি চূড়ান্ত উদাহরণ দেখা যায় ২১ অধ্যায় আল আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াতে:

"আর তিনিই সেইজন যিনি রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকেই একটি পরিধিতে ভাসমান।"

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানীরা সৌরজগৎ ঠিক কীভাবে সাজানো তা নিয়ে তত্ত্ব নিয়ে লড়াই করে আসছেন, যেমন সূর্য স্থির থাকে এবং পৃথিবী তার চারপাশে ঘোরে নাকি তার বিপরীত। সম্প্রতি বিভিন্ন ধর্ম ও পটভূমির বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে প্রতিটি বস্তু; সূর্য, চাঁদ এবং পৃথিবী সকলেই তাদের নিজস্ব অক্ষের উপর ঘোরে এবং একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে একে অপরের চারপাশে ঘোরে। কিন্তু মহান আল্লাহ ১৪০০ বছরেরও বেশি আগে এটি ঘোষণা করেছিলেন। পবিত্র কুরআনের সমস্ত বিজ্ঞান সম্পর্কিত আয়াত আজ বিজ্ঞানীরা ধীরে ধীরে প্রমাণ করছেন। এটি একটি বিশাল প্রমাণ যা প্রমাণ করে যে পবিত্র কুরআন একমাত্র সত্য ঈশ্বর, মহান আল্লাহ, যিনি এই মহাবিশ্ব এবং এর মধ্যে থাকা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, কারণ কেবলমাত্র একজন স্রষ্টাই তার সৃষ্টিকে সত্যিকার অর্থে ব্যাখ্যা করতে পারেন।

পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করলে কেউ বুঝতে পারবে যে এতে সুস্পষ্ট এবং সূক্ষ্ম উভয় অর্থের মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠত্বের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সূরা ১১ হুদ, আয়াত ১:

"...[এটি] এমন একটি কিতাব যার আয়াতসমূহ পরিপূর্ণ করা হয়েছে এবং তারপর বিশদভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে [একজন] প্রজ্ঞাময় ও অবগত ব্যক্তির কাছ থেকে।"

পবিত্র কুরআনের বাক্যাংশগুলি অতুলনীয় এবং এর অর্থগুলি সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর শব্দ এবং আয়াতগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অন্য কোনও গ্রন্থ এটিকে অতিক্রম করতে পারে না। পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী জাতিগুলির ইতিহাস বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছে যদিও মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) ইতিহাসে শিক্ষিত ছিলেন না। এটি প্রতিটি সৎকাজের আদেশ দেয় এবং প্রতিটি মন্দকে নিষেধ করে। যা একজন ব্যক্তি এবং সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে, যাতে ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা এবং শান্তি প্রতিটি ঘর এবং সম্প্রদায়ে ছড়িয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআন অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা যেকোনো মিথ্যা এড়িয়ে চলে, কবিতা, গল্প এবং উপকথার বিপরীতে। সমস্ত আয়াত উপকারী এবং ব্যবহারিকভাবে একজনের জীবনে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এমনকি যখন পবিত্র কুরআনে একই গল্প পুনরাবৃত্তি করা হয়, তখনও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরা হয়। অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থের বিপরীতে, পবিত্র কুরআন বারবার অধ্যয়ন করলে একজন ব্যক্তিকে বিরক্ত করে না। পবিত্র কুরআন প্রতিশ্রুতি এবং সতর্কীকরণ প্রদান করে এবং অনস্বীকার্য এবং স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে তাদের সমর্থন করে। পবিত্র কুরআন যখন এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে যা বিমূর্ত বলে মনে হতে পারে, যেমন ধৈর্য অবলম্বন করা, তখন এটি সর্বদা এটিকে তার জীবনে বাস্তবায়নের একটি সহজ এবং ব্যবহারিক উপায় প্রদান করে। এটি মানুষকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে উৎসাহিত করে, যার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে, যার ফলে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে। এটি উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং প্রকৃত সাফল্য কামনাকারী ব্যক্তির জন্য সরল পথকে স্পষ্ট এবং আকর্ষণীয় করে তোলে। পবিত্র কুরআনের জ্ঞান চিরন্তন কারণ এটি প্রতিটি সমাজ এবং যুগে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি প্রতিটি মানসিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক সমস্যার জন্য একটি নিরাময় যখন এটি সঠিকভাবে বোঝা এবং প্রয়োগ করা হয়। এটি একজন ব্যক্তি বা সমগ্র সমাজের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি সমস্যার সমাধান প্রদান করে। কেবল ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করা এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা বাস্তবায়নকারী সমাজগুলি কীভাবে এর সর্বব্যাপী এবং কালজয়ী শিক্ষা থেকে সঠিকভাবে উপকৃত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। শতাব্দী পেরিয়ে গেছে কিন্তু পবিত্র কুরআনের একটি অক্ষরও পরিবর্তন করা হয়নি, যেমনটি আল্লাহ তাআলা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিলেন। ইতিহাসের অন্য কোনও গ্রন্থে এই গুণটি নেই। অধ্যায় ১৫ আল হিজর, আয়াত ৯:

"নিশ্চয়ই, আমরাই বাণী [অর্থাৎ, কুরআন] নাযিল করেছি এবং অবশ্যই, আমরাই এর রক্ষণাবেক্ষণকারী।"

মহান আল্লাহ তাআলা একটি সমাজের মূল সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সেগুলোর সকলের বাস্তব প্রতিকারের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। মূল সমস্যাগুলো সংশোধন করার মাধ্যমে, এগুলো থেকে উদ্‌ভূত অসংখ্য শাখা-প্রশাখার সমস্যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধন হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআন এভাবেই একজন ব্যক্তি এবং সমাজের উভয় জগতে সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ের সমাধান করেছে। সূরা আন নাহল, আয়াত ৮৯:

"...এবং আমরা আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি সবকিছুর স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ..."

এটি মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর দান করা সর্বশ্রেষ্ঠ কালজয়ী অলৌকিক ঘটনা। কিন্তু যারা সত্যের সন্ধান করে এবং তার উপর আমল করে, কেবল তারাই এর দ্বারা উপকৃত হবে, আর যারা তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং এর থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করে, তারা উভয় জগতেই কেবল ক্ষতির সম্মুখীন হবে। অধ্যায় ১৭ আল-ইসরা, আয়াত ৮২:

"আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাজিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু এটি জালেমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।"

যদিও পবিত্র কুরআনের অনেক আদেশ মানুষ বুঝতে পারে না, তবুও এর অর্থ এই নয় যে সেগুলি ভুল। পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত, যার জ্ঞান মানুষের কাছে গোপন ছিল, সমাজ যখন একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছেছিল তখন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেহেতু পুরো পবিত্র কুরআন জ্ঞান এবং নির্দেশনার একটি গ্রন্থ, তাই কেউ এর আদেশগুলি বুঝতে পারুক বা না বুঝুক, তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। এই পরিস্থিতি ঠিক এমন একটি শিশুর মতো যে ঠান্ডা লাগায় ভুগছে এবং আইসক্রিম খেতে চায় কিন্তু তার পিতামাতা তাকে তা দেয় না। শিশুটি পিছনের জ্ঞান না বুঝে কাঁদতে থাকবে কিন্তু যাদের জ্ঞান আছে তারা পিতামাতার সাথে একমত হবে, যদিও বাহ্যিকভাবে মনে হয় যেন পিতামাতার সিদ্ধান্ত শিশুর প্রতি অন্যায় করছে। অতএব, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং সম্প্রসারণে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য গ্রহণ এবং তার উপর কাজ করা উচিত, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। তাদের একজন জ্ঞানী রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং তার উপর কাজ করে, জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা দেওয়া হয়। এই জ্ঞানী রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণকারী এবং তার উপর আমলকারী ব্যক্তিও ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন। কারণ একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার জ্ঞান কখনোই এই ফলাফল অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে না, যদিও সমস্ত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তাদের জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার কারণে সকল ধরণের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসের আকারে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্যটি তখন স্পষ্ট হয় যখন কেউ দেখে যে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি কে ব্যবহার করে এবং কে ব্যবহার করে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা

তাদের প্রেসক্রাইব করা ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝেন না এবং তাই অন্ধভাবে তাদের ডাক্তারের উপর বিশ্বাস করেন, তবুও মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষার উপর চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে লোকেরা অন্ধভাবে ইসলামের শিক্ষার উপর বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

এবং সম্পদের লোভ

মক্কার অমুসলিম নেতারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সাঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করার একটি প্রধান কারণ ছিল, যদিও তারা তাদের সত্যবাদিতার প্রতি নিশ্চিত ছিল, কর্তৃত্ব এবং সম্পদের প্রতি তাদের লোভ। আরব উপদ্বীপে নেতারা আল্লাহর ঘর, মহিমান্বিত কাবার রক্ষক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন এবং এর ফলে ব্যবসায়িক সুযোগ এবং সম্পদ অর্জনের অন্যান্য উপায় তৈরি হয়েছিল, যেমন তাদের বাণিজ্য কাফেলাগুলি হাইওয়ে ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা করা। তাই তারা ভয় পেয়েছিলেন যে তারা ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের নেতৃত্ব এবং সম্পদ হারাতে হবে। অধ্যায় ২৮ আল কাসাস, আয়াত ৫৭:

"আর তারা [কুরাইশরা] বলে, "আমরা যদি তোমার সাথে হেদায়েতের অনুসরণ করি, তাহলে আমাদের দেশ থেকে উচ্ছেদ করা হবে।" আমরা কি তাদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল স্থাপন করিনি যেখানে আমাদের পক্ষ থেকে রিযিক হিসেবে সকল কিছুর ফলমূল আনা হয়? কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।"

জামে আত তিরমিযীতে ২৩৭৬ নম্বর হাদিসে মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, সম্পদ ও মর্যাদার প্রতি আকুলতা ঈমানের জন্য দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ভেড়ার পালের উপর ছেড়ে দেওয়া ধ্বংসের চেয়েও বেশি ধ্বংসাত্মক।

এ থেকে বোঝা যায় যে, পৃথিবীতে সম্পদ ও খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা থাকলে খুব কমই কোন মুসলিমের ঈমান নিরাপদ থাকে, ঠিক যেমন দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ের হাত থেকে কোন ভেড়া রক্ষা পাবে। তাই এই মহান উপমায় পৃথিবীতে অতিরিক্ত সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার আকাঙ্ক্ষার মন্দের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কীকরণ রয়েছে।

প্রথম ধরণের সম্পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা হলো যখন কেউ সম্পদের প্রতি অত্যধিক ভালোবাসা পোষণ করে এবং বৈধ উপায়ে তা অর্জনের জন্য ক্লান্তিহীনভাবে চেষ্টা করে। এই ধরণের আচরণ করা একজন জ্ঞানী ব্যক্তির লক্ষণ নয়, কারণ একজন মুসলিমের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের রিজিক তাদের জন্য নিশ্চিত এবং এই বন্টন কখনও পরিবর্তন হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছরেরও বেশি আগে সৃষ্টির রিজিক বরাদ্দ করা হয়েছিল। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে তাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব অবহেলা করবে কারণ তারা সম্পদ অর্জনে অত্যধিক ব্যস্ত থাকে। যে ব্যক্তি সম্পদ অর্জনে অত্যধিক ব্যস্ত থাকে সে কখনই পরকালের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হবে না, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যক্তি আরও সম্পদ অর্জনের জন্য এত বেশি প্রচেষ্টা করবে যে তারা তা উপভোগ করার সুযোগও পাবে না। পরিবর্তে, তারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে এবং অন্যদের উপভোগ করার জন্য এটি রেখে যাবে, যদিও তাদের এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এই ব্যক্তি বৈধভাবে সম্পদ অর্জন করতে পারে কিন্তু তবুও তারা মানসিক শান্তি পাবে না কারণ তারা যতই সম্পদ অর্জন করুক না কেন, তারা কেবল আরও বেশি কামনা করবে। এই ব্যক্তি অভাবী এবং তাই, তাদের প্রচুর সম্পদ থাকলেও, তারা একজন প্রকৃত দরিদ্র। যেহেতু আরও সম্পদের জন্য প্রচেষ্টা করার অর্থ হল আরও বেশি পার্থিব দরজা এবং ব্যস্ততা খোলা, তারা যত বেশি তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করবে, ততই তারা মানসিক এবং শারীরিক শান্তি পাবে। এবং তারা তাদের ভাগ্য অর্জনের জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভুলে যায়, কেবল সেই আল্লাহর দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন] এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।"

একমাত্র উপকারী আকাঙ্ক্ষা হল প্রকৃত সম্পদ সঞ্চয় করার আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ পুনরাগমনের দিনের প্রস্তুতির জন্য সৎকর্মের আকাঙ্ক্ষা।

দ্বিতীয় ধরণের সম্পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রথম ধরণের অনুরূপ, তবে এর পাশাপাশি এই ধরণের ব্যক্তি অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করে এবং মানুষের অধিকার, যেমন ফরজ দান, পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অনেক হাদিসে এর বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৬ নম্বর হাদিসে তিনি সতর্ক করেছেন যে এই মনোভাব অতীতের জাতিগুলিকে ধ্বংস করেছে কারণ তারা অবৈধ জিনিসগুলিকে হালাল করেছে, অন্যদের অধিকার হরণ করেছে এবং অতিরিক্ত সম্পদের জন্য অন্যদের হত্যা করেছে। এই ব্যক্তি সেই সম্পদের জন্য প্রচেষ্টা করে যার অধিকার তাদের নেই যা অসংখ্য বড় পাপের দিকে পরিচালিত করে। যখন কেউ এই মনোভাব গ্রহণ করে তখন তারা তীব্র লোভী হয়ে ওঠে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক সতর্ক করা হয়েছে যে, জামে আত তিরমিযী, ১৯৬১ নম্বর হাদিসে লোভী ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসায়ীর ৩১১৪ নম্বর হাদিসে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, একজন প্রকৃত মুসলিমের অন্তরে চরম লোভ এবং প্রকৃত ঈমান কখনোই একত্রিত হতে পারে না।

যদি কোন মুসলিম এই ধরণের আকাঙ্ক্ষা গ্রহণ করে, তাহলে এর চরম বিপদ একজন অশিক্ষিত মুসলিমের কাছেও স্পষ্ট। এটি তাদের ঈমানকে ধ্বংস করে দেবে যতক্ষণ না সামান্য কিছু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আলোচ্য মূল হাদিসে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, তেমনি একজনের ঈমানের এই ধ্বংস দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ভেড়ার পালের উপর ছেড়ে দেওয়া ধ্বংসের চেয়েও ভয়াবহ। এই

মুসলিম তাদের মৃত্যুর মুহূর্তে তাদের সামান্য ঈমান হারানোর ঝুঁকিতে থাকে, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

একজন ব্যক্তির খ্যাতি এবং মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা অতিরিক্ত সম্পদের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে তার বিশ্বাসের জন্য বেশি ধ্বংসাত্মক। একজন ব্যক্তি প্রায়শই খ্যাতি এবং সামাজিক মর্যাদা অর্জনের জন্য তার প্রিয় সম্পদ ব্যয় করে।

এমনটা বিরল যে কেউ মর্যাদা ও খ্যাতি অর্জন করে এবং তারপরও সঠিক পথে অটল থাকে, যার ফলে তারা বস্তুগত জগতের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেয়। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারীতে (৬৭২৩) একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সমাজে নেতৃত্বের মতো মর্যাদার সন্ধান করে, তাকে নিজেই তা মোকাবেলা করতে হবে, কিন্তু যদি কেউ তা না চেয়েই পায়, তাহলে মহান আল্লাহ তাকে তাঁর আনুগত্য করতে সাহায্য করবেন। এই কারণেই নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এমন কাউকে নিয়োগ করতেন না যে কর্তৃত্বের পদে নিযুক্ত হতে চেয়েছিল অথবা এমনকি এর জন্য আকাঙ্ক্ষাও দেখিয়েছিল। সহীহ বুখারীতে (৬৯২৩) একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সহীহ বুখারীতে (৭১৪৮) আরেকটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব অর্জনের জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু কিয়ামতের দিন এটি তাদের জন্য বিরাট অনুশোচনার বিষয় হবে। এটি একটি বিপজ্জনক আকাঙ্ক্ষা কারণ এটি একজনকে এটি অর্জনের জন্য তীব্র প্রচেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং তারপরে এটি ধরে রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টা করতে বাধ্য করে, এমনকি যদি এটি তাদের অত্যাচার এবং অন্যান্য পাপ করতে উৎসাহিত করে।

ধর্মের মাধ্যমে যখন কেউ মর্যাদা লাভ করে, তখনই সবচেয়ে খারাপ ধরণের মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৬৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করে বলেছেন যে, এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

অতএব, একজন মুসলিমের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা এড়িয়ে চলাই নিরাপদ। কারণ এই দুটি জিনিস তাদের ঈমানের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা তাদেরকে পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা।

অধিকন্তু, মক্কার অমুসলিমদের তাদের সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদা হারানোর ভয় ইসলাম প্রত্যাখ্যান করার যথেষ্ট কারণ ছিল না কারণ মহান আল্লাহ তাদের মূর্তিপূজক থাকাকালীন সুরক্ষা এবং সম্পদ উভয়ই দিয়েছিলেন, তাহলে কেন তিনি তাদের এই জিনিসগুলি প্রদান করবেন না যখন তারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করত? অধ্যায় ১০৬ কুরাইশ, আয়াত ১-৪:

"কুরাইশদের অভ্যস্ত নিরাপত্তার জন্য। শীত ও গ্রীষ্মের কাফেলায় তাদের অভ্যস্ত নিরাপত্তার জন্য। তারা যেন এই ঘরের প্রভুর উপাসনা করে। যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে আহার দিয়েছেন এবং ভয় থেকে নিরাপদ করেছেন।"

পরিশেষে, যখন কোন ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তার উপর আমল করে, তখন সমাজ এবং এমনকি তার আত্মীয়স্বজনদের দ্বারাও তাকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে, কিন্তু এটি তাদের লক্ষ্য থেকে বিরত রাখা উচিত নয়। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে দৃঢ় থাকে, তাকে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি প্রদান করা হবে, কারণ একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, যার মধ্যে রয়েছে মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল। এবং এটি

মানুষকে খুশি করার সময় তাঁর অবাধ্যতা করে যে কোনও পার্থিব আশীর্বাদ অর্জনের চেয়ে অনেক ভালো। যারা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে এবং যারা করে না তাদের দেখলে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যারা তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করে, তাদের আল্লাহ তায়ালা রক্ষা করবেন, যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে, যারা মানুষকে খুশি করার সময় তাঁর অবাধ্যতা করে, তারা আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি মানসিক শান্তি কামনা করে, তাহলে তাদের ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে মহান আল্লাহ তায়ালাকে খুশি করার চেষ্টা করা উচিত।

সত্যের প্রতি আন্তরিক

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে, দিমাদ (রাঃ) কে একজন জাদুকর হিসেবে বিবেচনা করা হত যিনি কালো জাদুতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সুস্থ করতে পারতেন। যখন তিনি মক্কার অমুসলিমদের কাছ থেকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে কালো জাদুতে আক্রান্ত বলে অভিযোগ করতে শুনলেন, তখন তিনি তাকে সুস্থ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। যখন তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে খুঁজে পেলেন এবং তাঁর সেবা প্রদান করলেন, তখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বললেন: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি; এবং আল্লাহ যাকে সঠিক পথ দেখান তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই, এবং যাকে পথভ্রষ্ট করা হয় তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই, এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।" দিমাদ (রাঃ) তাকে তার বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করতে বললেন এবং তিনবার তা করার পর দিমাদ (রাঃ) উত্তর দিলেন যে এগুলো কোন গণক, যাদুকর বা কবির কথা নয়। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সহীহ মুসলিম, ২০০৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

দিমাদ, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, এমন জটিল বা গভীর আধ্যাত্মিক বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেননি যা তাকে অবাক করে এবং ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তাকে নিশ্চিত করার জন্য কোনও অলৌকিক ঘটনা দেখানো হয়নি, তবুও তিনি সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং তার বিশ্বাস, আচরণ এবং জীবনযাত্রা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করেছিলেন। এর কারণ হল তিনি এমন একজন ছিলেন যিনি সত্য গ্রহণ করেছিলেন। যখন কেউ সত্য গ্রহণ করে এই ঘোষণা দিয়ে আন্তরিকতা গ্রহণ করে যে তারা সত্য গ্রহণ করবে এবং তাদের সর্বোত্তম ক্ষমতার সাথে তা অনুসরণ করবে, এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে, তখন এমনকি সরলতম সত্য, অন্যদের দ্বারা উপেক্ষিত সত্যগুলিও তাদের সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দেবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আসে, তার ইচ্ছা অনুসারে কী গ্রহণ করবে এবং কী

অনুসরণ করবে এবং কী উপেক্ষা করবে তা বেছে নেওয়ার সময়, সে কখনই সঠিকভাবে সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না, এমনকি যদি তারা মুসলিম হয়। এই আন্তরিকতার কারণেই ইতিহাসে অনেক মানুষ গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নয়, সবচেয়ে সহজতম জিনিসের মুখোমুখি হওয়ার পরেও ইসলাম গ্রহণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ কেবল আকাশ এবং পৃথিবীর প্রতিফলনের মাধ্যমে এক ঈশ্বরের বাস্তবতা গ্রহণ করতে পারে। যখন কেউ মহাবিশ্বের মধ্যে অসংখ্য সুষম ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, যেমন সূর্য থেকে পৃথিবী পর্যন্ত নিখুঁত দূরত্ব, জলচক্র, সমুদ্রের ঘনত্ব যা জাহাজগুলিকে তাদের উপর দিয়ে চলাচল করতে দেয় এবং সমুদ্রের জীবনকে তাদের মধ্যে বিকশিত হতে দেয়, এবং আরও অনেক কিছু, তারা একজন স্রষ্টার হাত পর্যবেক্ষণ করবে। এত নিখুঁত সুষম ব্যবস্থা এলোমেলো ঘটনার পরিণতি হতে পারে না। উপরন্তু, যদি একাধিক ঈশ্বর থাকে তবে এটি বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করবে কারণ প্রতিটি ঈশ্বর মহাবিশ্বের মধ্যে ভিন্ন কিছু কামনা করবেন। এটি স্পষ্টতই ঘটনা নয় এবং তাই একক ঈশ্বর, মহান আল্লাহকে নির্দেশ করে। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 22:

"যদি তাদের মধ্যে [অর্থাৎ, আসমান ও জমিনের] আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত..."

অতএব, যারা আন্তরিকভাবে এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে এবং পূরণ করতে চায়, তারা সহজেই ইসলামের শিক্ষা খুঁজে পাবে, চিনতে পারবে, গ্রহণ করতে পারবে এবং তার উপর আমল করতে পারবে। কিন্তু যারা এই পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে চায় না এবং কেবল তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায়, তারা ইসলামের শিক্ষা মেনে চলবে না, এমনকি যদি তারা মুসলিমও হয়। অতএব, মুসলমানদের এই আন্তরিকতা অবলম্বন করার চেষ্টা করা উচিত, কারণ ইসলামকে সঠিকভাবে অনুসরণ না করে সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব নয়।

ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া

মক্কার অমুসলিমদের আগ্রাসন যখন বৃদ্ধি পেল, তখন তারা অসহায় এবং সামাজিকভাবে দুর্বল সাহাবীদের উপর আক্রমণ শুরু করল, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। যদিও কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে যুদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, তিনি তাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার এবং তাদের অত্যাচারীদের ক্ষমা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রাঃ)-এর "নবী (সাঃ)-এর নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মক্কার অমুসলিমদের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ অবস্থান গ্রহণের পেছনে একটি প্রজ্ঞা ছিল সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, মানুষ এবং সমস্যার মোকাবেলা করার সময় ধৈর্য ধারণ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া। তাদেরকে আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদেশ মেনে নেওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল, এমনকি যদি তা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাংঘর্ষিক হয়।

মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করলে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে, এমনকি সেই সাহাবীদের বিরুদ্ধেও, যারা গোত্রীয় সুরক্ষার অধীনে ছিলেন, প্রাণঘাতী শক্তি প্রয়োগের জন্য আরও বেশি কারণ পেত। এটি ইসলামের প্রচারের লক্ষ্যকে যুদ্ধের দিকে ঘুরিয়ে দিত।

মক্কার অভ্যন্তরে যুদ্ধের ফলে নিরীহ মানুষদের হত্যা করা হত যারা সাহাবীদের প্রতি দেখানো আগ্রাসনের সাথে সরাসরি জড়িত ছিল না, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ এবং হত্যা করলে তাদের ভাগ্যও জাহান্নামে পরিণত হত। ধৈর্য ধারণের ফলে এই হিংস্র অমুসলিমদের অনেককে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল, যেমন উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ এবং হত্যা তাদের আত্মীয়দের ক্রোধে উন্মত্ত করে তুলত, যারা ইসলাম গ্রহণের প্রতি আগ্রহী ছিল। প্রতিশোধের অনুভূতি তাদের ইসলাম গ্রহণের প্রবণতাকে কাটিয়ে উঠতে পারে, যার ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ করতে পারেনি।

আগ্রাসনের মুখে ধৈর্য প্রদর্শনের ফলে কিছু শক্তিশালী অমুসলিম তাদের মুসলিম আত্মীয়দের গোত্রীয় আনুগত্যের কারণে সুরক্ষা প্রদান করতে উৎসাহিত হয়েছিল। সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, যদি মক্কার অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতেন, তাহলে এই পরিস্থিতি অদৃশ্য হয়ে যেত।

যুদ্ধের ফলে কেবল মুসলিমদের সংখ্যাই কমে যেত, যা আরব উপদ্বীপ জুড়ে ইসলামের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল।

অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা হিসেবেও ব্যবহার করা হত, কারণ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হত যে তিনি

কেবল দেশে কর্তৃত্ব চাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ইতিহাস দেখায় যে, যারা কেবল ক্ষমতার সন্ধান করত তাদের অনেকেই দ্রুত সহিংসতার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, ধৈর্যের এই সময়ে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হচ্ছিলেন, যার ফলে তাদের ঐক্য আরও দৃঢ় হচ্ছিল।

মহান আল্লাহ কেন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে মক্কায় থাকাকালীন যুদ্ধ না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তার পিছনে আরও অনেক কারণ এবং প্রজ্ঞা রয়েছে।

ইথিওপিয়ায় প্রথম অভিবাসন

মক্কার অমুসলিমদের সামাজিকভাবে দুর্বল সাহাবীদের উপর নির্যাতন বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের কয়েকজনকে ইথিওপিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দেন। তিনি তাদের পরামর্শ দেন যে তাদের রাজা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এবং তারা সেখানে নির্যাতনের সম্মুখীন হবে না। অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন, তাদের পরিবার, ব্যবসা এবং ঘরবাড়ি সবকিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রেখে চলে যান। ইমাম ইবনে কাথিরের "নবীজীর জীবনী", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১-২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ মুসলিমদের কাছ থেকে সেইসব অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার দাবি করেন না যা মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রা.)-এর উপর বর্ষিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, এই ঘটনাটি যেখানে কিছু সাহাবী (রা.)-এর ইথিওপিয়ায় হিজরতের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তুলনামূলকভাবে, মুসলিমরা বর্তমানে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে, তা পূর্বসূরীদের মতো কঠিন নয়। অতএব, মুসলমানদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে তাদের কেবল কয়েকটি ছোট ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, যেমন ফজরের ফরজ নামাজ আদায়ের জন্য কিছু ঘুম এবং ফরজ দান করার জন্য কিছু সম্পদ উৎসর্গ করতে হবে। মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ঘরবাড়ি ও পরিবার পরিজন ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন না। এই কৃতজ্ঞতা বাস্তবে দেখানো উচিত, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের আশীর্বাদ ব্যবহার করে।

এছাড়াও, যখন কোন মুসলিম সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন তাদের মনে রাখা উচিত যে, নবী-রাসূলগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং কীভাবে তারা আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে সেগুলো কাটিয়ে উঠেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এই জ্ঞান একজন মুসলিমকে তাদের সমস্যা কাটিয়ে ওঠার শক্তি প্রদান করতে পারে কারণ তারা জানে যে, নবী-রাসূলগণ আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন, তবুও তারা ধৈর্যের সাথে আরও কঠোর সমস্যা সহ্য করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে ইবনে মাজাহের ৪০২৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণ (সাঃ) সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা সহ্য করেছেন এবং নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

যদি কোন মুসলিম পূর্বসূরীদের ন্যায়পরায়ণ মনোভাব অনুসরণ করে, তাহলে আশা করা যায় যে পরকালে তারাও তাদের সাথেই থাকবে।

আলোচ্য মূল ঘটনাটি এই বিষয়টিও বোঝার গুরুত্বকে নির্দেশ করে যে ইসলাম উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জনের জন্য মানুষের কাছ থেকে ত্যাগ দাবি করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একজন ব্যক্তি ত্যাগ ছাড়া পার্থিব সাফল্য, যেমন ডাক্তার হওয়া, অর্জন করতে পারে না এবং ত্যাগ ছাড়া উভয় জগতে মানসিক শান্তির অমূল্য উপহারও অর্জন করতে পারে না। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম এই ভুল করে যে কেবল মৌখিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেই উভয় জগতে মানসিক শান্তির অমূল্য আশীর্বাদ পাওয়া যায়। এটি একটি অদ্ভুত মনোভাব কারণ তারা বোঝে যে ত্যাগ ছাড়া পার্থিব সাফল্য আসে না তবুও তারা ত্যাগ এবং প্রচেষ্টা ছাড়াই উভয় জগতে মানসিক শান্তি পাওয়ার আশা করে। অধ্যায় ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ২:

"মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না?"

এই বিভ্রান্তিকর মনোভাব ত্যাগ করতে হবে এবং তারা যে স্তরের মানসিক প্রশান্তি পেতে চায় সেই স্তর অনুসারে মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তারা যত বেশি মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, তত বেশি তাদের মানসিক প্রশান্তি দেওয়া হবে। কেউ যা দান করবে, তাই তারা পাবে, এটা এত সহজ। ৪৭ অধ্যায় মুহাম্মদ, আয়াত ৭:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করবেন।"

সহানুভূতি অনুভব করা

যখন সাহাবীদের একটি দল, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, ইথিওপিয়ায় হিজরতের জন্য মক্কা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন উমর ইবনে খাত্তাব, যিনি তখনও একজন অমুসলিম ছিলেন, তাদের কার্যকলাপ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তারা তাকে বলেন যে তারা মক্কা ছেড়ে যাচ্ছেন কারণ তারা তাঁর এবং অন্যান্য অমুসলিমদের উপর বিরক্ত, যারা তাদের উপর ক্রমাগত নির্যাতন চালাচ্ছিল। তার স্বাভাবিক কঠোরতা দেখানোর পরিবর্তে, উমর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, এমন কিছু সদয় কথা বলেছিলেন যা তাদের মনে করিয়ে দিয়েছিল যে তিনি তাদের মিস করবেন। এটি ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, তাঁর জীবন ও সময়, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৯-৫০-এ আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও উমর (রাঃ) তাদের প্রতি কঠোর ছিলেন, তবুও তার কঠোরতা মন্দতার মধ্যে নিহিত ছিল না, বরং এর মূলে ছিল মক্কার অমুসলিমদের প্রতি ভুল আনুগত্য এবং তাদের বিপথগামী পথ। মনে হচ্ছে, তিনি কেবল সেইভাবে আচরণ করেছিলেন যেমনটি তিনি চেয়েছিলেন যে তাঁর জনগণ ঐক্যবদ্ধ হোক, যেমনটি ইসলামের আগমনের আগে ছিল।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, অন্যদের প্রতি এই ধরণের সহানুভূতিশীলতা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সম্ভবত এটিই প্রথম আবেগ যা উমর (রাঃ) কে ইসলামের প্রতি তার মনোভাব পুনর্বিবেচনা করতে উৎসাহিত করেছিল, কারণ তার আচরণ তার নিজের লোকদের তাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। অন্যদিকে, মক্কার অন্যান্য অমুসলিমদের অনেকেই কেবল সম্পদ এবং কর্তৃত্বের লোভে তাদের জীবনধারা রক্ষা করার বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন, যা ইসলাম চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং তাই তারা বিদায়ী সাহাবীদের (রাঃ) উপর আনন্দিত হয়েছিল, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে, মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের কোন অংশ যদি ব্যথা পায়, তাহলে বাকি অংশও তার ব্যথায় শরীক হয়।

এই হাদিসটি, অন্যান্য অনেক হাদিসের মতো, নিজের জীবনে এতটা মগ্ন না হয়ে এমন আচরণ করার গুরুত্ব নির্দেশ করে যেন মহাবিশ্ব তাদের এবং তাদের সমস্যাগুলির চারপাশে ঘোরে। শয়তান একজন মুসলিমকে তাদের নিজের জীবন এবং তাদের সমস্যাগুলির উপর এত বেশি মনোযোগ দিতে অনুপ্রাণিত করে যে তারা বৃহত্তর চিত্রের উপর মনোযোগ হারিয়ে ফেলে যা তাদের অধৈর্যের দিকে পরিচালিত করে এবং তাদের অন্যদের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের সামর্থ্য অনুসারে অন্যদের সহায়তা করার দায়িত্বে ব্যর্থ হয়। একজন মুসলিমের সর্বদা এটি মনে রাখা উচিত এবং যতটা সম্ভব অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত। এটি আর্থিক সাহায্যের বাইরেও বিস্তৃত এবং এর মধ্যে সমস্ত মৌখিক এবং শারীরিক সাহায্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন ভাল এবং আন্তরিক পরামর্শ।

মুসলিমদের উচিত নিয়মিত সংবাদ এবং বিশ্বজুড়ে যারা কঠিন পরিস্থিতিতে আছেন তাদের প্রতি নজর রাখা। এটি তাদেরকে আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্মমগ্ন না হয়ে অন্যদের সাহায্য করার জন্য অনুপ্রাণিত করবে। বাস্তবে, যে কেবল নিজের কথা চিন্তা করে সে পশুর চেয়েও নিম্ন স্তরের, কারণ সে তার সন্তানদেরও যত্ন করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলিমের উচিত তার নিজের পরিবারের বাইরে অন্যদের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে পশুর চেয়েও উত্তম হওয়া।

এই হাদিসটি ইসলামে ঐক্য ও সাম্যের গুরুত্বকেও নির্দেশ করে, কারণ একজনকে অবশ্যই অন্য মুসলমানদের তাদের সামর্থ্য অনুসারে সাহায্য করতে হবে, তাদের লিঙ্গ, জাতিগততা বা অন্য কিছু নির্বিশেষে।

যেভাবে একজন ব্যক্তি নিজের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে চান, ঠিক সেভাবেই অন্যদের সাথেও আচরণ করার চেষ্টা করতে হবে, কারণ মূল হাদিসটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, একজন মুসলিমের জন্য দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হওয়া বা অন্য কোন মুসলিমের দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হওয়া - এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটি একই রকম।

পরিশেষে, যদিও একজন মুসলিম পৃথিবীর সকল সমস্যা দূর করতে পারে না, তবুও তারা তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তাদের সামর্থ্য অনুসারে অন্যদের সাহায্য করতে পারে কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা এটাই আদেশ করেন এবং আশা করেন।

উপরন্তু, আলোচ্য মূল ঘটনাটি এই বিষয়টিও নির্দেশ করে যে এই পৃথিবীতে নিজের উদ্দেশ্য গ্রহণ করা এবং পূরণ করা আত্মীয়তা এবং বন্ধুত্বের বন্ধন সহ অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে বড়। মনে হয় এটি এমন একটি বিষয় যা উমর (রাঃ) পরে বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাই এটিই ছিল তার ইসলাম গ্রহণের একটি কারণ। প্রকৃত সুখ এবং মানসিক শান্তি পার্থিব জিনিসপত্র এবং সম্পর্কের মধ্যে নিহিত নয়। এটি কেবল এই পৃথিবীতে নিজের উদ্দেশ্য পূরণের মধ্যে নিহিত, যা হল আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, যা তাকে সঠিকভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। কেবলমাত্র এটিই একজনকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেওয়ার অনুমতি দেবে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করতে পারে। এটিই

একটি অর্থপূর্ণ জীবনযাপনের একমাত্র উপায়। অতএব, যে ব্যক্তি তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করে না সে অর্থহীন জীবনযাপন করবে, এমনকি যদি তারা পার্থিব সাফল্যও পায়। তাই পার্থিব জিনিসগুলিকে নিজের উদ্দেশ্যের উপরে স্থান দেওয়া তাদের তাদের উদ্দেশ্য পূরণে বাধা দেবে এবং তাই এটি তাদের মানসিক শান্তি এবং একটি মূল্যবান অস্তিত্ব অর্জনে বাধা দেবে। যারা তাদের সমস্ত সময়, শক্তি এবং সম্পদ পার্থিব জিনিসের জন্য উৎসর্গ করে, যেমন মানুষকে খুশি করা বা নিজেদের ইচ্ছা পূরণ করা, তাদের দেখলে এটি বেশ স্পষ্ট হয়।

বিশ্বাসের জন্য ত্যাগ স্বীকার

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে, মুস'আব বিন উমাইর (রাঃ) একজন ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন এবং তাই তিনি বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। ইসলাম গ্রহণের পর তার পরিবার তাকে বন্দী করে কারাগারে রাখে, যতক্ষণ না তিনি পালিয়ে অন্যান্য সাহাবীদের সাথে ইথিওপিয়ায় হিজরত করতে সক্ষম হন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। পরে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন এবং তার দৃঢ় ঈমানের কারণে তিনি তার বাকি জীবন দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়ে দেন। ইমাম মুহাম্মদ কান্ধলভীর "হায়াতুস সাহাবা", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুস'আব (রাঃ) বিলাসবহুল জীবনের চেয়ে দারিদ্র্যকে গ্রহণ করেছিলেন কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে একজন ব্যক্তি সবচেয়ে মূল্যবান পার্থিব জিনিস যা পেতে পারেন তা হল মনের শান্তি। পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে এবং তার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করে এটি অর্জন করা যায় না। ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ করলে এবং তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করেও কীভাবে চাপ ও হতাশাগ্রস্ত জীবনযাপন করে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনের শান্তি কেবল তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করার এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিক স্থানে স্থাপন করার মধ্যেই নিহিত। মানুষ যতই জ্ঞান অর্জন করুক না কেন, তারা কখনই পর্যাপ্ত জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না যাতে মনের শান্তির দিকে পরিচালিত করে এমন নিখুঁত আচরণবিধি তৈরি করা যায়। অতএব, এই নিখুঁত আচরণবিধি কেবলমাত্র সেই সত্তার কাছ থেকে আসতে পারে যিনি সবকিছু জানেন: মহান আল্লাহ। অতএব, উভয় জগতে মানসিক শান্তি পেতে চাইলে, ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে, এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। তাদের অবশ্যই একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, কারণ তারা জানেন যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

কিন্তু যদি তারা এটি করতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে সেই বোকা রোগীর মতো আচরণ করে যে তাদের ডাক্তারের পরামর্শ উপেক্ষা করে, কারণ এটি তাদের আকাঙ্ক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে, তাহলে এটি তাদের কেবল মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের অবনতির দিকে পরিচালিত করবে, এমনকি যদি তাদের কাছে আনন্দের মুহূর্ত থাকে। অধ্যায় ৯ আত তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

দুটি পথ স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, এখন মানুষের উপর নির্ভর করছে তারা সিদ্ধান্ত নেবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি চায় কিনা এবং সেই অনুযায়ী কাজ করবে কিনা।

ইথিওপিয়ার বিশ্বাসীদের জন্য সমস্যা

নেতিবাচকতা এবং মিথ্যা বিশ্বাস সংশোধন

কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, ইথিওপিয়ায় হিজরত করার পর, মক্কার অমুসলিমদের নেতারা তাদের দুজন লোককে ইথিওপিয়ার রাজার কাছে পাঠান যাতে তার এবং সাহাবীদের মধ্যে সমস্যা তৈরি করা যায়, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তারা মিথ্যা কথার মাধ্যমে বাদশার হৃদয়ে সাহাবীদের প্রতি শত্রুতা এবং ঘৃণা ভরে দেওয়ার চেষ্টা করে। যেহেতু ইথিওপিয়ার রাজা খ্রিস্টান ছিলেন, তাই তারা দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন যে ইসলাম হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মা মরিয়ম (আঃ) কে অসম্মান করছে। কিন্তু যখন সাহাবীদের (আঃ) জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, তখন তারা সত্য কথা বলেছিলেন এবং রাজাকে পবিত্র কুরআন পাঠ করেছিলেন, যিনি তা শুনে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুওয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সাহাবীদের (আঃ) তাঁর দেশে শান্তিতে বসবাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাদের সাথে শ্রদ্ধা ও সদয় আচরণ করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫-৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের অবশ্যই অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলা এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি মানুষের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করে। সুনানে আবু দাউদের ৪৮৬০ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলার বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করেছেন, কারণ এটি মানুষের হৃদয়ে তাদের প্রতি বিদ্বেষের সৃষ্টি করে।

প্রায়শই দেখা যায় যে, পরিবারগুলো, বিশেষ করে এশীয় সম্প্রদায়ের পরিবারগুলো, সময়ের সাথে সাথে ভেঙে যায়। এটি পরিবারের সদস্যদের, যেমন বাবা-মায়ের, সবচেয়ে বড় অভিযোগ। তারা ভাবছেন যে, তাদের সন্তানরা কেন আলাদা হয়ে গেছে, যদিও তারা একসময় দৃঢ়ভাবে একসাথে ছিল।

আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সম্পর্ক ভাঙার অন্যতম প্রধান কারণ হল কেউ একজন ব্যক্তির আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলেছে। এটি প্রায়শই পরিবারের কোনও সদস্য করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মা তার অন্য সন্তানের সাথে তার ছেলে সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলবেন। এর ফলে দুই আত্মীয়ের মধ্যে শত্রুতা তৈরি হয় এবং সময়ের সাথে সাথে এটি দুজনের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে। যারা একসময় একই ব্যক্তির মতো ছিল তারা একে অপরের কাছে অপরিচিত হয়ে যায়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষ ফেরেশতা নয়। খুব কম সংখ্যক ব্যতীত, যখন একজন ব্যক্তির কাছে অন্য ব্যক্তির সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলা হয়, তখন তারা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়, এমনকি যদি তারা এটি ঘটতে না চায়। এই শত্রুতা তখনও ঘটে, এমনকি যদি প্রথম ব্যক্তিটি কারো আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলে, তার আত্মীয়দের মধ্যে ফাটল তৈরি করার ইচ্ছা না থাকে। কেউ কেউ প্রায়শই অভ্যাসের বাইরে এইভাবে কাজ করে এবং সম্পর্ক নষ্ট করার চেষ্টা করে না। উদাহরণস্বরূপ, বাবা-মা প্রায়শই এই অভ্যাসটি গ্রহণ করে এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে তারা তাদের সন্তানদের সম্পর্ক ভাঙতে বা ভেঙে যেতে চায় না।

এই মনোভাব মানুষের মানসিকতার উপর এতটাই মারাত্মক প্রভাব ফেলে যে, এটি সেই আত্মীয়দেরও প্রভাবিত করে যারা খুব কমই একে অপরের সাথে দেখা করে বা কথা বলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি তার আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলবে, যদিও তার আত্মীয় হয়তো তাদের দেশে বাস করে না।

এই আচরণ তাদের হৃদয়ে শত্রুতা তৈরি করে এবং সময়ের সাথে সাথে তারা দেখতে পাবে যে তারা তাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়কে অপছন্দ করে, যদিও তারা তাদের খুব কমই চেনে।

এই সমস্যাটি প্রায়শই ঘটে যখন দুজন ব্যক্তি অন্যদের সামনে অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলে। উদাহরণস্বরূপ, বাবা-মা তাদের সন্তানদের সামনে তাদের আত্মীয়দের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলতে পারেন। যদিও তারা তাদের সন্তানদের সরাসরি কিছু বলছেন না, তবুও এটি তাদের হৃদয়কে প্রভাবিত করে। কেউ যদি সত্যিই এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে অন্যদের প্রতি তাদের বেশিরভাগ খারাপ অনুভূতি সেই ব্যক্তি সরাসরি যা করেছে বা বলেছে তার কারণে নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, এটি ঘটেছিল তৃতীয় পক্ষের কারণে, যারা তাদের কাছে সেই ব্যক্তির সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু উল্লেখ করেছিল।

যখন কেউ অন্য কাউকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করার চেষ্টা করছে, তখন অন্য ব্যক্তির নাম নেতিবাচকভাবে উল্লেখ করা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য। যদি কেউ অন্য কাউকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছে, তাহলে তাদের উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে নেতিবাচক বিষয় উল্লেখ করা। এই সুন্দর মানসিকতার একটি উদাহরণ সহিহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে, সংখ্যা ৬৯৭৯। ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে নেতিবাচক বিষয় উল্লেখ করা কাউকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

পরিশেষে, মুসলিমদের তাদের আত্মীয়স্বজন বা অন্যদের সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রকাশ্যে নেতিবাচক কথা বলার আগে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। অন্যথায়,

তারা সময়ের সাথে সাথে তাদের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের বিচ্ছিন্ন এবং মানসিকভাবে একে অপরের থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে।

যে ব্যক্তি অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা শোনে, তার উচিত বক্তাকে গীবত করা থেকে বিরত থাকতে এবং তাদের কর্মের পরিণতি ব্যাখ্যা করতে সতর্ক করা। তাদের অবশ্যই একজন ব্যক্তির সম্পর্কে বলা নেতিবাচক কথার উপর মনোযোগ দেওয়া এড়িয়ে চলতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে একটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য একজন ব্যক্তির সম্পূর্ণ চরিত্রকে সংজ্ঞায়িত করে না। তাদের অবশ্যই যার সম্পর্কে নেতিবাচক কথা শুনেছে তার প্রতি ভালো আচরণ প্রদর্শন করতে হবে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার পূরণ করতে হবে। সহজ কথায়, একজনের উচিত অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যাতে সে অন্যদের দ্বারা আচরণ পেতে চায়। এইভাবে আচরণ করলে অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলার ফলে তার হৃদয়ে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে তা কমবে।

এছাড়াও, আলোচিত মূল অনুষ্ঠানে হযরত ঈসা (আঃ) কে সম্বোধন করা হয়েছিল।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রসারের কারণগুলির মধ্যে রয়েছে তাঁর অলৌকিক জন্ম, তাঁর জীবদ্দশায় সম্পাদিত অলৌকিক ঘটনা এবং তাঁর আসমানে আরোহণ। পবিত্র কুরআন হযরত ঈসা (আঃ)-এর অলৌকিক জন্মের সত্যতা নিশ্চিত করে এবং তাঁর পিতৃহীন জন্মকে মহান আল্লাহর অসীম শক্তির নিদর্শন হিসেবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪৭:

“তিনি [মারিয়াম, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট] বললেন, “হে আমার প্রতিপালক, আমার সন্তান কীভাবে হবে যখন কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি?” [ফেরেশতা] বললেন, “আল্লাহ এমনই; তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেন, তখন কেবল বলেন, ‘হও’, আর তা হয়ে যায়।”

মহান আল্লাহ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, ঠিক যেমন তিনি হযরত আদম আলাইহিস সালামকে পিতা বা মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। এই বাস্তবতার অর্থ এই নয় যে তারা ঐশ্বরিক। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৫৯:

"নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে ঈসার উদাহরণ আদমের মতো। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে বলেছেন, "হও", আর সে হয়ে গেল।"

এটা অদ্ভুত যে খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে হযরত ঈসা (আঃ) হলেন মহান আল্লাহর পুত্র, কারণ তিনি পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তারা হযরত আদম (আঃ)-কে মহান আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে না, যদিও তিনি পিতা বা মাতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মানসিকতা অনুসারে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর চেয়ে হযরত আদম (আঃ)-এর মহান আল্লাহর পুত্র বলে অভিহিত হওয়ার অধিকার বেশি, কিন্তু তারা তা দাবি করে না। হযরত আদম (আঃ)-এর ক্ষেত্রে তারা যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করে, কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রে যুক্তি বা সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করে না। এটা অদ্ভুত।

পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অলৌকিক ঘটনাগুলি যাচাই করা হয়েছে। তবে এটি স্পষ্ট করে যে, মহান আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি এবং

আদেশে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এই অলৌকিক ঘটনাগুলি সম্পাদন করেছিলেন। যদি মহান আল্লাহর ইচ্ছা বা অনুমতির প্রয়োজন হত, তাহলে তাঁর জন্য মহান আল্লাহর ইচ্ছা বা অনুমতির প্রয়োজন হত না। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৪৯:

“আর [ঈসা আলাইহিস সালামকে] বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূল বানাও, [যিনি বলবেন], 'আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরি করি, অতঃপর আমি তাতে ফুঁ দেই, আল্লাহর নির্দেশে তা পাখি হয়ে যায়। আর আমি অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করি এবং আল্লাহর নির্দেশে মৃতকে জীবিত করি। আর আমি তোমাদেরকে তোমাদের খাবার এবং তোমাদের ঘরে যা জমা করে রাখি তা জানিয়ে দেই.."

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম জীবিত অবস্থায় আসমানে আরোহণ করা মহান আল্লাহর শক্তির আরও ইঙ্গিত দেয়, যখন তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে এই যাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন। যদি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ঐশ্বরিক হতেন, তাহলে তিনি তাঁর নিজস্ব সহজাত শক্তি দিয়ে এই যাত্রা করতে পারতেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৫৫:

"[স্মরণ করো] যখন আল্লাহ বললেন, "হে ঈসা, আমি অবশ্যই তোমাকে গ্রহণ করব এবং আমার দিকে উঠিয়ে নেব এবং তোমাকে পবিত্র করব [অর্থাৎ, মুক্ত করব] যারা অবিশ্বাস করে...""

পবিত্র কুরআন খ্রিস্টানদের বলে যে, তাদের বিশ্বাসের বিপরীতে, নবী ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি। ক্রুশে যার ছবি দেখা গিয়েছিল তিনি নবী ঈসা (আঃ)-এর মতো দেখতে ছিলেন না, বরং তিনি এমন একজন ছিলেন যাকে তাঁর মতো করে তৈরি করা হয়েছিল। আল্লাহ, মহিমান্বিত, ইতিমধ্যেই নবী ঈসা (আঃ)-কে আকাশের দিকে তুলে নিয়েছিলেন। সূরা ৪ আন-নিসা, আয়াত ১৫৬-১৫৮:

"এবং তাদের অবিশ্বাস এবং মরিয়মের বিরুদ্ধে তাদের বিরাট অপবাদ বলার জন্য। এবং তাদের এই কথার জন্য যে, "আমরা আল্লাহর রাসূল মরিয়মের পুত্র মসীহ ঈসাকে হত্যা করেছি।" তারা তাকে হত্যা করেনি, ক্রুশেও চড়ায়নি; বরং তাদের কাছে তার অনুরূপ করা হয়েছিল... বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে তুলে নিয়েছেন।"

হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া মানে হত্যা করা, এই ভুল খ্রিস্টান বিশ্বাস নিজেই অদ্ভুত কারণ একজন প্রকৃত ঐশ্বরিক সত্তা মৃত্যু অনুভব করার চেয়ে অনেক বেশি দূরে। যদি কোন সত্তা মারা যেতে পারে, তবে তা ঐশ্বরিক হতে পারে না। তাই বাস্তবে, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে তাদের ভুল বিশ্বাস তাঁর ঐশ্বরিকতা সম্পর্কে তাদের ভুল বিশ্বাসকে অস্বীকার করে।

স্বভাবতই একটি ঐশ্বরিক সত্তা এমন একটি জিনিস যা স্বয়ংসম্পূর্ণ, অর্থাৎ তাদের অন্য কারো দ্বারা তাদের প্রতিপালনের প্রয়োজন হয় না। যদি একটি সত্তা অন্য কারো দ্বারা প্রতিপালিত হয় তবে তারা ঐশ্বরিক হতে পারে না। নবী ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মা মরিয়ম (আঃ) উভয়ই ঐশ্বরিক সত্তা ছিলেন না কারণ তাদের মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুষ্টির প্রয়োজন ছিল, অর্থাৎ তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা ছিলেন না। ৫ম অধ্যায় আল মায়িদা, আয়াত ৭৫:

"মরিয়মপুত্র মসীহ একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না; তাঁর পূর্বে আরও রসূল গত হয়ে গেছেন। আর তাঁর মা ছিলেন সত্যবাদী। তাঁরা দুজনেই খাবার খেতেন। দেখো, আমি কীভাবে তাদের কাছে নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করি; তারপর দেখো, কীভাবে তারা বিভ্রান্ত হয়।"

তাছাড়া, কেউ দাবি করতে পারে না যে, যেহেতু ফেরেশতারা খায় না, তাই তাদেরকে ঈশ্বর হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বাস্তবে, তাদেরকেও আল্লাহ তাআলা ভিন্নভাবে রিযিক দান করেন, তাই তারাও স্বয়ংসম্পূর্ণ নন। অন্যান্য সৃষ্টির মতোই তাদেরকেও সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মৃত্যু ভোগ করতে হবে, এই সত্যই দেবত্বকে অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট।

একজন জৈবিক শিশু তার পিতামাতার সাথে সর্বদা কিছু বৈশিষ্ট্য ভাগ করে নেবে। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রে, তিনি মহান আল্লাহর সাথে কোন গুণাবলী ভাগ করে নিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে, তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য অন্যান্য মানুষের সাথে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে খাদ্য ও জল দ্বারা লালন-পালন করা হয়েছে, সে মারা যাবে এবং পুনরুত্থিত হবে, ঠিক অন্যান্য সমস্ত মানুষের মতো। তার বৈশিষ্ট্যগুলি ঐশ্বরিকতাকে অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট।

খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারী রোমানরা তাদের ধর্মে নবী ঈসা (আঃ)-এর ঐশ্বরিক অস্তিত্বের ধারণা প্রবর্তন করে, যা তারা তাদের পূর্বের ধর্ম, পৌত্তলিকতা থেকে ধারণ করেছিল। তারা একজন মহান ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত নবী (সাঃ)-কে গ্রহণ করে জিউস, হারকিউলিস এবং ওডেনের মতো উপকথা এবং পৌরাণিক কাহিনীর সাথে যুক্ত করে। কেবলমাত্র সামান্য সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় এটি বোঝার জন্য যে, যে সত্তা অন্য কারো দ্বারা সৃষ্ট, প্রতিপালিত এবং মারা যেতে পারে, সে কখনও

ঐশ্বরিক হতে পারে না, কারণ এই বিষয়গুলি ঐশ্বরিক সত্তার গুণাবলীর বিরোধিতা করে।

কল্যাণের আহ্বান

কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, ইথিওপিয়ায় হিজরত করার পর, জাফর ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, ইথিওপিয়ার রাজার কাছে ইসলাম এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেছিলেন। এটি সিরাত ইবনে হিশামের ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে।

সে বলল, "হে বাদশাহ! আমরা অজ্ঞতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিলাম এবং আমরা মূর্তিপূজক ছিলাম। আমরা মৃতদেহ খেতাম, জঘন্য কাজ করতাম, রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, আতিথেয়তা ও প্রতিবেশীর কর্তব্য অবহেলা করতাম এবং কেবল শক্তিশালীদের আইন ব্যবহার করতাম। আমাদের জীবন ছিল এই পর্যন্ত যে, মহান আল্লাহ আমাদের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তিকে উৎপন্ন করলেন যার বংশ, সত্যবাদিতা, সততা এবং পবিত্রতা আমরা ভালোভাবে জানতাম। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর একত্বের দিকে ডাকলেন এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করার শিক্ষা দিলেন। তিনি আমাদের মূর্তি পূজা করতে নিষেধ করলেন। তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলতে, আমাদের আমানতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে, অন্যের প্রতি দয়ালু হতে, প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে, আত্মীয়স্বজনের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে এবং অপরাধ ও রক্তপাত থেকে বিরত থাকতে আদেশ করলেন। তিনি আমাদেরকে নামাজ পড়তে, দান করতে এবং রোজা রাখতে আদেশ করলেন। আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি, তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করেছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি। তিনি যা অনুমতি দিয়েছেন তা আমরা অনুমোদন করেছি এবং তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করেছি। এই কারণে আমাদের লোকেরা আমাদের উপর আক্রমণ করেছিল এবং আমাদের উপর অত্যাচার করেছিল। আমাদেরকে আল্লাহর ইবাদত ত্যাগ করতে এবং মূর্তিপূজার দিকে ফিরে যেতে এবং আমরা যে মন্দ কাজগুলো করেছি সেগুলোকে বৈধ বলে গণ্য করতে বাধ্য করার জন্য। যখন তারা আমাদের জীবনকে নির্যাতন ও ঘেরাও করে ফেলেছিল এবং আমরা তাদের মধ্যে কোনও নিরাপত্তা পাইনি, তখন আমরা

আপনার দেশে এসেছিলাম এবং আশা করেছিলাম যে আমরা যখন আপনার সাথে আছি তখন আপনি আমাদেরকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করবেন, হে রাজা!"

এই ঘটনা থেকে অনেক শিক্ষা নেওয়া যায়। প্রথমত, অজ্ঞতা সমাজের মধ্যে পাপ ও দুর্নীতির দিকে পরিচালিত করে । অজ্ঞ ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে জানে না এবং ফলস্বরূপ তারা সেগুলোর অপব্যবহার করবে। যখন তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ, যেমন তাদের সম্পদ এবং শক্তির অপব্যবহার করবে, তখন এটি পাপ, অপরাধ এবং সমাজের মধ্যে দুর্নীতির বিস্তার ঘটাবে, যেমন আলোচনার মূল ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, মুসলমানদের জন্য ইসলামের শিক্ষা শেখা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটিই তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোর অপব্যবহার থেকে বিরত রাখতে পারে।

অধিকন্তু, জাফর (রাঃ) স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে মক্কার সকল মানুষ মহানবী (সাঃ) এর সততা, বিশ্বস্ততা এবং পবিত্রতা জানত এবং গ্রহণ করত। যেহেতু মুসলিমদেরকে মহানবী (সাঃ) এর অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাই তাদের অবশ্যই তাঁর মহৎ চরিত্র সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"বলুন, [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন...""

এটি তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন ও শিক্ষা অধ্যয়ন করে। এটা অবাক করার মতো যে কত মুসলিম তাঁকে অনুসরণ করার দাবি করে কিন্তু তাঁর জীবন বা শিক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানে না। যার শিক্ষা ও চরিত্র সম্পর্কে তারা জানে না, তাকে কীভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে? অতএব, একজনকে অবশ্যই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে জানার জন্য কিছু সময় এবং শক্তি উৎসর্গ করতে হবে, যাতে তারাও মহৎ চরিত্র অর্জন করতে পারে। ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং উদারতার মতো ইতিবাচক গুণাবলী গ্রহণ করা একজনকে মানসিক শান্তি অর্জনে সহায়তা করবে, কারণ এটি তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি অহংকার, শত্রুতা এবং হিংসার মতো নেতিবাচক গুণাবলী গ্রহণ করে সে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হবে। এটি তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে।

আলোচ্য মূল অনুষ্ঠানে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মৌলিক ভূমিকা ছিল মানবজাতিকে কেবল মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও উপাসনা করার আহ্বান জানানো। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন, তাই তিনিই মানবজাতির জন্য নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যাতে তারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে, যাতে তারা তাদের জীবনের মধ্যে সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেয় এবং পরকালে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেয়। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির মতো অন্যান্য জিনিস মেনে চলে, সে মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে না কারণ এই জিনিসগুলির কোনওটিই একজন ব্যক্তিকে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করার পরামর্শ দিতে পারে না বা দেবে না, কারণ এই জিনিসগুলির পিছনে থাকা ব্যক্তিদের নিজস্ব লক্ষ্য এবং লক্ষ্য রয়েছে, যেমন সম্পদ এবং সামাজিক প্রভাব অর্জন। যে ব্যক্তি অন্যান্য জিনিস মেনে চলে সে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল স্থানে ফেলবে। এইভাবে আচরণ করলে এই পৃথিবীতে বা পরকালে কখনও মানসিক শান্তি পাওয়া যাবে না।

আলোচ্য মূল ঘটনাটিতে মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতদের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার কিছু বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমটি হল সত্য কথা বলা। কথা বলাকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটি হল মন্দ কথা যা যেকোনো মূল্যে এড়িয়ে চলতে হবে। দ্বিতীয়টি হল ভালো কথা যা উপযুক্ত সময়ে বলা উচিত। কথার শেষ ভাগ হল অসার কথা। এই ধরণের কথাকে পাপ বা সৎ কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, তবে যেহেতু এই ধরণের কথা মন্দ কথার দিকে পরিচালিত করে, তাই এটি এড়িয়ে চলাই ভালো। এছাড়াও, অসার কথা বলা একজন ব্যক্তির জন্য কিয়ামতের দিন অনুশোচনার কারণ হবে যখন সে অসার কথা বলার জন্য তাদের সময় এবং সুযোগ নষ্ট করতে দেখবে। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত হয় ভালো কথা বলা, নয়তো চুপ থাকা। সহিহ মুসলিমের ১৭৬ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তী যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হলো, আমানতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা। এর মধ্যে রয়েছে একজন ব্যক্তি এবং আল্লাহ তাআলার মধ্যে আমানত এবং অন্যান্য মানুষের মধ্যে আমানত। আল্লাহ তাআলা মানুষকে পার্থিব আমানত অর্পণ করেছেন। অতএব, এই আমানতগুলি সঠিকভাবে পালন করে তাদের বিশ্বস্ত থাকতে হবে। এটি তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আমানতগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে তাকে উভয় জগতেই আশীর্বাদ, রহমত এবং মানসিক শান্তি প্রদান করা হবে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎ কর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

এছাড়াও, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যদের সাথে সম্পর্কিত আমানতও পূরণ করতে হবে। কেউ এই ভেবে বোকা বানাতে পারবে না যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের এবং আল্লাহ, মহান আল্লাহর মধ্যে আমানত পূরণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের এবং মানুষের মধ্যে আমানত ভঙ্গ করতে পারে। বিচারের দিন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। যে অন্যদের উপর অন্যায় করে তাকে তাদের নেক আমলগুলো তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য করা হবে এবং প্রয়োজনে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের পাপ নিতে বাধ্য করা হবে। এর ফলে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, তাদের এবং আল্লাহ, মহান আল্লাহর মধ্যে আমানত এবং তাদের এবং অন্যান্য মানুষের মধ্যে আমানত পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত।

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তী যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হলো অন্যদের প্রতি দয়ালু হও। ইসলামের একটি সহজ নীতি রয়েছে। কেউ অন্যদের সাথে যেভাবে আচরণ করে, আল্লাহ তার সাথে কেমন আচরণ করবেন তা হলো। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ অন্যদের সাথে দয়ালু আচরণ করে, তাহলে আল্লাহ তার প্রতি দয়ালু হবেন। জামে আত তিরমিযী, ১৯২২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে। অতএব, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে সে আল্লাহ তার সাথে আচরণ করতে চায়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা মানুষের অধিকার পূরণ করছে, যা ইসলামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) পরবর্তী যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হলো প্রতিবেশীর প্রতি সদয় আচরণ করা। প্রথমত, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলামে একজন ব্যক্তির প্রতিবেশী বলতে সেই সকল ব্যক্তিকে বোঝায় যারা একজন মুসলিমের বাড়ির

প্রতিটি দিকে চল্লিশটি ঘরের মধ্যে বাস করে। ইমাম বুখারীর "আদাবুল মুফরাদ", নং ১০৯-এ এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমের ১৭৪ নম্বর হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) একবার আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসকে প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণের সাথে যুক্ত করেছিলেন। প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এই হাদিসটিই যথেষ্ট। অতএব, একজন ব্যক্তির সর্বদা তার প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণ করা উচিত। এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন কেউ তার প্রতিবেশীর সাথে সেই আচরণ করে যা সে নিজেই তার প্রতিবেশীর দ্বারা সদয় আচরণ করতে চায়।

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তী যে নির্দেশ দিয়েছেন তা হলো আত্মীয়স্বজনের অধিকার পূরণ করা। ইসলাম সর্বদা মানবজাতিকে সর্বাত্মক উপদেশ দেয়। এই ক্ষেত্রে, ইসলাম প্রায়শই আত্মীয়স্বজনের সাথে সদয় আচরণের উপর জোর দেয়, কারণ কেবলমাত্র এই উপদেশের উপর আমল করলেই সমাজে সমৃদ্ধি, শান্তি এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে। যদি প্রতিটি ব্যক্তি তাদের আত্মীয়স্বজনের সাথে সদয় আচরণ করে, তাহলে বাইরের উৎস থেকে অন্য কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। এর ফলে প্রতিটি পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সাথে সদয় আচরণ নিশ্চিত হবে, যার ফলস্বরূপ সমগ্র সমাজের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

ইসলামে প্রশংসনীয় যেকোনো কাজে আত্মীয়স্বজনদের সাহায্য করা উচিত এবং নিন্দনীয় যেকোনো বিষয়ে তাদের সতর্ক করা উচিত। ৫ম অধ্যায় আল মায়িদাহ, আয়াত ২:

"...এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

দুঃখের বিষয় হল, আজকাল অনেক মুসলিম এই উপদেশ উপেক্ষা করে এবং তাদের সাথে তাদের সম্পর্ক অনুসারে অন্যদের সাহায্য করে, তারা যে জিনিসে তাদের সাহায্য করছে তা ভালো হোক বা খারাপ, তা নির্বিশেষে। একজন মুসলিমের উচিত নিম্নলিখিত আয়াতে উপদেশিত ক্রম মেনে চলা এবং কেবলমাত্র তাদের আত্মীয়দের এমন কিছুতে সাহায্য করা যা সরাসরি আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের সাথে সম্পর্কিত। সূরা ২ আল বাকারা, ৮৩:

"... *আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত করো না; এবং পিতামাতা এবং আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করো...*"

আত্মীয়স্বজনদের তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক সহায়তা। এটি তখনই সবচেয়ে ভালোভাবে অর্জন করা যায় যখন কেউ অন্যদের সাথে সেই আচরণ করে যেভাবে সে অন্যদের সাথে আচরণ করতে চায়। মানুষের দ্বারা নির্ধারিত ভালো আত্মীয়ের মান এবং সংজ্ঞা সম্পর্কে খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাদের মান এবং সংজ্ঞা প্রায়শই ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত সংজ্ঞা এবং মানদণ্ডের বিপরীত। পরিবর্তে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুসারে আত্মীয়স্বজনের অধিকার পূরণ করতে হবে, তা নির্বিশেষে আত্মীয়স্বজনরা তাদের ভালো আত্মীয় বলে মনে করুক বা না করুক। পরিশেষে, একজন মুসলিমের কখনও পার্থিব কারণে তাদের আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয়, যেমনটি সহিহ বুখারির ৫৯৮৪ নম্বর হাদিসে হুঁশিয়ার করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি পার্থিব কারণে তাদের আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তাছাড়া, যদিও একজন মুসলিম ধর্মীয় কারণে তার আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে, তবুও তার আত্মীয়কে ভালো কাজে সাহায্য করে এবং খারাপ কাজে সতর্ক করে তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখাই উত্তম, কারণ এটি তার আত্মীয়কে

তাদের ভুল পথে চালিত হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করতে পারে।

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তী যে কাজটি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হলো ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠা করা। ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যে রয়েছে সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ শর্তাবলী এবং আদব-কায়দা পূরণ করা, যেমন সময়মতো আদায় করা। পবিত্র কুরআনে ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার কথা প্রায়শই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে কারণ এটি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক প্রমাণ। উপরন্তু, যেহেতু প্রতিদিনের নামাজগুলি বিস্তৃত, তাই এগুলি বিচার দিনের ধ্রুবক স্মারক এবং এর জন্য কার্যত প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করে, কারণ ফরজ নামাজের প্রতিটি স্তর বিচার দিনের সাথে সম্পর্কিত। যখন কেউ সঠিক অবস্থানে দাঁড়ায়, তখন বিচারের দিনে সে এভাবেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। সূরা ৮৩ আল মুতাফিফিন, আয়াত ৪-৬:

" তারা কি ভাবে না যে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে? এক মহাদিনের জন্য, যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে?"

যখন তারা রুকু করে, তখন এটি তাদের সেই অনেক লোকের কথা মনে করিয়ে দেয় যারা পৃথিবীতে তাদের জীবদ্দশায় মহান আল্লাহর কাছে রুকু না করার জন্য বিচারের দিনে সমালোচিত হবে। সূরা ৭৭ আল মুরসালাত, আয়াত ৪৮:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'নামাজে রুকু করো', তখন তারা রুকু করে না।"

এই সমালোচনার মধ্যে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ না করাও অন্তর্ভুক্ত। যখন কেউ নামাজে সিজদা করে, তখন এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিচারের দিনে মানুষকে মহান আল্লাহর কাছে সিজদা করার জন্য কীভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য করার জন্য সঠিকভাবে সিজদা করেনি, তারা বিচারের দিনে এটি করতে সক্ষম হবে না। সূরা ৬৮ আল-কালাম, আয়াত ৪২-৪৩:

"যেদিন পরিস্থিতি কঠিন হবে, সেদিন তাদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের চোখ অবনত হবে, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। আর তাদেরকে সুস্থ অবস্থায় সিজদা করার জন্য ডাকা হত।"

যখন কেউ নামাযে হাঁটু গেড়ে বসে, তখন এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে কিয়ামতের দিন তারা কীভাবে তাদের চূড়ান্ত বিচারের ভয়ে আল্লাহর সামনে এই অবস্থানে বসে থাকবে। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২৮:

"আর তুমি প্রত্যেক জাতিকে [ভয়ে] নতজানু দেখবে। প্রত্যেক জাতিকে তার আমলনামার দিকে ডাকা হবে [এবং বলা হবে], "আজ তোমাদেরকে তোমাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।"

যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে নামাজ পড়বে, সে তার নামাজ সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবে। এর ফলে তারা নামাজের মাঝখানে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে। সূরা ২৯, আল আনকাবুত, আয়াত ৪৫:

"...প্রকৃতপক্ষে, নামাজ অশ্লীলতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা, যা তাঁর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) পরবর্তী যে কাজটি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হলো ফরজ দান করা। ফরজ দান হল ব্যক্তির মোট আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং শুধুমাত্র তখনই তা প্রদান করা হয় যখন একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের অধিকারী হয়। ফরজ দান করার একটি লক্ষ্য হল এটি একজন মুসলিমকে মনে করিয়ে দেয় যে তাদের কাছে থাকা সম্পদ তাদের নয়, অন্যথায় তারা যেভাবে ইচ্ছা তা ব্যয় করতে স্বাধীন থাকবে। সম্পদ আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে দান করেছেন, তাই তাঁর সন্তুষ্টি অনুসারে ব্যবহার করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি নিয়ামত কেবল একটি ঋণ যা তার ন্যায্য মালিক, মহান আল্লাহ তাআলাকে পরিশোধ করতে হবে। এটি তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ তাদের প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করে যা আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সাঃ) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে এমন আচরণ করে যেন তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদ, যেমন তাদের সম্পদ, তাদেরই এবং তাই ফরজ দান থেকে বিরত থাকে, সে শাস্তির সম্মুখীন হবে, ঠিক যেমন পার্থিব ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ ব্যক্তি শাস্তির সম্মুখীন হয়। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদিস, ১৪০৩ নম্বরে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাদের ফরজ

দান করে না, সে একটি বৃহৎ বিষাক্ত সাপের মুখোমুখি হবে যা বিচারের দিন তাকে ক্রমাগত কামড়াবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮০:

"আর যারা [লোভের বশে] আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দিয়েছেন তা দান করে না, তারা যেন কখনও মনে না করে যে এটি তাদের জন্য ভালো। বরং এটি তাদের জন্য আরও খারাপ। কিয়ামতের দিন তাদের ঘাড়ে তারা যা দান করেছে তা দিয়ে তাদের গলা বেষ্টিত করা হবে..."

এই পৃথিবীতে, যে সম্পদের উপর তারা ফরজ সদকা করতে ব্যর্থ হয়, তা তাদের মানসিক চাপ ও দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা মনে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাদের প্রদত্ত নেয়ামতের উপর তাঁর অধিকার রয়েছে। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তী যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হলো ফরজ দান করা।

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তী যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হলো রোজা রাখা।

সুনানে আন নাসায়ীর ২২১৯ নম্বর হাদিসে পাওয়া গেছে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, রোজা ছাড়া মানুষের সকল সৎকর্ম কেবল তাদের নিজেদের জন্য, কারণ এটি মহান আল্লাহর জন্য এবং তিনি সরাসরি এর প্রতিদান দেবেন।

এই হাদিসটি রোজার অনন্যতা নির্দেশ করে। এটিকে এভাবে বর্ণনা করার একটি কারণ হল, অন্যান্য সমস্ত নেক আমল মানুষের কাছে দৃশ্যমান, যেমন নামাজ, অথবা সেগুলো মানুষের মধ্যে হয়, যেমন গোপন দান। অন্যদিকে, রোজা একটি অনন্য নেক আমল, কারণ অন্যরা কেবল সেগুলো দেখেই জানতে পারে না যে কেউ রোজা রাখছে।

অধিকন্তু, রোজা একটি সৎকর্ম যা মানুষের প্রতিটি দিকের উপর তালা ঝুলিয়ে দেয়। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সঠিকভাবে রোজা রাখে সে মৌখিক এবং শারীরিক পাপ থেকে বিরত থাকবে, যেমন অবৈধ জিনিস দেখা এবং শোনা। এটি নামাজের মাধ্যমেও অর্জন করা হয় তবে নামাজ কেবল অল্প সময়ের জন্য করা হয় এবং অন্যদের কাছে দৃশ্যমান হয়, অন্যদিকে, রোজা সারা দিন ধরে থাকে এবং অন্যদের কাছে অদৃশ্য থাকে। সূরা আল আনকাবুত, আয়াত ৪৫:

"...প্রকৃতপক্ষে, নামাজ অশ্লীলতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

নিচের আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি বৈধ কারণ ছাড়া ফরজ রোজা পূর্ণ করে না সে প্রকৃত মুমিন হবে না, কারণ এ দুটির মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৮৩:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযীতে ৭২৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করে বলেছেন যে, যদি কোন মুসলিম বৈধ কারণ ছাড়া একটিও ফরজ রোজা পালন না করে, তাহলে সে তার হারানো সওয়াব এবং বরকতের ক্ষতিপূরণ করতে পারবে না, এমনকি যদি সে সারা জীবন প্রতিদিন রোজা রাখে।

উপরন্তু, পূর্বে উদ্‌ধৃত আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রোজা সঠিকভাবে তাকওয়ার দিকে পরিচালিত করে। অর্থাৎ, কেবল দিনের বেলায় অভুক্ত থাকার ফলে তাকওয়ার দিকে পরিচালিত হয় না কিন্তু রোজার সময় পাপ থেকে বিরত থাকা এবং সৎকর্ম করার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া তাকওয়ার দিকে পরিচালিত করে। এই কারণেই জামে আত তিরমিযীতে ৭০৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যদি কেউ মিথ্যা কথা বলা এবং কাজ করা থেকে বিরত না থাকে তবে রোজার কোনও তাৎপর্য থাকবে না। সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৬৯০ নম্বরে পাওয়া অনুরূপ একটি হাদিস সতর্ক করে যে, কিছু রোজাদার ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই পান না। যখন কেউ রোজা রাখার সময় মহান আল্লাহ তায়ালার

আনুগত্যের ক্ষেত্রে আরও সচেতন এবং সতর্ক হয়ে ওঠে, তখন এই অভ্যাসটি অবশেষে তাদের উপর প্রভাব ফেলবে, যার ফলে তারা রোজা না থাকলেও একই রকম আচরণ করবে। এটি আসলে প্রকৃত তাকওয়া।

পূর্বে উদ্‌ধৃত আয়াতে উল্লেখিত ধার্মিকতা রোজার সাথে সম্পর্কিত, কারণ রোজা মানুষের মন্দ কামনা-বাসনা এবং আবেগকে হ্রাস করে। এটি অহংকার এবং পাপের উৎসাহকে বাধা দেয়। কারণ রোজা পেটের ক্ষুধা এবং দৈহিক কামনা-বাসনাকে বাধা দেয়। এই দুটি জিনিস অনেক পাপের দিকে পরিচালিত করে। উপরন্তু, এই দুটি জিনিসের আকাঙ্ক্ষা অন্যান্য অবৈধ জিনিসের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি। তাই যে কেউ রোজার মাধ্যমে এগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তার দুর্বল মন্দ ইচ্ছাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে। এটি প্রকৃত ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে।

যেমনটি আগে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, রোজার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। রোজার প্রথম এবং সর্বনিম্ন স্তর হল এমন জিনিস থেকে বিরত থাকা যা রোজা ভঙ্গ করে, যেমন খাবার। পরবর্তী স্তর হল পাপ থেকে বিরত থাকা যা রোজার ক্ষতি করে এবং রোজার সওয়াব হ্রাস করে, যেমন মিথ্যা বলা। সুনানে আন নাসায়ীর ২২৩৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে। রোজা হল শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে জড়িত করে এমন একটি স্তর। এটি হল যখন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ পাপ থেকে রোজা রাখে, যেমন চোখ হারাম জিনিসের দিকে তাকানো থেকে, কান হারাম জিনিসের কথা শোনা থেকে ইত্যাদি। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ রোজা না থাকা সত্ত্বেও এইভাবে আচরণ করে। পরিশেষে, রোজার সর্বোচ্চ স্তর হল এমন সমস্ত জিনিস থেকে বিরত থাকা যা মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত নয়, অর্থাৎ, ব্যক্তি তাকে প্রদত্ত সমস্ত নিয়ামত, যেমন তাদের সময়, পাপ বা নিরর্থক উপায়ে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে।

একজন মুসলিমের উচিত তাদের দেহ যেমন বাহ্যিকভাবে রোজা রাখে, তেমনি পাপ বা নিরর্থক চিন্তাভাবনা থেকে বিরত থাকা। তাদের নিজেদের ইচ্ছার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের পরিকল্পনায় অটল থাকা এবং কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এছাড়াও, তাদের অন্তরে আল্লাহর তাকদীরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত, বরং ভাগ্য এবং তা যা-ই আনুক না কেন, আল্লাহকে জেনে রাখা উচিত যে, তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কেবল সর্বোত্তমটিই বেছে নেন, এমনকি যদি তারা এই পছন্দগুলির পিছনের প্রজ্ঞা বুঝতে না পারে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

পরিশেষে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের রোজা গোপন রেখে সর্বোচ্চ সওয়াবের লক্ষ্য রাখা এবং যদি তা এড়ানো সম্ভব হয় তবে অন্যদের না জানানো, কারণ অপ্রয়োজনীয়ভাবে অন্যদের জানানোর ফলে সওয়াব নষ্ট হয় কারণ এটি লোক দেখানোর একটি দিক।

আলোচ্য মূল ঘটনাটি নির্দেশ করে যে, ধর্মের মধ্যে নতুন নতুন জিনিস এড়িয়ে চলার সময় পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীসের আন্তরিকভাবে আনুগত্য ও অনুসরণ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করা হবে, এমনকি যদি তা সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে, তবুও তারা পথনির্দেশনার দুটি উৎসের উপর তত কম কাজ করবে, যা পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে। এই কারণেই সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, যে বিষয় দুটি পথনির্দেশনার উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা আল্লাহ তাআলা প্রত্যাখ্যান করবেন।

উপরন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করা হবে, তত বেশি তারা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলিতে কাজ করতে শুরু করবে। এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে বিপথগামী করে। উদাহরণস্বরূপ, সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রাখে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পা দেবে এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করবে যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথেও সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান নির্দেশনার দুটি উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বিভ্রান্তিকর অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফর, যেমন কালো জাদু অনুশীলন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"...সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

সুতরাং একজন মুসলিম অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রয়েছে। এই কারণেই ধর্মীয় উদ্ভাবনগুলিতে কাজ করা যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

ঐশ্বরিক সুরক্ষা

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)ও ইথিওপিয়ায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন যাতে তিনি শান্তিতে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে পারেন। সহীহ বুখারী, ৩৯০৫ নম্বরে পাওয়া হাদিস অনুসারে। মক্কা থেকে কিছু দূরে পৌঁছানোর পর, তিনি মক্কার একজন অমুসলিম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইবনে আদ দাগিনার সাথে দেখা করেন। দুজনের মধ্যে কথা বলার সময় ইবনে আদ দাগিনা মন্তব্য করেন যে তার মতো একজন ভালো ব্যক্তিকে তার জন্মভূমি ছেড়ে যেতে বাধ্য করা উচিত নয়। ইবনে আদ দাগিনা আবু বকর (রাঃ) এর কিছু মহৎ গুণাবলী বর্ণনা করেন, যার মধ্যে রয়েছে: অভাবী ও দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার জন্য এবং শোকাহতদের সাহায্য করার জন্য তার আগ্রহ। এরপর ইবনে আদ দাগিনা আবু বকর (রাঃ) কে মক্কায় ফিরে যেতে উৎসাহিত করেন যেখানে তিনি তাকে মক্কার অমুসলিমদের হাত থেকে রক্ষা করবেন। যখন তারা উভয়েই ফিরে আসেন, তখন মক্কার অমুসলিমদের নেতারা ইবনে আদ দাগিনার দাবিতে রাজি হন কিন্তু জোর দেন যে আবু বকর (রাঃ) প্রকাশ্যে নয় বরং তাঁর নিজের ঘরের একান্তে আল্লাহর ইবাদত ও প্রার্থনা করেন। আবু বকর (রাঃ) রাজি হন কিন্তু তাঁর বাড়ির সামনে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন যেখানে তিনি নামাজ পড়েন এবং পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন যা পথচারীরা শুনতে পেত। মক্কার অমুসলিমদের নেতারা যখন এই বিষয়ে ইবনে আদ দাগিনাকে চ্যালেঞ্জ করেন, তখন তিনি আবু বকর (রাঃ) কে অনুরোধ করেন যে হয় গোপনে আল্লাহর ইবাদত করুন, অথবা তাঁকে তাঁর সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি দিন। আবু বকর (রাঃ) তাকে মুক্তি দেন এবং পরিবর্তে বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে সুরক্ষা প্রার্থনা করেন।

এই ঘটনা থেকে অনেক শিক্ষা নেওয়া যায়। আবু বকর (রাঃ) সর্বদা অভাবীদের সাহায্য করতে আগ্রহী ছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে এটি আল্লাহর অবিরাম সাহায্য লাভের একটি সহজ উপায়। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার উপর আল্লাহর অবিরাম সাহায্য থাকে, সে

সহজেই তার মুখোমুখি হওয়া সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে এবং উভয় জগতেই মানসিক প্রশান্তি এবং আশীর্বাদ লাভ করতে পারে। যেহেতু অভাবীদের সাহায্য করার মধ্যে মানসিক, আর্থিক এবং শারীরিক সহায়তা অন্তর্ভুক্ত, তাই উভয় জগতেই আল্লাহর অবিরাম সাহায্য লাভের জন্য অন্যদের সাহায্য না করার কোনও অজুহাত কারও কাছে অবশিষ্ট নেই।

অধিকন্তু, আবু বকর (রাঃ) সর্বদা আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখতেন কারণ তিনি বুঝতেন যে এর ফলে সমগ্র সমাজের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। যদি প্রতিটি পরিবার তাদের আত্মীয়দের অধিকার পূরণ করত, তাহলে সমাজের অধিকাংশ মানুষের অন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজন হত না। তাদের আত্মীয়দের ভালো কাজে সাহায্য করা এবং খারাপ কাজের বিরুদ্ধে সতর্ক করা উচিত। ৫ম অধ্যায় আল মায়িদা, আয়াত ২:

"...এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

তাদের অবশ্যই আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যকে অন্য কারো প্রতি, এমনকি তাদের আত্মীয়স্বজনদের প্রতি আনুগত্যের চেয়েও বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে যখন কেউ তাদের আত্মীয়স্বজনদের সঠিকভাবে তাদের জীবনে স্থান দেয়, তখন এটি অর্জন করা সম্ভব হয়। এর ফলে তারা তাদের আত্মীয়স্বজনের অধিকার পূরণ করবে এবং ফলস্বরূপ উভয় জগতেই অগণিত প্রতিদান পাবে।

পরিশেষে, আলোচ্য মূল ঘটনাটি নির্দেশ করে যে, সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর সুরক্ষা চাওয়ার গুরুত্ব কত। এটি তখনই অর্জন করা যায় যখন কেউ আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস অনুসারে, তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে, সে প্রতিটি পরিস্থিতিতেই মহান আল্লাহর সুরক্ষা এবং সাহায্য পাবে। অধ্যায় ৬৫ তালাকের ২ নং আয়াতে:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর এই সাহায্য আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে, মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে নয়। অতএব, মহান আল্লাহর সাহায্য তাঁর সময়সূচী অনুসারে এবং এমনভাবে আসবে যা ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। অতএব, একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, এমনকি যদি তাঁর সাহায্য তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

কৃতজ্ঞতার একটি শিক্ষা

কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, ইথিওপিয়া থেকে ইথিওপিয়ার রাজার প্রেরিত একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে ফিরে আসেন। এই প্রতিনিধি দলটি মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে পৌঁছালে তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাদের সেবা করার জন্য উঠে দাঁড়ান। সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, মহানবী (সাঃ)-কে অনুরোধ করেন যে, তিনি বসে থাকুন এবং প্রতিনিধিদলের সেবা করার অনুমতি দিন। কিন্তু মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উত্তরে বলেন যে, তারা তাঁর সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাই তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাদের সেবা করে তাদের প্রতিদান দিতে চেয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, ১৯৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে কখনও মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না।

যদিও নিঃসন্দেহে সকল নিয়ামতের উৎস মহান আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ নন, তবুও মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কারণ, মহান আল্লাহ তাআলা মাঝে মাঝে একজন ব্যক্তিকে অন্যদের সাহায্য করার জন্য, যেমন তার পিতামাতাকে সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করেন। যেহেতু উপায় আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন এবং ব্যবহার করেছেন, তাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা আসলে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অতএব, মুসলমানদের উচিত উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা এবং অন্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত যেকোনো সাহায্য বা সহায়তার জন্য সর্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তা যত বড়ই হোক না কেন। তাদের উচিত আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁর আদেশ অনুসারে আশীর্বাদ ব্যবহার করে, কারণ তিনিই আশীর্বাদের উৎস এবং তাদের

উচিত সেই ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যিনি তাদের সাহায্য করেছেন, কারণ এটিই সেই মাধ্যম যা মহান আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন এবং নির্বাচিত করেছেন। একজন মুসলমানের উচিত মানুষের প্রতি মৌখিকভাবে এবং কার্যত তাদের সদয় আচরণের প্রতিদান তাদের সামর্থ্য অনুসারে প্রদান করা, এমনকি যদি তা কেবল তাদের পক্ষ থেকে একটি প্রার্থনাও হয়। ইমাম বুখারীর "আদাব আল মুফরাদ", ২১৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাহায্যের বাহ্যিক প্রকাশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, অর্থাৎ একজন ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে সরাসরি মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সম্ভাবনা কম।

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না, তাই তাদের নিয়ামত বৃদ্ধি করা হবে না। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"আর [স্মরণ করো] যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের [নেয়ামত] বৃদ্ধি করব..."

যদি কোন মুসলিম বরকত বৃদ্ধি করতে চায়, তাহলে তাকে কৃতজ্ঞতার উভয় দিকই পূরণ করতে হবে, যথা, মহান আল্লাহর প্রতি এবং মানুষের প্রতি।

সঠিক পথ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার মক্কার অমুসলিমদের মূর্তিপূজা করতে দেখেছিলেন। তিনি তাদের সমালোচনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তাদের পূর্বপুরুষ, পবিত্র নবী ইব্রাহিম এবং ইসমাঈল (আঃ) এই ধরণের আচরণ করতেন না এবং উভয়েই মুসলিম ছিলেন, যারা কেবল মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। অমুসলিমরা উত্তরে বলেছিল যে তারা মহান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা থেকে এবং যাতে তারা তাদের তাঁর নিকটবর্তী করে, তার জন্য মূর্তি পূজা করে। এর জবাবে আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা আলে ইমরানের ৩১ নং আয়াত নাযিল করেন:

"[নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন...""

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৩:৩১, পৃষ্ঠা ৩২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী (সাঃ) এর অনুসরণের মূল হলো তাঁর প্রতি আন্তরিকতা। সহীহ মুসলিমের ১৯৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হলো মহানবী (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর ঐতিহ্য অনুসারে কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টা। এই হাদীসগুলির মধ্যে রয়েছে ইবাদতের আকারে মহান আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত হাদীস এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর পবিত্র মহৎ চরিত্র। ৬৮ সূরা আল-কালাম, আয়াত ৪:

"আর সত্যিই, তুমি মহান নৈতিক চরিত্রের অধিকারী।"

এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়া। এটি মহান আল্লাহ তায়ালা একটি ফরজ কাজ করেছেন। সূরা আল হাশর, আয়াত ৭:

"... আর রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো; আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো..."

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কর্মের উপর তাঁর ঐতিহ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া, কারণ মহান আল্লাহর দিকে যাওয়ার সকল পথ বন্ধ, কেবল মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পথ ছাড়া। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"[নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন...""

তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পরে যারা তাঁকে সমর্থন করেছেন, আল্লাহ তাদের সকলকেই ভালোবাসা উচিত, হোক তারা তাঁর পরিবারের সদস্য অথবা তাঁর সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। যারা তাঁর পথে

চলেন এবং তাঁর ঐতিহ্য শিক্ষা দেন তাদের সমর্থন করা তাদের উপর কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে যারা তাঁকে ভালোবাসেন তাদের ভালোবাসা এবং যারা তাঁর সমালোচনা করেন তাদের অপছন্দ করা, তাদের সাথে সম্পর্কের কথা বিবেচনা না করে। সহিহ বুখারির ১৬ নম্বর হাদিসে এই সবের সারসংক্ষেপ রয়েছে। এটি পরামর্শ দেয় যে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত ঈমান অর্জন করতে পারে না যতক্ষণ না সে আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-কে সমগ্র সৃষ্টির চেয়ে বেশি ভালোবাসে। এই ভালোবাসা কেবল কথার মাধ্যমে নয়, কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। তাঁকে শ্রদ্ধা করা, ভালোবাসা এবং কার্যত অনুসরণ করা তাঁর প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক। কিন্তু তাঁর পবিত্র জীবন এবং শিক্ষা সম্পর্কে না জেনে এটি করা সম্ভব নয়। কেউ কীভাবে এমন কাউকে সম্মান করতে, ভালোবাসতে এবং অনুসরণ করতে পারে যাকে তারা চেনে না? যে ব্যক্তি তাঁকে ভালোবাসতে এবং সম্মান করার দাবি করে কিন্তু কার্যত তাঁকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে তার দাবিতে অকৃতজ্ঞ।

সত্যকে রক্ষা করা

আবু জাহেল একবার মহানবী (সাঃ)-কে কষ্ট দিয়েছিল। হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব, যিনি তখনও মুসলিম ছিলেন না, যখন তিনি শুনতে পেলেন যে তার ভাই তাদের ভাগ্নে, মহানবী (সাঃ)-কে কষ্ট দিয়েছে, তখন তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ফলস্বরূপ, তিনি আবু জাহেলকে আক্রমণ করে আহত করেন এবং প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। হামজা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের দিন মুসলমানরা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ইমাম মুহাম্মদ কান্ধলভীর "হায়াতুস সাহাবা", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৮২-২৮৩"-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা আল-আন'আমের ১২২ নম্বর আয়াত নাযিল করেছেন:

"আর যে মৃত ছিল, তাকে আমরা জীবিত করেছি এবং তাকে আলো দিয়েছি, যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মতো যে অন্ধকারে আছে, আর কখনো সেখান থেকে বের হতে পারবে না? এভাবেই কাফেরদের কাছে তাদের কর্মকাণ্ড সুশোভিত করা হয়েছে।"

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৬:১২২, পৃষ্ঠা ৭৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি এই বিষয়টি বোঝার গুরুত্বকে নির্দেশ করে যে, একটি সমাজ যতই ইসলামের ক্ষতি করার এবং মানুষের হৃদয় থেকে তা উৎপাটন করার চেষ্টা করুক না কেন, মহান আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন উপায়ে, যেমন আন্তরিক মুসলিমদের মাধ্যমে, এটিকে রক্ষা করবেন। ৬১ আস সাফ, আয়াত ৮:

"তারা তাদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতা দেবেন, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।"

অতএব, মুসলিম জাতির অবস্থা দেখে একজন মুসলিমের সাহস হারানো উচিত নয়। বরং, তাদের এমন একটি উপায় হওয়ার চেষ্টা করা উচিত যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ ইসলামকে শক্তিশালী করেন। এটি তখনই অর্জন করা যায় যখন তারা বাইরের বিশ্বের কাছে ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করে। এর মূল হলো পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য শেখা এবং তার উপর আমল করা। এইভাবে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করা প্রতিটি মুসলিমের উপর কর্তব্য এবং তাই বিচারের দিন তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

অজ্ঞতা এবং তার মানুষ

যখন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কায় প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করছিলেন, তখন ২০ জন জ্ঞানী খ্রিস্টান তাঁর কাছে এসে তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর এবং পবিত্র কুরআন পাঠ করার পর তারা ইসলাম গ্রহণ করেন কারণ তারা তাদের ঐশী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিদর্শনগুলি চিনতে পেরেছিলেন এবং পবিত্র কুরআনকে চিনতে পেরেছিলেন কারণ তারা এর লেখক, মহান আল্লাহ, মহিমান্বিত, এর সাথে পরিচিত ছিলেন। যখন তারা তাঁকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, তখন মক্কার অমুসলিম নেতা আবু জাহল তাদের পথ বন্ধ করে দিয়ে তাদের অপমান করে দাবি করেন যে তারা তাদের সঠিক ধর্ম ত্যাগ করেছেন। তারা কেবল উত্তর দিয়েছিলেন যে তারা তাকে অপমান করবে না বরং তাকে সালাম জানিয়ে তাকে ছেড়ে চলে যান। এরপর আল্লাহ, মহিমান্বিত, পবিত্র কুরআনের ২৮ নম্বর সূরা আল-কাসাস, আয়াত ৫২-৫৫ নাযিল করেন:

"যাদেরকে এর আগে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে বিশ্বাসী। আর যখন তাদের কাছে এটি পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, "আমরা এতে বিশ্বাস করেছি; অবশ্যই এটি আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য। আমরা এর আগেও মুসলিম ছিলাম [অর্থাৎ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী]।" তাদের ধৈর্যের জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং [কারণ] তারা মন্দকে ভালোর মাধ্যমে প্রতিহত করে এবং আমরা তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। আর যখন তারা মন্দ কথা শুনে, তখন তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, "আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক; আমরা অজ্ঞদের খুঁজি না।"

এই ঘটনাটি ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪-২৫-এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

২৫ নম্বর সূরা আল ফুরকানের ৬৩ নম্বর আয়াতের সাথে সম্পর্কিত :

"... আর যখন অজ্ঞরা তাদের সাথে [কঠোরভাবে] কথা বলে, তখন তারা [শান্তির] কথা বলে।"

বিশেষ করে, যখন মানুষ বোকামি করে, তখন তারা একইভাবে উত্তর দেয় না। বরং, তারা ধৈর্য ধরে এবং সদয় আচরণ করে যা তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। তারা বোঝে যে একজন বোকা ব্যক্তিকে তারা সবচেয়ে ভালো উত্তর দিতে পারে তা হল তাদের শান্তিতে ছেড়ে দেওয়া কারণ খারাপভাবে তাদের উত্তর দেওয়া কেবল তাদের উৎসাহিত করে। এর অর্থ এই নয় যে তারা নিজেদের রক্ষা করে না যেমন ইসলাম এটি অনুমোদন করে, বরং তারা দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতা অবলম্বন করেছে। তারা এমন লোকদের উপর তাদের সময় নষ্ট করতে চায় না যারা কেবল ঝামেলা খুঁজছে। অজ্ঞতা ইসলামে একটি অপছন্দনীয় বৈশিষ্ট্য এবং জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের উপর কর্তব্যের একটি কারণ। সুনান ইবনে মাজাহ, ২২৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অজ্ঞরা এটি না জেনেও পাপ করে, তাই, পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস অধ্যয়নের জন্য সময় উৎসর্গ করে এবং কর্মের মাধ্যমে এই শিক্ষাগুলিকে তাদের জীবনে গ্রহণ করার চেষ্টা করে। অধ্যায় ৩৯ আয-যুমার, আয়াত ৯:

"... বলুন, "যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?"..."

পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, একজন অজ্ঞ ব্যক্তি প্রকৃত তাকওয়া অর্জন করতে পারে না। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ২৮:

"... আল্লাহকে কেবল তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই ভয় করে..."

কারণ ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত ভালো গুণাবলী গ্রহণ এবং মন্দ গুণাবলী এড়িয়ে চলার জন্য জ্ঞান প্রয়োজন। যদি কেউ খারাপ গুণাবলী সম্পর্কে অবগত না থাকে, তাহলে কীভাবে তারা তাদের চরিত্র থেকে তা এড়াতে বা দূর করতে পারবে?

কেবল ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করা উচিত নয় বরং জ্ঞানীদের প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধা বজায় রাখা উচিত কারণ এটি অহংকার থেকে দূরে রাখে।

পবিত্র কুরআন মুসলমানদেরকে অজ্ঞদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেয় কারণ তারা কেবল তাদের বন্ধুদেরকে অর্থহীন বা খারাপ কাজের দিকেই উদ্‌বুদ্ধ করতে পারে। সূরা ২৮ আল কাসাস, আয়াত ৫৫:

" আর যখন তারা কোন অশ্লীল কথা শোনে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, "আমাদের জন্য আমাদের কর্ম, আর তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক; আমরা অজ্ঞদের খুঁজি না।"

এর অর্থ এই নয় যে অজ্ঞদের উপদেশ দেওয়া বা শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, বরং এটি শিক্ষিত মুসলমানদের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত যারা ইসলামের বার্তা সঠিকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করেছেন।

প্রকৃত অজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞানের অভাবী নয়। প্রকৃতপক্ষে, অজ্ঞ ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যে তার জ্ঞান অনুসারে কাজ করে না। এমন ব্যক্তি অজ্ঞ, যদিও তার জ্ঞান অনেক বেশি। জ্ঞান অনুসারে কাজ করা হল এমন জ্ঞান যা উপকারী। বাকি সবকিছু কেবল জিহ্বার জ্ঞান যা এর অধিকারীর কোন উপকার করবে না। প্রকৃতপক্ষে এই জ্ঞান বিচারের দিন একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তাই মুসলমানদের উচিত ইসলামী জ্ঞান শেখার এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করা এবং মহান আল্লাহর কাছে এমন জ্ঞান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা যা উপকার করে না যেমনটি মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন। সুনান ইবনে মাজাহ, ৩৮৪৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন

ইসলামের শক্তিশালীকরণ

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে, উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) মক্কার অমুসলিম নেতাদের দ্বারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যা করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছিল। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে খুঁজতে গিয়ে যখন তিনি তরবারি নিয়ে তাদের সভা থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন তিনি নু'আইম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) এর সাথে দেখা করেন, যিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) থেকে তার মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি উমর (রাঃ) কে তিরস্কার করেন, তাকে জানান যে তার পরিবারের সদস্যরা ইসলাম গ্রহণ করেছে: তার বোন, শ্যালক এবং চাচাতো ভাই। উমর (রাঃ) তার বোনের বাড়ির দিকে রওনা হন। তিনি তাদের পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতে শুনেন এবং তার ঘরে প্রবেশ করার পর তারা প্রথমে তাদের কাজ অস্বীকার করে। অবশেষে, তারা অবাধ্যতার সাথে তাদের ইসলাম ঘোষণা করে, যদিও এর ফলে উমর (রাঃ) তাদের মারধর করেন। অবশেষে, উমর (রাঃ) শান্ত হন এবং তার বোনকে অনুরোধ করেন যে তারা তাকে কী তেলাওয়াত করছে তা দেখান। তিনি তাকে প্রথমে নিজেকে গোসল করতে বললেন, কারণ সে অপবিত্র ছিল। এরপর, সে তাদের তেলাওয়াত করা কাগজটি নিল এবং পবিত্র কুরআনের ২০ সূরা ত্বাহা তেলাওয়াত করতে শুরু করল। তেলাওয়াতের সময় ঈমানের আলো তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ে প্রবেশ করল। তারপর সে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কোথায় আছেন তা জিজ্ঞাসা করল। খাব্বাব বিন আরাত (রাঃ) ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন এবং উমর (রাঃ) এর আধ্যাত্মিক হৃদয়ে সত্য প্রবেশ করতে দেখে তিনি নিজেকে প্রকাশ করলেন এবং তাকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হেদায়েতের জন্য অথবা আবু জাহলের হেদায়েতের জন্য করা দুআ সম্পর্কে বললেন। এই দুআটি জামে আত তিরমিযী, ৩৬৮১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। উমর (রাঃ) এরপর নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে গেলেন, যিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে ছিলেন। যখন তিনি সেখানে পৌঁছালেন, তখন সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রথমে ভয় পেয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দিয়েছিলেন। সাহাবাগণ

(রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে রক্ষা করার ইচ্ছায় তাকে ধরেছিলেন, কিন্তু সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাদেরকে তাকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যার ফলে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ইসলাম ঘোষণা করেন। এটি ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, তাঁর জীবন ও সময়, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫১-৫৬-এ আলোচনা করা হয়েছে।

ঠিক যেমন উমরের বোন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, নিপীড়নের মুখেও তার বিশ্বাসে অটল ছিলেন, তেমনি সামাজিক চাপ ও সমালোচনার মুখেও মুসলমানদের ইসলাম পালন থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামী শিক্ষা শিখতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে যাতে তারা ইসলামের বিধানের পিছনের জ্ঞান বুঝতে পারে যাতে তারা সেগুলিতে অটল থাকে। অন্যদিকে, ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা কেবল তখনই তাদের নিজেদের বিশ্বাসে সন্দেহের জন্ম দেবে যখন তারা অন্যদের দ্বারা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। মূল কথা এই নয় যে ইসলামের সত্যতা নিয়ে অন্যদের সাথে বিতর্ক করা উচিত, বরং জ্ঞান এবং প্রমাণের মাধ্যমে এটিই সত্য বলে নিশ্চিত হয়ে ইসলামী আচরণবিধি অনুসারে জীবনযাপন করা উচিত। এটি সামাজিক চাপের মুখে পড়ে ভেঙে পড়া থেকে রক্ষা করবে যা মুসলমানদের ইসলাম পালন থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে করা হয়। সমস্ত মুসলমানদের এই শক্তি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে একই কাজ করতে উৎসাহিত করতে হবে।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, উমর (রাঃ) যখন খোলামেলা ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করেছিলেন, তখন তিনি এর স্পষ্ট প্রমাণ গ্রহণ করেছিলেন। তাই মুসলমানদের অবশ্যই খোলামেলা মন নিয়ে ইসলামের শিক্ষা অধ্যয়ন করে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে যাতে তারাও আলোচিত ইসলামের স্পষ্ট প্রমাণগুলি উপলব্ধি করতে এবং বুঝতে পারে। এটি ঈমানের

দৃঢ়তার দিকে পরিচালিত করে। ঈমানের দৃঢ়তা নিশ্চিত করবে যে তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে, স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা কঠিন সময়ের, সর্বোপরি আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকবে। এই আনুগত্যের মধ্যে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। এর ফলে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা তৈরি হয় এবং বিচার দিবসের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার সময় তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দিতে সহায়তা করে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে।

সত্যের উপর কাজ করা

যখন উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তিনি মহানবী (সাঃ) কে মক্কার কাবা ঘরে সাহাবীদের সাথে খোলাখুলি নামাজ আদায় করতে রাজি করান। তাদের সংখ্যা, সামাজিক শক্তি এবং প্রভাব দুর্বল থাকায় আগে এটি করা সম্ভব ছিল না। মক্কার অমুসলিমরা উমর (রাঃ) কে তাদের সাথে দেখে তাদের আক্রমণ করার সাহস করেনি। এরপর নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উমর (রাঃ) কে "আল ফারুক" উপাধি দেন, যার অর্থ "সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী"। ইমাম আল আসফাহানীর "হিলিয়াত আল আউলিয়া", ৬৩ নম্বরে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্যবাদিতা অবলম্বন করে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে।

জামে আত তিরমিযী, ১৯৭১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে যা জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। যখন একজন ব্যক্তি সত্যবাদিতায় অটল থাকে, তখন তাকে মহান আল্লাহ তাআলা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সত্যবাদিতা তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রথমটি হল যখন কেউ তার নিয়ত এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থাৎ, তারা কেবল মহান

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো কোনও গোপন উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়। সহিহ বুখারির ১ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন ব্যক্তির আন্তরিকতার প্রমাণ হল যখন সে অন্যদের কৃতজ্ঞতা কামনা করে না বা আশা করে না।

পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা কেবল মিথ্যা নয়, সকল ধরণের মৌখিক পাপ থেকে বিরত থাকে। কারণ যে ব্যক্তি অন্যান্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি দুর্দান্ত উপায় হল জামে আত তিরমিযী, ২৩১৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসের উপর আমল করা, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উন্নত করতে পারে যখন সে এমন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া এড়িয়ে চলে যা তার সাথে সম্পর্কিত নয়। বেশিরভাগ মৌখিক পাপ ঘটে কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে যা তার সাথে সম্পর্কিত নয়। এর মধ্যে অনর্থক কথাবার্তা এড়ানোও অন্তর্ভুক্ত, কারণ এটি প্রায়শই পাপপূর্ণ কথাবার্তার দিকে পরিচালিত করে এবং একজনের মূল্যবান সময়ের অপচয় করে, যা বিচারের দিনে তাদের জন্য অনুশোচনা হবে। কেউ কেবল ভালো কিছু বলার মাধ্যমে বা নীরব থাকার মাধ্যমে সত্যবাদিতার এই স্তরটি গ্রহণ করতে পারে।

চূড়ান্ত পর্যায় হলো কর্মে সত্যবাদিতা। এটি অর্জন করা সম্ভব হয় মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুসারে ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করে, নিজের ইচ্ছানুযায়ী ইসলামের শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা না করে। তাদের সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকার ক্রম মেনে চলতে হবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে আল্লাহ, মহিমান্বিতকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করবে।

আলোচ্য মূল হাদিস অনুসারে, সত্যবাদিতার এই স্তরগুলির বিপরীত, অর্থাৎ মিথ্যা বলার পরিণতি হল, এটি অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে যা পরবর্তীতে জাহান্নামের আগুনের দিকে পরিচালিত করে। যখন কেউ এই মনোভাব ধরে রাখে, তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে একজন মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হবে। পূর্বে আলোচিত তিনটি স্তর অনুসারে, নিয়তে মিথ্যা বলার অর্থ হল মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া এবং মানুষের জন্য সৎকর্ম করা। কথায় মিথ্যা বলার অর্থ হল সকল ধরণের পাপপূর্ণ কথা বলা। কাজে মিথ্যা বলার অর্থ হল পাপ করে যাওয়া, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তায়ালা এবং মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করা। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলার এই সমস্ত স্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে সে একজন মহান মিথ্যাবাদী এবং বিচারের দিন যে ব্যক্তিকে মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করবে তার কী হবে তা নির্ধারণ করার জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না।

ভিন্ন পথ বেছে নেওয়া

ইসলাম গ্রহণের পর, উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তার মামা আবু জাহলের সাথে দেখা করতে যান। উমর (রাঃ) তাকে বলেন যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আবু জাহল রেগে তার ঘরে ফিরে আসেন এবং তার মুখে দরজা বন্ধ করে দেন। মক্কার অমুসলিমদের মধ্যে থেকে অন্য একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাথে দেখা করার সময়ও একই ঘটনা ঘটে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, উমর ইবনে আল খাত্তাব, তাঁর জীবন ও সময়, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, সাধারণত যখন কেউ এমন একটি পথ বেছে নেয় যা অন্যদের পথ থেকে ভিন্ন, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব, তখন তারা তাদের কাছ থেকে সমালোচনা এবং প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ সমালোচনা আসে একজন ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে। উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন মুসলিম ইসলামের শিক্ষার উপর আরও বেশি মনোযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং যদি এটি এমন কিছু হয় যা তাদের পরিবার নিজেরাই অনুসরণ করে না, তাহলে তারা তাদের কাছ থেকে সমালোচনার মুখোমুখি হবে। যারা তাদের বিশ্বাস করেছিল যে তাদের পথে তাদের সমর্থন করবে তারা তাদের দ্বারা তাদেরকে বোকা এবং চরমপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করবে। মুসলমানদের জন্য তাদের নির্বাচিত বৈধ পথে অবিচল থাকা এবং মহান আল্লাহর সাহায্যের উপর আস্থা রাখা গুরুত্বপূর্ণ, আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, যাতে এই অসুবিধাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে।

এটি মানুষের মধ্যে একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া কারণ যখন একজন ব্যক্তি অন্যদের থেকে জীবনে ভিন্ন পথ বেছে নেয়, তখন তাদের মনে হয় যে তার পথ খারাপ বা মন্দ এবং এই কারণেই ব্যক্তিটি ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছে। যদিও ব্যক্তি এটি বিশ্বাস

করে না বরং কেবল ভিন্ন পথ বেছে নেয় এই বিশ্বাস করে যে এটি তাদের জন্য ভালো, তবুও তারা সমালোচনার সম্মুখীন হবে। একই কারণে সমস্ত নবী (সাঃ) তাদের সম্প্রদায়ের দ্বারা সমালোচিত হয়েছিলেন কারণ তারা অন্যদেরকে একটি ভিন্ন ভালো পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে অন্যদেরকে একটি ভিন্ন ভালো পথের দিকে আহ্বান করেছিলেন।

পরিশেষে, যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনের পথ বৈধ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের অবিচল থাকা উচিত এবং অন্যদের সমালোচনার দ্বারা বিচলিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তাদের তাদের পরিস্থিতি এবং চরিত্র উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের বৈধ পছন্দ অনুসরণ করা থেকে তাদের বিরত থাকা উচিত নয়।

নিজেকে রক্ষা করা

সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, সামাজিকভাবে দুর্বল ছিলেন, তাই উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) মুসলিম হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা আল্লাহর ঘর কাবা ঘরে নামাজ পড়তে পারতেন না। তিনি যখন মুসলিম হন, তখন তিনি সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে লড়াই চালিয়ে যান যতক্ষণ না তারা সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, একা ছেড়ে দেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর বিন আল খাত্তাব, তাঁর জীবন ও সময়, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, ১৯৩১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্য মুসলিমের সম্মান রক্ষা করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।

ঠিক যেমন একজন মুসলিম চায় অন্যরা তার উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে তার সম্মান রক্ষা করুক, তেমনি তার উচিত অন্যদের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতেও তার সম্মান রক্ষা করা। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, ২৫১৫ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, অন্যদের জন্য যা চায় তা ভালোবাসা একজন প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য। অন্যরা যখন তাদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলে, যেমন গীবত বা অপবাদ, তখন একজন মুসলিমের উচিত তাদের সম্মান রক্ষা করা, তারা যা বলছে তা সত্য হোক বা না হোক। এটি অন্যদের দোষ গোপন করার একটি দিক এবং উভয় জগতে তাদের দোষ গোপন করে মহান আল্লাহর দিকে নিয়ে যাওয়ার একটি দিক। সুনান ইবনে মাজাহ, ২২৫ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই ধরণের আচরণ করা আল্লাহর জন্য অন্যদের প্রতি

ভালোবাসার স্পষ্ট প্রমাণ, যা জামে আত তিরমিযী, ২৬৮৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার একটি বৈশিষ্ট্য।

আলোচ্য মূল হাদিসটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে একজন মুসলিম অন্যদের সাহায্য করার মাধ্যমে উপকৃত হন, তাই অন্যদের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে যদি তারা খুব বেশি ব্যস্ত থাকে, তবুও তাদের উচিত অন্তত নিজের স্বার্থে এইভাবে কাজ করা। এই বাস্তবতা সকল সৎকর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন দান। মানুষ কেবল সৎকর্ম করার মাধ্যমেই লাভবান হয়। মহান আল্লাহর কারও আনুগত্যের প্রয়োজন নেই এবং অভাবীদের কোন না কোনভাবে রিযিক দেওয়া হবে। মহান আল্লাহ কেবল অন্যদের সাহায্য করে সওয়াব অর্জনের সুযোগ দেন।

অধিকন্তু, যে ব্যক্তি সুযোগ এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও, ক্ষতির ভয় ছাড়াই অন্যের সম্মান রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়, তার ভয় করা উচিত যে, মহান আল্লাহ এমন সময় এবং স্থানে তাদের সম্মান রক্ষা করবেন না যেখানে অন্যরা এটি লঙ্ঘন করছে, বিশেষ করে কিয়ামতের দিন।

পরিশেষে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি যেমন অন্যের সম্মান রক্ষা করার পরামর্শ দেয়, তেমনি এটি পরোক্ষভাবে অন্যের সম্মান লঙ্ঘন না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। সুনানে আন নাসায়ী, ৪৯৯৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃতপক্ষে একজন প্রকৃত মুসলিম এবং মুমিনের লক্ষণ। বিশেষ করে, এটি পরামর্শ দেয় যে একজন প্রকৃত মুসলিম এবং মুমিন অন্যের জান ও সম্পদ থেকে তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি দূরে রাখে।

সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অভিভাবকত্ব

উসমান বিন মাযূন, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁকে প্রচণ্ড নির্যাতন করা হয়েছিল। তিনি ইথিওপিয়ায় হিজরত করতে সক্ষম হন কিন্তু পরে ভুলভাবে জানানো হলে তিনি ফিরে আসেন যে মক্কার পরিস্থিতি মুসলমানদের জন্য উন্নত হয়েছে।

মক্কায়, কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের গোত্রীয় সম্পৃক্ততার কারণে অমুসলিমদের নির্যাতন থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। উসমান বিন মাযূন, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, অমুসলিমদের একজন নেতা, ওয়ালিদ বিন মুগিরার সুরক্ষা পেয়েছিলেন। একবার, উসমান, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, খারাপ অনুভব করেছিলেন যে তিনি একজন মুশরিক দ্বারা সুরক্ষিত ছিলেন যখন তার মুসলিম ভাই ও বোনেরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নির্যাতিত হচ্ছিল। ফলস্বরূপ, তিনি প্রকাশ্যে ওয়ালিদের দেওয়া সুরক্ষা প্রত্যাহার করেছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি একজন অমুসলিমের সাথে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন এবং ফলস্বরূপ তার চোখ আহত হয়। ওয়ালিদ তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে তিনি যদি তাকে প্রদত্ত সুরক্ষা প্রত্যাহার না করতেন তবে এই আঘাত হত না। উসমান (রাঃ) আত্মবিশ্বাসের সাথে উত্তর দিলেন যে, তিনি আল্লাহর পথে আহত হতে পেরে খুশি এবং এখন তিনি ওয়ালিদের চেয়েও অধিক সম্মানিত ও শক্তিশালী আল্লাহর আশ্রয়ে আছেন, অর্থাৎ, মহান আল্লাহ। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "নবী (সাঃ)-এর নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১৩-৪১৫-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনা থেকে প্রথমেই যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় তা হলো, নিজের জন্য যা কামনা করে, অন্যদের জন্যও তাই ভালোবাসার গুরুত্ব। সহিহ বুখারির ১৩ নম্বর হাদিস অনুসারে, একজন মুমিনের সংজ্ঞা আসলে এটাই। এর অর্থ এই নয় যে,

জীবনকে কঠিন করে তুলতে হবে, বরং এর অর্থ হলো, তাদের উচিত আন্তরিকভাবে অন্যদের সাহায্য করা, তাদের প্রদত্ত উপায় অনুসারে , ঠিক যেমন তারা চায় যে, প্রয়োজনের মুহূর্তে লোকেরা তাদের সাহায্য করুক।

মূল ঘটনাটি আরও ইঙ্গিত করে যে, মহান আল্লাহর সুরক্ষা মানুষের ইচ্ছা এবং চিন্তাভাবনা অনুসারে ঘটে না। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে তাঁর ধার্মিক বান্দাদের রক্ষা করেন এবং তাই এমনভাবে যা মানুষের জন্য সর্বোত্তম, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। যে ব্যক্তি এটি বোঝে সে মনের শান্তি পাবে কারণ তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকবে, যদিও তাঁর সুরক্ষা তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তাগাবুনের ৬৪ নম্বর অধ্যায়, আয়াত ১১:

"আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন বিপদ আসে না। আর যে আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে, তিনি তার হৃদয়কে পথ দেখাবেন..."

অধিকন্তু, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার ঈমানকে পার্থিব সুরক্ষার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন, কারণ ঈমান হলো অমূল্য রত্ন যা উভয় জগতেই মানসিক প্রশান্তি এনে দেয়। পরিশেষে, একমাত্র আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই কেউ তার সুরক্ষা লাভ করতে পারে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। অধ্যায় ৬৫ তালাকের ২ নং আয়াতে:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন"

ইথিওপিয়ায় আরেকটি অভিবাসন

সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, যারা প্রথমবার ইথিওপিয়ায় হিজরত করেছিলেন, তাদের ভুলভাবে জানানো হয়েছিল যে মক্কার পরিস্থিতি মুসলমানদের জন্য উন্নত হয়ে উঠেছে। ফলস্বরূপ, তাদের অনেকেই মক্কায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু দেখতে পান যে বিপরীতটি সত্য: মক্কার পরিস্থিতি মুসলমানদের জন্য আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং সাহাবাগণের বিরুদ্ধে অমুসলিমদের সহিংসতা ও আগ্রাসন বৃদ্ধি পাওয়ার পর, তাদের আবার ইথিওপিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ১০২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জীবনে একজন মুসলিম সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অথবা কঠিন সময়ের মুখোমুখি হবে। কেউই কেবল কিছু অসুবিধা ছাড়াই স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে না। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, সংজ্ঞা অনুসারে, যদিও অসুবিধাগুলি মোকাবেলা করা কঠিন, তবুও তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতি তার প্রকৃত মহত্ত্ব এবং দাসত্ব অর্জন এবং প্রদর্শনের একটি উপায়। উপরন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ যখন অসুবিধার মুখোমুখি হয় তখন তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জীবনের পাঠ শেখে। এবং মানুষ প্রায়শই স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে কঠিন সময়ের অভিজ্ঞতা অর্জনের পরে আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হয়। এই সত্যটি বোঝার জন্য কেবল এটি নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে তবে সে বুঝতে পারবে যে আলোচিত বেশিরভাগ ঘটনাই অসুবিধার সাথে জড়িত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে প্রকৃত মহত্ত্ব সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করার মধ্যেই নিহিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি নিহিত রয়েছে আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে অসুবিধার মুখোমুখি হওয়ার মধ্যে। এটি এই সত্য দ্বারা সমর্থিত যে ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত প্রতিটি বড় কঠিন বিষয়ই তাদের জন্য চূড়ান্ত সাফল্যের সাথে শেষ হয় যারা মহান আল্লাহকে আনুগত্য করেছে। তাই একজন মুসলিমের

সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে মাথা ঘামানো উচিত নয় কারণ এটি কেবল তাদের জন্য উজ্জ্বল হওয়ার মুহূর্ত, যখন তারা আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের প্রকৃত দাসত্ব স্বীকার করে । এটি উভয় জগতের চূড়ান্ত সাফল্যের চাবিকাঠি। সূরা আয-যুমার, আয়াত ১০:

"...*নিশ্চয়ই, ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান বিনা হিসাব [অর্থাৎ, সীমা] দেওয়া হবে।*"

মন্দ পরিকল্পনার ফলাফল

যখন মক্কার অমুসলিমদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সহিংসতা তীব্রতর হয়ে ওঠে, তখন অমুসলিম নেতারা প্রকাশ্যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চাচা আবু তালিব তার গোত্রকে নির্দেশ দেন যে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে তাদের মক্কা অঞ্চলে নিয়ে আসুন এবং মক্কার অমুসলিম নেতাদের হাত থেকে রক্ষা করুন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

কখনোই খারাপ কাজ করার চক্রান্ত করা উচিত নয় কারণ এটি সর্বদা, এক বা অন্যভাবে, তাদের উপরই আঘাত হানবে। এমনকি যদি এই পরিণতিগুলি পরবর্তী জগতে বিলম্বিত হয় তবে তারা অবশেষে এর মুখোমুখি হবে। উদাহরণস্বরূপ, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন যেমন তারা তাদের পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং স্নেহ কামনা করেছিলেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তাদের চক্রান্ত তাদের তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১৮:

"এবং তারা তার জামার উপর মিথ্যা রক্ত আনল। [ইয়াকুব] বলল, "বরং তোমাদের আত্মা তোমাদেরকে কিছু একটার প্রতি প্ররোচিত করেছে, তাই ধৈর্যই সবচেয়ে উপযুক্ত..."

যে যত বেশি মন্দ চক্রান্ত করবে, আল্লাহ তাআলা তত বেশি তাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। এমনকি যদি তারা বাহ্যিকভাবে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ

করে, তবুও আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য উভয় জগতে অভিশাপ হিসেবে তাদের আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটিকেই পরিণত করবেন, যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ৪৩:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজস্ব লোকদের ছাড়া আর কাউকে ঘিরে রাখে না। তাহলে তারা কি পূর্ববর্তী লোকদের পথ [অর্থাৎ, ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করছে?..."

সামাজিক বয়কট

মক্কার অমুসলিম নেতারা যখন আবু তালিবের মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে রক্ষা করার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন তারা একটি চুক্তি করেন যে, তারা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে রক্ষাকারী গোত্রগুলোর সাথে বসবেন না, ব্যবসা করবেন না এবং তাদের বাড়িতে প্রবেশ করবেন না, যতক্ষণ না তারা তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের জন্য আত্মসমর্পণ করেন। এই সামাজিক বয়কট তিন বছর ধরে চলেছিল, যার সময়কালে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ), তাঁর সাহাবীগণ, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন, এমনকি আবু তালিব গোত্রও চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছিল। তাদের বাজার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, মক্কায় তাদের এলাকায় কোনও খাদ্য প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি এবং তাদের সমস্ত ব্যবসায়িক লেনদেন ব্যাহত হয়েছিল। কিন্তু বয়কটের তৃতীয় বছরের শুরুতে, মক্কার অমুসলিমদের পক্ষের কিছু ব্যক্তি এই চুক্তির সমালোচনা করেছিলেন এবং স্বীকার করেছিলেন যে তারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করছেন এবং যা সঠিক তা উপেক্ষা করছেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭-২৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উপরন্তু, আল্লাহ্, মহিমান্বিত, কাঠপোকা প্রেরণ করেছিলেন যারা তাদের মন্দ চুক্তিপত্রের উপর আক্রমণ করেছিল। তারা তাদের চুক্তিপত্রের সাথে সম্পর্কিত সবকিছুই খেয়ে ফেলেছিল, চুক্তিপত্রে যা অবশিষ্ট ছিল তা ছিল শিরক, অবিচার এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহ্, মহিমান্বিত, এটি নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে প্রকাশ করেছিলেন, যিনি তাঁর চাচা আবু তালিবকে বলেছিলেন। আবু তালিব তাঁর বংশের কিছু সদস্যকে নিয়ে আল্লাহর ঘর, কাবার দিকে রওনা হন, যেখানে দলিলটি রাখা হয়েছিল। তিনি প্রথমে অমুসলিমদের নেতাদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের কাছে দলিলের সাথে কী ঘটেছিল তা বলেন এবং আরও বলেন যে যদি তিনি সত্য বলেন তবে তাদের এই চিহ্নটি গ্রহণ করা উচিত এবং তাদের চুক্তি ভঙ্গ করা উচিত। তারা এই বিশ্বাসে সম্মত হন যে তিনি ভুল ছিলেন কিন্তু যখন দলিলগুলি উদ্ধার করা হয়েছিল তখন তারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে আবু তালিব সত্য বলছেন। এই স্পষ্ট চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও তারা কেবল

ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেনি বরং নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর এবং ইসলামের বিরুদ্ধে আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭-২৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, যখনই কেউ ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে নিষেধ করে, তখনই সে অনেকের গাফিলতিপূর্ণ জীবনযাত্রাকে চ্যালেঞ্জ জানাবে , যা তাদেরকে যেভাবেই হোক সত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে অনুপ্রাণিত করবে। পূর্ববর্তী সমস্ত জাতি তাদের পবিত্র নবীদের (সাঃ) প্রত্যাখ্যান করার প্রধান কারণ ছিল এই কারণেই। তারা তাদের জীবনধারা এবং বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করতে পারেনি এবং তাদের প্রতিরক্ষায় আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল। মহিমান্বিত, এবং তাদের পবিত্র নবী , সা. যখন কেউ এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে, তখন তাকে অবশ্যই অন্যদের দ্বারা সৃষ্ট অনেক কষ্টের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত থাকতে হবে , এমনকি তাদের নিজস্ব আত্মীয়স্বজনদের দ্বারাও। পবিত্র নবীগণ , সা. তাদের উপর বর্ষিত হোক, তারা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় , মহিমান্বিত, তবুও তারা অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তাদের জাতি থেকে। কেবল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদিস অধ্যয়ন করা প্রয়োজন , শান্তি এবং এই সত্যটি পালন করার জন্য তাঁর উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর উপর দরুদ বর্ষিত হোক, একবার একটি হাদিসে ঘোষণা করা হয়েছে জামে আত তিরমিযী, ২৪৭২ নম্বরে পাওয়া যায় যে , সৃষ্টির কেউই আল্লাহর পথে নির্যাতিত হয়নি , তার চেয়েও বেশি , উচ্চ।

এই ধরণের ক্ষেত্রে অন্যদের খারাপ মনোভাবের প্রতি ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া শিক্ষিত, শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত এবং কোমল। এর একটি উদাহরণ ১৯তম অধ্যায় মরিয়ম , ৪৬-৪৭ আয়াতে পাওয়া যায় :

“[তার পিতা] বললেন, “হে ইব্রাহিম, তুমি কি আমার উপাস্যদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা করো না? যদি তুমি বিরত না হও, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে পাথর ছুঁড়ে মারব, অতএব আমাকে দীর্ঘকাল দূরে রাখো।” [ইব্রাহিম] বললেন, “তোমার উপর শান্তি [অর্থাৎ, নিরাপত্তা] বর্ষিত হোক। আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।”

এখানে মহানবী ইব্রাহিম (আঃ)-এর সদয় ও শ্রদ্ধাশীল জবাব , শান্তি বর্ষিত হোক। তার উপর, তার বড়দের কঠোর মনোভাবের জন্য আলোচনা করা হয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই , একজন ব্যক্তির অবশ্যই একটি চরিত্রগত ত্রুটি থাকতে হবে যদি সে দাবি করে যে সে সকলের সাথে মিলেমিশে থাকে। সমাজের সদস্যদের মধ্যে পার্থক্যের কারণে একজন ব্যক্তি কখনই সকলের সাথে মিলেমিশে থাকতে পারে না। তারা সর্বদা এক বা একাধিক ব্যক্তি থাকবে যারা ভিন্নমত পোষণ করবে। তাদের মানসিকতা, জীবনধারা এবং পরামর্শের সাথে। এই বৈচিত্র্য উত্তেজনা এবং মাঝে মাঝে সমস্যার সৃষ্টি করবে। কিন্তু যদি একজন ব্যক্তি সকলের পছন্দ হয় তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি প্রমাণ করে যে তারা দ্বিমুখী হয়ে মুনাফিকদের মানসিকতা গ্রহণ করেছে। যদি পবিত্র নবীগণ , শান্তি তাদের উপর বর্ষিত হোক, সকলের কাছে প্রিয় ছিল না একজন সাধারণ মানুষ কিভাবে পারে? এই মর্যাদা অর্জন করেছেন? এই কারণেই আমাদের প্রচারণায় বিশ্বাস করা উচিত নয় কারণ এইভাবে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হওয়া দলটি হলেন পবিত্র নবী (সা.)-এর উপর। তাদের উপর বর্ষিত হোক। সুনান ইবনে মাজাহ, ৪০২৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, একবার এক নির্লজ্জ মহিলা হযরত মুসা (আঃ) -এর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পর্কের মিথ্যা অভিযোগ এনেছিলেন। আল্লাহর শত্রু , মুসা (আঃ)-এর দ্বারা তিনি তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করতে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। মহিমান্বিত , কুরান। যখন সে অভিযোগ করেছিল পবিত্র নবী মুসা (আঃ) এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এক ধর্মীয় সমাবেশে প্রকাশ্যে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। যখন তিনি তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন , তখন তিনি তৎক্ষণাৎ তার অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেন এবং সত্য স্বীকার করেন। ফলস্বরূপ, আল্লাহ , মহিমান্বিত, ধ্বংসপ্রাপ্ত কোরাউনকে পৃথিবীকে তাকে এবং তার বিশাল ভাণ্ডারকে গ্রাস করার নির্দেশ দিয়ে। এই ঘটনাটি ইমাম যাহাবীর "দ্য মেজর সিনস", পৃষ্ঠা ১৬৬-১৬৭ - এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অধ্যায় ২৮ আল কাসাস, আয়াত ৮১:

" এবং আমরা তাকে এবং তার ঘরকে মাটিতে গ্রাস করেছিলাম..."

পবিত্র নবীগণ , শান্তি তাদের উপর অনেকবার অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তাদের লক্ষ্যে অবিচল ছিল যতক্ষণ না তাদের আল্লাহ তায়ালা বিজয় দান করেন। মহিমান্বিত। যখন মহান আল্লাহ, যিনি এমন ব্যক্তিকে সাহায্য করার মতো কাজ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন যিনি সমগ্র সৃষ্টির সাথে বিশ্বাসের সত্য বাণী ছড়িয়ে দেয় তাকে থামাতে পারবে না।

মুসলমানদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, ইসলাম প্রচারের সময় তাদেরও কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। ইসলামের। অতএব , তাদের অবশ্যই পবিত্র নবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে , শান্তি তাদের উপর বর্ষিত হোক, কষ্টের মুখে অবিচল থেকে। সাহাবীদের মনোভাব ছিল এটাই , আল্লাহ! তাদের উপর এবং সৎকর্মশীল পূর্বসূরীদের উপর সন্তুষ্ট থাকো। যদি কেউ পরকালে তাদের সাথে যোগ দিতে চায়, তাহলে তাদেরও এই মনোভাব গ্রহণ করতে হবে।

উপরন্তু, মুসলিমদের বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কটের সমালোচনা অমুসলিমদের কাছ থেকে আসা, এই বিষয়টি আরও ইঙ্গিত দেয় যে মুসলিমদের আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার গুরুত্ব বোঝা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা সাফল্য কামনা করলে পরিত্যাগ করা যাবে না। উভয় জগতেই। ঈমানের প্রকৃত নিদর্শন হলো সারাদিন মসজিদে আল্লাহর ইবাদত করা নয় বরং আল্লাহর হক আদায় করা এবং সৃষ্টির হক আদায় করা। সৃষ্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলির মধ্যে একটি হলো আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা। কেউ ইসলামী পোশাক পরে ধার্মিকতার ভান করতে পারে কিন্তু তারা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে পারে না। যখন কেউ ইতিহাসের পাতায় তারা সর্বদা লক্ষ্য করবে যে, মহান আল্লাহর ধার্মিক বান্দারা তাদের আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রেখেছিলেন। এমনকি যখন তাদের আত্মীয়রা তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করত, তখনও তারা সদয়ভাবে সাড়া দিয়েছিল। অধ্যায় ৪১ ফুসসিলাত, আয়াত ৩৪:

"আর ভালো কাজ ও মন্দ সমান নয়। [মন্দ কাজ] প্রতিহত করো সেই [কাজ] দ্বারা যা উত্তম; তাহলে যার সাথে তোমার শত্রুতা আছে সে [একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হয়ে যাবে।"

সহীহ মুসলিমের ৬৫২৫ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার জন্য প্রচেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে সর্বদা সাহায্য করবেন, এমনকি যদি তার আত্মীয়রা তাদের সাথে ঝামেলা করে। তাদের জন্য.

ভালোর জবাব ভালো দিয়ে দেওয়া বিশেষ কিছু নয়, বরং ভালোর জবাব মন্দ দিয়ে দেওয়া একজন আন্তরিক মুমিনের লক্ষণ। পূর্বের আচরণ এমনকি পশুদের মধ্যেও দেখা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, যখন কেউ কোন পশুর সাথে সদয় আচরণ করে, তখন সে তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে। সহীহ বুখারী, ৫৯৯১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, আত্মীয়স্বজন ছিন্ন করলেও যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে , সে ব্যক্তিই আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরেও সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। তার বেশিরভাগ আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে তিনি সবসময় তাদের প্রতি সদয় আচরণ করতেন।

এটা সর্বজনবিদিত যে, মহান আল্লাহর নৈকট্য ছাড়া কেউ সফল হতে পারে না। কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফের ৫৯৮৭ নম্বর হাদিসে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি পার্থিব কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। মনে রাখবেন, ফরজ নামাজের মতো ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর অধিকার আদায়ের জন্য যতই সংগ্রাম করা হোক না কেন, এটি সত্য। যদি মহান আল্লাহ তাআলা একজন মুসলিমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন, তাহলে তারা কীভাবে তাঁর নৈকট্য এবং চিরস্থায়ী সাফল্য অর্জন করতে পারবে?

অধিকন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আল্লাহ, মহিমান্বিত, শাস্তি বিলম্বিত করেন মানুষকে সুযোগ দেওয়ার জন্য পাপের তওবা করা। কিন্তু পার্থিব কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করলে দ্রুত শাস্তি দেওয়া হয়। সুনান ইবনে মাজাহ, ৪২১২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, আজকাল পৃথিবীতে সম্পর্ক ছিন্ন করা খুবই সাধারণ। মানুষ তুচ্ছ জাগতিক কারণে সহজেই আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে। তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে কোনও ক্ষতি বস্তুজগতে যা ঘটে তা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু যদি তারা মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে তারা উভয় জগতেই দীর্ঘস্থায়ী কষ্টের সম্মুখীন হবে।

ইসলামী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার একটি কারণ যখন কেউ তার পেশার মাধ্যমে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদায় পৌঁছায়। এটি তাদের আত্মীয়স্বজনদের ত্যাগ করতে অনুপ্রাণিত করে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা আর তাদের সাথে যোগাযোগ করার যোগ্য নয়। তাদের সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতি তাদের ভালোবাসা তাদেরকে ভৌতিকতার দরজায় ঠেলে দেয় যা তাদের বিশ্বাস করে যে তাদের আত্মীয়স্বজনরা কেবল তাদের সম্পদ কেড়ে নিতে চায়।

পবিত্র কুরআন ইঙ্গিত দেয় যে, কিয়ামতের দিন এই বন্ধন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সূরা ৪ আন নিসা, আয়াত ১:

"...আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে প্রার্থনা করো এবং গর্ভাশয়কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সর্বদাই পর্যবেক্ষক।"

এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে আত্মীয়তার বন্ধন বজায় না রেখে কেউ ধার্মিকতা অর্জন করতে পারে না। সুতরাং যারা বিশ্বাস করে অতিরিক্ত ইবাদতের

মাধ্যমে তারা তা অর্জন করতে পারে এবং উপবাস ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং তাই তাদের আচরণ পরিবর্তন করতে হবে।

ইসলাম মুসলমানদেরকে তাদের আত্মীয়স্বজনদের সকল প্রকার আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার শিক্ষা দেয়, যখনই এবং যেখানেই সম্ভব ভালো বিষয়ে সহায়তা করার মাধ্যমে। তাদেরকে এমন একটি গঠনমূলক মানসিকতা গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যা আত্মীয়দের সমাজের কল্যাণের জন্য একত্রিত করে, বরং একটি ধ্বংসাত্মক মানসিকতা যা কেবল পরিবারের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। সুনানে আবু দাউদের ৪৯১৯ নম্বর হাদিস অনুসারে, মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে।

যারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে তাদের পবিত্র কুরআনে অভিশপ্ত করা হয়েছে। সূরা ৪৭ মুহাম্মদ, আয়াত ২২-২৩:

"তাহলে কি তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করবে? [যারা তা করে] তারাই হল সেইসব লোক যাদের উপর আল্লাহ অভিশপ্ত করেছেন..."

আল্লাহর অভিশাপে আচ্ছন্ন এবং তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত, তখন এই পৃথিবীতে বা পরকালে কেউ কীভাবে তাদের বৈধ কামনা-বাসনা পূরণ করতে পারে ?

ইসলাম আত্মীয়স্বজনদের সাহায্য করার জন্য তাদের সামর্থ্যের বাইরে যেতে আদেশ দেয় না এবং তাদের আত্মীয়স্বজনের জন্য মহান আল্লাহর সীমানা ত্যাগ করতেও বলে না কারণ সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই যদি এর অর্থ হয় স্রষ্টার অবাধ্যতা। সুনান আবু দাউদের ২৬২৫ নম্বর হাদিসে এটি প্রমাণিত হয়েছে। অতএব, কখনও তাদের আত্মীয়দের মন্দ কাজে শরিক করা উচিত নয়। এই ক্ষেত্রে , একজন মুসলিমের উচিত তাদের আত্মীয়স্বজনদের সৎকাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে তাদের নিষেধ করো, তাদের প্রতি সম্মান বজায় রেখে। ৫ম সূরা আল-মায়েদা, আয়াত ২:

" আর তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

অসংখ্য সুবিধা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী ব্যক্তিই লাভ করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি সম্পর্ক রক্ষা করে, তার রিজিক এবং জীবনে অতিরিক্ত রহমত বর্ষিত হবে। সুনানে আবু দাউদের ১৬৯৩ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এর অর্থ হল, তাদের রিজিক যত কমই হোক না কেন, তাদের জন্য যথেষ্ট হবে এবং এটি তাদের মানসিক প্রশান্তি প্রদান করবে । এবং শরীর। জীবনে অনুগ্রহের অর্থ হল তারা তাদের সমস্ত ধর্মীয় এবং পার্থিব কর্তব্য পালনের জন্য সময় পাবে। এই দুটি আশীর্বাদ মুসলমানরা তাদের সমগ্র জীবন এবং সম্পদ অর্জনের চেষ্টায় ব্যয় করে কিন্তু অনেকেই বুঝতে পারে না যে, মহান আল্লাহ তাদের উভয়কেই আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার ক্ষেত্রে।

আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা এত গুরুত্বপূর্ণ যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদেরকে আদেশ করেছেন এমনকি তাদের অমুসলিম আত্মীয়দের

সাথেও এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা । সহীহ মুসলিম, ২৩২৪ নম্বরে এই পরামর্শ দেওয়া একটি হাদিস পাওয়া যায়।

শয়তানের একটি ফাঁদ হলো, তার লক্ষ্য হলো আত্মীয়স্বজন এবং সমাজের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা, যা পরিবার ভেঙে যায়। এবং সামাজিক বিভাজন। তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো ইসলামকে জাতি হিসেবে দুর্বল করা। দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ দশকের পর দশক ধরে চলতে থাকা এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে আসা ক্ষোভ পোষণ করার জন্য কুখ্যাত হয়ে উঠেছে। একজন ব্যক্তি দশকের পর দশক ধরে তার আত্মীয়ের সাথে ভালো ব্যবহার করবে কিন্তু একটি ভুল এবং তর্কের কারণে সে আর কখনও তাদের সাথে কথা বলবে না বলে শপথ করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন। সহীহ মুসলিমের ৬৫২৬ নম্বরে পাওয়া গেছে যে, একজন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের সাথে পার্থিব কোন বিষয়ে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা অবৈধ। যদি এটিই হয় আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ, তাহলে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার গুরুত্ব কল্পনা করা যায় কি? এই প্রশ্নটি সহীহ বুখারী, ৫৯৮৪ নম্বরে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি পার্থিব কারণে আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে এমন আয়াত ও হাদিসগুলো নিয়ে চিন্তা করা উচিত এবং উপলব্ধি করা উচিত যে, দশকের পর দশক ধরে পাপ করার পরও যদি মহান আল্লাহ তাঁর দরজা বন্ধ না করেন অথবা মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন না করেন, তাহলে মানুষ কেন ছোটখাটো জাগতিক বিষয়ের জন্য তাদের আত্মীয়স্বজনদের থেকে এত সহজেই মুখ ফিরিয়ে নেয়? যদি কেউ আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়, তাহলে এই পরিবর্তন অবশ্যই ঘটাতে হবে।

পরিশেষে, আলোচিত মূল ঘটনাটি ইঙ্গিত দেয় যে কিছু মানুষ বস্তুজগতে এতটাই ডুবে আছে যে তাদের আবরণযুক্ত হৃদয়ে কোন স্পষ্ট প্রমাণ প্রবেশ করতে পারে না। পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে যে কীভাবে এই দলের মানুষের হৃদয় পাথরের চেয়েও শক্ত। সূরা আল বাকারা, আয়াত ৭৪:

"তারপর তোমাদের হৃদয় পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেল, এমনকি আরও কঠিন..."

এই মুহূর্তে যারা ইসলামের বাণী প্রচার করতে চান তাদের উচিত এই ধরণের ব্যক্তি থেকে আলাদা হয়ে অন্যদের উপর মনোনিবেশ করা । তবে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে , এই ক্ষেত্রেও একজন মুসলিমের উচিত পাপীদের প্রতি সর্বদা ভালো চরিত্র প্রদর্শন করা কারণ তারা যেকোনো সময় তওবা করতে পারে। সূরা আল ফুরকান, আয়াত: ৬৩:

"... আর যখন অজ্ঞরা তাদের সাথে [কঠোরভাবে] কথা বলে, তখন তারা [শান্তির] কথা বলে।"

একইভাবে, পবিত্র কুরআনের অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ , মহিমান্বিত, পরামর্শ দেন যে যখন একটা সীমা অতিক্রম করা হয়, তখন একগুঁয়ে এবং বিপথগামী লোকদের আলাদা করে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। তাদের মিথ্যা বিশ্বাসের কাছে। নিঃসন্দেহে এমন একটি দিন আসবে যখন আল্লাহ , মহিমান্বিত, মানবজাতিকে

অবহিত করবে কে সঠিক পথপ্রাপ্ত ছিল আর কে পথভ্রষ্ট ছিল অন্ধকারে। ২৮তম সূরা আল-কাসাস, আয়াত ৫৫:

"আর যখন তারা কোন অশ্লীল কথা শোনে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, "আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক; আমরা অজ্ঞদের খুঁজি না।"

মুসলমানদের কখনই হতাশ এবং বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয় যখন তাদের ভালো পরামর্শ অন্যদের উপর প্রভাব ফেলবে না। কিছু ক্ষেত্রে, এই লোকেরা পাপে ডুবে থাকা অবস্থায় তাদের হৃদয় এতটাই আবৃত হয়ে যায় যে, এই আবৃতি তাদের উপর সৎ উপদেশের প্রভাবকে বাধা দেয়। ইতিবাচকভাবে। একটি হাদিস পাওয়া গেছে সুনান ইবনে মাজাহ, ৪২৪৪ নম্বরে , ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে একটি পাপ আধ্যাত্মিক হৃদয়ে একটি কালো দাগ লেপন করে। যত বেশি পাপ করে, তত বেশি তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় এই অন্ধকারে ডুবে যায়। অধ্যায় ৮৩ আল মুতাফিফিন, আয়াত ১৪:

" না! বরং, তারা যা অর্জন করেছিল তার কলঙ্ক তাদের হৃদয়কে ঢেকে দিয়েছে।"

এটি অন্য একটি আয়াতের অনুরূপ যেখানে আল্লাহ , মহিমান্বিত, ঘোষণা করেন যে তাদের কান, চোখ এবং হৃদয় সত্য থেকে আড়াল করা হয়েছে এবং তাই তাদেরকে সত্যের দিকে পরিচালিত করা যাবে না । সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ৭:

" আল্লাহ তাদের অন্তর ও শ্রবণশক্তির উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টিশক্তির উপর পর্দা চাপিয়ে দিয়েছেন..."

দোষ ইসলামের বাণীর নয়, বরং পথভ্রষ্টদের অন্তরের। ঠিক যেমন দোষ একজন অন্ধ ব্যক্তির চোখে থাকে, উজ্জ্বল সূর্যের চোখে নয়। দুর্ভাগ্যবশত, তার একগুঁয়ে মনোভাব একটি ব্যাপক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। সমাজের মধ্যে। এইসব লোকদের মধ্যে কিছু ইসলামে বিশ্বাস করে কিন্তু পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)- এর হাদিসের শিক্ষার প্রতি তাদের হৃদয় ও মন বন্ধ করে রেখেছে। এবং তার উপর রহমত বর্ষিত হোক। তারা এমন কোন ভালো উপদেশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে যা উভয় জগতেই তাদের উপকারে আসবে।

যারা ইসলামের বাণী প্রচার করতে চান তাদের বুঝতে হবে যে মানুষ দুই ধরণের মানসিকতা গ্রহণ করতে পারে। প্রথমটি হল যখন কেউ কোনও বিষয়ে আগে থেকেই তার মন তৈরি করে এবং তারপরে কেবল সেই বিষয়গুলি অনুসন্ধান করে এবং গ্রহণ করে যা তাদের পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসকে সমর্থন করে। অন্যদিকে , সঠিক মনোভাব হল বিভিন্ন বিষয়ে দৃঢ় প্রমাণ অনুসন্ধান এবং গ্রহণ করে খোলা মনে জীবনযাপন করা। প্রথম মানসিকতা কেবল ব্যক্তিগত স্তর থেকে শুরু করে জাতীয় স্তর পর্যন্ত সমস্যা তৈরি করবে। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু দিক এভাবেই মিডিয়ার কাজের পরিমাণ। তারা পূর্বনির্ধারিত করে তারা যে তথ্য প্রকাশ করতে চায়, দুর্বল সমর্থনকারী প্রমাণের কিছু অংশ খুঁজে বের করতে এবং তারপর তা বিশ্বের সামনে উড়িয়ে দেওয়া উচিত। যারা ইসলামের বাণী প্রচার করছেন তাদের উচিত প্রথম ধরণের লোকদের এড়িয়ে চলা এবং পরিবর্তে দ্বিতীয় দলকে সত্যের দিকে আহ্বান করার দিকে মনোনিবেশ করা।

বন্ধুরা

মক্কার একজন অমুসলিম নেতা উবাই বিন খালাফ একবার তার বন্ধু উকবা বিন আবু মুয়াইতের উপর রেগে যান, যিনি একবার মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কুরআন তেলাওয়াত শুনেছিলেন। উবাই তার বন্ধুকে হুকুম দেন যে, তিনি যেন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেন, অন্যথায় তিনি আর কখনও তাঁর দিকে তাকাবেন না। উকবা তার বন্ধুর প্রতি অন্ধ ভালোবাসার কারণে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি অসম্মান করেছিলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের ২৫ নম্বর সূরা আল ফুরকানের ২৭-২৮ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"আর যেদিন জালেম তার হাত কামড়াবে [অনুতাপে], সেদিন সে বলবে, "হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে কোন পথ অবলম্বন করতাম! হায়, আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি তাকে বন্ধু হিসেবে না নিতাম।"

এই ঘটনাটি ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৫-এ আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের মনে রাখা উচিত যে, প্রকৃত ভালোবাসার একটি প্রধান লক্ষণ হলো যখন কেউ তার প্রিয়জনকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কারণ আনুগত্য ইহকাল ও পরকালে সাফল্য ও নিরাপত্তার দিকে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি কারো জন্য নিরাপত্তা ও সাফল্য কামনা করে না, সে কখনোই তাকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসতে পারে

না, সে যাই দাবি করুক বা অন্য ব্যক্তির সাথে কেমন আচরণ করুক না কেন। একজন ব্যক্তি যখন তার প্রিয়জনকে চাকরির মতো পার্থিব সাফল্য লাভ করে, তখন ঠিক যেমন খুশি হয়, তেমনি সেও তার প্রিয়জনকে আখেরাতে সাফল্য লাভ করতে চায়। যদি একজন ব্যক্তি অন্যের নিরাপত্তা ও সাফল্য লাভের বিষয়ে চিন্তা না করে, বিশেষ করে পরকালে, তাহলে সে তাকে ভালোবাসে না।

একজন প্রকৃত প্রেমিক তার প্রিয়জনকে এই পৃথিবীতে বা পরকালে কষ্ট এবং শাস্তির সম্মুখীন হতে দেখা এবং জানা সহ্য করতে পারে না। এটি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই এড়ানো সম্ভব। অতএব, তারা সর্বদা তাদের প্রিয়জনকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করবে। যদি কেউ অন্যকে আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে নিজের স্বার্থ বা অন্যের স্বার্থের দিকে পরিচালিত করে, তাহলে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে না। এটি বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়স্বজনের মতো সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত মূল্যায়ন করা যে তাদের জীবনের বিষয়গুলি তাদেরকে মহান আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে কিনা। যদি তারা তা করে তবে এটি তাদের প্রতি তাদের ভালোবাসার স্পষ্ট লক্ষণ। যদি তারা তা না করে তবে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাদেরকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে না। অধ্যায় ৪৩ আয যুখরুফ, আয়াত ৬৭:

"সেদিন ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হবে, কেবল সৎকর্মশীলরা ছাড়া।"

যুক্তি

একজন অমুসলিম ইবনে জিবারাহ একবার দাবি করেছিলেন যে, যদি আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুর উপাসনা করা হয় তা জাহান্নামে যায়, তার অর্থ হল যে তারা যে ফেরেশতাদের উপাসনা করত, এবং পবিত্র নবী উযাইর ও ঈসা আলাইহিস সালাম, যাদের কিছু ইহুদি ও খ্রিস্টানরা উপাসনা করত, তারাও জাহান্নামে যাবে। যখন এই কথাটি মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হল, তখন তিনি উত্তর দিলেন যে, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের উপাসনা করতে চায় এবং দাবি করে, তারা তাদের উপাসনাকারীদের সাথে জাহান্নামে থাকবে। এরপর আল্লাহ পবিত্র কুরআনের ২১ নম্বর সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ১০১-১০২ নাযিল করলেন:

" নিশ্চয়ই, যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পূর্বেই কল্যাণ নির্ধারিত আছে, তারা জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে। তারা তার শব্দ শুনতে পাবে না, যখন তারা তাদের আত্মা যা কামনা করে তাতে চিরকাল থাকবে।"

এই আয়াতে পবিত্র নবী উযাইর ও ঈসা (আঃ) এবং কিছু সম্প্রদায় যাদের পূজা করতো সেই ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে। এবং তাদের বিতর্কমূলক এবং নেতিবাচক মানসিকতা নির্দেশ করার জন্য সূরা ৪৩ আয যুখরুফের ৫৭-৫৮ আয়াত নাজিল হয়েছে:

" আর যখন মরিয়মের পুত্রের উদাহরণ দেওয়া হল, তখনই তোমার সম্প্রদায় উচ্চস্বরে হেসে উঠল। তারা বলল, "আমাদের দেবতারা কি ভালো, না সে?" তারা

[অর্থাৎ, তুলনা] কেবল [নিছক] তর্ক ছাড়া পেশ করেনি। বরং, [প্রকৃতপক্ষে], তারা বিতর্কপ্রবণ জাতি।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

বিশেষ করে, এই যুগে মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যারা বিতর্কিত কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, যাতে ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের সত্যিকারের উপকার হয় এবং যারা কেবল এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন, তাদের মধ্যে পার্থক্য কী। যারা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন চান তারা সর্বদা অন্যদের প্রতি সম্মান এবং ভালো চরিত্র দেখান, বিশেষ করে যাদের তারা তাদের কথার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করেন। তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার জন্য কখনও অশ্লীল ভাষা বা কর্মকাণ্ডের দিকে পরিচালিত করেন না। বরং তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করার জন্য তথ্যের ভুল ব্যাখ্যা বা মিথ্যাচার না করে যে বিষয়ে বিতর্ক করছেন তা অধ্যয়ন করেন এবং বোঝেন। তাদের সমালোচনা সর্বদা গঠনমূলক এবং সমাজকে উন্নত করার জন্য তাদের প্রকৃত এবং আন্তরিক উদ্দেশ্য তাদের আচরণ এবং কথার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এইসব মানুষদের প্রতি মুসলমানদের মনোযোগ দেওয়া উচিত কারণ তারা সঠিক হলে সমাজের সকলের উন্নতি হবে। কিন্তু যদি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভুল হয় তবে তারা সত্যকে অন্যদের দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া হলে তা গ্রহণ করবে। কিন্তু যারা এই সঠিক মনোভাবের বিপরীত আচরণ করেন, তারা মিডিয়াতে বা অন্য কোথাও পাওয়া যাক না কেন, তাদের উপেক্ষা করা উচিত কারণ তারা মানুষের জীবন উন্নত করতে চান না। তারা মনোযোগের জন্য ক্ষুধার্ত এবং অন্যদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য শিশুর মতো অভিনয় করে। মুসলমানদের উচিত এই ধরণের লোকদের সাথে সম্পর্কিত ভিডিও বা অন্যান্য সামগ্রী প্রচার করা এবং প্রেরণ করা উচিত নয় কারণ তারা তাদের হাতেই খেলছে এবং তাদের যে মনোযোগ আকর্ষণ করছে তা তাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। এই লোকদের সাথে বিতর্ক করা সম্পূর্ণ সময়ের অপচয় কারণ তাদের খারাপ উদ্দেশ্য এবং আচরণ। পরিবর্তে মুসলমানদের তাদের প্রচেষ্টা অন্য

কার্যকর জায়গায় নিয়োজিত করা উচিত যা তাদের এবং উভয় জগতের অন্যদের উপকার করে।

মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সহযোগিতা

একবার মহানবী (সাঃ) আল্লাহর ঘর কাবা তাওয়াফ করছিলেন। তাঁর ইবাদতের সময়, মক্কার কিছু অমুসলিম নেতা তাঁকে বাধা দেন, যারা দাবি করেন যে, তাদের বিশ্বাসের সাথে আপোষ করে একে অপরের সাথে সহযোগিতা করা সকলের জন্য মঙ্গলজনক। মহানবী (সাঃ) যদি তাদের মূর্তি পূজা করতে রাজি হন, তাহলে তারা আল্লাহর উপাসনা করবে। এইভাবে সকলেই শত্রুতা ছাড়াই একত্রে মিলিত হবে। এর পরে, আল্লাহ, সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, সূরা আল-কাফিরুন, আয়াত ১-৬ নাযিল করেন:

"বল, "হে কাফেররা! আমি যার উপাসনা করি, আমি তার উপাসনা করি না। আর তোমরা যার উপাসনা করি, আমি তার উপাসনাকারী নও। আর আমি যার উপাসনা করি, আমি তার উপাসনাকারী নই। আর তোমরা যার উপাসনা করি, আমি তার উপাসনাকারী নই। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আর আমার জন্য আমার ধর্ম।"

এই ঘটনাটি ইমাম ইবনে কাথিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৫-৩৬-এ লিপিবদ্ধ আছে।

ইসলাম মুসলমানদেরকে নমনীয় হতে শেখায়, যাতে তারা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন পার্থিব বিষয়ের ক্ষেত্রে একগুঁয়েমিপূর্ণ মনোভাব এড়িয়ে চলতে পারে। কিন্তু ইসলামী শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়ে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই দৃঢ় থাকতে হবে এবং তাদের ঈমানের সাথে আপোষ করা

এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এর ফলে উভয় জাহানেই কেবল মানসিক শান্তি নষ্ট হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন, যেমন মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন যে কে মনের শান্তি পাবে আর কে পাবে না। অতএব, তাঁর অবাধ্য হয়ে কখনোই তাদের ঈমানের সাথে আপোষ করা উচিত নয় কারণ তারা যে পার্থিব জিনিসগুলি, যেমন সম্পদ এবং বন্ধুবান্ধব, তা উভয় জাহানেই তাদের জন্য চাপ এবং দুর্দশার উৎস হয়ে উঠবে, এমনকি তারা আনন্দের মুহূর্তগুলি উপভোগ করলেও, কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতা থেকে বাঁচতে পারে না। অধ্যায় ৯ তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

একজন জ্ঞানী রোগী তার ডাক্তারের পরামর্শের সাথে আপস করেন না, এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের দিকে পরিচালিত করে, কারণ তারা জানেন যে এটি দীর্ঘমেয়াদে তাদের জন্য মানসিক এবং শারীরিক ক্ষতির কারণ হবে। একইভাবে, একজন মুসলিমকে বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহর অবাধ্যতা উভয় জগতেই তাদের জন্য মানসিক এবং শারীরিক ক্ষতির কারণ হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে অবাধ্য করে, তার প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, সে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা পাবে না, সে তার জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল জায়গায় রাখবে এবং বিচারের দিনে তার জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হবে। অতএব, এই ব্যক্তি এই পৃথিবীতে বা পরকালে মানসিক শান্তি অর্জন করবে না, এমনকি যদি তারা আনন্দের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে। অতএব, একজন মুসলিমকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থাকতে হবে এবং তাদের নিজস্ব মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য তাদের ঈমানের সাথে আপস করা এড়িয়ে চলতে হবে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 30:

"নিশ্চয়ই, যারা বলেছে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ", তারপর সঠিক পথে অবিচল রয়েছে, তাদের কাছে ফেরেশতারা অবতীর্ণ হবে এবং বলবে, "ভয় করো না এবং দুঃখ করো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ গ্রহণ করো।"

সবার জন্য ইসলাম

একবার মক্কার একজন অত্যন্ত সম্মানিত অমুসলিম নেতা মহানবী (সাঃ) এর সাথে কথোপকথন করছিলেন। তিনি তাকে ইসলাম গ্রহণে রাজি করাতে আগ্রহী ছিলেন কারণ এর ফলে তার পুরো গোত্রও তাকে ইসলামে অনুসরণ করবে। তাদের কথোপকথনের সময় একজন অন্ধ ও দরিদ্র সাহাবী, আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম, অজান্তেই তাদের কথোপকথনে বাধা দেন এবং মহানবী (সাঃ) এর কাছে প্রার্থনা করেন যে তিনি তাকে ইসলাম সম্পর্কে আরও শিক্ষা দিন। যেহেতু মহানবী (সাঃ) অমুসলিম নেতার সাথে কথোপকথন বন্ধ করতে চাননি, তাই তিনি সাময়িকভাবে দরিদ্র সাহাবী (সাঃ) এর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তাকে এই আশায় উত্তর দেননি যে তিনি পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারবেন এবং পরে ফিরে আসবেন। এই মুহূর্তে আল্লাহ, মহিমান্বিত, ৮০ সূরা আবাসার, আয়াত ১-১০ অবতীর্ণ করেন:

" তিনি [রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)] ভ্রুকুটি করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন । কারণ তার কাছে অন্ধ লোকটি এসেছিল, [বাধা দিচ্ছিল]। কিন্তু তুমি কি বুঝতে পারো যে হয়তো সে পবিত্র হবে। অথবা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে এবং স্মরণ করিয়ে দেওয়া তার উপকারে আসবে? যে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তার দিকে মনোযোগ দাও। আর যদি সে পবিত্র না হয় তবে তোমার উপর কোন দোষ নেই। কিন্তু যে তোমার কাছে [জ্ঞানের জন্য] সংগ্রাম করতে এসেছিল। অথচ সে [আল্লাহকে] ভয় করে। তুমি তার থেকে বিচ্যুত।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনায়, মহান আল্লাহ মানবজাতিকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে ইসলামের দাওয়াত এবং তা গ্রহণের পর সকল মানুষ সমান। এই দাওয়াতের ক্ষেত্রে কাউকেই অন্যদের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয়, যেমন সামাজিক মর্যাদা, এমনকি যদি কারো নিয়ত ভালোও হয়। আল্লাহ ইসলামের দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের উপর অনুগ্রহ করেন, মানুষ ইসলামের দাওয়াত শুনে বা গ্রহণ করে আল্লাহর উপর কোন অনুগ্রহ করে না। যদি কেউ ইসলাম প্রত্যাখ্যান করতে চায়, তাহলে তাতে আল্লাহর কোন পার্থক্য নেই, কারণ এই ব্যক্তিকে তার পছন্দের পরিণতি ভোগ করতে হবে, ঠিক যেমন ইসলামের দাওয়াত শোনে এবং গ্রহণ করে এমন ব্যক্তিকে তার পছন্দের পরিণতি ভোগ করতে হবে।

অধিকন্তু, আলোচিত মূল ঘটনাটি এই বিষয়টিও বোঝার গুরুত্বকে নির্দেশ করে যে, একমাত্র মানদণ্ড যা মানুষকে একে অপরের থেকে পৃথক করে তা হল মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ড। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

যে ব্যক্তি যত বেশি আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে, সে তত বেশি শ্রেষ্ঠ। এই আনুগত্যের মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। সমাজ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য সমস্ত মান, যেমন লিঙ্গ, জাতিগততা, সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদা, ইসলামের দৃষ্টিতে কোন মূল্য নেই এবং তাই এগুলিকে উপেক্ষা করা উচিত। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যেহেতু কারও নিয়ত গোপন থাকে,

তাই কেউ নিজের বা অন্যের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে না। সূরা ৫৩ আন নাজম, আয়াত ৩২:

"... তাই তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবি করো না; তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কে তাঁকে ভয় করে।"

এই একক মানদণ্ড বুঝতে এবং তা অনুসরণ করতে ব্যর্থ হলে বর্ণবাদের মতো বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

সদয় ও কোমল প্রচার

দাওস গোত্রের একজন সম্মানিত ও সম্মানিত ব্যক্তি তুফায়েল বিন আমর একবার মক্কা সফরে এলে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে সতর্ক করে এবং জোর দিয়ে বলেন যে তিনি যেন তাঁর কথা না শোনেন এবং তাঁর সাথে কথা না বলেন। তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর বাণী না শোনার জন্য তার কানে তুলাও ঢেকে রাখেন। কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেখার পর, তিনি তার সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নেন যে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে যা আহ্বান করেন তা যদি ভালো হয় তবে তিনি তা গ্রহণ করবেন কিন্তু যদি তা খারাপ হয় তবে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করবেন। ইসলামের শিক্ষা শোনার পর তিনি তা গ্রহণ করেন এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়ে তার গোত্রে ফিরে যান। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে তার গোত্রের কাছে সদয় ও ভদ্রভাবে প্রচার করার পরামর্শ দেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, তুফাইল (রাঃ) অন্যদের উপদেশ অন্ধভাবে অনুসরণ করার পরিবর্তে তার সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করেছিলেন। অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করা সর্বদাই পথভ্রষ্টতা, পাপ এবং অপরাধের একটি প্রধান কারণ এবং তাই ইসলাম কর্তৃক তীব্র সমালোচনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, এমনকি অন্ধভাবে ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করাও ইসলাম কর্তৃক সমালোচনা করা হয়েছে, কারণ মহান আল্লাহ আশা করেন যে মানুষ খোলা মনে ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করবে এবং তারপর জ্ঞান ও প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলাম গ্রহণ করবে এবং অন্যদের, যেমন নিজের পরিবারকে অন্ধভাবে অনুকরণ করার পরিবর্তে অনুসরণ করবে। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

এবং ৩৪তম অধ্যায় সাবা, ৪৬তম আয়াত:

"বলুন, "আমি তোমাদেরকে কেবল একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি - তোমরা আল্লাহর জন্য জোড়ায় জোড়ায় এবং এককভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, তারপর চিন্তা করো।" তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন পাগলামি নেই। তিনি কেবল তোমাদেরকে কঠোর শাস্তির পূর্বে সতর্ককারী।"

ইসলামে অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ করা প্রায়শই পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করে কারণ এই ব্যক্তি যখন অন্ধভাবে অনুসরণকারীরা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য থেকে সরে যায় তখন তা বুঝতে ব্যর্থ হয়। যখন এটি ঘটে, তখন এই ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে তারা ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করছে যখন তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামী শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত নয় এমন প্রথাগত অনুশীলনের উপর আমল করছে। যে ব্যক্তি এই মনোভাব ধরে রাখবে সে অজান্তেই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ করার পরিবর্তে ইসলামী জ্ঞানের উপর আমল করবে সে সহজেই এমন অনুশীলনগুলিকে স্বীকৃতি দেবে যা ইসলামে মূলগত নয় এবং তাই সেগুলি এড়িয়ে চলবে। ফলস্বরূপ, তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্যকে মেনে চলবে, যা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে।

অতএব, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই অন্ধভাবে অন্যদের অনুকরণ করা এড়িয়ে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তে, তাদের প্রতিটি পরিস্থিতির সাথে খোলা মনে মোকাবিলা করতে হবে এবং যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রমাণ এবং জ্ঞান মূল্যায়ন করতে হবে। এই পদ্ধতি নিশ্চিত করবে যে তারা যে কোনও পার্থিব এবং ধর্মীয় সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তার সঠিক নির্দেশনা অর্জন করবে।

আলোচ্য মূল ঘটনাটিও ইসলামের বাণীকে কোমল ও সদয়ভাবে প্রচারের গুরুত্ব নির্দেশ করে। ইসলামের সৌন্দর্য কোমলতার মধ্যে রয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৬৮৯ নম্বরের হাদিসের মতো অনেক হাদিসে এই পরামর্শ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে এমনকি উল্লেখ করা হয়েছে যে সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে সর্বদা প্রেমের সাথে থাকতেন, তাঁর কোমল স্বভাবের কারণে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯:

" অতএব, [হে মুহাম্মদ], আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি কোমল ছিলেন। আর যদি আপনি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

আরবরা কঠোর হৃদয়ের জন্য কুখ্যাত ছিল কিন্তু মহানবী (সা.)-এর কারণে , শান্তি ও তাঁর উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, প্রায়শই তাদের কঠোর হৃদয় গলে যায় এবং এভাবে তারা গ্রহণ করে এই গুণটি এবং বাকি মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠে। এই কারণেই মহানবী মুহাম্মদ , শান্তি এবং তাঁর উপর বরকত বর্ষিত হোক, একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে সুনান আবু দাউদ, ৪৮০৯

নম্বরে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি ভদ্রতা থেকে বঞ্চিত, সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৩:

"... আর তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো- যখন তোমরা শত্রু ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে সম্প্রীতি স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছো..."

যারা ইসলামের বাণী প্রচার করতে চান তাদের জন্য এটি একটি স্পষ্ট বার্তা। তাদের কঠোর ধ্বংসাত্মক মানসিকতার চেয়ে কোমল গঠনমূলক মানসিকতা থাকা উচিত। তাদের উচিত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং অন্যদের উপকার করার চেষ্টা করা, সমাজের মধ্যে বিতর্ক। এর একটি ভালো উদাহরণ এই সন্তানদের প্রতি ব্যক্তির মনোভাবের মধ্যে এটি দেখা যায়। যেসব বাবা-মা তাদের সন্তানদের প্রতি কোমল মনোভাব দেখিয়েছিলেন , তাদের সন্তানদের উপর দত্তক নেওয়া বাবা-মায়ের তুলনায় বেশি ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। কঠোর স্বভাব। প্রায়শই কেউ কেউ তাদের কঠোর মনোভাবের মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয় এবং এটি ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে চ্যালেঞ্জ করে মহানবী (সাঃ)-এর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। উদাহরণস্বরূপ, একবার একজন অশিক্ষিত বেদুইন মহানবী (সাঃ) -এর মসজিদে প্রস্রাব করে ফেলল। যখন সাহাবীরা , আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন, তাকে শাস্তি দিতে চাইলেন। মহানবী মুহাম্মদ , শান্তি তাঁর উপর রহমত বর্ষিত হোক, তিনি তাদেরকে নিষেধ করেছিলেন এবং মসজিদে থাকার আদব-কায়দা সম্পর্কে বেদুইনদেরকে নম্রভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই ঘটনাটি সুনান ইবনে মাজাহের ৫২৯ নম্বর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এই নরম মনোভাব লোকটির উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায়ও এর উল্লেখ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যদিও ফেরাউন নিজেকে সর্বোচ্চ প্রভু বলে দাবি করেছিল তবুও মহান আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ)-কে আদেশ করলেন , তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। উভয়কেই, ফেরাউনকে আমন্ত্রণ জানাতে মৃদু ও সদয় কথাবার্তার মাধ্যমে পথনির্দেশনার দিকে। অধ্যায় ৭৯ আন নাজিয়াত, আয়াত ২৪:

"এবং বলল, "আমি তোমাদের সবচেয়ে মহান প্রতিপালক।"

এবং অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ৪৩-৪৪:

"তোমরা দুজনেই ফেরাউনের কাছে যাও। নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘন করেছে। আর তার সাথে নম্রভাবে কথা বলো, হয়তো সে স্মরণ করবে অথবা [আল্লাহকে] ভয় করবে।"

শিশুরা আর পশুরাও ভদ্রতার ভাষা বোঝে। তাহলে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যদি ইসলাম ও কল্যাণের দিকে দাওয়াত দেওয়ার সময় এই বৈশিষ্ট্যটি গ্রহণ করে, তাহলে কীভাবে তাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করা যাবে না? এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর উপর দরুদ বর্ষিত হোক, একবার একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে সহীহ মুসলিম, ৬৬০১ নম্বরে পাওয়া গেছে যে , আল্লাহ , তিনি তাঁর অসীম মর্যাদা অনুসারে দয়ালু এবং কোমল এবং সৃষ্টিকে একে অপরের সাথে নরম আচরণ করতে পছন্দ করেন। দুর্ভাগ্যবশত, যারা এই কথাটি ছড়িয়ে দেয় তাদের অনেকেই ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা এই ভুল বিশ্বাস গ্রহণ করেছেন যে,

কোমল হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ। এটি শয়তানের একটি চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ সে মানবজাতিকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চায়।

মক্কায় দুর্ভিক্ষ

যখন মক্কার অমুসলিমদের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং সাহাবীদের উপর সহিংসতা আরও তীব্র হয়ে ওঠে, তখন আল্লাহ, মক্কায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করেন। দুর্ভিক্ষ এতটাই ভয়াবহ ছিল যে অমুসলিমদের মৃতদেহ, চামড়া এবং হাড় খেতে বাধ্য করা হয়েছিল। মক্কার কিছু অমুসলিম নেতা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে এসে বলেন যে তিনি দাবি করেন যে তাঁর লক্ষ্য মানবজাতির জন্য রহমত, তাই তাঁর উচিত এই দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য প্রার্থনা করা। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং মক্কায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছিল এবং দুর্ভিক্ষের প্রভাব দূর হয়েছিল। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৯-৬০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ২৩ সূরা আল মু'মিনুনের ৭৬ নং আয়াত নাযিল করেছেন:

"আর আমি তাদেরকে [সতর্কীকরণ হিসেবে] কষ্ট দিয়ে পাকড়াও করেছিলাম, কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার কাছে নতি স্বীকার করেনি এবং বিনীতভাবে প্রার্থনাও করেনি।"

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ২৩:৭৬, পৃষ্ঠা ১১৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলাম হলো রহমতের একটি মিশন কারণ এর লক্ষ্য হলো মানুষকে এই পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করা। এই পরীক্ষায় জড়িত থাকে যে, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, কেউ প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করছে কিনা। যে ব্যক্তি সঠিকভাবে আচরণ করবে, সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে। যে আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবে, তার মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ হবে এবং নিশ্চিত করবে যে, সে তার জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থান দেবে এবং বিচার দিবসে জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেবে। যেহেতু মহান আল্লাহ সবকিছু জানেন, তাই তিনিই একমাত্র নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা নিশ্চিত করে যে, জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করা সম্ভব। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্যের মাধ্যমে মানবজাতির জন্য রহমত হিসেবে এই জ্ঞান দান করা হয়েছে। তাঁর উপর শান্তি ও শান্তি বর্ষিত হোক।

এছাড়াও, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মানুষকে জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ক করা এবং এই পৃথিবীতে শাস্তি দেওয়াও মহান আল্লাহর রহমতের কাজ। জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ক করা ভয়াবহ হতে পারে কিন্তু এটি তাদেরকে পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করার সুযোগ দেয় যাতে তারা জাহান্নামে প্রবেশ এড়াতে পারে। যদি আল্লাহ, মহান, মানুষকে জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ক না করতেন, যেমন তিনি তাদের ভয় দেখাতে চাননি, তাহলে অধিকাংশ মানুষই বিচারের দিন জাহান্নামে যেত কারণ তারা অজ্ঞতা এবং জাহান্নামের তীব্রতাকে ছোট করে দেখার কারণে সেখানে প্রবেশ এড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করত না। তাঁর সতর্কীকরণ সকলকে জাহান্নামে প্রবেশ থেকে বিরত রাখবে এবং এই সতর্কীকরণগুলি তাঁর পক্ষ থেকে রহমতের কাজ। অধিকন্তু, যখন কেউ এই পৃথিবীতে তাদের পাপের জন্য শাস্তির সম্মুখীন হয়, তখন এটি তাদেরকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে এবং বিচারের দিনের আগে নিজেকে সংশোধন করতে উৎসাহিত করে, যখন কোন তওবা কবুল করা হবে না। যদি কোন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে কোন সমস্যার সম্মুখীন না হয়, তাহলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তাদের অবাধ্যতা চালিয়ে যাবে। অতএব, একটি পার্থিব শাস্তি যা একজন ব্যক্তিকে ধ্বংস করে না, তাও আল্লাহর রহমত। অধ্যায় 32 সাজদাহ, আয়াত 21:

"আর আমরা অবশ্যই তাদেরকে বড় শাস্তির পরিবর্তে লঘু শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো, হয়তো তারা ফিরে আসবে।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিমের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, সৃষ্টির কোনও কিছুই বিজ্ঞ কারণ ছাড়া ঘটে না, এমনকি যদি মানুষ এই জ্ঞান তাৎক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ নাও করে। একজন মুসলিমের উচিত যা কিছু ঘটে, তা সে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা অসুবিধার সময়, তাকে বোতলের মধ্যে একটি বার্তা হিসাবে বিবেচনা করা। বোতলের মূল্যায়ন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাদের খুব বেশি ব্যস্ত থাকা উচিত নয় কারণ এটি কেবল একটি বার্তাবাহক যা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দেয়। এটি তখন ঘটে যখন মুসলমানরা ঘটে যাওয়া ভালো জিনিসগুলিতে আনন্দিত হয় যার ফলে ভালো জিনিসের মধ্যে বার্তার প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়ে। অথবা তারা অসুবিধার সময় শোকাহত হয় যার ফলে অসুবিধার মধ্যে বার্তাটি বুঝতে খুব বেশি বিভ্রান্ত হয়। তাদের পরিবর্তে পবিত্র কুরআনের উপদেশ অনুসরণ করার উপর মনোনিবেশ করা উচিত এবং প্রতিটি পরিস্থিতিকে ভারসাম্যপূর্ণভাবে মোকাবেলা করা উচিত। অধ্যায় ৫৭ আল হাদিদ, আয়াত ২৩:

"যাতে তুমি যা হারিয়ে ফেলেছ তার জন্য হতাশ না হও এবং তিনি যা দিয়েছেন তার জন্য [গর্বে] আনন্দিত না হও..."

এই আয়াতটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সুখী বা দুঃখী হতে নিষেধ করে না কারণ এটি মানব প্রকৃতির একটি অংশ। তবে এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতির পরামর্শ দেয় যেখানে একজন ব্যক্তি চরম আবেগ যেমন উল্লাস যা অতিরিক্ত সুখ বা শোক যা অতিরিক্ত দুঃখ এড়িয়ে চলে। এই ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতিটি একজন ব্যক্তিকে

বোতলের ভিতরে থাকা আরও গুরুত্বপূর্ণ বার্তার উপর তাদের মনকে কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করবে, পরিস্থিতির ভিতরে, তা স্বাচ্ছন্দ্যের বা অসুবিধার পরিস্থিতি হোক। লুকানো বার্তাটি মূল্যায়ন, বোঝার এবং তার উপর কাজ করার মাধ্যমে একজন মুসলিম তাদের পার্থিব এবং ধর্মীয় জীবনকে আরও উন্নত করতে পারে। কখনও কখনও বার্তাটি তাদের সময় শেষ হওয়ার আগে মহান আল্লাহর দিকে ফিরে আসার জন্য একটি জাগরণ আহ্বান হবে। কখনও কখনও এটি তাদের পদমর্যাদা বৃদ্ধির একটি উপায় হবে। কখনও কখনও এটি তাদের পাপ মুছে ফেলার একটি উপায় হবে এবং কখনও কখনও পার্থিব বস্তুগত জগৎ এবং এর মধ্যে থাকা জিনিসগুলির সাথে নিজেকে সংযুক্ত না করার জন্য একটি স্মারক হবে। এই মূল্যায়ন ছাড়া কেউ কেবল তাদের পার্থিব বা ধর্মীয় জীবনের উন্নতি না করেই ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করবে।

সেরা কোম্পানি

মহানবী (সাঃ) সর্বদাই আগ্রহী ছিলেন যেন মানুষ তাদের নিজেদের স্বার্থে ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি বিশেষ করে অমুসলিমদের নেতাদের জন্য এটি করতে আগ্রহী ছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে যদি এটি ঘটে তবে তাদের অনুসারীরা আরও সহজেই ইসলাম গ্রহণ করবে। মক্কার অমুসলিমরা, যারা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হত, যখন ইসলাম সম্পর্কে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে কথা বলতে চাইল, তখন তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে দাবি জানাল যে তিনি যেন তাঁর দরিদ্র সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তাদের সভায় তাদের সরিয়ে দেন কারণ তারা দরিদ্রদের সাথে বসতে চান না। যখন মহানবী (সাঃ) এই বিষয়টি বিবেচনা করেছিলেন, শুধুমাত্র তাদের ইসলাম গ্রহণের আগ্রহের কারণে, নিম্নলিখিত আয়াত এবং অনুরূপ আয়াতগুলি নাজিল হয়েছিল: সূরা 6 আল আন'আম, আয়াত 52-54:

"আর যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে তাড়িয়ে দিও না। তাদের কোন হিসাব তোমার উপর নেই এবং তোমার কোন হিসাব তাদের উপর নেই। যদি তুমি তাদেরকে তাড়িয়ে দাও, তাহলে তুমিও জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এভাবেই আমি তাদের কাউকে কাউকে অন্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছি যাতে তারা বলে, "আমাদের মধ্যে কি এদেরকেই আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন?" আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে ভালো জানেন না? আর যখন তোমাদের কাছে তারা আসে যারা আমাদের আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে, তখন বলো, "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের পালনকর্তা নিজের উপর রহমত ফরজ করেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞতাবশত অন্যায় করে, তারপর তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে, তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

ইমাম আল ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৬:৫২, পৃষ্ঠা ৭৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি ইঙ্গিত দেয় যে ইসলাম সকলের জন্য একটি ধর্ম এবং তাই লিঙ্গ, জাতি, সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার মতো সমস্ত পার্থিব বাধা, যা মানুষকে পৃথক করে, তার কোনও মূল্য নেই এবং মুসলমানদের দ্বারা কখনই এগুলি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সকলের সাথে আচরণ করা উচিত। যদিও একজন ব্যক্তির জীবনের কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির তাদের সদয় আচরণের অধিকার বেশি, যেমন তার পিতামাতা, কিন্তু তবুও, একজনের সকলের সাথে শ্রদ্ধা ও সদয় আচরণ করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুসলিম বা মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি একজন ব্যক্তি এবং তার সম্পত্তি থেকে দূরে রাখে। সুনানে আন নাসায়ীর ৪৯৯৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও, কারও কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয় যে সে তার পার্থিব জিনিসপত্রের কারণে অন্যদের থেকে কোনওভাবেই শ্রেষ্ঠ, কারণ এই মনোভাব তাকে কেবল ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের সাথে আচরণ করতে ব্যর্থ করবে। একজন ব্যক্তির বিশ্বাস করার কোনও অধিকার নেই যে সে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ, কারণ তার কাছে থাকা প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদই তাকে সৃষ্টি করেছে এবং দান করেছে, মহান আল্লাহ। অতএব, অন্যের মালিকানাধীন জিনিসের উপর তাদের গর্ব করার কোন অধিকার নেই। শ্রেষ্ঠত্ব কেবল মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত। সূরা ৪৯, আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এর মধ্যে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। যেহেতু একজনের নিয়ত এবং তার বেশিরভাগ কাজ গোপন থাকে, তাই কেউ যেন নিজেকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে না করে এবং অন্যদেরকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি না করে। সূরা ৫৩ আন নাজম, আয়াত ৩২:

"... তাই তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবি করো না; তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কে তাঁকে ভয় করে।"

সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা

মক্কার অমুসলিমরা মহানবী (সাঃ) এর কাছে তাঁর ঘোষণার সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য পবিত্র কুরআনের বাইরে অন্য কোন অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল। তিনি তাদেরকে চাঁদের দ্বিখণ্ডিতকরণ দেখিয়েছিলেন। এই স্পষ্ট নিদর্শনের পরেও তারা কেবল দাবি করেছিল যে তিনি তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়েছেন। এই সময় সূরা আল-কামারের ৫৪ নম্বর আয়াত, ১-৩ নম্বর আয়াত নাজিল হয়েছিল:

"কেয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে, এবং চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। আর যদি তারা কোন নিদর্শন [অর্থাৎ, অলৌকিক ঘটনা] দেখে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, "যাদু"। আর তারা অস্বীকার করে এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। কিন্তু প্রতিটি বিষয়েরই একটি মীমাংসা আছে।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত ৩৬৩৭ নম্বর হাদিসেও এই ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন মানবজাতিকে শিক্ষা দেয় যে কিছু মানুষ বস্তুগত জগতে এতটাই ডুবে আছে যে তাদের অন্তরে কোন উপদেশ প্রবেশ করতে পারে না। পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে যে, এই দলের মানুষের হৃদয় পাথরের চেয়েও শক্ত। সূরা আল বাকারা, আয়াত ৭৪:

"তারপর তোমাদের হৃদয় পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেল, এমনকি আরও কঠিন..."

এই মুহুর্তে যারা ইসলামের বাণী প্রচার করতে চান তাদের উচিত এই ধরণের ব্যক্তি থেকে আলাদা হয়ে অন্যদের উপর মনোনিবেশ করা । তবে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে , এই ক্ষেত্রেও একজন মুসলিমের উচিত পাপীদের প্রতি সর্বদা ভালো চরিত্র প্রদর্শন করা কারণ তারা যেকোনো সময় তওবা করতে পারে। সূরা আল ফুরকান, আয়াত: ৬৩:

"... আর যখন অজ্ঞরা তাদের সাথে [কঠোরভাবে] কথা বলে, তখন তারা [শান্তির] কথা বলে।"

একইভাবে, পবিত্র কুরআনের অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ , মহিমান্বিত, পরামর্শ দেন যে যখন একটা সীমা অতিক্রম করা হয়, তখন একগুঁয়ে এবং বিপথগামী লোকদের আলাদা করে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। তাদের মিথ্যা বিশ্বাসের কাছে। নিঃসন্দেহে এমন একটি দিন আসবে যখন আল্লাহ , মহিমান্বিত, মানবজাতিকে অবহিত করবে কে সঠিক পথপ্রাপ্ত ছিল আর কে পথভ্রষ্ট ছিল অন্ধকারে। ২৮তম সূরা আল-কাসাস, আয়াত ৫৫:

"আর যখন তারা কোন অশ্লীল কথা শোনে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, "আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক; আমরা অজ্ঞদের খুঁজি না।"

মুসলমানদের কখনই হতাশ এবং বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয় যখন তাদের ভালো পরামর্শ অন্যদের উপর প্রভাব ফেলবে না। কিছু ক্ষেত্রে, এই লোকেরা পাপে ডুবে থাকা অবস্থায় তাদের হৃদয় এতটাই আবৃত হয়ে যায় যে, এই আবৃতি তাদের উপর সৎ উপদেশের প্রভাবকে বাধা দেয়। ইতিবাচকভাবে। একটি হাদিস পাওয়া গেছে সুনান ইবনে মাজাহ, ৪২৪৪ নম্বরে , ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে একটি পাপ আধ্যাত্মিক হৃদয়ে একটি কালো দাগ খোদাই করে । যত বেশি পাপ করে, তত বেশি তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় এই অন্ধকারে ডুবে যায়। অধ্যায় ৮৩ আল মুতাফিফিন, আয়াত ১৪:

" না! বরং, তারা যা অর্জন করেছিল তার কলঙ্ক তাদের হৃদয়কে ঢেকে দিয়েছে।"

এটি অন্য একটি আয়াতের অনুরূপ যেখানে আল্লাহ , মহিমান্বিত, ঘোষণা করেন যে তাদের কান, চোখ এবং হৃদয় সত্য থেকে আড়াল করা হয়েছে এবং তাই তাদেরকে সত্যের দিকে পরিচালিত করা যাবে না । সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ৭:

" আল্লাহ তাদের অন্তর ও শ্রবণশক্তির উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টিশক্তির উপর পর্দা চাপিয়ে দিয়েছেন..."

দোষ ইসলামের বাণীর নয়, বরং পথভ্রষ্টদের অন্তরের। ঠিক যেমন দোষ একজন অন্ধ ব্যক্তির চোখে থাকে, উজ্জ্বল সূর্যের চোখে নয়। দুর্ভাগ্যবশত, তার একগুঁয়ে

মনোভাব একটি ব্যাপক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। সমাজের মধ্যে। এইসব লোকদের মধ্যে কিছু ইসলামে বিশ্বাস করে কিন্তু পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)- এর হাদিসের শিক্ষার প্রতি তাদের হৃদয় ও মন বন্ধ করে রেখেছে। এবং তার উপর রহমত বর্ষিত হোক। তারা এমন কোন ভালো উপদেশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে যা উভয় জগতেই তাদের উপকারে আসবে।

যারা ইসলামের বাণী প্রচার করতে চান তাদের বুঝতে হবে যে মানুষ দুই ধরণের মানসিকতা গ্রহণ করতে পারে। প্রথমটি হল যখন কেউ কোনও বিষয়ে আগে থেকেই তার মন তৈরি করে এবং তারপরে কেবল সেই বিষয়গুলি অনুসন্ধান করে এবং গ্রহণ করে যা তাদের পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসকে সমর্থন করে। অন্যদিকে , সঠিক মনোভাব হল বিভিন্ন বিষয়ে দৃঢ় প্রমাণ অনুসন্ধান এবং গ্রহণ করে খোলা মনে জীবনযাপন করা। প্রথম মানসিকতা কেবল ব্যক্তিগত স্তর থেকে শুরু করে জাতীয় স্তর পর্যন্ত সমস্যা তৈরি করবে। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু দিক এভাবেই মিডিয়ার কাজের পরিমাণ। তারা পূর্বনির্ধারিত করে তারা যে তথ্য প্রকাশ করতে চায়, দুর্বল সমর্থনকারী প্রমাণের কিছু অংশ খুঁজে বের করতে এবং তারপর তা বিশ্বের সামনে উড়িয়ে দেওয়া উচিত। যারা ইসলামের বাণী প্রচার করছেন তাদের উচিত প্রথম ধরণের লোকদের এড়িয়ে চলা এবং পরিবর্তে দ্বিতীয় দলকে সত্যের দিকে আহ্বান করার দিকে মনোনিবেশ করা।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চাচা আবু তালিবের মৃত্যু

যখন মহানবী (সাঃ) এর চাচা আবু তালিব মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, তখন তাঁর অমুসলিম আত্মীয়স্বজনরা তাঁর বাড়িতে জড়ো হয়েছিলেন এবং তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি মহানবী (সাঃ) কে তাদের সাথে আপোষ করতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু পরিবর্তে মহানবী (সাঃ) আবু তালিবকে ইসলাম গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেন এবং উৎসাহিত করেন। কিন্তু আবু তালিব অমুসলিম অবস্থায় মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁর আত্মীয়স্বজনরা তাঁকে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকেন। মহানবী (সাঃ) ঘোষণা করেন যে, তিনি তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা চালিয়ে যাবেন যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইসলাম গ্রহণ থেকে নিষেধ করেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তওবার ৯ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"নবী এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য এটা জায়েজ নয় যে তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যদিও তারা আত্মীয়স্বজন হয়, যখন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে তারা জাহান্নামী।"

এবং ২৮তম অধ্যায় আল কাসাস, ৫৬তম আয়াত:

"নিশ্চয়ই, তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে সৎপথে পরিচালিত করো না, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন। এবং তিনি [সঠিক] সৎপথপ্রাপ্তদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮৩-৮৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে এবং সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদিস, ৪৭৭২ নম্বরেও এই ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও আবু তালিব একজন অমুসলিম হিসেবে মারা গিয়েছিলেন, তবুও তাঁর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে রক্ষা করার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বৃথা যায়নি। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার নিশ্চিত করেছিলেন যে তাঁর কারণেই আবু তালিব জাহান্নামের গভীরতম স্থানে নয় বরং তার অগভীর স্থানে অবস্থান করবেন, যা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসের কারণেই হত। সহীহ মুসলিমের ৫১০ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে, মহান আল্লাহ তাআলা কারো উপর সঠিক পথনির্দেশনা বা পথভ্রষ্টতা চাপিয়ে দেন না কারণ এটি এই পৃথিবীতে জীবনের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে। মহান আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট প্রমাণ ও প্রমাণের ভিত্তিতে সত্য উপস্থাপন করেন এবং তারপর মানুষকে তাদের নিজস্ব পছন্দ করার অনুমতি দেন। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি সঠিক পথনির্দেশনা চান তবে তাকে অবশ্যই খোলা মনে ইসলামী জ্ঞান গবেষণা করতে হবে এবং তারপর এর স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে এর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। এই আত্মসমর্পণের মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। অতএব, একজন ব্যক্তি এই ব্যবহারিক সংগ্রাম ছাড়া সঠিক পথনির্দেশনা পাবে না, কারণ মহান আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর সঠিক পথনির্দেশনা চাপিয়ে দেন না।

এছাড়াও, কেউ অন্যদের উপর, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজনদের উপর, সঠিক নির্দেশনা জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে না। একজন মুসলিমের ভূমিকা হলো ইসলামের শিক্ষা অন্যদের কাছে স্পষ্ট করে দেওয়া যাতে তারা অন্ধ অনুকরণের

পরিবর্তে প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার উপর কাজ করে। তাহলে একজন ব্যক্তি নিজের পথ বেছে নিতে স্বাধীন এবং যে মুসলিম তাদের কাছে ইসলামী শিক্ষা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেছে সে দোষমুক্ত থাকবে এবং অন্যদের সিদ্ধান্তের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। অধ্যায় ৮৮ আল গাশিয়াহ, আয়াত ২১-২২:

"সুতরাং স্মরণ করিয়ে দাও, তুমি কেবল স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। তুমি তাদের উপর নিয়ন্ত্রক নও।"

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত তাদের কর্তব্য ও দায়িত্বের উপর মনোনিবেশ করা এবং এমন বিষয় নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয় যার জন্য তারা দায়ী থাকবে না, যেমন অন্যদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালনের পর তাদের জীবন পছন্দ।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর স্ত্রী খাদিজা (রাঃ) এর মৃত্যু

মহানবী (সাঃ) এর এই কঠিন বছরগুলিতে, তাঁর প্রিয় স্ত্রী খাদিজা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। তাঁর সমস্ত বিপদে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত উপদেষ্টা ছিলেন এবং তিনি সর্বদা তাঁর কাছ থেকে আশ্বাস চাইতেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার বহু বছর পর তার কথা স্মরণ করে তার প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, যখন অন্য কেউ তাকে বিশ্বাস করেনি, তখন তিনি তার উপর ঈমান এনেছিলেন। যখন লোকেরা তাকে অবিশ্বাস করেছিল, তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এবং যখন তাকে সাহায্য করার জন্য আর কেউ ছিল না, তখন তিনি নিজের জীবন ও সম্পদ দিয়ে তাকে সাহায্য ও সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। মুসনাদে আহমাদ, ৬/১১৮-তে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

পৃথিবীতে অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যে, একজন ব্যক্তি কীভাবে তার বন্ধুকে ভুল পথে চলতে অনুপ্রাণিত করেছিল, যার ফলে তারা কারাগারের মতো গুরুতর সমস্যায় পড়েছিল। কেবল খারাপ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিদের থেকে সাবধান থাকা উচিত নয়, কারণ তারা তাদের বন্ধুদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, যা সুনানে আবু দাউদের ৪৮৩৩ নম্বর হাদিসে প্রমাণিত হয়েছে। তবে একজন মুসলিমের উচিত এমন লোকদের থেকেও সতর্ক থাকা যারা তাদের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা পোষণ করে, বিশেষ করে যাদের প্রকৃত জ্ঞান নেই। এর কারণ হল, যার প্রকৃত জ্ঞান নেই সে কখনও কখনও তার প্রিয়জনদের ভুলভাবে বিশ্বাস করে উপদেশ দেয় যে তারা তাদের সঙ্গীর প্রতি ভালোবাসা পূরণ করেছে এবং তাদের ভালোবাসা প্রকাশ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, একজন স্ত্রী তার ক্লান্ত স্বামীকে মসজিদে জামাতের সাথে না পড়ে বাড়িতে ফরজ নামাজ পড়ার পরামর্শ দিতে

পারেন। যদিও কিছু পণ্ডিতের মতে এখনও ঘরে ফরজ নামাজ পড়া জায়েজ, এই উপদেশ কেবল নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবে, তাঁর উপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। এর ফলে এটি তাদের আল্লাহ, মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে আরও দূরে নিয়ে যাবে। এই স্ত্রী হয়তো বিশ্বাস করতে পারে যে সে প্রেমময় আচরণ করেছে যদিও সে করেনি। এই কারণেই সুনান ইবনে মাজাহ, ২২৪ নম্বরে বর্ণিত একটি হাদিস অনুসারে, সকল মুসলমানের জন্য উপকারী জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কর্তব্য। কারণ কিছু জিনিস বাহ্যিকভাবে কঠিন মনে হলেও তার ভেতরে অনেক বরকত নিহিত থাকে। এবং অনেক জিনিস সহজ এবং এমনকি বৈধ বলে মনে হতে পারে কিন্তু তা কেবল আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। অতএব, একজন মুসলিমের সতর্ক থাকা উচিত এবং আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা উচিত, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে এবং প্রিয়জনের উপদেশে বোকা না হয়ে। তাদের মনে করা উচিত নয় যে পরামর্শটি তাদের উপকার করবে কারণ এটি একজন প্রিয় সঙ্গীর কাছ থেকে এসেছে।

পুরনো বন্ধন ধরে রাখা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর স্ত্রী খাদিজা (রাঃ) এর মৃত্যুর পর, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি প্রায়শই তাদের খাবার এবং উপহার দিতেন। সহীহ বুখারী (৩৮১৮) এর একটি হাদিসে এটি উল্লেখ করা হয়েছে।

এইভাবে অন্যদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য খুব বেশি প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। একজন মুসলিমের উচিত যখনই প্রয়োজন হয়, তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকা। এবং তাদের আত্মীয়স্বজনদের ভালো থাকার জন্য তাদের উপর নজর রাখা উচিত, যা এই ডিজিটাল যুগে করা বেশ সহজ এবং সহজ।

তাছাড়া, মহানবী (সাঃ)-এর সাহাবীগণ ছিলেন নবীগণের (সাঃ) পরে সর্বকালের সেরা দল। মহানবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় তারা তাঁকে শারীরিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, এটি অবশ্যই একটি বিষয়। কিন্তু যারা তাদের জীবন এবং তাদের সৎকর্ম সম্পর্কে জানেন তারা বুঝতে পারেন যে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল এই অনন্য এবং মহান কাজের চেয়েও বেশি কিছুর কারণে।

তাদের শ্রেষ্ঠত্বের একটি প্রধান কারণ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) সম্পর্কিত একটি হাদিসে দেখানো হয়েছে, যা সহীহ মুসলিম, ৬৫১৫ নম্বরে পাওয়া যায়। ইবনে উমর (রাঃ) একবার মরুভূমিতে তাঁর বাহনে চড়েছিলেন, এমন সময় তিনি এক বেদুইনের মুখোমুখি হন। ইবনে উমর (রাঃ) বেদুইনকে সালাম করেন, বেদুইনের মাথায় তার পাগড়ি রাখেন এবং জোর দেন যে বেদুইন তার

বাহনে চড়ে। ইবনে উমর (রাঃ) কে বলা হয়েছিল যে তিনি বেদুইনকে যে সালাম দিয়েছিলেন তা যথেষ্ট ছিল কারণ বেদুইনরা মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মহান সাহাবী তাকে সালাম জানালে অত্যন্ত খুশি হত। তবুও, ইবনে উমর (রাঃ) এর চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গিয়ে বেদুইনদের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। ইবনে উমর (রাঃ) উত্তরে বলেন যে, তিনি এটা করেছেন কারণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, একজন ব্যক্তি তার পিতামাতাকে সম্মান করার সর্বোত্তম উপায়গুলির মধ্যে একটি হল তার পিতামাতার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। ইবনে উমর (রাঃ) আরও বলেন যে, বেদুইনের বাবা তার পিতা আমিরুল মুমিনীন উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) এর বন্ধু ছিলেন।

এই ঘটনাটি সাহাবীদের শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত দেয়, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। তারা ইসলামের শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তারা কেবল ফরজ কর্তব্য পালন করেননি এবং সমস্ত পাপ থেকে বিরত ছিলেন না বরং তাদের কাছে সুপারিশকৃত সমস্ত কাজ সর্বোচ্চ মাত্রায় সম্পূর্ণরূপে পালন করেছিলেন। তাদের আত্মসমর্পণ তাদেরকে তাদের নিজস্ব কামনা-বাসনাকে দূরে সরিয়ে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করতে পরিচালিত করেছিল। ইবনে উমর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি সহজেই বেদুইনদের উপেক্ষা করতে পারতেন কারণ তিনি যে কোনও কাজই তখন বাধ্যতামূলক ছিল না, অনেক মুসলমানের বিপরীতে যারা এই অজুহাত ব্যবহার করতেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার প্রতি আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং তিনি যেভাবে কাজ করতেন সেভাবেই কাজ করেছিলেন।

ইসলামের শিক্ষার প্রতি আনুগত্যের অভাবই মুসলমানদের ঈমানকে দুর্বল করে তুলেছে। কেউ কেউ কেবল বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালন করে এবং স্বেচ্ছায় দান-খয়রাতের মতো অন্যান্য সৎকর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যা তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে এবং দাবি করে যে কাজগুলি বাধ্যতামূলক নয়। সমস্ত মুসলমানই পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের (আল্লাহ তাদের প্রতি

সন্তুষ্ট থাকুন) সাথে মিলিত হতে চায়। কিন্তু যদি তারা তাদের পথ বা পথ অনুসরণ না করে তবে এটি কীভাবে সম্ভব? যদি কোনও মুসলিম তাদের পথ ছাড়া অন্য কোনও পথ অনুসরণ করে তবে কীভাবে তারা তাদের সাথে মিলিত হতে পারে? তাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তাদের পথ অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু এটি কেবল তখনই সম্ভব যখন কেউ তাদের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করার পরিবর্তে ইসলামের শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে।

দ্য গার্ডিয়ান

এক বছরের মধ্যেই, মহানবী (সাঃ) এর প্রিয় স্ত্রী খাদিজা (রাঃ) এবং তাঁর চাচা আবু তালিব (রাঃ) উভয়ই ইন্তেকাল করেন। তিনি তাঁর সমস্ত বিপদে তাঁর বিশ্বস্ত উপদেষ্টা ছিলেন এবং তিনি তাঁর কাছ থেকে আশ্বস্ত হতেন। আর তাঁর চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর অর্থ হল তিনি মক্কার অমুসলিমদের বিরুদ্ধে সমর্থন এবং সুরক্ষার উৎস হারিয়ে ফেলেন। তাদের মৃত্যুর পর মহানবী (সাঃ) এর কষ্ট অনেক বেড়ে যায়। মক্কার অমুসলিমদের তাঁর উপর শারীরিক নির্যাতন অনেক বেড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, একবার তারা তাঁর মাথায় মাটি ঢেলে দেয়। তিনি যখন বাড়ি ফিরে আসেন, তখন তাঁর এক কন্যা কাঁদতে কাঁদতে মাটি ধুয়ে ফেলেন। তিনি তাকে বলেছিলেন যে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, তাঁর রক্ষক, তাই কাঁদো না। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

অন্যান্য সময়ে, তার প্রতিবেশীরা, যারা তার আত্মীয়ও ছিল, তারা যখন তার বাড়িতে থাকত, তখন তার উপর নোংরা জিনিস ছুঁড়ে মারত এবং এমনকি তার রান্নার পাত্রেও এই জিনিসগুলো রাখত। মহানবী (সা.) কখনও একইভাবে সাড়া দিতেন না এবং তার পরিবর্তে তার ঘর থেকে নোংরা জিনিস বের করে ফেলতেন এবং তা ফেলে দিতেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অভিভাবক ছিলেন, তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক, তবুও তাঁর জীবনকালে তাঁকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছিল। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, মহান আল্লাহর সুরক্ষা সর্বদা মানুষের কাছে স্পষ্ট নয় এবং এটি মানুষের ইচ্ছানুযায়ীও ঘটে না। মহান আল্লাহ, তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের সুরক্ষা প্রদান

করেন, যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অধিকন্তু, আল্লাহ তাআলা একজন মুসলিমের ঈমান রক্ষা করার ব্যাপারে বেশি চিন্তিত, পার্থিব জিনিসপত্র থেকে রক্ষা করার চেয়ে, কারণ প্রথমটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এবং অনেক ক্ষেত্রে পার্থিব সমস্যা থেকে সুরক্ষা একজন ব্যক্তির জন্য ভালো হবে না কারণ এই সমস্যাগুলি তাদের জন্য অগণিত সওয়াব অর্জনের সুযোগ। অতএব, একজনকে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করার চেষ্টা করতে হবে, যাতে তারা উভয় জগতেই তাঁর সুরক্ষা লাভ করতে পারে এবং তারপর আল্লাহ তাআলা যেভাবে তাদের সুরক্ষা দেন তা গ্রহণ করতে পারে, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। অধ্যায় ৬৫ তালাক, আয়াত ২:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

যতই কষ্ট হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করবে।

উপরন্তু, আলোচিত মূল ঘটনাটি প্রতিবেশীর ক্ষতি এড়ানোর গুরুত্বকেও নির্দেশ করে কারণ এটি একজন মুসলিমের মনোভাবের পরিপন্থী। সহীহ বুখারীতে ৬০১৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি প্রতিবেশীর সাথে এতটাই সদয় আচরণ করতে উৎসাহিত হয়েছেন যে তিনি ভেবেছিলেন যে একজন প্রতিবেশী তার মুসলিম প্রতিবেশীর উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে।

দুর্ভাগ্যবশত, এই কর্তব্য প্রায়শই অবহেলা করা হয়, যদিও প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণ করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রথমত, এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলামে একজন ব্যক্তির প্রতিবেশী বলতে সেই সকল ব্যক্তিকে বোঝায় যারা একজন মুসলিমের বাড়ির প্রতিটি দিকে চল্লিশটি বাড়ির মধ্যে বাস করে। ইমাম বুখারীর "আদাব আল মুফরাদ", সংখ্যা ১০৯-এ এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ১৭৪ নম্বর হাদিসে পাওয়া গেছে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একবার আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসকে প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণের সাথে যুক্ত করেছেন। প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণের গুরুত্ব বোঝাতে এই হাদিসটিই যথেষ্ট। ইমাম বুখারীর "আদাবুল মুফরাদ" নম্বর ১১৯ নম্বর হাদিসে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, যে নারী তার বাধ্যবাধকতা পালন করে এবং প্রচুর নফল ইবাদত করে, সে জাহান্নামে যাবে কারণ সে তার কথার মাধ্যমে তার প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার করে। যদি এমন ব্যক্তি হয় যে তার প্রতিবেশীর কথার মাধ্যমে ক্ষতি করে, তাহলে তার প্রতিবেশীর শারীরিক ক্ষতি করার ভয়াবহতা কি তা কল্পনা করা যায়?

একজন মুসলিমকে তার প্রতিবেশীর দ্বারা দুর্ব্যবহারের সময় ধৈর্য ধরতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলিমের উচিত এই ধরণের ক্ষেত্রে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। ভালোর বিনিময়ে ভালো করা কঠিন নয়। ভালো প্রতিবেশী হলো

সেই ব্যক্তি যে ভালোর বিনিময়ে খারাপের প্রতিদান দেয়। ৪১ ফুসসিলাত, আয়াত ৩৪:

"আর ভালো কাজ আর মন্দ সমান নয়। [মন্দ কাজ] প্রতিহত করো সেই [কাজ] দ্বারা যা উত্তম; তাহলে যার সাথে তোমার শত্রুতা আছে সে [এমন হয়ে যাবে যেন সে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রতিবেশী বা অন্যদের সীমা লঙ্ঘন করতে দেওয়া উচিত নয় এবং যখনই উপযুক্ত হবে তখন তাদের আত্মরক্ষা করা উচিত। উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা ছোটখাটো পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য, যা ভবিষ্যতে তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না এবং জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে বারবার এটি পুনরুত্থিত হবে না।

একজন মুসলিমের উচিত তার প্রতিবেশীর ব্যক্তিগত স্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, কিন্তু একই সাথে তাকে অভ্যর্থনা জানানো এবং খুব বেশি হস্তক্ষেপ না করে সাহায্য করা। আর্থিক বা মানসিক সহায়তার মতো যেকোনো উপায়ে তাকে সমর্থন করা উচিত।

একজন মুসলিমের উচিত তার প্রতিবেশীর দোষ গোপন করা, যখন তা কোন নেতিবাচক পরিণতি বয়ে আনবে না। যে অন্যের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন। আর যে অন্যের দোষ প্রকাশ করবে, আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করবেন এবং জনসমক্ষে তাদের অপমান করবেন। সুনানে আবু দাউদের ৪৮৮০ নম্বর হাদিসে এটি প্রমাণিত হয়েছে।

উপসংহারে, একজন ব্যক্তির উচিত তার প্রতিবেশীর সাথে এমন আচরণ করা যেমন সে চায় তার প্রতিবেশীরা তার সাথে আচরণ করুক, যার মধ্যে রয়েছে দয়া এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

তাইফ ভ্রমণ

ব্যক্তিগত কথোপকথন

যখন মহানবী (সাঃ) এর চাচা আবু তালিব মারা যান, তখন তিনি মক্কার অমুসলিমদের বিরুদ্ধে সমর্থন এবং সুরক্ষার উৎস হারিয়ে ফেলেন। তাই, তিনি নিকটবর্তী তায়েফ শহর পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত নেন যাতে তারা তাদের জনগণকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে পারে এবং মক্কার অমুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য চাইতে পারে। যখন তিনি তায়েফের নেতাদের সাথে দেখা করেন, তারা তাকে অপমান ও উপহাস করে। তায়েফ ছেড়ে যাওয়ার সময়, তিনি তাদের সাক্ষাৎ এবং কথোপকথন গোপন রাখতে অনুরোধ করেন কারণ তিনি জানতেন যে মক্কার অমুসলিমরা যদি এটি জানতে পারে তবে তারা কেবল তার বিরুদ্ধে তাদের সহিংসতা আরও তীব্র করবে। কিন্তু তায়েফের নেতারা এই সাধারণ ভদ্রতার কাজটিও করতে অস্বীকৃতি জানান। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯৯-১০০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, ১৯৫৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) ইঙ্গিত করেছেন যে ব্যক্তিগত কথোপকথন একটি আমানত যা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেকেরই মানুষের ব্যক্তিগত কথোপকথন অন্যদের কাছে প্রকাশ করার খারাপ অভ্যাস থাকে। এটি একটি অবিশ্বাস্যরকম খারাপ বৈশিষ্ট্য কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলিমের মনোভাবের পরিপন্থী। অনেকে তাদের নিকটাত্মীয়দের সাথে এটি করে, যারা মনে করে এটি গ্রহণযোগ্য, যদিও এটি

স্পষ্টতই গ্রহণযোগ্য নয়। একজন মুসলিমের উচিত সর্বদা কথোপকথনে বলা কথাগুলি গোপন রাখা, যদি না তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হন যে যার সাথে তারা কথা বলেছেন তিনি তৃতীয় পক্ষের কাছে তথ্য উল্লেখ করায় আপত্তি করবেন না। যদি তারা তা করে, তাহলে এটি তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং এটি তাদের প্রতি আন্তরিকতার পরিপন্থী। সুনানে আন নাসায়ী, ৪২০৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে অন্যদের প্রতি আন্তরিক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এমনকি যদি কেউ বিশ্বাস করে যে অন্য ব্যক্তি তাদের কথোপকথন অন্যদের কাছে প্রকাশ করায় আপত্তি করবে না, তবুও, তৃতীয় পক্ষের সাথে কথোপকথন ভাগ করে নেওয়া থেকে বিরত থাকা নিরাপদ এবং উত্তম।

মূল হাদিসের উপর আমল করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি গীবত এবং পরচর্চার মতো পাপ প্রতিরোধ করে এবং মানুষের মধ্যে নেতিবাচক অনুভূতি তৈরি হতে বাধা দেয়। এটি প্রায়শই ঘটে কারণ তৃতীয় পক্ষের সাথে কথোপকথন প্রায়শই ভুল ব্যাখ্যা এবং ভুল বোঝাবুঝির দিকে পরিচালিত করে। এই সবগুলি কেবল ভাঙা এবং সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার দিকে পরিচালিত করে। যদি কেউ সৎভাবে তাদের জীবন সম্পর্কে চিন্তা করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে যাদের প্রতি তারা নেতিবাচক অনুভূতি অনুভব করেছে তাদের বেশিরভাগই তাদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল তার কারণেই হয়েছিল, তাদের কাছ থেকে সরাসরি যা দেখেছিল তার কারণে নয়। ব্যক্তিগত কথোপকথন প্রকাশ করা মানুষের মধ্যে ঐক্যকে বাধা দেয়, বিশেষ করে আত্মীয়দের মধ্যে। এবং ইসলামের অনেক শিক্ষায় ঐক্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন সহিহ বুখারীতে পাওয়া হাদিস, সংখ্যা 6065। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 58:

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাদেরকে আমানতসমূহ তাদের প্রাপ্যদের হাতে অর্পণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন..."

অন্যদের কথাবার্তার সাথে ঠিক তেমনই আচরণ করা উচিত যেমন তারা চায় লোকেরা তাদের কথোপকথনের সাথে আচরণ করুক।

ঐশ্বরিক বিধান গ্রহণ করা

যখন মহানবী (সাঃ) তাদের নেতাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর তায়েফ ত্যাগ করছিলেন, তখন তারা জনতার একটি দলকে তাকে গালিগালাজ, আহত এবং তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য উস্কে দিয়েছিল। মহানবী (সাঃ) জনতার হাত থেকে রক্ষা পেতে একটি বাগানে আশ্রয় চেয়েছিলেন। এই সময় তিনি নিম্নলিখিত প্রার্থনা করেছিলেন, "হে আল্লাহ, আমি মানুষের সামনে আমার দুর্বলতা এবং অযোগ্যতার অভিযোগ করছি। হে সর্বোপরি দয়ালু, তুমি যিনি মজলুমদের পালনকর্তা, তুমি যে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে কার কাছে সোপর্দ করবে? যারা আমাকে অসন্তুষ্ট করে অভ্যর্থনা জানায় তাদের কাছে অথবা কোন শত্রুর কাছে যার কাছে তুমি আমাকে সোপর্দ করেছ? যতক্ষণ না তুমি আমার উপর রাগান্বিত হও, আমি পরোয়া করব না বরং আমি তোমার অনুগ্রহকে প্রাধান্য দেব। আমি তোমার মুখের আলোর আশ্রয় নিচ্ছি যা ছায়াকে আলোকিত করে, দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্যাগুলি মেরামত করে, নিশ্চিত করে যে তোমার রাগ বা অসন্তোষ আমার উপর না পড়ে। তুমি সন্তুষ্ট থাকো এবং সন্তুষ্ট থাকো; সমস্ত শক্তি এবং শক্তি তোমার কাছ থেকেই আসে।" ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯৯-১০০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি পরিস্থিতিই একজন মুমিনের জন্য কল্যাণকর। একমাত্র শর্ত হলো, তাদের প্রতিটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে, মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, বিশেষ করে, অসুবিধার সময় ধৈর্য এবং সুখের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

জীবনের দুটি দিক আছে। একটি দিক হলো মানুষ যেসব পরিস্থিতিতে নিজেদের খুঁজে পায়, তা সে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা অসুবিধার সময়। একজন ব্যক্তি কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন তার নিয়ন্ত্রণ তার হাতের বাইরে। মহান আল্লাহ

তাআলা এটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং এ থেকে রেহাই পাওয়ার কোনও উপায় নেই। অতএব, যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হন তার উপর চাপ দেওয়া অর্থহীন কারণ সেগুলি ভাগ্যনির্ধারিত এবং তাই অনিবার্য। অন্য দিক হলো প্রতিটি পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া। এটি প্রতিটি ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং এটিই তাদের বিচার করা হয়, উদাহরণস্বরূপ, একটি কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য বা অধৈর্য প্রদর্শন। অতএব, একজন মুসলিমকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের আচরণ এবং প্রতিক্রিয়ার উপর মনোনিবেশ করতে হবে, কোনও পরিস্থিতিতে থাকার জন্য চাপ দেওয়ার পরিবর্তে, কারণ এটি অনিবার্য। যদি একজন মুসলিম উভয় জগতে সাফল্য পেতে চায় তবে তাদের প্রতিটি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা উচিত এবং সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যে কাজ করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাদের অবশ্যই ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত অনুগ্রহগুলি ব্যবহার করতে হবে, যা মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"আর [স্মরণ করো] যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের [নেয়ামত] বৃদ্ধি করব..."

এবং কঠিন সময়ে তাদের ধৈর্য ধরতে হবে কারণ তারা জানে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি তারা পছন্দের পিছনের প্রজ্ঞা বুঝতে নাও পারে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মূল হাদিসে প্রতিটি পরিস্থিতিতে সাফল্য মুমিনের জন্য নির্দেশিত হয়েছে, মুসলিমের জন্য নয়। এর কারণ হল একজন মুমিনের ঈমান শক্তিশালী থাকে যা ইসলামী জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে। তাদের দৃঢ় ঈমানের ফলে, তারা আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যকে আরও কঠোরভাবে মেনে চলে, যার মধ্যে রয়েছে অসুবিধার সময় ধৈর্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা। অন্যদিকে, মুসলিম হল এমন একজন ব্যক্তি যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন কিন্তু দুর্বল ঈমানের কারণে, যা ইসলামী জ্ঞানের অজ্ঞতার কারণে ঘটে, তারা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের সাথে সাড়া দিতে ব্যর্থ হতে পারে। অতএব, একজন ব্যক্তির জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা একজন মুমিনের মর্যাদায় পৌঁছাতে পারে এবং তাই সকল পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখতে পারে।

ইতিবাচকতা

যখন তায়েফের অধিবাসীদের তাদের নেতারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়, তখন তিনি একটি বাগানে আশ্রয় নেন। বাগানটি ছিল দুই ভাই উতবা এবং শায়বা-এর, যারা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি কিছুটা সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। ফলস্বরূপ, তারা তাদের দাস আদ্দাস (রাঃ)-কে আঙ্গুরের একটি ট্রে দিয়ে তার কাছে পাঠান। আদ্দাস (রাঃ)-ও একজন খ্রিস্টান ছিলেন, কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে খাওয়ার আগে আল্লাহর নাম পাঠ করার পর এবং তাঁর সাথে সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের পর, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন কারণ তিনি বাইবেলের ঐশী শিক্ষার আলোচিত নিদর্শনগুলি থেকে তাকে চিনতে পেরেছিলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯৯-১০১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, লক্ষ্য করার বিষয় হলো, যদি অমুসলিমরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি করুণা প্রদর্শন করত, তাহলে মুসলমানদেরও অন্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের অধিকার বেশি। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ১৯২২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে না, আল্লাহ তাকে করুণা প্রদর্শন করবেন না। এই করুণা তখনই সবচেয়ে ভালোভাবে প্রদর্শিত হয় যখন কেউ অন্যদের সাথে সেইভাবে আচরণ করে যেমন সে নিজে অন্যদের দ্বারা আচরণ পেতে চায়। এর মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে অন্যদেরকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করা, যেমন আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিক সহায়তা। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য এইভাবে আচরণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা উভয় জগতেই তাঁর সমর্থন, করুণা এবং আশীর্বাদ পাবে।

তাছাড়া, যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তায়েফের লোকদের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেননি, তবুও অন্তত একজন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অতএব, এটি ইতিবাচক মানসিকতা দিয়ে পরিস্থিতি দেখার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

মুসলমানদের জন্য ইতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি তাদের অসুবিধা মোকাবেলায় সাহায্য করার একটি দুর্দান্ত হাতিয়ার যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে পারে। যখনই কোনও ব্যক্তি সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তাদের সর্বদা একটি সত্য বুঝতে হবে যে অসুবিধাটি আরও খারাপ হতে পারত। যদি এটি একটি পার্থিব সমস্যা হত তবে তাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে এটি তাদের ঈমানকে প্রভাবিত করে এমন কোনও দুর্দশা ছিল না। অসুবিধার সাথে আসা তাৎক্ষণিক দুঃখের উপর চিন্তা করার পরিবর্তে, তাদের শেষ এবং সেই পুরস্কারের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য প্রদর্শনকারীদের জন্য অপেক্ষা করছে। যখন কোনও ব্যক্তি কিছু আশীর্বাদ হারায় তখন তাদের এখনও থাকা অগণিত আশীর্বাদগুলি স্মরণ করা উচিত। প্রতিটি আশীর্বাদের মধ্যে, একজন মুসলিমের পবিত্র কুরআনের আয়াতটি মনে রাখা উচিত যা মুসলমানদের মনে করিয়ে দেয় যে এমন অনেক গোপন জ্ঞান রয়েছে যা তারা পর্যবেক্ষণ করেনি এমন অসুবিধা এবং পরীক্ষাগুলির মধ্যে। অতএব, তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে তা তাদের কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির চেয়ে ভাল। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

পরিশেষে, একজন মুসলিমের উচিত এই তথ্য এবং অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করা যাতে তারা একটি ইতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করতে পারে যা এমনভাবে অসুবিধা মোকাবেলার একটি মূল উপাদান যা উভয় জগতেই অসংখ্য আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। মনে রাখবেন, পেয়ালাটি অর্ধেক খালি নয় বরং অর্ধেক পূর্ণ।

ক্ষমা এবং উপেক্ষা

যখন তায়েফের অধিবাসীদের তাদের নেতারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়েছিল, তখন তিনি একটি বাগানে আশ্রয় চেয়েছিলেন। মহান আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে পাহাড়ের ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন, যিনি শহরটিকে দুটি পাহাড়ের মাঝখানে চূর্ণ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং পরিবর্তে মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি আশা করেছিলেন যে শহরটি একদিন ইসলাম গ্রহণ করবে এবং মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করবে না। সহিহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সংখ্যা ৩২৩১।

সহীহ বুখারীতে ৬৮৫৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি বরং ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং উপেক্ষা করেছেন।

যখন অন্য কোন বিকল্প অবশিষ্ট থাকে না, তখন মুসলমানদেরকে আনুপাতিক এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে আত্মরক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের কখনই সীমা লঙঘন করা উচিত নয় কারণ এটি একটি পাপ। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৯০:

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

যেহেতু চিহ্ন অতিক্রম করা এড়ানো কঠিন, তাই একজন মুসলিমের ধৈর্য ধারণ করা, অন্যদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা উচিত কারণ এটি কেবল নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যই নয়, বরং মহান আল্লাহ্‌র কাছেও পৌঁছে দেয়, যিনি তাদের পাপ ক্ষমা করে দেন। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ২২:

"...এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন..."

অন্যদের ক্ষমা করা অন্যদের চরিত্রকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রেও আরও কার্যকর, যা ইসলামের উদ্দেশ্য এবং মুসলমানদের উপর কর্তব্য, কারণ প্রতিশোধ নেওয়া কেবল জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও শত্রুতা এবং ক্রোধের জন্ম দেয়।

যাদের অন্যদের ক্ষমা না করার বদ অভ্যাস আছে এবং ছোটখাটো বিষয়েও সবসময় ক্ষোভ পোষণ করে, তারা হয়তো দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করেন না বরং তাদের প্রতিটি ছোট পাপ পরীক্ষা করেন। একজন মুসলিমের উচিত সবকিছু ছেড়ে দেওয়া শেখা কারণ এর ফলে উভয় জগতেই ক্ষমা লাভ হয়। উপরন্তু, যখন কেউ তাদের বিরক্তিকর প্রতিটি ছোটখাটো বিষয় ধরে রাখার অভ্যাস গ্রহণ করে তখন মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। অতএব, অন্যদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা শেখা একজনকে ছোটখাটো বিষয়গুলি ছেড়ে দিতে সাহায্য করে, যা তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে সহায়তা করে।

পরিশেষে, মূল হাদিসটির অর্থ এই নয় যে অন্যরা যখন সীমা অতিক্রম করে, তখন আত্মরক্ষা করা উচিত নয়, কারণ ইসলাম দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতা শেখায়। উপরন্তু, যখন কেউ অন্যদের ক্ষমা করে, তার অর্থ এই নয় যে তাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত বা স্বাভাবিকভাবেই তাদের সাথে মেলামেশা চালিয়ে যাওয়া উচিত। এতে কেবল তাদের উপর আবার অন্যায় হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহর জন্য অন্যদের ক্ষমা করা উচিত, তাদের ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের অধিকার পূরণ করতে হবে এবং অতীতে যারা তাদের উপর অন্যায় করেছে তাদের সাথে আচরণ করার সময় সতর্কতার সাথে চলতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয় এবং তারা উভয় জগতেই আশীর্বাদ এবং প্রতিদান লাভ করে।

বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া

মহানবী (সাঃ) তায়েফ থেকে ফিরে আসার পর, একজন অমুসলিম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মুত'ইম ইবনে আদির সুরক্ষায় তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে হয়েছিল, কারণ মক্কার অমুসলিম নেতারা তায়েফের জনগণকে ধর্মান্তরিত করার জন্য মহানবী (সাঃ) এর প্রচেষ্টায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। বহু বছর পর, বদরের যুদ্ধে বিজয়ের পর, মহানবী (সাঃ) মন্তব্য করেছিলেন যে, যদি মুত'ইম ইবনে আদি জীবিত থাকতেন এবং অমুসলিম যুদ্ধবন্দীদের জন্য সুপারিশ করতেন, তাহলে তিনি তাদের সকলকে বিনামূল্যে মুক্তি দিতেন। সহীহ বুখারী, ৪০২৪ নম্বর এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, দ্য নোবেল লাইফ অফ দ্য প্রফেট (সাঃ), খণ্ড ১, ৫৩৪ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, লক্ষণীয় বিষয় হলো, যদিও মনে হচ্ছিল যে তায়েফের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করলে মহানবী (সা.)-এর জন্য পরিস্থিতি সহজ হয়ে যেত, তবুও তা তাঁর বা ইসলামের জন্য ভালো হত না। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যেহেতু মানুষের জ্ঞান এবং দূরদর্শিতা অত্যন্ত সীমিত, তাই তাদের কাছে যা সহজ বলে মনে হয় তা সর্বোত্তম ফলাফল নাও হতে পারে। অন্যদিকে, আল্লাহ, তাঁর অসীম জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতা অনুসারে মানুষের জন্য সর্বোত্তম ফলাফল বেছে নেন, যা প্রায়শই সহজ বিকল্পের সাথে মেলে না। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই আল্লাহর পছন্দ মেনে নিতে হবে, কারণ তিনি জানেন যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি তারা তাঁর পছন্দের পিছনের প্রজ্ঞাগুলি পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হয় এবং তাঁর পছন্দ সহজ পথ নাও হয়। বরং একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, যার মধ্যে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। এই মনোভাব মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে, এমনকি যদি কেউ সারা জীবন সমস্যার সম্মুখীন হয়।

এছাড়াও, আলোচিত মূল ঘটনাটি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। জামে আত তিরমিযী, ১৯৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে কখনও মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না।

যদিও নিঃসন্দেহে সকল নিয়ামতের উৎস মহান আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ নন, তবুও মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কারণ, মহান আল্লাহ তাআলা মাঝে মাঝে একজন ব্যক্তিকে অন্যদের সাহায্য করার জন্য, যেমন তার পিতামাতাকে সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করেন। যেহেতু উপায় আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন এবং ব্যবহার করেছেন, তাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা আসলে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অতএব, মুসলমানদের উচিত উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা এবং অন্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত যেকোনো সাহায্য বা সহায়তার জন্য সর্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তা যত বড়ই হোক না কেন। তাদের উচিত আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁর আদেশ অনুসারে আশীর্বাদ ব্যবহার করে, কারণ তিনিই আশীর্বাদের উৎস এবং তাদের উচিত সেই ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যিনি তাদের সাহায্য করেছেন, কারণ এটিই সেই মাধ্যম যা মহান আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন এবং নির্বাচিত করেছেন। একজন মুসলমানের উচিত মানুষের প্রতি মৌখিকভাবে এবং কার্যত তাদের সদয় আচরণের প্রতিদান তাদের সামর্থ্য অনুসারে প্রদান করা, এমনকি

যদি তা কেবল তাদের পক্ষ থেকে একটি প্রার্থনাও হয়। ইমাম বুখারীর "আদাব আল মুফরাদ", ২১৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাহায্যের বাহ্যিক প্রকাশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, অর্থাৎ একজন ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে সরাসরি মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সম্ভাবনা কম।

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না, তাই তাদের নিয়ামত বৃদ্ধি করা হবে না। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"আর [স্মরণ করো] যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের [নেয়ামত] বৃদ্ধি করব..."

যদি কোন মুসলিম বরকত বৃদ্ধি করতে চায়, তাহলে তাকে কৃতজ্ঞতার উভয় দিকই পূরণ করতে হবে, যথা, মহান আল্লাহর প্রতি এবং মানুষের প্রতি।

স্বর্গীয় যাত্রা

সর্বশক্তিমান

মদিনায় হিজরতের আগে মক্কায় তাঁর শেষ বছরগুলিতে, মহানবী (সা.)-কে অলৌকিকভাবে স্বর্গীয় যাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রথমে তাঁকে জেরুজালেমের মসজিদে আকসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তারপর রাতের একটি ছোট অংশে সাত আসমানে উঠে যাওয়া হয়েছিল। ১৭তম অধ্যায় আল-ইসরা, আয়াত ১:

"পবিত্র তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে (অর্থাৎ, নবী মুহাম্মদ (সাঃ)) রাতে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে গিয়েছিলেন, যার চারপাশের পরিবেশকে আমি বরকতময় করেছি, যাতে তাকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাতে পারি..."

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, মুসলমানদের কখনোই তাদের সমস্যা সমাধান এবং অসুবিধা থেকে মুক্তির পথ প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ করা উচিত নয়। এই স্বর্গযাত্রা অসম্ভব শোনালেও তা ঘটেছে কারণ আল্লাহর অসীম ক্ষমতার বাইরে আর কিছুই নেই। সকল অসুবিধা থেকে মুক্তির পথ পাওয়ার শর্ত হলো আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর

আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। অধ্যায় ৬৫ তালাক, আয়াত ২:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ মানুষকে যে পথ দান করেন তা হলো তাদের জন্য সর্বোত্তম, তাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা অনুসারে নয়। প্রায়শই মহান আল্লাহর পছন্দের পেছনের হিকমত মানুষের কাছে স্পষ্ট নয়। এই ক্ষেত্রে, তাদের অবশ্যই তাঁর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে এবং আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে যে তিনি তাদের জন্য সর্বোত্তম ফলাফল বেছে নেবেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

নিশ্চিততার জন্য প্রচেষ্টা করা

মদিনায় হিজরতের আগে মক্কায় তাঁর শেষ বছরগুলিতে, মহানবী (সা.) কে অলৌকিকভাবে স্বর্গীয় যাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অধ্যায় ১৭ আল-ইসরা, আয়াত ১:

"পবিত্র তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে (অর্থাৎ, নবী মুহাম্মদ (সাঃ)) রাতে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে গিয়েছিলেন, যার চারপাশের পরিবেশকে আমি বরকতময় করেছি, যাতে তাকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাতে পারি..."

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উপরের আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) কে জান্নাত যাত্রা করার প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি ছিল মহান আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে তাঁর ঈমানকে শক্তিশালী করা।

অতএব, মুসলমানদের জন্য ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা গুরুত্বপূর্ণ।

সকল মুসলমানের ইসলামে বিশ্বাস আছে কিন্তু তাদের বিশ্বাসের শক্তি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তার পরিবারের কথামতো ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে এবং যে ব্যক্তি প্রমাণের মাধ্যমে বিশ্বাস করে, সে একইভাবে বিশ্বাস করে না। যে ব্যক্তি কোন কিছু সম্পর্কে শুনেছে, সে সেইভাবে বিশ্বাস করবে না যে ব্যক্তি নিজের চোখে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, ২২৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে প্রমাণিত হয়েছে যে, দরকারী জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য। এর একটি কারণ হল, এটিই একজন মুসলিমের ইসলামের প্রতি তাদের ঈমানকে শক্তিশালী করার সর্বোত্তম উপায়। এটি অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ঈমানের দৃঢ়তা যত শক্তিশালী হবে, বিশেষ করে যখন তারা সমস্যার মুখোমুখি হবে তখন সঠিক পথে অবিচল থাকার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। এছাড়াও, সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৮৪৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে ঈমানের দৃঢ়তা থাকাকে সর্বোত্তম জিনিসগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জ্ঞান পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিস অধ্যয়ন করে, নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে অর্জন করা উচিত।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে কেবল সত্য ঘোষণা করেননি বরং উদাহরণের মাধ্যমে এর পক্ষে প্রমাণও প্রদান করেছেন। কেবল অতীতের জাতিগুলিতে পাওয়া উদাহরণই নয় বরং এমন উদাহরণও রয়েছে যা মানুষের নিজের জীবনেও স্থান পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে, কখনও কখনও মানুষ এমন কিছু ভালোবাসে, যদিও তা পেলে তা তাদের জন্য কষ্টের কারণ হতে পারে। একইভাবে, তারা এমন কিছু ঘৃণা করতে পারে যেখানে তাদের জন্য অনেক ভালো লুকানো থাকে। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

ইতিহাসে এই সত্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেমন হুদাইবার চুক্তি। কিছু মুসলিম বিশ্বাস করতেন যে মক্কার অমুসলিমদের সাথে করা এই চুক্তিটি সম্পূর্ণরূপে পরবর্তী গোষ্ঠীর পক্ষে হবে। তবুও, ইতিহাস স্পষ্টভাবে দেখায় যে এটি ইসলাম এবং মুসলমানদের পক্ষে ছিল। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত হাদিসগুলিতে এই ঘটনাটি আলোচনা করা হয়েছে, সংখ্যা 2731 এবং 2732।

যদি কেউ নিজের জীবনের দিকে চিন্তা করে, তাহলে সে এমন অনেক উদাহরণ পাবে যেখানে সে বিশ্বাস করেছিল যে কিছু ভালো, যদিও তা আসলে তার জন্য খারাপ, এবং এর বিপরীত। এই উদাহরণগুলি এই আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে এবং একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।

আরেকটি উদাহরণ ৭৯ অধ্যায় আন নাজিয়াত, ৪৬ নং আয়াতে পাওয়া যায়:

"যেদিন তারা তা (বিচার দিবস) দেখবে, সেদিন এমন হবে যেন তারা (দুনিয়ায়) কেবল এক বিকেল অথবা এক সকাল অবস্থান করেনি।"

ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখলে স্পষ্ট দেখা যাবে কিভাবে মহান সাম্রাজ্য এসেছিল এবং চলে গেছে। কিন্তু যখন তারা চলে গেল তখন তারা এমনভাবে চলে গেল যেন তারা কেবল এক মুহূর্তের জন্য পৃথিবীতে ছিল। তাদের কয়েকটি চিহ্ন ছাড়া বাকি সবই অদৃশ্য হয়ে গেছে যেন তারা প্রথম স্থানে পৃথিবীতে কখনও উপস্থিত ছিল না। একইভাবে, যখন কেউ তাদের নিজের জীবনের দিকে চিন্তা করে তখন তারা বুঝতে পারবে যে তারা যতই বৃদ্ধ হোক না কেন এবং সামগ্রিকভাবে যতই ধীর মনে হোক না কেন, তাদের জীবন এক মুহূর্তের মধ্যে কেটে গেছে। এই আয়াতের সত্যতা বোঝা একজনের বিশ্বাসের দৃঢ়তাকে শক্তিশালী করে এবং এটি তাদের সময় শেষ হওয়ার আগে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে অনুপ্রাণিত করে।

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদিসে এ ধরণের উদাহরণ প্রচুর। অতএব, এই ঐশ্বরিক শিক্ষাগুলি শেখা এবং সেগুলি অনুসরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত যাতে তারা ঈমানের দৃঢ়তা গ্রহণ করতে পারে। যে ব্যক্তি এটি অর্জন করবে সে কোনও অসুবিধার মুখোমুখি হবে না এবং জান্নাতের দরজার দিকে নিয়ে যাওয়ার পথে অবিচল থাকবে। সূরা ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদেরকে দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

সর্বোচ্চ পদমর্যাদা

মদিনায় হিজরতের আগে মক্কায় তাঁর শেষ বছরগুলিতে, মহানবী (সা.) কে অলৌকিকভাবে স্বর্গীয় যাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অধ্যায় ১৭ আল-ইসরা, আয়াত ১:

"পবিত্র তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে (অর্থাৎ, নবী মুহাম্মদ (সাঃ)) রাতে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে গিয়েছিলেন, যার চারপাশের পরিবেশকে আমি বরকতময় করেছি, যাতে তাকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাতে পারি..."

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই মহান ঘটনা এবং উদ্ধৃত আয়াতটি নির্দেশ করে যে, একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ মর্যাদায় পৌঁছাতে পারে, অর্থাৎ আল্লাহর একজন আন্তরিক বান্দা। যদি এর চেয়ে বড় মর্যাদা থাকত, তাহলে মহান আল্লাহ তাআলা অবশ্যই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এর সাথে উল্লেখ করতেন। অনেক হাদিসে এটি উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন সহীহ মুসলিমের ৮৫১ নম্বর হাদিসে, যেখানে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নবুয়ত ঘোষণা করার আগে নিজেকে আল্লাহর বান্দা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এটি সকল মুসলমানের জন্য একটি স্পষ্ট শিক্ষা যে, যদি তারা চূড়ান্ত সাফল্য এবং উভয় জগতের সর্বোচ্চ মর্যাদা চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হতে হবে। এটি কেবলমাত্র আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা, অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই অর্জন করা সম্ভব।

অন্য কোন উপায়ে দাসত্ব অর্জন করা সম্ভব নয়। ৩য় অধ্যায় আলী ইমরান, আয়াত ৩১:

“[নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলুন, “যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।”

গ্রেটদের কোম্পানি

মদিনায় হিজরতের আগে মক্কায় তাঁর শেষ বছরগুলিতে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অলৌকিকভাবে স্বর্গযাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে জান্নাতের বিভিন্ন স্তরে অসংখ্য নবী (সাঃ) স্বাগত জানিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি প্রথম জান্নাতে হযরত আদম (সাঃ) এর সাথে দেখা করেছিলেন। দ্বিতীয় জান্নাতে তিনি হযরত ইয়াহইয়া এবং ঈসা (সাঃ) এর সাথে দেখা করেছিলেন। চতুর্থ জান্নাতে তিনি হযরত ইদ্রিস (সাঃ) এর সাথে দেখা করেছিলেন। ষষ্ঠ জান্নাতে তিনি হযরত মুসা (সাঃ) এবং সপ্তম জান্নাতে হযরত ইব্রাহিম (সাঃ) এর সাথে দেখা করেছিলেন। এটি ইমাম ইবনে কাথিরের "নবী (সাঃ) এর জীবনী", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৬-এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রতিটি মুসলিম খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করে যে তারা পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), অন্যান্য নবীগণ, সাহাবীগণ এবং সাহাবীগণের সাহচর্য কামনা করে। তারা প্রায়শই সহীহ বুখারীতে ৩৬৮৮ নম্বর হাদিসটি উদ্ধৃত করে, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে একজন ব্যক্তি পরকালে যাদের ভালোবাসে তাদের সাথেই থাকবে। এবং এই কারণে তারা খোলাখুলিভাবে আল্লাহর এই নেক বান্দাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা ঘোষণা করে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তারা কীভাবে এই পরিণতি কামনা করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসার দাবি করে, অথচ তারা তাঁকে খুব কমই চেনে কারণ তারা তাঁর জীবন, চরিত্র এবং শিক্ষা অধ্যয়ন করতে ব্যস্ত। এটা বোকামি কারণ একজন ব্যক্তি কীভাবে সত্যিকার অর্থে এমন কাউকে ভালোবাসতে পারে যাকে তারা চেনেই না?

তাছাড়া, যখন এই লোকদের কাছে মহানবী (সাঃ) এর প্রতি তাদের ভালোবাসার প্রমাণ চাওয়া হবে, তখন বিচার দিবসে তারা কী বলবে? তারা কী উপস্থাপন করবে? এই ঘোষণার প্রমাণ হলো মহানবী (সাঃ) এর জীবন, চরিত্র এবং শিক্ষা

অধ্যয়ন করা এবং তার উপর আমল করা। এই প্রমাণ ছাড়া কোন ঘোষণা মহান আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। এটি বেশ স্পষ্ট কারণ সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, তাদের চেয়ে ইসলামকে আর কেউ ভালোভাবে বুঝতে পারেনি এবং এটি তাদের মনোভাব ছিল না। তারা মহানবী (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা ঘোষণা করেছিলেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কর্মের মাধ্যমে তাদের দাবিকে সমর্থন করেছিলেন। এই কারণেই তারা পরকালে তাঁর সাথে থাকবেন।

যারা বিশ্বাস করে যে ভালোবাসা হৃদয়ে থাকে এবং কাজে তা প্রকাশের প্রয়োজন হয় না, তারা সেই ছাত্রের মতোই বোকা, যে তার শিক্ষকের কাছে খালি পরীক্ষার খাতা ফেরত দিয়ে দাবি করে যে জ্ঞান তার মনে আছে তাই তাকে বাস্তবে তা কাগজে লিখে রাখার প্রয়োজন নেই এবং তারপরও সে পাস করার আশা করে।

যে ব্যক্তি এমন আচরণ করে, সে আল্লাহর নেক বান্দাদের ভালোবাসে না, কেবল তাদের নিজেদের কামনা-বাসনাকেই ভালোবাসে এবং নিঃসন্দেহে শয়তান তাদের বোকা বানিয়েছে।

পরিশেষে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যান্য ধর্মের সদস্যরাও তাদের পবিত্র নবীদের প্রতি ভালোবাসার দাবি করে, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। কিন্তু যেহেতু তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে এবং তাদের শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই বিচারের দিনে তারা অবশ্যই তাদের সাথে থাকবে না। এই সত্যটি যদি কেউ একবার চিন্তা করে দেখে তবে এটি বেশ স্পষ্ট।

জীবন একটি আয়না

মদিনায় হিজরতের আগে মক্কায় তাঁর শেষ বছরগুলিতে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অলৌকিকভাবে স্বর্গযাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হযরত ইব্রাহিম (সাঃ) এর সাথে দেখা করেছিলেন এবং তাঁকে সপ্তম আসমানে অবস্থিত আল্লাহর ঘর বায়তুল মামুরের দিকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। আল্লাহর এই ঘর মক্কায় তাঁর ঘর কাবার ঠিক উপরে অবস্থিত। বায়তুল মামুর এত পবিত্র যে প্রতিদিন ৭০,০০০ ফেরেশতা সেখানে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করেন এবং তাওয়াফ করেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের আর এটি করার সুযোগ থাকবে না। এটি ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৬-এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ঐশী ধর্মগ্রন্থ জুড়ে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যা ইঙ্গিত দেয় যে একজন ব্যক্তির সাথে তার আচরণ অনুসারে আচরণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি তাকে স্মরণ করে, তিনি তাকে স্মরণ করবেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৫২।

"অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব।"

আরেকটি উদাহরণ সূরা আল বাকারার ৪০ নম্বর আয়াতে পাওয়া যায়:

"...তোমাদের উপর আমার চুক্তি পূর্ণ করো, আমিও তোমাদের [আমার কাছ থেকে] চুক্তি পূর্ণ করবো..."

পরিশেষে, জামে আত তিরমিযী, ১৯২৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদের প্রতি দয়া করে, আল্লাহ তাকে দয়া করবেন।

এবং একইভাবে এই ঘটনাটি ইঙ্গিত দেয় যে, হাজার হাজার বছর আগে মক্কায় মহান আল্লাহর ঘর নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য কঠোর পরিশ্রম করার সময়, হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে সপ্তম আসমানে অবস্থিত আল্লাহর ঘর, বায়তুল মামুরের কাছে একটি স্থান দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় সূরা আল বাকারা, আয়াত ১২৭:

" আর [স্মরণ করো] যখন ইব্রাহিম ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন এবং [তার সাথে] ইসমাঈল [বলছিলেন], "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে [এটা] কবুল করুন। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।"

উপরন্তু, এই আলোচনাটি ৪৭তম অধ্যায় মুহাম্মদের ৭ম আয়াতের সাথে যুক্ত :

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করবেন।"

এই আয়াতের অর্থ হলো, কেউ যদি ইসলামকে সাহায্য করে, তাহলে মহান আল্লাহ উভয় জগতেই তাদের সাহায্য করবেন। এটা আশ্চর্যজনক যে অসংখ্য মানুষ আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, কিন্তু আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, তার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এই আয়াতের প্রথম অংশটি পূরণ করে না। বেশিরভাগ মানুষ যে অজুহাত দেয় তা হল, তাদের সৎকর্ম করার সময় নেই। তারা আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, কিন্তু তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সময় বের করে না। এর কি কোন যুক্তি আছে? যারা বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালন করে না এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে আল্লাহর সাহায্যের আশা করে, তারা বেশ বোকা। আর যারা বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালন করে কিন্তু তার বাইরে যেতে অস্বীকার করে, তারা দেখতে পায় যে তারা যে সাহায্য পায় তা সীমিত। কেউ কীভাবে আচরণ করে তার সাথে কীভাবে আচরণ করা হয়। মহান আল্লাহর জন্য যত বেশি সময় এবং শক্তি নিবেদিত হয়, তারা তত বেশি সমর্থন পাবে। এটা সত্যিই এত সহজ।

একজন মুসলিমের বুঝতে হবে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মতো বেশিরভাগ ফরজ কাজই তার দিনের মধ্যে খুব অল্প সময়ের জন্য সম্পন্ন হয়। একজন মুসলিম কখনোই আশা করতে পারে না যে, প্রতিদিন মাত্র এক ঘন্টা ফরজ নামাজ আদায়ের জন্য সময় ব্যয় করবে এবং তারপর বাকি সময় আল্লাহকে অবহেলা করবে এবং সমস্ত অসুবিধার মধ্যেও তাঁর অবিরাম সহায়তা আশা করবে। একজন ব্যক্তি এমন বন্ধুকে অপছন্দ করবে যে তার সাথে এমন আচরণ করে। তাহলে কীভাবে একজন ব্যক্তি বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর সাথে এমন আচরণ করতে পারে?

কেউ কেউ পার্থিব কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে, তারপর স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করে তার সমাধানের জন্য

তাঁর কাছে দাবি করে। এই বোকা মানসিকতা স্পষ্টতই আল্লাহর দাসত্বের পরিপন্থী। এটা আশ্চর্যজনক যে এই ধরণের ব্যক্তিরা তাদের অন্যান্য অবসর কাজ যেমন পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো, টিভি দেখা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য সময় বের করে কিন্তু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সময় বের করে না। তারা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং গ্রহণ করার জন্য সময় বের করে না। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অধ্যয়ন এবং তার উপর আমল করার জন্য সময় বের করে না। এই লোকেরা কোনওভাবে তাদের অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা ব্যয় করার জন্য সম্পদ খুঁজে পায় কিন্তু স্বেচ্ছায় দান করার জন্য কোন সম্পদ খুঁজে পায় না।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিমের সাথে তার আচরণ অনুসারে আচরণ করা হবে। অর্থাৎ, যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য অতিরিক্ত সময় উৎসর্গ করে, তাহলে তারা সমস্ত অসুবিধার মধ্য দিয়ে নিরাপদে ভ্রমণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবে। কিন্তু যদি তারা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় অথবা শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য অন্য কোনও সময় উৎসর্গ না করেই তা পালন করে, তাহলে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে একই রকম প্রতিক্রিয়া পাবে। সহজ কথায়, যে যত বেশি দেবে, সে তত বেশি পাবে। যদি কেউ বেশি না দেয়, তবে তার বিনিময়ে খুব বেশি আশা করা উচিত নয়।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সমাধান করা

মদিনায় হিজরতের আগে মক্কায় তাঁর শেষ বছরগুলিতে, মহানবী (সাঃ) কে অলৌকিকভাবে স্বর্গযাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বহু প্রজন্ম ধরে পণ্ডিতরা বিতর্ক করে আসছেন যে, স্বর্গযাত্রার সময় মহানবী (সাঃ) কি আল্লাহকে শারীরিকভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, নাকি ফেরেশতা জিব্রাইল (সাঃ) কে তাঁর প্রকৃত রূপে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। উভয় পক্ষই তাদের মতামতের সমর্থনে প্রমাণ উপস্থাপন করেছে। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মুসলমানদের কখনোই এই এবং অনুরূপ বিষয় নিয়ে এতটা বিতর্কে জড়িয়ে পড়া উচিত নয় যে, তা তাদের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করে। অধিকন্তু, এক বা অন্যভাবে বিশ্বাস করা তাদের ঈমান এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যকে প্রভাবিত করবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা এই বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না, অন্যথায় মুসলিম জাতিকে এ বিষয়ে অবহিত করা হত। তাই এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে অগণিত ঘন্টা বিতর্ক, বিতর্ক এবং বই প্রকাশ করা অর্থহীন। বরং মুসলমানদের উচিত সেই বিষয়গুলিতে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া যায় যা স্পষ্ট হলে আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে, যেমন তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস অনুসারে, এবং বিচারের দিনে যেসব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলা হবে, যেমন মানুষের অধিকার পূরণ করা। দুর্ভাগ্যবশত, এই ধরণের বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক মুসলিমদেরকে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করতে বিরত রেখেছে এবং এটিই সময়ের সাথে সাথে মুসলিম জাতির সামগ্রিক শক্তি হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ।

এই বিষয়টি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিসের সাথে সম্পর্কিত, যা জামে আত তিরমিযী, ২৫১৮ নম্বরে পাওয়া যায়। এটি পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলিমের উচিত এমন জিনিস ত্যাগ করা যা তাদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করে এবং এমন জিনিসগুলিতে কাজ করা যা তাদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করে না। মুসলমানদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ফরজ কর্তব্য এবং বেশিরভাগ হারাম বিষয় সম্পর্কে সচেতন, যেমন মদ্যপান। তাই এই বিষয়গুলি মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করে না তাই তাদের সেই অনুযায়ী কাজ করা উচিত, ফরজ কর্তব্যগুলি পালন করা এবং অবৈধ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

তাই অন্যান্য সকল কাজ যা বাধ্যতামূলক নয় এবং সমাজে সন্দেহের সৃষ্টি করে, তা এড়িয়ে চলা উচিত। মহান আল্লাহ বিচারের দিন প্রশ্ন করবেন না যে কেন কেউ নফল কাজ করেনি। বরং তিনি প্রশ্ন করবেন যে কেন তারা নফল কাজ করেছে। অতএব, নফল কাজ ত্যাগ করলে পরকালে কোন পরিণতি হবে না, যেখানে নফল কাজ করলে শাস্তি, পুরষ্কার বা ক্ষমা হবে। মুসলমানদের জন্য এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদিসের উপর আমল করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি অনেক সমস্যা এবং বিতর্কের সমাধান এবং প্রতিরোধ করবে। প্রকৃতপক্ষে, এটিই নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর আরেকটি হাদিসে দেওয়া উপদেশ, যা জামে আত তিরমিযী, ১২০৫ নম্বরে পাওয়া যায়। এটি পরামর্শ দেয় যে ইসলামে বৈধ এবং অবৈধ উভয় বিষয়ই মানবজাতির জন্য স্পষ্ট করা হয়েছে এবং সন্দেহের সৃষ্টিকারী অন্যান্য সমস্ত নফল কাজ বাদ দেওয়া উচিত। এই মনোভাব মানুষের ধর্ম এবং সম্মান রক্ষা করবে।

ফরজ নামাজ

জামে আত তিরমিযীতে ২১৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে স্বর্গযাত্রার একটি নির্দিষ্ট অংশের কথা বলা হয়েছে। এই সময়টি ছিল যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ফরজ নামাজ দান করা হয়েছিল। এই একমাত্র ফরজ নামাজই ছিল এইভাবে প্রদান করা হয়েছিল, বাকিগুলো হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, যা ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্বকে নির্দেশ করে। এই নির্দিষ্ট হাদিসটি পরামর্শ দেয় যে, প্রাথমিকভাবে পঞ্চাশটি ফরজ নামাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং ধাপে ধাপে সেগুলো কমিয়ে পাঁচটি অবশিষ্ট রাখা হয়েছিল। যদি একজন মুসলিমকে প্রতিদিন পঞ্চাশটি ফরজ নামাজ আদায় করতে হত তবে এটি তাদের অন্য কিছু থেকে বিরত রাখত। এটি ফরজ নামাজের গুরুত্বকে নির্দেশ করে। এটি মুসলমানদের শিক্ষা দেয় যে তাদের জীবন অবশ্যই ফরজ নামাজের চারপাশে আবর্তিত হবে। অতএব, তাদের জীবনকে তাদের ফরজ নামাজের চারপাশে গড়ে তোলা উচিত, তাদের ধর্মীয় কর্তব্যকে তাদের জীবনের চারপাশে ছাঁচে ফেলা উচিত নয়।

অধিকন্তু, ফরজ নামাজ হলো সেই ইঙ্গিত, যে কীভাবে একজন ব্যক্তিকে বস্তুজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাকালীন মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে। একজন মুসলিম নামাজরত ব্যক্তির নামাজের সময় কথা বলা, খাওয়া বা অন্যান্য স্বাভাবিক বৈধ কাজ করার অনুমতি নেই। এটি নির্দেশ করে যে, আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সংযুক্ত হতে পারে। প্রাথমিকভাবে পঞ্চাশটি ফরজ নামাজ আদায় করার নির্দেশ মুসলমানদের মনে করিয়ে দেয় যে, মহান আল্লাহর সাথে এই আনুগত্য এবং সংযোগ তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যান্য সমস্ত জিনিসকে তাদের যথাযথ স্থানে স্থাপন করা উচিত। এটাই মানবজাতির প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাদের উদ্দেশ্য এই বস্তুজগৎ এর অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিসের জন্য প্রচেষ্টা করা নয়। এই বস্তুজগৎ একটি সেতু যা

একজনকে পরকালের সাথে সংযুক্ত করে। এটি কোনও স্থায়ী আবাস নয়। ফরজ নামাজ এবং এই মহান ঘটনা মুসলমানদের এই সত্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। অতএব, তাদের ইসলামের শিক্ষা অনুসারে এই সেতু অতিক্রম করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত যাতে তারা নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে পারে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যে রয়েছে সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ শর্তাবলী এবং আদব-কায়দা পূরণ করা, যেমন সময়মতো আদায় করা। পবিত্র কুরআনে ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার কথা প্রায়শই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে কারণ এটি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক প্রমাণ। উপরন্তু, যেহেতু প্রতিদিনের নামাজগুলি বিস্তৃত, তাই এগুলি বিচার দিনের ধ্রুবক স্মারক এবং এর জন্য কার্যত প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করে, কারণ ফরজ নামাজের প্রতিটি স্তর বিচার দিনের সাথে সম্পর্কিত। যখন কেউ সঠিক পথে দাঁড়ায়, তখন বিচারের দিন সে এভাবেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। সূরা ৮৩ আল মুতাফিফিন, আয়াত ৪-৬:

" তারা কি ভাবে না যে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে? এক মহাদিনের জন্য, যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে?"

যখন তারা রুকু করে, তখন এটি তাদের সেই অনেক লোকের কথা মনে করিয়ে দেয় যারা পৃথিবীতে তাদের জীবদ্দশায় মহান আল্লাহর কাছে রুকু না করার জন্য বিচারের দিনে সমালোচিত হবে। সূরা ৭৭ আল মুরসালাত, আয়াত ৪৮:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'নামাজে রুকু করো', তখন তারা রুকু করে না।"

এই সমালোচনার মধ্যে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ না করাও অন্তর্ভুক্ত। যখন কেউ নামাজে সিজদা করে , তখন এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিচারের দিনে মানুষকে মহান আল্লাহর কাছে সিজদা করার জন্য কীভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য করার জন্য সঠিকভাবে সিজদা করেনি, তারা বিচারের দিনে এটি করতে সক্ষম হবে না। সূরা ৬৮ আল-কালাম, আয়াত ৪২-৪৩:

"যেদিন পরিস্থিতি কঠিন হবে, সেদিন তাদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের চোখ অবনত হবে, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। আর তাদেরকে সুস্থ অবস্থায় সিজদা করার জন্য ডাকা হত।"

যখন কেউ নামাযে হাঁটু গেড়ে বসে, তখন এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে কিয়ামতের দিন তারা কীভাবে তাদের চূড়ান্ত বিচারের ভয়ে আল্লাহর সামনে এই অবস্থানে বসে থাকবে। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২৮:

"আর তুমি প্রত্যেক জাতিকে [ভয়ে] নতজানু দেখবে। প্রত্যেক জাতিকে তার আমলনামার দিকে ডাকা হবে [এবং বলা হবে], "আজ তোমাদেরকে তোমাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।"

যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে নামাজ পড়বে, সে তার নামাজ সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবে। এর ফলে তারা নামাজের মাঝখানে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে। সূরা ২৯, আল আনকাবুত, আয়াত ৪৫:

"...প্রকৃতপক্ষে, নামাজ অশ্লীলতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা, যা তাঁর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

আবু বক্কর (রা.) - সত্যের সমর্থক

স্বর্গীয় যাত্রা থেকে ফিরে আসার পর, মহানবী (সা.) মক্কার অমুসলিমদের এ সম্পর্কে অবহিত করেন। মহানবী (সা.) মক্কার অমুসলিমদের কাছে এই যাত্রার অনেক বিবরণ তুলে ধরেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি মসজিদ আল আকসার একটি বিস্তারিত বর্ণনা দেন, যা অসম্ভব ছিল, কারণ তিনি আগে কখনও সেখানে ভ্রমণ করেননি, যা অমুসলিমরা জানত। তিনি একটি ভ্রমণকারী কাফেলার বিস্তারিত বর্ণনা দেন যা মক্কার দিকে যাচ্ছিল এবং তিনি যখন বলেছিলেন ঠিক তখনই পৌঁছেছিল। তিনি মক্কায় ফেরার পথে তাঁর মুখোমুখি হওয়া আরও কিছু ভ্রমণকারীর কথা উল্লেখ করেন এবং তাদের জিনিসপত্র বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। কিন্তু মক্কার অমুসলিমদের একগুঁয়েমি ছিল এবং তাই তারা তাকে এবং এই ঘটনাকে প্রত্যাখ্যান করে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, নবী (সা.)-এর নোবেল লাইফ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৫১-৫৫২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মক্কার অমুসলিমরা সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, ইসলাম ত্যাগ করতে রাজি করানোর চেষ্টা করেছিল কারণ তারা বিশ্বাস করত যে এই যাত্রা অসম্ভব। কিন্তু আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কেবল উত্তর দিয়েছিলেন যে এই যাত্রায় বিশ্বাস করা একটি ছোট বিষয় কারণ তিনি মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে যে বৃহত্তর বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন, যেমন ঐশ্বরিক ওহী, তাতে বিশ্বাস করতেন। এই সময়ই তাকে আস সিদ্দীক উপাধি দেওয়া হয়েছিল, যার অর্থ সত্যবাদী। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সর্বদা মহানবী (সাঃ) এর প্রতি প্রকৃত আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন এবং এই মনোভাব সকল মুসলমানেরই গ্রহণ করা উচিত।

সহীহ মুসলিমের ১৯৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, ইসলাম হলো মহানবী (সা.)-এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর ঐতিহ্যের উপর আমল করার জন্য জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টা। এই হাদিসগুলির মধ্যে রয়েছে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কিত হাদীস এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর পবিত্র মহৎ চরিত্র। ৬৮ সূরা আল-কালাম, আয়াত ৪:

"আর সত্যিই, তুমি মহান নৈতিক চরিত্রের অধিকারী।"

এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়া। এটি মহান আল্লাহ তায়ালা একটি ফরজ কাজ করেছেন। সূরা আল হাশর, আয়াত ৭:

"... আর রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো; আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো..."

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কর্মের উপর তাঁর ঐতিহ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া, কারণ মহান আল্লাহর দিকে যাওয়ার সকল পথ বন্ধ, কেবল মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পথ ছাড়া। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"[নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..." "

তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পরে যারা তাঁকে সমর্থন করেছেন, আল্লাহ তাদের সকলকেই ভালোবাসা উচিত, হোক তারা তাঁর পরিবারের সদস্য অথবা তাঁর সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। যারা তাঁর পথে চলেন এবং তাঁর ঐতিহ্য শিক্ষা দেন তাদের সমর্থন করা তাদের উপর কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে যারা তাঁকে ভালোবাসেন তাদের ভালোবাসা এবং যারা তাঁর সমালোচনা করেন তাদের অপছন্দ করা, তাদের সাথে সম্পর্কের কথা বিবেচনা না করে। সহিহ বুখারির ১৬ নম্বর হাদিসে এই সবের সারসংক্ষেপ রয়েছে। এটি পরামর্শ দেয় যে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত ঈমান অর্জন করতে পারে না যতক্ষণ না সে আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-কে সমগ্র সৃষ্টির চেয়ে বেশি ভালোবাসে। এই ভালোবাসা কেবল কথার মাধ্যমে নয়, কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। তাঁকে শ্রদ্ধা করা, ভালোবাসা এবং কার্যত অনুসরণ করা তাঁর প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক। কিন্তু তাঁর পবিত্র জীবন এবং শিক্ষা সম্পর্কে না জেনে এটি করা সম্ভব নয়। কেউ কীভাবে এমন কাউকে সম্মান করতে, ভালোবাসতে এবং অনুসরণ করতে পারে যাকে তারা চেনে না? যে ব্যক্তি তাঁকে ভালোবাসতে এবং সম্মান করার দাবি করে কিন্তু কার্যত তাঁকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে তার দাবিতে অকৃতজ্ঞ।

বিভিন্ন উপজাতির কাছে ইসলাম প্রচার

মৃদু অধ্যবসায়

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর মিশনে অবিচল ছিলেন এবং তাঁর সকল সাক্ষাৎকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছিলেন। ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য তিনি অনেক গোত্র ও গোত্র পরিদর্শন করেছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে, বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, তিনি কিন্দা গোত্র, কালব গোত্র, হানিফা গোত্র এবং আরও অনেকের সাথে দেখা করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি ইসলামের বাণী প্রচার করতে চায়, তার উচিত অন্যদেরকে বারবার ভালোর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা। মানুষ দ্রুত গাফিল হয়ে যেতে পারে, তাই তাদের ধারাবাহিকভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। সূরা আল কাসাস, আয়াত ৫১:

" আর আমি তাদের কাছে বারবার বাণী [অর্থাৎ, কুরআন] পৌঁছে দিয়েছি যাতে তারা স্মরণ করিয়ে দেয়।"

ঠিক যেমন শিক্ষার্থীরা তাদের নোট বারবার সংশোধন করে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য তাদের মনে বারবার মনে করিয়ে দিলে উপকৃত হবেন ইসলামের সত্য বাণী

সম্পর্কে। একবার ভালো উপদেশ দিয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। ভালো কথা বারবার বলা অবিরাম পানির ফোঁটার মতো যা সময়ের সাথে সাথে পানিতে ভেসে যায়। সবচেয়ে শক্ত কাঠামো। এটি আল্লাহর রীতি , মহিমান্বিত, এবং সকল পবিত্র নবীগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক । উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ , মহিমান্বিত, কেবল একবারই মুসলমানদের ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার আদেশ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তিনি পবিত্র কুরআন জুড়ে বহুবার এটি করেছেন।

নবী নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে ঈমানের বাণী প্রচারের জন্য প্রায় ৯৫০ বছর অবিরামভাবে কাটিয়েছিলেন। ২৯ সূরা আল আনকাবুত, আয়াত ১৪:

" আর অবশ্যই আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম, আর সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ বছর কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিল..."

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক, তিনি প্রতিটি মুহূর্ত ইসলামের প্রচারের জন্য ব্যয় করেছিলেন এবং এমনকি তাঁর শেষ মুহূর্তগুলিতেও সাহাবীদের , আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন, ইসলামী শিক্ষা মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সুনানে ইবনে মাজাহ, ২৬৯৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি লিপিবদ্ধ আছে । অতএব, এই মনোভাব গ্রহণ করা উচিত এবং কয়েকবার উপদেশ দেওয়ার পরে শয়তানের কুমন্ত্রণার শিকার না হওয়া উচিত। যে মুসলিম অন্যদের ইসলামের দিকে আহ্বান করে তার কর্তব্য হল এটি ধারাবাহিকভাবে করা, তবে এটি মানুষের হৃদয়ে প্রভাব ফেলবে কিনা তা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

কিন্তু এটা জোর দিয়ে বলা গুরুত্বপূর্ণ যে নিয়মিত থাকা এবং অন্যদের উপর নির্যাতন করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একজন মুসলিমের উচিত অন্যদেরকে ক্রমাগত ভালো কাজের আদেশ দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি অন্যদের জন্য অতিরিক্ত চাপ এবং বোঝা হয়ে উঠতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব বেশি বক্তৃতা দেওয়া থেকে বিরত থাকতেন কারণ তিনি চাননি যে সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, একঘেয়ে এবং অতিরিক্ত বোঝা হয়ে যান। এই কারণেই সাহাবী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তিনি কেবল বৃহস্পতিবারে বক্তৃতা দিতেন যদিও তাকে আরও বেশি দিতে বলা হয়েছিল। সহীহ মুসলিমের ৭১২৭ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

একটি ভালো উদ্দেশ্য

মহানবী (সাঃ) ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য অনেক গোত্র ও গোত্র পরিদর্শন করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, কিন্দার উপজাতি নেতারা প্রশ্ন করেছিলেন যে, যদি তারা তাঁকে সাহায্য করে, তাহলে তিনি কি তাদেরকে কর্তৃত্বের পদে বসাতেন? মহানবী (সাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন যে, ক্ষমতা সর্বদা আল্লাহর হাতে, এবং তিনি যেখানে ইচ্ছা সেখানেই তা স্থাপন করেন। অর্থাৎ, যদি তারা তাঁকে সাহায্য করে, তাহলে তিনি তাদের কর্তৃত্বের পদের নিশ্চয়তা দেওয়ার মতো অবস্থানে ছিলেন না। এই উত্তর শোনার পর তারা তাঁর ইসলামের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

অনেক মানুষ এসেছেন এবং চলে গেছেন যারা নারী অধিকার, মানবাধিকার, দরিদ্র বা অন্য কিছুর জন্য কোনও না কোনও কারণেই দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু এই লোকদের মধ্যে মাত্র অল্প কিছু লোক সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বেশিরভাগের কোনও ইতিবাচক প্রভাব ছিল না এবং তারা ইতিহাসের পাদটীকা হয়ে উঠেছে। এর একটি কারণ হল আন্তরিকতার অভাব। ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখলে দেখা যাবে যে যারা সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেছিলেন, অর্থাৎ কোনও গোপন উদ্দেশ্য ছাড়াই সত্যিকার অর্থে সমাজের উপকার করার জন্য, তারা মুসলিম না হলেও সাফল্য পেয়েছেন। অন্যদের উপকার করা এমন একটি বিষয় যা মহান আল্লাহ ভালোবাসেন এবং তাই তিনি তাদের সকলকে সাফল্য দান করেন যারা এই লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা করেন।

যারা সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি তাদের এই ভালো উদ্দেশ্যের অভাব ছিল কারণ তারা অন্য কিছু, যেমন খ্যাতি, চেয়েছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের খারাপ উদ্দেশ্য বেশ স্পষ্ট কারণ তাদের কথা এবং কাজ একে অপরের সাথে স্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক। উদাহরণস্বরূপ, কেউ কেউ নারীর অধিকারের পক্ষে

দাঁড়ানোর দাবি করে এবং আনন্দের সাথে এমন বিজ্ঞাপন প্রচারণায় অংশ নেয় যেখানে দেখানো হয় যে নারীরা কেবল অলংকার মাত্র। যদি তাদের কাজ তাদের দাবির পক্ষে দাঁড়াত তবে তারা বিজ্ঞাপন কোম্পানিগুলিকে শিখিয়ে দিত যে একজন নারীর বুদ্ধিমত্তা, ভালো চরিত্র এবং অভ্যন্তরীণ শক্তি হল তাদের বিজ্ঞাপন প্রচারণার মাধ্যমে বিশ্বের কাছে প্রদর্শন করা উচিত।

বিভিন্ন কারণে দাঁড়ানোর দাবি করা এইসব মানুষদের অনেকেই রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবশালী পদে আছেন এবং তাদের প্রচুর সম্পদ আছে, তবুও সমাজে তাদের ইতিবাচক প্রভাব খুবই কম এবং খুব ক্ষণস্থায়ী। অন্যদিকে, যাদের এই ধরনের প্রভাব ছিল না তারা তাদের আন্তরিকতার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের মনোভাব পরিবর্তন করেছে। তারা কেবল সমাজের উপকার করতে চেয়েছিল; তারা অন্য কিছু খুঁজছিল না। তাদের আন্তরিকতার কারণে তাদের ইতিবাচক প্রভাব এবং স্মৃতি এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার অনেক পরেও স্থায়ী হয়েছিল, অন্যদিকে, যাদের উদ্দেশ্য দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল তারা জীবিত থাকাকালীনও দ্রুত ভুলে গিয়েছিল।

তাই যদি কেউ বস্তুগত জগতে অথবা তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণভাবে ঈমানের ক্ষেত্রে সাফল্য পেতে চায়, তাহলে তার উচিত তার নিয়ত সংশোধন করার চেষ্টা করা। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের নিয়তের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন। সহীহ বুখারী, ১ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পথভ্রষ্ট সাহাবীরা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য অনেক গোত্র ও গোত্রে সফর করতেন। উৎসবের সময় তিনি উপস্থিত সকলকে আমন্ত্রণ জানাতেন কিন্তু কেউই তাঁর প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিত না। মায়সারা বিন মাসরুক (রাঃ) নামে এক ব্যক্তি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং তাঁর গোত্রকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপদেশ গ্রহণ ও সুরক্ষার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁর গোত্র তাঁর উপদেশ প্রত্যাখ্যান করে এবং ফলস্বরূপ মায়সারা (রাঃ) তাঁর লোকদের অনুসরণ করে এবং সেই সময় ইসলাম গ্রহণ করে না। ফেরার পথে তিনি ফাদাকের পাশ দিয়ে যান এবং আহলে কিতাবদের কিছু আলেমের কাছ থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। এই আলেমরা তাঁকে শেষ নবী (সাঃ) এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত করেন, যা হুবহু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়। এই পণ্ডিতরা মায়সারা (রাঃ)-কে ইসলাম গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু আরও বলেছিলেন যে তারা তা করবে না, কারণ তারা মহানবী (সাঃ)-কে ঈর্ষা করত। মায়সারা (রাঃ)-কে তার গোত্রের কিছু লোককে পরবর্তী হজ্জ মৌসুমে ফিরে এসে মহানবী (সাঃ)-এর সাথে দেখা করতে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি করাতে সক্ষম হন, কিন্তু তাদের বয়স্করা তাদের বাধা দেন। বহু বছর পর, মায়সারা (রাঃ)-এর বিদায়ী হজ্জের সময় মহানবী (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়, যেখানে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাকে কুফর থেকে রক্ষা করার জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করেন। ইবনে কাথিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১১৪-১১৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মায়সারা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করেছিলেন কারণ তিনি তার গোত্রের লোকদের অন্ধভাবে অনুসরণ করেছিলেন। মানুষের জন্য অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করা এড়িয়ে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি প্রায়শই বিপথগামীতার দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই সঠিক নির্দেশনা পাওয়ার জন্য তাদের প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান এবং বুদ্ধি ব্যবহার করা

উচিত। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাদের অবশ্যই প্রমাণ এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিটি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে হবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে তার সঠিক নির্দেশনা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এছাড়াও, ইসলাম অন্ধ অনুকরণের তীব্র সমালোচনা করে, কারণ মহান আল্লাহ চান মানুষ ইসলামের স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণ মূল্যায়ন করুক এবং তারপর সাধারণ জ্ঞান এবং যুক্তির ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

এবং ৩৪তম অধ্যায় সাবা, ৪৬তম আয়াত:

"বলুন, "আমি তোমাদেরকে কেবল একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি - তোমরা আল্লাহর জন্য জোড়ায় জোড়ায় এবং এককভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, তারপর চিন্তা করো।" তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন পাগলামি নেই। তিনি কেবল তোমাদেরকে কঠোর শাস্তির পূর্বে সতর্ককারী।"

তাছাড়া, ইসলামে অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ করা প্রায়শই পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করে কারণ এই ব্যক্তি যখন অন্ধভাবে অনুসরণকারীরা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্য থেকে সরে যায়, তখন তা বুঝতে ব্যর্থ হয়। যখন এটি ঘটে, তখন এই ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে তারা ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করছে, যখন তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামী শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত নয় এমন প্রথাগত রীতিনীতি অনুসরণ করছে। যে ব্যক্তি এই মনোভাব ধরে রাখবে সে অজান্তেই পথভ্রষ্ট হবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ করার

পরিবর্তে ইসলামী জ্ঞানের উপর আমল করবে, সে সহজেই এমন রীতিনীতি চিনতে পারবে যা ইসলামে মূলগত নয় এবং তাই সেগুলি এড়িয়ে চলবে। ফলস্বরূপ, তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্য মেনে চলবে, যা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে।

মদীনার সাহায্যকারীরা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন

উৎসবের সময়, মহানবী (সাঃ) সকলকে আমন্ত্রণ জানাতেন কিন্তু কেউই তাঁর প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিত না। এভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ না তিনি মদীনার লোকদের সাথে দেখা করেন, যা মহানবী (সাঃ) এর আগে ইয়াসরিব নামে পরিচিত ছিল। তারা তাঁর ইসলামের বার্তা গ্রহণ করে এবং তাঁর মিশনে তাঁকে সহায়তা করে। তারা সেই সময় পর্যন্ত অবতীর্ণ ঐশ্বরিক ওহী সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাদের লোকদের ইসলামের দিকে আমন্ত্রণ জানাতে মদীনায় ফিরে আসে। অবশেষে মদীনার কোনও ঘরই মুসলিম শূন্য ছিল না। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়াও, মদীনায় বসবাসকারী আহলে কিতাবদের কাছ থেকে অর্জিত জ্ঞানের কারণে মদীনার জনগণ ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত হয়েছিল। এই জ্ঞানের মধ্যে ছিল নবুওয়তের ধারণা, আসমানী কিতাব এবং শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভবিষ্যদ্বাণী, যারা তাদের সময়ে তাদের দেশে হিজরত করেছিলেন। সিরাত ইবনে হিশামের ৮৩-৮৪ পৃষ্ঠায় এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মদীনার প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন আবু উমামা, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। তিনি তাঁর কথার মাধ্যমে তাঁর দৃঢ় স্বভাবের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, প্রতিটি আহ্বানের একটি পথ থাকে। কিছু পথ সহজ হলেও অন্যগুলি কঠিন। আজ আপনি আমাদের এমন একটি দিকে আহ্বান করেছেন যা মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা নতুন এবং কঠিন। আপনি আমাদেরকে আমাদের ধর্ম ত্যাগ করতে এবং আপনার বিশ্বাসে আপনার অনুসরণ করতে আহ্বান করেছেন। এটি কোনও সহজ কাজ নয়। তবে, আমরা আপনার আহ্বান গ্রহণ করেছি। আপনি আমাদেরকে নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী উভয় আত্মীয়দের সাথে আমাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান

জানিয়েছেন (তাদের পরিবর্তে আপনার অনুসরণ করে)। এটি কোনও সহজ কাজ নয়। তবে, আমরা আপনার আহ্বান গ্রহণ করেছি। আপনি আমাদের ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন, যদিও আমরা একটি শক্তিশালী দল যা এমন একটি জায়গায় বাস করে যা শক্তিশালী এবং পরাক্রমশালী (যেখানে আমাদের জীবন এবং সম্পত্তি নিরাপদ)। কেউ কখনও কল্পনাও করতে পারেনি যে আমাদের নেতা আমাদের মধ্যে থেকে নয়, যার লোকেরা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং যার পরিবার তাকে পরিত্যাগ করেছে। এটি কোনও সহজ কাজ নয় তবে আমরা এটি গ্রহণ করেছি। এই জিনিসগুলি সকলের জন্য কঠিন বলে মনে হয়, কেবল তাদের জন্য যাদের কল্যাণ আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন এবং যারা এর ফলাফলে মঙ্গল আশা করে। আমরা আমাদের জিহ্বা, হৃদয় এবং হাত দিয়ে তোমার ডাক গ্রহণ করেছি কারণ তুমি আমাদের যা বলেছো তাতে আমরা বিশ্বাস করেছি এবং আমাদের অন্তরের গভীরে স্থাপিত দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তা গ্রহণ করেছি। আমরা এই সকল ক্ষেত্রে তোমার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার করছি এবং আমাদের প্রভু এবং তোমার প্রভুর কাছেও অঙ্গীকার করছি। মহান আল্লাহর হাত আমাদের উপরে (এই অঙ্গীকার অনুমোদন করে)। আমরা তোমাদের রক্ষা করার জন্য আমাদের রক্ত ঝরাবো এবং তোমাদের জন্য আমাদের জীবন দেব। আমরা তোমাদের রক্ষা করব যেমন আমরা নিজেদের, আমাদের সন্তানদের এবং আমাদের স্ত্রীদের রক্ষা করি। যদি আমরা এই অঙ্গীকার পূরণ করি, তাহলে তা হবে মহান আল্লাহর জন্য। যদি আমরা এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করি, তাহলে তা হবে মহান আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা, যার মূল্য আমাদেরকে সবচেয়ে হতভাগ্য মানুষ করে তোলা। হে আল্লাহর রাসূল , আমরা আপনাকে যা বলেছি তা সম্পূর্ণ সত্য এবং আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য ও সাহায্য কামনা করি।" ইমাম মুহাম্মদ কান্ধলভীর, হায়াতুস সাহাবা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৫-১২৬-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি ইঙ্গিত দেয় যে, যেকোনো পরিস্থিতিতে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে ইসলাম গ্রহণের পর তার উপর অবিচল থাকার গুরুত্ব কতটুকু। সহীহ মুসলিমের ১৫৯ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে

আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস ঘোষণা করার এবং তারপরে তার উপর অবিচল থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হলো, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যে সংগ্রাম করা। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোজা এবং মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহ, মহানের মধ্যে এবং অন্যদের সাথে সম্পর্কিত। একজন মুসলিমকে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে, সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

পরিশেষে, এর মধ্যে রয়েছে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসারে এই দিকগুলি পূরণ করা। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

দৃঢ়তার মধ্যে উভয় ধরণের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান প্রকার হল যখন কেউ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা করে। গৌণ প্রকার হল যখন কেউ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুর জন্য ভালো কাজ করে, যেমন লোক দেখানো। সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৮৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, দৃঢ়তার একটি দিক হল সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা এবং কখন এবং কোন ইসলামী শিক্ষা কেউ তার ইচ্ছানুযায়ী অনুসরণ করবে তা থেকে বিরত থাকা।

দৃঢ়তার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, নিজের বা অন্যদের আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পরিবর্তে। যদি কোন মুসলিম নিজেকে বা অন্যদের খুশি করে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়, তাহলে তার জানা উচিত যে তার ইচ্ছা বা মানুষ কেউই তাকে আল্লাহ তাআলার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল, সে যদি এই সুরক্ষা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়, তবুও তিনি তাকে সবকিছু থেকে রক্ষা করবেন।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস দ্বারা নির্ধারিত পথ অনুসরণ করা এবং এমন পথ গ্রহণ না করা যা এই পথ থেকে বিচ্যুত হয়। যে ব্যক্তি এই পথ গ্রহণ করার চেষ্টা করবে তার আর কোনও কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটি তাদের ঈমানে অবিচল রাখার জন্য যথেষ্ট। ৪র্থ সূরা আন নিসা, আয়াত ৫৯:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্যে করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী..."

এই আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অবিচল থাকার একটি দিক হল এমন কারো আনুগত্য করা যার আদেশ ও উপদেশ আল্লাহ, মহানবী (সাঃ) এবং মহানবী (সাঃ) এর আন্তরিক আনুগত্যের উপর নিহিত।

যেহেতু মানুষ নিখুঁত নয়, তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। তাই ঈমানের ক্ষেত্রে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে, বরং এর অর্থ হল তাদের অবশ্যই পূর্বে বর্ণিত মহান আল্লাহর আনুগত্য কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে এবং পাপ করলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 সূরা ফুসসিলাতের 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"...তাই তোমরা তাঁর দিকে সোজা পথ অবলম্বন করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো..."

জামে আত তিরমিযী, ১৯৮৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থিত, যেখানে মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে সংঘটিত (ছোট) পাপ মোচন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই ২, হাদিস নম্বর ৩৭-এ প্রাপ্ত আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) মুসলমানদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা এটি নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবে না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল তাদের নিয়ত এবং শারীরিক কর্মের

মাধ্যমে প্রদত্ত সম্ভাবনাকে আল্লাহ, মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে পূরণ করা। তাদের পরিপূর্ণতা অর্জনের আদেশ দেওয়া হয়নি কারণ এটি সম্ভব নয়।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ তার আধ্যাত্মিক হৃদয়কে প্রথমে পবিত্র না করে শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৮৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কেবল তখনই বিশুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় পবিত্র থাকে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসের শিক্ষা অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই হৃদয়ের বিশুদ্ধতা অর্জন করা সম্ভব।

অবিচল আনুগত্যের জন্য জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করে। জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ না করে মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, ২৪০৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, যদি মহান আল্লাহর আনুগত্যে কোন ত্রুটি দেখা দেয়, তাহলে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তওবা করা উচিত এবং মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। সূরা আল আহকাফ, আয়াত ১৩:

"নিশ্চয়ই যারা বলেছে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ," অতঃপর সৎপথে অবিচল রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

সাহায্যকারীদের প্রথম শপথ (রা.)

ইসলামের আগমনের আগে মক্কায় হজ্জের মৌসুমে, যদিও সঠিক রীতিনীতিগুলি কলুষিত হয়ে গিয়েছিল, মদীনার লোকেরা, সাহায্যকারীরা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দেখা করেছিলেন এবং তাঁর কাছে একটি অঙ্গীকার করেছিলেন। অঙ্গীকার ছিল যে তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, তারা চুরি করবে না, তারা ব্যভিচার করবে না, তারা তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তারা মিথ্যা অভিযোগ করবে না এবং তারা মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন ভালো কাজের অবাধ্য হবে না। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১২০-তে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

অঙ্গীকারের প্রথম অংশ ছিল যে তারা মহান আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না।

এর মূল হলো মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক হওয়া।

সহীহ মুসলিমের ১৯৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, ইসলাম হলো মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা বলতে কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর প্রদত্ত সকল আদেশ ও নিষেধ পালন করাকে বোঝায়। সহীহ বুখারী, ১ নম্বর হাদিসে

যেমনটি নিশ্চিত করা হয়েছে, সবকিছুর বিচার তাদের নিয়ত দ্বারা করা হবে। সুতরাং যদি কেউ সৎকর্ম করার সময় মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, তাহলে তারা এই পৃথিবীতে বা পরকালে কোন প্রতিদান পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বর হাদিস অনুসারে, যারা অসাধু কাজ করেছে তাদের বিচারের দিন তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইতে বলা হবে যাদের জন্য তারা কাজ করেছে, যা সম্ভব হবে না। ৯৮ আল বাইয়্যিনাহ, আয়াত ৫।

"আর তাদেরকে কেবল আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তাঁর প্রতি খাঁটি মনোভাব পোষণ করে....."

যদি কেউ মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালনে শিথিলতা দেখায়, তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের উচিত আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া এবং সেগুলি পালনের জন্য সংগ্রাম করা। মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ কখনও কাউকে এমন কর্তব্যের বোঝা চাপান না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮৬।

"আল্লাহ কোন আত্মার উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন বোঝা চাপান না..."

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হলো, নিজের এবং অন্যদের সন্তুষ্টির চেয়ে তাঁর সন্তুষ্টিকে সর্বদা প্রাধান্য দেওয়া। একজন মুসলিমের উচিত সর্বদা সেইসব কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। অন্যদের ভালোবাসা এবং তাদের পাপকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা করা উচিত, নিজের ইচ্ছার জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে বা পাপে অংশগ্রহণ করতে

অস্বীকার করে, তখন তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি এই মানসিকতা গ্রহণ করে সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে। সুনান আবু দাউদের ৪৬৮১ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক হল, এই বিশ্বাস রাখা যে তাঁর সিদ্ধান্ত এবং পছন্দগুলি সংশ্লিষ্ট মানুষের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি তাঁর সিদ্ধান্তের পিছনের প্রজ্ঞা মানুষের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হুকুমে সন্তুষ্ট থাকা এবং নিজের ইচ্ছার সাথে বিরোধী হুকুমে বিরক্ত হওয়া আল্লাহর প্রতি স্পষ্ট অকৃতজ্ঞতা। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে তার আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে, সে প্রকৃতই আন্তরিক।

অঙ্গীকারের পরবর্তী অংশ ছিল যে তারা চুরি করবে না।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, হারাম ব্যবহার করা একটি মহাপাপ। এর মধ্যে রয়েছে হারাম সম্পদ ব্যবহার, হারাম জিনিস ব্যবহার এবং হারাম খাবার খাওয়া। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলাম যেসব নির্দিষ্ট জিনিসকে হারাম বলে ঘোষণা করেছে, যেমন মদ, সেগুলোই কেবল হারাম নয়। প্রকৃতপক্ষে, এমনকি হালাল জিনিসও হারাম হয়ে যেতে পারে যদি সেগুলি হারাম জিনিসের মাধ্যমে অর্জিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, হালাল খাবার যদি হারাম সম্পদ দিয়ে কেনা হয়, তাহলে তা হারাম হয়ে যেতে পারে। অতএব, মুসলমানদের জন্য এটি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা কেবল হালাল জিনিসের সাথেই লেনদেন করে কারণ কাউকে ধ্বংস করার জন্য হারাম জিনিসের একটি উপাদানের প্রয়োজন হয়।

প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিমের ২৩৪৬ নম্বর হাদিসে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি হারাম জিনিস ব্যবহার করবে তার সকল দোয়া বাতিল করা হবে। যদি আল্লাহ তাআলা তাদের দোয়া বাতিল করে দেন, তাহলে কি কেউ তাদের কোন নেক আমল কবুল হওয়ার আশা করতে পারে? সহীহ বুখারী, ১৪১০ নম্বর হাদিসে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা কেবল হালাল জিনিসই গ্রহণ করেন। অতএব, হারাম জিনিসের ভিত্তি যেমন হারাম জিনিস দিয়ে হজ্জ পালন করা, তা বাতিল করা হবে।

বস্তুত, সহীহ বুখারী শরীফের ৩১১৮ নম্বর হাদিসে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে বলেছেন যে, এই ধরণের ব্যক্তিকে বিচারের দিন জাহান্নামে পাঠানো হবে। দ্বিতীয় সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৮৮:

" আর তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং শাসকদের কাছে তা [ঘুষ হিসেবে] পাঠাও না যাতে তারা তোমাদেরকে [মানুষের সম্পদের

একটি অংশ] পাপের মাধ্যমে গ্রাস করতে সাহায্য করতে পারে, যদিও তোমরা জেনে থাকো [এটি অবৈধ]।"

এছাড়াও, চুরি করা একজন মুমিনের চরিত্রের পরিপন্থী কারণ একজন প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি এবং তার সম্পদ থেকে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি দূরে রাখে। সুনানে আন নাসায়ী, ৪৯৯৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন ব্যক্তিকে মনে রাখতে হবে যে বিচারের দিনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, এমনকি যদি তারা বিশ্বাস করে যে তারা এই পৃথিবীতে তাদের কর্মের পরিণতি থেকে বাঁচতে পারবে। অন্যায়কারীকে তাদের নেক আমলগুলি তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য করা হবে এবং প্রয়োজনে, অন্যায়কারী তাদের শিকারের পাপ গ্রহণ করবে। এর ফলে অন্যায়কারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিম, ৬৫৭৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মানুষের অধিকার পূরণ করছে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে। মানুষের অধিকার পূরণ করা সবচেয়ে ভালো হয় যখন কেউ অন্যদের সাথে এমন আচরণ করে যেমন সে নিজে অন্যদের দ্বারা আচরণ করা হোক বলে আশা করে।

অঙ্গীকারের পরবর্তী অংশ ছিল যে তারা ব্যভিচার করবে না।

এটি আল ফুরকানের ২৫ নম্বর সূরার ৬৮ নম্বর আয়াতের সাথে সম্পর্কিত:

"...এবং অবৈধ যৌন মিলন করো না। আর যে কেউ তা করবে তাকে শাস্তি পেতে হবে।"

মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দারা সকল প্রকার অবৈধ সম্পর্ক এড়িয়ে চলে। এই আয়াতে ব্যভিচারকে শিরক এবং একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যার পাশে রাখা হয়েছে, যা এর তীব্রতা নির্দেশ করে।

অবৈধ সম্পর্কের প্রলোভন এড়াতে মুসলমানদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। প্রথমত, তাদের দৃষ্টি নিচু করতে শেখা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে সর্বদা তাদের জুতার দিকে তাকানো উচিত, বরং এর অর্থ হল তাদের অপ্রয়োজনীয়ভাবে চারপাশে তাকানো এড়ানো উচিত, বিশেষ করে জনসাধারণের জায়গায়। তাদের অন্যদের দিকে তাকানো এড়ানো উচিত এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখা উচিত। ঠিক যেমন একজন মুসলিম তার বোন বা মেয়ের দিকে কেউ তাকিয়ে থাকুক তা পছন্দ করে না, তেমনি অন্যের বোন এবং মেয়েদের দিকেও তাকানো উচিত নয়। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ৩০:

"মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিশক্তি কিছুটা কমিয়ে রাখে এবং তাদের গোপনাঙ্গের হেফাজত করে। এটি তাদের জন্য অধিক পবিত্র..."

যখনই সম্ভব, একজন মুসলিমের উচিত বিপরীত লিঙ্গের সাথে একা সময় কাটানো এড়িয়ে চলা, যদি না তারা এমনভাবে সম্পর্কিত হয় যা বিবাহকে নিষিদ্ধ করে। সহীহ বুখারী, ১৮৬২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এই পরামর্শ দিয়েছেন।

মুসলমানদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আচরণ শালীনভাবে করা উচিত। শালীন পোশাক অপরিচিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এড়ায় এবং শালীন আচরণ করা প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত রাখে যা বিপরীত লিঙ্গের সাথে অপ্রয়োজনীয়ভাবে কথা বলার মতো অবৈধ সম্পর্কের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

অবৈধ সম্পর্ক এড়িয়ে চলার আশীর্বাদ বোঝা হল এগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করার আরেকটি উপায়। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার জিহ্বা এবং সতীত্ব রক্ষাকারী ব্যক্তির জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। জামে আত তিরমিযী, ২৪০৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

অবৈধ সম্পর্কে জড়িত থাকার শাস্তির ভয় একজন মুসলিমকে এগুলো এড়িয়ে চলতে সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ব্যভিচার করছে তার ঈমান চলে যাবে। সুনান আবু দাউদের ৪৬৯০ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

বাস্তবে, ইসলামে বিবাহের বিধান অনুসারে একজন মুসলিমের অবৈধ সম্পর্কের প্রয়োজন নেই। যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে না তাদের ঘন ঘন রোজা রাখা উচিত কারণ এটি তাদের ইচ্ছা এবং কর্ম নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। সহিহ মুসলিমের ৩৩৯৮ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ বিবাহকে উৎসাহিত করেন এবং অবৈধ সম্পর্ক নিষিদ্ধ করেন। যখন কোন দম্পতি বিবাহিত দম্পতির মতো একে অপরের প্রতি সত্যিকার অর্থে নিবেদিতপ্রাণ না থাকে, তখন তাদের মুখোমুখি হওয়া যেকোনো বাস্তব সমস্যার কারণে দম্পতির জন্য আরও মানসিক চাপ তৈরি হয়, কারণ তারা একে অপরকে সঠিকভাবে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়। জীবনে একাধিক সম্পর্কের আগমন এবং বিচ্ছেদ নিঃসন্দেহে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে যারা তাদের সঙ্গীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায় তারা প্রায়শই কাউন্সেলিংয়ে পড়ে। তারা এই সম্পর্কগুলি এড়িয়ে চলা লোকদের তুলনায় বিষণ্নতার মতো মানসিক ব্যাধিতে বেশি ভোগেন। এছাড়াও, যারা সমাজে একাধিক সঙ্গী থাকার জন্য পরিচিত, তারা তাদের অধিকার পূরণের জন্য উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এর কারণ হল যার জীবনে একাধিক সঙ্গী আছে সে একটি শিথিল এবং অবাঞ্ছিত চরিত্র গ্রহণ করবে, যা বিবাহের মতো গুরুতর প্রতিশ্রুতি খুঁজছেন এমন লোকেরা অপছন্দ করবে। এটি কেবল একাধিক সঙ্গী থাকা ব্যক্তির জন্য মানসিক চাপ বাড়িয়ে তুলবে। নৈমিত্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, দম্পতি প্রায়শই একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের হয় না। অর্থাত্, দুজনের মধ্যে একজন সবসময় সম্পর্কটিকে আরও গুরুত্ব সহকারে নেয়, যেমন তাদের সঙ্গীর সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চাওয়া। অন্যদিকে, অন্যজন তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একই রকম অনুভব করে না। যখন এই মনোভাবের পার্থক্য অবশেষে সামনে আসে, তখন এটি প্রায়শই সেই ব্যক্তির জন্য দীর্ঘস্থায়ী মানসিক আঘাতের দিকে পরিচালিত করে যারা সম্পর্কটিকে আরও গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিল। অন্যদিকে, প্রথম ধাপ থেকেই বিবাহিত দম্পতি একে অপরের প্রতি তাদের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে থাকে। বিবাহিত দম্পতি প্রতিটি পরিস্থিতিতে একে অপরের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ থাকে, তারা পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হোক, যেমন সন্তান ধারণ। এই মনোভাব সাধারণ দম্পতিদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। অন্যের সাথে সম্পর্ক থাকা একজন ব্যক্তিকে বোকা বানায় যে তারা তাদের সঙ্গীকে সম্পূর্ণরূপে চেনে এবং তাই যদি তারা বিয়ে করে তবে তারা প্রায়শই বিয়ের পরে তাদের সঙ্গীর পরিবর্তনের অভিযোগ করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা পরিবর্তন করেনি। পরিবর্তিত জিনিসগুলি ছিল তাদের সম্পর্কের দায়িত্ব এবং চাপ। এই সমস্যাটি প্রায়শই সেই দম্পতিদের জন্য বিবাহের সমস্যার দিকে পরিচালিত করে যারা তাদের বিয়ের আগে সম্পর্কে ছিলেন। এমনকি যদি তারা বিয়ের আগে একসাথে থাকেন, তবুও একই সমস্যা দেখা দেবে। উপরন্তু, এটি কোনও গোপন বিষয় নয়

যে যখনই কেউ তাদের সঙ্গীর সাথে সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন এটি তাদের জীবনের অন্যান্য প্রতিটি দিককে কতটা তীব্রভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক তরুণ-তরুণী কেবল এই কারণেই পড়াশোনা ছেড়ে দেয় যে তারা তাদের প্রাক্তন সঙ্গীকে প্রতিদিন দেখতে পারে না। যেহেতু বিবাহ দুটি মানুষের মধ্যে একটি গভীর সংযোগ এবং প্রতিশ্রুতি, তাই সাধারণ দম্পতিদের বিচ্ছেদের মতো একই ছোটখাটো বিষয়ে তাদের বিচ্ছেদের সম্ভাবনা কম থাকে।

এছাড়াও, একজন ব্যক্তিকে অবৈধ সম্পর্কের বাহ্যিক রূপ দেখে বোকা বানানো উচিত নয় যে এতে দম্পতি বা বৃহত্তর সমাজের জন্য কোনও ক্ষতি নেই। যেহেতু মানুষের জ্ঞান সীমিত, তারা অত্যন্ত অদূরদর্শী এবং প্রায়শই তাদের আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই তারা ভুলভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থাকা ক্ষতিকারক নয়, অন্যদিকে তারা লুকানো বিষ দেখতে ব্যর্থ হয় যা তাদের এবং অন্যদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে থাকা একজন মুসলিম সময়ের সাথে সাথে কেবল আরও পদক্ষেপ নিতে এবং তাদের সঙ্গীর সাথে পাপ করতে উৎসাহিত হবে। যেহেতু আবেগ এবং অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন এবং যেহেতু এই পাপগুলি, যেমন ব্যভিচার, বেশিরভাগ সমাজে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, তাই একজন অবিবাহিত দম্পতি সহজেই এই পাপে পতিত হতে পারে। এর ফলে তাদের এবং সমাজের জন্য অসংখ্য অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি হয়, যেমন অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ এবং এমনকি ইসলামের অন্যান্য বড় পাপকে ছোট করা। উপরন্তু, কেউ যদি তাদের অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে অন্য কোনও বড় পাপ, যেমন ব্যভিচার, না করেও, তবে তাদের অনুভূতি তাদের স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে বাধা দেবে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের সঙ্গীকে বিয়ে করতে পারে, বুঝতে না পেরে যে তারা উপযুক্ত জীবনসঙ্গী নয়, এমনকি যদি তারা একজন ভালো সঙ্গী বলে মনে হয়। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এর কারণ হল বিবাহের চাপ এবং দায়িত্ব, যেমন স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানদের অধিকার পূরণ, দম্পতির মধ্যে সম্পর্ক পরিবর্তন করে, যার ফলে প্রায়শই বিবাহের সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই কারণেই বিবাহিত দম্পতিরা যারা বিয়ের আগে একসাথে ছিলেন তারা প্রায়শই একে অপরকে বিয়ের পরে তাদের আচরণ পরিবর্তনের জন্য দোষারোপ করেন। উপরন্তু, কেউ তাদের সঙ্গীর সাথে যতই সময় কাটান না কেন, তারা কখনই তাদের চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন না যেমন একজন বিবাহিত

দম্পতি একে অপরকে চেনে। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে লুকানো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি বিয়ের পরে প্রকাশিত হবে, যা কেবল আরও বিবাহ সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে। অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে থাকা ব্যক্তিদের দ্বারা প্রায়শই উপেক্ষা করা একটি সত্য হল যে একজন ব্যক্তি যিনি একজন ভালো সঙ্গী তৈরি করেন তিনি একজন ভালো স্বামী/স্ত্রী বা ভালো পিতা/মাতা হওয়ার নিশ্চয়তা পান না। এর কারণ হল একজন ভালো সঙ্গী তৈরির তুলনায় একজন ভালো স্বামী/স্ত্রী এবং অভিভাবক হওয়ার জন্য বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হয়। তাদের সঙ্গীর প্রতি তাদের অনুভূতির কারণে, একজন ব্যক্তি প্রায়শই একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে বিয়ে করার গুরুত্ব উপেক্ষা করবেন, কারণ তারাই একমাত্র ব্যক্তি যারা তাদের স্ত্রী/স্ত্রী এবং সন্তানদের অধিকার পূরণ করবেন এবং তাদের ক্ষতি এড়াবেন, এমনকি যখন তারা রাগান্বিত হন। অন্যদিকে, যে ব্যক্তির মধ্যে ধার্মিকতা নেই, সে তার স্ত্রী বা সন্তানদের অধিকার পূরণ করবে না এবং তাদের উপর অন্যায় করবে, বিশেষ করে যখন তারা রাগান্বিত থাকে। যার সঙ্গী আছে সে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপেক্ষা করবে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের সঙ্গীর প্রতি তাদের অনুভূতির কারণে তাদের সাথে বিবাহ করবে, যদিও তাদের ধার্মিকতা নেই। ভালোবাসার মতো আবেগ একজন ব্যক্তিকে তার প্রিয়জনের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অন্ধ এবং বধির করে তোলে। সুনান আবু দাউদের ৫১৩০ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এছাড়াও, সম্পর্ক থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে জন্ম নেওয়া যেকোনো শিশু তাদের সম্পর্কের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করবে, যার ফলে প্রায়শই তাদের বিচ্ছেদের দিকে পরিচালিত হবে, কারণ তারা সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব ভাগাভাগি করতে চায় না। এর ফলে শিশুটি এমন একটি ভাঙা ঘর তৈরি করে যেখানে তাদের বাবা-মা উভয়ের সমর্থন এবং তত্ত্বাবধান থাকে না, যা প্রায়শই সকলের জন্যই সমস্যার সৃষ্টি করে। এটা স্পষ্ট যে অপরাধ, গ্যাং এবং যৌন শিকারিদের দ্বারা লালিত-পালিত এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার শিশুদের বেশিরভাগই ভাঙা পরিবার থেকে আসে। যখন কেউ সন্তান কামনা করে তখন সঠিকভাবে সন্তান লালন-পালন করা অত্যন্ত কঠিন, তাহলে কি কেউ কল্পনা করতে পারে যে যখন বাবা-মা প্রথমে সন্তান নিতে চাননি তখন সঠিকভাবে সন্তান লালন-পালনের মানসিক চাপ কতটা? এটি শিশুর লালন-পালনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে

এবং প্রায়শই আগে উল্লেখিত সমস্যার সৃষ্টি করে। এই চাপ প্রায়শই একক পিতা-মাতাকে লালন-পালন বা দত্তক নেওয়ার জন্য সন্তানকে ছেড়ে দিতে বাধ্য করে, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিশুর উপর ক্ষতিকর নেতিবাচক এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে, যার মধ্যে কিছু আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি শিশুর বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে তোলে।

অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে এই সমস্ত এবং আরও নেতিবাচক বিষয়গুলি আবেগপ্রবণ বা অজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, এমনকি যদি অবৈধ সম্পর্কগুলি ক্ষতিকারক বলে মনে হয়। অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া ঠিক এমন খাবার খাওয়ার মতো যা সুস্বাদু দেখায় যখন এটি আসলে বিষাক্ত। যেহেতু এই বিষটি লুকানো থাকে, তাই এই বিষ সম্পর্কে সচেতন এমন ব্যক্তির উপর নির্ভর করা উচিত এবং তাদের পরামর্শে বিশ্বাস করা উচিত যাতে সুস্বাদু খাবার খাওয়া এড়ানো যায়, এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। যেহেতু মহান আল্লাহ, একমাত্র, সবকিছু জানেন, বিশেষ করে, কিছু কর্ম এবং সম্পর্কের মধ্যে লুকানো বিষ, তাই তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত এবং তার উপর কাজ করা উচিত, এমনকি যদি এটি ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। এটি একজন জ্ঞানী রোগীর মতো যিনি তার ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত থাকে। একইভাবে এই জ্ঞানী রোগী ভাল মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, একইভাবে যিনি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন। কারণ একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ, মহান আল্লাহ। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, যদিও এত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তার জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার কারণে সকল ধরণের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসের মাধ্যমে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্যটি তখনই স্পষ্ট হয় যখন কেউ দেখে যে ইসলামী শিক্ষার উপর

যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে কাজ করে এবং যারা করে না।

মহান আল্লাহ তাআলা মূল সমস্যার অর্থ সমাধান করে, অবৈধ সম্পর্ক নিষিদ্ধ করে এবং বিবাহকে উৎসাহিত করে এই অসংখ্য শাখা-প্রশাখাগত সমস্যা দূর করেছেন, যার মাধ্যমে একটি দম্পতি আন্তরিকভাবে একে অপরের এবং তাদের সন্তানদের প্রতি নিজেদের নিবেদিত করে।

অনেক চিন্তাবিদ এসেছেন এবং চলে গেছেন যারা মানুষ এবং সমাজের মুখোমুখি সমস্যাগুলি সমাধান করেছেন কিন্তু যেহেতু এই সমাধানগুলি শাখা সমস্যাগুলিকে লক্ষ্য করে, তাই এই সমাধানগুলির সুবিধা ন্যূনতম। অন্যদিকে, মহান আল্লাহ, এই মূল সমস্যাগুলি সমাধানের পদ্ধতির মাধ্যমে, যা একজন ব্যক্তি এবং সমাজকে প্রভাবিত করে, সবকিছু স্পষ্ট করে দিয়েছেন যাতে মানুষ উভয় জগতেই সাফল্য অর্জন করতে পারে। সূরা 16 আন নাহল, আয়াত 89:

"...এবং আমরা আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি সবকিছুর স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশনা ও রহমতস্বরূপ..."

অঙ্গীকারের পরবর্তী অংশ ছিল যে তারা তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না।

অমুসলিমরা প্রায়শই তাদের নবজাতক কন্যাদের অভিশাপ হিসেবে দেখে হত্যা করত।

ইমাম বুখারীর 'আদাবুল মুফরাদ', ৭৮ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) দুটি কন্যা সন্তানের সঠিক লালন-পালনকারী পিতামাতাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। এটা অবাক করার মতো যে, অনেক মুসলিম, বিশেষ করে এশিয়ানরা সবসময় পুত্র সন্তানের কামনা করে এবং কন্যা সন্তান জন্ম দিলে খুশি না হওয়ার অজ্ঞ মানসিকতা গ্রহণ করে, যদিও এই হাদিস এবং আরও অনেক হাদিসে উল্লেখিত সুসংবাদ পুত্র সন্তানের ব্যাপারে দেওয়া হয়নি। এটা বিশ্বাস করা গ্রহণযোগ্য যে, একজন পিতামাতা পুত্র সন্তানের চেয়ে কন্যা সন্তানের জন্য বেশি চিন্তিত হবেন, বিশেষ করে আজকের যুগে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মুসলিম পিতামাতারা পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান জন্ম দিলে কম খুশি হবেন। তাদের মনে রাখা উচিত যে তাদের কর্তব্য হল ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করা এবং তাদের ভাগ্যের জন্য চিন্তিত হওয়া নয় কারণ এটি তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই।

কন্যা সন্তান ধারণ অপছন্দ করা একটি অজ্ঞ মানসিকতা যা ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে। প্রকৃতপক্ষে, কন্যা সন্তান ধারণ অপছন্দ করা মুশরিকদের মনোভাব এবং যেকোনো মূল্যে তাদের বৈশিষ্ট্য এড়িয়ে চলা উচিত। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৫৮-৫৯:

" আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের খবর দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃখ চেপে রাখে। যে খারাপ খবর তাকে দেওয়া হয়েছে তার কারণে সে নিজেকে লোকদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে..."

মুসলিমদের এই মানসিকতা গ্রহণ করা এড়িয়ে চলা উচিত এবং তাদের যে কোনও সন্তান দেওয়া হোক তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত, কারণ তাদের মধ্যে প্রচুর বিবাহিত দম্পতি রয়েছে যাদের কোনও সন্তান নেই।

কিছু মানুষ দারিদ্র্যের ভয়ে তাদের সন্তানদেরও হত্যা করে। এই ক্ষেত্রে, একজন মুসলিমকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য তাদের রিজিক বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং এই বরাদ্দ মোটেও পরিবর্তন করা যাবে না। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত উপায়, যেমন তাদের শারীরিক শক্তি, ব্যবহার করে তাদের এবং তাদের নির্ভরশীলদের, যেমন তাদের সন্তানদের, রিজিক অর্জন করা এবং তারপর বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন এবং তাদের রিজিক তাদের কাছে পৌঁছাবে। একজন পিতামাতা কেবল একটি সন্তানের রিজিক প্রদানের একটি মাধ্যম এবং মহান আল্লাহ তাআলা যখনই চান, এই উপায় অন্য কিছু বা কাউকে দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে পারেন, যেমন আত্মীয়স্বজন বা দাতব্য সংস্থা। ১৭তম অধ্যায় আল ইসরা, আয়াত ৩১:

"আর দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে এবং তোমাদেরকে রিযিক দেই। নিঃসন্দেহে তাদের হত্যা করা মহাপাপ।"

অঙ্গীকারের পরবর্তী অংশ ছিল যে তারা মিথ্যা অভিযোগ করবে না।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৯৩ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) গীবত ও অপবাদের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন।

গীবত হলো যখন কেউ কারো অনুপস্থিতিতে এমনভাবে সমালোচনা করে যা তাদের কাছে অপছন্দনীয় হবে, যদিও এটি সত্য। অন্যদিকে, গীবত করা গীবের অনুরূপ, তবে বিবৃতিটি সত্য নয়। এই পাপগুলি মূলত কথার সাথে জড়িত তবে অন্যান্য জিনিসও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, যেমন হাতের ইশারা ব্যবহার করা। এগুলি উভয়ই কবীরা পাপ এবং পবিত্র কুরআনে গীবতকে নিজের ভাইয়ের মৃতদেহের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১২:

"... আর তোমরা একে অপরের গুপ্তচরবৃত্তি করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার ভাইয়ের মৃতদেহ খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তা ঘৃণা করবে..."

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই পাপগুলি একজন ব্যক্তি এবং আল্লাহ তাআলার মধ্যে হওয়া বেশিরভাগ পাপের চেয়েও খারাপ। কারণ, যদি পাপী আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়, তাহলে একজন ব্যক্তি এবং আল্লাহ তাআলার মধ্যেকার পাপ তিনি ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা, একজন গীবতকারী বা নিন্দুককে ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না তার শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে। যদি তারা তা না করে, তাহলে বিচারের দিন গীবতকারী/নিন্দুকের নেক আমলগুলি ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাদের গীবতকারী/নিন্দুককে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত গীবতকারী/নিন্দুকের পাপগুলি তাদের গীবতকারী/নিন্দুককে দেওয়া হবে। এর ফলে গীবতকারী/নিন্দুককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

গীবত তখনই বৈধ যখন কেউ অন্য ব্যক্তিকে সতর্ক করে এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা করে অথবা যদি কেউ তৃতীয় পক্ষের কাছে অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ নিষ্পত্তি করে, যেমন আইনি মামলা।

প্রথমত, এই কবীরা পাপের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে গীবত ও অপবাদ এড়িয়ে চলা উচিত। দ্বিতীয়ত, একজন ব্যক্তির কেবল সেইসব কথা বলা উচিত যা সে আনন্দের সাথে ব্যক্তির সামনে বলবে, যদিও সে জানে যে সে তা আপত্তিকরভাবে নেবে না। তৃতীয়ত, একজন মুসলিমের অন্য ব্যক্তির সম্পর্কে কেবল তখনই কথা বলা উচিত যদি অন্য কেউ তার সম্পর্কে ঐ বা অনুরূপ কথা বলতে আপত্তি না করে। অর্থাৎ, তাদের অন্যদের সম্পর্কে সেভাবেই কথা বলা উচিত যেভাবে তারা চায় লোকেরা তাদের সম্পর্কে কথা বলুক। পরিশেষে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের নিজেদের দোষ সংশোধনের দিকে মনোনিবেশ করা এবং যখন আন্তরিকভাবে করা হয়, তখন এটি তাকে অন্যদের গীবত ও অপবাদ থেকে বিরত রাখবে।

গীবতকারী এবং নিন্দুকদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ তারা ঝামেলা সৃষ্টিকারী, যারা আজ হোক কাল হোক, তাদের গীবত বা অপবাদ দেবে। তাদের উচিত এই বড় পাপ থেকে অন্যদের সাবধান করা, যতক্ষণ না তারা শারীরিক ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে। তাদের কখনই অন্যদের সম্পর্কে বলা পরচর্চা বিশ্বাস করা উচিত নয়, কারণ বেশিরভাগ পরচর্চা হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা অথবা এতে অনেক মিথ্যা মিশে আছে। বরং অন্যদের সম্মান রক্ষা করা উচিত, ঠিক যেমন তারা চায় যে লোকেরা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সম্মান রক্ষা করুক। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে তাকে মহান আল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। জামে আত তিরমিযী, ১৯৩১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অন্যদের সম্পর্কে শোনা পরচর্চা উপেক্ষা করা উচিত এবং কখনও

তাদের প্রতি তাদের আচরণকে প্রভাবিত করতে দেওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের অধিকার পূরণ করা।

একজন মুসলিমের কখনোই এই সত্য দেখে বোকা হওয়া উচিত নয় যে, অন্যের গীবত করা এবং অপবাদ দেওয়া সমাজে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। অন্যের পাপ কখনোই মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে তার পাপের তীব্রতা কমাতে পারবে না, এবং অন্যের পাপও পাপ করার ন্যায্যতা প্রমাণ করতে পারবে না। এটি একটি বোকামিপূর্ণ মনোভাব যা একজন পার্থিব বিচারকও গ্রহণ করবেন না, তাহলে একজন মুসলিম কীভাবে আশা করতে পারে যে বিচারকদের বিচারক, মহান আল্লাহ তা'আলা এটি গ্রহণ করবেন?

অঙ্গীকারের শেষ অংশ ছিল যে, তারা কোন ভালো কাজেই মহানবী (সা.)-এর অবাধ্য হবে না।

যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অন্যদেরকে সৎকাজ ছাড়া আর কিছুই করার নির্দেশ দিতেন না, তবুও এই ধারাটি ইসলামী জাতির ভবিষ্যৎ নেতাদের জন্য যুক্ত করা হয়েছিল, যাদের অন্যদেরকে অন্যায় কাজ করার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। পবিত্র কুরআন অনুসারে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আনুগত্য করা একটি বাধ্যতামূলক কর্তব্য। সূরা ৫৯ আল হাশর, আয়াত ৭:

"... আর রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো; আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো..."

এবং অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৫৯:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো..."

এবং অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৮০:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

অতএব, তাঁর জীবন ও শিক্ষা শেখা এবং সে অনুযায়ী কাজ করার মাধ্যমে তাঁকে কার্যত মেনে চলতে হবে। যেহেতু আনুগত্য বাস্তবসম্মত, তাই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আনুগত্য করাকে কার্যত তাঁর শিক্ষা অনুসরণ না করে তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, তাঁর প্রতি মৌখিকভাবে ভালোবাসা প্রকাশ করাই সঠিক নির্দেশনা, বিচারের দিনে তাঁর সুপারিশ এবং পরকালে তাঁর সাহচর্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট। বাস্তবে, যে ব্যক্তি তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়, সে বিচারের দিনে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে, কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-ই একজন সাক্ষী এবং সুপারিশকারী। ৪র্থ অধ্যায় আন-নিসা, আয়াত ৪১:

"তাহলে কেমন হবে যখন আমরা প্রতিটি উম্মত থেকে একজন সাক্ষী আনব এবং তোমাকেও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে আনব?"

এবং অধ্যায় 25 আল ফুরকান, আয়াত 30:

"আর রাসূল বলেছেন, "হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে [পরিত্যক্ত] জিনিস হিসেবে গ্রহণ করেছে।"

যেহেতু মুসলিমরাই পবিত্র কুরআন গ্রহণ করেছে এবং গ্রহণ করেছে, তাই এই আয়াতটি সেইসব মুসলমানদের কথা বলে যারা পবিত্র কুরআনের উপর কার্যত আমল করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি অমুসলিমদের কথা বলতে পারে না কারণ তারা কখনও পবিত্র কুরআন পরিত্যাগ করার জন্য গ্রহণ করেনি বা গ্রহণ করেনি। কিয়ামতের দিন যার বিরুদ্ধে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) সাক্ষ্য দেবেন, তার কী হবে তা নির্ধারণ করার জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না।

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি তাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার মৌখিক ঘোষণাকে বাস্তবে অনুসরণ করে সমর্থন করা, যাতে তারা পরকালে মানসিক শান্তি, তাঁর সুপারিশ এবং সাহচর্য লাভ করতে পারে।

মদিনায় ইসলামের প্রসার

ভালো ছড়িয়ে পড়া

মদীনার অধিবাসীদের অনুরোধে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুস'আব বিন উমাইর (রাঃ) কে মদীনায় ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন যতক্ষণ না মদীনার প্রতিটি ঘরে মুসলমানরা বসবাস শুরু করে। ইমাম মুহাম্মদ কান্ধলভীর "হায়াতুস সাহাবা", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৬-১৩৭ এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, ২৬৭৪ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে ভালো কিছুর দিকে পরিচালিত করে, সে তাদের উপদেশ অনুসারে কাজ করা লোকদের সমান সওয়াব পাবে। আর যারা অন্যদের পাপের দিকে পরিচালিত করে, তাদের উপর এমনভাবে জবাবদিহি করা হবে যেন তারা পাপ করেছে।

অন্যদের উপদেশ ও নির্দেশনা দেওয়ার সময় মুসলমানদের সতর্ক থাকা গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুসলিমের উচিত কেবল ভালো কাজেই অন্যদের উপদেশ দেওয়া যাতে তারা এর প্রতিদান পায় এবং আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হওয়ার উপদেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকা। কেউ যদি কেবল এই দাবি করে যে সে অন্যদের পাপের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, এমনকি যদি সে নিজে পাপ নাও করে, তাহলেও বিচার দিবসে শাস্তি থেকে বাঁচবে না। মহান আল্লাহ, পথপ্রদর্শক এবং অনুসারী উভয়কেই তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করবেন। অতএব, মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে কেবল সেই কাজ করার পরামর্শ দেওয়া যা

তারা নিজেরাই করত। যদি তারা তাদের আমলনামায় কোন কাজ লিপিবদ্ধ করা অপছন্দ করে, তাহলে তাদের অন্যদের সেই কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়।

এই ইসলামী নীতির কারণে, মুসলমানদের উচিত অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা নিশ্চিত করা, কারণ অন্যদের ভুল উপদেশ দিলে তারা সহজেই তাদের পাপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

উপরন্তু, এই নীতিটি মুসলমানদের জন্য সম্পদের মতো সামর্থ্যের অভাবে নিজেরা যে কাজ করতে পারে না তার জন্য সওয়াব অর্জনের একটি অত্যন্ত সহজ উপায়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি আর্থিকভাবে দান করতে সক্ষম নয়, সে অন্যদেরকেও তা করতে উৎসাহিত করতে পারে এবং এর ফলে তারা দানকারীর মতোই সওয়াব পাবে।

অধিকন্তু, মৃত্যুর পরেও মানুষের সৎকর্মের বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য এই ইসলামী নীতি একটি চমৎকার উপায়। যত বেশি মানুষ অন্যদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত করবে, তত বেশি তাদের সৎকর্ম বৃদ্ধি পাবে। এই উত্তরাধিকার সম্পর্কে একজন মুসলিমকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে, কারণ সম্পত্তির সাম্রাজ্যের মতো অন্যান্য সমস্ত উত্তরাধিকার আসবে এবং যাবে, এবং মৃত্যুর পরে তা তাদের কোনও কাজে আসবে না। যদি কিছু থাকে, তবে তাদের সাম্রাজ্য উপার্জন এবং জমা করার জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে, যখন তাদের উত্তরাধিকারীরা মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সাম্রাজ্য উপভোগ করবে।

ভদ্রভাবে পরামর্শ দেওয়া

মুস'আব বিন উমাইর (রাঃ) যখন মদিনায় ইসলাম প্রচার করছিলেন, তখন মদিনার দুইজন অমুসলিম নেতা একের পর এক আক্রমণাত্মকভাবে তার মুখোমুখি হন এবং ইসলাম প্রচারের জন্য তার সমালোচনা করেন। মুস'আব (রাঃ) কঠোরভাবে সাড়া দেননি এবং বরং তাদেরকে পরামর্শ দেন যে তারা বসে বসে তার কথা শোনেন এবং যদি তারা এতে সন্তুষ্ট হন, তাহলে তারা তা গ্রহণ করতে পারেন, অন্যথায় তারা তা প্রত্যাখ্যান করে শান্তিতে চলে যেতে পারেন। দুই নেতা, উসাইদ ইবনে হুদাইর এবং সা'দ ইবনে মু'আজ (রাঃ) পবিত্র কুরআন এবং ইসলামের শিক্ষা শোনার পর, তারা উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ১৫৪-১৫৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সৌন্দর্য কোমলতার মধ্যেই নিহিত। মহানবী (সাঃ) সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৬৮৯ নম্বরের সহিত অনেক হাদিসে এই উপদেশ দিয়েছেন । পবিত্র কুরআনে এমনকি উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, নবী (সাঃ) এর সাথে সর্বদা প্রেমের সাথে থাকতেন, তাঁর কোমলতা এবং কোমল স্বভাবের কারণে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯:

" অতএব আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের প্রতি কোমল ছিলে। আর যদি তুমি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতে, তাহলে তারা তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

আরবরা কঠোর হৃদয়ের জন্য কুখ্যাত ছিল কিন্তু মহানবী (সা.)-এর কারণে , শান্তি ও তাঁর উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, প্রায়শই তাদের কঠোর হৃদয় গলে যায় এবং এভাবে তারা গ্রহণ করে এই গুণটি এবং বাকি মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠে। এই কারণেই মহানবী মুহাম্মদ , শান্তি এবং তাঁর উপর বরকত বর্ষিত হোক, একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে সুনান আবু দাউদ, ৪৮০৯ নম্বরে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি ভদ্রতা থেকে বঞ্চিত, সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৩:

"... আর তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো- যখন তোমরা শত্রু ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে সম্প্রীতি স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছো..."

যারা ইসলামের বাণী প্রচার করতে চান তাদের জন্য এটি একটি স্পষ্ট বার্তা। তাদের কঠোর ধ্বংসাত্মক মানসিকতার চেয়ে কোমল গঠনমূলক মানসিকতা থাকা উচিত। তাদের উচিত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং অন্যদের উপকার করার চেষ্টা করা, সমাজের মধ্যে বিতর্ক। এর একটি ভালো উদাহরণ এই সন্তানদের প্রতি ব্যক্তির মনোভাবের মধ্যে এটি দেখা যায়। যেসব বাবা-মা তাদের সন্তানদের প্রতি কোমল মনোভাব দেখিয়েছিলেন , তাদের সন্তানদের উপর দত্তক নেওয়া বাবা-মায়ের তুলনায় বেশি ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। কঠোর স্বভাব। প্রায়শই কেউ কেউ তাদের কঠোর মনোভাবের মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয় এবং এটি ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে চ্যালেঞ্জ করে মহানবী (সাঃ)-এর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। উদাহরণস্বরূপ, একবার একজন অশিক্ষিত বেদুইন মহানবী (সাঃ) -এর মসজিদে প্রস্রাব করে ফেলল । যখন সাহাবীরা , আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন, তাকে শাস্তি দিতে চাইলেন। মহানবী মুহাম্মদ , শান্তি তাঁর উপর রহমত বর্ষিত হোক, তিনি তাদেরকে নিষেধ করেছিলেন এবং মসজিদে থাকার আদব-কায়দা সম্পর্কে বেদুইনদেরকে নম্রভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই ঘটনাটি সুনান ইবনে মাজাহের ৫২৯ নম্বর

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে । এই নরম মনোভাব লোকটির উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায়ও এর উল্লেখ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যদিও ফেরাউন নিজেকে সর্বোচ্চ প্রভু বলে দাবি করেছিল তবুও মহান আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ)-কে আদেশ করলেন , তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। উভয়কেই, ফেরাউনকে আমন্ত্রণ জানাতে মৃদু ও সদয় কথাবার্তার মাধ্যমে পথনির্দেশনার দিকে। অধ্যায় ৭৯ আন নাজিয়াত, আয়াত ২৪:

"এবং বলল, "আমি তোমাদের সবচেয়ে মহান প্রতিপালক।"

এবং অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ৪৩-৪৪:

"তোমরা দুজনেই ফেরাউনের কাছে যাও। নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘন করেছে। আর তার সাথে নম্রভাবে কথা বলো, হয়তো সে স্মরণ করবে অথবা [আল্লাহকে] ভয় করবে।"

শিশুরা আর পশুরাও ভদ্রতার ভাষা বোঝে। তাহলে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যদি ইসলাম ও কল্যাণের দিকে দাওয়াত দেওয়ার সময় এই বৈশিষ্ট্যটি গ্রহণ করে, তাহলে কীভাবে তাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করা যাবে না? এই কারণেই মহানবী

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর উপর দরুদ বর্ষিত হোক, একবার একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে সহীহ মুসলিম, ৬৬০১ নম্বরে পাওয়া গেছে যে , আল্লাহ , তিনি তাঁর অসীম মর্যাদা অনুসারে দয়ালু এবং কোমল এবং সৃষ্টিকে একে অপরের সাথে নরম আচরণ করতে পছন্দ করেন। দুর্ভাগ্যবশত, যারা এই কথাটি ছড়িয়ে দেয় তাদের অনেকেই ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা এই ভুল বিশ্বাস গ্রহণ করেছেন যে, কোমল হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ। এটি শয়তানের একটি চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ সে মানবজাতিকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চায়।

নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে চলা

মদীনার কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, হজ্জের মৌসুমে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য মক্কার দিকে যাত্রা করেছিলেন। তাদের ভ্রমণের সময়, তাদের একজন, বারা ইবনে মারুর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, মক্কায় অবস্থিত আল্লাহর ঘর, কাবা, দিকে প্রার্থনা করার জন্য জোর দিয়েছিলেন, যদিও সেই সময়ে নির্ধারিত পদ্ধতি ছিল জেরুজালেমের মসজিদ আল আকসার দিকে প্রার্থনা করা। যদিও অন্যান্য সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তার সমালোচনা করেছিলেন, তবুও তিনি মক্কায় পৌঁছানো পর্যন্ত অবিচল ছিলেন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে বলেছিলেন যে তার মসজিদ আল আকসার দিকে নির্ধারিত প্রার্থনার দিকেই থাকা উচিত ছিল। সিরাত ইবনে হিশামের ৮৫-৮৬ পৃষ্ঠায় এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি সকল ক্ষেত্রে নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করা হবে, যদিও তা সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করবে, ততই তারা পথনির্দেশের দুটি উৎসের উপর তত কম কাজ করবে: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস, যা পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে। এই কারণেই সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, যে বিষয় দুটি পথনির্দেশের মধ্যে নিহিত নয়, তা আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করবেন। উপরন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করা হবে, ততই তারা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলিতে কাজ করতে শুরু করবে। এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে বিপথগামী করে। উদাহরণস্বরূপ, সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হবে

যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর কাজ করার অভ্যাস রয়েছে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পড়ে যাবে এবং এমন আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করবে যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথেও সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান নির্দেশনার দুটি উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে নেওয়া হয়। এই বিভ্রান্তিকর অভ্যাস এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফর, যেমন কালো জাদু অনুশীলন করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"...সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

সুতরাং একজন মুসলিম অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রয়েছে। এই কারণেই ধর্মীয় উদ্ভাবনগুলিতে কাজ করা যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

সাহায্যকারীদের দ্বিতীয় শপথ (রা.)

ইসলামের আগমনের আগে মক্কায় হজ্জের আরেকটি মৌসুমে, যদিও সঠিক রীতিনীতিগুলি কলুষিত হয়ে গিয়েছিল, মদীনার লোকেরা, সাহায্যকারীরা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, আবারও মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দেখা করে এবং তাঁর সাথে আরেকটি শপথ গ্রহণ করে। এই শপথের মধ্যে ছিল ইসলামের শিক্ষা শোনা এবং মেনে চলা , স্বাচ্ছন্দ্য এবং অসুবিধা উভয় সময়েই অভাবীদের সাথে তাদের প্রদত্ত পার্থিব জিনিসপত্র ভাগ করে নেওয়া, সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা, মন্দ কাজের প্রতিবাদ করা এবং তা করার সময় কোনও সমালোচনার ভয় না করা এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রক্ষা করা, ঠিক যেমন তারা তাদের নিজস্ব আত্মীয়দের সাহায্য এবং রক্ষা করবে। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদেরকে বলেছিলেন যে এই অঙ্গীকারের বিনিময়ে তাদের জান্নাত দেওয়া হবে। আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) তখন মন্তব্য করেছিলেন যে এটি একটি সমৃদ্ধ লেনদেন এবং তারা কখনও এটি প্রত্যাহার বা ত্যাগ করবে না। এই প্রসঙ্গে, আল্লাহ তায়ালা সূরা তওবার ৯ নং আয়াত, ১১১ নাযিল করেছেন:

" নিশ্চয়ই, আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও ধনসম্পদ কিনে নিয়েছেন [বিনিময়ে] এই বিনিময়ে যে তাদের জন্য জান্নাত থাকবে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, তাই তারা হত্যা করে এবং নিহত হয়। [এটি] তাওরাত, ইঞ্জিল এবং কুরআনে তাঁর উপর একটি সত্য প্রতিশ্রুতি [অবশ্যই]। আর আল্লাহর চেয়ে কে তার প্রতিশ্রুতি পালনে বেশি সত্যবাদী? অতএব, তোমরা যে চুক্তি করেছো তাতে আনন্দ করো। আর এটাই হলো মহাসাফল্য।"

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৯:১১১, পৃষ্ঠা ৯৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

অঙ্গীকারের প্রথম অংশে ইসলামের শিক্ষা শ্রবণ এবং মেনে চলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে সঠিকভাবে শ্রবণ বলতে বোঝায় যখন কেউ যা বলা হয়েছে তার উপর মনোনিবেশ করে, তার উপর চিন্তা করে, বক্তব্যকে তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে সংযুক্ত করার চেষ্টা করে, যা বলা হয়েছে তা কীভাবে তার জীবনে বাস্তবায়ন করা যায় তা নির্ধারণ করে এবং তারপর বাস্তবে তা করার জন্য প্রচেষ্টা করে। এই প্রক্রিয়া এবং ফলাফলটি ২৮৫ আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে। যদিও, এই ধাপে ধাপে প্রক্রিয়া ছাড়া কেবল যা বলা হয়েছে তা শোনা কখনই কারও আচরণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। পরিবর্তে, শব্দগুলি তাদের চিন্তাভাবনা বা ভবিষ্যতের কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত না করে তাদের কানের মধ্য দিয়ে যাবে। দুঃখের বিষয় হল, অনেকেই বিশ্বাস করেন যে এইভাবে কেবল ইসলামী শিক্ষা শোনা মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট। ২৮৫ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, একজন ব্যক্তিকে সঠিকভাবে শ্রবণ করতে হবে, যা ফলস্বরূপ মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে। এই আনুগত্যের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। উপরন্তু, পবিত্র কুরআনের ক্ষেত্রে, এই আয়াতটি স্পষ্ট করে যে একজনকে পবিত্র কুরআন শুনতে হবে এবং তারপরে তার উপর আমল করতে হবে। কিন্তু যখন কেউ তা বোঝে না, তখন তার উপর আমল করা সম্ভব নয়। অতএব, যে ভাষায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা বা শোনা যায় না, তা মানসিক শান্তি এবং উভয় জাহানে সাফল্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। মুসলমানদের পবিত্র কুরআনের শিক্ষা শোনা, তেলাওয়াত করা, বোঝা এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। যেহেতু বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআনের শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রচুর পরিমাণে মিডিয়া সামগ্রী পাওয়া যায়, তাই পবিত্র কুরআন এবং সম্প্রসারিতভাবে মহানবী (সা.)-এর হাদীস বুঝতে এবং আমল করতে ব্যর্থ হলে মুসলমানদের কাছে কোন অজুহাত থাকে না।

পরিশেষে, শ্রবণ এবং আনুগত্য করা অন্যদের পছন্দ এবং সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অন্ধভাবে অনুসরণ করার বিভ্রান্তিকর মনোভাবের বিরোধিতা করে, কারণ যে সঠিকভাবে শুনবে সে নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে যে আনুগত্য করা সঠিক কাজ কিনা। অন্ধ অনুকরণ এমন একটি বিষয় যা ইসলামী শিক্ষায় অত্যন্ত সমালোচনা করা হয় কারণ মহান আল্লাহ, মানুষ আশা করেন যে তারা ইসলামই সত্য তা নির্ধারণ করার জন্য খোলা মনে ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করবে। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

এবং ৩৪তম অধ্যায় সাবা, ৪৬তম আয়াত:

"বলুন, "আমি তোমাদেরকে কেবল একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি - তোমরা আল্লাহর জন্য জোড়ায় জোড়ায় এবং এককভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, তারপর চিন্তা করো।" তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন পাগলামি নেই। তিনি কেবল তোমাদেরকে কঠোর শাস্তির পূর্বে সতর্ককারী।"

অতএব, মুসলমানদের তাদের প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান এবং বুদ্ধি ব্যবহার করে ইসলামের সত্যতা নির্ধারণ করতে হবে এবং দৃঢ়তার সাথে এর শিক্ষার উপর আমল করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে ব্যক্তি সর্বদা, স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক

বা কঠিন, সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকবে। এর ফলে মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ভারসাম্য বজায় থাকবে এবং নিশ্চিত হবে যে ব্যক্তি তার জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থান দেবে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসবে। অন্যদিকে, ইসলামে অন্যদের অন্ধভাবে অনুসরণ করলে কেবল দুর্বল ঈমানের দিকে পরিচালিত হবে। এই ব্যক্তি যখনই তাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয়, যেমন যখন তারা কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়, তখন তারা প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এটি তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে।

মদীনার বাসিন্দারা, সাহায্যকারীরা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তার পরবর্তী অংশ ছিল এই যে, তারা কষ্ট এবং স্বাচ্ছন্দ্য উভয় সময়েই তাদের প্রদত্ত পার্থিব আশীর্বাদ আন্তরিকভাবে অভাবীদের সাথে ভাগ করে নেবে।

যখন একজন মুসলিম সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে তার যা কিছু আছে তা মহান আল্লাহর, তখন তার কাছে থাকা আশীর্বাদগুলো, যেমন দান, আল্লাহর অনুগ্রহে সঠিকভাবে ব্যবহার করা সহজ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এই মনোভাব গ্রহণ করে সে বুঝতে পারে যে তারা কেবল আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ফেরত দিচ্ছে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৫৪:

"হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদের যা রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করো..."

এই আচরণ অহংকারের মাধ্যমে তাদের দানশীলতার সৎকর্ম নষ্ট করা থেকেও রক্ষা করে। অহংকার একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করায় যে তারা দান করে আল্লাহ

এবং অভাবীদের প্রতি অনুগ্রহ করছে। কিন্তু একইভাবে একজন ব্যক্তি গর্ব ছাড়াই ব্যাংক ঋণ ফেরত দেয়, মুসলমানদের বুঝতে হবে যে তাদের দান হল আল্লাহ প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের একটি উপায়। উপরন্তু, অভাবীরা তাদের দান গ্রহণ করে দাতার প্রতি অনুগ্রহ করছে। অভাবীরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাওয়ার একটি উপায়, এবং তাদের ছাড়া এটি অসম্ভব। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে তাদের সম্পদ তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং শক্তির মাধ্যমে জমা হয়েছে, তাহলে তাদের বুঝতে হবে যে এই জিনিসগুলিও আল্লাহ প্রদত্ত। অতএব, সম্পদের মতো আশীর্বাদের আকারে এই ঋণ অবশ্যই আল্লাহর কাছে ফেরত দিতে হবে, অন্যথায় তাদের এমন শাস্তির সম্মুখীন হতে হতে পারে যা এই পৃথিবীতে শুরু হবে এবং পরকালেও অব্যাহত থাকবে।

যখন কেউ দান করে, তখন তার লেনদেন কোন অভাবী ব্যক্তির সাথে হয় না, বরং তা হয় মহান আল্লাহর সাথে। যখন কোন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর সাথে ব্যবসা করে, তখন তারা এমন এক অকল্পনীয় লাভের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে যা তাদের এই দুনিয়া ও আখেরাতে উপকৃত করবে। আলোচ্য মূল আয়াতগুলিতে এটি নির্দেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ২৪৫:

"কে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, যাতে তিনি তার জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন?"

অধিকন্তু, যখন নিজের কঠিন সময় আসে তখন অন্যদের সাহায্য করা একজনের দৃঢ় ঈমানের লক্ষণ, কারণ যখন কেউ স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আসে তখন অন্যদের সাহায্য করা সহজ। এই সঠিক আচরণ অর্জনের জন্য একজনকে অবশ্যই আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব গ্রহণ করা এড়িয়ে চলতে হবে যেখানে সে কেবল নিজের বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে যখন

নিজের কঠিন সময় আসে তখন অন্যদের সাহায্য করতে ব্যর্থ হবে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সাহায্য করতে ব্যস্ত থাকে, সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে সর্বদা সাহায্য পাবে। এই ঐশ্বরিক সমর্থন দাতাকে যে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে সাহায্য করবে। সহিহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মদীনার জনগণ, সাহায্যকারীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তার পরবর্তী অংশ ছিল এই যে, তারা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজের নিষেধ করবে।

সহীহ বুখারীতে ২৬৮৬ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা বোঝা যায় এমন একটি নৌকার উদাহরণ দিয়ে যার দুটি স্তর মানুষে ভরা। নীচের স্তরের লোকেরা যখনই জল পেতে চায় তখন উপরের স্তরের লোকদের বিরক্ত করতে থাকে, তাই তারা নীচের স্তরে একটি গর্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে তারা সরাসরি জল পেতে পারে। যদি উপরের স্তরের লোকেরা তাদের থামাতে ব্যর্থ হয় তবে তারা নিশ্চিতভাবে ডুবে যাবে।

মুসলিমদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা কখনই ইসলামী জ্ঞান অনুসারে সৎকাজের আদেশ এবং মন্দকাজের নিষেধ করা ছেড়ে না দেয়, নম্রভাবে। একজন মুসলিমের কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে যতক্ষণ তারা আল্লাহর আনুগত্য করে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য বিপথগামী লোকেরা তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে না। একটি ভালো আপেল পচা আপেলের সাথে রাখলে অবশেষে তার ক্ষতি হবে। একইভাবে, যে মুসলিম অন্যদের ভালোকাজের আদেশ দিতে ব্যর্থ হয়, সে অবশেষে তাদের নেতিবাচক আচরণের দ্বারা প্রভাবিত

হবে, তা সে সূক্ষ্ম হোক বা দৃশ্যত। এমনকি যদি বৃহত্তর সমাজ গাফেল হয়ে পড়ে, তবুও তাদের উপর নির্ভরশীলদের, যেমন তাদের পরিবারকে উপদেশ দেওয়া কখনও ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাদের নেতিবাচক আচরণ কেবল তাদের উপরই বেশি প্রভাব ফেলবে না বরং এটি সকল মুসলমানের উপরও কর্তব্য, সুনান আবু দাউদের ২৯২৮ নম্বর হাদিস অনুসারে। এমনকি যদি একজন মুসলিমকে অন্যরা উপেক্ষা করে, তবুও তাদের কর্তব্য পালন করা উচিত, ক্রমাগত তাদেরকে নম্রভাবে উপদেশ দিয়ে যা শক্তিশালী প্রমাণ এবং জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত। অজ্ঞতা এবং খারাপ আচরণের সাথে সৎকাজের আদেশ এবং মন্দকাজের নিষেধ মানুষকে সত্য এবং সঠিক পথনির্দেশনা থেকে আরও দূরে ঠেলে দেবে, যা সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

যখন কেউ সৎকাজের আদেশ দেয় এবং মন্দকাজে নিষেধ করে, কেবল তখনই সে সমাজের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে এবং বিচারের দিন তাকে ক্ষমা করা হবে। ৭ম সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ১৬৪:

"আর যখন তাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় বলল, "কেন তোমরা এমন জাতিকে উপদেশ দাও, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করতে অথবা কঠোর শাস্তি দিতে যাচ্ছেন?" তারা বলল, "তোমাদের প্রতিপালকের সামনে ক্ষমা চাও এবং সম্ভবত তারা তাঁকে ভয় করবে।"

কিন্তু যদি তারা কেবল নিজেদের কথা চিন্তা করে এবং অন্যদের কাজ উপেক্ষা করে, তাহলে আশঙ্কা করা হয় যে অন্যদের নেতিবাচক প্রভাব তাদের শেষ পর্যন্ত বিপথগামী করে তুলতে পারে।

মদীনার জনগণ, সাহায্যকারীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তার পরবর্তী অংশ ছিল এই যে, তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মন্দের বিরোধিতা করবে এবং এর জন্য তাদের উপর পরিচালিত কোনও সমালোচনাকে ভয় পাবে না।

সুনানে আবু দাউদের ৪৩৪০ নম্বর হাদিসে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মন্দ কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার গুরুত্ব সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন। এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, সকল মুসলমানের উপর তাদের শক্তি এবং সামর্থ্য অনুসারে সকল ধরণের মন্দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা কর্তব্য। এই হাদিসে উল্লেখিত সর্বনিম্ন স্তর হল অন্তর দিয়ে মন্দকে প্রত্যাখ্যান করা।

এ থেকে বোঝা যায় যে, অভ্যন্তরীণভাবে মন্দ কাজকে অনুমোদন করা নিষিদ্ধ জিনিসগুলির মধ্যে সবচেয়ে জঘন্যতম। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আবু দাউদের ৪৩৪৫ নম্বর হাদিসে মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি মন্দ কাজের সময় উপস্থিত থাকে এবং তা নিন্দা করে, সে যেন সেই ব্যক্তির মতো যে উপস্থিত ছিল না। কিন্তু যে ব্যক্তি অনুপস্থিত ছিল এবং মন্দ কাজের অনুমোদন করেছিল, সে যেন সেই ব্যক্তির মতো যে মন্দ কাজের সময় উপস্থিত ছিল এবং নীরব ছিল।

আলোচ্য মূল হাদিসে বর্ণিত মন্দ কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রথম দুটি দিক হলো শারীরিক কর্মকাণ্ড এবং কথাবার্তার মাধ্যমে। এটি কেবলমাত্র একজন মুসলিমের উপর কর্তব্য যার তা করার শক্তি আছে, উদাহরণস্বরূপ, তাদের কাজ বা কথার দ্বারা তাদের কোন ক্ষতি হবে না।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, নিজের হাতে মন্দ কাজের প্রতিবাদ করা মানে যুদ্ধ নয়। এটি অন্যের মন্দ কাজ সংশোধন করা, যেমন কারো অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া যা বেআইনিভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এখনও তা করার মতো অবস্থানে আছে, সে তা করা থেকে বিরত থাকে, তাকে সুনান আবু দাউদের ৪৩৩৮ নম্বর হাদিসে শাস্তির বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, ২১৯১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদের উপদেশ দিয়েছেন যে, সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে তাদের সৃষ্টিকে ভয় করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি সৃষ্টির ভয়কে মন্দ কাজের প্রতি আপত্তি জানাতে বাধা দেয় তাকে এমন ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যে নিজেকে ঘৃণা করে এবং বিচারের দিনে মহান আল্লাহ তাকে সমালোচিত করবেন। সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪০০৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি লক্ষণীয় যে, এটি সেই ব্যক্তির কথা নয় যে ক্ষতির ভয়ে চুপ থাকে কারণ এটি একটি গ্রহণযোগ্য অজুহাত। বরং এটি সেই ব্যক্তির কথা বলে যে মানুষের দৃষ্টিতে যে মর্যাদা রয়েছে তার কারণে চুপ থাকে, যদিও তারা যদি ঘটছে সেই মন্দের বিরুদ্ধে কথা বলে তবে তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

সুনানে আবু দাউদের ৪৩৪১ নম্বর হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যখন অন্যরা তাদের লোভের আনুগত্য করে, তাদের ভুল মতামত ও আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করে এবং পরকালের চেয়ে বস্তুগত জগৎকে প্রাধান্য দেয়, তখন একজন ব্যক্তি তাদের কাজ ও কথার মাধ্যমে মন্দ কাজের প্রতিবাদ করা ত্যাগ করতে পারে। এই সময় এসে গেছে বলে সিদ্ধান্ত নিতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না। ৫ম অধ্যায় আল মায়িদা, আয়াত ১০৫।

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিজেদের উপরই [দায়িত্ব]। যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না যখন তোমরা সৎ পথে চলে যাবে..."

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের উপর নির্ভরশীলদের প্রতি এই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করা, কারণ এটি তাদের উপর একটি কর্তব্য, সুনান আবু দাউদের ২৯২৮ নম্বর হাদিস অনুসারে, এবং যাদের থেকে তারা শারীরিক ও মৌখিকভাবে নিরাপদ বোধ করে, তাদের প্রতি, কারণ এটিই সর্বোত্তম মনোভাব।

আলোচ্য মূল হাদিসে স্পষ্টতই মন্দ বিষয়ের প্রতি আপত্তি জানানোর কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এটি মুসলমানদেরকে অন্যদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করার অনুমতি দেয় না যাতে তারা আপত্তি করার জন্য মন্দ বিষয় খুঁজে পায়। গুপ্তচরবৃত্তি এবং এর সাথে সম্পর্কিত যেকোনো কিছু নিষিদ্ধ। সূরা আল হুজুরাত, আয়াত ১২:

"হে ঈমানদারগণ...গোয়েন্দাগিরি করো না..."

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিমকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মন্দ কাজের প্রতিবাদ করতে হবে, তাদের ইচ্ছা অনুসারে নয়। একজন মুসলিম হয়তো বিশ্বাস করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করছে, যদিও তারা তা করে না। এটি তখন প্রমাণিত হয় যখন তারা এমনভাবে মন্দ কাজের প্রতিবাদ করে যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। প্রকৃতপক্ষে, এই

নেতিবাচক মনোভাবের কারণে যাকে সৎ কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় তা পাপে পরিণত হতে পারে।

একজন মুসলিমের উচিত পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে মন্দ কাজের বিরুদ্ধে নম্রভাবে প্রতিবাদ করা, বিশেষ করে গোপনে। ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল না করে এটি অর্জন করা সম্ভব নয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির বিপরীতটি মানুষকে কেবল আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে এবং অন্যদের রাগানোর ফলে আরও পাপের দিকে পরিচালিত করতে পারে। পরিশেষে, সঠিক সময়ে মন্দ কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত, কারণ ভুল সময়ে, যেমন যখন তারা রাগান্বিত থাকে, তখন গঠনমূলকভাবে সমালোচনা করা তাদের ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা কম।

মদীনার জনগণ, সাহায্যকারীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তার পরবর্তী অংশ ছিল এই যে, তারা মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সাহায্য ও প্রতিরক্ষা করবে, ঠিক যেমন তারা তাদের আত্মীয়স্বজনদের সাহায্য ও প্রতিরক্ষা করবে।

আজকের যুগে, যখন কেউ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে এবং তার উপর আমল করে, তখনই এটি অর্জন করা সম্ভব। এর মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন শেখা এবং তার উপর আমল করা। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি তার প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে তার জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসবে। উপরন্তু, এইভাবে আচরণ করলে একজন ব্যক্তি আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে

বহির্বিশ্বের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন করবে। এটি প্রতিটি মুসলমানের উপর কর্তব্য এবং তাই তাদের এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। অতএব, একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা বহির্বিশ্বের কাছে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন না করে যাতে অমুসলিম এবং অন্যান্য মুসলমানরা তাদের কর্মের কারণে ইসলাম থেকে বিচ্যুত না হয়।

আল্লাহর জন্য ঐক্যবদ্ধ (SWT)

মহানবী (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাতের পর, মদীনার সাহাবীরা, সাহায্যকারীরা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, তাঁর সাথে আনুগত্যের আরেকটি শপথ গ্রহণ করেন। মদীনার একজন সাহাবী, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন, তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে তিনি আশঙ্কা করেন যে যখন আল্লাহ, মহিমান্বিত, মহানবী (সাঃ) কে বিজয় দান করবেন, তখন তিনি মক্কায় ফিরে যাবেন এবং মদীনার সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, ছেড়ে যাবেন। এটি তাদের জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে, বিশেষ করে অসংখ্য শত্রুর বিরুদ্ধে মহানবী (সাঃ) কে সমর্থন করার পর। এতে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মুচকি হেসে উত্তর দিলেন যে, যদি তাদের শত্রুরা তাদের রক্ত চায়, তাহলে তা তার রক্ত চাওয়ার মতোই হবে। এবং তাদের পরাজয় হবে তার পরাজয়। তিনি তাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছে তাদের সাথে যুদ্ধ করার এবং যাদের সাথে তারা শান্তি স্থাপন করেছে তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে তিনি তাদের থেকে এবং তারা তার থেকে। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সময়ের সাথে সাথে অনেক মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের একে অপরের সাথে একসময়ের দৃঢ় সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে। এর অনেক কারণ আছে কিন্তু একটি প্রধান কারণ হল তাদের পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা যে ভিত্তির উপর তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এটা সর্বজনবিদিত যে যখন একটি ভবনের ভিত্তি দুর্বল হয় তখন সময়ের সাথে সাথে ভবনটি হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমনকি ভেঙে পড়ে। একইভাবে, যখন মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ভিত্তি সঠিক না হয় তখন তাদের মধ্যে বন্ধন অবশেষে দুর্বল হয়ে পড়ে এমনকি ভেঙে যায়। যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাহাবীদের (রাঃ) একত্রিত করেছিলেন, তখন তিনি তাদের মধ্যে বন্ধন তৈরি করেছিলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। যদিও, আজকের বেশিরভাগ মুসলিম গোত্রপ্রথা, ভ্রাতৃত্ব এবং অন্যান্য পরিবারের কাছে প্রদর্শনের জন্য। যদিও, বেশিরভাগ সাহাবী,

আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, আত্মীয় ছিলেন না কিন্তু যেহেতু তাদের সংযোগ স্থাপনের ভিত্তি সঠিক ছিল, অর্থাৎ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাদের বন্ধন আরও শক্তিশালী হতে থাকে। যদিও আজকাল অনেক মুসলিম রক্তের সম্পর্কযুক্ত, তবুও সময়ের সাথে সাথে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে কারণ তাদের বন্ধনের ভিত্তি ছিল মিথ্যা, যেমন গোত্রবাদ এবং অনুরূপ জিনিসের উপর ভিত্তি করে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, যদি তারা তাদের বন্ধন টিকে থাকতে এবং আত্মীয়তার বন্ধন এবং অ-আত্মীয়দের অধিকার রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য সওয়াব অর্জন করতে চায়, তাহলে তাদের কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই বন্ধন তৈরি করতে হবে। এর ভিত্তি হল, মানুষ কেবল একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করবে এবং এমনভাবে কাজ করবে যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে। পবিত্র কুরআনে এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৫ম সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ২:

"...এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

তোমার তত্ত্বাবধানে

মহানবী (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাতের পর, মদীনার সাহাবীরা, সাহায্যকারীরা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, তাঁর সাথে আনুগত্যের আরেকটি শপথ গ্রহণ করেন। মদীনার সাহাবীদের মধ্য থেকে ১২ জন নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর, মহানবী (সাঃ) এই নেতাদের উপদেশ দেন যে, মদীনার জনগণকে তাদের উপর ন্যস্ত করা হবে ঠিক যেমন নবী ঈসা (সাঃ) এর প্রতিনিধিত্ব করতেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ) এর জীবনী", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ২৪০৯ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি ব্যক্তি একজন অভিভাবক এবং তাই তার তত্ত্বাবধানে থাকা জিনিসপত্রের জন্য দায়ী।

একজন মুসলিমের সবচেয়ে বড় রক্ষাকর্তা হলো তার ঈমান। অতএব, তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে এর দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

এই অভিভাবকত্বের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ, যার মধ্যে রয়েছে বাহ্যিক জিনিস, যেমন সম্পদ, এবং অভ্যন্তরীণ জিনিস, যেমন দেহ। একজন মুসলিমকে ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতিতে এই জিনিসগুলি ব্যবহার করে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিমের উচিত কেবল হালাল জিনিস দেখার জন্য চোখ ব্যবহার করা, কেবল হালাল ও

কল্যাণকর কথা বলা এবং তাদের সম্পদ কল্যাণকর ও পুণ্যময় উপায়ে ব্যবহার করা।

এই অভিভাবকত্ব তার জীবনের অন্যান্যদের, যেমন আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একজন মুসলিমকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার পূরণ করে, যেমন তাদের ভরণপোষণ করা এবং সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশেষ করে পার্থিব বিষয়গুলিতে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের তাদের সাথে সদয় আচরণ করা উচিত এই আশায় যে তারা আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হবে। এই অভিভাবকত্বের মধ্যে একজনের সন্তানরাও অন্তর্ভুক্ত। একজন মুসলিমকে উদাহরণ দিয়ে তাদের নেতৃত্ব দিতে হবে, কারণ এটি শিশুদের পরিচালনার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তাদের অবশ্যই পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, কার্যত যেমন মহান আল্লাহকে মেনে চলতে হবে এবং তাদের সন্তানদেরও একই কাজ করতে শেখাতে হবে। এর মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা।

পরিশেষে, এই হাদিস অনুসারে, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু দায়িত্ব রয়েছে যা তাদের উপর অর্পিত হয়েছে। তাই তাদের উচিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান অর্জন করা এবং তা পালনের জন্য কাজ করা, কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ, এবং তাই বিচারের দিনে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৩৪:

"...এবং [প্রত্যেক] অঙ্গীকার পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সর্বদা [যার বিষয়ে] জিজ্ঞাসা করা হবে।"

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা

মহানবী (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাতের পর, মদীনার সাহাবীরা, সাহায্যকারীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাঁর সাথে আনুগত্যের আরেকটি শপথ গ্রহণ করেন। এই সাক্ষাতের পর, তাদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। মক্কার অমুসলিম নেতারা জানতে পারেন যে মদীনার কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং ফলস্বরূপ তারা মদীনায় ফিরে যাওয়ার আগে তাদের গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করে। সা'দ বিন উবাদাহ (রাঃ) ছাড়া সকলেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তাকে ধরা হয়, বেঁধে মক্কায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তাকে প্রচণ্ড মারধর করা হয়। সা'দ (রাঃ) তার ঈমানের উপর অটল থাকেন এবং কখনও দ্বিধা করেন না। মক্কার কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ডেকে তিনি মুক্তি পেতে সক্ষম হন যারা তার সাথে ব্যবসা করতেন। সিরাত ইবনে হিশামের ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠায় এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জীবনে একজন মুসলিম সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অথবা কঠিন সময়ের মুখোমুখি হবে। কেউই কেবল কিছু অসুবিধা ছাড়াই স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে না। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, সংজ্ঞা অনুসারে, যদিও অসুবিধাগুলি মোকাবেলা করা কঠিন, তবুও তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতি তার প্রকৃত মহত্ত্ব এবং দাসত্ব অর্জন এবং প্রদর্শনের একটি উপায়। উপরন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ যখন অসুবিধার মুখোমুখি হয় তখন তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জীবনের পাঠ শেখে। এবং মানুষ প্রায়শই স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে কঠিন সময়ের অভিজ্ঞতা অর্জনের পরে আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হয়। এই সত্যটি বোঝার জন্য কেবল এটি নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে তবে সে বুঝতে পারবে যে আলোচিত বেশিরভাগ ঘটনাই অসুবিধার সাথে জড়িত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে প্রকৃত মহত্ত্ব সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করার মধ্যেই নিহিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি নিহিত রয়েছে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে অসুবিধার মুখোমুখি হওয়ার মধ্যে। এটি এই সত্য দ্বারা প্রমাণিত যে ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত প্রতিটি বড় কঠিন বিষয়ই

তাদের জন্য চূড়ান্ত সাফল্যের সাথে শেষ হয় যারা মহান আল্লাহকে আনুগত্য করেছে। তাই একজন মুসলিমের উচিত সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করা উচিত নয় কারণ এটি কেবল তাদের জন্য উজ্জ্বল হওয়ার মুহূর্ত, যখন তারা আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের প্রকৃত দাসত্ব স্বীকার করে। এটিই উভয় জগতের চূড়ান্ত সাফল্যের চাবিকাঠি।

সাহাবীদের (রাঃ) মদিনায় হিজরত

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণের উপর সহিংসতা আরও তীব্র হওয়ার পর, তিনি সাহাবীগণকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দেন। গোপনে, তারা তাদের যা কিছু ছিল এবং যা কিছু জানত তা রেখে মদীনায় হিজরত করতে শুরু করে।

একমাত্র ব্যক্তি যিনি গোপনে হিজরত করেননি তিনি হলেন উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)। যখন তিনি হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি তার তরবারি রাখেন, কাঁধে ধনুক রাখেন, তীর তুলে নেন এবং তার লাঠিটি পাশে রাখেন। তিনি আল্লাহর ঘর কাবা ঘরে যান, যেখানে অমুসলিমরা বসে ছিল এবং কাবা তাওয়াফ করেন এবং ইব্রাহিম (আ.)-এর মাকামের পিছনে নামাজ পড়েন। তারপর তিনি অমুসলিমদের প্রতিটি সমাবেশে যান এবং তাদের বলেন যে তিনি হিজরত করছেন এবং যারা তাদের মাকে নিজেকে হারাতে, তার সন্তানকে এতিম করতে এবং তার স্ত্রীকে বিধবা করতে চায়, তারা যেন একটি উপত্যকার পিছনে তার সাথে দেখা করে। কেউ তাকে যুদ্ধের জন্য চ্যালেঞ্জ করার সাহস করেনি। পরিবর্তে, কয়েকজন দুর্বল ও নির্যাতিত লোক তার পিছনে আসে এবং তিনি তাদের ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেন এবং তারপর মক্কা ছেড়ে মদিনার দিকে রওনা হন, কয়েকজন সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর লেখা, উমর ইবনে আল খাত্তাব, তাঁর জীবন ও সময়, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬০-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উসমান ইবনে আফফান এবং তার স্ত্রী রুকাইয়া (রা.)-সহ বেশ কয়েকজন সাহাবী তাদের পরিবার, ব্যবসা এবং ঘরবাড়ি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রেখে ইথিওপিয়ার

উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিছুক্ষণ পরে, তারা শুনতে পান যে মক্কার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মক্কায় ফিরে আসেন, যাদের মধ্যে উসমান এবং তার স্ত্রী রুকাইয়া (রা.)-ও ছিলেন, কিন্তু তারা বুঝতে পারেন যে খবরটি মিথ্যা। অবশেষে তাদের মদিনায় হিজরতের নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তারা মক্কায়ই থেকে যান। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১-২ এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী'র "উসমান ইবনে আফফানের জীবনী", যুন-নূরাইন, পৃষ্ঠা ২২-২৬-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ মুসলিমদের কাছ থেকে সেইসব অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার দাবি করেন না যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রাঃ) সহ্য করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন যেখানে তারা তাদের পরিবার, ঘরবাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে এক অপরিচিত দেশে হিজরত করেছিলেন, সবকিছুই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

তুলনামূলকভাবে, মুসলিমরা বর্তমানে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে, তা পূর্বসূরীদের মতো কঠিন নয়। অতএব, মুসলমানদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে তাদের কেবল কয়েকটি ছোট ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, যেমন ফজরের ফরজ নামাজ আদায়ের জন্য কিছু ঘুম এবং ফরজ দান করার জন্য কিছু সম্পদ উৎসর্গ করতে হবে। মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ঘরবাড়ি ও পরিবার পরিজন ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন না। এই কৃতজ্ঞতা বাস্তবে দেখানো উচিত, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের আশীর্বাদ ব্যবহার করে।

এছাড়াও, যখন কোন মুসলিম সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন তাদের মনে রাখা উচিত যে, নবী-রাসূলগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং কীভাবে তারা আল্লাহর

প্রতি অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে সেগুলো কাটিয়ে উঠেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এই জ্ঞান একজন মুসলিমকে তাদের সমস্যা কাটিয়ে ওঠার শক্তি প্রদান করতে পারে কারণ তারা জানে যে, নবী-রাসূলগণ আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন, তবুও তারা ধৈর্যের সাথে আরও কঠোর সমস্যা সহ্য করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে ইবনে মাজাহের ৪০২৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণ (সাঃ) সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা সহ্য করেছেন এবং নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

যদি কোন মুসলিম পূর্বসূরীদের ন্যায়পরায়ণ মনোভাব অনুসরণ করে, তাহলে আশা করা যায় যে পরকালে তারাও তাদের সাথেই থাকবে।

মানুষের প্রতি আন্তরিকতা

মদিনায় হিজরতের পর, উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) কে জানানো হয় যে মক্কার দুই অমুসলিম, আবু জাহল ইবনে হিশাম এবং হারিস ইবনে হিশাম, তাদের মুসলিম সৎ ভাই, আয়াশ ইবনে আবি রাবী'আহ (রা.)-কে তাদের সাথে মক্কায় ফিরে যেতে রাজি করানোর জন্য মদীনা সফর করেছেন। তারা তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তারা তার ক্ষতি করতে চান না এবং কেবল তাকে মক্কায় ফিরে যেতে চান তাদের মায়ের সাথে দেখা করতে, যিনি তাকে না দেখা পর্যন্ত নিজের যত্ন নেবেন না বলে শপথ করেছিলেন। উমর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, বুঝতে পেরেছিলেন যে দুই অমুসলিম আয়াশ (রা.)-এর বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র করছে। উমর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাকে তাদের সাথে যেতে নিষেধ করেছিলেন। তার মা, আয়াশ (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসা থেকে, মক্কা যেতে চেয়েছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি তার মাকে দেখার পর তার কিছু সম্পদ মক্কা থেকে মদিনায় ফিরিয়ে আনবেন। তাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য, উমর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাকে তার অর্ধেক সম্পদের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু আইয়াশ (রাঃ) মদিনাতে থাকতে অস্বীকৃতি জানান। অবশেষে, উমর (রাঃ) তাকে তার নিজের দ্রুতগামী উটটি দেন এবং মক্কার অমুসলিমদের বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ হলে তাৎক্ষণিকভাবে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সতর্ক করেন। মক্কায় ফেরার পথে, আইয়াশ (রাঃ) বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং অপহরণ করেন। তারা তাকে নির্যাতন করে যতক্ষণ না সে ইসলাম ত্যাগ করে তার পূর্বের ধর্মে ফিরে আসে।

সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, বিশ্বাস করতেন যে, মহান আল্লাহ কখনও মুরতাদ ব্যক্তির তওবা কবুল করবেন না। পরবর্তীতে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর, মুরতাদদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত আয়াতগুলি নাজিল হয়। সূরা আয-যুমার, আয়াত ৫৩-৫৫:

"বল, হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনিই ক্ষমাশীল, করুণাময়। আর তোমাদের উপর আযাব আসার আগেই তোমাদের প্রতি অনুতপ্ত হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো; তারপর তোমাদের সাহায্য করা হবে না। আর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সর্বোত্তম অনুসরন করো[অর্থাৎ, কুরআন], হঠাৎ আযাব আসার আগেই এবং তোমরা টেরও পাবে না।"

উমর (রাঃ) এরপর এই আয়াতগুলো লিখে পাঠান এবং নির্যাতনের শিকার এবং ধর্মত্যাগে বাধ্য হওয়া ব্যক্তিদের কাছে পাঠান। তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হন এবং অবশেষে তাদের মুসলিম ভাইদের সাথে যোগ দিতে মদিনায় হিজরত করতে সক্ষম হন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর লেখা, উমর ইবনে আল খাত্তাব, তাঁর জীবন ও সময়, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬১-৬৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

প্রতিটি পদক্ষেপে, উমর (রাঃ) তার মুসলিম ভাইদের প্রতি পূর্ণ আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি প্রথমে আয়াশ (রাঃ) কে সতর্ক করেছিলেন যে তিনি যেন দুই অমুসলিমকে মক্কায় ফিরে না যান এবং এমনকি তাকে মদিনায় রাখার জন্য তার অর্ধেক সম্পদও দান করেছিলেন। তারপর তিনি তাকে ভ্রমণের জন্য তার নিজস্ব উট দিয়েছিলেন। অবশেষে, তিনি পবিত্র কুরআনের এই আয়াতগুলি তাদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন যাতে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে ইসলামের পথে পুনরায় প্রবেশ করতে উৎসাহিত হয়। অন্যদের প্রতি এই আন্তরিকতা ইসলামের একটি মূল দিক।

সহীহ মুসলিমের ১৯৬ নম্বর হাদিসে নবী মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, ইসলাম হলো জনসাধারণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য মঙ্গল কামনা করা এবং নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা। এর মধ্যে রয়েছে অন্যদের ভালো কাজের পরামর্শ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, সর্বদা অন্যদের প্রতি করুণা ও সদয় হওয়া। সহীহ মুসলিমের ১৭০ নম্বর হাদিসে এর সারসংক্ষেপ পাওয়া যায়। এটি সতর্ক করে যে, কেউ যতক্ষণ না নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অন্যদের জন্য তাই পছন্দ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃত মুমিন হতে পারে না।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে সহীহ বুখারীর ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এই দায়িত্বকে ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠা এবং ফরজ দান করার পরেই রেখেছেন। এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব বোঝা যায় কারণ এটিকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্বের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ হলো, যখন তারা সুখী হয় তখন খুশি হওয়া এবং যখন তারা দুঃখিত হয় তখন দুঃখিত হওয়া, যতক্ষণ না তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। উচ্চ স্তরের আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্যদের জীবনকে উন্নত করার জন্য চরম সীমা অতিক্রম করা, এমনকি যদি এটি তাদের নিজেদেরকে অসুবিধার মধ্যে ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ অভাবীদের জন্য সম্পদ দান করার জন্য কিছু জিনিসপত্র ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। সর্বদা কল্যাণের জন্য মানুষকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের একটি বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় ১৭ আল ইসরা, আয়াত ৫৩:

"... শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়..."

মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি উপায় হল অন্যদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং তাদের পাপের বিরুদ্ধে গোপনে উপদেশ দেওয়া। যে ব্যক্তি এইভাবে কাজ করে, আল্লাহ তার পাপ ঢেকে রাখবেন। জামে আত তিরমিযী, ১৪২৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব অন্যদের ধর্মের দিকগুলি এবং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া এবং শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে তাদের পার্থিব এবং ধর্মীয় জীবন উভয়ই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যদের অপবাদ থেকে তাদের সমর্থন করে। অন্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ প্রাণীই এইরকম আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজ পরিবর্তন করতে না পারে, তবুও তারা তাদের জীবনের লোকদের, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, অন্যদের সাথে সেই আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় লোকেরা তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় ২৮ আল কাসাস, আয়াত ৭৭:

"... আর তুমিও ভালো কাজ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি ভালো করেছেন..."

অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক হল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য তাদের সাহায্য করা। মানুষের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা কামনা করা উচিত নয়, কারণ এটি তার সওয়াব নষ্ট করে এবং আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি স্পষ্ট অকৃতজ্ঞতা।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত

মাইগ্রেটের অনুমতি

মহান আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মদিনায় হিজরতের অনুমতি দান করে সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৮০ নাযিল করেন:

"আর বলো, "হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সুস্থভাবে প্রবেশ করাও এবং সুস্থভাবে বের হও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাকে সাহায্যকারী কর্তৃত্ব দান করো।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই আয়াতে দোয়া ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ নিয়ত এবং বাহ্যিক কর্ম উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। সত্যের সাথে প্রবেশ করা ইঙ্গিত দিতে পারে যে যখনই একজন মুসলিম যেকোনো পরিস্থিতিতে প্রবেশ করে, তা সে পার্থিব হোক বা ধর্মীয়, তাদের তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়তে করা উচিত। একজন মুসলিম এই নিয়তে সম্পন্ন সমস্ত বৈধ কর্মের জন্য পুরস্কৃত হবে, এমনকি যদি কাজটি পার্থিব বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ, হালাল সম্পদ উপার্জন এবং নিজের পরিবারের চাহিদা পূরণ করা একটি পার্থিব কাজ বলে মনে হয় কিন্তু যখন সঠিক নিয়তে করা হয় তখন এটি একটি নেক কাজ হয়ে ওঠে। সহীহ বুখারী, ৪০০৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি

হাদিসে এটি সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে কাজ সর্বদা একটি আন্তরিক নিয়তকে সমর্থন করে। যার ভুল নিয়ত আছে তাকে আল্লাহ তায়ালা পুরস্কৃত করবেন না। প্রকৃতপক্ষে, বিচারের দিন তাদেরকে বলা হবে যে তারা যার জন্য কাজ করেছে তার কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইতে। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সত্যে প্রবেশের অর্থ হলো, প্রতিটি পরিস্থিতিতে শারীরিকভাবে প্রবেশ করা, এমনভাবে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে এবং কেবল সেইসব কাজ করা যা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে এবং মিথ্যা ও পাপের উপর ভিত্তি করে তৈরি সমস্ত পরিস্থিতি এবং কাজ এড়িয়ে চলে। এটি কেবলমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া হলো যখন কেউ প্রতিটি পরিস্থিতি এমন নিয়ত নিয়ে ত্যাগ করে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। অর্থাৎ, একজন মুসলিমকে অবশ্যই কোনও কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার সৎ নিয়তকে পরিবর্তন না করে বজায় রাখতে হবে। এবং এর মধ্যে রয়েছে কার্যত এমনভাবে পরিস্থিতি ত্যাগ করা যাতে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে ধৈর্যের সাথে একটি অসুবিধা বা পরীক্ষা ত্যাগ করা, জেনে রাখা যে, মহান আল্লাহ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম পরিস্থিতি বেছে নেন, এমনকি যদি তারা তাঁর পছন্দের পিছনের প্রজ্ঞা পর্যবেক্ষণ না করে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

এই দোয়ার শেষ অংশটি পবিত্র কুরআনের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস মেনে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে। সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বর হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, ইসলামের উপর ভিত্তি করে নয় এমন যেকোনো বিষয় প্রত্যাখ্যাত হবে।

যদি মুসলমানরা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই স্থায়ী সাফল্য চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্য কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যদিও, কিছু কিছু কাজ যা সরাসরি এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎস থেকে নেওয়া হয় না, তবুও তাকে একটি সৎকর্ম হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, তবুও এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎসকে অন্য সকল কাজের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাস্তবতা হল, যে কাজগুলি এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎস থেকে নেওয়া হয় না, এমনকি যদি তা একটি সৎকর্ম হয়, তবুও তারা এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎসের উপর তত কম কাজ করবে। এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ হল কতজন মুসলমান তাদের জীবনে এমন সাংস্কৃতিক রীতিনীতি গ্রহণ করেছে যার এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎসের ভিত্তি নেই। যদিও এই সাংস্কৃতিক রীতিনীতিগুলি পাপ নয়, তবুও তারা তাদের আচরণে সন্তুষ্ট বোধ করে এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎস শেখা এবং সেগুলি অনুসরণ করা থেকে মুসলমানদের বিরত রেখেছে। এর ফলে এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎস সম্পর্কে অজ্ঞতা তৈরি হয় যা কেবল পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে।

এই কারণেই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই দুটি পথনির্দেশনা শিখতে হবে এবং সেগুলি অনুসরণ করতে হবে, যা পথনির্দেশনার নেতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং তারপরে যদি তাদের সময় এবং শক্তি থাকে তবেই অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সৎকর্ম সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু যদি তারা অজ্ঞতা এবং বানানো অভ্যাস বেছে নেয়,

যদিও সেগুলি পথনির্দেশনার এই দুটি উৎস শেখা এবং সেগুলি অনুসরণ করার চেয়ে পাপ নাও হয়, তবে তারা সাফল্য অর্জন করতে পারবে না।

পরিশেষে, একজন সহায়ক কর্তৃপক্ষের অর্থ হতে পারে যে, তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে একজন মুসলিমকে তার নিজের শরীরের উপর কর্তৃত্ব ব্যবহার করার শক্তি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আশীর্বাদ দান করার জন্য অনুরোধ করেন।

একটি দুষ্ট সমাবেশ

যখন সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, মক্কার অমুসলিম নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করা কেবল সময়ের ব্যাপার। তারা আশঙ্কা করেছিলেন যে যদি মদিনা একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয় তবে এই অঞ্চলে তাদের প্রভাব এবং ক্ষমতা হুমকির মুখে পড়বে। তাই তারা মক্কায় অবস্থিত দার আল নাদওয়ায় একটি সভা করেন, যা আল্লাহর ঘর কাবার কাছে অবস্থিত। এমনকি একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির ছদ্মবেশে শয়তানও তাদের সভায় যোগ দেয়। এই সভায় সদস্যরা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মিশনকে ধ্বংস করার জন্য কী করতে হবে সে সম্পর্কে তাদের মতামত পেশ করে কিন্তু শয়তান তাদের প্রত্যাখ্যান করে যতক্ষণ না নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর চাচা আবু জাহল তার মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বিভিন্ন গোত্রের লোকদের একটি দলকে দিয়ে তাকে হত্যা করার পরামর্শ দেন। এটি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর গোত্রকে প্রতিশোধ হিসেবে তাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধা দেবে এবং তারা কেবল তার গোত্রকে অর্থ প্রদান করবে যাতে বিষয়টি শেষ হয়। শয়তান এবং এই সভার অন্যান্য সকল সদস্য এই মন্দ পরিকল্পনার সাথে একমত হয়েছিল। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য একটি সহজ কিন্তু গভীর শিক্ষা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো, তারা কখনোই এই পৃথিবীতে বা পরকালে আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে সফল হবে না। যুগের সূচনা থেকে এই যুগ পর্যন্ত এবং শেষ যুগ পর্যন্ত, কেউই আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে প্রকৃত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি এবং পাবেও না। কারণ, মহান আল্লাহ, সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর অবাধ্যতার মাধ্যমে যে পার্থিব জিনিস পাওয়া যায়, তা তিনি উভয় জগতে তাদের জন্য চাপ, দুর্দশা এবং ঝামেলার কারণ করে তুলবেন। উপরন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ, মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে মনের শান্তি অর্জন করবে এবং কে করবে না। অধ্যায় ৫৩ আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

অতএব, যে ব্যক্তি তাঁর অবাধ্য হয় সে এই পৃথিবীতে বা পরকালে কখনও মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারবে না, এমনকি যদি তারা বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে। অধ্যায় ৯, তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

তখন এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতএব, যখন একজন মুসলিম এমন পরিস্থিতিতে পড়ে যেখানে তারা ইতিবাচক এবং সফল ফলাফল অর্জন করতে চায়, তখন তাদের কখনই মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করা উচিত নয়, তা যতই প্রলোভনসঙ্কুল বা সহজ মনে হোক না কেন। এমনকি যদি তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনরা তাকে তা করার পরামর্শ দেয় কারণ সৃষ্টির প্রতি আনুগত্য নেই, যদি এর অর্থ স্রষ্টার অবাধ্যতা হয়। এবং প্রকৃতপক্ষে তারা কখনও তাদের আল্লাহ, মহান আল্লাহর এবং তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না, এই পৃথিবীতে বা পরকালে। ঠিক যেমন আল্লাহ, তাঁর আনুগত্যকারীদের সাফল্য দান করেন, তিনি তাঁর অবাধ্যদের কাছ থেকে একটি সফল পরিণতি দূর করেন, এমনকি যদি এই অপসারণ প্রত্যক্ষ করতে সময় লাগে। একজন মুসলিমকে বোকা বানানো উচিত নয় কারণ এটি শীঘ্রই বা পরে ঘটবে। পবিত্র কুরআন অত্যন্ত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে একটি মন্দ পরিকল্পনা বা কর্ম কেবল সেই ব্যক্তিকেই ঘিরে রাখে, এমনকি যদি এই শাস্তি বিলম্বিত হয়। 35 সূরা ফাতির, আয়াত 43:

"...কিন্তু সেই মন্দ চক্রান্ত তার নিজস্ব লোকদের ছাড়া আর কাউকে ঘিরে রাখে না..."

অতএব, পরিস্থিতি এবং পছন্দ যতই কঠিন হোক না কেন, মুসলিমদের সর্বদা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্য বেছে নেওয়া উচিত কারণ এটিই উভয় জগতে প্রকৃত সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে, যদিও এই সাফল্য তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট নাও হতে পারে।

সমর্থনকারী দাবি

যখন মক্কার অমুসলিম নেতারা মহানবী (সাঃ) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে, তখন তারা এই জঘন্য কাজের জন্য নিযুক্ত দলটিকে মহানবী (সাঃ) এর ঘরের বাইরে অপেক্ষা করতে এবং তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে আক্রমণ করতে নির্দেশ দেয়। মহানবী (সাঃ) আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ)-কে তাঁর বিছানায় স্থান নিতে নির্দেশ দেন এবং তাঁর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেন, যাতে তিনি গোপনে হিজরত করতে পারেন। ইমাম ইবনে কাথিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৩-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সকল সাহাবীর মতো, আলী (রাঃ)ও মহানবী (সাঃ)-কে ভালোবাসা এবং বিশ্বাস করার মৌখিক দাবিকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করেছিলেন।

কুফর বলতে ইসলামকে আক্ষরিক অর্থে প্রত্যাখ্যান করা অথবা কর্মের মাধ্যমে, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহকে অমান্য করা, যদিও কেউ তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে এটি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যদি একজন অজ্ঞ ব্যক্তিকে অন্য একজন সিংহের আগমন সম্পর্কে সতর্ক করে এবং অজ্ঞ ব্যক্তি নিরাপত্তা লাভের জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপ নেয়, তাহলে তাকে এমন একজন হিসেবে বিবেচনা করা হবে যিনি তাকে প্রদত্ত সতর্কীকরণে বিশ্বাস করেছেন কারণ তারা সতর্কীকরণের ভিত্তিতে তাদের আচরণকে অভিযোজিত করেছেন। অন্যদিকে, যদি অজ্ঞ ব্যক্তি সতর্কীকরণের পরেও তাদের আচরণ বাস্তবে পরিবর্তন না করে, তাহলে মানুষ সন্দেহ করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত সতর্কীকরণে বিশ্বাস করে না, এমনকি যদি অজ্ঞ ব্যক্তি মৌখিকভাবে তাদের প্রদত্ত সতর্কীকরণে বিশ্বাস করার দাবি করে।

কিছু মানুষ দাবি করে যে তাদের আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং আনুগত্য তাদের হৃদয়ে রয়েছে এবং তাই তাদের এটি ব্যবহারিকভাবে প্রদর্শন করার প্রয়োজন নেই। দুর্ভাগ্যবশত, এই বোকা মানসিকতা অনেক মুসলমানকে সংক্রামিত করেছে যারা বিশ্বাস করে যে তাদের একটি বিশুদ্ধ বিশ্বস্ত হৃদয় রয়েছে যদিও তারা ইসলামের বাধ্যবাধকতা পালনে ব্যর্থ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৮৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যখন কারো হৃদয় পবিত্র থাকে তখন শরীর পবিত্র হয় যার অর্থ তাদের কর্ম সঠিক হয়ে যায়। কিন্তু যদি কারো হৃদয় কলুষিত হয় তবে শরীর কলুষিত হয় যার অর্থ তাদের কর্ম কলুষিত এবং ভুল হবে। অতএব, যে ব্যক্তি কার্যত তাদের কর্তব্য পালন করে মহান আল্লাহকে মান্য করে না, তার হৃদয় কখনও পবিত্র হতে পারে না।

অধিকন্তু, মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস প্রদর্শন করা কার্যত তাদের প্রমাণ এবং প্রমাণ যা বিচারের দিন জান্নাত লাভের জন্য প্রয়োজনীয়। এই বাস্তব প্রমাণ না থাকা ঠিক ততটাই বোকামি যতটা একজন ছাত্র তার শিক্ষকের কাছে একটি খালি পরীক্ষার খাতা ফেরত দিয়ে দাবি করে যে তার জ্ঞান তার মনে আছে তাই পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাকে তা লিখে রাখার প্রয়োজন নেই। ঠিক যেমন এই ছাত্র নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হবে, তেমনি যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি না হয়ে বিচারের দিনে পৌঁছাবে, তার হৃদয়ে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও।

পরিশেষে, এটা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ঈমান হলো একটি গাছের মতো যাকে ভালো কাজের মাধ্যমে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি গাছ যা সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, সে মারা যায়, ঠিক তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও মারা যেতে পারে যদি সে ভালো কাজের মাধ্যমে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। অতএব, যদি কেউ এই সম্ভাব্য পরিণতি এড়াতে চায়,

তাহলে তাকে ইসলামিক শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে ভালো কাজের মাধ্যমে তার ঈমানের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করতে হবে।

একটি উপায় আউট

যখন মহানবী (সাঃ) মাদিয়ানে হিজরতের জন্য তাঁর বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন, তখন তিনি পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাঁকে হত্যা করার জন্য তাঁর বাড়ির বাইরে অবস্থানরত খুনিদের দৃষ্টিশক্তি সাময়িকভাবে কেড়ে নিয়েছিলেন। তাদের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়, মহানবী (সাঃ) তাদের মাথায় মাটি ঢেলে চলে গিয়েছিলেন। খুনিরা কেবল তখনই বুঝতে পেরেছিল যে মহানবী (সাঃ) এলাকা ছেড়ে যাওয়ার পরে এবং একজন পথচারী যখন তাদের সাথে কী ঘটেছিল তখনই কী ঘটেছিল। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর এই অলৌকিক ঘটনা মুসলমানদের শিক্ষা দেয় যে, যখনই তারা কোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তখন তাদের উচিত আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া, এই বিশ্বাসে যে তিনি তাদের এ থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখাবেন, যদিও তা সেই সময়ে অসম্ভব বলে মনে হয়। ৬৫ অধ্যায় তালাক, আয়াত ২:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

একজন মুসলিমের বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটিই বেছে নেন, যদিও সমস্যার পেছনের হিকমত স্পষ্ট নয়। এটি একজন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া যা হয় আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে অথবা মহান

আল্লাহর ক্রোধের দিকে পরিচালিত করে। একজনকে কেবল তাদের নিজের জীবনের অসংখ্য উদাহরণের দিকে চিন্তা করতে হবে যেখানে তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু খারাপ ছিল কিন্তু পরে তাদের মন পরিবর্তন হয় এবং বিপরীতভাবে। এটি ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যখন একজন ডাক্তার দ্বারা নির্ধারিত তিক্ত ওষুধ গ্রহণ করেন। যদিও ওষুধটি তিক্ত হয় তবুও তারা এটি বিশ্বাস করে গ্রহণ করেন যে এটি তাদের উপকার করবে। এটা আশ্চর্যজনক যে একজন মুসলিম কীভাবে এমন একজন ডাক্তারকে বিশ্বাস করতে পারে যার জ্ঞান সীমিত এবং যিনি পুরোপুরি নিশ্চিত নন যে তিক্ত ওষুধ তাদের উপকার করবে এবং মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হন, যার জ্ঞান অসীম এবং যখন তিনি কেবল তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম নির্ধারণ করেন।

একজন মুসলিমের উচিত ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এবং মহান আল্লাহর উপর ভরসার মধ্যে পার্থক্য বোঝা। যে ব্যক্তি আল্লাহকে মান্য করে না এবং তারপর বিপদে সাহায্যের আশা করে, সে একজন ইচ্ছাকৃত চিন্তাবিদ। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাহায্য লাভ করবে, যা এই ঘটনায় ইঙ্গিত করা হয়েছে, সে হল সেই ব্যক্তি যে আন্তরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করে এবং তারপর অভিযোগ বা তাঁর পছন্দের উপর প্রশ্ন না তুলে তাঁর রায়ের উপর আস্থা রাখে।

ট্রাস্ট পরিশোধ করা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সাথে মদিনায় হিজরত করেন। তিনি আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ)-কে রেখে যান, মক্কাবাসীদের তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র, যা তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে জমা রেখেছিল, তা ফেরত দেওয়ার পর, তাকে মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন, কারণ তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার খ্যাতি ব্যাপকভাবে পরিচিত এবং গৃহীত হয়েছিল। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ)-এর জীবনী", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

অমুসলিমরা যখন তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেছিল, তখনও মহানবী (সা.) সততা ও সদাচরণ বজায় রেখে তাঁর উপর অর্পিত জিনিসপত্র ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এটি সকল পরিস্থিতিতে ইসলামের শিক্ষা মেনে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তি কখন একজন ভালো মুসলিমের মতো আচরণ করবে এবং কখন একজন অবিশ্বাসীর মতো আচরণ করবে তা বেছে নিতে পারে না। ইসলাম একটি সম্পূর্ণ আচরণবিধি যা একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে হবে। ইসলামকে এমন একটি পোশাকের মতো বিবেচনা করা যায় না যা কেউ তার ইচ্ছা অনুসারে পরতে এবং খুলতে পারে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে কেবল তাদের ইচ্ছার পূজা করছে, এমনকি তারা অন্যথা দাবি করলেও। অধ্যায় ২৫ আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

অতএব, একজন মুসলিম যদি সঠিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও উপাসনা করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই প্রতিটি পরিস্থিতিতে ইসলামের শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে হবে।

এছাড়াও, আলোচিত মূল ঘটনাটিও আমানত পূরণের গুরুত্ব নির্দেশ করে। সহীহ বুখারীতে ২৭৪৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকির একটি দিক।

এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ এবং মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত সকল আমানত। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি আমানত তাদের উপর অর্পণ করেছেন। এই আমানত পূরণের একমাত্র উপায় হল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমানতগুলো ব্যবহার করা। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা এবং রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আমানত পাবে, কারণ এটিই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"আর [স্মরণ করো] যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের [নেয়ামত] বৃদ্ধি করব..."

মানুষের মধ্যে আমানতও পালন করা গুরুত্বপূর্ণ। যার উপর অন্য কারো জিনিসপত্রের আমানত রাখা হয়েছে, তার উচিত সেগুলোর অপব্যবহার করা নয় এবং কেবল মালিকের ইচ্ছানুযায়ী সেগুলো ব্যবহার করা। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আমানতের মধ্যে একটি হল কথোপকথন গোপন রাখা, যদি না অন্যদের

জানানোর মাধ্যমে কিছু সুস্পষ্ট লাভ হয়। দুর্ভাগ্যবশত, মুসলমানদের মধ্যে এটি প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়। তাদের এবং মানুষের মধ্যে আমানতগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যেভাবে তারা চায় অন্যরা তাদের মধ্যে থাকা আমানতগুলির সাথে আচরণ করুক।

এছাড়াও, এই ট্রাস্টগুলির মধ্যে একজনের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যেমন নির্ভরশীল ব্যক্তিরা। একজন মুসলিমকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে এই ব্যক্তিদের অধিকার পূরণের মাধ্যমে এই ট্রাস্টগুলি পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতার উপর কর্তব্য হল তাদের সন্তানদের পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য শেখা, বোঝা এবং তার উপর আমল করতে উৎসাহিত করা।

স্বাধীনতার জন্য প্রচেষ্টা

আবু বকর (রাঃ) মহানবী (সাঃ)-এর সাথে হিজরতের জন্য দুটি উট কিনে প্রস্তুত করেছিলেন। যখন তিনি মহানবী (সাঃ)-কে দুটি উটের মধ্যে সেরাটি উপহার হিসেবে প্রদান করেন, তখন তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং পরিবর্তে আবু বকর (সাঃ)-এর কাছ থেকে উটটি কিনতে রাজি হন। সিরাত ইবনে হিশামের ৯৮ পৃষ্ঠায় এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটি স্বাধীন হওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ বুখারীতে ৬৪৭০ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদের কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাকে, তাকে স্বাধীনতা দান করা হবে। আর যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে ধৈর্য ধরার চেষ্টা করে, তাকে মহান আল্লাহ ধৈর্য দান করবেন। আর যে ব্যক্তি তার যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, তাকে স্বাবলম্বী করে তোলা হবে। তিনি উপসংহারে বলেছেন যে, ধৈর্যের চেয়ে বড় আর কোন দান নেই।

প্রয়োজনে অন্যের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ায় কোনও ক্ষতি নেই, তবে একজন মুসলিমের এই অভ্যাসে জড়িয়ে পড়া উচিত নয় কারণ এর ফলে আত্মসম্মান নষ্ট হতে পারে। এটি বিপজ্জনক হতে পারে কারণ যে ব্যক্তি আত্মসম্মান হারিয়ে ফেলে, সে পাপ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে কারণ সে আল্লাহ, মহান, এবং অন্যরা তাদের সম্পর্কে কী ভাববে তা পরোয়া করা বন্ধ করে দেয়। যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনে অন্যদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, সে আল্লাহ, মহান, তাদের সাহায্য করার জন্য বিশ্বাস করার পরিবর্তে অন্যদের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে শুরু করে।

আল্লাহর উপর আস্থা রাখার অর্থ হল, তাকে যে উপায়ে সাহায্য করা হয়েছে তা বৈধভাবে ব্যবহার করা এবং তারপর বিশ্বাস করা, যা একমাত্র আল্লাহ, মহান , শুধুমাত্র পছন্দ করেন, তা সকলের জন্যই মঙ্গলজনক হবে। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের সাহায্যের জন্য আবেদন করার আগে তাকে যে সমস্ত উপায়ে সাহায্য দেওয়া হয়েছে তা কাজে লাগানো। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে, তাকে আল্লাহ, মহান, মানুষের স্বাধীনতা দান করবেন।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই নিজের উপর ধৈর্য ধরতে হবে, বিশেষ করে কঠিন সময়ে। এটি অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হল ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি জানে যে, মহান আল্লাহ তাআলা অগণিত প্রতিদান দেবেন, তার ধৈর্যশীল মুসলিমের ধৈর্য ধরার সম্ভাবনা বেশি, যে ব্যক্তি এই সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ, তার চেয়ে। সূরা আয-যুমার, আয়াত ১০:

"...নিশ্চয়ই, ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান বিনা হিসাব [অর্থাৎ, সীমা] দেওয়া হবে।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রকৃত ধৈর্য্য কোনও পরিস্থিতির শুরুতেই দেখানো হয়, পরে নয়। যখন কেউ পরে ধৈর্য প্রদর্শন করে, তখন এটি গ্রহণযোগ্যতা, যা সবচেয়ে অধৈর্য ব্যক্তিও অনুভব করে।

প্রকৃত ধনী ব্যক্তি হলেন তিনি, যিনি অভাবী এবং লোভী নন। এটি তখনই ঘটে যখন কেউ মহান আল্লাহ তায়ালা যা দান করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে। এটি তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ সঠিকভাবে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা

তাঁর অসীম জ্ঞান অনুসারে প্রতিটি ব্যক্তিকে যা সর্বোত্তম তা দান করেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

এই ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে ধনী, অন্যদিকে যে ব্যক্তি সর্বদা লোভী এবং অভাবী, সে দরিদ্র, যদিও তার প্রচুর সম্পদ থাকে। সহীহ মুসলিমের ২৪২০ নম্বর হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে। অতএব, নিজের রিযিকে সন্তুষ্ট থাকাই প্রকৃত সম্পদ, অন্যদিকে আরও বেশি লাভের লোভ একজন অভাবীকে অর্থাত্ দরিদ্র করে তোলে।

পরিশেষে, ধৈর্য ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের প্রতিটি উপাদানের জন্য প্রয়োজনীয়। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। সহজ কথায়, ধৈর্য ছাড়া পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে সাফল্য সম্ভব নয়। অতএব, এটি মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত একটি দুর্দান্ত উপহার যারা এটি গ্রহণ করার চেষ্টা করে।

সত্যের প্রতি আনুগত্য

মদিনায় হিজরতের সময়, আবু বকর (রাঃ) কে একজন পথচারী জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে মহানবী (সাঃ) কে, কারণ তিনি তাঁকে চিনতে পারেননি। আবু বকর (রাঃ) তাঁকে সত্য বলতে চাননি, কারণ এই তথ্য মক্কার অমুসলিমদের কাছে পৌঁছেছিল, যারা তাদের পিছনে ছুটছিল, কিন্তু একই সাথে তিনি মিথ্যা বলতে চাননি, কারণ তিনি ছিলেন সততা ও সত্যবাদিতার শীর্ষ। আবু বকর (রাঃ) লোকটিকে বলেছিলেন যে মহানবী (সাঃ) কেবল তাঁর পথপ্রদর্শক। আবু বকর (রাঃ) বলতে এই পৃথিবীতে তাঁর পথপ্রদর্শক বোঝাতে চেয়েছিলেন, অন্যদিকে, লোকটি ধরে নিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর ভ্রমণের সময় তাঁর পথপ্রদর্শক ছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "আবু বকর আস সিদ্দীকের জীবনী", পৃষ্ঠা ১০৪-১০৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটা খুবই লজ্জার যে আজকাল মুসলমানরা কোন কারণ ছাড়াই মিথ্যা বলে, যদিও আবু বকর (রাঃ) মারাত্মক পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার পরেও সৎ ছিলেন।

মিথ্যা বলা অগ্রহণযোগ্য, তা সে ছোট মিথ্যা হোক, যাকে প্রায়শই সাদা মিথ্যা বলা হয় অথবা যখন কেউ রসিকতা করে মিথ্যা বলে। এই সকল ধরণের মিথ্যা নিষিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, তাই তাদের লক্ষ্য কাউকে প্রতারণা করা নয়, তাকে জামে আত তিরমিযী, ২৩১৫ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে তিনবার অভিশপ্ত করা হয়েছে।

আরেকটি জনপ্রিয় মিথ্যা কথা যা মানুষ প্রায়শই বলে যে এটি পাপ নয়, তা হল শিশুদের সাথে মিথ্যা বলা। সুনানে আবু দাউদের ৪৯৯১ নম্বরের হাদিস অনুসারে

এটি নিঃসন্দেহে একটি পাপ। শিশুদের সাথে মিথ্যা বলা স্পষ্ট বোকামি কারণ তারা কেবল সেই বড়দের কাছ থেকে এই পাপপূর্ণ অভ্যাসটি গ্রহণ করবে যারা তাদের সাথে মিথ্যা বলে। এইভাবে আচরণ করা শিশুদের দেখায় যে মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য, যখন ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তা গ্রহণযোগ্য নয়। খুব বিরল এবং চরম ক্ষেত্রেই মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য, উদাহরণস্বরূপ, একজন নির্দোষ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করার জন্য মিথ্যা বলা।

জামে আত তিরমিযী, ১৯৭১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটি গীবত এবং মানুষের সাথে উপহাসের মতো অন্যান্য পাপের দিকে পরিচালিত করে। এই আচরণ মানুষকে জাহান্নামের দরজায় নিয়ে যায়। যখন একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে থাকে, তখন তাকে আল্লাহ তাআলা একজন মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন। যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা একজন মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছেন, বিচারের দিন তার কী হবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না।

সকল মুসলিমই ফেরেশতাদের সান্নিধ্য কামনা করে, কিন্তু যখন কেউ মিথ্যা বলে, তখন তাকে তাদের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়। বস্তুত, মিথ্যাবাদীর মুখ থেকে যে দুর্গন্ধ বের হয়, তার কারণে ফেরেশতারা তাদের থেকে এক মাইল দূরে সরে যায়। জামে আত তিরমিযী, ১৯৭২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি প্রমাণিত হয়েছে।

মিথ্যা বলা যা সমাজের অন্যদের কাছে ছড়িয়ে পড়ে তা এতটাই গুরুতর পাপ যে সহীহ বুখারীতে ৭০৪৭ নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে, যদি কেউ এটি করে এবং তওবা না করে তবে তাকে মৃত্যুর পর এমন শাস্তি দেওয়া হবে যে তার মুখে লোহার হুক পরিয়ে দেওয়া হবে এবং তার মুখের চামড়া ছিঁড়ে ফেলা হবে। তার মুখ

তাৎক্ষণিকভাবে পুনরুজ্জীবিত হবে এবং তারপর এই প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি হবে। কিয়ামত পর্যন্ত এটি ক্রমাগত ঘটবে।

পরিশেষে, সকল মুসলমানের উচিত সকল প্রকার মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা, তারা কার সাথেই কথা বলছে না কেন।

সত্য ভালবাসা

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সাথে মদিনায় হিজরত করেন। তাদের যাত্রার সময় আবু বকর (রাঃ) প্রথমে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সামনে দাঁড়াতেন এবং কখনও কখনও তাঁর পিছনে দাঁড়াতেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন তাঁকে তাঁর আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন, তখন তিনি উত্তর দিতেন যে, যখনই তিনি ভয় পেতেন যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে পিছন থেকে আক্রমণ করা হবে, তখন তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পিছনে দাঁড়াতেন। কিন্তু তারপর তিনি ভয় পেতেন যে সম্মুখ আক্রমণ তাকে অবস্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য করবে। অবশেষে তারা কয়েকদিনের জন্য সাওর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন। গুহায় প্রবেশের আগে, আবু বকর (রাঃ) গুহা থেকে ক্ষতিকারক জিনিস পরিষ্কার এবং অপসারণ করার জন্য প্রথমে প্রবেশ করার জন্য জোর দিয়েছিলেন। এমনকি তিনি গুহার ভেতরের একটি ফাটলের উপর তার পা রেখেছিলেন এই ভয়ে যে, কোন প্রাণী সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ক্ষতি করতে পারে। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

প্রতিটি মুসলিম খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করে যে তারা পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), অন্যান্য নবীগণ, সাহাবীগণ এবং সাহাবীগণের সাহচর্য কামনা করে। তারা প্রায়শই সহীহ বুখারীতে ৩৬৮৮ নম্বর হাদিসটি উদ্ধৃত করে, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে একজন ব্যক্তি পরকালে যাদের ভালোবাসে তাদের সাথেই থাকবে। এবং এই কারণে তারা খোলাখুলিভাবে আল্লাহর এই নেক বান্দাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা ঘোষণা করে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তারা কীভাবে এই পরিণতি কামনা করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসার দাবি করে, অথচ তারা তাঁকে খুব কমই চেনে কারণ তারা তাঁর জীবন, চরিত্র এবং শিক্ষা অধ্যয়ন করতে ব্যস্ত। এটা বোকামি কারণ একজন ব্যক্তি কীভাবে সত্যিকার অর্থে এমন কাউকে ভালোবাসতে পারে যাকে তারা চেনেই না?

তাছাড়া, যখন এই লোকদের কাছে মহানবী (সাঃ) এর প্রতি তাদের ভালোবাসার প্রমাণ চাওয়া হবে, তখন বিচার দিবসে তারা কী বলবে? তারা কী উপস্থাপন করবে? এই ঘোষণার প্রমাণ হলো মহানবী (সাঃ) এর জীবন, চরিত্র এবং শিক্ষা অধ্যয়ন করা এবং তার উপর আমল করা। এই প্রমাণ ছাড়া কোন ঘোষণা মহান আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। এটি বেশ স্পষ্ট কারণ সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, তাদের চেয়ে ইসলামকে আর কেউ ভালোভাবে বুঝতে পারেনি এবং এটি তাদের মনোভাব ছিল না। তারা মহানবী (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা ঘোষণা করেছিলেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কর্মের মাধ্যমে তাদের দাবিকে সমর্থন করেছিলেন। এই কারণেই তারা পরকালে তাঁর সাথে থাকবেন।

যারা বিশ্বাস করে যে ভালোবাসা হৃদয়ে থাকে এবং কাজে তা প্রকাশের প্রয়োজন হয় না, তারা সেই ছাত্রের মতোই বোকা, যে তার শিক্ষকের কাছে খালি পরীক্ষার খাতা ফেরত দিয়ে দাবি করে যে জ্ঞান তার মনে আছে তাই তাকে বাস্তবে তা কাগজে লিখে রাখার প্রয়োজন নেই এবং তারপরও সে পাস করার আশা করে।

যে ব্যক্তি এমন আচরণ করে, সে আল্লাহর নেক বান্দাদের ভালোবাসে না, কেবল তাদের নিজেদের কামনা-বাসনাকেই ভালোবাসে এবং নিঃসন্দেহে শয়তান তাদের বোকা বানিয়েছে।

পরিশেষে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যান্য ধর্মের সদস্যরাও তাদের পবিত্র নবীদের প্রতি ভালোবাসার দাবি করে, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। কিন্তু যেহেতু তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে এবং তাদের শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই বিচারের দিনে তারা অবশ্যই তাদের সাথে থাকবে না। এই সত্যটি যদি কেউ একবার চিন্তা করে দেখে তবে এটি বেশ স্পষ্ট।

সেরা সঙ্গী

যখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) মদিনায় হিজরতের সময় সাওর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন, তখন মক্কার অমুসলিমরা তাদের তাড়া করে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যা করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। মক্কার অমুসলিমরা অবশেষে সেই গুহায় পৌঁছে যায় যেখানে তারা লুকিয়ে ছিল। আবু বকর (রাঃ) লক্ষ্য করেন যে, অমুসলিমরা যদি তাদের পায়ের দিকে খুব বেশি তাকায়, তাহলে তারা তাকে এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উভয়কেই গুহায় লুকিয়ে থাকতে দেখবে। আবু বকর (রাঃ) স্পষ্ট করে বলেন যে তিনি নিজের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত নন, বরং তিনি ভীত ছিলেন যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে কিছু ঘটতে পারে। এই কথা শুনে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে উপদেশ দেন যে, তিনি শোক করবেন না কারণ আল্লাহ তাদের তৃতীয় সাহাবী। সহীহ বুখারী, ৩৯২২ নম্বরে এবং ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫৯-১৬০-এ প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় ৯, আত তাওবাহ, আয়াত ৪০:

"... যখন তারা গুহায় ছিল এবং তিনি [অর্থাৎ, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তার সঙ্গীকে বললেন, "চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"..."

সহীহ বুখারীতে ৭৪০৫ নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহান আল্লাহ উপদেশ দেন যে, যে ব্যক্তি তাঁকে স্মরণ করে, তিনি তাদের সাথেই থাকেন।

মানসিক সমস্যা এবং ব্যাধি, যেমন বিষণ্ণতা, বৃদ্ধির সাথে সাথে, মুসলমানদের জন্য এই ঘোষণার গুরুত্ব বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন ব্যক্তি যখন সর্বদা

এমন কাউকে ঘিরে থাকেন এবং তাকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসেন, তখন তার মানসিক সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। যদি এটি একজন ব্যক্তির জন্য সত্য হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে এটি মহান আল্লাহর জন্য আরও উপযুক্ত, যিনি তাঁর স্মরণকারীর সাথে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শুধুমাত্র এই ঘোষণার উপর আমল করলেই হতাশার মতো মানসিক সমস্যা দূর হবে। এই কারণেই অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা বা অন্যদের মধ্যে থাকা ধার্মিক পূর্বসূরীদের মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলেনি কারণ তারা সর্বদা মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে ছিলেন। এটা স্পষ্ট যে যখন কেউ মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে, তখন তারা সমস্ত বাধা এবং অসুবিধা সফলভাবে অতিক্রম করে, যতক্ষণ না তারা পরকালে তাঁর নৈকট্য অর্জন করে।

অধিকন্তু, তাঁর অসীম করুণার কারণে, মহান আল্লাহ এই ঘোষণাকে কোনওভাবেই সীমাবদ্ধ করেননি। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ঘোষণা করেননি যে তিনি কেবল সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন অথবা যারা নির্দিষ্ট সৎকর্ম করে তাদের সাথেই আছেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি প্রতিটি মুসলিমকে তাদের ঈমানের শক্তি বা তারা যতই পাপ করুক না কেন, বেষ্টন করেছেন। অতএব, একজন মুসলিমের কখনই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তবে এই হাদিসে উল্লেখিত শর্তটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, মহান আল্লাহকে স্মরণ করা। এই স্মরণের মধ্যে নিজের নিয়ত সংশোধন করা অন্তর্ভুক্ত যাতে তারা কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে এবং তাই মানুষের কাছ থেকে কোনও কৃতজ্ঞতা আশা বা আশা না করে। জিহ্বা দিয়ে স্মরণের মধ্যে রয়েছে ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা। এবং স্মরণের সর্বোচ্চ স্তর হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। এটিই মহান আল্লাহর প্রকৃত স্মরণ। যে ব্যক্তি এই ধরণের আচরণ করবে, সে মহান আল্লাহর সাহচর্য এবং সাহায্য লাভ করবে।

সহজ কথায়, যে ব্যক্তি যত বেশি আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে, তত বেশি সে তার সাহচর্য পাবে। যে যা দান করবে, তাই সে পাবে।

সঠিকভাবে বিশ্বাস করা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হিজরত প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার অর্থ হলো, আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত উপায়-উপকরণ সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং তারপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ যা সিদ্ধান্ত নেন, তা সকলের জন্যই মঙ্গলজনক।

জামে আত তিরমিযীতে ২৩৪৪ নম্বর হাদিসে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যদি মানুষ সত্যিই মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে, তাহলে তিনি তাদের রিজিক দেবেন ঠিক যেমন তিনি পাখিদের রিজিক দেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় তাদের বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় তৃপ্ত হয়ে ফিরে আসে।

মহান আল্লাহর উপর প্রকৃত ভরসা করা এমন একটি বিষয় যা হৃদয়ে অনুভূত হয় কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, অর্থাৎ, যখন কেউ আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। ৬৫তম অধ্যায় তালাক, আয়াত ৩:

"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে - তার জন্য তিনিই যথেষ্ট..."

আস্থার যে দিকটি অভ্যন্তরীণ, তা হলো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, একমাত্র মহান আল্লাহই মানুষকে উপকারী জিনিস সরবরাহ করতে পারেন এবং পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর জিনিস থেকে রক্ষা করতে পারেন। একজন মুসলিম বোঝে যে, দান, প্রতিরোধ, ক্ষতি বা উপকারের উৎস আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন। একজন মুসলিম সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে, তার জীবনে যা কিছু ঘটে, যা একমাত্র আল্লাহই নির্ধারণ করেন, তা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই সর্বোত্তম, এমনকি যদি তা তাদের এবং অন্যদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। ২য় সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর উপর সত্যিকার অর্থে ভরসা করার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তাআলা যে উপায়-উপকরণ, যেমন ঔষধ, ব্যবহার করা ছেড়ে দিতে হবে। আলোচ্য প্রধান হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাখিরা তাদের বাসা থেকে বেরিয়ে জীবিকার সন্ধানে সক্রিয়ভাবে বেরিয়ে পড়ে। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, যখন কেউ মহান আল্লাহর প্রদত্ত শক্তি এবং উপায় ব্যবহার করে, তখন তারা নিঃসন্দেহে তাঁর আনুগত্য করছে এবং তাঁর উপর নির্ভর করছে। এটি আসলে, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার বাহ্যিক উপাদান। এটি অনেক আয়াত এবং হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। সূরা ৪ আন-নিসা, আয়াত ৭১:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করো..."

বাস্তবে, বাহ্যিক কার্যকলাপ হলো মহানবী (সাঃ)-এর একটি ঐতিহ্য, আর মহান আল্লাহর উপর আভ্যন্তরীণভাবে আস্থা রাখা হলো মহানবী (সাঃ)-এর আভ্যন্তরীণ অবস্থা। বাহ্যিক ঐতিহ্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়, যদিও তাদের আভ্যন্তরীণ আস্থা থাকে।

আল্লাহ তাআলার দেওয়া উপায় ব্যবহার এবং কর্মকাণ্ড তাঁর উপর ভরসা করার একটি দিক। এই ক্ষেত্রে, কর্মকাণ্ডকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের আনুগত্যের সেইসব কর্মকাণ্ড করতে বলেছেন যাতে তারা উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারে। এই কর্মকাণ্ড ত্যাগ করে এই বিশ্বাস দাবী করা যে, আল্লাহ তাআলা শান্তি ও সাফল্য দান করবেন, কেবল আকাঙ্ক্ষা এবং ইসলামে এর কোন মূল্য নেই।

দ্বিতীয় ধরণের কাজ হলো সেইসব উপায় যা আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীতে মানুষ নিরাপদে বসবাসের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেমন ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাওয়া, তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পান করা এবং ঠান্ডা আবহাওয়ায় গরম পোশাক পরা। যে ব্যক্তি এগুলো পরিত্যাগ করে নিজের ক্ষতি করে সে দোষী। তবে, এমন কিছু লোক আছে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ শক্তি দান করেছেন, যাতে তারা নিজেদের ক্ষতি না করে এই উপায়গুলো এড়িয়ে চলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দিনের পর দিন রোজা রাখতেন কিন্তু অন্যদেরও তা করতে নিষেধ করতেন, যেমন আল্লাহ তাআলা তাকে সরাসরি খাবারের প্রয়োজন ছাড়াই সরবরাহ করতেন। সহীহ বুখারী, ১৯২২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) চতুর্থ সঠিক পথপ্রাপ্ত খলিফা আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ)-এর জন্য দোয়া করেছিলেন, যাতে তিনি অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরম অনুভব না করেন। সুনানে ইবনে মাজাহের ১১৭ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি এই উপায়গুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কিন্তু আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ না হয়ে ধৈর্য ধারণের শক্তি পায়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় এটি নিন্দনীয়।

আল্লাহর উপর ভরসা করার ক্ষেত্রে তৃতীয় ধরণের কাজ হল সেইসব কাজ যা একটি প্রচলিত রীতি হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে যা আল্লাহ তাআলা কখনও কখনও নির্দিষ্ট কিছু মানুষের জন্য ভেঙে দেন। এর একটি উদাহরণ হল সেইসব মানুষ যারা চিকিৎসার প্রয়োজন ছাড়াই রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে। এটি বেশ সাধারণ, বিশেষ করে দরিদ্র দেশগুলিতে যেখানে চিকিৎসা পাওয়া কঠিন। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, ২১৪৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসের সাথে সম্পর্কিত, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যাবে না যতক্ষণ না সে তার জন্য বরাদ্দকৃত রিযিকের প্রতিটি আউন্স ব্যবহার করে, যা সহীহ মুসলিম, ৬৭৪৮ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিস অনুসারে, আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে ছিল। তাই যে ব্যক্তি এই হাদিসটি সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করে, সে হয়তো সক্রিয়ভাবে রিযিকের সন্ধান করবে না, কারণ সে জানে যে এতদিন আগে তাদের জন্য যা বরাদ্দ করা হয়েছিল তা মিস করা যাবে না। তাই এই ব্যক্তির জন্য রিযিক পাওয়ার প্রচলিত উপায়, যেমন চাকরির মাধ্যমে তা পাওয়া, আল্লাহ তাআলা তা ভেঙে দেন। এটি একটি উচ্চ এবং বিরল পদমর্যাদা। যে ব্যক্তি অভিযোগ, আতঙ্ক বা মানুষের কাছ থেকে কিছু আশা না করে এই ধরণের আচরণ করতে পারে, কেবল সে যদি এই পথ বেছে নেয়, তাহলে সে দোষমুক্ত হবে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদের ১৬৯২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তির জন্য তাদের নির্ভরশীলদের ভরণপোষণে ব্যর্থ হওয়া পাপ, যদিও তারা এত উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী হোক না কেন।

যদিও এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, যে উপায়-উপকরণ প্রদত্ত হয়েছে তা ব্যবহার করা, সেগুলো পরিত্যাগ করার চেয়ে অনেক ভালো, কারণ মহানবী (সা.)-এর পথের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"বলুন, [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন...""

মহান আল্লাহর উপর প্রকৃত আস্থা রাখা ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকার দিকে পরিচালিত করে। অর্থাত্, মহান আল্লাহ যা কিছু পছন্দ করেন, তারা কোনও অভিযোগ ছাড়াই এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই তা গ্রহণ করে, কারণ তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে মহান আল্লাহ কেবল তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটিই বেছে নেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

পরিশেষে, মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করাই সর্বোত্তম, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত বৈধ উপায় ব্যবহার করে, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং অভ্যন্তরীণভাবে বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ যা নির্ধারণ করেন তা কেবল ঘটবে, যা নিঃসন্দেহে জড়িত প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম পছন্দ, তারা এটি পর্যবেক্ষণ করুক বা না করুক।

সেরা স্থান

মদিনায় প্রবেশের আগে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) দশ দিন কুবায় অবস্থান করেছিলেন যেখানে তিনি ইসলামের প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, যাকে মসজিদ হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা সূরা তওবার ৯ম আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"...প্রথম দিন থেকেই যে মসজিদটি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত, সেটাই তোমার দাঁড়ানোর যোগ্য। সেখানে এমন লোক আছে যারা পবিত্র থাকতে ভালোবাসে; আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।"

সহীহ বুখারী, ৩৯০৬ নং-এ প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ১৫২৮ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো মসজিদ এবং তাঁর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হলো বাজার।

ইসলাম মুসলমানদের মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও যেতে নিষেধ করে না, এমনকি তাদের সর্বদা মসজিদে বসবাস করার নির্দেশও দেয় না। তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা বাজার এবং অন্যান্য স্থানে অপ্রয়োজনীয়ভাবে যাওয়ার চেয়ে জামাতে নামাজ এবং ধর্মীয় সমাবেশে যোগদানের জন্য মসজিদে যাওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়।

যখন কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন অন্য জায়গায়, যেমন শপিং সেন্টারে যাওয়া কোন ক্ষতি নেই, তবে একজন মুসলিমের উচিত অপ্রয়োজনে সেখানে যাওয়া এড়িয়ে চলা, কারণ সেখানে পাপের ঘটনা বেশি ঘটে। যখনই তারা অন্য জায়গায় যায়, তখন তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা যেন মহান আল্লাহর অবাধ্যতা না করে, যার মধ্যে অন্যদের প্রতি অন্যায় করাও অন্তর্ভুক্ত। তাদের অতিরঞ্জিত মেলামেশা এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এটিই সমাজে সংঘটিত বেশিরভাগ পাপের কারণ।

মসজিদগুলিকে পাপ থেকে মুক্তির জন্য এবং মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের জন্য একটি আরামদায়ক স্থান হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। যেমন একজন ছাত্র একটি গ্রন্থাগার থেকে উপকৃত হয়, যেমন এটি অধ্যয়নের জন্য তৈরি একটি পরিবেশ, তেমনি মুসলমানরা মসজিদ থেকে উপকৃত হতে পারে, কারণ এর মূল উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে কার্যকর জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করতে উৎসাহিত করা যাতে তারা সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করতে পারে।

মসজিদগুলি তাদের উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যও একটি চমৎকার স্থান, যা হল মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে। মসজিদগুলি তাদের কার্যকলাপকে সঠিকভাবে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্যও উৎসাহিত করে, যাতে তারা তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করতে পারে, পরকালের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে পারে এবং পরিমিতভাবে বৈধ আনন্দ উপভোগ করতে পারে। যে ব্যক্তি মসজিদ এড়িয়ে চলে সে প্রায়শই তাদের সময় এবং সম্পদকে নিরর্থক এবং

অর্থহীন কাজে নষ্ট করে এবং ফলস্বরূপ তারা উভয় জগতেই লাভবান হতে হারাবে।

একজন মুসলিমের উচিত কেবল অন্যান্য স্থানের চেয়ে মসজিদকে অগ্রাধিকার দেওয়া নয়, বরং অন্যদের, যেমন তাদের সন্তানদেরকেও একই কাজ করতে উৎসাহিত করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, এটি যুবকদের জন্য পাপ, অপরাধ এবং খারাপ সঙ্গ এড়াতে একটি চমৎকার জায়গা, যা উভয় জগতে ঝামেলা এবং অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।

মদিনার বরকতময় জীবন

মাইগ্রেশনের পর প্রথম বছর

মদিনায় মসজিদে নববী নির্মাণ

একটি সুন্দর উত্তরাধিকার

যখন মহানবী (সাঃ) মদিনায় আগমন করেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন তা হলো আল্লাহর ঘর, মসজিদে নববী নির্মাণ করা। জমিটি ছিল দুই এতিম ছেলে, সুহাইল এবং সাহল (রাঃ) এর, যারা বিনামূল্যে জমিটি প্রদান করেছিলেন কিন্তু মহানবী (সাঃ) তা বিনামূল্যে নিতে অস্বীকৃতি জানান এবং তাদের কাছ থেকে এটি কিনে নেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীজীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬৫-১৬৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, পার্থিব উত্তরাধিকার আসে এবং যায় তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। কত ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন যাতে তাদের মৃত্যুর পরপরই সেগুলো ভেঙে ফেলা হয় এবং ভুলে যাওয়া হয়? এই উত্তরাধিকারগুলির কিছু থেকে যে কয়েকটি নিদর্শন রেখে গেছে তা কেবল মানুষকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করার জন্যই টিকে আছে। এর একটি উদাহরণ

হল ফেরাউনের মহান সাম্রাজ্য। ইসলাম মুসলমানদের কেবল সৎকর্মের মাধ্যমে পরকালের জন্য আশীর্বাদ পাঠাতে শেখায় না বরং এটি তাদের এমন একটি সুন্দর উত্তরাধিকার রেখে যেতেও শেখায় যা থেকে মানুষ উপকৃত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, যখন একজন মুসলিম মারা যায় এবং এমন কিছু রেখে যায় যা কার্যকর, যেমন জলের কূপের আকারে চলমান দান, তখন তারা এর জন্য পুরস্কৃত হবে। সহিহ মুসলিমের ৪২২৩ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই একজন মুসলিমের উচিত সৎকর্ম করার চেষ্টা করা এবং যতটা সম্ভব ভালো কাজ পাঠানোর চেষ্টা করা, তবে তাদের এমন একটি ভালো উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত যা তাদের মৃত্যুর পরে তাদের উপকার করবে।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম তাদের সম্পদ এবং সম্পত্তি নিয়ে এতটাই চিন্তিত যে তারা কেবল সেগুলো রেখে যায় যা তাদের মোটেও উপকারে আসে না। প্রতিটি মুসলিমের এই বোকা বানানো উচিত নয় যে তাদের নিজেদের জন্য একটি উত্তরাধিকার তৈরি করার জন্য প্রচুর সময় আছে কারণ মৃত্যুর মুহূর্ত অজানা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আজ সেই দিন যখন একজন মুসলিমের তাদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার সম্পর্কে সত্যিকার অর্থে চিন্তা করা উচিত। যদি এই উত্তরাধিকার ভালো এবং কল্যাণকর হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত যে তিনি তাদেরকে তা করার শক্তি দিয়েছেন। কিন্তু যদি এটি এমন কিছু হয় যা তাদের উপকারে আসবে না, তবে তাদের এমন কিছু প্রস্তুত করা উচিত যাতে তারা কেবল পরকালেই কল্যাণ প্রেরণ না করে বরং কল্যাণ রেখে যায়। আশা করা যায় যে এইভাবে যে ব্যক্তি কল্যাণ দ্বারা বেষ্টিত, তাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। তাই প্রতিটি মুসলিমের নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে তাদের উত্তরাধিকার কী?

উদাহরণ দ্বারা পরিচালিত

মহান আল্লাহর ঘর মসজিদে নববী নির্মাণের সময়, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর নির্মাণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে। মসজিদ নির্মাণের সময়, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উচ্চারণ করতেন, "হে আল্লাহ, পরকালের কল্যাণ ছাড়া আর কোন কল্যাণ নেই; সাহায্যকারী এবং মুহাজিরদের সাহায্য করুন!" সুনান আবু দাউদের ৪৫৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য মূল ঘটনাটি উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। সকল মুসলমানের জন্য, বিশেষ করে পিতামাতার জন্য, তারা অন্যদের যা পরামর্শ দেয় তা মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ। এটা স্পষ্ট। যদি কেউ ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখে যারা তাদের প্রচারিত কথা অনুসারে কাজ করেছিল অন্যদের উপর অনেক বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল যারা আদর্শের দ্বারা নেতৃত্ব দেননি তাদের তুলনায় । সর্বোত্তম উদাহরণ হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর, যিনি কেবল তাঁর প্রচারিত শিক্ষাই পালন করেননি বরং অন্য যে কারো চেয়ে কঠোরভাবে সেই শিক্ষাগুলো মেনে চলেন । শুধুমাত্র এই মনোভাবই মুসলিমদের, বিশেষ করে পিতামাতাদের, অন্যদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মা তার সন্তানদের মিথ্যা না বলার জন্য সতর্ক করেন কারণ এটি একটি পাপ কিন্তু প্রায়শই তাদের সামনেই থাকে, তার সন্তানদের সম্ভাবনা কম তার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা। একজন ব্যক্তির কাজ অন্যদের উপর তাদের কথার চেয়ে সবসময় বেশি প্রভাব ফেলবে । এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে একজনকে নিখুঁত হতে হবে । এর অর্থ হল তাদের আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা উচিত নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে। পবিত্র কুরআন নিম্নলিখিত আয়াতে স্পষ্ট করে বলেছে যে, মহান আল্লাহ এই আচরণকে ঘৃণা

করেন। প্রকৃতপক্ষে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহিহ বুখারীতে ৩২৬৭ নম্বর হাদিসে সতর্ক করে বলেছেন যে, একজন ব্যক্তি যারা সৎকাজের আদেশ দিত কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকত এবং মন্দ কাজ নিষিদ্ধ করেছেন তবুও তারা নিজেরাই এটিতে অভিনয় করেছে কঠোর জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। ৬১ সূরা আস সাফ, আয়াত ৩:

"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য বিষয় হলো তোমরা এমন কথা বলো যা তোমরা করো না।"

তাই সকল মুসলমানের জন্য তাদের উপদেশ অনুসারে নিজেরা কাজ করার চেষ্টা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারপর অন্যদের উপদেশ দিন একই কাজ করা। উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেওয়া হল ঐতিহ্য সকল পবিত্র নবীদের মধ্যে, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, এবং এটি অন্যদের ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার সর্বোত্তম উপায়।

এছাড়াও, মসজিদ নির্মাণের সময় মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) যে দোয়া করেছিলেন তা ইঙ্গিত দেয় যে, কেউ যখন তাদের পার্থিব আশীর্বাদকে আখেরাতের সাথে সংযুক্ত করবে তখনই কেবল উভয় জগতেই কল্যাণ অর্জন করবে।

বাস্তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই বস্তুজগতের কোন কিছুই নিজের মধ্যে ভালো বা খারাপ নয়, যেমন সম্পদ। কোন জিনিসকে ভালো বা খারাপ করে তোলে তা হল এটি কীভাবে ব্যবহার করা হয়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের শিক্ষা অনুসারে এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা। যখন কোন কিছু সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না তখন বাস্তবে তা

অকেজো হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, সম্পদ উভয় জগতেই কার্যকর যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় যেমন একজন ব্যক্তির এবং তার উপর নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা। কিন্তু যদি এটি সঠিকভাবে ব্যবহার না করা হয়, যেমন মজুদ করা বা পাপপূর্ণ জিনিসে ব্যয় করা হয় তবে এটি অকেজো হয়ে যেতে পারে এবং এমনকি এর ধারকদের জন্য অভিশাপও হতে পারে। কেবল সম্পদ মজুদ করার ফলে সম্পদের মূল্য হ্রাস পায়। মজুদ করা কাগজ এবং ধাতব মুদ্রা কীভাবে কার্যকর হতে পারে? এই ক্ষেত্রে, একটি খালি কাগজ এবং টাকার নোটের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এটি কেবল তখনই কার্যকর যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়।

তাই যদি কোন মুসলিম চায় যে তার সমস্ত পার্থিব সম্পদ উভয় জগতের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠুক, তাহলে তাকে কেবল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু যদি তারা ভুলভাবে ব্যবহার করে, তাহলে একই আশীর্বাদ উভয় জগতের জন্য তাদের জন্য বোঝা এবং অভিশাপে পরিণত হবে। এটা এতটাই সহজ যে।

এই আশীর্বাদগুলির উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেই কেউ সঠিক মনোভাব গ্রহণ করতে পারে।

একজন মুসলিমের কাছে থাকা প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদই কেবল একটি উপায় যা তাকে পরকালে নিরাপদে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। এটি নিজেই কোন লক্ষ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, সম্পদ হল এমন একটি উপায় যা একজন ব্যক্তির আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাদের এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করে, আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য ব্যবহার করা উচিত। এটি নিজেই কোন লক্ষ্য বা চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়।

এটি কেবল একজন মুসলিমকে আখেরাতের প্রতি মনোযোগ বজায় রাখতে সাহায্য করে না, বরং যখন তারা পার্থিব আশীর্বাদ হারায় তখনও এটি তাদের সাহায্য করে। যখন একজন মুসলিম প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদ, যেমন একটি শিশু, আল্লাহকে খুশি করার এবং পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর উপায় হিসাবে বিবেচনা করে, তখন এটি হারানো তাদের উপর তেমন ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলবে না। তারা দুঃখিত হতে পারে, যা একটি গ্রহণযোগ্য আবেগ, কিন্তু তারা দুঃখিত হবে না যা অধৈর্যতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করে, যেমন বিষণ্নতা। কারণ তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের কাছে থাকা পার্থিব আশীর্বাদ কেবল একটি উপায় ছিল তাই এটি হারানোর ফলে চূড়ান্ত লক্ষ্য, অর্থাৎ জান্নাত, ক্ষতি হয় না, যার ক্ষতি বিপর্যয়কর। অতএব, চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন এবং তার উপর মনোনিবেশ করা তাদের শোক করা থেকে বিরত রাখবে।

অধিকন্তু, তারা বুঝতে পারবে যে, তারা যে জিনিসটি হারিয়েছে তা যেমন কেবল একটি উপায় ছিল, তেমনি তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর এবং তা পূরণ করার জন্য তাদের আরেকটি উপায় প্রদান করবেন। এটি তাদের শোক করা থেকেও বিরত রাখবে। অন্যদিকে, যারা বিশ্বাস করে যে তাদের পার্থিব আশীর্বাদই উপায় নয় বরং লক্ষ্য, তারা এটি হারানোর সময় তীব্র শোক অনুভব করবে কারণ তাদের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য হারিয়ে গেছে। এই শোক হতাশা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে।

মুসলমানদের উচিত তাদের প্রতিটি আশীর্বাদকে পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর উপায় হিসেবে বিবেচনা করা, কেবল একটি লক্ষ্য হিসেবে নয়। এভাবেই কেউ জিনিসপত্রের অধিকারী হতে পারে, সেগুলোর দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়েও। এভাবেই তারা পার্থিব জিনিসপত্র তাদের হাতে রাখতে পারে, হৃদয়ে নয়।

পরিশেষে, যে ব্যক্তি সঠিক মনোভাব গ্রহণ করে, সে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেবে এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেবে। এটি উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎ কর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষকে উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য নিখুঁত আচরণবিধি প্রদানের জ্ঞান এবং দূরদর্শিতা প্রদানের অধিকারী। মানুষের তৈরি আচরণবিধি এই ফলাফল অর্জন করতে পারে না কারণ তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং তাদের মধ্যে বিদ্যমান পক্ষপাতের কারণে। অতএব, একজন ব্যক্তির অবশ্যই ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে, এমনকি যদি তা তার আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয়। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাস নির্ধারিত থাকে। ঠিক যেমন এই রোগী সুস্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তার উপর আমল করেন তিনি উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করবেন।

ঈর্ষার প্রভাব

যখন মহানবী (সাঃ) মদিনায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি মদিনার একজন সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের বাড়ির পাশ দিয়ে যান, যিনি পরবর্তীতে মুনাফিকদের সর্দার হয়ে ওঠেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তার কাছ থেকে আমন্ত্রণ আশা করেছিলেন কিন্তু আবদুল্লাহ বিন উবাই তাকে অভদ্রভাবে মদিনায় আমন্ত্রণ জানানো লোকদের সাথে থাকতে বলেন। সা'দ বিন উবাদা (রাঃ) আবদুল্লাহর আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়ে মন্তব্য করেন এবং মন্তব্য করেন যে মদিনায় আসার আগে তারা আবদুল্লাহকে তাদের রাজা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ইবনে কাথিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৮০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

হিংসা একটি মহাপাপ যা যেকোনো মূল্যে এড়িয়ে চলতে হবে। এটি একটি মহাপাপ কারণ হিংসুক সরাসরি আল্লাহর পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করে। তারা এমন আচরণ করে যেন আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে একটি বিশেষ আশীর্বাদ প্রদান করে ভুল করেছেন। যে ব্যক্তি তাদের হিংসাকে তাদের ঈর্ষা করা ব্যক্তির বিরুদ্ধে মৌখিক ও শারীরিকভাবে লড়াই করতে দেয়, সে কেবল তাদের নিজস্ব সৎকর্মই ধ্বংস করবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪২১০ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। বৈধ হিংসা হল যখন কেউ অন্য কারো অনুরূপ আশীর্বাদ পেতে চায়, যাতে অন্য কেউ তার প্রদত্ত জিনিসটি না হারায়। যদিও এই ধরণের হিংসা বৈধ, তবুও এটি কেবল ধর্মীয় বিষয়ে প্রশংসনীয় এবং পার্থিব বিষয়ে নিন্দনীয়। উদাহরণস্বরূপ, সহিহ মুসলিম, ১৮৯৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দুটি বৈধ ও প্রশংসনীয় ঈর্ষার পরামর্শ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি তাদের জ্ঞান সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যদের তা শেখায়, তাকে ঈর্ষা করা যেতে পারে। অন্য যে ব্যক্তিকে ঈর্ষা করা যেতে পারে সে হল সেই ব্যক্তি যে হালাল সম্পদ অর্জন করে এবং তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে।

হিংসা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি একটি মহাপাপ যা মহান আল্লাহর বণ্টনের পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করে। তাদের বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার জন্য যা সর্বোত্তম তাই দান করেন। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, অন্যদের প্রতি ঈর্ষা করার পরিবর্তে, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যেমন পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এটি উভয় জগতে আরও আশীর্বাদ, মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"...যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাদের [অনুগ্রহে] বৃদ্ধি করব..."

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অন্যদিকে, অন্যদের হিংসা করলে কেবল মহান আল্লাহর আনুগত্য ভুলে যেতে হবে, যা উভয় জগতেই বিপদ ডেকে আনবে। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

যে মুসলিমের উপর ঈর্ষা করা হয় তাকে অবশ্যই তার ঈর্ষাকারীর মৌখিক ও শারীরিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ধৈর্য ধরতে হবে এবং কেবল ইসলামের সীমানার মধ্যেই আত্মরক্ষা করতে হবে। ধৈর্যের অর্থ হলো নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা, যার অর্থ হলো পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত নিয়ামতগুলো ব্যবহার করা। এভাবেই একজন ব্যক্তি তার ঈর্ষাকারী থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। সূরা ১১৩ আল ফালাক, আয়াত ১ এবং ৫:

"বলুন, "আমি প্রভাতের প্রভুর আশ্রয় প্রার্থনা করছি...এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"

তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে তাদের হিংসুকদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়, কারণ মহান আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে কাজ করেন, মানুষের সীমিত চিন্তাভাবনা অনুসারে নয়।

সঠিকভাবে ব্যবসা করা

যখন মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরত করেন, তখন অনেক ব্যবসায়ী অন্যায়ভাবে ব্যবসা করত এবং তাই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ৮৩ সূরা আল মুতাফিফিন, আয়াত ১-৬ নাযিল করেন:

" যারা কম দেয় তাদের জন্য দুর্ভোগ। যারা মানুষের কাছ থেকে মেপে নিলে পূর্ণ পরিমাণে নেয়। কিন্তু যদি মেপে বা ওজন করে দেয়, তাহলে ক্ষতি করে। তারা কি ভাবে না যে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে। এক মহাদিনের জন্য। যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে?"

এর পর, ব্যবসায়ীরা ন্যায্য ও সৎভাবে ব্যবসা শুরু করে। ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৮৩:১, পৃষ্ঠা ১৬২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহের ২১৪৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, কেয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে অনৈতিক লোক হিসেবে উত্থিত করা হবে, তবে তারা ব্যতীত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, সৎকর্ম করে এবং সত্য কথা বলে।

এই হাদিসটি ব্যবসায়িক লেনদেনে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য প্রযোজ্য। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে, তাঁর আদেশ পালন করে,

তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে আল্লাহকে ভয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, অন্যদের সাথে সেভাবেই আচরণ করা উচিত যেভাবে সে মানুষের কাছ থেকে আচরণ পেতে চায়।

ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের কথাবার্তায় সৎ থাকা এবং লেনদেনের সমস্ত বিবরণ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে প্রকাশ করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদিস, সংখ্যা ২০৭৯, সতর্ক করে যে, যখন মুসলিমরা আর্থিক লেনদেনে জিনিসপত্র, যেমন তাদের পণ্যের ত্রুটি, গোপন করে, তখন এর ফলে বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

সৎকর্ম করার মধ্যে রয়েছে অন্যদের সাথে প্রতারণা করা থেকে বিরত থাকা, যাতে তারা অতিরিক্ত মূল্যে জিনিসপত্র কিনে প্রতারণা না করে। একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের সাথে সেই আচরণ করা যা সে অর্থপূর্ণভাবে চায়, সততা এবং সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে। একজন মুসলিম যেমন আর্থিক বিষয়ে দুর্ব্যবহার পছন্দ করেন না, তেমনি তাদেরও অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করা উচিত নয়।

সৎকর্ম করার মধ্যে রয়েছে ইসলাম এবং দেশের আইনে আলোচিত অবৈধ অনুশীলন এড়িয়ে চলা। যদি কেউ তাদের দেশের ব্যবসায়িক আইন নিয়ে সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে তাদের সেখানে ব্যবসা করা উচিত নয়।

অধিকন্তু, সৎকর্ম করার মধ্যে রয়েছে নিজের ব্যবসায়িক সাফল্যকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তাদের

ব্যবসা এবং সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য আরাম এবং শান্তির উৎস হয়ে উঠবে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

কিন্তু যারা তাদের ব্যবসায়িক সাফল্যের অপব্যবহার করে তারা দেখতে পাবে যে এটি তাদের চাপ এবং দুর্দশার উৎস হয়ে ওঠে, কারণ তারা মহান আল্লাহকে ভুলে গেছে, যিনি তাদের সাফল্য দিয়েছেন। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন] এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।"

যারা ব্যবসা পরিচালনা করেন তাদের সর্বদা মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা উচিত কারণ এটি অনৈতিকতার দিকে পরিচালিত করে এবং অমরত্ব জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে এবং তার উপর কাজ করতে থাকবে যতক্ষণ না তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা একজন মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন। জামে আত তিরমিযী, ১৯৭১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

মহান ত্যাগ

আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) মক্কাবাসীদের মালপত্র, যা তাঁর উপর অর্পিত ছিল, তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নির্দেশ পালন করার পর, আলী (রাঃ) মদিনায় হিজরত করে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে যোগ দেন। তিনি একাই চলে যান, কোনও সওয়ারী ছাড়াই এবং তাই যাত্রা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং কঠিন ছিল। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রাঃ)-এর, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যখন একজন সাহাবী, শোয়াব (রাঃ) হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন, তখন মক্কার অমুসলিমরা তাকে তা করতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। তারা দাবি করে যে, যখন তিনি প্রথম মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি দরিদ্র ছিলেন এবং মক্কায় তাকে যে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, তার কারণে তিনি ধনী হয়ে ওঠেন, তাই তারা তাকে মক্কা ছেড়ে যেতে দেননি। শোয়াব (রাঃ) তাকে ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে অথবা এক পক্ষ জয়ী না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে যুদ্ধ করার বিনিময়ে মক্কায় সমাহিত তার সমস্ত সম্পদ তাদের কাছে তুলে দেন। তারা তার সম্পদের বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মদিনায় আগমনের পর মহানবী (সাঃ) তাকে পরামর্শ দেন যে, তার ব্যবসাই সবচেয়ে লাভজনক। এই প্রসঙ্গে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা আল-বাকারার, আয়াত ২০৭ নাযিল করেন:

"আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেকে বিক্রি করে দেয়। আর আল্লাহ [তাঁর] বান্দাদের প্রতি দয়ালু।"

এটি তাফসির ইবনে কাসির, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৮০-এ আলোচনা করা হয়েছে।

ধামরা (রাঃ) ছিলেন মক্কার একজন ধনী অন্ধ ব্যক্তি যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যদিও তার অক্ষমতার কারণে তাকে মদিনায় হিজরতের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল, তবুও তিনি সওয়াব অর্জন করতে এবং মহানবী (সাঃ) এর সাথে মিলিত হতে চেয়েছিলেন। তিনি হিজরতের সময় মারা যান এবং তার সম্পর্কে নিম্নলিখিত আয়াত নাজিল হয়। সূরা ৪ আন-নিসা, আয়াত ১০০:

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে অনেক [বিকল্প] স্থান এবং প্রাচুর্য পাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করার জন্য নিজের ঘর থেকে বের হবে এবং তারপর মৃত্যু তাকে স্পর্শ করবে, তার প্রতিদান আল্লাহর উপর অবধারিত হয়ে গেছে। আর আল্লাহ সর্বদা ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

ইমাম মুহাম্মদ কান্ধলভীর লেখা, হায়াতুস সাহাবা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬৫-৩৬৭-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের কাছ থেকে সেইসব কঠিন পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার দাবি করেন না যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রা.)-এর উপর বর্ষিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, এই ঘটনায় মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে তারা তাদের পরিবার, ঘরবাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে এক অপরিচিত দেশে চলে গিয়েছিল, সবকিছুই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

তুলনামূলকভাবে, মুসলিমরা বর্তমানে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে, তা পূর্বসূরীদের মতো কঠিন নয়। অতএব, মুসলমানদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে তাদের কেবল কয়েকটি ছোট ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, যেমন ফজরের ফরজ নামাজ আদায়ের জন্য কিছু ঘুম এবং ফরজ দান করার জন্য কিছু সম্পদ উৎসর্গ করতে হবে। মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ঘরবাড়ি ও পরিবার পরিজন ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন না। এই কৃতজ্ঞতা বাস্তবে দেখানো উচিত, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের আশীর্বাদ ব্যবহার করে।

এছাড়াও, যখন কোন মুসলিম সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন তাদের মনে রাখা উচিত যে, নবী-রাসূলগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং কীভাবে তারা আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে সেগুলো কাটিয়ে উঠেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এই জ্ঞান একজন মুসলিমকে তাদের সমস্যা কাটিয়ে ওঠার শক্তি প্রদান করতে পারে কারণ তারা জানে যে, নবী-রাসূলগণ আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন, তবুও তারা ধৈর্যের সাথে আরও কঠোর সমস্যা সহ্য করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে ইবনে মাজাহের ৪০২৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণ (সাঃ) সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা সহ্য করেছেন এবং নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

যদি কোন মুসলিম পূর্বসূরীদের ন্যায়পরায়ণ মনোভাব অনুসরণ করে, তাহলে আশা করা যায় যে পরকালে তারাও তাদের সাথেই থাকবে।

ভালোবাসার চিহ্ন

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যদি তাকে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য না করা হয়, যার ফলে তিনি একজন মুহাজির হয়ে যান, তাহলে তিনি মদীনার সাহায্যকারী হতে চাইতেন, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। আর যদি মানুষকে কোন উপত্যকায় ভ্রমণ করতে বলা হত, তাহলে তিনি মদীনার সাহাবীদের উপত্যকায় যেতেন, সাহায্যকারীরা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

তিনি একবার আরও বলেছিলেন যে মদীনার সাহায্যকারীরা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাঁর পরিবার এবং পরিবারের অংশ ছিলেন।

অন্য এক অনুষ্ঠানে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, মদীনার সাহায্যকারীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, কেউ ভালোবাসে না, কেবল একজন মুমিন ছাড়া এবং মুনাফিক ছাড়া কেউ তাদের ঘৃণা করে না। যে তাদের ভালোবাসে, সে মহান আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন, আর যে তাদের ঘৃণা করে, সে মহান আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন।

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৮৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

অসংখ্য আয়াত ও হাদিস রয়েছে যেখানে সকল সাহাবী (রাঃ) এর উচ্চ মর্যাদা এবং সকল পরিস্থিতিতে তাদের সম্মান, ভালোবাসা এবং অনুসরণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসার নিদর্শন, তাঁর উপর শান্তি ও সালাম বর্ষিত হোক। যারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ভালোবাসে, তাদের সকলকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, এমনকি যদি এটি তাদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত মতামতের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এই ভালোবাসায় তারাও অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের কথার মাধ্যমে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তাদের কাজের মাধ্যমে ভালোবাসা প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ, এটা সকলের কাছে স্পষ্ট যে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারের সকল সদস্য, সকল সাহাবী (রাঃ)-এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং নেক পূর্বসূরীরা এই প্রকৃত ভালোবাসার অধিকারী ছিলেন। তাই তাদের প্রত্যেককে ভালোবাসা তার উপর কর্তব্য, যে আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ভালোবাসার দাবি করে। সহিহ বুখারী, ১৭ নম্বর হাদিসের মতো অনেক হাদিস দ্বারা এটি প্রমাণিত হয়েছে। এটি পরামর্শ দেয় যে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহায্যকারীদের প্রতি ভালোবাসা, অর্থাৎ পবিত্র মদীনার বাসিন্দাদের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের অংশ এবং তাদের প্রতি ঘৃণা মুনাফিকির লক্ষণ। জামে আত তিরমিযী, ৩৮৬২ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্টভাবে মুসলমানদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে তারা যেন কোন সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাদের সমালোচনা না করে, কারণ তাদের ভালোবাসা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে ভালোবাসার লক্ষণ এবং তাদের প্রতি ঘৃণা করা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং মহান আল্লাহকে ঘৃণা করার লক্ষণ। এই ব্যক্তি সফল হবে না যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে তওবা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর পবিত্র পরিবার সম্পর্কে অনুরূপ একটি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, সুনান ইবনে মাজাহ, ১৪৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে।

যদি কোন মুসলিম অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমের সমালোচনা করে, যে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে, তাহলে তা প্রমাণ করে যে, তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার অভাব পোষণ করে। যদি কোন মুসলিম কোন পাপ করে, তাহলে অন্য মুসলিমদের সেই পাপকে ঘৃণা করা উচিত, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, পাপী মুসলিমের প্রতি ভালোবাসা থাকা উচিত কারণ তারা আল্লাহ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে। অন্যদের ভালোবাসার লক্ষণ হলো তাদের সাথে সদয় ও শ্রদ্ধাশীল আচরণ করা। সহজ কথায়, অন্যদের সাথে সেভাবেই আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় অন্যরা তাদের সাথে আচরণ করুক।

অধিকন্তু, একজন মুসলিমের উচিত তাদের সকলকে ঘৃণা করা যারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং নবী মুহাম্মদ, সা.-কে ভালোবাসেন তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে, সে ব্যক্তি আত্মীয় হোক বা অপরিচিত হোক। একজন মুসলিমের অনুভূতি কখনই আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং নবী মুহাম্মদ, সা.-এর প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসার এই নিদর্শন পূরণে বাধা সৃষ্টি করবে না। এর অর্থ এই নয় যে তাদের ক্ষতি করা উচিত, বরং তাদের স্পষ্ট করে বলা উচিত যে যারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং নবী মুহাম্মদ, সা.-কে ভালোবাসেন তাদের প্রতি ঘৃণা করা অগ্রহণযোগ্য। যদি তারা এই বিচ্যুতিপূর্ণ মনোভাব বজায় রাখে, তাহলে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া উচিত যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

সঠিক পথ অনুসরণ করা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় আগমনের পর, আবদুল্লাহ বিন সালাম, যিনি একজন সম্মানিত ও জ্ঞানী ইহুদি পণ্ডিত, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেখার পরপরই ইসলাম গ্রহণ করেন, কারণ তিনি পূর্ববর্তী ঐশী ওহীতে উল্লিখিত তাঁর নিদর্শনগুলি চিনতে পেরেছিলেন। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [অর্থাৎ, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাদের একদল সত্যকে গোপন করে, যদিও তারা তা জানে।"

তিনি মহানবী (সাঃ) কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, অন্যান্য ইহুদি পণ্ডিতরা তাকে অত্যন্ত সম্মান করেন কিন্তু যদি তারা জানতে পারেন যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাহলে তারা তার সম্পর্কে মিথ্যাচার করবে। যখন মহানবী (সাঃ) ইহুদি পণ্ডিতদের ডেকে বললেন যে তারা তাঁকে শেষ নবী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করলেন। নবী (সাঃ) যখন তাঁর কথা উল্লেখ করেছিলেন, তখন তারা প্রথমে আবদুল্লাহ ইবনে সালামের প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন জানতে পেরে তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯৪-১৯৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আহলে কিতাবরা এই সত্যে ঈর্ষান্বিত ছিল যে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ভাই হযরত ইসহাকের বংশধর না হয়ে বরং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। যেহেতু তাদের পুরো ধর্ম বংশের গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে

উঠেছিল, যা তাদের মতে অন্যান্য মানবজাতির উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিল, তাই তারা এমন একজন নবী (সাঃ)-কে গ্রহণ এবং অনুসরণ করতে পারত না, যিনি ভিন্ন বংশ থেকে এসেছিলেন। এর ফলে তাদের তৈরি শ্রেষ্ঠত্বের জটিলতা কেবল ধ্বংস হয়ে যেত। উপরন্তু, তারা জানত যে ইসলাম গ্রহণের অর্থ হবে নেতৃত্ব এবং সম্পদের মতো পার্থিব জিনিসপত্র অর্জনের জন্য তারা আর তাদের ঐশ্বরিক শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করতে পারবে না। ফলস্বরূপ, তারা ইসলামকে অস্বীকার করেছিল এবং এর ফলে তাদের অজ্ঞ অনুসারীদের বিভ্রান্ত করেছিল।

সম্পদ এবং নেতৃত্বের মতো পার্থিব লাভের জন্য কখনোই ইসলামের শিক্ষার সাথে আপস করা উচিত নয়। মহান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতার মাধ্যমে যে পার্থিব জিনিসগুলি অর্জন করা হয়, তা উভয় জগতেই তাদের জন্য ঝামেলা, দুর্দশা এবং অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা মহান আল্লাহর ক্ষমতা থেকে বাঁচতে পারবে না। উপরন্তু, যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে যা তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে বাধা দেবে, এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থাপন করতে বাধা দেবে এবং এটি তাদের বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে বাধা দেবে। এটি তাদের উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে, এমনকি যদি তারা বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে। অধ্যায় ৯ তওবার ৮২ নম্বর আয়াতে:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

এছাড়াও, মহানবী (সা.) সুনান ইবনে মাজাহ, ২৫৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই ব্যক্তিকে জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। অতএব, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ ও মেনে চলতে হবে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি লাভ করতে পারে, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয়। কারণ, মনের ও শরীরের শান্তি অর্জনের জন্য নিজের আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই সামান্য মূল্য, ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি সুস্বাস্থ্য অর্জনের জন্য তার খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করলেও মনের শান্তি পেতে ব্যর্থ হয়, তার জন্য জীবন একটি অন্ধকার কারাগারে পরিণত হয়। ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ করলে এটি বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎ কর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্য

মদিনায় প্রবেশের পর, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বপ্রথম যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল: শান্তি ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে খাবার দেওয়া এবং রাতে যখন অন্যরা ঘুমাচ্ছে তখন নামাজ পড়া এবং তাদের প্রতিদানে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া। সুনান ইবনে মাজাহ, ১৩৩৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বপ্রথম যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা হলো শান্তি ছড়িয়ে দেওয়ার।

সহীহ বুখারীর ১২ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলামের মধ্যে পাওয়া একটি ভালো গুণের পরামর্শ দিয়েছেন। তা হলো, পরিচিত এবং অপরিচিত সকলের মধ্যে শান্তির ইসলামিক শুভেচ্ছা ছড়িয়ে দেওয়া।

এই ভালো গুণটি কাজে লাগানো গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজকাল মুসলমানরা প্রায়শই কেবল তাদের পরিচিতদের কাছেই শান্তির ইসলামিক শুভেচ্ছা পৌঁছে দেয়। সকলের কাছে এটি ছড়িয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মানুষের মধ্যে ভালোবাসার জন্ম দেয় এবং ইসলামকে শক্তিশালী করে। সহীহ মুসলিমের ১৯৪ নম্বর হাদিস অনুসারে, এই বৈশিষ্ট্যটি জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। অন্য মুসলমানদের সাথে কেবল করমর্দনের বদ অভ্যাস এড়িয়ে চলতে হবে, তাদের সাথে শান্তির ইসলামিক শুভেচ্ছা না জানিয়ে। কেবল করমর্দনের চেয়ে মৌখিকভাবে শান্তির শুভেচ্ছা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

একজন মুসলিমের কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, অন্যদের প্রতি তাদের প্রতিটি সালামের জন্য তারা কমপক্ষে দশটি সওয়াব পাবে, এমনকি যদি অন্যরা তাদের সালামের উত্তর নাও দেয়। সুনানে আবু দাউদের ৫১৯৫ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলিমের উচিত শান্তির ইসলামিক অভিবাদন সঠিকভাবে পালন করা, অন্যদের প্রতি তাদের অন্যান্য কথাবার্তা এবং কাজে এই শান্তি প্রদর্শন করা, মানুষ এবং তাদের সম্পদ থেকে তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি দূরে রাখা। প্রকৃতপক্ষে, সুনান আন নাসায়ী, ৪৯৯৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিস অনুসারে এটিই একজন প্রকৃত মুসলিম এবং মুমিনের সংজ্ঞা। কারো প্রতি শান্তির শুভেচ্ছা জানানো এবং তারপর তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের ক্ষতি করা ভণ্ডামি। প্রকৃতপক্ষে এই মনোভাব অন্যদের প্রতি শান্তির শুভেচ্ছা জানানোর উদ্দেশ্যকে লঙ্ঘন করে।

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তী যে জিনিসটির পরামর্শ দিয়েছিলেন তা হল মানুষকে খাবার পরিবেশন করা।

আল্লাহ, মহিমান্বিত, মানুষকে তাদের কর্ম অনুসারে প্রতিদান দেন। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কেউ আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহলে তিনিও তাদের স্মরণ করবেন। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ১৫২:

"অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব..."

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের খাওয়ানোও একই রকম। যে ব্যক্তি এই সৎকর্ম করবে তাকে জান্নাতের খাবার খাওয়ানো হবে এবং যে ব্যক্তি অন্যদের পান করাবে তাকে বিচারের দিন জান্নাতের পানীয় দেওয়া হবে। জামে আত তিরমিযী, ২৪৪৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী শরীফের ৬২৩৬ নম্বর হাদিসে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বোত্তম ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উপদেশ দেন যে, অন্যদের খাওয়ানো এবং সদয় কথাবার্তায় অন্যদের অভিবাদন জানানো ইসলামের সর্বোত্তম গুণ।

মুসলমানদের উচিত এই নেক আমলটি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া এবং নিয়মিতভাবে অন্যদের, বিশেষ করে দরিদ্রদের, খাওয়ানোর চেষ্টা করা। এটি একটি আশ্চর্যজনক কাজ যার জন্য খুব বেশি সম্পদের প্রয়োজন হয় না। প্রতিটি ব্যক্তিরই তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের খাওয়ানো উচিত, এমনকি যদি তা কেবল অর্ধেক খেজুরও হয়, যেমনটি সহিহ বুখারির ১৪১৭ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, এটি তাদেরকে বিচারের দিন জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। এর ফলে এই নেক আমল থেকে বিরত থাকার কোন অজুহাত থাকবে না।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বশেষ যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা হলো, অন্যরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন রাতের নামাজ আদায় করা।

সহীহ বুখারী শরীফের ১১৪৫ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর অসীম মহিমা অনুসারে প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন এবং মানুষকে তাদের চাহিদা পূরণের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করার জন্য আহ্বান জানান যাতে তিনি তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারেন।

রাতের বেলায় স্বেচ্ছায় ইবাদত করা আল্লাহর প্রতি মানুষের আন্তরিকতার প্রমাণ দেয়, কারণ অন্য কোন চোখ তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখে না। এটি করা আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ কথোপকথনের একটি মাধ্যম এবং এটি তাঁর দাসত্বের একটি নিদর্শন। এর অসংখ্য ফজিলত রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আন নাসায়ী, ১৬১৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে এটি সর্বোত্তম স্বেচ্ছায় ইবাদত।

বিচার দিবসে বা জান্নাতে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চেয়ে উচ্চতর মর্যাদা আর কারো থাকবে না, তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। এবং এই মর্যাদা সরাসরি রাতের নফল নামাজের সাথে সম্পর্কিত। এটি দেখায় যে যারা রাতের নফল নামাজ প্রতিষ্ঠা করে তারা উভয় জগতের সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৭৯:

"আর রাতের [একাংশ] অংশে, এর সাথে সালাত (অর্থাৎ, কুরআন তেলাওয়াত) পাঠ করো, এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত [ইবাদত]; আশা করা যায় যে তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে উত্থিত করবেন।"

জামে আত তিরমিযীতে ৩৫৭৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, একজন মুসলিম রাতের শেষ অংশে আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হন। অতএব, এই সময়ে যদি তারা আল্লাহকে স্মরণ করে তবে তারা অসংখ্য বরকত লাভ করতে পারে।

সকল মুসলিমই চায় তাদের প্রার্থনা কবুল হোক এবং তাদের চাহিদা পূরণ হোক। অতএব, তাদের নফল রাতের নামাজ পড়ার চেষ্টা করা উচিত কারণ সহীহ মুসলিমের ১৭৭০ নম্বর হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, প্রতি রাতে একটি বিশেষ সময় থাকে যখন ভালো প্রার্থনার উত্তর সর্বদা দেওয়া হয়।

রাতের নফল নামাজ প্রতিষ্ঠা করা পাপ থেকে বিরত রাখার একটি চমৎকার উপায়, এটি একজন ব্যক্তিকে অর্থহীন সামাজিক সমাবেশ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে এবং এটি একজন ব্যক্তিকে অনেক শারীরিক অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে। জামে আত তিরমিযী, ৩৫৪৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ করে ঘুমানোর আগে অতিরিক্ত খাওয়া-দাওয়া না করে নফল ইশারার নামাজের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া উচিত, কারণ এটি অলসতা তৈরি করে। দিনের বেলায় অযথা ক্লান্তি সৃষ্টি করা উচিত নয়। দিনের বেলায় একটি ছোট ঘুম এতে সাহায্য করতে পারে। পরিশেষে, পাপ এড়িয়ে চলা উচিত এবং মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস অনুসারে তাঁর আনুগত্য করা উচিত, কারণ আনুগত্যশীলদের জন্য নফল ইশারার নামাজ পড়া সহজ হয়।

পরিশেষে, মূল হাদিসটি আশা ত্যাগ না করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে কারণ অনুতাপ এবং সাফল্যের দরজা সর্বদা খোলা থাকে। মানুষকে প্রতিদিন এবং রাতে আন্তরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসার সুযোগ দেওয়া হয়, যাতে তারা উভয় জগতেই শান্তি এবং সাফল্য পেতে পারে। মহান আল্লাহর মহান করুণার প্রশংসা করা উচিত, কারণ তিনি সৃষ্টির প্রয়োজন করেন না বরং তাদেরকে নিজের দিকে আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা সফল হতে পারে। সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে এবং অনুশোচনা ছাড়া তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, এই সুযোগগুলি গ্রহণ করা উচিত।

সম্পূর্ণ জমা দিন

কিছু সাহাবী, যারা পূর্বে আহলে কিতাব ছিলেন, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, ইসলামের শিক্ষা এবং তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের সেই শিক্ষার উপর আমল করতে চেয়েছিলেন যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক ছিল না। আল্লাহ, মহিমান্বিত, নিম্নলিখিত আয়াতগুলিতে তাদেরকে এইভাবে আচরণ না করার জন্য সতর্ক করেছেন কারণ ইসলাম ছাড়া আর কোন সঠিক নির্দেশনা নেই। সূরা আল বাকারা, আয়াত 208-209:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। কিন্তু তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও যদি তোমরা পিছলে পড়ো, তবে জেনে রাখো যে, আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"

তাফসির আল কুরতুবী, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 531-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

শয়তানের লক্ষ্য হলো মুসলমানদেরকে নির্দেশনার দুটি উৎসের উপর কাজ করতে বাধা দেওয়া: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস, কারণ তিনি জানেন যে তাদের জন্য মুক্তি এতেই নিহিত। অতএব, মুসলমানদের সর্বোপরি নির্দেশনার এই দুটি উৎস মেনে চলা উচিত।

ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করা হবে, যদিও তা সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করবে, ততই তারা হেদায়েতের দুটি উৎসের উপর তত কম কাজ করবে, যা পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে। এই কারণেই সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, হেদায়েতের দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত না থাকা যেকোনো বিষয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যাখ্যান করবেন। উপরন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করা হবে, ততই তারা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক এমন কিছু কাজ করতে শুরু করবে। এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে বিপথগামী করে। উদাহরণস্বরূপ, সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর কাজ করার অভ্যাস রাখে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পা দেবে এবং এমন আধ্যাত্মিক অনুশীলন করতে শুরু করবে যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথেও সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান নির্দেশনার দুটি উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে নেওয়া হয়। এই বিভ্রান্তিকর অভ্যাস এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফর, যেমন কালো জাদু অনুশীলন করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"...সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

সুতরাং একজন মুসলিম অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস

রয়েছে। এই কারণেই ধর্মীয় উদ্ভাবনগুলিতে কাজ করা যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা

অনেক বিভিন্ন হাদিস এবং ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে যেখানে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সময়ের অনেক ইহুদি ও খ্রিস্টান পণ্ডিতের ইসলাম প্রত্যাখ্যানের কথা আলোচনা করা হয়েছে, যদিও তারা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করত যে তিনিই শেষ নবী, যাকে তারা তাদের ঐশী কিতাবগুলির মাধ্যমে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [অর্থাৎ, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাদের একদল সত্যকে গোপন করে, যদিও তারা তা জানে।"

উদাহরণস্বরূপ, একবার দুজন ইহুদি পণ্ডিত মহানবী (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করে ফিরে আসেন। তাদের মধ্যে একজন মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলেন যে তিনি নিঃসন্দেহে শেষ নবী, কারণ তারা তাদের ঐশী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নিদর্শনগুলির মাধ্যমে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু তারপর তিনি মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলেন যে তিনি যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন তিনি তাঁর সাথে শত্রুতা করবেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

তাদের এই আচরণের দুটি প্রধান কারণ ছিল সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতি তাদের চরম ভালোবাসা। তারা বুঝতে পেরেছিল যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে গ্রহণ করার অর্থ হবে তাদের সামাজিক প্রভাব এবং এর থেকে অর্জিত সম্পদ হারাবে। তারা তাদের গোত্র এবং ধর্মের নেতা থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

এর সাধারণ অনুসারী হয়ে উঠবে। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদা উভয়ের প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি উভয় জগতেই তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

জামে আত তিরমিযীতে ২৩৭৬ নম্বর হাদিসে মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, সম্পদ ও মর্যাদার প্রতি আকুলতা ঈমানের জন্য দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ভেড়ার পালের উপর ছেড়ে দেওয়া ধ্বংসের চেয়েও বেশি ধ্বংসাত্মক।

এ থেকে বোঝা যায় যে, পৃথিবীতে সম্পদ ও খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা থাকলে খুব কমই কোন মুসলিমের ঈমান নিরাপদ থাকে, ঠিক যেমন দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ের হাত থেকে কোন ভেড়া রক্ষা পাবে। তাই এই মহান উপমায় পৃথিবীতে অতিরিক্ত সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার আকাঙ্ক্ষার মন্দের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কীকরণ রয়েছে।

প্রথম ধরণের সম্পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা হলো যখন কেউ সম্পদের প্রতি অত্যধিক ভালোবাসা পোষণ করে এবং বৈধ উপায়ে তা অর্জনের জন্য ক্লান্তিহীনভাবে চেষ্টা করে। এই ধরণের আচরণ করা একজন জ্ঞানী ব্যক্তির লক্ষণ নয়, কারণ একজন মুসলিমের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের রিজিক তাদের জন্য নিশ্চিত এবং এই বন্টন কখনও পরিবর্তন হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছরেরও বেশি আগে সৃষ্টির রিজিক বরাদ্দ করা হয়েছিল। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে তাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব অবহেলা করবে কারণ তারা সম্পদ অর্জনে অত্যধিক ব্যস্ত থাকে। যে ব্যক্তি সম্পদ অর্জনে অত্যধিক ব্যস্ত থাকে সে কখনই পরকালের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হবে না, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যক্তি আরও সম্পদ অর্জনের জন্য এত বেশি প্রচেষ্টা করবে যে তারা তা উপভোগ করার সুযোগও পাবে না। পরিবর্তে, তারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে

যাবে এবং অন্যদের উপভোগ করার জন্য এটি রেখে যাবে, যদিও তাদের এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এই ব্যক্তি বৈধভাবে সম্পদ অর্জন করতে পারে কিন্তু তবুও তারা মানসিক শান্তি পাবে না কারণ তারা যতই সম্পদ অর্জন করুক না কেন, তারা কেবল আরও বেশি কামনা করবে। এই ব্যক্তি অভাবী এবং তাই, তাদের প্রচুর সম্পদ থাকলেও, তারা একজন প্রকৃত দরিদ্র। যেহেতু আরও সম্পদের জন্য প্রচেষ্টা করার অর্থ হল আরও বেশি পার্থিব দরজা এবং ব্যস্ততা খোলা, তারা যত বেশি তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করবে, ততই তারা মানসিক এবং শারীরিক শান্তি পাবে। এবং তারা তাদের ভাগ্য অর্জনের জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভুলে যায়, কেবল সেই আল্লাহর দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন] এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।"

একমাত্র উপকারী আকাঙ্ক্ষা হল প্রকৃত সম্পদ সঞ্চয় করার আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ পুনরাগমনের দিনের প্রস্তুতির জন্য সৎকর্মের আকাঙ্ক্ষা।

দ্বিতীয় ধরণের সম্পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রথম ধরণের অনুরূপ, তবে এর পাশাপাশি এই ধরণের ব্যক্তি অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করে এবং মানুষের অধিকার, যেমন ফরজ দান, পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অনেক হাদিসে এর বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৬ নম্বর হাদিসে তিনি সতর্ক করেছেন যে এই মনোভাব অতীতের জাতিগুলিকে ধ্বংস করেছে কারণ তারা অবৈধ জিনিসগুলিকে হালাল করেছে, অন্যদের অধিকার হরণ করেছে এবং অতিরিক্ত সম্পদের জন্য অন্যদের হত্যা করেছে। এই ব্যক্তি সেই সম্পদের জন্য প্রচেষ্টা করে যার অধিকার তাদের নেই যা

অসংখ্য বড় পাপের দিকে পরিচালিত করে। যখন কেউ এই মনোভাব গ্রহণ করে তখন তারা তীব্র লোভী হয়ে ওঠে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক সতর্ক করা হয়েছে যে, জামে আত তিরমিযী, ১৯৬১ নম্বর হাদিসে লোভী ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসায়ীর ৩১১৪ নম্বর হাদিসে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, একজন প্রকৃত মুসলিমের অন্তরে চরম লোভ এবং প্রকৃত ঈমান কখনোই একত্রিত হতে পারে না।

যদি কোন মুসলিম এই ধরণের আকাঙ্ক্ষা গ্রহণ করে, তাহলে এর চরম বিপদ একজন অশিক্ষিত মুসলিমের কাছেও স্পষ্ট। এটি তাদের ঈমানকে ধ্বংস করে দেবে যতক্ষণ না সামান্য কিছু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আলোচ্য মূল হাদিসে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, তেমনি একজনের ঈমানের এই ধ্বংস দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ভেড়ার পালের উপর ছেড়ে দেওয়া ধ্বংসের চেয়েও ভয়াবহ। এই মুসলিম তাদের মৃত্যুর মুহূর্তে তাদের সামান্য ঈমান হারানোর ঝুঁকিতে থাকে, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

একজন ব্যক্তির খ্যাতি এবং মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা অতিরিক্ত সম্পদের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে তার বিশ্বাসের জন্য বেশি ধ্বংসাত্মক। একজন ব্যক্তি প্রায়শই খ্যাতি এবং সামাজিক মর্যাদা অর্জনের জন্য তার প্রিয় সম্পদ ব্যয় করে।

এমনটা বিরল যে কেউ মর্যাদা ও খ্যাতি অর্জন করে এবং তারপরও সঠিক পথে অটল থাকে, যার ফলে তারা বস্তুগত জগতের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেয়। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারীতে (৬৭২৩) একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সমাজে নেতৃত্বের মতো মর্যাদার সন্ধান করে, তাকে নিজেই তা মোকাবেলা করতে হবে, কিন্তু যদি কেউ তা না চেয়েই পায়, তাহলে মহান আল্লাহ তাকে তাঁর আনুগত্য করতে সাহায্য করবেন। এই কারণেই নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এমন কাউকে

নিয়োগ করতেন না যে কর্তৃত্বের পদে নিযুক্ত হতে চেয়েছিল অথবা এমনকি এর জন্য আকাঙ্ক্ষাও দেখিয়েছিল। সহীহ বুখারীতে (৬৯২৩) একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সহীহ বুখারীতে (৭১৪৮) আরেকটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব অর্জনের জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু কিয়ামতের দিন এটি তাদের জন্য বিরাট অনুশোচনার বিষয় হবে। এটি একটি বিপজ্জনক আকাঙ্ক্ষা কারণ এটি একজনকে এটি অর্জনের জন্য তীব্র প্রচেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং তারপরে এটি ধরে রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টা করতে বাধ্য করে, এমনকি যদি এটি তাদের অত্যাচার এবং অন্যান্য পাপ করতে উৎসাহিত করে।

ধর্মের মাধ্যমে যখন কেউ মর্যাদা লাভ করে, তখনই সবচেয়ে খারাপ ধরণের মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৬৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করে বলেছেন যে, এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

অতএব, একজন মুসলিমের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা এড়িয়ে চলাই নিরাপদ। কারণ এই দুটি জিনিস তাদের ঈমানের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা তাদেরকে পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা।

ফাইন মিত্রগণ

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)-এর মতো কিছু ইহুদি পণ্ডিত ইসলাম গ্রহণ করার পর, তাদের গোত্রের অনেক লোক তাদের পরিত্যাগ করে এবং তাদের সাথে সঙ্গ না রাখার শপথ করে। তাদের জন্য এটি কঠিন ছিল কারণ তারা তাদের পরিবার এবং বন্ধু ছিল। এই প্রসঙ্গে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ৫৫-৫৬ নাযিল করেন:

"তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারগণ ছাড়া আর কেউ নন - যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং রুকু করে। আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারগণের বন্ধু হয় - নিঃসন্দেহে আল্লাহর দল - তারাই হবে বিজয়ী।"

এই আয়াতগুলো শুনে আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) উত্তর দিলেন যে, তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত, তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং মুমিনদেরকে তাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৫:৫৫, পৃষ্ঠা ৬৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে, সে তার চারপাশের মানুষের কাছ থেকে সমালোচনা এবং বিরোধিতার সম্মুখীন হবে। কিন্তু এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকে, তাকে মনের শান্তি দেওয়া হবে, যা একটি অমূল্য আশীর্বাদ যা পার্থিব মানুষের প্রশংসা এবং সাহচর্যের চেয়েও বেশি, এমনকি তার পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদেরও।

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি মানুষকে খুশি করার জন্য ইসলামের শিক্ষার সাথে আপস করে, সে অনিবার্যভাবে প্রদত্ত অনুগ্রহের অপব্যবহার করবে। এটি তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে বাধা দেবে, এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দিতে বাধা দেবে এবং এটি তাদের বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে বাধা দেবে। এই সবকিছুই তাদের মনের শান্তি অর্জনে বাধা দেবে, এমনকি যদি তাদের মানুষের প্রশংসা এবং সাহচর্য থাকে। অতএব, নিজের স্বার্থে, মহান আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থাকতে হবে, কারণ মনের শান্তি অর্জন মানুষকে খুশি করার এবং এর নেতিবাচক পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে অনেক ভালো।

মদিনায় প্রথম জুমার খুতবা

মদিনায় প্রথম জুমার নামাজে প্রদত্ত নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর খুতবা নিম্নরূপ:

“সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রশংসা; আমি তাঁর প্রশংসা করি, এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি। আমি তাঁর ক্ষমা এবং তাঁর হেদায়েত প্রার্থনা করি। আমি তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করি, তাঁকে অবিশ্বাস করি না, এবং যারা তা করে তাদের সাথে যুদ্ধ করব। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা এবং রাসূল যাকে তিনি হেদায়েত এবং সত্য ও আলোর ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন, এমন এক সময়ে যখন নবীদের জ্ঞান কম থাকে, মানুষ পথভ্রষ্ট হয়, যখন সময় অমিল থাকে এবং প্রতিশোধ ও ভাগ্য নিকটবর্তী হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়; যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয় সে পথভ্রষ্ট হয়, পথভ্রষ্ট হয় এবং বহুদূর পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দিচ্ছি; একজন মুসলিম একজন মুসলিমকে পরকালের জন্য উৎসাহিত করার জন্য, তাকে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য এটিই সর্বোত্তম উপদেশ। আল্লাহ, মহান, নিজেই তোমাকে যা সতর্ক করেছেন তা থেকে সাবধান থাকো। এর চেয়ে ভালো উপদেশ বা দায়িত্ব আর কিছু হতে পারে না। যারা আশঙ্কা ও ভয়ের সাথে এটি সম্পন্ন করে তাদের জন্য এটি একটি তাকওয়ার কাজ এবং পরকালের জন্য আপনার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য এটি একটি সত্যিকারের সাহায্য। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে এবং গোপনে, শুধুমাত্র তাঁর অনুগ্রহের জন্য, মহান আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক গড়ে তোলে, সে মৃত্যুর পরে স্বল্পমেয়াদে স্বীকৃতি এবং পুরষ্কার পাবে, যখন একজন মানুষ চাইবে যে সে আগের চেয়ে ভিন্নভাবে কাজ করেছে, এবং নিজের এবং সেই আচরণের মধ্যে অনেক দূরত্ব রাখতে চাইবে। আল্লাহ, মহান, তোমাদের তাঁর সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলেছেন, যদিও তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি করুণাময়। যে কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করে এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করে, সে তার কাছ থেকে কিছুই ফিরিয়ে পাবে না কারণ আল্লাহ, মহান বলেছেন, " *আমি যা বলি তা পরিবর্তন করা হবে না, এবং আমি আমার বান্দাদের*

প্রতি অন্যায়কারী নই।" (অধ্যায় ৫০ ক্বাফ, আয়াত ২৯)। গোপনে এবং প্রকাশ্যে, সামনে এবং পরবর্তী উভয় ক্ষেত্রেই, মহান আল্লাহকে ভয় করো, কারণ "... *যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার মন্দ পথগুলি তার থেকে সরিয়ে দেবেন এবং তাকে মহান প্রতিদান দেবেন* ।" (অধ্যায় ৬৫, তালাক্ব, আয়াত ৫)। এবং *"...যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে বিরাট সাফল্য অর্জন করবে।"* (অধ্যায় ৩৩ আল আহযাব, আয়াত ৭১)। আল্লাহকে ভয় করলে তাঁর অসন্তুষ্টি, তাঁর শাস্তি এবং তাঁর ক্রোধ প্রতিরোধ করা যাবে। আল্লাহকে ভয় করলে সন্তুষ্টি, প্রভুকে সন্তুষ্ট করা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করা যাবে। তোমাদের সৌভাগ্যের সদ্ব্যবহার করো এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করো না। আল্লাহ, মহান, তোমাদেরকে তাঁর কিতাবে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমাদের জন্য তাঁর পথ নির্ধারণ করেছেন, যাতে তিনি সত্যবাদীদের এবং মিথ্যাবাদীদেরকে স্পষ্ট করে দিতে পারেন। আল্লাহ, মহান, তোমাদের প্রতি যেমন মঙ্গল করেন, তেমনি সৎকর্ম করো। তাঁর শত্রুদের বিরোধিতা করো এবং মহান আল্লাহর জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করো। তিনিই তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন এবং তোমাদের নাম দিয়েছেন মুসলিম, যাতে যারা ধ্বংস হয় তারা স্পষ্ট কারণে ধ্বংস হয়, আর যারা বেঁচে থাকে তারা স্পষ্ট কারণে। মহান আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন শক্তি নেই। "মহান আল্লাহকে ঘন ঘন স্মরণ করো। মৃত্যুর পর যা আসবে তার জন্য চেষ্টা করো। কারণ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক ভালো করে, সে মানুষের সাথে তার সম্পর্ককে সন্তোষজনক মনে করবে। কারণ মহান আল্লাহ মানুষের উপর বিচার করেন, কিন্তু তারা তাঁর উপর বিচার করে না। তিনিই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু তারা তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করে না। মহান আল্লাহ সত্যিই মহান! মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন শক্তি নেই।" এটি ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯৭-১৯৯-এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

পৃথিবীর সেরা স্থান

মদিনায় অবস্থিত নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মসজিদটি প্রথমে ইট দিয়ে নির্মিত হয়েছিল যার উপরে ছিল খেজুর পাতা দিয়ে তৈরি হালকা ছাদ। আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁর খিলাফতের সময় এর কোন উন্নতি করেননি। কিন্তু তাঁর খিলাফতের সময় উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এটিকে সম্প্রসারিত করেন, নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময়ের মতোই ইট ও খেজুর পাতা দিয়ে এটি পুনর্নির্মাণ করেন এবং এর কাঠের স্তম্ভগুলিও পুনরুদ্ধার করেন। তাঁর খিলাফতের সময় উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) পরিবর্তন এবং বড় বড় সংযোজন করেন। তিনি এর দেয়ালগুলি কাটা পাথর এবং প্লাস্টার দিয়ে তৈরি করেছিলেন, পাথরের স্তম্ভগুলি তৈরি করেছিলেন এবং সেগুন কাঠের ছাদ তৈরি করেছিলেন। তিনি সুনান ইবনে মাজাহ, ৭৩৮ নম্বরে পাওয়া নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদিসটি বাস্তবায়ন করছিলেন। এতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, এমনকি চড়ুই পাখির বাসার মতো ছোট বা তার চেয়েও ছোট, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ)-এর জীবনী", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২০১-২০২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ১৫২৮ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো মসজিদ এবং তাঁর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হলো বাজার।

ইসলাম মুসলমানদের মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও যেতে নিষেধ করে না, এমনকি তাদের সর্বদা মসজিদে বসবাস করার নির্দেশও দেয় না। তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা বাজার এবং অন্যান্য স্থানে অপ্রয়োজনীয়ভাবে যাওয়ার চেয়ে

জামাতে নামাজ এবং ধর্মীয় সমাবেশে যোগদানের জন্য মসজিদে যাওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়।

যখন কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন অন্য জায়গায়, যেমন শপিং সেন্টারে যাওয়া কোন ক্ষতি নেই, তবে একজন মুসলিমের উচিত অপ্রয়োজনে সেখানে যাওয়া এড়িয়ে চলা, কারণ সেখানে পাপের ঘটনা বেশি ঘটে। যখনই তারা অন্য জায়গায় যায়, তখন তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা যেন মহান আল্লাহর অবাধ্যতা না করে, যার মধ্যে অন্যদের প্রতি অন্যায় করাও অন্তর্ভুক্ত। তাদের অতিরঞ্জিত মেলামেশা এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এটিই সমাজে সংঘটিত বেশিরভাগ পাপের কারণ।

মসজিদগুলিকে পাপ থেকে মুক্তির জন্য এবং মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের জন্য একটি আরামদায়ক স্থান হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। যেমন একজন ছাত্র একটি গ্রন্থাগার থেকে উপকৃত হয়, যেমন এটি অধ্যয়নের জন্য তৈরি একটি পরিবেশ, তেমনি মুসলমানরা মসজিদ থেকে উপকৃত হতে পারে, কারণ এর মূল উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে কার্যকর জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করতে উৎসাহিত করা যাতে তারা সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করতে পারে।

মসজিদগুলি তাদের উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যও একটি চমৎকার স্থান, যা হল মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে। মসজিদগুলি তাদের কার্যকলাপকে সঠিকভাবে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্যও উৎসাহিত করে, যাতে তারা তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করতে পারে, পরকালের জন্য পর্যাপ্তভাবে

প্রস্তুত হতে পারে এবং পরিমিতভাবে বৈধ আনন্দ উপভোগ করতে পারে। যে ব্যক্তি মসজিদ এড়িয়ে চলে সে প্রায়শই তাদের সময় এবং সম্পদকে নিরর্থক এবং অর্থহীন কাজে নষ্ট করে এবং ফলস্বরূপ তারা উভয় জগতেই লাভবান হতে হারাবে।

একজন মুসলিমের উচিত কেবল অন্যান্য স্থানের চেয়ে মসজিদকে অগ্রাধিকার দেওয়া নয়, বরং অন্যদের, যেমন তাদের সন্তানদেরকেও একই কাজ করতে উৎসাহিত করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, এটি যুবকদের জন্য পাপ, অপরাধ এবং খারাপ সঙ্গ এড়াতে একটি চমৎকার জায়গা, যা উভয় জগতে ঝামেলা এবং অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।

এছাড়াও, আলোচ্য মূল ঘটনাটি এই পৃথিবীকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে নির্মাণ ও সুন্দর করার পরিবর্তে পরকাল নির্মাণের উপর মনোনিবেশ করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। এই পৃথিবীকে যতই সুন্দর করা হোক না কেন, এটি অবশেষে শেষ হয়ে যাবে এবং যারা এটি নির্মাণের জন্য তাদের সম্পদ উৎসর্গ করেছে তারা এই পৃথিবীতে বা পরকালে মানসিক শান্তি পাবে না। এর কারণ হল যে ব্যক্তি এই পৃথিবীকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে নির্মাণে মনোনিবেশ করবে সে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এটি তাদের মানসিক এবং শারীরিক ভারসাম্য অর্জনে বাধা দেবে, এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থাপন করতে বাধা দেবে এবং এটি তাদের বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে বাধা দেবে। ফলস্বরূপ, এই ব্যক্তি এই পৃথিবীতে বা পরকালে মানসিক শান্তি পাবে না, এমনকি তারা তাদের পার্থিব জীবনকে সুন্দর করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করলেও। সূরা ৯ তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

অন্যদিকে, যারা তাদের পরকাল গঠনে মনোনিবেশ করে, তারা এই পৃথিবীতে এবং পরকালে মানসিক শান্তিতে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে, কারণ তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের হাদীস অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং পরকালে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকবে। সূরা 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অন্য মানুষের জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করলে এই দুটি মনোভাবের ফলাফল স্পষ্ট হয়।

নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর অ্যাপার্টমেন্ট

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর মসজিদের চারপাশে এমন কিছু অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করেছিলেন যা তাঁর এবং তাঁর পরিবারের জন্য বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হত। এগুলি ছিল ছোট ছোট আবাসস্থল এবং সংকীর্ণ উঠোন। এগুলি আকারে ছোট ছিল, কারণ একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় এই অ্যাপার্টমেন্টগুলির সর্বোচ্চ ছাদ স্পর্শ করতে পারতেন। এটি ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২০৭-এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, ২৪৮২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, সকল বৈধ ব্যয়ের প্রতিদান আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ করা হয়, কেবল নির্মাণ কাজে ব্যয় করা সম্পদ ছাড়া।

এর মধ্যে রয়েছে হালাল জিনিসপত্রের উপর সমস্ত ব্যয় যা অতিরিক্ত, অপচয় বা অপচয়মুক্ত। প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজে ব্যয় করা এই হাদিসে অন্তর্ভুক্ত নয় তবে প্রয়োজনের বাইরে নির্মাণ। এটি অপছন্দনীয় কারণ নির্মাণে ব্যয় করা সহজেই অপচয় এবং অপচয়ের দিকে পরিচালিত করে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি নির্মাণে সম্পদ ব্যয় করে তার দান-খয়রাত এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করার সম্ভাবনা কম থাকে। এছাড়াও এই আচরণ প্রায়শই একজন মুসলিমকে দীর্ঘ জীবনের আশা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে, কারণ যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে এই পৃথিবীতে তাদের অবস্থান অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, সে একটি সুন্দর বাড়ি তৈরিতে শক্তি এবং সম্পদ নষ্ট করবে না। দীর্ঘ জীবনের আশা যত বেশি, সে তত কম সৎকর্ম করবে এই বিশ্বাসে যে তারা ভবিষ্যতে সর্বদা সৎকর্ম করতে পারবে। এটি একজনকে আন্তরিক তওবা করতে বিলম্বিত করে এই বিশ্বাসে যে তারা ভবিষ্যতে সর্বদা উন্নতির জন্য পরিবর্তন করতে পারবে। অবশেষে, এটি একজনকে এই

পৃথিবীতে তাদের কথিত দীর্ঘস্থায়ী থাকার জন্য আরও আরামদায়ক জীবন তৈরি করার জন্য বিশ্বের প্রতি আরও প্রচেষ্টা উৎসর্গ করতে বাধ্য করে।

অপ্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা মানুষের সময় নষ্ট করে, যা তাদেরকে চরম ক্লান্তির কারণে রোজা এবং রাতের নামাজের মতো স্বেচ্ছাসেবী সৎকর্ম সম্পাদন করতে বাধা দেয়। এটি তাদেরকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার প্রচেষ্টা থেকেও বিরত রাখে।

অবশেষে, বাস্তবে, অপ্রয়োজনীয় নির্মাণে অংশ নেওয়া কখনও শেষ হয় না। অর্থাৎ, একজন ব্যক্তি তার বাড়ির একটি অংশ সম্পূর্ণ করার মুহূর্তে অন্যটিতে চলে যায় যতক্ষণ না চক্রটি পুনরাবৃত্তি হয়।

অতএব, মুসলমানদের উচিত কেবল নির্মাণ নয়, বরং সকল বিষয়ে তাদের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে যা আছে তা মেনে চলা, যাতে তারা এই নেতিবাচক পরিণতিগুলি এড়াতে পারে।

নামাযের আযান

মহানবী (সাঃ) এর মসজিদ নির্মাণের পর, মসজিদে জামাতের নামাজ কখন শুরু হবে সে সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করার প্রয়োজন ছিল। কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, যেমন শিঙা বা ঘণ্টা ব্যবহার করা, কিন্তু মহানবী (সাঃ) তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কারণ তিনি আহলে কিতাবদের অনুকরণ করতে চাননি। কেউ একজন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে জামাতের নামাজ শুরু হওয়ার সময় একজন ব্যক্তিকে আযান দিতে হবে। মহানবী (সাঃ) এই বিকল্পটি পছন্দ করেছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে একজন ব্যক্তি তাকে আযান কী হওয়া উচিত তা নির্দেশ করে। উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)ও একই রকম স্বপ্ন দেখেছিলেন। মহানবী (সাঃ) বিলাল বিন রাবাহ (রাঃ) কে জামাতের নামাজের জন্য আযান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর (সা.) মহানবী (সা.)-এর নোবেল লাইফ" বইয়ের ১ম খণ্ডের ৭৩১-৭৩৩ পৃষ্ঠায় এ বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একজন ইথিওপীয় প্রাক্তন দাসকে আজান দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। এমন একজন ব্যক্তি যাকে তার জাতিগততা এবং সামাজিক মর্যাদার কারণে আরবের বৃহত্তর সমাজ প্রায়শই অবজ্ঞার চোখে দেখত। এটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

ইসলাম মানুষের মর্যাদা বিচার করে একটি মাত্র বিষয়ের উপর ভিত্তি করে, অর্থাৎ তাকওয়া। অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে, যে ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো যত বেশি সঠিকভাবে ব্যবহার করবে, তার মর্যাদা তত বেশি হবে। সূরা ৪৯, আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যেহেতু একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য গোপন থাকে, তাই তাদের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে নিজেকে বা অন্যদেরকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিচার করা উচিত নয়। ৫৩তম অধ্যায় আন নাজম, আয়াত ৩২:

"... তাই তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবি করো না; তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কে তাঁকে ভয় করে।"

সঠিক আচরণ না করলে কেবল মানুষের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, যেমন বর্ণবাদ। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত লিঙ্গ, জাতিগততা বা সামাজিক মর্যাদার মতো অন্যান্য সমস্ত পার্থিব মানদণ্ডকে উপেক্ষা করা এবং পরিবর্তে ধার্মিকতার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা করা এবং অন্যদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করা।

এছাড়াও, আলোচিত মূল ঘটনাটি মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ আদায়ের গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ৪৩:

"...এবং যারা [ইবাদত ও আনুগত্যে] রুকু করে তাদের সাথে রুকু করো।"

প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদিসের কারণে, কিছু নির্ভরযোগ্য আলেম মুসলিম পুরুষদের উপর এটিকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আবু দাউদের ৫৫০ নম্বর হাদিসে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, যারা মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ আদায় করবে না, তাদেরকে সাহাবাগণ (রাঃ) মুনাফিক বলে মনে করতেন। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এমনকি এমন লোকদের ঘর পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন যারা বৈধ ওজর ছাড়া জামাতের সাথে ফরজ নামাজ আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সহিহ মুসলিমের ১৪৮২ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যারা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার অবস্থানে আছেন তাদের তা করা উচিত। তাদের নিজেদেরকে বোকা বানানো উচিত নয় এই দাবি করে যে তারা অন্যান্য সৎকর্ম করছে, যেমন তাদের পরিবারের সাথে ঘরের কাজে সাহায্য করা। যদিও সহীহ বুখারী, ৬৭৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এটি মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একটি ঐতিহ্য, কিন্তু নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর ঐতিহ্যের গুরুত্ব পুনর্বিন্যাস করা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে কেউ এটি করে সে তার ঐতিহ্য অনুসরণ করছে না, তারা কেবল তাদের নিজস্ব কামনা-বাসনা অনুসরণ করছে, এমনকি যদি তারা কোনও সৎকর্মও করে। প্রকৃতপক্ষে, এই একই হাদিসটি উপদেশ দিয়ে শেষ হয় যে, যখন ফরজ নামাজের সময় হত, তখন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) মসজিদের দিকে রওনা হতেন।

পরিশেষে, আলোচ্য মূল ঘটনাটিও ইঙ্গিত করে যে, জামাতের নামাজের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের অন্যান্য মুসলমানদের সাথে সংযোগ স্থাপনের গুরুত্ব কতটা। অভাবগ্রস্ত বেশিরভাগ মানুষ অন্যদের সাহায্যের বিজ্ঞাপন দেয় না বা ভিক্ষা করে না। অতএব, মুসলমানদের তাদের সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে পরিচিত হতে উৎসাহিত করা হয় যাতে তারা তাদের সমস্যার কথা একে অপরকে জানাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং তাদের সাহায্যের প্রয়োজন বলে মনে করে। ইসলামী শিক্ষায় মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ পড়ার উপর জোর দেওয়ার এটিই একটি কারণ। এটি মুসলমানদের অন্যদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে এবং এই সংযোগের মাধ্যমে অন্যদের সাহায্য করতে সাহায্য করে যারা তাদের প্রয়োজন স্পষ্ট করে না। এছাড়াও, এই সংযোগগুলি অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে অন্য

একজনের কাছে পরিচালিত করার সুযোগ দেয় যারা তাদের সাহায্য করার জন্য আরও ভালো অবস্থানে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, চাকরি খুঁজছেন এমন একজন ব্যক্তি সম্প্রদায়ের এমন একজন সদস্যের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন যিনি একজন কর্মচারী খুঁজছেন।

সদয় আচরণ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনার বিভিন্ন মুসলিম ও অমুসলিম গোষ্ঠীর মধ্যে একটি চুক্তি করেছিলেন। এটি নিশ্চিত করেছিল যে মদিনার অমুসলিমদের, যেমন ইহুদিদের, সাথে কখনও দুর্ব্যবহার করা হবে না। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিমকে এমন কাউকে সাহায্য করতে নিষেধ করা হয়েছিল যারা তাদের উপর অত্যাচার করার লক্ষ্য রাখে। এটি ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২১৩-এ আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আন নাসায়ীর ৪৯৯৮ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সা.) একজন প্রকৃত মুসলিম এবং একজন প্রকৃত মুমিনের লক্ষণ সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন। একজন প্রকৃত মুসলিম হলেন তিনি যিনি অন্যদের থেকে তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি দূরে রাখেন। প্রকৃতপক্ষে, এটি তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর মধ্যে এমন সব ধরণের কথা এবং কাজ অন্তর্ভুক্ত যা অন্যের ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হতে পারে। এর মধ্যে অন্যদের সর্বোত্তম উপদেশ না দেওয়াও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, কারণ এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার পরিপন্থী। সুনানে আন নাসায়ীর ৪২০৪ নম্বর হাদিসে এটি নির্দেশ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অন্যদেরকে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়ার পরামর্শ দেওয়া, যার ফলে তাদের পাপের দিকে আহ্বান করা। একজন মুসলিমের এই আচরণ এড়ানো উচিত কারণ তাদের খারাপ পরামর্শ অনুসারে কাজ করা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে। সহিহ মুসলিমের ২৩৫১ নম্বর হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অন্যদের ব্যবসায় জড়িত না হওয়া, কারণ এটি প্রায়শই অন্যদের ক্ষতি করে। একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের উপস্থিতিতে এবং অনুপস্থিতিতে তাদের প্রতি ইতিবাচকভাবে কথা বলা, ঠিক যেমন সে চায় অন্যরা তাদের সম্পর্কে ইতিবাচকভাবে কথা বলুক।

শারীরিক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবিকার জন্য সমস্যা তৈরি করা, প্রতারণা করা, অন্যদের প্রতারণা করা এবং শারীরিক নির্যাতন করা। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং এগুলি এড়িয়ে চলতে হবে।

আলোচ্য মূল হাদিস অনুসারে, একজন প্রকৃত মুমিন হলেন তিনি যিনি অন্যের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি থেকে দূরে থাকেন। আবার, এটি তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এর মধ্যে অন্যের সম্পত্তি চুরি, অপব্যবহার বা ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত। যখনই কাউকে অন্যের সম্পত্তির দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা কেবল মালিকের অনুমতি নিয়ে এবং মালিকের সন্তুষ্টি এবং সম্মতিক্রমে তা ব্যবহার করছে। সুনানে আন নাসায়ী, ৫৪২১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কেউ মিথ্যা শপথের মাধ্যমে অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে গ্রহণ করে, এমনকি তা গাছের ডালের মতো ছোট হলেও, সে জাহান্নামে যাবে।

উপসংহারে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই তার মৌখিক বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করতে হবে, কারণ এটি তার বিশ্বাসের শারীরিক প্রমাণ যা উভয় জগতে সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয়। এছাড়াও, একজন মুসলিমের উচিত আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মানুষের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্যগুলি পূরণ করা। মানুষের প্রতি এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল অন্যদের সাথে কেবল সেই আচরণ করা যা তারা মানুষের কাছ থেকে তাদের সাথে আচরণ করতে চায়, যা শ্রদ্ধা ও শান্তির সাথে।

ভ্রাতৃত্ব (RA)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর মক্কার মুহাজিরদের এবং মদীনার সাহাবীদের, সাহায্যকারীদের, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে ভাই হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীজীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২১৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সময়ের সাথে সাথে মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একে অপরের সাথে তাদের একসময়ের দৃঢ় সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে। এর অনেক কারণ আছে কিন্তু একটি প্রধান কারণ হল তাদের পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা যে ভিত্তির উপর তাদের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। এটা সর্বজনবিদিত যে যখন একটি ভবনের ভিত্তি দুর্বল হয় তখন সময়ের সাথে সাথে ভবনটি হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমনকি ভেঙে পড়ে। একইভাবে, যখন মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ভিত্তি সঠিক না হয় তখন তাদের মধ্যে বন্ধন অবশেষে দুর্বল হয়ে পড়ে এমনকি ভেঙে যায়। যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাহাবীদের (রাঃ) একত্রিত করেছিলেন, তখন তিনি তাদের মধ্যে বন্ধন তৈরি করেছিলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। যদিও, আজকের বেশিরভাগ মুসলিম গোত্রপ্রথা, ভ্রাতৃত্ব এবং অন্যান্য পরিবারের কাছে প্রদর্শনের জন্য। যদিও, বেশিরভাগ সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, আত্মীয় ছিলেন না কিন্তু যেহেতু তাদের সংযোগ স্থাপনের ভিত্তি সঠিক ছিল, অর্থাৎ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাদের বন্ধন আরও শক্তিশালী হতে থাকে। যদিও আজকাল অনেক মুসলিম রক্তের সম্পর্কযুক্ত, তবুও সময়ের সাথে সাথে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে কারণ তাদের বন্ধনের ভিত্তি ছিল মিথ্যা, যেমন গোত্রবাদ এবং অনুরূপ জিনিসের উপর ভিত্তি করে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, যদি তারা তাদের বন্ধন টিকে থাকতে এবং আত্মীয়তার বন্ধন এবং অ-আত্মীয়দের অধিকার রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য সওয়াব অর্জন করতে চায়, তাহলে তাদের কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই বন্ধন তৈরি করতে হবে। এর ভিত্তি হল, মানুষ কেবল একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করবে এবং এমনভাবে কাজ করবে যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে। পবিত্র কুরআনে এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৫ম সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ২:

"...এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

কৃতজ্ঞতার দুটি অংশ

মক্কার সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, একবার মদীনার সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা করেছিলেন। তারা বলেছিলেন যে তারা এমন কোনও জাতির সাথে কখনও যাননি যারা মদীনার সাহাবাগণের চেয়ে বেশি সাহায্য করেছে এবং বিনিময়ে কিছুই চায়নি। তারা আরও যোগ করেছেন যে মদীনার সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, তাদের অনেক কষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাদের সাথে তাদের সান্ত্বনা ভাগ করে নিয়েছেন। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে তারা ভয় পেয়েছেন যে মদীনার সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, মহান আল্লাহর সমস্ত প্রতিদান পাবেন এবং তারা, মক্কার সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, কিছুই পাবেন না, কারণ তারা প্রতিদান দেওয়ার মতো অবস্থায় ছিলেন না। কিন্তু মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছিলেন যে মক্কার সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, তারা ঠিক যেমন মদীনার সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, তাদের জন্য সঠিক প্রশংসা এবং দুআ করেছিলেন তেমনই পুরষ্কার পাবেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২১৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, ১৯৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে কখনও মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না।

যদিও নিঃসন্দেহে সকল নিয়ামতের উৎস মহান আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ নন, তবুও মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কারণ, মহান আল্লাহ তাআলা মাঝে মাঝে একজন ব্যক্তিকে অন্যদের সাহায্য

করার জন্য, যেমন তার পিতামাতাকে সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করেন। যেহেতু উপায় আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন এবং ব্যবহার করেছেন, তাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা আসলে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অতএব, মুসলমানদের উচিত উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা এবং অন্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত যেকোনো সাহায্য বা সহায়তার জন্য সর্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তা যত বড়ই হোক না কেন। তাদের উচিত আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁর আদেশ অনুসারে আশীর্বাদ ব্যবহার করে, কারণ তিনিই আশীর্বাদের উৎস এবং তাদের উচিত সেই ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যিনি তাদের সাহায্য করেছেন, কারণ এটিই সেই মাধ্যম যা মহান আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন এবং নির্বাচিত করেছেন। একজন মুসলমানের উচিত মানুষের প্রতি মৌখিকভাবে এবং কার্যত তাদের সদয় আচরণের প্রতিদান তাদের সামর্থ্য অনুসারে প্রদান করা, এমনকি যদি তা কেবল তাদের পক্ষ থেকে একটি প্রার্থনাও হয়। ইমাম বুখারীর "আদাব আল মুফরাদ", ২১৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাহায্যের বাহ্যিক প্রকাশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, অর্থাৎ একজন ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে সরাসরি মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সম্ভাবনা কম।

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না, তাই তাদের নিয়ামত বৃদ্ধি করা হবে না। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"আর [স্মরণ করো] যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের [নেয়ামত] বৃদ্ধি করব..."

যদি কোন মুসলিম বরকত বৃদ্ধি করতে চায়, তাহলে তাকে কৃতজ্ঞতার উভয় দিকই পূরণ করতে হবে, যথা, মহান আল্লাহর প্রতি এবং মানুষের প্রতি।

এছাড়াও, আলোচিত মূল ঘটনাটি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সাহায্য করার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

যখন একজন মুসলিম সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে তার যা কিছু আছে তা মহান আল্লাহর, তখন তার কাছে থাকা আশীর্বাদগুলো, যেমন দান, আল্লাহর অনুগ্রহে সঠিকভাবে ব্যবহার করা সহজ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এই মনোভাব গ্রহণ করে সে বুঝতে পারে যে তারা কেবল আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ফেরত দিচ্ছে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৫৪:

"হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদের যা রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করো..."

এই আচরণ অহংকারের মাধ্যমে তাদের দানশীলতার সৎকর্ম নষ্ট করা থেকেও রক্ষা করে। অহংকার একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করায় যে তারা দান করে আল্লাহ এবং অভাবীদের প্রতি অনুগ্রহ করছে। কিন্তু একইভাবে একজন ব্যক্তি গর্ব ছাড়াই ব্যাংক ঋণ ফেরত দেয়, মুসলমানদের বুঝতে হবে যে তাদের দান হল আল্লাহ প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের একটি উপায়। উপরন্তু, অভাবীরা তাদের দান গ্রহণ করে দাতার প্রতি অনুগ্রহ করছে। অভাবীরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাওয়ার একটি উপায়, এবং তাদের ছাড়া এটি অসম্ভব। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে তাদের সম্পদ তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং শক্তির মাধ্যমে জমা হয়েছে, তাহলে তাদের

বুঝতে হবে যে এই জিনিসগুলিও আল্লাহ প্রদত্ত। অতএব, সম্পদের মতো আশীর্বাদের আকারে এই ঋণ অবশ্যই আল্লাহর কাছে ফেরত দিতে হবে, অন্যথায় তাদের এমন শাস্তির সম্মুখীন হতে হতে পারে যা এই পৃথিবীতে শুরু হবে এবং পরকালেও অব্যাহত থাকবে।

যখন কেউ দান করে, তখন তার লেনদেন কোন অভাবী ব্যক্তির সাথে হয় না, বরং তা হয় মহান আল্লাহর সাথে। যখন কোন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর সাথে ব্যবসা করে, তখন তারা এমন এক অকল্পনীয় লাভের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে যা তাদের এই দুনিয়া ও আখেরাতে উপকৃত করবে। আলোচ্য মূল আয়াতগুলিতে এটি নির্দেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ২৪৫:

"কে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, যাতে তিনি তার জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন?"

উদারতা এবং বিধান

মদীনার সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, একবার মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে অনুরোধ করেছিলেন যে, তাদের খেজুর গাছের বাগান তাদের এবং মক্কার সাহাবীগণের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিতে। যেহেতু মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাননি, তাই তিনি তাদের মালিকানা ধরে রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং পরিবর্তে মক্কার সাহাবীগণকে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের জমিতে তাদের সাথে কাজ করার এবং তারপর জমির ফসল তাদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। সহীহ বুখারী, ৩৭৮২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও মদীনার সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের সম্পদ এবং ঘরবাড়ি মক্কার সাহাবীদের সাথে ভাগ করে নিতেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তবুও তারা অলস এবং অন্যদের উপর নির্ভরশীল হননি। বরং তারা নিজেদের এবং অন্যদের জন্য হালাল রিজিক অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, সা'দ ইবনে আর রাবী, আবদুর রহমান বিন আউফ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, কে অর্ধেক সম্পদ প্রদান করেছিলেন, কিন্তু আব্দুর রহমান বিন আউফ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাকে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং পরিবর্তে তার হালাল রিজিক অর্জনের জন্য বাজারে চলে গিয়েছিলেন। সহীহ বুখারী, ২০৪৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম ঘটনাটি ৩য় সূরা আলে ইমরানের ৯২ নং আয়াতের সাথে সম্পর্কিত:

"তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও কল্যাণ [প্রতিদান] পাবে না। আর তোমরা যা ব্যয় করো, আল্লাহ তা জানেন।"

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে যে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতে পারে না, অর্থাৎ, যতক্ষণ না তারা তাদের প্রিয় জিনিসগুলিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক হয়, ততক্ষণ তাদের ঈমানে ত্রুটি থাকবে। যদিও অনেকে বিশ্বাস করে যে এই আয়াতটি সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু বাস্তবে এর অর্থ আরও অনেক বেশি। এর মধ্যে প্রতিটি আশীর্বাদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা একজন মুসলিম পছন্দ করে এবং ভালোবাসে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানরা তাদের মূল্যবান সময়কে এমন জিনিসের জন্য উৎসর্গ করতে খুশি যা তাদের খুশি করে। কিন্তু তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সময় উৎসর্গ করতে অস্বীকার করে, ফরজ কর্তব্যের বাইরে যা দিনে মাত্র এক বা দুই ঘন্টা সময় নেয়। অগণিত মুসলমান তাদের শারীরিক শক্তি বিভিন্ন আনন্দদায়ক কাজে উৎসর্গ করতে খুশি, তবুও তাদের অনেকেই তা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য উৎসর্গ করতে অস্বীকার করে, যেমন স্বেচ্ছায় রোজা। সাধারণত, মানুষ তাদের কাঙ্ক্ষিত জিনিসের জন্য চেষ্টা করতে পেরে খুশি হয়, যেমন অতিরিক্ত সম্পদ অর্জন করা যার প্রয়োজন নেই, এমনকি যদি এর জন্য তাদের অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হয় এবং ঘুম ত্যাগ করতে হয়, তবুও কতজন এইভাবে আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়? কতজন নফল নামাজ পড়ার জন্য তাদের মূল্যবান ঘুম ত্যাগ করে?

এটা অদ্ভুত যে মুসলমানরা বৈধ পার্থিব ও ধর্মীয় আশীর্বাদ কামনা করে, কিন্তু একটি সহজ সত্য উপেক্ষা করে। তারা কেবল তখনই এই জিনিসগুলি পাবে যখন তারা তাদের আশীর্বাদগুলি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করবে। তারা কীভাবে তাঁর কাছে ন্যূনতম জিনিসগুলি উৎসর্গ করতে পারে এবং তবুও তাদের সমস্ত স্বপ্ন পূরণের আশা করতে পারে? এই মনোভাব সত্যিই অদ্ভুত।

এছাড়াও, আলোচ্য প্রধান ঘটনাগুলি অলস মনোভাব এড়িয়ে চলার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে যেখানে একজন ব্যক্তি তার দেওয়া সম্পদ, যেমন তাদের শারীরিক শক্তি, ব্যবহার করা এড়িয়ে চলে এবং তার পরিবর্তে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য অন্যদের সাহায্যের উপর নির্ভর করে। একজন মুসলিমের কর্তব্য হল ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের প্রদত্ত সম্পদ ব্যবহার করে তাদের রিজিক অর্জন করা যাতে তারা তাদের প্রয়োজন এবং দায়িত্ব পূরণ করতে পারে। মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছরেরও বেশি আগে তাদের রিজিক তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং এই বরাদ্দ পরিবর্তন হতে পারে না। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । কেবল তাদের অংশ পূরণ করতে হবে এবং তারপর ধৈর্য ধরে তাদের রিজিক প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। একজন মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হল তারা তাদের চাহিদা এবং দায়িত্ব পূরণ করে এবং অন্যদের সাহায্য করে। এমন নয় যে তারা অন্যদের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে সমাজের উপর বোঝা হয়ে ওঠে, যদি না তারা বৈধভাবে এর অধিকারী হয়, যেমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা।

প্রকৃত জ্ঞান

মদিনায়, বেশিরভাগ ইহুদি পণ্ডিত উদ্ধতভাবে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের (রাঃ) প্রতি বিদ্বেষে পরিপূর্ণ ছিলেন। তারাই ছিলেন যারা অন্যদের বিভ্রান্ত করার জন্য এবং তাদের একগুঁয়েমি ও অবিশ্বাস প্রকাশ করার জন্য মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে অনেক অর্থহীন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তারা ইসলামের জন্য পরিস্থিতি কঠিন করে তুলেছিলেন এবং ইসলামকে নির্মূল করার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করেছিলেন, যদিও তারা এর সত্যতা স্বীকার করেছিলেন। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 20:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই পণ্ডিতরা এইভাবে আচরণ করেছিলেন কারণ ইসলাম গ্রহণ এবং অনুসরণ তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে বাধা দিত, যার মধ্যে ছিল সম্পদ এবং নেতৃত্বের মতো পার্থিব জিনিসপত্র অর্জনের জন্য তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করা। ফলস্বরূপ, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ঐশ্বরিক শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা এবং সম্পাদনা করেছিল যাতে তারা ইসলাম প্রত্যাখ্যানকে ন্যায্যতা দেয় এবং নিশ্চিত করে যে তাদের অজ্ঞ অনুসারীরা ইসলাম গ্রহণের পরিবর্তে তাদের প্রতি অনুগত থাকবে।

সুনানে ইবনে মাজাহের ২৫৩ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি পণ্ডিতদের কাছে নিজেকে দেখানোর জন্য, অন্যদের সাথে তর্ক করার জন্য অথবা নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে, সে জাহান্নামে যাবে।

যদিও পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই সকল কল্যাণের ভিত্তি হলো জ্ঞান, তবুও মুসলমানদের বুঝতে হবে যে জ্ঞান তখনই তাদের উপকার করবে যখন তারা প্রথমে তাদের নিয়ত সংশোধন করবে। অর্থাৎ, তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করে। অন্য সকল কারণ কেবল পুরস্কার হারাতে পারে এমনকি শাস্তিও বয়ে আনবে যদি একজন মুসলিম আন্তরিকভাবে তওবা না করে।

বাস্তবে, জ্ঞান হলো বৃষ্টির পানির মতো যা বিভিন্ন ধরণের গাছের উপর পড়ে। কিছু গাছ এই পানি দিয়ে জন্মায় অন্যদের উপকার করার জন্য, যেমন একটি ফলের গাছ। অন্যদিকে, অন্যান্য গাছ এই পানি দিয়ে জন্মায় এবং অন্যদের জন্য বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। যদিও বৃষ্টির পানি উভয় ক্ষেত্রেই একই, তবুও ফলাফল খুব

আলাদা। একইভাবে, ধর্মীয় জ্ঞান মানুষের জন্য একই, কিন্তু যদি কেউ ভুল উদ্দেশ্য গ্রহণ করে তবে তা তাদের ধ্বংসের উপায় হয়ে উঠবে। বিপরীতে, যদি কেউ সঠিক উদ্দেশ্য গ্রহণ করে তবে তা তাদের মুক্তির উপায় হয়ে উঠবে।

তাই মুসলমানদের সকল বিষয়ে তাদের নিয়ত সংশোধন করা উচিত, কারণ এর ভিত্তিতেই তাদের বিচার করা হবে। সহীহ বুখারী, ১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এবং তাদের মনে রাখা উচিত যে জাহান্নামে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হবেন একজন পণ্ডিত যিনি কেবল অন্যদের দেখানোর জন্য জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সহীহ মুসলিম, ৪৯২৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এছাড়াও, জ্ঞানের উপর আমল করার সাথে সৎ উদ্দেশ্যকে যুক্ত করতে হবে, কারণ কর্ম ছাড়া জ্ঞান উপকারী জ্ঞান নয়, এটি কেবল তথ্য। জ্ঞানের উপর আমল না করা একজন ডাক্তারের মতো, যে মানুষের চিকিৎসার জন্য তার চিকিৎসা জ্ঞান প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়। ঠিক যেমন তারা নিজের বা অন্যদের উপকার করে না, তেমনি একজন মুসলিমেরও উপকার হয় না যার কাছে ইসলামী জ্ঞান আছে এবং তা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যক্তিকে জ্ঞানের বই বহনকারী গাধার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সূরা ৬২ আল জুমু'আ, আয়াত ৫:

"...এবং তারপর তা গ্রহণ না করা (তাদের জ্ঞান অনুসারে কাজ না করা) হল সেই গাধার মতো যে [বইয়ের] বই বহন করে..."

এছাড়াও, যে ব্যক্তি বৈধ কারণ ছাড়া জ্ঞান গোপন করবে, তাকে বিচারের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৪৯ নম্বরে পাওয়া একটি

হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, মুসলমানদের তাদের উপার্জিত উপকারী জ্ঞান অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়া উচিত। এটি না করা নিছক বোকামি কারণ এটি এমন একটি সৎকর্ম যা একজন মুসলিমের মৃত্যুর পরেও উপকারে আসবে। সুনান ইবনে মাজাহ, ২৪১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যারা জ্ঞান জমা করে রেখেছিল তাদের ইতিহাস ভুলে গেছে কিন্তু যারা তা অন্যদের সাথে ভাগ করে নিয়েছিল তারা মানবজাতির পণ্ডিত এবং শিক্ষক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

পরিশেষে, জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য বিতর্কে অন্যদের পরাজিত করা নয়। একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো দৃঢ় প্রমাণ সহকারে অন্যদের কাছে সত্য সঠিকভাবে উপস্থাপন করা। তর্ক-বিতর্ক এবং বিতর্কের মাধ্যমে মানুষকে সত্য গ্রহণে বাধ্য করার দায়িত্ব তাদের দেওয়া হয়নি। এই মনোভাব মানুষকে কেবল সত্য থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়। পরিবর্তে, তর্ক না করে মানুষকে সত্য ব্যাখ্যা করা উচিত এবং নিজেরাই সেই সত্যের উপর কাজ করে এই সত্যটি দেখানো উচিত। ধার্মিক পূর্বসূরীরা এভাবেই আচরণ করতেন এবং এই পদ্ধতি অন্যদের সত্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকর।

মদিনার মুনাফিকরা

দ্বিমুখী

এটা সকলেরই জানা যে, সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং যারা প্রকাশ্যে কুফরী করেছিলেন, তাদের বাদ দিয়ে মদিনায় তৃতীয় একটি দল আবির্ভূত হয়েছিল যারা মুনাফিক নামে পরিচিত ছিল। তারা মুসলিম হওয়ার সওয়াব পাওয়ার জন্য বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণের ভান করত কিন্তু অভ্যন্তরীণ ও গোপনে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে তারা কাফের ছিল। তাদের অনেক খারাপ বৈশিষ্ট্য ছিল যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, তাদের মধ্যে একজন মনোযোগ সহকারে পবিত্র কুরআন পাঠ শুনত, যখন তার সহযোগী মুনাফিকদের সাথে গোপনে ইসলামের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করত। এই ব্যক্তি একবার বলেছিলেন যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কেবল একজন কান ছিলেন যিনি তাকে বলা যেকোনো কথা বিশ্বাস করতেন। এই কথা শুনে আল্লাহ তায়ালা সূরা তওবার ৯ নং আয়াত নাজিল করেন:

"আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা নবীকে গালি দেয় এবং বলে, "তিনি কান।" বলো, "তোমাদের জন্য কল্যাণের কান, যে আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে এবং মুমিনদের কথা বিশ্বাস করে এবং তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য রহমত।" আর যারা আল্লাহর রাসূলকে গালি দেয়, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৯:৬১-৬২, পৃষ্ঠা ৮৮-৮৯-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুনাফিকের লক্ষণ হলো দ্বিমুখী হওয়া। এই ব্যক্তিই বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকদের খুশি করার জন্য তাদের আচরণ পরিবর্তন করে, যার মাধ্যমে তারা কিছু পার্থিব জিনিসপত্র অর্জনের ইচ্ছা পোষণ করে। তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, বিভিন্ন লোকের প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করে, কিন্তু তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। তারা মানুষের প্রতি আন্তরিক হতে ব্যর্থ হয় যা সুনানে আন নাসায়ী, ৪২০৪ নম্বরে বর্ণিত একটি হাদিসে নির্দেশিত হয়েছে। যদি তারা তওবা না করে তবে তারা আখেরাতে আগুনের দুটি জিহ্বা নিয়ে নিজেদের দেখতে পাবে। সুনানে আবু দাউদের ৪৮৭৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় আল বাকারা, আয়াত ১৪:

"যখন তারা মুমিনদের সাথে দেখা করে, তখন বলে, "আমরা ঈমান এনেছি", আর যখন তারা তাদের দুষ্ট সঙ্গীদের সাথে (একান্তে) মিলিত হয়, তখন বলে, "আমরা তোমাদের সাথে আছি; আমরা তো কেবল রসিকতা করছিলাম।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইসলামী শিক্ষার মধ্যে মুনাফিকির বৈশিষ্ট্যগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যাতে মুসলমানরা এগুলি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মৌখিকভাবে ইসলামে বিশ্বাসের দাবিকে এমন ভালো কাজের মাধ্যমে সমর্থন করা উচিত যা ভালো বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি। কিন্তু যদি কেউ খারাপ বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে, যেমন মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য, তাহলে তারা অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে, যার ফলে তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করবে। অতএব তাদের মনোভাব তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণার বিরোধিতা করবে এবং তাদের বিপথগামীতার তীব্রতার উপর নির্ভর করে, তারা তাদের ঈমানের আলো নিভিয়ে দিতে পারে।

এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। কারণ ঈমান একটি গাছের মতো যাকে ভালো কর্মের মাধ্যমে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ পুষ্টি না পেয়ে মারা যায়, তেমনি যে ব্যক্তি শারীরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমানও একইভাবে মারা যায়। অতএব, মুসলিমদের জন্য ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি শেখা এবং হিংসা, অহংকার এবং লোভের মতো এগুলি এড়িয়ে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিবর্তে ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত ভালো বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন উদারতা, কৃতজ্ঞতা এবং ধৈর্য গ্রহণ করা, যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে পারে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেওয়ার মাধ্যমে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করবে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অনৈক্য সৃষ্টি করা

মক্কার অমুসলিমরা যখন জানতে পারল যে মহানবী (সাঃ) মদিনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এমনকি স্থানীয় অমুসলিমদের সাথে চুক্তিও স্বাক্ষর করেছেন, তখন তারা মুনাফিকদের প্রধান আবদুল্লাহ বিন উবাইকে একটি হুমকিমূলক চিঠি পাঠিয়ে সতর্ক করে দিয়েছিল যে, তিনি যেন যুদ্ধ করে মহানবী (সাঃ) কে বহিষ্কার করেন, অন্যথায় তারা তাঁর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে মদীনা ধ্বংস করে দেন। সাহাবীদের (রাঃ) চ্যালেঞ্জ করার জন্য আবদুল্লাহ তার কিছু বন্ধুকে একত্রিত করেন, কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের কথা নাকচ করে দেন এবং তাদের মনে করিয়ে দেন যে মক্কার অমুসলিমরা কেবল তাদের মধ্যে সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করছে। আবদুল্লাহ বিন উবাই এবং তার অনুসারীরা পিছু হটে যান, কিন্তু তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকেন। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ১৯৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ভণ্ডামির লক্ষণ হলো, একজন ব্যক্তি সমাজে দুর্নীতি ছড়িয়ে দেয়। এই নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য পারিবারিক ইউনিট থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক স্তরে শেষ পর্যন্ত সকল সামাজিক স্তরকে প্রভাবিত করে। এই ধরণের ব্যক্তি ভালোর জন্য একত্রিত হতে দেখতে অপছন্দ করে কারণ এর ফলে অন্যদের পার্থিব মর্যাদা তাদের নিজেদের চেয়েও বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি তাদের গীবত এবং অপবাদের দিকে ঠেলে দেয় যাতে মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে চলে যায়। তাদের মন্দ মনোভাব তাদের নিজস্ব আত্মীয়তার বন্ধন ধ্বংস করে এবং যখন তারা অন্য পরিবারগুলিকে সুখী দেখতে পায় তখন তাদের সুখও নষ্ট করে। তারা দোষ খুঁজে বের করার লোক যারা তাদের সামাজিক মর্যাদাকে টেনে নামানোর জন্য অন্যদের ভুল উন্মোচন করার জন্য তাদের সময় ব্যয় করে। তারাই প্রথম ব্যক্তি যারা অন্যদের সম্পর্কে পরচর্চা শুরু করে এবং ভালো কথা বলা হলে বধির আচরণ করে। শান্তি ও নীরবতা তাদের বিরক্ত করে তাই তারা নিজেদের মনোরঞ্জনের জন্য সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করে। তারা সুনান ইবনে মাজাহ, ২৫৪৬ নম্বরে পাওয়া হাদিসটি মনে রাখতে ব্যর্থ

হয়। এটি পরামর্শ দেয় যে যে কেউ অন্যের দোষ ঢেকে রাখে, আল্লাহ, তার দোষ ঢেকে রাখবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করে এবং প্রকাশ করে, আল্লাহ তাআলা তার দোষ-ত্রুটি মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবেন। সুতরাং, বাস্তবে, এই ধরণের ব্যক্তি কেবল সমাজের কাছে নিজের দোষ-ত্রুটিই প্রকাশ করছে, যদিও তারা বিশ্বাস করে যে তারা অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করছে।

ঐশ্বরিক অভিভাবকত্ব

প্রথমদিকে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, দ্বারা পাহারায় ছিলেন, বিশেষ করে রাতে, কারণ তারা তাদের শত্রুদের কাছ থেকে আকস্মিক আক্রমণের আশঙ্কা করতেন। এরপর, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ৫ম সূরা আল-মায়িদার ৬৭ নম্বর আয়াতে নিম্নলিখিত কথাগুলি নাজিল করেন:

"... আর আল্লাহ তোমাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবেন..."

এরপর, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, নির্দেশ দিলেন যে, তাঁকে যেন আল্লাহ পাক যেমন পাহারা দিচ্ছিলেন, তেমন পাহারা না দেন। জামে আত তিরমিযী, ৩০৪৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকে রক্ষা করেন এবং বিশেষ যত্নের সাথে তাদের যত্ন নেন। তিনি অনুগতদের শয়তানের চক্রান্ত ও ফাঁদ থেকে রক্ষা করেন এবং অবাধ্যদেরকে তাঁর তাৎক্ষণিক শাস্তি থেকে রক্ষা করেন যাতে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার সুযোগ পায়।

একজন মুসলিমের উচিত মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে এই ঐশ্বরিক গুণাবলীর উপর কাজ করা, কিন্তু প্রতিটি পরিস্থিতি এবং

ফলাফলের মুখোমুখি হলে সর্বদা তাঁর ঐশ্বরিক যত্ন এবং পছন্দের উপর আস্থা রাখা, এমনকি যদি তারা কিছু পছন্দের পিছনের প্রজ্ঞা লক্ষ্য না করেও। এটি ধৈর্য এবং এমনকি মহান আল্লাহর পছন্দের প্রতি সন্তুষ্টি জাগিয়ে তোলে। অধ্যায় ৬৫ তালাক, আয়াত ৩:

"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে - তার জন্য তিনিই যথেষ্ট..."

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর সুরক্ষা মানুষের আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে না। বরং এটি মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করে। অতএব, এটি সর্বোত্তম সময়ে এবং এমনভাবে ঘটে যা সংশ্লিষ্ট মানুষের জন্য সর্বোত্তম। অতএব, একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য অব্যাহত রাখতে হবে, এমনকি যদি তারা তাঁর সুরক্ষা স্বীকার না করেও। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

একজন মুসলিমের এটাও বোঝা উচিত যে, তারা কেবল মহান অভিভাবক, অর্থাৎ মহান আল্লাহ, কর্তৃকই পথভ্রষ্টতা এবং শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে। এটি অহংকারের সকল লক্ষণ দূর করে এবং তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই ঐশ্বরিক গুণাবলীর উপর কাজ করতে হবে, তাদের প্রতিটি আমানত যেমন তাদের আশীর্বাদ ইসলামের শিক্ষা অনুসারে ব্যবহার করে রক্ষা করতে হবে। তাদের উচিত তাদের কর্ম এবং

কথাবার্তাকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে আরও বেশি আশীর্বাদ পাবে। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"আর [স্মরণ করো] যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের [নেয়ামত] বৃদ্ধি করব..."

ভালো ব্যবসার গুরুত্ব

প্রধান বাণিজ্যিক বাজারগুলি ইহুদিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, যারা সুদের মতো অবৈধ ও অন্যায্য কাজে অংশগ্রহণ করত। এরপর মহানবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর মসজিদের কাছে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ন্যায়সঙ্গত ও সুষ্ঠু ব্যবসায়িক লেনদেনের গুরুত্ব তুলে ধরেন যাতে লোকেরা একে অপরের সাথে ন্যায্যভাবে ব্যবসা করতে পারে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "নবী (সা.)-এর নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯২৩-৯২৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহের ২১৪৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, কেয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে অনৈতিক লোক হিসেবে উত্থিত করা হবে, তবে তারা ব্যতীত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, সৎকর্ম করে এবং সত্য কথা বলে।

এই হাদিসটি ব্যবসায়িক লেনদেনে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য প্রযোজ্য। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে আল্লাহকে ভয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, অন্যদের সাথে সেভাবেই আচরণ করা উচিত যেভাবে সে মানুষের কাছ থেকে আচরণ পেতে চায়।

ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের কথাবার্তায় সৎ থাকা এবং লেনদেনের সমস্ত বিবরণ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে প্রকাশ করা। সহীহ

বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদিস, সংখ্যা ২০৭৯, সতর্ক করে যে, যখন মুসলিমরা আর্থিক লেনদেনে জিনিসপত্র, যেমন তাদের পণ্যের ত্রুটি, গোপন করে, তখন এর ফলে বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

সৎকর্ম করার মধ্যে রয়েছে অন্যদের সাথে প্রতারণা করা থেকে বিরত থাকা, যাতে তারা অতিরিক্ত মূল্যে জিনিসপত্র কিনে প্রতারণা না করে। একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের সাথে সেই আচরণ করা যা সে অর্থপূর্ণভাবে চায়, সততা এবং সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে। একজন মুসলিম যেমন আর্থিক বিষয়ে দুর্ব্যবহার পছন্দ করেন না, তেমনি তাদেরও অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করা উচিত নয়।

সৎকর্ম করার মধ্যে রয়েছে ইসলাম এবং দেশের আইনে আলোচিত অবৈধ অনুশীলন এড়িয়ে চলা। যদি কেউ তাদের দেশের ব্যবসায়িক আইন নিয়ে সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে তাদের সেখানে ব্যবসা করা উচিত নয়।

অধিকন্তু, সৎকর্ম করার মধ্যে রয়েছে নিজের ব্যবসায়িক সাফল্যকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তাদের ব্যবসা এবং সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য আরাম এবং শান্তির উৎস হয়ে উঠবে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

কিন্তু যারা তাদের ব্যবসায়িক সাফল্যের অপব্যবহার করে তারা দেখতে পাবে যে এটি তাদের চাপ এবং দুর্দশার উৎস হয়ে ওঠে, কারণ তারা মহান আল্লাহকে ভুলে গেছে, যিনি তাদের সাফল্য দিয়েছেন। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন] এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।"

যারা ব্যবসা পরিচালনা করেন তাদের সর্বদা মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা উচিত কারণ এটি অনৈতিকতার দিকে পরিচালিত করে এবং অমরত্ব জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে এবং তার উপর কাজ করতে থাকবে যতক্ষণ না তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা একজন মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন। জামে আত তিরমিযী, ১৯৭১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

যুদ্ধের অনুমতি

ইসলামের শত্রুরা, মক্কার অমুসলিমরা, যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছিল, তখন মহান আল্লাহ মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য এবং শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। সূরা ২২ আল হজ্জ, আয়াত ৩৯:

" যাদের সাথে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদের [যুদ্ধের] অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কারণ তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ী করতে সক্ষম।"

ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার" বইয়ের ২০০-২০১ পৃষ্ঠায় এটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীসের অর্থ সঠিকভাবে বোঝার জন্য, সেগুলোকে সঠিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করতে হবে। অর্থাত্, কোনও আয়াত বা হাদিসকে বিচ্ছিন্নভাবে নেওয়া যাবে না, যদি না কারও কর্মকাণ্ডকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য এটি কোন প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়েছিল তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রেক্ষাপট সঠিকভাবে বোঝার জন্য, মহানবী (সা.)-এর জীবনের আলোকে এর সাথে সম্পর্কিত আয়াত এবং হাদিসগুলি মূল্যায়ন করা উচিত। কেবলমাত্র এইভাবেই এটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে একটি নির্দিষ্ট আয়াত বা হাদিস কী বা কাকে বোঝায়।

অধিকন্তু, মুসলমানরা কেবলমাত্র বৈধ শাসকের পতাকাতলে বহিরাগত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারে এবং যখন তা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে করা হয়। যারা যুদ্ধ করে তাদের অবশ্যই এই সীমা এবং নিয়ম লঙঘনের ক্ষেত্রে সর্বদা মহান আল্লাহকে ভয় করতে হবে। আলোচ্য মূল আয়াতে যেমনটি নির্দেশিত হয়েছে, কেবল তখনই যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া উচিত যখন কেউ আক্রমণ করা হয়। অতএব, শান্তিপূর্ণ অবস্থায় শত্রুর বিরুদ্ধে শারীরিক আগ্রাসন প্রদর্শন নিষিদ্ধ। আরেকটি নিয়ম হল, যখন শত্রু আগ্রাসন থেকে বিরত থাকে, তখন মুসলমানদেরও বিরত থাকতে হবে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৯৩:

"... কিন্তু যদি তারা থামে, তাহলে লঙঘনকারীদের ছাড়া আর কোনও আগ্রাসন [অর্থাৎ আক্রমণ] চলবে না।"

যদি শত্রু চায় শান্তি অবশ্যই প্রদান করতে হবে। ৪র্থ অধ্যায় আন নিসা, আয়াত ৯০:

"... অতএব যদি তারা তোমাদের কাছ থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয় এবং তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে শান্তি প্রস্তাব করে, তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে [যুদ্ধের] কোন কারণ রাখেননি।"

তৃতীয় নিয়ম হলো, বেসামরিক নাগরিকদের ক্ষতি করা যাবে না। আলোচ্য মূল আয়াতে এটি নির্দেশ করা হয়েছে কারণ এটি সীমালঙঘন। এছাড়াও, মহানবী

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বারবার যুদ্ধের সময় নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ, সেইসাথে সন্ন্যাসী ও সাধুদের ক্ষতি করতে নিষেধ করেছেন। এটি অনেক হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, যেমন সুনানে আবু দাউদ, ২৬১৪ নম্বরে এবং মুসনাদে আহমাদ, ২৭২৮ নম্বরে।

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) শিশু, মহিলা এবং বৃদ্ধদের হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। তিনি ফলদায়ক গাছ কাটা, সম্পত্তির ক্ষতি করা এবং গবাদি পশু হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, ৩৩১২১ নম্বরে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর বিন খাত্তাব (রা.) মুসলিম সেনাবাহিনীকে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, কৃষকের মতো অ-সৈনিকদের ক্ষতি না করা। মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, ৩৩১২০ নম্বরে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আসন্ন সংঘাতের ক্ষেত্রে মুসলিম জাতিকে যথাসাধ্য প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। এই প্রস্তুতির লক্ষ্য শত্রুকে আক্রমণ থেকে বিরত রাখা, এই ক্ষেত্রে শত্রু যদি শান্তি চায় তবে তাদের অবশ্যই তা মঞ্জুর করতে হবে। অধ্যায় ৮ আন-আনফাল, আয়াত ৬০-৬১:

"আর তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও ঘোড়া প্রস্তুত রাখো, যাতে তোমরা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারো... আর যদি তারা শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তোমরাও তার দিকে ঝুঁকে পড়ো..."

যারা মুসলমানদের সাথে তাদের চুক্তি মেনে চলে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হল। ৯ম অধ্যায়, তওবা, আয়াত ১২-১৩:

"আর যদি তারা চুক্তির পর তাদের শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের নিন্দা করে, তাহলে কুফরের নেতাদের সাথে যুদ্ধ করো, কারণ তাদের কোন শপথ [পবিত্র] নয়; [তাদের সাথে যুদ্ধ করো] যাতে তারা বিরত থাকে। তোমরা কি এমন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না যারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অথচ তারা প্রথমবারই তোমাদের উপর আক্রমণ শুরু করেছে?"

ইসলাম তাদের উপর আক্রমণ নিষিদ্ধ করেছে যারা তাদের চুক্তি মেনে চলে। অধ্যায় ৯, তওবা, আয়াত ৭:

"... যতক্ষণ তারা তোমার প্রতি সরল থাকে, ততক্ষণ তুমিও তাদের প্রতি সরল থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ [তাঁকে ভয় করে] সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার কোন প্রশ্নই ওঠে না কারণ এটি এমন একটি বিষয় যা কেবল মুখ এবং কাজের মাধ্যমেই নয়, হৃদয় দিয়েও গ্রহণ করতে হবে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২৫৬:

"ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন জোরজবরদস্তি থাকবে না..."

যারা মুসলমানদের সাথে শান্তিতে আছে তাদের সাথে সর্বদা ন্যায়বিচার করা উচিত। ৬০তম অধ্যায় আল মুমতাহানা, আয়াত ৮-৯:

"যারা ধর্মের কারণে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করে না, তাদের সাথে সদাচরণ করতে এবং তাদের সাথে ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন যারা ন্যায়বিচার করে। আল্লাহ কেবল তাদের সাথেই নিষেধ করেন যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে কারণ ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলব এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেব এবং তোমাদের বহিষ্কারে সহায়তা করব..."

যুদ্ধ মহান আল্লাহর কাছে ঘৃণ্য এবং মুসলমানদের এতে বাধ্য করা উচিত, তা কামনা করা উচিত নয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়..."

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এমনকি মুসলমানদেরকে যুদ্ধের ইচ্ছা না করার জন্য সতর্ক করেছিলেন এবং বরং তাদেরকে মহান আল্লাহর কাছ থেকে নিরাপত্তা

কামনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু যদি তাদেরকে শত্রুর মুখোমুখি হতে বাধ্য করা হয় তবে তাদের অবশ্যই অবিচল থাকতে হবে। সহীহ বুখারী, ২৯৬৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি উল্লেখ করা হয়েছে।

এই আয়াতগুলোর আসল উদ্দেশ্য হলো এই বিষয়টি জোর দিয়ে বলা যে, শক্তি প্রয়োগ কেবল তখনই করা উচিত যখন এর ব্যবহার অনিবার্য, কেবলমাত্র সেই পরিমাণে যা একেবারে প্রয়োজনীয় এবং পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের নির্দেশনায়।

যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কোন আয়াত বা হাদিস কে, কী এবং কোথায় প্রযোজ্য তা বোঝার জন্য তার সঠিক প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধ সম্পর্কিত আয়াত এবং হাদিসগুলিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হন। একটি খুব বিখ্যাত উদাহরণ হল একটি আয়াত যাকে তরবারির আয়াত বলা হয় যদিও পবিত্র কুরআনে "তরবারি" শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি। অধ্যায় ৯ তওবা, আয়াত ৫:

"আর যখন পবিত্র মাসগুলি অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন মুশরিকদের যেখানেই পাও হত্যা করো, তাদের বন্দী করো, অবরোধ করো এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে বসে থাকো..."

যেমনটি আগে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যুদ্ধের এই বিবৃতিটিও নির্দিষ্ট শর্ত এবং শান্তির ছাড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উপরন্তু, এই এবং অন্যান্য সম্পর্কিত আয়াতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অধ্যয়ন করলে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে এটি অমুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি সর্বজনীন নীতি নয়। অর্থ,

আয়াতটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং একটি নির্দিষ্ট স্থানে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করে।

"তরবারি" আয়াতের আশেপাশের আয়াতগুলি বারবার স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, যেসব মুশরিকদের কথা বলা হয়েছে তারা কেবল তারাই যারা বারবার মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তাদের শান্তি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে এবং মুসলিম সম্প্রদায় এবং তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে সহিংস আগ্রাসনে লিপ্ত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, "তরবারি" আয়াতের ঠিক আগের আয়াত, যার অর্থ, অধ্যায় ৯, আত তাওবাহ, আয়াত ৪, বলে:

"মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছো, অতঃপর তারা তোমাদের সাথে কোন কিছুতে কমতি করেনি অথবা তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি; সুতরাং তাদের সাথে তাদের চুক্তি তাদের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ [তাঁকে ভয় করে এমন] সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

এর পরে আরেকটি আদেশ এসেছে, সম্পর্কিত আয়াত, অধ্যায় ৯, আত তাওবার ৭ নং আয়াতে:

"আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কাছে মুশরিকদের চুক্তি কীভাবে হতে পারে, তবে যাদের সাথে তোমরা মসজিদুল হারামে চুক্তিবদ্ধ হয়েছো তাদের ছাড়া? যতক্ষণ তারা তোমাদের প্রতি একনিষ্ঠ থাকে, তোমরাও তাদের প্রতি একনিষ্ঠ থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ [তাঁকে ভয় করে] সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

এই মুশরিকদের অপরাধ, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, অন্যান্য সম্পর্কিত আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে। ৯ম অধ্যায়, তওবা, ৮-১০ আয়াত:

"কিভাবে [চুক্তি হতে পারে], যখন তারা তোমাদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে, তারা তোমাদের সম্পর্কে কোন আত্মীয়তার চুক্তি বা সুরক্ষার চুক্তি পালন করে না? তারা তাদের মুখ দিয়ে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের হৃদয় [সম্মতি] অস্বীকার করে, এবং তাদের অধিকাংশই অবাধ্য। তারা আল্লাহর আয়াতগুলিকে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিনিময় করেছে এবং [মানুষকে] তাঁর পথ থেকে বিরত রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে, তারা যা করছিল তা খুবই মন্দ। তারা কোন মুমিনের সাথে কোন আত্মীয়তার চুক্তি বা সুরক্ষার চুক্তি পালন করে না। এবং তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।"

এবং ৯ম অধ্যায়ে তাওবাহ, আয়াত ১২-১৩:

"আর যদি তারা চুক্তির পর তাদের শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের নিন্দা করে, তাহলে কুফরের নেতাদের সাথে যুদ্ধ করো, কারণ তাদের কোন শপথ [পবিত্র] নয়; [তাদের সাথে যুদ্ধ করো] যাতে তারা বিরত থাকে। তোমরা কি এমন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না যারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অথচ তারা প্রথমবারই তোমাদের উপর [আক্রমণ] শুরু করেছে?"

এই নির্দিষ্ট মুশরিকরা ক্রমাগত তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অন্যদের সাহায্য করেছে। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করেছে, মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিয়েছে, মক্কা এবং মসজিদ আল হারাম থেকে মুসলমানদের বহিষ্কার করেছে। উদ্ধৃত আয়াতগুলিতে কমপক্ষে আটবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৯ম সূরা তওবার ১২ নম্বর আয়াতে, যা উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে, "কুফরের নেতাদের" বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্য হল যাতে তারা তাদের আগ্রাসনমূলক কাজ থেকে "বিরতি" পায়। এই আয়াতগুলি, অন্যান্য আয়াতগুলির মতো, যুদ্ধের সময় নির্দিষ্ট শর্ত মেনে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমন কেবল তাদের সাথে লড়াই করা যারা প্রথমে তাদের সাথে লড়াই করে।

উপরন্তু, এই মুশরিকদের এখনও অনেক সতর্কীকরণ এবং ছাড় দেওয়া হয়েছিল। তাদের চার মাসের অবকাশ এবং শান্তি দেওয়া হয়েছিল। অধ্যায় ৯ তওবা, আয়াত ২:

"অতএব, [হে কাফেররা], তোমরা চার মাস ধরে পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করো এবং জেনে রাখো যে, তোমরা আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না..."

এবং অধ্যায় ৯, তওবা, আয়াত ৫:

"আর যখন অলঙ্ঘনীয় [চার] মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন মুশরিকদের যেখানেই পাও হত্যা করো, তাদের বন্দী করো, অবরোধ করো এবং প্রতিটি ওৎ পেতে থাকা স্থানে তাদের জন্য ওৎ পেতে বসে থাকো..."

এই অবকাশ দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে অথবা শান্তিপূর্ণভাবে আরব উপদ্বীপ ত্যাগ করে। অধিকন্তু, মহানবী (সা.) কে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, এই মুশরিকদের যে কেউ যদি ইসলামের শিক্ষা শুনতে চায়, তাহলে তাদেরকে সুরক্ষা প্রদান করা হোক যাতে তারা কোনও ভয় বা চাপ ছাড়াই ইসলামের শিক্ষা শোনার সুযোগ পায় অথবা তারা কোনও ক্ষতির আশঙ্কা ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে আরব উপদ্বীপ ত্যাগ করতে পারে। ৯ম অধ্যায় তওবা, ৬ম আয়াত:

"আর যদি কোন মুশরিক তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও যাতে সে আল্লাহর বাণী [অর্থাৎ, কুরআন] শুনতে পায়। তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা জানে না।"

তরবারি আয়াতে এই মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ এবং হত্যা করার নির্দেশ কেবল তখনই কার্যকর হবে যদি তারা চার মাসের অবকাশের পরে ইসলাম গ্রহণ না করে আরব উপদ্বীপে থেকে যায়। এটি লক্ষণীয় যে অনেক মুশরিক এই অবকাশের সুযোগ নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই অবকাশের কারণে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায় এবং তরবারি আয়াতের কারণে কোনও রক্তপাত হয়নি কারণ এই আয়াতের লক্ষ্য ছিল আরও রক্তপাতের অর্থ প্রতিরোধ করা, হয় এই মুশরিকরা ইসলাম গ্রহণ করে অথবা শান্তিপূর্ণভাবে আরব উপদ্বীপ ত্যাগ করে।

পরিশেষে, আশেপাশের আয়াতগুলি এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনী, তরবারির আয়াতটিকে তার সঠিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে। অর্থাৎ, এই আয়াতগুলি বিশেষভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট শত্রু মুশরিকদের আক্রমণ বন্ধ করার জন্য নাজিল করা হয়েছিল। অতএব, তাদের পরে অন্যদের ক্ষেত্রে এগুলি খালি প্রয়োগ করা যাবে না।

অভিবাসনের পর দ্বিতীয় বছর

প্রার্থনার দিক পরিবর্তন

সর্বদা মহান আল্লাহর মুখোমুখি থাকা

মহানবী (সাঃ) এর মদিনায় হিজরতের দ্বিতীয় বছরে, নামাজের দিক, কিবলা, জেরুজালেমের মসজিদ আকসা থেকে মক্কার কাবা শরীফে পরিবর্তন করা হয়। মহানবী (সাঃ) এই পরিবর্তন কামনা করেছিলেন এবং তাঁর পবিত্র মুখমন্ডল আসমানের দিকে ফিরিয়ে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা সূরা আল বাকারার ১৪৪ নং আয়াত নাযিল করেন:

"আমরা অবশ্যই তোমার মুখ আকাশের দিকে ফেরা দেখেছি, এবং আমরা অবশ্যই তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেবো যার প্রতি তুমি সন্তুষ্ট হবে। অতএব, তোমার মুখ [অর্থাৎ, নিজেকে] মসজিদ আল-হারামের দিকে ফেরাও। আর তোমরা [মুমিনগণ] যেখানেই থাকো না কেন, [নামাজে] তোমাদের মুখ [অর্থাৎ, নিজেদের] তার দিকে ফেরাও..."

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মুসলমানরা যখন নামাজ পড়েন, তখন মক্কায় অবস্থিত আল্লাহর ঘর কাবার দিকে মুখ করে থাকার অন্যতম কারণ হলো তাদের সারাদিন আল্লাহর আনুগত্যের মুখোমুখি হওয়ার কথা মনে করিয়ে দেওয়া। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত সঠিক আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করা জড়িত। ইসলাম একটি সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা যেখানে একজন ব্যক্তিকে সারাদিন এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে আল্লাহর আনুগত্যের মুখোমুখি হতে হয়। ইসলাম কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের একটি সেট নয় যা দিনে, সপ্তাহে বা বছরে কয়েকবার করা হয়। যদি কেউ ইসলামের সাথে এইভাবে আচরণ করে, তাহলে তারা অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে, এমনকি যদি তারা মৌলিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলি পালন করে। এটি তাদের মানসিক এবং শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখতে বাধা দেবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল জায়গায় নিয়ে যাবে। অতএব, এই মনোভাব তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে। এই ভুল মনোভাব গ্রহণ করাই একটি প্রধান কারণ, মুসলমানরা ইসলামের মৌলিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ, পালন করার পরেও মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে না।

প্রার্থনার দিকনির্দেশনা

মহানবী (সাঃ) এর মদিনায় হিজরতের দ্বিতীয় বছরে, নামাজের দিক, কিবলা, জেরুজালেমের মসজিদ আকসা থেকে মক্কার কাবা শরীফে পরিবর্তন করা হয়। মহান আল্লাহ, দ্বিতীয় সূরা আল বাকারার ১৪৩ আয়াতে, একের পর এক দুটি নামাজের দিকনির্দেশনা রাখার উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছেন:

"... আর তুমি যে কেবলায় ছিলে, আমরা তাকে কেবলা হিসেবে নির্ধারণ করিনি, কেবল এজন্য যে আমরা স্পষ্ট করে দিতে পারি যে কে রাসূলের অনুসরণ করবে এবং কে পশ্চাদপসরণ করবে..."

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

একের পর এক দুটি প্রার্থনার নির্দেশনার উদ্দেশ্য ছিল এই পরিবর্তনে এবং জীবনের যে কোনও দিকেই তাঁর পছন্দ অনুসারে তাঁকে অনুসরণ করে স্পষ্ট করে তোলা যে কে সত্যিই মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি আন্তরিক ছিলেন। অতএব, তাঁর জীবন ও শিক্ষা শেখা এবং সে অনুযায়ী কাজ করার মাধ্যমে, পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বিশ্বাস করা, ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা করার তাদের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করা উচিত। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এবং ৫৯তম অধ্যায় আল হাশর, ৭ম আয়াত:

"... আর রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো; আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো..."

এবং অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৮০:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

এবং অধ্যায় ৩৩ আল আহযাব, আয়াত ২১:

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে একটি চমৎকার আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"

তাঁর পবিত্র চরিত্রের অনুকরণে তাদের চরিত্রকে গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং উদারতার মতো ভালো গুণাবলী গ্রহণ করে এবং হিংসা, অহংকার এবং লোভের মতো নেতিবাচক গুণাবলী পরিত্যাগ করে। এটি তাদের মানসিক শান্তি নিশ্চিত করবে, কারণ ইতিবাচক গুণাবলী গ্রহণের ফলে ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে শেখা এবং তার উপর আমল করা, বহির্বিশ্বের কাছে তাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা নিশ্চিত করবে। যে ব্যক্তি এটি করতে ব্যর্থ হয় সে অনিবার্যভাবে তাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করবে এবং অমুসলিম এবং অন্যান্য মুসলিমদের ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করা থেকে বিরত রাখবে। তাঁর ভুল উপস্থাপনের ফলে বহির্বিশ্ব মুসলমানদের খারাপ আচরণ পর্যবেক্ষণ করলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমালোচনা করবে। এটি এমন একটি বিষয় যা প্রতিটি মুসলিমকে জবাবদিহি করতে হবে কারণ তাদের উপর কর্তব্য হলো আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে বহির্বিশ্বের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা।

উপরন্তু, পূর্ববর্তী জাতিগুলি যারা তাদের পবিত্র নবীদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভালোবাসার দাবি করে, তারা যেমন আখেরাতে তাদের সাথে মিলিত হবে না কারণ তারা কার্যত তাদের অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তেমনি যে মুসলিমরা কার্যত নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তারাও আখেরাতে তাঁর সাথে মিলিত হবে না। বরং, একজন ব্যক্তি তাদের সাথে মিলিত হবে যাদের তারা এই পৃথিবীতে কার্যত অনুকরণ করেছিল। সুনান আবু দাউদের ৪০৩১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ভালো প্রচেষ্টা এবং বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা

মহানবী (সাঃ) এর মদিনায় হিজরতের দ্বিতীয় বছরে, নামাজের দিক, কিবলা, জেরুজালেমের মসজিদ আকসা থেকে মক্কার কাবাতে পরিবর্তন করা হয়। সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, অন্যান্য সাহাবীদের, যারা নামাজের দিক পরিবর্তনের আগে মারা গেছেন, তাদের নামাজ কি কবুল হবে? আল্লাহ, মহিমান্বিত, এরপর সূরা আল বাকারার ১৪৩ নং আয়াত নাযিল করেন:

"... আর আল্লাহ কখনও তোমাদের ঈমান [অর্থাৎ, তোমাদের পূর্ববর্তী নামাজ] নষ্ট করতেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি স্নেহশীল ও করুণাময়।"

জামে আত তিরমিযী, ২৯৬৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি ১১ নম্বর সূরা হুদের ১১৫ নম্বর আয়াতের সাথে সম্পর্কিত:

"... আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট হতে দেন না।"

এই আয়াতটি আশা প্রদান করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ বৈধ ও কল্যাণকর কিছু করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রচেষ্টা নষ্ট হবে না। যদি আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, এমন লোকদের প্রচেষ্টা নষ্ট না করেন যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করে না, তাহলে তিনি কেন তাদের সমর্থন করবেন না যারা তাঁর একত্ববাদ এবং প্রভুত্বে বিশ্বাস করে? যদি আল্লাহ, মানুষের পার্থিব জীবনের জন্য প্রচেষ্টা করার সময় তাদের প্রচেষ্টা নষ্ট না করেন, তাহলে তিনি কীভাবে তাদের প্রচেষ্টা নষ্ট করবেন যারা পরকালে কল্যাণ অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করে?

তাই মানুষের উচিত কখনোই এই দুনিয়া এবং পরকালে কল্যাণ অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা ত্যাগ করা নয়। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলিম কিছু কষ্টের সম্মুখীন হয়ে বৈধ আয় উপার্জনের জন্য সংগ্রাম ছেড়ে দিয়েছেন। পরিবর্তে তারা সামাজিক সুবিধা গ্রহণ এবং সমাজের উপর বোঝা হয়ে ওঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যারা সুবিধা পাওয়ার অধিকারী তাদের উচিত এগুলো ব্যবহার করা চালিয়ে যাওয়া কারণ এটি তাদের অধিকার। কিন্তু যাদের নিজেদের জন্য উপার্জন করার ক্ষমতা আছে তাদের তা করা উচিত।

এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে অন্যদের প্রতি ভালো কাজ চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করে, এমনকি যদি তারা তাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা না করেও। যদি কেউ আন্তরিকতার সাথে কাজ করে অর্থাৎ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাহলে তাদের আত্মবিশ্বাস থাকা উচিত যে তাদের প্রচেষ্টা রেকর্ড করা হয়েছে এবং উভয় জগতেই পুরস্কৃত করা হবে।

পরিশেষে, একজন মুসলিম যে বৈধ কাজই করুক না কেন, তা সে পার্থিব হোক, যেমন ব্যবসায়িক সুযোগ, অথবা ধর্মীয় কাজ, তাদের সেই কাজে পূর্ণ প্রচেষ্টা করা উচিত, এই জেনে যে, মহান আল্লাহ তাআলা তাদের সাহায্য করবেন এবং শীঘ্রই বা পরে তাদের সাফল্য দান করবেন।

উপরন্তু, আলোচিত মূল ঘটনাটি স্পষ্টভাবে ঈমানকে ফরজ নামাজের সাথে সংযুক্ত করে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৪৩:

"... আর আল্লাহ কখনও তোমাদের ঈমান [অর্থাৎ, তোমাদের পূর্ববর্তী নামাজ] নষ্ট করতেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি স্নেহশীল ও করুণাময়।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ এই আয়াতে নামাজের পরিবর্তে "ঈমান" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হলো, ফরজ নামাজ কায়েম না করে প্রকৃত ঈমান অর্জন করা সম্ভব নয়।

জামে আত তিরমিযী, ২৬১৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো ফরজ নামাজ ত্যাগ করা।

আজকের যুগে এটা খুবই সাধারণ হয়ে উঠেছে। অনেকেই তুচ্ছ কারণে তাদের ফরজ নামাজ ছেড়ে দেয়, যার সবগুলোই নিঃসন্দেহে বাতিল। যদি যুদ্ধে লিপ্ত ব্যক্তির উপর থেকে নামাজের ফরজ তুলে না নেওয়া হয়, তাহলে অন্য কারো উপর থেকে কিভাবে তা তুলে নেওয়া যাবে? ৪র্থ অধ্যায় আন-নিসা, আয়াত ১০২:

"আর যখন তুমি [অর্থাৎ, সেনাবাহিনীর অধিনায়ক] তাদের মধ্যে থাকো এবং তাদের নামাজে ইমামতি করো, তখন তাদের একটি দল যেন তোমার সাথে [নামাজে] দাঁড়ায় এবং তারা যেন তাদের অস্ত্র বহন করে। আর যখন তারা সিজদা করে, তখন যেন তারা তোমার পিছনে থাকে এবং অন্য দল যারা [এখনও] নামাজ পড়েনি তাদের এগিয়ে নিয়ে আসে এবং তারা যেন তোমার সাথে নামাজ পড়ে, সাবধানতা অবলম্বন করে এবং তাদের অস্ত্র বহন করে..."

মুসাফির বা অসুস্থ উভয়কেই তাদের ফরজ নামাজ আদায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় না। মুসাফিরদের উপর বোঝা কমানোর জন্য কিছু ফরজ নামাজে চক্রের সংখ্যা কমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে তা আদায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। ৪র্থ সূরা আন-নিসা, আয়াত ১০১:

"আর যখন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো, তখন নামায সংক্ষিপ্ত করার ক্ষেত্রে তোমাদের কোন দোষ নেই..."

অসুস্থদের পানির সংস্পর্শে আসার ফলে যদি তাদের ক্ষতি হয়, তাহলে শুকনো অযু করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সূরা ৫, আল মায়িদা, আয়াত ৬:

"...কিন্তু যদি তোমরা অসুস্থ হও, অথবা সফরে থাকো, অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে, অথবা তোমরা নারীদের সাথে যোগাযোগ করে পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি ব্যবহার করো এবং তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মুছে ফেলো..."

এছাড়াও, অসুস্থ ব্যক্তিরা তাদের জন্য সহজে ফরজ নামাজ আদায় করতে পারেন। অর্থাৎ, যদি তারা দাঁড়াতে না পারে তবে তাদের বসতে দেওয়া হবে এবং যদি তারা বসতে না পারে তবে তারা শুয়ে ফরজ নামাজ আদায় করতে পারবে। জামে আত তিরমিযীর ৩৭২ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু আবারও, অসুস্থ ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয় না যদি না তারা মানসিকভাবে অসুস্থ হয় যা তাদের নামাজের ফরজ বুঝতে বাধা দেয়।

আরেকটি প্রধান সমস্যা হলো, কিছু মুসলিম তাদের ফরজ নামাজ বিলম্বিত করে এবং সঠিক সময়ের চেয়ে বেশি সময় ধরে আদায় করে। এটি স্পষ্টতই পবিত্র কুরআনের বিরোধিতা করে কারণ মুমিনদেরকে তারা বলে বর্ণনা করা হয়েছে যারা তাদের ফরজ নামাজ সময়মতো আদায় করে। ৪র্থ সূরা আন নিসা, আয়াত ১০৩:

"...নিশ্চয়ই, নামাজ মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফরজ করা হয়েছে।"

অনেকে বিশ্বাস করেন যে পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি তাদের কথা বলে যারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে তাদের ফরজ নামাজ বিলম্বিত করে। এটি তাফসীরে ইবনে কাসির, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৬০৩-৬০৪-এ আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় ১০৭ আল মা'উন, আয়াত ৪-৫:

"অতএব দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নামাজ পড়ে। [কিন্তু] যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে গাফিল।"

এখানে মহান আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে তাদের অভিশাপ দিয়েছেন যারা এই খারাপ স্বভাব গ্রহণ করেছে। যদি তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে, তাহলে কীভাবে তারা এই পৃথিবীতে বা পরকালে সাফল্য পাবে?

সুনানে আন নাসায়ীর ৫১২ নম্বর হাদিসে মহানবী (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, ফরজ নামাজ অকারণে বিলম্বিত করা মুনাফিকির লক্ষণ। পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে যে, মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করবে তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো ফরজ নামাজ কায়াম না করা। ৭৪ সূরা আল-মুদ্দাছ্‌সির, আয়াত ৪২-৪৩:

"[এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে], "কিসে তোমাদের সাকারে প্রবেশ করানো হয়েছিল?" তারা বলবে, "আমরা নামাজ পড়তাম না।"

ফরজ নামাজ ত্যাগ করা এতটাই গুরুতর পাপ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৬২১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, যে কেউ এই পাপ করবে সে ইসলামে কুফরী করল।

তাছাড়া, অন্য কোন নেক আমল একজন মুসলিমের জন্য উপকারী হবে না যতক্ষণ না তার ফরজ নামাজ কায়েম হয়। সহীহ বুখারীতে পাওয়া ৫৫৩ নম্বর হাদিসে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি কেউ দুপুরের ফরজ নামাজ ত্যাগ করে, তাহলে তার নেক আমল ধ্বংস হয়। যদি এই অবস্থায় একটি ফরজ নামাজ ত্যাগ করার হয়, তাহলে কি কেউ কল্পনা করতে পারে যে, সবগুলো ত্যাগ করার শাস্তি কী হতে পারে?

সহীহ মুসলিমের ২৫২ নম্বর হাদিসে সঠিক সময়ে ফরজ নামাজ আদায় করাকে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমলের মধ্যে একটি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, ফরজ নামাজ সময়ের চেয়ে বিলম্বিত করা বা সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজগুলির মধ্যে একটি।

সকল বয়স্কদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য যে তারা তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা শিশুদের ছোটবেলা থেকেই ফরজ নামাজ পড়তে উৎসাহিত করে, যাতে তারা আইনত বাধ্যতামূলক হওয়ার আগেই তা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। যারা প্রাপ্তবয়স্করা এটি বিলম্বিত করে এবং শিশুদের বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তারা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে। যেসব শিশুদের উপর ফরজ নামাজ ফরজ হওয়ার পরই ফরজ নামাজ আদায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছিল, তারা খুব কমই তা দ্রুত আদায় করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে তাদের বছরের পর বছর সময় লাগে। এবং এর জন্য দায় পরিবারের বয়স্কদের, বিশেষ করে পিতামাতার। এই কারণেই নবী মুহাম্মদ (সা.) সুনানে আবু দাউদের ৪৯৫ নম্বর হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, পরিবারগুলি তাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে ফরজ নামাজ পড়তে উৎসাহিত করে।

অনেক মুসলিমের আরেকটি প্রধান সমস্যা হলো, তারা হয়তো ফরজ নামাজ আদায় করে কিন্তু সঠিকভাবে আদায় করতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ, অনেকেই নামাজের ধাপগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করে না এবং তাড়াহুড়ো করে তা সম্পন্ন করে। বাস্তবে, সহীহ বুখারির ৭৫৭ নম্বর হাদিসে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এভাবে নামাজ পড়ে সে মোটেও নামাজ পড়েনি। অর্থাৎ, তাকে নামাজ পড়া ব্যক্তি হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি এবং তাই তার ফরজ আদায় করা হয়নি।

জামে আত তিরমিযির ২৬৫ নম্বর হাদিসে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি নামাজের প্রতিটি অবস্থানে স্থির থাকে না তার নামাজ কবুল হয় না।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সালাতে সঠিকভাবে রুকু বা সিজদা না করা ব্যক্তিকে সবচেয়ে খারাপ চোর হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মুওয়াত্তা মালিকের বই নম্বর ৯, হাদিস নম্বর ৭৫-এ প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম যারা দশকের পর দশক ধরে এই ধরণের ফরজ এবং নফল নামাজ আদায় করে আসছেন, তারা দেখতে পাবেন যে তাদের কেউই তাদের ফরজ আদায় করেনি এবং তাই তাদের সাথে এমন আচরণ করা হবে যারা তাদের ফরজ আদায় করেনি। সুনান আন নাসায়ীর ১৩১৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ৪৩:

"...এবং যারা [ইবাদত ও আনুগত্যে] রুকু করে তাদের সাথে রুকু করো।"

প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদিসের কারণে, কিছু নির্ভরযোগ্য আলেম মুসলিম পুরুষদের উপর এটিকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আবু দাউদের ৫৫০ নম্বর হাদিসে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, যারা মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ আদায় করবে না, তাদেরকে সাহাবীগণ (রাঃ) মুনাফিক বলে মনে করতেন। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এমনকি এমন লোকদের ঘর পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন যারা বৈধ ওজর ছাড়া জামাতের সাথে ফরজ নামাজ

আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সহিহ মুসলিমের ১৪৮২ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যারা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার অবস্থানে আছেন তাদের তা করা উচিত। তাদের নিজেদেরকে বোকা বানানো উচিত নয় যে তারা তাদের পরিবারের সাথে ঘরের কাজে সাহায্য করার মতো অন্যান্য সৎকর্ম করছে। যদিও সহীহ বুখারী, ৬৭৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এটি মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একটি ঐতিহ্য, কিন্তু নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর ঐতিহ্যের গুরুত্ব পুনর্বিন্যাস করা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে কেউ এটি করে সে তার ঐতিহ্য অনুসরণ করছে না, বরং তারা কেবল নিজের ইচ্ছা অনুসরণ করছে, এমনকি যদি তারা কোনও সৎকর্মও করে। প্রকৃতপক্ষে, এই একই হাদিসটি উপদেশ দিয়ে শেষ হয় যে, যখন ফরজ নামাজের সময় হত, তখন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মসজিদে যাওয়া উচিত ছিল।

উপরন্তু, যেহেতু প্রতিদিনের নামাজগুলো বিস্তৃত, তাই এগুলো বিচার দিবসের ধ্রুবক স্মারক হিসেবে কাজ করে এবং এর জন্য কার্যত প্রস্তুতি নেয়, কারণ ফরজ নামাজের প্রতিটি ধাপ বিচার দিবসের সাথে সম্পর্কিত। যখন কেউ সঠিক পথে দাঁড়াবে, তখন বিচার দিবসে সে এভাবেই মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। আল মুতাফিফিন অধ্যায় ৮৩, আয়াত ৪-৬:

" তারা কি ভাবে না যে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে? এক মহাদিনের জন্য, যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে?"

যখন তারা রুকু করে, তখন এটি তাদের সেই অনেক লোকের কথা মনে করিয়ে দেয় যারা পৃথিবীতে তাদের জীবদ্দশায় মহান আল্লাহর কাছে রুকু না করার জন্য বিচারের দিনে সমালোচিত হবে। সূরা ৭৭ আল মুরসালাত, আয়াত ৪৮:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'নামাজে রুকু করো', তখন তারা রুকু করে না।"

এই সমালোচনার মধ্যে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ না করাও অন্তর্ভুক্ত। যখন কেউ নামাজে সিজদা করে, তখন এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিচারের দিনে মানুষকে মহান আল্লাহর কাছে সিজদা করার জন্য কীভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য করার জন্য সঠিকভাবে সিজদা করেনি , তারা বিচারের দিনে এটি করতে সক্ষম হবে না। সূরা ৬৮ আল-কালাম, আয়াত ৪২-৪৩:

"যেদিন পরিস্থিতি কঠিন হবে, সেদিন তাদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের চোখ অবনত হবে, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। আর তাদেরকে সুস্থ অবস্থায় সিজদা করার জন্য ডাকা হত।"

যখন কেউ নামাযে হাঁটু গেড়ে বসে, তখন এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে কিয়ামতের দিন তারা কীভাবে তাদের চূড়ান্ত বিচারের ভয়ে আল্লাহর সামনে এই অবস্থানে বসে থাকবে। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২৮:

"আর তুমি প্রত্যেক জাতিকে [ভয়ে] নতজানু দেখবে। প্রত্যেক জাতিকে তার আমলনামার দিকে ডাকা হবে [এবং বলা হবে], "আজ তোমাদেরকে তোমাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।"

যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে নামাজ পড়বে, সে তার নামাজ সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবে। এর ফলে তারা নামাজের মাঝখানে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে। সূরা ২৯, আল আনকাবুত, আয়াত ৪৫:

"...প্রকৃতপক্ষে, নামাজ অশ্লীলতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা, যা তাঁর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

বেঞ্চের লোকেরা

নামাজের দিক পরিবর্তনের পর, মহানবী (সাঃ) এর মসজিদের দক্ষিণ অংশ, কিবলা, মসজিদের পিছনের অংশে পরিণত হয়। মহানবী (সাঃ) সেই অংশের উপর একটি ছাদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, যাদের থাকার জায়গা ছিল না এবং দরিদ্র ছিলেন, তারা সেখানে থাকতে পারেন, কারণ মদীনার সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, সকলকে সেখানে থাকতে দিতেন না। বছরের পর বছর ধরে সংখ্যা পরিবর্তিত হত এবং মহানবী (সাঃ) তাদের ব্যক্তিগতভাবে আতিথ্য করতেন। মহানবী (সাঃ) এর কাছে বিতরণের জন্য যে কোনও দান আসত, তিনি এবং তাঁর পরিবার তার কোনও অংশ নিতেন না এবং তিনি তা মদিনার দরিদ্রদের, বিশেষ করে এই সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, বিতরণ করতেন। যদি কেউ মহানবী (সাঃ) কে উপহার হিসেবে পাঠাতেন, তাহলে তিনি এর কিছু অংশ নিজের এবং তার পরিবারের জন্য ব্যবহার করতেন এবং বাকি অংশ দরিদ্রদের, বিশেষ করে এই সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, দান করতেন। এই লোকেরা সুফফার লোক নামে পরিচিতি লাভ করে, যার অর্থ, বেঞ্চের লোক। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর (সাঃ) নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৩৪-৭৩৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মনে রাখা উচিত যে, এই সাহাবীদের মধ্যে অনেকেরই, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, সম্পদ ও সম্পদ ছিল কিন্তু তারা হিজরত করে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে থাকার জন্য সবকিছু ত্যাগ করে সরাসরি তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন।

এটি ৪৭তম অধ্যায় মুহাম্মদের ৭ম আয়াতের সাথে সম্পর্কিত :

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করবেন।"

এই আয়াতের অর্থ হলো, কেউ যদি ইসলামকে সাহায্য করে, তাহলে মহান আল্লাহ উভয় জগতেই তাদের সাহায্য করবেন। এটা আশ্চর্যজনক যে অসংখ্য মানুষ আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, কিন্তু আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, তার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এই আয়াতের প্রথম অংশটি পূরণ করে না। বেশিরভাগ মানুষ যে অজুহাত দেয় তা হল, তাদের সৎকর্ম করার সময় নেই। তারা আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, কিন্তু তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সময় বের করে না। এর কি কোন যুক্তি আছে? যারা বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালন করে না এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে আল্লাহর সাহায্যের আশা করে, তারা বেশ বোকা। আর যারা বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালন করে কিন্তু তার বাইরে যেতে অস্বীকার করে, তারা দেখতে পায় যে তারা যে সাহায্য পায় তা সীমিত। কেউ কীভাবে আচরণ করে তার সাথে কীভাবে আচরণ করা হয়। মহান আল্লাহর জন্য যত বেশি সময় এবং শক্তি নিবেদিত হয়, তারা তত বেশি সমর্থন পাবে। এটা সত্যিই এত সহজ।

একজন মুসলিমের বুঝতে হবে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মতো বেশিরভাগ ফরজ কাজই তার দিনের মধ্যে খুব অল্প সময়ের জন্য সম্পন্ন হয়। একজন মুসলিম কখনোই আশা করতে পারে না যে, প্রতিদিন মাত্র এক ঘন্টা ফরজ নামাজ আদায়ের জন্য সময় ব্যয় করবে এবং তারপর বাকি সময় আল্লাহকে অবহেলা করবে এবং সমস্ত অসুবিধার মধ্যেও তাঁর অবিরাম সহায়তা আশা করবে। একজন ব্যক্তি এমন

বন্ধুকে অপছন্দ করবে যে তার সাথে এমন আচরণ করে। তাহলে কীভাবে একজন ব্যক্তি বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর সাথে এমন আচরণ করতে পারে?

কেউ কেউ পার্থিব কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে, তারপর স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করে তার সমাধানের জন্য তাঁর কাছে দাবি করে। এই বোকা মানসিকতা স্পষ্টতই আল্লাহর দাসত্বের পরিপন্থী। এটা আশ্চর্যজনক যে এই ধরণের ব্যক্তিরা তাদের অন্যান্য অবসর কাজ যেমন পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো, টিভি দেখা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য সময় বের করে কিন্তু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সময় বের করে না। তারা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং গ্রহণ করার জন্য সময় বের করে না। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অধ্যয়ন এবং তার উপর আমল করার জন্য সময় বের করে না। এই লোকেরা কোনওভাবে তাদের অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা ব্যয় করার জন্য সম্পদ খুঁজে পায় কিন্তু স্বেচ্ছায় দান করার জন্য কোন সম্পদ খুঁজে পায় না।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিমের সাথে তার আচরণ অনুসারে আচরণ করা হবে। অর্থাৎ, যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য অতিরিক্ত সময় উৎসর্গ করে, তাহলে তারা সমস্ত অসুবিধার মধ্য দিয়ে নিরাপদে ভ্রমণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবে। কিন্তু যদি তারা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় অথবা শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য অন্য কোনও সময় উৎসর্গ না করেই তা পালন করে, তাহলে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে একই রকম প্রতিক্রিয়া পাবে। সহজ কথায়, যে যত বেশি দেবে, সে তত বেশি পাবে। যদি কেউ বেশি না দেয়, তবে তার বিনিময়ে খুব বেশি আশা করা উচিত নয়।

অন্যদের পথভ্রষ্ট করা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরতের পর দ্বিতীয় বছরে, নামাজের দিক, কিবলা, জেরুজালেমের মসজিদ আকসা থেকে মক্কার কাবাতে পরিবর্তন করা হয়েছিল। ইহুদিদের কাছে নামাজের দিক পরিবর্তন করা কঠিন মনে হয়েছিল কারণ পূর্ববর্তী নামাজের দিকটি তাদের নামাজের দিকের সাথে মিলে গিয়েছিল এবং তাই তারা এটিকে তাদের সঠিক পথের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছিল। ইহুদি নেতাদের একজন কা'ব বিন আশরাফ তার কিছু অনুসারীকে প্রথমে ইসলামে বিশ্বাস করার এবং সাহাবীদের সাথে মক্কার দিকে প্রার্থনা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, এবং তারপর দিনের শেষে ইসলাম এবং মুসলমানদের নামাজের দিক অস্বীকার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি সাহাবীদের বিভ্রান্ত করার লক্ষ্য রেখেছিলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, এবং আশা করেছিলেন যে তারা মদিনার শিক্ষিত এবং শিক্ষিত মানুষ হওয়ায় তাদের অনুসরণ করবে। অর্থাৎ, শিক্ষিত লোকেরা যদি ইসলাম সম্পর্কে জানার পরে তা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে তা অবশ্যই ভুল। এই বিষয়ে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা আলে ইমরানের ৭২ নম্বর আয়াত নাযিল করেছেন:

"আর আহলে কিতাবদের একদল [একে অপরকে] বলে, "দিনের শুরুতে মুমিনদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করো এবং দিনের শেষে তা অস্বীকার করো, যাতে তারা ফিরে আসে [অর্থাৎ, তাদের ধর্ম ত্যাগ করে]।"

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৩:৭২, পৃষ্ঠা ৩৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ভণ্ডামির একটি অংশ হলো, একজন ব্যক্তি কেবল নিজে খারাপ কাজ করে না এবং সৎ কাজ থেকে বিরত থাকে না বরং অন্যদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করে। তারা চায় অন্যরাও তাদের মতো একই নৌকায় থাকুক যাতে তারা তাদের খারাপ চরিত্রে কিছুটা সান্ত্বনা পায়। তারা কেবল নিজেকে ডুবিয়ে দেয় না বরং তাদের সাথে অন্যদেরও ডুবিয়ে দেয়। মুসলমানদের জানা উচিত যে, একজন ব্যক্তি তার আহ্বানের কারণে পাপ করলে অন্য প্রতিটি ব্যক্তির জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এই ব্যক্তির সাথে এমন আচরণ করা হবে যেন সে পাপ করেছে যদিও সে কেবল অন্যদেরকেই এর দিকে আহ্বান করেছিল। সুনানে ইবনে মাজাহ, ২০৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে । এই কারণেই কেউ কেউ বলেছেন যে, ধন্য সেই ব্যক্তি যার পাপ তাদের সাথে মারা যায় কারণ অন্যরা যদি তাদের খারাপ পরামর্শ অনুসারে কাজ করে তবে তাদের পাপ বৃদ্ধি পাবে যদিও তারা আর বেঁচে নেই।

এছাড়াও, আলোচিত মূল ঘটনাটি অন্যদের অন্ধভাবে অনুসরণ করার বিরুদ্ধেও সতর্ক করে। কোন কিছু গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে জ্ঞান এবং প্রমাণ অনুসারে প্রতিটি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা উচিত। এই কারণেই মহান আল্লাহ মানুষকে সাধারণ জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন। এমনকি ইসলাম অন্ধভাবে ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করার সমালোচনা করেছে, কারণ মহান আল্লাহ চান মানুষ খোলা মনে ইসলামী শিক্ষা মূল্যায়ন করুক এবং তা বোধগম্যতা ও অন্তর্দৃষ্টির সাথে অনুসরণ করুক। সূরা ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

এবং ৩৪তম অধ্যায় সাবা, ৪৬তম আয়াত:

"বলুন, "আমি তোমাদেরকে কেবল একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি- তোমরা আল্লাহর জন্য জোড়ায় জোড়ায় এবং এককভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, তারপর চিন্তা করো।" তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন পাগলামি নেই। তিনি কেবল তোমাদেরকে কঠোর শাস্তির পূর্বে সতর্ককারী।"

অতএব, অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে, এমনকি যদি তা জনপ্রিয় মতামতও হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে জ্ঞান এবং প্রমাণ অনুসারে প্রতিটি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার জন্য তাদের সাধারণ জ্ঞান এবং বুদ্ধি ব্যবহার করতে হবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে তার ধর্মীয় এবং পার্থিব উভয় ক্ষেত্রেই সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

রোজার ফরজতা

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের পর দ্বিতীয় বছরে, রমজান মাসে রোজা রাখা সকল প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের জন্য ফরজ হয়ে যায়, যদি না কেউ ইসলাম কর্তৃক অব্যাহতিপ্রাপ্ত হয়। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৫০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আন নাসায়ীর ২২১৯ নম্বর হাদিসে পাওয়া গেছে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, রোজা ছাড়া মানুষের সকল সৎকর্ম কেবল তাদের নিজেদের জন্য, কারণ এটি মহান আল্লাহর জন্য এবং তিনি সরাসরি এর প্রতিদান দেবেন।

এই হাদিসটি রোজার অনন্যতা নির্দেশ করে। এটিকে এভাবে বর্ণনা করার একটি কারণ হল, অন্যান্য সমস্ত নেক আমল মানুষের কাছে দৃশ্যমান, যেমন নামাজ, অথবা সেগুলো মানুষের মধ্যে হয়, যেমন গোপন দান। অন্যদিকে, রোজা একটি অনন্য নেক আমল, কারণ অন্যরা কেবল সেগুলো দেখেই জানতে পারে না যে কেউ রোজা রাখছে।

অধিকন্তু, রোজা একটি সৎকর্ম যা মানুষের প্রতিটি দিকের উপর তালা ঝুলিয়ে দেয়। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সঠিকভাবে রোজা রাখে সে মৌখিক এবং শারীরিক পাপ থেকে বিরত থাকবে, যেমন অবৈধ জিনিস দেখা এবং শোনা। এটি নামাজের মাধ্যমেও অর্জন করা হয় তবে নামাজ কেবল অল্প সময়ের জন্য করা হয় এবং

অন্যদের কাছে দৃশ্যমান হয়, অন্যদিকে, রোজা সারা দিন ধরে থাকে এবং অন্যদের কাছে অদৃশ্য থাকে। সূরা আল আনকাবুত, আয়াত ৪৫:

"...প্রকৃতপক্ষে, নামাজ অশ্লীলতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

নিচের আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি বৈধ কারণ ছাড়া ফরজ রোজা পূর্ণ করে না সে প্রকৃত মুমিন হবে না, কারণ এ দুটির মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৮৩:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযীতে ৭২৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করে বলেছেন যে, যদি কোন মুসলিম বৈধ কারণ ছাড়া একটিও ফরজ রোজা পালন না করে, তাহলে সে তার হারানো সওয়াব এবং বরকতের ক্ষতিপূরণ করতে পারবে না, এমনকি যদি সে সারা জীবন প্রতিদিন রোজা রাখে।

উপরন্তু, পূর্বে উদ্ধৃত আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রোজা সঠিকভাবে তাকওয়ার দিকে পরিচালিত করে। অর্থাৎ, কেবল দিনের বেলায় অভুক্ত থাকার

ফলে তাকওয়ার দিকে পরিচালিত হয় না কিন্তু রোজার সময় পাপ থেকে বিরত থাকা এবং সৎকর্ম করার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া তাকওয়ার দিকে পরিচালিত করে। এই কারণেই জামে আত তিরমিযীতে ৭০৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যদি কেউ মিথ্যা কথা বলা এবং কাজ করা থেকে বিরত না থাকে তবে রোজার কোনও তাৎপর্য থাকবে না। সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৬৯০ নম্বরে পাওয়া অনুরূপ একটি হাদিস সতর্ক করে যে, কিছু রোজাদার ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই পান না। যখন কেউ রোজা রাখার সময় মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের ক্ষেত্রে আরও সচেতন এবং সতর্ক হয়ে ওঠে, তখন এই অভ্যাসটি অবশেষে তাদের উপর প্রভাব ফেলবে, যার ফলে তারা রোজা না থাকলেও একই রকম আচরণ করবে। এটি আসলে প্রকৃত তাকওয়া।

পূর্বে উদ্ধৃত আয়াতে উল্লেখিত ধার্মিকতা রোজার সাথে সম্পর্কিত, কারণ রোজা মানুষের মন্দ কামনা-বাসনা এবং আবেগকে হ্রাস করে। এটি অহংকার এবং পাপের উৎসাহকে বাধা দেয়। কারণ রোজা পেটের ক্ষুধা এবং দৈহিক কামনা-বাসনাকে বাধা দেয়। এই দুটি জিনিস অনেক পাপের দিকে পরিচালিত করে। উপরন্তু, এই দুটি জিনিসের আকাঙ্ক্ষা অন্যান্য অবৈধ জিনিসের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি। তাই যে কেউ রোজার মাধ্যমে এগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তার দুর্বল মন্দ ইচ্ছাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে। এটি প্রকৃত ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে।

যেমনটি আগে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, রোজার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। রোজার প্রথম এবং সর্বনিম্ন স্তর হল এমন জিনিস থেকে বিরত থাকা যা রোজা ভঙ্গ করে, যেমন খাবার। পরবর্তী স্তর হল পাপ থেকে বিরত থাকা যা রোজার ক্ষতি করে এবং রোজার সওয়াব হ্রাস করে, যেমন মিথ্যা বলা। সুনানে আন নাসায়ীর ২২৩৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে। রোজা হল শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে জড়িত করে এমন একটি স্তর। এটি হল যখন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ পাপ থেকে রোজা রাখে, যেমন চোখ হারাম জিনিসের দিকে তাকানো থেকে, কান হারাম জিনিসের কথা শোনা থেকে ইত্যাদি। পরবর্তী স্তর

হল যখন কেউ রোজা না থাকা সত্ত্বেও এইভাবে আচরণ করে। পরিশেষে, রোজার সর্বোচ্চ স্তর হল এমন সমস্ত জিনিস থেকে বিরত থাকা যা মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত নয়, অর্থাৎ, ব্যক্তি তাকে প্রদত্ত সমস্ত নিয়ামত, যেমন তাদের সময়, পাপ বা নিরর্থক উপায়ে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে।

একজন মুসলিমের উচিত তাদের দেহ যেমন বাহ্যিকভাবে রোজা রাখে, তেমনি পাপ বা নিরর্থক চিন্তাভাবনা থেকে বিরত থাকা। তাদের নিজেদের ইচ্ছার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের পরিকল্পনায় অটল থাকা এবং কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এছাড়াও, তাদের অন্তরে আল্লাহর তাকদীরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত, বরং ভাগ্য এবং তা যা-ই আনুক না কেন, আল্লাহকে জেনে রাখা উচিত যে, তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কেবল সর্বোত্তমটিই বেছে নেন, এমনকি যদি তারা এই পছন্দগুলির পিছনের প্রজ্ঞা বুঝতে না পারে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

পরিশেষে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের রোজা গোপন রেখে সর্বোচ্চ সওয়াবের লক্ষ্য রাখা এবং যদি তা এড়ানো সম্ভব হয় তবে অন্যদের না জানানো, কারণ অপ্রয়োজনীয়ভাবে অন্যদের জানানোর ফলে সওয়াব নষ্ট হয় কারণ এটি লোক দেখানোর একটি দিক।

বাধ্যতামূলক দানশীলতা

মহানবী (সা.) মদিনায় হিজরতের পর দ্বিতীয় বছরে, দানের বাধ্যতামূলক আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এর আগে মুসলমানরা দান করত কিন্তু সঠিক পরিমাণ এবং সূক্ষ্ম বিবরণ এই বছর পর্যন্ত প্রকাশ এবং নির্দেশিত হয়নি। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর (সা.)-এর নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৩৩-৯৩৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ফরজ দান হলো একজন ব্যক্তির মোট আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং শুধুমাত্র তখনই তা দেওয়া হয় যখন তার কাছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ থাকে। ফরজ দান করার একটি লক্ষ্য হল এটি একজন মুসলিমকে মনে করিয়ে দেয় যে তাদের কাছে থাকা সম্পদ তাদের নিজস্ব নয়, অন্যথায় তারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যয় করতে স্বাধীন থাকবে। সম্পদ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউ সৃষ্টি করেছেন এবং দান করেছেন, তাই তাঁর সন্তুষ্টি অনুসারে ব্যবহার করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি দানই কেবল একটি ঋণ যা তার প্রকৃত মালিক, মহান আল্লাহ তাআলার কাছে পরিশোধ করতে হবে। এটি তখনই অর্জন করা হয় যখন কেউ তাদের প্রদত্ত দানগুলিকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে এমন আচরণ করে যেন তাদের প্রদত্ত দান, যেমন তাদের সম্পদ, তাদেরই এবং তাই ফরজ দান করা থেকে বিরত থাকে, সে শাস্তির সম্মুখীন হবে, ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি পার্থিব ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারীতে ১৪০৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাদের ফরজ দান করে না, সে একটি বৃহৎ বিষাক্ত সাপের মুখোমুখি হবে যা বিচারের দিন তাকে ক্রমাগত কামড়াতে থাকবে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮০:

"আর যারা [লোভের বশে] আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দিয়েছেন তা দান করে না, তারা যেন কখনও মনে না করে যে এটি তাদের জন্য ভালো। বরং এটি তাদের জন্য আরও খারাপ। কিয়ামতের দিন তাদের ঘাড়ে তারা যা দান করেছে তা দিয়ে তাদের গলা বেষ্টিত করা হবে..."

এই পৃথিবীতে, যে সম্পদের উপর তারা ফরজ সদকা করতে ব্যর্থ হয়, তা তাদের মানসিক চাপ ও দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা মনে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাদের প্রদত্ত নেয়ামতের উপর তাঁর অধিকার রয়েছে। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

একটি খারাপ উদ্দেশ্য

নিজেকে মুসলিম দাবিকারী থালাবা নামের এক ব্যক্তি একবার মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেন যেন তিনি তাকে প্রচুর পরিমাণে ধন-সম্পদের অধিকারী করেন যাতে তিনি প্রচুর পরিমাণে দান-সদকা করতে পারেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) থালাবাকে সতর্ক করে বলেন যে, তার জন্য কম থাকা এবং কৃতজ্ঞ থাকা অনেক বেশি থাকা এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে না পারার চেয়ে ভালো। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আরও বলেন যে, তার নির্দেশনা অনুসরণ করা এবং সরল জীবনযাপন করা তার জন্য ভালো। থালাবা বারবার জেদ করার পর, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার জন্য দোয়া করেন। কিছুক্ষণ পরে, থালাবার ব্যবসা এতটাই বৃদ্ধি পেতে থাকে যে তাকে মদিনা শহরের বাইরে চলে যেতে হয়। এই সময়কালে থালাবাকে কেবল শুক্রবারের নামাজের সময় মসজিদে দেখা যেত। এই সময়কালে সামর্থ্যবানদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ দান-সদকা করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। মহানবী (সাঃ) সাহাবীগণকে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, বিভিন্ন ইসলামী অঞ্চলে এই দান সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন, যার মধ্যে সালাবাহর বসবাসের স্থানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাহাবী, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, যখন সালাবাহর কাছ থেকে ফরজ দান প্রার্থনা করেছিলেন, তখনই সালাবাহ তার ভণ্ডামি প্রকাশ করেছিলেন। লোভ তাকে গ্রাস করেছিল এবং তিনি কিছু অসম্মানজনক কথা বলেছিলেন যে, আল্লাহ, এখন তার উপর কর আরোপ করেছেন। এই কথা বলার পর, সালাবাহ, সাহাবী, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাকে এগিয়ে যেতে বললেন এবং অন্যদের কাছ থেকে ফরজ দান আদায় করতে বললেন এবং তিনি এই সময়টি বিবেচনা করার জন্য ব্যবহার করবেন যে তা দেবেন কি দেবেন না। যখন এই সাহাবী, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, অবশেষে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে ফিরে এসে বললেন যে, সালাবাহ ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ, মহিমান্বিত, তখন তাওবার ৯ নম্বর সূরা নাযিল করেন, আয়াত ৭৫-৭৭:

“আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, “যদি তিনি আমাদের তাঁর অনুগ্রহ থেকে দান করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই দান করব এবং আমরা অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব।” কিন্তু যখন তিনি তাদের তাঁর অনুগ্রহ থেকে দান করলেন, তখন তারা তাতে কৃপণতা করল এবং অস্বীকৃতি জানিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। তাই তিনি তাদের অন্তরে মুনাফিকির শাস্তি দিলেন সেই দিন পর্যন্ত যখন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে– কারণ তারা আল্লাহর সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা ভঙ্গ করেছিল এবং যেহেতু তারা [অভ্যন্তরীণভাবে] মিথ্যা বলত।”

যখন সালাবাকে এই খবর দেওয়া হয়, তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে তাঁর ফরজ দান করার জন্য যান। কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সালাবাকে জানান যে, আল্লাহ, এখন তাঁকে তাঁর দান গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এরপর নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সালাবাকে তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সালাবা বহু বছর ধরে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু প্রতিবারই নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছিলেন যে, অনেক দেরি হয়ে গেছে এবং তিনি কখনও আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে যেতে পারবেন না। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পর, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ইসলামী জাতির খলিফা হন। সালাবা আবারও তাঁর ফরজ দান করে তাঁর মর্যাদা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু নেতা কেবল উত্তর দেন যে, যদি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) দান গ্রহণ না করেন, তাহলে তিনি কীভাবে দান করবেন? থালাবা ইসলামী জাতির পরবর্তী দুই খলিফার সাথে এটি করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তারাও থালাবার প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ইমাম আল ওয়াহিদীর, আসবাব আল নুযুল, ৯:৭৫, পৃষ্ঠা ৯০-৯১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যেহেতু তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল সমাজের মধ্যে তার পার্থিব মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা, তাই তার দান প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। পূর্বে উদ্‌ধৃত আয়াতগুলিতে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে । যদি সে মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য তার ভণ্ডামি থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হত, তবে তাকে ক্ষমা করা হত। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ অনুভব করা, মহান আল্লাহ এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একজনকে আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি যে কোনও অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দেবে।

এছাড়াও, আলোচ্য মূল ঘটনাটি জ্ঞান এবং দূরদর্শিতার অভাবের কারণে কোনটি তাদের জন্য সর্বোত্তম তা জানে না বলে সম্পদের মতো নির্দিষ্ট পার্থিব জিনিস চাওয়া এড়িয়ে চলার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। মানুষ প্রায়শই এমন জিনিস কামনা করে যা তাদের জন্য চাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং কখনও কখনও এমন জিনিস অপছন্দ করে যা উভয় জগতেই তাদের জন্য কল্যাণের উৎস হয়ে ওঠে। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

এই কারণেই ইসলাম মুসলমানদের পার্থিব বিষয়ে সাধারণ কল্যাণ কামনা করতে উৎসাহিত করে, কারণ তাদের কাছে এমন জ্ঞান নেই যে তাদের জন্য কী ভালো আর কী ক্ষতিকর। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২০০-২০১:

"...আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দুনিয়াতে দান করুন", আর আখেরাতে তার কোন অংশ থাকবে না। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।"

দুর্নীতি বন্ধ করা

মক্কার অমুসলিমরা স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে যতক্ষণ মদিনা একটি প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত দুটি শহরের মধ্যে যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না, তাই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কার অমুসলিমদের আর্থিক অবকাঠামো আক্রমণ করে তাদের সংকল্পকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছিলেন। মক্কার অমুসলিমরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণের সময় মদিনার পাশ দিয়ে যেত। অতএব, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কার অমুসলিমদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং মদিনায় হিজরতের সময় যে সম্পত্তি ও সম্পদ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন তার ক্ষতিপূরণ আদায়ের লক্ষ্যে এই ভ্রমণকারী কাফেলাগুলিকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতেন।

একবার মহানবী (সাঃ) মক্কার অমুসলিমদের উপর নজরদারি করার এবং তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সাহাবীদের একটি দলকে নাখলাতে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাদের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ দেননি। কিন্তু এই অভিযানের সময় এই সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, সুযোগ গ্রহণ করে তাদের একটি কাফেলা আক্রমণ করে তাদের সম্পদ লুট করেন এবং এই অভিযানে একজন অমুসলিম নিহত হন এবং দুজন অমুসলিমকে বন্দী করে মদিনায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। মহানবী (সাঃ) সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, সমালোচনা করেছিলেন কারণ তিনি তাদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ দেননি এবং কেবল গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তারাও বুঝতে পারেননি যে তারা চারটি পবিত্র মাসের একটিতে কাফেলা আক্রমণ করেছিলেন, যে সময়ে আরবদের জন্য সর্বসম্মতভাবে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল, যদিও অমুসলিমরা এই নিয়ম মেনে চলতেন না এবং প্রায়শই নিজেদেরকে যুদ্ধ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ক্যালেন্ডার বছরের মাসের ক্রম পরিবর্তন করতেন। ৯ম অধ্যায় তওবার ৩৬-৩৭ আয়াতে:

“নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা আল্লাহর কিতাবে বারো [চন্দ্র] মাস, যেদিন থেকে তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে চারটি পবিত্র। এটাই সঠিক ধর্ম [অর্থাৎ, পথ], তাই এগুলিতে তোমরা নিজেদের উপর জুলুম করো না। এবং কাফেরদের সাথে সম্মিলিতভাবে লড়াই করো যেমন তারা সম্মিলিতভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন [যারা তাঁকে ভয় করে]। প্রকৃতপক্ষে, [পবিত্র মাসগুলিতে নিষেধাজ্ঞা] পিছিয়ে দেওয়া কুফরের বৃদ্ধি, যার দ্বারা কাফেররা [আরও] বিভ্রান্ত হয়। তারা এক বছর হালাল করে এবং অন্য বছর হারাম করে, যাতে আল্লাহর নিষিদ্ধ সংখ্যার সাথে মিল থাকে এবং [এইভাবে] আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন তা হালাল করে। তাদের মন্দ কাজ তাদের কাছে সুশোভিত করা হয়েছে; এবং আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ দেখান না।”

প্রথমদিকে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) যুদ্ধবন্দী বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেননি, কিন্তু তারপর মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা আল বাকারার ২১৭ নং আয়াত নাজিল করেন, যার ফলে সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তাদের স্বস্তি দান করেন:

“তারা তোমাকে পবিত্র মাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে - তাতে যুদ্ধ করা সম্পর্কে। বলো, “এতে যুদ্ধ করা মহাপাপ, কিন্তু আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখা, তাঁর প্রতি অবিশ্বাস, মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়া এবং সেখান থেকে সেখানকার অধিবাসীদের বহিষ্কার করা আল্লাহর কাছে আরও বড় পাপ। আর ফিতনা হত্যার চেয়েও বড়।” আর তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার ধর্ম থেকে ফিরে আসে এবং কাফের অবস্থায় মারা যায়, তাদের কর্ম দুনিয়া ও আখেরাতে নিষ্ফল হয়ে যায়, আর তারাই জাহান্নামের অধিবাসী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।”

মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এরপর যুদ্ধবন্দী এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গ্রহণ করেন। যুদ্ধবন্দীদের একজন ইসলাম গ্রহণ করে এবং অন্যজনকে মক্কার অমুসলিমরা মুক্তিপণ দেয়। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর (সাঃ) নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৭৯-৮৮১ এবং ৮৯০-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামের আগমনের পূর্বেও বছরের চারটি পবিত্র মাসে (যিল আল-কা'দা, যিল আল-হিজ্জাহ, মুহাররম এবং রজব) যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই আয়াতে উল্লেখিত মক্কার অমুসলিমদের দ্বারা সৃষ্ট ব্যাপক দুর্নীতি পবিত্র মাসে যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ। মক্কার অমুসলিমরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরতের পূর্বে তেরো বছর ধরে তাদের মুসলিম আত্মীয়স্বজনদের উপর অকথ্য জুলুম চালিয়ে আসছিল, কেবল এই কারণে যে তারা মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করত। তাই তারা পবিত্র মাসে যুদ্ধের আপত্তি জানাতে সক্ষম ছিল না। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণকে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, কেবল তাদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করা হয়নি, বরং মসজিদে হারামের পথও তাদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, যা হাজার হাজার বছর ধরে কেউ জারি করেনি। দুর্নীতির এই রেকর্ডের সাথে, প্রয়োজনে পবিত্র মাসে যুদ্ধের আপত্তি তোলা তাদের বা অন্য কারোর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

উদ্ধৃত আয়াতে দুর্নীতি ইসলামের শত্রুদের দ্বারা অর্থাৎ মক্কার অমুসলিমদের দ্বারা সৃষ্ট নিপীড়নের ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাবকে নির্দেশ করে। এই দুর্নীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল তাদের বিপথগামী বিশ্বাস এবং তাদের গোত্রের প্রতি আনুগত্য, সম্পদ, সংস্কৃতি এবং মিথ্যা দেবতাদের প্রতি ভালোবাসা। এই আয়াতটি আরও প্রমাণ করে যে মক্কায় অমুসলিমদের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তাই এই আয়াতগুলি অন্যদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না।

অতএব, এই আয়াতগুলিতে দুর্নীতি বলতে নিরপরাধ মানুষের উপর নির্যাতনকে বোঝায়। এটি এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে একজন ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠী হয়রানি এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের শিকার হয় কারণ তারা বর্তমান ধারণার বিপরীত কিছু ধারণাকে সত্য বলে গ্রহণ করে এবং ভালো কথা প্রচার করে এবং অন্যায় কথা নিষেধ করে সমাজের বিদ্যমান ব্যবস্থায় সংস্কার আনার চেষ্টা করে। অতএব, এই দুর্নীতির মাধ্যমে নিরপরাধ মানুষের এই নির্দিষ্ট ক্ষতি প্রতিরোধ করার একমাত্র উপায় ছিল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা যতক্ষণ না বিরোধিতা ছাড়াই ইসলামকে প্রকাশ্যে অনুশীলন করার অনুমতি দেওয়া হয় এবং অমুসলিমদের দ্বারা সমাজের উপর যে নেতিবাচক ক্ষতি হয় তা বন্ধ করা হয়।

এছাড়াও, মহানবী (সাঃ) এর সময় রোমান ও পারস্যের মতো অত্যাচারী শাসকদের দ্বারা ব্যাপক অত্যাচার ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিল। তারা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন দেশের জনগণের উপর ক্রমাগত অত্যাচার চালাত। এই লোকদের সাথে যুদ্ধ করার ফলে সৈন্যদের হত্যা করা হত, যারা যুদ্ধ করতে এবং মৃত্যুর জন্য স্বাক্ষর করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি নিরীহ নাগরিকদের উপর যে অত্যাচার করা হত তা দূর করে। আর যদি ইসলামী শাসন সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হত, যেমনটি মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর পরবর্তী সঠিক পথপ্রদর্শক খলিফাদের সময়ে হয়েছিল, তাহলে দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হত। অতএব, এ থেকে বোঝা যায় যে, জনগণের উপর দীর্ঘস্থায়ী অত্যাচার যদি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দিকে পরিচালিত করে, তাহলে সৈন্যদের হত্যার চেয়েও খারাপ।

বদরের যুদ্ধ

নম্রতার মধ্যেই মহত্ত্ব নিহিত

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের পর দ্বিতীয় বছরে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মক্কার অমুসলিমদের একটি বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ করার পথে, সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের উটে চড়ে পালাক্রমে চলে যান কারণ তাদের কাছে খুব কম ছিল। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) আলী ইবনে আবু তালিব এবং আবু লুবাবা (রাঃ) এর সাথে একটি উটে ভাগ করে নেন। যখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাঁটার পালা ছিল, তখন তাঁর দুই সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, উটে চড়ে তাঁর স্থান গ্রহণের প্রস্তাব দেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উত্তর দেন যে তারা তাঁর চেয়ে শক্তিশালী নন, অর্থাৎ, তিনি আহত বা অসুস্থ ছিলেন না যে তিনি হাঁটতে না পারার অজুহাত হিসেবে এটি ব্যবহার করতে পারেন, এবং তিনি আরও বলেন যে তিনি হাঁটার সওয়াব চান। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৫৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আজকের নেতারা তাদের অনুসারীদের মতো একই সমস্যার মুখোমুখি হতে অস্বীকৃতি জানায়, কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন, তাতে তিনিও সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এটি ছিল তাঁর মহান বিনয়ের একটি ইঙ্গিত। সূরা আল ফুরকান, আয়াত ৬৩:

"আর দয়াময়ের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করে..."

আল্লাহর বান্দারা বুঝতে পেরেছেন যে, তাদের কাছে যা কিছু ভালো আছে তা কেবল আল্লাহ তাআলার দানেই। আর যে কোন মন্দ থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে তা হলো আল্লাহ তাআলা তাদের রক্ষা করেছেন। যা কারোর নয়, তা নিয়ে গর্ব করা কি বোকামি নয়? ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি স্পোর্টস কার নিয়ে গর্ব করে না যা মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে বাস্তবে কিছুই তাদের নয়। এই মনোভাব নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি সর্বদা বিনয়ী থাকে। আল্লাহর বিনীত বান্দারা সহীহ বুখারী, ৫৬৭৩ নম্বরে পাওয়া নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসে পূর্ণ বিশ্বাস করেন, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কোনও ব্যক্তির সৎকর্ম তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। কেবলমাত্র আল্লাহর রহমতই এটি ঘটাতে পারে। কারণ প্রতিটি সৎকর্ম তখনই সম্ভব যখন আল্লাহ তায়ালা তাকে জ্ঞান, শক্তি, সুযোগ এবং অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। এমনকি কাজের গ্রহণযোগ্যতাও নির্ভরশীল। মহান আল্লাহর রহমতের উপর । যখন কেউ এই কথাটি মনে রাখে, তখন এটি তাদের অহংকার থেকে রক্ষা করে এবং নম্রতা গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে। সর্বদা মনে রাখা উচিত যে নম্র হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ নয় কারণ ইসলাম প্রয়োজনে আত্মরক্ষা করার জন্য উৎসাহিত করেছে। অন্য কথায়, ইসলাম মুসলমানদের দুর্বলতা ছাড়াই নম্র হতে শেখায়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, ২০২৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যে কেউ মহান আল্লাহর সামনে নিজেকে বিনীত করে, তিনি তাকে উত্থিত করবেন। তাই বাস্তবে, নম্রতা উভয় জগতে সম্মানের দিকে পরিচালিত করে। এই সত্যটি বোঝার জন্য কেবল সৃষ্টির সবচেয়ে বিনয়ী ব্যক্তি, অর্থাৎ মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর চিন্তা করা প্রয়োজন। মহান আল্লাহ, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই গুরুত্বপূর্ণ গুণটি গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে মানুষকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা ২৬ আশ শু'আরা, আয়াত ২১৫:

"আর যারা তোমার অনুসরণকারী মুমিন, তাদের প্রতি তোমার ডানা নত করো [অর্থাৎ, দয়া দেখাও]।"

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিনয়ী জীবনযাপন করতেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি আনন্দের সাথে ঘরের কাজকর্ম সম্পাদন করতেন এবং প্রমাণ করতেন যে এই কাজগুলি পুরুষ-পুরুষের উপর নির্ভরশীল নয়। ইমাম বুখারীর "আদাব আল মুফরাদ", ৫৩৮ নম্বর গ্রন্থে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

২৫ নম্বর সূরা আল ফুরকানের ৬৩ নম্বর আয়াতে দেখানো হয়েছে যে, নম্রতা হলো একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য যা বাইরের দিকে প্রকাশিত হয়, যেমন একজন ব্যক্তি কীভাবে হাঁটেন। ৩১ নম্বর সূরা লুকমানের ১৮ নম্বর আয়াতে এটি আলোচনা করা হয়েছে:

"আর মানুষের প্রতি তোমার গাল [অপমানে] ঘুরিয়ে দিও না এবং পৃথিবীতে উল্লাস করে চলাফেরা করো না..."

মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, জান্নাত সেই বিনয়ী বান্দাদের জন্য যাদের মধ্যে অহংকার নেই। সূরা ২৮, আল-কাসাস, আয়াত ৮৩:

"যারা পৃথিবীতে মর্যাদা বা দুর্নীতি চায় না, তাদের জন্যই আমরা পরকালের সেই ঘর নির্ধারণ করি। আর [সর্বোত্তম] পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ১৯৯৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যার অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালারই গর্ব করার অধিকার রয়েছে কারণ তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং মালিক।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, অহংকার হলো যখন কেউ নিজেকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং যখন সত্য তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন তা প্রত্যাখ্যান করে কারণ তারা তাদের ব্যতীত অন্যদের কাছ থেকে আসা সত্য গ্রহণ করতে অপছন্দ করে । সুনানে আবু দাউদের ৪০৯২ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

এছাড়াও, আলোচ্য মূল ঘটনাটি সৎকর্ম অর্জনের প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগানোর গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। কখনোই সৎকর্মকে ছোট করে দেখা উচিত নয় কারণ মহান আল্লাহ পরিমাণের ভিত্তিতে নয় বরং গুণগত মানের ভিত্তিতে কাজ বিচার করেন। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে একটি খেজুর পরিমাণ দান করে তাকে পাহাড়ের চেয়েও বেশি সওয়াব দেওয়া হবে। জামে আত তিরমিযীর ৬৬১ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অতএব, ছোট হোক বা বড়, প্রতিটি সুযোগকে সৎকর্ম অর্জনের জন্য কাজে লাগানোর চেষ্টা করা উচিত।

পিতামাতাকে সম্মান করা

আবু উমামা (রাঃ) নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অসুস্থ মায়ের দেখাশোনা করার জন্য তাঁকে পিছনে থাকতে বলা হয়েছিল, যিনি পরে মারা যান। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "নবী (সাঃ)-এর নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০১১-১০১২-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও মহানবী (সাঃ) এর সাথে বের হওয়া ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং পুণ্যের কাজ, তবুও তাঁকে তাঁর অসুস্থ মায়ের সেবা-যত্ন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এটি সর্বদা পিতামাতাকে সম্মান ও সম্মান করার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

পিতামাতার প্রতি সদয় হওয়া মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিচিত একটি বৈশিষ্ট্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অনেকেই এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় পিতামাতার প্রতি সদয় হওয়াকে কেবল তাঁর ইবাদতের পাশে স্থান দিয়েছেন, যেমন, সূরা আল-ইসরা, আয়াত ২৩:

" আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। যদি তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার সাথে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে "উফ" পর্যন্ত বলো না, তাদেরকে ধমক দিও না বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।"

প্রকৃতপক্ষে এই একই আয়াতে মুসলমানদের তাদের পিতামাতার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অন্য এক স্থানে মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতার সাথে একত্রিত করেছেন। সূরা ৩১, লোকমান, আয়াত ১৪:

"... আমার প্রতি এবং তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো..."

যদিও বাবা-মায়ের সাথে সদয় আচরণ করার নির্দেশ দেওয়া অসংখ্য হাদিসে রয়েছে, সুনানে ইবনে মাজাহের ৩৬৬২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসই এর গুরুত্ব বোঝার জন্য যথেষ্ট। মহানবী (সা.) পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা একজন ব্যক্তির উত্তরে বলেছিলেন যে, তারা সন্তানের জন্য জান্নাত না জাহান্নাম। অর্থাৎ, যদি কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পিতামাতার সাথে সদয় আচরণ করে, তাহলে তারা এর জন্য জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু যারা তাদের পিতামাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করে, তারা এর জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

যদিও, যতক্ষণ না এতে আল্লাহর অবাধ্যতা জড়িত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত পিতামাতার প্রতি আনুগত্য করা খুবই কঠিন, বিশেষ করে বর্তমান যুগে মুসলমানদের ধৈর্যশীল থাকার চেষ্টা করা উচিত এবং তাদের পিতামাতার সাথে তর্ক করা উচিত নয়। যদি কোন মুসলিম তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করে, তাহলে তারা সর্বদা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখতে পারে এবং এখনও তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা উচিত।

ধর্মপরায়ণতার মধ্যেই আভিজাত্য নিহিত

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের দ্বিতীয় বছরে, ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মহানবী (সাঃ) যখন মক্কার অমুসলিমদের একটি কাফেলা আক্রমণ করার জন্য মদীনা ত্যাগ করেন, তখন তিনি ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)-কে তাঁর অনুপস্থিতিতে জামাতের নামাজের ইমামতি করার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। ইবনে কাছীরের "নবীজীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৫৭-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) একজন অন্ধ এবং দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন এবং যদিও অন্যান্য লোকদের তাদের গোত্রের নেতা হিসেবে বিবেচনা করা হত, তবুও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে জামাতের নামাজের ইমামতি করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। এটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্বকে নির্দেশ করে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪৩ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক রূপ বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের অভ্যন্তরীণ নিয়ত এবং শারীরিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন।

প্রথমত, যে কোন কাজ করার সময় একজন মুসলিমের সর্বদা তাদের নিয়ত সংশোধন করা উচিত কারণ মহান আল্লাহ কেবল তখনই তাদের পুরষ্কৃত করবেন যখন তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎকর্ম করবে। যারা অন্য মানুষ এবং জিনিসের জন্য কাজ করবে, তাদেরকে বিচারের দিন তাদের কাছ থেকে তাদের পুরষ্কার

পেতে বলা হবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদিসটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। জাতিগত বা সম্পদের মতো পার্থিব বিষয়ের কারণে একজন ব্যক্তি অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। যদিও অনেক মুসলিম সামাজিক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মতো এই বাধাগুলি তৈরি করেছে, যার ফলে তারা বিশ্বাস করে যে কিছু লোক অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, ইসলাম স্পষ্টভাবে এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে, এই ক্ষেত্রে, ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। একমাত্র জিনিস যা একজন মুসলিমকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাদের ধার্মিকতা, তারা কতটা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

উপরন্তু, আলোচ্য মূল হাদিসটি এও নির্দেশ করে যে, নারীদের পুরুষদের তুলনায় পৃথিবীতে তাদের অবস্থান নিয়ে বিতর্ক এবং তর্ক-বিতর্ক করে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বরং, তাদের বুঝতে হবে যে শ্রেষ্ঠত্ব পুরুষদের অনুকরণ বা তাদের ছাড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে নিহিত নয়। এটি কেবল আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে নিহিত।

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর এবং মানুষের অধিকার পূরণে নিজেকে ব্যস্ত রাখা এবং এই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তাদের যা আছে বা যার মালিকানা আছে তা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে মুসলিমের মধ্যে সৎকর্মের অভাব রয়েছে অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য নেই, তার বংশের কারণে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে না। বাস্তবে, এটি সম্পদ, জাতিগততা, লিঙ্গ বা সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং বর্ণের মতো সমস্ত পার্থিব জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পরিশেষে, ইসলাম যেমন মানুষকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে বিচার করে, তেমনি মানুষেরও উচিত। তাদের উচিত অন্যদেরকে তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করা বা পার্থিব মানদণ্ডের ভিত্তিতে অন্যদেরকে নিকৃষ্ট মনে করা নয়, কারণ এটি প্রায়শই অহংকার এবং অন্যদের অধিকার পূরণে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করে, যা উভয় জগতেই বিপর্যয়ের দিকে পরিচালিত করে।

একজন ব্যক্তির আসল মর্যাদা লুকানো থাকে, যেমন তার উদ্দেশ্য মানুষের কাছ থেকে লুকানো থাকে, এমনকি যদি তারা তাদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে পারে। অতএব, অন্যদের অবজ্ঞা করা বোকামি, কারণ তারা তাদের চেয়ে উচ্চতর হতে পারে।

পরামর্শ চাওয়া

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের দ্বিতীয় বছরে, ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মক্কার অমুসলিমদের একটি কাফেলা আক্রমণ করার পথে, মহানবী (সাঃ) কে জানানো হয় যে মক্কার অমুসলিম নেতারা মুসলমানদের মোকাবেলা করার জন্য একটি সেনাবাহিনী গঠন করেছেন। মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের মতামত জানতে চান।

এই সময়, আবু বকর (রাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে সান্ত্বনা দিলেন, সকল পরিস্থিতিতে তাঁর প্রতি তাঁর সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং অন্যান্য সাহাবীদের (রাঃ) কে একই কাজ করার জন্য উৎসাহিত করলেন। এরপর উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) উঠে একই কাজ করলেন: তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং অন্যদেরও একই কাজ করার জন্য উৎসাহিত করলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রাঃ) এর লেখা, উমর ইবনে আল খাত্তাব, তাঁর জীবন ও সময়, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৩-৯৪-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আল মিকদাদ বিন আমর, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন, আরও বলেছেন যে, সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, হযরত মুসা আলাইহিস সালামের উম্মতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাকে পরিত্যাগ করবেন না, যখন তারা অসম্মানজনকভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর প্রভু যুদ্ধ করতে পারেন, কারণ তারা তাঁকে সাহায্য করতে যাচ্ছিলেন না। ৫ম সূরা আল মায়িদা, আয়াত ২৪:

"তারা বলল, "হে মূসা, আমরা কখনোই সেখানে প্রবেশ করব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে; তাই তুমি এবং তোমার প্রভু যাও এবং যুদ্ধ করো। আমরা এখানেই অবস্থান করছি।"

বরং, মিকদাদ (রাঃ) ঘোষণা করেছিলেন যে, সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, সকল পরিস্থিতিতেই তার সাথে যুদ্ধ করবেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৫০-২৬০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যেহেতু এই মুসলিম সেনাবাহিনীর বেশিরভাগই ছিল মদীনার সাহাবীদের মধ্য থেকে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের মতামত জানাতে চেয়েছিলেন। তাদের একজন নেতা, সা'দ বিন মু'আয, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, এটি বুঝতে পেরেছিলেন এবং মদীনার সকল সাহাবীদের পক্ষ থেকে বলেছিলেন যে, তিনি তাদেরকে যা আদেশ করেন তাতে তারা তাঁর আনুগত্য করবেন। তিনি আরও বলেন যে, যদি তাদেরকে যুদ্ধের জন্য সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, তাহলে তারা তা করবে এবং তাদের কেউই পিছপা হবে না। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ২১২-২১৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, যদিও মহানবী (সা.) ঐশী নির্দেশিত ছিলেন, তবুও তিনি জনসাধারণের কাজে অন্যদের সাথে পরামর্শ করতেন, যাতে তারা উদাহরণ স্থাপন করতে পারে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯:

"...তাই তাদের ক্ষমা করো, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাদের সাথে পরামর্শ করো..."

তাই অন্যদের ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেবলমাত্র কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া উচিত। অনেক ব্যক্তির কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করলে কেবল বিভ্রান্তি তৈরি হবে কারণ তারা যে পরামর্শ পাবে তা ভিন্ন ভিন্ন হবে। উপরন্তু, তাদের কেবল এমন ব্যক্তির কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া উচিত যার সঠিক জ্ঞান আছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও ব্যক্তির স্বাস্থ্যগত সমস্যা থাকে, তবে তাদের অবশ্যই একজন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা উচিত, কারণ তারা মানব স্বাস্থ্যের বিশেষজ্ঞ। যদি তাদের ধর্মীয় সমস্যা থাকে, তবে তাদের অবশ্যই এমন একজনের সাথে পরামর্শ করা উচিত যার ইসলামী জ্ঞান আছে। এটা অবাক করার বিষয় যে মুসলিমরা প্রায়শই পার্থিব বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করে কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে অজ্ঞ লোকদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে। দ্বিতীয়ত, কেবলমাত্র তাদের সাথেই পরামর্শ করা উচিত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, কারণ এই ব্যক্তি কখনও তাদের তাঁকে অমান্য করার পরামর্শ দেয় না। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভয় করে না, সে সহজেই অন্যদের তাঁর অমান্য করার পরামর্শ দেবে। বাস্তবে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তাদেরই প্রকৃত জ্ঞান থাকে এবং কেবল এই জ্ঞানই অন্যদের তাদের সমস্যাগুলি সফলভাবে সমাধান করবে। ৩৫তম সূরা ফাতির, ২৮তম আয়াত:

"... আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, কেবল তারাই ভয় করে..."

আলোচ্য মূল ঘটনাটি মানুষকে উৎসাহিত করে যে, আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করতে, প্রতিটি পরিস্থিতিতে, তা সে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা কঠিন, আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে। ইসলাম এমন কোনও পোশাক নয় যা কারও ইচ্ছা অনুসারে পরা বা খুলে ফেলা যায়। বরং এটি একটি সম্পূর্ণ আচরণবিধি যা একজন মুসলিমের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রয়োগ

করতে হবে। যে ব্যক্তি ইসলামকে পোশাকের মতো আচরণ করে সে কেবল তাদের ইচ্ছার আনুগত্য এবং উপাসনা করছে, এমনকি যদি তারা অন্যথা দাবি করে। অধ্যায় ২৫ আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

অতএব, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস প্রমাণের জন্য প্রতিটি পরিস্থিতিতেই তাঁর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকতে হবে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে এবং কঠিন সময়ে ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে। নিয়তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ কেবল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা। কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা। এবং কাজের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে খুশি করার জন্য যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা। অধিকন্তু, ধৈর্য প্রকাশের অর্থ হল নিজের কথা বা কাজে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের উপর দৃঢ় থাকা, বিশ্বাস করা যে তিনি কেবল তার জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। ২য় সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক পথে কাজ করে, সে মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থন এবং করুণা লাভ করবে, যা উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে

পরিচালিত করবে। সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মন্দ চক্রান্তের সমাপ্তি

আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে অমুসলিম কাফেলাটি একটি বিকল্প পথ বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় যা তাদেরকে মুসলমানদের হাত থেকে নিরাপদে দূরে সরিয়ে দেয়। এরপর আবু সুফিয়ান মক্কার অমুসলিমদের কাছে বার্তা পাঠান, যারা মুসলমানদের মোকাবেলা করার জন্য একটি বিশাল সেনাবাহিনী সংগ্রহ করেছিল, তাদের মক্কায় ফিরে যেতে কারণ তাদের কাফেলা নিরাপদ ছিল। কিন্তু অমুসলিম সেনাবাহিনীর অন্যতম নেতা আবু জাহল জোর দিয়ে বলেন যে তাদের বদরের দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত, মুসলমানদের মুখোমুখি হওয়া উচিত এবং চিরতরে ধ্বংস করা উচিত। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার", পৃষ্ঠা 211-212-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

কখনোই খারাপ কাজ করার চক্রান্ত করা উচিত নয় কারণ এটি সর্বদা, এক বা অন্যভাবে, তাদের উপরই আঘাত হানবে। এমনকি যদি এই পরিণতিগুলি পরবর্তী জগতে বিলম্বিত হয় তবে তারা অবশেষে এর মুখোমুখি হবে। উদাহরণস্বরূপ, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন যেমন তারা তাদের পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং স্নেহ কামনা করেছিলেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তাদের চক্রান্ত তাদের তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১৮:

"এবং তারা তার জামার উপর মিথ্যা রক্ত আনল। [ইয়াকুব] বলল, "বরং তোমাদের আত্মা তোমাদেরকে কিছু একটার প্রতি প্ররোচিত করেছে, তাই ধৈর্যই সবচেয়ে উপযুক্ত..."

যে যত বেশি মন্দ চক্রান্ত করবে, আল্লাহ তাআলা তত বেশি তাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। এমনকি যদি তারা বাহ্যিকভাবে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে, তবুও আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য উভয় জগতে অভিশাপ হিসেবে তাদের আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটিকেই পরিণত করবেন, যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ৪৩:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজস্ব লোকদের ছাড়া আর কাউকে ঘিরে রাখে না। তাহলে তারা কি পূর্ববর্তী লোকদের পথ [অর্থাৎ, ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করছে?..."

ভালো পরামর্শ গ্রহণ করা

যখন মহানবী (সাঃ) বদরে পৌঁছান, তখন তিনি একটি নির্দিষ্ট স্থানে থামেন। হুবাব বিন মুনযির (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেন যে, ঐ স্থানে থামানো কি ঐশী আদেশ নাকি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সিদ্ধান্ত? যখন তিনি উত্তর দেন যে, এটা তাঁর পছন্দ, ঐশী আদেশ নয়, তখন হুবাব (রাঃ) নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে অন্য কোন স্থানে শিবির স্থাপনের পরামর্শ দেন, কারণ এটি কৌশলগতভাবে বেশি সুবিধাজনক ছিল। মহানবী (সাঃ) তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন। ইমাম ইবনে কাথিরের "নবী (সাঃ) এর জীবনী", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৬৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

একজন মুসলিমের জীবনে ইসলামের আদেশ-নিষেধের সাথে আপস না করে অবিচল থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। কিন্তু যেসব বিষয়ে ইসলামী শিক্ষার বিরোধিতা করে না, সেসব ক্ষেত্রে মুক্ত মন থাকা উচিত, যেখানে তারা জ্ঞান ও প্রমাণের ভিত্তিতে অন্যদের পরামর্শ ও মতামত মূল্যায়ন করে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নেয়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে। অতএব, একজনের এমন একগুঁয়ে মানসিকতা এড়ানো উচিত যেখানে তারা কেবল সেই বিষয়গুলিই গ্রহণ করে যা তাদের নিজস্ব মতামত এবং আকাঙ্ক্ষার সাথে মিলে যায়, কারণ এই মনোভাব তাদের জীবনে কেবল ভুল সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করবে, যা তাদের কেবল চাপের কারণ হবে।

নেতাদের প্রতি আন্তরিকতা

যখন মুসলিম সেনাবাহিনী বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছায়, তখন একজন সাহাবী, সা'দ বিন মু'আয, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন, পরামর্শ দেন যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর জন্য একটি অস্থায়ী আশ্রয়স্থল তৈরি করা উচিত। যদি মুসলিম সেনাবাহিনী যুদ্ধে হেরে যায়, তাহলে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) পশ্চাদপসরণ করে মদীনায় তাঁর অন্যান্য সাহাবীদের সাথে পুনরায় মিলিত হতে পারেন। তিনি আরও বলেন যে, এই সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, কেবল মদীনায়ই থেকে যান কারণ তারা জানতেন না যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হতে চলেছে এবং তারা সর্বদা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে রক্ষা করার জন্য এবং তাকে সদুপদেশ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তার ধারণার সাথে একমত হলেও অন্য যে কারো চেয়ে বেশি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৬৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ১৯৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, ইসলাম হলো সমাজের নেতাদের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সদয়ভাবে তাদের সর্বোত্তম পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো যেকোনো প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়া। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, ৫৬ নম্বর বই এবং ২০ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। ৪র্থ অধ্যায় আন-নিসা, ৫৯ নম্বর আয়াত:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী..."

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত একটি কর্তব্য যতক্ষণ না কেউ মহান আল্লাহর অবাধ্যতা না করে। সৃষ্টির প্রতি আনুগত্য যদি স্রষ্টার অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে তবে তা নেই। এই ধরণের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এড়ানো উচিত কারণ এটি কেবল নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে নেতাদেরকে মৃদুভাবে ভালোর উপদেশ দেওয়া এবং মন্দের নিষেধ করা উচিত। অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা যদি সঠিক পথে থাকেন তবে সাধারণ মানুষও সঠিক থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভণ্ডামির লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলা উচিত। আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে সমাজকে কল্যাণের উপর ঐক্যবদ্ধ করে এমন বিষয়ে তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী যেকোনো কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করা। ইসলামে নেতাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য নেই, কেবল এমন বিষয়ে তাদের আনুগত্য করা যা মহান আল্লাহকে খুশি করে।

ভাগ্যে কল্যাণ

অমুসলিম সেনাবাহিনী প্রথমে বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছানোর পর, তারা এমন একটি স্থানে শিবির স্থাপন করে যা মনে হয়েছিল সবচেয়ে উন্নত স্থান বলে মনে হয়েছিল, অন্যদিকে সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের শিবির কেবল নিম্নতর স্থানেই রয়ে গেল। কিন্তু বৃষ্টিপাতের পর, পরিস্থিতি বিপরীত হয়ে যায় এবং সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের শিবির উন্নত স্থানে পরিণত হয়। বৃষ্টিপাতের ফলে তারা যে জমিতে শিবির স্থাপন করেছিল তা আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। বৃষ্টিপাতের ফলে তারা অযু এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য সহজেই বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। অধ্যায় ৮ আল আনফাল, আয়াত ১১:

"[স্মরণ করো] যখন তিনি তোমাদের উপর তন্দ্রা চাপিয়ে দিয়েছিলেন [তাঁর পক্ষ থেকে] নিরাপত্তা প্রদানের জন্য এবং তোমাদের উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন, যার মাধ্যমে তোমাদের পবিত্র করার জন্য এবং তোমাদের থেকে শয়তানের মন্দ [পরামর্শ] দূর করার জন্য এবং তোমাদের হৃদয়কে দৃঢ় করার জন্য এবং তোমাদের পা দৃঢ় করার জন্য।"

এটি তাফসির ইবনে কাসির, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৭১-২৭২-এ আলোচনা করা হয়েছে।

তাদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্নতা প্রদান করা হয়েছিল কারণ আল্লাহ তাদের অন্তরে নিরাপত্তার অনুভূতি রেখেছিলেন যা তাদেরকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেছিল। যদি তারা ভীত থাকত, তাহলে তারা ঘুমাতে পারত না। এই ঘুম তাদেরকে যুদ্ধের আগে

পুরোপুরি বিশ্রাম দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। একমাত্র যিনি ঘুমাননি তিনি হলেন মহানবী মুহাম্মদ (সা.)। তিনি বিজয়ের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ও প্রার্থনা করে রাত কাটিয়েছিলেন। মুসনাদে আহমাদের ১১৬১ নম্বর হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্ধৃত আয়াতটি আরও ইঙ্গিত করে যে যখন জিনিসগুলি সর্বোত্তম বলে মনে হয় না, তখন মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা উচিত, কারণ পরিস্থিতি যেমনই দেখাক না কেন, তাদের আশীর্বাদ এবং সাফল্য দান করা হবে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪১৬৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদেরকে নিয়তি নিয়ে প্রশ্ন না করার পরামর্শ দিয়েছেন কারণ এটি শয়তানের জন্য দরজা খুলে দেয়। তিনি মুসলমানদেরকে আল্লাহর পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করতে উৎসাহিত করেন, কারণ তারা তাদের অদূরদর্শিতা এবং বোধগম্যতার অভাবের কারণে এর পিছনের প্রজ্ঞাগুলি পর্যবেক্ষণ করে না। এর ফলে অধৈর্যতা এবং পুরষ্কার হারানোর দিকে পরিচালিত হয়। তাদের অতীত অভিজ্ঞতাগুলি নিয়ে চিন্তা করা উচিত যেখানে তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু খারাপ হলেও ভাল ছিল এবং বিপরীতভাবে ধৈর্য ধরে রাখতে অনুপ্রাণিত করা উচিত, কারণ শীঘ্রই বা পরে তাদের এই সুবিধাগুলি দেখানো হবে। দ্বিতীয় অধ্যায় আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর বিধান কীভাবে তাদের উপকারে আসে তার ব্যাখ্যা কাউকেই দিতে বাধ্য নন। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই মহান আল্লাহর দাস হিসেবে মহাবিশ্বে তার স্থান বুঝতে হবে। মালিক কখনোই তাঁর বিধানের ব্যাখ্যা দাসের কাছে দিতে বাধ্য নন। মহান আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমানের অংশ হলো, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে, তিনি যে আশীর্বাদ পেয়েছেন তা সঠিকভাবে ব্যবহার করে ধৈর্য ধারণ করা এবং তাঁর আনুগত্য অব্যাহত রাখা, এমনকি যদি তারা তাঁর পছন্দের পিছনের প্রজ্ঞাগুলি পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হয় এবং বিশ্বাস করে যে তিনি তাদের জন্য সর্বোত্তম সময়ে এবং সর্বোত্তম উপায়ে সাহায্য করবেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। অধ্যায় ৬৫ তালাক, আয়াত ২:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

এটি আসলে মুসলিম হওয়ার পরীক্ষার অংশ। ২৯তম অধ্যায় আল আনকাবুত, আয়াত ২-৩:

"মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না? কিন্তু আমরা অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি, আর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা মিথ্যাবাদী।"

ঐশ্বরিক আশীর্বাদ এবং সমর্থন

বদরের যুদ্ধে, আল্লাহ তাআলা প্রথমে সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, অমুসলিমদের দৃষ্টিতে এবং বিপরীতক্রমে, অমুসলিমদের দৃষ্টিতে সংখ্যা কম দেখিয়েছিলেন, যাতে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং সত্য মিথ্যার উপর জয়লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, শত্রুর সংখ্যা ৭০ জন এবং সাহাবী, আল্লাহ তাআলা তাঁর পাশে শত্রুর সংখ্যা ১০০ জন নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর, আল্লাহ তাআলা সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, অমুসলিমদের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখিয়েছিলেন যাতে তাদের হৃদয়ে ভয় সঞ্চারিত হয় এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, সাহায্য করেন। প্রকৃত সংখ্যা ছিল ১০০০ অমুসলিমের বিপরীতে প্রায় ৩১০ জন মুসলিম। অধ্যায় ৮ আল-আনফাল, আয়াত ৪৪:

"আর [স্মরণ করো] যখন তোমরা মুখোমুখি হলে তিনি তোমাদের চোখে তাদেরকে কম দেখিয়েছিলেন এবং তাদের চোখে তোমাদেরকে কম দেখিয়েছিলেন যাতে আল্লাহ পূর্বে নির্ধারিত কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন..."

এবং অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৩:

"তোমাদের জন্য অবশ্যই দুটি সৈন্যদলের মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে যারা [বদরের যুদ্ধে] মুখোমুখি হয়েছিল - একটি আল্লাহর পথে লড়াই করছিল এবং অন্যটি কাফেরদের। তারা তাদের দৃষ্টিতে তাদের দ্বিগুণ দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর বিজয় দিয়ে সাহায্য করেন। অবশ্যই এতে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্নদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৬৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, উদ্‌ধৃত আয়াতগুলি যেমন ইঙ্গিত করে, একজনকে অবশ্যই একটি পর্যবেক্ষণশীল মানসিকতা গ্রহণ করতে হবে যেখানে তারা অতীতের ঘটনাবলী এবং তাদের চারপাশের লোকেদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে, যাতে তারা জীবনে সঠিক পথ বেছে নিতে পারে এবং অন্যদের করা ভুলগুলি এড়াতে পারে যা তাদের মানসিক শান্তি থেকে বঞ্চিত করে, যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টির চেয়ে মানুষের সন্তুষ্টির পিছনে ছুটতে এবং তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করা। মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাঁর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে, তিনি নিশ্চিত করবেন যে তারা তাদের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠবে যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করতে পারে। অধ্যায় 65 তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই সাফল্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে নয়। এটি সর্বদা মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা অনুসারে। অতএব, এই সাফল্য সেই অনুযায়ী ঘটে যখন এটি মানুষের জন্য সর্বোত্তম এবং এমনভাবে যা তাদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, এই জেনে রাখা উচিত যে, তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য দান করা হবে, কোন না কোনভাবে, তা তাদের কাছে স্পষ্ট হোক বা না হোক। এই আনুগত্যের মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎ কর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

সত্যিকারের আশা

বদরের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর কাছে তাদের বিজয়ের জন্য অবিরাম ও আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছিলেন। মহান আল্লাহর কাছে তাঁর প্রার্থনা এত তীব্র ছিল যে তিনি যখন দুআ করার জন্য হাত তুলেন তখন তাঁর চাদরটি কাঁধ থেকে পড়ে যেত। আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে ছিলেন এবং তাঁর জন্য তাঁর চাদরটি পুনরায় স্থাপন করতেন এবং সহানুভূতিশীল হয়ে তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে অনুরোধ করেছিলেন যে, যেন তিনি তাঁর চাদরটি কমিয়ে দেন কারণ আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন এবং তাঁকে বিজয় দান করবেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ) এর জীবনী", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি নির্দেশ করে যে, মহান আল্লাহর রহমত ও সাহায্যের ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণের পরিবর্তে, মহান আল্লাহর উপর প্রকৃত আশা রাখার গুরুত্ব কতটুকু। যেহেতু মহান আল্লাহর উপর প্রকৃত আশার অর্থ হলো তাঁর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তাই নবী মুহাম্মদ (সাঃ) হয়তো আশঙ্কা করেছিলেন যে, তাঁর আনুগত্য এবং সাহাবীদের আনুগত্যের দুর্বলতার কারণে, যারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করেছিলেন তাদের বিজয় প্রদানের বিষয়ে মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এই যুদ্ধে তাদের উপর প্রযোজ্য নাও হতে পারে। ফলস্বরূপ, তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে তারা এই যুদ্ধে হেরে যাবে এবং তাই তিনি মহান আল্লাহর কাছে তাঁর সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত নিশ্চিত করা যে তারা আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকবে এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করা এড়িয়ে চলবে।

জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি প্রকৃত আশা এবং ইচ্ছাপূরণের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত আশা হলো যখন কেউ আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করে। অন্যদিকে, মূর্খ ইচ্ছাপূরণকারী ব্যক্তি তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করে এবং তারপর আশা করে যে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন।

মুসলমানদের জন্য এই দুটি মনোভাবকে গুলিয়ে ফেলা গুরুত্বপূর্ণ নয় যাতে তারা ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনাকারী হিসেবে বেঁচে থাকা এবং মরতে না পারে, কারণ এই ব্যক্তির এই পৃথিবীতে বা পরকালে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা হল একজন কৃষকের মতো যে জমি রোপণের জন্য প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়, বীজ রোপণ করতে ব্যর্থ হয়, জমিতে জল দিতে ব্যর্থ হয় এবং তারপর বিশাল ফসল কাটার আশা করে। এটি স্পষ্ট বোকামি এবং এই কৃষকের সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। অন্যদিকে, প্রকৃত আশা হল একজন কৃষকের মতো যে জমি প্রস্তুত করে, বীজ রোপণ করে, জমিতে জল দেয় এবং তারপর আশা করে যে মহান আল্লাহ তাদের প্রচুর ফসল দেবেন। মূল পার্থক্য হল যে যার প্রকৃত আশা থাকে সে মহানবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য অনুসারে তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে সক্রিয়ভাবে আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করে, তার উপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। এবং যখনই তারা ভুল করে তখন তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অন্যদিকে, ইচ্ছাকৃত চিন্তাকারী ব্যক্তি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা করবে না, বরং তাদের আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করবে এবং তবুও আশা করবে যে আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা করবেন এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন।

তাই মুসলমানদের অবশ্যই মূল পার্থক্যটি শিখতে হবে যাতে তারা ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা ত্যাগ করতে পারে এবং পরিবর্তে মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের

আশা গ্রহণ করতে পারে, যা সর্বদা উভয় জগতে কল্যাণ এবং সাফল্য ছাড়া আর কিছুই নিয়ে যায় না। সহিহ বুখারীতে প্রাপ্ত ৭৪০৫ নম্বর হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে।

পূর্ববর্তী জাতিসমূহ এমনকি মুসলিম জাতিকেও এক ধরণের ইচ্ছাপূরণমূলক চিন্তাভাবনা প্রভাবিত করেছিল, যা তখনই ঘটে যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ উপেক্ষা করতে পারবে এবং কেয়ামতের দিন কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুপারিশ একটি সত্য এবং অনেক হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪৩০৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস, তবুও তার সুপারিশের মাধ্যমে কিছু মুসলিম, যাদের শাস্তি হ্রাস পাবে, তারা এখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। জাহান্নামে এক মুহূর্তও সত্যিই অসহনীয়। তাই ইচ্ছাপূরণমূলক চিন্তাভাবনা ত্যাগ করা উচিত এবং আল্লাহর আনুগত্যে কার্যত প্রচেষ্টা চালিয়ে সত্যিকারের আশা গ্রহণ করা উচিত।

যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, শয়তান তাদেরকে বিশ্বাস করায় যে, যদি তা ঘটেও, তবুও তারা সেদিন মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে এই দাবি করে যে, তারা হত্যার মতো বড় অপরাধ এড়িয়ে যাওয়ার কারণে এত খারাপ ছিল না। তারা নিজেদেরকে নিশ্চিত করেছে যে তাদের আবেদন গ্রহণ করা হবে এবং তাদেরকে জান্নাতে পাঠানো হবে, যদিও তারা পৃথিবীতে তাদের জীবদ্দশায় মহান আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছিল। এটি অবিশ্বাস্যরকম বোকামি কারণ মহান আল্লাহ, যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করে, তার সাথে সেই ব্যক্তির মতো আচরণ করবেন না যারা তাঁকে অবিশ্বাস করেছিল। একটি মাত্র আয়াত এই ধরণের ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা মুছে দিয়েছে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৮৫:

"আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম কামনা করে, তার কাছ থেকে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

পরিশেষে, একজন মুসলিমের এই বিশ্বাস করে ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করা উচিত নয় যে তারা একজন মুসলিম, তারা একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে, এমনকি তাদের পাপের ফলে প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হলেও। কেউই তাদের ঈমান নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে বলে নিশ্চিত নয়। যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ত্যাগ করে, তার ঈমান ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার বড় ঝুঁকি থাকে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ঈমান একটি গাছের মতো যাকে লালন-পালন এবং যত্ন নিতে হবে, আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে। যখন ঈমানের চারা অবহেলা করা হয় তখন এটি মারা যেতে পারে, যার ফলে উভয় জগতে সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য তার কিছুই থাকে না।

ন্যায়পরায়ণ আচরণ

বদরের যুদ্ধের সময়, মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, অমুসলিমদের পক্ষে থাকা কিছু লোককে হত্যা না করতে, কারণ তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিল। এছাড়াও, তিনি আবু আল বাখতারী নামে একজন ব্যক্তিকে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন, কারণ তিনি মক্কার অমুসলিম নেতাদের হাত থেকে মহানবী (সাঃ) কে রক্ষা করেছিলেন এবং মদিনায় হিজরতের আগে মহানবী (সাঃ) কে বয়কট করার দলিল বাতিল করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি কঠিন সময়ে, যেমন যুদ্ধের সময়, ন্যায়বিচার বজায় রাখার গুরুত্ব নির্দেশ করে। তাই মুসলমানদের সর্বদা ন্যায়বিচারের উপর নির্ভর করতে হবে, এমনকি যখন তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করা হয়। যখন কেউ ইতিবাচক পরিস্থিতি এবং মেজাজে থাকে তখন মানুষের সাথে আচরণ করার সময় ন্যায়বিচারের উপর নির্ভর করা সহজ। আসল পরীক্ষা হল যখন কেউ কঠিন এবং বিরক্তিকর পরিস্থিতিতে থাকে তখন মানুষের সাথে আচরণ করার সময় ন্যায়বিচারের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ভালো জীবনসঙ্গী বলতে এমন কাউকে বোঝানো হয় না যে তার স্ত্রীর সাথে সদয় আচরণ করে যখন তারা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। একজন ভালো জীবনসঙ্গী বলতে আসলে এমন কাউকে বোঝানো হয় যে তার স্ত্রীর সাথে সদয় এবং ন্যায়পরায়ণ আচরণ করে এবং তারা যখন তাদের প্রতি বিরক্ত হয় তখনও তাদের অধিকার পূরণ করে। অতএব, একজন মুসলিমের ভালো গুণাবলী বাস্তবায়নের জন্য এবং সকল পরিস্থিতিতে অন্যদের অধিকার পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত এবং কখন একজন ভালো মুসলিমের মতো আচরণ করা উচিত এবং কখন করা উচিত নয়, তাদের ইচ্ছা অনুসারে তা বেছে নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত।

আন্তরিকভাবে পরামর্শ দেওয়া

বদরের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) অমুসলিম সেনাবাহিনীর একজন অমুসলিম নেতা উতবা ইবনে রাবী'আহকে দেখেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে অমুসলিম সেনাবাহিনীর মধ্যে যদি কারও মধ্যে সদ্ভাব থাকে তবে তিনি হলেন তিনি এবং সেনাবাহিনী যদি তার কথা মেনে চলে তবে তারা সঠিক কাজ করবে। এদিকে, উতবা অমুসলিমদের ঘরে ফিরে যেতে এবং যুদ্ধে না জড়াতে আহ্বান জানান। তিনি তাদের মনে করিয়ে দেন যে অনেক মুসলিম তাদের আত্মীয় এবং যদি তারা নিহত হয় তবে অমুসলিমরা যুদ্ধে জয়ী হতে পারে কিন্তু যখন তারা ঘরে ফিরে আসে, তখন তাদের একে অপরের প্রতি শত্রুতা তৈরি হবে, কারণ তারা একে অপরের আত্মীয়দের হত্যা করেছিল। আবু জাহল যেকোনো মূল্যে ইসলামের ধ্বংস চেয়েছিল এবং তাই তাকে এবং অন্যদের যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করার জন্য তাকে কাপুরুষ বলে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী'র "দ্য নোবেল লাইফ অফ দ্য প্রফেট (পিবিইউএইচ), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৬২" বইয়ে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও উতবা একজন অমুসলিম ছিলেন, তবুও তিনি তার সহকর্মীদের প্রতি কিছুটা আন্তরিকতা দেখিয়েছিলেন, অন্যদিকে, আবু জাহল সকলের প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখিয়েছিলেন, তাদের নিজেদের আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করার এবং হত্যা করার পরামর্শ দিয়ে, সবই পার্থিব লাভের জন্য, যেমন কর্তৃত্ব এবং সম্পদের জন্য।

অন্যদের প্রতি আন্তরিকতা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের সাহায্য করা, যেমন শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক সাহায্য। সৎ নিয়তের একটি ইতিবাচক লক্ষণ হলো, মানুষের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা বা প্রতিদান কামনা করা উচিত নয়। বরং তাদের উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সাহায্য করা এবং তাঁর কাছ থেকে প্রতিদান আশা করা। যে ব্যক্তি অন্য কোনও কারণে কাজ করে সে আল্লাহর

কাছ থেকে প্রতিদান পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মনে রাখা উচিত যে যখন তারা অন্যদের সাহায্য করবে, তখন তারা আল্লাহর কাছ থেকে সর্বদা সাহায্য পাবে। সহিহ মুসলিম, ৬৮৫৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে । যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে সর্বদা সাহায্য লাভ করে, সে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য অনুপ্রাণিত হবে যাতে সে প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক নির্দেশনা পায়। এটি শেষ পর্যন্ত উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মানুষের অধিকার পূরণ করা। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ তাদের নিজস্ব সংজ্ঞা অনুসারে মানুষের অধিকার পূরণ করতে পারে না কারণ এটি কেবল অন্যদের প্রতি অন্যায় করবে। অতএব, একজনকে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষা শিখতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে যাতে তারা অন্যদের, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজনের, অধিকার সঠিকভাবে পূরণ করতে পারে। অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়া তখনই সহজ হয় যখন কেউ অন্যদের সাথে এমন আচরণ করে যেমন সে নিজেও অন্যদের দ্বারা আচরণ পেতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এটিই একজন প্রকৃত মুমিনের সংজ্ঞা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত ১৩ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রতিশ্রুতি পালন করা

বদরের যুদ্ধের সময়, হুদাইফা বিন ইয়ামান এবং তার পিতা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, উভয়েই বদরের যুদ্ধে মহানবী (সাঃ)-এর সাথে যোগদানের জন্য মক্কা থেকে হিজরত করছিলেন। পথে মক্কার অমুসলিমরা তাদের ধরে নিয়ে যায় কিন্তু তারা তাদের বোঝাতে সক্ষম হয় যে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মদীনায় যাওয়া এবং বদরে মহানবী (সাঃ)-এর সেনাবাহিনীতে যোগদান না করা। তারা অমুসলিমদের সাথে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে। অবশেষে যখন তারা বদরের কাছাকাছি মহানবী (সাঃ)-এর কাছে পৌঁছায় এবং তাকে ঘটনাটি অবহিত করে, তখন তিনি তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে এবং তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সেনাবাহিনীতে যোগদানের পরিবর্তে মদিনায় চলে যেতে বলেন, ৩ থেকে ১ অনুপাত। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রাঃ)-এর "দ্য নোবেল লাইফ অফ দ্য প্রফেট (সাঃ)-এর (পবিত্র) খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৫৫-১০৫৬"-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদেরকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

সহীহ বুখারীতে ২৭৪৯ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মুনাফিকির একটি দিক।

একজন মুসলিমের সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি হলো মহান আল্লাহর সাথে, যা তখনই সম্মত হয়েছিল যখন কেউ তাকে তাদের প্রভু ও ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং

মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া।

মানুষের সাথে করা অন্যান্য সমস্ত প্রতিশ্রুতিও অবশ্যই পালন করতে হবে, যদি না কারো কাছে কোন বৈধ অজুহাত থাকে, বিশেষ করে যেগুলি একজন বাবা-মা সন্তানদের সাথে করেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা কেবল বাচ্চাদের খারাপ চরিত্র শেখায় এবং তাদের বিশ্বাস করতে উৎসাহিত করে যে প্রতারণা করা একটি গ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সহীহ বুখারীতে ২২২৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর নামে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বৈধ অজুহাত ছাড়াই তা ভঙ্গ করে, তিনি তার বিরুদ্ধে থাকবেন। বিচারের দিন যার বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলা থাকবেন, সে কীভাবে সফল হতে পারে? যেখানেই সম্ভব অন্যদের সাথে প্রতিশ্রুতি না দেওয়াই সর্বদা নিরাপদ। কিন্তু যখন একটি বৈধ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তখন তা পূরণ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে হবে।

দ্বৈত

বদরের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে, তিনজন অমুসলিম তিনজন মুসলিমকে এককভাবে লড়াইয়ের জন্য চ্যালেঞ্জ জানায়। আলী ইবনে আবু তালিব, হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এবং উবাইদা ইবনে হারিস, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তিনজন অমুসলিম নেতার বিরুদ্ধে এই দ্বন্দ্বে অংশ নিয়েছিলেন। আলী এবং হামজা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, দ্রুত তাদের প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে হত্যা করেন। উবাইদা, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, তার প্রতিপক্ষকে মারাত্মকভাবে আহত করেন কিন্তু নিজেও মারাত্মকভাবে আহত হন। যখন তাকে নবী মুহাম্মদ, সা.-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তিনি নিশ্চিত করেন যে তিনি শহীদ। মৃত্যুর আগে, উবাইদা, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, মন্তব্য করেন যে নবী মুহাম্মদ, সা.-এর চাচা আবু তালিবের নিম্নলিখিত কবিতাটি তার জন্য আরও প্রযোজ্য: "আমরা তাকে (অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ, সা.-কে) রক্ষা করব যতক্ষণ না আমরা আহত হয়ে তাঁর চারপাশে মারা যাই। আমাদের নিজেদের সন্তানদের এবং স্ত্রীদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।" ইমাম মুহাম্মদ কান্ধলভীর রচিত, হায়াতুস সাহাবা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫০০-৫০১ এবং ইমাম সাফি উর রহমানের রচিত, দ্য সিলড নেকটার, পৃষ্ঠা ২১৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ তায়ালা সূরা আল হজ্জের ২২ নং আয়াত নাযিল করেছেন:

“এইগুলো" দুই শত্রু তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করেছে। কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করবে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে।"

সুনান ইবনে মাজাহ, ২৮৩৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা করার দাবিকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন ও শিক্ষার উপর আন্তরিকভাবে কাজ না করে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার মৌখিক ঘোষণার ইসলামে কোন মূল্য নেই, কারণ কর্মই উভয় জগতে সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণ। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"বলুন, [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন...""

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলিও তাদের পবিত্র নবীদের (সাঃ) ভালোবাসার দাবি করে, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তারা আখেরাতে তাদের সাথে যোগ দেবে না, কারণ তারা এই পৃথিবীতে কার্যত তাদের অনুসরণ করেনি। অতএব, যে ব্যক্তি কার্যত তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়, সে আখেরাতে তার সাথে যোগ দেবে না, যদিও তারা দাবি করে যে তারা তাঁকে ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা করে।

সাহসিকতা

বদরের যুদ্ধের সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অন্য যে কারো চেয়ে শত্রুর সবচেয়ে কাছে ছিলেন এবং সেদিন তিনিই ছিলেন সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তি। এটি ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮২-এ লিপিবদ্ধ আছে।

আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, আবু বকর (রাঃ) ছিলেন সবচেয়ে সাহসী। বদরের যুদ্ধের সময় তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে ছিলেন এবং প্রতিটি আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করেছিলেন। ইমাম সুয়ূতী, তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা ১৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিমের জীবনের কঠিন পরিস্থিতি ও পরীক্ষার মুখোমুখি হতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। একজন মুসলিমের অবশ্যই এমন দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করা উচিত যার মাধ্যমে সে জীবনের কঠিন পরিস্থিতি ও পরীক্ষাগুলোর মুখোমুখি হয় ইতিবাচক মানসিকতার সাথে যাতে সে সেগুলো কাটিয়ে উঠতে পারে। একজন মুসলিমের এমন নেতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করা উচিত নয় যার ফলে সে পরীক্ষা ও সমস্যার চাপে ভেঙে পড়ে কারণ তার সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, মহান আল্লাহ কখনও কাউকে তার সীমার বাইরে পরীক্ষা করেন না। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮৬:

"আল্লাহ কোন আত্মার উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন বোঝা চাপান না..."

এছাড়াও, দৃঢ় ঈমান গ্রহণ করলেই একজন ব্যক্তি অবিচল এবং ইতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করতে পারে। ইসলামী শিক্ষা শিখলে এবং তার উপর আমল করলেই ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জিত হয়। যার দৃঢ় ঈমানের অধিকারী সে প্রতিটি পরিস্থিতিতেই, স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা কঠিন, আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকবে। এই আনুগত্যের মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত। তারা কঠিন সময়ে ধৈর্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবে। নিয়তে কৃতজ্ঞতা বলতে কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করা বোঝায়। কারো কথায় কৃতজ্ঞতা বলতে ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা বোঝায়। আর কারো কাজে কৃতজ্ঞতা বলতে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা বোঝায়। অধিকন্তু, ধৈর্য বলতে নিজের কথা বা কাজে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা বোঝায়, বিশ্বাস করা যে তিনি কেবল তার জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক পথে কাজ করে, সে মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থন এবং করুণা লাভ করবে, যা উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, ইসলামী শিক্ষার অজ্ঞতা দুর্বল ঈমান গ্রহণ করবে। দুর্বল ঈমান মানুষকে কঠিন সময়ে, যেমন কিছু পরিস্থিতিতে, সহজেই মহান আল্লাহর

আনুগত্য ত্যাগ করতে বাধ্য করবে। অতএব, যে ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি চ্যালেঞ্জকে আত্মবিশ্বাসের সাথে অতিক্রম করার জন্য দৃঢ় ও ইতিবাচক মনোভাব চায়, তাকে ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে ঈমানের দৃঢ়তা গ্রহণ করতে হবে।

স্বর্গ থেকে সাহায্য

বদরের যুদ্ধের সময়, মহান আল্লাহ তাআলা হাজার হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করেছিলেন নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীগণকে সাহায্য করার জন্য। সূরা ৮ আল আনফাল, আয়াত ১২:

"[স্মরণ করো] যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের কাছে ওহী পাঠালেন যে, "আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং যারা বিশ্বাস করেছে তাদের শক্তিশালী করো। আমি অবিশ্বাসীদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করব। অতএব, তোমরা তাদের ঘাড়ে আঘাত করো এবং তাদের প্রতিটি আঙুলের ডগায় আঘাত করো।"

একবার একজন সাহাবী, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, একজন অমুসলিম সৈনিকের পিছনে ধাওয়া করলেন এবং চাবুকের শব্দ শুনতে পেলেন এবং কেউ কথা বলতে শুরু করলেন, যদিও অন্য কেউ সেখানে ছিল না। তিনি অমুসলিমকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেলেন। যখন তিনি মহানবী (সাঃ) কে ঘটনাটি অবহিত করলেন, তখন তিনি নিশ্চিত করলেন যে এটি তৃতীয় আসমান থেকে একজন ফেরেশতা ছিলেন। সহীহ মুসলিমের ৪৫৮৮ নম্বর হাদিসে এটি উল্লেখ করা হয়েছে।

আরেকবার, একজন ফেরেশতা একজন সাহাবীকে, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন, মহানবী (সা.)-এর চাচা, আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবকে বন্দী করতে সাহায্য করেছিলেন, যাকে মক্কার অমুসলিমরা এই যুদ্ধে তাদের সাথে যোগ দিতে বাধ্য করেছিল। মুসনাদে আহমাদের ৯৪৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যুদ্ধের সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অমুসলিম সেনাবাহিনীর দিকে এক মুঠো বালি এবং নুড়ি নিক্ষেপ করেছিলেন যা প্রতিটি অমুসলিম সৈন্যের চোখে পড়ে এবং তাদের যুদ্ধ থেকে বিরত রাখে। এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা আল-আনফালের ১৭ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"...আর তুমি যখন ছুঁড়েছিলে, তখন তুমি ছুঁড়ে মারেনি, বরং আল্লাহই ছুঁড়েছিলেন..."

ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "The Noble Life of the Prophet (PBUH), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৭৭-৯৭৮" এবং ইমাম ওয়াহিদীর "Asbab Al Nuzul", ৮:১৭, পৃষ্ঠা ৮২-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাগুলি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, যখন কেউ মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে, যার মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত, তখন সে প্রতিটি পরিস্থিতিতেই মহান আল্লাহর সমর্থন পাবে। ৬৫তম অধ্যায় তালাকের আয়াত ২:

"...আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

কিন্তু এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই ঐশ্বরিক সাহায্য আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে ঘটে, মানুষের ইচ্ছা বা সময়সূচী অনুসারে নয়। অতএব, এই ঐশ্বরিক সাহায্য সর্বোত্তম সময়ে আসে এবং সর্বোত্তম উপায়ে ঘটে, এমনকি যদি এটি মানুষের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। অতএব, একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, একই সাথে বিশ্বাস করতে হবে যে উভয় জগতেই তাদের সাহায্য করা হবে, এমনকি যদি এই সমর্থন তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়।

উপরন্তু, আলোচ্য মূল ঘটনাটি ইঙ্গিত দেয় যে, যারা মহান আল্লাহকে অমান্য করে, তারা কখনই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারবে না, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। কেউ যেন এই বিশ্বাস করে ভুল না করে যে সম্পদ এবং ক্ষমতার মতো পার্থিব জিনিস অর্জন করা প্রকৃত সাফল্যের লক্ষণ। যদি এটি সত্য হয়, তাহলে ধনী এবং বিখ্যাতরা পৃথিবীর সবচেয়ে সন্তুষ্ট এবং সন্তুষ্ট মানুষ হত। এটি স্পষ্টতই সত্য নয়, কারণ ধনী এবং বিখ্যাতরা যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে মহান আল্লাহকে অমান্য করে, তারা প্রায়শই মানসিক ব্যাধিতে সবচেয়ে বেশি ডুবে থাকে, যেমন হতাশা, মাদকাসক্তি এবং আত্মহত্যার প্রবণতা। অতএব, একজনকে বুঝতে হবে যে প্রকৃত সাফল্য উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জনের মধ্যে নিহিত। এটি তখনই অর্জিত হয় যখন তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের জন্য ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে, এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। তাদের অবশ্যই একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তা মেনে চলেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। ঠিক যেমন এই বিজ্ঞ রোগী ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তা মেনে চলেন তিনিও ভালো থাকবেন। কারণ একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র

আল্লাহ তাআলার। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার জ্ঞান কখনই এই ফলাফল অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে না, যদিও সমস্ত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তাদের জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার কারণে তাদের পরামর্শ সকল ধরণের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের হাদীসের আকারে মানবজাতিকে এটি দান করেছেন। এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি কে ব্যবহার করে এবং যারা তা করে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের প্রেসক্রাইব করা ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝেন না এবং তাই অন্ধভাবে তাদের ডাক্তারের উপর বিশ্বাস করেন, তবুও মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষার উপর চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে লোকেরা অন্ধভাবে ইসলামের শিক্ষার উপর বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

একজন খারাপ সঙ্গী

বদরের যুদ্ধের সময়, শয়তান একজন অমুসলিম নেতার রূপ ধারণ করে এবং অমুসলিমদের সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করে এবং তাদের সুরক্ষা ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু শয়তান যখন মুসলিম সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য স্বর্গ থেকে ফেরেশতাদের নেমে আসতে দেখে, তখন সে তার অনুসারীদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে যায় এবং পিছু হটে। অমুসলিমরা যখন তার সমালোচনা করে, তখন সে উত্তর দেয় যে সে এমন কিছু দেখে যা তারা দেখতে পায় না এবং মহান আল্লাহ এবং তার শাস্তিকে ভয় করে। এটি ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮৮-এ আলোচনা করা হয়েছে।

৮ম অধ্যায় আল-আনফাল, ৪৮ নং আয়াত:

"আর [স্মরণ করো] যখন শয়তান তাদের কর্মকাণ্ড তাদের কাছে সুশোভিত করে তুলেছিল এবং বলেছিল, "আজ মানুষের মধ্যে কেউ তোমাদের উপর জয়লাভ করতে পারবে না এবং আমিই তোমাদের অভিভাবক।" কিন্তু যখন উভয় সেনাবাহিনী একে অপরের মুখোমুখি হল, তখন সে তার পায়ের পাতার উপর ফিরে গেল এবং বলল, "আমি তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি যা দেখছি তা তোমরা দেখছ না; আমি আল্লাহকে ভয় করি। আর আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"

এই ঘটনাটি খারাপ সঙ্গ এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে কারণ এটি উভয় জগতেই কেবল ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়।

সহীহ বুখারীতে ৫৫৩৪ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একজন ভালো এবং খারাপ সঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। একজন ভালো সঙ্গী হলো এমন একজন ব্যক্তির মতো যে সুগন্ধি বিক্রি করে। তার সঙ্গী হয় কিছু সুগন্ধি পাবে অথবা অন্তত এর সুগন্ধে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে। অন্যদিকে, একজন খারাপ সঙ্গী হলো একজন কামারের মতো, যদি তার সঙ্গী তার কাপড় না পোড়ায় তবে ধোঁয়ার কারণে তার উপর অবশ্যই নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

মুসলমানদের বুঝতে হবে যে, যাদের সাথে তারা যায়, তাদের উপর তাদের প্রভাব পড়বে, তা ইতিবাচক হোক বা নেতিবাচক, স্পষ্ট হোক বা সূক্ষ্ম, যাই হোক না কেন। কারো সাথে থাকা এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া সম্ভব নয়। সুনানে আবু দাউদের ৪৮৩৩ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তার সঙ্গীর ধর্মের উপর। অর্থাত্, একজন ব্যক্তি তার সঙ্গীর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। অতএব, মুসলমানদের জন্য সর্বদা ধার্মিকদের সাথে থাকা গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা নিঃসন্দেহে তাদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, অর্থাৎ, তারা তাদেরকে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে আল্লাহর আনুগত্য করতে অনুপ্রাণিত করবে। অন্যদিকে, খারাপ সঙ্গী হয় একজনকে আল্লাহকে অমান্য করতে অনুপ্রাণিত করবে, অথবা তারা একজন মুসলিমকে আখেরাতের জন্য কার্যত প্রস্তুতি নেওয়ার চেয়ে বস্তুগত জগতের দিকে মনোনিবেশ করতে উৎসাহিত করবে। অর্থাত্, তারা তাদেরকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করতে বাধা দেবে। এই মনোভাব তাদের জন্য উভয় জগতেই এক বিরাট অনুশোচনা হয়ে দাঁড়াবে, এমনকি যদি তারা যে জিনিসগুলির জন্য প্রচেষ্টা করে তা বৈধ হয় কিন্তু তাদের চাহিদার বাইরেও হয়, কারণ প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে নিরর্থক বা পাপপূর্ণ উপায়ে ব্যবহার করা হল মহান আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার মূল কারণ। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন] এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।"

পরিশেষে, যেহেতু একজন ব্যক্তি পরকালে তাদের সাথেই থাকবে যাদেরকে সে ভালোবাসে, তাই সহিহ বুখারী, ৩৬৮৮ নম্বরে পাওয়া হাদিস অনুসারে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের সাথে থাকার এবং তাদের জীবনধারা ও আচরণ গ্রহণ করার মাধ্যমে সৎকর্মশীলদের প্রতি তার ভালোবাসা প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু যদি তারা খারাপ বা গাফিল লোকদের সাথে থাকে তবে এটি তাদের প্রতি এবং আখেরাতে তাদের চূড়ান্ত সাহচর্যের প্রমাণ এবং ইঙ্গিত দেয়। সুনান আবু দাউদের ৪০৩১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে। ৪৩ আয যুখরুফ, আয়াত ৬৭:

"সেদিন ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হবে, কেবল সৎকর্মশীলরা ছাড়া।"

অধিকন্তু, আলোচ্য মূল ঘটনাটি এও ইঙ্গিত দেয় যে, শয়তান মহান আল্লাহর অবাধ্যতাকে যতই সুন্দর করে তুলুক না কেন, তা থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ এটি উভয় জগতে কখনও মানসিক শান্তি আনতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে সে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে না, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল স্থানে রাখবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হবে। এটি তাদের উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে, তারা যতই পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করুক না কেন। অধ্যায় ৯, তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

পরকালকে উপলব্ধি করা

বদরের যুদ্ধের সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন এবং তাদের প্রতিদানে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। উমাইর বিন হামাম (রাঃ) যখন এই প্রতিশ্রুতি শুনতে পান, তখন তিনি খাচ্ছিলেন এমন কিছু খেজুর ফেলে দেন, তরবারি তুলে নেন এবং শহীদ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করেন। ইমাম মুহাম্মদ কান্ধলভীর "হায়াতুস সাহাবা", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪০৯-৪১০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমাইর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন, এইভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন কারণ তিনি এই বস্তুগত জগৎ এবং পরকাল সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং বোধগম্যতা গ্রহণ করেছিলেন।

মুসলমানদের জন্য সঠিক ধারণা গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি করতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটিই ছিল ধার্মিক পূর্বসূরীদের অধিকার এবং এটি তাদেরকে পার্থিব জগতের অতিরিক্ত বিলাসিতা এড়িয়ে চলতে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করেছিল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং এটি একটি পার্থিব উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দু'জন ব্যক্তি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত এবং এক পেয়ালা ঘোলা জলের মুখোমুখি হয়। তারা উভয়েই এটি পান করতে চায় যদিও এটি বিশুদ্ধ নয় এবং এমনকি এর অর্থ তাদের এটি নিয়ে তর্ক করতে হয়। তাদের তৃষ্ণা যত বাড়বে ততই ঘোলা জলের পেয়ালার প্রতি তারা এতটাই মনোযোগী হয়ে উঠবে যে তারা অন্য সবকিছুর উপর মনোযোগ হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে কেউ তাদের মনোযোগ সরিয়ে নেয় এবং বিশুদ্ধ জলের একটি নদী দেখতে

পায় যা কেবল অল্প দূরে ছিল, তবে তারা তৎক্ষণাৎ পানির পেয়ালার প্রতি এত মনোযোগ হারিয়ে ফেলবে যে তারা আর এটির যত্ন নেবে না এবং এটি নিয়ে আর তর্ক করবে না। এবং পরিবর্তে তারা ধৈর্য ধরে তাদের তৃষ্ণা সহ্য করবে কারণ তারা জেনে থাকবে যে বিশুদ্ধ জলের একটি নদী কাছে রয়েছে। যে ব্যক্তি নদী সম্পর্কে অজ্ঞ, সে সম্ভবত অন্য ব্যক্তির মনোভাবের পরিবর্তন দেখে তাকে পাগল বলে বিশ্বাস করবে। এই পৃথিবীর দুই ধরণের মানুষের ক্ষেত্রেই এটি ঘটে। একদল লোভের সাথে বস্তুগত জগতের দিকে মনোনিবেশ করে। অন্য দল তাদের মনোযোগ পরকালের দিকে এবং এর মধ্যে বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আশীর্বাদের দিকে সরিয়ে নিয়েছে। যখন কেউ তাদের মনোযোগ পরকালের আনন্দের দিকে সরিয়ে নেয়, তখন পার্থিব সমস্যাগুলি এত বড় বিষয় বলে মনে হয় না। অতএব, ধৈর্য ধারণ করা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু যদি কেউ এই পৃথিবীর উপর তাদের মনোযোগ রাখে তবে এটি তাদের কাছে সবকিছু বলে মনে হবে। তারা তর্ক করবে, লড়াই করবে, এর জন্য ভালোবাসা এবং ঘৃণা করবে। ঠিক যেমনটি আগে উল্লেখিত উদাহরণে উল্লেখিত ব্যক্তির মতো, যে কেবল ঘোলা জলের পেয়ালার দিকে মনোনিবেশ করে।

এই সঠিক উপলব্ধি কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্যের মধ্যে প্রাপ্ত ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। সূরা ৪১ ফুসসিলাত, আয়াত ৫৩:

"আমরা তাদেরকে দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

বিশ্বাসে আপোষহীন

বদরের যুদ্ধের সময়, উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) তার মামা আস ইবনে হাশিমের মুখোমুখি হয়ে তাকে হত্যা করেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর লেখা, উমর ইবনে আল খাত্তাব, তাঁর জীবন ও সময়, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৩-৯৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর (রাঃ) আল্লাহ তাআলা এবং মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি তাঁর আন্তরিকতা এবং আনুগত্যের উপর কোনও সম্পর্ককে প্রাধান্য দিতেন না।

এছাড়াও, এই যুদ্ধের সময়, আবু বকরের পুত্র আবদুর রহমান (রা.) অমুসলিমদের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন। বহু বছর পর, ইসলাম গ্রহণের পর, তিনি তার বাবাকে বলেন যে বদরের যুদ্ধের সময়, তার উপর আক্রমণ করার সুযোগ ছিল কিন্তু তার প্রতি শ্রদ্ধার কারণে তিনি তার হাত আটকে রেখেছিলেন। আবু বকর (রা.) উত্তরে বলেন যে, যদি সেদিন তার সাথে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করার সুযোগ থাকত, তাহলে তিনি অবশ্যই তা করতেন। ইমাম সুয়ূতির "তারিখ আল খুলাফা", পৃষ্ঠা ১২-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বদরের যুদ্ধের সময় মুস'আব বিন উমাইরের অমুসলিম ভাইকে আরেকজন সাহাবী (রাঃ) বন্দী করেছিলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। মুস'আব সাহাবী (রাঃ) কে বলেছিলেন, তাদের মায়ের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ নিতে, কারণ তিনি ধনী ছিলেন। যখন তার অমুসলিম ভাই তার সাথে তার পারিবারিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন, তখন তিনি বলেন যে সাহাবী (রাঃ) তার

ভাই, তিনি নন। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ২২৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

বদরের যুদ্ধের সময়, আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন, যুদ্ধ করেছিলেন এবং তার পিতাকে হত্যা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা ৫৮, আল-মুজাদিলা, আয়াত ২২ নাযিল করেছিলেন:

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে, তুমি এমন কোন সম্প্রদায়কে পাবে না যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতাকারীদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা আত্মীয়স্বজন হয়। যাদের অন্তরে তিনি ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছেন। এবং আমরা তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহর দল। নিঃসন্দেহে আল্লাহর দলই সফলকাম।"

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৫৮:২২, পৃষ্ঠা ১৫০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলিমরা যদি উভয় জগতেই সাফল্য চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই এই আপোষহীন মনোভাব গ্রহণ করতে হবে।

ইসলাম মুসলমানদের শিক্ষা দেয় যে, বস্তুজগৎ থেকে কিছু লাভের জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে কখনও আপস করা উচিত নয়। অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ১৩৫:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদান করো, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়..."

যেহেতু বস্তুজগৎ ক্ষণস্থায়ী, তাই এখান থেকে যা কিছু লাভ হবে তা অবশেষে বিলীন হয়ে যাবে এবং পরকালে তাদের কর্ম ও মনোভাবের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে। অন্যদিকে, ঈমান হলো সেই মূল্যবান রত্ন যা একজন মুসলিমকে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নিরাপদে পরিচালিত করে। অতএব, ক্ষণস্থায়ী জিনিসের জন্য অধিকতর কল্যাণকর এবং স্থায়ী জিনিসের সাথে আপস করা স্পষ্ট বোকামি।

অনেক মানুষ, বিশেষ করে নারীরা, তাদের জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত দেখতে পাবেন যেখানে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপোষ করা উচিত কিনা তা বেছে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ক্ষেত্রে একজন মুসলিম মহিলা বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি যদি তার স্কার্ফ খুলে নির্দিষ্ট পোশাক পরেন তবে তিনি কর্মক্ষেত্রে আরও সম্মানিত হবেন এবং এমনকি আরও দ্রুত কর্পোরেট সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারবেন। একইভাবে, কর্পোরেট জগতে কাজের সময় পরে সহকর্মীদের সাথে মেলামেশা করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই একজন মুসলিম হয়তো কাজের পরে কোনও পাব বা ক্লাবে আমন্ত্রিত হতে পারেন।

এইরকম সময়ে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে চূড়ান্ত বিজয় এবং সাফল্য কেবল তাদেরই লাভ হবে যারা ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকবে। যারা এইভাবে কাজ করবে তাদের পার্থিব এবং ধর্মীয় সাফল্য দেওয়া হবে। তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাদের পার্থিব সাফল্য তাদের জন্য বোঝা হয়ে উঠবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি মহান আল্লাহর কাছে মানবজাতির মধ্যে তাদের মর্যাদা এবং স্মরণ বৃদ্ধির একটি উপায় হয়ে উঠবে। এর উদাহরণ হল ইসলামের সঠিক নির্দেশিত খলিফারা। তারা তাদের ঈমানের সাথে আপস করেননি এবং বরং তাদের জীবনকাল ধরে অবিচল ছিলেন এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদেরকে একটি পার্থিব এবং ধর্মীয় সাম্রাজ্য দান করেছিলেন।

সাফল্যের অন্য সকল রূপ খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং আজ হোক কাল হোক, এগুলো এর ধারকদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কেবল সেইসব সেলিব্রিটিদের লক্ষ্য করা উচিত যারা খ্যাতি এবং ভাগ্য অর্জনের জন্য তাদের আদর্শ এবং বিশ্বাসের সাথে আপোষ করেছিলেন, কারণ এই বিষয়গুলি তাদের দুঃখ, উদ্বেগ, বিষণ্নতা, মাদকাসক্তি এমনকি আত্মহত্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই দুটি পথের উপর একবার চিন্তা করুন এবং তারপর সিদ্ধান্ত নিন কোনটি পছন্দ করা উচিত এবং বেছে নেওয়া উচিত।

সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি ঘৃণা

বদরের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এবং অমুসলিমদের পরাজয়ের পর, মহানবী (সাঃ) অমুসলিমদের মৃতদেহ একটি পুরাতন কূপে পুঁতে ফেলার নির্দেশ দেন। আবু হুযাইফা বিন উতবা (রাঃ) তার মৃত অমুসলিম পিতাকে দেখে স্পষ্টতই দুঃখিত হয়ে পড়েন। মহানবী (সাঃ) যখন তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন, তখন তিনি উত্তর দেন যে তার ঈমান নিয়ে তার কোন সন্দেহ নেই বরং তিনি দুঃখিত কারণ তিনি চান তার পিতা ইসলাম গ্রহণ করুন এবং কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ না করুন। মহানবী (সাঃ) তাকে তিরস্কার করেননি বরং তাকে সান্ত্বনামূলক কথা বলেন। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ২২৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটি অমুসলিমদের ঘৃণা না করার বরং ইসলামের শিক্ষার উপর দৃঢ় থাকা এবং তাদের জন্য মঙ্গল কামনা করা এবং আশা করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা নির্দেশ করে।

সুনানে আবু দাউদের ৪৬৮১ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুসলিমের ঈমানকে পরিপূর্ণ করে এমন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল, মহান আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা। এর অর্থ হল, মহান আল্লাহ যা অপছন্দ করেন, যেমন তাঁর অবাধ্যতা, তা অপছন্দ করা উচিত। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এর অর্থ এই নয় যে, অন্যদের ঘৃণা করা উচিত, কারণ মানুষ আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে তওবা করতে পারে। বরং একজন

মুসলিমের উচিত সেই পাপকেই অপছন্দ করা যা তাদের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তা এড়িয়ে চলা এবং অন্যদেরকে এর বিরুদ্ধে সতর্ক করা। মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিবর্তে তাদের উপদেশ দেওয়া, কারণ এই দয়ার কাজটি তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে নিজের অনুভূতির উপর ভিত্তি করে জিনিসগুলিকে অপছন্দ না করা, যেমন কোনও কাজ, যা বৈধ। পরিশেষে, মহান আল্লাহর জন্য অপছন্দ করার প্রমাণ হল, যখন তারা তাদের কথা এবং কাজের মাধ্যমে তাদের অপছন্দ দেখায় তখন তা কখনই এমনভাবে হবে না যা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে। অর্থাত্, কোনও কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের কখনই পাপ করতে বাধ্য করবে না, কারণ এটি প্রমাণ করবে যে কোনও কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের নিজের জন্য।

উপরন্তু, আলোচ্য মূল ঘটনাটি এই বিষয়টিও নির্দেশ করে যে ইসলাম কখনও কখনও মুসলমানদেরকে তাদের নিজস্ব স্বার্থের জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করার দাবি করে। এই ক্ষেত্রে, একজন মুসলিমকে একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। ঠিক যেমন এই বিজ্ঞ রোগী সুস্বাস্থ্য অর্জন করেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন তিনি উভয় জগতেই মানসিক ও শারীরিক শান্তি অর্জন করবেন, কারণ তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবেন এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেবেন। মনে রাখতে হবে যে, একমাত্র মহান আল্লাহই একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক শান্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় আচরণবিধি প্রদানের জ্ঞান রাখেন। অন্যদিকে, সমস্ত মানবসৃষ্ট আচরণবিধি কখনই এই পরিণতির দিকে পরিচালিত করবে না কারণ তাদের সর্বদা জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের অভাব থাকবে।

কর্মের পরিণতি

বদরের যুদ্ধের সময়, ইসলামের প্রধান শত্রু আবু জাহল দুই তরুণ সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, কর্তৃক নিহত হন। যখন তাকে তাদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়, তখন তারা তার উপর আক্রমণ চালায় যতক্ষণ না তারা তাকে মারাত্মকভাবে আহত করে। তারপর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, আবু জাহলকে তার শেষ নিঃশ্বাসে খুঁজে পান এবং তাকে হত্যা করেন। সহীহ বুখারী, সংখ্যা 3988 এবং 4020-এ প্রাপ্ত হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এবং অমুসলিমদের পরাজিত হওয়ার পর, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অমুসলিমদের মৃতদেহ একটি পুরাতন কূপে রাখার নির্দেশ দেন। এটি সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি তাদের ডেকে বললেন, কূপে থাকা মৃতদেহগুলোর তালিকা করে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা কি আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জিনিসপত্র পেয়েছে, কারণ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জিনিসপত্র তাকে দেওয়া হয়েছিল। মৃতদের ডাকা সম্পর্কে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, তারা তার কথা শুনতে পাচ্ছে কিন্তু তারা উত্তর দিতে পারে না। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীজীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩০০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটা শেখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন ব্যক্তির শারীরিক বা সামাজিক শক্তি যতই থাকুক না কেন, এমন একটা দিন অবশ্যই আসবে যখন তাকে তার কর্মের পরিণতি ভোগ করতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, এটি তার জীবনের সময় ঘটে যেখানে একজন ব্যক্তির কর্ম তাকে সমস্যার দিকে ঠেলে দেয়, যেমন জেলখানা এবং অবশেষে তাকে পরকালেও তার কর্মের পরিণতি ভোগ করতে হবে। এটি কেবল নেতাদের ক্ষেত্রেই নয়, সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

তাই একজন মুসলিমের কখনোই অন্যদের সাথে, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজনের সাথে, খারাপ ব্যবহার করা উচিত নয়। তাদের ইতিহাসের অত্যাচারী নেতাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যারা তাদের চেয়েও শক্তিশালী ছিল, এমন একটি দিন অবশ্যই এসেছিল যখন তাদের শক্তি তাদের কোন উপকারে আসেনি এবং তারা তাদের মন্দ কাজের পরিণতি ভোগ করেছে। সামাজিক প্রভাব এবং শক্তি অস্থির জিনিস কারণ এগুলি দ্রুত ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে চলে যায় এবং দীর্ঘকাল কারও সাথে থাকে না। অতএব, যে মুসলিমের এই শক্তি আছে তার উচিত এটি এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, নিজের এবং অন্যদের উপকার করে। কিন্তু যদি তারা তাদের কর্তৃত্বের অপব্যবহার করে তবে অবশেষে তারা শাস্তির মুখোমুখি হও যা থেকে কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবে না।

উপরন্তু, এটি গুরুত্বপূর্ণ কারো কর্তৃত্বের অপব্যবহার না করা, কারণ এর ফলে বিচারের দিন তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। প্রতিটি অত্যাচারীকে তাদের নেক আমল তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের দিতে হবে এবং প্রয়োজনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের পাপ গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে অনেক অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলিমের কখনোই তাদের কর্মের জন্য নিজেকে জবাবদিহি করতে ভুলা উচিত নয়। যারা তা করে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এবং অন্যদের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু যারা নিজেরাই বিচার করে না তারা সর্বদা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এবং অন্যদের অসাবধানতার সাথে ক্ষতি করতে থাকবে। তারা জানে না যে আসলে তারা কেবল নিজেদেরই ক্ষতি করছে। কিন্তু যখন তারা এই সত্যটি বুঝতে পারবে তখন শাস্তি থেকে বাঁচতে তাদের অনেক দেরি হয়ে যাবে।

এছাড়াও, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ইতিহাসের ঘটনাবলীর পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার পেছনের শিক্ষাগুলি বোঝা এবং সেগুলি অনুসরণ করা উচিত এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিতে বিভ্রান্ত না হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, মৃতরা জীবিতদের কথা শুনতে পারে কিনা তা একটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয় কারণ এটি বিচার দিবস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। একজন ব্যক্তির সর্বদা এমন বিষয় এবং বিষয়গুলিতে মনোযোগ দেওয়া উচিত যা বিচার দিবসে প্রশ্ন করা হবে, যেমন এই পৃথিবীতে তাকে যে সম্পদ দেওয়া হয়েছে তার সদ্ব্যবহার করা। যদি বিচার দিবসে কোনও নির্দিষ্ট বিষয় বা বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা না হয়, তবে একজনের উচিত এটি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা, আলোচনা এবং গবেষণা করা এড়িয়ে চলা।

পরকাল অন্বেষণ করা

বদরের যুদ্ধের পর, কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, যুদ্ধের গনীমতের মাল নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন, যখন তাদের কেউ কেউ তা সংগ্রহ করেন, অন্যরা অমুসলিম সৈন্যদের পিছনে ধাওয়া করেন যাতে তারা ফিরে না আসে এবং অন্যরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে আকস্মিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। এই বিরোধের ফলে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সম্পদ তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর অর্পণ করেন। অধ্যায় ৮ আল আনফাল, আয়াত ১:

"হে নবী মুহাম্মদ, তারা তোমাকে [যুদ্ধের] নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, "নিয়ামত আল্লাহ ও রাসূলের জন্য।" অতএব, আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের মধ্যে যা সম্পর্ক আছে তা সংশোধন করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা ঈমানদার হও।"

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পালাক্রমে এটি সৈন্যদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিয়েছিলেন। এটি তাফসীর ইবনে কাসির, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৫৩ এবং সিরাত ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা ১৩৪-এ আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতটি সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, পার্থিব লাভের পরিবর্তে আন্তরিকভাবে আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আনুগত্যের উপর মনোনিবেশ করতে উৎসাহিত করেছিল। যদিও এটি লক্ষণীয় যে, গনীমত অর্জন করা তাদের জন্য সর্বদা একটি বোনাস হিসাবে দেখা হত এবং এটি অর্জন করা কখনই তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য সর্বদা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যুদ্ধ করা ছিল। যদি তারা

কেবল যুদ্ধের গনীমতের প্রতি আগ্রহী হত, তবে তাদের কোনও যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর পক্ষে লড়াই করার কোনও অর্থ ছিল না, কারণ তারা প্রায়শই সংখ্যায় কম ছিল এবং শক্তি এবং অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে অতুলনীয় ছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে এবং গনীমত অর্জনের বোনাস তাদের দেওয়া হয়েছিল বলে বিতর্ক দেখা দেয়।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা কেন মহান আল্লাহর ইবাদত করে, কারণ এই কারণটি মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধির কারণ হতে পারে, অথবা কিছু ক্ষেত্রে এটি অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করতে পারে। যখন কেউ তাঁর কাছ থেকে বৈধ পার্থিব জিনিসপত্র অর্জনের জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করে, তখন তারা তাঁর অবাধ্য হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। পবিত্র কুরআনে এই ধরণের ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা ২২ আল হজ্জ, আয়াত ১১:

"আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে আল্লাহর ইবাদত করে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে। যদি তাকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে, তবে সে তাতে আশ্বস্ত হয়; আর যদি তাকে কোন পরীক্ষায় পতিত করে, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটাই স্পষ্ট ক্ষতি।"

যখন তারা পার্থিব আশীর্বাদ পেতে ব্যর্থ হয় অথবা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তখন তারা প্রায়শই রাগান্বিত হয়ে পড়ে যা তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত রাখে। এই লোকেরা প্রায়শই তাদের পরিস্থিতি অনুসারে আল্লাহকে আনুগত্য ও অবাধ্যতা করে, যা বাস্তবে আল্লাহর প্রকৃত দাসত্বের পরিপন্থী।

যদিও ইসলামে মহান আল্লাহর কাছ থেকে বৈধ পার্থিব জিনিসপত্র কামনা করা গ্রহণযোগ্য, তবুও কেউ যদি এই মনোভাব ধরে রাখে তবে সে এই আয়াতে উল্লেখিতদের মতো হয়ে যেতে পারে। পরকালে মুক্তি এবং জান্নাত লাভের জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করা অনেক ভালো। এই ব্যক্তির অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাদের আচরণ পরিবর্তন করার সম্ভাবনা কম। তবে সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম কারণ হল মহান আল্লাহকে মেনে চলা, কারণ তিনি তাদের প্রভু এবং বিশ্বজগতের প্রভু। এই মুসলিম, যদি আন্তরিক হয়, তাহলে সকল পরিস্থিতিতেই অবিচল থাকবে এবং এই আনুগত্যের মাধ্যমে তারা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ধরনের আশীর্বাদ লাভ করবে যা প্রথম ধরণের ব্যক্তির পার্থিব আশীর্বাদকে ছাড়িয়ে যাবে।

পরিশেষে, মুসলমানদের জন্য তাদের নিয়তের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তা সংশোধন করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়।

ঐশ্বরিক সিদ্ধান্ত

বদর যুদ্ধের জন্য মক্কা ত্যাগ করার আগে, মক্কার অমুসলিম নেতারা আল্লাহর ঘর কাবার পর্দা ধরেছিলেন এবং তাঁর পছন্দের দলকে বিজয় দান করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ৮ম সূরা আল-আনফালের ১৯ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"যদি তোমরা [অবিশ্বাসীরা] সিদ্ধান্ত [অর্থাৎ, বিজয়] চাও, তাহলে সিদ্ধান্ত [অর্থাৎ, পরাজয়] তোমাদের কাছে এসে গেছে। আর যদি তোমরা [শত্রুতা থেকে] বিরত থাকো, তাহলে তা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক; কিন্তু যদি তোমরা আবার [যুদ্ধে] ফিরে যাও, তাহলে আমরাও আবার ফিরে আসবো, এবং তোমাদের [বৃহৎ] দল তোমাদের কোন উপকারে আসবে না, যদিও তা বৃদ্ধি পায়; এবং [এটা] কারণ আল্লাহ মুমিনদের সাথে আছেন।"

এ বিষয়ে তাফসীর ইবনে কাসির, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৮১-২৮২ এবং ইমাম ওয়াহিদীর, আসবাব আল নুযুল, ৮:১৯, পৃষ্ঠা ৮২-এ আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন এবং মুসলমানদের বিজয় দান করেছেন। অতএব, মক্কার অমুসলিমদের উচিত ছিল এই স্পষ্ট নিদর্শনের প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিমের জন্য তাদের দৈনন্দিন জীবনে সতর্ক থাকা এবং তাদের পার্থিব বিষয়গুলিতে অতিরিক্ত আত্মমগ্ন হওয়া এড়িয়ে চলা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা তাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া এবং ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ, কারণ এটি তাদের ঈমানকে শক্তিশালী করার একটি দুর্দান্ত উপায় যা সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন মুসলিম কোনও অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখেন, তখন তাদের কেবল তাদের কাছে থাকা যেকোনো উপায়েই তাকে সাহায্য করা উচিত নয়, এমনকি যদি তা কেবল একটি প্রার্থনাও হয়, বরং তাদের নিজের স্বাস্থ্যের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত এবং বুঝতে হবে যে তারাও অবশেষে অসুস্থতা, বার্ধক্য বা এমনকি মৃত্যুর কারণে তাদের সুস্বাস্থ্য হারাবে। এটি তাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞ হতে অনুপ্রাণিত করবে এবং তাদের কর্মের মাধ্যমে এটি প্রদর্শন করবে, তাদের সুস্বাস্থ্যের সুযোগ গ্রহণ করে, পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে।

যখন তারা কোন ধনী ব্যক্তির মৃত্যু দেখে, তখন তাদের কেবল মৃত ব্যক্তি এবং তার পরিবারের জন্য শোক করা উচিত নয়, বরং এটিও উপলব্ধি করা উচিত যে একদিন তাদেরও মৃত্যু হবে যা তাদের অজানা। তাদের বুঝতে হবে যে, ধনী ব্যক্তি যেমন তাদের সম্পদ, খ্যাতি এবং পরিবার দ্বারা কবরে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন, তেমনি তাদেরও কবরে কেবল তাদের কর্মকাণ্ডই অবশিষ্ট থাকবে। এটি তাদের কবর এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করবে।

এই মনোভাব সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং তা করা উচিত। একজন মুসলিমের উচিত তার চারপাশের সবকিছু থেকে শিক্ষা নেওয়া যা পবিত্র কুরআনে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯১:

"...আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির প্রতি চিন্তা করো, [বলে], "হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি এগুলোকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করোনি; তুমি [এরকম কিছুর উপরে] পবিত্র; তাহলে আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।"

যারা এইভাবে আচরণ করে তারা প্রতিদিন তাদের ঈমানকে শক্তিশালী করবে, অন্যদিকে যারা তাদের পার্থিব জীবনে খুব বেশি আত্মমগ্ন তারা গাফিল থাকবে যা তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

সর্বোত্তম আচরণ

বদরের যুদ্ধে পরিণত হওয়া অভিযানের জন্য মদীনা ত্যাগ করার আগে, তিনি তাঁর জামাতা উসমান বিন আফফান (রা.)-কে মদীনায় থাকতে এবং তাঁর স্ত্রী, নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর কন্যা রুকাইয়া (রা.)-কে সেবা করার নির্দেশ দেন, কারণ তিনি গুরুতর অসুস্থ ছিলেন এবং অবশেষে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। বদরের যুদ্ধের পর মদীনায় ফিরে আসার পর, নবী মুহাম্মদ (সা.) উসমান (রা.)-কে যুদ্ধের গনীমতের অংশ প্রদান করেন, যা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হিসেবে বিবেচিত ছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীজীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩১৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও মহানবী (সাঃ) এর সাথে অভিযানে বের হওয়া গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তবুও উসমান (রাঃ) কে তার অসুস্থ স্ত্রীর যত্ন নেওয়ার জন্য পিছনে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই অন্যদের, যেমন তাদের পরিবারের, অধিকার পূরণের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে, পাশাপাশি মহান আল্লাহর অধিকার পূরণের জন্যও প্রচেষ্টা করতে হবে, কারণ সাফল্য অর্জনের জন্য উভয়ই প্রয়োজন।

জামে আত তিরমিযী, ২৬১২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যার পূর্ণ ঈমান আছে, সে ব্যক্তিই উত্তম আচরণকারী এবং পরিবারের প্রতি সবচেয়ে সদয়।

দুঃখের বিষয় হল , কেউ কেউ আত্মীয়স্বজনবিহীনদের সাথে সদয় আচরণ করার খারাপ অভ্যাস গ্রহণ করেছে, অন্যদিকে তাদের নিজেদের পরিবারের সাথেও

দুর্ব্যবহার করেছে। তারা এই আচরণ করে কারণ তারা নিজের পরিবারের সাথে সদয় আচরণ করার গুরুত্ব বোঝে না এবং তাদের পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। একজন মুসলিম কখনোই সফল হতে পারে না যতক্ষণ না তারা ঈমানের উভয় দিকই পূরণ করে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করা, তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত সমস্ত আশীর্বাদকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে।

দ্বিতীয়ত, মানুষের অধিকার পূরণ করা, যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। নিজের পরিবারের চেয়ে এই সদয় আচরণের অধিকার আর কারো নেই। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের পরিবারকে সকল ভালো বিষয়ে সাহায্য করা এবং মন্দ কাজ ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে ভদ্রভাবে সতর্ক করা। তাদের উচিত কেবল আত্মীয় বলে তাদের খারাপ কাজে অন্ধভাবে সমর্থন করা নয় এবং তাদের প্রতি কিছু খারাপ অনুভূতির কারণে তাদের ভালো বিষয়ে সাহায্য করতে ব্যর্থ হওয়া উচিত নয়, কারণ এটি ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। অধ্যায় ৫ আল মায়িদা, আয়াত ২:

"...এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

অন্যদের পথ দেখানোর সর্বোত্তম উপায় হল ব্যবহারিক উদাহরণের মাধ্যমে, কারণ এটিই মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য এবং এটি কেবল মৌখিক নির্দেশনার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর।

একজনকে অবশ্যই অন্যদের, বিশেষ করে তাদের আত্মীয়স্বজনের, প্রতি তাদের প্রাপ্য অধিকারগুলি শিখতে হবে যাতে তারা তা পূরণ করতে পারে। একজন মুসলিমকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবেন যে তারা অন্যদের অধিকার পূরণ করেছে কিনা, তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করবেন না যে লোকেরা তাদের অধিকার পূরণ করেছে কিনা। অতএব, একজনকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে তাদের কী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, অর্থাৎ অন্যদের অধিকার, এবং তাই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সেগুলি পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

পরিশেষে, সকল বিষয়ে, বিশেষ করে পরিবারের সাথে আচরণের সময়, একজনের উচিত সাধারণত নম্রতা বেছে নেওয়া। এমনকি যদি তারা পাপ করেও থাকে, তবুও তাদের ভদ্রভাবে সতর্ক করা উচিত এবং ভালো কাজে সহায়তা করা উচিত, কারণ এই দয়া তাদের সাথে কঠোর আচরণ করার চেয়ে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে আনতে বেশি কার্যকর।

বদরের যুদ্ধের পর

একটি করুণাময় কাজ

বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় লাভের পর, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, যুদ্ধবন্দীদের সাথে কী করবেন। উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) তাদের বহু অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধের জন্য তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পরামর্শ দেন। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই পরামর্শ অপছন্দ করেন। এরপর, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাদের মৃত্যুদণ্ড থেকে ক্ষমা করার এবং তাদের নিজস্ব স্বাধীনতা কিনতে দেওয়ার পরামর্শ দেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই পরামর্শে সন্তুষ্ট হন এবং তা বাস্তবায়ন করেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩০৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদিস জুড়ে, মুসলমানদের অন্যদের প্রতি দয়ালু হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জামে আত তিরমিযী, ১৯২৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে যারা সৃষ্টির প্রতি দয়া করে, আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করবেন।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, দয়া দেখানো কেবল নিজের কাজের মাধ্যমেই নয়, যেমন দরিদ্রদের সম্পদ দান করা। এটি আসলে নিজের জীবনের প্রতিটি দিক এবং অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন নিজের কথা। এই কারণেই আল্লাহ, মহান, দানশীলতার মাধ্যমে অন্যদের প্রতি দয়া প্রদর্শনকারীদের সতর্ক করে দেন যে, তাদের কথার মাধ্যমে দয়া প্রদর্শন না করা,

যেমন অন্যদের প্রতি করা তাদের অনুগ্রহ গণনা করা, কেবল তাদের প্রতিদান বাতিল করে দেয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৬৪:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের দান-খয়রাতকে স্মরণ করিয়ে অথবা কষ্ট দিয়ে নষ্ট করো না..."

প্রকৃত করুণা সবকিছুতেই প্রকাশিত হয়: মুখের ভাব, দৃষ্টিভঙ্গি এবং কথা বলার স্বর। এটাই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত পূর্ণ করুণা, এবং তাই মুসলমানদের অবশ্যই এইভাবেই কাজ করতে হবে।

অধিকন্তু, দয়া প্রদর্শন এত গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অসংখ্য সুন্দর ও মহৎ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন, তবুও মানুষের হৃদয়কে তাঁর এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে এমন একটি বিষয় ছিল দয়া। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯:

"অতএব, [হে মুহাম্মদ], আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি কোমল ছিলেন। আর যদি আপনি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

এটি স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দেয় যে, দয়া না থাকলে মানুষ মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছ থেকে পালিয়ে যেত, তাঁর উপর শান্তি ও শান্তি বর্ষিত হোক। যদি তাঁর ক্ষেত্রেও এমন হতো, যদিও তিনি অসংখ্য সুন্দর গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন,

তবুও মুসলমানরা, যাদের মধ্যে এই ধরনের মহৎ গুণাবলী নেই, তারা প্রকৃত দয়া না দেখিয়ে অন্যদের উপর, যেমন তাদের সন্তানদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে কীভাবে?

সহজ কথায়, মুসলমানদের অন্যদের সাথে সেই আচরণ করা উচিত যে আচরণ তারা আল্লাহ, সর্বশক্তিমান এবং অন্যদের দ্বারা তাদের সাথে করা হোক, যা নিঃসন্দেহে সত্যিকারের এবং পূর্ণ করুণার সাথে করা হয়।

একটি ন্যায্য শাস্তি

উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যখন ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন, তখন তাকে ইসলামের গভীর ধারণা দেওয়া হয়েছিল, যা খুব কম লোকই বুঝতে পেরেছিল। তিনি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন যে তাঁর মতামত এবং বক্তব্য প্রায়শই ঐশ্বরিক ওহীর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হত। এই কারণেই আলী ইবনে আবু তালিব একবার মন্তব্য করেছিলেন যে সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, বিশ্বাস করতেন যে একজন ফেরেশতা আছেন যিনি উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর জিহ্বা দিয়ে কথা বলতেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলিয়াত আল আউলিয়া, সংখ্যা 64-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় লাভের পর, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যুদ্ধবন্দীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরিবর্তে তাদের নিজেদের স্বাধীনতা ক্রয় করার অনুমতি দেন। পরের দিন, উমর (রাঃ) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং আবু বকর (রাঃ)-কে কাঁদতে দেখেন। যখন তিনি তাদের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মন্তব্য করেন যে, আল্লাহ তাকে সেই শাস্তি দেখিয়েছেন যা তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পরিবর্তে বন্দীদের জন্য মুক্তিপণ গ্রহণের জন্য কষ্ট দিত। এরপর আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা আল-আনফাল, আয়াত ৬৭-৬৮ নাযিল করেন:

"কোন নবীর জন্য এটা শোভন নয় যে, তিনি (আল্লাহর শত্রুদের উপর) দেশে গণহত্যা না চালানো পর্যন্ত তাঁর কাছে বন্দী থাকবেন। তোমরা [অর্থাৎ, কিছু মুসলিম] দুনিয়ার ভোগ-সম্পদ কামনা করো, কিন্তু আল্লাহ [তোমাদের জন্য] আখেরাতের কামনা করেন। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। যদি

আল্লাহর পূর্ববর্তী কোন নির্দেশ না থাকতো, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করেছো তার জন্য তোমাদের উপর বিরাট আযাব আসতো।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩০৫ এবং সহীহ মুসলিমের ৪৫৮৮ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বন্দীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা তাদের অপরাধের জন্য ন্যায্য শাস্তি ছিল এবং মক্কার অমুসলিমদের সহিংস আচরণের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করত। এই প্রতিবন্ধকতা দীর্ঘমেয়াদে আরও যুদ্ধ প্রতিরোধ করতে পারত যার ফলে জীবন রক্ষা পেত। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ঘটনাটি ইঙ্গিত দেয় যে, নিজের দূরদর্শিতার অভাবকে মেনে নেওয়া এবং পরিবর্তে মহান আল্লাহর উপদেশ, আদেশ এবং নিষেধাজ্ঞার উপর আস্থা রাখা এবং কাজ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় একজন ব্যক্তি তার পছন্দের নেতিবাচক পরিণতিগুলি পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হন এবং এগুলি এড়াতে তাদের অবশ্যই ইসলামী উপদেশের উপর আস্থা রাখতে হবে এবং কাজ করতে হবে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। ঠিক যেমন একজন জ্ঞানী রোগী তার ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শে বিশ্বাস করে এবং কাজ করে, যদিও এটি প্রায়শই তাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয়, একজন ব্যক্তির অবশ্যই মহান আল্লাহর পরামর্শে আস্থা রাখতে হবে এবং কাজ করতে হবে, যাতে তারা মানসিক এবং শারীরিক শান্তি অর্জন করতে পারে। সর্বদা সেই বিভিন্ন সময়গুলি মনে রাখা উচিত যেখানে তারা বিশ্বাস করেছিল যে কোনও কিছু তাদের জন্য ভাল, যদিও এটি তাদের জন্য চাপের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং যখন তারা মনে করেছিল যে কোনও কিছু তাদের জন্য খারাপ, কেবল তখনই এটি তাদের জন্য মঙ্গলের উৎস হয়ে ওঠে। এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর উপদেশ, আদেশ এবং নিষেধের উপর আস্থা রাখতে উৎসাহিত করবে, এমনকি যদি তারা এর পিছনের হিকমতগুলি পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

ভদ্রতা প্রদর্শন করা

বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় লাভের পর, কিছু যুদ্ধবন্দীকে বন্দী করা হয়, যার মধ্যে ছিল সুহাইল বিন আমর, একজন অমুসলিম নেতা। মক্কায় থাকাকালীন তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরোধিতায় অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন এবং ফলস্বরূপ উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তাকে শাস্তি দেওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন যাতে তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কথা বলতে না পারেন। নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উত্তরে তিনি বলেন, যদি তিনি মানুষের উপর নির্যাতনের অনুমতি দেন, তাহলে মহান আল্লাহ তাকে নির্যাতনের অনুমতি দেবেন, যদিও তিনি তাঁর পবিত্র নবী, তাঁর উপর বরকত ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। তিনি আরও বলেন যে, সম্ভবত সুহাইল একদিন এমন কিছু করার জন্য দাঁড়াবে যা তাকে এবং অন্যদেরকে তার সমালোচনা করা থেকে বিরত রাখবে। সুহাইল (রাঃ) অবশেষে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মহানবী (সাঃ) এর মৃত্যুর পর, যখন কিছু মুসলিম গোত্র ইসলাম ত্যাগ করে, তখন তিনি মক্কায় দাঁড়িয়ে তাদেরকে ইসলামের উপর অবিচল থাকার আহ্বান জানান এবং যদি তারা ধর্মত্যাগ করে তবে তাদের হুমকি দেন। এটি ছিল সেই সময়ে মক্কা ইসলামের উপর অবিচল থাকার অন্যতম প্রধান কারণ। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর (সাঃ) নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০২৬-১০২৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুহাইল (রাঃ) এর প্রতি দেখানো ভদ্রতা তাকে ইসলামের সত্যতা গ্রহণ করতে এবং এর উপর অটল থাকতে উৎসাহিত করেছিল।

সৌন্দর্য কোমলতার মধ্যেই নিহিত। মহানবী (সাঃ) সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৬৮৯ নম্বরের সহিত অনেক হাদিসে এই উপদেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে এমনকি উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন,

নবী (সাঃ) এর সাথে সর্বদা প্রেমের সাথে থাকতেন, তাঁর কোমলতা এবং কোমল স্বভাবের কারণে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯:

" অতএব আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের প্রতি কোমল ছিলে। আর যদি তুমি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতে, তাহলে তারা তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

আরবরা কঠোর হৃদয়ের জন্য কুখ্যাত ছিল কিন্তু মহানবী (সা.)-এর কারণে , শান্তি ও তাঁর উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, প্রায়শই তাদের কঠোর হৃদয় গলে যায় এবং এভাবে তারা গ্রহণ করে এই গুণটি এবং বাকি মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠে । এই কারণেই মহানবী মুহাম্মদ , শান্তি এবং তাঁর উপর বরকত বর্ষিত হোক, একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে সুনান আবু দাউদ, ৪৮০৯ নম্বরে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি ভদ্রতা থেকে বঞ্চিত, সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৩:

"... আর তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো- যখন তোমরা শত্রু ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে সম্প্রীতি স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছো..."

যারা ইসলামের বাণী প্রচার করতে চান তাদের জন্য এটি একটি স্পষ্ট বার্তা। তাদের কঠোর ধ্বংসাত্মক মানসিকতার চেয়ে কোমল গঠনমূলক মানসিকতা থাকা উচিত । তাদের উচিত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং অন্যদের উপকার করার চেষ্টা করা, সমাজের মধ্যে বিতর্ক। এর একটি ভালো উদাহরণ এই সন্তানদের প্রতি

ব্যক্তির মনোভাবের মধ্যে এটি দেখা যায়। যেসব বাবা-মা তাদের সন্তানদের প্রতি কোমল মনোভাব দেখিয়েছিলেন , তাদের সন্তানদের উপর দত্তক নেওয়া বাবা-মায়ের তুলনায় বেশি ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। কঠোর স্বভাব। প্রায়শই কেউ কেউ তাদের কঠোর মনোভাবের মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয় এবং এটি ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে চ্যালেঞ্জ করে মহানবী (সাঃ)-এর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। উদাহরণস্বরূপ, একবার একজন অশিক্ষিত বেদুইন মহানবী (সাঃ) -এর মসজিদে প্রস্রাব করে ফেলল । যখন সাহাবীরা , আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন, তাকে শাস্তি দিতে চাইলেন। মহানবী মুহাম্মদ , শান্তি তাঁর উপর রহমত বর্ষিত হোক, তিনি তাদেরকে নিষেধ করেছিলেন এবং মসজিদে থাকার আদব-কায়দা সম্পর্কে বেদুইনদেরকে নম্রভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই ঘটনাটি সুনান ইবনে মাজাহের ৫২৯ নম্বর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে । এই নরম মনোভাব লোকটির উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায়ও এর উল্লেখ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যদিও ফেরাউন নিজেকে সর্বোচ্চ প্রভু বলে দাবি করেছিল তবুও মহান আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ)-কে আদেশ করলেন , তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। উভয়কেই, ফেরাউনকে আমন্ত্রণ জানাতে মৃদু ও সদয় কথাবার্তার মাধ্যমে পথনির্দেশনার দিকে। অধ্যায় ৭৯ আন নাজিয়াত, আয়াত ২৪:

"এবং বলল, "আমি তোমাদের সবচেয়ে মহান প্রতিপালক।"

এবং অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ৪৩-৪৪:

"তোমরা দুজনেই ফেরাউনের কাছে যাও। নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘন করেছে। আর তার সাথে নম্রভাবে কথা বলো, হয়তো সে স্মরণ করবে অথবা [আল্লাহকে] ভয় করবে।"

শিশুরা আর পশুরাও ভদ্রতার ভাষা বোঝে। তাহলে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যদি ইসলাম ও কল্যাণের দিকে দাওয়াত দেওয়ার সময় এই বৈশিষ্ট্যটি গ্রহণ করে, তাহলে কীভাবে তাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করা যাবে না? এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর উপর দরুদ বর্ষিত হোক, একবার একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে সহীহ মুসলিম, ৬৬০১ নম্বরে পাওয়া গেছে যে , আল্লাহ , তিনি তাঁর অসীম মর্যাদা অনুসারে দয়ালু এবং কোমল এবং সৃষ্টিকে একে অপরের সাথে নরম আচরণ করতে পছন্দ করেন। দুর্ভাগ্যবশত, যারা এই কথাটি ছড়িয়ে দেয় তাদের অনেকেই ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা এই ভুল বিশ্বাস গ্রহণ করেছেন যে, কোমল হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ । এটি শয়তানের একটি চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ সে মানবজাতিকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চায় ।

হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর উত্তরাধিকার

বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় লাভের পর, মহানবী (সা.)-এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব সহ কিছু যুদ্ধবন্দীকে বন্দী করা হয়। আলী ইবনে আবু তালিব (রা.)-সহ সাহাবীরা আব্বাসের অবিশ্বাসের সমালোচনা করেছিলেন এবং তাকে কঠোর ভাষায় সম্বোধন করেছিলেন। আব্বাস প্রশ্ন করেছিলেন যে, তারা সকলেই কেন তার খারাপ কাজের কথা উল্লেখ করেছেন, তার ভালো কাজের কথা উল্লেখ করেননি। তারপর তিনি তাদের কয়েকটির তালিকা তৈরি করেন, যার মধ্যে রয়েছে: আল্লাহর ঘর, কাবা শরীফের রক্ষণাবেক্ষণ, এর দ্বাররক্ষী হিসেবে কাজ করা এবং হজ্জের মৌসুমে হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ করা। এই প্রসঙ্গে, আল্লাহ তা'আলা তাওবার ৯ম সূরার ১৭-১৮ আয়াত নাজিল করেন:

"মুশরিকদের জন্য আল্লাহর মসজিদগুলো আবাদ করা উচিত নয়, যখন তারা নিজেদের বিরুদ্ধে কুফরী সাক্ষ্য দিচ্ছে। [তাদের জন্য], তাদের কর্ম ব্যর্থ হয়েছে এবং তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। আল্লাহর মসজিদগুলো কেবল তারাই আবাদ করবে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না, কারণ আশা করা যায় যে তারাই [সঠিকভাবে] সৎপথপ্রাপ্ত হবে।"

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৯:১৭, পৃষ্ঠা ৮৫-৮৬-তে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মক্কার অমুসলিমদের নেতারা প্রায়শই গর্ব করতেন যে তারা অন্য সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যেমন সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, কারণ মক্কা বিজয়ের

পূর্বে তারা মক্কায় অবস্থিত আল্লাহর ঘর কাবার রক্ষক ছিলেন। তারা কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং মানুষের সম্মান অর্জনের জন্য আল্লাহর ঘরের হজযাত্রীদের সেবা করতেন। এই দাবির মূলে ছিল এই সত্য যে তারা ছিলেন মহানবী ইব্রাহিম (আঃ)-এর বংশধর, যিনি মহান আল্লাহর ঘর নির্মাণ করেছিলেন এবং পবিত্র হজযাত্রার কাজগুলি মূলত যাদের কাছেই দায়ী করা হয়। তাই তাদের দৃষ্টিতে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ছিল মহানবী ইব্রাহিম (আঃ)-এর উত্তরাধিকার।

কিন্তু এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ তাআলা অমুসলিম আরবদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, যেহেতু তারা ইসলামের স্পষ্ট সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাই তারা আর নবী ইব্রাহিম (আঃ)-এর উত্তরাধিকার বহন করার যোগ্য নয়, বরং এটি তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে যারা কার্যত তাঁর পথ অনুসরণ করেছিল, অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর আশীর্বাদ ও বরকত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। যদি অমুসলিম আরবরা তাদের অবাধ্যতার উপর অটল থাকে, তাহলে তারা নবী ইব্রাহিম (আঃ)-এর উত্তরাধিকার থেকে এই পৃথিবীতে বা পরকালেও উপকৃত হবে না।

অতএব, এটি মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ, অর্থাৎ ইসলামের দূতদের কথা মনে করিয়ে দেয়। মুসলমানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এই দায়িত্ব পালন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হল মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং তাঁর পছন্দগুলির প্রতি ধৈর্য ধরা। ইসলাম সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে কারণ ধার্মিক পূর্বসূরীরা এই দায়িত্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছিলেন। যখন তারা উপকারী জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং তার উপর কাজ করেছিলেন, তখন বাইরের বিশ্ব তাদের আচরণের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা স্বীকৃতি দিয়েছিল। এর ফলে অসংখ্য মানুষ ইসলামের পথে প্রবেশ করেছিল। দুর্ভাগ্যবশত, আজ অনেক মুসলিম বিশ্বাস করে যে ইসলাম সম্পর্কে অন্যদের দেখানো কেবল নিজের চেহারা, যেমন দাড়ি রাখা বা স্কার্ফ পরা। এটি ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করার একটি দিক মাত্র। সবচেয়ে বড় অংশ হল পবিত্র কুরআন এবং

তাঁর ঐতিহ্যে আলোচিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা। কেবলমাত্র এই মনোভাব দিয়েই বহির্বিশ্ব ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করবে। একজন মুসলমানের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতাকারী বৈশিষ্ট্য ধারণ করে ইসলামী চেহারা গ্রহণ করলে বহির্বিশ্ব কেবল ইসলামকে অসম্মান করে। এই অসম্মানের জন্য তারাই দায়ী থাকবে কারণ তারাই এর কারণ। তাই একজন মুসলিমের উচিত ইসলামের অভ্যন্তরীণ শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামের বাহ্যিক রূপ গ্রহণ করে ইসলামের একজন প্রকৃত দূত হিসেবে আচরণ করা।

এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানটি মুসলমানদের মনে করিয়ে দেয় যে, বিচারের দিন তাদের জবাবদিহি করতে হবে এবং জিজ্ঞাসা করা হবে যে তারা এই ভূমিকা পালন করেছে কিনা। একজন রাজা যেমন তাদের কূটনীতিক এবং প্রতিনিধিদের উপর তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে তাদের উপর রাগান্বিত হবেন, তেমনিভাবে আল্লাহ, ইসলামের দূত হিসেবে তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হওয়া মুসলিমদের উপর রাগান্বিত হবেন।

অধিকন্তু, আলোচিত মূল ঘটনাটি এও ইঙ্গিত দেয় যে, নবী ইব্রাহিম (আঃ)-এর উত্তরাধিকার, যার উপর প্রতিটি মুসলিম নির্ভরশীল, কেবল কথার উপর নয়, বরং কর্মের উপর নির্ভরশীল। এই ঘটনার সাথে সম্পর্কিত নাজিল হওয়া আয়াতগুলি দ্বারা এটি সমর্থিত। অধ্যায় ৯ তওবা, আয়াত ১৭-১৮:

"মুশরিকদের জন্য আল্লাহর মসজিদগুলো আবাদ করা উচিত নয়, যখন তারা নিজেদের বিরুদ্ধে কুফরী সাক্ষ্য দিচ্ছে। [তাদের জন্য], তাদের কর্ম ব্যর্থ হয়েছে এবং তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। আল্লাহর মসজিদগুলো কেবল তারাই আবাদ করবে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, নামাজ কায়েম

করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না, কারণ আশা করা যায় যে তারাই [সঠিকভাবে] সৎপথপ্রাপ্ত হবে।"

অতএব, তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে আনুগত্যের মাধ্যমে সমর্থন করা উচিত। এর জন্য ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিক আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। ইসলামের দৃষ্টিতে কর্ম ছাড়া কথার মূল্য কম। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে তার ঈমান হারানোর ঝুঁকি থাকে। কারণ ঈমান হলো একটি গাছের মতো যাকে ভালো কাজের মাধ্যমে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি গাছ পানি না পেয়ে মারা যায়, ঠিক তেমনি একজন মুসলিমের ঈমানেরও মৃত্যু হতে পারে যদি তারা তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা

বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় লাভের পর, কিছু যুদ্ধবন্দীকে বন্দী করা হয়, যার মধ্যে ছিল মহানবী (সাঃ)-এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ), যিনি পরবর্তীতে মুসলিম হয়েছিলেন। উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) আব্বাস (রাঃ)-কে ইসলাম গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে, তার ইসলাম গ্রহণ তার নিজের পিতার ইসলাম গ্রহণের চেয়েও বেশি আনন্দিত হবে, কারণ তার ঈমান গ্রহণ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে অত্যন্ত আনন্দিত করবে। ইমাম ইবনে কাসীরের "নবী (সাঃ)-এর জীবনী", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩০৭-৩০৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর (রাঃ) তাঁর কর্মের মাধ্যমে মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রমাণ করেছেন। এই প্রমাণের মধ্যে রয়েছে মহানবী (সাঃ)-এর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা। যে ব্যক্তি এমন আচরণ করে যা মহানবী (সাঃ)-এর শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক, তার প্রমাণ হল তাঁর প্রতি তাদের ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার অভাব। অতএব, যে মুসলিম মহানবী (সাঃ)-কে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা করার দাবি করে, তাকে অবশ্যই তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা পরকালে তাঁর সাথে মিলিত হবে, যেমন একজন ব্যক্তি পরকালে যাদেরকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে তাদের সাথে মিলিত হবে। সহীহ বুখারীতে ৩৬৮৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী জাতিগুলির মতো যারা তাদের পবিত্র নবীদের ভালোবাসার দাবি করে, কিন্তু তাদের সাথে মিলিত হবে না, কারণ তারা তাদের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তেমনি যে মুসলিম মহানবী (সাঃ)-এর শিক্ষা অনুযায়ী আমল করতে ব্যর্থ হয়েছিল, সেও পরকালে তাঁর সাথে মিলিত হবে না।

সংবাদ প্রচার

বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় দান করার পর, মহানবী (সা.) মদিনায় ফিরে আসেন। তিনি তাঁর দুই সাহাবী, যায়েদ বিন হারিসা এবং আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.)-কে মদিনায় পাঠিয়ে দেন যাতে তারা শহরবাসীকে বিজয়ের সুসংবাদ দিতে পারেন। তারা মদিনায় পৌঁছে বদরের ঘটনা সকলকে বলতে শুরু করে। কিছু মুনাফিক মদিনায় গুজব ছড়াতে শুরু করে যে মুসলিম সেনাবাহিনী পরাজিত হয়েছে এবং দুই সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, বিভ্রান্ত। এর ফলে শহরের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং ভয় ছড়িয়ে পড়ে। ইমাম ইবনে কাথিরের "নবী (সা.)-এর জীবনী", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩১৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতের উপর আমল করা এবং অন্যদের কাছে তথ্য ছড়িয়ে না দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি যদি তারা বিশ্বাস করে যে তারা তথ্য যাচাই না করেই অন্যদের উপকার করছে। অর্থাৎ, তাদের নিশ্চিত করা উচিত যে এটি একটি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে এসেছে এবং সঠিক। সূরা আল হুজুরাত, আয়াত 6:

" হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তা পরীক্ষা করে দেখো, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি না করো এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।"

যদিও এই আয়াতে একজন দুষ্ট ব্যক্তি সংবাদ প্রচারের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তবে এটি সেই সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে যারা অন্যদের সাথে তথ্য ভাগ করে। এই আয়াতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, একজন ব্যক্তি হয়তো বিশ্বাস

করতে পারেন যে তারা অন্যদের সাহায্য করছেন কিন্তু যাচাই না করা তথ্য ছড়িয়ে দিয়ে তারা অন্যদের ক্ষতি করতে পারে, যেমন মানসিক ক্ষতি। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম এই বিষয়ে গাফিল এবং যাচাই না করে কেবল টেক্সট বার্তা এবং সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে তথ্য ফরোয়ার্ড করার অভ্যাস রাখেন। যেসব ক্ষেত্রে তথ্য ধর্মীয় বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, সেখানে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার আগে তা যাচাই করা আরও গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু অন্যদের ভুল তথ্যের ভিত্তিতে তাদের কর্মের জন্য শাস্তি পেতে পারে। সহিহ মুসলিমের ২৩৫১ নম্বর হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে।

তাছাড়া, বিশ্বে যা কিছু ঘটছে এবং এটি মুসলমানদের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলছে, তার সাথে সাথে তথ্য যাচাই করা আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ যা ঘটেনি সে সম্পর্কে অন্যদের সতর্ক করা কেবল সমাজে অস্থিরতা তৈরি করে এবং মুসলিম এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল আরও বাড়িয়ে তোলে। এটি ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী।

একজন মুসলিমের বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ বিচারের দিন প্রশ্ন করবেন না যে তারা কেন অযাচাইকৃত তথ্য অন্যদের সাথে ভাগ করে নিল না। কিন্তু তিনি অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসা করবেন যদি তারা অন্যদের সাথে তথ্য ভাগ করে, তা যাচাইকৃত হোক বা না হোক। অতএব, একজন বুদ্ধিমান মুসলিম কেবল যাচাইকৃত তথ্য ভাগ করে নেবে এবং যা যাচাইকৃত নয় তা তারা জেনেও ছেড়ে দেবে যে এর জন্য তাদের কোনও জবাবদিহি করতে হবে না।

মহৎ চরিত্র

বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় দান করার পর, মহানবী (সাঃ) মদিনায় ফিরে যান। তিনি বদরের বন্দীদের সাহাবীদের (রাঃ) হাতে অর্পণ করেন এবং তাদের সাথে ভালো আচরণ করার নির্দেশ দেন। সাহাবীরা (রাঃ) তাদের রুটি বন্দীদের দিতেন, যা তাদের কাছে সবচেয়ে ভালো খাবার ছিল এবং খেজুর খেতেন, যা তাদের কাছে সবচেয়ে নিম্নমানের খাবার ছিল। তারা বন্দীদের হাঁটার সময় তাদের ঘোড়ায় চড়তেও দিতেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩১৯ এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রাঃ) এর "প্রভুর নোবেল জীবন", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০২০-তে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলাম মানুষকে উত্তম চরিত্র গ্রহণের পরামর্শ দেয় যাতে তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মানুষের অধিকার পূরণ করতে পারে। উত্তম চরিত্র একজনকে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে। অতএব, উত্তম চরিত্র গ্রহণ মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতেই সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে।

জামে আত তিরমিযী, ২০০৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, বিচার দিবসের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে উত্তম চরিত্র। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এর ফলে একজন ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করতে পারবে

যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এর সারমর্ম হল ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করা।

মূল হাদিসটিতে মানুষের প্রতি ভালো চরিত্র প্রদর্শনের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম আল্লাহর প্রতি বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালনের চেষ্টা করে, কিন্তু অন্যদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে দ্বিতীয় দিকটি উপেক্ষা করে। তারা এর গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়। জামে আত তিরমিযী, ২৫১৫ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে পরামর্শ দেয় যে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে অন্যদের জন্য যা পছন্দ করে তা নিজের জন্য পছন্দ করে। অর্থাৎ, যেভাবে একজন ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে সদয় আচরণ পেতে চায়, তাকে অন্যদের সাথেও ভালো চরিত্রের সাথে আচরণ করতে হবে।

তাছাড়া, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন ও মুসলিম হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার ধর্ম নির্বিশেষে অন্যদের এবং তাদের সম্পদের উপর তার মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি থেকে দূরে থাকে। সুনানে আন নাসায়ীর ৪৯৯৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ৩৩১৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, একজন মহিলা জাহান্নামে প্রবেশ করবে কারণ সে একটি বিড়ালের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে যার ফলে বিড়ালটি মারা গেছে। সুনানে আবু দাউদের ২৫৫০ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, একজন পুরুষকে ক্ষমা করা হয়েছে কারণ সে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে খাওয়ায়। যদি এটি ভালো চরিত্র দেখানোর ফলাফল এবং পশুদের প্রতি খারাপ চরিত্র দেখানোর ফলাফল হয়, তাহলে কি কেউ কল্পনা করতে পারে যে, আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি ভালো চরিত্র দেখানোর গুরুত্ব কত? প্রকৃতপক্ষে, আলোচিত মূল হাদিসটি এই উপদেশ দিয়ে শেষ হয়েছে যে, যার ভালো চরিত্র আছে সে সেই

মুসলিমের মতোই পুরস্কৃত হবে যে অবিরাম আল্লাহর ইবাদত করে এবং নিয়মিত রোজা রাখে।

পরিশেষে, মূল হাদিস অনুসারে, যদি ভালো চরিত্র একজন ব্যক্তির পক্ষে বিচার দিবসের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হয়, তাহলে এর অর্থ হল একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচার দিবসের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে খারাপ চরিত্র। মহান আল্লাহর প্রতি, তাঁর আন্তরিকভাবে আনুগত্য না করার মাধ্যমে, এবং সৃষ্টির প্রতি, অন্যদের দ্বারা যেভাবে আচরণ করা হোক তা না করার মাধ্যমে, খারাপ আচরণ করা।

দুর্বলতা ছাড়া কোমলতা

বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের বিজয় দান করার পর, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় ফিরে যান। বদরের এক বন্দী দাবি করে যে সে খুবই দরিদ্র এবং আত্মত্যাগ করার মতো যথেষ্ট সম্পদ তার নেই। সে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কোমল স্বভাবের কাছে আবেদন করে তাকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন এবং তার অনুরোধ পূরণ করেন এই শর্তে যে সে আর ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পর, সে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে অমুসলিমদের সাথে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। উহুদের যুদ্ধে, আরেকটি যুদ্ধে, নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে আবার বন্দী করেন। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে তাকে আবার মুক্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন কিন্তু তিনি উত্তর দেন যে, একজন মুমিন একই গর্ত থেকে দুবার কামড়ায় না। এরপর এই বন্দীকে ইসলামী জাতির বিরুদ্ধে তার অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২৬-৩২৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও ইসলাম মুসলমানদের তাদের সামর্থ্য অনুসারে অন্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করতে শেখায়, যেমন অন্যদের মানসিক, আর্থিক এবং শারীরিকভাবে সহায়তা করা, তবুও এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানের অন্যদের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করা উচিত নয়।

সহীহ বুখারীতে ৬১৩৩ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুমিন একই গর্ত থেকে দুবার দংশন করে না।

এর অর্থ হলো, একজন মুমিন কখনোই কোন কিছু বা কারো দ্বারা দুবার প্রতারিত হয় না। এর মধ্যে পাপ করাও অন্তর্ভুক্ত। একজন সত্যিকারের মুমিন পাপ করার হাত থেকে রেহাই পায় না। কিন্তু যখন তারা ভুল করে, তখন তারা তাদের ভুল পুনরাবৃত্তি করে না এবং পরিবর্তে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা অনুভব করা, মহান আল্লাহর কাছে এবং যাদের উপর অন্যায় করা হয়েছে তাদের ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার সৃষ্টি করে, একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকার পূরণ করে।

একজন সত্যিকারের মুমিন কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে না, যার ফলে তার উপর অন্যায়ের ঝুঁকি বেড়ে যায়। কিন্তু যদি কেউ তাকে বোকা বানায়, তাহলে তাকে উপেক্ষা করা উচিত এবং ক্ষমা করা উচিত, কারণ এটি তাকে ক্ষমা করে দেয়। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ২২:

"...এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন..."

কিন্তু ভবিষ্যতে এই ব্যক্তির সাথে আচরণ করার সময় তাদের আচরণও পরিবর্তন করা উচিত, যাতে তারা আবার বোকা না হয়। অন্যদের ক্ষমা করা এবং বিশেষ করে যখন তারা কারো সাথে অন্যায় করে, তখন তাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করার মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে।

অধিকন্তু, এই হাদিসটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কারণ একজন প্রকৃত মুমিন হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ক্রমাগত তাদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন যাতে তারা উন্নতির জন্য পরিবর্তন আনতে পারেন যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি করতে পারে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে।

পরিশেষে, মূল হাদিসটি ক্ষমা করা এবং ভুলে যাওয়ার ভুল ধারণাটি দূর করে। যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যদের ক্ষমা করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কিন্তু ভুলে যাওয়া কেবল মানুষের জন্য আবার তাদের উপর অন্যায় করার দরজা খুলে দেয়। মানুষ তাদের স্মৃতি মুছে ফেলতে পারে না এবং তাদেরও করা উচিত নয়। পরিবর্তে, অন্যদের ক্ষমা করা উচিত, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের অধিকার পূরণ করার চেষ্টা করা উচিত, তবে মানুষের সাথে আচরণ করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, বিশেষ করে যারা অতীতে তাদের উপর অন্যায় করেছে, যাতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয়।

কোনও অগ্রাধিকারমূলক চিকিৎসা নেই

বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় দান করার পর, মহানবী (সাঃ) মদিনায় ফিরে যান। যদিও মহানবী (সাঃ) বদরের কিছু বন্দীকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দিয়েছিলেন, তবুও সাহাবীগণ (রাঃ) তাঁর নিজের চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ নিশ্চিত করেছিলেন, যদিও সাহাবীগণ (রাঃ) তাঁকে বিনামূল্যে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন কারণ তিনি ছিলেন মহানবী (সাঃ) এর চাচা। প্রকৃতপক্ষে, আব্বাসকে তার মুক্তির জন্য অন্য কারও চেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয়েছিল। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৪৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

বদরের যুদ্ধের সময় নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অমুসলিম জামাতা আবুল আসকেও বন্দী করা হয়েছিল। আবুল আস-এর স্ত্রী জয়নব (রাঃ) তার স্বামীর মুক্তিপণ হিসেবে তার হার তার পিতা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। হারটি ছিল তার মা এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রথম স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রাঃ)-এর। হারটি দেখে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। এই অবস্থায়ও তিনি সাহাবীদের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য তাঁর ক্ষমতার ব্যবহার করেননি, যাতে তিনি তাঁর জামাতাকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দিতে পারেন। তারা আবুল আসকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং জয়নব (রাঃ)-কে হারটি ফিরিয়ে দেন। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ২৩১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাগুলি মানুষের প্রতি অগ্রাধিকারমূলক আচরণ না দেখানোর গুরুত্ব নির্দেশ করে। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, আইন ও বিধি সকলের জন্য সমানভাবে প্রয়োগ করা উচিত। সমাজ বিপথগামী হওয়ার একটি প্রধান কারণ হল মানুষ ন্যায়বিচার করা ছেড়ে দিয়েছে। সহীহ বুখারীতে ৬৭৮৭ নম্বরে পাওয়া একটি

হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে পূর্ববর্তী জাতিগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে কারণ কর্তৃপক্ষ আইন ভঙ্গ করলে দুর্বলদের শাস্তি দিত কিন্তু ধনী ও প্রভাবশালীদের ক্ষমা করত। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, যদি তার নিজের মেয়ে কোনও অপরাধ করে তবে তিনি তার উপর পূর্ণ আইনি শাস্তি প্রয়োগ করবেন। যদিও সাধারণ জনগণ তাদের নেতাদের তাদের কর্মে ন্যায়সঙ্গত থাকার পরামর্শ দেওয়ার অবস্থানে নাও থাকতে পারে, তবে তারা তাদের সমস্ত আচরণ এবং কর্মে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে পরোক্ষভাবে তাদের প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিমকে তাদের উপর নির্ভরশীলদের, যেমন তাদের সন্তানদের সাথে সমান আচরণ করে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হবে। সুনানে আবু দাউদের ৩৫৪৪ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে বিশেষভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের সকল ব্যবসায়িক লেনদেনে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা উচিত, তা সে কার সাথেই করুক না কেন। যদি মানুষ ব্যক্তিগত স্তরে ন্যায়বিচারের সাথে আচরণ করে, তাহলে সমাজ আরও ভালোর দিকে পরিবর্তিত হতে পারে এবং ফলস্বরূপ যারা প্রভাবশালী পদে আছেন, যেমন রাজনীতিবিদ, তারা ইচ্ছা করুক বা না করুক, ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবেন।

ভালো হওয়া

বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় দান করার পর, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় ফিরে আসেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব, যিনি যুদ্ধবন্দী ছিলেন, তাকে তার মুক্তি কিনতে বাধ্য করা হয়। এরপর আল্লাহ তায়ালা ৮ম সূরা আল-আনফালের ৭০-৭১ আয়াত নাযিল করেন:

"হে নবী, তোমার হাতে যারা বন্দী আছে তাদের বলো, "যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরে কোন কল্যাণ জানেন, তাহলে তোমাদের কাছ থেকে যা নেওয়া হয়েছে তার চেয়ে উত্তম কিছু তিনি তোমাদের দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন; আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" কিন্তু যদি তারা তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায় - তাহলে তারা পূর্বেই আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং তিনি তাদের উপর তোমাকে ক্ষমতায়িত করেছেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।"

পরবর্তীতে আব্বাস (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বদরের যুদ্ধে তিনি যা হারিয়েছিলেন তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাকে বিশজন দাস, অর্থাৎ অন্য একটি বর্ণনা অনুসারে চল্লিশজন দাসী দেওয়া হয় এবং তিনি সর্বদা আশা করেন যে মহান আল্লাহ তাকেও ক্ষমা করবেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর (সাঃ) নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০২১-১০২২-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ঘটনাটি সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্য এবং আত্মসমর্পণের গুরুত্ব নির্দেশ করে, কারণ এটি উভয় জগতের কল্যাণ বয়ে আনে, এমনকি যদি এটি কোনও ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট নাও হয়।

যারা ইসলামে বিশ্বাসকে অস্বীকার করে অথবা তার উপর আমল করা থেকে বিরত থাকে, তারা বস্তুজগৎ এবং এর ভেতরের জিনিসের প্রতি ভালোবাসা থেকে তা করে। তারা বিশ্বাস করে যে বিশ্বাস করা বা তার উপর আমল করা তাদের পার্থিব আশীর্বাদ উপভোগ করা থেকে বিরত রাখবে, অর্থাৎ তাদের জন্য ঈমান এমন একটি জিনিস যা তাদের আকাঙ্ক্ষাকে সীমাবদ্ধ করে এবং তাই তারা আক্ষরিক বা ব্যবহারিকভাবে তা থেকে দূরে সরে যায়। পরিবর্তে তারা বস্তুজগতে ফিরে আসে এবং সীমাবদ্ধতা ছাড়াই তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার চেষ্টা করে এই বিশ্বাসে যে প্রকৃত শান্তি এতে নিহিত। তারা তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে তাদের ঈমানকে গ্রহণ করে এবং বাস্তবায়িত করে তাদের অবজ্ঞা করে। তারা বিশ্বাস করে যে এই ধার্মিক মুসলিমরা হল নিম্নমানের দাস যাদের নিজেদের আনন্দ উপভোগ করতে নিষেধ করা হয়েছে, অথচ তারা, কাফের এবং পথভ্রষ্টরা, স্বাধীন। কিন্তু বাস্তবে এটি সত্য থেকে দূরে থাকতে পারে না কারণ প্রকৃত দাস হল তারা যারা মহান আল্লাহকে গ্রহণ করতে এবং তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে ব্যর্থ হয় এবং শ্রেষ্ঠরা হল তারা যারা পৃথিবীর দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে এটি করেছে। এটি একটি উদাহরণ দ্বারা বোঝা যায়। একজন ভালো বাবা-মা তাদের সন্তানের খাবারের ধরণ সীমিত করে দেবেন, অর্থাৎ তারা মাঝে মাঝেই কেবল জাঙ্ক এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার খেতে দেবেন এবং পরিবর্তে তাদের স্বাস্থ্যকর খাবার অনুসরণ করতে বাধ্য করবেন। তাই এই শিশুটি বিশ্বাস করে যে তার বাবা-মা তাদের উপর অবাঞ্ছিত বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন এবং তারা তাদের বাবা-মা এবং তাদের স্বাস্থ্যকর খাবারের দাস হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, অন্য একটি শিশুকে তাদের বাবা-মা যখন ইচ্ছা এবং যতটা ইচ্ছা তাই খেতে অনুমতি দিয়েছেন। তাই এই শিশুটি বিশ্বাস করে যে তারা সমস্ত বিধিনিষেধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যখন এই শিশুরা একত্রিত হয়, তখন যে শিশুটিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, সে তার বাবা-মা কর্তৃক সীমাবদ্ধ শিশুটির সমালোচনা করে এবং তাকে অবজ্ঞা করে। দ্বিতীয় শিশুটি যখন দেখবে যে অন্য শিশুটিকে তার ইচ্ছামত আচরণ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, তখন তারা নিজের জন্যও দুঃখিত হবে। বাহ্যিকভাবে মনে হবে যে যে শিশুটিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে সে সুখ পেয়েছে যেখানে অন্য শিশুটি জীবন উপভোগ করার জন্য এত বিধিনিষেধের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে সত্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যে শিশুটির কোন বিধিনিষেধ ছিল

না, সে বড় হয়ে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে যেমন স্থূলতা, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি। এর ফলে তারা মানসিকভাবেও অসুস্থ হয়ে পড়ে কারণ তারা তাদের শরীর এবং চেহারার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। এর ফলে তারা ওষুধ, রোগ, মানসিক ও সামাজিক সমস্যার দাস হয়ে ওঠে। এই সমস্ত জিনিস তাদের সুখ এবং জীবনকে সীমাবদ্ধ করে। অন্যদিকে, যে শিশুটিকে তার বাবা-মা দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল, সে মন এবং দেহে সুস্থভাবে বেড়ে ওঠে। ফলস্বরূপ তারা তাদের শরীর এবং ক্ষমতার উপর আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে, যা তাদের জীবনে সফল হতে সাহায্য করে। সঠিক ভারসাম্য এবং নির্দেশনা নিয়ে বেড়ে ওঠার সাথে সাথে তারা ওষুধ, রোগ, মানসিক ও সামাজিক সমস্যার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তাই যে শিশুটির কোন বিধিনিষেধ ছিল না, সে অনেক কিছুর দাস হয়ে বেড়ে ওঠে, অন্যদিকে যে শিশুটির বিধিনিষেধ ছিল সে সমস্ত বিধিনিষেধ থেকে স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠে।

পরিশেষে, প্রকৃত দাস হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল কিছুর দাসত্ব করে, যেমন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সমাজ, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি, এবং এর ফলে মানসিক, শারীরিক এবং সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে প্রকৃত স্বাধীন ব্যক্তি হলো সেই ব্যক্তি যে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছে আত্মসমর্পণ করে, যার ফলে মানসিক ও শারীরিক শান্তি অর্জন করে।

শিক্ষার গুরুত্ব

বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় দান করার পর, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কিছু যুদ্ধবন্দীকে নিয়ে মদিনায় ফিরে আসেন। এই বন্দীদের মধ্যে কিছুর মুক্তিপণের টাকা ছিল না, তাই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের কিছুকে মদীনার শিশুদের লেখা শেখানোর মাধ্যমে তাদের মুক্তিপণ থেকে অর্থ উপার্জন করতে বলেছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৪৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই বন্দীদের মুক্তিপণ থেকে বিভিন্ন উপায়ে কাজ করিয়ে নিতে পারতেন, যেমন শারীরিক শ্রম, কিন্তু তিনি তাদের আরও গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে ব্যবহার করতে বেছে নিয়েছিলেন। এটি শিক্ষা এবং জ্ঞানের গুরুত্বকে নির্দেশ করে।

মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আত্মসমর্পণ থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য একটি বিরাট বিক্ষেপ হলো অজ্ঞতা। যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে এটিই প্রতিটি পাপের উৎস কারণ যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে পাপের পরিণতি জানে সে কখনই পাপ করবে না। এটি প্রকৃত উপকারী জ্ঞানকে বোঝায় যা এমন জ্ঞান যা অনুসারে কাজ করা হয়। বাস্তবে, যে জ্ঞান অনুসারে কাজ করা হয় না তা উপকারী জ্ঞান নয়। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে তার উদাহরণ পবিত্র কুরআনে একটি গাধার মতো বর্ণনা করা হয়েছে যা জ্ঞানের বই বহন করে যা তার কোন উপকার করে না। সূরা আল জুমু'আ, আয়াত ৫:

"...এবং তারপর এটা গ্রহণ করিনি (জ্ঞান অনুসারে কাজ না করা) হল সেই গাধার মতো যে [বইয়ের] বই বহন করে..."

যে ব্যক্তি তার জ্ঞানের উপর কাজ করে সে খুব কমই ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে এবং পাপ করে। আসলে, যখন এটি ঘটে তখন এটি কেবল অজ্ঞতার কারণে ঘটে যেখানে একজন ব্যক্তি তার জ্ঞানের উপর কাজ করতে ভুলে যায় যার ফলে সে পাপ করে।

জামে আত তিরমিযী, ২৩২২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার অজ্ঞতার ভয়াবহতা তুলে ধরেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, মহান আল্লাহর স্মরণ, এই স্মরণের সাথে সম্পর্কিত যা কিছু, পণ্ডিত এবং জ্ঞানের ছাত্র ছাড়া বস্তুগত জগতের সবকিছুই অভিশপ্ত। এর অর্থ হল, বস্তুগত জগতের সমস্ত আশীর্বাদ অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অভিশপ্ত হয়ে উঠবে কারণ তারা এর অপব্যবহার করে পাপ করবে।

প্রকৃতপক্ষে, অজ্ঞতাকে একজন ব্যক্তির সবচেয়ে খারাপ শত্রু হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে কারণ এটি তাকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে এবং উপকার লাভ করতে বাধা দেয়, যা কেবল জ্ঞানের উপর কাজ করার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের সম্পর্কে অবগত না হয়েই পাপ করে। যদি তারা না জানে যে কোনটি পাপ বলে বিবেচিত হয়, তাহলে কীভাবে পাপ এড়ানো যাবে? অজ্ঞতা একজনকে তাদের বাধ্যতামূলক কর্তব্যগুলিতে অবহেলা করতে বাধ্য করে। যদি তারা তাদের কর্তব্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তবে কীভাবে তাদের কর্তব্য পালন করতে পারে?

অতএব, সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য হলো তাদের সকল ফরজ কর্তব্য পালন এবং পাপ থেকে বিরত থাকার জন্য পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা। সুনানে ইবনে মাজাহ, ২২৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিভাবে জিতবেন

মক্কার অমুসলিমরা যখন বদরের যুদ্ধে তাদের বিশাল ক্ষতি এবং তাদের কতজন নেতা নিহত হয়েছে এই খবর পেয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। আবু লাহাব যুদ্ধ থেকে নিজেকে মুক্ত করে তার জায়গায় একজনকে পাঠান এবং তাই গণহত্যা থেকে রক্ষা পান। পরাজিত অমুসলিম সেনাবাহিনী মক্কায় ফিরে আসার পর, আবু লাহাব যুদ্ধের সময় ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। লোকটি বর্ণনা করেন যে তিনি কীভাবে ঘোড়ায় চড়ে অদ্ভুত লোকদের তাদের সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করতে দেখেছিলেন। আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)-এর দাস আবু রাফাই তখন একজন মুসলিম ছিলেন কিন্তু তার ঈমান গোপন রেখেছিলেন। তিনি এই কথোপকথন শুনে চিৎকার করে বলেন যে এরা ফেরেশতা। এরপর আবু লাহাব আবু রাফাইকে আঘাত করে মারধর করেন। আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)-এর স্ত্রী উম্মে ফদল, যিনি নিজেও একজন মুসলিম ছিলেন, তিনি তাঁবুর খুঁটি দিয়ে আবু লাহাবের মাথায় আঘাত করেন। এরপর আবু লাহাব আহত অবস্থায় সমাবেশ থেকে বেরিয়ে যান। কয়েকদিন পর তিনি এক ভয়াবহ রোগে মারা যান যেখানে তার শরীর ঘায়ে ঢাকা পড়ে যায়। তার শরীরে ঘা হয়ে যাওয়ার ভয়ে কেউ কয়েকদিন ধরে তার মৃতদেহের কাছে যায়নি। তার বাবার মৃতদেহ পরিত্যাগ করার জন্য তার ছেলেদের সমালোচনার পর, তারা তার মৃতদেহকে কবরস্থানে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু লোক নিয়োগ করে এবং দূর থেকে তার উপর পাথর ছুঁড়ে মারে যতক্ষণ না তাকে দাফন করা হয়। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ২২৭ এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী রচিত "দ্য নোবেল লাইফ অফ দ্য প্রফেট (সাঃ)", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৩২-১০৩৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

বদরের যুদ্ধের দুই বন্দী, নাদর বিন হারিস এবং উকবা ইবনে আবু মুআইত, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নির্দেশে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল। কারণ তারা মক্কায় থাকাকালীন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের উপর মারাত্মক ক্ষতি করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন এবং মক্কার অভ্যন্তরে

দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিস্তারকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। একসময় , মদিনায় হিজরতের আগে, আবু বকর (রাঃ) হস্তক্ষেপ না করলে উকবা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে শ্বাসরোধ করে হত্যা করতেন। তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা ইসলামের শত্রুদের জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ এবং স্পষ্ট বার্তা ছিল যে, মুসলমানরা আত্মরক্ষা করতে ভয় পায় না। এই প্রতিরোধ অনেক সম্ভাব্য লড়াই এবং আক্রমণকে প্রতিরোধ করেছিল যার ফলে অনেক প্রাণহানি হত। অবশেষে, তাদের অতীত এবং বর্তমান আচরণ থেকে স্পষ্ট ছিল যে যদি তাদের মুক্তিপণ দেওয়া হত তবে তারা ব্যাপকভাবে দুর্নীতি এবং অন্যায় ছড়িয়ে দিতে থাকত। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার" বইয়ের ২২৯ পৃষ্ঠায় এটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য একটি সহজ কিন্তু গভীর শিক্ষা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা এই পৃথিবীতে বা পরকালে পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে কখনও সফল হবে না। যুগের সূচনা থেকে এই যুগ পর্যন্ত এবং শেষ যুগ পর্যন্ত, কেউ কখনও মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে প্রকৃত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি এবং কখনও পাবেও না। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতএব, যখন একজন মুসলিম এমন পরিস্থিতিতে পড়ে যেখানে তারা ইতিবাচক এবং সফল ফলাফল অর্জন করতে চায়, তখন তাদের কখনই মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করা উচিত নয়, তা যতই প্রলোভনসঙ্কুল বা সহজ মনে হোক না কেন। এমনকি যদি তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনরা তাকে তা করার পরামর্শ দেয় কারণ সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই, যদি এর অর্থ স্রষ্টার অবাধ্যতা হয়। এবং প্রকৃতপক্ষে তারা কখনও তাদের মহান আল্লাহ এবং তাঁর শাস্তি থেকে এই পৃথিবীতে বা পরকালে রক্ষা করতে পারবে না। ঠিক যেমনভাবে মহান আল্লাহ তাঁর আনুগত্যকারীদের সাফল্য দান করেন, তিনি তাঁর অবাধ্যদের কাছ থেকে একটি সফল ফলাফল সরিয়ে দেন, এমনকি এই অপসারণ প্রত্যক্ষ করতে সময় লাগে। একজন মুসলিমের বোকা বানানো উচিত নয় কারণ এটি শীঘ্রই বা পরে ঘটবে। পবিত্র কুরআন অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছে যে একটি মন্দ পরিকল্পনা বা কর্ম কেবল সেই ব্যক্তিকেই ঘিরে রাখে যিনি শাস্তি বিলম্বিত হলেও। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ৪৩:

"...কিন্তু সেই মন্দ চক্রান্ত তার নিজস্ব লোকদের ছাড়া আর কাউকে ঘিরে রাখে না..."

অতএব, পরিস্থিতি এবং পছন্দ যতই কঠিন হোক না কেন, মুসলিমদের সর্বদা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্য বেছে নেওয়া উচিত কারণ এটিই উভয় জগতে প্রকৃত সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে, যদিও এই সাফল্য তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট নাও হতে পারে।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা

বদরের যুদ্ধের পর, উমাইর বিন ওহাব মক্কার মসজিদুল হারামে সাফওয়ান বিন উমাইয়ার সাথে বসে ছিলেন। বদরের যুদ্ধের জন্য উমাইর বিশেষভাবে রেগে গিয়েছিলেন কারণ তার ছেলেকে মুসলমানরা বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছিল। উমাইর সাফওয়ানকে বলেছিলেন যে, যদি মক্কায় তার পরিবার না থাকত, যাদের দেখাশোনা করার কেউ ছিল না, তাহলে তিনি মহানবী (সাঃ) কে হত্যা করার জন্য আত্মঘাতী অভিযানে মদীনায় যেতেন। সাফওয়ান তাকে তার দুষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উৎসাহিত করেছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি তার পরিবারের সবাইকে হত্যা করবেন। উমাইর তার তরবারি বিষে ডুবিয়ে মদিনার দিকে রওনা হন। মদিনায় পৌঁছানোর পর, উমাইর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তাকে দেখতে পান এবং তার দুষ্ট ও খারাপ স্বভাবের সাথে খুব পরিচিত হন। তিনি উমাইরকে শারীরিকভাবে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে নিয়ে যান যাতে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কোন ক্ষতি না হয়। যখন তারা মহানবী (সাঃ) এর কাছে পৌঁছালেন, তখন তিনি উমর (রাঃ) কে বললেন, উমাইরকে যেতে দিন এবং তার ভ্রমণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। উমাইর এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন এবং মন্তব্য করলেন যে তিনি কেবল যুদ্ধবন্দীদের সম্মানের সাথে আচরণ করা হচ্ছে তা নিশ্চিত করতে এসেছিলেন। মহানবী (সাঃ) এরপর তাকে তার পরিকল্পনা এবং মক্কায় সাফওয়ানের সাথে তার গোপন কথোপকথনের কথা জানান। যেহেতু অন্য কেউ তাদের কথোপকথন শুনছিল না, তাই উমাইর নবী (সাঃ) এর সত্যতা বুঝতে পেরে ইসলাম গ্রহণ করলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন। তারপর তিনি ইসলাম প্রচার এবং শিরকের বিরোধিতা করার জন্য মক্কায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন, ঠিক যেমন তিনি ইসলাম গ্রহণের আগে বিরোধিতা করেছিলেন। যখন তাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি মক্কায় ফিরে আসেন এবং প্রকাশ্যে মানুষকে ইসলাম গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন এবং তাঁর কারণে অনেকেই তা গ্রহণ করেছিলেন। ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২৭-৩২৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমাইর (রাঃ) একগুঁয়েমি করার পরিবর্তে ইসলাম গ্রহণের দ্বিতীয় সুযোগটি গ্রহণ করেন। তারপর তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইসলাম প্রচারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। এই ঘটনাটি ইঙ্গিত দেয় যে সময় শেষ হওয়ার আগে দ্বিতীয় সুযোগটি গ্রহণ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তিকে প্রতিটি মুহূর্তেই তার উদ্দেশ্য এবং কর্ম পরিবর্তন করার জন্য দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হয় যাতে সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিক আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। কাউকে এই বিশ্বাসে বোকা বানানো উচিত নয় যে এই দ্বিতীয় সুযোগগুলি চিরকাল স্থায়ী হবে, কারণ তাদের মৃত্যুর সময় অজানা। যদিও মানুষকে এই পৃথিবীতে দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হয়, তবুও তাদের পরকালে দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হবে না। অধ্যায় 30 আর রুম, আয়াত 57:

"অতএব, সেদিন তাদের ওজর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না যারা অন্যায় করেছে এবং তাদেরকে [আল্লাহকে] সন্তুষ্ট করতে বলা হবে না।"

অতএব, দ্বিতীয় সুযোগটি কাজে লাগাতে বিলম্ব করা উচিত নয় কারণ এটি তাদের কেবল ভুল পথেই চলতে বাধ্য করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করা। এটি তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে বাধা দেবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল স্থানে ফেলবে। অতএব, এই মনোভাব উভয় জগতেই চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে, এমনকি যদি কেউ বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে এবং কিছু পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে। যদি তারা এই অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তারা খালি হাতে বিচারের দিনে প্রবেশ করবে এবং আর কোন দ্বিতীয় সুযোগ পাবে না। সূরা ৮৯ আল ফজর, আয়াত ২৩-২৪:

"এবং সেদিন জাহান্নামকে সামনে আনা হবে - সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু স্মরণ তার জন্য কেমন হবে? সে বলবে, "হায়, আমি যদি আমার জীবনের জন্য [কিছু কল্যাণ] আগে পাঠাতাম।"

দ্বিমুখী আচরণ

অমুসলিম নেতা আবু সুফিয়ান বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি ২০০ জন লোক নিয়ে মদিনার উপকণ্ঠে যান। তিনি ইহুদি গোত্র বনু আন নাদিরের প্রধান সাল্লাম ইবনে মিশকামের সাথে রাত কাটান। সাল্লাম আবু সুফিয়ানকে আতিথ্য দেন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের সম্পর্কে তাঁর কাছে থাকা সমস্ত তথ্য জানান। সকালে, আবু সুফিয়ান এবং তার লোকেরা মদিনার উপকণ্ঠে আক্রমণ করে এবং মদিনার একজন সাহাবীকে হত্যা করতে সক্ষম হন। যখন এই খবর মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে পৌঁছায়, তখন তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে আবু সুফিয়ানের পিছনে ধাওয়া করেন কিন্তু তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। সিরাত ইবনে হিশামের ১৩৮ পৃষ্ঠায় এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ইহুদি গোত্রের প্রধান সাল্লাম, আবু সুফিয়ানকে আতিথ্য দিয়ে এবং মুসলমানদের সম্পর্কে তার সংগৃহীত তথ্য প্রকাশ করে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তার শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করেছিলেন। মদীনা এবং তার আশেপাশের অনেক অমুসলিম গোত্র ইসলামের প্রতি শত্রুতা বশত এই আচরণ করেছিল।

মুনাফিকির লক্ষণ হলো দ্বিমুখী হওয়া। এটা তখনই হয় যখন একজন ব্যক্তি তার আচরণ পরিবর্তন করে কাদের সাথে মেলামেশা করার জন্য, তাদেরকে খুশি করার জন্য, যাতে সে সম্মান এবং খ্যাতির মতো পার্থিব জিনিসপত্র অর্জন করতে পারে। সুনানে আবু দাউদের ৪৮৭৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কেউ দ্বিমুখী মানসিকতা গ্রহণ করে, কিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের দুটি জিহ্বা থাকবে। একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো তাদের কথাবার্তা এবং কাজে সৎ এবং অবিচল থাকা এবং তাদের সকল কাজে কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে,

তাকে আল্লাহ তাআলা দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন যা ধারাবাহিকভাবে সৎ থাকার ফলে হতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি মুনাফিকদের পথ অনুসরণ করবে, সে মহান আল্লাহর রহমত এবং সুরক্ষা হারাবে, যার ফলে তারা অন্ধভাবে বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়াবে। মহান আল্লাহ তাআলা নিশ্চিত করবেন যে, আজ হোক কাল হোক, তাদের মন্দ উদ্দেশ্য তাদের কাছে প্রকাশ পাবে যাদের তারা খুশি করতে চায়, যাতে তারা পার্থিব আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের সমাজের কাছে ঘৃণিত হয়। এই পার্থিব শাস্তি পরকালে তাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তির তুলনায় খুবই সামান্য, যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

ন্যায়পরায়ণ থাকা

বদরের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা জয়নব (রাঃ) অনেক কষ্টের মুখোমুখি হয়ে মদিনায় তার বাবার কাছে হিজরত করেন। সেই সময় তার স্বামী আবুল আস তখনও একজন অমুসলিম ছিলেন এবং তাকে হিজরতের অনুমতি দেন, কারণ বদরের যুদ্ধের সময় যুদ্ধবন্দী হিসেবে বন্দী হওয়ার সময় তার মুক্তির শর্তগুলির মধ্যে এটি একটি ছিল। হিজরতের পর, তিনি সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বাণিজ্য ভ্রমণে রওনা হন। ফেরার পথে তাকে অতর্কিত আক্রমণ করা হয় এবং তার সমস্ত সম্পদ লুট করা হয়, যার বেশিরভাগই ছিল মক্কার অমুসলিমদের, যারা তাকে তাদের পক্ষ থেকে ব্যবসা করতে পাঠিয়েছিল। তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং মদিনায় পৌঁছান যেখানে তিনি তার স্ত্রী জয়নব (রাঃ) এর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তিনি তাকে সুরক্ষা প্রদান করেন এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ)ও একইভাবে আশ্রয় নেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণকারীদের পণ্য ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কারণ তাদের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি ছিল এবং তারা একমত হয়েছিল। আবুল আস তার ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন এবং তার উপর অর্পিত সমস্ত সম্পদ ফেরত দেন। এটি শেষ করার পর তিনি তার ইসলাম ঘোষণা করেন এবং মন্তব্য করেন যে তিনি মক্কার অমুসলিমদের পণ্য ফেরত দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন এবং তার ইসলাম ঘোষণা করেন কারণ তিনি চাননি যে তারা বিশ্বাস করুক যে তিনি কেবল তাদের সম্পদ রাখার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তারপর তিনি মদিনায় হিজরত করেন এবং তার স্ত্রী, আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তার সাথে বসবাস করেন। ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৫০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আবুল আস, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাঁর উপর অর্পিত সম্পদ রাখতে পারতেন এবং মদিনায় থাকতে পারতেন, কিন্তু তিনি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং সম্মতি অনুসারে তাঁর ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পন্ন করেছিলেন।

সুনানে ইবনে মাজাহের ২১৪৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, কেয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে অনৈতিক লোক হিসেবে উত্থিত করা হবে, তবে তারা ব্যতীত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, সৎকর্ম করে এবং সত্য কথা বলে।

এই হাদিসটি ব্যবসায়িক লেনদেনে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য প্রযোজ্য। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে আল্লাহকে ভয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, অন্যদের সাথে সেভাবেই আচরণ করা উচিত যেভাবে সে মানুষের কাছ থেকে আচরণ পেতে চায়।

ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের কথাবার্তায় সৎ থাকা এবং লেনদেনের সমস্ত বিবরণ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে প্রকাশ করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদিস, সংখ্যা ২০৭৯, সতর্ক করে যে, যখন মুসলিমরা আর্থিক লেনদেনে জিনিসপত্র, যেমন তাদের পণ্যের ত্রুটি, গোপন করে, তখন এর ফলে বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

সৎকর্ম করার মধ্যে রয়েছে অন্যদের সাথে প্রতারণা করা থেকে বিরত থাকা, যাতে তারা অতিরিক্ত মূল্যে জিনিসপত্র কিনে প্রতারণা না করে। একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের সাথে সেই আচরণ করা যা সে অর্থপূর্ণভাবে চায়, সততা এবং সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে। একজন মুসলিম যেমন আর্থিক বিষয়ে দুর্ব্যবহার পছন্দ করেন না, তেমনি তাদেরও অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করা উচিত নয়।

সৎকর্ম করার মধ্যে রয়েছে ইসলাম এবং দেশের আইনে আলোচিত অবৈধ অনুশীলন এড়িয়ে চলা। যদি কেউ তাদের দেশের ব্যবসায়িক আইন নিয়ে সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে তাদের সেখানে ব্যবসা করা উচিত নয়।

অধিকন্তু, সৎকর্ম করার মধ্যে রয়েছে নিজের ব্যবসায়িক সাফল্যকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তাদের ব্যবসা এবং সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য আরাম এবং শান্তির উৎস হয়ে উঠবে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

কিন্তু যারা তাদের ব্যবসায়িক সাফল্যের অপব্যবহার করে তারা দেখতে পাবে যে এটি তাদের চাপ এবং দুর্দশার উৎস হয়ে ওঠে, কারণ তারা মহান আল্লাহকে ভুলে গেছে, যিনি তাদের সাফল্য দিয়েছেন। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন] এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।"

যারা ব্যবসা পরিচালনা করেন তাদের সর্বদা মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা উচিত কারণ এটি অনৈতিকতার দিকে পরিচালিত করে এবং অমরত্ব জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে এবং তার উপর কাজ করতে থাকবে যতক্ষণ না তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা একজন মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন। জামে আত তিরমিযী, ১৯৭১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বন্ধন ভাঙা

মদিনায় বসবাসকারী একজন ঈর্ষান্বিত বয়স্ক অমুসলিম শাস বিন কায়স একবার মদিনার সাহাবীদের (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) এক সমাবেশের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মদিনার সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, মূলত দুটি প্রধান গোত্র, আউস এবং খাজরাজ থেকে এসেছিলেন। এই দুটি গোত্র প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একে অপরের সাথে যুদ্ধ করে আসছিল এবং ইসলাম গ্রহণের পরই তারা একত্রিত হয়েছিল। যখন শাস মদিনার সাহাবীদের (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) একে অপরের প্রতি যে মহান ভালোবাসা এবং স্নেহ লক্ষ্য করেছিলেন, যদিও কয়েক বছর আগে তারা শত্রু ছিল, তখন ইসলামের প্রতি তার ঘৃণা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। তিনি একজন তরুণ কবিকে আউস এবং খাজরাজ দুটি গোত্রের মধ্যে সংঘটিত একটি পুরানো যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু কথা বলতে উৎসাহিত করেছিলেন, যেখানে তাদের অনেক বিশিষ্ট নেতা নিহত হয়েছিল। এই কবিতাটি প্রাচীন পুরানো নেতিবাচক অনুভূতিগুলিকে উস্কে দিয়েছিল যা ইসলাম দ্বারা সমাহিত করা হয়েছিল যার ফলে কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, একে অপরের সাথে তর্ক করতে বাধ্য হয়েছিল। যেকোনো যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আগে, মহানবী (সা.)-কে কী ঘটেছিল তা জানানো হয়েছিল এবং তিনি তাদের কাছে গিয়ে তাদের নতুন যুগের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। উপজাতি আনুগত্যের নামে অজ্ঞতাপূর্ণ অনুশীলন এবং অর্থহীন সহিংসতা থেকে দূরে একটি নতুন যুগ। এই নেতিবাচক অনুভূতিগুলি এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্যগুলির দ্বারা দ্রুত নিভে গিয়েছিল যতক্ষণ না সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, একে অপরের প্রতি তাদের মনোভাব এবং আচরণ সংশোধন করে একে অপরের প্রতি তাদের ভ্রাতৃপ্রেমে ফিরে আসেন। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা 236-237-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা আলে ইমরানের ১০০ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আহলে কিতাবদের কোন দলের কথা মেনে চলো, তাহলে তারা তোমাদের ঈমানের পর কাফের করে ফেলবে।"

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৩:১০০, পৃষ্ঠা ৩৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলা এড়িয়ে চলা কারণ এটি মানুষের হৃদয়ে নেতিবাচক অনুভূতি তৈরি করে।

সুনানে আবু দাউদের ৪৮৬০ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলার বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করেছেন, কারণ এটি মানুষের হৃদয়ে তাদের প্রতি বিদ্বেষের অনুভূতি তৈরি করে।

প্রায়শই দেখা যায় যে, পরিবারগুলো, বিশেষ করে এশীয় সম্প্রদায়ের পরিবারগুলো, সময়ের সাথে সাথে ভেঙে যায়। এটি পরিবারের সদস্যদের, যেমন বাবা-মায়ের, সবচেয়ে বড় অভিযোগ। তারা ভাবছেন যে, তাদের সন্তানরা কেন আলাদা হয়ে গেছে, যদিও তারা একসময় দৃঢ়ভাবে একসাথে ছিল।

আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সম্পর্ক ভাঙার অন্যতম প্রধান কারণ হল কেউ একজন ব্যক্তির আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলেছে। এটি প্রায়শই পরিবারের কোনও সদস্য করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মা তার অন্য সন্তানের সাথে তার ছেলে সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলবেন। এর ফলে দুই আত্মীয়ের মধ্যে শত্রুতা তৈরি হয় এবং সময়ের সাথে সাথে এটি দুজনের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে। যারা একসময় একই ব্যক্তির মতো ছিল তারা একে অপরের কাছে অপরিচিত হয়ে যায়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষ ফেরেশতা নয়। খুব কম সংখ্যক ব্যতীত, যখন একজন ব্যক্তির কাছে অন্য ব্যক্তির সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলা হয়, তখন তারা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়, এমনকি যদি তারা এটি ঘটতে না চায়। এই শত্রুতা তখনও ঘটে, এমনকি যদি প্রথম ব্যক্তিটি কারো আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলে, তার আত্মীয়দের মধ্যে ফাটল তৈরি করার ইচ্ছা না থাকে। কেউ কেউ প্রায়শই অভ্যাসের বাইরে এইভাবে কাজ করে এবং সম্পর্ক নষ্ট করার চেষ্টা করে না। উদাহরণস্বরূপ, বাবা-মা প্রায়শই এই অভ্যাসটি গ্রহণ করে এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে তারা তাদের সন্তানদের সম্পর্ক ভাঙতে বা ভেঙে যেতে চায় না।

এই মনোভাব মানুষের মানসিকতার উপর এতটাই মারাত্মক প্রভাব ফেলে যে, এটি সেই আত্মীয়দেরও প্রভাবিত করে যারা খুব কমই একে অপরের সাথে দেখা করে বা কথা বলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি তার আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলবে, যদিও তার আত্মীয় হয়তো তাদের দেশে বাস করে না। এই আচরণ তাদের হৃদয়ে শত্রুতা তৈরি করে এবং সময়ের সাথে সাথে তারা দেখতে পাবে যে তারা তাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়কে অপছন্দ করে, যদিও তারা তাদের খুব কমই চেনে।

এই সমস্যাটি প্রায়শই ঘটে যখন দুজন ব্যক্তি অন্যদের সামনে অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলে। উদাহরণস্বরূপ, বাবা-মা তাদের সন্তানদের সামনে তাদের আত্মীয়দের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলতে পারেন। যদিও তারা তাদের সন্তানদের সরাসরি কিছু বলছেন না, তবুও এটি তাদের হৃদয়কে প্রভাবিত করে। কেউ যদি সত্যিই এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে অন্যদের প্রতি তাদের বেশিরভাগ খারাপ অনুভূতি সেই ব্যক্তি সরাসরি যা করেছে বা বলেছে তার কারণে নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, এটি ঘটেছিল তৃতীয় পক্ষের কারণে, যারা তাদের কাছে সেই ব্যক্তির সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু উল্লেখ করেছিল।

যখন কেউ অন্য কাউকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করার চেষ্টা করছে, তখন অন্য ব্যক্তির নাম নেতিবাচকভাবে উল্লেখ করা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য। যদি কেউ অন্য কাউকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছে, তাহলে তাদের উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে নেতিবাচক বিষয় উল্লেখ করা। এই সুন্দর মানসিকতার একটি উদাহরণ সহিহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে, সংখ্যা ৬৯৭৯। ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে নেতিবাচক বিষয় উল্লেখ করা কাউকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

পরিশেষে, মুসলিমদের তাদের আত্মীয়স্বজন বা অন্যদের সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রকাশ্যে নেতিবাচক কথা বলার আগে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। অন্যথায়, তারা সময়ের সাথে সাথে তাদের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের বিচ্ছিন্ন এবং মানসিকভাবে একে অপরের থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে।

যে ব্যক্তি অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা শোনে, তার উচিত বক্তাকে গীবত করা থেকে বিরত থাকতে এবং তাদের কর্মের পরিণতি ব্যাখ্যা করতে সতর্ক করা।

তাদের অবশ্যই একজন ব্যক্তির সম্পর্কে বলা নেতিবাচক কথার উপর মনোযোগ দেওয়া এড়িয়ে চলতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে একটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য একজন ব্যক্তির সম্পূর্ণ চরিত্রকে সংজ্ঞায়িত করে না। তাদের অবশ্যই যার সম্পর্কে নেতিবাচক কথা শুনেছে তার প্রতি ভালো আচরণ প্রদর্শন করতে হবে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার পূরণ করতে হবে। সহজ কথায়, একজনের উচিত অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যাতে সে অন্যদের দ্বারা আচরণ পেতে চায়। এইভাবে আচরণ করলে অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলার ফলে তার হৃদয়ে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে তা কমবে।

উপরন্তু, আলোচ্য মূল ঘটনাটি মুসলমানদেরকে অনৈক্যের বিষয়ে সতর্ক করে কারণ এটি প্রায়শই তর্ক এবং লড়াইয়ের দিকে পরিচালিত করে। বরং মুসলমানদের অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে তারা যখন আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলে, তখন এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা সম্ভব। যখন কেউ মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা ইচ্ছাকৃতভাবে নেতৃত্ব এবং সম্পদের মতো পার্থিব জিনিস অর্জনের জন্য ঐশ্বরিক শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করবে, যার ফলে অনৈক্যের সৃষ্টি হবে। অথবা যখন কেউ ইসলামী শিক্ষা শিখতে এবং তার উপর আমল করতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে, যা তাদের অন্যদের অধিকার পূরণে বাধা দেবে। এই আচরণও অনৈক্যের দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, অনৈক্য কেবল তখনই এড়ানো সম্ভব যদি কেউ আন্তরিকভাবে ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করে আল্লাহকে মেনে চলে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আল্লাহ এবং মানুষের অধিকার পূরণ করবে, যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের সৃষ্টি হবে।

আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ (সাঃ) কে বিয়ে করেন

একটি বিজ্ঞ প্রস্তাব

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের পর দ্বিতীয় বছরে, আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কন্যা ফাতিমা (রাঃ) এর সাথে বিবাহের প্রস্তাব করেন। এতে সম্মতি জানানো হয় এবং বিবাহ সম্পন্ন হয়। তার যৌতুক ছিল চারটি রূপার মুদ্রার মূল্যের একটি শিকলযুক্ত বর্ম। ইমাম ইবনে কাথিরের "নবী (সাঃ)-এর জীবনী", খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৬৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, যৌতুক ছিল খুবই নগণ্য। এটি বিবাহকে সহজ এবং ব্যয়বহুল রাখার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যা আজকাল অনেক মুসলিম সহজেই উপেক্ষা করে। একজনকে অবশ্যই আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করতে হবে একটি সাধারণ বিবাহের আয়োজন করে এবং অপচয় এবং অপচয় এড়িয়ে চলতে হবে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই ব্যয়বহুল এবং অযৌক্তিক বিবাহ আয়োজনের সমাজের রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবর্তে আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করতে হবে, কারণ এর ফলে বিবাহ শুরু হবে আল্লাহর রহমত এবং আশীর্বাদে।

এছাড়াও, মুসলিমদের অবশ্যই সাহাবীদের (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, ইসলামের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে সঠিক জীবনসঙ্গী নির্বাচন করার মাধ্যমে।

সহীহ বুখারীতে ৫০৯০ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তিকে চারটি কারণে বিবাহ করা হয়: তার সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য অথবা তার ধার্মিকতার জন্য। তিনি এই সতর্কবাণী দিয়ে শেষ করেছেন যে, একজন ব্যক্তির উচিত ধার্মিকতার জন্য বিবাহ করা, অন্যথায় সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এই হাদিসে উল্লেখিত প্রথম তিনটি জিনিস খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং অসম্পূর্ণ। এগুলো হয়তো কাউকে ক্ষণস্থায়ী সুখ দিতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই জিনিসগুলো তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে কারণ এগুলো বস্তুগত জগতের সাথে যুক্ত, চূড়ান্ত এবং স্থায়ী সাফল্য প্রদানকারী জিনিসের সাথে নয়, অর্থাৎ বিশ্বাসের সাথে। সম্পদ সুখ বয়ে আনে না তা বোঝার জন্য কেবল ধনী এবং বিখ্যাতদের পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, ধনীরা পৃথিবীর সবচেয়ে অসন্তুষ্ট এবং অসুখী মানুষ। বংশের জন্য কাউকে বিয়ে করা বোকামি কারণ এটি নিশ্চিত করে না যে ব্যক্তিটি একজন ভালো জীবনসঙ্গী হবে। প্রকৃতপক্ষে, যদি বিবাহ সফল না হয়, তবে এটি বিয়ের আগে দুটি পরিবারের মধ্যে যে পারিবারিক বন্ধন ছিল তা ধ্বংস করে দেয়। শুধুমাত্র সৌন্দর্যের জন্য, অর্থাৎ ভালোবাসার জন্য বিয়ে করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কারণ এটি একটি অস্থির আবেগ যা সময়ের সাথে সাথে এবং মেজাজের সাথে পরিবর্তিত হয়। প্রেমে ডুবে থাকা কত দম্পতি একে অপরকে ঘৃণা করতে শুরু করে?

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে একজন দরিদ্র জীবনসঙ্গী খুঁজে বের করা উচিত, যেমনটি এমন কাউকে বিয়ে করা গুরুত্বপূর্ণ যে আর্থিকভাবে পরিবারকে সাহায্য করতে পারে। এর অর্থ এইও নয় যে একজনের তার জীবনসঙ্গীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়, কারণ এটি একটি সুস্থ বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তবে এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে এই জিনিসগুলি কোনও ব্যক্তির বিবাহের প্রধান বা চূড়ান্ত কারণ হওয়া উচিত নয়।

একজন মুসলিমের একজন স্ত্রীর মধ্যে যে প্রধান এবং চূড়ান্ত গুণটি সন্ধান করা উচিত তা হল ধার্মিকতা। এটি তখনই ঘটে যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। সহজ কথায়, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভয় করে, সে সুখ এবং অসুবিধা উভয় সময়েই তার স্ত্রীর সাথে ভাল আচরণ করবে। অন্যদিকে, যারা ধর্মহীন তারা যখনই মন খারাপ করবে তখনই তার স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মুসলমানদের মধ্যে পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ার এটি একটি প্রধান কারণ। এবং এমনকি যখন তারা তাদের স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তখনও তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে তাদের অধিকার পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, যা দূর করতে ধার্মিকতা সাহায্য করে। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ২৮:

"... আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল তারাই ভয় করে, যারা জ্ঞানী..."

পরিশেষে, ধার্মিক ব্যক্তি সর্বদা অন্যদের অধিকার পূরণের ব্যাপারে বেশি চিন্তিত থাকে, যেমন তাদের স্ত্রী, তার চেয়ে তারা মানুষের অধিকার পূরণের ব্যাপারে বেশি চিন্তিত। কারণ তারা বোঝে যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে তারা মানুষের অধিকার পূরণ করেছে কিনা। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন না যে মানুষ তাদের অধিকার পূরণ করেছে কিনা, কারণ এটি তখনই মোকাবেলা করা হবে যখন আল্লাহ অন্যদের প্রশ্ন করবেন, যখন তিনি তাদের প্রশ্ন করবেন না। অন্যদিকে, দুষ্ট মুসলিম কেবল তাদের অধিকার সম্পর্কেই চিন্তিত থাকবে, সেই অধিকারগুলি যা তারা সমাজ, সংস্কৃতি, ফ্যাশন এবং তাদের কল্পনা থেকে নিয়েছে, ইসলাম থেকে নয়। ফলস্বরূপ, তারা কখনই তাদের স্ত্রীর প্রতি সত্যিকার অর্থে সন্তুষ্ট হবে না, এমনকি যদি তাদের স্ত্রী ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার পূরণ করে। এই কারণেই ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং বিবাহবিচ্ছেদ এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

পরিশেষে, যদি কোন মুসলিম বিয়ে করতে চায়, তাহলে তাকে প্রথমে এর সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যেমন তাদের স্ত্রীর উপর তাদের কী অধিকার, তাদের স্ত্রীর উপর তাদের কী অধিকার এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের স্ত্রীর সাথে কীভাবে সঠিকভাবে আচরণ করতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত, এই বিষয়ে অজ্ঞতা অনেক বিতর্ক এবং বিবাহবিচ্ছেদের দিকে পরিচালিত করে কারণ লোকেরা এমন কিছু দাবি করে যা তাদের স্ত্রী পূরণ করতে বাধ্য নয়। অতএব, জ্ঞান, যা ধার্মিকতার মূল, একটি সুস্থ ও সফল বিবাহের ভিত্তি।

সরল জীবনযাপন

আলী ইবনে আবু তালিব এবং তাঁর স্ত্রী ফাতিমা (রাঃ) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মতোই অত্যন্ত সরল জীবনযাপন করতেন। তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করার চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া এবং অন্যদের সাহায্য করাকে অগ্রাধিকার দিতেন। উদাহরণস্বরূপ, আলী (রাঃ) একবার বলেছিলেন যে, তাঁর ঘরে একটি ভেড়ার চামড়া ছাড়া আর কোনও আসবাবপত্র ছিল না, যার উপর তারা ঘুমাতেন।

তারা দুজনেই কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত এবং জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সংগ্রাম করত। একবার, যখন কিছু যুদ্ধবন্দীকে মহানবী (সাঃ) এর কাছে আনা হয়েছিল, তখন তারা তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য একজন দাসী দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল। কিন্তু মহানবী (সাঃ) বন্দীদের বিক্রি করে মদীনার দরিদ্রদের উপর মূল্য ব্যয় করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি নিজের পরিবারের চেয়ে অন্যদের অগ্রাধিকার দিতেন। সেই রাতেই, মহানবী (সাঃ) তাদের দুজনকেই ঘুমাতে যাওয়ার আগে পড়ার জন্য একটি আধ্যাত্মিক অনুশীলন শিখিয়েছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে এই আধ্যাত্মিক অনুশীলন একজন দাস পাওয়ার চেয়ে উত্তম। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪৭-১৪৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের উচিত নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার ঘোষণাকে সমর্থন করা, তাদের জীবনধারা এবং আচরণে কার্যত অনুসরণ করে। তাদের আচরণে তাদের অনুসরণ করাই হল একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর রহমত ও আশীর্বাদ লাভ করতে পারে এবং এটি পরকালে তাদের সাথে

একতাবদ্ধ হতে পারে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে পূর্ববর্তী জাতিগুলিও তাদের পবিত্র নবীগণকে ভালোবাসা এবং সম্মান করার দাবি করে, কিন্তু তারা পরকালে তাদের সাথে একত্রিত হবে না কারণ তারা এই পৃথিবীতে কার্যত তাদের অনুসরণ করেনি।

মূল ঘটনায় যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণের (রাঃ) আচরণের একটি দিক হল সরল জীবনযাপন।

সুনানে ইবনে মাজাহের ৪১১৮ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পরামর্শ দিয়েছেন যে, সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

ইসলাম মুসলমানদের তাদের সমস্ত সম্পদ এবং বৈধ কামনা-বাসনা ত্যাগ করতে শেখায় না বরং তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে, যেমন খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান এবং ব্যবসা, একটি সরল জীবনধারা গ্রহণ করতে শেখায়, যাতে তারা পরকালের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য অবসর সময় পায়। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এই সরল জীবনের মধ্যে রয়েছে নিজের এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য এই পৃথিবীতে প্রচেষ্টা করা, অতিরিক্ত ব্যয়, অপচয় বা অপচয় ছাড়াই। একজন ব্যক্তি যত বেশি সরল জীবনের দিকে মনোনিবেশ করেন, ততই তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহ, মহিমান্বিতকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা সহজ হয়ে ওঠে। এর ফলে উভয় জগতেই শান্তি এবং সাফল্য আসে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

এছাড়াও, একজন মুসলিমের বুঝতে হবে যে তারা যত সহজ জীবনযাপন করবে, পার্থিব বিষয়বস্তুর উপর তাদের চাপ তত কম হবে এবং এর ফলে তারা পরকালের জন্য তত বেশি প্রচেষ্টা করতে পারবে, মানসিক, শারীরিক ও আত্মার শান্তি পাবে। কিন্তু একজন ব্যক্তির জীবন যত জটিল হবে, তত বেশি তারা চাপের সম্মুখীন হবে, অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং তাদের পরকালের জন্য কম প্রচেষ্টা করবে, কারণ পার্থিব বিষয়বস্তুর প্রতি তাদের ব্যস্ততা কখনোই শেষ হবে না বলে মনে হবে। এই মনোভাব তাদের মানসিক, শারীরিক ও আত্মার শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সরলতা এই পৃথিবীতে আরামের জীবন এবং বিচারের দিনে সরাসরি হিসাব-নিকাশের দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, একটি জটিল এবং আনন্দময় জীবন কেবল চাপপূর্ণ জীবন এবং বিচারের দিনে কঠোর এবং কঠিন হিসাব-নিকাশের দিকে পরিচালিত করবে। যে ব্যক্তি যত কঠোর হিসাব-নিকাশ করবে, তাকে তত বেশি শাস্তি দেওয়া হবে। সহিহ বুখারীতে প্রাপ্ত ১০৩ নম্বর হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে।

অভিবাসনের পর ৩ য় বছর

সঠিকভাবে উপস্থাপন করা

যখনই নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনা থেকে বিদায় নিতেন, তখনই তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে মদীনার বিষয়গুলি পরিচালনা করার জন্য নিযুক্ত করতেন। উদাহরণস্বরূপ, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় হিজরতের তৃতীয় বছরে, তিনি যু-আমর নামে পরিচিত একটি অভিযানে যান এবং উসমান বিন আফফান (রাঃ)-কে মদীনার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার সময় প্রতিটি মুসলিমকে তার প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। এটি এমন একটি কর্তব্য যার বিষয়ে বিচারের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতএব, পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে বহির্বিশ্বের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন করে এটি পালন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে অমুসলিম এবং অন্যান্য মুসলিমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বুঝতে পারে। এটি তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য শিখে এবং তার উপর আমল করে। এটি নিশ্চিত করবে যে কেউ ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করবে, যেমন উদারতা, ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা, এবং এতে আলোচিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন হিংসা, লোভ এবং স্বার্থপরতা এড়িয়ে চলবে। যে ব্যক্তি সঠিক চরিত্র গ্রহণ করবে সে বহির্বিশ্বের কাছে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করবে। কিন্তু ঠিক যেমন একজন রাজার দূত রাজার ভুল উপস্থাপন করলে শাস্তির সম্মুখীন হয়, যে ব্যক্তি মহানবী

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে ভুল উপস্থাপন করে, তাকে উভয় জগতেই তাদের ব্যর্থতার জন্য দায়ী করা হবে।

প্রতিশোধ নেওয়া

মদিনায় হিজরতের পর তৃতীয় বছরে, তিনি একটি অভিযানে বের হন। এই অভিযানের সময়, মহানবী (সা.) একটি গাছের নীচে ঘুমিয়ে পড়েন। অমুসলিম সেনাবাহিনী এই সুযোগটি গ্রহণ করে গোপনে একজন সৈনিককে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে পাঠিয়ে তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে চমকে দেন এবং তরবারি উঁচিয়ে নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাকে রক্ষা করবে। নবী মুহাম্মদ (সা.)-এ আত্মবিশ্বাসের সাথে উত্তর দেন যে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, তিনি তা করবেন। ফেরেশতা জিবরাঈল (সা.)-এর পরে লোকটিকে মাটিতে ফেলে দেন। নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর তরবারি তুলে নেন এবং সৈনিকটি যা জিজ্ঞাসা করেছিল, সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। সৈনিকটি নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে তাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং তিনি তাকে শাস্তি না দিয়েই তা করেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১-২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ৬৮৫৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি বরং ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং উপেক্ষা করেছেন।

যখন অন্য কোন বিকল্প অবশিষ্ট থাকে না, তখন মুসলমানদেরকে আনুপাতিক এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে আত্মরক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের কখনই সীমা লঙঘন করা উচিত নয় কারণ এটি একটি পাপ। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৯০:

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

যেহেতু চিহ্ন অতিক্রম করা এড়ানো কঠিন, তাই একজন মুসলিমের ধৈর্য ধারণ করা, অন্যদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা উচিত কারণ এটি কেবল নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যই নয়, বরং মহান আল্লাহ্‌র কাছেও পৌঁছে দেয়, যিনি তাদের পাপ ক্ষমা করে দেন। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ২২:

"...এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন..."

অন্যদের ক্ষমা করা অন্যদের চরিত্রকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রেও আরও কার্যকর, যা ইসলামের উদ্দেশ্য এবং মুসলমানদের উপর কর্তব্য, কারণ প্রতিশোধ নেওয়া কেবল জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও শত্রুতা এবং ক্রোধের জন্ম দেয়।

যাদের অন্যদের ক্ষমা না করার বদ অভ্যাস আছে এবং ছোটখাটো বিষয়েও সবসময় ক্ষোভ পোষণ করে, তারা হয়তো দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করেন না বরং তাদের প্রতিটি ছোট পাপ পরীক্ষা করেন। একজন মুসলিমের উচিত সবকিছু ছেড়ে দেওয়া শেখা কারণ এর ফলে উভয় জগতেই ক্ষমা লাভ হয়। উপরন্তু, যখন কেউ তাদের বিরক্তিকর প্রতিটি ছোটখাটো বিষয় ধরে রাখার অভ্যাস গ্রহণ করে তখন মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। অতএব,

অন্যদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা শেখা একজনকে ছোটখাটো বিষয়গুলি ছেড়ে দিতে সাহায্য করে, যা তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে সহায়তা করে।

পরিশেষে, মূল হাদিসটির অর্থ এই নয় যে অন্যরা যখন সীমা অতিক্রম করে তখন আত্মরক্ষা করা উচিত নয়, কারণ ইসলাম দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতা শেখায়। উপরন্তু, যখন কেউ অন্যদের ক্ষমা করে, তার অর্থ এই নয় যে তাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত বা স্বাভাবিকভাবেই তাদের সাথে মেলামেশা চালিয়ে যাওয়া উচিত। এটি কেবল তাদের উপর আবার অন্যায় হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। মহান আল্লাহর জন্য অন্যদের ক্ষমা করা উচিত, তাদের ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের অধিকার পূরণ করতে হবে এবং অতীতে যারা তাদের উপর অন্যায় করেছে তাদের সাথে আচরণ করার সময় সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এটি নিশ্চিত করবে যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয় এবং তারা উভয় জগতেই আশীর্বাদ এবং প্রতিদান লাভ করে।

ইসলামে আভিজাত্য

যখনই নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনা থেকে বিদায় নিতেন, তখনই তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে এর বিষয়গুলি পরিচালনা করার জন্য নিযুক্ত করতেন। উদাহরণস্বরূপ, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় হিজরতের তৃতীয় বছরে, তিনি বুহরান নামক স্থানে অভিযানের জন্য রওনা হন এবং একজন অন্ধ ও দরিদ্র সাহাবী, ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)-কে মদীনার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

একজন দরিদ্র সাহাবীকে, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, নিযুক্ত করে, যদিও তারা অন্যান্য সাহাবী ছিলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, যারা ধনী ছিলেন এবং তাদের গোত্রের নেতা ছিলেন, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) সকলকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে, দুনিয়াবী মানদণ্ড যা মানুষকে পৃথক করে, যেমন সম্পদ, আল্লাহর দৃষ্টিতে একজন ব্যক্তির মর্যাদা নির্ধারণে ইসলামে কোন মূল্য নেই।

সুনানে আবু দাউদের ৫১১৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, মর্যাদা কারো বংশের উপর নির্ভর করে না, কারণ সকল মানুষই হযরত আদম (আঃ)-এর বংশধর এবং তিনি মাটি দিয়ে তৈরি। তিনি উপসংহারে বলেছিলেন যে, মানুষের উচিত তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বংশ সম্পর্কে গর্ব করা ছেড়ে দেওয়া।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও কিছু অজ্ঞ মুসলিম জাতি ও সম্প্রদায় তৈরি করে অন্যান্য জাতির মনোভাব গ্রহণ করেছে, যার ফলে এই গোষ্ঠীর উপর ভিত্তি করে

কিছু লোককে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করেছে, তবুও ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের জন্য একটি সহজ মানদণ্ড ঘোষণা করেছে, তা হলো তাকওয়া। অর্থ, একজন মুসলিম যত বেশি আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে তাদের মর্যাদা তত বেশি হয়। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এই আয়াতটি অজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা তৈরি অন্যান্য সমস্ত মানদণ্ডকে ধ্বংস করে দেয়, যেমন কারো জাতি, জাতিগততা, সম্পদ, লিঙ্গ বা সামাজিক মর্যাদা।

অধিকন্তু, যদি কোন মুসলিম তার বংশের কোন ধার্মিক ব্যক্তির উপর গর্বিত হয়, তাহলে তাদের উচিত আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই বিশ্বাস সঠিকভাবে প্রদর্শন করা। অন্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে তাদের সম্পর্কে গর্ব করা এই দুনিয়া বা আখেরাতে কারোরই কোন উপকারে আসবে না। জামে আত তিরমিযী, ২৯৪৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি অন্যদের নিয়ে গর্ব করে কিন্তু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়, সে পরোক্ষভাবে তাদের অসম্মান করছে, কারণ বাইরের জগৎ তাদের খারাপ চরিত্র দেখবে এবং ধরে নেবে যে তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষও একইভাবে আচরণ করেছিলেন। অতএব, এই কারণেই এই লোকদের মহান আল্লাহর আনুগত্যে আরও বেশি প্রচেষ্টা করা উচিত। এরা সেই লোকদের মতো যারা মহানবী (সাঃ)

এর বাহ্যিক ঐতিহ্য এবং উপদেশ গ্রহণ করে , যেমন দাড়ি রাখা বা স্কার্ফ পরা, কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ মহৎ চরিত্র গ্রহণ করে না। বাইরের জগৎ যখন এই মুসলমানদের খারাপ চরিত্র দেখবে, তখন তারা মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে কেবল নেতিবাচক চিন্তা করবে।

পরিশেষে, মানবজাতির উৎপত্তি স্মরণ করলে অহংকার থেকে বিরত থাকা যাবে, যার এক অণু পরিমাণও নরকে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহিহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অহংকার কেবল অন্যদের অবজ্ঞা করতে উৎসাহিত করে, যদিও তাদের কাছে থাকা সমস্ত ভালো জিনিসই মহান আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন এবং দান করেছেন। অহংকারও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করবে, যখন তা তাদের কাছ থেকে আসে না। অতএব, যেকোনো কিছুর প্রতি অহংকার, যেমন একজনের ধার্মিক পূর্বপুরুষ, যেকোনো মূল্যে এড়িয়ে চলতে হবে।

বনু কাইনুকা

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের পর তৃতীয় বছরে, মদিনায় বসবাসকারী একটি ইহুদি গোত্র, বনু কাইনুকা, ক্রমাগত তাদের শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তারা এই আচরণ করেছিল যদিও মহানবী (সাঃ) বারবার তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তারা তাঁকে আল্লাহর শেষ নবী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, যেমনটি তাদের ঐশী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তারা একগুঁয়েভাবে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং পরিবর্তে মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে হুমকি দিয়েছিল এবং যুদ্ধ করেছিল। তারা এই আচরণ করেছিল কারণ তারা জানত যে ইসলাম গ্রহণ করলে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার থেকে বিরত থাকবে এবং তারা ভয় পেয়েছিল যে তারা ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের সামাজিক প্রভাব হারাতে হবে। উপরন্তু, আহলে কিতাবরা ছিলেন মহানবী (সাঃ) এর বংশধর, যেখানে মহানবী (সাঃ) ছিলেন মহানবী (সাঃ) এর ভাই, মহানবী (সাঃ) এর বংশধর। আহলে কিতাবরা, বিশেষ করে ইহুদিরা, বংশের প্রতি ভালোবাসায় আচ্ছন্ন ছিল, যা তাদের ঈমানের কেন্দ্রীয় দিক, তাই তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে গ্রহণ বা অনুসরণ করতে পারত না, কারণ তিনি ভিন্ন বংশ থেকে এসেছিলেন। তারা এমন কাউকে গ্রহণ এবং অনুসরণ করতে পারত যা তাদের বংশের নয়, কারণ এটি তাদের বংশের চেয়ে কম ছিল কারণ এটি মানবজাতির উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে দূর করবে, একটি বিশ্বাস যা তারা তৈরি করেছিল।

দুনিয়াবী সুবিধার কারণে, মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই, যিনি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদিনায় হিজরতের আগে বনু কাইনুকার সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন, তিনি জোর দিয়েছিলেন যে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ক্ষতি করবেন না এবং তারা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাদের চুক্তি ভঙ্গ করলেও তিনি তাদের প্রতি অনুগত ছিলেন। অন্যদিকে, একজন সাহাবী, উবাদা বিন সামিত, যার বনু কাইনুকার সাথেও পুরনো মিত্রতা ছিল , তিনি তাদের সাথে তার মিত্রতা প্রকাশ্যে ত্যাগ করেছিলেন এবং পরিবর্তে আল্লাহ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম, এবং তাঁর সাহাবীদের সাথে তার মিত্রতা পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন। এরপর আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৫১ নাযিল করেন:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা [প্রকৃতপক্ষে] একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, সে অবশ্যই তাদেরই একজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

এবং ৫ম সূরা আল মায়িদাহ, ৫৬ নং আয়াত:

"আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারদের বন্ধু হবে- আল্লাহর দল- তারাই হবে বিজয়ী।"

মুনাফিকদের প্রধান আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের সুপারিশের ফলে, মহানবী (সা.) অমুসলিম গোত্র বনু কাইনুকাকে অবরোধের পর শান্তিপূর্ণভাবে মদীনা ত্যাগ করার অনুমতি দেন এবং তারা যুদ্ধ না করেই আত্মসমর্পণ করে, এমনকি তারা বারবার মুসলমানদের সাথে তাদের শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করার পরেও। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩-৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সকল পরিস্থিতিতে ইসলামের প্রতি আনুগত্য এবং মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা উচিত।

ইসলাম মুসলমানদের শিক্ষা দেয় যে, বস্তুজগৎ থেকে কিছু লাভের জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে কখনও আপস করা উচিত নয়। অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ১৩৫:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদান করো, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়..."

যেহেতু বস্তুজগৎ ক্ষণস্থায়ী, তাই এখান থেকে যা কিছু লাভ হবে তা অবশেষে বিলীন হয়ে যাবে এবং পরকালে তাদের কর্ম ও মনোভাবের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে। অন্যদিকে, ঈমান হলো সেই মূল্যবান রত্ন যা একজন মুসলিমকে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নিরাপদে পরিচালিত করে। অতএব, ক্ষণস্থায়ী জিনিসের জন্য অধিকতর কল্যাণকর এবং স্থায়ী জিনিসের সাথে আপস করা স্পষ্ট বোকামি।

অনেক মানুষ, বিশেষ করে নারীরা, তাদের জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত দেখতে পাবেন যেখানে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপোষ করা উচিত কিনা তা বেছে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ক্ষেত্রে একজন মুসলিম মহিলা বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি যদি তার স্কার্ফ খুলে নির্দিষ্ট পোশাক পরেন তবে তিনি কর্মক্ষেত্রে আরও সম্মানিত হবেন এবং এমনকি আরও দ্রুত কর্পোরেট সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারবেন। একইভাবে, কর্পোরেট জগতে কাজের সময় পরে সহকর্মীদের সাথে মেলামেশা করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই একজন মুসলিম হয়তো কাজের পরে কোনও পাব বা ক্লাবে আমন্ত্রিত হতে পারেন।

এইরকম সময়ে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে চূড়ান্ত বিজয় এবং সাফল্য কেবল তাদেরই লাভ হবে যারা ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকবে। যারা এইভাবে কাজ করবে তাদের পার্থিব এবং ধর্মীয় সাফল্য দেওয়া হবে। তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাদের পার্থিব সাফল্য তাদের জন্য বোঝা হয়ে উঠবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি মহান আল্লাহর কাছে মানবজাতির মধ্যে তাদের মর্যাদা এবং স্মরণ বৃদ্ধির একটি উপায় হয়ে উঠবে। এর উদাহরণ হল ইসলামের সঠিক নির্দেশিত খলিফারা। তারা তাদের ঈমানের সাথে আপস করেননি এবং বরং তাদের জীবনকাল ধরে অবিচল ছিলেন এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদেরকে একটি পার্থিব এবং ধর্মীয় সাম্রাজ্য দান করেছিলেন।

সাফল্যের অন্য সকল রূপ খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং আজ হোক কাল হোক, এগুলো এর ধারকদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কেবল সেইসব সেলিব্রিটিদের লক্ষ্য করা উচিত যারা খ্যাতি এবং ভাগ্য অর্জনের জন্য তাদের আদর্শ এবং বিশ্বাসের সাথে আপোষ করেছিলেন, কারণ এই বিষয়গুলি তাদের দুঃখ, উদ্বেগ, বিষণ্ণতা, মাদকাসক্তি এমনকি আত্মহত্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই দুটি পথের উপর একবার চিন্তা করুন এবং তারপর সিদ্ধান্ত নিন কোনটি পছন্দ করা উচিত এবং বেছে নেওয়া উচিত।

খারাপ পরামর্শ

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের পর তৃতীয় বছরে, একজন ইহুদি পণ্ডিত এবং ইসলামের একজন আক্রমণাত্মক শত্রু কা'ব বিন আশরাফ মক্কা সফর করেন যাতে তাদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে আরও উত্তেজিত করা যায়। মক্কার একজন অমুসলিম নেতা তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মক্কার মূর্তিপূজকদের কাছে কে বেশি সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং অনুগ্রহপ্রাপ্ত, নাকি মহানবী (সাঃ) এবং ইসলামের কাছে। কা'ব উত্তর দেন যে, মক্কার মূর্তিপূজকরা বেশি সঠিক পথপ্রাপ্ত। এটি ছিল একটি বোকামিপূর্ণ উত্তর কারণ তিনি একজন ইহুদি পণ্ডিত হিসেবে খুব ভালোভাবেই জানতেন যে মূর্তিপূজা সঠিক পথনির্দেশনা থেকে অনেক দূরে। এই উপলক্ষে, মহান আল্লাহ, সুরা আন-নিসার ৫১ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদের কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে, যারা কুসংস্কার ও মিথ্যা উপাস্যের উপর বিশ্বাস করে এবং কাফেরদের সম্পর্কে বলে, "এরাই মুমিনদের তুলনায় পথের দিক দিয়ে অধিকতর সঠিক পথে আছে?"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি খারাপ সাহচর্য এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে কারণ এটি পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করে। মুসলমানদের মনে রাখা উচিত যে সত্যিকারের ভালোবাসার একটি প্রধান লক্ষণ হল যখন কেউ তার প্রিয়জনকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের

মুখোমুখি হওয়া। কারণ আনুগত্য ইহকাল এবং পরকালে উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্য এবং নিরাপত্তার দিকে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি কারো জন্য নিরাপত্তা এবং সাফল্য কামনা করে না সে কখনই তাকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসতে পারে না, সে যাই দাবি করুক বা অন্য ব্যক্তির সাথে কেমন আচরণ করুক না কেন। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যখন তার প্রিয়জন চাকরির মতো পার্থিব সাফল্য লাভ করে, তখন সে তার প্রিয়জনকে পরকালেও সাফল্য পেতে চায়। যদি একজন ব্যক্তি অন্যের নিরাপত্তা এবং সাফল্য লাভের বিষয়ে চিন্তা না করে, বিশেষ করে পরকালে, তাহলে সে তাকে ভালোবাসে না।

একজন প্রকৃত প্রেমিক তার প্রিয়জনকে এই পৃথিবীতে বা পরকালে কষ্ট এবং শাস্তির সম্মুখীন হতে দেখা এবং জানা সহ্য করতে পারে না। এটি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই এড়ানো সম্ভব। অতএব, তারা সর্বদা তাদের প্রিয়জনকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করবে। যদি কেউ অন্যকে আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে নিজের স্বার্থ বা অন্যের স্বার্থের দিকে পরিচালিত করে, তাহলে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে না। এটি বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়স্বজনের মতো সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত মূল্যায়ন করা যে তাদের জীবনের বিষয়গুলি তাদেরকে মহান আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে কিনা। যদি তারা তা করে তবে এটি তাদের প্রতি তাদের ভালোবাসার স্পষ্ট লক্ষণ। যদি তারা তা না করে তবে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাদেরকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে না। অধ্যায় ৪৩ আয যুখরুফ, আয়াত ৬৭:

"সেদিন ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হবে, কেবল সৎকর্মশীলরা ছাড়া।"

রাষ্ট্রদ্রোহের শাস্তি

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের পর তৃতীয় বছরে, একজন ইহুদি পণ্ডিত এবং ইসলামের একজন আক্রমণাত্মক শত্রু কা'ব বিন আশরাফ বারবার রাষ্ট্রপ্রধান হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তার শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করেছিলেন। তিনি মক্কা, মদিনা এবং আশেপাশের অঞ্চলে বসবাসকারী অমুসলিমদের হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে উসকানি দিতে থাকেন। তার বহু বিশ্বাসঘাতকতার ফলে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাঃ) রাতে কা'বের সাথে একটি গোপন বৈঠক করেন এবং তাকে হত্যা করেন। ইবনে কাথিরের "নবী (সাঃ) এর জীবনী", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫-৬ এবং সহীহ বুখারী, ৪০৩৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

অনেক দেশে, এমনকি আজকের যুগেও, রাষ্ট্রদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। অতএব, এটি একটি ন্যায্য শাস্তি ছিল।

এই ঘটনাটি আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়, কিন্তু কেউ যেন ভুলে না যায় যে, যারা তাঁর অবাধ্যতায় অটল থাকে, তিনি তাদের শাস্তিও দেন। আল্লাহর ঐশ্বরিক গুণাবলী সঠিকভাবে না বোঝার ফলে কেউ ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করতে পারে যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর অবাধ্যতায় অটল থাকে, অথচ তিনি ক্ষমাশীল বলে আশা করে। যদি আল্লাহ এইভাবে আচরণ করেন, তাহলে এর অর্থ হবে তিনি সৎকর্মশীল এবং অসৎকর্মশীলদের সাথে সমান আচরণ করবেন, যা তাঁর ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতার গুণাবলীর পরিপন্থী। অধ্যায় ৪৫ আল জাসিয়াহ, আয়াত ২১:

"যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমি তাদেরকে তাদের মতো করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে- তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান করে দেব? তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না মন্দ।"

আহলে কিতাবদের কিছু পণ্ডিত, যারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করার পরেও ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার উপর অটল ছিলেন, যেমন কা'ব বিন আশরাফ। অতএব, ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবর্তে মহান আল্লাহর উপর প্রকৃত আশা গ্রহণ করতে হবে। মহান আল্লাহর উপর আশা করার অর্থ হল আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং তারা যে কোনও পাপ করে থাকলে তা থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া। আন্তরিক অনুতাপের অর্থ হল অপরাধবোধ করা, মহান আল্লাহ এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে তার ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও ঝামেলার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকারের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত। অতএব, ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা যেকোনো মূল্যে এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি উভয় জগতেই কেবল ঝামেলার দিকে পরিচালিত করে।

কথোপকথন গোপন রাখা

যখন উমর ইবনে খাত্তাবের কন্যা হাফসা (রাঃ) বিধবা হয়ে গেলেন, তখন তিনি উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) এর সাথে সম্ভাব্য বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি বিবাহের উপযুক্ত অবস্থানে না থাকায় তিনি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর উমর আবু বকর (রাঃ) এর সাথে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন, যিনি তাৎক্ষণিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি। পরবর্তীতে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) হাফসা (রাঃ) কে বিবাহের প্রস্তাব দেন এবং তাকে বিবাহ করেন। আবু বকর (রাঃ) উমর (রাঃ) কে ব্যাখ্যা করেন যে, তিনি প্রথমে উত্তর দেননি কারণ তিনি জানতেন যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই তথ্য প্রকাশ করার পরিবর্তে, তিনি তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথন গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নেন এবং তাই তাৎক্ষণিকভাবে তাকে উত্তর দেননি। সুনান আন নাসায়ীর ৩২৬১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, ১৯৫৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) ইঙ্গিত করেছেন যে ব্যক্তিগত কথোপকথন একটি আমানত যা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেকেরই মানুষের ব্যক্তিগত কথোপকথন অন্যদের কাছে প্রকাশ করার খারাপ অভ্যাস থাকে। এটি একটি অবিশ্বাস্যরকম খারাপ বৈশিষ্ট্য কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলিমের মনোভাবের পরিপন্থী। অনেকে তাদের নিকটাত্মীয়দের সাথে এটি করে, যারা মনে করে এটি গ্রহণযোগ্য, যদিও এটি স্পষ্টতই গ্রহণযোগ্য নয়। একজন মুসলিমের উচিত সর্বদা কথোপকথনে বলা কথাগুলি গোপন রাখা, যদি না তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হন যে যার সাথে তারা কথা বলেছেন তিনি তৃতীয় পক্ষের কাছে তথ্য উল্লেখ করায় আপত্তি করবেন না। যদি তারা তা করে, তাহলে এটি তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং এটি

তাদের প্রতি আন্তরিকতার পরিপন্থী। সুনানে আন নাসায়ী, ৪২০৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে অন্যদের প্রতি আন্তরিক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এমনকি যদি কেউ বিশ্বাস করে যে অন্য ব্যক্তি তাদের কথোপকথন অন্যদের কাছে প্রকাশ করায় আপত্তি করবে না, তবুও, তৃতীয় পক্ষের সাথে কথোপকথন ভাগ করে নেওয়া থেকে বিরত থাকা নিরাপদ এবং উত্তম।

মূল হাদিসের উপর আমল করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি গীবত এবং পরচর্চার মতো পাপ প্রতিরোধ করে এবং মানুষের মধ্যে নেতিবাচক অনুভূতি তৈরি হতে বাধা দেয়। এটি প্রায়শই ঘটে কারণ তৃতীয় পক্ষের সাথে কথোপকথন প্রায়শই ভুল ব্যাখ্যা এবং ভুল বোঝাবুঝির দিকে পরিচালিত করে। এই সবগুলি কেবল ভাঙা এবং সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার দিকে পরিচালিত করে। যদি কেউ সৎভাবে তাদের জীবন সম্পর্কে চিন্তা করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে যাদের প্রতি তারা নেতিবাচক অনুভূতি অনুভব করেছে তাদের বেশিরভাগই তাদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল তার কারণেই হয়েছিল, তাদের কাছ থেকে সরাসরি যা দেখেছিল তার কারণে নয়। ব্যক্তিগত কথোপকথন প্রকাশ করা মানুষের মধ্যে ঐক্যকে বাধা দেয়, বিশেষ করে আত্মীয়দের মধ্যে। এবং ইসলামের অনেক শিক্ষায় ঐক্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন সহিহ বুখারীতে পাওয়া হাদিস, সংখ্যা 6065। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 58:

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাদেরকে আমানতসমূহ তাদের প্রাপ্যদের হাতে অর্পণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন..."

অন্যদের কথাবার্তার সাথে ঠিক তেমনই আচরণ করা উচিত যেমন তারা চায় লোকেরা তাদের কথোপকথনের সাথে আচরণ করুক।

যা যা যায় তাই আসে

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের তৃতীয় বছরে, মক্কার অমুসলিম নেতারা ১০০,০০০ রৌপ্য মুদ্রা সহ একটি বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়ার দিকে পাঠান। কিন্তু মুসলমানরা যখন তাদের বাণিজ্য কাফেলাগুলিকে আক্রমণ করছিল, তখন তারা নজদ পেরিয়ে ইরাক যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এই তথ্য মহানবী (সাঃ) এর কাছে ফাঁস হয়ে যায়, যিনি যায়েদ বিন হারিসাকে ১০০ জন অশ্বারোহী সহ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, কাফেলাটি দখল করার জন্য প্রেরণ করেন। তারা বাণিজ্য কাফেলাকে পাহারা দেওয়া লোকদের পরাজিত করতে সক্ষম হয় এবং ফলস্বরূপ অমুসলিমরা পালিয়ে যায় এবং মুসলমানরা সম্পদ এবং তিনজন যুদ্ধবন্দীকে ধরে ফেলে, যাদের মধ্যে একজন কিছুক্ষণ পরেই ইসলাম গ্রহণ করে। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ২৪৩-২৪৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ঠিক যেমন, বহু বছর আগে, মদিনায় হিজরতের আগে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, মক্কায় সামাজিক বয়কটের শিকার হয়েছিলেন যার ফলে তাদের সম্পদ এবং খাদ্য সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, আল্লাহ, মক্কার অমুসলিমদেরও একই পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছিলেন যার ফলে মুসলমানরা তাদের বাণিজ্য পথ বন্ধ করে দিয়েছিল।

কখনোই খারাপ কাজ করার চক্রান্ত করা উচিত নয় কারণ এটি সর্বদা, এক বা অন্যভাবে, তাদের উপরই আঘাত হানবে। এমনকি যদি এই পরিণতিগুলি পরবর্তী জগতে বিলম্বিত হয় তবে তারা অবশেষে এর মুখোমুখি হবে। উদাহরণস্বরূপ, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন যেমন তারা তাদের পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা

এবং স্নেহ কামনা করেছিলেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তাদের চক্রান্ত তাদের তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১৮:

"এবং তারা তার জামার উপর মিথ্যা রক্ত আনল। [ইয়াকুব] বলল, "বরং তোমাদের আত্মা তোমাদেরকে কিছু একটার প্রতি প্ররোচিত করেছে, তাই ধৈর্যই সবচেয়ে উপযুক্ত..."

যে যত বেশি মন্দ চক্রান্ত করবে, আল্লাহ তাআলা তত বেশি তাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। এমনকি যদি তারা বাহ্যিকভাবে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে, তবুও আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য উভয় জগতে অভিশাপ হিসেবে তাদের আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটিকেই পরিণত করবেন, যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ৪৩:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজস্ব লোকদের ছাড়া আর কাউকে ঘিরে রাখে না। তাহলে তারা কি পূর্ববর্তী লোকদের পথ [অর্থাৎ, ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করছে?..."

উহুদের যুদ্ধ

একটি খারাপ কথোপকথন

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের পর তৃতীয় বছরে, মক্কার অমুসলিম নেতারা বদরের যুদ্ধে তাদের আত্মীয়স্বজনদের হারিয়ে যাওয়া অমুসলিমদের সাথে একত্রিত হন। তারা ঘোষণা করেন যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের অনেক ক্ষতি করেছেন এবং তাদের অভিজাত ও আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করেছেন। তারা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাদের আর্থিক ও শারীরিকভাবে সহায়তা করার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানান। প্রতিশোধের তৃষ্ণা এবং মুসলমানদের তাদের বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণের ফলে সৃষ্ট আর্থিক সমস্যা তাদেরকে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করে, যেখানে তাদের বিনয়ী হয়ে সত্য গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা উচিত ছিল। তারা সকলেই এই মন্দ অভিযানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন যা অবশেষে উহুদের যুদ্ধে পরিণত হয়। এই উপলক্ষে, মহান আল্লাহ, সূরা আল-আনফালের ৮ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"নিশ্চয়ই, যারা কাফের, তারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর পথ থেকে [মানুষকে] বিরত রাখার জন্য। তাই তারা তা ব্যয় করবে; তারপর তা তাদের জন্য অনুশোচনার কারণ হবে; তারপর তারা পরাজিত হবে। এবং যারা কাফের, তাদেরকে জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

৪র্থ সূরা আন নিসার ১১৪ নং আয়াতের সাথে সম্পর্কিত :

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনের বেশিরভাগের মধ্যেই কোন কল্যাণ নেই, তবে যারা দান-খয়রাতের নির্দেশ দেয়, সৎকর্মের নির্দেশ দেয় অথবা মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ কাজ করে, আমি তাকে বিরাট প্রতিদান দেব।"

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ব্যাখ্যা করেছেন যে, অন্যদের সাথে কথা বলার সময় মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত যাতে তারা নিজেদের এবং অন্যদের জন্য কল্যাণকর হয়। প্রথমত, যখন মুসলমানরা একত্রিত হয় তখন তাদের আলোচনা করা উচিত যে কীভাবে অন্যদের উপকার করা যায়, যার মধ্যে রয়েছে সম্পদ এবং শারীরিক সাহায্যের আকারে দান। যদি কোন মুসলিম কোন অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করার অবস্থানে না থাকে, তাহলে এটি তাদের সাহায্য করার সমান সওয়াব অর্জনের একটি চমৎকার উপায়। সহীহ মুসলিমের ৬৮০০ নম্বর হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্য কাউকে ভালো কাজের জন্য অনুপ্রাণিত করে, সে যেন নিজে ভালো কাজ করেছে, সেও সেভাবেই পুরস্কৃত হবে। যদি কেউ কাউকে কষ্টে সাহায্য করতে না পারে বা অন্যকে এই কাজটি সম্পন্ন করতে অনুপ্রাণিত করতে না পারে, তাহলে অন্তত অন্যদের অভাবী ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করতে পারে। অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা ফেরেশতাদের প্রার্থনাকারীর জন্য প্রার্থনা করতে বাধ্য করে। সুনানে আবু দাউদের ১৫৩৪ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই মানসিকতা দলটিকে অভাবী ব্যক্তির সাথে দেখা করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে যা তাদের মানসিক সমর্থন প্রদান করে। এর একটি শক্তিশালী মানসিক প্রভাব রয়েছে এবং তাদের কষ্ট মোকাবেলা করার সময় তাদের একটি নতুন শক্তি প্রদান করে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যখন কেউ একজন অভাবী ব্যক্তির পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে, তখন তার উদ্দেশ্য অবশ্যই তাদের প্রয়োজনের সময় সাহায্য করা। এটি কখনই সময় নষ্ট করা এবং তাদের উপহাসের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা উচিত নয়।

দ্বিতীয়ত, আশীর্বাদ লাভের উপায় হলো, যখন কেউ এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে যা ইহকাল বা পরকালে কারো জন্য কল্যাণকর হবে। এর মধ্যে রয়েছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যদেরকে সৎকাজ করার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া।

এই আয়াতে উল্লেখিত তৃতীয় দিকটি হল অন্যদের সাথে গঠনমূলক মানসিকতার সাথে কথোপকথন করা যা মানুষকে ইতিবাচকভাবে একত্রিত করে, বরং ধ্বংসাত্মক মানসিকতা ধারণ করে যা সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। যদি কোনও ব্যক্তি মানুষকে প্রেমময় উপায়ে একত্রিত করতে না পারে তবে তার ন্যূনতম কাজ হল তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা নয়। এমনকি যখন এটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় তখন এটি একটি সৎকর্ম হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। সহিহ বুখারীতে ২৫১৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আবু দাউদের ৪৯১৯ নম্বর একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুই বিরোধী মুসলিমের মধ্যে পুনর্মিলন করা নফল নামাজ এবং রোজার চেয়েও উত্তম। সমাজের মধ্যে পাওয়া প্রতিটি ভালো জিনিসই ছিল স্কুল, হাসপাতাল এবং মসজিদ নির্মাণের মতো এই ধার্মিক মনোভাবের ফল।

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিম কেবল তখনই এই আয়াতে উল্লেখিত মহান প্রতিদান পাবে যখন সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সৎকর্ম করবে । কেবল তাদের শারীরিক কর্মের ভিত্তিতে নয়, তাদের নিয়তের ভিত্তিতে পুরস্কৃত করা হবে। সহীহ বুখারী, ১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা

হয়েছে। কপট মুসলিমরা দেখতে পাবে যে বিচারের দিন তাদের বলা হবে যে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরষ্কার পেতে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের তৃতীয় বছরে, মক্কার অমুসলিম নেতারা বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, যা পূর্ববর্তী বছর সংঘটিত হয়েছিল। বদরের যুদ্ধের পর নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একজন অমুসলিম যুদ্ধবন্দী আবু আজ্জা আল জুমাহিকে মুক্তি দেন, কারণ তিনি দরিদ্র ছিলেন এবং মুক্তিপণ দিতে পারতেন না। একজন অমুসলিম নেতা আবু আজ্জাকে একটি অমুসলিম গোত্রকে তাদের অভিযানে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করে তাদের সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেন। যদিও তিনি স্বীকার করেন যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তার প্রতি সদয় ছিলেন এবং তিনি তার বিরোধিতা করতে চাননি, অবশেষে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযানে যোগ দিতে রাজি হন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১২-১৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুরুত্ব নির্দেশ করে। জামে আত তিরমিযী, ১৯৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে কখনও মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না।

যদিও নিঃসন্দেহে সকল নিয়ামতের উৎস মহান আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ নন, তবুও মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কারণ, মহান আল্লাহ তাআলা মাঝে মাঝে একজন ব্যক্তিকে অন্যদের সাহায্য করার জন্য, যেমন তার পিতামাতাকে সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করেন। যেহেতু উপায় আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন এবং ব্যবহার করেছেন, তাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা আসলে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অতএব, মুসলমানদের উচিত উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা এবং অন্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত যেকোনো সাহায্য বা সহায়তার জন্য সর্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তা যত বড়ই

হোক না কেন। তাদের উচিত আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁর আদেশ অনুসারে আশীর্বাদ ব্যবহার করে, কারণ তিনিই আশীর্বাদের উৎস এবং তাদের উচিত সেই ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যিনি তাদের সাহায্য করেছেন, কারণ এটিই সেই মাধ্যম যা মহান আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন এবং নির্বাচিত করেছেন। একজন মুসলমানের উচিত মানুষের প্রতি মৌখিকভাবে এবং কার্যত তাদের সদয় আচরণের প্রতিদান তাদের সামর্থ্য অনুসারে প্রদান করা, এমনকি যদি তা কেবল তাদের পক্ষ থেকে একটি প্রার্থনাও হয়। ইমাম বুখারীর "আদাব আল মুফরাদ", ২১৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাহায্যের বাহ্যিক প্রকাশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, অর্থাৎ একজন ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে সরাসরি মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সম্ভাবনা কম।

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না, তাই তাদের নিয়ামত বৃদ্ধি করা হবে না। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"আর [স্মরণ করো] যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের [নেয়ামত] বৃদ্ধি করব..."

যদি কোন মুসলিম বরকত বৃদ্ধি করতে চায়, তাহলে তাকে কৃতজ্ঞতার উভয় দিকই পূরণ করতে হবে, যথা, মহান আল্লাহর প্রতি এবং মানুষের প্রতি।

অধিকন্তু, আলোচিত মূল ঘটনাটি অন্যদের খারাপ কাজে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকার এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকারী কাজে সাহায্য করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। ৫ম সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত ২:

"...এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত কে তাদের কোন কাজে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তা দেখা এড়িয়ে চলা এবং পরিবর্তে তাদের লক্ষ্য করা উচিত যে তাদের কী দিকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে এবং কেবল তখনই তাতে অংশ নেওয়া উচিত যদি তা ভালো হয়। অন্যদের খারাপ কাজে সাহায্য করা কেবল পাপ এবং অপরাধের দিকে পরিচালিত করবে, যা উভয় জগতেই একজন ব্যক্তির জন্য চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। মনে রাখা উচিত যে যতক্ষণ তারা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখবে, ততক্ষণ তিনি তাদেরকে অন্যদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে, মানুষ তাদেরকে এই পৃথিবীতে বা পরকালে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে না। অতএব, আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, যার একটি শাখা হল অন্যদেরকে ভালো কাজে সাহায্য করা।

কথোপকথন পাহারা দেওয়া

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের তৃতীয় বছরে, মক্কার অমুসলিম নেতারা পূর্ববর্তী বছরে সংঘটিত বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই খবর নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে তাঁর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) এর মাধ্যমে পৌঁছে, যিনি সেই সময় মক্কায় ছিলেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সিনিয়র সাহাবীদের (রাঃ) সাথে একটি গোপন বৈঠক করেন এবং তাদের পরামর্শ চান। বৈঠক শেষ হওয়ার আগে তিনি তাদেরকে তথ্য গোপন রাখতে বলেন যাতে মদিনার ইসলামের শত্রুরা জানতে পারে এবং মক্কার অমুসলিমদের অবহিত করতে না পারে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রাঃ) এর "দ্য নোবেল লাইফ অফ দ্য প্রফেট (সাঃ)", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৯৮-১১০০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, যদিও মহানবী (সা.) ঐশী নির্দেশিত ছিলেন, তবুও তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য মানুষের কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯:

"... তাই তাদের ক্ষমা করো, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাদের সাথে পরামর্শ করো..."

অতিরিক্ত পরামর্শে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তির কয়েকজনের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া উচিত। তাদের কেবল এমন ব্যক্তির কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া উচিত যার কাছে তারা যে বিষয়ে পরামর্শ চাইছেন সে সম্পর্কে জ্ঞান আছে। উদাহরণস্বরূপ, যার গাড়ির সমস্যা আছে, তার একজন মেকানিকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় হল যে, পার্থিব বিষয়ে মুসলমানরা

বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয় কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে তারা যে কোনও অজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করে। এটি তাদের ধর্মীয় বিষয়ে যত্নের অভাবের স্পষ্ট ইঙ্গিত। একজনকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা এমন কারো কাছ থেকে ধর্মীয় পরামর্শ নেবে যার কাছে ইসলামী জ্ঞান আছে। পরিশেষে, একজনের কেবল এমন ব্যক্তির কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া উচিত যিনি মহান আল্লাহকে ভয় করেন, কারণ তারা কখনই তাদের আল্লাহকে অমান্য করার পরামর্শ দেবেন না, কারণ এটি উভয় জগতেই তাদের জন্য কেবল সমস্যা এবং চাপের কারণ হবে।

আলোচ্য মূল ঘটনাটি অন্যদের সাথে গোপনে কথা বলার মাধ্যমে তাদের সম্মান করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিমেরই অন্যদের সাথে তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথন প্রকাশ করার অভ্যাস রয়েছে, কারণ এটি তাদের মধ্যে একটি প্রচলিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার পরিপন্থী, যা সহিহ মুসলিমের ১৯৬ নম্বর হাদিস অনুসারে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কথোপকথন গোপন না রাখার ফলে প্রায়শই অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয় এবং মানুষের মধ্যে নেতিবাচকতা তৈরি হয়। এর ফলে সম্পর্ক ভেঙে যায়। অতএব, অন্যদের সাথে তাদের কথোপকথন গোপন রেখে অন্যদের সাথে সেইভাবে আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা নিজেরাও অন্যদের দ্বারা আচরণ পেতে চায়।

কোর্সে থাকা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের পর তৃতীয় বছরে, মক্কার অমুসলিম নেতারা পূর্ববর্তী বছরের বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অমুসলিম সেনাবাহিনী যখন উহুদের কাছাকাছি পৌঁছে, তখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একটি স্বপ্ন দেখেন যেখানে বলা হয়েছিল যে মুসলিম সেনাবাহিনীকে মদিনায় অবস্থান করতে হবে এবং শহরের ভেতরে শত্রুদের মোকাবেলা করতে হবে। মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই এই পরিকল্পনার সাথে একমত হন কারণ তিনি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হতে চাননি। কিন্তু তরুণ সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, যারা বদরের যুদ্ধ দেখেননি, তারা তাকে এগিয়ে যাওয়ার এবং উহুদে অমুসলিম সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন, যা তিনি অবশেষে মেনে নেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর যুদ্ধের বর্ম পরিধান করার পর, তরুণ সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে মদিনার ভেতরে অমুসলিম সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার জন্য তার প্রাথমিক পরামর্শে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উত্তরে বলেন যে, মহান আল্লাহর শত্রুদের মোকাবেলা না করে একজন মহানবী (সাঃ) এর জন্য তাঁর যুদ্ধের বর্ম খুলে ফেলা ঠিক নয়। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর স্বপ্নে মদিনায় থাকাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, যদিও তিনি শেষ যুগ পর্যন্ত সকল নেতার জন্য একটি ভালো উদাহরণ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। একজন ভালো নেতা শত্রু সম্পর্কে নতুন তথ্য পাওয়ার মতো বৈধ কারণ ছাড়া তাদের আদেশ পরিবর্তন করে অনিশ্চিত আচরণ করেন না। এই ধরনের আচরণের ফলে সৈন্যরা কেবল তাদের নেতার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলবে, যা যুদ্ধের সময় অত্যন্ত বিপজ্জনক। অতএব, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উহুদের দিকে যাত্রা করার নির্দেশে অটল ছিলেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন ব্যক্তির জীবনে একটি দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করা উচিত যার মাধ্যমে তারা

তাদের বৈধ পার্থিব এবং ধর্মীয় সিদ্ধান্তে অটল থাকে এবং কেবল প্রমাণ এবং জ্ঞানের কারণে পথ পরিবর্তন করে। যে ব্যক্তি অনিশ্চিত মনোভাব গ্রহণ করে সে কখনই তাদের নেওয়া কোনও সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে না, যার ফলে তাদের সিদ্ধান্তের প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং নিবেদিতপ্রাণ থাকার মাধ্যমে তারা যে সুবিধাগুলি অর্জন করতে পারত তা হারাবে। উপরন্তু, এই ব্যক্তি ক্রমাগত পিছনের দিকে তাকাবে, যদিও তারা ইতিহাস পরিবর্তন করতে পারে না, যা তাদের সামনের দিকে তাকাতে এবং তাদের সুযোগ এবং বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উপকৃত হতে বাধা দেবে।

উপায় ব্যবহার এবং আল্লাহর উপর ভরসা করা

উহুদের যুদ্ধের সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দুটি বর্ম পরিধান করেছিলেন, একটির উপরে অন্যটির চেইন-মেল বর্ম ছিল। ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর উপর ভরসা করার দুটি দিকই গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমটি হল, প্রদত্ত উপায়গুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন। অন্যটি হল, বিশ্বাস করা যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই যে ফলাফল নির্ধারণ করবেন তা সকলের জন্যই সর্বোত্তম হবে।

জামে আত তিরমিযীতে ২৩৪৪ নম্বর হাদিসে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যদি মানুষ সত্যিই মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে, তাহলে তিনি তাদের রিজিক দেবেন ঠিক যেমন তিনি পাখিদের রিজিক দেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় তাদের বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় তৃপ্ত হয়ে ফিরে আসে।

মহান আল্লাহর উপর প্রকৃত ভরসা করা এমন একটি বিষয় যা হৃদয়ে অনুভূত হয় কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, অর্থাৎ, যখন কেউ আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। ৬৫তম অধ্যায় তালাক, আয়াত ৩:

"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে- তার জন্য তিনিই যথেষ্ট..."

আস্থার যে দিকটি অভ্যন্তরীণ, তা হলো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, একমাত্র মহান আল্লাহই মানুষকে উপকারী জিনিস সরবরাহ করতে পারেন এবং পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর জিনিস থেকে রক্ষা করতে পারেন। একজন মুসলিম বোঝে যে, দান, প্রতিরোধ, ক্ষতি বা উপকারের উৎস আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন। একজন মুসলিম সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে, তার জীবনে যা কিছু ঘটে, যা একমাত্র আল্লাহই নির্ধারণ করেন, তা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই সর্বোত্তম, এমনকি যদি তা তাদের এবং অন্যদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। ২য় সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর উপর সত্যিকার অর্থে ভরসা করার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তাআলা যে উপায়-উপকরণ, যেমন ঔষধ, ব্যবহার করা ছেড়ে দিতে হবে। আলোচ্য প্রধান হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাখিরা তাদের বাসা থেকে বেরিয়ে জীবিকার সন্ধানে সক্রিয়ভাবে বেরিয়ে পড়ে। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, যখন কেউ মহান আল্লাহর প্রদত্ত শক্তি এবং উপায় ব্যবহার করে, তখন তারা নিঃসন্দেহে তাঁর আনুগত্য করছে এবং তাঁর উপর নির্ভর করছে। এটি আসলে, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার বাহ্যিক উপাদান। এটি অনেক আয়াত এবং হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। সূরা ৪ আন-নিসা, আয়াত ৭১:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করো..."

বাস্তবে, বাহ্যিক কার্যকলাপ হলো মহানবী (সাঃ)-এর একটি ঐতিহ্য, আর মহান আল্লাহর উপর আভ্যন্তরীণভাবে আস্থা রাখা হলো মহানবী (সাঃ)-এর আভ্যন্তরীণ অবস্থা। বাহ্যিক ঐতিহ্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়, যদিও তাদের আভ্যন্তরীণ আস্থা থাকে।

আল্লাহ তাআলার দেওয়া উপায় ব্যবহার এবং কর্মকাণ্ড তাঁর উপর ভরসা করার একটি দিক। এই ক্ষেত্রে, কর্মকাণ্ডকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের আনুগত্যের সেইসব কর্মকাণ্ড করতে বলেছেন যাতে তারা উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারে। এই কর্মকাণ্ড ত্যাগ করে এই বিশ্বাস দাবী করা যে, আল্লাহ তাআলা শান্তি ও সাফল্য দান করবেন, কেবল আকাঙ্ক্ষা এবং ইসলামে এর কোন মূল্য নেই।

দ্বিতীয় ধরণের কাজ হলো সেইসব উপায় যা আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীতে মানুষ নিরাপদে বসবাসের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেমন ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাওয়া, তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পান করা এবং ঠান্ডা আবহাওয়ায় গরম পোশাক পরা। যে ব্যক্তি এগুলো পরিত্যাগ করে নিজের ক্ষতি করে সে দোষী। তবে, এমন কিছু লোক আছে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ শক্তি দান করেছেন, যাতে তারা নিজেদের ক্ষতি না করে এই উপায়গুলো এড়িয়ে চলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দিনের পর দিন রোজা রাখতেন কিন্তু অন্যদেরও তা করতে নিষেধ করতেন, যেমন আল্লাহ তাআলা তাকে সরাসরি খাবারের প্রয়োজন ছাড়াই সরবরাহ করতেন। সহীহ বুখারী, ১৯২২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত

করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) চতুর্থ সঠিক পথপ্রাপ্ত খলিফা আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ)-এর জন্য দোয়া করেছিলেন, যাতে তিনি অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরম অনুভব না করেন। সুনানে ইবনে মাজাহের ১১৭ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি এই উপায়গুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কিন্তু আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ না হয়ে ধৈর্য ধারণের শক্তি পায়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় এটি নিন্দনীয়।

আল্লাহর উপর ভরসা করার ক্ষেত্রে তৃতীয় ধরণের কাজ হল সেইসব কাজ যা একটি প্রচলিত রীতি হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে যা আল্লাহ তাআলা কখনও কখনও নির্দিষ্ট কিছু মানুষের জন্য ভেঙে দেন। এর একটি উদাহরণ হল সেইসব মানুষ যারা চিকিৎসার প্রয়োজন ছাড়াই রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে। এটি বেশ সাধারণ, বিশেষ করে দরিদ্র দেশগুলিতে যেখানে চিকিৎসা পাওয়া কঠিন। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, ২১৪৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসের সাথে সম্পর্কিত, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যাবে না যতক্ষণ না সে তার জন্য বরাদ্দকৃত রিযিকের প্রতিটি আউন্স ব্যবহার করে, যা সহীহ মুসলিম, ৬৭৪৮ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিস অনুসারে, আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে ছিল। তাই যে ব্যক্তি এই হাদিসটি সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করে, সে হয়তো সক্রিয়ভাবে রিযিকের সন্ধান করবে না, কারণ সে জানে যে এতদিন আগে তাদের জন্য যা বরাদ্দ করা হয়েছিল তা মিস করা যাবে না। তাই এই ব্যক্তির জন্য রিযিক পাওয়ার প্রচলিত উপায়, যেমন চাকরির মাধ্যমে তা পাওয়া, আল্লাহ তাআলা তা ভেঙে দেন। এটি একটি উচ্চ এবং বিরল পদমর্যাদা। যে ব্যক্তি অভিযোগ, আতঙ্ক বা মানুষের কাছ থেকে কিছু আশা না করে এই ধরণের আচরণ করতে পারে, কেবল সে যদি এই পথ বেছে নেয়, তাহলে সে দোষমুক্ত হবে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদের ১৬৯২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তির জন্য তাদের নির্ভরশীলদের ভরণপোষণে ব্যর্থ হওয়া পাপ, যদিও তারা এত উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী হোক না কেন।

যদিও এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, যে উপায়-উপকরণ প্রদত্ত হয়েছে তা ব্যবহার করা, সেগুলো পরিত্যাগ করার চেয়ে অনেক ভালো, কারণ মহানবী (সা.)-এর পথের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"বলুন, [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন...""

মহান আল্লাহর উপর প্রকৃত আস্থা রাখা ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকার দিকে পরিচালিত করে। অর্থাত্, মহান আল্লাহ যা কিছু পছন্দ করেন, তারা কোনও অভিযোগ ছাড়াই এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই তা গ্রহণ করে, কারণ তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে মহান আল্লাহ কেবল তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটিই বেছে নেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

পরিশেষে, মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করাই সর্বোত্তম, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত বৈধ উপায় ব্যবহার করে, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং অভ্যন্তরীণভাবে বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ

যা নির্ধারণ করেন তা কেবল ঘটবে, যা নিঃসন্দেহে জড়িত প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম পছন্দ, তারা এটি পর্যবেক্ষণ করুক বা না করুক।

উপযুক্ত সঙ্গী নির্বাচন করা

যখন মহানবী (সাঃ) উহুদের যুদ্ধে শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য মদীনা ত্যাগ করেন, তখন তিনি একটি সৈন্যদলের মুখোমুখি হন যারা যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে যোগ দিতে অগ্রসর হচ্ছিল। যখন মহানবী (সাঃ) কে জানানো হয় যে তারা মদীনার অমুসলিম, যারা মদীনার সাহাবীদের মিত্র ছিল, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, এবং এই যুদ্ধে মুসলমানদের সমর্থন করতে এসেছেন, তখন মহানবী (সাঃ) জিজ্ঞাসা করেন যে তারা কি ইসলাম গ্রহণ করেছে। যখন তাকে বলা হয় যে তারা তাদের ঈমানের উপর অটল, তখন তিনি তাদের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে তিনি মক্কার অমুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য গ্রহণ করবেন না। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ২৪৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও মহানবী (সাঃ) এর সংখ্যা ছিল খুবই কম, যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে অনুপাত ছিল ৩ থেকে ১ যা ৪ থেকে ১ হয়ে গিয়েছিল, তবুও তিনি কাফেরদের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন কারণ তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করার দুটি দিক পূরণ করেছিলেন। প্রথমটি হল, সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, সংগঠিত করে যুদ্ধের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উপায় ব্যবহার করা, এবং দ্বিতীয়টি হল বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা সকলের জন্যই সর্বোত্তম, এই বিশ্বাস তাঁর সর্বদা সর্বোচ্চ স্তরে ছিল।

তাছাড়া, মহানবী (সাঃ) মদিনার অমুসলিমদের ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন, যদিও তারা মহানবী (সাঃ) এর সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। যদি তিনি তাদের তার সেনাবাহিনীতে যোগদানের অনুমতি দেন, তাহলে তারা যুদ্ধের সময় সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, আক্রমণ করতে পারতেন, যা তাদের জন্য

একটি বড় বিপর্যয়ের কারণ হত। অতএব, মহানবী (সাঃ) যুদ্ধের সময় তাদের সাহায্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি খারাপ সাহচর্য এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ বুখারীতে ৫৫৩৪ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একজন ভালো এবং খারাপ সঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। একজন ভালো সঙ্গী হলো এমন একজন ব্যক্তির মতো যে সুগন্ধি বিক্রি করে। তার সঙ্গী হয় কিছু সুগন্ধি পাবে অথবা অন্তত এর সুগন্ধে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে। অন্যদিকে, একজন খারাপ সঙ্গী হলো একজন কামারের মতো, যদি তার সঙ্গী তার কাপড় না পোড়ায় তবে ধোঁয়ার কারণে তার উপর অবশ্যই নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

মুসলমানদের বুঝতে হবে যে, যাদের সাথে তারা যায়, তাদের উপর তাদের প্রভাব পড়বে, তা ইতিবাচক হোক বা নেতিবাচক, স্পষ্ট হোক বা সূক্ষ্ম, যাই হোক না কেন। কারো সাথে থাকা এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া সম্ভব নয়। সুনানে আবু দাউদের ৪৮৩৩ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তার সঙ্গীর ধর্মের উপর। অর্থাত্, একজন ব্যক্তি তার সঙ্গীর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। অতএব, মুসলমানদের জন্য সর্বদা ধার্মিকদের সাথে থাকা গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা নিঃসন্দেহে তাদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, অর্থাৎ, তারা তাদেরকে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে আল্লাহর আনুগত্য করতে অনুপ্রাণিত করবে। অন্যদিকে, খারাপ সঙ্গী হয় একজনকে আল্লাহ, মহানের অবাধ্য হতে উদ্‌বুদ্ধ করবে, অথবা তারা একজন মুসলিমকে আখেরাতের জন্য কার্যত প্রস্তুতি নেওয়ার চেয়ে বস্তুগত জগতের দিকে মনোনিবেশ করতে উৎসাহিত করবে। অর্থাত্, তারা তাদেরকে আল্লাহ, মহানকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে বাধা দেবে। এই

মনোভাব তাদের জন্য উভয় জগতেই এক বিরাট অনুশোচনা হয়ে দাঁড়াবে, এমনকি যদি তারা যে জিনিসগুলির জন্য প্রচেষ্টা করে তা বৈধ হয় কিন্তু তাদের চাহিদার বাইরেও হয়, কারণ প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে নিরর্থক বা পাপপূর্ণ উপায়ে ব্যবহার করা হল মহান আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার মূল কারণ। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন] এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।"

পরিশেষে, যেহেতু একজন ব্যক্তি পরকালে তাদের সাথেই থাকবে যাদেরকে সে ভালোবাসে, তাই সহিহ বুখারী, ৩৬৮৮ নম্বরে পাওয়া হাদিস অনুসারে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের সাথে থাকার এবং তাদের জীবনধারা ও আচরণ গ্রহণ করার মাধ্যমে সৎকর্মশীলদের প্রতি তার ভালোবাসা প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু যদি তারা খারাপ বা গাফিল লোকদের সাথে থাকে তবে এটি তাদের প্রতি এবং আখেরাতে তাদের চূড়ান্ত সাহচর্যের প্রমাণ এবং ইঙ্গিত দেয়। সুনান আবু দাউদের ৪০৩১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে। ৪৩ আয যুখরুফ, আয়াত ৬৭:

"সেদিন ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হবে, কেবল সৎকর্মশীলরা ছাড়া।"

সব কথা, কোনও পদক্ষেপ নেই

যখন মহানবী (সাঃ) উহুদের শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য মদীনা ত্যাগ করেন, তখন প্রথমে মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই তার লোকদের সাথে যুদ্ধে অংশ নিতে সম্মত হন। তারা উহুদের কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথে আবদুল্লাহ বিন উবাই তার ৩০০ সৈন্য নিয়ে পিছু হটে যান এবং মুসলিম সেনাবাহিনী ৩০০০ অমুসলিম বাহিনীর সামনে ৭০০ সৈন্য নিয়ে অবশিষ্ট থাকে। তিনি এই সত্যটিকে ব্যবহার করেন যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনার অভ্যন্তরে যুদ্ধ করার পরামর্শ অনুসরণ করেননি এবং তার বন্ধুদের সাথে পিছু হটেন। একজন মুসলিম হিসেবে দাবি করা ব্যক্তির জন্য এটি একটি খারাপ অজুহাত, যিনি সর্বদা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর আনুগত্য করতে চান। তাছাড়া, যদি তিনি পরিকল্পনার বিরোধিতা করতেন তবে তিনি মদীনায় থাকতে পারতেন কিন্তু পরিবর্তে তিনি উহুদ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর সাথে যেতে বেছে নিয়েছিলেন এবং শত্রুরা তাদের লক্ষ্য করতে পারতেন, তবুও তিনি মুসলিমদের সংকল্পকে দুর্বল করার এবং অমুসলিম সেনাবাহিনীর সংকল্পকে শক্তিশালী করার জন্য মুসলিম সেনাবাহিনীকে ত্যাগ করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬-১৭ এবং ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ২৫০-২৫১ -এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ভণ্ডামির একটি দিক হলো যখন কেউ মৌখিকভাবে অন্যদের এবং তাদের ভালো প্রকল্পের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে, যেমন মসজিদ নির্মাণ, কিন্তু যখন সম্পদ দান করার মতো প্রকল্পে অংশ নেওয়ার সময় আসে, তখন মনে হয় যেন তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। একইভাবে, যখন মানুষ সুখের সময় পার করে, তখন তারা মৌখিকভাবে তাদের প্রতি তাদের আনুগত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু যখন মানুষ সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন এই ভণ্ডামিরা কোনও মানসিক বা শারীরিক সমর্থন দেয় না। বরং তারা তাদের সমালোচনা করে। মহানবী (সা.)-এর সময়ে মুনাফিকদের মনোভাব ছিল এটাই। সূরা ৪ আন-নিসা, আয়াত ৬২:

"তাহলে কেমন হবে যখন তাদের উপর তাদের কৃতকর্মের কারণে কোন বিপদ আসে এবং তারা তোমার কাছে আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, "আমরা কেবল সদাচরণ এবং আশ্রয়দানের ইচ্ছা করেছিলাম।"

অতএব, মুসলমানদের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে তারা তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে সমর্থন করে আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের অধিকার পূরণ করে। যে ব্যক্তি এটি করতে ব্যর্থ হবে সে দেখতে পাবে যে তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণা আল্লাহর দৃষ্টিতে খুবই কম। কারণ ঈমান হলো এমন একটি উদ্ভিদের মতো যাকে বৃদ্ধি পেতে হলে আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ যা সূর্যালোকের মতো পুষ্টি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, তা বৃদ্ধি পেতে ব্যর্থ হয় এবং এমনকি মারাও যেতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে না এবং মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। অধ্যায় ৬১ আস সাফ, আয়াত ২-৩:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য বিষয় হলো, তোমরা যা বলো না, তা বলো।"

নিশ্চিত বিশ্বাস

যখন মহানবী (সাঃ) উহুদের যুদ্ধে শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য মদীনা ত্যাগ করেন, তখন আবদুল্লাহ বিন উবাই তার ৩০০ সৈন্য নিয়ে মুসলিমদের সংকল্পকে দুর্বল করার লক্ষ্যে পিছু হটে যান। তার পরিকল্পনা প্রায় কার্যকর হয়ে ওঠে কারণ কয়েকজন সাহাবীর সংকল্প দুর্বল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু আল্লাহর প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস শয়তানের কুমন্ত্রণাকে জয় করে এবং তারা অটল থাকে। এই সংকটময় মুহূর্তের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা ৩য় সূরা আলে ইমরানের ১২২ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"যখন তোমাদের মধ্যে দুটি দল সাহস হারাতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাদের বন্ধু ছিলেন; এবং মুমিনদের আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত।"

ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার" বইয়ের ২৫০-২৫১ পৃষ্ঠায় এটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তাদের ঈমানের শক্তি তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত রেখেছিল, তাই, মুসলমানদের অবশ্যই ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জনের জন্য ইসলামী জ্ঞান শেখার এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারাও সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অবিচল থাকে।

সকল মুসলমানের ইসলামে বিশ্বাস আছে কিন্তু তাদের বিশ্বাসের শক্তি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তার পরিবারের কথামতো ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে এবং যে ব্যক্তি প্রমাণের মাধ্যমে বিশ্বাস করে, সে একইভাবে বিশ্বাস করে না। যে ব্যক্তি কোন কিছু সম্পর্কে শুনেছে, সে সেইভাবে বিশ্বাস করবে না যে ব্যক্তি নিজের চোখে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, ২২৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে প্রমাণিত হয়েছে যে, দরকারী জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য। এর একটি কারণ হল, এটিই একজন মুসলিমের ইসলামের প্রতি তাদের ঈমানকে শক্তিশালী করার সর্বোত্তম উপায়। এটি অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ঈমানের দৃঢ়তা যত শক্তিশালী হবে, বিশেষ করে যখন তারা সমস্যার মুখোমুখি হবে তখন সঠিক পথে অবিচল থাকার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। এছাড়াও, সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৮৪৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে ঈমানের দৃঢ়তা থাকাকে সর্বোত্তম জিনিসগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জ্ঞান পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিস অধ্যয়ন করে, নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে অর্জন করা উচিত।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে কেবল সত্য ঘোষণা করেননি বরং উদাহরণের মাধ্যমে এর পক্ষে প্রমাণও প্রদান করেছেন। কেবল অতীতের জাতিগুলিতে পাওয়া উদাহরণই নয় বরং এমন উদাহরণও রয়েছে যা মানুষের নিজের জীবনেও স্থান পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে, কখনও কখনও মানুষ এমন কিছু ভালোবাসে, যদিও তা পেলে তা তাদের জন্য কষ্টের কারণ হতে পারে। একইভাবে, তারা এমন কিছু ঘৃণা করতে পারে যেখানে তাদের জন্য অনেক ভালো লুকানো থাকে। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

ইতিহাসে এই সত্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেমন হুদাইবার চুক্তি। কিছু মুসলিম বিশ্বাস করতেন যে মক্কার অমুসলিমদের সাথে করা এই চুক্তিটি সম্পূর্ণরূপে পরবর্তী গোষ্ঠীর পক্ষে হবে। তবুও, ইতিহাস স্পষ্টভাবে দেখায় যে এটি ইসলাম এবং মুসলমানদের পক্ষে ছিল। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত হাদিসগুলিতে এই ঘটনাটি আলোচনা করা হয়েছে, সংখ্যা 2731 এবং 2732।

যদি কেউ নিজের জীবনের দিকে চিন্তা করে, তাহলে সে এমন অনেক উদাহরণ পাবে যেখানে সে বিশ্বাস করেছিল যে কিছু ভালো, যদিও তা আসলে তার জন্য খারাপ, এবং এর বিপরীত। এই উদাহরণগুলি এই আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে এবং একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।

আরেকটি উদাহরণ ৭৯ অধ্যায় আন নাজিয়াত, ৪৬ নং আয়াতে পাওয়া যায়:

"যেদিন তারা তা (বিচার দিবস) দেখবে, সেদিন এমন হবে যেন তারা (দুনিয়ায়) কেবল এক বিকেল অথবা এক সকাল অবস্থান করেনি।"

ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখলে স্পষ্ট দেখা যাবে কিভাবে মহান সাম্রাজ্য এসেছিল এবং চলে গেছে। কিন্তু যখন তারা চলে গেল তখন তারা এমনভাবে চলে গেল যেন তারা কেবল এক মুহূর্তের জন্য পৃথিবীতে ছিল। তাদের কয়েকটি চিহ্ন ছাড়া বাকি সবই অদৃশ্য হয়ে গেছে যেন তারা প্রথম স্থানে পৃথিবীতে কখনও উপস্থিত ছিল না। একইভাবে, যখন কেউ তাদের নিজের জীবনের দিকে চিন্তা করে তখন তারা বুঝতে পারবে যে তারা যতই বৃদ্ধ হোক না কেন এবং সামগ্রিকভাবে যতই ধীর মনে হোক না কেন, তাদের জীবন এক মুহূর্তের মধ্যে কেটে গেছে। এই আয়াতের সত্যতা বোঝা একজনের বিশ্বাসের দৃঢ়তাকে শক্তিশালী করে এবং এটি তাদের সময় শেষ হওয়ার আগে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে অনুপ্রাণিত করে।

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদিসে এ ধরণের উদাহরণ প্রচুর। অতএব, এই ঐশ্বরিক শিক্ষাগুলি শেখা এবং সেগুলি অনুসরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত যাতে তারা ঈমানের দৃঢ়তা গ্রহণ করতে পারে। যে ব্যক্তি এটি অর্জন করবে সে কোনও অসুবিধার মুখোমুখি হবে না এবং জান্নাতের দরজার দিকে নিয়ে যাওয়ার পথে অবিচল থাকবে। সূরা ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদেরকে দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

বিশ্বাসের উপর দৃঢ় থাকা

যখন মহানবী (সাঃ) উহুদের যুদ্ধে শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য মদীনা ত্যাগ করেন, তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাই তার ৩০০ সৈন্য নিয়ে মুসলিমদের সংকল্পকে দুর্বল করার লক্ষ্যে পিছু হটে যান। আব্দুল্লাহ বিন হারাম, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট, মুনাফিকদেরকে অন্তত মদীনা রক্ষা করার জন্য আহ্বান জানান, যদিও তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করতে আগ্রহী নাও হন। কিন্তু এতে কাপুরুষদের উপর কোন প্রভাব পড়েনি, যারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। এরপর তিনি তাদের সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবী (সাঃ) এর জন্য যথেষ্ট হবেন এবং সেনাবাহিনীর মুনাফিকদের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। এই মুহূর্ত সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা আলে ইমরানের ১৬৭ নং আয়াত নাজিল করেন:

"এবং যাতে তিনি মুনাফিকদের স্পষ্ট করে দেন। কারণ তাদের বলা হয়েছিল, "এসো, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো অথবা [অন্তত] প্রতিরক্ষা করো।" তারা বলল, "যদি আমরা জানতাম যে যুদ্ধ হবে, তাহলে আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম।" তারা সেদিন ঈমানের চেয়ে কুফরের বেশি কাছাকাছি ছিল, তারা মুখে যা বলে তা তাদের অন্তরে ছিল না। আর তারা যা গোপন করে তা আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।"

ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার" বইয়ের ২৫০-২৫২ পৃষ্ঠায় এটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, আবদুল্লাহ বিন হারামের মতো, মুসলমানদেরও অন্যদের কাছ থেকে কোন সমর্থন না থাকলেও, মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে। যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, সে আল্লাহর সমর্থন পাবে। এই সমর্থন নিশ্চিত করবে যে, তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করবে, এমনকি যদি তারা অন্য কারো কাছ থেকে সমর্থন পায় বা সমর্থন পায়। ৬৫ তালাকের আয়াত ২:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই সাফল্য মানুষের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুসারে নয়, বরং মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে ঘটে। অতএব, এটি সর্বোত্তম সময়ে এবং সর্বোত্তম উপায়ে ঘটে, যদিও এটি মানুষের কাছে স্পষ্ট নয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অধিকন্তু, আলোচ্য মূল ঘটনাটি ইঙ্গিত দেয় যে মুসলমানদের অবশ্যই এমন মুনাফিকের মনোভাব গ্রহণ করা এড়িয়ে চলতে হবে যারা কঠিন সময়ের মুখোমুখি হলে মহান আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করে। সূরা ২২ আল হজ্জ, আয়াত ১১:

"আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে আল্লাহর ইবাদত করে এক প্রান্তে। যদি তাকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে, তবে সে তাতে আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে কোন পরীক্ষায় পতিত করে, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় । সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই হারিয়ে ফেলেছে। এটাই স্পষ্ট ক্ষতি।"

একজন মুসলিমকে যেভাবে পরীক্ষা করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো অসুবিধার মুখোমুখি হওয়া, যাতে বোঝা যায় যে তারা আসলেই মহান আল্লাহকে মেনে চলে কিনা। সুখের সময় মহান আল্লাহ এবং ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা কঠিন নয়। আসল পরীক্ষা হলো যখন কেউ সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তবুও মহান আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকে। ২৯ সূরা আল আনকাবুত, আয়াত ২-৩:

"মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না? কিন্তু আমরা অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি, আর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা মিথ্যাবাদী।"

অধিকন্তু, একজন মুসলিমের এই বিশ্বাস করে সরল মনোভাব গ্রহণ করা উচিত নয় যে তাদের এই পৃথিবীতে পরীক্ষা করা হবে না। এই পৃথিবীতে জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল পরীক্ষা করা। অধ্যায় 67 আল মুলক, আয়াত 2:

"যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম..."

অতএব, একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে সমর্থন করতে হবে, স্বাচ্ছন্দ্যের সময় , কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে এবং কঠিন সময়ে, ধৈর্য প্রদর্শনের মাধ্যমে। নিয়তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ কেবল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা। কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা। এবং কাজের মধ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে খুশি করার জন্য যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা। অধিকন্তু , ধৈর্য ধারণের অর্থ হল নিজের কথা বা কাজে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের উপর দৃঢ় থাকা, বিশ্বাস করা যে তিনি কেবল তার জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক পথে কাজ করে, সে মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থন এবং করুণা লাভ করবে, যা উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উহুদে একটি অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতা

উহুদের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিম্নলিখিত ভাষণ দিয়েছিলেন:

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "হে মানুষ! মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে আমাকে যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, আমি তোমাদের তা করতে আদেশ করছি। তাঁর আনুগত্যে কাজ করো এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাঁর আনুগত্য করেন এবং শয়তান তাদের সাথে আছেন যারা আল্লাহর অবাধ্য হন। আজ তোমরা পুরস্কার এবং সঞ্চয়ের জায়গায় আছো, অন্তত তোমাদের মধ্যে যারা তাদের দায়িত্ব জানে এবং তারপর ধৈর্য, বিশ্বাসের দৃঢ়তা, গম্ভীরতা এবং সক্রিয়তার উপর তা পালনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে। তাই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্য ধৈর্য ধরে তোমাদের কাজ শুরু করো এবং তা করার সময়, আল্লাহ তোমাদের যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অনুসন্ধান করো। আমি তোমাদের যা করার আদেশ দিয়েছি তা তোমাদের অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে, কারণ আমি আন্তরিকভাবে চাই তোমরা যা সঠিক তা করো। প্রকৃতপক্ষে, বিবাদ, মতবিরোধ এবং হৃদয় হারানো অক্ষম এবং দুর্বল হওয়ার অর্থের অংশ, যা আল্লাহ পছন্দ করেন না এবং যার জন্য আল্লাহ কোন সাহায্য বা বিজয় দেন না।"

এটি ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "দ্য নোবেল লাইফ অফ দ্য প্রফেট (সাঃ)", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১১৩-১১১৪-এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এই ভাষণের প্রথম অংশটি উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। সকল মুসলমানের জন্য, বিশেষ করে পিতামাতার জন্য, তারা অন্যদের যা উপদেশ দেয় তা মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের পাতা উল্টালে স্পষ্ট হয় যে যারা তাদের প্রচারিত উপদেশ অনুসারে কাজ করেছিলেন, তাদের প্রভাব অন্যদের উপর তাদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল যারা উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেননি। এর সর্বোত্তম উদাহরণ হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যিনি কেবল তাঁর প্রচারিত উপদেশই পালন করেননি বরং সেই শিক্ষাগুলি অন্যদের তুলনায় আরও কঠোরভাবে মেনে চলেন। শুধুমাত্র এই মনোভাবের মাধ্যমেই মুসলিমরা, বিশেষ করে পিতামাতারা অন্যদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মা তার সন্তানদের মিথ্যা না বলার জন্য সতর্ক করে দেন কারণ এটি একটি পাপ কিন্তু প্রায়শই তাদের সামনে মিথ্যা বলে, তবে তার সন্তানরা তার উপদেশ অনুসারে কাজ করার সম্ভাবনা কম। একজন ব্যক্তির কর্ম সর্বদা তাদের কথার চেয়ে অন্যদের উপর বেশি প্রভাব ফেলবে। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে একজনকে নিখুঁত হতে হবে। এর অর্থ হল অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে তাদের নিজের উপদেশ অনুসারে কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা উচিত। পবিত্র কুরআন নিম্নলিখিত আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মহান আল্লাহ এই আচরণকে ঘৃণা করেন। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারীতে ৩২৬৭ নম্বর হাদিসে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ দেয় কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকে এবং মন্দকাজ থেকে নিষেধ করে এবং তারপর নিজে তা অনুসরণ করে, তাকে জাহান্নামে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। সূরা আস সাফ, আয়াত ৩:

"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য বিষয় হলো তোমরা এমন কথা বলো যা তোমরা করো না।"

তাই সকল মুসলমানের জন্য তাদের উপদেশ অনুসারে নিজে কাজ করার চেষ্টা করা এবং অন্যদেরও তা করার পরামর্শ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়া হল সমস্ত পবিত্র নবী (সাঃ) এর ঐতিহ্য এবং অন্যদের ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার সর্বোত্তম উপায়।

এরপর নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ভাষণে মুসলমানদেরকে আন্তরিকভাবে আল্লাহকে আনুগত্য করার এবং তাঁর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন যাতে তারা তাঁর সমর্থন লাভ করতে পারে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যেহেতু একমাত্র আল্লাহই সবকিছু জানেন, তাই তিনিই একমাত্র নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের অভাবের কারণে, সমস্ত মানবসৃষ্ট আচরণবিধি কখনই এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। একমাত্র আল্লাহই মানবজাতিকে তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শেখাতে পারেন যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে। অতএব, এটি উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অতএব, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত অনুগ্রহগুলো ব্যবহার করে মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য করার চেষ্টা করা উচিত, এমনকি যদি তা তাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়ও। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তিও ভালো থাকবেন। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝেন না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন, তবুও মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব

উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

তাঁর ভাষণে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মুসলমানদের এই পৃথিবীতে তাদের দায়িত্বগুলি বুঝতে এবং তা পালনের জন্য প্রচেষ্টা করার পরামর্শও দিয়েছিলেন। এটা সাধারণ জ্ঞান যে একজন ব্যক্তিকে চাকরি গ্রহণ করার আগে প্রথমে তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যগুলি বুঝতে হবে। যে ব্যক্তি তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যগুলি না বুঝে চাকরি গ্রহণ করে তাকে পাগল বলে গণ্য করা হবে। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম ইসলামকে তাদের জীবনধারা হিসেবে গ্রহণ করে কিন্তু ইসলামের সাথে সম্পর্কিত দায়িত্ব এবং কর্তব্যগুলি বুঝতে ব্যর্থ হয়, কারণ তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য শিখতে এবং তার উপর আমল করতে ব্যর্থ হয়। এই মনোভাব তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে বাধা দেয়, এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় রাখে এবং আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মানুষের অধিকার পূরণ করতে বাধা দেয়। অতএব, এই মনোভাব তাদের উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেয়। অতএব, একজন মুসলিমকে যদি উভয় জগতে মানসিক শান্তি অর্জন করতে চায় তবে তাদের ইসলামী এবং পার্থিব দায়িত্ব এবং কর্তব্যগুলি শেখার এবং পালন করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

তাঁর ভাষণে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করার সময় ধৈর্য অবলম্বন করার গুরুত্ব সম্পর্কেও পরামর্শ দিয়েছিলেন। ধৈর্য হলো যখন কেউ তাদের কাজ বা কথার মাধ্যমে কঠিন সময়ে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। এই আনুগত্যের মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ঈমানের দৃঢ়তা অর্জনের মাধ্যমে ধৈর্য সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা সম্ভব। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে প্রাপ্ত স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণগুলি শিখে এবং তার উপর আমল করলে দৃঢ় ঈমান অর্জিত হয়, যেখানে আলোচনা করা হয়েছে যে যারা আল্লাহ, মহানের আনুগত্যের উপর ধৈর্য ধারণ করে, তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করে। যখন কেউ দৃঢ় ঈমান অর্জন করে, তখন তারা আল্লাহর আনুগত্যের উপর ধৈর্য ধারণ করে, কারণ তারা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, যারা তাঁর আনুগত্য করে তাদের সাহায্য করার জন্য মহান আল্লাহর ঐতিহ্য

সর্বদাই ঘটবে, এমনকি যদি তাকে তাঁর বাধ্য বান্দাকে সাহায্য করার জন্য আকাশ ও পৃথিবী স্থানান্তর করতে হয়। ৬৫তম অধ্যায় তালাকের ২য় আয়াতে:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

কিন্তু দৃঢ় ঈমান একজনকে এটাও বুঝতে সাহায্য করে যে, যারা ধৈর্য ধরে তাঁর আনুগত্য করে, তাদের জন্য মহান আল্লাহর সাহায্য আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে হয়, মানুষের ইচ্ছা বা পরিকল্পনা অনুসারে নয়। অতএব, ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে এমনভাবে সাহায্য করা হবে যা তাদের জন্য সর্বোত্তম এবং তাদের জন্য সর্বোত্তম সময়ে, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করতে চায়, তার উচিত ইসলামী শিক্ষা শিখে এবং তার উপর আমল করে ঈমানের দৃঢ়তা অবলম্বন করার চেষ্টা করা।

তাঁর ভাষণে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর আনুগত্যের গুরুত্ব সম্পর্কেও পরামর্শ দিয়েছিলেন। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর আনুগত্য করা প্রতিটি মুসলমানের উপর একটি বাধ্যতামূলক কর্তব্য। সূরা ৪ আন নিসা, আয়াত ৮০:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

এবং ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, ৩১ আয়াত:

"বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এবং ৫৯তম অধ্যায় আল হাশর, ৭ম আয়াত:

"...আর রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো; আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো..."

এবং অধ্যায় ৩৩ আল আহযাব, আয়াত ২১:

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে একটি চমৎকার আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"

কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আনুগত্য করা তখনই সম্ভব যখন কেউ তাঁর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তার উপর আমল করে। দুঃখের বিষয় হল, অনেক মুসলিম যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে বিশ্বাস করে, ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা করে বলে দাবি করে, তারা সক্রিয়ভাবে তাঁর জীবন বা শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করে না বা তার উপর আমল করে না। তাদের কর্মকাণ্ড স্পষ্টতই তাঁকে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা করার তাদের মৌখিক ঘোষণার বিরোধিতা করে। কীভাবে কেউ এমন কাউকে আনুগত্য করতে পারে, ভালোবাসে এবং সম্মান করতে পারে যাকে তারা চেনে না? অতএব, প্রতিটি মুসলমানের জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তার উপর আমল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে।

তাঁর ভাষণে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের গুরুত্ব সম্পর্কেও পরামর্শ দিয়েছিলেন। ঐক্য তখনই অর্জিত হয় যখন মুসলমানরা সর্বদা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য গ্রহণ করে এবং অনুসরণ করে। যখন একদল লোক একটি একক আচরণবিধি অনুসরণ করে, তখন তারা ঐক্য অর্জন করবে। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির একটি প্রধান কারণ হল, তারা বিভিন্ন উপদলের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছে যারা বিভিন্ন আচরণবিধি অনুসরণ করে। মুসলিমদের অবশ্যই অন্যান্য সমস্ত আচরণবিধি পরিত্যাগ করতে হবে এবং পরিবর্তে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর

ঐতিহ্যের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, যদি তারা ধার্মিক পূর্বসূরীদের শক্তি অর্জন করতে চায়।

পরিশেষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ভাষণে মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করার সময় সাহস না হারানোর গুরুত্ব সম্পর্কেও পরামর্শ দিয়েছিলেন। ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে দৃঢ় ঈমান অর্জন করলে এটি এড়ানো সম্ভব। যার দৃঢ় ঈমান আছে সে স্বীকার করবে যে এই পৃথিবী হলো পরীক্ষার স্থান, যাতে আল্লাহকে যারা মানেন না তাদের থেকে আলাদা করা যায়। সূরা আল আনকাবুত, আয়াত ২-৩:

"মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না? কিন্তু আমরা অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি, আর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা মিথ্যাবাদী।"

অতএব, এমন সরল মনোভাব গ্রহণ করা এড়িয়ে চলা উচিত যেখানে তারা বিশ্বাস করে যে তাদের কোন অসুবিধা হবে না। এই সরল মনোভাব তাদের সমস্যার সম্মুখীন হলে সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং ফলস্বরূপ তারা অধৈর্য হয়ে পড়বে। এই পৃথিবীতে জীবনের উদ্দেশ্য হল মানুষ আল্লাহর আনুগত্য করে কিনা তা পরীক্ষা করা, এই কথা মেনে নেওয়া একজনকে এমন পরীক্ষা এবং অসুবিধার সম্মুখীন হলে অবিচল থাকতে সাহায্য করবে যা তাদের নিরুৎসাহিত করে।

কাপুরুষতা এড়িয়ে চলা

উহুদের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি তরবারি উঁচিয়ে তাঁর সৈন্যদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কেউ কি এটি তার কাছ থেকে কেড়ে নেবে এবং এর অধিকার পূরণ করবে? তাদের অনেকেই এটি গ্রহণের জন্য হাত তুলেছিলেন কিন্তু আবু দুজানা সাম্মাক বিন খারশা (রাঃ) প্রশ্ন করেছিলেন যে তরবারির অধিকার কী। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে বলেছিলেন যে এটি দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রয়োজন যতক্ষণ না এটি ক্ষতিগ্রস্ত এবং ভেঙে যায়। আবু দুজানা (রাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি এটি গ্রহণ করবেন এবং এর অধিকার পূরণ করবেন এবং এভাবেই এটি তাকে দেওয়া হয়েছিল। এরপর তিনি তার লাল মাথার বন্ধনী পরলেন, যা মৃত্যুর বন্ধনী নামে পরিচিত ছিল। যখনই তিনি মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করতেন, তখন তিনি এই লাল মাথার বন্ধনী পরতেন। এরপর তিনি অমুসলিম সৈন্যদের উত্তেজিত করার জন্য মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার চলাফেরা লক্ষ্য করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে এটি এমন একটি হাঁটার ধরণ যা আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন, যুদ্ধের মতো পরিস্থিতিতে ছাড়া। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার" বইয়ের ২৫৪-২৫৫ পৃষ্ঠায় এটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যুদ্ধের সময়, আবু দুজানা, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, অনেক অমুসলিমকে হত্যা করেছিলেন। তিনি একজন অমুসলিমের দিকে ছুটে যান যিনি অমুসলিম সেনাবাহিনীকে মুসলিমদের হত্যা করার জন্য উস্কে দিচ্ছিলেন। যখন আবু দুজানা, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাকে দেওয়া তরবারি দিয়ে এই ব্যক্তিকে হত্যা করতে যাচ্ছিলেন, তখন ব্যক্তিটি চিৎকার করে উঠলেন এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে ব্যক্তিটি একজন মহিলা, হিন্দ বিনতে উতবা। তিনি তার হাত ধরে রেখেছিলেন এবং তার কোনও ক্ষতি করেননি কারণ তিনি একজন মহিলাকে হত্যা করে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর তরবারির অসম্মান করতে চাননি। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ২৬০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদের ২৫১১ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী (সা.) কাপুরুষোচিত আচরণের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। এই মনোভাব মহান আল্লাহর উপর এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে, যেমন নিশ্চিত রিযিকের উপর আস্থা রাখতে বাধা দেয়। এটি সন্দেহজনক এবং অবৈধ উপায়ে রিযিক খোঁজার কারণ হতে পারে, যা উভয় জাহানে একজন ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দেবে। আল্লাহ, মহান, এমন কোনও কাজ গ্রহণ করেন না যার ভিত্তি হারাম। সহিহ মুসলিমের ২৩৪২ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ঠিক যেমন ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি হল নিয়ত, তেমনি ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল অর্জন এবং ব্যবহার করা।

অধিকন্তু, কাপুরুষ হওয়া শয়তান এবং তার ভেতরের শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করা থেকে বিরত রাখে যার জন্য প্রকৃত সংগ্রাম প্রয়োজন। এর ফলে একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করতে ব্যর্থ হবে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এবং তাই এটি মানুষের অধিকার পূরণে বাধা দেবে। পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্যের জন্য প্রচেষ্টা এবং সময় প্রয়োজন। একজন কাপুরুষ এই সংগ্রাম করতে খুব ভয় পাবে এবং পরিবর্তে অলস হবে যা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে।

অধিকন্তু, একজন কাপুরুষ সহজেই দাবি করবে যে তারা মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে, যদিও তারা খুব কমই চেষ্টা করছে। তারা এই দাবি করে, যদিও পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে যে, যদি কেউ তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে, তাহলে সে আল্লাহ তায়ালা এবং মানুষের অধিকার সঠিকভাবে পূরণ করবে। এর কারণ হল, আল্লাহ

তায়ালা কখনও এমন কর্তব্য কাউকে দেন না যা তাদের পালনের ক্ষমতার বাইরে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮৬।

"আল্লাহ কোন আত্মার উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন বোঝা চাপান না..."

কাপুরুষতা ধর্মীয় এবং পার্থিব উভয় ক্ষেত্রেই ন্যূনতম লক্ষ্য অর্জনে উৎসাহিত করবে। তারা তাদের সম্ভাবনা পূরণ করা থেকে বিরত থাকবে, কারণ এর জন্য প্রকৃত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এই মনোভাব উভয় জগতেই কেবল চাপ এবং অনুশোচনার দিকে পরিচালিত করবে।

রক্তের চেয়েও শক্তিশালী

উহুদের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে, অমুসলিম নেতা আবু সুফিয়ান মদীনার সাহাবীদের কাছে একটি বার্তা পাঠান, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, তাদেরকে সরে যেতে এবং যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করার আহ্বান জানান কারণ অমুসলিমরা কেবল মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং মক্কার সাহাবীদের (সাঃ) বিরুদ্ধে লড়াই করতে চেয়েছিল। তিনি পরিস্থিতিকে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের পরিবর্তে ভ্রাতৃত্ব এবং গোত্রের মধ্যে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। মদীনার সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীদের (সাঃ) প্রতি তাদের আনুগত্য গোত্রীয় এবং রক্তের সম্পর্কের চেয়ে অনেক গভীর এবং শক্তিশালী ছিল।

এছাড়াও, ইসলামের আগমনের পূর্বে মদীনার জনগণের একজন বিশিষ্ট নেতা আবু আমির আল ফাসিকও অমুসলিমদের পক্ষে ছিলেন। মহানবী (সা.) মদিনায় হিজরত করার পর তিনি তার মর্যাদা হারান এবং তার হিংসার কারণে তিনি মক্কায় পালিয়ে যান এবং অমুসলিমদের ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করেন। উহুদের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে, তিনি সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, ডাকেন, আশা করেন যে তিনি তাদের তার সাথে যোগ দিতে রাজি করাতে পারবেন, কিন্তু তারা তাকে প্রতিদানে অপমান করে। ইমাম সাফি উর রহমানের, দ্য সিলড নেকটার, পৃষ্ঠা ২৫৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাগুলি ইঙ্গিত দেয় যে ঈমানের বন্ধনকে অন্যান্য সকল সম্পর্কের উপরে স্থান দেওয়ার গুরুত্ব কত। সময়ের সাথে সাথে মানুষ প্রায়শই বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একে অপরের সাথে তাদের এককালের দৃঢ় সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে। এর অনেক কারণ রয়েছে তবে একটি প্রধান কারণ হল তাদের পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা তাদের সম্পর্ক যে ভিত্তির উপর তৈরি হয়েছিল। এটি

সর্বজনবিদিত যে যখন একটি ভবনের ভিত্তি দুর্বল হয় তখন সময়ের সাথে সাথে ভবনটি হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমনকি ভেঙে পড়ে। একইভাবে, যখন মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ভিত্তি সঠিক না হয় তখন তাদের মধ্যে বন্ধন অবশেষে দুর্বল হয়ে পড়ে এমনকি ভেঙে যায়। যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাহাবীদের (রাঃ) একত্রিত করেছিলেন, তখন তিনি তাদের মধ্যে বন্ধন তৈরি করেছিলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। যদিও, আজকের বেশিরভাগ মুসলিম গোত্রপ্রথা, ভ্রাতৃত্ব এবং অন্যান্য পরিবারের কাছে প্রদর্শনের জন্য। যদিও, বেশিরভাগ সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, আত্মীয় ছিলেন না কিন্তু যেহেতু তাদের সংযোগ স্থাপনের ভিত্তি সঠিক ছিল, অর্থাৎ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাদের বন্ধন আরও শক্তিশালী হতে থাকে। যদিও আজকাল অনেক মুসলিম রক্তের সম্পর্কযুক্ত, তবুও সময়ের সাথে সাথে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে কারণ তাদের বন্ধনের ভিত্তি ছিল মিথ্যা, যেমন গোত্রবাদ এবং অনুরূপ জিনিসের উপর ভিত্তি করে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, যদি তারা তাদের বন্ধন টিকে থাকতে এবং আত্মীয়তার বন্ধন এবং অ-আত্মীয়দের অধিকার রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য সওয়াব অর্জন করতে চায়, তাহলে তাদের কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই বন্ধন তৈরি করতে হবে। এর ভিত্তি হল, মানুষ কেবল একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করবে এবং এমনভাবে কাজ করবে যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে। পবিত্র কুরআনে এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৫ম সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ২:

"...এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

পরকাল বিশ্বজুড়ে

যখন উহুদের যুদ্ধ শুরু হয়, তখন সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, দ্রুত অমুসলিম সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন যার ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হন। কিন্তু মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, উহুদ পাহাড়ের সামনে অবস্থিত জাবাল আল রুমাহ নামক একটি ছোট পাহাড়ে অবস্থান করার নির্দেশ দেন, তারা বিশ্বাস করেন যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং আদেশ আর প্রযোজ্য নয়। যখন তারা যুদ্ধের গনীমত সংগ্রহের জন্য জাবাল আল রুমাহতে নেমে আসেন, তখন মুসলিম সেনাবাহিনীর পশ্চাদভাগ উন্মোচিত হয়ে যায়। অমুসলিম সেনাবাহিনী তখন একত্রিত হয় এবং উভয় পক্ষ থেকে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে। এর ফলে অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, শহীদ হন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯-৩০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, কোন পাপ করেননি কারণ তারা বিশ্বাস করতেন যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে আদেশটি আর প্রযোজ্য হবে না, তবুও যুদ্ধের গনীমত সংগ্রহ করার, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করার তাদের সৎ ও ধার্মিক ইচ্ছা সমস্যার দিকে পরিচালিত করেছিল। যেখানেই তারা ছিলেন সেখানেই অবস্থান করা সরাসরি পরকালের সাথে সম্পর্কিত ছিল, অন্যদিকে, যুদ্ধের গনীমত সংগ্রহ করে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করা, বস্তুগত জগতের মাধ্যমে পরকালের সাথে সম্পর্কিত ছিল। এই ক্ষেত্রে, পরকালের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত কাজটিই উত্তম ছিল।

পরকালের উপর পার্থিব জিনিসকে প্রাধান্য দেওয়া এড়াতে হলে এই বস্তুগত জগৎ এবং পরকাল সম্পর্কে সঠিক ধারণা গ্রহণ করতে হবে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪১০৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, আখেরাতের তুলনায় বস্তুগত জগৎ সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতো।

বাস্তবে, এই দৃষ্টান্তটি মানুষকে বোঝানোর জন্য দেওয়া হয়েছিল যে পরকালের তুলনায় বস্তুজগৎ কতটা ছোট। কিন্তু বাস্তবে তাদের তুলনা করা যায় না কারণ বস্তুজগৎ ক্ষণস্থায়ী আর পরকাল চিরস্থায়ী। অর্থাৎ, সীমিতকে অসীমের সাথে তুলনা করা যায় না। বস্তুজগৎকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং ব্যক্তির সামাজিক জীবন, যেমন তার পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব। এই গোষ্ঠীর মধ্যে যে পার্থিব আশীর্বাদই আসুক না কেন, তা সর্বদা অসম্পূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী হবে এবং মৃত্যু একজন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অন্যদিকে, পরকালের আশীর্বাদ স্থায়ী এবং নিখুঁত। তাই এই দিক থেকে বস্তুজগৎ একটি অসীম সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা ছাড়া আর কিছু নয়।

তাছাড়া, মৃত্যুর সময় অজানা বলে একজন ব্যক্তির এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবন লাভের নিশ্চয়তা নেই। অন্যদিকে, প্রত্যেকেরই মৃত্যু অনুভব করা এবং পরকালে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা রয়েছে। তাই অবসরের মতো এমন একটি দিনের জন্য প্রচেষ্টা করা বোকামি, যা তারা কখনও অর্জন করতে পারবে না, পরকালের জন্য প্রচেষ্টা করে, যা তারা অর্জনের নিশ্চয়তা দেয়।

এর অর্থ এই নয় যে, পৃথিবীকে ত্যাগ করা উচিত কারণ এটি একটি সেতু যা নিরাপদে পরকালে পৌঁছানোর জন্য অতিক্রম করতে হবে। বরং, একজন মুসলিমের উচিত এই বস্তুগত পৃথিবী থেকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ গ্রহণ

করা, অপচয়, বাড়াবাড়ি বা অপচয় ছাড়াই। এবং তারপর তাদের বাকি প্রচেষ্টা আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে চিরন্তন পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য উৎসর্গ করা।

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অসীম সমুদ্রের চেয়ে এক ফোঁটা জলকে প্রাধান্য দেবেন না এবং একজন বুদ্ধিমান মুসলিম চিরন্তন পরকালের চেয়ে পার্থিব বস্তুগত জগৎকে প্রাধান্য দেবেন না।

সর্বদা আন্তরিক

যখন উহুদের যুদ্ধ শুরু হয়, তখন সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, অমুসলিম সেনাবাহিনীকে দ্রুত পরাজিত করেন যার ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। যখন কিছু মুসলিম তীরন্দাজ তাদের অবস্থান ছেড়ে চলে যায়, তখন অমুসলিম সেনাবাহিনী একত্রিত হয় এবং উভয় দিক থেকে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে। মুসলিম সেনাবাহিনীর পিছনে অবস্থানরত মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) লক্ষ্য করেন যে অমুসলিমরা কীভাবে ঘুরে মুসলিম সেনাবাহিনীর পিছনে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, বুঝতে পারেননি কী ঘটেছে এবং তাই তারা অরক্ষিত ছিলেন। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) চুপ থাকতে পারতেন এবং তাঁর সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, হত্যা করতে দিতে পারতেন, কারণ অমুসলিমরা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সঠিক অবস্থান সম্পর্কে অবগত ছিল না। পরিবর্তে, তিনি চিৎকার করে তাঁর সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, সতর্ক করে দিয়েছিলেন, যার ফলে তাঁর অবস্থান অমুসলিমদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, যারা তাঁকে আক্রমণ করার জন্য একত্রিত হয়েছিল। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার" বইয়ের ২৬৩-২৬৪ পৃষ্ঠায় এটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, প্রতি অত্যন্ত আন্তরিকতা দেখিয়েছিলেন, যদিও তিনি নিজের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছিলেন।

সহীহ মুসলিমের ১৯৬ নম্বর হাদিসে নবী মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, ইসলাম হলো জনসাধারণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য মঙ্গল কামনা করা এবং নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা। এর মধ্যে রয়েছে অন্যদের ভালো কাজের পরামর্শ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে বিরত

রাখা, সর্বদা অন্যদের প্রতি করুণা ও সদয় হওয়া। সহীহ মুসলিমের ১৭০ নম্বর হাদিসে এর সারসংক্ষেপ পাওয়া যায়। এটি সতর্ক করে যে, কেউ যতক্ষণ না নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অন্যদের জন্য তাই পছন্দ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃত মুমিন হতে পারে না।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে সহীহ বুখারীর ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এই দায়িত্বকে ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠা এবং ফরজ দান করার পরেই রেখেছেন। এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব বোঝা যায় কারণ এটিকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্বের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ হলো, যখন তারা সুখী হয় তখন খুশি হওয়া এবং যখন তারা দুঃখিত হয় তখন দুঃখিত হওয়া, যতক্ষণ না তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। উচ্চ স্তরের আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্যদের জীবনকে উন্নত করার জন্য চরম সীমা অতিক্রম করা, এমনকি যদি এটি তাদের নিজেদেরকে অসুবিধার মধ্যে ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ অভাবীদের জন্য সম্পদ দান করার জন্য কিছু জিনিসপত্র ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। সর্বদা কল্যাণের জন্য মানুষকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের একটি বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় ১৭ আল ইসরা, আয়াত ৫৩:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়..."

মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি উপায় হল অন্যদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং তাদের পাপের বিরুদ্ধে গোপনে উপদেশ দেওয়া। যে ব্যক্তি এইভাবে কাজ করে, আল্লাহ তার পাপ ঢেকে রাখবেন। জামে আত তিরমিযী, ১৪২৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব অন্যদের ধর্মের দিকগুলি এবং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া এবং শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে তাদের পার্থিব এবং ধর্মীয় জীবন উভয়ই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যদের অপবাদ থেকে তাদের সমর্থন করে। অন্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ প্রাণীই এইরকম আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজ পরিবর্তন করতে না পারে, তবুও তারা তাদের জীবনের লোকদের, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, অন্যদের সাথে সেই আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় লোকেরা তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় ২৮ আল কাসাস, আয়াত ৭৭:

"... আর তুমিও ভালো কাজ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি ভালো করেছেন..."

সকল পরিস্থিতিতে ধন্য

যখন উহুদের যুদ্ধ শুরু হয়, তখন সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, দ্রুত অমুসলিম সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন যার ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। যখন কিছু মুসলিম তীরন্দাজ তাদের অবস্থান ছেড়ে চলে যায়, তখন অমুসলিম সেনাবাহিনী একত্রিত হয় এবং উভয় পক্ষ থেকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে। এর ফলে অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, শহীদ হন। মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হয়েছেন বলে কণ্ঠস্বর শোনা গেলে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা আরও বেড়ে যায়। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯-৩০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য ও অসুবিধা উভয় সময়েই আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই উভয় পরিস্থিতিই একজনকে তাঁর আনুগত্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে। এর ফলে তারা উভয় জগতেই সওয়াব এবং মানসিক শান্তি লাভ করতে পারবে না।

সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি পরিস্থিতিই একজন মুমিনের জন্য কল্যাণকর। একমাত্র শর্ত হলো, তাদের প্রতিটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে, মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, বিশেষ করে, অসুবিধার সময় ধৈর্য এবং সুখের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

জীবনের দুটি দিক আছে। একটি দিক হলো মানুষ যেসব পরিস্থিতিতে নিজেদের খুঁজে পায়, তা সে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা অসুবিধার সময়। একজন ব্যক্তি কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন তার নিয়ন্ত্রণ তার হাতের বাইরে। মহান আল্লাহ

তাআলা এটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং এ থেকে রেহাই পাওয়ার কোনও উপায় নেই। অতএব, যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হন তার উপর চাপ দেওয়া অর্থহীন কারণ সেগুলি ভাগ্যনির্ধারিত এবং তাই অনিবার্য। অন্য দিক হলো প্রতিটি পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া। এটি প্রতিটি ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং এটিই তাদের বিচার করা হয়, উদাহরণস্বরূপ, একটি কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য বা অধৈর্য প্রদর্শন। অতএব, একজন মুসলিমকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের আচরণ এবং প্রতিক্রিয়ার উপর মনোনিবেশ করতে হবে, কোনও পরিস্থিতিতে থাকার জন্য চাপ দেওয়ার পরিবর্তে, কারণ এটি অনিবার্য। যদি একজন মুসলিম উভয় জগতে সাফল্য পেতে চায় তবে তাদের প্রতিটি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা উচিত এবং সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যে কাজ করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাদের অবশ্যই ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত অনুগ্রহগুলি ব্যবহার করতে হবে, যা মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"আর [স্মরণ করো] যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের [নেয়ামত] বৃদ্ধি করব..."

এবং কঠিন সময়ে তাদের ধৈর্য ধরতে হবে কারণ তারা জানে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি তারা পছন্দের পিছনের প্রজ্ঞা বুঝতে নাও পারে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মূল হাদিসে প্রতিটি পরিস্থিতিতে সাফল্য মুমিনের জন্য নির্দেশিত হয়েছে, মুসলিমের জন্য নয়। এর কারণ হল একজন মুমিনের ঈমান শক্তিশালী থাকে যা ইসলামী জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে। তাদের দৃঢ় ঈমানের ফলে, তারা আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যকে আরও কঠোরভাবে মেনে চলে, যার মধ্যে রয়েছে অসুবিধার সময় ধৈর্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা। অন্যদিকে, মুসলিম হল এমন একজন ব্যক্তি যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন কিন্তু দুর্বল ঈমানের কারণে, যা ইসলামী জ্ঞানের অজ্ঞতার কারণে ঘটে, তারা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের সাথে সাড়া দিতে ব্যর্থ হতে পারে। অতএব, একজন ব্যক্তির জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা একজন মুমিনের মর্যাদায় পৌঁছাতে পারে এবং তাই সকল পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখতে পারে।

মিশন অব্যাহত রাখা

উহুদের যুদ্ধের সময় যখন কিছু মুসলিম তীরন্দাজ তাদের অবস্থান ত্যাগ করে, তখন অমুসলিম সেনাবাহিনী একত্রিত হয়ে উভয় পক্ষ থেকে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে। মহানবী (সাঃ) শহীদ হয়েছেন বলে দাবি করা কণ্ঠস্বর শোনা গেলে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা আরও বেড়ে যায়। এর ফলে কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, আশা হারিয়ে ফেলেন কারণ তাদের শক্তি এবং অনুপ্রেরণা শহীদ হয়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিন্তু একজন সাহাবী, আনাস বিন নাদর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, ঘোষণা করেন যে, মহানবী (সাঃ) শহীদ হলেও, আল্লাহ চিরঞ্জীব এবং তিনি মৃত্যুবরণ করতে পারবেন না। তাই তাদের উচিত মহানবী (সাঃ) যে বিষয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তার জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া। আনাস বিন নাদর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, শহীদ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যান। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯-৩১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

একইভাবে, আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) বিশ্বাস করতেন যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) ছাড়া বেঁচে থাকার কোন কারণ নেই, তাই তিনি তার তরবারির খাপ ভেঙে ফেলেন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে না দেখা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। তারা পিছু হটতে না পারা পর্যন্ত তিনি তাকে রক্ষা করতে থাকেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রঃ) এর আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৩-১৬৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনার সাথে সম্পর্কিত, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা আলে ইমরানের ১৪৪ নং আয়াত নাজিল করেছেন:

"মুহাম্মদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর পূর্বেও [অন্যান্য] রাসূল গত হয়েছেন। যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা তোমাদের পশ্চাদপদতায় ফিরে যাবে? আর যে পশ্চাদপদতায় ফিরে যায় সে কখনও আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না; কিন্তু আল্লাহ কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।"

মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর শেষ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করছিলেন এবং সেই সময় তাদের যে মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে তাও তিনিই করেছিলেন। বহু বছর পর যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইন্তেকাল করেন, তখন সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, কিছু মুসলিম আরব গোত্র ধর্মত্যাগ করলেও, তাদের ঈমানের উপর কৃতজ্ঞ এবং অবিচল ছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর (সাঃ) নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১৯৬-১১৯৯-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও নবী মুহাম্মদ (সাঃ) শারীরিকভাবে আজ মুসলমানদের মধ্যে নেই, তবুও তাদের ইসলামের প্রকৃত দূত হয়ে তাঁর আদর্শের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এটি অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হল মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং তাঁর পছন্দগুলির প্রতি ধৈর্য ধরা। ইসলাম সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে কারণ ধার্মিক পূর্বসূরীরা এই দায়িত্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পালন করেছিলেন। যখন তারা উপকারী জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং তার উপর কাজ করেছিলেন, তখন বাইরের বিশ্ব তাদের আচরণের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা স্বীকৃতি দিয়েছিল। এর ফলে অসংখ্য মানুষ ইসলামের পথে প্রবেশ করেছিল। দুর্ভাগ্যবশত, আজ অনেক মুসলিম বিশ্বাস করে যে ইসলাম সম্পর্কে অন্যদের জানানো কেবল নিজের চেহারা, যেমন দাড়ি রাখা বা স্কার্ফ পরা। এটি ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করার একটি দিক মাত্র। সবচেয়ে বড় অংশ হল পবিত্র কুরআন এবং তাঁর ঐতিহ্যে আলোচিত নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা। কেবলমাত্র এই মনোভাব দিয়েই বহির্বিশ্ব ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ

পর্যবেক্ষণ করবে। একজন মুসলিমের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতাকারী বৈশিষ্ট্য ধারণ করে ইসলামী চেহারা গ্রহণ করলে বহির্বিশ্ব কেবল ইসলামকে অসম্মান করে। এই অসম্মানের জন্য তারাই দায়ী থাকবে কারণ তারাই এর কারণ। তাই একজন মুসলিমের উচিত ইসলামের অভ্যন্তরীণ শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামের বাহ্যিক রূপ গ্রহণ করে ইসলামের একজন প্রকৃত দূত হিসেবে আচরণ করা।

অধিকন্তু, এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানটি মুসলমানদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে বিচারের দিন তাদের জবাবদিহি করা হবে এবং জিজ্ঞাসা করা হবে যে তারা এই ভূমিকা পালন করেছে কিনা। একজন রাজা যেমন তাদের কূটনীতিক এবং প্রতিনিধি তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে তাদের উপর ক্রুদ্ধ হবেন, তেমনি মহান আল্লাহও সেই মুসলিমের উপর ক্রুদ্ধ হবেন যারা ইসলামের দূত হিসেবে তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়।

পরিশেষে, ইসলামের দূত হিসেবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পরকালে মহানবী (সা.)-এর সাথে একতাবদ্ধ হওয়া নিশ্চিত করা হবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রেখে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, সে মহানবী (সা.)-এর সাথে একতাবদ্ধ হবে না, কারণ তারা এই পৃথিবীতে কার্যত তাঁর অনুসরণ করেনি। এটা বোঝা সাধারণ জ্ঞানের বিষয় যে, যদি কেউ অন্যের থেকে ভিন্ন পথ গ্রহণ করে, তবে তারা তাদের যাত্রার শেষে একত্রিত হবে না। মনে রাখা উচিত যে পূর্ববর্তী জাতিগুলিও তাদের পবিত্র নবীদের ভালোবাসা এবং সম্মান করার দাবি করে, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, কিন্তু তারা পরকালে তাদের সাথে একতাবদ্ধ হবে না কারণ তারা এই পৃথিবীতে কার্যত তাদের অনুসরণ করেনি।

সকল অসুবিধা

উহুদের যুদ্ধের সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) গুরুতর আহত হন। তাঁর দাঁত ভেঙে যায় এবং মুখমণ্ডল ও ঠোঁট কেটে ফেলা হয়। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যুদ্ধের সময়, যখন মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে উহুদ পাহাড়ে পিছু হটছিলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, অমুসলিমরা যখন তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাড়া করছিল, তখন অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, নবী (সাঃ) এর প্রতিরক্ষায় তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) তাঁকে এতটাই রক্ষা করেছিলেন যে তিনি ৩০টিরও বেশি আঘাত পেয়েছিলেন এবং ফলস্বরূপ তাঁর হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ২৬৯-২৭০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও পবিত্র নবীগণ (সাঃ) পাপ করা থেকে সুরক্ষিত ছিলেন, তবুও মুসলমানদের অবশ্যই শারীরিক ও মানসিক আঘাতের সম্মুখীন হওয়ার উপকারিতা মনে রাখতে হবে।

ইমাম বুখারীর "আদাবুল মুফরাদ", ৪৯২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম কোন ধরণের শারীরিক অসুবিধার সম্মুখীন হয় না, তা সে যত বড়ই হোক না কেন, যেমন কাঁটা বিঁধলে, অথবা মানসিক চাপের মতো কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় না, তবে আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে তাদের পাপ মোচন করে দেন।

এটি ছোট পাপের কথা বলে, কারণ বড় পাপের জন্য আন্তরিক অনুতাপ প্রয়োজন। এই পরিণতি তখনই ঘটে যখন একজন মুসলিম কঠিন পরিস্থিতির শুরু থেকে জীবনের শেষ অবধি ধৈর্য ধরে থাকে। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনেকেই বিশ্বাস করেন যে তারা প্রথমে অভিযোগ করতে পারেন এবং পরে ধৈর্য প্রদর্শন করতে পারেন। এটি প্রকৃত ধৈর্য নয়, বরং এটি কেবল গ্রহণযোগ্যতা, যা স্বাভাবিকভাবেই সময়ের সাথে সাথে ঘটে। সুনানে আন নাসায়ী, ১৮৭০ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে। এছাড়াও, সারা জীবন ধৈর্য প্রদর্শন করা প্রয়োজন, কারণ একজন ব্যক্তি অধৈর্য দেখিয়ে তার সওয়াব নষ্ট করতে পারে।

একজন মুসলিমের মনে রাখা উচিত যে, এই ছোট ছোট পাপগুলো কিয়ামতের দিন পর্যন্ত পৌঁছানোর চেয়ে এই কষ্টের মধ্য দিয়ে মুছে ফেলা অনেক ভালো। একজন মুসলিমের উচিত তাদের ছোট ছোট পাপগুলো মুছে ফেলার জন্য ক্রমাগত অনুতপ্ত হওয়া এবং সৎকর্ম সম্পাদনের চেষ্টা করা। এবং যদি তারা কোনও শারীরিক বা মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাহলে তাদের ধৈর্য ধরে তাদের ছোট ছোট পাপগুলো মুছে ফেলার এবং অগণিত প্রতিদান পাওয়ার আশা করা উচিত। সূরা আয-যুমার, আয়াত ১০:

"...নিশ্চয়ই, ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান বিনা হিসাব [অর্থাৎ, সীমা] দেওয়া হবে।"

যে ব্যক্তি ধৈর্যের সাথে প্রতিটি কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, যার মধ্যে রয়েছে কথা বা কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা বা আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়া থেকে বিরত থাকা এবং তার আচরণে আন্তরিক অনুতাপ যোগ করা, তার ছোট এবং বড় উভয়

পাপই মুছে ফেলা হবে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা অনুভব করা, আল্লাহ্‌র কাছে এবং যাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে তাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে, একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার আন্তরিক প্রতিশ্রুতি দেয় এবং এর মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ্‌র এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকারের ক্ষতিপূরণ।

যারা এইভাবে সমস্যার মুখোমুখি হয় এবং কৃতজ্ঞতার সাথে স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলি মোকাবেলা করে, যার অর্থ হল যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা, তারা উভয় জগতের প্রতিটি পরিস্থিতিতে শান্তি এবং সাফল্য পাবে। সূরা 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে কেউ সৎ কর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

মানুষের জন্য উদ্বেগ

উহুদের যুদ্ধের সময়, যখন আবু বকর সিদ্দিকী এবং আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর মতো কিছু সাহাবী নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হন, তখন তারা তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর ক্ষতের চিকিৎসা করেন, কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে প্রথমে তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ক্ষতের চিকিৎসা করতে বলেন। তারা উভয়েই নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চিকিৎসার জন্য জোর দেন। আবু উবাইদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার দাঁত দিয়ে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর লোহার রিংযুক্ত শিরস্ত্রাণের দুটি আংটি টেনে বের করেন, যা তার মুখে আটকানো ছিল। তারপর তিনি একটি তীর বের করেন যা নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখে, তার দাঁতে আঘাত করে, যাতে তাকে ক্ষতি না হয়। ফলস্বরূপ, তার সামনের দাঁতটি পড়ে যায়। এরপর মহানবী (সা.) আবার তাদেরকে তালহা (রা.)-কে খুঁজে বের করে সাহায্য করার পরামর্শ দিলেন, যা তারা করেছিল। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ২৬৯-২৭১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও মহানবী (সা.) নিজের চেয়ে অন্যদের জন্য চিন্তিত ছিলেন।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে, মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের কোন অংশ যদি ব্যথা পায়, তাহলে বাকি অংশও তার ব্যথায় শরীক হয়।

এই হাদিসটি, অন্যান্য অনেক হাদিসের মতো, নিজের জীবনে এতটা মগ্ন না হয়ে এমন আচরণ করার গুরুত্ব নির্দেশ করে যেন মহাবিশ্ব তাদের এবং তাদের সমস্যাগুলির চারপাশে ঘোরে। শয়তান একজন মুসলিমকে তাদের নিজের জীবন এবং তাদের সমস্যাগুলির উপর এত বেশি মনোযোগ দিতে অনুপ্রাণিত করে যে তারা বৃহত্তর চিত্রের উপর মনোযোগ হারিয়ে ফেলে যা তাদের অধৈর্যের দিকে পরিচালিত করে এবং তাদের অন্যদের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের সামর্থ্য অনুসারে অন্যদের সহায়তা করার দায়িত্বে ব্যর্থ হয়। একজন মুসলিমের সর্বদা এটি মনে রাখা উচিত এবং যতটা সম্ভব অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত। এটি আর্থিক সাহায্যের বাইরেও বিস্তৃত এবং এর মধ্যে সমস্ত মৌখিক এবং শারীরিক সাহায্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন ভাল এবং আন্তরিক পরামর্শ।

মুসলিমদের উচিত নিয়মিত সংবাদ এবং বিশ্বজুড়ে যারা কঠিন পরিস্থিতিতে আছেন তাদের প্রতি নজর রাখা। এটি তাদেরকে আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্মমগ্ন না হয়ে অন্যদের সাহায্য করার জন্য অনুপ্রাণিত করবে। বাস্তবে, যে কেবল নিজের কথা চিন্তা করে সে পশুর চেয়েও নিম্ন স্তরের, কারণ সে তার সন্তানদেরও যত্ন করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলিমের উচিত তার নিজের পরিবারের বাইরে অন্যদের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে পশুর চেয়েও উত্তম হওয়া।

এই হাদিসটি ইসলামে ঐক্য ও সাম্যের গুরুত্বকেও নির্দেশ করে, কারণ একজনকে অবশ্যই অন্য মুসলমানদের তাদের সামর্থ্য অনুসারে সাহায্য করতে হবে, তাদের লিঙ্গ, জাতিগততা বা অন্য কিছু নির্বিশেষে।

যেভাবে একজন ব্যক্তি নিজের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে চান, ঠিক সেভাবেই অন্যদের সাথেও আচরণ করার চেষ্টা করতে হবে, কারণ মূল হাদিসটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, একজন মুসলিমের জন্য দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হওয়া বা অন্য কোন

মুসলিমের দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হওয়া - এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটি একই রকম।

পরিশেষে, যদিও একজন মুসলিম পৃথিবীর সকল সমস্যা দূর করতে পারে না, তবুও তারা তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তাদের সামর্থ্য অনুসারে অন্যদের সাহায্য করতে পারে কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা এটাই আদেশ করেন এবং আশা করেন।

সকলের জন্য নির্দেশনা কামনা করা

উহুদের যুদ্ধের সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর উম্মতের জন্য এতটাই চিন্তিত ও শোকাহত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর মুখ থেকে রক্ত মুছে ফেলার সময় তিনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, মহান আল্লাহ কীভাবে সেইসব লোকদের ক্ষমা করতে পারেন যারা তাদের নবী (সাঃ) কে এভাবে কষ্ট দিয়েছে। এরপর আল্লাহ (সাঃ) নিম্নলিখিত আয়াতটি নাযিল করেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে আশ্বস্ত করেন যে, তাদের জন্য ক্ষমার দরজা এখনও খোলা রয়েছে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১২৮:

"তিনি তাদের ক্ষমা করবেন নাকি শাস্তি দেবেন, সেটা তোমার ব্যাপার নয়, কারণ তারা আসলেই জালেম।"

সুনান ইবনে মাজাহ, ৪০২৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

অমুসলিমদের কাছ থেকে এই ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছিলেন যে, তিনি যেন তাদের ক্ষমা করেন কারণ তারা তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞান এবং পূর্ণ বোধগম্যতা রাখে না। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ২৬৮-২৬৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ঘটনাটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর করুণাময় ও ক্ষমাশীল স্বভাবের ইঙ্গিত দেয়।

সকল মুসলিম আশা করে যে বিচারের দিনে আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপকে দূরে রাখবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, এই একই মুসলিমদের বেশিরভাগই যারা এই আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থাৎ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আঁকড়ে ধরে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলিকে বোঝাচ্ছে না যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তোলে এমন একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে ভুক্তভোগীকে প্রভাবিত করবে। এই ধরণের ভুলকে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা বোধগম্যভাবে কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলিম প্রায়শই অন্যদের ভুলগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকে যা ভবিষ্যতে কোনওভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি অদৃশ্য হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা সুযোগ পেলেই তা পুনরুজ্জীবিত করার এবং অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা ধারণ করা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে মানুষ ফেরেশতা নয়। অন্তত একজন মুসলিম যিনি আশা করেন যে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুলগুলিকে উপেক্ষা করবেন, তার উচিত অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকৃতি জানায় তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্কই ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সর্বদা একটি মতবিরোধে লিপ্ত থাকবে যা প্রতিটি সম্পর্কের ক্ষেত্রেই ভুলের দিকে পরিচালিত করতে পারে। অতএব, যারা এইভাবে আচরণ করে তারা একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা অদ্ভুত যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে কিন্তু এমন মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ জীবিত থাকাকালীন এবং তাদের মৃত্যুর পরে ভালোবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাবের ফলে একেবারে বিপরীত ঘটে। তারা জীবিত থাকাকালীন মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়ে এবং যখন তারা মারা

যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ এবং ভালোবাসার সাথে স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের স্মরণ করে তবে এটি কেবল অভ্যাসের বাইরে।

অতীতকে ভুলে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে অন্যদের প্রতি অতিরিক্ত ভালো ব্যবহার করা উচিত, তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে একজন ব্যক্তি সর্বনিম্ন যা করতে পারে তা হল শ্রদ্ধাশীল হওয়া। এর জন্য কোনও মূল্য দিতে হয় না এবং খুব কম প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। অতএব, একজনের উচিত মানুষের অতীতের ভুলগুলিকে উপেক্ষা করা এবং ভুলে যাওয়া শেখা, সম্ভবত, মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলি উপেক্ষা করবেন। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ২২:

"... এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই আলোচনার অর্থ এই নয় যে ভবিষ্যতে তাদের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ না নিয়ে অন্যদের ক্ষমা করা উচিত। ইসলাম স্পষ্ট করে বলে যে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেজন্য অন্যদের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং তারপর মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ক্ষমা করার চেষ্টা করা উচিত।

পরিশেষে, আলোচ্য মূল ঘটনাটি অমুসলিমদের ঘৃণা না করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। একজন মুসলিমের কর্তব্য হল পাপকে ঘৃণা করা কিন্তু তাদের মানুষকে ঘৃণা করা উচিত নয়, কারণ তারা যে কোনও সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে, ঠিক যেমন উহুদের যুদ্ধে উপস্থিত অনেক অমুসলিম করেছিলেন। যখন

একজন মুসলিম অমুসলিমদের ঘৃণা করে, তখন এটি পরবর্তীদেরকে সঠিক নির্দেশনা থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয় কারণ তারা বিশ্বাস করবে যে ইসলাম অমুসলিমদের ঘৃণা প্রচার করে, যখন তা করে না। পরিবর্তে, মুসলমানদের পাপকে ঘৃণা করতে হবে এবং সেই পাপগুলি থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তাদের ঘৃণা প্রমাণ করতে হবে এবং তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি দয়া ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন প্রকৃত মুসলিম এবং বিশ্বাসী ব্যক্তি এবং তাদের সম্পদ থেকে তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি দূরে রাখে, তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে। সুনান আন নাসায়ীর ৪৯৯৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সত্য গ্রহণ এবং মেনে চলা

উহুদের যুদ্ধের সময়, যখন মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে উহুদ পাহাড়ে পিছু হটছিলেন, তখন অমুসলিমরা তাদের পিছু ধাওয়া করছিল। অমুসলিমদের একজন নেতা, উবাই বিন খালাফ, চিৎকার করতে শুরু করেন এবং মহানবী (সাঃ) কে হুমকি দিতে শুরু করেন, যখন তিনি তাঁর পিছু ধাওয়া করছিলেন। মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের বললেন, তাকে কাছে আসতে দিন। এরপর তিনি একটি বর্শা নিয়ে উবাইয়ের বর্মের ফাঁক দিয়ে ঘাড়ে আঘাত করেন। উবাই তার ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং ব্যথায় চিৎকার করেন। অন্যান্য অমুসলিমরা যখন তাকে তুলে নিয়ে তার ক্ষত পরীক্ষা করে দেখেন, তখন তারা দেখতে পান যে ঘাড়ের ক্ষতটি সামান্য আঁচড়ের মতো ছিল, যদিও উবাই এমনভাবে কাঁদছিলেন যেন তাকে শারীরিক নির্যাতন করা হচ্ছে। এরপর সে তাদের বলল যে, এই ক্ষত থেকে সে মারা যাবে, যেমন বহু বছর আগে সে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যার হুমকি দিয়েছিল, এবং তার পরিবর্তে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে সতর্ক করেছিলেন যে সে আসলে তাকে হত্যা করবে। এরপর উবাই মন্তব্য করেছিলেন যে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) যদি তার দিকে থুথুও ফেলেন, তবুও তিনি মারা যাবেন কারণ তিনি নিশ্চিতভাবে তাকে হত্যা করার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করতেন। অমুসলিমরা মক্কায় ফিরে আসার পর উবাই মারা যান। সিরাত ইবনে হিশামের ১৪৮ পৃষ্ঠায় এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটা আশ্চর্যজনক যে উবাই কীভাবে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সত্যবাদিতার প্রতি এতটা নিশ্চিত ছিলেন, কিন্তু তাঁকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করেননি। এর থেকে বোঝা যায় যে, তিনি অন্তরে অন্তরে সত্য জানতেন, যেমন তিনি মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে তাঁর সমগ্র জীবন জানতেন, এবং তাই জানতেন যে তিনি মিথ্যাবাদী নন।

উবাই ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত থাকা সত্ত্বেও তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ তিনি ইসলামের শিক্ষা সঠিকভাবে অনুসরণ করে তার প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে চাননি। পরিবর্তে, তিনি তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। একজন ব্যক্তির এই মনোভাব এড়িয়ে চলা উচিত কারণ তারা এই পৃথিবীতে কখনও সর্বশ্রেষ্ঠ পার্থিব আশীর্বাদ পাবে না, যা হল মনের শান্তি। মনের শান্তি তখনই সম্ভব যখন কেউ একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করে এবং যখন তারা সবকিছু এবং প্রত্যেককে তার জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেয়। এটি তখনই অর্জন করা যেতে পারে যখন কেউ ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তার উপর কাজ করে। কারণ মহান আল্লাহই একমাত্র যিনি নিখুঁত আচরণবিধি প্রদানের জ্ঞান রাখেন যা উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। সমস্ত মানবসৃষ্ট আচরণবিধি কখনও এই পরিণতির দিকে পরিচালিত করবে না কারণ তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের অভাব রয়েছে। এটি স্পষ্ট হয় যখন কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে এবং কীভাবে এটি তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেয়, যদিও তারা পার্থিব বিলাসিতা ধারণ করে এবং উপভোগ করে। অতএব, একজন ব্যক্তির অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তার উপর আমল করা উচিত, এমনকি যদি তা তার ইচ্ছার বিরোধিতা করেও। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন তিনিও ভালো থাকবেন। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝেন না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন, তবুও মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

উপেক্ষা এবং সদিচ্ছা

উহুদের যুদ্ধের সময়, উভয় পক্ষের অমুসলিমরা মুসলিমদের উপর আক্রমণ করলে যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়, তাতে কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, ভুল করে আরেক সাহাবী, আল-ইয়াম্মান, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, শহীদ হন। তাঁর পুত্র হুদাইফা বিন ইয়াম্মান, যিনি উহুদে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন কিন্তু কখনও সাহাবীদের উপর সন্তুষ্ট হননি, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাঁর পিতার দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর জন্য যে রক্তপণ তিনি দিয়েছিলেন তা কখনও নেননি, যা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে দিয়েছিলেন। তিনি বরং এই অর্থ দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। বহু বছর পরে তিনি এই সদিচ্ছা বজায় রেখেছিলেন যতক্ষণ না তিনি এই সদিচ্ছাটি বজায় রেখেছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৬, সহীহ বুখারী, ৩৮২৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, নবীর নোবেল জীবন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১৪৮-১১৪৯-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও আল-ইয়াম্মান, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, ভুল করে শহীদ হয়েছিলেন, তবুও ইসলাম মুসলমানদেরকে অন্যদের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত পাপ ক্ষমা করতে এবং উপেক্ষা করতে শেখায়। এটা মেনে নিতে হবে যে মানুষ ফেরেশতা নয় এবং তাই কখনও কখনও অন্যদের প্রতি অন্যায় করতে বাধ্য। এই ধরনের ক্ষেত্রে, একজন মুসলমানের আত্মরক্ষা করার অধিকার রয়েছে এবং ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য তাদের অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে ইসলাম তাদেরকে অন্যদের ক্ষমা করতেও উৎসাহিত করে, ঠিক যেমন তারা চায় যে আল্লাহ, মহিমান্বিত, উভয় জগতেই তাদের ক্ষমা করে দিন। মানুষের প্রতি ক্ষোভ পোষণ করা এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এই মনোভাব আল্লাহ, মহিমান্বিতকে, পৃথিবীতে তাদের জীবনের সমস্ত কাজের জন্য বিচারের দিনে তাদের কঠোরভাবে জবাবদিহি করতে বাধ্য করতে পারে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষের ভুল উপেক্ষা করার অভ্যাস গ্রহণ করে, সে দেখতে পাবে যে, মহান

আল্লাহ, মহিমান্বিত, বিচারের দিন তাদের ভুল এবং পাপ উপেক্ষা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন..."

সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছ থেকে প্রতিদান লাভ

উহুদের যুদ্ধের সময়, কুযমান নামে এক ব্যক্তি মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধে ছিলেন। যখন তার সাহসিকতার কথা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করা হলো, তখন তিনি ঘোষণা করলেন যে তিনি জাহান্নামে যাবেন। যুদ্ধের সময় তিনি অমুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই করেছিলেন এবং অসাধারণ সাহস দেখিয়েছিলেন। অবশেষে তার আঘাত তাকে অক্ষম করে দেয় এবং তাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বের করে আনা হয়। সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, তাঁর প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি কেবল তাঁর গোত্রের সম্মান এবং সামাজিক মর্যাদার জন্য লড়াই করেছিলেন, অর্থাৎ, তিনি মহান আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করেননি। যখন তার ক্ষতের যন্ত্রণা চরম আকার ধারণ করে, তখন তিনি আত্মহত্যা করার জন্য তীর ছুঁড়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযীতে ৩১৫৪ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ না করে, বরং লোক দেখানোর জন্য কাজ করে, তাদেরকে বলা হবে যে, বিচারের দিন তারা তাদের সেইসব লোকদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান পাবে যারা তাদের জন্য কাজ করেছে, যা বাস্তবে করা সম্ভব নয়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সকল কাজের ভিত্তি, এমনকি ইসলামও, নিয়ত। এটিই সেই জিনিস যার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তাআলা মানুষের বিচার করেন। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত ১ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলিমের উচিত সকল ধর্মীয় ও পার্থিব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা, যাতে উভয় জগতেই তার কাছ থেকে প্রতিদান লাভ করা যায়। এই সঠিক মানসিকতার একটি লক্ষণ হল যে, এই ব্যক্তি তার কাজের জন্য মানুষ তার প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক, তা আশা করে না এবং চায় না। যদি কেউ এটি চায় তবে এটি তার ভুল উদ্দেশ্যকে নির্দেশ করে।

অধিকন্তু, সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করলে দুঃখ এবং তিক্ততা রোধ করা যায় কারণ যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করে, সে অবশেষে অকৃতজ্ঞ লোকদের মুখোমুখি হবে যারা তাদের বিরক্ত এবং তিক্ত করে তুলবে, কারণ তারা মনে করবে যে তারা তাদের প্রচেষ্টা এবং সময় নষ্ট করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি পিতামাতা এবং আত্মীয়দের মধ্যে দেখা যায় কারণ তারা প্রায়শই তাদের সন্তান এবং আত্মীয়দের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তাদের জন্য। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে, সে অন্যদের প্রতি, যেমন তাদের সন্তানদের প্রতি, তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবে এবং যখন তারা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয় তখন কখনও তিক্ত বা ক্রুদ্ধ হয় না। এই মনোভাব মনের শান্তি এবং সাধারণ সুখের দিকে পরিচালিত করে কারণ তারা জানে যে, মহান আল্লাহ তাদের সৎকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত এবং তাদের এর জন্য পুরস্কৃত করবেন। এইভাবেই সকল মুসলমানকে কাজ করতে হবে অন্যথায় বিচারের দিন তারা খালি হাতে থাকতে পারে। অধ্যায় ১৮ আল কাহফ, আয়াত ১১০:

"...অতএব যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।"

দুর্দশায় সাহায্য

উহুদের যুদ্ধের কঠিন সময়ে, মহান আল্লাহ সাহাবাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেছিলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, যা তাদের চাপ এবং উদ্বেগকে দূর করেছিল। আবু তালহা, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, এই আশীর্বাদ প্রাপ্তদের মধ্যে একজন ছিলেন। প্রশান্তি তন্দ্রার আকারে এসেছিল, যার ফলে তিনি যুদ্ধের সময় বেশ কয়েকবার তার তরবারি ফেলে দিয়েছিলেন। সূরা ৩ আলী ইমরান, আয়াত ১৫৪:

"অতঃপর কষ্টের পর তিনি তোমাদের কারো কারো উপর তন্দ্রার মতো প্রশান্তি নাজিল করলেন..."

ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার", পৃষ্ঠা ২৭৭-এ এটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসনাদে আহমাদের ২৮০৩ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এই বিষয়টি বোঝার গুরুত্ব সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তির প্রতিটি কঠিন পরিস্থিতির পরেই স্বস্তি আসবে। এই বাস্তবতা পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, ৬৫ নম্বর সূরা তালাকের ৭ নম্বর আয়াতে:

"... আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি [অর্থাৎ, স্বস্তি] আনবেন।"

মুসলমানদের জন্য এই বাস্তবতা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ধৈর্য এবং এমনকি সন্তুষ্টির জন্ম দেয়। পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা একজনকে অধৈর্য, অকৃতজ্ঞতা এবং এমনকি অবৈধ রিযিকের মতো অবৈধ জিনিসের প্রতিও পরিচালিত করতে পারে। কিন্তু যে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সমস্ত অসুবিধা অবশেষে স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিস্থাপিত হবে, সে ইসলামের শিক্ষার উপর পূর্ণ আস্থা রেখে ধৈর্য ধরে এই পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করবে। এই ধৈর্য মহান আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত পছন্দ করেন এবং প্রচুর পুরস্কৃত হন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৬:

"... আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।"

এই কারণেই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে অসংখ্য উদাহরণ উল্লেখ করেছেন যখন কঠিন পরিস্থিতির পরে স্বাচ্ছন্দ্য ও আশীর্বাদ এসেছিল। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে নবী নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং কীভাবে আল্লাহ তাঁকে মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা করেছিলেন তা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ৭৬:

"আর নূহের কথা [স্মরণ করো], যখন সে [সেই সময়ের] পূর্বে [আল্লাহকে] ডাকছিল, অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে মহাবিপদ [অর্থাৎ, বন্যা] থেকে রক্ষা করেছি।"

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় ২১ নম্বর সূরা আল আম্বিয়ার ৬৯ নম্বর আয়াতে:

“আমরা [অর্থাৎ, আল্লাহ] বললাম, "হে আগুন, তুমি ইব্রাহিমের উপর শীতলতা ও নিরাপত্তা বর্ষণ করো।"

হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এক বিরাট অগ্নিকুণ্ডের মতো কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন, কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য তা শীতল ও শান্তিপূর্ণ করে তুলেছিলেন।

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদিসে এই এবং আরও অনেক উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মুসলমানরা বুঝতে পারে যে, যারা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, তাদের জন্য কঠিন মুহূর্ত অবশেষে স্বস্তি নিয়ে আসবে।

অতএব, মুসলমানদের জন্য এই ইসলামী শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা অসংখ্য ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে পারে যেখানে আল্লাহ তাঁর বাধ্য বান্দাদেরকে তাদের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার পরেও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন। যদি আল্লাহ, মহান, তাঁর বাধ্য বান্দাদেরকে ঐশী শিক্ষায় উল্লিখিত বড় বড় সমস্যা থেকে রক্ষা করে থাকেন, তাহলে তিনি ছোট ছোট সমস্যায় ভোগা বাধ্য মুসলমানদেরও রক্ষা করতে পারেন এবং করবেন।

মহিলাদের জন্য মানদণ্ড

উহুদের যুদ্ধের সময়, আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.)-এর মতো মহিলা সাহাবীরা আহতদের চিকিৎসা করেছিলেন এবং সৈন্যদের পানি পান করিয়েছিলেন। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ২৭৯-২৮০-তে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ধার্মিক মহিলারা ইসলামকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তারা নিজেদেরকে পুরুষদের সাথে তুলনা করেননি, অথবা তারা যা করেন তা করার চেষ্টাও করেননি। বরং, তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে সৎকর্ম অর্জন করা পুরুষদের অনুকরণ করার মাধ্যমে নয়, বরং তাদের ভূমিকা এবং কর্তব্য পালনের মাধ্যমে মহান আল্লাহকে আনুগত্য করার মাধ্যমেই সম্ভব।

পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে মহান আল্লাহ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ব্যাখ্যা করেছেন, অর্থাৎ, সবচেয়ে সম্মানিত এবং সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন সেই ব্যক্তি যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া রয়েছে। সূরা আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

" হে মানবজাতি ... নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এটা তখনই ঘটে যখন কেউ মহান আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য প্রচেষ্টা করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। দুর্ভাগ্যবশত, শয়তান অনেক নারীকে পুরুষদের তুলনায় নারীর মর্যাদা নিয়ে বিতর্ক করতে প্ররোচিত করেছে। যদিও ইসলাম নারীদের এমন সম্মান দিয়েছে যা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান বা বিশ্বাস কখনও দেয়নি, যেমন জান্নাত, যা পরম আনন্দ, একজন নারীর পায়ের নীচে, অর্থাৎ একজনের মায়ের পায়ের নীচে স্থাপন করা। সুনানে আন নাসায়ী, ৩১০৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। জামে আত তিরমিযী, ৩৮৯৫ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে , মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ দিয়েছেন যে সর্বোত্তম পুরুষ হলেন তিনি যিনি তার স্ত্রীর সাথে সর্বোত্তম আচরণ করেন। আরও অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। তবে লক্ষণীয় বিষয় হল, নারীদের নিজেদের পুরুষদের সাথে তুলনা করার বিষয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয় কারণ এটি আল্লাহ, যা চান তা নয়। বরং, নারীদের উচিত তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করা এবং যদি তারা তা অর্জন করে, তাহলে তারা তাদের চেয়ে কম তাকওয়ার অধিকারী প্রতিটি পুরুষ বা মহিলার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে। এটিই হল সেই মানদণ্ড যা কে শ্রেষ্ঠ তা আলাদা করে। এবং এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে এটি কেবল পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখলে দেখা যাবে যে, মহান মুসলিম নারীরা পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করার পরিবর্তে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। এবং ফলস্বরূপ তারা বেশিরভাগ পুরুষ ও নারীর চেয়ে উন্নত হয়ে ওঠেন। এমনকি যদি মুসলিম নারীদের সেই সময়েও তাদের স্বপ্নের সমস্ত অধিকার দেওয়া হয়, তবুও তারা ধর্মপরায়ণতা গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাদের অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া সম্ভব হবে না, কারণ সংবাদ এবং যারা তাদের ইচ্ছামত আচরণ করে, তারা তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। এবং এই বাস্তবতা পরকালে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অতএব, যদি কোন মুসলিম অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ হতে চায়, তাহলে তাদের তা তর্ক-বিতর্ক এবং বিতর্কের মাধ্যমে নয়, বরং তা তাকওয়ার মাধ্যমেই অনুসন্ধান করা উচিত।

অসুবিধা এবং কষ্টের মুখোমুখি হওয়া

উহুদের যুদ্ধের শেষে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ নিরাপদে উহুদ পাহাড়ে ফিরে আসার পর, অমুসলিম নেতা আবু সুফিয়ান তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) নিহত হয়েছেন কিনা। আবু সুফিয়ান বুঝতে পেরেছিলেন যে ইসলামের ধারাবাহিকতা এই মহান ব্যক্তিত্বদের উপর নির্ভরশীল। প্রথমদিকে, কেউই তাকে উত্তর দেয়নি কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের চুপ থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু যখন আবু সুফিয়ান ঘটনাটি নিয়ে গর্ব করতে শুরু করেন, তখন উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) চুপ থাকতে পারেননি এবং তাকে তিরস্কার করেন। আবু সুফিয়ান তখন তাদের বলেন যে তার সৈন্যরা নিহত সাহাবীগণের মৃতদেহ বিকৃত করেছে, যদিও তিনি তাদের তা করার নির্দেশ দেননি, কিন্তু তাদের কাজ তাকে অসন্তুষ্ট করেনি। আবু সুফিয়ান গর্ব করে বলেছিলেন যে এই যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ ছিল, কিন্তু উমর (রাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি ভুল করেছেন কারণ নিহত অমুসলিমরা জাহান্নামে ছিল এবং নিহত সাহাবীরা (রাঃ) জান্নাতে ছিলেন। যাওয়ার আগে আবু সুফিয়ান নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে পরের বছর বদরে আবার যুদ্ধ করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেন, যা তিনি গ্রহণ করেন। অমুসলিম সেনাবাহিনী চলে যাওয়ার পর, আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করতে এবং অমুসলিম সেনাবাহিনী মক্কায় ফিরে যাচ্ছে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য পাঠানো হয়েছিল, নাকি মদীনা আক্রমণ করতে যাচ্ছে তা নির্ধারণ করার জন্য। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মন্তব্য করেছিলেন যে যদি তারা মদিনার দিকে রওনা হয়, তাহলে তিনি সেখানে অভিযান চালিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন। কিন্তু আলী (রাঃ) পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার পর বুঝতে পারলেন যে তারা মক্কায় ফিরে যাচ্ছে। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার", পৃষ্ঠা ২৮১-২৮২ এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জীবনে একজন মুসলিম সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অথবা কঠিন সময়ের মুখোমুখি হবে। কেউই কেবল কিছু অসুবিধা ছাড়াই স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে না। কিন্তু

লক্ষণীয় বিষয় হল, সংজ্ঞা অনুসারে, যদিও অসুবিধাগুলি মোকাবেলা করা কঠিন, তবুও তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতি তার প্রকৃত মহত্ত্ব এবং দাসত্ব অর্জন এবং প্রদর্শনের একটি উপায়। উপরন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ যখন অসুবিধার মুখোমুখি হয় তখন তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জীবনের পাঠ শেখে। এবং মানুষ প্রায়শই স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে কঠিন সময়ের অভিজ্ঞতা অর্জনের পরে আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হয়। এই সত্যটি বোঝার জন্য কেবল এটি নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে তবে সে বুঝতে পারবে যে আলোচিত বেশিরভাগ ঘটনাই অসুবিধার সাথে জড়িত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে প্রকৃত মহত্ত্ব সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করার মধ্যেই নিহিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি নিহিত রয়েছে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে অসুবিধার মুখোমুখি হওয়ার মধ্যে। এটি এই সত্য দ্বারা প্রমাণিত যে ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত প্রতিটি বড় কঠিন বিষয়ই তাদের জন্য চূড়ান্ত সাফল্যের সাথে শেষ হয় যারা মহান আল্লাহকে আনুগত্য করেছে। তাই একজন মুসলিমের উচিত সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করা উচিত নয় কারণ এটি কেবল তাদের জন্য উজ্জ্বল হওয়ার মুহূর্ত, যখন তারা আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের প্রকৃত দাসত্ব স্বীকার করে। এটিই উভয় জগতের চূড়ান্ত সাফল্যের চাবিকাঠি।

অধিকন্তু, মূল ঘটনাটি এও নির্দেশ করে যে, যখন কোন সমস্যার মুখোমুখি হওয়া যায়, তখন সাহস হারানো উচিত নয় এবং পার্থিব পরিস্থিতির ভয় না পেয়ে আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আল্লাহকে ভয় করে তাঁর আনুগত্যের উপর অটল থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কোনও অসুবিধার ভয় পাবে না, কারণ আল্লাহ তাদেরকে তা কাটিয়ে ওঠার শক্তি প্রদান করবেন যাতে তারা উভয় জাহানে মানসিক শান্তি এবং পুরষ্কার অর্জন করতে পারে। ৬৫তম অধ্যায় তালাক, আয়াত ২:

"...আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই সমর্থন আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে ঘটে, মানুষের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুসারে নয়। অতএব, এটি সর্বোত্তম সময়ে এবং সর্বোত্তম উপায়ে ঘটে, যদিও এটি মানুষের কাছে স্পষ্ট নয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভয় করে না এবং তার অবাধ্যতায় অবিচল থাকে, সে দেখতে পাবে যে সে পার্থিব সমস্যাগুলির প্রতি সর্বদা ভীত এবং সেগুলি কাটিয়ে ওঠার শক্তি পাবে না। এর ফলে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা আরও বাড়বে, যেমন হতাশা, মাদকাসক্তি এবং এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতা, এমনকি যদি সে পার্থিব বিলাসিতা ভোগ করে। অধ্যায় ৯, আত-তাওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

অতএব, নিজের স্বার্থে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে। এই আনুগত্যের মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা অন্তর্ভুক্ত।

সর্বস্ব ত্যাগ করা

উহুদের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের নিহত সাহাবীদের খোঁজখবর নিতে উহুদ পাহাড় থেকে নেমে আসেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যায়েদ বিন সাবিতকে সা'দ বিন আর রাবী (রাঃ)-কে খুঁজে বের করে তার সুস্থতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে বলেন। অবশেষে তিনি তাকে সত্তরটিরও বেশি ক্ষতবিক্ষত সৈন্যদের মধ্যে পেয়েছিলেন। যায়েদ (রাঃ) নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সালাম পৌঁছে দেন এবং তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। সা'দ (রাঃ) নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সালামের জবাব দেন এবং মন্তব্য করেন যে তিনি জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছেন। তাঁর শেষ কথা ছিল মদীনার সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের জন্য একটি সতর্কীকরণ বার্তা। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন যে, যদি নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জীবিত অবস্থায় কোন ক্ষতি করা হয়, তাহলে বিচারের দিন তাদের কাছে আল্লাহর কাছে কোন অজুহাত থাকবে না। তারপর তিনি ইন্তেকাল করেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার", পৃষ্ঠা ২৮২-২৮৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ, আজকের মুসলমানদের কাছ থেকে এই ধরণের ত্যাগ আশা করেন না এবং দাবিও করেন না। বরং, তিনি আশা করেন যে তারা তাদের পার্থিব আশীর্বাদের তুলনায় ছোট ত্যাগ করবে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৯২:

"তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও কল্যাণ [প্রতিদান] পাবে না। আর তোমরা যা ব্যয় করো, আল্লাহ তা জানেন।"

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতে পারে না, অর্থাৎ, যতক্ষণ না তারা তাদের প্রিয় জিনিসগুলিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক হয়, ততক্ষণ তাদের ঈমানে ত্রুটি থাকবে। যদিও অনেকে বিশ্বাস করে যে এই আয়াতটি সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু বাস্তবে এর অর্থ আরও অনেক বেশি। এর মধ্যে প্রতিটি আশীর্বাদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা একজন মুসলিম পছন্দ করে এবং ভালোবাসে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানরা তাদের মূল্যবান সময়কে এমন জিনিসের জন্য উৎসর্গ করতে খুশি যা তাদের সন্তুষ্ট করে। কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সময় উৎসর্গ করতে অস্বীকার করে, ফরজ কর্তব্যের বাইরে যা দিনে মাত্র এক বা দুই ঘন্টা সময় নেয়। অগণিত মুসলমান তাদের শারীরিক শক্তি বিভিন্ন আনন্দদায়ক কাজে উৎসর্গ করতে খুশি, তবুও তাদের অনেকেই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য, যেমন স্বেচ্ছায় রোজা রাখার জন্য, তা উৎসর্গ করতে অস্বীকার করে। সাধারণত, মানুষ তাদের ইচ্ছামত জিনিসগুলিতে প্রচেষ্টা করতে খুশি হয় যেমন অতিরিক্ত সম্পদ অর্জন করা যা তাদের প্রয়োজন হয় না, এমনকি যদি এর অর্থ তাদের অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হয় এবং তাদের ঘুম ত্যাগ করতে হয়, তবুও কতজন এইভাবে আল্লাহর আনুগত্যে তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়? স্বেচ্ছায় প্রার্থনা করার জন্য কতজন তাদের মূল্যবান ঘুম ত্যাগ করে?

এটা অদ্ভুত যে মুসলমানরা বৈধ পার্থিব ও ধর্মীয় আশীর্বাদ কামনা করে, কিন্তু একটি সহজ সত্য উপেক্ষা করে। তারা কেবল তখনই এই জিনিসগুলি পাবে যখন তারা তাদের আশীর্বাদগুলি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করবে। তারা কীভাবে তাঁর কাছে ন্যূনতম জিনিসগুলি উৎসর্গ করতে পারে এবং তবুও তাদের সমস্ত স্বপ্ন পূরণের আশা করতে পারে? এই মনোভাব সত্যিই অদ্ভুত।

এছাড়াও, আলোচ্য মূল ঘটনাটি নির্দেশ করে যে, আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে ভালোবাসার মৌখিক দাবিকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করার গুরুত্ব কতটুকু। সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, আল্লাহকে খুশি করার জন্য এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে রক্ষা করার জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করে তাদের দাবি প্রমাণ করেছিলেন। মুসলমানদের কাছ থেকে এইভাবে তাদের ভালোবাসার মৌখিক ঘোষণা প্রমাণ করার আশা করা হয় না, বরং তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সাঃ) এর হাদীসে বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর আনুগত্য করবে। ইসলামে কর্ম ছাড়া ভালোবাসার মৌখিক ঘোষণার কোন মূল্য নেই এবং একজনকে ভয় করতে হবে যে তারা যদি আনুগত্যের মাধ্যমে এটিকে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা তাদের ঈমান ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারে। কারণ ঈমান একটি উদ্ভিদের মতো যাকে বৃদ্ধি পেতে আনুগত্যের মাধ্যমে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি না পেলেও বেড়ে উঠতে পারে না এবং এমনকি মারাও যেতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি আনুগত্যের মাধ্যমে তাকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমানও বৃদ্ধি পায় না এবং মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

বিশ্বাসের আহ্বানে সাড়া দেওয়া

উহুদের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের নিহত সাহাবীদের খোঁজখবর নিতে উহুদ পাহাড় থেকে নেমে আসেন। সাহাবীগণ হানযালা ইবনে আবু আমির, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, এর মৃতদেহ খুঁজে পাননি এবং মহানবী মুহাম্মদ, সা. তাদের জানান যে, তার অবস্থান এবং তার দেহ ফেরেশতাদের দ্বারা ধৌত করা হয়েছে। সাধারণত, শহীদের দেহ দাফনের আগে ধৌত করা হয় না। মহানবী মুহাম্মদ, সা. তাদের বলেছিলেন যে, তার স্ত্রীকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে। মদিনায় ফিরে আসার পর, তারা তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, যিনি তাদের বলেন যে, হানযালা, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, নবী মুহাম্মদ, সা. এর আহ্বানের আগেই তাকে বিয়ে করেছিলেন এবং তাকে ভয় দেখিয়েছিলেন, উহুদের যুদ্ধে সৈন্যদের ডেকেছিলেন। যদিও তার জন্য গোসল করা বাধ্যতামূলক ছিল, তবুও এটি করলে তিনি সৈন্যদের সাথে যোগ দিতে এবং সরাসরি ডাকে সাড়া দিতে পারতেন না। তাই তিনি গোসল বিলম্বিত করে সৈন্যদের সাথে যোগ দেন এবং উহুদের দিকে যাত্রা করেন যেখানে তিনি শহীদ হন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আহ্বানের প্রতি তাঁর আনুগত্যের ফলে, ফেরেশতারা তাঁকে দাফনের আগে তাঁর দেহকে স্নান করান। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ২৮৪-২৮৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের প্রতি মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর আহ্বানে সাড়া দিতে হবে, তাদের সময় শেষ হওয়ার আগেই। অধ্যায় ৮ আন-আনফাল, আয়াত ২৪:

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদের জীবন দান করে..."

শিঙ্গার ফুঁৎকার সৃষ্টির মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করবে। সহীহ মুসলিমের ৭৩৮১ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এটি এমন একটি আহ্বান যা কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারে না বা করবে না। এটি পুনরুত্থান এবং চূড়ান্ত বিচারের দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, মুসলমানদের উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেওয়া, আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকবে। এটি উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। এছাড়াও, যে কেউ এই পৃথিবীতে এই আহ্বানে সাড়া দেবে তার জন্য চূড়ান্ত আহ্বান সহ্য করা এবং সাড়া দেওয়া সহজ হবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর ডাকে গাফেল থাকে, সে সেখানে শান্তি পাবে না এবং তাকে শিঙ্গার ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য করা হবে, যা তাদের জন্য সহ্য করা এবং সাড়া দেওয়া এক বিরাট বোঝা। একজন ব্যক্তি কেবল ততক্ষণ পর্যন্তই আল্লাহর ডাককে উপেক্ষা করতে পারে যতক্ষণ না শেষ আহ্বান আসবে, দেরিতে হোক বা দেরিতে, এবং কেউই তা এড়াতে বা উপেক্ষা করতে সক্ষম হবে না। যদি এটি অনিবার্য হয়, তাহলে গাফেল থাকার পরিবর্তে এখনই, আজই এর প্রতি সাড়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। যদি কেউ গাফেল অবস্থায় শিঙ্গার আওয়াজ শোনে, তাহলে কোনও পদক্ষেপ বা অনুশোচনা তাদের জন্য উপকারী হবে না এবং পরবর্তীকালে এই ব্যক্তির জন্য যা ঘটবে তা আরও ভয়াবহ হবে।

অল্পের জন্য অনেক

উহুদের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের নিহত সাহাবীদের খোঁজ নিতে উহুদ পাহাড় থেকে নেমে আসেন। তারা উসাইরিম আমর ইবনে সাবেতকে, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তার শেষ নিঃশ্বাসে দেখতে পান। তারা তাকে দেখে অবাক হয়ে যান কারণ তিনি মদিনায় বসবাসকারী কয়েকজন মুশরিকের মধ্যে একজন ছিলেন যারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি যখন মদিনার যাত্রা থেকে ফিরে আসেন, তখন তিনি এলাকাটি খালি দেখতে পান। যখন তিনি সেখানকার লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তখন তাকে বলা হয় যে তারা মক্কার অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উহুদের দিকে যাত্রা করেছে। এই সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উহুদের দিকে রওনা হন যেখানে তিনি অমুসলিমদের বিরুদ্ধে কঠোর লড়াই করেন যতক্ষণ না তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। তাঁর শেষ নিঃশ্বাসের সময়, তিনি সাহাবীগণকে বলেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং তারপর মৃত্যুবরণ করেন। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) নিশ্চিত করেছেন যে তিনি জান্নাতীদের একজন এবং মন্তব্য করেছেন যে তিনি সামান্য পরিশ্রমের বিনিময়ে অনেক কিছু অর্জন করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) তার গল্প বলতেন এবং আরও বলতেন যে তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি একটিও নামাজ না পড়েই জান্নাতে প্রবেশ করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর (সাঃ) নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১৫০-১১৫১-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি ৪৭তম অধ্যায় মুহাম্মদের ৭ম আয়াতের সাথে সম্পর্কিত :

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করবেন।"

এই আয়াতের অর্থ হলো, কেউ যদি ইসলামকে সাহায্য করে, তাহলে মহান আল্লাহ উভয় জগতেই তাদের সাহায্য করবেন। এটা আশ্চর্যজনক যে অসংখ্য মানুষ আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, কিন্তু আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, তার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এই আয়াতের প্রথম অংশটি পূরণ করে না। বেশিরভাগ মানুষ যে অজুহাত দেয় তা হল, তাদের সৎকর্ম করার সময় নেই। তারা আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, কিন্তু তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সময় বের করে না। এর কি কোন যুক্তি আছে? যারা বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালন করে না এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে আল্লাহর সাহায্যের আশা করে, তারা বেশ বোকা। আর যারা বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালন করে কিন্তু তার বাইরে যেতে অস্বীকার করে, তারা দেখতে পায় যে তারা যে সাহায্য পায় তা সীমিত। কেউ কীভাবে আচরণ করে তার সাথে কীভাবে আচরণ করা হয়। মহান আল্লাহর জন্য যত বেশি সময় এবং শক্তি নিবেদিত হয়, তারা তত বেশি সমর্থন পাবে। এটা সত্যিই এত সহজ।

একজন মুসলিমের বুঝতে হবে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মতো বেশিরভাগ ফরজ কাজই তার দিনের মধ্যে খুব অল্প সময়ের জন্য সম্পন্ন হয়। একজন মুসলিম কখনোই আশা করতে পারে না যে, প্রতিদিন মাত্র এক ঘন্টা ফরজ নামাজ আদায়ের জন্য সময় ব্যয় করবে এবং তারপর বাকি সময় আল্লাহকে অবহেলা করবে এবং সমস্ত অসুবিধার মধ্যেও তাঁর অবিরাম সহায়তা আশা করবে। একজন ব্যক্তি এমন বন্ধুকে অপছন্দ করবে যে তার সাথে এমন আচরণ করে। তাহলে কীভাবে একজন ব্যক্তি বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর সাথে এমন আচরণ করতে পারে?

কেউ কেউ পার্থিব কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে, তারপর স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করে তার সমাধানের জন্য তাঁর কাছে দাবি করে। এই বোকা মানসিকতা স্পষ্টতই আল্লাহর দাসত্বের পরিপন্থী। এটা আশ্চর্যজনক যে এই ধরণের ব্যক্তিরা তাদের অন্যান্য অবসর কাজ যেমন পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো, টিভি দেখা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য সময় বের করে কিন্তু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সময় বের করে না। তারা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং গ্রহণ করার জন্য সময় বের করে না। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অধ্যয়ন এবং তার উপর আমল করার জন্য সময় বের করে না। এই লোকেরা কোনওভাবে তাদের অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা ব্যয় করার জন্য সম্পদ খুঁজে পায় কিন্তু স্বেচ্ছায় দান করার জন্য কোন সম্পদ খুঁজে পায় না।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিমের সাথে তার আচরণ অনুসারে আচরণ করা হবে। অর্থাৎ, যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য অতিরিক্ত সময় উৎসর্গ করে, তাহলে তারা সমস্ত অসুবিধার মধ্য দিয়ে নিরাপদে ভ্রমণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবে। কিন্তু যদি তারা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় অথবা শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য অন্য কোনও সময় উৎসর্গ না করেই তা পালন করে, তাহলে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে একই রকম প্রতিক্রিয়া পাবে। সহজ কথায়, যে যত বেশি দেবে, সে তত বেশি পাবে। যদি কেউ বেশি না দেয়, তবে তার বিনিময়ে খুব বেশি আশা করা উচিত নয়।

রাগের উপর কর্তৃত্ব

উহুদের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের নিহত সাহাবীদের খোঁজখবর নিতে উহুদ পাহাড় থেকে নেমে আসেন। যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের, বিশেষ করে তাঁর চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)-এর বিকৃত দেহ দেখেন, তখন তিনি রাগান্বিত হন এবং মন্তব্য করেন যে, পরের বার যখন অমুসলিমরা তাদের উপর বিজয় লাভ করবে, তখন তিনি তাদের বিকৃত করে প্রতিশোধ নেবেন। সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, একই রকম মন্তব্য করেন। মহান আল্লাহ এই প্রসঙ্গে সূরা আন নাহলের ১২৬ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"যদি তোমরা প্রতিশোধ নাও, তাহলে তোমাদের যা কষ্ট হয়েছে তার সমপরিমাণ শাস্তি দাও। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, তাহলে অবশ্যই ধৈর্যশীলদের জন্য তা উত্তম।"

মহানবী (সা.) তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করে নেন এবং সর্বদা স্পষ্টভাবে তাঁর প্রেরিত প্রতিটি সেনাবাহিনীকে শত্রু সৈন্যদের বিকৃত করতে নিষেধ করেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর (সা.)-এর নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১৬০-১১৬১-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, মহানবী (সা.)-এর প্রতিক্রিয়া এই সত্যকে আরও স্পষ্ট করে তোলে যে তিনি একজন মানুষ, কোন ফেরেশতা নন। পবিত্র

কুরআনে এবং তাঁর জীবনকালে এই বৈশিষ্ট্যটি বহুবার তুলে ধরা হয়েছে, যাতে মানুষ তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, যেমন তিনি তাদের অনুভূতি অনুভব করেছিলেন, তিনি তাদের অভিজ্ঞতা যেমন রাগ অনুভব করেছিলেন। সূরা আল-কাহফ, আয়াত ১১০:

"বলুন, "আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী এসেছে যে তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য..."

যে আদর্শের সাথে মানুষ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না, সে আদর্শ আদর্শ নয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন একজন আদর্শ আদর্শ কারণ তিনি একজন মানুষ ছিলেন এবং অন্যান্য সকল মানুষের মতোই অনুভব করেছিলেন, তবুও তিনি ইসলাম এবং মহৎ চরিত্রের সীমানার মধ্যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। উপরন্তু, এই ঘটনাটি ইঙ্গিত দেয় যে, একজন মুসলিমের উচিত যখনই তারা সঠিক আচরণের সীমা অতিক্রম করে তখনই তাদের কথা এবং কাজ দ্রুত সংশোধন করা, কারণ এটি নিশ্চিত করবে যে তারা সঠিক পথে অটল থাকবে যা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে।

দ্বিতীয়ত, আলোচিত মূল ঘটনাটি রাগ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ বুখারীতে ৬১১৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন ব্যক্তিকে রাগ না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

বাস্তবে, এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে, কোনও ব্যক্তির কখনই রাগ করা উচিত নয় কারণ রাগ একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য যা এমনকি নবীগণের (সাঃ) মধ্যেও পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, কিছু বিরল ক্ষেত্রে রাগ আত্মরক্ষার মতো কাজে লাগতে পারে। এই হাদিসের অর্থ আসলে এই যে, একজন ব্যক্তির উচিত তার রাগ নিয়ন্ত্রণ করা যাতে তা তাকে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে না নিয়ে যায়, যা নবীগণ (সাঃ) দ্বারা নিখুঁতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদিসটি দেখায় যে রাগ অনেক মন্দের দিকে পরিচালিত করতে পারে এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করলে অনেক কল্যাণ হয়।

প্রথমত, এই উপদেশটি এমন সমস্ত ভালো গুণাবলী গ্রহণ করার নির্দেশ যা একজন ব্যক্তিকে তার রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে উৎসাহিত করবে, যেমন ধৈর্য।

এই হাদিসটি আরও ইঙ্গিত করে যে, একজন ব্যক্তির রাগের উপর নির্ভর করে কাজ করা উচিত নয়। বরং, রাগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিজের সাথে সংগ্রাম করা উচিত যাতে এটি তাকে পাপের দিকে পরিচালিত না করে। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগ নিয়ন্ত্রণ করা একটি মহান কাজ এবং ঐশ্বরিক প্রেমের দিকে পরিচালিত করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৪:

"... যারা রাগ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে - এবং আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

ইসলামে এমন অনেক শিক্ষা রয়েছে যা মুসলমানদের তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে উৎসাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, যেহেতু রাগ শয়তানের সাথে সম্পর্কিত এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাই সহীহ বুখারীতে ৩২৮২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, রাগান্বিত ব্যক্তির উচিত শয়তান থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

জামে আত তিরমিযী, ২১৯১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে একজন রাগান্বিত মুসলিমকে মাটিতে আঁকড়ে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হতে পারে যে তাদের শান্ত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে সিজদা করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, যত বেশি কেউ নিষ্ক্রিয় দেহের অবস্থান গ্রহণ করবে, ততই তার রাগ প্রকাশের সম্ভাবনা কম থাকবে। সুনানে আবু দাউদের ৪৭৮২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার রাগকে নিজের মধ্যে আটকে রাখতে পারে যতক্ষণ না তা কেটে যায় যাতে এটি অন্যদের উপর নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে।

যে মুসলিম রাগান্বিত, তার উচিত সুনান আবু দাউদের ৪৭৮৪ নম্বর হাদিসে বর্ণিত উপদেশ অনুসরণ করা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) রাগান্বিত মুসলিমকে অজু করার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ পানি রাগের সহজাত বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ তাপকে প্রতিহত করে। এরপর যদি কেউ নামাজ পড়ে, তাহলে এটি তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণে আরও সাহায্য করবে এবং মহান সওয়াবের দিকে পরিচালিত করবে।

এখন পর্যন্ত আলোচিত উপদেশগুলি একজন রাগান্বিত মুসলিমকে তাদের শারীরিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। নিজের কথা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, রাগের সময় কথা বলা থেকে বিরত থাকাই ভালো। দুর্ভাগ্যবশত, শারীরিক কার্যকলাপের চেয়ে কথার প্রভাব প্রায়শই অন্যদের উপর বেশি স্থায়ী হতে পারে। রাগের মধ্যে বলা কথার কারণে অসংখ্য সম্পর্ক ভেঙে গেছে এবং ভেঙে গেছে। এই আচরণ প্রায়শই অন্যান্য পাপ এবং অপরাধের দিকে পরিচালিত করে। একজন মুসলিমের জন্য সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৭০ নম্বরে পাওয়া হাদিসটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে সতর্ক করা হয়েছে যে বিচারের দিনে একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য কেবল একটি খারাপ কথার প্রয়োজন।

রাগ নিয়ন্ত্রণ করা একটি মহান পুণ্য এবং যে ব্যক্তি এটিকে আয়ত্তে আনতে পারে তাকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন শক্তিশালী ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন, সহীহ বুখারী, ৬১১৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগকে গ্রাস করে, অর্থাৎ, তারা তাদের রাগের কারণে কোনও পাপ করে না, তার হৃদয় শান্তি এবং প্রকৃত ঈমানে পূর্ণ হবে। সুনান আবু দাউদের ৪৭৭৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত সুস্থ হৃদয়ের এটিই একটি বৈশিষ্ট্য। এটিই একমাত্র হৃদয় যা বিচারের দিন নিরাপত্তা লাভ করবে। ২৬শে সূরা আশ শু'আরা, আয়াত ৮৮-৮৯:

"যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কারো কোন উপকারে আসবে না। কেবল সেই ব্যক্তিই লাভবান হবে যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।"

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সীমার মধ্যে রাগ কার্যকর হতে পারে। এটি নিজের, ঈমানের এবং সম্পদের ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য ব্যবহার করা উচিত, যা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সঠিকভাবে করা হলে, মহান আল্লাহর জন্য রাগ হিসেবে গণ্য হবে। এটি ছিল মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অবস্থা, যিনি কখনও নিজের ইচ্ছার জন্য রাগ করেননি। তিনি কেবল মহান আল্লাহর জন্য রাগ করেছিলেন, যা সহিহ মুসলিম, ৬০৫০ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চরিত্র ছিল পবিত্র কুরআন, যা সহিহ মুসলিম, ১৭৩৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হল তিনি যা খুশি তাই খুশি হতেন এবং যা রাগ করত তাই রাগ করতেন। উপরন্তু, মহান আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা, ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। সুনানে আবু দাউদের ৪৬৮১ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ঘৃণার মূল হলো রাগ। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে ইসলাম রাগকে নিবৃত্ত করার নির্দেশ দেয় না, কারণ এটি অর্জন করা আসলে সম্ভব নয়, বরং ইসলামের সীমানার মধ্যে থেকে রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হওয়া প্রশংসনীয়, কিন্তু যদি এই রাগ সীমা অতিক্রম করে তবে তা নিন্দনীয় হয়ে ওঠে। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি যখন তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হয়। সুনানে আবু দাউদের ৪৯০১ নম্বর হাদিসে একজন ইবাদতকারী সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি কেউ রাগান্বিতভাবে দাবি করে যে, আল্লাহ তাআলা একজন নির্দিষ্ট পাপীকে ক্ষমা করবেন না। ফলস্বরূপ, সেই ইবাদতকারীকে জাহান্নামে পাঠানো হবে এবং পাপীকে বিচারের দিন ক্ষমা করা হবে।

মন্দের উৎপত্তি চারটি জিনিস থেকে: নিজের ইচ্ছা, ভয়, মন্দ ক্ষুধা এবং রাগ নিয়ন্ত্রণে না থাকা। অতএব, যে ব্যক্তি এই হাদিসের উপদেশ গ্রহণ করবে, সে তার চরিত্র এবং জীবন থেকে এক-চতুর্থাংশ মন্দ দূর করবে।

পরিশেষে, মুসলমানদের জন্য তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা এমন কোনও কাজ বা কথা না বলে যা তাদের ইহকাল ও পরকালে চরম অনুশোচনার দিকে ঠেলে দেয়।

একটি অঙ্গীকার পূর্ণ হয়েছে

উহুদের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, তাদের নিহত সাহাবীদের খোঁজখবর নিতে উহুদ পাহাড় থেকে নেমে আসেন। মহানবী (সা.) একজন শহীদ সাহাবী, মুসআব বিন উমাইর (রা.)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন এবং সূরা আল আহযাবের ২৩ নম্বর আয়াত পাঠ করেন:

"মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতিতে সত্যবাদী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছে [মৃত্যুর আগ পর্যন্ত], এবং কেউ কেউ [তার সুযোগের] অপেক্ষা করছে। এবং তারা [তাদের প্রতিশ্রুতির শর্তাবলী] কোন পরিবর্তন করেনি।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসআব বিন উমাইর (রাঃ) এর কাছে কেবল একটি পশমী চাদর ছিল। তাঁর দাফনের সময়, যখন তাঁর মাথা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হত, তখন তাঁর পা খোলা থাকত এবং যখন তাঁর পা পশমী চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হত, তখন তাঁর মাথা খোলা থাকত। মহানবী (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তাঁর মাথা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত এবং তাঁর পা ঢাকতে ঘাস ব্যবহার করা উচিত। হামজা (রাঃ) এর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। ইমাম ইবনে কাথির, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৬ এবং ইমাম সাফি উর রহমানের, দ্য সিলড নেকটার, পৃষ্ঠা ২৮৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়াও, এই যুদ্ধের সময় হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.) নিহত হন। ওয়াহশী বিন হারব ছিলেন জুবাইর বিন মুত'ইম নামে এক অমুসলিম ব্যক্তির দাস। উহুদের যুদ্ধে জুবাইর প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদি তিনি হামজা (রা.)-কে হত্যা করেন, তাহলে তিনি ওয়াহশীকে মুক্ত করে দেবেন। যুদ্ধের সময় ওয়াহশী হামজা (রা.)-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং দূর থেকে তাঁর দিকে বর্শা নিক্ষেপ করেন, যা তাঁর পেট ভেদ করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করে। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ২৬১-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ঘটনাটি ইসলামকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করার প্রতিটি পরিস্থিতিতেই আন্তরিকভাবে আল্লাহকে আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি পূরণের গুরুত্বকে নির্দেশ করে। এই আনুগত্যের মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস অনুসারে সঠিকভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা জড়িত। অতএব, একজন মুসলিম হওয়া ঈমানের মৌখিক ঘোষণার বাইরে এবং কার্যত আল্লাহকে আনুগত্য করা জড়িত। যে ব্যক্তি আল্লাহকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, সে সেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য পাবে না যা আল্লাহ আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্যকারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৯:

"সুতরাং তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, যদি তোমরা [সত্যিকারের] মুমিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।"

উপরন্তু, এই ব্যক্তিকে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য বিচারের দিন জবাবদিহি করতে হবে। বিচারের দিন এই ব্যক্তির কী হবে তা নির্ধারণ করার জন্য পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

কুরআনের জ্ঞান

উহুদের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, তাদের নিহত সাহাবীদের খোঁজখবর নিতে উহুদ পাহাড় থেকে নেমে আসেন। সীমিত সরবরাহের কারণে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) দুজন শহীদ সাহাবীর, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, দাফনের সময় তাদের উপর এক টুকরো কাপড় পরিয়ে দিতেন। তিনি আদেশ দিয়েছিলেন যে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে যার ভালো জ্ঞান আছে তাকে প্রথমে কবরে রাখা উচিত। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং সহীহ বুখারী, ১৩৪৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি পবিত্র কুরআন বোঝা এবং তার উপর আমল করার গুরুত্বকে নির্দেশ করে কারণ এটিই ছিল একজন সাহাবীকে অন্য একজন সাহাবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

ইমাম মুনজারীর "সচেতনতা ও উপলব্ধি", ৩০ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, পবিত্র কুরআন বিচার দিবসে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে জীবদ্দশায় এটি অনুসরণ করবে তাদের বিচার দিবসে এটি জান্নাতে নিয়ে যাবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে জীবদ্দশায় এটিকে অবহেলা করবে তারা দেখবে যে এটি তাদেরকে বিচার দিবসে জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি পথনির্দেশনার গ্রন্থ। এটি কেবল তেলাওয়াতের গ্রন্থ নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সকল দিক পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে যাতে এটি উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে।

প্রথম দিকটি হল এটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিতভাবে তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয় দিকটি হল একজন নির্ভরযোগ্য আলেমের মাধ্যমে এটি বোঝা। এবং শেষ দিকটি হল মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসারে এর শিক্ষার উপর আমল করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা পবিত্র কুরআনের উপর সঠিকভাবে আমল করবে, কারণ মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনই পবিত্র কুরআনের ব্যবহারিক বাস্তবায়ন। যারা এইভাবে আচরণ করে তারাই পৃথিবীর প্রতিটি কঠিন সময়ে সঠিক পথনির্দেশনা এবং কিয়ামতের দিনে এর সুপারিশের সুসংবাদ পায়। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

কিন্তু মূল হাদিস অনুসারে, পবিত্র কুরআন কেবল তাদের জন্য পথনির্দেশনা এবং রহমত যারা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে এর দিকগুলি সঠিকভাবে পালন করে। কিন্তু যারা এটিকে বুঝতে এবং তার উপর আমল করতে অস্বীকৃতি জানায় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে এর ভুল ব্যাখ্যা করে এবং পরিবর্তে তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, তারা বিচারের দিনে এই সঠিক পথনির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। সূরা ত্বাহা, আয়াত ১২৪:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন] এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।"

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময়, একজন মুসলিমের কেবল এই উদ্দেশ্যেই এটি ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থাৎ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি তেলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে একটি হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, যা কোনও সমস্যার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং সমস্যা সমাধানের পরে আবার একটি হাতিয়ার বাক্সে রাখা হয়। পবিত্র কুরআনের মূল কাজ হল পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য এই পৃথিবীর কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পথ দেখানো। পবিত্র কুরআন বোঝা এবং তার উপর আমল না করে এই উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব নয়। অন্ধ তেলাওয়াত যথেষ্ট নয়। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং কেবল নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলিমের আচরণের বিরোধিতা করে। এটি এমন ব্যক্তির মতো যে অনেক ধরণের জিনিসপত্র সহ একটি গাড়ি কিনে কিন্তু এটি চালানো যায় না, যা একটি গাড়ির মূল উদ্দেশ্য। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তি কেবল বোকা। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাজিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু এটি জালেমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।"

যখন অন্যরা চলে যায়

উহুদের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের শহীদ সাহাবীদের খোঁজখবর নিতে উহুদ পাহাড় থেকে নেমে আসেন। জাবির বিন আবদুল্লাহ, যার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন, তার শোক দেখার পর, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে উৎসাহিত করেন এই বলে যে, আল্লাহ কেবল পর্দার আড়াল থেকে কারো সাথে কথা বলেন, যেখানে তিনি তার পিতার সাথে মুখোমুখি কথা বলেন। আল্লাহ, মহান, তার পিতাকে তাঁর কাছে কিছু চাইতে বলেন। তার পিতা, আব্দুল্লাহ, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, উত্তর দেন যে তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসতে এবং তাঁর পথে যুদ্ধ করতে এবং আবার নিহত হতে চান। আল্লাহ, মহান, তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে তিনি ইতিমধ্যেই ফয়সালা করেছেন যে তাদের মৃত্যুর পর কেউ পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। পরিবর্তে, আল্লাহ, তৃতীয় সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ নম্বর আয়াত নাজিল করেন, যেখানে লোকদের তার পিতার অবস্থা এবং অন্যান্য শহীদদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়:

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা তাদের পালনকর্তার কাছে জীবিত, রিযিকপ্রাপ্ত।"

ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ঘটনাটি মানুষের ক্ষতির সাথে ইতিবাচকভাবে মোকাবিলা করার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

প্রতিদিন মানুষ তাদের প্রিয়জনদের হারায়। এটি একটি অনিবার্য পরিণতি। একজন মুসলিম এই কঠিন সময়ে অনেক কিছু মনে রাখতে এবং সেগুলি অনুসরণ করতে পারে। একটি বিষয় হল পরিস্থিতিকে ইতিবাচকভাবে পর্যবেক্ষণ করা। অর্থাত্, কেউ যা হারিয়েছে তাতে দুঃখিত হওয়ার পরিবর্তে, তার উচিত সেই ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত ভালো জিনিসগুলির উপর মনোনিবেশ করা যা সে হারিয়ে গেছে, যেমন তার ভালো পরামর্শ এবং নির্দেশনা। যখন কেউ এই বিষয়ে চিন্তা করে তখন সে বুঝতে পারবে যে তাকে হারানোর আগে তাকে জানা ভালো ছিল, তাকে একেবারেই না জানার চেয়ে। এটি উক্তির অনুরূপ, ভালোবাসা এবং হারানো ভালো, একেবারেই না ভালোবাসার চেয়ে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই উক্তিটি প্রসঙ্গের বাইরে নেওয়া হয় এবং অপব্যবহার করা হয় কিন্তু যখন এইভাবে ব্যবহার করা হয় তখন এটি সঠিক এবং সহায়ক।

অধিকন্তু, একজন মুসলিম যিনি নিঃসন্দেহে পরকালে বিশ্বাস করেন, তাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে মানুষ এই পৃথিবীতে কেবল একে অপরকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য মিলিত হয় না। বরং তারা কেবল পরকালে আবার দেখা করার জন্যই এই পৃথিবী ছেড়ে যায়। এই মনোভাব এমন কঠিন সময়ে ধৈর্য ধারণে সাহায্য করতে পারে। এবং এটি তাদেরকে আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে তাদের প্রিয়জনের সাথে চিরকালের জন্য মিলিত হতে অনুপ্রাণিত করবে।

ইতিবাচক মনোভাব

উহুদের যুদ্ধের পর যখন মুসলিম সেনাবাহিনী মদিনায় ফিরে আসে, তখন একজন মহিলাকে বলা হয় যে তার স্বামী, বাবা এবং ভাই উহুদে শহীদ হয়েছেন। তার একমাত্র উত্তর ছিল মহানবী (সা.)-এর সুস্থতা সম্পর্কে। যখন তাকে বলা হয় যে তিনি জীবিত আছেন, তখন তিনি জোর দিয়ে বলেন যে তারা যেন তাকে তাঁর কাছে নিয়ে যান যাতে তিনি নিজেই দেখতে পান। যখন তারা এটি করে, তখন তিনি মন্তব্য করেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিরাপদ থাকেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত দুর্ভাগ্য কিছুই নয়। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ২৮৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য ইতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি তাদের অসুবিধা মোকাবেলায় সাহায্য করার একটি দুর্দান্ত হাতিয়ার যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে পারে। যখনই কোনও ব্যক্তি সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তাদের সর্বদা একটি সত্য বুঝতে হবে যে অসুবিধাটি আরও খারাপ হতে পারত। যদি এটি একটি পার্থিব সমস্যা হত তবে তাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে এটি তাদের ঈমানকে প্রভাবিত করে এমন কোনও দুর্দশা ছিল না। অসুবিধার সাথে আসা তাৎক্ষণিক দুঃখের উপর চিন্তা করার পরিবর্তে, তাদের শেষ এবং সেই পুরস্কারের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য প্রদর্শনকারীদের জন্য অপেক্ষা করছে। যখন কোনও ব্যক্তি কিছু আশীর্বাদ হারায় তখন তাদের এখনও থাকা অগণিত আশীর্বাদগুলি স্মরণ করা উচিত। প্রতিটি আশীর্বাদের মধ্যে, একজন মুসলিমের পবিত্র কুরআনের আয়াতটি মনে রাখা উচিত যা মুসলমানদের মনে করিয়ে দেয় যে এমন অনেক গোপন জ্ঞান রয়েছে যা তারা পর্যবেক্ষণ করেনি এমন অসুবিধা এবং পরীক্ষাগুলির মধ্যে। অতএব, তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে তা তাদের কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির চেয়ে ভাল। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

পরিশেষে, একজন মুসলিমের উচিত এই তথ্য এবং অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করা যাতে তারা একটি ইতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করতে পারে যা এমনভাবে অসুবিধা মোকাবেলার একটি মূল উপাদান যা উভয় জগতেই অসংখ্য আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। মনে রাখবেন, পেয়ালাটি অর্ধেক খালি নয় বরং অর্ধেক পূর্ণ।

শোকের সময়

উহুদের যুদ্ধের পর মুসলিম সেনাবাহিনী যখন মদিনায় ফিরে আসে, তখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের নিহত আত্মীয়দের জন্য মহিলাদের বিলাপ করতে শুনতে পান। যুদ্ধের সময় শহীদ হওয়া তাঁর চাচা হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিবের জন্য কেউ শোক প্রকাশ করতে না পেরে তিনি দুঃখিত হয়ে পড়েন। মনে রাখতে হবে যে ইবনে মাসউদের মতে, তিনি এবং অন্যান্য সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, কখনও নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে এত কাঁদতে দেখেননি যতটা তিনি হামজা (সাঃ) এর বিকৃত দেহ দেখেছিলেন। এরপর তাদের পুরুষ আত্মীয়রা এই মহিলাদের হামজার জন্য বিলাপ করতে বলেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের জন্য প্রার্থনা করেন কিন্তু উত্তর দেন যে তিনি এটি চান না এবং সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি বিলাপ পছন্দ করেন না। এর পরে তিনি বিলাপ করতে নিষেধ করেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭ এবং ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ২৮৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদের ৩১২৭ নম্বর হাদিসে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানুষকে বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, প্রিয়জন হারানোর মতো কঠিন সময়ে কাঁদতে নিষেধ। এটি ভুল কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অনেক সময় কারো মৃত্যুতে কেঁদেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর পুত্র ইব্রাহিম (রাঃ) যখন মারা গিয়েছিলেন, তখন তিনি কেঁদেছিলেন। সুনানে আবু দাউদের ৩১২৬ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, কারো মৃত্যুতে কান্না করা হলো রহমতের একটি নিদর্শন যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে স্থাপন করেছেন। এবং যারা অন্যদের প্রতি করুণা করে, কেবল তাদেরই আল্লাহ দয়া করবেন। সহীহ বুখারীতে ১২৮৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাতির মৃত্যুতে কেঁদেছিলেন।

সহীহ মুসলিমের ২১৩৭ নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে যে, কারো মৃত্যুতে কান্নাকাটি করার জন্য অথবা তার অন্তরে শোকের জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না। তবে যদি সে এমন কথা বলে যা আল্লাহর পছন্দের প্রতি তার অধৈর্যতা প্রকাশ করে, তাহলে তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হতে পারে।

এটা স্পষ্ট যে, কারো অন্তরে শোক প্রকাশ করা বা চোখের জল ফেলা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। যেসব জিনিস নিষিদ্ধ তা হলো বিলাপ করা, কথা বা কাজের মাধ্যমে অধৈর্যতা প্রকাশ করা, যেমন শোকে কাপড় ছিঁড়ে ফেলা বা মাথা ন্যাড়া করা। যারা এই ধরণের কাজ করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কীকরণ রয়েছে। অতএব, যেকোনো মূল্যে এই ধরণের কাজ এড়িয়ে চলা উচিত। এই ধরণের কাজ করার জন্য একজন ব্যক্তিকে কেবল শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে না, বরং যদি মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর সময় অন্যদের এই ধরণের কাজ করতে ইচ্ছা করে এবং আদেশ দেয়, তাহলে তাকেও জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তি এটি না চায়, তাহলে তারা কোনও জবাবদিহি থেকে মুক্ত। জামে আত তিরমিযী, ১০০৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা বোঝা সাধারণ জ্ঞানের বিষয় যে, মহান আল্লাহ, অন্যের কাজের জন্য কাউকে শাস্তি দেবেন না, যখন পূর্ববর্তী ব্যক্তি তাকে সেইভাবে কাজ করার পরামর্শ দেননি। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ১৮:

"আর কোন বোঝা বহনকারী অন্য কারো বোঝা বহন করবে না..."

অসুবিধার মধ্যে আনুগত্য

উহুদের যুদ্ধের পর যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ মদিনায় ফিরে আসেন, তখন তারা জানতে পারেন যে মক্কার অমুসলিম নেতারা ইসলামকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য মদিনার দিকে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের গুরুতর ক্ষত এবং ক্লান্ত দেহ থাকা সত্ত্বেও, অমুসলিমদের পিছনে ধাওয়া করার জন্য বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যখন সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তখন আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা আলে ইমরানের ১৭২ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"যারা [ঈমানদাররা] আঘাত পাওয়ার পরও আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে। তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মা'বাদ ইবনে আবু মা'বাদ নামে এক ব্যক্তি মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর সেনাবাহিনীর সাথে দেখা করে তাঁর সমবেদনা ও সেবা প্রদান করেন। মহানবী (সাঃ) তাকে অমুসলিম সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছাতে এবং মদীনা আক্রমণ থেকে তাদের নিরুৎসাহিত করতে বলেন। অবশেষে তিনি অমুসলিম সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছান এবং তাদেরকে মদীনা আক্রমণ না করার জন্য সতর্ক করেন কারণ মহানবী (সাঃ) একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন যারা তিক্ত

পরিণতি পর্যন্ত লড়াই করার জন্য প্রস্তুত ছিল। এর মাধ্যমে, মহান আল্লাহ, অমুসলিমদের হৃদয়ে ভয় ঢুকিয়ে দেন যারা মক্কায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, যদিও মহানবী (সাঃ) কে হত্যা করা এবং মদীনার বাইরে তাদের বাণিজ্য মূল সুরক্ষিত করার তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ব্যর্থ হয়েছিল। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৫১:

"যারা কাফের, তাদের অন্তরে আমরা ভীতি সঞ্চার করব কারণ তারা আল্লাহর সাথে এমন কিছু শরীক করেছে যার কোন প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি। তাদের আবাসস্থল হবে আগুন, আর জালেমদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট।"

অমুসলিম নেতা আবু সুফিয়ান একটি বাণিজ্য কাফেলার মাধ্যমে মহানবী (সাঃ) এর কাছে বার্তা পাঠান যে, অমুসলিম সেনাবাহিনী আরও বেশি সমর্থন সংগ্রহ করেছে এবং মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুত। তিনি আশা করেছিলেন যে এই মিথ্যা তথ্য মহানবী (সাঃ) কে তাদের তাড়া করা থেকে বিরত রাখবে। তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে, কারণ তারা তাদের তাড়া করেছিল কিন্তু অমুসলিমরা তাদের নাগালের বাইরে চলে যায়। এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা আলে ইমরানের ১৭৩-১৭৪ আয়াত নাজিল করেছেন:

“যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, “নিশ্চয়ই, লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে জড়ো হয়েছে, তাই তাদের ভয় করো।” কিন্তু এতে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পেল এবং তারা বলল, “আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক।” অতঃপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এল, কোন অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করল, আর আল্লাহই মহা অনুগ্রহের অধিকারী।”

ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ২৮৮-২৯১ এবং ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৩:১৫১, পৃষ্ঠা ৪২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, এমনকি চাপ ও অসুবিধার সময়েও, তাদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের প্রতি তাদের মহান উৎসাহের ইঙ্গিত দেয়। স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও আনুগত্য করা এত কঠিন নয়। আসল পরীক্ষা তখনই হয় যখন কেউ সমস্যার মুখোমুখি হয় এবং ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও আনুগত্য করে। অতএব, অসুবিধার মুখোমুখি হওয়াই সেই পরীক্ষা যা তাদের মধ্যে পার্থক্য করে যারা আল্লাহ, মহিমান্বিত, বিশ্বাস করার দাবিতে সত্যবাদী এবং যারা তা করে না। সূরা ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ২-৩:

"মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না? কিন্তু আমরা অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি, আর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা মিথ্যাবাদী।"

অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই স্বাচ্ছন্দ্য ও অসুবিধা উভয় সময়েই আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকার মাধ্যমে তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণা প্রমাণ করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। এর ফলে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে

সঠিকভাবে স্থান দেবে। এর ফলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসবে। অন্যথায়, এই আয়াতগুলি দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, তারা দেখতে পাবে যে তাদের সাথে এই পৃথিবীতে এবং পরকালে মিথ্যাবাদীর মতো আচরণ করা হচ্ছে যদি তারা তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়। এটি নির্ধারণ করার জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না যে, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ উভয় জগতেই মিথ্যাবাদী বলে গণ্য করেন, তিনি এই পৃথিবীতে বা পরকালে মানসিক শান্তি পাবেন না।

বিভাগ সৃষ্টিকারী

উহুদের যুদ্ধের পর যখন মুসলিম সেনাবাহিনী মদিনায় ফিরে আসে, তখন মুনাফিকরা শোকাহত সাহাবীদের (আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন) সুযোগ নেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তাদের আবেগগতভাবে বিচ্ছিন্ন করে। ইহুদি পণ্ডিত এবং মুনাফিকরা দাবি করেছিল যে ইসলাম যদি সত্য হত তবে তারা পরাজিত হত না। এই প্রসঙ্গে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা আল-বাকারার, আয়াত ১০৯, নাযিল করেন:

"অনেক কিতাবী চায় যে, তোমাদের ঈমান আনার পর তোমাদেরকে আবার কুফরীতে ফিরিয়ে আনুক, কারণ তারা নিজেদের হিংসা করে, সত্য তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও। অতএব, ক্ষমা করো এবং উপেক্ষা করো যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর আদেশ দেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৭ এবং ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ২:১০৯, পৃষ্ঠা ৭ -এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ভণ্ডামির লক্ষণ হলো, একজন ব্যক্তি সমাজে দুর্নীতি ছড়িয়ে দেয়। এই নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য পারিবারিক ইউনিট থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক স্তরে শেষ পর্যন্ত সকল সামাজিক স্তরকে প্রভাবিত করে। এই ধরণের ব্যক্তি ভালোর জন্য একত্রিত হতে দেখতে অপছন্দ করে কারণ এর ফলে অন্যদের পার্থিব মর্যাদা তাদের নিজেদের চেয়েও বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি তাদের গীবত এবং অপবাদের দিকে ঠেলে দেয় যাতে মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে চলে যায়। তাদের মন্দ মনোভাব তাদের নিজস্ব আত্মীয়তার বন্ধন ধ্বংস করে এবং যখন তারা অন্য পরিবারগুলিকে সুখী দেখতে

পায় তখন তাদের সুখও নষ্ট করে। তারা দোষ খুঁজে বের করার লোক যারা তাদের সামাজিক মর্যাদাকে টেনে নামানোর জন্য অন্যদের ভুল উন্মোচন করার জন্য তাদের সময় ব্যয় করে। তারাই প্রথম ব্যক্তি যারা অন্যদের সম্পর্কে পরচর্চা শুরু করে এবং ভালো কথা বলা হলে বধির আচরণ করে। শান্তি ও নীরবতা তাদের বিরক্ত করে তাই তারা নিজেদের মনোরঞ্জনের জন্য সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করে। তারা সুনান ইবনে মাজাহ, ২৫৪৬ নম্বরে পাওয়া হাদিসটি মনে রাখতে ব্যর্থ হয়। এটি পরামর্শ দেয় যে যে কেউ অন্যের দোষ ঢেকে রাখে, আল্লাহ, তার দোষ ঢেকে রাখবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করে এবং প্রকাশ করে, আল্লাহ তাআলা তার দোষ-ত্রুটি মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবেন। সুতরাং, বাস্তবে, এই ধরণের ব্যক্তি কেবল সমাজের কাছে নিজের দোষ-ত্রুটিই প্রকাশ করছে, যদিও তারা বিশ্বাস করে যে তারা অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করছে।

অধিকন্তু, এটা স্পষ্ট যে সকল নবী-রাসূল (সাঃ) বিভিন্ন ধরণের কষ্ট ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পরীক্ষিত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪০২৩ নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, তারা সকল মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষিত হয়েছিলেন। অতএব, মুসলমানদের বুঝতে হবে যে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করা, অসুবিধা থেকে সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয় না। এটি আসলে অসুবিধাগুলির মধ্য দিয়ে নিরাপদ যাত্রা এবং একটি বিশাল পুরষ্কারের নিশ্চয়তা দেয় যাতে একজন ব্যক্তি উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করতে পারে। ৩৯ আয-যুমার, আয়াত ১০:

"... অবশ্যই, ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান বিনা হিসাবেই দেওয়া হবে।"

১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎ কর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

উহুদের যুদ্ধের জ্ঞানগর্ভ দিকগুলো

উহুদের যুদ্ধের সময়, যখন কিছু মুসলিম তীরন্দাজ তাদের অবস্থান থেকে নেমে আসে, তখন মুসলিম সেনাবাহিনীর পিছনের অংশ উন্মুক্ত হয়ে যায়। এরপর অমুসলিম সেনাবাহিনী একত্রিত হয়ে উভয় দিক থেকে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে। এর ফলে অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, শহীদ হন এবং অমুসলিমরা তাদের দেহ বিকৃত করে। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯-৩০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটা স্পষ্ট যে, মুসলিমদের এত ক্ষতির মূল কারণ ছিল তীরন্দাজদের ভুল বিচারবুদ্ধি। তারা অনিচ্ছাকৃতভাবে মহানবী (সা.)-এর অবাধ্য হয়েছিল, কারণ তারা বিশ্বাস করত যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং তাঁর আদেশ আর প্রযোজ্য হবে না। এর অর্থ হল, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিম আন্তরিকভাবে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সাফল্য পাবে, কিন্তু যদি তারা তাঁর অবাধ্য হয়, তাহলে এই সমর্থন প্রত্যাহার করা হবে। ৪র্থ সূরা আন-নিসা, আয়াত ৮০:

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করল..."

এবং ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, ৩১ আয়াত:

“বলুন, [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], “যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।”

এবং ২৪ নুর অধ্যায়, ৬৩ নং আয়াত:

"তোমরা নিজেদের মধ্যে রাসূলের আহ্বানকে একে অপরের প্রতি আহ্বানের মতো মনে করো না। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে যায় তাদের অবশ্যই জানেন। অতএব, যারা তাঁর [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আদেশের বিরোধিতা করে তাদের সতর্ক থাকা উচিত, পাছে তাদের উপর কোন বিপদ আসে অথবা তাদের উপর কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসে।"

অধিকন্তু, নবীগণ, তাদের শত্রুদের উপর কখনও কখনও বিজয়ী হন এবং কখনও কখনও তাদের শত্রুরা বিজয়ী হন, যদিও চূড়ান্ত বিজয় সর্বদা নবীগণ, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তাদের পক্ষেই হয়। এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির কারণ হল প্রকৃত বিশ্বাসীদের মুনাফিক এবং সুবিধাবাদীদের থেকে পৃথক করা, যারা সর্বদা পার্থিব সুবিধা অর্জনের জন্য সফল দলে যোগ দেয়। যদি নবীগণ, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, সর্বদা জয়ী হন, তাহলে মুনাফিক এবং সুবিধাবাদীরা আন্তরিক বিশ্বাসীদের থেকে অনির্বাণ হয়ে যাবে। যদি নবীগণ, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, সর্বদা হেরে যান, তাহলে এটি তাদের লক্ষ্যকে বাধাগ্রস্ত করবে। সূরা ৩ আলী ইমরান, আয়াত ১৪০:

"যদি তোমাদের কোন আঘাত লাগে, তবে [বিরোধী] লোকদেরও ইতিমধ্যেই অনুরূপ আঘাত লেগেছে। আর এই দিনগুলো [বিভিন্ন অবস্থার] আমরা মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তিত করি যাতে আল্লাহ ঈমানদারদের প্রকাশ করেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে শহীদদেরকে নিজের কাছে গ্রহণ করেন..."

জয়-পরাজয়ের এই পরিবর্তনের আরেকটি কারণ হলো, বিশ্বাসীদের ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা উভয়ই গ্রহণ করতে শেখানো। যদি তারা সব সময় হেরে যায়, তাহলে তারা হয়তো ধৈর্যশীল হতে পারে কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কঠিন হবে। যদি তারা সব সময় জয়ী হয়, তাহলে তারা হয়তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে কিন্তু প্রকৃত ধৈর্য ধারণ করতে তাদের কষ্ট করতে হবে। পরিস্থিতির পরিবর্তন তাদের ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা উভয়ই গ্রহণ করার সুযোগ করে দেয়: দুটি অংশ যা উভয় জগতে সাফল্য অর্জনের জন্য অত্যাবশ্যক। নিয়তে কৃতজ্ঞতা বলতে কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করা জড়িত। কারো কথায় কৃতজ্ঞতা বলতে ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা জড়িত। আর কারো কাজে কৃতজ্ঞতা বলতে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জড়িত। উপরন্তু, ধৈর্য বলতে নিজের কথা বা কাজে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা, বিশ্বাস করা যে তিনি কেবল তার জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক পথে কাজ করে, সে মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থন এবং করুণা লাভ করবে, যা উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

করুণা দেখানো

উহুদের যুদ্ধের পর, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কখনও সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, ভর্ৎসনা করেননি বা তিরস্কার করেননি, যারা তাদের অবস্থান ত্যাগ করেছিলেন এবং উহুদের যুদ্ধে তাদের পরাজয়ের দিকে পরিচালিত করেছিলেন। এরপর আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা আলে ইমরানের ১৫৯ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"অতএব আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের প্রতি কোমল ছিলে। আর যদি তুমি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতে, তাহলে তারা তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। অতএব, তাদের ক্ষমা করো, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাদের সাথে পরামর্শ করো। আর যখন তুমি সিদ্ধান্ত নিবে, তখন আল্লাহর উপর নির্ভর করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ [তাঁর উপর নির্ভরকারীদের] ভালোবাসেন।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী (সা.) এমন সংকটময় সময়ে সেনাবাহিনী ত্যাগ করার জন্য মুনাফিকদের সমালোচনাও করেননি। এতে তারা কেবল ক্রোধে পতিত হতো এবং ইসলাম থেকে আরও দূরে সরে যেত। পরিবর্তে তিনি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও দয়া প্রদর্শন করতে থাকেন এই আশায় যে তারা এই করুণার কাজটিকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করবে এবং আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবে এবং ইসলাম গ্রহণ করবে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর (সা.)-এর নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২০৩-১২০৪-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদিস জুড়ে, মুসলমানদের অন্যদের প্রতি দয়ালু হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, জামে আত তিরমিযী, ১৯২৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে যারা সৃষ্টির প্রতি দয়া করে, আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করবেন।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, দয়া দেখানো কেবল নিজের কাজের মাধ্যমেই নয়, যেমন দরিদ্রদের সম্পদ দান করা। এটি আসলে নিজের জীবনের প্রতিটি দিক এবং অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন নিজের কথা। এই কারণেই আল্লাহ, মহান, দানশীলতার মাধ্যমে অন্যদের প্রতি দয়া প্রদর্শনকারীদের সতর্ক করে দেন যে, তাদের কথার মাধ্যমে দয়া প্রদর্শন না করা, যেমন অন্যদের প্রতি করা তাদের অনুগ্রহ গণনা করা, কেবল তাদের প্রতিদান বাতিল করে দেয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৬৪:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের দান-খয়রাতকে স্মরণ করিয়ে অথবা কষ্ট দিয়ে নষ্ট করো না..."

প্রকৃত করুণা সবকিছুতেই প্রকাশিত হয়: মুখের ভাব, দৃষ্টিভঙ্গি এবং কথা বলার স্বর। এটাই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত পূর্ণ করুণা, এবং তাই মুসলমানদের অবশ্যই এইভাবেই কাজ করতে হবে।

অধিকন্তু, করুণা প্রদর্শন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অসংখ্য সুন্দর ও মহৎ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন, তবুও মানুষের হৃদয়কে তাঁর এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার একমাত্র কারণ ছিল করুণা।

পূর্বে উদ্‌ধৃত আয়াতটি স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দেয় যে, দয়া না থাকলে মানুষ মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছ থেকে পালিয়ে যেত, তাঁর উপর শান্তি ও শান্তি বর্ষিত হোক। যদি তাঁর ক্ষেত্রেও এমন হতো, যদিও তিনি অসংখ্য সুন্দর গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন, তবুও মুসলমানরা, যাদের মধ্যে এই ধরনের মহৎ গুণাবলী নেই, তারা প্রকৃত দয়া না দেখিয়ে অন্যদের উপর, যেমন তাদের সন্তানদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে কীভাবে?

সহজ কথায়, মুসলমানদের অন্যদের সাথে সেই আচরণ করা উচিত যে আচরণ তারা আল্লাহ, সর্বশক্তিমান এবং অন্যদের দ্বারা তাদের সাথে করা হোক, যা নিঃসন্দেহে সত্যিকারের এবং পূর্ণ করুণার সাথে করা হয়।

দুটি জিহ্বা

উহুদের যুদ্ধে, মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তার অনুসারীদের নিয়ে উহুদ থেকে পিছু হটে যান। মহানবী (সাঃ) জুমার খুতবা দেওয়ার আগে, আবদুল্লাহ বিন উবাই প্রায়শই উঠে ঘোষণা করতেন যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের মধ্যে আছেন এবং আল্লাহ (সাঃ) তাদের সম্মান ও মহিমা দান করেছেন। এরপর তিনি মদীনার লোকদেরকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে সমর্থন করার, তাঁর কথা শোনার এবং তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিতেন। উহুদের যুদ্ধের পর এবং জুমার খুতবার আগে, তিনি তার স্বাভাবিক অকৃতজ্ঞ বক্তৃতা দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান কিন্তু এবার সাহাবীগণ (রাঃ) তাকে মারধর করেন, যারা তাকে বসতে এবং চুপ থাকতে বলেন কারণ তিনি আর নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মসজিদে লোকদের সাথে কথা বলার যোগ্য নন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৭১-৭২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুনাফিকের লক্ষণ হলো দ্বিমুখী হওয়া। এই ব্যক্তিই বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকদের খুশি করার জন্য তাদের আচরণ পরিবর্তন করে, যার মাধ্যমে তারা কিছু পার্থিব জিনিসপত্র অর্জনের ইচ্ছা পোষণ করে। তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, বিভিন্ন লোকের প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করে, কিন্তু তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। তারা মানুষের প্রতি আন্তরিক হতে ব্যর্থ হয় যা সুনানে আন নাসায়ী, ৪২০৪ নম্বরে বর্ণিত একটি হাদিসে নির্দেশিত হয়েছে। যদি তারা তওবা না করে তবে তারা আখেরাতে আগুনের দুটি জিহ্বা নিয়ে নিজেদের দেখতে পাবে। সুনানে আবু দাউদের ৪৮৭৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় আল বাকারা, আয়াত ১৪:

"যখন তারা মুমিনদের সাথে দেখা করে, তখন বলে, "আমরা ঈমান এনেছি", আর যখন তারা তাদের দুষ্ট সঙ্গীদের সাথে (একান্তে) মিলিত হয়, তখন বলে, "আমরা তোমাদের সাথে আছি; আমরা তো কেবল রসিকতা করছিলাম।"

আবদুল্লাহ বিন উবাই রাগান্বিতভাবে মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং তার দরজায় কিছু সাহাবীর সাথে দেখা করলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন। যখন তিনি তাদের ঘটনাটি জানালেন, তখন তারা তাকে পরামর্শ দিলেন যে, তিনি যেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং মহানবী (সাঃ) এর কাছেও তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি অহংকার করে তাদের আন্তরিক পরামর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। আল্লাহ, মহিমান্বিত, এই বিষয়ে সূরা আল মুনাফিকুনের ৫-৬ আয়াত নাযিল করেন:

“আর যখন তাদেরকে বলা হয়, “এসো, আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন,” তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে অহংকার করে পালিয়ে যেতে দেখো। তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো বা না করো, তাদের জন্য সমান; আল্লাহ কখনো তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপাচারী জাতিকে পথ দেখান না।”

এটি তাফসির ইবনে কাসির, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৬৫৩-৬৫৪-এ আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, যার আধ্যাত্মিক হৃদয়ে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে, অহংকার হলো যখন কেউ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যদের অবজ্ঞা করে।

অহংকারে ভরা ব্যক্তির কোন পরিমাণ সৎকর্মই কোন কাজে আসবে না। শয়তান যখন অহংকারী হয়ে ওঠে, তখন তার অগণিত বছরের ইবাদত তার কোন উপকারে আসেনি, তখন এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্টভাবে অহংকারকে কুফরের সাথে সংযুক্ত করে, তাই একজন মুসলিমকে যেকোনো মূল্যে এই খারাপ বৈশিষ্ট্য এড়িয়ে চলতে হবে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ৩৪:

"আর [স্মরণ করো] যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, "আদমের সামনে সিজদা করো"; তখন তারা সিজদা করলো, ইবলিস ছাড়া। সে অস্বীকৃতি জানালো এবং অহংকার করলো এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।"

অহংকারী হলো সেই ব্যক্তি যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন তা তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয় কেবল এই কারণে যে এটি তাদের কাছ থেকে আসেনি এবং এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে। অহংকারী ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যদিও তারা মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে তাদের প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা হয়তো বিশ্বাস করে যে তারা তাদের করা অল্প কিছু অকৃত্রিম এবং অসম্পূর্ণ সৎকর্মের কারণে তারা মহান, অথচ তাদের অসংখ্য পাপের কারণে তারা আল্লাহ তায়ালা দ্বারা অপছন্দিত। উপরন্তু, অন্যদের অবজ্ঞা করা বোকামি কারণ কেউ তাদের নিজের চূড়ান্ত পরিণতি এবং অন্যদের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞ। অর্থাত্, তারা যাকে অবজ্ঞা করে সে হয়তো একজন আন্তরিক মুসলিম হিসেবে মারা যেতে পারে, অন্যদিকে, তারা কাফের হিসেবে মারা যেতে পারে।

বাস্তবে, আল্লাহ তাআলা একজন ব্যক্তির সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং দান করেছেন বলে মনে করে যে তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন, তা নিয়ে গর্ব করা বোকামি। এমনকি একজন ব্যক্তি যে সৎকর্ম করেন তাও কেবল আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত অনুপ্রেরণা, জ্ঞান এবং শক্তির কারণে। অতএব, এমন কিছু নিয়ে গর্ব করা যা তার সহজাতভাবে নিজস্ব নয়, তা স্পষ্ট বোকামি। এটি ঠিক এমন একজন ব্যক্তির মতো যে এমন একটি প্রাসাদের জন্য গর্ব করে যা তার মালিকানাধীন নয় বা যেখানে সে বাস করে না।

এই কারণেই অহংকার আল্লাহর, কারণ তিনিই একমাত্র সকল কিছুর স্রষ্টা এবং সহজাত মালিক। যে ব্যক্তি অহংকার করে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সুনানে আবু দাউদের ৪০৯০ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলিমের উচিত নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। বিনয়ী ব্যক্তিরা সত্যিকার অর্থে স্বীকার করে যে তাদের সমস্ত ভালো দিক এবং সমস্ত মন্দ দিক যা থেকে তারা সুরক্ষিত তা আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছ থেকে আসে না। অতএব, অহংকারের চেয়ে নম্রতা একজন ব্যক্তির জন্য বেশি উপযুক্ত। একজন ব্যক্তিকে এই বিশ্বাসে বিভ্রান্ত করা উচিত নয় যে নম্রতা অপমানের দিকে পরিচালিত করে, কারণ আল্লাহর বিনীত বান্দাদের চেয়ে বেশি সম্মানিত আর কেউ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, ২০২৯ নম্বরে বর্ণিত একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নম্রতা গ্রহণকারীর মর্যাদা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিয়েছেন। একজন বিনয়ী ব্যক্তি সত্য গ্রহণ করে, তা যে কারো কাছ থেকে আসুক না কেন, কারণ তারা জানে যে সত্যের উৎস আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন। অন্যদের অবজ্ঞা করার পরিবর্তে, তারা অন্যদের প্রতি করুণা ও করুণার দৃষ্টিতে দেখে এবং আন্তরিক কর্মের মাধ্যমে এটিকে সমর্থন করে, সর্বদা আশা করে যে আল্লাহ, মহান, তাদের প্রতি করুণা ও করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন। তারা বোঝে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে সেই

আচরণ করবেন যেভাবে তারা অন্যদের সাথে আচরণ করে। সহীহ বুখারীতে ৭৩৭৬ নম্বর হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে।

বিশ্বাসের উপর দৃঢ়তা

উহুদের যুদ্ধের কিছু সময় পর, আবু সুফিয়ান এবং ইকরিমা ইবনে আবু জাহল সহ মক্কার কিছু প্রবীণ অমুসলিম মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের সাথে দেখা করতে আসেন। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা সফরের সময় তাদের সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন, সম্ভবত আশা করেছিলেন যে তাদের অবস্থানকালে তাদের হৃদয় ইসলামের প্রতি নরম হবে। তাদের সফরের সময়, তারা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে বলেছিলেন যে তাদের মূর্তিগুলির সমালোচনা করবেন না এবং বরং ঘোষণা করবেন যে তাদের মূর্তিগুলি আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখে এবং বিনিময়ে তারা তাকে একা ছেড়ে দেবেন। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-কে তাদের মদীনা থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এই বিষয়ে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা আল আহযাবের ৩৩ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"হে নবী, আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।"

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৩৩:১, পৃষ্ঠা ১২৭-১২৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনা এবং আয়াতটি এই বিষয়টি বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে, যেহেতু মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং সর্বজ্ঞ, তাই তিনিই মানবজাতিকে অনুসরণ করার জন্য সর্বোত্তম আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক

শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে। তিনিই কেবল মানুষকে তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শেখাতে পারেন যাতে তারা মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ভারসাম্য অর্জন করতে পারে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে। অন্যদিকে, মানুষের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা এবং অভিজ্ঞতা নেই যে এমন একটি আচরণবিধি তৈরি করতে পারে যা উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অতএব, একজন ব্যক্তির এই সত্য গ্রহণ করা উচিত এবং নিজের স্বার্থে ইসলামী আচরণবিধি অনুসারে কাজ করা উচিত। তাদের এমন একজন জ্ঞানী রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তা মেনে চলেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। ঠিক যেমন এই জ্ঞানী রোগী ভালো মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তা মেনে চলেন তিনিও ভালো হবেন। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের প্রেসক্রাইব করা ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝেন না এবং তাই অন্ধভাবে তাদের ডাক্তারের উপর বিশ্বাস করেন, তবুও মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষার উপর চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে লোকেরা অন্ধভাবে ইসলামের শিক্ষার উপর বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

ধর্মভীরুতা অনুসন্ধান করুন

নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় হিজরতের তৃতীয় বছরে, উসমান বিন আফফান তাঁর পূর্ববর্তী স্ত্রী উম্মে কুলসুমের বোন রুকাইয়া (রাঃ) এর মৃত্যুর পর, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কন্যা উম্মে কুলসুম (রাঃ)-কে বিয়ে করেন। উসমান (রাঃ)-ই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একের পর এক দুটি কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর "জীবনী", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৮২-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিয়ের পর, যখন মহানবী (সাঃ) তাঁর কন্যাকে উসমান (রাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তিনি তাকে সর্বোত্তম স্বামী হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "উসমান ইবনে আফফানের জীবনী", যুন-নূরাইন, পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনান ইবনে মাজাহের ১১০ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহান আল্লাহ তাআলা উসমানকে উম্মে কুলসুম (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কেবলমাত্র উসমান (রাঃ) একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন বলেই এই বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন। অতএব, যদি মুসলমানরা এমন একজন ভালো জীবনসঙ্গী চায় যে তাদের অধিকার পূরণ করবে, তাহলে তাদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষার ভিত্তিতে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করতে হবে।

সহীহ বুখারীতে ৫০৯০ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তিকে চারটি কারণে বিবাহ করা হয়: তার সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য অথবা তার ধার্মিকতার জন্য। তিনি এই সতর্কবাণী দিয়ে শেষ করেছেন যে, একজন ব্যক্তির উচিত ধার্মিকতার জন্য বিবাহ করা, অন্যথায় সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এই হাদিসে উল্লেখিত প্রথম তিনটি জিনিস খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং অসম্পূর্ণ। এগুলো হয়তো কাউকে ক্ষণস্থায়ী সুখ দিতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই জিনিসগুলো তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে কারণ এগুলো বস্তুগত জগতের সাথে যুক্ত, চূড়ান্ত এবং স্থায়ী সাফল্য প্রদানকারী জিনিসের সাথে নয়, অর্থাৎ বিশ্বাসের সাথে। সম্পদ সুখ বয়ে আনে না তা বোঝার জন্য কেবল ধনী এবং বিখ্যাতদের পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, ধনীরা পৃথিবীর সবচেয়ে অসন্তুষ্ট এবং অসুখী মানুষ। বংশের জন্য কাউকে বিয়ে করা বোকামি কারণ এটি নিশ্চিত করে না যে ব্যক্তিটি একজন ভালো জীবনসঙ্গী হবে। প্রকৃতপক্ষে, যদি বিবাহ সফল না হয়, তবে এটি বিয়ের আগে দুটি পরিবারের মধ্যে যে পারিবারিক বন্ধন ছিল তা ধ্বংস করে দেয়। শুধুমাত্র সৌন্দর্যের জন্য, অর্থাৎ ভালোবাসার জন্য বিয়ে করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কারণ এটি একটি অস্থির আবেগ যা সময়ের সাথে সাথে এবং মেজাজের সাথে পরিবর্তিত হয়। প্রেমে ডুবে থাকা কত দম্পতি একে অপরকে ঘৃণা করতে শুরু করে?

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে একজন দরিদ্র জীবনসঙ্গী খুঁজে বের করা উচিত, যেমনটি এমন কাউকে বিয়ে করা গুরুত্বপূর্ণ যে আর্থিকভাবে পরিবারকে সাহায্য করতে পারে। এর অর্থ এইও নয় যে একজনের তার জীবনসঙ্গীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়, কারণ এটি একটি সুস্থ বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তবে এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে এই জিনিসগুলি কোনও ব্যক্তির বিবাহের প্রধান বা চূড়ান্ত কারণ হওয়া উচিত নয়।

একজন মুসলিমের একজন স্ত্রীর মধ্যে যে প্রধান এবং চূড়ান্ত গুণটি সন্ধান করা উচিত তা হল ধার্মিকতা। এটি তখনই ঘটে যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। সহজ কথায়, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভয় করে, সে সুখ এবং অসুবিধা উভয় সময়েই তার স্ত্রীর সাথে ভাল আচরণ করবে। অন্যদিকে, যারা ধর্মহীন তারা যখনই মন খারাপ করবে তখনই তার স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মুসলমানদের মধ্যে পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ার এটি একটি প্রধান কারণ। এবং এমনকি যখন তারা তাদের স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তখনও তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে তাদের অধিকার পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, যা দূর করতে ধার্মিকতা সাহায্য করে। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ২৮:

"... আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল তারাই ভয় করে, যারা জ্ঞানী..."

পরিশেষে, ধার্মিক ব্যক্তি সর্বদা অন্যদের অধিকার পূরণের ব্যাপারে বেশি চিন্তিত থাকে, যেমন তাদের স্ত্রী, তার চেয়ে তারা মানুষের অধিকার পূরণের ব্যাপারে বেশি চিন্তিত। কারণ তারা বোঝে যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে তারা মানুষের অধিকার পূরণ করেছে কিনা। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন না যে মানুষ তাদের অধিকার পূরণ করেছে কিনা, কারণ এটি তখনই মোকাবেলা করা হবে যখন আল্লাহ অন্যদের প্রশ্ন করবেন, যখন তিনি তাদের প্রশ্ন করবেন না। অন্যদিকে, দুষ্ট মুসলিম কেবল তাদের অধিকার সম্পর্কেই চিন্তিত থাকবে, সেই অধিকারগুলি যা তারা সমাজ, সংস্কৃতি, ফ্যাশন এবং তাদের কল্পনা থেকে নিয়েছে, ইসলাম থেকে নয়। ফলস্বরূপ, তারা কখনই তাদের স্ত্রীর প্রতি সত্যিকার অর্থে সন্তুষ্ট হবে না, এমনকি যদি তাদের স্ত্রী ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার পূরণ করে। এই কারণেই ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং বিবাহবিচ্ছেদ এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

পরিশেষে, যদি কোন মুসলিম বিয়ে করতে চায়, তাহলে তাকে প্রথমে এর সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যেমন তাদের স্ত্রীর উপর তাদের কী অধিকার, তাদের স্ত্রীর উপর তাদের কী অধিকার এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের স্ত্রীর সাথে কীভাবে সঠিকভাবে আচরণ করতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত, এই বিষয়ে অজ্ঞতা অনেক বিতর্ক এবং বিবাহবিচ্ছেদের দিকে পরিচালিত করে কারণ লোকেরা এমন কিছু দাবি করে যা তাদের স্ত্রী পূরণ করতে বাধ্য নয়। অতএব, জ্ঞান, যা ধার্মিকতার মূল, একটি সুস্থ ও সফল বিবাহের ভিত্তি।

অভিবাসনের পর চতুর্থ বছর

দৃঢ়তার সাথে কষ্টের মুখোমুখি হওয়া

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের চতুর্থ বছরে, উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষতির পর মদিনার প্রতি বহিরাগত হুমকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন অমুসলিম গোত্র বিশ্বাস করত যে উহুদের ঘটনা মুসলমানদের দুর্বল করে দিয়েছে এবং তারা আর বদরের যুদ্ধে বিজয়ী শক্তিশালী শক্তি ছিল না। এই গোত্রগুলির মধ্যে অনেকেই মদিনা জয় করার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুযোগ হিসেবে এটিকে গ্রহণ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, বনু আসাদ গোত্র মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য যোদ্ধা সংগ্রহ করেছিল। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) অমুসলিমদের মাতৃভূমিতে ১৫০ জন যোদ্ধার একটি মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করে তাদের আক্রমণের আগে তাদের লক্ষ্যবস্তুতে প্রেরণ করেন এবং তাদের অভিযানকে ব্যর্থ করে দেন, তাদের যোদ্ধাদের ছত্রভঙ্গ করেন এবং যুদ্ধের কিছু মাল অর্জন করেন। আরেকটি অমুসলিম গোত্র মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য কিছু যোদ্ধা সংগ্রহ করে। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন যারা তাদের নেতাকে হত্যা করতে এবং তাদের যোদ্ধাদের দলকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার" বইয়ের ২৯৬-২৯৭ পৃষ্ঠায় এটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে প্রতিটি কঠিন পরিস্থিতি ও আক্রমণ মোকাবেলা করেছেন।

সহীহ মুসলিমের ১৫৯ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে তাদের বিশ্বাস ঘোষণা করার এবং তারপরে তার উপর অবিচল থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হলো, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যে সংগ্রাম করা। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোজা এবং মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহ, মহানের মধ্যে এবং অন্যদের সাথে সম্পর্কিত। একজন মুসলিমকে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে, সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

পরিশেষে, এর মধ্যে রয়েছে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসারে এই দিকগুলি পূরণ করা। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

দৃঢ়তার মধ্যে উভয় ধরণের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান প্রকার হল যখন কেউ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা করে। গৌণ প্রকার হল যখন কেউ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুর জন্য ভালো কাজ করে, যেমন লোক দেখানো। সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৮৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, দৃঢ়তার একটি দিক হল সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা এবং কখন এবং কোন ইসলামী শিক্ষা কেউ তার ইচ্ছানুযায়ী অনুসরণ করবে তা থেকে বিরত থাকা।

দৃঢ়তার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, নিজের বা অন্যদের আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পরিবর্তে। যদি কোন মুসলিম নিজেকে বা অন্যদের খুশি করে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়, তাহলে তার জানা উচিত যে তার ইচ্ছা বা মানুষ কেউই তাকে আল্লাহ তাআলার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল, সে যদি এই সুরক্ষা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়, তবুও তিনি তাকে সবকিছু থেকে রক্ষা করবেন।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস দ্বারা নির্ধারিত পথ অনুসরণ করা এবং এমন পথ গ্রহণ না করা যা এই পথ থেকে বিচ্যুত হয়। যে ব্যক্তি এই পথ গ্রহণ করার চেষ্টা করবে তার আর কোনও কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটি তাদের ঈমানে অবিচল রাখার জন্য যথেষ্ট। ৪র্থ সূরা আন নিসা, আয়াত ৫৯:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্যে করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী..."

এই আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অবিচল থাকার একটি দিক হল এমন কারো আনুগত্য করা যার আদেশ ও উপদেশ আল্লাহ, মহানবী (সাঃ) এবং মহানবী (সাঃ) এর আন্তরিক আনুগত্যের উপর নিহিত।

যেহেতু মানুষ নিখুঁত নয়, তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। তাই ঈমানের ক্ষেত্রে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে, বরং এর অর্থ হল তাদের অবশ্যই পূর্বে বর্ণিত মহান আল্লাহর আনুগত্য কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে এবং পাপ করলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 সূরা ফুসসিলাতের 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"...তাই তোমরা তাঁর দিকে সোজা পথ অবলম্বন করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো..."

জামে আত তিরমিযী, ১৯৮৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থিত, যেখানে মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে সংঘটিত (ছোট) পাপ মোচন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই ২, হাদিস নম্বর ৩৭-এ প্রাপ্ত আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) মুসলমানদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার জন্য যথাসাধ্য

চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা এটি নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবে না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল তাদের নিয়ত এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে প্রদত্ত সম্ভাবনাকে আল্লাহ, মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে পূরণ করা। তাদের পরিপূর্ণতা অর্জনের আদেশ দেওয়া হয়নি কারণ এটি সম্ভব নয়।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ তার আধ্যাত্মিক হৃদয়কে প্রথমে পবিত্র না করে শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৮৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কেবল তখনই বিশুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় পবিত্র থাকে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসের শিক্ষা অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই হৃদয়ের বিশুদ্ধতা অর্জন করা সম্ভব।

অবিচল আনুগত্যের জন্য জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করে। জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ না করে মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, ২৪০৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, যদি মহান আল্লাহর আনুগত্যে কোন ত্রুটি দেখা দেয়, তাহলে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তওবা করা উচিত এবং মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। সূরা আল আহকাফ, আয়াত ১৩:

"নিশ্চয়ই যারা বলেছে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ," অতঃপর সৎপথে অবিচল রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

ভালোবাসার প্রমাণ

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের চতুর্থ বছরে, মদিনার বাইরে বসবাসকারী একটি গোত্র ইসলাম গ্রহণের দাবি করে এবং মহানবী (সাঃ) কে অনুরোধ করে যে তারা তাদের গোত্রে কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের ইসলাম সম্পর্কে আরও শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠান। মহানবী (সাঃ) কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, কিন্তু তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, শহীদ হন, অন্যদের বন্দী করে মক্কার অমুসলিমদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যখন এই বন্দীদের একজন, যায়েদ বিন আল-দাসীনা, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তিনি কি নবী (সাঃ) এর সাথে স্থান পরিবর্তন করতে পছন্দ করবেন? তিনি শপথ করে বলেন যে, তিনি চান না যে, মহানবী (সাঃ) মৃত্যুদণ্ড থেকে বেঁচে গেলেও তাঁর শরীরে কাঁটা বিঁধুক। একজন অমুসলিম নেতা, আবু সুয়ফান, মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি কখনও দেখেননি যে কোন দল সাহাবীদের (রাঃ) চেয়ে বেশি ভালোবাসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৮৬-৮৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়াও, খুবাইব বিন আদি (রা.) ছিলেন মক্কার এক অমুসলিম ব্যক্তির কাছে বন্দী হয়ে বিক্রি হয়েছিলেন, যারা বদরের যুদ্ধে তার আত্মীয় খুবাইব (রা.)-এর মৃত্যুর প্রতিশোধ হিসেবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চেয়েছিলেন। খুবাইব (রা.)-এর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের দিন নিজেকে পরিষ্কার করার জন্য একটি ক্ষুর অনুরোধ করেছিলেন। একজন দাসী তার ছোট ছেলেকে খুবাইব (রা.)-এর কাছে ক্ষুর দিয়ে পাঠান, যিনি তাদের ঘরে শৃঙ্খলিত ছিলেন। তখন সে বুঝতে পারে যে সে ভুল করেছে এবং ভয় পায় যে খুবাইব (রা.)-এর মৃত্যুদণ্ডের প্রতিশোধ হিসেবে শিশুটিকে হত্যা করতে পারে। সে শিশুটিকে তার কোলে বসে থাকতে দেখে শিশুটিকে তার হাতে তুলে দেয় এবং মন্তব্য করে যে সে কখনও কোনও শিশুর ক্ষতি করবে না। সেদিন, যখন তাকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন সে দুই রক নামাজ পড়ার জন্য অনুরোধ করে, যা তাকে করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

তারা তাকে নির্যাতন করে আশা করেছিল যে সে ইসলাম ত্যাগ করবে, কিন্তু সে অবিচল ছিল। অবশেষে, মক্কার অমুসলিমরা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয় এবং ক্রুশবিদ্ধ করে। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৮৬-৮৮ এবং ইমাম মুহাম্মদ কান্ধলভীর "হায়াতুস সাহাবা", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫০৯-৫১০" -এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উভয়েই ইসলামের উপর অটল থেকে এবং নিজেদের চেয়ে তাঁর নিরাপত্তা কামনা করে মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাদের ভালোবাসার প্রমাণ দিয়েছেন।

প্রতিটি মুসলিম খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করে যে তারা পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), অন্যান্য নবীগণ, সাহাবীগণ এবং সাহাবীগণের সাহচর্য কামনা করে। তারা প্রায়শই সহীহ বুখারীতে ৩৬৮৮ নম্বর হাদিসটি উদ্‌ধৃত করে, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে একজন ব্যক্তি পরকালে যাদের ভালোবাসে তাদের সাথেই থাকবে। এবং এই কারণে তারা খোলাখুলিভাবে আল্লাহর এই নেক বান্দাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা ঘোষণা করে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তারা কীভাবে এই পরিণতি কামনা করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসার দাবি করে, অথচ তারা তাঁকে খুব কমই চেনে কারণ তারা তাঁর জীবন, চরিত্র এবং শিক্ষা অধ্যয়ন করতে ব্যস্ত। এটা বোকামি কারণ একজন ব্যক্তি কীভাবে সত্যিকার অর্থে এমন কাউকে ভালোবাসতে পারে যাকে তারা চেনেই না?

তাছাড়া, যখন এই লোকদের কাছে মহানবী (সাঃ) এর প্রতি তাদের ভালোবাসার প্রমাণ চাওয়া হবে, তখন বিচার দিবসে তারা কী বলবে? তারা কী উপস্থাপন করবে? এই ঘোষণার প্রমাণ হলো মহানবী (সাঃ) এর জীবন, চরিত্র এবং শিক্ষা অধ্যয়ন করা এবং তার উপর আমল করা। এই প্রমাণ ছাড়া কোন ঘোষণা মহান আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। এটি বেশ স্পষ্ট কারণ সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, তাদের চেয়ে ইসলামকে আর কেউ ভালোভাবে বুঝতে পারেনি এবং

এটি তাদের মনোভাব ছিল না। তারা মহানবী (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা ঘোষণা করেছিলেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কর্মের মাধ্যমে তাদের দাবিকে সমর্থন করেছিলেন। এই কারণেই তারা পরকালে তাঁর সাথে থাকবেন।

যারা বিশ্বাস করে যে ভালোবাসা হৃদয়ে থাকে এবং কাজে তা প্রকাশের প্রয়োজন হয় না, তারা সেই ছাত্রের মতোই বোকা, যে তার শিক্ষকের কাছে খালি পরীক্ষার খাতা ফেরত দিয়ে দাবি করে যে জ্ঞান তার মনে আছে তাই তাকে বাস্তবে তা কাগজে লিখে রাখার প্রয়োজন নেই এবং তারপরও সে পাস করার আশা করে।

যে ব্যক্তি এমন আচরণ করে, সে আল্লাহর নেক বান্দাদের ভালোবাসে না, কেবল তাদের নিজেদের কামনা-বাসনাকেই ভালোবাসে এবং নিঃসন্দেহে শয়তান তাদের বোকা বানিয়েছে।

পরিশেষে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যান্য ধর্মের সদস্যরাও তাদের পবিত্র নবীদের প্রতি ভালোবাসার দাবি করে, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। কিন্তু যেহেতু তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে এবং তাদের শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই বিচারের দিনে তারা অবশ্যই তাদের সাথে থাকবে না। এই সত্যটি যদি কেউ একবার চিন্তা করে দেখে তবে এটি বেশ স্পষ্ট।

অধিকন্তু, খুবাইব (রাঃ) যখন জানতেন যে মক্কার অমুসলিমরা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেবে, তখনও তিনি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। এটি ইসলামের শিক্ষার উপর অটল থাকার গুরুত্ব নির্দেশ করে, এমনকি যখন অন্যরা তাদের উপর অত্যাচার করে। একজন মুসলিমকে আত্মরক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু ইসলামের সীমানার মধ্যে। অতএব, একজন ব্যক্তি কখন মুসলিমের মতো আচরণ করবে

এবং কখন করবে না তা বেছে নিতে পারে না। তাদের ইসলামকে একটি পোশাকের মতো আচরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে যা তারা তাদের ইচ্ছা অনুসারে খুলে ফেলে এবং পরবে। ইসলাম একটি সম্পূর্ণ আচরণবিধি যা প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করতে ব্যর্থ হয় সে কেবল নিজের আনুগত্য করছে এবং নিজের উপাসনা করছে, এমনকি যদি তারা অন্যথা দাবি করে। অধ্যায় 25 আল ফুরকান, আয়াত 43:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

অতএব, একজন ব্যক্তির উচিত ইসলামের প্রতি তার মৌখিক বিশ্বাসের ঘোষণাকে সমর্থন করা, প্রতিটি পরিস্থিতিতে তার শিক্ষার উপর আমল করা, এমনকি যদি তার ইচ্ছার সাথে সাংঘর্ষিক হয়।

উপেক্ষা করা এবং ক্ষমাশীল

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের চতুর্থ বছরে, অমুসলিম নেতা আবু সুফিয়ান মন্তব্য করেন যে তাদের উচিত নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যা করার জন্য কাউকে পাঠানো। একজন বেদুইন তার মন্তব্য শুনে গোপনে তার সাথে বৈঠক করেন যেখানে তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এই খারাপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্মত হন। বেদুইন মদিনায় রওনা হন এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে তার মসজিদে তাঁর সাহাবীদের সাথে দেখতে পান। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মন্তব্য করেন যে লোকটি বিশ্বাসঘাতকতার ইচ্ছা করেছিল কিন্তু আল্লাহ, মহিমান্বিত, তার পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেবেন। যখন তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিকটবর্তী হন, তখন উসাইদ বিন হুদাইর (রাঃ) লোকটিকে টেনে নিয়ে যান এবং তা করার সময় তার উপর একটি ছুরি দেখতে পান। বেদুইনটি পরাজিত হয়ে পড়ে কিন্তু কেউ তাকে ক্ষতি করার আগেই, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে তার পরিকল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। যখন সে তাকে তার পরিকল্পনার কথা জানালো, তখন বেদুইনকে বন্দী হিসেবে উসাইদের হাতে তুলে দেওয়া হলো, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন, তাকে হত্যা না করার নির্দেশ দেওয়া হলো। পরের দিন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) বেদুইনের সাথে কথা বললেন এবং তাকে অক্ষত অবস্থায় মুক্তি দেওয়া অথবা ইসলাম গ্রহণ করার বিকল্প দিলেন। লোকটি ইসলাম গ্রহণ করল। সে মন্তব্য করল যে, সে যখন প্রথম মদিনায় প্রবেশ করে তখনই সে ইসলামের সত্যতা বুঝতে পেরেছিল। যখন সে প্রথমবারের মতো মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেখল, তখন সে তার সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলল, যা তার সাথে আগে কখনও ঘটেনি। উপরন্তু, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কিছু করার আগেই তার বিশ্বাসঘাতকতা বুঝতে পেরেছিলেন। এই বিষয়গুলি তাকে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত করেছিল। ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯২-৯৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ঘটনাটি নির্দেশ করে যে, আল্লাহ তাআলা বারবার যে দ্বিতীয় সুযোগটি দেন তা গ্রহণ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি দিনই একজন ব্যক্তির জন্য আরেকটি সুযোগ, যাতে সে তার আচরণ সংশোধন করতে পারে

এবং আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করতে পারে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করবে। তবে এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই দ্বিতীয় সুযোগগুলি চিরকাল স্থায়ী হবে না, তাই সময় শেষ হওয়ার আগে এবং বিচারের দিনে পৌঁছানোর আগে তাদের অবশ্যই এগুলি ব্যবহার করতে হবে, কারণ সেই দিন তারা দ্বিতীয় সুযোগ হবে না।

উপরন্তু, আলোচিত মূল ঘটনাটি অন্যদের সাথে করুণার সাথে আচরণ করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। যদিও একজন মুসলমানের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে এবং ভবিষ্যতে একই ব্যক্তিদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য তাদের অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে, তবুও তাদের অন্যদের ভুল উপেক্ষা করার এবং ক্ষমা করার চেষ্টা করা উচিত, ঠিক যেমন তারা চায় যে মহান আল্লাহ তাদের ভুল ক্ষমা করুন। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ২২:

"...এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন..."

আলোচ্য মূল ঘটনায় যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, এই করুণাময় মনোভাব মানুষের খারাপ চরিত্র পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও আরও কার্যকর।

অসুবিধার মধ্যে দৃঢ়তা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের চতুর্থ বছরে, আবু বারা আমির বিন মালিক নামে এক অমুসলিম নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে মদিনায় দেখা করতে আসেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং এর প্রতি শত্রুতাও প্রকাশ করেননি। তিনি পরামর্শ দেন যে কিছু সাহাবীকে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, নজদে তার এলাকায় পাঠানো উচিত যাতে তারা ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে পারে। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন কারণ তিনি সন্দেহ করেছিলেন যে তারা তাঁর সাহাবীদের উপর আক্রমণ করবে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, কিন্তু আবু বারা তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। প্রায় সত্তর জন জ্ঞানী সাহাবীকে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, পাঠানো হয়েছিল কিন্তু নজদে অন্য একটি গোত্র, বনু সুলাইম তাদের উপর আক্রমণ করেছিল। আহত একজন ছাড়া সকলেই শহীদ হন। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ২৯৯-৩০১ এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "দ্য নোবেল লাইফ অফ দ্য প্রফেট (সাঃ)", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৩৪-১২৩৫ -এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জীবনে একজন মুসলিম সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অথবা কঠিন সময়ের মুখোমুখি হবে। কেউই কেবল কিছু অসুবিধা ছাড়াই স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে না। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, সংজ্ঞা অনুসারে, যদিও অসুবিধাগুলি মোকাবেলা করা কঠিন, তবুও তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতি তার প্রকৃত মহত্ত্ব এবং দাসত্ব অর্জন এবং প্রদর্শনের একটি উপায়। উপরন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ যখন অসুবিধার মুখোমুখি হয় তখন তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জীবনের পাঠ শেখে। এবং মানুষ প্রায়শই স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে কঠিন সময়ের অভিজ্ঞতা অর্জনের পরে আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হয়। এই সত্যটি বোঝার জন্য কেবল এটি নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে তবে সে বুঝতে পারবে যে আলোচিত বেশিরভাগ ঘটনাই অসুবিধার সাথে জড়িত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে প্রকৃত মহত্ত্ব সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করার মধ্যেই নিহিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি নিহিত রয়েছে আল্লাহর প্রতি

আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে অসুবিধার মুখোমুখি হওয়ার মধ্যে। এটি এই সত্য দ্বারা প্রমাণিত যে ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত প্রতিটি বড় কঠিন বিষয়ই তাদের জন্য চূড়ান্ত সাফল্যের সাথে শেষ হয় যারা মহান আল্লাহকে আনুগত্য করেছে। তাই একজন মুসলিমের উচিত সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করা উচিত নয় কারণ এটি কেবল তাদের জন্য উজ্জ্বল হওয়ার মুহূর্ত, যখন তারা আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের প্রকৃত দাসত্ব স্বীকার করে। এটিই উভয় জগতের চূড়ান্ত সাফল্যের চাবিকাঠি।

বনু নাদির

অঙ্গীকার ভঙ্গ

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের চতুর্থ বছরে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একটি অমুসলিম গোত্র, বনু নাদিরের সাথে দেখা করেন, যাদের সাথে তিনি পূর্বেই আর্থিক সহায়তা এবং শান্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তারা উত্তর দেয় যে তারা গোপনে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করার সময় তাকে সাহায্য করবে। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানিয়ে ঐশ্বরিক ওহী লাভ করেন এবং তারা তাদের মন্দ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ পাওয়ার আগেই তিনি মদিনায় ফিরে আসেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০০-১০১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ১১ নাযিল করেছেন:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের হাত প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু তিনি তাদের হাত তোমাদের থেকে বিরত রেখেছিলেন; আর আল্লাহকে ভয় করো। আর আল্লাহর উপরই মুমিনদের নির্ভর করা উচিত।"

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৫:১১, পৃষ্ঠা ৬৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ২৭৪৯ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মুনাফিকির একটি দিক।

একজন মুসলিমের সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি হলো মহান আল্লাহর সাথে, যা তখনই সম্মত হয়েছিল যখন কেউ তাকে তাদের প্রভু ও ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া।

মানুষের সাথে করা অন্যান্য সমস্ত প্রতিশ্রুতিও অবশ্যই পালন করতে হবে, যদি না কারো কাছে কোন বৈধ অজুহাত থাকে, বিশেষ করে যেগুলি একজন বাবা-মা সন্তানদের সাথে করেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা কেবল বাচ্চাদের খারাপ চরিত্র শেখায় এবং তাদের বিশ্বাস করতে উৎসাহিত করে যে প্রতারণা করা একটি গ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সহীহ বুখারীতে ২২২৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর নামে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বৈধ অজুহাত ছাড়াই তা ভঙ্গ করে, তিনি তার বিরুদ্ধে থাকবেন। বিচারের দিন যার বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলা থাকবেন, সে কীভাবে সফল হতে পারে? যেখানেই সম্ভব অন্যদের সাথে প্রতিশ্রুতি না দেওয়াই সর্বদা নিরাপদ। কিন্তু যখন একটি বৈধ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তখন তা পূরণ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে হবে।

অধিকন্তু, আলোচিত মূল ঘটনাটি এও ইঙ্গিত দেয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ উভয় জগতেই তাকে রক্ষা করবেন। অধ্যায় ৬৫ তালাকের ২ নম্বর আয়াতে:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই সুরক্ষা মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে ঘটে না। এটি সর্বদা মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা অনুসারে। অতএব, এই সুরক্ষা সেই অনুযায়ী ঘটে যখন এটি মানুষের জন্য সর্বোত্তম এবং এমনভাবে যা তাদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, এই জেনে যে, তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য দান করা হবে, কোন না কোনভাবে, তা তাদের কাছে স্পষ্ট হোক বা না হোক। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎ কর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

সত্য ন্যায়বিচার

অমুসলিম গোত্র বনু নাদির যখন মহানবী (সাঃ) কে হত্যার চেষ্টা করে, যদিও তাদের সাথে মুসলিমদের শান্তি চুক্তি ছিল, তখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বনু নাদিরকে একটি বার্তা পাঠান যাতে তাদের তাঁর এলাকা এবং সুরক্ষা ছেড়ে চলে যেতে সতর্ক করা হয়। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০০-১০১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এই অমুসলিম গোত্রের বিরুদ্ধে অবিলম্বে প্রতিশোধ নিতে পারতেন, যারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল এবং তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, কিন্তু পরিবর্তে তিনি ন্যায়বিচারের বাইরে গিয়ে তাদের শান্তিপূর্ণভাবে চলে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে একজন মুসলিমের আচরণ এবং চরিত্র সর্বদা অন্যদের আচরণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে হবে, এমনকি আবেগগত পরিস্থিতিতেও, যেমন তর্ক-বিতর্ক। বাইরের জগতকে একজন মুসলিমের চরিত্র এবং অন্যদের চরিত্রের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি বাইরের জগতের কাছে ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করছে, যা প্রতিটি মুসলমানের উপর কর্তব্য। তাই একজন মুসলিমের ইসলামী চরিত্র এবং আচরণকে এমন একটি কোট হিসেবে ব্যবহার করা এড়িয়ে চলা উচিত যা তার ইচ্ছা অনুসারে খুলে পরা যেতে পারে। তাদের সঠিক ইসলামী চরিত্র কেবল তখনই প্রদর্শন করা উচিত নয় যখন এটি তাদের ইচ্ছা অনুসারে হয়। তাদের ইচ্ছা এবং অনুভূতি নির্বিশেষে প্রতিটি পরিস্থিতিতে এটি প্রদর্শন করা উচিত। এই মনোভাবই একজন মুসলিমকে একজন মুনাফিক থেকে আলাদা করে, কারণ একজন মুনাফিক তার অনুভূতি এবং আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে তার আচরণ পরিবর্তন করে।

ইভিল সাপোর্ট

অমুসলিম গোত্র বনু নাদির যখন মহানবী (সাঃ) কে হত্যার চেষ্টা করে, যদিও তাদের সাথে মুসলিমদের শান্তি চুক্তি ছিল, তখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বনু নাদিরকে একটি বার্তা পাঠান যাতে তারা তাদের এলাকা এবং সুরক্ষা ছেড়ে চলে যেতে পারে। মুনাফিকরা বনু নাদিরকে সেখানে থাকার জন্য অনুরোধ করে এবং তাদের সমর্থন প্রদান করে। তারা দাবি করে যে, যদি বনু নাদির মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে, তাহলে তারা তাদের সমর্থন করবে, যদি বনু নাদির যুদ্ধ করে, তাহলে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং যদি তাদের এলাকা থেকে বহিষ্কার করা হয়, তাহলে তারা তাদের সাথে চলে যাবে। এই প্রসঙ্গে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা আল হাশরের ৫৯ নম্বর আয়াত, আয়াত ১১-১২ নাযিল করেছেন:

"তুমি কি তাদের কথা ভাবোনি যারা মুনাফিকী করে, যারা তাদের কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফের, তাদের ভাইদের বলে, "যদি তোমাদের বহিষ্কার করা হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে চলে যাব, এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারো কথা মানব না; আর যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব।" কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তারা মিথ্যাবাদী। যদি তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়, তাহলে তারা তাদের সাথে চলে যাবে না, আর যদি তাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়, তাহলে তারা তাদের সাহায্য করবে না। আর যদি তারা তাদের সাহায্য করে, তাহলে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে; তারপর [এরপর] তাদের সাহায্য করা হবে না।"

এটি বনু নাদিরকে মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উৎসাহিত করেছিল। অবশেষে যখন মহানবী (সাঃ) বনু নাদিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন মুনাফিকরা কিছুই করেনি। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৩,

পৃষ্ঠা ১০০-১০১ এবং ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ৩০২-৩০৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনা খারাপ সাহচর্যের বিরুদ্ধে সতর্ক করে কারণ এটি সর্বদা সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। মুসলমানদের মনে রাখা উচিত যে সত্যিকারের ভালোবাসার একটি প্রধান লক্ষণ হল যখন কেউ তার প্রিয়জনকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কারণ আনুগত্য ইহকাল এবং পরকালে সাফল্য এবং নিরাপত্তার দিকে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি একজন ব্যক্তির জন্য নিরাপত্তা এবং সাফল্য কামনা করে না সে কখনই তাকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসতে পারে না, সে যাই দাবি করুক বা অন্য ব্যক্তির সাথে কীভাবে আচরণ করুক না কেন। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যখন তার প্রিয়জন চাকরির মতো পার্থিব সাফল্য অর্জন করে তখন খুশি হয়, একইভাবে সে তার প্রিয়জনকে পরকালেও সাফল্য পেতে চায়। যদি একজন ব্যক্তি অন্যের নিরাপত্তা এবং সাফল্য অর্জনের বিষয়ে চিন্তা না করে, বিশেষ করে পরকালে, তাহলে সে তাকে ভালোবাসে না।

একজন প্রকৃত প্রেমিক তার প্রিয়জনকে এই পৃথিবীতে বা পরকালে কষ্ট এবং শাস্তির সম্মুখীন হতে দেখা এবং জানা সহ্য করতে পারে না। এটি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই এড়ানো সম্ভব। অতএব, তারা সর্বদা তাদের প্রিয়জনকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করবে। যদি কেউ অন্যকে আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে নিজের স্বার্থ বা অন্যের স্বার্থের দিকে পরিচালিত করে, তাহলে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে না। এটি বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়স্বজনের মতো সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত মূল্যায়ন করা যে তাদের জীবনের বিষয়গুলি তাদেরকে মহান আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে কিনা। যদি তারা তা করে তবে এটি তাদের প্রতি তাদের ভালোবাসার স্পষ্ট লক্ষণ। যদি তারা তা না করে তবে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাদেরকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে না। অধ্যায় ৪৩ আয যুখরুফ, আয়াত ৬৭:

"সেদিন ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হবে, কেবল সৎকর্মশীলরা ছাড়া।"

ত্যাগ করা প্রতিশোধ

অমুসলিম গোত্র বনু নাদির যখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যার চেষ্টা করে, যদিও তাদের সাথে মুসলিমদের শান্তি চুক্তি ছিল এবং তারপর তারা শান্তিপূর্ণভাবে এলাকা ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন মুসলিমরা তাদের অবরোধ করে। এরপর বনু নাদিররা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে অনুরোধ করে যে, তাদের রক্তপাত এড়িয়ে যান এবং তাদের জিনিসপত্রসহ এলাকাটি খালি করার জন্য নিরাপদ পথ প্রদান করুন। বনু নাদিরদের বিরুদ্ধে তাদের মন্দ পরিকল্পনার প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের অস্ত্র ছাড়া যা কিছু বহন করা সম্ভব তা বহন করার অনুমতি দেন। ইমাম ইবনে কাথিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০০-১০১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ৬৮৫৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি বরং ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং উপেক্ষা করেছেন।

যখন অন্য কোন বিকল্প অবশিষ্ট থাকে না, তখন মুসলমানদেরকে আনুপাতিক এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে আত্মরক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের কখনই সীমা লঙ্ঘন করা উচিত নয় কারণ এটি একটি পাপ। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৯০:

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

যেহেতু চিহ্ন অতিক্রম করা এড়ানো কঠিন, তাই একজন মুসলিমের ধৈর্য ধারণ করা, অন্যদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা উচিত কারণ এটি কেবল নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যই নয়, বরং মহান আল্লাহ্‌র কাছেও পৌঁছে দেয়, যিনি তাদের পাপ ক্ষমা করে দেন। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ২২:

"...এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন..."

অন্যদের ক্ষমা করা অন্যদের চরিত্রকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রেও আরও কার্যকর, যা ইসলামের উদ্দেশ্য এবং মুসলমানদের উপর কর্তব্য, কারণ প্রতিশোধ নেওয়া কেবল জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও শত্রুতা এবং ক্রোধের জন্ম দেয়।

যাদের অন্যদের ক্ষমা না করার বদ অভ্যাস আছে এবং ছোটখাটো বিষয়েও সবসময় ক্ষোভ পোষণ করে, তারা হয়তো দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করেন না বরং তাদের প্রতিটি ছোট পাপ পরীক্ষা করেন। একজন মুসলিমের উচিত সবকিছু ছেড়ে দেওয়া শেখা কারণ এর ফলে উভয় জগতেই ক্ষমা লাভ হয়। উপরন্তু, যখন কেউ তাদের বিরক্তিকর প্রতিটি ছোটখাটো বিষয় ধরে রাখার অভ্যাস গ্রহণ করে তখন মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। অতএব, অন্যদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা শেখা একজনকে ছোটখাটো বিষয়গুলি ছেড়ে দিতে সাহায্য করে, যা তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে সহায়তা করে।

পরিশেষে, মূল হাদিসটির অর্থ এই নয় যে অন্যরা যখন সীমা অতিক্রম করে, তখন আত্মরক্ষা করা উচিত নয়, কারণ ইসলাম দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতা শেখায়। উপরন্তু, যখন কেউ অন্যদের ক্ষমা করে, তার অর্থ এই নয় যে তাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত বা স্বাভাবিকভাবেই তাদের সাথে মেলামেশা চালিয়ে যাওয়া উচিত। এতে কেবল তাদের উপর আবার অন্যায় হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহর জন্য অন্যদের ক্ষমা করা উচিত, তাদের ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের অধিকার পূরণ করতে হবে এবং অতীতে যারা তাদের উপর অন্যায় করেছে তাদের সাথে আচরণ করার সময় সতর্কতার সাথে চলতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয় এবং তারা উভয় জগতেই আশীর্বাদ এবং প্রতিদান লাভ করে।

বিশ্বাসে কোন জোরজবরদস্তি নেই

অমুসলিম গোত্র বনু নাদির নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যার চেষ্টা করার পর, যদিও তাদের সাথে মুসলিমদের শান্তি চুক্তি ছিল এবং তারপর তারা শান্তিপূর্ণভাবে এই অঞ্চল ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানায়, মুসলিমরা তাদের অবরোধ করে। ফলস্বরূপ, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের পরাজিত করেন এবং তাদের বহু বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাদের হত্যা করার পরিবর্তে নির্বাসন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ইসলামের আগমনের আগে, যখন মদীনার একজন মুশরিক মহিলা অল্প বয়সে তার সন্তানদের হারাতেন, তখন তিনি তার পরবর্তী সন্তানকে ইহুদি হিসেবে লালন-পালন করার শপথ করতেন, এই আশায় যে এটি শিশুটির মৃত্যু রোধ করবে। ফলস্বরূপ, এই শিশুদের বনু নাদির গোত্রের মধ্যে লালন-পালন করা হয়েছিল এবং তাই বাকি গোত্রের সাথে তাদের বহিষ্কার করা হয়েছিল। যখন তাদের জৈবিক পিতামাতা, যারা এখন মুসলিম হয়েছিলেন, তাদের সন্তানদের মদিনায় রাখতে এবং তাদের উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, তখন মহান আল্লাহ সূরা আল বাকারার ২৫৬ নং আয়াত নাজিল করেন:

"ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন জোরজবরদস্তি নেই। সঠিক পথ ভুল থেকে পৃথক হয়ে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি মিথ্যা উপাসনাকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে, সে এমন একটি নির্ভরযোগ্য হাতল ধরেছে যার কোন ছিন্নভিন্নতা নেই। আর আল্লাহ শ্রবণকারী এবং জ্ঞানী।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ)-এর জীবনী", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০০-১০১ এবং সুনান আবু দাউদ, সংখ্যা ২৬৮২-এ প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলাম এমন একটি জিনিস যা কেবল কথা ও কাজের মাধ্যমেই নয়, বরং মানুষের হৃদয় দ্বারা গ্রহণ করা আবশ্যক। যেহেতু মানুষের হৃদয়ের বিষয় গোপন থাকে , তাই তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা অর্থহীন প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়ায়। এটি স্পষ্টতই তাদের খণ্ডন করে যারা দাবি করে যে ইসলাম তরবারির জোরে ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ, মহিমান্বিত, বারবার তাদের নিন্দা ও কঠোর সমালোচনা করেছেন যারা জিহ্বা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু অন্তরে তা প্রত্যাখ্যান করে, অর্থাৎ মুনাফিকদের। যারা ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয় তাদের পরিণতি এটাই হবে। মহান আল্লাহ, কখনও এই আচরণবিধিতে সন্তুষ্ট হবেন না কারণ প্রকাশ্য কুফরীকে ভণ্ডামির চেয়ে পছন্দ করা হয়। এটি স্পষ্ট কারণ জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর মুনাফিকদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। সূরা ৪ আন-নিসা, আয়াত ১৪৫:

"নিশ্চয়ই, মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে..."

অধিকন্তু, পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিস্টান) শান্তিতে এবং পূর্ণ অধিকার নিয়ে বসবাস করতে পারে, এমনকি যদি তারা কর প্রদান করে ইসলাম গ্রহণ না করেও। যদি মুসলমানদের অন্যদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে এই কর নির্ধারণের কোন প্রয়োজন নেই। সূরা তওবা, আয়াত ২৯:

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম বলে মনে করে না এবং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো - যতক্ষণ না তারা জিযিয়া [কর] প্রদান করে..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, আলোচ্য মূল ঘটনাটি এই বিষয়টিও বোঝার গুরুত্বকে নির্দেশ করে যে পার্থিব বা ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই সঠিক নির্দেশনা অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। একজন মুসলিমের কর্তব্য হল দৃঢ় প্রমাণ সহকারে অন্যদের কাছে সত্য উপস্থাপন করা এবং তারপর তা গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত জনগণের উপর ছেড়ে দেওয়া। এমনকি যখন একজন ব্যক্তি তাদের প্রিয়জনদের সাথে, যেমন তাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের সাথে আচরণ করেন, তখনও একজন পিতামাতা তাদের জীবনে সঠিক পথ বেছে নিতে বাধ্য করতে পারেন না। তারা কেবল ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের সন্তানকে সঠিক পথে শিক্ষিত করে পিতামাতা হিসেবে তাদের কর্তব্য পালন করতে পারেন, তবে সঠিক নির্দেশনা বা বিপথগামীতা বেছে নেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শিশুর উপর নির্ভর করে। মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ, কেবলমাত্র তাদের সন্তানদের সঠিক শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, তিনি তাদের সন্তানদের স্বাধীন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।

চরম উদারতা

বনু নাদির গোত্রকে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মদিনা থেকে বহিষ্কার করার পর, যুদ্ধের গনীমতের মাল কোন যুদ্ধ ছাড়াই অর্জিত হয়েছিল এবং তাই তা মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। তিনি মদীনার সাহাবীদের একত্রিত করেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন এবং তাদের মক্কার সাহাবীদের সাথে সমানভাবে গনীমতের মাল ভাগ করে নেওয়ার অথবা মক্কার সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, সবকিছু গ্রহণ করার অনুমতি দেন, যার ফলে তাদের আর মদীনার সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হবে না, যেমন তাদের সাথে বসবাস করার। মদীনার সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, উত্তর দেন যে তিনি সমস্ত গনীমতের মাল মক্কার সাহাবীদের মধ্যে বিতরণ করবেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, এবং তারা তাদের আর্থিকভাবেও সাহায্য করতে থাকবে। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০০-১০১ এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর মহান জীবন", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৬৯-১২৭০ -এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উদারতার মহৎ বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করার জন্য সঠিক মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। যখন একজন মুসলিম সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে তার যা কিছু আছে তা মহান আল্লাহর, তখন তার কাছে থাকা আশীর্বাদগুলি, যেমন দান, আল্লাহর অনুগ্রহে সঠিকভাবে ব্যবহার করা সহজ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এই মনোভাব গ্রহণ করে সে বুঝতে পারে যে সে কেবল আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ফেরত দিচ্ছে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৫৪:

"হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদের যা রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করো..."

এই আচরণ অহংকারের মাধ্যমে তাদের দানশীলতার সৎকর্ম নষ্ট করা থেকেও রক্ষা করে। অহংকার একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করায় যে তারা দান করে আল্লাহ এবং অভাবীদের প্রতি অনুগ্রহ করছে। কিন্তু একইভাবে একজন ব্যক্তি গর্ব ছাড়াই ব্যাংক ঋণ ফেরত দেয়, মুসলমানদের বুঝতে হবে যে তাদের দান হল আল্লাহ প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের একটি উপায়। উপরন্তু, অভাবীরা তাদের দান গ্রহণ করে দাতার প্রতি অনুগ্রহ করছে। অভাবীরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাওয়ার একটি উপায়, এবং তাদের ছাড়া এটি অসম্ভব। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে তাদের সম্পদ তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং শক্তির মাধ্যমে জমা হয়েছে, তাহলে তাদের বুঝতে হবে যে এই জিনিসগুলিও আল্লাহ প্রদত্ত। অতএব, সম্পদের মতো আশীর্বাদের আকারে এই ঋণ অবশ্যই আল্লাহর কাছে ফেরত দিতে হবে, অন্যথায় তাদের এমন শাস্তির সম্মুখীন হতে হতে পারে যা এই পৃথিবীতে শুরু হবে এবং পরকালেও অব্যাহত থাকবে।

যখন কেউ দান করে, তখন তার লেনদেন কোন অভাবী ব্যক্তির সাথে হয় না, বরং তা হয় মহান আল্লাহর সাথে। যখন কোন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর সাথে ব্যবসা করে, তখন তারা এমন এক অকল্পনীয় লাভের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে যা তাদের এই দুনিয়া ও আখেরাতে উপকৃত করবে। আলোচ্য মূল আয়াতগুলিতে এটি নির্দেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ২৪৫:

"কে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, যাতে তিনি তার জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন?"

অন্ধ অনুকরণ এবং ভ্রম

মদিনা থেকে বনু নাদির গোত্রের নির্বাসনের পর, মদিনার কাছাকাছি বসবাসকারী বনু কুরাইজা গোত্রের সদস্য আমর বিন সু'দা নামে একজন ইহুদি পণ্ডিত বনু নাদিরের পরিত্যক্ত বাড়িগুলির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর, তিনি তার গোত্র, বনু কুরাইজায় ফিরে আসেন এবং তাদের নেতাদের একত্রিত করেন। তিনি খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেন যে এটি ঘটেছে কারণ তারা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে গ্রহণ ও অনুসরণ না করে মহান আল্লাহকে অমান্য করেছিল। তাদের প্রতিটি নেতা স্বীকার করেন যে তাদের ঐশী গ্রন্থে পাওয়া নিদর্শনগুলি স্পষ্টভাবে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতা নির্দেশ করে। এমনকি তারা কিছু প্রবীণ ইহুদি পণ্ডিতের কথাও উল্লেখ করেছেন, যারা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর আগমনের আগে ইন্তেকাল করেছিলেন এবং কীভাবে তারা তাদের লোকদের তাকে গ্রহণ ও অনুসরণ করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। এই নেতাদের মধ্যে একজন মন্তব্য করেছিলেন যে, একমাত্র জিনিস যা তাকে এবং তার অনুসারীদের ইসলাম গ্রহণে বাধা দিয়েছিল তা হল অন্য নেতা, কারণ তিনি তার বিরোধিতা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি এবং আরও যোগ করেছেন যে, যদি সেই নেতা ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি এবং তার অনুসারীরাও তাই করবেন। কিন্তু তাদের মর্যাদা, পার্থিব সুবিধা হারানোর ভয়ে এবং একে অপরের অন্ধ অনুকরণের ভয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০০-১০১ এবং ১০৮-১০৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

অন্যদের অন্ধ অনুকরণ করা মানুষের সত্য প্রত্যাখ্যানের একটি প্রধান কারণ। একজন ব্যক্তির উচিত তাদের সাধারণ জ্ঞানকে কাজে লাগানো এবং প্রমাণ ও স্পষ্ট নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে জীবনযাপনের পথ বেছে নেওয়া এবং গরুর মতো অন্ধভাবে অন্যদের অনুকরণ করা উচিত নয়। এমনকি ইসলামেও অন্ধ অনুকরণ অপছন্দনীয়।

সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪০৪৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যদের, যেমন নিজের পরিবারের, অন্ধভাবে অনুকরণ না করার গুরুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে, ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল না করে যাতে কেউ অন্ধ অনুকরণকে অতিক্রম করে এবং মহান আল্লাহকে আনুগত্য করে, একই সাথে তাঁর প্রভুত্ব এবং তাদের নিজস্ব দাসত্বকে সত্যিকার অর্থে স্বীকৃতি দেয়। এটিই আসলে মানবজাতির উদ্দেশ্য। অধ্যায় ৫১ আয ধরিয়াত, আয়াত ৫৬:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।"

কীভাবে কেউ সত্যিকার অর্থে এমন কাউকে উপাসনা করতে পারে যাকে সে চিনতেও পারে না? অন্ধ অনুকরণ শিশুদের জন্য গ্রহণযোগ্য কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের অবশ্যই জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সত্যিকার অর্থে বুঝতে হবে এবং ধার্মিক পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। অজ্ঞতাই হল সেই কারণ যেখানে মুসলিমরা তাদের ফরজ কর্তব্য পালন করে তারা এখনও মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। এই স্বীকৃতি একজন মুসলিমকে কেবল পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সময় নয়, সারা দিন আল্লাহর একজন প্রকৃত বান্দা হিসেবে আচরণ করতে সাহায্য করে। কেবলমাত্র এর মাধ্যমেই মুসলমানরা মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত দাসত্ব পালন করতে পারবে। এবং এটিই এমন একটি অস্ত্র যা একজন মুসলিমের জীবনে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হয়। যদি তাদের কাছে এটি না থাকে তবে তারা প্রতিদান না পেয়ে সমস্যার মুখোমুখি হবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি উভয় জগতেই আরও সমস্যার সৃষ্টি করবে। অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে ফরজ কর্তব্য পালন করলে দায়িত্ব পালন করা হয়তো বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে পারে কিন্তু উভয় জগতেই মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য প্রতিটি অসুবিধা অতিক্রম করে নিরাপদে পরিচালিত হবে না। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্ধ অনুকরণ একজনকে অবশেষে তাদের ফরজ কর্তব্য পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবে। এই মুসলিম কেবল কঠিন সময়েই তাদের কর্তব্য পালন করবে এবং

স্বাচ্ছন্দ্যের সময় সেগুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে অথবা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় সেগুলি পূরণ করবে এবং কঠিন সময়ে সেগুলি পরিত্যাগ করবে। উপরন্তু, কেউ যদি অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক কর্তব্যগুলি পালন করে, তবুও তাদের মনোভাব তাদেরকে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সমস্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে বাধা দেবে। এটি তাদেরকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে বাধা দেবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় স্থাপন করবে। অতএব, অন্ধ অনুকরণ তাদের মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেবে।

যেহেতু আহলে কিতাবরা ঐশ্বরিক ওহীর প্রাপক ছিলেন এবং তাই ঐশ্বরিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তাই বৃহত্তর সমাজের মধ্যে, এমনকি মূর্তিপূজকদের মধ্যেও তাদের একটি বিশেষ স্থান ছিল। কিন্তু ইসলামের আগমনের মাধ্যমে এই বিশেষ মর্যাদা সরাসরি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। যদিও আহলে কিতাবদের পণ্ডিতরা পবিত্র কুরআনকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, কারণ তারা এর লেখক, মহান আল্লাহ, এর সাথে খুব পরিচিত ছিলেন এবং তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উভয়কেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তবুও তাদের হিংসা তাদেরকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করেছিল। অধ্যায় 6 আল আন'আম, আয়াত 20:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

অধিকন্তু, আহলে কিতাব এবং মক্কার অমুসলিম উভয়ই জানত যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) পূর্ববর্তী ঐশী কিতাব অধ্যয়ন করেননি এবং তাই তাঁর পক্ষে পবিত্র কুরআন জাল করা অসম্ভব ছিল। সূরা ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ৪৮:

"আর তুমি এর আগে কোন কিতাব পাঠ করোনি এবং তোমার ডান হাতে কোন কিতাব লিখে রাখোনি। তাহলে [অর্থাৎ, অন্যথায়] মিথ্যাবাদীদের সন্দেহের কারণ হত।"

আহলে কিতাবরা আরও ঈর্ষান্বিত ছিল যে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ভাই হযরত ইসহাকের বংশধর না হয়ে বরং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। যেহেতু তাদের পুরো ধর্ম বংশের গুরুত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, যা তাদের মতে অন্যান্য মানবজাতির উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিল, তাই তারা এমন একজন নবী (সাঃ)-কে গ্রহণ এবং অনুসরণ করতে পারত না, যিনি ভিন্ন বংশ থেকে এসেছিলেন। এটি কেবল তাদের তৈরি শ্রেষ্ঠত্বের জটিলতাকে ধ্বংস করবে।

অধিকন্তু, আহলে কিতাবদের মধ্যে থেকে পণ্ডিতরা জানতেন যে, যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাদেরকে ঐশী শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে বাধ্য করা হবে। তারা আরও ভয় পেয়েছিলেন যে ইসলাম গ্রহণের ফলে তারা তাদের সমাজের মধ্যে অর্জিত নেতৃত্ব, সম্মান এবং সামাজিক প্রভাব হারাতে পারে। এটি তাদের ইসলাম প্রত্যাখ্যান করতে আরও উৎসাহিত করেছিল।

তাদের হিংসা এবং পার্থিব জিনিসের প্রতি ভালোবাসা তাদেরকে ইসলামকে ভুল প্রমাণ করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ঐশী গ্রন্থের ভুল ব্যাখ্যা এবং সম্পাদনা করতে উৎসাহিত করেছিল এবং এমনকি তারা পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছিল। এর ফলে তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করার পরও তাকে অবিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিল এবং এর ফলে তারা উভয় জগতেই তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৯:

"কিতাবধারীদের একদল তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চায়। কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে বিভ্রান্ত করে না এবং তারা তা উপলব্ধি করে না।"

মহান আল্লাহ সম্পর্কে তাদের ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা তাদের বুঝতে বাধা দিয়েছিল যে তাদের কর্মকাণ্ড কীভাবে তাদেরকে উভয় জগতে অবিশ্বাস এবং শাস্তির দিকে নিয়ে যায়। তারা এই ভ্রান্ত বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল যে তারা মহান আল্লাহর প্রিয় এবং প্রিয়জন, কারণ তারা পবিত্র নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধর। তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের মাধ্যমে তারা মিথ্যাভাবে বর্ণবাদকে আল্লাহকে দায়ী করেছিল। ৫ম সূরা আল মায়িদা, আয়াত ১৮:

"কিন্তু ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, "আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়জন।" বলুন, "তাহলে তিনি তোমাদের পাপের জন্য কেন শাস্তি দেন?" বরং তোমরা তাঁর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন..."

এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের মাধ্যমে, তারা মহান আল্লাহ তায়ালার উপর অবিচার ও অবিচার আরোপ করেছিল, কারণ তারা দাবি করেছিল যে তিনি তাদের মধ্য থেকে মন্দ কর্মকারীর সাথে অন্যান্য জাতির সৎকর্মকারীর মতো আচরণ করবেন। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২১:

"যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমি তাদেরকে তাদের মতো করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান করে দেব? তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না মন্দ।"

অধিকন্তু, তাদের ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা তাদের এই মিথ্যা বিশ্বাসে প্ররোচিত করেছিল যে, তাদের অপরাধের জন্য যদি তাদের জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হয়, তবুও তা কেবল অল্প সময়ের জন্য হবে, কারণ তারা নিজেদেরকে বিশ্বাসী বলে মনে করত। সর্বজনীনভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, একজন বিশ্বাসী চিরকাল জাহান্নামে যাবে না। কিন্তু তারা নিজেদেরকে বোকা বানিয়েছিল, কারণ তারা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, যদিও তারা এখনও অন্যান্য ঐশী গ্রন্থ এবং অন্যান্য পবিত্র নবীদের উপর বিশ্বাস করত। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ৮০:

"আর তারা বলে, "জাহান্নাম আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না, [কয়েক] দিন ছাড়া।" বলুন, "তোমরা কি আল্লাহর সাথে কোন অঙ্গীকার করেছ? কারণ আল্লাহ কখনও তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। নাকি তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে এমন কিছু বল যা তোমরা জানো না?"

এবং অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ১৫০-১৫১:

" যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, "আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে অবিশ্বাস করি" এবং এর মাঝামাঝি কোন পথ অবলম্বন করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফের। আর আমরা কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।"

অতএব, মহান আল্লাহ সম্পর্কে তাদের আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে অজান্তেই অবিশ্বাসের পথে ধোঁকা দিয়েছিল। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৯:

"কিতাবধারীদের একদল তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চায়। কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে বিভ্রান্ত করে না এবং তারা তা উপলব্ধি করে না।"

তাই মুসলিমদের জন্য আহলে কিতাবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি উভয় জগতেই সমস্যা, চাপ এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে। মুসলিমদের অবশ্যই ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এবং মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি প্রকৃত আশার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর অবাধ্যতা চালিয়ে যাওয়া, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, অন্যদিকে উভয় জগতেই তাঁর রহমত এবং ক্ষমার আশা করা। অতএব, মহান আল্লাহর উপর আশা করার মধ্যে রয়েছে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে আল্লাহকে আনুগত্য করার চেষ্টা করা এবং তারপর উভয় জগতেই তাঁর রহমত এবং ক্ষমার আশা করা। যেহেতু মানুষের কাছ থেকে পরিপূর্ণতা আশা করা যায় না, তাই মহান আল্লাহর উপর আশা করার মধ্যে রয়েছে যখনই কেউ পাপ করে তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ অনুভব করা,

মহান আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে তার ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ ও মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকার পূরণ করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এবং আল্লাহর প্রতি আশার মধ্যে পার্থক্য এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অধিকন্তু, মুসলমানদের অবশ্যই আহলে কিতাবদের মনোভাব গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ তারা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারী। এটা করা অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং কুফরের কাছাকাছি, যেমনটি কেউ দাবি করে যে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, মুসলমানদের মধ্যে থেকে দুষ্টদের সাথে সৎকর্মকারীদের সমান আচরণ করবেন। এটি সরাসরি আল্লাহর ন্যায়বিচার এবং ন্যায্যতার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। মহান আল্লাহ, পবিত্র কুরআনে বারবার বলেছেন যে, তিনি মানুষের সাথে যে আচরণ করেন তা কখনও পরিবর্তন হয় না। যেমন তিনি পূর্ববর্তী জাতিগুলির অবাধ্য লোকদের শাস্তি দিয়েছিলেন যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছিলেন, ঠিক তেমনই তিনি তাঁর অবাধ্যতায় অবিচল থাকা মুসলিমদেরও শাস্তি দেবেন। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ৪৩:

"...কিন্তু তুমি কখনো আল্লাহর পদ্ধতিতে [অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে] কোন পরিবর্তন পাবে না, এবং তুমি কখনো আল্লাহর পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না।"

অধিকন্তু, মুসলমানদের অবশ্যই আহলে কিতাবদের মনোভাব গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে যারা ধরে নিয়েছিল যে তারা এখনও বিশ্বাসী, তাই তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতাকে অপব্যবহার করে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে তাদের ঈমান হারানোর বড় ঝুঁকিতে থাকে।

কারণ ঈমান এমন একটি গাছের মতো যাকে বেড়ে ওঠার জন্য আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ যা সূর্যালোকের মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, তা বৃদ্ধি পেতে ব্যর্থ হয় এবং এমনকি মারাও যেতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে না এবং মৃত্যুর গুরুতর ঝুঁকিতে থাকে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। অতএব, যে মুসলিম তাদের মৌখিক ঈমানের দাবি সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়, সে হয়তো বিচারের দিন তাদের অমুসলিম হিসেবে গণ্য করবে, ঠিক যেমন আহলে কিতাবরা, যারা নিজেদেরকে আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাসী বলে দাবি করেছিল, কিন্তু যখন তারা তাঁর অবাধ্য হয়েছিল তখন তারা তাঁকে অবিশ্বাস করেছিল।

মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের চতুর্থ বছরে, মহান আল্লাহ মদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর (সাঃ) নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৮১-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

রহিতকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কিছু সময় পর একটি আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা অন্য একটি আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

একজন অমুসলিম থেকে একজন শক্তিশালী মুসলিমে রূপান্তর সহজ করার জন্য, মহান আল্লাহ এই কৌশলটি ব্যবহার করেছেন। যদি সমস্ত চূড়ান্ত আদেশ এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি একসাথে পূর্ণরূপে কার্যকর করা হয়, তাহলে এই প্রক্রিয়াটি কঠিন হয়ে পড়ে। এই কারণেই ইসলামে মদ্যপান অবিলম্বে নিষিদ্ধ করা হয়নি, কারণ এক মুহূর্তের মধ্যে তা ছেড়ে দেওয়া বেশিরভাগ লোকের জন্য কঠিন হত যারা এটি পান করত। পরিবর্তে এটি পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৯:

"তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, "এগুলোতে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারিতা রয়েছে। কিন্তু তাদের পাপ তাদের উপকারের চেয়ে অনেক বেশি।"..."

এবং অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৪৩:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের কাছেও যেও না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পারো যে তোমরা কী বলছো..."

এবং পরিশেষে, ৫ম অধ্যায় আল মায়িদাহ, আয়াত ৯০:

"হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, [আল্লাহ ব্যতীত] পাথরের বেদিতে বলিদান এবং ভাগ্য নির্ধারণকারী তীর শয়তানের কাজ থেকে অপবিত্রতা মাত্র, তাই তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাকো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

এই প্রক্রিয়াটি চিকিৎসা চিকিৎসকরাও গ্রহণ করেন যারা সরাসরি সম্পূর্ণ ডোজ লিখে দেন না বরং সময়ের সাথে সাথে ডোজ বাড়িয়ে দেন যাতে রোগীরা ইতিবাচকভাবে ওষুধের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এই কৌশলটি আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিরাট আশীর্বাদ এবং করুণা ছিল, কারণ ইসলাম গ্রহণকারী অসংখ্য মানুষ যদি ওহীর শুরুতে সমস্ত চূড়ান্ত আদেশ এবং নিষেধাজ্ঞা একসাথে নাজিল হত তবে তা প্রত্যাখ্যান করত। এই আয়াতের শেষ অংশ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও মহান আল্লাহ তা'আলা নিঃসন্দেহে এটি করার ক্ষমতা রাখেন, তবুও তিনি মানুষের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য এবং করুণার পথ বেছে নিয়েছেন।

তাছাড়া, মহান আল্লাহর নিষেধ ও আদেশ মানুষের জীবনকে কঠিন করে তোলার জন্য বিদ্যমান নয়। এগুলো কেবল ইহকাল ও পরকাল উভয় জায়গায় মানুষের

উপকারের জন্যই বিদ্যমান, যদিও এই উপকারিতা মানুষের কাছে স্পষ্ট নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে অ্যালকোহলের নেতিবাচক প্রভাব সবসময় স্পষ্ট ছিল না যেমন শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব। ইসলামে কেবল মানুষকে এই এবং অন্যান্য ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্যই এটি অবৈধ হয়ে ওঠে। তাছাড়া, কোনও কিছুর হিকমত না বুঝে গ্রহণ করা ঈমানের একটি দিক। যদি আদেশ ও নিষেধের সমস্ত হিকমত স্পষ্ট করে দেওয়া হত, তাহলে মুসলমানদের পূর্ণ ঈমান অর্জন করতে দিত না। এই আদেশ ও নিষেধ থেকে কেবল মানুষই উপকৃত হয়, মহান আল্লাহ তাআলা উপকৃত হন না।

এই রহিতকরণ প্রক্রিয়াটি প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর সুরক্ষা এবং সাহায্যের একটি দিক, যাতে মানুষ উভয় জগতেই সহজেই সফল হতে পারে।

সুনানে ইবনে মাজাহ নং ৩৩৭১-এ প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, একজন মুসলিমের কখনই মদ পান করা উচিত নয়, কারণ এটি সকল মন্দের মূল চাবিকাঠি।

দুর্ভাগ্যবশত, সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের মধ্যে এই মহাপাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটিই সকল মন্দের মূল কারণ কারণ এটি অন্যান্য পাপের জন্ম দেয়। এটি বেশ স্পষ্ট যে একজন মাতাল ব্যক্তি তার জিহ্বা এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। মদ্যপানের কারণে কত অপরাধ সংঘটিত হয় তা দেখার জন্য কেবল সংবাদগুলি দেখে নেওয়া উচিত। যারা পরিমিত পরিমাণে মদ্যপান করে তারাও তাদের শরীরের ক্ষতি করে, যা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে। মদের সাথে সম্পর্কিত শারীরিক ও মানসিক রোগগুলি অসংখ্য এবং জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং করদাতাদের উপর ভারী বোঝা তৈরি করে। এটি সমস্ত মন্দের মূল চাবিকাঠি কারণ এটি একজন ব্যক্তির তিনটি দিককেই নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে: তাদের শরীর, মন এবং আত্মা। এটি মানুষের মধ্যে সম্পর্ক ধ্বংস করে, কারণ

মদ্যপান একজনের আচরণকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, মদ্যপান এবং পারিবারিক সহিংসতার মধ্যে একটি স্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদা, আয়াত 90:

"হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, [আল্লাহ ব্যতীত] পাথরের বেদিতে বলিদান এবং ভাগ্য নির্ধারণকারী তীর শয়তানের কাজ থেকে অপবিত্রতা মাত্র, তাই তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাকো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

এই আয়াতে শিরকের সাথে সম্পর্কিত জিনিসগুলির পাশে মদ্যপানকে রাখা হয়েছে, এই বিষয়টি স্পষ্ট করে যে এটি এড়ানো কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

এটি এতটাই গুরুতর পাপ যে, সুনানে ইবনে মাজাহের ৩৩৭৬ নম্বর হাদিসে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি নিয়মিত মদ্যপান করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

সুনান ইবনে মাজাহ, ৬৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, শান্তির ইসলামিক অভিবাদন প্রচার করা জান্নাত লাভের একটি চাবিকাঠি। তবুও, ইমাম বুখারীর, আদাব আল মুফরাদ, ১০১৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মুসলিমদের নিয়মিত মদ্যপানকারী কাউকে অভিবাদন না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৩৮০ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মদকে দশটি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মদ নিজেই, যিনি এটি

তৈরি করেন, যার জন্য এটি তৈরি করা হয়, যিনি এটি বিক্রি করেন, যিনি এটি কিনেন, যিনি এটি বহন করেন, যার কাছে এটি বহন করা হয়, যিনি এটি বিক্রি করে অর্জিত সম্পদ ব্যবহার করেন, যিনি এটি পান করেন এবং যিনি এটি ঢেলে দেন। যে ব্যক্তি এই ধরণের অভিশপ্ত জিনিসের সাথে লেনদেন করে, সে যদি আন্তরিকভাবে তওবা না করে তবে প্রকৃত সাফল্য পাবে না।

যদিও মদ্যপানের নেশা ত্যাগ করা কঠিন, তবুও, খারাপ বন্ধুদের মতো সমস্ত জিনিস এড়িয়ে চলার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করা উচিত। তাদের অবশ্যই তাদের জন্য উপলব্ধ সমস্ত সাহায্য ব্যবহার করতে হবে, যেমন পরামর্শ অধিবেশন। তাদের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তিকে এমন দায়িত্ব দেন না যা সে পূরণ করতে পারে না। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮৬:

"আল্লাহ কোন আত্মার উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন বোঝা চাপান না..."

এই জিনিসগুলি তাদের এই মহাপাপ থেকে চিরতরে দূরে সরে যেতে সাহায্য করবে।

জুয়া নিষিদ্ধকরণ

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের চতুর্থ বছরে, আল্লাহ জুয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর (সাঃ) নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৮১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

নিম্নলিখিত আয়াতে জুয়াকে বহুঈশ্বরবাদের সাথে সম্পর্কিত জিনিসের পাশে রাখা হয়েছে, যা এটিকে এড়িয়ে চলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরে। ৫ম সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত ৯০:

"হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, [আল্লাহ ব্যতীত] পাথরের বেদিতে বলিদান এবং ভাগ্য নির্ধারণকারী তীর শয়তানের কাজ থেকে অপবিত্রতা মাত্র, তাই তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাকো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

ইমাম বুখারীর "আদাবুল মুফরাদ", ১২৬২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিমের উচিত অন্যকে বাজি ধরার কথা বলার ক্ষতিপূরণ হিসেবে দান করা। যদি বাজি ধরার কথা বলার শাস্তি থাকে, তাহলে জুয়ার ভয়াবহতা কি আসলেই কল্পনা করা যায়?

জুয়া কেবল একজন ব্যক্তিকেই ধ্বংস করে না, বরং তার সাথে সম্পর্কিত সকলকে, যেমন তার পরিবারকে ধ্বংস করে। এটি আরও অনেক পাপ এবং অবস্থার সাথে জড়িত, যেমন মদ্যপান এবং বিষণ্নতা।

জুয়া খেলে একজন ব্যক্তি কিছু সম্পদ জিততে পারে কিন্তু শেষমেশ সে কেবল হেরে যাবে।

পবিত্র কুরআনের প্রতি অনিশ্চয়তা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের পর চতুর্থ বছরে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যাত আল-রিকা নামক একটি অভিযানের জন্য রওনা হন। যখন তারা রাতের বেলায় একটি উপত্যকায় থেমে যান, তখন তিনি দুইজন সাহাবীকে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, সেনাবাহিনী ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় উপত্যকার মুখে পাহারা দেওয়ার নির্দেশ দেন। এই সাহাবীদের মধ্যে একজন, আব্বাদ বিন বিশর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন, প্রথম শিফটে যান এবং দ্বিতীয় সাহাবী, আম্মার বিন ইয়াসির, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন, ঘুমিয়ে থাকেন। আব্বাদ বিন বিশর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন, নামাজ পড়তে শুরু করেন। নামাজের সময় একজন অমুসলিম শত্রু সৈন্য তাকে দেখতে পায় এবং তাকে তীর দিয়ে আঘাত করে। আব্বাদ বিন বিশর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন, তার শরীর থেকে তীরটি সরিয়ে প্রার্থনা করতে থাকেন। আম্মার বিন ইয়াসির, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন, ঘুম থেকে ওঠার আগে এটি চারবার ঘটেছিল। অমুসলিম সৈনিক যখন বুঝতে পারে যে দুজন প্রহরী রয়েছে তখন পালিয়ে যায়। আম্মার বিন ইয়াসির জিজ্ঞাসা করেন যে, আব্বাদ বিন বিশর, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, প্রথম তীর আঘাত করার সময় কেন তাকে জাগালেন না? তিনি উত্তর দেন যে, তিনি তার নামাজ শেষ না করা পর্যন্ত পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত বন্ধ করতে চান না। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ)-এর জীবনী", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১৫-১১৬-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের কাছ থেকে এই ধরণের আচরণ আশা করা হয় না, তবে তাদের কাছ থেকে পবিত্র কুরআনের প্রতি প্রকৃত আন্তরিকতা প্রদর্শনের আশা করা হয়।

সহীহ মুসলিমের ১৯৬ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, ইসলাম হলো পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতা। পবিত্র কুরআনের তিনটি দিক

পূরণ করলে এই আন্তরিকতা প্রমাণিত হয়। প্রথমটি হলো সঠিকভাবে এবং নিয়মিতভাবে তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয়টি হলো নির্ভরযোগ্য উৎস এবং শিক্ষকের মাধ্যমে এর শিক্ষা বোঝা। শেষ দিক হলো মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করা। একজন আন্তরিক মুসলিম পবিত্র কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর আমল করার চেয়ে এর শিক্ষার উপর আমল করাকে অগ্রাধিকার দেয়। পবিত্র কুরআনের উপর নিজের চরিত্র গঠন করা হলো মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত আন্তরিকতার লক্ষণ। এটিই নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য, যা সুনানে আবু দাউদ, ১৩৪২ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক হলো এর সকল বিষয় বোঝার এবং তার উপর আমল করার আন্তরিক ইচ্ছা নিয়ে এর সাথে যোগাযোগ করা, যদিও কারো আকাঙ্ক্ষা পবিত্র কুরআন দ্বারা বিরোধিতা করা হয়। যে ব্যক্তি তাদের ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে কোন আদেশ, নিষেধ এবং উপদেশ অনুসরণ করতে এবং উপেক্ষা করতে উৎসাহিত করে, সে এর প্রতি অকৃতজ্ঞতা অবলম্বন করেছে এবং তাই তারা এর নির্দেশনা থেকে প্রকৃত অর্থে উপকৃত হবে না। সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৮২:

"আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাজিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু এটি জালেমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।"

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময়, একজন মুসলমানের কেবল এই উদ্দেশ্যেই এটি ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থাৎ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি তেলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে এমন একটি হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা উচিত যা কোনও সমস্যার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারপর একটি টুলবক্সে রাখা হয়। পবিত্র কুরআনের মূল কাজ হল একজনকে পরকালের নিরাপদে পথ দেখানো। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং কেবল নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলিমের আচরণের পরিপন্থী। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যে

অনেক ধরণের আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কিনেছে, তবে এর কোনও ইঞ্জিন নেই। এইভাবে আচরণ করা এর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করছে।

সুন্দর চরিত্র

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের পর চতুর্থ বছরে, যখন তিনি একটি অভিযান থেকে ফিরে আসেন, তখন জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর দুর্বল উটটি বাকি সেনাবাহিনীর চেয়ে পিছিয়ে ছিল। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যখন এটি লক্ষ্য করেন, তখন তিনি তাকে উট থেকে নেমে যেতে বলেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) লাঠি দিয়ে উটটিকে কয়েকবার ঠেলে দেন এবং আবার আরোহণ করতে বলেন। এরপর উটটি শক্তিশালী এবং দ্রুত হয়ে ওঠে। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে উটটি বিক্রি করতে বলেন। জাবির (রাঃ) তাকে উপহার হিসেবে দেওয়ার প্রস্তাব দেন কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং মূল্য নির্ধারণ করা হয়। জাবির (রাঃ) সদ্য বিবাহিত হওয়ায়, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তার জন্য একটি বিবাহভোজের আয়োজন করেন। যখন তারা মদিনায় ফিরে আসেন, তখন জাবির (রাঃ) উটটি নিয়ে আসেন যা তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে বিক্রি করতে রাজি হন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উটটি দেখে জাবির (রাঃ) কে উপহার হিসেবে দেন এবং বিক্রয়ের জন্য তারা যে অর্থ দিতে রাজি হন তা এবং অতিরিক্ত কিছু অর্থ প্রদান করেন। ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ) এর জীবনী", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১৭-১১৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

অন্যদের প্রতি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মনোভাব ছিল এটাই।

জামে আত তিরমিযী, ২০০৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, বিচার দিবসের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে উত্তম চরিত্র। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এর ফলে একজন ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করতে পারবে

যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এর সারমর্ম হল ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করা।

মূল হাদিসটিতে মানুষের প্রতি ভালো চরিত্র প্রদর্শনের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম আল্লাহর প্রতি বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালনের চেষ্টা করে, কিন্তু অন্যদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে দ্বিতীয় দিকটি উপেক্ষা করে। তারা এর গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়। জামে আত তিরমিযী, ২৫১৫ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে পরামর্শ দেয় যে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে অন্যদের জন্য যা পছন্দ করে তা নিজের জন্য পছন্দ করে। অর্থাৎ, যেভাবে একজন ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে সদয় আচরণ পেতে চায়, তাকে অন্যদের সাথেও ভালো চরিত্রের সাথে আচরণ করতে হবে।

তাছাড়া, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন ও মুসলিম হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার ধর্ম নির্বিশেষে অন্যদের এবং তাদের সম্পদের উপর তার মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি থেকে দূরে থাকে। সুনানে আন নাসায়ীর ৪৯৯৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ৩৩১৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, একজন মহিলা জাহান্নামে প্রবেশ করবে কারণ সে একটি বিড়ালের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে যার ফলে বিড়ালটি মারা গেছে। সুনানে আবু দাউদের ২৫৫০ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, একজন পুরুষকে ক্ষমা করা হয়েছে কারণ সে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে খাওয়ায়। যদি এটি ভালো চরিত্র দেখানোর ফলাফল এবং পশুদের প্রতি খারাপ চরিত্র দেখানোর ফলাফল হয়, তাহলে কি কেউ কল্পনা করতে পারে যে, আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি ভালো চরিত্র দেখানোর গুরুত্ব কত? প্রকৃতপক্ষে, আলোচিত মূল হাদিসটি এই উপদেশ দিয়ে শেষ হয়েছে যে, যার ভালো চরিত্র আছে সে সেই

মুসলিমের মতোই পুরস্কৃত হবে যে অবিরাম আল্লাহর ইবাদত করে এবং নিয়মিত রোজা রাখে।

পরিশেষে, মূল হাদিস অনুসারে, যদি ভালো চরিত্র একজন ব্যক্তির পক্ষে বিচার দিবসের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হয়, তাহলে এর অর্থ হল একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচার দিবসের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে খারাপ চরিত্র। মহান আল্লাহর প্রতি, তাঁর আন্তরিকভাবে আনুগত্য না করার মাধ্যমে, এবং সৃষ্টির প্রতি, অন্যদের দ্বারা যেভাবে আচরণ করা হোক তা না করার মাধ্যমে, খারাপ আচরণ করা।

বৃদ্ধি বা ক্ষতি

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের চতুর্থ বছরে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জয়নব বিনতে খুজাইমা (রাঃ)-কে বিয়ে করেন। তিনি তাঁর নিরন্তর উদার দানশীলতা এবং দরিদ্র ও অভাবীদের প্রতি তাঁর দয়া ও করুণার জন্য "দরিদ্রদের মা" হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীজীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১২-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ২৩৩৬ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রতিদিন দুজন ফেরেশতা আল্লাহর কাছে দু'আ করেন। প্রথম ফেরেশতা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন যে তিনি যেন তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয়কারীর ক্ষতিপূরণ দেন। দ্বিতীয় ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেন তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয়কারীকে ধ্বংস করেন।

এই হাদিসের উদ্দেশ্য হলো উদার হতে এবং কৃপণতা এড়াতে উৎসাহিত করা। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করার অর্থ কেবল ফরজ দান নয়, বরং নিজের এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটাতেও ব্যয় করা হয়, অপচয় এবং অপচয় ছাড়াই, যেমনটি ইসলাম নির্দেশ করেছে। যে কেউ এই উপাদানগুলিতে ব্যয় করতে ব্যর্থ হয় তার সম্পদ ধ্বংস হওয়ার যোগ্য, কারণ তারা এর উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যা বাস্তবে সম্পদকে অকেজো করে তোলে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা কখনই সামগ্রিক ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে না কারণ একজন ব্যক্তিকে এক বা অন্যভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২০২৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে গ্যারান্টি দিয়েছেন যে দান কারও সম্পদ হ্রাস করে না। অধ্যায় ৩৪ সাবা, আয়াত ৩৯:

"...কিন্তু তোমরা [তাঁর পথে] যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তার প্রতিদান দেবেন..."

একজন মুসলিমের মনে রাখা উচিত যে, একজন দানশীল ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরে। অন্যদিকে, কৃপণ ব্যক্তি মহান আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের নিকটবর্তী। জামে আত তিরমিযী, ১৯৬১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই হাদিসটি কেবল সম্পদের ক্ষেত্রেই নয়, বরং সুস্বাস্থ্যের মতো সকল আশীর্বাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই যদি কেউ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের আশীর্বাদ সঠিকভাবে উৎসর্গ এবং ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ফেরেশতাদের প্রার্থনা তাদের বিরুদ্ধে যাবে। মূল হাদিসে উল্লেখিত ধ্বংসের অর্থ আশীর্বাদ হারানো নয় বরং পার্থিব আশীর্বাদ উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ এবং অসুবিধার উৎস হয়ে ওঠা। যারা তাদের আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়, যেমন তাদের সম্পদ। তারা যে সম্পদ অর্জন করে এবং জমা করে রাখে, তা তাদের জন্য শান্তির উৎস হয়ে ওঠে, তা তাদের চাপ এবং উদ্বেগের উৎস হয়ে ওঠে। অতএব, মুসলমানদের জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুসারে প্রতিটি আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা উভয় জগতেই আরও বেশি লাভ করতে পারে, যা বাস্তবে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অন্যথায়, তারা চিরতরে আশীর্বাদ হারাতে পারে। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"আর [স্মরণ করো] যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের [নেয়ামত] বৃদ্ধি করব..."

সহজে অসুবিধা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের চতুর্থ বছরে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উম্মে সালামা (রাঃ)-কে বিয়ে করেন। তার প্রথম বিবাহ হয় একজন সাহাবী আবু সালামা (রাঃ)-এর সাথে, কিন্তু তিনি উহুদের যুদ্ধে এবং তার মৃত্যুর কিছু পরে গুরুতর আহত হন। তার মৃত্যুর পর তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপদেশ অনুসরণ করেন, স্বীকার করেন যে সবকিছুই আল্লাহর এবং সবকিছুই তাঁর কাছে ফিরে যাবে, এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন যাতে তিনি তার স্বামীর ক্ষতিপূরণ পান এবং বিনিময়ে তাকে আরও ভালো কিছু দেন। তিনি ভাবতে থাকেন যে তিনি কীভাবে আবু সালামা (রাঃ)-এর চেয়ে উত্তম কাউকে খুঁজে পাবেন, কিন্তু আল্লাহ (সাঃ)-এর প্রার্থনা পূর্ণ করেন এবং তাই তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছ থেকে বিবাহের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ)-এর জীবনী", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১২৩-১২৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে এবং সহীহ মুসলিমের ২১২৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসনাদে আহমাদের ২৮০৩ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এই বিষয়টি বোঝার গুরুত্ব সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তির প্রতিটি কঠিন পরিস্থিতির পরেই স্বস্তি আসবে। এই বাস্তবতা পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, ৬৫ নম্বর সূরা তালাকের ৭ নম্বর আয়াতে:

"... আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি [অর্থাৎ, স্বস্তি] আনবেন।"

জন্য এই বাস্তবতা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ধৈর্য এবং এমনকি সন্তুষ্টির জন্ম দেয়। পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা একজনকে অধৈর্য, অকৃতজ্ঞতা

এবং এমনকি অবৈধ রিযিকের মতো অবৈধ জিনিসের প্রতিও পরিচালিত করতে পারে। কিন্তু যে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সমস্ত অসুবিধা অবশেষে স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিস্থাপিত হবে, সে ইসলামের শিক্ষার উপর পূর্ণ আস্থা রেখে ধৈর্য ধরে এই পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করবে। এই ধৈর্য মহান আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত পছন্দ করেন এবং প্রচুর পুরস্কৃত হন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৬:

"... আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।"

এই কারণেই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে অসংখ্য উদাহরণ উল্লেখ করেছেন যখন কঠিন পরিস্থিতির পরে স্বাচ্ছন্দ্য ও আশীর্বাদ এসেছিল। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে নবী নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং কীভাবে আল্লাহ তাঁকে মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা করেছিলেন তা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ৭৬:

"আর নূহের কথা [স্মরণ করো], যখন সে [সেই সময়ের] পূর্বে [আল্লাহকে] ডাকছিল, অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে মহাবিপদ [অর্থাৎ, বন্যা] থেকে রক্ষা করেছি।"

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় ২১ নম্বর সূরা আল আম্বিয়ার ৬৯ নম্বর আয়াতে:

“আমরা [অর্থাৎ, আল্লাহ] বললাম, "হে আগুন, তুমি ইব্রাহিমের উপর শীতলতা ও নিরাপত্তা বর্ষণ করো।"

হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এক বিরাট অগ্নিকুণ্ডের মতো কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন, কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য তা শীতল ও শান্তিপূর্ণ করে তুলেছিলেন।

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদিসে এই এবং আরও অনেক উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মুসলমানরা বুঝতে পারে যে, যারা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, তাদের জন্য কঠিন মুহূর্ত অবশেষে স্বস্তি নিয়ে আসবে।

অতএব, মুসলমানদের জন্য এই ইসলামী শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা অসংখ্য ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে পারে যেখানে আল্লাহ তাঁর বাধ্য বান্দাদেরকে তাদের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার পরেও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন। যদি আল্লাহ, মহান, তাঁর বাধ্য বান্দাদেরকে ঐশী শিক্ষায় উল্লিখিত বড় বড় সমস্যা থেকে রক্ষা করে থাকেন, তাহলে তিনি ছোট ছোট সমস্যায় ভোগা বাধ্য মুসলমানদেরও রক্ষা করতে পারেন এবং করবেন।

দ্বিতীয় বদর

উহুদের যুদ্ধ ত্যাগ করার আগে, অমুসলিম নেতা আবু সুফিয়ান পরের বছর বদরে উভয় বাহিনীর পুনরায় মুখোমুখি হওয়ার জন্য একটি সময় ঘোষণা করেন। সময় এলে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) ১৫০০ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন এবং অমুসলিমদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে বদরে শিবির স্থাপন করেন। অমুসলিম সেনাবাহিনীতে প্রায় ২০০০ সৈন্য ছিল কিন্তু বদর থেকে দূরে শিবির স্থাপন করেন। মহান আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ত্রাস ঢেলে দেন এবং যদিও তিনি নিজেই সময় নির্ধারণ করেছিলেন, আবু সুফিয়ান সৈন্যদের মক্কায় ফিরে যেতে উৎসাহিত করেন। মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে তারা ভীত হওয়ায়, তারা তার কোনও বিরোধিতা করেননি এবং মক্কায় ফিরে আসেন। সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, বদরে অবস্থান করেন এবং কিছু লাভজনক ব্যবসা করেন। আট দিন পর, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) আরব জনগণের হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়া বিস্ময় এবং শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বদর ত্যাগ করেন। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার", পৃষ্ঠা ৩০৬-৩০৭-এ এটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তাদের দৃঢ়তার কারণে, মহান আল্লাহ মুসলমানদের এমন একটি মানসিক বিজয় দান করেছিলেন যা সামরিক বিজয়ের চেয়েও বেশি আরব জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

আল্লাহ, মহিমান্বিত, সাহাবাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকুন, কারণ তারা সত্য ঈমানের শর্ত পূরণ করেছিলেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৯:

"সুতরাং তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, যদি তোমরা [সত্যিকারের] মুমিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।"

প্রকৃত ঈমানের মধ্যে রয়েছে প্রতিটি পরিস্থিতিতে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করলে অর্জন করা সম্ভব। এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ভারসাম্য নিশ্চিত করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেবে। এটি উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে এবং এটি এই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের একটি দিক। কিন্তু যদি মুসলমানরা এইভাবে মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা সেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারবে না যা তাদের প্রতিশ্রুত যারা তাঁর প্রতি সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে। পরিশেষে, প্রকৃত ঈমান কেবল কথায় নয়, কাজেই প্রতিফলিত হয়।

প্রিয়জন হারানো

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের চতুর্থ বছরে, হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-এর ছয় বছর বয়সী পুত্র, যিনি মহানবী (সাঃ)-এর নাতিও ছিলেন, ইন্তেকাল করেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রাঃ)-এর "উসমান ইবনে আফফানের জীবনী", যুন-নূরাইন, পৃষ্ঠা ৫৫-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কয়েক বছর পর, হযরত উসমান (রাঃ)-এর স্ত্রী এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কন্যা উম্মে কুলসুমও ইন্তেকাল করেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মন্তব্য করেন যে, যদি তাঁর আরেকটি অবিবাহিত কন্যা থাকত, তাহলে তিনি তাকেও হযরত উসমান (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ দিতেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রাঃ)-এর "উসমান ইবনে আফফানের জীবনী", যুন-নূরাইন, পৃষ্ঠা ৫৬-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্য একটি হাদিসে, মহানবী (সাঃ) একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, যদি তাঁর চল্লিশটি কন্যা থাকত, তাহলে তিনি তাদেরকে উসমান (রাঃ)-এর সাথে একের পর এক বিবাহ দিতেন, যতক্ষণ না তাদের কেউই অবশিষ্ট থাকে। ইমাম সুয়ূতীর "তারিখ আল খুলাফা", পৃষ্ঠা ১৬৩- এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

প্রতিদিন মানুষ তাদের প্রিয়জনদের হারায়। এটি একটি অনিবার্য পরিণতি। একজন মুসলিম এই কঠিন সময়ে অনেক কিছু মনে রাখতে এবং সেগুলি অনুসরণ করতে পারে। একটি বিষয় হল পরিস্থিতিকে ইতিবাচকভাবে পর্যবেক্ষণ করা। অর্থাত্, কেউ যা হারিয়েছে তাতে দুঃখিত হওয়ার পরিবর্তে, তার উচিত সেই

ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত ভালো জিনিসগুলির উপর মনোনিবেশ করা যা সে হারিয়ে গেছে, যেমন তার ভালো পরামর্শ এবং নির্দেশনা। যখন কেউ এই বিষয়ে চিন্তা করে তখন সে বুঝতে পারবে যে তাকে হারানোর আগে তাকে জানা ভালো ছিল, তাকে একেবারেই না জানার চেয়ে। এটি উক্তির অনুরূপ, ভালোবাসা এবং হারানো ভালো, একেবারেই না ভালোবাসার চেয়ে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই উক্তিটি প্রসঙ্গের বাইরে নেওয়া হয় এবং অপব্যবহার করা হয় কিন্তু যখন এইভাবে ব্যবহার করা হয় তখন এটি সঠিক এবং সহায়ক।

অধিকন্তু, একজন মুসলিম যিনি নিঃসন্দেহে পরকালে বিশ্বাস করেন, তাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে মানুষ এই পৃথিবীতে কেবল একে অপরকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য মিলিত হয় না। বরং তারা কেবল পরকালে আবার দেখা করার জন্যই এই পৃথিবী ছেড়ে যায়। এই মনোভাব এমন কঠিন সময়ে ধৈর্য ধারণে সাহায্য করতে পারে। এবং এটি তাদেরকে আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে তাদের প্রিয়জনের সাথে চিরকালের জন্য মিলিত হতে অনুপ্রাণিত করবে।

এছাড়াও, আলোচিত প্রধান ঘটনাগুলিও একজন ভালো জীবনসঙ্গী খুঁজে বের করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। এটি কেবল তখনই অর্জন করা যায় যখন কেউ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনসঙ্গী নির্বাচন করে। সহীহ বুখারী, ৫০৯০ নম্বরে পাওয়া হাদিস অনুসারে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের ধর্মপরায়ণতার উপর ভিত্তি করে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা, অন্যথায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ যার মধ্যে ধার্মিকতা আছে সে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত, এবং মানুষের, যেমন তাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের অধিকার পূরণ করবে। এছাড়াও, যার মধ্যে ধার্মিকতা আছে সে অন্যদের, যেমন তাদের স্ত্রীর, অধিকার পূরণ করবে, এমনকি যখন তারা তাদের উপর বিরক্ত থাকে। অতএব, যখন উভয় স্বামী/স্ত্রীর মধ্যে ধার্মিকতা থাকে, তখন তারা একে

অপরের অধিকার পূরণ করবে, তাদের বিবাহের সময় সুখের হোক বা অসুবিধার, যাই হোক না কেন। অন্যদিকে, যার ধার্মিকতা নেই সে মানুষের অধিকার পূরণ করতে ব্যর্থ হবে, বিশেষ করে যখন তারা তাদের উপর বিরক্ত থাকে। অতএব, একজন অধার্মিক জীবনসঙ্গী নির্বাচন করলে কেবল বিবাহের সমস্যাই তৈরি হবে এবং ঘরে মানসিক শান্তির অভাব হবে। আজকের বেশিরভাগ মুসলিমের দিকে তাকালে এটি বেশ স্পষ্ট।

অভিবাসনের ৫ ম বছর

নেতাদের প্রতি শুভকামনা

অমুসলিমরা বদরের যুদ্ধে উপস্থিত না হওয়ার পর এবং মহানবী (সাঃ) মদিনায় ফিরে আসার পর, তিনি আবার একটি সেনাবাহিনী নিয়ে দৌমাতুল জান্দালের দিকে রওনা হন। এই ভূমিটি রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তে ছিল এবং তাই এটি একটি দীর্ঘ যাত্রা ছিল। দৌমাতুল জান্দালের শত্রুরা মুসলিমদের এবং মুসলিমদের সাথে শান্তি চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদের বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ করছিল। মহানবী (সাঃ) এর কাছেও খবর পৌঁছেছিল যে তারা মদিনার দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা করছে। মহানবী (সাঃ) সমগ্র আরব এবং সম্প্রসারিতভাবে রোমান সাম্রাজ্যকে একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠাতে চেয়েছিলেন যে মুসলিম ভূমি সুরক্ষিত এবং তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সেনাবাহিনী দৌমাতুল জান্দালে পৌঁছালে শত্রু বাহিনী ভয়ে পালিয়ে যায় এবং কোনও যুদ্ধ হয় না। কিছুক্ষণ পর মুসলিম বাহিনী নিরাপদে মদিনায় ফিরে আসে। মদিনা থেকে তাঁর অনুপস্থিতিতে, মহানবী (সাঃ) সিবাকে মদিনার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। মজার বিষয় হলো, সিবা (রাঃ) মদিনার অধিবাসী ছিলেন না এবং মূলত গাফফার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একজন বিদেশীকে কর্তৃত্বে নিযুক্ত করা সাহাবীদের জন্য একটি পরীক্ষা ছিল, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, যারা মহানবী (সাঃ) এর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে পারতেন, কিন্তু তারা তা করেননি। যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন সাহাবীরা (রাঃ) তাদের গোত্রীয় সম্পর্ক ত্যাগ করে ঈমানের সাথে সকলেই একত্রিত হন। অতএব, তারা তাদের নেতার পটভূমি নির্বিশেষে তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রাঃ) এর "প্রভুর (সাঃ) নোবেল জীবন", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩০০-১৩০৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ১৯৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, ইসলাম হলো সমাজের নেতাদের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সদয়ভাবে তাদের সর্বোত্তম পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো যেকোনো প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়া। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, ৫৬ নম্বর বই এবং ২০ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। ৪র্থ অধ্যায় আন-নিসা, ৫৯ নম্বর আয়াত:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী..."

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত একটি কর্তব্য যতক্ষণ না কেউ মহান আল্লাহর অবাধ্যতা না করে। সৃষ্টির প্রতি আনুগত্য যদি স্রষ্টার অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে তবে তা নেই। এই ধরণের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এড়ানো উচিত কারণ এটি কেবল নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে নেতাদেরকে মৃদুভাবে ভালোর উপদেশ দেওয়া এবং মন্দের নিষেধ করা উচিত। অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা যদি সঠিক পথে থাকেন তবে সাধারণ মানুষও সঠিক থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভণ্ডামির লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলা উচিত। আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে সমাজকে কল্যাণের উপর ঐক্যবদ্ধ করে এমন বিষয়ে তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী যেকোনো কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করা। ইসলামে নেতাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য নেই, কেবল এমন বিষয়ে তাদের আনুগত্য করা যা মহান আল্লাহকে খুশি করে।

এছাড়াও, আলোচিত মূল ঘটনাটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে রক্তের মতো অন্যান্য সকল ধরণের বন্ধনের চেয়ে অন্যান্য মুসলমানদের সাথে ঈমানের বন্ধনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার গুরুত্ব কতটুকু। ইসলামের বিরুদ্ধে প্রধান আক্রমণগুলির মধ্যে একটি ছিল মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্য তৈরি করা, যাতে তারা ঈমানের বন্ধনের চেয়ে জাতীয়তাবাদের মতো মানুষের সাথে অন্যান্য সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দিতে উৎসাহিত করা হয়। এটি একটি প্রধান কারণ যা মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের দিকে পরিচালিত করে, কারণ তারা অন্যান্য মুসলমানদের সাথে ঈমানের বন্ধনের চেয়ে মানুষের সাথে তাদের পার্থিব সম্পর্ক নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিল। ফলস্বরূপ, ইসলামী দেশগুলি সহজেই অন্যান্য জাতির মুসলমানদের দুর্দশা উপেক্ষা করে, কারণ তারা তাদের জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়।

উপরন্তু, যখন মুসলমানদেরকে জাতিগত ও বর্ণের মতো পার্থিব কারণে একে অপরের সাথে বন্ধন গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা হয়, তখন ঈমানের বন্ধনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরিবর্তে, তারা যাদের সাথে তাদের পার্থিব সম্পর্ক রয়েছে তাদের সমর্থন করতে উৎসাহিত হবে, এমনকি যদি তারা তাদের ভুল কাজে সমর্থনও করে। অন্যদিকে, যারা অন্য সকল বন্ধনের চেয়ে অন্য মুসলমানদের সাথে তাদের ঈমানের বন্ধনকে অগ্রাধিকার দেয়, তারা কেবল ভালো কাজেই অন্যদের সাহায্য করবে, কারণ ঈমানের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রথমে আসে।

অধিকন্তু, যেহেতু পার্থিব বন্ধন দুর্বল, তাই সময়ের সাথে সাথে তা ভেঙে যায়। এটি আরেকটি কারণ যে কারণে পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ মুসলিমরা সময়ের সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যেমন ভাইবোন। যদি তাদের একে অপরের সাথে প্রাথমিক সম্পর্ক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে হত, তাহলে সময়ের সাথে সাথে তাদের বন্ধন আরও দৃঢ় হত।

আহযাবের যুদ্ধ

একজন সত্যিকারের নেতা

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের পঞ্চম বছরে, মদীনার ইসলামের শত্রুরা মক্কার অমুসলিমদের এবং অন্যান্য বিভিন্ন অমুসলিম গোত্রকে মদীনা আক্রমণ করতে উৎসাহিত করে। এর ফলে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা আহযাবের যুদ্ধ নামেও পরিচিত। সালমান আল ফারসির পরামর্শে মহানবী (সাঃ) এর কাছে তাদের আক্রমণের খবর পৌঁছালে তিনি মদীনার একমাত্র প্রান্তে একটি বিশাল পরিখা খননের নির্দেশ দেন যেখান থেকে শত্রুবাহিনী আক্রমণ করতে পারে। মহানবী (সাঃ) এই পরিখা খননে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১২৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। সকল মুসলিমের জন্য, বিশেষ করে পিতামাতার জন্য, তারা অন্যদের যা পরামর্শ দেন তা মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ। এটা স্পষ্ট। যদি কেউ ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখে যারা তাদের প্রচারিত কথা অনুসারে কাজ করেছিল অন্যদের উপর অনেক বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল যারা আদর্শের দ্বারা নেতৃত্ব দেননি তাদের তুলনায় । সর্বোত্তম উদাহরণ হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর, যিনি কেবল তাঁর প্রচারিত শিক্ষাই পালন করেননি বরং অন্য যে কারো চেয়ে কঠোরভাবে সেই শিক্ষাগুলো মেনে চলেন । শুধুমাত্র এই মনোভাবই মুসলিমদের, বিশেষ করে পিতামাতাদের, অন্যদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মা তার সন্তানদের মিথ্যা না বলার জন্য সতর্ক করেন কারণ এটি একটি পাপ কিন্তু প্রায়শই তাদের সামনেই থাকে, তার সন্তানদের সম্ভাবনা কম তার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা। একজন ব্যক্তির কাজ অন্যদের উপর তাদের কথার

চেয়ে সবসময় বেশি প্রভাব ফেলবে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে একজনকে নিখুঁত হতে হবে। এর অর্থ হল তাদের আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা উচিত নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে। পবিত্র কুরআন নিম্নলিখিত আয়াতে স্পষ্ট করে বলেছে যে, মহান আল্লাহ এই আচরণকে ঘৃণা করেন। প্রকৃতপক্ষে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহিহ বুখারীতে ৩২৬৭ নম্বর হাদিসে সতর্ক করে বলেছেন যে, একজন ব্যক্তি যারা সৎকাজের আদেশ দিত কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকত এবং মন্দ কাজ নিষিদ্ধ করেছেন তবুও তারা নিজেরাই এটিতে অভিনয় করেছে কঠোর জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। ৬১ সূরা আস সাফ, আয়াত ৩:

"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য বিষয় হলো তোমরা এমন কথা বলো যা তোমরা করো না।"

তাই সকল মুসলমানের জন্য তাদের উপদেশ অনুসারে নিজেরা কাজ করার চেষ্টা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারপর অন্যদের উপদেশ দিন একই কাজ করা। উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেওয়া হল ঐতিহ্য সকল পবিত্র নবীদের মধ্যে, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, এবং এটি অন্যদের ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার সর্বোত্তম উপায়।

প্রচেষ্টা পুরষ্কারের দিকে নিয়ে যায়

আহযাবের যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে, শত্রু বাহিনী যাতে সহজেই মদিনায় প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য একটি বিশাল পরিখা খনন করা হয়েছিল। মহানবী (সা.) এই পরিখা খননে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে এবং আখেরাতের পুরষ্কার অর্জন করতে উৎসাহিত করেছিলেন। তারা সকলেই তাঁর সাথে কাজ করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১২৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি ৪৭ তম অধ্যায় মুহাম্মদের ৭ম আয়াতের সাথে সম্পর্কিত :

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করবেন।"

এই আয়াতের অর্থ হলো, কেউ যদি ইসলামকে সাহায্য করে, তাহলে মহান আল্লাহ উভয় জগতেই তাদের সাহায্য করবেন। এটা আশ্চর্যজনক যে অসংখ্য মানুষ আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, কিন্তু আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, তার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এই আয়াতের প্রথম অংশটি পূরণ করে না। বেশিরভাগ মানুষ যে অজুহাত দেয় তা হল, তাদের সৎকর্ম করার সময় নেই। তারা আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, কিন্তু তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সময় বের করে না। এর কি কোন যুক্তি আছে? যারা বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালন করে না এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে আল্লাহর সাহায্যের আশা করে, তারা বেশ বোকা। আর যারা বাধ্যতামূলক

কর্তব্য পালন করে কিন্তু তার বাইরে যেতে অস্বীকার করে, তারা দেখতে পায় যে তারা যে সাহায্য পায় তা সীমিত। কেউ কীভাবে আচরণ করে তার সাথে কীভাবে আচরণ করা হয়। মহান আল্লাহর জন্য যত বেশি সময় এবং শক্তি নিবেদিত হয়, তারা তত বেশি সমর্থন পাবে। এটা সত্যিই এত সহজ।

একজন মুসলিমের বুঝতে হবে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মতো বেশিরভাগ ফরজ কাজই তার দিনের মধ্যে খুব অল্প সময়ের জন্য সম্পন্ন হয়। একজন মুসলিম কখনোই আশা করতে পারে না যে, প্রতিদিন মাত্র এক ঘন্টা ফরজ নামাজ আদায়ের জন্য সময় ব্যয় করবে এবং তারপর বাকি সময় আল্লাহকে অবহেলা করবে এবং সমস্ত অসুবিধার মধ্যেও তাঁর অবিরাম সহায়তা আশা করবে। একজন ব্যক্তি এমন বন্ধুকে অপছন্দ করবে যে তার সাথে এমন আচরণ করে। তাহলে কীভাবে একজন ব্যক্তি বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর সাথে এমন আচরণ করতে পারে?

কেউ কেউ পার্থিব কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে, তারপর স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করে তার সমাধানের জন্য তাঁর কাছে দাবি করে। এই বোকা মানসিকতা স্পষ্টতই আল্লাহর দাসত্বের পরিপন্থী। এটা আশ্চর্যজনক যে এই ধরণের ব্যক্তিরা তাদের অন্যান্য অবসর কাজ যেমন পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো, টিভি দেখা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য সময় বের করে কিন্তু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সময় বের করে না। তারা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং গ্রহণ করার জন্য সময় বের করে না। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অধ্যয়ন এবং তার উপর আমল করার জন্য সময় বের করে না। এই লোকেরা কোনওভাবে তাদের অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা ব্যয় করার জন্য সম্পদ খুঁজে পায় কিন্তু স্বেচ্ছায় দান করার জন্য কোন সম্পদ খুঁজে পায় না।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিমের সাথে তার আচরণ অনুসারে আচরণ করা হবে। অর্থাৎ, যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য অতিরিক্ত সময় উৎসর্গ করে, তাহলে তারা সমস্ত অসুবিধার মধ্য দিয়ে নিরাপদে ভ্রমণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবে। কিন্তু যদি তারা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় অথবা শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য অন্য কোনও সময় উৎসর্গ না করেই তা পালন করে, তাহলে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে একই রকম প্রতিক্রিয়া পাবে। সহজ কথায়, যে যত বেশি দেবে, সে তত বেশি পাবে। যদি কেউ বেশি না দেয়, তবে তার বিনিময়ে খুব বেশি আশা করা উচিত নয়।

প্রচেষ্টায় দুর্বলতা

আহযাবের যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে, শত্রু বাহিনী যাতে সহজেই মদিনায় প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য একটি বিশাল পরিখা খনন করা হয়েছিল। মহানবী (সাঃ) এই পরিখা খননে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিছু মুনাফিক শারীরিকভাবে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং দুর্বলতার অভিযোগ করেছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অনুমতি ছাড়াই গোপনে মহানবী (সাঃ) এবং সাহাবীগণকে পরিখা খনন করার সময় ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা ২৪ নুর, আয়াত ৬২-৬৪ নাযিল করেন:

“মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে এবং যখন তারা কোন সাধারণ কাজে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন তাঁর অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত চলে যায় না। নিঃসন্দেহে, যারা আপনার অনুমতি চান, তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে। অতএব, যখন তারা তাদের কোন কাজের জন্য আপনার কাছে অনুমতি চান, তখন তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। তোমাদের মধ্যে রাসূলের ডাককে তোমাদের একজনের অন্যজনের ডাকের মতো মনে করো না। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা লুকিয়ে লুকিয়ে চলে যায় তাদের সম্পর্কে জানেন। অতএব, যারা তাঁর (অর্থাৎ, নবীর) আদেশের বিরোধিতা করে তাদের সতর্ক থাকা উচিত, পাছে তাদের উপর কোন বিপদ আসে অথবা তাদের উপর কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসে। নিঃসন্দেহে, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই। তোমরা যা কিছুর উপর দাঁড়িয়ে আছো, তিনি তা জানেন এবং যেদিন তারা তাঁর কাছে ফিরে আসবে, তিনি তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। আর আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে অবগত।”

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১২৮-১২৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ভণ্ডামির একটি দিক হলো যখন কেউ মৌখিকভাবে অন্যদের এবং তাদের ভালো প্রকল্পের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে, যেমন মসজিদ নির্মাণ, কিন্তু যখন সম্পদ দান করার মতো প্রকল্পে অংশ নেওয়ার সময় আসে, তখন মনে হয় যেন তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। একইভাবে, যখন মানুষ সুখের সময় পার করে, তখন তারা মৌখিকভাবে তাদের প্রতি তাদের আনুগত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু যখন মানুষ সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন এই ভণ্ডামিরা কোনও মানসিক বা শারীরিক সমর্থন দেয় না। বরং তারা তাদের সমালোচনা করে। মহানবী (সা.)-এর সময়ে মুনাফিকদের মনোভাব ছিল এটাই। সূরা ৪ আন-নিসা, আয়াত ৬২:

"তাহলে কেমন হবে যখন তাদের উপর তাদের কৃতকর্মের কারণে কোন বিপদ আসে এবং তারা তোমার কাছে আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, "আমরা কেবল সদাচরণ এবং আশ্রয়দানের ইচ্ছা করেছিলাম।"

অধিকন্তু, এই ঘটনাটি সর্বদা, স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা অসুবিধার সময়, মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকার গুরুত্ব নির্দেশ করে। যে ব্যক্তি কখন মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে এবং কখন করবে না তা বেছে নেয় এবং বেছে নেয়, সে কেবল তার ইচ্ছার উপাসনা করে, এমনকি যদি তারা অন্যথা দাবি করে। সূরা আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

পূর্বে উদ্‌ধৃত আয়াতগুলিতে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এই ধরণের আচরণ করবে সে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। কারণ তাদের আচরণ তাদেরকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধ্য করবে যা তাদেরকে একটি সুষম মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনে বাধা দেবে এবং এর ফলে তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল পথে চালিত করবে। এটি তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে। ফলস্বরূপ, তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলেই তাদের জন্য চাপের উৎস হয়ে উঠবে যা তাদেরকে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, যেমন বিষণ্নতা, মাদকাসক্তি এবং এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতার দিকে ঠেলে দেবে। এই সত্যটি বোঝার জন্য কেবল তাদের পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে। অতএব, ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ এবং তার উপর কাজ করা উচিত যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। তাদের এমন একজন জ্ঞানী রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত থাকে। এই জ্ঞানী রোগী যেভাবে ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যারা ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন তিনিও একইভাবে ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন। সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, একমাত্র মহান আল্লাহই এমন নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা মনের শান্তির দিকে পরিচালিত করে। জ্ঞান, দূরদর্শিতা, অভিজ্ঞতার অভাব এবং পক্ষপাতের কারণে মানবসৃষ্ট সমস্ত আচরণবিধি এই পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে না।

বাস্তব জীবন

আহযাবের যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে, শত্রু বাহিনী যাতে সহজেই মদিনায় প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য একটি বিশাল পরিখা খনন করা হয়েছিল। মহানবী (সাঃ) এই পরিখা খননে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। একবার মহানবী (সাঃ) শীতল সকালে সাহাবাদের (রাঃ) কাছে বেরিয়ে এসে পরিখা খনন করার সময় তাদের ক্ষুধা ও চরম ক্লান্তি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি মহান আল্লাহর কাছে তাদের ক্ষমা করার জন্য দুআ করেছিলেন এবং আরও যোগ করেছিলেন যে আসল জীবন হল পরকালের জীবন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ)-এর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১২৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে এবং সহীহ বুখারী, ৪০৯৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি এই কথা মনে রাখার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে, এই পৃথিবীর জীবন এমন একজন ব্যক্তির মতো, যে অস্থায়ী কর্ম ভিসায় অন্য দেশে ভ্রমণ করে। তাদের লক্ষ্য পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করা নয়, বরং কঠোর পরিশ্রম করে যতটা সম্ভব অর্থ সঞ্চয় করা, যা তারা তাদের কর্ম ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে তাদের স্বদেশে ফিরিয়ে নিতে পারে। এই কর্মচারী যদি তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করার জন্য উৎসর্গ করে এবং তাদের স্বদেশে উল্লেখযোগ্য কিছুই ফিরিয়ে না আনে, তাহলে যেভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হবে, ঠিক তেমনিভাবে যে মুসলিম তাদের বেশিরভাগ সম্পদ পার্থিব আনন্দ উপভোগ করার জন্য উৎসর্গ করে এবং বিচারের দিনে মহান আল্লাহর কাছে খালি হাতে ফিরে আসে, তারাও সমালোচিত হবে। একজন মুসলিম মাঝে মাঝে বৈধ আনন্দ উপভোগ করতে পারে, কিন্তু তাদের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তাদের এই পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট দায়িত্বের জন্য পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। এর ফলে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেওয়ার

পাশাপাশি তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেবে। কিন্তু যদি কেউ পার্থিব আনন্দ উপভোগকে অগ্রাধিকার দেয়, তাহলে তারা এই কর্তব্যকে অবহেলা করবে এবং পরিবর্তে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি পাবে না এবং তারা বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হবে। অতএব, তারা উভয় জগতেই ক্ষতিগ্রস্থ হবে, যদিও এটি এই পৃথিবীতে তাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

ধৈর্যের সাথে কৃতজ্ঞতা

আহযাবের যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে, শত্রু বাহিনী যাতে সহজেই মদিনায় প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য একটি বিশাল পরিখা খনন করা হয়েছিল। পরিখা খননের সময়, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সাহাবীদের উৎসাহিত করার জন্য দোয়া এবং পংক্তি পাঠ করতেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। এর মধ্যে একটি পংক্তি ছিল: "আল্লাহর নামে এবং তাঁর মাধ্যমে আমরা হেদায়াত পেয়েছি এবং যদি আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করতাম তবে আমরা কষ্ট পেতাম। কত সুন্দর প্রভু! কত সুন্দর ধর্ম!" ইমাম ইবনে কাথিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩০-১৩১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনা আত্মার একটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। যখন একজন ব্যক্তি মনে করে যে তার ধৈর্যের প্রয়োজন, তখন আসলে তার উচিত মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যখন একজন ব্যক্তি কোনও সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন তার উচিত তার অগণিত আশীর্বাদগুলি স্মরণ করা যায়। তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে তারা যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তা আরও খারাপ হতে পারত এবং বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য কেবল সর্বোত্তম সিদ্ধান্তই দেন, এমনকি যদি তারা তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্তের পিছনের প্রজ্ঞা পর্যবেক্ষণ না করে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

এই সত্যগুলি এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করবে যেখানে বেশিরভাগ মানুষ ধৈর্য প্রদর্শনের প্রত্যাশা করে। নিয়তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ কেবল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা। কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ ভালো কথা বলা বা নীরব থাকা। আর কাজের মধ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে খুশি করার জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

পরীক্ষার ফলাফল

আহযাবের যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে, শত্রু বাহিনী যাতে সহজেই মদিনায় প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য একটি বিশাল পরিখা খনন করা হয়েছিল। মহানবী (সাঃ) এই পরিখা খননে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরিখা খনন করার সময়, সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, মহানবী (সাঃ) কে অত্যন্ত শক্ত জমির একটি টুকরো সম্পর্কে বলেছিলেন যা তারা ভাঙতে পারেনি। মহানবী (সাঃ) এসে কোদাল দিয়ে শক্ত জমিতে আঘাত করলে তা নরম বালিতে পরিণত হয়। তারা আরও প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, মহানবী (সাঃ) সম্পদের অভাবের কারণে তিন দিন ধরে না খেয়ে থাকার কারণে ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে নিজের পেটে একটি পাথর বেঁধেছিলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে এবং সহীহ বুখারী, ৪১০১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসেও আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর যুগে, সৃষ্টির শুরু থেকেই, বিশেষ করে তাঁর উপর শান্তি ও শান্তি বর্ষিত হোক, মুমিনদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রভাব পড়েছে, তবুও মনে হয় আধুনিক যুগের পরীক্ষা মুসলিমদের জন্য আরও বেশি অসুবিধা ও অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, নেককার পূর্বসূরীরা যে পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন তা উভয় জগতেই তাদের সম্মানের দিকে পরিচালিত করেছিল। পরীক্ষার ফলাফল এবং ফলাফলের এই পার্থক্যের মূল কারণ হল, যখন নেককার পূর্বসূরীরা আসলে পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন, তখন আধুনিক যুগের মুসলমানদের তুলনায় তারা আরও বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, যা সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪০২৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করে তাদের পরীক্ষা ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এর ফলে তারা নিরাপদে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং উভয় জগতেই মহান আল্লাহর কাছ থেকে মহান সম্মান

ও আশীর্বাদ পেয়েছে। অন্যদিকে, এই যুগের অনেক মুসলিম পরীক্ষার সম্মুখীন হলেও আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকে না। তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে, পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সাফল্য এবং সম্মান কেবল তাদেরই দেওয়া হয় যারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকে, অন্যদিকে, অবাধ্যতা কেবল অপমানের দিকেই পরিচালিত করে। অতএব, মুসলমানদের এমন এক প্রান্তে আল্লাহকে উপাসনা করা উচিত নয় যেখানে তারা কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের সময় তাঁর আনুগত্য করে এবং কঠিন সময়ে ক্রুদ্ধ ও অবাধ্য হয়ে তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এটি প্রকৃত দাসত্ব বা মহান আল্লাহর আনুগত্য নয়। সহজ কথায়, কোন কাজই দীর্ঘমেয়াদে মুসলমানদের সাহায্য করবে না যদি না তা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। অবাধ্যতা কেবল এক অসুবিধা থেকে অন্য অসুবিধায়, এক অপমানের দিকে অন্য অসুবিধায় নিয়ে যাবে। অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ১৪৭:

"যদি তোমরা কৃতজ্ঞ থাকো এবং ঈমান আনো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দিয়ে কী করবেন?"...

অন্যদের জন্য উদ্বেগ

আহযাবের যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে, শত্রু বাহিনী যাতে সহজেই মদিনায় প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য একটি বিশাল পরিখা খনন করা হয়েছিল। মহানবী (সাঃ) এই পরিখা খননে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরিখা খনন করার সময়, সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ক্ষুধার যন্ত্রণা নিবারণের জন্য নিজের পেটে একটি পাথর বেঁধেছিলেন, কারণ তারা সকলেই তিন দিন ধরে সম্পদের অভাবে খাবার খায়নি। একজন সাহাবী, জাবির, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন এবং তার স্ত্রীকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর জন্য কিছু খাবার রান্না করতে বললেন। কয়েকজনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে রান্না করার পর, তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানালেন যে সামান্য খাবার পাওয়া গেলেও, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সাহাবীগণকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, যারা শত শত উপস্থিত ছিলেন এবং অলৌকিকভাবে উপস্থিত সকলের জন্য খাবার যথেষ্ট হয়ে গেল। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ)-এর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩১-১৩২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে এবং সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত ৪১০১ নম্বর হাদিসেও আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজেও এই দাওয়াত গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি সর্বদা সকল মানুষের প্রতি আন্তরিক ছিলেন।

সহীহ মুসলিমের ১৯৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, ইসলাম হলো সাধারণ মানুষের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা। এর মধ্যে রয়েছে অন্যদের ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে

নিষেধ করা, সর্বদা অন্যদের প্রতি করুণা ও সদয় হওয়া। সহীহ মুসলিমের ১৭০ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিসের মাধ্যমে এর সারসংক্ষেপ করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে, কেউ যতক্ষণ না নিজের জন্য যা কামনা করে, অন্যদের জন্য তাই পছন্দ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃত মুমিন হতে পারে না।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে সহীহ বুখারীর ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এই দায়িত্বকে ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠা এবং ফরজ দান করার পরেই রেখেছেন। এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব বোঝা যায় কারণ এটিকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্বের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ হলো, যখন তারা সুখী হয় তখন খুশি হওয়া এবং যখন তারা দুঃখিত হয় তখন দুঃখিত হওয়া, যতক্ষণ না তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। উচ্চ স্তরের আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্যদের জীবনকে উন্নত করার জন্য চরম সীমা অতিক্রম করা, এমনকি যদি এটি তাদের নিজেদেরকে অসুবিধার মধ্যে ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ অভাবীদের জন্য সম্পদ দান করার জন্য কিছু জিনিসপত্র ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। সর্বদা কল্যাণের জন্য মানুষকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের একটি বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় ১৭ আল ইসরা, আয়াত ৫৩:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়..."

মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি উপায় হল অন্যদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং তাদের পাপের বিরুদ্ধে গোপনে উপদেশ দেওয়া। যে ব্যক্তি এইভাবে কাজ করে, আল্লাহ তার পাপ ঢেকে রাখবেন। জামে আত তিরমিযী, ১৪২৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব অন্যদের ধর্মের দিকগুলি এবং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া এবং শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে তাদের পার্থিব এবং ধর্মীয় জীবন উভয়ই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যদের অপবাদ থেকে তাদের সমর্থন করে। অন্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ প্রাণীই এইরকম আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজ পরিবর্তন করতে না পারে, তবুও তারা তাদের জীবনের লোকদের, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, অন্যদের সাথে সেই আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় লোকেরা তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় ২৮ আল কাসাস, আয়াত ৭৭:

"... আর তুমিও ভালো কাজ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি ভালো করেছেন..."

অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক হল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য তাদের সাহায্য করা। মানুষের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা কামনা করা উচিত নয়, কারণ এটি তার সওয়াব নষ্ট করে এবং আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি স্পষ্ট অকৃতজ্ঞতা।

আমাদের একজন

আহযাবের যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে, শত্রু বাহিনী যাতে সহজেই মদিনায় প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য একটি বিশাল পরিখা খনন করা হয়েছিল। খননের সময়, মক্কার সাহাবী এবং মদীনার সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, সালমান আল ফারসি, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, নিয়ে তর্ক শুরু করে। উভয় পক্ষই দাবি করেছিল যে তিনি তাদেরই, যদিও তিনি মদিনার বাসিন্দা বা মক্কা থেকে আসা মুহাজির ছিলেন না, বরং তিনি পারস্য থেকে এসেছিলেন। মহানবী মুহাম্মদ (সা.) বিতর্কের সমাপ্তি ঘোষণা করে ঘোষণা করেছিলেন যে সালমান, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তার পরিবারের সদস্য ছিলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সালমান (রাঃ) কে এই সম্মান প্রদান করা হয়েছিল তাঁর ধার্মিকতার কারণে, কারণ তিনি রক্তের মাধ্যমে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে কোনভাবেই সম্পর্কিত ছিলেন না। সুনানে আবু দাউদের ৫১১৬ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, মর্যাদা কারো বংশের মধ্যে নিহিত নয়, কারণ সকল মানুষই হযরত আদম (সাঃ) এর বংশধর এবং তিনি মাটি থেকে তৈরি। তিনি উপসংহারে বলেছিলেন যে, মানুষের উচিত তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বংশ সম্পর্কে গর্ব করা ছেড়ে দেওয়া।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও কিছু অজ্ঞ মুসলিম জাতি ও সম্প্রদায় তৈরি করে অন্যান্য জাতির মনোভাব গ্রহণ করেছে, যার ফলে এই গোষ্ঠীর উপর ভিত্তি করে কিছু লোককে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করেছে, তবুও ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের জন্য একটি সহজ মানদণ্ড ঘোষণা করেছে, তা হলো তাকওয়া। অর্থ, একজন মুসলিম যত বেশি আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে তাদের মর্যাদা তত বেশি হয়। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এই আয়াতটি অজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা তৈরি অন্যান্য সমস্ত মানদণ্ডকে ধ্বংস করে দেয়, যেমন কারো জাতি, জাতিগততা, সম্পদ, লিঙ্গ বা সামাজিক মর্যাদা।

অধিকন্তু, যদি কোন মুসলিম তার বংশের কোন ধার্মিক ব্যক্তির উপর গর্বিত হয়, তাহলে তাদের উচিত আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই বিশ্বাস সঠিকভাবে প্রদর্শন করা। অন্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে তাদের সম্পর্কে গর্ব করা এই দুনিয়া বা আখেরাতে কারোরই কোন উপকারে আসবে না। জামে আত তিরমিযী, ২৯৪৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি অন্যদের নিয়ে গর্ব করে কিন্তু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়, সে পরোক্ষভাবে তাদের অসম্মান করছে, কারণ বাইরের জগৎ তাদের খারাপ চরিত্র দেখবে এবং ধরে নেবে যে তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষও একইভাবে আচরণ করেছিলেন। অতএব, এই কারণেই এই লোকদের মহান আল্লাহর আনুগত্যে আরও বেশি প্রচেষ্টা করা উচিত। এরা সেই লোকদের মতো যারা মহানবী (সাঃ) এর বাহ্যিক

ঐতিহ্য এবং উপদেশ গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি রাখা বা স্কার্ফ পরা, কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ মহৎ চরিত্র গ্রহণ করে না। বাইরের জগৎ যখন এই মুসলমানদের খারাপ চরিত্র দেখবে, তখন তারা মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে কেবল নেতিবাচক চিন্তা করবে।

পরিশেষে, মানবজাতির উৎপত্তি স্মরণ করলে অহংকার থেকে বিরত থাকা যাবে, যার এক অণু পরিমাণও নরকে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহিহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অহংকার কেবল অন্যদের অবজ্ঞা করতে উৎসাহিত করে, যদিও তাদের কাছে থাকা সমস্ত ভালো জিনিসই মহান আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন এবং দান করেছেন। অহংকারও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করবে, যখন তা তাদের কাছ থেকে আসে না। অতএব, যেকোনো কিছুর প্রতি অহংকার, যেমন একজনের ধার্মিক পূর্বপুরুষ, যেকোনো মূল্যে এড়িয়ে চলতে হবে।

দৃঢ় বিশ্বাস

আহযাবের যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে, শত্রু বাহিনী যাতে সহজেই মদিনায় প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য একটি বিশাল পরিখা খনন করা হয়েছিল। খননের সময় কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, একটি শক্তিশালী সাদা পাথরের মুখোমুখি হন যা তারা ভাঙতে পারেননি। যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সেখানে পৌঁছান, তখন তিনি একটি কুঠার দিয়ে তিনবার আঘাত করেন। প্রতিবারই তিনি এতে আঘাত করার সময় একটি বিশাল আলোর ঝলক দেখা যেত যা একটি অন্ধকার রাতে একটি বিশাল লণ্ঠনের মতো দেখা যেত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মন্তব্য করেছেন যে, প্রতিবারই তিনি পাথরটিতে আঘাত করার সময় তাকে তিনটি বিশাল অঞ্চল দেখানো হয়েছিল যেখানে সেই সময় প্রভাবশালী সাম্রাজ্য শাসিত ছিল এবং তাকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে তার জাতি তাদের সকলকে জয় করবে। সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, মহান আল্লাহর প্রশংসা করেছিলেন এবং এই সুসংবাদে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। অন্যদিকে, মুনাফিকরা এবং দুর্বল ঈমানদাররা উপহাসের সাথে ঘোষণা করেছিল যে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কীভাবে দাবি করতে পারেন যে, এই মহান সাম্রাজ্যগুলি তাঁর জাতির দ্বারা পরাজিত হবে, যদিও দরিদ্র সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, একটি পরিখা খনন করছিলেন এবং শত্রুর আক্রমণের ভয়ে খোলা জায়গায় যেতেও পারছিলেন না। এরপর আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা আল আহযাবের ১২ নং আয়াত নাযিল করেন:

"আর [স্মরণ করো] যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা বলেছিল, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে কেবল প্রতারণার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন সময়ে এটি ঘটেছিল। তারা খুব কম রসদ সহ একটি বিশাল পরিখা খনন করছিল এবং শত্রুদের বিশাল আক্রমণের আশঙ্কা করছিল। এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কথা মেনে নিয়েছিলেন, কারণ তাদের ঈমান অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। অতএব, এটি দৃঢ় ঈমান গ্রহণের গুরুত্ব নির্দেশ করে, কারণ এটি উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে।

দৃঢ় ঈমান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি নিশ্চিত করে যে, মানুষ যেকোনো পরিস্থিতিতে, স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা কঠিন, সর্বাবস্থায়, আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে প্রাপ্ত স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণগুলি শিখে এবং তার উপর আমল করে, যা ব্যাখ্যা করে যে, আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তার ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। এই ব্যক্তি যখন তাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয় তখন সহজেই আল্লাহকে অমান্য করবে, কারণ তারা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে, তাদের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে বরং আল্লাহকে মেনে চলা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অতএব, ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জন করতে হবে যাতে তারা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি

সঠিকভাবে ব্যবহার করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং তাদের জীবনের মধ্যে প্রত্যেককে এবং সবকিছুকে সঠিকভাবে স্থাপন করার মাধ্যমে।

বিজ্ঞতার সাথে বন্ধু নির্বাচন করা

আহযাবের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে, উবাদাহ বিন সামিত (রাঃ) নামে এক সাহাবী ইহুদীদের মিত্রদের সাথে ছিলেন এবং ফলস্বরূপ তিনি শত্রুদের ভয় দেখানোর জন্য তাদেরকে যুদ্ধের জন্য নিয়ে আসার পরামর্শ দেন। এই প্রসঙ্গে, আল্লাহ তায়ালা সূরা আলে ইমরানের ২৮ নং আয়াত নাযিল করেন:

" মুমিনরা যেন মুমিনদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে বন্ধু (অর্থাৎ, সমর্থক বা অভিভাবক) হিসেবে গ্রহণ না করে। আর যে কেউ [তোমাদের মধ্যে] এমনটি করে তার আল্লাহর সাথে কোন সম্পর্ক নেই, তবে সাবধানতার সাথে তাদের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা ছাড়া। আর আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের সম্পর্কে সতর্ক করছেন এবং আল্লাহর দিকেই [চূড়ান্ত] গন্তব্য।"

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৩:২৮, পৃষ্ঠা ৩২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই আয়াতের অর্থ এই নয় যে একজন মুসলিম একজন অমুসলিমের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে না কারণ এই আয়াতটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময়কার অমুসলিমদের কথা উল্লেখ করে। ইসলামের ধ্বংস কামনাকারী অমুসলিমদের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া সেই সময়ে বিশেষভাবে বিপজ্জনক ছিল কারণ অমুসলিমরা ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ে সাহায্য করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অর্জনের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করত।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে উপদেশ দেয় যে, মহান আল্লাহ অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন না। ৬০ তম সূরা আল মুমতাহানা, আয়াত ৮:

"যারা ধর্মের কারণে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের সাথে সদাচরণ করতে এবং তাদের সাথে ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন।"

আলোচ্য মূল আয়াতটি এই বিষয়টিকে আরও সমর্থন করে যে, একজন ব্যক্তি কেবল সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করে যার ভয়ে সে তার ক্ষতি করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময়ে বেশিরভাগ অমুসলিমদের আচরণ এই ছিল।

বাস্তবে, মূল আয়াতটি মুসলমানদের সতর্ক করে যে, যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করতে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত তিনি তাদেরকে যে আশীর্বাদ দিয়েছেন তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা। বাস্তবে এটি মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুনানে আবু দাউদের ৪৮৩৩ নম্বর হাদিসে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, একজন ব্যক্তি তার সঙ্গীর জীবনধারা গ্রহণ করবে। এর অর্থ হল, একজন ব্যক্তি তার সঙ্গীর মধ্যে থাকা ভালো বা খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করবে, তা সে স্পষ্ট হোক বা না হোক।

এছাড়াও, মুসলিম ও অমুসলিম সকলের সাথে সদয় আচরণ করা একজন প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য। সুনানে আন নাসায়ীর ৪৯৯৮ নম্বর হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, একজন প্রকৃত মুসলিম ও মুমিন হলেন সেই ব্যক্তি যিনি তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্য ব্যক্তি ও তাদের সম্পদ থেকে দূরে রাখেন। তাই এই আয়াতে মুসলমানদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন মুত্তাকীদের সাথে থাকে কারণ তারা তাদেরকে মহান আল্লাহর রহমত ও আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, অন্যদের সাথে সুস্থ সামাজিক আচরণ এবং অন্যদের সাথে গভীর বন্ধুত্বের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। গভীর বন্ধুত্ব একজনকে তার সঙ্গীর প্রতি ভালোবাসার কারণে তার ঈমানের সাথে আপোষ করতে পরিচালিত করতে পারে, অন্যদিকে, অন্যদের সাথে ভালো সামাজিক আচরণ কখনই তাকে এই পর্যায়ে নিয়ে যাবে না। অতএব, মুসলমানদের সকলের সাথে ভালো চরিত্র এবং আচরণ গ্রহণ করা উচিত, তবে তাদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব সংরক্ষণ করা উচিত যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের দিকে উৎসাহিত করবে। এটি কেবল একজন মুসলিম অন্য মুসলিমের জন্য করতে পারে। অন্যদিকে, একজন অমুসলিম, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর অবাধ্য হতে উৎসাহিত করবে, যদিও তারা এটির উদ্দেশ্য নাও রাখে। এর কারণ হল, একজন অমুসলিম একজন মুসলিমের চেয়ে আলাদা আচরণবিধি অনুসরণ করে জীবনযাপন করে। এবং একজন অমুসলিমের কাছে যে আচরণ গ্রহণযোগ্য তা ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। এই ধরনের লোকদের সাথে থাকলে এই অগ্রহণযোগ্য আচরণ মুসলমানদের দৃষ্টিতে স্বাভাবিক হয়ে যাবে। যখন কারো চোখে কিছু স্বাভাবিক হয়ে যায় তখন তা করা সহজ হয়ে যায়।

বন্ধু এবং বিশ্বাস

মদিনার অমুসলিম গোত্র বনু কুরাইজা, যাদের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে শান্তি চুক্তি ছিল, আহযাবের যুদ্ধের সময় তাদের দুর্গগুলি তালাবদ্ধ করে। অমুসলিম সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক বনু কুরাইজার একজন নেতা কা'ব বিন আসাদকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তার শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য অনুরোধ করে এবং যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মদিনার ভেতর থেকে সাহাবীদের উপর আক্রমণ করে অমুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। প্রাথমিকভাবে, কা'ব বিন আসাদ তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে চাননি কারণ তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী। কিন্তু অমুসলিমরা কা'বকে বারবার অনুরোধ করতে থাকে যতক্ষণ না সে শেষ পর্যন্ত মন্দ পরিকল্পনার কাছে আত্মসমর্পণ করে। এরপর কা'ব বিন আসাদ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তার শান্তি চুক্তি ভেঙে ফেলে এবং যে দলিলটিতে লেখা ছিল তা ছিঁড়ে ফেলে। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি খারাপ সঙ্গীদের এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে। মুসলমানদের মনে রাখা উচিত যে সত্যিকারের ভালোবাসার একটি প্রধান লক্ষণ হল যখন কেউ তার প্রিয়জনকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কারণ আনুগত্য ইহকাল এবং পরকালে সাফল্য এবং নিরাপত্তার দিকে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি কারো জন্য নিরাপত্তা এবং সাফল্য কামনা করে না সে কখনই তাকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসতে পারে না, সে যাই দাবি করুক বা অন্য ব্যক্তির সাথে কেমন আচরণ করুক না কেন। একজন ব্যক্তি যখন তার প্রিয়জনকে চাকরির মতো পার্থিব সাফল্য লাভ করে তখন ঠিক যেমন খুশি হয়, তেমনি সেও তার প্রিয়জনকে আখেরাতে সাফল্য লাভ করতে চায়। যদি

একজন ব্যক্তি অন্যের নিরাপত্তা এবং সাফল্য লাভের বিষয়ে চিন্তা না করে, বিশেষ করে পরকালে, তাহলে সে তাকে ভালোবাসে না।

একজন প্রকৃত প্রেমিক তার প্রিয়জনকে এই পৃথিবীতে বা পরকালে কষ্ট এবং শাস্তির সম্মুখীন হতে দেখা এবং জানা সহ্য করতে পারে না। এটি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই এড়ানো সম্ভব। অতএব, তারা সর্বদা তাদের প্রিয়জনকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করবে। যদি কেউ অন্যকে আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে নিজের স্বার্থ বা অন্যের স্বার্থের দিকে পরিচালিত করে, তাহলে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে না। এটি বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়স্বজনের মতো সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত মূল্যায়ন করা যে তাদের জীবনের বিষয়গুলি তাদেরকে মহান আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে কিনা। যদি তারা তা করে তবে এটি তাদের প্রতি তাদের ভালোবাসার স্পষ্ট লক্ষণ। যদি তারা তা না করে তবে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাদেরকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে না। অধ্যায় ৪৩ আয যুখরুফ, আয়াত ৬৭:

"সেদিন ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হবে, কেবল সৎকর্মশীলরা ছাড়া।"

উপরন্তু, এই ঘটনাটি নিজের বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা এড়ানোর গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ বুখারীতে ২৭৪৯ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকির একটি দিক।

এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ এবং মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত সকল আমানত। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি আমানত তাদের উপর অর্পণ করেছেন। এই আমানত পূরণের একমাত্র উপায় হল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমানতগুলো ব্যবহার করা। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা এবং রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আমানত পাবে, কারণ এটিই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"আর [স্মরণ করো] যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের [নেয়ামত] বৃদ্ধি করব..."

মানুষের মধ্যে আমানতও পালন করা গুরুত্বপূর্ণ। যার উপর অন্য কারো জিনিসপত্রের আমানত রাখা হয়েছে, তার উচিত সেগুলোর অপব্যবহার করা নয় এবং কেবল মালিকের ইচ্ছানুযায়ী সেগুলো ব্যবহার করা। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আমানতের মধ্যে একটি হল কথোপকথন গোপন রাখা, যদি না অন্যদের জানানোর মাধ্যমে কিছু সুস্পষ্ট লাভ হয়। দুর্ভাগ্যবশত, মুসলমানদের মধ্যে এটি প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়। তাদের এবং মানুষের মধ্যে আমানতগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যেভাবে তারা চায় অন্যরা তাদের মধ্যে থাকা আমানতগুলির সাথে আচরণ করুক।

এছাড়াও, এই ট্রাস্টগুলির মধ্যে একজনের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যেমন নির্ভরশীল ব্যক্তিরা। একজন মুসলিমকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে এই ব্যক্তিদের অধিকার পূরণের মাধ্যমে এই ট্রাস্টগুলি পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতার উপর কর্তব্য হল তাদের সন্তানদের পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য শেখা, বোঝা এবং তার উপর আমল করতে উৎসাহিত করা।

সন্দেহজনক হওয়া

আহযাবের যুদ্ধের সময়, অমুসলিম গোত্র, বনু কুরাইজা, শত্রু বাহিনীর দ্বারা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তাদের শান্তি চুক্তি বাতিল করতে রাজি হয়েছিল। যখন এই খবর মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে পৌঁছায়, তখন তিনি তাঁর কিছু সাহাবীকে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, বনু কুরাইজার সাথে দেখা করার জন্য এবং খবরটি সত্য কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য প্রেরণ করেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪০-১৪১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলিমদের জন্য একটি বিশেষ নেতিবাচক মানসিকতা এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ যা ৪৯তম সূরা আল হুজুরাতের ১২ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক [নেতিবাচক] অনুমান থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই কিছু অনুমান পাপ..."

দুর্ভাগ্যবশত, এই নেতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ পারিবারিক ইউনিট থেকে শুরু করে জাতীয় স্তর পর্যন্ত সকলের উপর প্রভাব ফেলে। প্রথমত, নেতিবাচক উপায়ে ব্যাখ্যা করার ফলে প্রায়শই পাপ হয়, যেমন গীবত এবং অপবাদ। সব ক্ষেত্রেই, একজন মুসলিমের উচিত যেখানে সম্ভব ইতিবাচক উপায়ে বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করা যাতে অন্যদের সন্দেহের সুবিধা দেওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি জাতি কতবার একটি অনুমান এবং সন্দেহের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে? মিডিয়াতে পাওয়া বেশিরভাগ কেলেঙ্কারি অনুমানের উপর ভিত্তি করে। এমনকি আইন তৈরি করা হয়েছে যা

অনুমান এবং সন্দেহের ব্যবহারকে সমর্থন করে। এটি প্রায়শই ভাঙা এবং সম্পর্ক ভেঙে দেয় কারণ এই মানসিকতার লোকেরা সর্বদা বিশ্বাস করে যে অন্যরা তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে তাদের সমালোচনা করছে। এটি একজনকে অন্যদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে বাধা দেয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে পরামর্শদাতা কেবল তাদের উপহাস করছে। এবং এটি একজনকে পরামর্শ দিতে বাধা দেয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে অন্য ব্যক্তি তাদের কথার প্রতি কোন মনোযোগ দেবে না। এবং একজন ব্যক্তি যার এই নেতিবাচক মানসিকতা আছে তাকে পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকবে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটি কেবল তর্কের দিকে পরিচালিত করবে। এর ফলে অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়, যেমন তিক্ততা। মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যে কোনও ভালো পরামর্শ গ্রহণ করে, এমনকি যদি তারা ধরেও নেয় যে কেউ তাদের নিয়ে সমালোচনা করছে। তাদের উচিত সম্ভব হলে ইতিবাচক উপায়ে বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা যা একটি ইতিবাচক মানসিকতার দিকে পরিচালিত করে।

সকল অবস্থাতেই অবিচল

আহযাবের যুদ্ধের সময়, অমুসলিম গোত্র, বনু কুরাইজা, শত্রু বাহিনীর দ্বারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে তাদের শান্তি চুক্তি বাতিল করতে রাজি হয়েছিল। শত্রুরা মদিনার বাইরে এবং ভেতরে থাকায় উদ্বেগ এবং ভয় আরও বেড়ে যায়। মুনাফিকরা তাদের জীবনের ভয়ে ভীত ছিল এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে পরিত্যাগ করতে চেয়েছিল, তাই তারা তাঁকে অনুরোধ করেছিল যে তাদেরকে তাদের ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিন যাতে তারা তাদের সুরক্ষা করতে পারে। এরপর আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা আল আহযাবের ১৩ নং আয়াত নাযিল করেন:

"আর যখন তাদের একদল বলল, "হে ইয়াসরিববাসী, তোমাদের জন্য [এখানে] কোন স্থিতিশীলতা নেই, তাই [ঘরে ফিরে যাও।" আর তাদের একদল নবীর কাছে অনুমতি চেয়ে বলল, "নিশ্চয়ই, আমাদের ঘরবাড়ি উন্মুক্ত [অর্থাৎ, অরক্ষিত]," অথচ সেগুলো উন্মুক্ত ছিল না। তারা কেবল পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪১-১৪২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা কেন মহান আল্লাহর ইবাদত করে, কারণ এই কারণটি মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধির কারণ হতে পারে, অথবা কিছু ক্ষেত্রে এটি অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করতে পারে। যখন কেউ তাঁর কাছ থেকে বৈধ পার্থিব জিনিসপত্র অর্জনের জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করে, তখন

তারা তাঁর অবাধ্য হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। পবিত্র কুরআনে এই ধরণের ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা ২২ আল হজ্জ, আয়াত ১১:

"আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে আল্লাহর ইবাদত করে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে। যদি তাকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে, তবে সে তাতে আশ্বস্ত হয়; আর যদি কোন পরীক্ষা তাকে স্পর্শ করে, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসের দিকে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটাই স্পষ্ট ক্ষতি।"

যখন তারা পার্থিব আশীর্বাদ পেতে ব্যর্থ হয় অথবা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তখন তারা প্রায়শই রাগান্বিত হয়ে পড়ে যা তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত রাখে। এই লোকেরা প্রায়শই তাদের পরিস্থিতি অনুসারে আল্লাহকে আনুগত্য ও অবাধ্যতা করে, যা বাস্তবে আল্লাহর প্রকৃত দাসত্বের পরিপন্থী।

যদিও ইসলামে মহান আল্লাহর কাছ থেকে বৈধ পার্থিব জিনিসপত্র কামনা করা গ্রহণযোগ্য, তবুও কেউ যদি এই মনোভাব ধরে রাখে তবে সে এই আয়াতে উল্লেখিতদের মতো হয়ে যেতে পারে। পরকালে মুক্তি এবং জান্নাত লাভের জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করা অনেক ভালো। এই ব্যক্তির অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাদের আচরণ পরিবর্তন করার সম্ভাবনা কম। তবে সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম কারণ হল মহান আল্লাহকে মেনে চলা, কারণ তিনি তাদের প্রভু এবং বিশ্বজগতের প্রভু। এই মুসলিম, যদি আন্তরিক হয়, তাহলে সকল পরিস্থিতিতেই অবিচল থাকবে এবং এই আনুগত্যের মাধ্যমে তারা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ধরনের আশীর্বাদ লাভ করবে যা প্রথম ধরণের ব্যক্তির পার্থিব আশীর্বাদকে ছাড়িয়ে যাবে।

পরিশেষে, মুসলমানদের জন্য তাদের নিয়তের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তা সংশোধন করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়।

জনগণের জন্য উদ্বেগ

আহযাবের যুদ্ধের সময়, অমুসলিম গোত্র, বনু কুরাইজা, শত্রু বাহিনীর দ্বারা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তাদের শান্তি চুক্তি বাতিল করতে রাজি হয়েছিল। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের সাথে থাকা একটি গোত্রকে পশ্চাদপসরণ এবং তাদের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে অমুসলিম সেনাবাহিনীর শক্তি ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি যখন তাঁর সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, পরামর্শ চাইলেন, তারা জিজ্ঞাসা করলেন যে এই ইচ্ছা কি আল্লাহর আদেশ, নাকি তাঁর নিজস্ব পছন্দ। তিনি উত্তর দিলেন যে এটি তাঁর নিজস্ব পছন্দ কারণ তিনি আরবের বিভিন্ন গোত্র কীভাবে মদিনায় নেমে এসেছিল তা প্রত্যক্ষ করছিলেন এবং তিনি তাঁর সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, যে কোনও উপায়ে সাহায্য করার জন্য মরিয়া ছিলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 142-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর অন্যদের প্রতি আন্তরিকতা এবং যত্নের প্রতিফলন ঘটায়। সহীহ বুখারীর ১৩ নম্বর হাদিসে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে অন্যদের জন্য যা পছন্দ করে তা নিজের জন্য পছন্দ করে।

এর অর্থ এই নয় যে, এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ না করলে একজন মুসলিম তার ঈমান হারিয়ে ফেলবে। এর অর্থ হল, একজন মুসলিমের ঈমান পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না তারা এই উপদেশ অনুসরণ করে। এই হাদিসটি আরও ইঙ্গিত করে যে, একজন মুসলিম তার ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ করতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও অপছন্দ করে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৮৬ নম্বর

হাদিসে পাওয়া আরেকটি হাদিস এটি সমর্থন করে। এটি পরামর্শ দেয় যে, মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। যদি শরীরের একটি অংশ ব্যথায় ভোগে, তাহলে শরীরের বাকি অংশও ব্যথার অংশীদার হয়। এই পারস্পরিক অনুভূতির মধ্যে রয়েছে অন্যদের জন্য ভালোবাসা এবং ঘৃণা করা, যা নিজের জন্য ভালোবাসে এবং যা ঘৃণা করে।

একজন মুসলিম কেবল তখনই এই মর্যাদা অর্জন করতে পারে যখন তার হৃদয় হিংসার মতো খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত থাকে। এই খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বদা একজনকে নিজের জন্য আরও ভালো কামনা করতে বাধ্য করবে। তাই বাস্তবে, এই হাদিসটি একটি ইঙ্গিত দেয় যে ক্ষমাশীল হওয়ার মতো ভালো বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে হৃদয়কে পবিত্র করা উচিত এবং হিংসার মতো খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি দূর করা উচিত। এটি কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই সম্ভব।

মুসলমানদের এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যদের জন্য ভালো কামনা করলে তারা ভালো জিনিস হারাবে। মহান আল্লাহর ভান্ডারের কোন সীমা নেই, তাই স্বার্থপর ও লোভী মানসিকতা গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

অন্যদের জন্য মঙ্গল কামনা করার অর্থ হলো অন্যদেরকে যেকোনোভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করা, যেমন আর্থিক বা মানসিক সহায়তা, ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি তার প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্যদের সাহায্য করতে চায়। অতএব, এই ভালোবাসা কেবল কথার মাধ্যমে নয়, বরং কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করা উচিত। এমনকি যখন একজন মুসলিম অন্যদের মন্দ কাজ নিষেধ করে এবং অন্যদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে

পরামর্শ দেয়, তখনও তাদের তা নম্রভাবে করা উচিত, ঠিক যেমন তারা চায় অন্যরা তাদের সদয়ভাবে উপদেশ দিক।

যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, আলোচ্য মূল হাদিসটি পারস্পরিক ভালোবাসা এবং যত্নের পরিপন্থী সকল খারাপ বৈশিষ্ট্য, যেমন হিংসা, দূর করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। হিংসা হল যখন একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট আশীর্বাদ পেতে চায় যা কেবল তখনই পাওয়া যায় যখন এটি অন্য কারো কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। এই মনোভাব মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত আশীর্বাদ বিতরণের প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ। এই কারণেই এটি একটি মহাপাপ এবং হিংসুকের সৎকর্ম ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে। সুনান আবু দাউদের ৪৯০৩ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। যদি একজন মুসলিম অন্যদের কাছে থাকা বৈধ জিনিসগুলি কামনা করে তবে তাদের উচিত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং একই বা অনুরূপ জিনিস দান করা যাতে অন্য ব্যক্তি আশীর্বাদ হারাতে না পারে। এই ধরণের হিংসা বৈধ এবং ধর্মের দিক থেকে প্রশংসনীয়। সহিহ মুসলিমের ১৮৯৬ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে মুসলমানদের কেবল সেই ধনী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা করা উচিত যিনি তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করেন। আর এমন একজন জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত হও যে তার জ্ঞানকে নিজের এবং অন্যদের উপকারের জন্য ব্যবহার করে।

একজন মুসলিমের উচিত কেবল অন্যদের বৈধ পার্থিব আশীর্বাদ লাভের জন্য ভালোবাসা নয়, বরং উভয় জগতেই ধর্মীয় আশীর্বাদ লাভের জন্য ভালোবাসাও। প্রকৃতপক্ষে, যখন কেউ অন্যদের জন্য এটি কামনা করে, তখন এটি তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে উৎসাহিত করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। ইসলামে এই ধরণের সুস্থ প্রতিযোগিতাকে স্বাগত জানানো হয়। সূরা ৮৩ আল মুতাফিফিন, আয়াত ২৬:

"... তাই এর জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করতে দিন।"

এই উৎসাহ একজন মুসলিমকে তার চরিত্রের ত্রুটি খুঁজে বের করার এবং তা দূর করার জন্য নিজেকে মূল্যায়ন করতে অনুপ্রাণিত করবে। যখন এই দুটি উপাদান অর্থপূর্ণভাবে একত্রিত হয়, মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং নিজের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করা, তখন এটি উভয় জগতেই সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে।

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত কেবল মুখেই অন্যদের জন্য যা চায় তা ভালোবাসার দাবি করা নয়, বরং তার কাজের মাধ্যমেও তা প্রকাশ করা। আশা করা যায় যে, যে ব্যক্তি এভাবে অন্যদের জন্য চিন্তা করে, সে উভয় জগতেই মহান আল্লাহর কাছ থেকে চিন্তা পাবে। জামে আত তিরমিযী, ১৯৩০ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অবিচল আনুগত্য

আহযাবের যুদ্ধের সময়, মহানবী (সাঃ) অমুসলিম সেনাবাহিনীর শক্তি ভেঙে ফেলতে চেয়েছিলেন, তাদের সাথে থাকা একটি গোত্রকে তাদের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মাধ্যমে। তিনি যখন সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, তাঁর ধারণা সম্পর্কে বললেন, তখন তারা উত্তর দিলেন যে ইসলামের আগে, অমুসলিম সেনাবাহিনী কখনও মদীনা আক্রমণ করার সাহস করত না এবং এখন যেহেতু আল্লাহ, তাদের ইসলাম এবং মহানবী (সাঃ) দ্বারা সম্মানিত করেছেন, তারা কখনও সত্যের সাথে আপস করবে না, এমনকি যদি এটি যুদ্ধ এবং মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করে। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 142-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ১৫৯ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে তাদের বিশ্বাস ঘোষণা করার এবং তারপরে তার উপর অবিচল থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হলো, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যে সংগ্রাম করা। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোজা এবং মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহ, মহানের মধ্যে এবং অন্যদের সাথে সম্পর্কিত। একজন মুসলিমকে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে, সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

পরিশেষে, এর মধ্যে রয়েছে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসারে এই দিকগুলি পূরণ করা। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

দৃঢ়তার মধ্যে উভয় ধরণের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান প্রকার হল যখন কেউ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা করে। গৌণ প্রকার হল যখন কেউ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুর জন্য ভালো কাজ করে, যেমন লোক দেখানো। সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৮৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, দৃঢ়তার একটি দিক হল সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা এবং কখন এবং কোন ইসলামী শিক্ষা কেউ তার ইচ্ছানুযায়ী অনুসরণ করবে তা থেকে বিরত থাকা।

দৃঢ়তার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, নিজের বা অন্যদের আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পরিবর্তে। যদি কোন মুসলিম নিজেকে বা অন্যদের খুশি করে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়, তাহলে তার জানা উচিত যে তার ইচ্ছা বা মানুষ কেউই তাকে আল্লাহ তাআলার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল, সে যদি এই সুরক্ষা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়, তবুও তিনি তাকে সবকিছু থেকে রক্ষা করবেন।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস দ্বারা নির্ধারিত পথ অনুসরণ করা এবং এমন পথ গ্রহণ না করা যা এই পথ থেকে বিচ্যুত হয়। যে ব্যক্তি এই পথ গ্রহণ করার চেষ্টা করবে তার আর কোনও কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটি তাদের ঈমানে অবিচল রাখার জন্য যথেষ্ট। ৪র্থ সূরা আন নিসা, আয়াত ৫৯:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী..."

এই আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অবিচল থাকার একটি দিক হল এমন কারো আনুগত্য করা যার আদেশ ও উপদেশ আল্লাহ, মহানবী (সাঃ) এবং মহানবী (সাঃ) এর আন্তরিক আনুগত্যের উপর নিহিত।

যেহেতু মানুষ নিখুঁত নয়, তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। তাই ঈমানের ক্ষেত্রে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে, বরং এর অর্থ হল তাদের অবশ্যই পূর্বে বর্ণিত মহান আল্লাহর আনুগত্য কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে এবং পাপ করলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 সূরা ফুসসিলাতের 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"... তাই তোমরা তাঁর দিকে সোজা পথ অবলম্বন করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো..."

জামে আত তিরমিযী, ১৯৮৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থিত, যেখানে মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে সংঘটিত (ছোট) পাপ মোচন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই ২, হাদিস নম্বর ৩৭-এ প্রাপ্ত আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) মুসলমানদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা এটি নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবে না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল তাদের নিয়ত এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে প্রদত্ত সম্ভাবনাকে আল্লাহ, মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে পূরণ করা। তাদের পরিপূর্ণতা অর্জনের আদেশ দেওয়া হয়নি কারণ এটি সম্ভব নয়।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ তার আধ্যাত্মিক হৃদয়কে প্রথমে পবিত্র না করে শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৮৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে,

শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কেবল তখনই বিশুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় পবিত্র থাকে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসের শিক্ষা অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই হৃদয়ের বিশুদ্ধতা অর্জন করা সম্ভব।

অবিচল আনুগত্যের জন্য জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করে। জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ না করে মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, ২৪০৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, যদি মহান আল্লাহর আনুগত্যে কোন ত্রুটি দেখা দেয়, তাহলে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তওবা করা উচিত এবং মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। সূরা আল আহকাফ, আয়াত ১৩:

"নিশ্চয়ই যারা বলেছে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ," অতঃপর সৎপথে অবিচল রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

ভালো ব্যবসা পরিচালনা করা

আহযাবের যুদ্ধের সময়, কয়েকটি সংঘর্ষ ছাড়া, মুসলমানদের খনন করা পরিখার কারণে কোনও বাস্তব যুদ্ধ হয়নি। অমুসলিমদের একটি ছোট বাহিনী পরিখার একটি সংকীর্ণ অংশ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল এবং মুসলমানরা তাদের অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, মক্কার অমুসলিমদের একজন প্রবীণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন, আমর বিন আবদ ওদ্দ, তাকে হত্যা করেন। অমুসলিমরা তাঁর দেহের জন্য ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে একটি বড় অঙ্কের অর্থ প্রদান করে। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) মন্তব্য করেছিলেন যে মৃতদের দ্বারা তাদের কোনও লাভ হয়নি এবং তাঁর দেহে বা এর জন্য প্রদত্ত অর্থে কোনও কল্যাণ ছিল না। তাঁর দেহ বিনামূল্যে অমুসলিমদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪২-১৪৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অনুপযুক্ত উপায়ে সম্পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান।

সুনানে ইবনে মাজাহের ২১৪৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, কেয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে অনৈতিক লোক হিসেবে উত্থিত করা হবে, তবে তারা ব্যতীত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, সৎকর্ম করে এবং সত্য কথা বলে।

এই হাদিসটি ব্যবসায়িক লেনদেনে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য প্রযোজ্য। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে আল্লাহকে ভয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, অন্যদের সাথে সেভাবেই আচরণ করা উচিত যেভাবে সে মানুষের কাছ থেকে আচরণ পেতে চায়।

ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের কথাবার্তায় সৎ থাকা এবং লেনদেনের সমস্ত বিবরণ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে প্রকাশ করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদিস, সংখ্যা ২০৭৯, সতর্ক করে যে, যখন মুসলিমরা আর্থিক লেনদেনে জিনিসপত্র, যেমন তাদের পণ্যের ত্রুটি, গোপন করে, তখন এর ফলে বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

সৎকর্ম করার মধ্যে রয়েছে অন্যদের সাথে প্রতারণা করা থেকে বিরত থাকা, যাতে তারা অতিরিক্ত মূল্যে জিনিসপত্র কিনে প্রতারণা না করে। একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের সাথে সেই আচরণ করা যা সে অর্থপূর্ণভাবে চায়, সততা এবং সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে। একজন মুসলিম যেমন আর্থিক বিষয়ে দুর্ব্যবহার পছন্দ করেন না, তেমনি তাদেরও অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করা উচিত নয়।

সৎকর্ম করার মধ্যে রয়েছে ইসলাম এবং দেশের আইনে আলোচিত অবৈধ অনুশীলন এড়িয়ে চলা। যদি কেউ তাদের দেশের ব্যবসায়িক আইন নিয়ে সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে তাদের সেখানে ব্যবসা করা উচিত নয়।

অধিকন্তু, সৎকর্ম করার মধ্যে রয়েছে নিজের ব্যবসায়িক সাফল্যকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তাদের ব্যবসা এবং সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য আরাম এবং শান্তির উৎস হয়ে উঠবে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

কিন্তু যারা তাদের ব্যবসায়িক সাফল্যের অপব্যবহার করে তারা দেখতে পাবে যে এটি তাদের চাপ এবং দুর্দশার উৎস হয়ে ওঠে, কারণ তারা মহান আল্লাহকে ভুলে গেছে, যিনি তাদের সাফল্য দিয়েছেন। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন] এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।"

যারা ব্যবসা পরিচালনা করেন তাদের সর্বদা মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা উচিত কারণ এটি অনৈতিকতার দিকে পরিচালিত করে এবং অমরত্ব জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে এবং তার উপর কাজ করতে থাকবে যতক্ষণ না তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা একজন মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ

করেন। জামে আত তিরমিযী, ১৯৭১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

দুষ্ট পরিকল্পনা ব্যর্থ

আহযাবের যুদ্ধের সময়, অমুসলিম গোত্র, বনু কুরাইজা, শত্রু বাহিনীর দ্বারা মহানবী (সাঃ) এর সাথে তাদের শান্তি চুক্তি বাতিল করতে রাজি হয়। বনু কুরাইজা অমুসলিম সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য বহনকারী অনেক উট পাঠায়। মহানবী (সাঃ) যখন এই বিষয়টি জানতে পারেন, তখন তিনি মুসলিম সৈন্যদের একটি দল পাঠান যারা অমুসলিমদের কাছে পৌঁছানোর আগেই এই কাফেলা আক্রমণ করে এবং দখল করে নেয়। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রঃ) এর "নবী (সাঃ) এর নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৬৮-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কখনোই খারাপ কাজ করার চক্রান্ত করা উচিত নয় কারণ এটি সর্বদা, এক বা অন্যভাবে, তাদের উপরই আঘাত হানবে। এমনকি যদি এই পরিণতিগুলি পরবর্তী জগতে বিলম্বিত হয় তবে তারা অবশেষে এর মুখোমুখি হবে। উদাহরণস্বরূপ, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন যেমন তারা তাদের পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং স্নেহ কামনা করেছিলেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তাদের চক্রান্ত তাদের তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১৮:

"এবং তারা তার জামার উপর মিথ্যা রক্ত আনল। [ইয়াকুব] বলল, "বরং তোমাদের আত্মা তোমাদেরকে কিছু একটার প্রতি প্ররোচিত করেছে, তাই ধৈর্যই সবচেয়ে উপযুক্ত..."

যে যত বেশি মন্দ চক্রান্ত করবে, আল্লাহ তাআলা তত বেশি তাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। এমনকি যদি তারা বাহ্যিকভাবে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে, তবুও আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য উভয় জগতে অভিশাপ হিসেবে তাদের আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটিকেই পরিণত করবেন, যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ৪৩:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজস্ব লোকদের ছাড়া আর কাউকে ঘিরে রাখে না। তাহলে তারা কি পূর্ববর্তী লোকদের পথ [অর্থাৎ, ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করছে?..."

সাহস এবং অটলতা

আহযাবের যুদ্ধের সময়, অমুসলিম গোত্র, বনু কুরাইজা, শত্রু বাহিনীর দ্বারা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তাদের শান্তি চুক্তি বাতিল করতে রাজি হয়েছিল। বনু কুরাইজা একজন গুপ্তচর প্রেরণ করে তদন্ত করার জন্য যে নারী ও শিশুদেরকে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) যে দুর্গগুলিতে রেখেছিলেন সেখানে পাহারা দেওয়া হচ্ছে কিনা। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর খালা সাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, গুপ্তচরটিকে লক্ষ্য করে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে লাঠি দিয়ে তাকে হত্যা করেন। যখন বনু কুরাইজাদের কাছে খবর পৌঁছায় যে তাদের গুপ্তচর নিহত হয়েছে, তখন তারা ধরে নেয় যে মুসলিম পুরুষরা দুর্গ পাহারা দিচ্ছে এবং তাই তারা তাদের আক্রমণ করেনি। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, নবী (সাঃ) এর নোবেল লাইফ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪০১-১৪০২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুদের দ্বারা, যেমন শয়তান, তাদের ভেতরের শয়তান এবং যারা তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আহ্বান করে, তাদের দ্বারা আক্রান্ত হলে অবিচল থাকার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন মুসলিমের উচিত যখনই এই শত্রুরা তাদের প্রলোভনে ফেলে, তখনই আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া নয়। বরং তাদের উচিত আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি অর্জন করা হয় সেই স্থান, জিনিস এবং মানুষদের এড়িয়ে যাওয়ার মাধ্যমে যারা তাদেরকে পাপ এবং আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আহ্বান করে এবং প্রলুব্ধ করে। শয়তানের ফাঁদ এড়ানো কেবল ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই সম্ভব। একইভাবে পথের ফাঁদগুলি কেবল তাদের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই এড়ানো যায়; শয়তানের ফাঁদ এড়াতে ইসলামী জ্ঞান প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতে অনেক সময় ব্যয় করতে পারে কিন্তু তাদের

অজ্ঞতার কারণে তারা গীবতের মতো পাপের মাধ্যমে তাদের সৎকর্মগুলি ধ্বংস করতে পারে। একজন মুসলিমকে এই আক্রমণের মুখোমুখি হতেই হবে, তাই তাদের উচিত মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া এবং এর বিনিময়ে অগণিত প্রতিদান লাভ করা। মহান আল্লাহ, যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এই পথে সংগ্রাম করে তাদের জন্য সঠিক পথনির্দেশনার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। সূরা আল আনকাবুত, আয়াত ৬৯:

"আর যারা আমার জন্য প্রচেষ্টা করে- আমি অবশ্যই তাদের আমার পথ দেখাব..."

যেখানে অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার সাথে এই আক্রমণগুলির মুখোমুখি হলে উভয় জগতেই কেবল অসুবিধা ও অপমানের সম্মুখীন হতে হবে। ঠিক যেমন একজন সৈনিকের আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র নেই, সে পরাজিত হবে; একজন অজ্ঞ মুসলিমের কাছে এই আক্রমণগুলির মুখোমুখি হওয়ার সময় আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র থাকবে না, যার ফলে তারা পরাজিত হবে। অন্যদিকে, জ্ঞানী মুসলিমকে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র দেওয়া হয় যা পরাজিত বা পরাজিত করা যায় না, তা হল মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এটি কেবলমাত্র আন্তরিকভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

অসুবিধা এবং সহজতা

আহযাবের যুদ্ধের সময়, অমুসলিম গোত্র, বনু কুরাইজা, শত্রু বাহিনীর দ্বারা মহানবী (সাঃ) এর সাথে তাদের শান্তি চুক্তি বাতিল করতে রাজি হয়েছিল। শত্রুরা মদিনার বাইরে এবং ভেতরে থাকায় উদ্বেগ এবং ভয় আরও বেড়ে যায়। মহানবী (সাঃ) যখন এই ভয় এবং উদ্বেগ প্রত্যক্ষ করেন, তখন তিনি সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, এই ঘোষণা দিয়ে অবিচল থাকতে উৎসাহিত করেন যে, এই দুর্দশার পরে আল্লাহ অবশ্যই তাদের মুক্তি দেবেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসনাদে আহমাদের ২৮০৩ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এই বিষয়টি বোঝার গুরুত্ব সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তির প্রতিটি কঠিন পরিস্থিতির পরেই স্বস্তি আসবে। এই বাস্তবতা পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, ৬৫ নম্বর সূরা তালাকের ৭ নম্বর আয়াতে:

"... আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি [অর্থাৎ, স্বস্তি] আনবেন।"

মুসলমানদের জন্য এই বাস্তবতা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ধৈর্য এবং এমনকি সন্তুষ্টির জন্ম দেয়। পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা একজনকে অধৈর্য, অকৃতজ্ঞতা এবং এমনকি অবৈধ রিযিকের মতো অবৈধ জিনিসের প্রতিও পরিচালিত করতে পারে। কিন্তু যে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সমস্ত অসুবিধা অবশেষে স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিস্থাপিত হবে, সে ইসলামের শিক্ষার উপর পূর্ণ আস্থা রেখে ধৈর্য ধরে

এই পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করবে। এই ধৈর্য মহান আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত পছন্দ করেন এবং প্রচুর পুরস্কৃত হন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৬:

"... আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।"

এই কারণেই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে অসংখ্য উদাহরণ উল্লেখ করেছেন যখন কঠিন পরিস্থিতির পরে স্বাচ্ছন্দ্য ও আশীর্বাদ এসেছিল। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে নবী নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং কীভাবে আল্লাহ তাঁকে মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা করেছিলেন তা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ৭৬:

"আর নূহের কথা [স্মরণ করো], যখন সে [সেই সময়ের] পূর্বে [আল্লাহকে] ডাকছিল, অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে মহাবিপদ [অর্থাৎ, বন্যা] থেকে রক্ষা করেছি।"

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় ২১ নম্বর সূরা আল আম্বিয়ার ৬৯ নম্বর আয়াতে:

“আমরা [অর্থাৎ, আল্লাহ] বললাম, "হে আগুন, তুমি ইব্রাহিমের উপর শীতলতা ও নিরাপত্তা বর্ষণ করো।"

হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এক বিরাট অগ্নিকুণ্ডের মতো কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন, কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য তা শীতল ও শান্তিপূর্ণ করে তুলেছিলেন।

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদিসে এই এবং আরও অনেক উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মুসলমানরা বুঝতে পারে যে, যারা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, তাদের জন্য কঠিন মুহূর্ত অবশেষে স্বস্তি নিয়ে আসবে।

অতএব, মুসলমানদের জন্য এই ইসলামী শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা অসংখ্য ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে পারে যেখানে আল্লাহ তাঁর বাধ্য বান্দাদেরকে তাদের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার পরেও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন। যদি আল্লাহ, মহান, তাঁর বাধ্য বান্দাদেরকে ঐশী শিক্ষায় উল্লিখিত বড় বড় সমস্যা থেকে রক্ষা করে থাকেন, তাহলে তিনি ছোট ছোট সমস্যায় ভোগা বাধ্য মুসলমানদেরও রক্ষা করতে পারেন এবং করবেন।

বিশ্বাসঘাতকতার মানসিকতা

আহযাবের যুদ্ধের সময়, অমুসলিম গোত্র, বনু কুরাইজা, শত্রু বাহিনীর দ্বারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তাদের শান্তি চুক্তি বাতিল করতে রাজি হয়েছিল। শত্রুরা মদিনার বাইরে এবং ভেতরে থাকায় উদ্বেগ এবং ভয় আরও বেড়ে যায়। নাঈম বিন মাসউদ, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, অমুসলিম সেনাবাহিনীর অংশ ছিলেন কিন্তু গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে গিয়েছিলেন এবং তার ইসলাম ঘোষণা করেছিলেন এবং তার সেবা প্রদান করেছিলেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে এমন কিছু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যা মুসলমানদের জন্য উপকারী। নাঈম, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, বনু কুরাইজা গোত্রের সাথে দেখা করেছিলেন এবং তাদের সতর্ক করেছিলেন যে অমুসলিমদের সাহায্য না করা উচিত কারণ তারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল না কারণ তারা নিশ্চিত ছিল না যে তারা জিততে পারবে। যদি অমুসলিমরা তাদের পরিকল্পনা ত্যাগ করে, তাহলে শান্তি চুক্তি লঙঘনের জন্য নিঃসন্দেহে বনু কুরাইজাকে মহানবী (সাঃ) শাস্তি দেবেন। তিনি বনু কুরাইজাকে বললেন, অমুসলিমদের সাহায্য করতে হবে যদি তারা তাদের কিছু অভিজাত ব্যক্তিকে তাদের দুর্গে তাদের সাথে থাকতে রাজি হয়, যার ফলে বনু কুরাইজাদের একই পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। এর ফলে অমুসলিমরা তাদের অভিজাতদের রক্ষা করার জন্য মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে বাধ্য হবে। নাঈম, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তারপর অমুসলিমদের কাছে গিয়ে তাদের বললেন যে বনু কুরাইজা মহানবী (সাঃ) এর সাথে তাদের শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য অনুতপ্ত এবং আবার তার সাথে মিত্রতা করেছে। এবং তাদের আন্তরিকতার নিদর্শন হিসেবে, তারা অমুসলিমদের কিছু অভিজাত ব্যক্তিকে তাদের কাছে এসে মৃত্যুদণ্ডের জন্য নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে হস্তান্তর করার জন্য প্ররোচিত করবে। নাঈম, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, অমুসলিমদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তারা তাদের কোনও পুরুষকে বনু কুরাইজায় পাঠাবে না, অন্যথায় তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। যখন অমুসলিম সেনাবাহিনীর নেতারা বনু কুরাইজাকে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করার জন্য একটি বার্তা পাঠালেন, তখন তারা উত্তর দিলেন যে, অমুসলিমদের কিছু নেতা তাদের কাছে আসার পরই তারা

মুসলিমদের উপর আক্রমণ করবে, যাতে অমুসলিমরা মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ এবং ধ্বংস করার পরিকল্পনা সম্পন্ন করতে পারে । নাঈমের পরামর্শের ভিত্তিতে, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, অমুসলিমরা এটি করতে অস্বীকৃতি জানায়। এর ফলে বনু কুরাইজা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে কারণ নাঈম, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তার দেওয়া সতর্কবার্তা সত্য বলে মনে হয়েছিল। এই অমুসলিমদের মধ্যে এই অবিশ্বাস এবং মতবিরোধ বনু কুরাইজাকে মদীনার ভেতর থেকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে বাধা দেয়। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪২ এবং ইমাম সাফি উর রহমানের, দ্য সিলড নেকটার, পৃষ্ঠা ৩১৮-৩১৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

অমুসলিমরা দ্রুত একে অপরকে অবিশ্বাস করতে শুরু করে কারণ তারা নিজেরাই প্রায়শই অন্যদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করত। তারা "চোরদের মধ্যে কোন সম্মান নেই" এই বিখ্যাত উক্তিটি পূরণ করেছিল।

সহীহ বুখারীতে ২৭৪৯ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মুনাফিকির একটি দিক।

একজন মুসলিমের সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি হলো মহান আল্লাহর সাথে, যা তখনই সম্মত হয়েছিল যখন কেউ তাকে তাদের প্রভু ও ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া।

মানুষের সাথে করা অন্যান্য সমস্ত প্রতিশ্রুতিও অবশ্যই পালন করতে হবে, যদি না কারো কাছে কোন বৈধ অজুহাত থাকে, বিশেষ করে যেগুলি একজন বাবা-মা সন্তানদের সাথে করেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা কেবল বাচ্চাদের খারাপ চরিত্র শেখায় এবং তাদের বিশ্বাস করতে উৎসাহিত করে যে প্রতারণা করা একটি গ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সহীহ বুখারীতে ২২২৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর নামে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বৈধ অজুহাত ছাড়াই তা ভঙ্গ করে, তিনি তার বিরুদ্ধে থাকবেন। বিচারের দিন যার বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলা থাকবেন, সে কীভাবে সফল হতে পারে? যেখানেই সম্ভব অন্যদের সাথে প্রতিশ্রুতি না দেওয়াই সর্বদা নিরাপদ। কিন্তু যখন একটি বৈধ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তখন তা পূরণ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে হবে।

একটি প্রস্থান

আহযাবের যুদ্ধের সময়, মুসলমানরা ভয় ও ধ্বংসের দ্বারা কঠোরভাবে পরীক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু তারা যখন মহান আল্লাহর আনুগত্যে অটল ছিল, তখন তিনি অমুসলিম সেনাবাহিনীর দিকে এক প্রচণ্ড বাতাস পাঠালেন যা তাদের শিবিরকে সম্পূর্ণরূপে উপড়ে ফেলল এবং তাদেরকে বিভ্রান্তি ও দুর্দশার মধ্যে নিমজ্জিত করল। আবহাওয়া তাদের প্রতিকূল থাকায় এবং তারা পরিখা ভেদ করে মদিনায় প্রবেশ করতে ব্যর্থ হওয়ায় অমুসলিমরা বাড়ি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৫৪-১৫৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

অমুসলিম সেনাবাহিনী চলে যাওয়ার আগে, মহানবী (সা.) হুদাইফা বিন ইয়াম্মান (রা.)-কে শত্রু শিবির থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু তাকে সতর্ক করে দেন যে, এমন কিছু করবেন না যাতে তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। শত্রু শিবিরে পৌঁছে তিনি অমুসলিম নেতা আবু সুফিয়ানকে দেখতে পান। হুদাইফা (রা.)-এর ধনুক বোঝাই করে আবু সুফিয়ানের দিকে গুলি চালাতে উদ্যত হন, কিন্তু যখন তিনি তাকে প্রদত্ত আদেশের কথা মনে করেন, তখন তিনি তার হাত আটকে রাখেন। তিনি গোপনে অমুসলিমদের একটি সভায় যোগ দেন এবং নিশ্চিত হন যে তারা তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারণ তাদের রসদ ফুরিয়ে যাচ্ছিল, মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত বাতাস তাদের উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল এবং তারা মুসলমানদের খনন করা পরিখা ভেদ করতে পারছিল না। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রহ.)-এর "নবী (সা.)-এর নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৮৩-১৩৮৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনা থেকে শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা। এমনকি এই মহান ঘটনার মতো অনিবার্য এবং বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতেও, একজন মুসলিমের সর্বদা মহান আল্লাহর পছন্দের উপর ভরসা করা উচিত। মুসলমানদের বুঝতে হবে যে তাদের জ্ঞান খুবই সীমিত এবং তারা অত্যন্ত অদূরদর্শী। অর্থাৎ, তারা মহান আল্লাহর পছন্দের পিছনের প্রজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। অন্যদিকে, মহান আল্লাহর জ্ঞান এবং ঐশ্বরিক উপলব্ধি সীমাহীন। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত মহান আল্লাহর পছন্দের উপর ভরসা করা, ঠিক যেমন একজন অন্ধ ব্যক্তি তার শারীরিক পথপ্রদর্শকের নির্দেশনার উপর ভরসা করে। একজন মুসলিমের মনোভাব যাই হোক না কেন, মহান আল্লাহর পছন্দ ঘটবেই, তাই অধৈর্য না হয়ে তাঁর প্রজ্ঞার উপর ভরসা করাই উত্তম, যা কেবল আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে।

এছাড়াও, জীবনের অসংখ্য উদাহরণ মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, যখন একজন ব্যক্তি এমন কিছু কামনা করে যা পাওয়ার পর কেবল অনুশোচনা করে। এবং যখন তারা এমন কিছু ঘটতে অপছন্দ করে যা পরবর্তীতে কেবল তাদের মন পরিবর্তন করে। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

যেহেতু ভাগ্য মানুষের হাতের বাইরে, তাই মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যদি সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চায়, তাহলে তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা জিনিসের উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত, অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর

নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। মহান আল্লাহ ইতিমধ্যেই গ্যারান্টি দিয়েছেন যে তিনি একজন মুসলিমকে উভয় জগতের সমস্ত সমস্যা থেকে রক্ষা করবেন। তাদের কেবল তাঁর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে হবে। অধ্যায় ৬৫ তালাক, আয়াত ২:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই সাফল্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে নয়। এটি সর্বদা মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা অনুসারে। অতএব, এই সাফল্য সেই অনুযায়ী ঘটে যখন এটি মানুষের জন্য সর্বোত্তম এবং এমনভাবে যা তাদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়।

বনু কুরাইজা

পরিণতির মুখোমুখি হওয়া

আহযাবের যুদ্ধের সময়, অমুসলিম গোত্র, বনু কুরাইজা, শত্রু বাহিনীর দ্বারা মহানবী (সাঃ) এর সাথে তাদের শান্তি চুক্তি বাতিল করতে রাজি হয়েছিল। আহযাবের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, পরের দিন সকালে মহানবী (সাঃ) সাহাবীদের (সাঃ) সাথে খন্দক ত্যাগ করেন এবং অস্ত্র রেখে বাড়ি ফিরে আসেন। যুদ্ধের বর্ম পরিহিত অবস্থায়, ফেরেশতা জিবরাঈল (সাঃ) নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে দেখা করেন এবং বনু কুরাইজার বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য আল্লাহর নির্দেশ পৌঁছে দেন। আল্লাহ, মহিমান্বিত, ৩৩ সূরার ২৫-২৭ আয়াতও নাযিল করেন:

"আর আল্লাহ কাফেরদেরকে তাদের ক্রোধের বশে বিতাড়িত করলেন, তারা কোন কল্যাণ লাভ করতে পারেনি। আর যুদ্ধে আল্লাহ মুমিনদের জন্য যথেষ্ট ছিলেন। আর আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী। আর তিনি আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিল তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন [যার ফলে] তোমরা একদলকে [অর্থাৎ, তাদের সৈন্যদের] হত্যা করলে এবং একদলকে [অর্থাৎ, নারী ও শিশুদের] বন্দী করলে। আর তিনি তোমাদেরকে তাদের জমি, তাদের ঘরবাড়ি, তাদের সম্পদ এবং এমন এক জমির উত্তরাধিকারী করলেন যেখানে তোমরা পদদলিত হওনি। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৫৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রত্যেকেই তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্মের পরিণতি এই পৃথিবীতে এবং পরকালে উভয় স্থানেই ভোগ করে। পরকালে পরিণতি মানুষের কাছে স্পষ্ট হবে। অন্যদিকে, এই পৃথিবীতে পরিণতি আরও সূক্ষ্ম। যখন কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করতে পছন্দ করে, তখন তারা মানসিক শান্তি পেতে ব্যর্থ হয়। তাদের আচরণ তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে বাধা দেয় এবং এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল স্থানে নিয়ে যায়। এর ফলে তাদের জন্য চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার সৃষ্টি হবে। তারা যত বেশি আল্লাহর অবাধ্য হবে, তত বেশি তারা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ডুবে যাবে, যেমন হতাশা, মাদকাসক্তি এবং আত্মহত্যার প্রবণতা, এমনকি তাদের পার্থিব বিলাসিতা থাকলেও। অজ্ঞতার কারণে, এই ব্যক্তি তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য তাদের জীবনের ভুল মানুষদের, যেমন তাদের স্ত্রীকে দোষারোপ করবে। এরপর তারা এই ভালো মানুষদের তাদের জীবন থেকে বাদ দেবে, যা কেবল তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাই বৃদ্ধি করবে। ফলস্বরূপ, তারা তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার আরও গভীরে ডুবে যাবে। এই ফলাফল স্পষ্ট হয় যখন কেউ দেখে যে, যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, যেমন ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিরা। অধ্যায় ৯, তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

অতএব, এই বিশ্বাস করে প্রতারিত হওয়া এড়িয়ে চলতে হবে যে তারা তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্মের ফলাফল নয়। সবকিছু এবং প্রত্যেকেই জবাবদিহিতার আওতায় আছে, তাই একজনকে অবশ্যই এটি গ্রহণ করতে হবে এবং নিজের স্বার্থে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা তাদের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্ম সংশোধন করছে যাতে তারা মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অবিচল থাকে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকবে। এটি উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। সূরা 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অতএব, একজন ব্যক্তির অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তার উপর আমল করা উচিত, এমনকি যদি তা তার ইচ্ছার বিরোধিতাও করে। তাদের এমন একজন বিচক্ষণ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাস নির্ধারিত থাকে। ঠিক যেমন এই বিচক্ষণ রোগী ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যারা ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন তাদেরও ভালো হবে।

সঠিক বিচার করা

আহযাবের যুদ্ধের পর, বনু কুরাইজা গোত্র যখন তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মহানবী (সাঃ) কে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়, যখন তারা মহানবী (সাঃ) এর সাথে শান্তি ও সমর্থনের চুক্তি ভঙ্গ করে অমুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে জোট বাঁধে। মহানবী (সাঃ) সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, বনু কুরাইজার দুর্গে পৌঁছানো পর্যন্ত আসরের নামাজ না পড়ার নির্দেশ দেন। কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, বনু কুরাইজায় পৌঁছানো পর্যন্ত নামাজ পড়েননি, আবার কেউ কেউ পথে নামাজ পড়েন, কারণ তারা নামাজ পুরোপুরি মিস করে দেবেন বলে ভয় পান। তারা ধরে নিয়েছিলেন যে বনু কুরাইজায় পৌঁছানোর পরই কেবল নবী (সাঃ) এর আদেশ প্রযোজ্য হবে। যখন মহানবী (সাঃ) কে দুটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করা হয়, তখন তিনি এর কোন সমালোচনা করেননি। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৫৮-১৫৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যখনই কোন পণ্ডিত ইসলামের বিভিন্ন বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেন, তখন তারা স্বাধীন যুক্তি নামক একটি স্তরে পৌঁছাতে পারেন। এর ফলে তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্য , তাদের পেশাদার নিরপেক্ষ বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করে ইসলামের মধ্যে একটি রায় বের করতে পারেন। সহীহ মুসলিমের ৪৪৮৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, যখন এই পণ্ডিত ভুল রায় দেন, তখন তাদের প্রচেষ্টার জন্য তারা একবার পুরস্কৃত হবেন। যদি তারা সঠিক রায় দেন, তাহলে তাদের দ্বিগুণ পুরস্কৃত করা হবে। এছাড়াও, এই ঘটনাটি বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে ইসলামের সমস্ত দিক স্পষ্ট নয় এবং তাই পণ্ডিতদের ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত। অতএব, একজন মুসলিম যিনি একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের সমর্থক একজন নির্দিষ্ট পণ্ডিতকে অনুসরণ করেন, তার একজন ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তাদের পণ্ডিত সর্বদা সঠিক, যার ফলে তাদের পণ্ডিতের মতামতের বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করা উচিত নয়। এই আচরণ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু বা

কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে বৈধ মতপার্থক্য থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত একজন নির্দিষ্ট পণ্ডিতকে অনুসরণকারী একজন মুসলিমের এটিকে সম্মান করা উচিত এবং তাদের পণ্ডিতের বিশ্বাসের সাথে ভিন্ন অন্যদের অপছন্দ করা উচিত নয়।

সেরা মানুষ

আহযাবের যুদ্ধের পর, বনু কুরাইজা যখন তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মহানবী (সাঃ) কে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন, তখন তারা মহানবী (সাঃ) এর সাথে শান্তি ও সমর্থনের চুক্তি ভঙ্গ করে অমুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে জোট বাঁধে। মহানবী (সাঃ) বনু কুরাইজাকে অবরোধ করেন এবং মহান আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেন। তাই তারা একজন সাহাবী আবু লুবাবা (রাঃ) এর কাছে কিছু পরামর্শ চেয়েছিলেন কারণ তারা সাহাবীদের সাথে লড়াই করার মতো অবস্থায় ছিলেন না। আবু লুবাবা (রাঃ) তাদের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে তাদের পুরুষ সৈন্যদের তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে, যা আজকের যুগেও একটি সাধারণ শাস্তি। আবু লুবাবা (রাঃ) তার ইঙ্গিতে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন কারণ তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মহানবী (সাঃ) এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তাই সে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মসজিদে একটি গাছের সাথে নিজেকে শৃঙ্খলিত করে রাখল, যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মন্তব্য করেছিলেন যে, যদি তিনি তাঁর কাছে আসতেন, তাহলে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন, কিন্তু যখন তিনি নিজেই বিষয়টির সিদ্ধান্ত নেবেন, তখন তিনি বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দেবেন। এই প্রসঙ্গে, আল্লাহ, সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, সূরা আল-আনফালের ৮ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং তোমাদের আমানতের খেয়ানত করো না।"

এবং ৯ম অধ্যায়, তাওবাহ, আয়াত ১০২:

"আর কিছু লোক আছে যারা তাদের পাপ স্বীকার করেছে। তারা একটি সৎকর্মের সাথে আরেকটি মন্দকর্ম মিশিয়ে ফেলেছে। সম্ভবত আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬২-১৬৪ এবং ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৮:২৭, পৃষ্ঠা ৮২-৮৩ -এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি ইঙ্গিত দেয় যে ইসলাম মানুষের কাছ থেকে পরিপূর্ণতা আশা করে না। সুনানে ইবনে মাজাহের ৪২৫১ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে মানুষ পাপ করে কিন্তু পাপকারী ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন যিনি আন্তরিকভাবে তওবা করেন।

মানুষ যেহেতু ফেরেশতা নয়, তাই পাপ করতে বাধ্য। মানুষকে বিশেষ করে তোলে যখন তারা তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুতাপ অনুভব করা, মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা চাওয়া, যার উপর অন্যায় করা হয়েছে, সেই পাপ বা অনুরূপ পাপ আর না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং আল্লাহ তায়ালা এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকারের ক্ষতিপূরণ দেওয়া।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সৎকর্মের মাধ্যমে ছোট ছোট পাপ মুছে ফেলা যায়। অনেক হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যেমন সহীহ মুসলিমের ৫৫০ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে যে, পাঁচটি ফরজ নামাজ এবং পরপর দুটি জুমার জামাতের নামাজ তাদের মধ্যবর্তী ছোট ছোট পাপগুলো মুছে দেয়, যদি না কবীরা পাপ এড়িয়ে চলা যায়।

আন্তরিক তওবার মাধ্যমেই কেবল কবীরা পাপ মোচন করা যায়। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত ছোট-বড় সকল পাপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা, খারাপ সঙ্গ এবং যেসব স্থানে পাপ বেশি সংঘটিত হয় সেসব স্থান এড়িয়ে চলা। তাদের ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা উচিত যাতে তারা পাপ প্রতিরোধকারী বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করে, যেমন দৃঢ়তা, ধৈর্য এবং মহান আল্লাহর ভয়। তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শিখতে হবে, যাতে তারা পাপের পথে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে। এবং যখনই কোন পাপ ঘটে তখন তাদের অবিলম্বে আন্তরিকভাবে তওবা করা উচিত, কারণ মৃত্যুর সময় অজানা। এবং তাদের উচিত মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে হাল ছেড়ে না দিয়ে তাঁর আনুগত্য করা চালিয়ে যাওয়া।

সত্যকে অস্বীকার করা

আহযাবের যুদ্ধের পর, বনু কুরাইজা গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মহানবী (সাঃ) কে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যখন তারা মহানবী (সাঃ) এর সাথে শান্তি ও সমর্থনের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং পরিবর্তে অমুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে জোটবদ্ধ হয়েছিল। মহানবী (সাঃ) বনু কুরাইজাকে অবরোধ করেছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করেছিলেন। বনু কুরাইজার একজন নেতা, কা'ব বিন আসাদ, যিনি তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য প্রধান দায়ী ছিলেন, তারপর তার গোত্রকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে গ্রহণ এবং অনুসরণ করার জন্য সতর্ক করেছিলেন, কারণ তাদের পবিত্র গ্রন্থে শেষ নবী (সাঃ) এর সমস্ত নিদর্শন উল্লেখ করা হয়েছে, মহানবী (সাঃ) এর মধ্যে। কিন্তু তার সম্প্রদায় একগুঁয়েভাবে এই উপদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং দাবি করেছিল যে তারা তাওরাতের আইন ত্যাগ করবে না, যদিও তারা প্রথমে কখনোই তা সঠিকভাবে মেনে চলেনি এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রত্যাখ্যান করে তারা তাওরাতের আদেশের বিরোধিতা করছিল। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

তারা এই আচরণ করেছিল কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে ইসলাম গ্রহণের অর্থ হল তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে যেমনটি ঐশ্বরিক শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, অন্যদিকে, তাদের ইচ্ছা অনুসারে এই আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

পার্থিব জিনিসের প্রতি তাদের ভালোবাসা তাদেরকে ইসলামকে ভুল প্রমাণ করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ঐশী গ্রন্থের ভুল ব্যাখ্যা, সম্পাদনা এবং গোপন করতে

উৎসাহিত করেছিল এবং এমনকি তারা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছিল। এর ফলে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পরও অবিশ্বাস করতে শুরু করেছিল এবং এর ফলে তারা উভয় জগতেই তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৯:

"কিতাবধারীদের একদল তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চায়। কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে বিভ্রান্ত করে না এবং তারা তা উপলব্ধি করে না।"

মহান আল্লাহর রহমত সম্পর্কে তাদের আকাঙ্ক্ষা তাদের বুঝতে বাধা দেয় যে তাদের কর্মকাণ্ড কীভাবে তাদেরকে উভয় জগতে কুফরী এবং শাস্তির দিকে নিয়ে যায়। তারা এই ভ্রান্ত বিশ্বাস গ্রহণ করে যে তারা মহান আল্লাহর প্রিয় এবং প্রিয়জন, কারণ তারা পবিত্র নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধর। তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের মাধ্যমে তারা মিথ্যাভাবে বর্ণবাদকে আল্লাহকে দায়ী করে। ৫ম সূরা আল মায়িদা, আয়াত ১৮:

"কিন্তু ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, "আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়জন।" বলুন, "তাহলে তিনি তোমাদের পাপের জন্য কেন শাস্তি দেন?" বরং তোমরা তাঁর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন..."

এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের মাধ্যমে তারা মহান আল্লাহ তায়ালার উপর অবিচার ও অবিচার আরোপ করেছিল, কারণ তারা দাবি করেছিল যে তিনি তাদের মধ্য থেকে মন্দ

কর্মকারীর সাথে অন্যান্য জাতির সৎকর্মকারীর মতো আচরণ করবেন। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২১:

"যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমি তাদেরকে তাদের মতো করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান করে দেব? তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না মন্দ।"

অধিকন্তু, তাদের ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা তাদের এই মিথ্যা বিশ্বাসে প্ররোচিত করেছিল যে, তাদের অপরাধের জন্য যদি তাদের জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হয়, তবুও তা কেবল অল্প সময়ের জন্য হবে, কারণ তারা নিজেদেরকে বিশ্বাসী বলে মনে করত। সর্বজনীনভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, একজন বিশ্বাসী চিরকাল জাহান্নামে যাবে না। কিন্তু তারা নিজেদেরকে বোকা বানিয়েছিল, কারণ তারা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, যদিও তারা এখনও অন্যান্য ঐশী গ্রন্থ এবং অন্যান্য পবিত্র নবীদের উপর বিশ্বাস করত। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ৮০:

"আর তারা বলে, "জাহান্নাম আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না, [কয়েক] দিন ছাড়া।" বলুন, "তোমরা কি আল্লাহর সাথে কোন অঙ্গীকার করেছ? কারণ আল্লাহ কখনও তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। নাকি তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে এমন কিছু বল যা তোমরা জানো না?"

এবং অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ১৫০-১৫১:

“ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, “আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে অবিশ্বাস করি” এবং এর মাঝামাঝি কোন পথ অবলম্বন করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফের। আর আমরা কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।”

অতএব, মহান আল্লাহ সম্পর্কে তাদের আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে অজান্তেই অবিশ্বাসের পথে ধোঁকা দিয়েছিল। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৯:

"কিতাবধারীদের একদল তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চায়। কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে বিভ্রান্ত করে না এবং তারা তা উপলব্ধি করে না।"

তাই মুসলিমদের জন্য আহলে কিতাবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি উভয় জগতেই সমস্যা, চাপ এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে। মুসলিমদের অবশ্যই ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এবং মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি প্রকৃত আশার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর অবাধ্যতা চালিয়ে যাওয়া, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, অন্যদিকে উভয় জগতেই তাঁর রহমত এবং ক্ষমার আশা করা। অতএব, মহান আল্লাহর উপর আশা করার মধ্যে রয়েছে, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে আল্লাহকে আনুগত্য করার চেষ্টা করা এবং

তারপর উভয় জগতেই তাঁর রহমত এবং ক্ষমার আশা করা। যেহেতু মানুষের কাছ থেকে পরিপূর্ণতা আশা করা যায় না, তাই মহান আল্লাহর উপর আশা করার মধ্যে রয়েছে যখনই কেউ পাপ করে তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ অনুভব করা, মহান আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে তার ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ ও মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকার পূরণ করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এবং আল্লাহর প্রতি আশার মধ্যে পার্থক্য এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অধিকন্তু, মুসলমানদের অবশ্যই আহলে কিতাবদের মনোভাব গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ তারা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারী। এটা করা অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং কুফরের কাছাকাছি, যেমনটি কেউ দাবি করে যে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, মুসলমানদের মধ্যে থেকে দুষ্টদের সাথে সৎকর্মকারীদের সমান আচরণ করবেন। এটি সরাসরি আল্লাহর ন্যায়বিচার এবং ন্যায্যতার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। মহান আল্লাহ, পবিত্র কুরআনে বারবার বলেছেন যে, তিনি মানুষের সাথে যে আচরণ করেন তা কখনও পরিবর্তন হয় না। যেমন তিনি পূর্ববর্তী জাতিগুলির অবাধ্য লোকদের শাস্তি দিয়েছিলেন যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছিলেন, ঠিক তেমনই তিনি তাঁর অবাধ্যতায় অবিচল থাকা মুসলিমদেরও শাস্তি দেবেন। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ৪৩:

"...কিন্তু তুমি কখনো আল্লাহর পদ্ধতিতে [অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে] কোন পরিবর্তন পাবে না, এবং তুমি কখনো আল্লাহর পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না।"

অধিকন্তু, মুসলমানদের অবশ্যই আহলে কিতাবদের মনোভাব গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে যারা ধরে নিয়েছিল যে তারা এখনও বিশ্বাসী, তাই তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত অনুগ্রহের অপব্যবহার করে তাঁর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, সে এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগে তার ঈমান হারানোর বড় ঝুঁকিতে থাকে। কারণ ঈমান এমন একটি গাছের মতো যাকে বেড়ে ওঠার জন্য আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ যা সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, তা বৃদ্ধি পেতে ব্যর্থ হয় এবং এমনকি মারাও যেতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে না এবং মৃত্যুর গুরুতর ঝুঁকিতে থাকে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। অতএব, যে মুসলিম তাদের মৌখিক ঈমানের দাবি সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়, সে হয়তো বিচারের দিনে তাকে অমুসলিম হিসেবে গণ্য করবে, ঠিক যেমন আহলে কিতাবরা, যারা নিজেদেরকে আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাসী বলে দাবি করেছিল, কিন্তু ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে তাঁর অবাধ্যতা করার সময় তাকে অবিশ্বাস করেছিল।

সত্যকে মেনে চলুন

আহযাবের যুদ্ধের পর, বনু কুরাইজারা যখন তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মহানবী (সাঃ) কে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যখন তারা মহানবী (সাঃ) এর সাথে শান্তি ও সমর্থনের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং পরিবর্তে অমুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে জোটবদ্ধ হয়েছিল। মহানবী (সাঃ) বনু কুরাইজাকে অবরোধ করেছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করেছিলেন। বনু কুরাইজার একজন সদস্য, আমর বিন সু'দা, তাদের দুর্গ ছেড়ে সাহাবী মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাঃ)-এর পাশ দিয়ে চলে যান, যিনি পাহারায় ছিলেন। আমর বিন সু'দা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে শান্তি ও সমর্থনের চুক্তি ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করতে অস্বীকৃতি জানানোয়, সাহাবী মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাঃ)-কে চলে যাওয়ার অনুমতি দেন। আমর বিন সু'দা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মসজিদে রাত কাটান এবং সকালে মদীনা ত্যাগ করেন। যখন মহানবী (সাঃ) এই ঘটনাটি শুনতে পেলেন, তখন তিনি মন্তব্য করলেন যে, আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, আমর বিন সু'দাকে রক্ষা করেছেন কারণ তিনি সত্যের উপর আস্থা রেখেছিলেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা করতে অস্বীকার করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬৪-১৬৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্যকে মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ, যদি তারা মহান আল্লাহর সুরক্ষা এবং আশীর্বাদ কামনা করে। জামে আত তিরমিযী, ১৯৭১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে যা জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। যখন একজন ব্যক্তি সত্যবাদিতায় অটল থাকে, তখন তাকে আল্লাহ, মহিমান্বিত, একজন সত্যবাদী ব্যক্তি হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সত্যবাদিতা তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রথমটি হল যখন কেউ তার নিয়ত এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থাৎ, তারা কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো কোনও গোপন উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়। সহিহ বুখারির ১ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন ব্যক্তির আন্তরিকতার প্রমাণ হল যখন সে অন্যদের কৃতজ্ঞতা কামনা করে না বা আশা করে না।

পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা কেবল মিথ্যা নয়, সকল ধরণের মৌখিক পাপ থেকে বিরত থাকে। কারণ যে ব্যক্তি অন্যান্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি দুর্দান্ত উপায় হল জামে আত তিরমিযী, ২৩১৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসের উপর আমল করা, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উন্নত করতে পারে যখন সে এমন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া এড়িয়ে চলে যা তার সাথে সম্পর্কিত নয়। বেশিরভাগ মৌখিক পাপ ঘটে কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে যা তার সাথে সম্পর্কিত নয়। এর মধ্যে অনর্থক কথাবার্তা এড়ানোও অন্তর্ভুক্ত, কারণ এটি প্রায়শই পাপপূর্ণ কথাবার্তার দিকে পরিচালিত করে এবং একজনের মূল্যবান সময়ের অপচয় করে, যা বিচারের দিনে তাদের জন্য অনুশোচনা হবে। কেউ কেবল ভালো কিছু বলার মাধ্যমে বা নীরব থাকার মাধ্যমে সত্যবাদিতার এই স্তরটি গ্রহণ করতে পারে।

চূড়ান্ত পর্যায় হলো কর্মে সত্যবাদিতা। এটি অর্জন করা সম্ভব হয় মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুসারে ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ

করে, নিজের ইচ্ছানুযায়ী ইসলামের শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা না করে। তাদের সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকার ক্রম মেনে চলতে হবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে আল্লাহ, মহিমান্বিতকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করবে।

আলোচ্য মূল হাদিস অনুসারে, সত্যবাদিতার এই স্তরগুলির বিপরীত, অর্থাৎ মিথ্যা বলার পরিণতি হল, এটি অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে যা পরবর্তীতে জাহান্নামের আগুনের দিকে পরিচালিত করে। যখন কেউ এই মনোভাব ধরে রাখে, তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে একজন মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হবে। পূর্বে আলোচিত তিনটি স্তর অনুসারে, নিয়তে মিথ্যা বলার অর্থ হল মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া এবং মানুষের জন্য সৎকর্ম করা। কথায় মিথ্যা বলার অর্থ হল সকল ধরণের পাপপূর্ণ কথা বলা। কাজে মিথ্যা বলার অর্থ হল পাপ করে যাওয়া, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তায়ালা এবং মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করা। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলার এই সমস্ত স্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে সে একজন মহান মিথ্যাবাদী এবং বিচারের দিন যে ব্যক্তিকে মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করবে তার কী হবে তা নির্ধারণ করার জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না।

সমালোচকদের ভয় পাওয়া

আহযাবের যুদ্ধের পর, বনু কুরাইজারা যখন তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মহানবী (সাঃ) কে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যখন তারা মহানবী (সাঃ) এর সাথে শান্তি ও সমর্থনের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং পরিবর্তে অমুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে জোটবদ্ধ হয়েছিল। মহানবী (সাঃ) বনু কুরাইজাকে অবরোধ করেছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করেছিলেন। বনু কুরাইজারা একজন সাহাবী, সা'দ বিন মু'আয (রাঃ)-এর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে সম্মত হয়েছিল, যাকে তারা মুসলিম হওয়ার আগেই ভালোভাবে চিনত। মহানবী (সাঃ) এরপর সা'দ (রাঃ)-কে তাদের বিচারের জন্য ডেকে পাঠান। পথে, মদীনা থেকে কিছু সাহাবী, যারা বনু কুরাইজার পুরনো মিত্র ছিলেন, সা'দ (রাঃ)-কে তাদের প্রতি নম্র হতে অনুরোধ করেছিলেন। সা'দ (রাঃ) কেবল উত্তর দিলেন যে, মহান আল্লাহর পথে, তিনি সমালোচকদের সমালোচনাকে ভয় পাবেন না। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬৪-১৬৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণ এবং অগঠনমূলক সমালোচনা প্রত্যাখ্যানের গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন মুসলিমের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে দুই ধরণের মানুষ থাকে। প্রথমটি সঠিক পথে পরিচালিত হয় কারণ অন্যদের সমালোচনা পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে প্রাপ্ত সমালোচনা এবং উপদেশের উপর ভিত্তি করে করা হয়। এই ধরণের মানুষ সর্বদা গঠনমূলক হবে এবং উভয় জগতে মহান আল্লাহর আশীর্বাদ এবং সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত করবে। এই ধরণের মানুষ অন্যদের অতিরিক্ত বা অবমূল্যায়ন করা থেকেও বিরত থাকবে। অন্যদের অতিরিক্ত প্রশংসা তাদের গর্বিত এবং অহংকারী করে তুলতে পারে। অন্যদের কম প্রশংসা তাদের অলস করে তুলতে পারে এবং তাদের সৎকর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে। এই প্রতিক্রিয়া প্রায়শই শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে প্রশংসা করা অন্যদের পার্থিব

এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই আরও কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করবে এবং এটি তাদের অহংকারী হওয়া থেকে বিরত রাখবে। অতএব, এই ব্যক্তির প্রশংসা এবং গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণ করা উচিত এবং তার উপর কাজ করা উচিত, এমনকি যদি তা অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকেও আসে।

দ্বিতীয় ধরণের ব্যক্তিরা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার ভিত্তিতে সমালোচনা করে। এই সমালোচনা বেশিরভাগই গঠনমূলক নয় এবং কেবল তাদের খারাপ মেজাজ এবং মনোভাব প্রকাশ করে। এই ব্যক্তিরা প্রায়শই তাদের নিজস্ব ইচ্ছার ভিত্তিতে কাজ করার সময় অন্যদের অতিরিক্ত প্রশংসা করে। এই দুটির নেতিবাচক প্রভাবগুলি আগে উল্লেখ করা হয়েছিল। অতএব, এই ব্যক্তির সমালোচনা এবং প্রশংসা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা উচিত, এমনকি যদি তা কোনও প্রিয়জনের কাছ থেকে আসে কারণ এটি কেবল সমালোচনার ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়ভাবে দুঃখিত এবং প্রশংসার ক্ষেত্রে অহংকারী হয়ে ওঠে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যে ব্যক্তি অন্যদের অতিরিক্ত প্রশংসা করে, সে প্রায়শই তাদেরও অতিরিক্ত সমালোচনা করে। একজন ব্যক্তির সর্বদা যে নিয়মটি অনুসরণ করা উচিত তা হল, তাকে কেবল ইসলামের শিক্ষার ভিত্তিতে সমালোচনা এবং প্রশংসা গ্রহণ করতে হবে। অন্য সমস্ত বিষয় উপেক্ষা করা উচিত এবং ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া উচিত নয়।

উপরন্তু, আলোচ্য মূল ঘটনাটি অন্যদের স্বার্থে নিজের ঈমানের সাথে আপোষ না করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষ কখনোই উভয় জগতে মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে একজন ব্যক্তিকে রক্ষা করতে পারবে না।

অন্যদিকে, মহান আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন যে তার আনুগত্যের উপর অটল থাকে, এমনকি যখন তারা অবাধ্য হয় এবং মানুষকে বিরক্ত করে। কিন্তু এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এই সুরক্ষা আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা অনুসারে , এবং তাই এমনভাবে ঘটে যা তাদের জন্য সর্বোত্তম এবং এমন সময়ে যা তাদের জন্য সর্বোত্তম।

অধিকন্তু, যে ব্যক্তি মানুষকে খুশি করার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হয়, সে উভয় জগতেই তাদের জন্য মানসিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হয়, সে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখতে বাধা দেবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল জায়গায় নিয়ে যাবে। তাই তাদের মনোভাব তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে। পরিবর্তে, তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেকেই উভয় জগতেই তাদের জন্য মানসিক চাপ এবং সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

পরিশেষে, যেহেতু মহান আল্লাহ মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয় নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনি নিশ্চিত করবেন যে, যে সকল মানুষকে একজন ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হয়ে খুশি করতে চায়, তারা কখনোই তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। এটা স্পষ্ট হয় যখন কেউ দেখে যে, যারা মানুষকে খুশি করার জন্য তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে। ৯ম অধ্যায়, তাওবাহ, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

বিশ্বাসঘাতকতা

আহযাবের যুদ্ধের পর, বনু কুরাইজারা যখন তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মহানবী (সাঃ) এর সাথে শান্তি ও সমর্থনের চুক্তি ভঙ্গ করে অমুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে জোটবদ্ধ হয়, তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। বনু কুরাইজারা সা'দ বিন মু'আয (রাঃ)-এর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে সম্মত হয়, যাকে তারা মুসলিম হওয়ার আগেই ভালোভাবে চিনত। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে বনু কুরাইজার সৈন্যদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে এবং তাদের সম্পদ জব্দ করা হবে। এরপর মহানবী (সাঃ) ঘোষণা করেন যে তিনি আল্লাহর হুকুম অনুসারে রায় দিয়েছেন। ইমাম ইবনে কাথিরের "নবী (সাঃ)-এর জীবনী", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, রাষ্ট্রদ্রোহের জন্য মৃত্যুদণ্ড একটি অত্যন্ত সাধারণ রায়, এমনকি আজকের যুগেও। তাছাড়া, তাদের অপরাধ ছিল একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয় বরং পুরো একটি শহরের বিরুদ্ধে, যেখানে মানুষ ছিল। যদি তাদের নির্বাসিত করা হত, তাহলে তারা আবার মদিনার সাথে যুদ্ধ শুরু করত।

অধিকন্তু, এই ঘটনাটি এই বিষয়টি বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে, একজন ব্যক্তির কর্মের সর্বদা পরিণতি রয়েছে, এমনকি যদি এই পরিণতিগুলি স্পষ্ট নাও হয়। এই পৃথিবীতে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর অবাধ্য হয় তার কাছে থাকা পার্থিব জিনিসগুলি তার জন্য চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এমনকি যদি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে, কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে পালাতে পারে না। ৫৩ সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

পরকালে এর পরিণতি আরও স্পষ্ট এবং আরও ধ্বংসাত্মক হবে। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

এই বাস্তবতাটি মনে রাখা উচিত এবং ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য করার চেষ্টা করা উচিত। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। অতএব, এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অন্ধ আনুগত্য এবং অনুকরণ

যখন বনু কুরাইজা গোত্রের সৈন্যদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে বারবার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছিল, তখন সাবিত বিন কায়েস, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, বনু কুরাইজার একজন অমুসলিম যুবাইর বিন বাতাকে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন, যাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, কারণ তিনি আগে একবার তার জীবন বাঁচিয়েছিলেন। সাবিত, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে তার মুক্তির জন্য আবেদন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। যুবাইরকে যখন জানানো হয়েছিল, তখন তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে তার পরিবার ছাড়া জীবন অর্থহীন হবে। সাবিত, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তারপর তার পরিবারকেও মুক্তি দেন। যুবাইর তখন মন্তব্য করেছিলেন যে সম্পত্তি ছাড়া জীবন তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। সাবিত, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তারপর তার সমস্ত সম্পত্তি এবং সম্পদ তাকে ছেড়ে দেন। এরপর যুবাইর বনু কুরাইজার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে একে একে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেন এবং প্রতিবার তাকে বলা হয় যে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এরপর তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে তাদের ছাড়া জীবন অর্থহীন এবং তাদের সাথে যোগ দিতে চান। এরপর সাবিত (রাঃ) তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৭০-১৭১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

লোকটি অদ্ভুতভাবে অন্ধ আনুগত্য এবং অনুকরণের এক স্তর দেখিয়েছিল, কারণ এটা স্পষ্ট ছিল যে তার লোকেরা প্রথমে মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য এবং দ্বিতীয়ত তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য ভুল করেছিল।

পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণই হলো মানুষের সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার একটি প্রধান কারণ, যেমন বিচার দিবস। একজন ব্যক্তির উচিত তাদের সাধারণ জ্ঞানকে কাজে লাগানো এবং প্রমাণ ও স্পষ্ট নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে জীবনযাপনের পথ বেছে নেওয়া এবং গরুর মতো অন্ধভাবে অন্যদের অনুকরণ করা উচিত নয়। এমনকি ইসলামেও অন্ধ অনুকরণ অপছন্দনীয়।

সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪০৪৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যদের, যেমন নিজের পরিবারের, অন্ধভাবে অনুকরণ না করার গুরুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে, ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল না করে যাতে কেউ অন্ধ অনুকরণকে অতিক্রম করে এবং মহান আল্লাহকে আনুগত্য করে, একই সাথে তাঁর প্রভুত্ব এবং তাদের নিজস্ব দাসত্বকে সত্যিকার অর্থে স্বীকৃতি দেয়। এটিই আসলে মানবজাতির উদ্দেশ্য। অধ্যায় ৫১ আয ধরিয়াত, আয়াত ৫৬:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।"

কীভাবে কেউ সত্যিকার অর্থে এমন কাউকে উপাসনা করতে পারে যাকে সে চিনতেও পারে না? অন্ধ অনুকরণ শিশুদের জন্য গ্রহণযোগ্য কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের অবশ্যই জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সত্যিকার অর্থে বুঝতে হবে এবং ধার্মিক পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। অজ্ঞতাই হল সেই কারণ যে মুসলমানরা তাদের বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালন করে তারা এখনও মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। এর কারণ হল অন্ধ অনুকরণ ঈমানের দুর্বলতার দিকে পরিচালিত করে। দুর্বল ঈমান মানুষকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার

আনুগত্য করতে বাধা দেয়, যখনই কারো আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করা হয়। ফলস্বরূপ, এই ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এটি তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে বাধা দেবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় নিয়ে যাবে। অতএব, অন্ধ অনুকরণ একজনকে মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা দেবে।

অধিকন্তু, আহলে কিতাবরা ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করেছিল যা তাদেরকে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করার পরেও বিভ্রান্তিতে থাকতে উৎসাহিত করেছিল। তারা বিশ্বাস করত যে যেহেতু তারা মহান আল্লাহর প্রিয়জন, তাই তিনি তাদের শাস্তি দেবেন না, এমনকি যদি তারা তাঁর অবাধ্য হয়। ৫ম সূরা আল মায়িদা, আয়াত ১৮:

"কিন্তু ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, "আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়জন।" বলুন, "তাহলে তিনি তোমাদের পাপের জন্য কেন শাস্তি দেন?" বরং তোমরা তাঁর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন..."

এই ধরণের বোকামিপূর্ণ বিশ্বাস গ্রহণ করে, তারা মহান আল্লাহর উপর অবিচার ও অবিচার আরোপ করেছিল, কারণ তারা দাবি করেছিল যে তিনি তাদের মধ্যে একজন মন্দ কর্মচারীর সাথে সৎকর্মকারীর মতোই আচরণ করবেন। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২১:

"যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমি তাদেরকে তাদের মতো করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে- তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান করে দেব? তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না মন্দ।"

অধিকন্তু, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস বর্ণবাদকে আল্লাহ তাআলার উপর আরোপ করেছিল, কারণ তারা দাবি করেছিল যে তাদের বংশের কারণে তারা বাকি মানবজাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছে।

অধিকন্তু, তারা এটাও বিশ্বাস করত যে, তাদের অবাধ্যতার জন্য যদি তাদের শাস্তি দেওয়া হয়, তবুও তা সীমিত সময়ের জন্য হবে কারণ তারা নিজেদেরকে বিশ্বাসী বলে মনে করত , যদিও তারা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে কাফের হয়ে গিয়েছিল। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ৮০:

"আর তারা বলে, "জাহান্নাম আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না, [কয়েক] দিন ছাড়া।" বলুন, "তোমরা কি আল্লাহর সাথে কোন অঙ্গীকার করেছ? কারণ আল্লাহ কখনও তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। নাকি তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে এমন কিছু বল যা তোমরা জানো না?"

এবং অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ১৫০-১৫১:

“ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, “আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে অবিশ্বাস করি” এবং এর মাঝামাঝি কোন পথ অবলম্বন করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফের। আর আমরা কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।”

এই ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনাই তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় অবিচল থাকতে এবং ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করেছিল, যদিও তারা এর সত্যতা স্বীকার করেছিল কারণ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উভয়ই তাদের ঐশী গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। সূরা আল আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

মুসলমানদের অবশ্যই ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে। তাদের এই মিথ্যা বিশ্বাস গ্রহণ করা এড়িয়ে চলতে হবে যে তারা মহান আল্লাহর প্রিয়, কারণ তারা মহান নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। এই মিথ্যা বিশ্বাস কেবল আল্লাহকে অমান্য করতে উৎসাহিত করে এবং তাঁর প্রতি অন্যায়, অবিচার এবং বর্ণবাদের মতো মিথ্যা জিনিস আরোপ করে। উপরন্তু, তাদের অবশ্যই আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে এবং ধরে নিতে হবে না যে তারা তাদের ঈমান নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে, কারণ আল্লাহকে প্রদত্ত নিয়ামতগুলির অপব্যবহার করে তার অবাধ্যতা অব্যাহত রাখা কুফরের দিকে পরিচালিত করতে পারে। কারণ ঈমান একটি গাছের মতো যাকে আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। যে গাছ সূর্যালোকের মতো পুষ্টি পায় না, সে মারা যাবে, ঠিক তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও মারা যেতে পারে যে আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

আনন্দদায়ক মানুষ

যখন বনু কুরাইজা গোত্রের সৈন্যদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে বারবার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছিল, তখন বনু কুরাইজার প্রধান কা'ব বিন আসাদকে মৃত্যুদণ্ডের জন্য সামনে আনা হয়েছিল। মহানবী (সা.) তাকে তাদের একজন প্রবীণ ইহুদি পণ্ডিত ইবনে খুরাশের উপদেশের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, যিনি মহানবী (সা.)-এর আগমনের পূর্বে ইন্তেকাল করেছিলেন। ইবনে খুরাশ তাঁর লোকদের, যাদের মধ্যে কা'ব বিন আসাদও ছিলেন, নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াত ঘোষণা করার সময় তাঁকে অনুসরণ করার এবং তাঁর কাছে তাঁর শুভেচ্ছা জানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। কা'ব এই সত্য স্বীকার করেছিলেন এবং যদিও তিনি ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত ছিলেন, কারণ তিনি বনু কুরাইজা অবরোধের সময় তাঁর লোকদেরকে মহানবী (সা.)-কে গ্রহণ ও অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তবুও তিনি ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কারণ তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে অন্যান্য ইহুদিরা তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য উপহাস করবে এবং দাবি করবে যে তিনি কেবল মৃত্যুদণ্ড থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যই তা গ্রহণ করেছেন। এরপর তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভু (সাঃ) এর নোবেল লাইফ" বইয়ের ১ম খণ্ডের ১৪১৫-১৪১৬ পৃষ্ঠায় এ বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও তিনি ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন, তবুও মানুষকে খুশি করার তার আকাঙ্ক্ষা এতটাই প্রবল ছিল যে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। মানুষকে খুশি করার এই আকাঙ্ক্ষা এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি একজনকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করতে পারে।

মানুষ প্রায়ই অভিযোগ করে যে, যতই চেষ্টা করুক না কেন, তারা সবাইকে খুশি করতে পারে না। তারা যে পরিস্থিতিতেই থাকুক না কেন, কেউ না কেউ সবসময় তাদের উপর অসন্তুষ্ট থাকে। এটি এমন একটি বাস্তবতা যা সকলেই অনুভব করে, তা সে তাদের পারিবারিক জীবনে হোক, কর্মক্ষেত্রে হোক বা বন্ধুদের সাথে হোক। একজন মুসলিমের সর্বদা কিছু সহজ জিনিস মনে রাখা উচিত যা তাদের এই বিষয়টি নিয়ে চাপ এড়াতে সাহায্য করবে।

প্রথমত, অধিকাংশ মানুষই আল্লাহ্‌র উপর সন্তুষ্ট নয়, যদিও তিনি তাদেরকে অগণিত নেয়ামত দান করেছেন, যাদের কাছ থেকে তিনি তাদের অনুরোধ না করেই। তাহলে এই লোকেরা কীভাবে অন্য একজন ব্যক্তির উপর সত্যিকার অর্থে খুশি হতে পারে যে বাস্তবে তাদেরকে কিছুই দেয়নি? তাদের অভিযোগ এবং কৃতজ্ঞতার অভাব থেকেই মহান আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের সন্তুষ্টির অভাব স্পষ্ট।

দ্বিতীয়ত, একজন ব্যক্তি তার চরিত্র যতই উন্নত করুক না কেন, সে কখনই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং অন্যান্য নবীদের মতো মহান চরিত্র অর্জন করতে পারবে না, তবুও কিছু লোক তাদের অপছন্দ করত। যদি তাদের ক্ষেত্রে এই অবস্থা হয়, তাহলে একজন সাধারণ মানুষ কীভাবে তার জীবদ্দশায় সকলের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে?

একজন মুসলিমের এটাও মনে রাখা উচিত যে, যেহেতু মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই সবসময় এমন মানুষ পাওয়া যাবে যারা তাদের মনোভাব এবং আচরণের সাথে দ্বিমত পোষণ করে। এ কারণেই এমন কিছু মানুষ সবসময় থাকবে যারা যেকোনো সময়ে একজন ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। একমাত্র দ্বিমুখী ব্যক্তিই সকলকে খুশি করার কাছাকাছি যেতে পারে, যে কার সাথে

আচরণ করছে তার উপর নির্ভর করে তাদের মনোভাব এবং বিশ্বাস পরিবর্তন করে। কিন্তু অবশেষে এই ব্যক্তিকেও মহান আল্লাহ তাআলার কাছে প্রকাশ্যে অপমানিত করা হবে।

অতএব, সকল মানুষের সন্তুষ্টি অর্জন করা অসম্ভব এবং কেবল একজন মূর্খ ব্যক্তিই এমন কিছু অর্জনের চেষ্টা করবে যা অর্জন করা সম্ভব নয়। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার চেষ্টা করা, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলিমের অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত নয় কারণ এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বিরোধিতা করে। এর অর্থ হল একজন মুসলিমের বুঝতে হবে যে যদি তারা আল্লাহকে মেনে চলে, তাহলে তিনি তাদের নেতিবাচক মনোভাব এবং মানুষের প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন, যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। কিন্তু যদি তারা মানুষকে খুশি করার অগ্রাধিকার দেয় তবে তারা তা অর্জন করতে পারবে না এবং মহান আল্লাহও তাদের মানুষের অসন্তুষ্টি এবং নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন না।

বাগান বা গর্ত

বনু কুরাইজা গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি নির্ধারণের পর, সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) আহযাবের যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা যান। মহানবী (সাঃ) মন্তব্য করেন যে, সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) এর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে। সহীহ মুসলিমের ৬৩৪৬ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তাঁর দাফনের সময়, মহানবী (সাঃ) ঘোষণা করেন যে, তাঁর দাফনের জন্য ৭০,০০০ ফেরেশতা আসমান থেকে অবতরণ করেছিলেন, ফেরেশতারা তাঁর জানাজা বহন করেছিলেন এবং তাঁর কবর তাঁকে মুহূর্তের জন্য বাধ্য করেছিল যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁকে তা থেকে মুক্তি দেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৭৫-১৭৭-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের কারণে এইভাবে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি পবিত্র কুরআন এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে সঠিকভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করার জন্য অবিচল ছিলেন। ফলস্বরূপ, আল্লাহ তাঁকে এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি এবং পরকালে মহান প্রতিদান দান করেছিলেন।

এছাড়াও, এই ঘটনা মুসলমানদেরকে তাদের কবরে যা ঘটবে তার জন্য সক্রিয়ভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জামে আত তিরমিযী, ২৪৬০ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পরামর্শ দিয়েছেন যে, একটি কবর হয় জান্নাতের বাগান অথবা জাহান্নামের গর্ত। এই হাদিসটি আরও ব্যাখ্যা করে যে, যখন একজন সফল মুমিনকে তার কবরে রাখা হয় তখন তা তাদের জন্য প্রশস্ত এবং

আরামদায়ক হয়ে ওঠে, অন্যদিকে, একজন পাপী ব্যক্তির কবর তাদের জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, বাস্তবে, প্রতিটি ব্যক্তি যখন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় তখন তাদের কর্মের আকারে জান্নাতের বাগান অথবা জাহান্নামের গর্ত তাদের সাথে নিয়ে যায়। যদি কোন মুসলিম মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, তাহলে এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের কবরকে জান্নাতের বাগানে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ামতগুলি প্রস্তুত করবে। কিন্তু যদি তারা তাদের প্রদত্ত নিয়ামতগুলির অপব্যবহার করে আল্লাহকে অমান্য করে, তাহলে তাদের পাপগুলি জাহান্নামের গর্ত তৈরি করবে যেখানে তারা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

অতএব, মুসলমানদের আজই কাজ করা উচিত এবং এই প্রস্তুতিতে বিলম্ব করা উচিত নয় কারণ মৃত্যুর সময় অজানা এবং প্রায়শই হঠাৎ করেই আসে। আগামীকালকে কেউ দেখতে না পারায় বিলম্ব করা বোকামি এবং এটি কেবল অনুশোচনার দিকে পরিচালিত করে। যেভাবে একজন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তার ঘরকে সুন্দর করার জন্য প্রচুর শক্তি এবং সময় ব্যয় করে, যে বাড়িতে সে কেবল অল্প সময়ের জন্য থাকবে, তাকে তার কবরকে সুন্দর করার জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, কারণ সেখানে যাত্রা অনিবার্য এবং সেখানে দীর্ঘ সময় কাটাতে হবে। এবং যদি কেউ তার কবরে কষ্ট পায় তবে পরবর্তী ঘটনাগুলি আরও খারাপ হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪২৬৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। কেউ কখনই ভুলে যাবে না যে মানুষ এবং পার্থিব জিনিসপত্র, যেমন তাদের ব্যবসা, যার জন্য তারা তাদের বেশিরভাগ শক্তি উৎসর্গ করে, তারা তাদের কবরে পৌঁছানোর সময় তাদের পরিত্যাগ করবে। কেবল তাদের আমলই তাদের সাথে

থাকবে, সেই একই আমল যা নির্ধারণ করবে যে তারা জান্নাতের বাগানে থাকবে নাকি জাহান্নামের গর্তে।

পরিশেষে, একজন ব্যক্তিকে এই ভেবে বোকা বানানো উচিত নয় যে তার ঈমান তার জান্নাতের বাগান নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট। ঈমান হল একটি অভ্যন্তরীণ অবস্থা যা তার কর্মের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে প্রতিফলিত হতে হবে। অন্তরের মধ্যে যা আছে তা জানেন এমনটাই তিনি আদেশ করেছেন। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়... আমরা অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব [পরকালে]।"

আর সত্য হলো, বিশ্বাস যেমন একটি গাছের মতো, তেমনি সৎকর্মের মাধ্যমে এটিকে জলসেচন এবং পুষ্ট করতে হবে। যদি কেউ তাদের বিশ্বাসের চারাটিকে লালন-পালন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা দেখতে পাবে যে তাদের কবরে পৌঁছানোর আগেই এটি শুকিয়ে যাবে।

রাষ্ট্রদ্রোহের শাস্তি – ২

আহযাবের যুদ্ধের পর এবং বনী কুরাইজা গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতার মুখোমুখি হয়ে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সাল্লাম বিন আবু হুকায়েককে হত্যা করতে সম্মত হন, যিনি রাষ্ট্রপ্রধান নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করতে অটল ছিলেন। তিনি মক্কা, মদিনা এবং আশেপাশের এলাকার অমুসলিমদের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে উসকানি দিতে থাকেন এবং আহযাবের যুদ্ধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। সাল্লাম খায়বারে অবস্থান করছিলেন এবং সাহাবীদের একটি ছোট দল গোপনে তার বাড়িতে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করে। সাল্লামের স্ত্রী চিৎকার করতে শুরু করলে তারা তাদের উদ্দেশ্য ত্যাগ করে এবং ফলস্বরূপ তারা তাকে হত্যা করার জন্য তরবারি তুলে নেয় কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কঠোর আদেশ মনে রাখে, কোন মহিলা বা শিশুর ক্ষতি না করার জন্য, তাই তারা তাদের হাত বিরত রাখে। ইবনে কাথিরের "প্রভুর জীবন" বইয়ের ৩য় খণ্ডের ১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠায় এটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, রাষ্ট্রদ্রোহের জন্য মৃত্যুদণ্ড একটি অত্যন্ত সাধারণ রায়, এমনকি আজকের যুগেও।

এটা শেখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন ব্যক্তির শারীরিক বা সামাজিক শক্তি যতই থাকুক না কেন, এমন একটা দিন অবশ্যই আসবে যখন তাকে তার কর্মের পরিণতি ভোগ করতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, এটি তার জীবনের সময় ঘটে যেখানে একজন ব্যক্তির কর্ম তাকে সমস্যার দিকে ঠেলে দেয়, যেমন জেলখানা এবং অবশেষে তাকে

পরকালেও তার কর্মের পরিণতি ভোগ করতে হবে। এটি কেবল নেতাদের ক্ষেত্রেই নয়, সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

তাই একজন মুসলিমের কখনোই অন্যদের সাথে, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজনের সাথে, খারাপ ব্যবহার করা উচিত নয়। তাদের ইতিহাসের অত্যাচারী নেতাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যারা তাদের চেয়েও শক্তিশালী ছিল, এমন একটি দিন অবশ্যই এসেছিল যখন তাদের শক্তি তাদের কোন উপকারে আসেনি এবং তারা তাদের মন্দ কাজের পরিণতি ভোগ করেছে। সামাজিক প্রভাব এবং শক্তি অস্থির জিনিস কারণ এগুলি দ্রুত ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে চলে যায় এবং দীর্ঘকাল কারও সাথে থাকে না। অতএব, যে মুসলিমের এই শক্তি আছে তার উচিত এটি এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, নিজের এবং অন্যদের উপকার করে। কিন্তু যদি তারা তাদের কর্তৃত্বের অপব্যবহার করে তবে অবশেষে তারা শাস্তির মুখোমুখি হও যা থেকে কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবে না।

উপরন্তু, এটি গুরুত্বপূর্ণ কারো কর্তৃত্বের অপব্যবহার না করা, কারণ এর ফলে বিচারের দিন তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। প্রতিটি অত্যাচারীকে তাদের নেক আমল তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের দিতে হবে এবং প্রয়োজনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের পাপ গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে অনেক অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলিমের কখনোই তাদের কর্মের জন্য নিজেকে জবাবদিহি করতে ভুলা উচিত নয়। যারা তা করে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এবং অন্যদের

ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু যারা নিজেরাই বিচার করে না তারা সর্বদা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এবং অন্যদের অসাবধানতার সাথে ক্ষতি করতে থাকবে। তারা জানে না যে আসলে তারা কেবল নিজেদেরই ক্ষতি করছে। কিন্তু যখন তারা এই সত্যটি বুঝতে পারবে তখন শাস্তি থেকে বাঁচতে তাদের অনেক দেরি হয়ে যাবে।

মন্দ উদ্দেশ্য

খায়বারে অবস্থানরত একজন বিশিষ্ট অমুসলিম সাল্লাম বিন আবু হুকাইককে হত্যা করার পর, খায়বারের অমুসলিমরা তার প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা মদীনা আক্রমণের জন্য সেনাবাহিনী জড়ো করতে শুরু করে এবং এমনকি বিদেশী অমুসলিম উপজাতিদের তাদের সাহায্য করার জন্য উৎসাহিত করার চেষ্টা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন এই খবর শুনতে পান, তখন তিনি ত্রিশজন সাহাবীকে (রাঃ) প্রেরণ করেন, তাদের নেতা ইউসাইর ইবনে রাজামকে মদীনায় ফিরে এসে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে আলোচনা করার জন্য উৎসাহিত করার জন্য। ইউসাইর রাজি হন কিন্তু জোর দেন যে তিনি এবং তার ২৯ জন সৈন্যকে ৩০ জন সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের সাথে মদীনায় ফিরে যেতে হবে। ফেরার পথে, ইউসাইর সাহাবীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন এবং যুদ্ধ শুরু হয়। সাহাবীরা (রাঃ) তাদের সকলকে হত্যা করতে সক্ষম হন, শুধুমাত্র একজন অমুসলিম ছাড়া যিনি পায়ে হেঁটে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভু (সাঃ) এর নোবেল লাইফ" বইয়ের ১ম খণ্ডের ১৪৮৫-১৪৮৬ পৃষ্ঠায় এ বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

কখনোই খারাপ কাজ করার চক্রান্ত করা উচিত নয় কারণ এটি সর্বদা, এক বা অন্যভাবে, তাদের উপরই আঘাত হানবে। এমনকি যদি এই পরিণতিগুলি পরবর্তী জগতে বিলম্বিত হয় তবে তারা অবশেষে এর মুখোমুখি হবে। উদাহরণস্বরূপ, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন যেমন তারা তাদের পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং স্নেহ কামনা করেছিলেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তাদের চক্রান্ত তাদের তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১৮:

"এবং তারা তার জামার উপর মিথ্যা রক্ত আনল। [ইয়াকুব] বলল, "বরং তোমাদের আত্মা তোমাদেরকে কিছু একটার প্রতি প্ররোচিত করেছে, তাই ধৈর্যই সবচেয়ে উপযুক্ত..."

যে যত বেশি মন্দ চক্রান্ত করবে, আল্লাহ তাআলা তত বেশি তাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। এমনকি যদি তারা বাহ্যিকভাবে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে, তবুও আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য উভয় জগতে অভিশাপ হিসেবে তাদের আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটিকেই পরিণত করবেন, যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ৪৩:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজস্ব লোকদের ছাড়া আর কাউকে ঘিরে রাখে না। তাহলে তারা কি পূর্ববর্তী লোকদের পথ [অর্থাৎ, ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করছে?..."

হযরত মুহাম্মদ (সা.) জয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-কে বিবাহ করেন

ভিত্তিহীন রীতিনীতি ত্যাগ করা

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের পঞ্চম বছরে, তিনি জয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ)-কে বিয়ে করেন, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন। এই বিবাহের সাথে সম্পর্কিত অনেক আয়াত নাজিল হয়েছে, যেমন সূরা আল আহযাব, আয়াত ৩৭-৩৯:

"আর যখন তুমি [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাকে বললে যার উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও অনুগ্রহ করেছ, "তোমার স্ত্রীকে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো।" অথচ তুমি নিজের অন্তরে এমন কিছু গোপন করে রেখেছিলে যা আল্লাহ প্রকাশ করবেন। আর তুমি মানুষকে ভয় করতে ভয় পাও, অথচ আল্লাহ তাকে ভয় করার অধিক অধিকারী। তারপর যখন যায়েদের আর তার প্রয়োজন রইল না, তখন আমরা তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম যাতে মুমিনদের উপর তাদের দাবি করা [অর্থাৎ, পালিত] পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে কোন অসুবিধা [অর্থাৎ, অপরাধ] না হয় যখন তাদের আর তাদের প্রয়োজন থাকে না। আর আল্লাহর আদেশ [অর্থাৎ, ফরমান] সর্বদাই পূর্ণ হয়। নবীর উপর আল্লাহ যা আরোপ করেছেন তাতে কোন অসুবিধা নেই। [এটি] পূর্বে অতীত হওয়া [নবীদের] ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি। এবং আল্লাহর আদেশ সর্বদাই নির্ধারিত। [আল্লাহ] তাদের প্রশংসা করেন যারা আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেয় এবং তাঁকে ভয় করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। এবং হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।"

এই আয়াতগুলিতে মহানবী (সাঃ)-এর দত্তক পুত্র যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ)-এর স্ত্রী জয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ)-কে তালাক দেওয়ার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। মহানবী (সাঃ) জানতেন যে এটি ঘটবে এবং আল্লাহ তাঁর সাথে জয়নব (রাঃ)-কে বিবাহ দেবেন। মহানবী (সাঃ)-এর এই বিষয়ে আশঙ্কা ছিল কারণ তিনি জানতেন যে ইসলামের আগমনের আগে লোকেরা এই ধরণের বিবাহকে পছন্দ করত না, যদিও কারও দত্তক পুত্র তাদের জৈবিক পুত্র নয় এবং যদিও তারা তার সৎ মাকে বিয়ে করার মতো জঘন্য সম্পর্কে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত। তিনি যে আশঙ্কা অনুভব করেছিলেন তা কেবল অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার কারণে ছিল কারণ তিনি তাদের অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে কোনও সন্দেহ তৈরি করতে চাননি। এই চিন্তাটিই নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রথম দিকে গোপন করেছিলেন। তিনি যদি আল্লাহর আদেশের চেয়ে মানুষকে ভয় পেতেন, তাহলে তিনি প্রথমেই কখনও নবুওয়াত ঘোষণা করতেন না। মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে সমাজের মধ্যে এই ভুল ধারণাটি দূর করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন করে তোলার জন্য এই ঘটনাটি ঘটতে দেননি। আলোচ্য আয়াতগুলিতে এটিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিমের কখনই সমাজের সমালোচনাকে ভয় করা উচিত নয়, কারণ এটি পার্থিব লাভের জন্য তাদের ঈমানের সাথে আপস করতে পারে।

ইসলাম মুসলমানদের শিক্ষা দেয় যে, বস্তুজগৎ থেকে কিছু লাভের জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে কখনও আপস করা উচিত নয়। অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ১৩৫:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদান করো, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়..."

যেহেতু বস্তুজগৎ ক্ষণস্থায়ী, তাই এখান থেকে যা কিছু লাভ হবে তা অবশেষে বিলীন হয়ে যাবে এবং পরকালে তাদের কর্ম ও মনোভাবের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে। অন্যদিকে, ঈমান হলো সেই মূল্যবান রত্ন যা একজন মুসলিমকে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নিরাপদে পরিচালিত করে। অতএব, ক্ষণস্থায়ী জিনিসের জন্য অধিকতর কল্যাণকর এবং স্থায়ী জিনিসের সাথে আপস করা স্পষ্ট বোকামি।

অনেক মানুষ, বিশেষ করে নারীরা, তাদের জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত দেখতে পাবেন যেখানে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপোষ করা উচিত কিনা তা বেছে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ক্ষেত্রে একজন মুসলিম মহিলা বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি যদি তার স্কার্ফ খুলে নির্দিষ্ট পোশাক পরেন তবে তিনি কর্মক্ষেত্রে আরও সম্মানিত হবেন এবং এমনকি আরও দ্রুত কর্পোরেট সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারবেন। একইভাবে, কর্পোরেট জগতে কাজের সময় পরে সহকর্মীদের সাথে মেলামেশা করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই একজন মুসলিম হয়তো কাজের পরে কোনও পাব বা ক্লাবে আমন্ত্রিত হতে পারেন।

এইরকম সময়ে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে চূড়ান্ত বিজয় এবং সাফল্য কেবল তাদেরই লাভ হবে যারা ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকবে। যারা এইভাবে কাজ করবে তাদের পার্থিব এবং ধর্মীয় সাফল্য দেওয়া হবে। তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাদের পার্থিব সাফল্য তাদের জন্য বোঝা হয়ে উঠবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি

মহান আল্লাহর কাছে মানবজাতির মধ্যে তাদের মর্যাদা এবং স্মরণ বৃদ্ধির একটি উপায় হয়ে উঠবে। এর উদাহরণ হল ইসলামের সঠিক নির্দেশিত খলিফারা। তারা তাদের ঈমানের সাথে আপস করেননি এবং বরং তাদের জীবনকাল ধরে অবিচল ছিলেন এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদেরকে একটি পার্থিব এবং ধর্মীয় সাম্রাজ্য দান করেছিলেন।

সাফল্যের অন্য সকল রূপ খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং আজ হোক কাল হোক, এগুলো এর ধারকদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কেবল সেইসব সেলিব্রিটিদের লক্ষ্য করা উচিত যারা খ্যাতি এবং ভাগ্য অর্জনের জন্য তাদের আদর্শ এবং বিশ্বাসের সাথে আপোষ করেছিলেন, কারণ এই বিষয়গুলি তাদের দুঃখ, উদ্বেগ, বিষণ্নতা, মাদকাসক্তি এমনকি আত্মহত্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই দুটি পথের উপর একবার চিন্তা করুন এবং তারপর সিদ্ধান্ত নিন কোনটি পছন্দ করা উচিত এবং বেছে নেওয়া উচিত।

এছাড়াও, আলোচ্য মূল ঘটনাটি নির্দেশ করে যে, নির্দেশনার দুটি উৎস: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্য কঠোরভাবে মেনে চলা এবং সাংস্কৃতিক অনুশীলনের মতো জ্ঞানের অন্যান্য উৎস এড়িয়ে চলার গুরুত্ব কতটা গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করা হবে, এমনকি যদি তা সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে, তবুও তারা নির্দেশনার দুটি উৎসের উপর তত কম কাজ করবে, যা পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে। এই কারণেই, সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয় এমন যেকোনো বিষয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যাখ্যান করবেন। উপরন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ

করা হবে, তত বেশি তারা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে এমন জিনিসগুলিতে কাজ করতে শুরু করবে। এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে বিপথগামী করে। উদাহরণস্বরূপ, সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রাখে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পা দেবে এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করবে যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথেও সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান নির্দেশনার দুটি উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বিভ্রান্তিকর অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফর, যেমন কালো জাদু অনুশীলন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"...সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

সুতরাং একজন মুসলিম অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রয়েছে। এই কারণেই ধর্মীয় উদ্ভাবনগুলিতে কাজ করা যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

অন্যদের সাথে দেখা করা

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের পঞ্চম বছরে, তিনি জয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ)-কে বিয়ে করেন। বিবাহের সম্মানে একটি ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল এবং অতিথিদের মহানবী (সাঃ)-এর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু কিছু অতিথি খাবার শেষ করার পরও দেরি করে একে অপরের সাথে কথা বলতে থাকেন। মহানবী (সাঃ) তাদের চলে যেতে বলতে চাননি তাই তিনি চলে যান এবং বেড়াতে যান। এরপর আল্লাহ তায়ালা সূরা আল আহযাবের ৫৩ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর ঘরে প্রবেশ করো না, যখন তোমাদের খাবারের জন্য অনুমতি দেওয়া হবে, তখনই খাবারের প্রস্তুতির অপেক্ষা করো না। কিন্তু যখন তোমাদের দাওয়াত দেওয়া হবে, তখন প্রবেশ করো; আর যখন খাও, তখন কথা বলার জন্য অপেক্ষা না করে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ো। নিঃসন্দেহে, সেই [আচরণ] নবীকে কষ্ট দিচ্ছিল, এবং তিনি তোমাদের [বরখাস্ত] করতে লজ্জা পাচ্ছেন। কিন্তু আল্লাহ সত্যকে লজ্জা করেন না..."

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৯৯-২০০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে এবং সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত ৫১৬৩ নম্বর হাদিসে এটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

একজন মুসলিমের জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যদের সাথে দেখা করার শিষ্টাচার এবং শর্তাবলী পালন করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা তাদের সওয়াব অর্জন

করতে পারে। তাদের দীর্ঘ সময় ধরে থাকা উচিত নয় যাতে তারা তাদের সাথে দেখা করতে পারে এবং তাদের আত্মীয়স্বজনদের সমস্যায় ফেলে। বর্তমান যুগে, উপযুক্ত সময়ে তাদের সাথে দেখা করার জন্য আগে থেকেই তাদের সাথে যোগাযোগ করা সহজ। অঘোষিতভাবে আসা এড়িয়ে চলা উচিত কারণ এটি প্রায়শই হোস্টকে অসুবিধার মধ্যে ফেলে। এই ধরণের ক্ষেত্রে, অঘোষিতভাবে আসা অতিথিকে ফিরিয়ে দিতে এবং যদি তারা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে তবে তাদের আরও উপযুক্ত সময়ে ফিরে আসতে বলার জন্য হোস্টের লজ্জা করা উচিত নয়, এবং অতিথি এতে বিরক্ত হওয়া উচিত নয়, যেমনটি পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা ২৪ আন নূর, আয়াত ২৮:

"আর যদি তোমরা সেখানে কাউকে না পাও, তাহলে অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি তোমাদের বলা হয়, "ফিরে যাও," তাহলে ফিরে যাও। এটা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। আর আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্পর্কে অবগত।"

একজন দর্শনার্থীর উচিত তাদের কাজ এবং কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করা যাতে তারা পরচর্চা, গীবত এবং অন্যদের নিন্দা করার মতো সকল ধরণের পাপ থেকে বিরত থাকে। তাদের উচিত দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য উপকারী বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা। কেউ যদি এইভাবে আচরণ করে তবেই তারা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদিসে বর্ণিত সওয়াব পাবে। যদি তারা এতে ব্যর্থ হয় তবে হয় তারা কোনও সওয়াব পাবে না অথবা তাদের আচরণের উপর নির্ভর করে তাদের পাপ থেকে যাবে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম এই সৎকর্মটি উপভোগ করে কিন্তু এর শর্তগুলি সঠিকভাবে পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। অধ্যায় ৪ আন-নিসা, আয়াত ১১৪:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনের বেশিরভাগের মধ্যেই কোন কল্যাণ নেই, তবে যারা দান-খয়রাতের নির্দেশ দেয়, সৎকর্মের নির্দেশ দেয় অথবা মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ কাজ করে, আমি তাকে বিরাট প্রতিদান দেব।"

অভিবাসনের পর ষষ্ঠ বছর

করুণা ও দয়া দেখানো

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের ষষ্ঠ বছরে, তিনি বহিরাগত হুমকি মোকাবেলা করার জন্য সৈন্যদের একটি ছোট দল প্রেরণ করেন। তারা শত্রু সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং এক কট্টর কাফের, সুমামা বিন উসালকে ফিরিয়ে আনে, যাকে মিথ্যাবাদী মুসাইলিমা কর্তৃক নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যা করার অভিযোগ আনা হয়েছিল। সুমামাকে মসজিদে একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়েছিল, যেখানে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। কিছু সময় পর, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন। সুমামা চলে যান এবং নিজেকে গোসল করেন এবং তারপর ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মসজিদ এবং মদিনা শহরের ভেতরে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাদের মহৎ আচরণ প্রত্যক্ষ করেন, যা তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করে। এরপর তিনি যিয়ারত (উমরা) করার জন্য মক্কায় রওনা হন এবং মক্কার অমুসলিমদের কাছে তার ইসলাম গ্রহণের কথা জানান। যেহেতু তিনি তার গোত্রের একজন প্রধান ছিলেন, তাই তিনি শপথ করেছিলেন যে তিনি মক্কার অমুসলিমদের ইয়ামামা থেকে এক শস্যও নিতে দেবেন না, যা তারা ব্যবসার জন্য যে অঞ্চলগুলিতে ভ্রমণ করত তার মধ্যে একটি ছিল। এই বয়কট অব্যাহত ছিল যতক্ষণ না মক্কার অমুসলিমরা তাদের পক্ষে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে সুপারিশ করার অনুরোধ করে এবং তার সুপারিশের কারণে, সুমামাহ (রাঃ) বয়কট প্রত্যাহার করেন। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা 326-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, সুমামাহ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কারণ তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণের (রাঃ) মহৎ আচরণ দেখেছিলেন। ইতিহাস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, প্রাথমিক যুগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের অধিকাংশই মুসলমানদের মহৎ আচরণ দেখে তা করেছিলেন। তারা বিতর্ক এবং ইসলামী শিক্ষায় পাওয়া ইসলামের স্পষ্ট প্রমাণ শুনে ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাই মুসলিমদেরকে অবশ্যই ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপনের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে, ঠিক যেমন ধার্মিক পূর্বসূরীরা করেছিলেন। এটি তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন তারা ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন উদারতা, কৃতজ্ঞতা এবং ধৈর্য, শিখে এবং গ্রহণ করে এবং ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন লোভ, হিংসা এবং অহংকার, ত্যাগ করে। এটি নিশ্চিত করবে যে বাইরের বিশ্ব ইসলামের আসল চেহারাটি পর্যবেক্ষণ করবে। কিন্তু যদি মুসলমানরা ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তবে তারা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করবে। ফলস্বরূপ, তাদের খারাপ আচরণ অমুসলিম এবং অন্যান্য মুসলমানদের ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। ইসলামের সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করা প্রতিটি মুসলমানের উপর কর্তব্য এবং তাই উভয় জগতেই তারা এর জন্য দায়ী থাকবে।

এছাড়াও, আলোচ্য মূল ঘটনাটি মুসলমানদেরকে মানুষের খারাপ আচরণের প্রতি নেতিবাচকভাবে প্রতিক্রিয়া না দেখানোর শিক্ষা দেয়। বরং তাদের ইতিবাচকভাবে এর জবাব দেওয়া উচিত। মহানবী (সা.) মক্কার অমুসলিমদের উপর যে বাণিজ্যিক বয়কট ছিল তা বাতিল করে দিয়েছিলেন, যদিও মদিনায় হিজরতের বহু বছর আগে এবং আগে তারা তাঁকে এবং তাঁর সাহাবীদের (আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন) সামাজিকভাবে বয়কট করেছিল। বহির্বিশ্বের উচিত একজন মুসলিমের আচরণ এবং অন্যদের আচরণের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা। একজন মুসলিমের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে, বিশেষ করে শারীরিক সহিংসতার ক্ষেত্রে, তবে এর বাইরেও, তাদের ইতিবাচকভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত, এমনকি যদি অন্যরা তাদের সাথে অভদ্র এবং কঠোর আচরণ করে। অধ্যায় ২৫ আল ফুরকান, আয়াত ৬৩:

"আর পরম করুণাময়ের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করে এবং যখন অজ্ঞরা তাদের সাথে [কঠোরভাবে] কথা বলে, তখন তারা [সালামের] কথা বলে।"

এবং অধ্যায় ৪১ ফুসসিলাত, আয়াত ৩৪:

"আর ভালো কাজ ও মন্দ সমান নয়। [মন্দ কাজ] প্রতিহত করো সেই [কাজ] দ্বারা যা উত্তম; তাহলে যার সাথে তোমার শত্রুতা আছে সে [একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হয়ে যাবে।"

এইভাবে আচরণ করলে উভয় জগতেই সওয়াব পাওয়া যায় এবং বাইরের জগতের কাছে ইসলামের আসল চেহারা ফুটে ওঠে। এই ভালো আচরণ যারা খারাপ আচরণ করে তাদের নিজেদের সংশোধন করতে আরও বেশি উৎসাহিত করবে, যদি কেউ তাদের খারাপ আচরণের প্রতি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখায়।

কপটরা অনৈক্যের জন্য সংগ্রাম করে

বিশ্বাসের বন্ধন

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের ষষ্ঠ বছরে, তিনি একটি অভিযান প্রেরণ করেন। সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, যখন এই অভিযান থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন তাদের একদল তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একটি কূপ ঘিরে ফেলে। কূপের চারপাশের এলাকা ভিড়ের কারণে, দুজন সাহাবী, একজন মদীনা থেকে এবং অন্যজন মক্কা থেকে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের মধ্যে একটি ছোটখাটো ঝগড়া হয়। এর ফলে মক্কা থেকে আসা সাহাবী মক্কা থেকে অন্যান্য সাহাবীদের সমর্থনের জন্য আহ্বান জানান এবং মদীনা থেকে আসা সাহাবী মদীনা থেকে অন্যান্য সাহাবীদের সমর্থনের জন্য আহ্বান জানান, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই আহ্বানে সাড়া দিলে, মহানবী (সাঃ) তাদের এই ধরণের গোত্রীয় আচরণের বিরুদ্ধে সতর্ক করেন এবং তারা আর কোনও সমস্যা ছাড়াই দ্রুত বিষয়টি শেষ করে ফেলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রঃ) এর "নবী (সাঃ)-এর নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩১৪-১৩১৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটি মানুষকে বিশ্বাসের বন্ধনে সংযুক্ত করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, অন্য কিছুর সাথে নয়, কারণ এটিই প্রকৃত ঐক্যের দিকে পরিচালিত করে।

সময়ের সাথে সাথে মানুষ প্রায়শই বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একে অপরের সাথে তাদের একসময়ের দৃঢ় সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে। এর অনেক কারণ রয়েছে তবে একটি প্রধান

কারণ হল তাদের পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা যে ভিত্তির উপর তাদের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। এটি সর্বজনবিদিত যে যখন একটি ভবনের ভিত্তি দুর্বল হয় তখন সময়ের সাথে সাথে ভবনটি হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমনকি ভেঙে পড়ে। একইভাবে, যখন মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ভিত্তি সঠিক না হয় তখন তাদের মধ্যে বন্ধন অবশেষে দুর্বল হয়ে পড়ে এমনকি ভেঙে যায়। যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাহাবীদের (রাঃ) একত্রিত করেছিলেন, তখন তিনি তাদের মধ্যে বন্ধন তৈরি করেছিলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। যদিও, আজকের বেশিরভাগ মুসলিম গোত্রপ্রথা, ভ্রাতৃত্ব এবং অন্যান্য পরিবারের কাছে প্রদর্শনের জন্য। যদিও, বেশিরভাগ সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, আত্মীয় ছিলেন না কিন্তু তাদের সংযোগ স্থাপনের ভিত্তি সঠিক ছিল, অর্থাৎ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাদের বন্ধন আরও শক্তিশালী হতে থাকে। যদিও আজকাল অনেক মুসলিম রক্তের সম্পর্কযুক্ত, তবুও সময়ের সাথে সাথে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে কারণ তাদের বন্ধনের ভিত্তি ছিল মিথ্যা, যেমন গোত্রবাদ এবং অনুরূপ জিনিসের উপর ভিত্তি করে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, যদি তারা তাদের বন্ধন টিকে থাকতে এবং আত্মীয়তার বন্ধন এবং অ-আত্মীয়দের অধিকার রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য সওয়াব অর্জন করতে চায়, তাহলে তাদের কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই বন্ধন তৈরি করতে হবে। এর ভিত্তি হল, মানুষ কেবল একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করবে এবং এমনভাবে কাজ করবে যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে। পবিত্র কুরআনে এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৫ম সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ২:

"...এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

অনৈক্য সৃষ্টি করা

দুই সাহাবীর মধ্যে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, যখন তারা একটি অভিযান থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন তাদের মধ্যে একটি ছোটখাটো ঝগড়া হওয়ার পর, মুনাফিকদের নেতা, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, এই সুযোগটি গ্রহণ করে আরও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দাবি করে যে মক্কার মুহাজিররা কেবল তাদের সমস্যা তৈরি করছে। তিনি মক্কার মুহাজিরদের মদিনায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য অন্যান্য মুনাফিকদের সমালোচনা করতে শুরু করেন। এটি ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 213-এ আলোচনা করা হয়েছে।

ভণ্ডামির লক্ষণ হলো, একজন ব্যক্তি সমাজে দুর্নীতি ছড়িয়ে দেয়। এই নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য পারিবারিক ইউনিট থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক স্তরে শেষ পর্যন্ত সকল সামাজিক স্তরকে প্রভাবিত করে। এই ধরণের ব্যক্তি ভালোর জন্য একত্রিত হতে দেখতে অপছন্দ করে কারণ এর ফলে অন্যদের পার্থিব মর্যাদা তাদের নিজেদের চেয়েও বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি তাদের গীবত এবং অপবাদের দিকে ঠেলে দেয় যাতে মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে চলে যায়। তাদের মন্দ মনোভাব তাদের নিজস্ব আত্মীয়তার বন্ধন ধ্বংস করে এবং যখন তারা অন্য পরিবারগুলিকে সুখী দেখতে পায় তখন তাদের সুখও নষ্ট করে। তারা দোষ খুঁজে বের করার লোক যারা তাদের সামাজিক মর্যাদাকে টেনে নামানোর জন্য অন্যদের ভুল উন্মোচন করার জন্য তাদের সময় ব্যয় করে। তারাই প্রথম ব্যক্তি যারা অন্যদের সম্পর্কে পরচর্চা শুরু করে এবং ভালো কথা বলা হলে বধির আচরণ করে। শান্তি ও নীরবতা তাদের বিরক্ত করে তাই তারা নিজেদের মনোরঞ্জনের জন্য সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করে। তারা সুনান ইবনে মাজাহ, ২৫৪৬ নম্বরে পাওয়া হাদিসটি মনে রাখতে ব্যর্থ হয়। এটি পরামর্শ দেয় যে যে কেউ অন্যের দোষ ঢেকে রাখে, আল্লাহ, তার দোষ ঢেকে রাখবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করে এবং প্রকাশ করে, আল্লাহ তাআলা তার দোষ-ত্রুটি মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবেন। সুতরাং, বাস্তবে, এই ধরণের ব্যক্তি

কেবল সমাজের কাছে নিজের দোষ-ত্রুটিই প্রকাশ করছে, যদিও তারা বিশ্বাস করে যে তারা অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করছে।

আগুনের দুটি জিহ্বা

দুই সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, যখন তারা একটি অভিযান থেকে ফিরে আসছিলেন, তাদের মধ্যে একটি ছোটখাটো ঝগড়া হওয়ার পর, মুনাফিকদের নেতা, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, এই সুযোগটি গ্রহণ করে আরও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দাবি করে যে মক্কার মুহাজিররা কেবল তাদের সমস্যা তৈরি করছে। যায়েদ বিন আরকাম, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন, তার খারাপ কথা শুনে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে তা জানায়। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু সে বড় বড় শপথ নিয়েছিল যে সে কখনও এই কথাগুলি বলেনি। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) আর কোনও পদক্ষেপ নেননি। এই ঘটনার সময়, আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা আল মুনাফিকুন, আয়াত ৭-৮ নাযিল করেন:

"তারা বলে, "যারা আল্লাহর রাসূলের সাথে আছে তাদের জন্য ব্যয় করো না যতক্ষণ না তারা ভেঙে পড়ে।" আর আসমান ও যমীনের ভান্ডার আল্লাহরই, কিন্তু মুনাফিকরা বোঝে না। তারা বলে, "যদি আমরা আল-মাদীনায় ফিরে যাই, তাহলে যারা অধিক সম্মানিত, তারা অবশ্যই সেখান থেকে অধিক বিনয়ীকে বহিষ্কার করবে।" আর [সমস্ত] সম্মান আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং মুমিনদের, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।"

এই আয়াতগুলো নাজিল হওয়ার পর, মহানবী (সা.) যায়েদ বিন আরকাম (রা.)-এর কান ধরে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে, এই ব্যক্তিই তাঁর কান আল্লাহর প্রতি উৎসর্গ করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীজীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২১৩-২১৫-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুনাফিকের লক্ষণ হলো দ্বিমুখী হওয়া। এই ব্যক্তিই বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকদের খুশি করার জন্য তাদের আচরণ পরিবর্তন করে, যার মাধ্যমে তারা কিছু পার্থিব জিনিসপত্র অর্জনের ইচ্ছা পোষণ করে। তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, বিভিন্ন লোকের প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করে, কিন্তু তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। তারা মানুষের প্রতি আন্তরিক হতে ব্যর্থ হয় যা সুনানে আন নাসায়ী, ৪২০৪ নম্বরে বর্ণিত একটি হাদিসে নির্দেশিত হয়েছে। যদি তারা তওবা না করে তবে তারা আখেরাতে আগুনের দুটি জিহ্বা নিয়ে নিজেদের দেখতে পাবে। সুনানে আবু দাউদের ৪৮৭৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় আল বাকারা, আয়াত ১৪:

"যখন তারা মুমিনদের সাথে দেখা করে, তখন বলে, "আমরা ঈমান এনেছি", আর যখন তারা তাদের দুষ্ট সঙ্গীদের সাথে (একান্তে) মিলিত হয়, তখন বলে, "আমরা তোমাদের সাথে আছি; আমরা তো কেবল রসিকতা করছিলাম।"

উপরন্তু, এই ঘটনাটি অন্য মানুষের, এমনকি শিশুদের অনুভূতি বিবেচনা করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় যায়েদ (রাঃ) মানসিকভাবে আহত হয়েছিলেন কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে বিশ্বাস করেননি। যদিও মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে বিশ্বাস করেছিলেন, তবুও তিনি বিষয়টিকে বড় করে তোলা থেকে বিরত থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যখন আল্লাহ, মহিমান্বিত, পবিত্র কুরআনের আয়াত নাজিল করেন, তখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রথমে যায়েদ (রাঃ) কে সান্ত্বনা দেন, কারণ তিনি তার অনুভূতি বিবেচনা করেছিলেন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিমের সর্বদা অন্যদের অনুভূতি বিবেচনা করার চেষ্টা করা উচিত এবং তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে তাদের আবেগগতভাবে ক্ষতি করা এড়িয়ে চলা উচিত। এটি তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ তাদের জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে এবং কেবল এমনভাবে কথা বলে যা মানুষের মধ্যে ইতিবাচক অনুভূতি তৈরি করে, যতক্ষণ না এটি ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। দুঃখের বিষয়, মুসলমানরা প্রায়শই এটিকে উপেক্ষা করে এবং ফলস্বরূপ তারা কথা বলার সময় বা কাজের সময় তাদের অনুভূতি বিবেচনা না করে মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে। একজন ব্যক্তির সত্য প্রকাশ করতে লজ্জা পাওয়া উচিত নয়, এমনকি যদি এটি অন্যদের অনুভূতিতে আঘাত করে, তবে তা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে সঠিক পদ্ধতিতে এবং সময়ে করা উচিত। তবে যে বিষয়গুলি ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, সেগুলিতে এমনভাবে কথা বলার এবং কাজ করার চেষ্টা করা উচিত যা অন্যদের অনুভূতিতে আঘাত না করে।

ঈর্ষা এবং ঘৃণা

দুই সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, যখন তারা একটি অভিযান থেকে ফিরে আসছিলেন, তাদের মধ্যে একটি ছোটখাটো ঝগড়া হওয়ার পর, মুনাফিকদের নেতা, আবদুল্লাহ বিন উবাই, এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে আরও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দাবি করে যে মক্কার মুহাজিররা কেবল তাদের সমস্যাই তৈরি করছে। আবদুল্লাহ বিন উবাইকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তিনি বড় বড় শপথ নিয়েছিলেন যে তিনি কখনও এই কথাগুলি বলেননি। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) আর কোনও পদক্ষেপ না নিয়েই তাকে বরখাস্ত করেছিলেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) পরে এই ঘটনাটি এমন একজন ব্যক্তির কাছে উল্লেখ করেছিলেন যিনি আবদুল্লাহ বিন উবাইকে ভালোভাবে চিনতেন। উসাইদ বিন হুদাইর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে বলেছিলেন যে, আবদুল্লাহ বিন উবাইকে মদীনার লোকেরা তাদের রাজা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, কারণ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সেখানে হিজরত করার আগে মদীনার লোকেরা আবদুল্লাহ বিন উবাইকে তাদের রাজা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তাই আবদুল্লাহ বিন উবাই সর্বদা বিশ্বাস করতেন যে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তার রাজ্য তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২১৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪২১০ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, হিংসা নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয় ঠিক যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

হিংসা একটি গুরুতর এবং কবীরা পাপ কারণ হিংসুকের সমস্যা অন্য ব্যক্তির সাথে নয়। বাস্তবে, তাদের সমস্যা মহান আল্লাহর সাথে, কারণ তিনিই সেই আশীর্বাদ দান

করেছেন যা ঈর্ষা করা হয়। সুতরাং একজন ব্যক্তির হিংসা কেবল মহান আল্লাহর বরাদ্দ এবং পছন্দের প্রতি তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। তারা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য একজনকে একটি বিশেষ আশীর্বাদ বরাদ্দ করে ভুল করেছেন।

কেউ কেউ ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির কাছ থেকে বরকত কেড়ে নেওয়ার জন্য তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালায়, যা নিঃসন্দেহে একটি পাপ। সবচেয়ে খারাপ ধরণ হল যখন ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে বরকত কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, এমনকি যদি ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি নিজে বরকত নাও পায়। ঈর্ষা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতি অনুসারে কাজ না করে, তাদের অনুভূতি অপছন্দ করে এবং মালিকের আশীর্বাদ না হারানো পর্যন্ত অনুরূপ বরকত পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই ধরণের বরকত পাপ নয়, তবে যদি ঈর্ষা পার্থিব আশীর্বাদের উপর হয় এবং যদি ধর্মীয় আশীর্বাদের উপর হয় তবে প্রশংসনীয় হয় তবে এটি অপছন্দনীয়। উদাহরণস্বরূপ, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সহিহ মুসলিমের ১৮৯৬ নম্বর হাদিসে প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথম ব্যক্তি যিনি বৈধভাবে ঈর্ষা করতে পারেন তিনি হলেন যিনি হালালভাবে ঈর্ষা করতে পারেন এবং আল্লাহকে খুশি করার জন্য হালাল সম্পদ অর্জন করেন এবং ব্যয় করেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি বৈধভাবে ঈর্ষা করতে পারেন তিনি হলেন যিনি তাদের জ্ঞানকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করেন এবং অন্যদের তা শিক্ষা দেন।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলিমের উচিত ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির প্রতি ভালো চরিত্র এবং দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করা, যতক্ষণ না তাদের ঈর্ষা তাদের প্রতি ভালোবাসায় পরিণত হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, তাদের ঈর্ষা কখনই অন্যের অধিকার পূরণে বাধা হতে দেওয়া উচিত নয়।

একজন মুসলিমের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, মহান আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে সর্বদা নিয়ামত বণ্টন করেন। অর্থাৎ, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার জন্য যা সর্বোত্তম তাই দেন। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

অতএব, অন্যদের প্রতি ঈর্ষা করার পরিবর্তে, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজে লাগানোর জন্য নিজেকে ব্যস্ত রাখা উচিত। এর ফলে নিয়ামত বৃদ্ধি পাবে, কারণ এই মনোভাব মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"আর [স্মরণ করো] যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের [নেয়ামত] বৃদ্ধি করব..."

উপরন্তু, এটি মনের শান্তির দিকে পরিচালিত করবে, যা একগুঁয়ে ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি কখনও পায় না। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

বিশ্বাসকে উৎকৃষ্ট করে তোলা

দুই সাহাবীর মধ্যে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, যখন তারা একটি অভিযান থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন তাদের মধ্যে একটি ছোটখাটো ঝগড়া হওয়ার পর, মুনাফিকদের নেতা, আবদুল্লাহ বিন উবাই, এই সুযোগটি গ্রহণ করে আরও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দাবি করে যে মক্কার মুহাজিররা কেবল তাদের সমস্যা তৈরি করছে। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের বিরুদ্ধে আর কোনও পদক্ষেপ নেননি কারণ তিনি তার কথা অস্বীকার করেছিলেন। ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি দ্রুত সেনাবাহিনীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা এ নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। ফলস্বরূপ, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সেনাবাহিনীকে স্বাভাবিক সময়ে অগ্রসর হতে নির্দেশ দেন এবং তাদের সারা রাত এবং পরের দিন সকাল পর্যন্ত অগ্রসর হতে বাধ্য করেন। অবশেষে যখন তারা শিবির স্থাপন করে, তখন সৈন্যরা এতটাই ক্লান্ত ছিল যে তারা সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২১৪ এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, নবীর নোবেল জীবন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩১৫-১৩১৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সারা রাত সৈন্যদের পদযাত্রা করিয়ে, মহানবী (সা.) তাদের কী ঘটেছিল তা নিয়ে আরও আলোচনা করতে ব্যস্ত করে তুলেছিলেন, কারণ এর ফলে কোনও ভালো ফল হত না। এটি ক্ষতিকারক এবং অকেজো জিনিস এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

জামে আত তিরমিযী, ২৩১৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম তার ইসলামকে উৎকৃষ্ট করতে পারে না যতক্ষণ না সে এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলে যা তার সাথে সম্পর্কিত নয়।

এই হাদিসে একটি সর্বব্যাপী উপদেশ রয়েছে যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত। এর মধ্যে একজন ব্যক্তির কথাবার্তার পাশাপাশি তার অন্যান্য শারীরিক কর্মকাণ্ডও অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ হল, যে মুসলিম তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে চায়, তাকে অবশ্যই সেইসব কথা এবং কাজের মাধ্যমে এড়িয়ে চলতে হবে যা তার সাথে সম্পর্কিত নয়। বরং তাকে সেইসব কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে যা তার সাথে সম্পর্কিত। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তার সাথে সম্পর্কিত দায়িত্বগুলি পালন করার জন্য একজনের উচিত, যা তার সাথে সম্পর্কিত, সেগুলিকে খুব গুরুত্ব সহকারে নেওয়া এবং তার সাথে থাকা দায়িত্বগুলি পালন করার চেষ্টা করা। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি সে তার নিজস্ব চিন্তাভাবনা বা ইচ্ছা অনুসারে জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে তবে সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে, সে সেইসব জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে যা ইসলাম এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে। অর্থ, তার সমস্ত কর্তব্য পালন করার, সমস্ত পাপ এবং ইসলামে অপছন্দনীয় জিনিসগুলি এড়িয়ে চলা এবং এমনকি অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসের অতিরিক্ত ব্যবহার এড়িয়ে চলা উচিত। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা হল সহীহ মুসলিমের ৯৯ নম্বর হাদিসে বর্ণিত ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের একটি বৈশিষ্ট্য। এটি তখনই হয় যখন কেউ এমনভাবে কাজ করে এবং আল্লাহ তাআলার উপাসনা করে যেন সে তাঁকে দেখতে পারে অথবা অন্তত তারা তাদের প্রতিটি চিন্তাভাবনা এবং কর্ম পর্যবেক্ষণ করে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন হয়। এই ঐশ্বরিক নজরদারি সম্পর্কে সচেতন থাকা একজন মুসলিমকে সর্বদা পাপ থেকে বিরত থাকতে এবং সৎকর্মের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। যে ব্যক্তি এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলে না যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয় সে এই শ্রেষ্ঠত্বের স্তরে পৌঁছাতে পারবে না।

মানুষের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলার একটি প্রধান দিক হল কথার সাথে সম্পর্কিত। বেশিরভাগ পাপ তখনই ঘটে যখন কেউ এমন কথা বলে যা

তার সাথে সম্পর্কিত নয়, যেমন গীবত এবং অপবাদ। অনর্থক কথার সংজ্ঞা হল যখন কেউ এমন কথা বলে যা পাপ নাও হতে পারে কিন্তু অকেজো এবং তাই তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়। সহীহ বুখারী, ২৪০৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে যেমন প্রমাণিত হয়েছে, অনর্থক কথা বলা আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন। অসংখ্য তর্ক, মারামারি এমনকি শারীরিক ক্ষতিও ঘটেছে কারণ কেউ এমন কিছু বলেছে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়। অনেক পরিবার বিভক্ত হয়ে গেছে; অনেক বিবাহ ভেঙে গেছে কারণ কেউ তাদের কাজে মনোযোগ দেয়নি। এই কারণেই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন ধরণের কার্যকর কথা বলার পরামর্শ দিয়েছেন যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত হওয়া উচিত। সূরা ৪ আন নিসা, আয়াত ১১৪:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনের বেশিরভাগের মধ্যেই কোন কল্যাণ নেই, তবে যারা দান-খয়রাতের নির্দেশ দেয়, সৎকর্মের নির্দেশ দেয় অথবা মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ কাজ করে, আমি তাকে বিরাট প্রতিদান দেব।"

প্রকৃতপক্ষে, এমন কথা বলা যা মানুষের জন্য উদ্বেগের বিষয় নয়, তা জাহান্নামে প্রবেশের প্রধান কারণ হবে। জামে আত তিরমিযী, ২৬১৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৪১২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, সকল কথাই একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে গণ্য হবে, যদি না তা সৎকাজের উপদেশ, মন্দকাজের নিষেধ বা মহান আল্লাহর স্মরণের সাথে সম্পর্কিত হয়। এর অর্থ হল, অন্য সকল ধরণের কথাবার্তা একজন ব্যক্তির উদ্বেগের বিষয় নয় কারণ এগুলি তার কোন উপকার করবে না। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সৎকাজের উপদেশ দেওয়ার মধ্যে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ব্যক্তির পার্থিব এবং ধর্মীয় জীবনে উপকারী, যেমন তার পেশা।

অতএব, মুসলমানদের উচিত কথা ও কাজের মাধ্যমে এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা যা তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করে। সহজ কথায়, যে ব্যক্তি এমন বিষয়গুলিতে সময় ব্যয় করে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়, সে সেই বিষয়গুলিতে ব্যর্থ হবে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত। আর যে ব্যক্তি এমন বিষয়গুলিতে নিজেকে ব্যস্ত রাখে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়, সে সেই বিষয়গুলিতে ব্যয় করার জন্য সময় পাবে না যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়। অর্থাৎ, তারা উভয় জগতেই মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করবে।

পরিশেষে, যে ব্যক্তি নিজেকে তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে ব্যস্ত রাখে, সে তার সমস্ত কার্যকর পার্থিব ও ধর্মীয় দায়িত্ব সম্পন্ন করবে এবং এর ফলে সে মানসিক শান্তি পাবে। মানসিক চাপের অন্যতম প্রধান উৎস হল যখন কেউ নিজেকে এমন বিষয়গুলিতে ব্যস্ত রাখে যা তার সাথে সম্পর্কিত নয়, কারণ এটি তাকে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়। সঠিক পদ্ধতিতে আচরণ করলে একজন ব্যক্তি তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলি সম্পন্ন করতে পারবেন এবং একই সাথে বিশ্রাম নেওয়ার এবং উপভোগ করার জন্য প্রচুর অবসর সময় পাবেন।

ভালো চিকিৎসা

দুই সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, যখন তারা একটি অভিযান থেকে ফিরে আসছিলেন, তাদের মধ্যে একটি ছোটখাটো ঝগড়া হওয়ার পর, মুনাফিকদের নেতা, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, এই সুযোগটি গ্রহণ করে আরও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দাবি করে যে মক্কার মুহাজিররা কেবল তাদের সমস্যা তৈরি করছে। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের বিরুদ্ধে আর কোনও পদক্ষেপ নেননি কারণ তিনি তার কথা অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর পুত্র, আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, যিনি একজন বিশ্বস্ত সাহাবী ছিলেন, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে এসে মদীনা শহর এবং তার নেতা, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার মন্দ কাজের জন্য তার মুনাফিক পিতাকে হত্যা করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি পরিবর্তে তার পিতা, মুনাফিকদের নেতা, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ক্ষমা করবেন এবং সদয় আচরণ করবেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 215-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সাথে সদয় আচরণ করেছিলেন কারণ এই আচরণ সর্বদা অন্যদের ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আরও কার্যকর।

জামে আত তিরমিযী, ২৭০১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে কোমলতা পছন্দ করেন।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা সকল মুসলমানের গ্রহণ করা উচিত। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা উচিত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, নম্রতা অন্য যে কারো চেয়ে মুসলমানদের জন্য বেশি উপকারী। একজন ভদ্র ব্যক্তি যখন কথা ও কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম রাখেন, তখন তারা কেবল মহান আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও প্রতিদানই পাবেন না এবং তাদের পাপের পরিমাণও কমিয়ে আনবেন না, কারণ একজন ভদ্র ব্যক্তি তার কথা ও কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম রাখেন, বরং এটি তাদের পার্থিব জীবনেও উপকৃত করবে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে কোমল আচরণ করে, সে তার স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণের চেয়ে বিনিময়ে বেশি ভালোবাসা এবং সম্মান পাবে। যখন তাদের সাথে কোমল আচরণ করা হয়, তখন সন্তানরা তাদের পিতামাতার বাধ্য হওয়ার এবং সম্মানের সাথে আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা তাদের সাথে কোমল আচরণকারীকে সাহায্য করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এর উদাহরণ অন্তহীন। খুব বিরল ক্ষেত্রেই কঠোর মনোভাব প্রয়োজন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, কঠোর মনোভাবের চেয়ে কোমল আচরণ অনেক বেশি কার্যকর হবে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অসংখ্য ভালো গুণাবলীর অধিকারী, তবুও মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর কোমলতা বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন, কারণ এটি অন্যদের ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯:

"অতএব আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের প্রতি কোমল ছিলে। আর যদি তুমি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতে, তাহলে তারা তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

একজন মুসলিমকে মনে রাখতে হবে যে তারা কখনই একজন নবীর চেয়ে ভালো হতে পারবে না, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, এবং যার সাথে তারা যোগাযোগ করবে সে ফেরাউনের চেয়ে খারাপও হতে পারবে না, তবুও, আল্লাহ, মহান নবী মুসা এবং নবী হারুন, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, ফেরাউনের সাথে সদয় আচরণ করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ৪৪:

"আর তার সাথে নম্রভাবে কথা বলো, হয়তো সে স্মরণ করবে অথবা [আল্লাহকে] ভয় করবে।"

কঠোরতা কেবল মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং অন্যদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে এটি একটি কঠোর এবং অশোধিত ধর্ম। এইভাবে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা একটি গুরুতর অপরাধ যা সকল মুসলমানের এড়িয়ে চলা উচিত।

অতএব, একজন মুসলিমের সকল বিষয়ে কোমলতা অবলম্বন করা উচিত কারণ এটি প্রচুর সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদের, যেমন তার পরিবারকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে মূল হাদিসটি এই অর্থ বহন করে না যে অন্যরা যখন সীমা অতিক্রম করে তখন আত্মরক্ষা করা উচিত নয়, কারণ ইসলাম দুর্বলতা ছাড়াই

নম্রতা শেখায়। তবে এটি মুসলমানদেরকে সাধারণভাবে ভদ্রতাকে তাদের পথ হিসেবে গ্রহণ করতে শেখায়, অন্যদের সুযোগ না দিয়ে।

পরিশেষে, একজনকে সর্বদা একটি সহজ ইসলামী দর্শন মনে রাখতে হবে, যেভাবে অন্যদের সাথে আচরণ করা হয়, আল্লাহ তার সাথেও তেমনই আচরণ করবেন। যদি কেউ অন্যদের প্রতি তাদের কথাবার্তা এবং কাজে কঠোরতা প্রদর্শন করে, তাহলে মহান আল্লাহ তার সাথেও একই আচরণ করবেন। অন্যদিকে, যদি তারা অন্যদের সাথে নম্রতার সাথে আচরণ করে, অন্যদের জন্য জিনিসপত্র সহজ করে, ভালো কাজে সাহায্য করে এবং অন্যদের ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে, তাহলে মহান আল্লাহ তার সাথেও একই আচরণ করবেন।

মহানবী (সাঃ) এর আনুগত্য

মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উবাই (রাঃ)-এর পুত্রের বহু বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তার পিতাকে হত্যা করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) সকলকে দেখিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করেন যে সম্মানিত ব্যক্তি হলেন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর মুনাফিক পিতা ছিলেন অসম্মানিত। একটি অভিযান শেষ করার পর, যখন তারা মদিনায় প্রবেশ করছিলেন, তখন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতাকে মদিনায় প্রবেশ করতে বাধা দেন, যতক্ষণ না মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁকে মদীনায় প্রবেশের জন্য মৌখিক অনুমতি দেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২১৫ এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর নোবেল জীবন", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩১৮-১৩১৯-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, সমগ্র সৃষ্টির আনুগত্যের চেয়ে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আনুগত্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, ঠিক যেমনটি করেছিলেন, ঠিক তেমনই নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন ও শিক্ষা শেখা এবং সে অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে তাদের নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং সম্মান করার মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করা উচিত। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এবং ৫৯তম অধ্যায় আল হাশর, ৭ম আয়াত:

"...আর রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো; আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো..."

এবং অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৮০:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

এবং অধ্যায় ৩৩ আল আহযাব, আয়াত ২১:

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে একটি চমৎকার আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"

তাঁর পবিত্র চরিত্রের অনুকরণে তাদের চরিত্রকে গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং উদারতার মতো ভালো গুণাবলী গ্রহণ করে এবং হিংসা, অহংকার এবং লোভের মতো নেতিবাচক গুণাবলী পরিত্যাগ করে। এটি তাদের মানসিক শান্তি নিশ্চিত করবে, কারণ ইতিবাচক গুণাবলী গ্রহণের ফলে ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে শেখা এবং তার উপর আমল করা, বহির্বিশ্বের কাছে তাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা নিশ্চিত করবে। যে ব্যক্তি এটি করতে ব্যর্থ হয় সে অনিবার্যভাবে তাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করবে এবং অমুসলিম এবং অন্যান্য মুসলিমদের ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করা থেকে বিরত রাখবে। তাঁর ভুল উপস্থাপনের ফলে বহির্বিশ্ব মুসলমানদের খারাপ আচরণ পর্যবেক্ষণ করলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমালোচনা করবে। এটি এমন একটি বিষয় যা প্রতিটি মুসলিমকে জবাবদিহি করতে হবে কারণ তাদের উপর কর্তব্য হলো আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে বহির্বিশ্বের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা।

উপরন্তু, পূর্ববর্তী জাতিগুলি যারা তাদের পবিত্র নবীদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভালোবাসার দাবি করে, তারা যেমন আখেরাতে তাদের সাথে মিলিত হবে না কারণ তারা কার্যত তাদের অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তেমনি যে মুসলিমরা কার্যত নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তারাও আখেরাতে তাঁর সাথে মিলিত হবে না। বরং, একজন ব্যক্তি তাদের সাথে মিলিত হবে যাদের তারা এই পৃথিবীতে কার্যত অনুকরণ করেছিল। সুনান আবু দাউদের ৪০৩১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

নিজের উপকার করো

মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উবাই (রাঃ)-এর পুত্রের, তাঁর বহু বিশ্বাসঘাতকতার জন্য, তাঁর পিতাকে হত্যা করার প্রস্তাব নবী মুহাম্মদ (সাঃ) প্রত্যাখ্যান করার পর, মদীনার লোকেরা আবদুল্লাহ বিন উবাই যখনই খারাপ আচরণ করত, তখনই তার সমালোচনা করতে শুরু করে। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যখন এই কথা শুনতে পান, তখন তিনি উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-কে, যিনি আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, মন্তব্য করেন যে, যদি তিনি আগে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আদেশ দিতেন, তবে কিছু লোক তাকে রক্ষা করত, যেখানে এখন, যদি তিনি তাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিতেন, তাহলে লোকেরা তা পালন করতে দ্বিধা করত না। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২১৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানদের এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যখন তারা অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করে, তখন তা বাস্তবে তাদের নিজেদেরই উপকার করে, অন্যদের নয়। কারণ, অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করার নির্দেশ মহান আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করলে এক ধরনের সওয়াব পাওয়া যায়।

এছাড়াও, যখন কেউ অন্যের প্রতি সদয় হয়, তখন তারা জীবিত অবস্থায় তাদের জন্য দুআ করবে যা তাদের উপকার করবে। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিমের ৬৯২৯ নম্বর হাদিসে মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, গোপনে কারো জন্য করা দুআ সর্বদা কবুল করা হয়।

অধিকন্তু, মানুষ তাদের মৃত্যুর পর তাদের জন্য প্রার্থনা করবে যা অবশ্যই কবুল করা হবে যেমনটি পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে। সূরা আল হাশর, আয়াত ১০:

"...এই বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের এবং আমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদার ভাইদের ক্ষমা করুন..."

পরিশেষে, যে ব্যক্তি অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করে, সে কিয়ামতের দিন তাদের সুপারিশ লাভ করবে, যেদিন মানুষ অন্যদের সুপারিশের জন্য ব্যাকুল হবে। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত ৭৪৩৯ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিন্তু যারা অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, এমনকি যদি তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে, তবুও তারা পূর্বে উল্লিখিত সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত হবে। এবং বিচারের দিন তারা দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে। যদি তারা তা না করতে চায়, তাহলে অত্যাচারীর নেক আমল তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে শিকারের পাপ তাদের অত্যাচারীকে দেওয়া হবে। এর ফলে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের প্রতি সদয় হয়ে নিজের প্রতি সদয় হওয়া, কারণ বাস্তবে তারা কেবল এই দুনিয়া এবং আখেরাতে নিজেদেরই উপকার করছে। সূরা ২৯, আল আনকাবুত, আয়াত ৬:

"আর যে চেষ্টা করে, সে কেবল নিজের জন্যই চেষ্টা করে..."

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রাঃ) কে বিয়ে করেন

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের ষষ্ঠ বছরে, তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ বনু আল মুস্তালিকের বিরুদ্ধে একটি অভিযানে বের হন। এই অভিযানের ফলে অনেক গনীমতের মাল এবং যুদ্ধবন্দী দখল করা হয়। এই যুদ্ধবন্দীদের সাহাবীগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস বিন আবু দিরার, বনু আল মুস্তালিকের নেতার কন্যা ছিলেন এবং তাকেও বন্দী করে একজন সাহাবীর কাছে হস্তান্তর করা হয়, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। তিনি তার কাছ থেকে তার মুক্তি কিনতে রাজি হন এবং মহানবী (সাঃ) এর সাহায্য প্রার্থনা করেন। মহানবী (সাঃ) তার চরিত্রের প্রশংসা করেন এবং তাকে স্বাধীনতা কিনে তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। যখন তিনি রাজি হন এবং সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, এই বিবাহের কথা শুনতে পান, তখন তারা যুদ্ধবন্দীদের ধরে রাখতে লজ্জা পান যারা এখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর আত্মীয় ছিল এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের সকলকে মুক্ত করে দেন। যখন তার বাবা, বনু আল মুস্তালিকের নেতা, ঘটনাটি জানতে পারলেন, তখন তিনি মদিনায় প্রবেশ করলেন এবং তার গোত্রের সকল সদস্যের সাথে ইসলাম গ্রহণ করলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর (সা.)-এর নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩১০-১৩১১-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনায় মহানবী (সাঃ) এর বিচক্ষণ দূরদর্শিতার প্রশংসা করা যেতে পারে। তিনি জানতেন যে গোত্রপতির কন্যার সাথে বিবাহ তার গোত্রের হৃদয়কে নরম করবে এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে ঝুঁকে ফেলবে। সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করার সিদ্ধান্ত এই কৌশলকে আরও শক্তিশালী করে এবং ফলস্বরূপ পুরো গোত্রটি মুক্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। মহানবী

(সাঃ) বিদেশী গোত্রের মহিলাদের সাথে বিবাহ করেছিলেন এই কারণেই, কিছু বিভ্রান্ত লোকের দাবি অনুসারে তাঁর শারীরিক কামনা-বাসনা পূরণের জন্য নয়। এর আরও সমর্থন এই সত্য দ্বারা পাওয়া যায় যে তাঁর সমগ্র যৌবনকালে, একজন ব্যক্তির শারীরিক কামনা-বাসনার উচ্চতায়, তিনি একাধিক মহিলাকে বিবাহ করার অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও, খাদিজা (রাঃ) নামে এক অবিবাহিত মহিলার সাথে বিবাহিত ছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর অপবাদ

একটি প্রকাশ্য অপবাদ

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের ষষ্ঠ বছরে, তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ বনু আল মুস্তালিকের বিরুদ্ধে অভিযানে যান। তাঁর স্ত্রী আয়েশা বিনতে আবু বকর (রাঃ)ও তাঁর সাথে ছিলেন। ভ্রমণের সময় মহিলারা একটি ছোট বগির ভেতরে বসতেন যা উটের উপর রাখা হত এবং বেঁধে রাখা হত। সেনাবাহিনী যখন শিবির স্থাপন করে, তখন আয়েশা (রাঃ) নিজেকে মুক্ত করার জন্য বেরিয়ে যান এবং শিবিরে ফিরে আসেন। ফিরে আসার পর তিনি লক্ষ্য করেন যে তার গলার হার হারিয়ে গেছে। তারপর তিনি তার পায়ের ছাপ ধরে পিছনে ফিরে যান যতক্ষণ না তিনি এটি খুঁজে পান। যখন তিনি আবার শিবিরে ফিরে আসেন, তখন তিনি দেখতে পান যে তারা তাকে ছাড়াই চলে গেছে। এটি ঘটেছিল যখন তার বগিটি উটের উপর রাখার এবং বাঁধার দায়িত্বে থাকা লোকেরা ধরে নিয়েছিলেন যে তিনি ইতিমধ্যেই ভিতরে আছেন। তিনি পরিত্যক্ত শিবিরে ছিলেন যতক্ষণ না একজন সাহাবী, সাফওয়ান বিন মু'আত্তাল (রাঃ) পাশ দিয়ে গিয়ে তাকে দেখতে পান। তাকে সেনাবাহিনীর পিছনে থাকার এবং ভ্রমণকারী সেনাবাহিনীর কাছ থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে পড়ে যাওয়া যেকোনো জিনিসপত্র তুলে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে চিনতে পেরেছিলেন, কারণ ইসলামে মহিলাদের পর্দা করা বাধ্যতামূলক হওয়ার আগে তিনি তাকে দেখেছিলেন। তিনি শ্রদ্ধার সাথে তার উটটি তাকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার জন্য অর্পণ করেছিলেন। যখন তারা সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছায়, লোকেরা আয়েশা (রাঃ)-কে শিবিরস্থলে প্রবেশ করতে দেখে। মুনাফিকরা এই সুযোগে তার সম্পর্কে খারাপ অপবাদ ছড়িয়ে দেয় এবং লোকেরা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে পড়ে। সহিহ বুখারীতে ৪৭৫০ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৯৩ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) গীবত ও অপবাদের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন।

গীবত হলো যখন কেউ কারো অনুপস্থিতিতে এমনভাবে সমালোচনা করে যা তাদের কাছে অপছন্দনীয় হবে, যদিও এটি সত্য। অন্যদিকে, গীবত করা গীবের অনুরূপ, তবে বিবৃতিটি সত্য নয়। এই পাপগুলি মূলত কথার সাথে জড়িত তবে অন্যান্য জিনিসও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, যেমন হাতের ইশারা ব্যবহার করা। এগুলি উভয়ই কবীরা পাপ এবং পবিত্র কুরআনে গীবতকে নিজের ভাইয়ের মৃতদেহের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১২:

"... আর তোমরা একে অপরের গুপ্তচরবৃত্তি করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার ভাইয়ের মৃতদেহ খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তা ঘৃণা করবে..."

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই পাপগুলি একজন ব্যক্তি এবং আল্লাহ তাআলার মধ্যে হওয়া বেশিরভাগ পাপের চেয়েও খারাপ। কারণ, যদি পাপী আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়, তাহলে একজন ব্যক্তি এবং আল্লাহ তাআলার মধ্যেকার পাপ তিনি ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা, একজন গীবতকারী বা নিন্দুককে ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না তার শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে। যদি তারা তা না করে, তাহলে বিচারের দিন গীবতকারী/নিন্দুকের নেক আমলগুলি ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাদের গীবতকারী/নিন্দুককে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত গীবতকারী/নিন্দুকের পাপগুলি তাদের গীবতকারী/নিন্দুককে দেওয়া হবে। এর

ফলে গীবতকারী/নিন্দুককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

গীবত তখনই বৈধ যখন কেউ অন্য ব্যক্তিকে সতর্ক করে এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা করে অথবা যদি কেউ তৃতীয় পক্ষের কাছে অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ নিষ্পত্তি করে, যেমন আইনি মামলা।

প্রথমত, এই কবীরা পাপের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে গীবত ও অপবাদ এড়িয়ে চলা উচিত। দ্বিতীয়ত, একজন ব্যক্তির কেবল সেইসব কথা বলা উচিত যা সে আনন্দের সাথে ব্যক্তির সামনে বলবে, যদিও সে জানে যে সে তা আপত্তিকরভাবে নেবে না। তৃতীয়ত, একজন মুসলিমের অন্য ব্যক্তির সম্পর্কে কেবল তখনই কথা বলা উচিত যদি অন্য কেউ তার সম্পর্কে ঐ বা অনুরূপ কথা বলতে আপত্তি না করে। অর্থাৎ, তাদের অন্যদের সম্পর্কে সেভাবেই কথা বলা উচিত যেভাবে তারা চায় লোকেরা তাদের সম্পর্কে কথা বলুক। পরিশেষে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের নিজেদের দোষ সংশোধনের দিকে মনোনিবেশ করা এবং যখন আন্তরিকভাবে করা হয়, তখন এটি তাকে অন্যদের গীবত ও অপবাদ থেকে বিরত রাখবে।

গীবতকারী এবং নিন্দুকদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ তারা ঝামেলা সৃষ্টিকারী, যারা আজ হোক কাল হোক, তাদের গীবত বা অপবাদ দেবে। তাদের উচিত এই বড় পাপ থেকে অন্যদের সাবধান করা, যতক্ষণ না তারা শারীরিক ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে। তাদের কখনই অন্যদের সম্পর্কে বলা পরচর্চা বিশ্বাস করা উচিত নয়, কারণ বেশিরভাগ পরচর্চা হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা অথবা এতে অনেক মিথ্যা মিশে আছে। বরং অন্যদের সম্মান রক্ষা করা উচিত, ঠিক যেমন তারা চায় যে লোকেরা তাদের

অনুপস্থিতিতে তাদের সম্মান রক্ষা করুক। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে তাকে মহান আল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। জামে আত তিরমিযী, ১৯৩১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অন্যদের সম্পর্কে শোনা পরচর্চা উপেক্ষা করা উচিত এবং কখনও তাদের প্রতি তাদের আচরণকে প্রভাবিত করতে দেওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের অধিকার পূরণ করা।

একজন মুসলিমের কখনোই এই সত্য দেখে বোকা হওয়া উচিত নয় যে, অন্যের গীবত করা এবং অপবাদ দেওয়া সমাজে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। অন্যের পাপ কখনোই মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে তার পাপের তীব্রতা কমাতে পারবে না, এবং অন্যের পাপও পাপ করার ন্যায্যতা প্রমাণ করতে পারবে না। এটি একটি বোকামিপূর্ণ মনোভাব যা একজন পার্থিব বিচারকও গ্রহণ করবেন না, তাহলে একজন মুসলিম কীভাবে আশা করতে পারে যে বিচারকদের বিচারক, মহান আল্লাহ তা'আলা এটি গ্রহণ করবেন?

ইতিবাচক চিন্তা করা

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের ষষ্ঠ বছরে, মুনাফিকরা মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর উপর অপবাদ দেওয়ার সুযোগ নেয়। কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্যদের সাথে এই অপবাদ সম্পর্কে কথা বলেন, যার ফলে মদিনায় এই অপবাদ আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সহীহ বুখারী (৪৭৫০) -এ প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদি কেউ গুজব সম্পর্কে কথা বলতে চান, তাহলে তা সর্বদা ইতিবাচকভাবে বলতে হবে যাতে অন্যায়ের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের রক্ষা করা যায়, অন্যথায়, একজন মুসলিমকে বিষয়টি সম্পর্কে নীরব থাকতে হবে।

সুনানে আবু দাউদের ৪৯৯৩ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা আল্লাহর ইবাদতের একটি দিক, অর্থাৎ, এটি আল্লাহর আনুগত্যের একটি দিক।

নেতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করা প্রায়শই পাপের দিকে পরিচালিত করে, যেমন গীবত এবং অপবাদ। একজন মুসলিমের উচিত যেখানেই সম্ভব ইতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করা যাতে অন্যদের সন্দেহের সুবিধা দেওয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশত, নেতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করা পরিবার থেকে শুরু করে জাতীয় স্তরের সকলের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একটি জাতি কতবার অনুমান এবং সন্দেহের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে? মিডিয়াতে পাওয়া বেশিরভাগ কেলেঙ্কারি অনুমানের উপর ভিত্তি করে।

এমনকি আইন তৈরি করা হয়েছে যা অনুমান এবং সন্দেহের ব্যবহারকে সমর্থন করে। এটি প্রায়শই ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্ক তৈরি করে কারণ এই মানসিকতার লোকেরা সর্বদা বিশ্বাস করে যে অন্যরা তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে তাদের সমালোচনা করছে। এটি একজনকে অন্যদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে বাধা দেয়, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে পরামর্শদাতা কেবল তাদের উপহাস করছে এবং এটি একজনকে পরামর্শ দিতে বাধা দেয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে অন্য ব্যক্তি তাদের কথার প্রতি কোন মনোযোগ দেবে না। এবং একজন ব্যক্তি যার এই নেতিবাচক মানসিকতা আছে তাকে পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকবে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটি কেবল তর্কের দিকে পরিচালিত করবে। এর ফলে অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়, যেমন তিক্ততা।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ যদি তাদের সমালোচনা করে বলে ধরে নেয়, তবুও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত যদি তা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে হয়।

সবসময় নেতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করার ফলে এক ধরণের শক্তিশালী মানসিক অসুস্থতা দেখা দেয়, যার নাম প্যারানয়া। যে প্যারানয়া গ্রহণ করে সে সবসময় অন্যদের খারাপ জিনিসের ব্যাপারে সন্দেহ করবে। এটি বিবাহের মতো সম্পর্কের জন্য অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক হতে পারে।

সম্ভব হলে ইতিবাচক উপায়ে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত, যা ইতিবাচক মানসিকতার দিকে পরিচালিত করে। এবং একটি ইতিবাচক মানসিকতা সুস্থ সম্পর্ক, অনুভূতি এবং ঐক্যের দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, সর্বদা নেতিবাচক উপায়ে বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা একজনকে সর্বদা অন্যদের প্রতি নেতিবাচক

চিন্তাভাবনা এবং আচরণ করতে উৎসাহিত করে, এমনকি যখন তাদের আচরণ ভালো হয়। এটি কেবল অন্যদের অধিকার পূরণ করতে বাধা দেয়, যা মহান আল্লাহ কর্তৃক আদেশ করা হয়েছে। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১২:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক [নেতিবাচক] অনুমান থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই কিছু অনুমান পাপ..."

ভালো আচরণ

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের ষষ্ঠ বছরে, মুনাফিকরা মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর উপর অপবাদ আরোপ করার সুযোগ নেয়। মদিনায় ফিরে আসার পর, আয়েশা (রাঃ)-এর উপর অপবাদ আরোপ করা শুরু হয়। মদিনায় যে অপবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল, তা কেউ তাকে জানায়নি, যা ইতিমধ্যে তার পুরো পরিবারে পৌঁছে গেছে। তিনি কেবল লক্ষ্য করেছিলেন যে, মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি আবেগগতভাবে তার চেয়ে অনেক দূরে ছিলেন, কিন্তু তিনি তার প্রতি তার চমৎকার আচরণ বজায় রেখেছিলেন। সহীহ বুখারীতে ৪৭৫০ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর থেকে আবেগগতভাবে দূরে ছিলেন, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, কারণ তিনি ভয় পেতেন যে তার সাথে অতিরিক্ত মেলামেশা করলে তিনি বুঝতে পারবেন যে কিছু ভুল আছে এবং তার বিরুদ্ধে অপবাদ তাকে আরও অসুস্থ করে তুলবে। একজন স্বামী/স্ত্রী সবসময় সমস্যাগুলি বুঝতে পারে, এমনকি যদি তার স্বামী তাদের কাছ থেকে তা গোপন করার চেষ্টা করেও। ফলস্বরূপ, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে তার যোগাযোগ সীমিত করে অপবাদ গোপন করার চেষ্টা করেছিলেন।

এই ঘটনাটি অন্যদের সাথে, বিশেষ করে আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্মান ও সদয় আচরণের গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। জামে আত তিরমিযী, ২৬১২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যার পূর্ণ ঈমান আছে, সে ব্যক্তিই উত্তম আচরণকারী এবং পরিবারের প্রতি সবচেয়ে সদয়।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ আত্মীয়স্বজনবিহীনদের সাথে সদয় আচরণ করার খারাপ অভ্যাস গ্রহণ করেছে, অন্যদিকে তাদের নিজেদের পরিবারের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে। তারা এই আচরণ করে কারণ তারা নিজের পরিবারের সাথে সদয় আচরণ করার গুরুত্ব বোঝে না এবং তাদের পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। একজন মুসলিম কখনোই সফল হতে পারে না যতক্ষণ না তারা ঈমানের উভয় দিকই পূরণ করে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করা, তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত সমস্ত আশীর্বাদকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে।

দ্বিতীয়ত, মানুষের অধিকার পূরণ করা, যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। নিজের পরিবারের চেয়ে এই সদয় আচরণের অধিকার আর কারো নেই। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের পরিবারকে সকল ভালো বিষয়ে সাহায্য করা এবং মন্দ কাজ ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে ভদ্রভাবে সতর্ক করা। তাদের উচিত কেবল আত্মীয় বলে তাদের খারাপ কাজে অন্ধভাবে সমর্থন করা নয় এবং তাদের প্রতি কিছু খারাপ অনুভূতির কারণে তাদের ভালো বিষয়ে সাহায্য করতে ব্যর্থ হওয়া উচিত নয়, কারণ এটি ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। অধ্যায় ৫ আল মায়িদা, আয়াত ২:

"...এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

অন্যদের পথ দেখানোর সর্বোত্তম উপায় হল ব্যবহারিক উদাহরণের মাধ্যমে, কারণ এটিই মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য এবং এটি কেবল মৌখিক নির্দেশনার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর।

একজনকে অবশ্যই অন্যদের, বিশেষ করে তাদের আত্মীয়স্বজনের, প্রতি তাদের প্রাপ্য অধিকারগুলি শিখতে হবে যাতে তারা তা পূরণ করতে পারে। একজন মুসলিমকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবেন যে তারা অন্যদের অধিকার পূরণ করেছে কিনা, তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করবেন না যে লোকেরা তাদের অধিকার পূরণ করেছে কিনা। অতএব, একজনকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে তাদের কী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, অর্থাৎ অন্যদের অধিকার, এবং তাই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সেগুলি পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

পরিশেষে, সকল বিষয়ে, বিশেষ করে পরিবারের সাথে আচরণের সময়, একজনের উচিত সাধারণত নম্রতা বেছে নেওয়া। এমনকি যদি তারা পাপ করেও থাকে, তবুও তাদের ভদ্রভাবে সতর্ক করা উচিত এবং ভালো কাজে সহায়তা করা উচিত, কারণ এই দয়া তাদের সাথে কঠোর আচরণ করার চেয়ে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে আনতে বেশি কার্যকর।

অন্যদের সান্ত্বনা দেওয়া

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের ষষ্ঠ বছরে, মুনাফিকরা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর উপর অপবাদ দেওয়ার সুযোগ নেয়। মদিনায় ফিরে এসে আয়েশা (রাঃ)-এর অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে যায় এবং তিনি তার আরোগ্য লাভের জন্য তার পিতামাতার বাড়িতে চলে যান। অপবাদ সম্পর্কে জানতে পেরে, তিনি তার মাকে জিজ্ঞাসা করেন কেন তিনি তার কাছ থেকে অপবাদ গোপন করেছিলেন। তার মা তাকে সান্ত্বনা দেন এবং তাকে অপবাদকে গুরুত্বের সাথে না নেওয়ার পরামর্শ দেন, কারণ লোকেরা সবসময় তাদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলে যারা তার মতো আশীর্বাদপ্রাপ্ত। সহীহ বুখারীতে ৪৭৫০ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

অন্যদের মানসিকভাবে সান্ত্বনা দেওয়া ইসলামের একটি দিক যা অবশ্যই পালন করা উচিত।

সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৬০১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি শোকাহত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেয়, তাকে বিচারের দিন সম্মানের পোশাক পরানো হবে।

যেহেতু সকলের জন্যই অসুবিধার মুখোমুখি হওয়া নিশ্চিত, তাই এটি একটি মহান সওয়াব অর্জনের একটি অত্যন্ত সহজ উপায় যার জন্য খুব বেশি সময়, শক্তি বা অর্থের প্রয়োজন হয় না। এর মধ্যে রয়েছে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী, যেমন মানসিক,

আর্থিক এবং শারীরিক সহায়তা, সমস্যার সম্মুখীন পরিবারকে সাহায্য করার চেষ্টা করা। একজন মুসলিমের উচিত কঠিন সময়ে ধৈর্য ধারণ করতে এবং পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদিস স্মরণ করিয়ে দেওয়া, যেখানে ধৈর্য ধরার গুরুত্ব এবং মহান প্রতিদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের ইতিবাচক কথা বলা উচিত, তাদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে জিনিসগুলি কেবল একটি ভাল কারণেই ঘটে, এমনকি যদি লোকেরা এর পিছনের প্রজ্ঞা বুঝতে ব্যর্থ হয়। বাস্তবে, এই সৎকর্মটি করার জন্য একজন ব্যক্তির পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অসুবিধার সম্মুখীন ব্যক্তিকে আরও ভালো বোধ করার জন্য কয়েকটি সদয় কথা যথেষ্ট। এবং কিছু ক্ষেত্রে কেবল শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকাই তাদের সমর্থনের অনুভূতি প্রদানের জন্য যথেষ্ট, এমনকি যদি কোনও শব্দ নাও বলা হয়।

এই মনোভাব সহজেই গৃহীত হয় যখন কেউ অন্যদের সাথে সেই আচরণ করে যেভাবে তারা মানুষের কাছ থেকে আচরণ পেতে চায়।

পরিশেষে, মুসলিমদের জন্য এই নেক আমল করার সময় তাদের নিয়ত সংশোধন করা গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ, এটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা উচিত, এবং অন্যদের, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে লোক দেখানোর জন্য করা উচিত নয়, অথবা যদি তারা এটি করতে ব্যর্থ হয় তবে অন্যদের দ্বারা সমালোচিত হওয়ার ভয়ে এটি করা উচিত নয়। যারা অন্যদের জন্য কাজ করে, তাদের বিচারের দিন বলা হবে যে তারা তাদের সেই কাজের প্রতিদান পাবে যা তারা করতে পারে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

গুজব ছড়ানো

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের ষষ্ঠ বছরে, মুনাফিকরা মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর উপর অপবাদ দেওয়ার সুযোগ নেয়। মদিনায় ফিরে এসে আয়েশা (রাঃ)-এর অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে যায় এবং তিনি তার আরোগ্য লাভের জন্য তার পিতামাতার বাড়িতে চলে যান। মহানবী (সাঃ) জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং জনসমক্ষে জিজ্ঞাসা করেন কেন লোকেরা তাঁর পরিবার এবং সাহাবী সাফওয়ান বিন মু'আত্তাল (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ ও অপবাদ ছড়াচ্ছে। সহীহ বুখারীতে ৪৭৫০ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি স্পষ্ট করে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর স্ত্রী বা তাঁর সাহাবী (রাঃ)-এর প্রতি সন্দেহ করেননি, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। এটি অন্যদের সন্দেহের সুযোগ দেওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যদি না তাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ থাকে। গুজবের উপর ভিত্তি করে কাজ করা উচিত নয় এবং স্পষ্ট প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তাদের অনুভূতি এবং কর্মকাণ্ড গড়ে তোলা উচিত। তা না করলে অন্যান্য পাপের দিকে পরিচালিত হয়, যেমন গীবত, পরচর্চা, গুপ্তচরবৃত্তি এবং অন্যদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করা।

এছাড়াও, আলোচিত মূল ঘটনাটি পরচর্চা ছড়ানোর বিরুদ্ধেও সতর্ক করে। সহীহ মুসলিমের ২৯০ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি পরচর্চা ছড়ায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এই সেই ব্যক্তি যে গুজব ছড়ায়, তা সত্য হোক বা মিথ্যা, যা মানুষের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করে এবং সম্পর্ক ভাঙার দিকে পরিচালিত করে। এটি একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য এবং যারা এই ধরণের আচরণ করে তারা আসলে মানব শয়তান, কারণ এই মানসিকতা অন্য কারও নয় বরং শয়তানের। সে সর্বদা মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এই ধরণের ব্যক্তির উপর অভিশাপ দিয়েছেন। সূরা ১০৪ আল হুমাযাহ, আয়াত ১:

"প্রত্যেক গীবতকারী ও নিন্দুকের জন্য দুর্ভোগ।"

যদি এই অভিশাপ তাদের ঘিরে ফেলে, তাহলে মহান আল্লাহ কীভাবে তাদের সমস্যার সমাধান করবেন এবং তাদের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করবেন বলে আশা করা যায়? যখন কেউ অন্যদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে, তখনই কেবল গল্প বলা গ্রহণযোগ্য।

একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো, কোন গুজবকারীর প্রতি মনোযোগ না দেওয়া, কারণ তারা দুষ্ট লোক যাদের বিশ্বাস করা উচিত নয়। ৪৯তম অধ্যায় আল হুজুরাত, আয়াত ৬:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তা পরীক্ষা করে দেখো, যাতে অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি না হয়..."

এবং ২৪ নুর অধ্যায়, ১২ নং আয়াত:

"তোমরা যখন এটা শুনলে, তখন কেন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা নিজেদের [অর্থাৎ একে অপরের] সম্পর্কে ভালো ধারণা করেনি এবং বলেনি যে, "এটা স্পষ্ট মিথ্যা"?"

একজন মুসলিমের উচিত অপবাদদাতাকে এই খারাপ চরিত্রের সাথে চলতে নিষেধ করা এবং তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করা। পবিত্র কুরআনে যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, একজন মুসলিমের উচিত তার বিরুদ্ধে কোনও বিদ্বেষ পোষণ করা উচিত নয় যে তার সম্পর্কে বা অন্যদের সম্পর্কে খারাপ কিছু বলেছে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক [নেতিবাচক] অনুমান থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই কিছু অনুমান পাপ..."

এই একই আয়াত মুসলমানদের শিক্ষা দেয় যে, অন্যদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করে গল্পকারকে প্রমাণ বা মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। অধ্যায় ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১২:

"...এবং গুপ্তচরবৃত্তি করো না..."

বরং গল্পকারীকে উপেক্ষা করা উচিত। একজন মুসলিমের গল্পকারীর দেওয়া তথ্য অন্য কাউকে বলা উচিত নয় অথবা গল্পকারীর নাম উল্লেখ করা উচিত নয় কারণ এতে সেও গল্পকারী হয়ে যাবে।

মুসলমানদের গল্প বলা এবং গল্প বলার লোকদের সাথে মেলামেশা করা এড়িয়ে চলা উচিত কারণ তারা কখনই বিশ্বাস বা সাহচর্যের যোগ্য হতে পারে না যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। মনে রাখা উচিত যে, যে ব্যক্তি অন্যের সাথে অন্যের সম্পর্কে কথা বলে, সে অন্যের সাথেও সেই ব্যক্তির সম্পর্কে কথা বলবে।

পরিশেষে, যেহেতু গল্পকারী মানুষের সাথে অন্যায় করেছে, তাই তাদের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা প্রথমে তাদের ক্ষমা না করা পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। যেহেতু মানুষ এতটা করুণাময় এবং ক্ষমাশীল নয়, এর ফলে গল্পকারী তাদের নেক আমল তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের কাছে দান করতে পারে এবং প্রয়োজনে, গল্পকারী তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের পাপ গ্রহণ করবে। এর ফলে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই সতর্কীকরণ করা হয়েছে। পরিশেষে, জান্নাত হারানোর মূল হাদিসে যে সতর্কীকরণ করা হয়েছে তা একজন গল্পকারীর জন্য সহজেই ঘটতে পারে, কারণ তারা যে বিদ্বেষপূর্ণ কথাবার্তা শুরু করেছে তা সহজেই সমাজে এমনকি সারা বিশ্বে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফলস্বরূপ, যে গল্পকারী এই গল্পটি শুরু

করেছে সে এই গল্পটি নিয়ে আলোচনা করা প্রতিটি ব্যক্তির পাপের ভাগীদার হবে। এবং মৃত্যুর পরেও তাদের পাপ বাড়তে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের শুরু করা কথাটি নিয়ে আলোচনা চলতে থাকবে। জামে আত তিরমিযিতে ২৬৭৪ নম্বর হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে।

অতএব, এই বিপজ্জনক পরিণতি এড়াতে হবে, সর্বদা অন্যদের সম্পর্কে পরচর্চা এড়িয়ে চলতে হবে, ঠিক যেমন তারা অন্যদের সম্পর্কে পরচর্চা করা অপছন্দ করে। যদি কাউকে অন্যদের সম্পর্কে কথা বলতেই হয়, তাহলে তাদের তা ইতিবাচকভাবে করা উচিত, অন্যথায় তাদের চুপ থাকা উচিত।

ঐক্যকে কলুষিত করছে

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের ষষ্ঠ বছরে, মুনাফিকরা মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর উপর অপবাদ দেওয়ার সুযোগ নেয়। মদিনায় ফিরে এসে আয়েশা (রাঃ)-এর অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে যায় এবং তিনি তার আরোগ্য লাভের জন্য তার পিতামাতার বাড়িতে চলে যান। মহানবী (সাঃ) জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং প্রকাশ্যে প্রশ্ন তোলেন কেন লোকেরা তাঁর পরিবার এবং সাহাবী সাফওয়ান বিন মু'আত্তাল (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়াচ্ছে। এই ভাষণের পর সাহাবীরা (রাঃ)-এর উপর এই অপবাদের ফলে নবী (সাঃ)-এর উপর যে কষ্ট নেমেছে তা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। কিন্তু মুনাফিকরা তাদের অবিশ্বাস ও শত্রুতা গোপন করার কারণে তাদের শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং এই চাপের কারণে কিছু সাহাবীও একে অপরের সাথে তর্ক করতে শুরু করেন যে এই অপবাদের জন্য কে দায়ী। সহীহ বুখারী, ৪৭৫০ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ভণ্ডামির লক্ষণ হলো, একজন ব্যক্তি সমাজে দুর্নীতি ছড়িয়ে দেয়। এই নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য পারিবারিক ইউনিট থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক স্তরে শেষ পর্যন্ত সকল সামাজিক স্তরকে প্রভাবিত করে। এই ধরণের ব্যক্তি ভালোর জন্য একত্রিত হতে দেখতে অপছন্দ করে কারণ এর ফলে অন্যদের পার্থিব মর্যাদা তাদের নিজেদের চেয়েও বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি তাদের গীবত এবং অপবাদের দিকে ঠেলে দেয় যাতে মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে চলে যায়। তাদের মন্দ মনোভাব তাদের নিজস্ব আত্মীয়তার বন্ধন ধ্বংস করে এবং যখন তারা অন্য পরিবারগুলিকে সুখী দেখতে পায় তখন তাদের সুখও নষ্ট করে। তারা দোষ খুঁজে বের করার লোক যারা তাদের সামাজিক মর্যাদাকে টেনে নামানোর জন্য অন্যদের ভুল উন্মোচন করার জন্য তাদের সময় ব্যয় করে। তারাই প্রথম ব্যক্তি যারা অন্যদের সম্পর্কে পরচর্চা শুরু করে এবং ভালো কথা বলা হলে বধির আচরণ করে। শান্তি ও নীরবতা তাদের বিরক্ত করে তাই তারা নিজেদের মনোরঞ্জনের জন্য সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করে। তারা সুনান

ইবনে মাজাহ, ২৫৪৬ নম্বরে পাওয়া হাদিসটি মনে রাখতে ব্যর্থ হয়। এটি পরামর্শ দেয় যে যে কেউ অন্যের দোষ ঢেকে রাখে, আল্লাহ, তার দোষ ঢেকে রাখবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করে এবং প্রকাশ করে, আল্লাহ তাআলা তার দোষ-ত্রুটি মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবেন। সুতরাং, বাস্তবে, এই ধরণের ব্যক্তি কেবল সমাজের কাছে নিজের দোষ-ত্রুটিই প্রকাশ করছে, যদিও তারা বিশ্বাস করে যে তারা অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করছে।

এছাড়াও, আলোচিত মূল ঘটনাটি এমন বিষয়গুলিতে নীরব থাকার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে যেখানে কেউ স্পষ্ট প্রমাণ বা তথ্য প্রদান করতে পারে না যা সমস্যার সমাধান করতে পারে। সমাধান না দিয়ে সমাজের অভ্যন্তরে সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা কেবল মানুষের জন্য আরও চাপের কারণ হয়।

তোমার কাজে মন দাও

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের ষষ্ঠ বছরে, মুনাফিকরা মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর অপবাদ দেওয়ার সুযোগ নেয়। এই অপবাদ ছড়ানোর সাথে জড়িতদের মধ্যে একজন ছিলেন মহানবী (সাঃ)-এর স্ত্রী জয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ)-এর বোন হামনা। হামনা এই অপবাদ ছড়ানোর সাথে জড়িত ছিলেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে এর ফলে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আয়েশার চেয়েও বেশি ভালোবাসতে হবে। তিনি এটা করেছিলেন যদিও তার বোন জয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ)-এর প্রতি সর্বদা আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি ভালো কথা বলতেন। সহীহ বুখারীতে ৪৭৫০ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, একজন মুসলিমের বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা কখনোই অন্য কাউকে সত্যিকার অর্থে সাহায্য করতে পারবে না। নিজের এবং অন্যদের জন্য যে পার্থিব সুবিধাই অর্জন করুক না কেন, তা শেষ পর্যন্ত উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। একজন মুসলিমের উচিত কেবল সেইসব কাজে মানুষকে সাহায্য করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে।

এছাড়াও, একজন মুসলিমের উচিত তাদের ব্যবসায় মনোযোগ দেওয়ার গুরুত্ব বোঝা। প্রথমত, যে ব্যক্তি এই মনোভাব গ্রহণ করতে ব্যর্থ হবে সে তার মূল্যবান সময় থেকে বঞ্চিত হবে। আরও সময় ছাড়া সবকিছুই কেনা যায়। সময় নষ্ট করা পরকালে একজন ব্যক্তির জন্য একটি বিরাট অনুশোচনা হবে যখন সে তাদের সময় সঠিকভাবে ব্যবহারকারীদের প্রতিদান দেখতে পাবে। যদিও , যে ব্যক্তি তাদের ব্যবসায় আপত্তি করে না তার দ্বারা বলা কিছু কথা পাপ নয়, তবুও স্পষ্টতই তারা তাদের সময়কে আরও উৎপাদনশীল উপায়ে ব্যবহার করার সুযোগ হারিয়ে

ফেলেছে। এই কারণেই সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৭৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি তার ইসলামকে পরিপূর্ণ করতে পারে না যতক্ষণ না সে এমন জিনিস থেকে দূরে থাকে যা তার সাথে সম্পর্কিত নয়।

এমন কিছু সম্পর্কে কথা বলার সংজ্ঞা হল যা কোনও ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত নয় যদি কোনও ব্যক্তি এই ধরণের বক্তৃতা থেকে নীরব থাকতে পছন্দ করেন তবে তিনি পাপী হবেন না। অথবা তাদের নীরবতা দ্বারা কোন ক্ষতি করবে না ।

বাস্তবে, একজন ব্যক্তির এমন বিষয় নিয়ে কথা বলা উচিত নয় যা তার জন্য উপযুক্ত সময় এবং স্থানে না হলে। এই পরামর্শ উপেক্ষা করলে কেবল বক্তা এবং অন্যদের জন্যই সমস্যা তৈরি হয়।

আজকাল সমাজে এমন একটি সাধারণ সমস্যা দেখা দেয় যা কারোর সাথে সম্পর্কিত নয়। মানুষ প্রায়শই এই ধরণের বিষয়গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে এবং যারা গোপন রাখতে চায় তাদের মিথ্যা বলতে, কৌশলে সরাসরি উত্তর দেওয়া এড়িয়ে চলতে অথবা অভদ্রভাবে উত্তর উপেক্ষা করতে বাধ্য করে। একজন মুসলিমের আরও বিবেচক হওয়া উচিত এবং কেবল সেই সাধারণ বিষয়গুলি সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা উচিত যা তাদের সাথে সম্পর্কিত।

যারা তাদের বক্তব্যকে এমন বিষয়ের জন্য উৎসর্গ করে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়, তারা সেই বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলতে বঞ্চিত হবে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত।

এবং যারা সত্যিকার অর্থে তাদের প্রচেষ্টাকে তাদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির উপর পরিচালিত করে, তারা এমন বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলার সময় পাবে না যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়। পরবর্তীরা হলেন সফল যারা তাদের জিহ্বাকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করেছেন।

যদি কেউ তাদের কাছে থাকা সমস্ত যুক্তিগুলো সত্যিই চিন্তা করে, তাহলে সে বুঝতে পারবে যে বেশিরভাগই এমন কারোর কারণে ঘটেছে যা তাদের উদ্বেগের বিষয় নয়। কল্পনা করুন, কেবল এই মনোভাব এড়িয়ে চললে কত যুক্তি এড়ানো সম্ভব?

সমস্যা ভাগ করে নেওয়া

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের ষষ্ঠ বছরে, মুনাফিকরা মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর উপর অপবাদ আরোপ করার সুযোগ নেয়। মদিনায় অপবাদের প্রভাব যখন তীব্রতর হয়, তখন নবী (সাঃ) তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ সাহাবী, আলী ইবনে আবু তালিব এবং উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)-কে ডেকে তাদের সাথে পরামর্শ করেন। আলী (রাঃ)-এর সম্ভাব্য সকল বিকল্পের রূপরেখা দিয়ে তাকে আন্তরিকভাবে পরামর্শ দেন। উপরন্তু, তারা উভয়েই আয়েশা (রাঃ)-এর সম্পর্কে ভালো কথা বলেন এবং এমনকি একজন সাক্ষী, একজন দাসীকে ডেকে তার সুন্দর চরিত্রের আরও প্রমাণ পান, যে নবী (সাঃ)-এর ঘরে কাজ করত। তিনি আয়েশা (রাঃ)-এর সম্পর্কে ভালো কথা ছাড়া আর কিছুই বলেননি। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে, ৪৭৫০ নম্বরে।

মুসলমানদের একটি নির্দিষ্ট মনোভাব গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত, যেমন তাদের সমস্যাগুলি অনেক লোকের সাথে ভাগ করে নেওয়া। এই মনোভাবের সমস্যা হল, যখন কেউ অনেক লোককে বলে, তখন তাদের সমস্যাগুলি ভাগ করে নেওয়া এবং পরামর্শ চাওয়া তাদের অসুবিধাগুলি সম্পর্কে অভিযোগ করার একটি উপায় হয়ে ওঠে যা তাদের অধৈর্যতার স্পষ্ট লক্ষণ। উপরন্তু, এই মনোভাব কেবল বিভ্রান্তির কারণ হবে কারণ তারা যে পরামর্শ পাবে তা বৈচিত্র্যময় হবে যার ফলে তারা সঠিক পথ সম্পর্কে আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। অন্যদিকে, কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করলে কেবল আত্মবিশ্বাসই বৃদ্ধি পাবে। বারবার অনেক লোকের কাছে নিজের সমস্যাগুলি পুনরাবৃত্তি করার ফলে তারা তাদের সমস্যার উপর খুব বেশি মনোযোগ দেয় যার ফলে এটি আসলে তার চেয়ে বড় এবং তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়, এমনকি এটি তাদের অন্যান্য কর্তব্যগুলিকে অবহেলা করে যা কেবল আরও অধৈর্যের দিকে পরিচালিত করে।

অতএব, মুসলমানদের উচিত তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য কেবল কয়েকজনের সাথে পরামর্শ করা। পবিত্র কুরআনের পরামর্শ অনুসারে তাদের এই কয়েকজনকে নির্বাচন করা উচিত। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৪৩:

"...তাহলে তোমরা যদি না জানো, তাহলে বার্তাবাহকদের জিজ্ঞাসা করো।"

এই আয়াতটি মুসলমানদের জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেহেতু একজন অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করলে কেবল আরও সমস্যা তৈরি হয়। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি তার শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে একজন গাড়ির মেকানিকের সাথে পরামর্শ করা বোকামি করবে, তেমনি একজন মুসলিমের উচিত কেবল তাদের সাথেই তাদের সমস্যাগুলি ভাগ করে নেওয়া যাদের এটি সম্পর্কে জ্ঞান আছে এবং এর সাথে সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষা।

অধিকন্তু, একজন মুসলিমের উচিত কেবল তাদের সাথেই তাদের সমস্যাগুলি ভাগ করে নেওয়া যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। কারণ তারা কখনও অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার পরামর্শ দেয় না। অন্যদিকে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে না বা তার আনুগত্য করে না, তাদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা থাকতে পারে কিন্তু তারা সহজেই অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার পরামর্শ দেয়, যা কেবল তাদের সমস্যা বৃদ্ধি করে। বাস্তবে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তাদের প্রকৃত জ্ঞান থাকে এবং কেবলমাত্র এই জ্ঞানই অন্যদের তাদের সমস্যাগুলি সফলভাবে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ২৮:

"... আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, কেবল তারাই ভয় করে..."

রাগ নিয়ন্ত্রণ করা

নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় হিজরতের ষষ্ঠ বছরে, মুনাফিকরা নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) এর উপর অপবাদ আরোপের সুযোগ নেয়। মদিনায় যখন অপবাদের প্রভাব তীব্রতর হয়, তখন নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়েশা (রাঃ) এর কাছে আসেন এবং তাকে সদয়ভাবে স্মরণ করিয়ে দেন যে, আল্লাহ, মহান, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে তওবা করে, তাকে ক্ষমা করেন। আয়েশা (রাঃ) এই কথাগুলো শোনার সাথে সাথেই কান্না থামিয়ে দেন। তিনি নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে তার পিতামাতার পক্ষ থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন, কিন্তু তাঁর প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার কারণে তারা চুপ থাকেন। এরপর তিনি সরাসরি নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি সাড়া দিয়ে ঘোষণা করেন যে, তিনি এমন কিছু করার কথা কখনোই স্বীকার করবেন না যা তিনি করেননি এবং তার একমাত্র বিকল্প ছিল ধৈর্য ধারণ করা, ঠিক যেমন নবী ইয়াকুব (সাঃ)-ও তাঁর পুত্র হযরত ইউসুফ (সাঃ)-এর মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। সহীহ বুখারীতে ৪৭৫০ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে কোন অন্যায়ের জন্য অভিযুক্ত করেননি, বরং তিনি প্রকাশ্যে তাকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু একজন মহানবী (সাঃ) হিসেবে তার ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল, প্রয়োজনে তাকে তওবা করার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। উপরন্তু, আয়েশা (রাঃ) সহজেই তার চারপাশের লোকদের উপর ক্রোধে পতিত হতে পারতেন, কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন যে তার কাছে তাদের পূর্ণ সমর্থন নেই। কিন্তু তিনি তার রাগ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং ধৈর্য ধরেছিলেন।

সহীহ বুখারীতে ৬১১৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন ব্যক্তিকে রাগ না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

বাস্তবে, এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে, কোনও ব্যক্তির কখনই রাগ করা উচিত নয় কারণ রাগ একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য যা এমনকি নবীগণের (সাঃ) মধ্যেও পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, কিছু বিরল ক্ষেত্রে রাগ আত্মরক্ষার মতো কাজে লাগতে পারে। এই হাদিসের অর্থ আসলে এই যে, একজন ব্যক্তির উচিত তার রাগ নিয়ন্ত্রণ করা যাতে তা তাকে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে না নিয়ে যায়, যা নবীগণ (সাঃ) দ্বারা নিখুঁতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদিসটি দেখায় যে রাগ অনেক মন্দের দিকে পরিচালিত করতে পারে এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করলে অনেক কল্যাণ হয়।

প্রথমত, এই উপদেশটি এমন সমস্ত ভালো গুণাবলী গ্রহণ করার নির্দেশ যা একজন ব্যক্তিকে তার রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে উৎসাহিত করবে, যেমন ধৈর্য।

এই হাদিসটি আরও ইঙ্গিত করে যে, একজন ব্যক্তির রাগের উপর নির্ভর করে কাজ করা উচিত নয়। বরং, রাগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিজের সাথে সংগ্রাম করা উচিত যাতে এটি তাকে পাপের দিকে পরিচালিত না করে। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য

রাগ নিয়ন্ত্রণ করা একটি মহান কাজ এবং ঐশ্বরিক প্রেমের দিকে পরিচালিত করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৪:

"...যারা রাগ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে - এবং আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

ইসলামে এমন অনেক শিক্ষা রয়েছে যা মুসলমানদের তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে উৎসাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, যেহেতু রাগ শয়তানের সাথে সম্পর্কিত এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাই সহীহ বুখারীতে ৩২৮২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, রাগান্বিত ব্যক্তির উচিত শয়তান থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

জামে আত তিরমিযী, ২১৯১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে একজন রাগান্বিত মুসলিমকে মাটিতে আঁকড়ে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হতে পারে যে তাদের শান্ত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে সিজদা করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, যত বেশি কেউ নিষ্ক্রিয় দেহের অবস্থান গ্রহণ করবে, ততই তার রাগ প্রকাশের সম্ভাবনা কম থাকবে। সুনানে আবু দাউদের ৪৭৮২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার রাগকে নিজের মধ্যে আটকে রাখতে পারে যতক্ষণ না তা কেটে যায় যাতে এটি অন্যদের উপর নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে।

যে মুসলিম রাগান্বিত, তার উচিত সুনান আবু দাউদের ৪৭৮৪ নম্বর হাদিসে বর্ণিত উপদেশ অনুসরণ করা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) রাগান্বিত মুসলিমকে অজু করার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ পানি রাগের সহজাত বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ তাপকে প্রতিহত করে। এরপর যদি কেউ নামাজ পড়ে, তাহলে এটি তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণে আরও সাহায্য করবে এবং মহান সওয়াবের দিকে পরিচালিত করবে।

এখন পর্যন্ত আলোচিত উপদেশগুলি একজন রাগান্বিত মুসলিমকে তাদের শারীরিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। নিজের কথা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, রাগের সময় কথা বলা থেকে বিরত থাকাই ভালো। দুর্ভাগ্যবশত, শারীরিক কার্যকলাপের চেয়ে কথার প্রভাব প্রায়শই অন্যদের উপর বেশি স্থায়ী হতে পারে। রাগের মধ্যে বলা কথার কারণে অসংখ্য সম্পর্ক ভেঙে গেছে এবং ভেঙে গেছে। এই আচরণ প্রায়শই অন্যান্য পাপ এবং অপরাধের দিকে পরিচালিত করে। একজন মুসলিমের জন্য সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৭০ নম্বরে পাওয়া হাদিসটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে সতর্ক করা হয়েছে যে বিচারের দিনে একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য কেবল একটি খারাপ কথার প্রয়োজন।

রাগ নিয়ন্ত্রণ করা একটি মহান পুণ্য এবং যে ব্যক্তি এটিকে আয়ত্তে আনতে পারে তাকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন শক্তিশালী ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন, সহীহ বুখারী, ৬১১৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগকে গ্রাস করে, অর্থাৎ, তারা তাদের রাগের কারণে কোনও পাপ করে না, তার হৃদয় শান্তি এবং প্রকৃত ঈমানে পূর্ণ হবে। সুনান আবু দাউদের ৪৭৭৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত সুস্থ হৃদয়ের এটিই একটি বৈশিষ্ট্য। এটিই একমাত্র হৃদয় যা বিচারের দিন নিরাপত্তা লাভ করবে। ২৬শে সূরা আশ শু'আরা, আয়াত ৮৮-৮৯:

"যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কারো কোন উপকারে আসবে না। কেবল সেই ব্যক্তিই লাভবান হবে যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।"

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সীমার মধ্যে রাগ কার্যকর হতে পারে। এটি নিজের, ঈমানের এবং সম্পদের ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য ব্যবহার করা উচিত, যা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সঠিকভাবে করা হলে, মহান আল্লাহর জন্য রাগ হিসেবে গণ্য হবে। এটি ছিল মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অবস্থা, যিনি কখনও নিজের ইচ্ছার জন্য রাগ করেননি। তিনি কেবল মহান আল্লাহর জন্য রাগ করেছিলেন, যা সহিহ মুসলিম, ৬০৫০ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চরিত্র ছিল পবিত্র কুরআন, যা সহিহ মুসলিম, ১৭৩৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হল তিনি যা খুশি তাই খুশি হতেন এবং যা রাগ করত তাই রাগ করতেন। উপরন্তু, মহান আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা, ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। সুনানে আবু দাউদের ৪৬৮১ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ঘৃণার মূল হলো রাগ। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে ইসলাম রাগকে নিবৃত্ত করার নির্দেশ দেয় না, কারণ এটি অর্জন করা আসলে সম্ভব নয়, বরং ইসলামের সীমানার মধ্যে থেকে রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হওয়া প্রশংসনীয়, কিন্তু যদি এই রাগ সীমা অতিক্রম করে তবে তা নিন্দনীয় হয়ে ওঠে। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি যখন তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হয়। সুনানে আবু দাউদের ৪৯০১ নম্বর হাদিসে একজন ইবাদতকারী সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি কেউ রাগান্বিতভাবে দাবি করে যে, আল্লাহ তাআলা একজন নির্দিষ্ট পাপীকে ক্ষমা করবেন

না। ফলস্বরূপ, সেই ইবাদতকারীকে জাহান্নামে পাঠানো হবে এবং পাপীকে বিচারের দিন ক্ষমা করা হবে।

মন্দের উৎপত্তি চারটি জিনিস থেকে: নিজের ইচ্ছা, ভয়, মন্দ ক্ষুধা এবং রাগ নিয়ন্ত্রণে না থাকা। অতএব, যে ব্যক্তি এই হাদিসের উপদেশ গ্রহণ করবে, সে তার চরিত্র এবং জীবন থেকে এক-চতুর্থাংশ মন্দ দূর করবে।

পরিশেষে, মুসলমানদের জন্য তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা এমন কোনও কাজ বা কথা না বলে যা তাদের ইহকাল ও পরকালে চরম অনুশোচনার দিকে ঠেলে দেয়।

ধৈর্য পুরস্কারের দিকে পরিচালিত করে

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের ষষ্ঠ বছরে, মুনাফিকরা মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর উপর অপবাদ আরোপের সুযোগ নেয়। মদিনায় অপবাদের প্রভাব যখন তীব্রতর হয়, তখন মহানবী (সাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে আসেন এবং তার সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। মহানবী (সাঃ)-এর আসন থেকে উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ পাওয়ার আগেই, আল্লাহ তাআলা আয়েশা (রাঃ)-কে ক্ষমা করে দেন এবং তাকে অত্যন্ত সম্মানিত করেন এবং যারা তার বিরুদ্ধে অপবাদ শুরু করেছিলেন এবং এতে অংশ নিয়েছিলেন তাদের কঠোর সমালোচনা করেন। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ১১-২৬:

"নিশ্চয়ই, যারা মিথ্যা নিয়ে এসেছে তারা তোমাদেরই একটি দল। একে তোমাদের জন্য মন্দ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গল... তারা [অর্থাৎ, অপবাদদাতারা] যা বলে তা থেকে [ভালো মানুষ] নির্দোষ ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযিক রয়েছে।"

সহীহ বুখারী, ৪৭৫০ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসনাদে আহমাদের ২৮০৩ নম্বর হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, অপছন্দনীয় বিষয়গুলোর উপর ধৈর্য ধারণ করলে বিরাট প্রতিদান পাওয়া যায়। ৩৯ সূরা আয-যুমার, আয়াত ১০:

"...নিশ্চয়ই, ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান বিনা হিসাব [অর্থাৎ, সীমা] দেওয়া হবে।"

ঈমানের তিনটি দিক পূরণের জন্য ধৈর্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান: মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কিন্তু ধৈর্যের চেয়ে উচ্চতর এবং অধিক ফলপ্রসূ স্তর হল সন্তুষ্টি। এটি তখনই ঘটে যখন একজন মুসলিম গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ কেবল তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটিই বেছে নেন এবং তাই তারা তাদের নিজেদের চেয়ে তাঁর পছন্দকে অগ্রাধিকার দেয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

একজন ধৈর্যশীল মুসলিম বোঝেন যে, যা কিছু তাদের উপর প্রভাব ফেলেছে, যেমন একটি অসুবিধা, তা এড়ানো যেত না, এমনকি যদি সমগ্র সৃষ্টি তাদের সাহায্য করত। একইভাবে, যা কিছু তাদের অনুপস্থিত করেছিল তা তাদের উপর প্রভাব ফেলতে পারত না। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে এই সত্যটি গ্রহণ করে, সে যা কিছু অর্জন করে তাতে আনন্দিত বা গর্বিত হবে না কারণ সে জানে যে, মহান আল্লাহ তা'আলা সেই জিনিসটি তাদের জন্য বরাদ্দ করেছেন। এবং তারা যা কিছু অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে তার জন্য তারা দুঃখিতও হবে না। জেনে রাখা যে, মহান আল্লাহ তা'আলা

সেই জিনিসটি তাদের জন্য বরাদ্দ করেননি এবং অস্তিত্বের কোন কিছুই এই সত্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। ৫৭ সূরা আল হাদিদ, আয়াত ২২-২৩:

"পৃথিবীতে অথবা তোমাদের উপর এমন কোন বিপদ আসে না যা আমরা তা সৃষ্টি করার পূর্বেই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ থাকে - অবশ্যই, এটি আল্লাহর জন্য সহজ। যাতে তোমরা যা হারিয়ে ফেলেছ তার জন্য হতাশ না হও এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তার জন্য [গর্বে] আনন্দিত না হও..."

এছাড়াও, সুনানে ইবনে মাজাহের ৭৯ নম্বর হাদিসে মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যখন কোন কিছু ঘটে, তখন একজন মুসলিমের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে, তা নির্ধারিত ছিল এবং ফলাফলের কোনও পরিবর্তন হতে পারত না। এবং একজন মুসলিমের এই ভেবে অনুশোচনা করা উচিত নয় যে, যদি তারা ভিন্নভাবে আচরণ করত, তাহলে তারা ফলাফল রোধ করতে পারত। কারণ এই মনোভাব কেবল শয়তানকে তাদের অধৈর্য এবং ভাগ্য সম্পর্কে অভিযোগ করার দিকে উৎসাহিত করে। একজন ধৈর্যশীল মুসলিম সত্যিকার অর্থে বোঝে যে, মহান আল্লাহ যা কিছু বেছে নিয়েছেন, তা তাদের জন্যই সর্বোত্তম, যদিও তারা এর পিছনের প্রজ্ঞাটি লক্ষ্য না করে। ধৈর্যশীল ব্যক্তি তাদের পরিস্থিতির পরিবর্তন কামনা করে এবং এমনকি এর জন্য প্রার্থনাও করে কিন্তু যা ঘটেছে তা নিয়ে তারা অভিযোগ করে না। অবিরাম ধৈর্যশীল থাকা একজন মুসলিমকে আরও উচ্চতর স্তরে, অর্থাৎ সন্তুষ্টিতে নিয়ে যেতে পারে।

যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট সে পরিবর্তন চায় না কারণ সে জানে যে, মহান আল্লাহর পছন্দ তার পছন্দের চেয়ে উত্তম। এই মুসলিম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদিসের উপর কাজ করে। এটি পরামর্শ দেয় যে, প্রতিটি পরিস্থিতিই

মুমিনের জন্য সর্বোত্তম। যদি তারা কোনও সমস্যার সম্মুখীন হয় তবে তাদের ধৈর্য প্রদর্শন করা উচিত যা আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। এবং যদি তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে তবে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা উচিত যা আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে।

এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন, তাদের পরীক্ষা করেন। যদি তারা ধৈর্য ধারণ করে তবে তাদের পুরষ্কার দেওয়া হবে, কিন্তু যদি তারা রাগান্বিত হয় তবে তা কেবল আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসার অভাবকেই প্রমাণ করে। জামে আত তিরমিযী, ২৩৯৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলিমের উচিত স্বাচ্ছন্দ্য ও কষ্ট উভয় সময়েই ধৈর্যশীল হওয়া অথবা আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা। এটি তার কষ্ট কমাবে এবং উভয় জগতেই তাকে প্রচুর আশীর্বাদ প্রদান করবে। অন্যদিকে, অধৈর্যতা কেবল তার প্রাপ্ত পুরস্কারকে ধ্বংস করবে। যেভাবেই হোক একজন মুসলিমকে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে, তবে তারা পুরস্কার চাইবে কি চাইবে না তা তাদের নিজস্ব পছন্দ।

একজন মুসলিম কখনোই পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের আচরণ কষ্ট ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে সমান হয়। একজন প্রকৃত বান্দা কীভাবে বিচারের জন্য প্রভু, অর্থাৎ মহান আল্লাহর কাছে যেতে পারে এবং তারপর যদি পছন্দটি তার ইচ্ছার সাথে মেলে না, তাহলে সে অসন্তুষ্ট হতে পারে? এমন একটি বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে যে যদি কেউ যা চায় তা পায় তবে তা তাকে ধ্বংস করে দেবে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

একজন মুসলিমের উচিত প্রান্তে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলার উপাসনা করা নয়। অর্থাৎ, যখন ঐশ্বরিক বিধান তাদের ইচ্ছার সাথে মিলে যায় তখন তারা আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যখন তা না হয় তখন তারা বিরক্ত হয়ে এমন আচরণ করে যেন তারা আল্লাহ তাআলার চেয়ে ভালো জানে। সূরা ২২ আল হজ্জ, আয়াত ১১:

"আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে আল্লাহর ইবাদত করে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে। যদি তাকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে, তবে সে তাতে আশ্বস্ত হয়; আর যদি কোন পরীক্ষা তাকে স্পর্শ করে, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসের দিকে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটাই স্পষ্ট ক্ষতি।"

একজন মুসলিমের উচিত আল্লাহর পছন্দ অনুযায়ী আচরণ করা, যেন সে একজন দক্ষ বিশ্বস্ত ডাক্তারের সাথে আচরণ করে। ঠিক যেমন একজন মুসলিম ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে তিক্ত ঔষধ গ্রহণের অভিযোগ করে না, কারণ সে জানে যে এটি তার জন্য সর্বোত্তম, তেমনি তার উচিত পৃথিবীতে যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা মেনে নেওয়া, কারণ এটি তার জন্য সর্বোত্তম। প্রকৃতপক্ষে, একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি তিক্ত ঔষধের জন্য ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানাবে এবং একইভাবে একজন বুদ্ধিমান মুসলিম যেকোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে মহান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাবে।

এছাড়াও, একজন মুসলিমের উচিত পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত এবং মহানবী (সা.)-এর হাদিস পর্যালোচনা করা, যেখানে ধৈর্যশীল ও সন্তুষ্ট মুসলিমের প্রতিদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর উপর গভীরভাবে চিন্তা করা একজন মুসলিমকে সমস্যার মুখোমুখি হলে অবিচল থাকতে অনুপ্রাণিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, ৩৯ সূরা আয-যুমার, আয়াত ১০:

"...নিশ্চয়ই, ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান বিনা হিসাব [অর্থাৎ, সীমা] দেওয়া হবে।"

জামে আত তিরমিযীতে ২৪০২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আরেকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। এটি পরামর্শ দেয় যে, যারা দুনিয়াতে ধৈর্য ধরে পরীক্ষা ও অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছে, তারা যখন বিচারের দিনে তাদের পুরস্কার পাবে, যারা এই ধরনের পরীক্ষার মুখোমুখি হয়নি, তারা কামনা করবে যে তারা যদি ধৈর্য ধরে কাঁচি দিয়ে তাদের চামড়া কেটে ফেলার মতো সমস্যা মোকাবেলা করত।

ধৈর্য এবং এমনকি আল্লাহ যা মনোনীত করেন তাতে সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, তাদের পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে প্রাপ্ত জ্ঞান অন্বেষণ করা এবং তার উপর আমল করা উচিত, যাতে তারা ঈমানের উচ্চ স্তরে পৌঁছাতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৯৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব হল যখন একজন মুসলিম নামাজের মতো কাজ করে, যেন তারা আল্লাহকে সাক্ষী রাখতে পারে। যে ব্যক্তি এই স্তরে পৌঁছাবে সে অসুবিধা এবং পরীক্ষার যন্ত্রণা অনুভব করবে না কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সচেতনতা

এবং ভালোবাসায় নিমজ্জিত থাকবে। এটি সেই মহিলাদের অবস্থার অনুরূপ যারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৌন্দর্য দেখে নিজের হাত কেটে ফেলার সময় ব্যথা অনুভব করেনি। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ৩১:

"...এবং তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিয়ে বললেন, "তাদের সামনে থেকে বেরিয়ে এসো।" তারা যখন তাকে দেখল, তখন তারা তার প্রতি খুব মুগ্ধ হল এবং তাদের হাত কেটে ফেলল এবং বলল, "আল্লাহ পূর্ণ! এ তো মানুষ নয়; এ তো একজন মহান ফেরেশতা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

যদি কোন মুসলিম ঈমানের এই উচ্চ স্তরে পৌঁছাতে না পারে, তাহলে তাদের অন্তত পূর্বে উদ্ধৃত হাদিসে উল্লেখিত নিম্ন স্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করা উচিত। এটি এমন একটি স্তর যেখানে একজন ব্যক্তি সর্বদা সচেতন থাকে যে তারা মহান আল্লাহ কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি এমন কোন কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যক্তির সামনে অভিযোগ করবে না যাকে তারা ভয় পায়, যেমন একজন নিয়োগকর্তা, তেমনি একজন মুসলিম যিনি সর্বদা মহান আল্লাহর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন, তিনি তাঁর পছন্দগুলি সম্পর্কে অভিযোগ করবেন না।

লেট থিংস গো

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের ষষ্ঠ বছরে, মুনাফিকরা মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর উপর অপবাদ আরোপ করার সুযোগ নেয়। আল্লাহ তাআলা আয়েশা (রাঃ)-কে এই অপবাদ থেকে মুক্ত করার পর, তার পিতা আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)- ঘোষণা করেন যে তিনি আর এই অপবাদ ছড়ানোর সাথে জড়িত তার আত্মীয়কে আর্থিকভাবে সাহায্য করবেন না। এরপর আল্লাহ তাআলা ২৪ নুর, আয়াত ২২ নাযিল করেন, যেখানে তিনি এবং সকল মুসলিমকে অন্যদের ভুল ক্ষমা করতে এবং উপেক্ষা করতে উৎসাহিত করেন:

" আর তোমাদের মধ্যে যারা সৎ ও বিত্তশালী তারা যেন তাদের আত্মীয়স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের সাহায্য না করার শপথ না করে, এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এরপর, আবু বকর (রাঃ) তার ঘোষণা প্রত্যাহার করে নেন এবং তার আত্মীয়কে সাহায্য করতে থাকেন। জামে আত তিরমিযী, ৩১৮০ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সকল মুসলিম আশা করে যে বিচারের দিনে আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপকে দূরে রাখবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, এই একই মুসলিমদের বেশিরভাগই যারা এই আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের

সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থাৎ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আঁকড়ে ধরে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলিকে বোঝাচ্ছে না যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তোলে এমন একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে ভুক্তভোগীকে প্রভাবিত করবে। এই ধরণের ভুলকে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা বোধগম্যভাবে কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলিম প্রায়শই অন্যদের ভুলগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকে যা ভবিষ্যতে কোনওভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি অদৃশ্য হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা সুযোগ পেলেই তা পুনরুজ্জীবিত করার এবং অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা ধারণ করা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে মানুষ ফেরেশতা নয়। অন্তত একজন মুসলিম যিনি আশা করেন যে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুলগুলিকে উপেক্ষা করবেন, তার উচিত অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকৃতি জানায় তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্কই ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সর্বদা একটি মতবিরোধে লিপ্ত থাকবে যা প্রতিটি সম্পর্কের ক্ষেত্রেই ভুলের দিকে পরিচালিত করতে পারে। অতএব, যারা এইভাবে আচরণ করে তারা একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা অদ্ভুত যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে কিন্তু এমন মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ জীবিত থাকাকালীন এবং তাদের মৃত্যুর পরে ভালোবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাবের ফলে একেবারে বিপরীত ঘটে। তারা জীবিত থাকাকালীন মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়ে এবং যখন তারা মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ এবং ভালোবাসার সাথে স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের স্মরণ করে তবে এটি কেবল অভ্যাসের বাইরে।

অতীতকে ভুলে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে অন্যদের প্রতি অতিরিক্ত ভালো ব্যবহার করা উচিত, তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে একজন ব্যক্তি সর্বনিম্ন যা করতে পারে তা হল শ্রদ্ধাশীল হওয়া। এর জন্য কোনও খরচ হয় না এবং খুব কম প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। তাই, মানুষের অতীতের ভুলগুলি উপেক্ষা করা এবং ভুলে যাওয়া শেখা উচিত, সম্ভবত, মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলি উপেক্ষা করবেন।

অন্যদের প্রতি অনুভূতি

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের ষষ্ঠ বছরে, তিনি আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এই সেনাবাহিনীর খাবারের অভাব দেখা দেওয়ায় তারা তীব্র সমস্যার সম্মুখীন হন। ফলস্বরূপ, আবু উবাইদা (রাঃ) সেনাবাহিনীর খাবার সংগ্রহ করেন এবং সৈন্যদের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করেন, যা এক পর্যায়ে প্রতি ব্যক্তি প্রতিদিন একটি করে খেজুর ফল ছিল। এমনকি নিজেদের পুষ্টির জন্য তাদের গাছের পাতা খেতে বাধ্য করা হয়েছিল। কাইস বিন সা'দ বিন উবাদাহ (রাঃ) এমনকি সেনাবাহিনীকে খাওয়ানোর জন্য তার উট জবাই করতে শুরু করেন। অবশেষে সেনাবাহিনী উপকূলরেখায় ভেসে আসা একটি তিমির মুখোমুখি হয়। তারা এক মাস ধরে তা খেয়েছিল এবং তাদের অভিযান শেষ করে তারা মদিনায় ফিরে আসে, যেখানে তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে তিমির কিছু মাংস ভাগ করে নেয়। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "দ্য নোবেল লাইফ অফ দ্য প্রফেট (সাঃ)", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪৫২-১৪৫৪ এবং সুনানে আন নাসায়ী, ৪৩৫৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি ইঙ্গিত দেয় যে প্রতিটি সৈন্যের একে অপরের প্রতি গভীর যত্ন ছিল।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে, মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের কোন অংশ যদি ব্যথা পায়, তাহলে বাকি অংশও তার ব্যথায় শরীক হয়।

এই হাদিসটি, অন্যান্য অনেক হাদিসের মতো, নিজের জীবনে এতটা মগ্ন না হয়ে এমন আচরণ করার গুরুত্ব নির্দেশ করে যেন মহাবিশ্ব তাদের এবং তাদের সমস্যাগুলির চারপাশে ঘোরে। শয়তান একজন মুসলিমকে তাদের নিজের জীবন এবং তাদের সমস্যাগুলির উপর এত বেশি মনোযোগ দিতে অনুপ্রাণিত করে যে তারা বৃহত্তর চিত্রের উপর মনোযোগ হারিয়ে ফেলে যা তাদের অধৈর্যের দিকে পরিচালিত করে এবং তাদের অন্যদের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের সামর্থ্য অনুসারে অন্যদের সহায়তা করার দায়িত্বে ব্যর্থ হয়। একজন মুসলিমের সর্বদা এটি মনে রাখা উচিত এবং যতটা সম্ভব অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত। এটি আর্থিক সাহায্যের বাইরেও বিস্তৃত এবং এর মধ্যে সমস্ত মৌখিক এবং শারীরিক সাহায্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন ভাল এবং আন্তরিক পরামর্শ।

মুসলিমদের উচিত নিয়মিত সংবাদ এবং বিশ্বজুড়ে যারা কঠিন পরিস্থিতিতে আছেন তাদের প্রতি নজর রাখা। এটি তাদেরকে আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্মমগ্ন না হয়ে অন্যদের সাহায্য করার জন্য অনুপ্রাণিত করবে। বাস্তবে, যে কেবল নিজের কথা চিন্তা করে সে পশুর চেয়েও নিম্ন স্তরের, কারণ সে তার সন্তানদেরও যত্ন করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলিমের উচিত তার নিজের পরিবারের বাইরে অন্যদের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে পশুর চেয়েও উত্তম হওয়া।

এই হাদিসটি ইসলামে ঐক্য ও সাম্যের গুরুত্বকেও নির্দেশ করে, কারণ একজনকে অবশ্যই অন্য মুসলমানদের তাদের সামর্থ্য অনুসারে সাহায্য করতে হবে, তাদের লিঙ্গ, জাতিগততা বা অন্য কিছু নির্বিশেষে।

যেভাবে একজন ব্যক্তি নিজের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে চান, ঠিক সেভাবেই অন্যদের সাথেও আচরণ করার চেষ্টা করতে হবে, কারণ মূল হাদিসটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে

যে, একজন মুসলিমের জন্য দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হওয়া বা অন্য কোন মুসলিমের দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হওয়া - এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটি একই রকম।

পরিশেষে, যদিও একজন মুসলিম পৃথিবীর সকল সমস্যা দূর করতে পারে না, তবুও তারা তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তাদের সামর্থ্য অনুসারে অন্যদের সাহায্য করতে পারে কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা এটাই আদেশ করেন এবং আশা করেন।

হুদাইবিয়ার চুক্তি

আসল তীর্থযাত্রা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের ষষ্ঠ বছরে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রাঃ) মক্কার দিকে রওনা হন এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। তাদের সিদ্ধান্ত ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রাঃ) কর্তৃক উমরা পালনের স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ) এর জীবনী", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে এবং সহীহ বুখারী, ২৭৩১-২৭৩২ নম্বরে প্রাপ্ত হাদিসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা যখন যিয়ারত বা পবিত্র তীর্থযাত্রার জন্য ভ্রমণ করবে তখন তাদের সঠিক নিয়ত এবং মনোভাব গ্রহণ করবে যাতে তারা উভয় জগতেই এর থেকে উপকৃত হতে পারে।

সহীহ বুখারীতে ১৭৭৩ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একটি গৃহীত পবিত্র হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

পবিত্র হজ্জের আসল উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের পরকালের শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা। যেভাবে একজন মুসলিম পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য তাদের ঘর, ব্যবসা, সম্পদ, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সামাজিক মর্যাদা ত্যাগ করে, ঠিক একইভাবে এটি তাদের মৃত্যুর সময় ঘটবে, যখন তারা পরকালের শেষ যাত্রায় যাবে। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযীর ২৩৭৯ নম্বর হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, একজন ব্যক্তির পরিবার এবং সম্পদ তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং কেবল তাদের ভালো-মন্দ কর্মই তাদের সাথে থাকে।

যখন একজন মুসলিম তাদের পবিত্র হজ্জের সময় এই কথাটি মনে রাখবেন, তখন তারা এই দায়িত্বের সমস্ত দিক সঠিকভাবে পালন করবেন। এই মুসলিম পরিবর্তিত ব্যক্তি হয়ে বাড়ি ফিরে আসবে, কারণ তারা এই বস্তুগত জগতের অতিরিক্ত জিনিসপত্র সংগ্রহের চেয়ে পরকালের চূড়ান্ত যাত্রার প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে। তারা মহান আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়ার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুসারে চেষ্টা করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের এবং তাদের উপর আস্থাশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য এই পৃথিবী থেকে অর্থ গ্রহণ করা, অপচয়, অতিরিক্ত ব্যয় বা অপচয় ছাড়াই। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে।

মুসলমানদের পবিত্র হজ্জকে ছুটির দিন এবং কেনাকাটার ভ্রমণ হিসেবে দেখা উচিত নয় কারণ এই মনোভাব এর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে। এটি মুসলমানদের তাদের পরকালের শেষ যাত্রার কথা মনে করিয়ে দেবে, এমন একটি যাত্রা যার কোন প্রত্যাবর্তন নেই এবং দ্বিতীয় কোন সুযোগ নেই। কেবলমাত্র এটিই পবিত্র হজ্জ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে এবং পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে অনুপ্রাণিত করবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে তাকে তাদের পবিত্র হজ্জের মাধ্যমে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে।

নিরপেক্ষ থাকা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের ষষ্ঠ বছরে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রাঃ) মক্কার দিকে রওনা হন, মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার এবং যিয়ারত (উমরা) করার উদ্দেশ্যে। যাত্রার সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে মক্কার অমুসলিমরা যুদ্ধে মগ্ন এবং যদি তারা তাকে একা ছেড়ে দেয় তবে তাদের কোনও ক্ষতি হবে না। যদি অন্য অমুসলিমরা তাকে হত্যা করে, তাহলে মক্কার অমুসলিমরা তাদের কাঙ্ক্ষিত অর্জন করবে এবং যদি তাকে বিজয় দেওয়া হয় তবে অমুসলিমরা ইসলামে প্রবেশ করতে এবং সাফল্যে যোগ দিতে পারবে। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৩-২২৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে, সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত হাদিসগুলিতে এটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সংখ্যা ২৭৩১-২৭৩২ এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর (সাঃ) নোবেল জীবন", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪৯২-এ এটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এর অর্থ হল, যদি কেউ কাউকে ভালো কাজে সাহায্য করতে না পারে, তাহলে তারা অন্তত যা করতে পারে তা হলো তাতে বাধা না দেওয়া।

মুসলমানরা প্রায়শই দাবি করে যে, যেহেতু তারা তাদের পার্থিব কাজে ব্যস্ত থাকে, তাই তাদের স্বেচ্ছাসেবী সৎকর্ম করা কঠিন হয়ে পড়ে, বিশেষ করে মানুষের সাথে সম্পর্কিত কাজ, যেমন কাউকে শারীরিকভাবে সাহায্য করা। যদিও মুসলমানদের যতটা সম্ভব স্বেচ্ছাসেবী সৎকর্ম করার চেষ্টা করা উচিত, যা তাদের উভয় জগতেই উপকৃত করবে, অন্যদিকে, তাদের পার্থিব কার্যকলাপ কেবল এই পৃথিবীতেই তাদের

উপকৃত করবে, তবুও এই মুসলমানদের অন্তত অন্যদের প্রতি নিরপেক্ষ মনোভাব অবলম্বন করা উচিত। এর অর্থ হল, যদি একজন মুসলিম অন্যদের সাহায্য করতে না পারে, তাহলে তাদের বৈধ ও ভালো কাজে বাধা দেওয়া উচিত নয়। যদি তারা অন্যদের খুশি করতে না পারে, তাহলে তাদের দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। যদি তারা অন্যদের হাসাতে না পারে, তাহলে তাদের কাঁদানো উচিত নয়। এটি অসংখ্য পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক মুসলিম অন্যদের প্রতি ভালো করতে পারে, যেমন তাদের মানসিক সমর্থন প্রদান করা, কিন্তু একই সাথে তারা মানুষের প্রতি নেতিবাচক আচরণ করে তাদের ভালো কাজগুলিকে ধ্বংস করে। এটি লক্ষণীয় যে, যদি একজন মুসলিম অন্যদের প্রতি অতিরিক্ত নেতিবাচক আচরণ করে, তাহলে বিচারের দিনে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহিহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। নিরপেক্ষ মানসিকতা থাকা আসলে একটি ভালো কাজ, যখন তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। সহিহ মুসলিমের ২৫০ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, জামে আত তিরমিযী, ২৫১৫ নম্বরে বর্ণিত হাদিস অনুসারে, অন্যদের সাথে ইতিবাচক আচরণ করাই সর্বোত্তম, যা একজন প্রকৃত মুমিনের লক্ষণ। কিন্তু যদি তারা এটি করতে না পারে তবে তাদের অন্তত অন্যদের সাথে নিরপেক্ষ আচরণ করা উচিত। কারণ অন্যদের সাথে নেতিবাচক আচরণ করা একজনের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

এগিয়ে টিপুন

যখন মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে যিয়ারত করার জন্য রওনা হলেন, তখন তাঁকে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। মহানবী (সাঃ) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, কী করতে হবে তা নিয়ে। আবু বকর (রাঃ) পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, যেহেতু তারা মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে চাইছিল না, তাই তাদের মক্কার দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত এবং যদি তাদের সেখানে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয় তবে তারা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করবে। এরপর মহানবী (সাঃ) এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সহীহ বুখারী, ২৭৩১-২৭৩২ নম্বরে এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আবু বকর আস সিদ্দীকের জীবনী, ১২৫-১২৬ পৃষ্ঠায় এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি মুসলমানদের শিক্ষা দেয় যে, যখনই তারা কোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তখন তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকা, এই বিশ্বাসে যে তিনি তাদের এ থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখাবেন, এমনকি যদি তা সেই সময়ে অসম্ভব বলে মনে হয়। ৬৫তম অধ্যায় তালাকের আয়াত, ২য় আয়াত:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

একজন মুসলিমের বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটিই বেছে নেন, যদিও সমস্যার পেছনের হিকমত স্পষ্ট নয়। এটি একজন ব্যক্তির

প্রতিক্রিয়া যা হয় আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে অথবা মহান আল্লাহর ক্রোধের দিকে পরিচালিত করে। একজনকে কেবল তাদের নিজের জীবনের অসংখ্য উদাহরণের দিকে চিন্তা করতে হবে যেখানে তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু খারাপ ছিল কিন্তু পরে তাদের মন পরিবর্তন হয় এবং বিপরীতভাবে। এটি ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যখন একজন ডাক্তার দ্বারা নির্ধারিত তিক্ত ওষুধ গ্রহণ করেন। যদিও ওষুধটি তিক্ত হয় তবুও তারা এটি বিশ্বাস করে গ্রহণ করেন যে এটি তাদের উপকার করবে। এটা আশ্চর্যজনক যে একজন মুসলিম কীভাবে এমন একজন ডাক্তারকে বিশ্বাস করতে পারে যার জ্ঞান সীমিত এবং যিনি পুরোপুরি নিশ্চিত নন যে তিক্ত ওষুধ তাদের উপকার করবে এবং মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হন, যার জ্ঞান অসীম এবং যখন তিনি কেবল তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম নির্ধারণ করেন।

একজন মুসলিমের উচিত ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এবং মহান আল্লাহর উপর ভরসার মধ্যে পার্থক্য বোঝা। যে ব্যক্তি আল্লাহকে মান্য করে না এবং তারপর বিপদে সাহায্যের আশা করে, সে একজন ইচ্ছাকৃত চিন্তাবিদ। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাহায্য লাভ করবে, যা এই মহান ঘটনায় ইঙ্গিত করা হয়েছে, সে হল সেই ব্যক্তি যে আন্তরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া এবং তারপর অভিযোগ বা তাঁর পছন্দের উপর প্রশ্ন না তুলে তাঁর রায়ের উপর বিশ্বাস রাখা।

নামাজের গুরুত্ব

যখন মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে যিয়ারত করার জন্য রওনা হলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, তখন তাঁকে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছেন। এই যাত্রার সময়, মুসলমানরা নামাজ আদায় করেছিল এবং অমুসলিম সেনাবাহিনী দূর থেকে তাদের লক্ষ্য করেছিল। নামাজ শেষ হওয়ার পর, অমুসলিমরা একে অপরের সমালোচনা করেছিল যে তারা নামাজ আদায় করার সময় মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেনি। এরপর আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা, আন-নিসার ১০২ নং আয়াত নাযিল করেন, যেখানে ভয়ের নামাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

"আর যখন তুমি [অর্থাৎ, সেনাবাহিনীর প্রধান] তাদের মধ্যে থাকো এবং তাদের নামাজে ইমামতি করো, তখন তাদের একটি দল যেন তোমার সাথে [নামাজে] দাঁড়ায় এবং তারা যেন তাদের অস্ত্র বহন করে। আর যখন তারা সিজদা করে, তখন যেন তারা তোমার পিছনে থাকে এবং অন্য দল যারা [এখনও] নামাজ পড়েনি তাদের এগিয়ে নিয়ে যায় এবং তারা যেন তোমার সাথে নামাজ পড়ে, সাবধানতা অবলম্বন করে এবং তাদের অস্ত্র বহন করে। যারা কাফের তারা চায় যে তোমরা তোমাদের অস্ত্র এবং জিনিসপত্র ভুলে যাও যাতে তারা তোমাদের উপর একবার আক্রমণ করে। কিন্তু যদি তোমরা বৃষ্টির কারণে কষ্ট পাও অথবা অসুস্থ হও, তাহলে তোমাদের অস্ত্র নামিয়ে দেওয়ার কোন দোষ নেই, বরং সাবধানতা অবলম্বন করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।"

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৪:১০২, পৃষ্ঠা ৬২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও মহান আল্লাহ ফরজ নামাজ বাতিল করেননি, তিনি কেবল এটি পরিবর্তন করেছেন। অতএব, এই ঘটনা ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

জামে আত তিরমিযী, ২৬১৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো ফরজ নামাজ ত্যাগ করা।

আজকের যুগে এটা খুবই সাধারণ হয়ে উঠেছে। অনেকেই তুচ্ছ কারণে তাদের ফরজ নামাজ ছেড়ে দেয়, যার সবগুলোই নিঃসন্দেহে বাতিল। যদি যুদ্ধে লিপ্ত ব্যক্তির উপর থেকে নামাজের ফরজ তুলে না নেওয়া হয়, তাহলে অন্য কারো উপর থেকে কিভাবে তা তুলে নেওয়া যাবে? ৪র্থ অধ্যায় আন-নিসা, আয়াত ১০২:

"আর যখন তুমি [অর্থাৎ, সেনাবাহিনীর অধিনায়ক] তাদের মধ্যে থাকো এবং তাদের নামাজে ইমামতি করো, তখন তাদের একটি দল যেন তোমার সাথে [নামাজে] দাঁড়ায় এবং তারা যেন তাদের অস্ত্র বহন করে। আর যখন তারা সিজদা করে, তখন যেন তারা তোমার পিছনে থাকে এবং অন্য দল যারা [এখনও] নামাজ পড়েনি তাদের

এগিয়ে নিয়ে আসে এবং তারা যেন তোমার সাথে নামাজ পড়ে, সাবধানতা অবলম্বন করে এবং তাদের অস্ত্র বহন করে..."

মুসাফির বা অসুস্থ উভয়কেই তাদের ফরজ নামাজ আদায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় না। মুসাফিরদের উপর বোঝা কমানোর জন্য কিছু ফরজ নামাজে চক্রের সংখ্যা কমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে তা আদায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। ৪র্থ সূরা আন-নিসা, আয়াত ১০১:

"আর যখন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো, তখন নামায সংক্ষিপ্ত করার ক্ষেত্রে তোমাদের কোন দোষ নেই.."

অসুস্থদের পানির সংস্পর্শে আসার ফলে যদি তাদের ক্ষতি হয়, তাহলে শুকনো অযু করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সূরা ৫, আল মায়িদা, আয়াত ৬:

"...কিন্তু যদি তোমরা অসুস্থ হও, অথবা সফরে থাকো, অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে, অথবা তোমরা নারীদের সাথে যোগাযোগ করে পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি ব্যবহার করো এবং তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মুছে ফেলো..."

এছাড়াও, অসুস্থ ব্যক্তিরা তাদের জন্য সহজে ফরজ নামাজ আদায় করতে পারেন। অর্থাৎ, যদি তারা দাঁড়াতে না পারে তবে তাদের বসতে দেওয়া হবে এবং যদি তারা বসতে না পারে তবে তারা শুয়ে ফরজ নামাজ আদায় করতে পারবে। জামে আত তিরমিযীর ৩৭২ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু আবারও, অসুস্থ ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয় না যদি না তারা মানসিকভাবে অসুস্থ হয় যা তাদের নামাজের ফরজ বুঝতে বাধা দেয়।

আরেকটি প্রধান সমস্যা হলো, কিছু মুসলিম তাদের ফরজ নামাজ বিলম্বিত করে এবং সঠিক সময়ের চেয়ে বেশি সময় ধরে আদায় করে। এটি স্পষ্টতই পবিত্র কুরআনের বিরোধিতা করে কারণ মুমিনদেরকে তারা বলে বর্ণনা করা হয়েছে যারা তাদের ফরজ নামাজ সময়মতো আদায় করে। ৪র্থ সূরা আন নিসা, আয়াত ১০৩:

"...নিশ্চয়ই, নামাজ মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফরজ করা হয়েছে।"

অনেকে বিশ্বাস করেন যে পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি তাদের কথা বলে যারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে তাদের ফরজ নামাজ বিলম্বিত করে। এটি তাফসীরে ইবনে কাসির, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৬০৩-৬০৪-এ আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় ১০৭ আল মা'উন, আয়াত ৪-৫:

"অতএব দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নামাজ পড়ে। [কিন্তু] যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে গাফিল।"

এখানে মহান আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে তাদের অভিশাপ দিয়েছেন যারা এই খারাপ স্বভাব গ্রহণ করেছে। যদি তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে, তাহলে কীভাবে তারা এই পৃথিবীতে বা পরকালে সাফল্য পাবে?

সুনানে আন নাসায়ীর ৫১২ নম্বর হাদিসে মহানবী (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, ফরজ নামাজ অকারণে বিলম্বিত করা মুনাফিকির লক্ষণ। পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে যে, মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করবে তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো ফরজ নামাজ কায়াম না করা। ৭৪ সূরা আল-মুদ্দাছ্‌সির, আয়াত ৪২-৪৩:

"[এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে], "কিসে তোমাদের সাকারে প্রবেশ করানো হয়েছিল?" তারা বলবে, "আমরা নামাজ পড়তাম না।"

ফরজ নামাজ ত্যাগ করা এতটাই গুরুতর পাপ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৬২১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, যে কেউ এই পাপ করবে সে ইসলামে কুফরী করল।

তাছাড়া, অন্য কোন নেক আমল একজন মুসলিমের জন্য উপকারী হবে না যতক্ষণ না তার ফরজ নামাজ কায়েম হয়। সহীহ বুখারীতে পাওয়া ৫৫৩ নম্বর হাদিসে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি কেউ দুপুরের ফরজ নামাজ ত্যাগ করে,

তাহলে তার নেক আমল ধ্বংস হয়। যদি এই অবস্থায় একটি ফরজ নামাজ ত্যাগ করার হয়, তাহলে কি কেউ কল্পনা করতে পারে যে, সবগুলো ত্যাগ করার শাস্তি কী হতে পারে?

সহীহ মুসলিমের ২৫২ নম্বর হাদিসে সঠিক সময়ে ফরজ নামাজ আদায় করাকে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমলের মধ্যে একটি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, ফরজ নামাজ সময়ের চেয়ে বিলম্বিত করা বা সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজগুলির মধ্যে একটি।

সকল বয়স্কদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য যে তারা তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা শিশুদের ছোটবেলা থেকেই ফরজ নামাজ পড়তে উৎসাহিত করে, যাতে তারা আইনত বাধ্যতামূলক হওয়ার আগেই তা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। যারা প্রাপ্তবয়স্করা এটি বিলম্বিত করে এবং শিশুদের বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তারা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে। যেসব শিশুদের উপর ফরজ নামাজ ফরজ হওয়ার পরই ফরজ নামাজ আদায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছিল, তারা খুব কমই তা দ্রুত আদায় করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে তাদের বছরের পর বছর সময় লাগে। এবং এর জন্য দায় পরিবারের বয়স্কদের, বিশেষ করে পিতামাতার। এই কারণেই নবী মুহাম্মদ (সা.) সুনানে আবু দাউদের ৪৯৫ নম্বর হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, পরিবারগুলি তাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে ফরজ নামাজ পড়তে উৎসাহিত করে।

অনেক মুসলিমের আরেকটি প্রধান সমস্যা হলো, তারা হয়তো ফরজ নামাজ আদায় করে কিন্তু সঠিকভাবে আদায় করতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ, অনেকেই নামাজের ধাপগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করে না এবং তাড়াহুড়ো করে তা সম্পন্ন করে। বাস্তবে,

সহীহ বুখারির ৭৫৭ নম্বর হাদিসে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এভাবে নামাজ পড়ে সে মোটেও নামাজ পড়েনি। অর্থাৎ, তাকে নামাজ পড়া ব্যক্তি হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি এবং তাই তার ফরজ আদায় করা হয়নি। জামে আত তিরমিযির ২৬৫ নম্বর হাদিসে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি নামাজের প্রতিটি অবস্থানে স্থির থাকে না তার নামাজ কবুল হয় না।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সালাতে সঠিকভাবে রুকু বা সিজদা না করা ব্যক্তিকে সবচেয়ে খারাপ চোর হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মুওয়াত্তা মালিকের বই নম্বর ৯, হাদিস নম্বর ৭৫-এ প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম যারা দশকের পর দশক ধরে এই ধরণের ফরজ এবং নফল নামাজ আদায় করে আসছেন, তারা দেখতে পাবেন যে তাদের কেউই তাদের ফরজ আদায় করেনি এবং তাই তাদের সাথে এমন আচরণ করা হবে যারা তাদের ফরজ আদায় করেনি। সুনান আন নাসায়ীর ১৩১৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ৪৩:

"...এবং যারা [ইবাদত ও আনুগত্যে] রুকু করে তাদের সাথে রুকু করো।"

প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদিসের কারণে, কিছু নির্ভরযোগ্য আলেম মুসলিম পুরুষদের উপর এটিকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা

করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আবু দাউদের ৫৫০ নম্বর হাদিসে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, যারা মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ আদায় করবে না, তাদেরকে সাহাবীগণ (রাঃ) মুনাফিক বলে মনে করতেন। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এমনকি এমন লোকদের ঘর পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন যারা বৈধ ওজর ছাড়া জামাতের সাথে ফরজ নামাজ আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সহিহ মুসলিমের ১৪৮২ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যারা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার অবস্থানে আছেন তাদের তা করা উচিত। তাদের নিজেদেরকে বোকা বানানো উচিত নয় যে তারা তাদের পরিবারের সাথে ঘরের কাজে সাহায্য করার মতো অন্যান্য সৎকর্ম করছে। যদিও সহীহ বুখারী, ৬৭৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এটি মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একটি ঐতিহ্য, কিন্তু নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর ঐতিহ্যের গুরুত্ব পুনর্বিন্যাস করা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে কেউ এটি করে সে তার ঐতিহ্য অনুসরণ করছে না, বরং তারা কেবল নিজের ইচ্ছা অনুসরণ করছে, এমনকি যদি তারা কোনও সৎকর্মও করে। প্রকৃতপক্ষে, এই একই হাদিসটি উপদেশ দিয়ে শেষ হয় যে, যখন ফরজ নামাজের সময় হত, তখন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মসজিদে যাওয়া উচিত ছিল।

পবিত্র কুরআনে ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার কথা প্রায়শই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে কারণ এটি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক প্রমাণ। এছাড়াও, যেহেতু প্রতিদিনের নামাজগুলি বিস্তৃত, তাই এগুলি বিচার দিনের ধ্রুবক স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এর জন্য ব্যবহারিকভাবে প্রস্তুতি নেয়, কারণ ফরজ নামাজের প্রতিটি স্তর বিচার দিনের সাথে সম্পর্কিত। যখন কেউ সঠিক পথে দাঁড়াবে, তখন বিচারের দিন সে এভাবেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। সূরা ৮৩ আল মুতাফিফিন, আয়াত ৪-৬:

" তারা কি ভাবে না যে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে? এক মহাদিনের জন্য, যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে?"

যখন তারা রুকু করে, তখন এটি তাদের সেই অনেক লোকের কথা মনে করিয়ে দেয় যারা পৃথিবীতে তাদের জীবদ্দশায় মহান আল্লাহর কাছে রুকু না করার জন্য বিচারের দিনে সমালোচিত হবে। সূরা ৭৭ আল মুরসালাত, আয়াত ৪৮:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'নামাজে রুকু করো', তখন তারা রুকু করে না।"

এই সমালোচনার মধ্যে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ না করাও অন্তর্ভুক্ত। যখন কেউ নামাজে সিজদা করে , তখন এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিচারের দিনে মানুষকে মহান আল্লাহর কাছে সিজদা করার জন্য কীভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য করার জন্য সঠিকভাবে সিজদা করেনি, তারা বিচারের দিনে এটি করতে সক্ষম হবে না। সূরা ৬৮ আল-কালাম, আয়াত ৪২-৪৩:

"যেদিন পরিস্থিতি কঠিন হবে, সেদিন তাদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের চোখ অবনত হবে, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। আর তাদেরকে সুস্থ অবস্থায় সিজদা করার জন্য ডাকা হত।"

যখন কেউ নামাযে হাঁটু গেড়ে বসে, তখন এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে কিয়ামতের দিন তারা কীভাবে তাদের চূড়ান্ত বিচারের ভয়ে আল্লাহর সামনে এই অবস্থানে বসে থাকবে। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২৮:

"আর তুমি প্রত্যেক জাতিকে [ভয়ে] নতজানু দেখবে। প্রত্যেক জাতিকে তার আমলনামার দিকে ডাকা হবে [এবং বলা হবে], "আজ তোমাদেরকে তোমাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।"

যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে নামাজ পড়বে, সে তার নামাজ সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবে। এর ফলে তারা নামাজের মাঝখানে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে। সূরা ২৯, আল আনকাবুত, আয়াত ৪৫:

"...প্রকৃতপক্ষে, নামাজ অশ্লীলতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা, যা তাঁর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া

যখন মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে যিয়ারত করার জন্য রওনা হলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, তখন তাঁকে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। তখন মহানবী (সাঃ) দলটিকে মক্কায় প্রবেশের জন্য একটি বিকল্প পথ বেছে নেওয়ার নির্দেশ দেন যা ছিল রুক্ষ এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে এবং সহীহ বুখারী, ২৭৩১-২৭৩২ নম্বরে প্রাপ্ত হাদিসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ইমাম বুখারীর "আদাবুল মুফরাদ", ৪৯২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম কোন ধরণের শারীরিক অসুবিধার সম্মুখীন হয় না, তা সে যত বড়ই হোক না কেন, যেমন কাঁটা বিঁধলে, অথবা মানসিক চাপের মতো কোন মানসিক অসুবিধার সম্মুখীন হয় না, তবে আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে তার পাপ মোচন করেন।

এটি ছোট পাপকে বোঝায় কারণ বড় পাপের জন্য আন্তরিক তওবা প্রয়োজন। এই পরিণতি তখন ঘটে যখন একজন মুসলিম কঠিন পরিস্থিতির শুরু থেকে জীবনের শেষ অবধি ধৈর্য ধরে থাকে। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক লোক বিশ্বাস করে যে তারা প্রথমে অভিযোগ করতে পারে এবং পরে ধৈর্য প্রদর্শন করতে পারে। এটি প্রকৃত ধৈর্য নয় বরং এটি কেবল সময়ের সাথে সাথে গ্রহণযোগ্যতা। সুনানে আন নাসায়ী, ১৮৭০ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে। এছাড়াও, একজন ব্যক্তির জীবন জুড়ে ধৈর্য প্রদর্শন করা প্রয়োজন কারণ একজন ব্যক্তি অধৈর্য দেখিয়ে তার সওয়াব নষ্ট করতে পারে।

একজন মুসলিমের মনে রাখা উচিত যে, এই ছোট ছোট পাপগুলো মুছে ফেলা অনেক ভালো, বরং সেগুলো ধরে রেখে কিয়ামত পর্যন্ত পৌঁছানোর চেয়ে। একজন মুসলিমের উচিত তাদের ছোট ছোট পাপগুলো মুছে ফেলার জন্য ক্রমাগত অনুতপ্ত হওয়া এবং সৎকর্ম সম্পাদনের চেষ্টা করা। এবং যদি তারা কোনও শারীরিক বা মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাহলে তাদের ধৈর্য ধরে তাদের ছোট ছোট পাপগুলো মুছে ফেলার এবং অগণিত প্রতিদান পাওয়ার আশা করা উচিত। সূরা আয-যুমার, আয়াত ১০:

"...নিশ্চয়ই, ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান বিনা হিসাব [অর্থাৎ, সীমা] দেওয়া হবে।"

ভালো জিনিস গ্রহণ করা

যখন মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে যিয়ারত করার জন্য রওনা হলেন, তখন তাঁকে সতর্ক করা হল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। অবশেষে, যখন তারা হুদাইবিয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেল, তখন মহানবী (সাঃ) এর উট বসে পড়ল এবং আর এগোতে অস্বীকৃতি জানাল। মহানবী (সাঃ) বুঝতে পারলেন যে মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে এই অঞ্চলে থাকাই তাদের জন্য সর্বোত্তম। তিনি সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, হুদাইবিয়াতে শিবির স্থাপনের নির্দেশ দিলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, সেদিন মক্কার অমুসলিম নেতারা তাঁর কাছে যা কিছু অনুরোধ করবেন তিনি তা গ্রহণ করবেন, যতক্ষণ না তা আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করে। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৪-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং সহীহ বুখারী, ২৭৩১-২৭৩২ নম্বরে প্রাপ্ত হাদিসে লিপিবদ্ধ আছে।

এই ঘটনাটি এমন বিষয়গুলিতে একগুঁয়েমি এড়ানোর গুরুত্ব নির্দেশ করে যা মহান আল্লাহর আনুগত্যের পরিপন্থী নয়।

কেউ কেউ পার্থিব বিষয়ে একগুঁয়েমি অবলম্বন করে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের চরিত্রের উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে না। বরং, তারা তাদের মনোভাবের উপর অবিচল থাকে এই বিশ্বাস করে যে এটি তাদের মহান শক্তি এবং প্রজ্ঞার লক্ষণ। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অবিচলতা একটি প্রশংসনীয় মনোভাব কিন্তু বেশিরভাগ পার্থিব বিষয়ে এটিকে কেবল একগুঁয়েমি বলা হয়, যা নিন্দনীয়।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে যদি তারা তাদের মনোভাব পরিবর্তন করে তবে এটি দুর্বলতা প্রদর্শন করে অথবা এটি দেখায় যে তারা তাদের দোষ স্বীকার করছে এবং এই কারণে তারা একগুঁয়েভাবে উন্নতির জন্য পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়। প্রাপ্তবয়স্করা অপরিণত শিশুদের মতো আচরণ করে, তারা বিশ্বাস করে যে যদি তারা তাদের আচরণ পরিবর্তন করে তবে এর অর্থ হল তারা হেরে গেছে, অন্যদিকে যারা তাদের মনোভাবের উপর অটল থাকে তারা জিতেছে। এটি কেবল শিশুসুলভ।

বাস্তবে, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয়ে অবিচল থাকবেন কিন্তু পার্থিব বিষয়ে তারা তাদের জীবনকে সহজ করার জন্য যতক্ষণ না পাপ না হয় ততক্ষণ তাদের মনোভাব পরিবর্তন করবেন। তাই নিজের জীবনকে উন্নত করার জন্য পরিবর্তন করা দুর্বলতার লক্ষণ নয়, বরং এটি বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।

অনেক ক্ষেত্রেই, একজন ব্যক্তি তার মনোভাব পরিবর্তন করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তার জীবনের অন্যদের কাছ থেকে, যেমন তার আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে, তাদের পরিবর্তন আশা করে। কিন্তু প্রায়শই যা ঘটে তা হল একগুঁয়েমির কারণে সবাই একই অবস্থায় থাকে যা কেবল নিয়মিত মতবিরোধ এবং তর্কের দিকে পরিচালিত করে। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বোঝেন যে যদি তার চারপাশের লোকেরা তাদের উন্নতির জন্য পরিবর্তন না করে যা তাদের উচিত ছিল। এই পরিবর্তন তাদের জীবনের মান এবং অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্কের উন্নতি করবে যা মানুষের সাথে বৃত্তাকার তর্ক করার চেয়ে অনেক ভালো। এই ইতিবাচক মনোভাব অবশেষে অন্যদের তাদের সম্মান করতে বাধ্য করবে কারণ একজনের চরিত্রকে আরও ভালো করার জন্য প্রকৃত শক্তির প্রয়োজন হয়।

যারা একগুঁয়ে থাকে তারা সবসময় এমন কিছু খুঁজে পাবে যা তাদের জীবন থেকে শান্তি কেড়ে নেবে। এর ফলে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে, যেমন তাদের মানসিক স্বাস্থ্যে আরও সমস্যা দেখা দেবে। কিন্তু যারা মানিয়ে নেয় এবং উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে, তারা সর্বদা শান্তির এক স্তর থেকে অন্য স্তরে চলে যাবে। যদি কেউ এই শান্তি অর্জন করে, তাহলে কি অন্যরা বিশ্বাস করে যে তারা কেবল ভুল ছিল বলেই তারা বদলেছে, তাতে কি সত্যিই কিছু আসে যায়?

পরিশেষে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীসের উপর অবিচল থাকা প্রশংসনীয়। কিন্তু পার্থিব বিষয়গুলিতে এবং যেখানে কোনও পাপ করা হয়নি, সেখানে একজন ব্যক্তির উচিত তাদের মনোভাব পরিবর্তন করা এবং মানিয়ে নেওয়া শেখা যাতে তারা এই পৃথিবীতে কিছুটা শান্তি খুঁজে পায়।

ধার্মিকতার জন্য পরীক্ষিত

যখন মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে যিয়ারতের জন্য বের হন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তখন অমুসলিমরা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং ফলস্বরূপ তারা মক্কার কাছে হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপন করে। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে এবং সহীহ বুখারী, সংখ্যা ২৭৩১-২৭৩২-এ প্রাপ্ত হাদিসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এই সময়, মহানবী (সাঃ) মন্তব্য করেছিলেন যে মক্কার অমুসলিমদের নেতাদের তাদের মন্দ কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ মহান আল্লাহ এমন একজনকে প্রেরণ করেছেন যিনি ইসলামের সমর্থনে তাদের গর্দানে আঘাত করবেন এবং যার হৃদয় আল্লাহ তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করেছেন। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি কাদের কথা বলছেন, তখন তিনি আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ)-এর দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, ২৪৫১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারে না যতক্ষণ না সে এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা তার ধর্মের জন্য ক্ষতিকর নয়, এই সতর্কতার সাথে যে এটি ক্ষতিকর কিছুর দিকে পরিচালিত করবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, তাকওয়া বলতে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া বোঝায়। এর মধ্যে মানুষের অধিকার পূরণ করা অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে অন্যদের সাথে সেই আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত যা মানুষ তার সাথে আচরণ করতে চায়।

ধার্মিকতার একটি দিক হলো সন্দেহজনক জিনিস এড়িয়ে চলা, কেবল অবৈধ নয়। কারণ সন্দেহজনক জিনিস একজন মুসলিমকে হারাম জিনিসের এক ধাপ কাছাকাছি নিয়ে যায়। হারাম জিনিস যত কাছে যায়, তার জন্য এতে পতিত হওয়া তত সহজ। এই কারণেই জামে আত তিরমিযীতে ১২০৫ নম্বর হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি হারাম এবং সন্দেহজনক জিনিস এড়িয়ে চলে এবং কেবল হালাল জিনিস ব্যবহার করে, সে তার ধর্ম ও সম্মান রক্ষা করবে।

সমাজে যারা বিপথগামী হয়ে পড়েছে তাদের যদি কেউ লক্ষ্য করে, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি হঠাৎ করে ঘটেনি, ধীরে ধীরে ঘটেছিল। অর্থাৎ, ব্যক্তি প্রথমে সন্দেহজনক জিনিসগুলিতে লিপ্ত হয়েছিল এবং তারপর অবৈধ জিনিসগুলিতে লিপ্ত হয়েছিল। এই কারণেই ইসলাম জীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় কারণ এটি তাকে অবৈধ জিনিসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা, যার অর্থ, এমন কথা যা কোনও উপকার করে না এবং এটি কোনও পাপও নয়, প্রায়শই মন্দ কথাবার্তার দিকে পরিচালিত করে, যেমন গীবত, মিথ্যা এবং অপবাদ। যদি কোনও ব্যক্তি প্রথম পদক্ষেপটি অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় লিপ্ত না হয়ে এড়িয়ে চলে তবে সে মন্দ কথাবার্তা এড়িয়ে চলবে। এই প্রক্রিয়াটি অপ্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় এবং বিশেষ করে সন্দেহজনক সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অতএব, একজন মুসলিমের পূর্বে বর্ণিত ধর্মপরায়ণতা অবলম্বন করার চেষ্টা করা উচিত, যার একটি শাখা হল অপ্রয়োজনীয়

এবং সন্দেহজনক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলা, কারণ ভয়ে যে তারা অবৈধ জিনিসের দিকে নিয়ে যাবে।

শুভেচ্ছা

যখন মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে যিয়ারত করার জন্য বের হলেন, তখন অমুসলিমরা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং ফলস্বরূপ তারা মক্কার কাছে হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপন করে। মক্কার অমুসলিম নেতারা ৪০ থেকে ৫০ জন লোককে প্রেরণ করেন যারা একজন সাহাবীকে বন্দী করার জন্য মহানবী (সাঃ) এর শিবির ঘেরাও করে। কিন্তু এই বাহিনী সাহাবীদের দ্বারা বন্দী হয়ে যায় এবং তাদেরকে নবী (সাঃ) এর কাছে বন্দী করে উপস্থাপন করা হয়। তাদের শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন এবং তাদের সকলকে মুক্ত করে দেন। এই বিষয়ে আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা আল-ফাতহ, আয়াত ২৪ নাযিল করেন:

"আর তিনিই সেইজন যিনি তোমাদের উপর বিজয়ী করার পর মক্কার ভেতরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলেন। তোমরা যা করছো আল্লাহ তা সর্বদাই দেখেন।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

তাদের শাস্তি দিলে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেত, যার ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ এবং প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে পারত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বদা উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি কামনা করেছিলেন বলে এটি প্রতিরোধ করেছিলেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি এমন পদক্ষেপ গ্রহণের গুরুত্ব নির্দেশ করে যা

মানুষের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করে এমন পদক্ষেপের পরিবর্তে মানুষের মধ্যে পুনর্মিলনের দিকে পরিচালিত করে। প্রয়োজনে আত্মরক্ষা করতে একজন মুসলিমের ভয় পাওয়া উচিত নয়, তবে তাদের প্রাথমিক মনোভাব হওয়া উচিত মানুষের মধ্যে পুনর্মিলন এবং শান্তি।

বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ

যখন মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে যিয়ারত করার জন্য বের হলেন, তখন অমুসলিমরা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং ফলস্বরূপ তারা মক্কার কাছে হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপন করে। মক্কার অমুসলিমদের নেতারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মক্কায় আসার উদ্দেশ্য জানতে তাঁর সাথে কথা বলার জন্য বিভিন্ন লোক পাঠান। মহানবী (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে বলেছিলেন যে তিনি কেবল শান্তিতে যিয়ারত (উমরা) করতে চান। মক্কার অমুসলিম নেতাদের দ্বারা প্রেরিত এই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন উরওয়া বিন মাসউদ। সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, এবং গোত্র, জাতি এবং সামাজিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কতটা পার্থক্য রয়েছে তা দেখার পর তিনি মন্তব্য করেন যে, মক্কার অমুসলিমরা যদি তাদের উপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। উরওয়া বিশ্বাস করতেন যে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে থেকে যুদ্ধ করবেন এবং তাঁর নিজের গোত্রের লোকেরাই থাকবেন। তিনি এবং আরও অনেকে বিশ্বাস করতেন যে, এই গোত্রীয় সম্পৃক্ততাই তাদের কাছে সবকিছু। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে এবং সহীহ বুখারী, ২৭৩১-২৭৩২ নম্বরে প্রাপ্ত হাদিসে এটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি অন্যান্য সকল বন্ধনের উপর ঈমান এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে বন্ধন গঠনের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সময়ের সাথে সাথে মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একে অপরের সাথে তাদের একসময়ের দৃঢ় সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে। এর অনেক কারণ আছে কিন্তু একটি প্রধান কারণ হল তাদের পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা যে ভিত্তির উপর তাদের

সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। এটা সর্বজনবিদিত যে যখন একটি ভবনের ভিত্তি দুর্বল হয় তখন সময়ের সাথে সাথে ভবনটি হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমনকি ভেঙে পড়ে। একইভাবে, যখন মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ভিত্তি সঠিক না হয় তখন তাদের মধ্যে বন্ধন অবশেষে দুর্বল হয়ে পড়ে এমনকি ভেঙে যায়। যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাহাবীদের (রাঃ) একত্রিত করেছিলেন, তখন তিনি তাদের মধ্যে বন্ধন তৈরি করেছিলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। যদিও, আজকের বেশিরভাগ মুসলিম গোত্রপ্রথা, ভ্রাতৃত্ব এবং অন্যান্য পরিবারের কাছে প্রদর্শনের জন্য। যদিও, বেশিরভাগ সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, আত্মীয় ছিলেন না কিন্তু যেহেতু তাদের সংযোগ স্থাপনের ভিত্তি সঠিক ছিল, অর্থাৎ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাদের বন্ধন আরও শক্তিশালী হতে থাকে। যদিও আজকাল অনেক মুসলিম রক্তের সম্পর্কযুক্ত, তবুও সময়ের সাথে সাথে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে কারণ তাদের বন্ধনের ভিত্তি ছিল মিথ্যা, যেমন গোত্রবাদ এবং অনুরূপ জিনিসের উপর ভিত্তি করে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, যদি তারা তাদের বন্ধন টিকে থাকতে এবং আত্মীয়তার বন্ধন এবং অ-আত্মীয়দের অধিকার রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য সওয়াব অর্জন করতে চায়, তাহলে তাদের কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই বন্ধন তৈরি করতে হবে। এর ভিত্তি হল, মানুষ কেবল একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করবে এবং এমনভাবে কাজ করবে যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে। পবিত্র কুরআনে এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৫ম সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ২:

"...এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

সত্যিকারের ভালোবাসা দেখানো

যখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে যিয়ারত করার জন্য বের হলেন, তখন অমুসলিমরা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং ফলস্বরূপ তারা মক্কার কাছে হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপন করে। মক্কার অমুসলিম নেতারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে কথা বলার জন্য বিভিন্ন লোক পাঠান। এই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন উরওয়া বিন মাসউদ। উরওয়া সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি যে অগাধ ভালোবাসা ছিল তা লক্ষ্য করেন। মক্কার অমুসলিম নেতাদের কাছে ফিরে এসে তিনি ঘোষণা করেন যে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যখনই অযু করতেন, তখন তাঁর সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, তাঁর ব্যবহৃত পানির জন্য প্রতিযোগিতা করতেন। তিনি যদি সাহাবীদের উপর থুথু ফেলেন, তাহলে তা মাটিতে পড়তে দেবেন না। আর যদি তাঁর চুল পড়ে যায়, তাহলে তারা তার চুলের জন্য প্রতিযোগিতা করতেন। তিনি উপসংহারে পৌঁছেছেন যে তিনি পারস্যের রাজা কসরু, রোমান রাজা সিজার এমনকি ইথিওপিয়ার রাজা নাজ্জাশীকেও দেখেছেন, কিন্তু সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, তাদের নেতা, মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি যে ভক্তি ও ভালোবাসা ছিল তা তিনি কখনও দেখেননি। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৬-২২৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে এবং সহীহ বুখারী, সংখ্যা ২৭৩১-২৭৩২-এ প্রাপ্ত হাদিসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, তাঁর শিক্ষা বাস্তবিকভাবে অনুসরণ করে মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাদের ভালোবাসার প্রমাণ দিয়েছিলেন।

প্রতিটি মুসলিম খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করে যে তারা পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), অন্যান্য নবীগণ, সাহাবীগণ এবং সাহাবীগণের সাহচর্য কামনা করে। তারা প্রায়শই সহীহ বুখারীতে ৩৬৮৮ নম্বর হাদিসটি উদ্‌ধৃত করে, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে একজন ব্যক্তি পরকালে যাদের ভালোবাসে তাদের সাথেই থাকবে। এবং এই কারণে তারা খোলাখুলিভাবে আল্লাহর এই নেক বান্দাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা ঘোষণা করে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তারা কীভাবে এই পরিণতি কামনা করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসার দাবি করে, অথচ তারা তাঁকে খুব কমই চেনে কারণ তারা তাঁর জীবন, চরিত্র এবং শিক্ষা অধ্যয়ন করতে ব্যস্ত। এটা বোকামি কারণ একজন ব্যক্তি কীভাবে সত্যিকার অর্থে এমন কাউকে ভালোবাসতে পারে যাকে তারা চেনেই না?

তাছাড়া, যখন এই লোকদের কাছে মহানবী (সাঃ) এর প্রতি তাদের ভালোবাসার প্রমাণ চাওয়া হবে, তখন বিচার দিবসে তারা কী বলবে? তারা কী উপস্থাপন করবে? এই ঘোষণার প্রমাণ হলো মহানবী (সাঃ) এর জীবন, চরিত্র এবং শিক্ষা অধ্যয়ন করা এবং তার উপর আমল করা। এই প্রমাণ ছাড়া কোন ঘোষণা মহান আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। এটি বেশ স্পষ্ট কারণ সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, তাদের চেয়ে ইসলামকে আর কেউ ভালোভাবে বুঝতে পারেনি এবং এটি তাদের মনোভাব ছিল না। তারা মহানবী (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা ঘোষণা করেছিলেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কর্মের মাধ্যমে তাদের দাবিকে সমর্থন করেছিলেন। এই কারণেই তারা পরকালে তাঁর সাথে থাকবেন।

যারা বিশ্বাস করে যে ভালোবাসা হৃদয়ে থাকে এবং কাজে তা প্রকাশের প্রয়োজন হয় না, তারা সেই ছাত্রের মতোই বোকা, যে তার শিক্ষকের কাছে খালি পরীক্ষার খাতা ফেরত দিয়ে দাবি করে যে জ্ঞান তার মনে আছে তাই তাকে বাস্তবে তা কাগজে লিখে রাখার প্রয়োজন নেই এবং তারপরও সে পাস করার আশা করে।

যে ব্যক্তি এমন আচরণ করে, সে আল্লাহর নেক বান্দাদের ভালোবাসে না, কেবল তাদের নিজেদের কামনা-বাসনাকেই ভালোবাসে এবং নিঃসন্দেহে শয়তান তাদের বোকা বানিয়েছে।

পরিশেষে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যান্য ধর্মের সদস্যরাও তাদের পবিত্র নবীদের প্রতি ভালোবাসার দাবি করে, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। কিন্তু যেহেতু তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে এবং তাদের শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই বিচারের দিনে তারা অবশ্যই তাদের সাথে থাকবে না। এই সত্যটি যদি কেউ একবার চিন্তা করে দেখে তবে এটি বেশ স্পষ্ট।

নমনীয় হওয়া

যখন মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে যিয়ারত করার জন্য বের হন, তখন অমুসলিমরা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং ফলস্বরূপ তারা মক্কার কাছে হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপন করে। মক্কার অমুসলিম নেতারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে কথা বলার জন্য বিভিন্ন লোক পাঠান। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলামের শিক্ষার সাথে আপস না করে প্রতিটি রাষ্ট্রদূতের সাথে তাদের মানসিকতা অনুসারে আচরণ করেন, তাদের উদ্দেশ্য প্রদর্শন করার জন্য এবং তাদের বোঝানোর জন্য যে ইসলাম অবশেষে মক্কার অমুসলিমদের উপর বিজয়ী হবে। এই রাষ্ট্রদূতদের প্রত্যেকে মক্কার অমুসলিমদের কাছে ফিরে এসে সতর্ক করে দেন যে তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেবেন না এবং যুদ্ধে উস্কানি দেবেন না। উদাহরণস্বরূপ, হাবশীদের একজন নেতা হুলাইসকে মক্কার অমুসলিমরা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। মহানবী (সাঃ) জানতেন যে হুলাইস ছিলেন সেই সময়ের ধর্মীয় রীতিনীতি, বিশেষ করে পবিত্র হজ্জ (হজ্জ) এবং যিয়ারতের (উমরা) রীতিনীতির প্রতি নিবেদিতপ্রাণ, তাই তিনি তাঁর সামনে থেকে কোরবানির পশু তাড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সাহাবীদের (আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন) বললেন, যেন তারা যিয়ারতের (উমরা) নিয়ত উচ্চস্বরে উচ্চারণ করে। হুলাইস যখন এই ঘটনাটি লক্ষ্য করলেন, তখন আরবদের রীতিনীতির প্রতি তার চরম ভক্তি তাকে আকৃষ্ট করে এবং তিনি মহানবী (সাঃ) এর সাথে দেখা করার আগেই মক্কার অমুসলিমদের কাছে ফিরে যান এবং দাবি করেন যে তারা তাকে মক্কায় প্রবেশের অনুমতি দিক। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৬-২২৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে, সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত হাদিসগুলিতে এটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সংখ্যা ২৭৩১-২৭৩২ এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর (সাঃ) মহানবী (সাঃ) এর নোবেল জীবন", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫০৭-১৫০৮-এ এটি উল্লেখ করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দেখানো এই অভিযোজিত আচরণটি গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আচরণে একগুঁয়েমি কেবল অনেক বিরোধ এবং সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একজন মুসলিমকে ইসলামের শিক্ষার উপর দৃঢ় থাকতে হবে এবং এর বিরোধিতা এড়িয়ে চলতে হবে। কিন্তু যেখানে নিজের আচরণের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে না, সেখানে একজন মুসলিমের উচিত নিজের এবং অন্যদের উপকারের জন্য তাদের আচরণকে অভিযোজিত করা। এটি এমন কিছুর অনুরূপ যখন মানুষ নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে যা তাদের জীবনকে উন্নত করে যতক্ষণ না এটি ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয়, যেমন পরিবহনের জন্য পশুর পরিবর্তে গাড়ি ব্যবহার করা।

তাড়াহুড়ো করে আচরণ করা এড়িয়ে চলুন

যখন মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে যিয়ারত করার জন্য বের হলেন, তখন অমুসলিমরা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং ফলস্বরূপ তারা মক্কার কাছে হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপন করে। মহানবী (সাঃ) খারাশ ইবনে উমাইয়া (রাঃ)-কে মক্কার অমুসলিমদের কাছে তাঁর দূত হিসেবে প্রেরণ করেন যাতে তারা তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন। খারাশ (রাঃ)-এর মক্কায় প্রবেশের পর অমুসলিমরা তৎক্ষণাৎ তাঁর উটকে হত্যা করে এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হয়, ঠিক তখনই মক্কার অমুসলিমদের দূত হুলাইস (রাঃ)-কে নবী (সাঃ)-এর কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। খারাশ, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে ফিরে আসেন, কিন্তু পরবর্তীরা একজন রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করার চেষ্টা করার বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে তাড়াহুড়ো করে আচরণ করেননি, যা ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হত, এবং পরিবর্তে অন্য একজন রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করতে চেয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৭ এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী-র, নবীর নোবেল জীবন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫০৯-১৫১০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

তাড়াহুড়ো করে কাজ করলে অনেক মানুষের মৃত্যু হত, যা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ধৈর্য ধরে এড়িয়ে যেতেন।

জামে আত তিরমিযী, ২০১২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, চিন্তাভাবনা করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর তাড়াহুড়ো করা শয়তানের পক্ষ থেকে।

এটি বোঝা এবং আমল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা, কারণ মুসলমানরা যারা অনেক সৎকর্ম করে তারা প্রায়শই তাড়াহুড়ো করে তাদের ধ্বংস করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা রাগের বশে কিছু খারাপ কথা বলতে পারে যা তাদের বিচারের দিনে জাহান্নামে নিমজ্জিত করতে পারে। জামে আত তিরমিযী, ২৩১৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বেশিরভাগ পাপ এবং সমস্যা, যেমন তর্ক, এর কারণ হল মানুষ সবকিছু ঠিকঠাকভাবে চিন্তা করতে ব্যর্থ হয় এবং তাড়াহুড়ো করে কাজ করে। বুদ্ধিমানের লক্ষণ হল যখন কেউ কথা বলার বা কাজ করার আগে চিন্তা করে এবং কেবল তখনই তাড়াহুড়ো করে যখন সে জানে যে তার কথা বা কাজ পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়ে ভালো এবং উপকারী।

যদিও একজন মুসলিমের সৎকর্ম সম্পাদনে দেরি করা উচিত নয়, তবুও সেগুলি করার আগে তাদের অবশ্যই সবকিছু ভেবে দেখা উচিত। কারণ একজন ব্যক্তির তাড়াহুড়োর কারণে তার শর্তাবলী এবং শিষ্টাচার পূরণ না হওয়ার কারণে কোনও সৎকর্মের কোনও প্রতিদান নাও পেতে পারে। এই ক্ষেত্রে, যে কোনও বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার পরেই কেবল এগিয়ে যাওয়া উচিত।

যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে, সে কেবল তার পাপ কমাবে না এবং মহান আল্লাহর প্রতি তার আনুগত্য বৃদ্ধি করবে না, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তারা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হবে, যেমন তর্ক, অসুবিধা এবং মতবিরোধ, তাও কমাবে।

নেতাদের প্রতি আন্তরিক হওয়া

যখন মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে যিয়ারত করার জন্য বের হন, তখন অমুসলিমরা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং ফলস্বরূপ তারা মক্কার কাছে হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপন করে। মহানবী (সাঃ) তখন উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-কে মক্কার অমুসলিমদের কাছে তাঁর দূত হিসেবে প্রেরণ করতে চান যাতে সংঘর্ষ এড়ানো যায় এবং তাঁর শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য স্পষ্ট করা যায়। উমর তাকে উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-কে প্রেরণ করার পরামর্শ দেন, কারণ তিনি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তাদের প্রতি তাঁর কঠোর মনোভাবের কারণে অমুসলিমরা তাঁর উপর ক্ষুব্ধ ছিল। উপরন্তু, উসমান (রাঃ)-কে সহজেই মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সুরক্ষা পেতেন। মহানবী (সাঃ)-এর সুপারিশ গ্রহণ করেন। ইমাম ইবনে কাথিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর (রাঃ) মহানবী (সাঃ) এর দূত হিসেবে এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারতেন, যা স্পষ্টতই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত দিত। কিন্তু তাঁর নেতা, মহানবী (সাঃ) এর প্রতি আনুগত্য এবং আন্তরিকতার কারণে, তিনি এই ভূমিকার জন্য আরও উপযুক্ত কাউকে সুপারিশ করেছিলেন।

সহীহ মুসলিমের ১৯৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, ইসলাম হলো সমাজের নেতাদের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সদয়ভাবে তাদের সর্বোত্তম পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো যেকোনো প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়া। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, ৫৬ নম্বর বই এবং ২০ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। ৪র্থ অধ্যায় আন-নিসা, ৫৯ নম্বর আয়াত:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী..."

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত একটি কর্তব্য যতক্ষণ না কেউ মহান আল্লাহর অবাধ্যতা না করে। সৃষ্টির প্রতি আনুগত্য যদি স্রষ্টার অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে তবে তা নেই। এই ধরণের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এড়ানো উচিত কারণ এটি কেবল নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে নেতাদেরকে মৃদুভাবে ভালোর উপদেশ দেওয়া এবং মন্দের নিষেধ করা উচিত। অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা যদি সঠিক পথে থাকেন তবে সাধারণ মানুষও সঠিক থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভণ্ডামির লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলা উচিত। আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে সমাজকে কল্যাণের উপর ঐক্যবদ্ধ করে এমন বিষয়ে তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী যেকোনো কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করা। ইসলামে নেতাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য নেই, কেবল এমন বিষয়ে তাদের আনুগত্য করা যা মহান আল্লাহকে খুশি করে।

সরল পথ মেনে চলুন

যখন মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে যিয়ারত করার জন্য বের হন, তখন অমুসলিমরা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং ফলস্বরূপ তারা মক্কার কাছে হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপন করে। মহানবী (সাঃ) অবশেষে উসমান বিন আফফান (রাঃ)-কে মক্কার অমুসলিম নেতাদের কাছে তাঁর শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্য তাঁর দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। উসমান (রাঃ)-এর এই বার্তা পৌঁছানোর পর, তাঁকে আল্লাহর ঘর কাবা প্রদক্ষিণ করার অনুমতি দেওয়া হয় কিন্তু তিনি উত্তর দেন যে, মহানবী (সাঃ)-এর আগে তিনি কখনও তা করতে পারবেন না। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

অর্থ গ্রহণের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী (সাঃ)-এর ঐতিহ্যের প্রতি কঠোরভাবে আনুগত্য প্রকাশ করা, এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎসের বাইরে কিছু করার পরিবর্তে, যার মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর কাজ করা অন্তর্ভুক্ত, এমনকি যদি তা সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করা হয়, এমনকি যদি তা সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে, ততই তারা দিকনির্দেশনার দুটি উৎসের উপর কাজ করবে না, যা ফলস্বরূপ বিভ্রান্তির দিকে পরিচালিত করে। এই কারণেই মহানবী (সাঃ) সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনও বিষয় যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করবেন। উপরন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করা হবে, তত বেশি তারা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে এমন জিনিসগুলিতে কাজ করতে শুরু করবে। এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে বিপথগামী করে। উদাহরণস্বরূপ, সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা

করে এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রাখে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পা দেবে এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করবে যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথেও সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান নির্দেশনার দুটি উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বিভ্রান্তিকর অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফর, যেমন কালো জাদু অনুশীলন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"... সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

সুতরাং একজন মুসলিম অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রয়েছে। এই কারণেই ধর্মীয় উদ্ভাবনগুলিতে কাজ করা যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

রিদওয়ানের বাইয়াত

দাসত্বের শপথ

যখন মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে যিয়ারত করার জন্য বের হলেন, তখন অমুসলিমরা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং ফলস্বরূপ তারা মক্কার কাছে হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপন করে। মহানবী (সাঃ) অবশেষে উসমান বিন আফফান (রাঃ)-কে মক্কার অমুসলিম নেতাদের কাছে তাঁর শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্য তাঁর দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। উসমান (রাঃ)-এর এই বার্তা পৌঁছানোর পর, মক্কার অমুসলিমরা তাঁকে আটক করে। মহানবী (সাঃ)-এর কাছে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে উসমান (রাঃ)-কে শহীদ করা হয়েছে। তিনি সাহাবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, উসমানের প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তারা মক্কা ত্যাগ করবেন না, কারণ তিনি কেবল নিরস্ত্র অবস্থায়ই মক্কায় প্রবেশ করেননি বরং মহানবী (সাঃ)-এর দূত হিসেবেও। রাষ্ট্রদূতদের সাথে সর্বদা সম্মানের সাথে আচরণ করা হয়েছে এবং তাদের ক্ষতি করা যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। আজকের যুগেও এটি সত্য। বাইয়াতের সময় মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর এক হাত অন্য হাতের উপর রেখে মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁর হাত উসমান (রাঃ) এর হাত এবং আল্লাহ, মহিমান্বিত, এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকারের প্রতিনিধিত্ব করে। এই প্রসঙ্গে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, অসংখ্য আয়াত নাযিল করেছেন, যেমন সূরা আল-ফাতহ, আয়াত ১০:

"যারা তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা আসলে আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। সুতরাং যে ব্যক্তি তার

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, সে কেবল নিজের ক্ষতির জন্যই তা ভঙ্গ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রতিশ্রুতি পূরণ করে, তিনি তাকে মহান প্রতিদান দেবেন।"

এবং ৪৮তম অধ্যায় আল-ফাতহ, আয়াত ১৮:

"যখন মুমিনরা গাছের নীচে তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ করেছিল, তখন আল্লাহ অবশ্যই তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি তাদের অন্তরে যা ছিল তা জানতেন, তাই তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয়ের পুরস্কার দিলেন।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ)-এর জীবনী", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৭-২২৮ এবং সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত ৪০৬৬ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মানবজাতির জন্য আল্লাহর সাথে করা অঙ্গীকার পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ, যা পবিত্র কুরআনের ৭ম সূরা আল-আ'রাফের ১৭২-১৭৩ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

" আর [স্মরণ করো] যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের কোমর থেকে তাদের বংশধরদের বের করেছিলেন এবং তাদের নিজেদের উপর সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, [তাদেরকে], "আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?" তারা বলল, "হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য

দিয়েছি।" [এটা] - যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন না বলো, "আমরা এ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম।" অথবা [যাতে] তোমরা না বলো, "আমাদের পূর্বপুরুষরা পূর্বে আল্লাহর সাথে [অন্যদের উপাসনা] করেছিল, এবং আমরা তাদের পরে কেবল বংশধর ছিলাম। তাহলে কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে মিথ্যাবাদীদের কৃতকর্মের জন্য?"

সকল মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তারা মহান আল্লাহর কাছে এই অঙ্গীকার করতে পারে। এই ঘটনার পেছনে যে শিক্ষাটি বোঝা যায় তা হলো, সকল মানুষ মহান আল্লাহকে তাদের প্রভু হিসেবে মেনে নিয়েছে। অর্থাৎ, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাদের লালন-পালন করেন এবং যিনি বিচারের দিন তাদের কর্মের বিচার করবেন। সকল মুসলমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক ও শারীরিক শান্তি লাভ করতে পারে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

মূল আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে, মহান আল্লাহ সৃষ্টিকে জিজ্ঞাসা করেননি যে তারা কি তাঁর বান্দা কিনা, বরং তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি কি তাদের প্রভু। এটি একটি ইঙ্গিত যে, মহান আল্লাহর ইচ্ছা সর্বদা একজন ব্যক্তির ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষার আগে আসা উচিত। যদি একজন মুসলিমের কাছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা বা অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকে, তাহলে

এই অঙ্গীকার তাদের মনে করিয়ে দেবে যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অবশ্যই প্রথমে আসবে।

এই প্রশ্নটিও মহান আল্লাহর অসীম করুণার ইঙ্গিত দেয়, কারণ তিনি সৃষ্টির উত্তরের ইঙ্গিত দিয়েছেন যেমনটি তিনি করেছিলেন। এটি মুসলমানদের দেখায় যে যদিও মহান আল্লাহ হলেন প্রভু যিনি তাদের কর্মের বিচার করবেন, তবুও তিনি অসীম করুণাময়।

এই চুক্তির প্রভাব সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ে গভীরভাবে গেঁথে আছে। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিমের ৬৭৫৫ নম্বর হাদিসে এই প্রকৃতির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের পক্ষে আগে থেকে মন স্থির করে সত্য অনুসন্ধান করা এবং তারপর তাদের পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসকে সমর্থন করে এমন প্রমাণ অনুসন্ধান করা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যারা পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত না নিয়ে তাদের মন খুলে দেয়, তারাই এই চুক্তির উন্মোচন করতে পারবে যা তাদের হৃদয়ের গভীরে গেঁথে আছে। প্রকৃতপক্ষে, খোলা মন থাকা সকল ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ, কেবল বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই নয়, কারণ এটি সত্য এবং সর্বোত্তম পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করে। এই মনোভাব সমাজকে শক্তিশালী করে এবং সর্বদা মানুষের মধ্যে শান্তিকে উৎসাহিত করে। কিন্তু যারা তাদের পছন্দ পূর্বনির্ধারিত করে তাদের একগুঁয়েমি সর্বদা সমাজের সদস্যদের মধ্যে ফাটল তৈরি করবে, যা জাতীয় স্তরের মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। মুসলিমদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা সর্বদা বিশ্বাস না করে যে তারা পার্থিব বিষয়ে সঠিক, অন্যথায় তারা এই একগুঁয়ে মনোভাব গ্রহণ করবে। এটি তাদের অন্যদের মতামত গ্রহণ করতে বাধা দেবে, যা তর্ক, শত্রুতা এবং ভাঙনের দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, এই মনোভাব যেকোনো মূল্যে এড়ানো উচিত।

এই অঙ্গীকার যে একজন ব্যক্তির হৃদয়ে গভীরভাবে গেঁথে আছে তা ইঙ্গিত করে যে এটি উন্মোচন করা মুসলমানদের কর্তব্য। এটি একজনকে বিশ্বাসের দৃঢ়তার দিকে পরিচালিত করবে যা তার পরিবারের দ্বারা বলা শোনা কথার অর্থের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। বিশ্বাসের দৃঢ়তা একজন মুসলিমকে তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব কর্তব্য পালনের সময় এই পৃথিবীতে সমস্ত অসুবিধা সফলভাবে অতিক্রম করতে সাহায্য করে। কেবলমাত্র তাদের ঈমানের দুর্বলতার কারণেই কেউ পরীক্ষা এবং কর্তব্যে ব্যর্থ হয়। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্যের মধ্যে প্রাপ্ত জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই কেবল বিশ্বাসের দৃঢ়তা অর্জন করা সম্ভব। সূরা ৪১ ফুসসিলাত, আয়াত ৫৩:

"আমরা তাদেরকে দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

মূল আয়াতের শেষ অংশ মানবজাতিকে সতর্ক করে দেয় যে তারা যেন অন্ধভাবে অন্যদের অনুকরণ না করে। মানুষের জন্য তাদের প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা এবং গরুর মতো আচরণ করা এড়িয়ে চলা গুরুত্বপূর্ণ। অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করা পার্থিব আদালতে একটি অগ্রহণযোগ্য অজুহাত, তাহলে মহান আল্লাহর আদালতে এটি কীভাবে গৃহীত হতে পারে? অন্ধ অনুকরণ এমন একটি বিষয় যা ইসলামে সমালোচনা করা হয়েছে, কারণ একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার সত্যতা এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য তাদের সাধারণ জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অতএব, ইসলামের স্পষ্ট প্রমাণগুলি উপলব্ধি করার জন্য একজন ব্যক্তির অবশ্যই ইসলামী জ্ঞান শিখতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে যাতে তারা নিশ্চিতভাবে তা অনুসরণ করতে পারে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা সকল পরিস্থিতিতে, যেমন অসুবিধার সময় ধৈর্য ধারণ করে এবং সুখের সময় কৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করবে, যার মধ্যে উভয়ই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত।

খবর যাচাই করা হচ্ছে

যখন মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে যিয়ারত করার জন্য বের হলেন, তখন অমুসলিমরা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং ফলস্বরূপ তারা মক্কার কাছে হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপন করে। মহানবী (সাঃ) অবশেষে উসমান বিন আফফান (রাঃ)-কে মক্কার অমুসলিম নেতাদের কাছে তাঁর শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্য দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। মহানবী (সাঃ)-এর কাছে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে উসমান (রাঃ)-কে শহীদ করা হয়েছে। তিনি সাহাবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেন যে, উসমানের প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তারা মক্কা ত্যাগ করবেন না। এই অঙ্গীকারের পর মহানবী (সাঃ)-এর কাছে খবর আসে যে উসমান (রাঃ)-কে জীবিত রাখা হয়েছে এবং তিনি অবশেষে তাদের শিবিরে ফিরে আসেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি সংবাদ যাচাই করার আগে পদক্ষেপ নেওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। এই যুগে সমাজ যে বিরাট সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তা হল সমাজের মধ্যে ভুয়া খবরের বিস্তার। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে এটি নিয়ন্ত্রণ করা কতটা কঠিন তা কল্পনা করা যায়। তাই মুসলমানদের জন্য পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াত অনুসারে কাজ করা এবং অন্যদের কাছে তথ্য ছড়িয়ে না দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি যদি তারা বিশ্বাস করে যে তারা তথ্য যাচাই না করেই অন্যদের উপকার করছে। অর্থাৎ, তাদের নিশ্চিত করা উচিত যে এটি একটি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে এসেছে এবং সঠিক। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ৬:

" হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তা পরীক্ষা করে দেখো, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি না করো এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।"

যদিও এই আয়াতে একজন দুষ্ট ব্যক্তি সংবাদ প্রচারের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তবে এটি সেই সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে যারা অন্যদের সাথে তথ্য ভাগ করে। এই আয়াতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, একজন ব্যক্তি হয়তো বিশ্বাস করতে পারেন যে তারা অন্যদের সাহায্য করছেন কিন্তু যাচাই না করা তথ্য ছড়িয়ে দিয়ে তারা অন্যদের ক্ষতি করতে পারে, যেমন মানসিক ক্ষতি। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম এই বিষয়ে গাফিল এবং যাচাই না করে কেবল টেক্সট বার্তা এবং সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে তথ্য ফরোয়ার্ড করার অভ্যাস রাখেন। যেসব ক্ষেত্রে তথ্য ধর্মীয় বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, সেখানে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার আগে তা যাচাই করা আরও গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু অন্যদের ভুল তথ্যের ভিত্তিতে তাদের কর্মের জন্য শাস্তি পেতে পারে। সহিহ মুসলিমের ২৩৫১ নম্বর হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে।

তাছাড়া, বিশ্বে যা কিছু ঘটছে এবং এটি মুসলমানদের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলছে, তার সাথে সাথে তথ্য যাচাই করা আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ যা ঘটেনি সে সম্পর্কে অন্যদের সতর্ক করা কেবল সমাজে অস্থিরতা তৈরি করে এবং মুসলিম এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল আরও বাড়িয়ে তোলে। এটি ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী।

একজন মুসলিমের বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ বিচারের দিন প্রশ্ন করবেন না যে তারা কেন অযাচাইকৃত তথ্য অন্যদের সাথে ভাগ করে নিল না। কিন্তু তিনি অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসা করবেন যদি তারা অন্যদের সাথে তথ্য ভাগ করে, তা যাচাইকৃত হোক বা না হোক। অতএব, একজন বুদ্ধিমান মুসলিম কেবল যাচাইকৃত তথ্য ভাগ

করে নেবে এবং যা যাচাইকৃত নয় তা তারা জেনেও ছেড়ে দেবে যে এর জন্য তাদের কোনও জবাবদিহি করতে হবে না।

সত্যিকারের ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা

যখন মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে যিয়ারত করার জন্য বের হন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তখন অমুসলিমরা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং ফলস্বরূপ তারা মক্কার কাছে হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপন করে। কয়েকটি ঘটনার পর, অবশেষে মক্কার অমুসলিম নেতারা সুহাইল বিন আমরকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে একটি শান্তি চুক্তি করার জন্য তাঁর কাছে প্রেরণ করেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৩১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) এই শান্তি চুক্তিটি লিখেছিলেন। অমুসলিমরা মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর পদবী লেখার বিরোধিতা করেছিল, অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর পদবী লেখার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিল এবং জোর দিয়েছিল যে তারা কেবল তাঁর নামই লিখবে। মহানবী মুহাম্মদ (সা.) আলী (রা.)-কে তাঁর পদবী দলিল থেকে মুছে কেবল তাঁর নাম লিখতে বলেছিলেন, কিন্তু আন্তরিকতা ও ভালোবাসার কারণে তিনি তা করতে পারেননি। এরপর নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর পদবী নিজের হাতে মুছে ফেলেন যাতে চুক্তিটি সম্পন্ন হয়। এটি ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (র.)-এর, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৩-১৭৪-এ আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি আন্তরিকতা অবলম্বন করতে হবে।

অতএব, নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার তাদের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করা উচিত, তাঁর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং সে অনুযায়ী কাজ করার মাধ্যমে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এবং ৫৯তম অধ্যায় আল হাশর, ৭ম আয়াত:

"...আর রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো; আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো..."

এবং অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৮০:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

এবং অধ্যায় ৩৩ আল আহযাব, আয়াত ২১:

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে একটি চমৎকার আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"

তাঁর পবিত্র চরিত্রের অনুকরণে তাদের চরিত্রকে গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং উদারতার মতো ভালো গুণাবলী গ্রহণ করে এবং হিংসা, অহংকার এবং লোভের মতো নেতিবাচক গুণাবলী পরিত্যাগ করে। এটি তাদের মানসিক শান্তি নিশ্চিত করবে, কারণ ইতিবাচক গুণাবলী গ্রহণের ফলে ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে শেখা এবং তার উপর আমল করা, বহির্বিশ্বের কাছে তাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা নিশ্চিত করবে। যে ব্যক্তি এটি করতে ব্যর্থ হয় সে অনিবার্যভাবে তাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করবে এবং অমুসলিম এবং অন্যান্য মুসলিমদের ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করা থেকে বিরত রাখবে। তাঁর ভুল উপস্থাপনের ফলে বহির্বিশ্ব মুসলমানদের খারাপ আচরণ পর্যবেক্ষণ করলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমালোচনা করবে। এটি এমন একটি বিষয় যা প্রতিটি মুসলিমকে জবাবদিহি করতে হবে কারণ তাদের উপর কর্তব্য হলো আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে বহির্বিশ্বের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা।

উপরন্তু, পূর্ববর্তী জাতিগুলি যারা তাদের পবিত্র নবীদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভালোবাসার দাবি করে, তারা যেমন আখেরাতে তাদের সাথে মিলিত হবে না কারণ তারা কার্যত তাদের অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তেমনি যে মুসলিমরা কার্যত নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তারাও আখেরাতে তাঁর সাথে মিলিত হবে না। বরং, একজন ব্যক্তি তাদের

সাথে মিলিত হবে যাদের তারা এই পৃথিবীতে কার্যত অনুকরণ করেছিল। সুনান আবু দাউদের ৪০৩১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে ।

মহিমা অসুবিধার মধ্যেই নিহিত

যখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে যিয়ারত করার জন্য বের হন, তখন অমুসলিমরা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং ফলস্বরূপ তারা মক্কার কাছে হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপন করে। অবশেষে, উভয় পক্ষের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই শান্তি চুক্তির একটি শর্ত ছিল যে, যদি মক্কা থেকে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে এবং তারপর মদিনায় পালিয়ে যায়, তাহলে অমুসলিমরা যদি তার প্রত্যাবর্তনের দাবি করে তবে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি মদীনা থেকে মক্কায় পালিয়ে যায়, তাহলে তাদের মদিনায় ফেরত পাঠানো হবে না। চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে, একজন সাহাবী, আবু জান্দাল, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন, যিনি মক্কায় বন্দী ছিলেন, পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং মহানবী (সাঃ) এর কাছে পৌঁছান। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সাথে সাথে, আবু জান্দাল, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন, তাকে মক্কায় ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল এবং অন্যান্য সাহাবীদের সাথে মদিনায় যেতে পারেননি। এটি দেখে সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, অত্যন্ত দুঃখিত হন। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জান্দাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ধৈর্য ধরতে এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, মক্কায় আটকে থাকা অন্যান্য সাহাবীদের জন্য, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, আল্লাহ তাদের জন্য ত্রাণ এবং সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৯-২৩০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জীবনে একজন মুসলিম সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অথবা কঠিন সময়ের মুখোমুখি হবে। কেউই কেবল কিছু অসুবিধা ছাড়াই স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে না। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, সংজ্ঞা অনুসারে, যদিও অসুবিধাগুলি মোকাবেলা করা কঠিন, তবুও তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতি তার প্রকৃত মহত্ত্ব এবং দাসত্ব অর্জন এবং প্রদর্শনের একটি উপায়। উপরন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ যখন অসুবিধার

মুখোমুখি হয় তখন তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জীবনের পাঠ শেখে। এবং মানুষ প্রায়শই স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে কঠিন সময় অভিজ্ঞতার পরে আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হয়। এই সত্যটি বোঝার জন্য কেবল এটি নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সাঃ) এর জীবন অধ্যয়ন করে, তাহলে সে বুঝতে পারবে যে আলোচিত বেশিরভাগ ঘটনা, যেমন এই ঘটনা, অসুবিধার সাথে জড়িত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে প্রকৃত মহত্ত্ব সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অভিজ্ঞতা লাভের মধ্যেই নিহিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে অসুবিধার মুখোমুখি হওয়ার মধ্যেই নিহিত। এটি প্রমাণিত হয় যে ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত প্রতিটি বড় বড় সমস্যাই তাদের জন্য চূড়ান্ত সাফল্যের সাথে শেষ হয় যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করেছে। তাই একজন মুসলিমের অসুবিধার মুখোমুখি হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করা উচিত নয় কারণ এটি কেবল তাদের জন্য উজ্জ্বল হওয়ার মুহূর্ত, যখন তারা আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের প্রকৃত দাসত্ব স্বীকার করে। এটি উভয় জগতের চূড়ান্ত সাফল্যের চাবিকাঠি।

অধিকন্তু, যারা তাঁর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকবে, আল্লাহ তাদের সকলের জন্যই কষ্ট থেকে মুক্তি প্রদান করবেন। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত সঠিক উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা অন্তর্ভুক্ত। অধ্যায় ৬৫ তালাকের ২ নং আয়াতে:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই স্বস্তি মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে নয়। এটি সর্বদা মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা অনুসারে। অতএব, এই প্রত্যাবর্তন ঘটে যখন এটি মানুষের জন্য সর্বোত্তম এবং এমনভাবে যা তাদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

সন্দেহের মধ্যে দৃঢ় থাকা

যখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে যিয়ারত করার জন্য বের হলেন, তখন অমুসলিমরা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং ফলস্বরূপ তারা মক্কার কাছে হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপন করে। অবশেষে, উভয় পক্ষের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা অমুসলিমদের পক্ষে বলে মনে হয়েছিল। এই শান্তি চুক্তির একটি শর্ত ছিল যে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সেই বছর উমরা করবেন না এবং পরের বছর ফিরে আসবেন। অন্যান্য অনেক সাহাবীদের মতো উমর বিন খাত্তাবও এই শর্তগুলিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই তিনি আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর সাথে এই বিষয়ে কথা বলেন এবং পরবর্তীরা তাকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি দৃঢ়ভাবে আনুগত্য করার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এরপর উমর (রাঃ) এই বিষয়টি নিয়ে মহানবী (সাঃ) এর সাথে আলোচনা করেন এবং তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করবেন না এবং তিনি কখনও তাঁর লক্ষ্যকে ব্যর্থ হতে দেবেন না। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উমরকে আবু বকর (রাঃ) এর মতোই সঠিক উত্তর দিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ)-এর জীবনী", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৮-২২৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে তারা সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকবে, এমনকি এমন পরিস্থিতিতেও যা তাদের কাছে অস্পষ্ট, কারণ মহান আল্লাহ সর্বদা সকল মানুষের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, এমনকি যদি তা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

সহীহ মুসলিমের ১৫৯ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে তাদের বিশ্বাস ঘোষণা করার এবং তারপরে তার উপর অবিচল থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হলো, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যে সংগ্রাম করা। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোজা এবং মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহ, মহানের মধ্যে এবং অন্যদের সাথে সম্পর্কিত। একজন মুসলিমকে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে, সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

পরিশেষে, এর মধ্যে রয়েছে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসারে এই দিকগুলি পূরণ করা। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

দৃঢ়তার মধ্যে উভয় ধরণের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান প্রকার হল যখন কেউ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা করে। গৌণ প্রকার হল যখন কেউ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুর জন্য ভালো কাজ করে, যেমন লোক দেখানো। সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৮৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, দৃঢ়তার একটি দিক হল সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা এবং কখন এবং কোন ইসলামী শিক্ষা কেউ তার ইচ্ছানুযায়ী অনুসরণ করবে তা থেকে বিরত থাকা।

দৃঢ়তার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, নিজের বা অন্যদের আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পরিবর্তে। যদি কোন মুসলিম নিজেকে বা অন্যদের খুশি করে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়, তাহলে তার জানা উচিত যে তার ইচ্ছা বা মানুষ কেউই তাকে আল্লাহ তাআলার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। অন্যদিকে,

যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল, সে যদি এই সুরক্ষা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়, তবুও তিনি তাকে সবকিছু থেকে রক্ষা করবেন।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস দ্বারা নির্ধারিত পথ অনুসরণ করা এবং এমন পথ গ্রহণ না করা যা এই পথ থেকে বিচ্যুত হয়। যে ব্যক্তি এই পথ গ্রহণ করার চেষ্টা করবে তার আর কোনও কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটি তাদের ঈমানে অবিচল রাখার জন্য যথেষ্ট। ৪র্থ সূরা আন নিসা, আয়াত ৫৯:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী..."

এই আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অবিচল থাকার একটি দিক হল এমন কারো আনুগত্য করা যার আদেশ ও উপদেশ আল্লাহ, মহানবী (সাঃ) এবং মহানবী (সাঃ) এর আন্তরিক আনুগত্যের উপর নিহিত।

যেহেতু মানুষ নিখুঁত নয়, তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। তাই ঈমানের ক্ষেত্রে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে, বরং এর অর্থ হল তাদের অবশ্যই পূর্বে বর্ণিত মহান আল্লাহর আনুগত্য কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে এবং পাপ করলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 সূরা ফুসসিলাতের 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"... তাই তোমরা তাঁর দিকে সোজা পথ অবলম্বন করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো..."

জামে আত তিরমিযী, ১৯৮৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থিত, যেখানে মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে সংঘটিত (ছোট) পাপ মোচন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই ২, হাদিস নম্বর ৩৭-এ প্রাপ্ত আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) মুসলমানদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা এটি নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবে না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল তাদের নিয়ত এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে প্রদত্ত সম্ভাবনাকে আল্লাহ, মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে পূরণ করা। তাদের পরিপূর্ণতা অর্জনের আদেশ দেওয়া হয়নি কারণ এটি সম্ভব নয়।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ তার আধ্যাত্মিক হৃদয়কে প্রথমে পবিত্র না করে শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৮৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কেবল তখনই বিশুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় পবিত্র থাকে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসের শিক্ষা অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই হৃদয়ের বিশুদ্ধতা অর্জন করা সম্ভব।

অবিচল আনুগত্যের জন্য জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করে। জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ না করে মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, ২৪০৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, যদি মহান আল্লাহর আনুগত্যে কোন ত্রুটি দেখা দেয়, তাহলে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তওবা করা উচিত এবং মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। সূরা আল আহকাফ, আয়াত ১৩:

"নিশ্চয়ই যারা বলেছে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ," অতঃপর সৎপথে অবিচল রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

এছাড়াও, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উমরের প্রশ্নে রাগান্বিত হতে পারতেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন, তবুও তিনি শান্ত ছিলেন এবং তাঁর প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করেছিলেন। অন্যদের সাথে, বিশেষ করে বয়স্কদের সাথে তরুণদের সাথে এবং নেতাদের তাদের অধীনস্থদের সাথে এইভাবেই আচরণ করা উচিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, কোমলতা অন্যদের, যেমন নিজের সন্তানদের, কঠোরতার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর। কোমলতা ছিল মহানবী (সাঃ) এর একটি নির্দিষ্ট গুণ, যা পবিত্র কুরআনে তুলে ধরা হয়েছে এবং তাই এটি গ্রহণ করা উচিত। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯:

"অতএব আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের প্রতি কোমল ছিলে। আর যদি তুমি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতে, তাহলে তারা তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

কঠোরতা কেবল বিরল ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা উচিত যখন কেউ বারবার ভদ্রতার প্রচেষ্টার পরেও ইতিবাচক সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু তবুও, কঠোরতা অবশ্যই ইসলামী শিক্ষার সীমানার মধ্যে থাকতে হবে যাতে কেউ ভালো এবং গ্রহণযোগ্য আচরণের সীমা অতিক্রম না করে।

পরামর্শ চাওয়া

যখন মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে যিয়ারত করার জন্য বের হলেন, তখন অমুসলিমরা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং ফলস্বরূপ তারা মক্কার কাছে হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপন করে। অবশেষে, উভয় পক্ষের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা অমুসলিমদের পক্ষে বলে মনে হয়েছিল। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর, মহানবী (সাঃ) সাহাবীদের (আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন) তাদের যিয়ারতের (উমরা) দিকগুলি পূরণ করতে বলেন, যার মধ্যে ছিল তাদের পশু কুরবানী করা এবং চুল কামানো। প্রথমে, সাহাবীদের কেউই সাড়া দেননি, কারণ তারা সকলেই শোক ও দুঃখে ডুবে ছিলেন। মহানবী (সাঃ) তাঁর তাঁবুতে ফিরে আসেন এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা (রাঃ) এর কাছ থেকে পরামর্শ চান। তিনি তাঁকে নীরবে তাঁর যিয়ারতের (উমরা) দিকগুলি সম্পন্ন করার পরামর্শ দেন এবং সাহাবীরা (রাঃ) যখন এটি প্রত্যক্ষ করতেন তখন নিঃসন্দেহে তাঁর অনুসরণ করতেন। তিনি তার পরামর্শ অনুসারে কাজটি করেছিলেন এবং সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, ইতিবাচকভাবে সাড়া দিয়েছিলেন এবং অধৈর্যতা বা অবাধ্যতার কোনও লক্ষণ দেখাননি। এটি ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৩৯-এ আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি সঠিক ব্যক্তিদের কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তির উচিত তাদের বিষয়ে কার সাথে পরামর্শ করা উচিত তা সাবধানতার সাথে বেছে নেওয়া এবং এই ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত যারা তাদের বিষয়ে জ্ঞানী। উদাহরণস্বরূপ, যার চিকিৎসা সমস্যা আছে তার উচিত চিকিৎসা জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা, যেমন একজন চিকিৎসা চিকিৎসক। এবং যিনি ধর্মীয় পরামর্শ চান তার উচিত ধর্মীয় জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা, যেমন একজন পণ্ডিত। দুঃখের বিষয় হল, পার্থিব বিষয়ে, মুসলিমরা প্রায়শই বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করে কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে তারা প্রায়শই যে কোনও অজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ

অনুসরণ করে। উপরন্তু, কেবলমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, কারণ তারাই একমাত্র প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং তারা কখনও অন্যদেরকে কোনও পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহকে অমান্য করার পরামর্শ দেবে না। ৩৫তম অধ্যায় ফাতির, আয়াত ২৮:

"... আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, কেবল তারাই ভয় করে..."

অতএব, কেবলমাত্র তাদের সাথেই পরামর্শ করা উচিত যারা সঠিক জ্ঞানের অধিকারী এবং যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। অন্যথায় তারা অন্ধভাবে তাদের অনুসরণ করবে যারা তাদের বিভ্রান্ত করবে, যদিও এটি তাদের উদ্দেশ্য নয়।

একটি স্পষ্ট বিজয়

যখন মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে যিয়ারত করার জন্য বের হলেন, তখন অমুসলিমরা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং ফলস্বরূপ তারা মক্কার কাছে হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপন করে। অবশেষে, উভয় পক্ষের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা অমুসলিমদের পক্ষে বলে মনে হয়েছিল। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর, মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ যিয়ারত (উমরা) না করেই মদীনায় ফিরে আসেন, যা শান্তি চুক্তির অংশ ছিল। দশ বছর ধরে এই শান্তি চুক্তি বাস্তবে মুসলমানদের পক্ষে ছিল। এই চুক্তির আগে, যখনই মুসলিম এবং অমুসলিমরা মুখোমুখি হত, তখন প্রায়শই এক ধরণের যুদ্ধ হত, কিন্তু যখন যুদ্ধ শেষ হত, যখনই এই লোকেরা মিলিত হত, তখনই তারা কেবল কথা বলত। অমুসলিমদের কাছে ইসলাম ব্যাখ্যা করা হলে তারা তা গ্রহণ করতে শুরু করে। ইসলাম তার আবির্ভাবের পর থেকে পূর্ববর্তী সমস্ত বছরের তুলনায় পরবর্তী দুই বছরে আরও বেশি মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে, প্রায় ১৮ বছর। এই স্পষ্ট বিজয়কে মহান আল্লাহ তাআলা স্বীকার করেছেন, যিনি চুক্তি স্বাক্ষরের পর ৪৮তম সূরা আল-ফাতহ নাজিল করেছেন। ৪৮তম সূরা আল-ফাতহ, আয়াত ১:

"নিশ্চয়ই, আমরা তোমাকে স্পষ্ট বিজয় দান করেছি"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৩১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাফল্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণকে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, প্রদান করা হয়েছিল, কারণ তারা সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেছিলেন। যদিও সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও স্পষ্ট যে মুসলমানদের শক্তি কেবল হ্রাস পেয়েছে। প্রতিটি মুসলিম তাদের ঈমানের শক্তি নির্বিশেষে পবিত্র কুরআনের সত্যতাতে বিশ্বাস করে কারণ সন্দেহ করা তাদের ঈমান নষ্ট করবে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ, মহান, শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাফল্য অর্জনের চাবিকাঠি দিয়েছেন যা সারা বিশ্বের মুসলমানদের দুর্বলতা এবং দুঃখ দূর করবে। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৯:

" সুতরাং তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, যদি তোমরা [সত্যিকারের] বিশ্বাসী হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।"

মহান আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, উভয় জাহানে এই শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাফল্য অর্জনের জন্য মুসলমানদের কেবল প্রকৃত মুমিন হতে হবে। প্রকৃত ঈমানের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর প্রতি এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য, যেমন নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও ভালোবাসা, যা জামে আত তিরমিযী, ২৫১৫ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর জন্য একজনকে ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করতে হবে। এই মনোভাবের মাধ্যমে সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের সাফল্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছিল। এবং যদি মুসলমানরা তা অর্জন করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই এই সঠিক নির্দেশিত মনোভাবের দিকে ফিরে যেতে হবে। যেহেতু মুসলমানরা পবিত্র কুরআনে বিশ্বাস করে, তাদের এই সহজ শিক্ষাটি বোঝা উচিত এবং তার উপর আমল করা উচিত।

দুষ্ট চক্রান্ত ব্যর্থ হয়

যখন মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে যিয়ারত করার জন্য বের হন, তখন অমুসলিমরা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং ফলস্বরূপ তারা মক্কার কাছে হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপন করে। অবশেষে, উভয় পক্ষের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই শান্তি চুক্তির একটি শর্ত ছিল যে, যদি মক্কা থেকে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে এবং তারপর মদিনায় পালিয়ে যায়, তাহলে অমুসলিমরা যদি তার প্রত্যাবর্তনের দাবি করে তবে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি মদিনা থেকে মক্কায় পালিয়ে যায়, তাহলে তাদের মদিনায় ফেরত পাঠানো হবে না। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর, মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীরা মদিনায় ফিরে আসেন। একজন সাহাবী, আবু বাসীর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, মক্কার কারাগার থেকে পালিয়ে মদিনায় পালিয়ে যান। মক্কার অমুসলিম নেতারা আবু বাসীর (রাঃ) কে মদিনা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য দু'জন লোককে প্রেরণ করেন। মহানবী (সাঃ) চুক্তিটি মেনে নিয়ে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে আনার জন্য হস্তান্তর করেন। মক্কায় ফেরার পথে আবু বাসীর (রাঃ) পালিয়ে যান এবং অবশেষে মদীনা ও মক্কা থেকে দূরে অন্য এক নির্জন অঞ্চলে পালিয়ে যান। এই ঘটনার পর, যখনই কোন সাহাবী মক্কায় তাদের কারাবাস থেকে পালিয়ে যেতেন, তারা আবু বাসীর (রাঃ) এর সাথে যোগ দিতেন। তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং অবশেষে তারা মক্কার অমুসলিম নেতাদের ব্যবসায়িক কাফেলাগুলিতে লুটপাট ও লুটপাট শুরু করে, কারণ শান্তি চুক্তিতে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কেবল মদীনার নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এর ফলে মক্কার জনগণের জন্য মারাত্মক আর্থিক সমস্যা দেখা দেয়। অবশেষে তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে একটি বার্তা পাঠান, যাতে তিনি আবু বাসীর (রাঃ) এবং তার বাহিনীকে মদীনায় ডেকে পাঠান যাতে লুটপাট এবং লুটপাট বন্ধ হয়। মহানবী (সাঃ) একমত হন এবং এই লোকেরা শান্তিপূর্ণভাবে মদিনায় হিজরত করে। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 240-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

অমুসলিমদের বাণিজ্য কাফেলা লুটপাট করা তাদের এবং মুসলমানদের মধ্যে শান্তি চুক্তির শর্ত স্থাপনের সময় তাদের অসৎ উদ্দেশ্যের সরাসরি পরিণতি ছিল।

কখনোই খারাপ কাজ করার চক্রান্ত করা উচিত নয় কারণ এটি সর্বদা, এক বা অন্যভাবে, তাদের উপরই আঘাত হানবে। এমনকি যদি এই পরিণতিগুলি পরবর্তী জগতে বিলম্বিত হয় তবে তারা অবশেষে এর মুখোমুখি হবে। উদাহরণস্বরূপ, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন যেমন তারা তাদের পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং স্নেহ কামনা করেছিলেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তাদের চক্রান্ত তাদের তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১৮:

"এবং তারা তার জামার উপর মিথ্যা রক্ত আনল। [ইয়াকুব] বলল, "বরং তোমাদের আত্মা তোমাদেরকে কিছু একটার প্রতি প্ররোচিত করেছে, তাই ধৈর্যই সবচেয়ে উপযুক্ত..."

যে যত বেশি মন্দ চক্রান্ত করবে, আল্লাহ তাআলা তত বেশি তাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। এমনকি যদি তারা বাহ্যিকভাবে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে, তবুও আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য উভয় জগতে অভিশাপ হিসেবে তাদের আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটিকেই পরিণত করবেন, যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ৪৩:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজস্ব লোকদের ছাড়া আর কাউকে ঘিরে রাখে না। তাহলে তারা কি পূর্ববর্তী লোকদের পথ [অর্থাৎ, ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করছে?..."

বিদেশী দেশগুলিকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া

সহজ এবং ভদ্র বক্তৃতা

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের ষষ্ঠ বছরে, তিনি ইসলামের দাওয়াত প্রচারের উপর মনোনিবেশ করেন, বিশেষ করে হুদাইবিয়ার চুক্তির কারণে মক্কার অমুসলিমদের উপর ক্রমাগত হুমকি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর। মহানবী (সাঃ) কিছু দূত প্রেরণ করেন যারা মিশরের উত্তরাধিকারী, পারস্য সম্রাট খসরু এবং রোমান রাজা হেরাক্লিয়াসের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে তাঁর চিঠি পৌঁছে দেন। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার", পৃষ্ঠা ৩৫০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই অক্ষরগুলি অধ্যয়ন করার সময়, দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশল নির্দেশ করা হয়। প্রথমটি হল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ব্যবহৃত সরল ও সরল বক্তৃতা, এবং অন্যটি হল কোমল বক্তৃতা।

ইসলামের বাণী প্রচারের সময় অপ্রয়োজনীয় জটিল শব্দ এবং ফুলেল কথাবার্তা এড়িয়ে চলা গুরুত্বপূর্ণ। এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করে, যিনি সহীহ মুসলিমের ১১৬৭ নম্বর হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে তিনি ব্যাপক বক্তৃতা প্রদানের ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। এর অর্থ হল তাঁর কথাগুলি ছিল স্পষ্ট কিন্তু জ্ঞানের সমুদ্রের সমান। এই মনোভাবের অনুরূপ যখন লোকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যা সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে। কেউ কেউ অন্যদের থেকে আলাদা হওয়ার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করে কিন্তু এটি

একটি বিভ্রান্তিকর মনোভাব কারণ ইসলামের বাণী প্রচারকারী একজন মুসলিমের কর্তব্য হল সমাজকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা।

তাছাড়া, ইসলামের সৌন্দর্য কোমলতার মধ্যে পাওয়া যায়। মহানবী (সাঃ) সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৬৮৯ নম্বরের সহায়তায় অনেক হাদিসে এই উপদেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে এমনকি উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে সর্বদা প্রেমের সাথে থাকতেন, তাঁর কোমলতা এবং কোমল স্বভাবের কারণে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯:

" অতএব, [হে মুহাম্মদ], আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি কোমল ছিলেন। আর যদি আপনি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

আরবরা কঠোর হৃদয়ের জন্য কুখ্যাত ছিল কিন্তু মহানবী (সা.)-এর কারণে , শান্তি ও তাঁর উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, প্রায়শই তাদের কঠোর হৃদয় গলে যায় এবং এভাবে তারা গ্রহণ করে এই গুণটি এবং বাকি মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠে। এই কারণেই মহানবী মুহাম্মদ , শান্তি এবং তাঁর উপর বরকত বর্ষিত হোক, একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে সুনান আবু দাউদ, ৪৮০৯ নম্বরে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি ভদ্রতা থেকে বঞ্চিত, সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৩:

"... আর তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো - যখন তোমরা শত্রু ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে সম্প্রীতি স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছো..."

যারা ইসলামের বাণী প্রচার করতে চান তাদের জন্য এটি একটি স্পষ্ট বার্তা। তাদের কঠোর ধ্বংসাত্মক মানসিকতার চেয়ে কোমল গঠনমূলক মানসিকতা থাকা উচিত। তাদের উচিত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং অন্যদের উপকার করার চেষ্টা করা, সমাজের মধ্যে বিতর্ক। এর একটি ভালো উদাহরণ এই সন্তানদের প্রতি ব্যক্তির মনোভাবের মধ্যে এটি দেখা যায়। যেসব বাবা-মা তাদের সন্তানদের প্রতি কোমল মনোভাব দেখিয়েছিলেন , তাদের সন্তানদের উপর দত্তক নেওয়া বাবা-মায়ের তুলনায় বেশি ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। কঠোর স্বভাব। প্রায়শই কেউ কেউ তাদের কঠোর মনোভাবের মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয় এবং এটি ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে চ্যালেঞ্জ করে মহানবী (সাঃ)-এর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। উদাহরণস্বরূপ, একবার একজন অশিক্ষিত বেদুইন মহানবী (সাঃ) -এর মসজিদে প্রস্রাব করে ফেলল। যখন সাহাবীরা , আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন, তাকে শাস্তি দিতে চাইলেন। মহানবী মুহাম্মদ , শান্তি তাঁর উপর রহমত বর্ষিত হোক, তিনি তাদেরকে নিষেধ করেছিলেন এবং মসজিদে থাকার আদব-কায়দা সম্পর্কে বেদুইনদেরকে নম্রভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই ঘটনাটি সুনান ইবনে মাজাহের ৫২৯ নম্বর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এই নরম মনোভাব লোকটির উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায়ও এর উল্লেখ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যদিও ফেরাউন নিজেকে সর্বোচ্চ প্রভু বলে দাবি করেছিল তবুও মহান আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ)-কে আদেশ

করলেন , তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। উভয়কেই, ফেরাউনকে আমন্ত্রণ জানাতে মৃদু ও সদয় কথাবার্তার মাধ্যমে পথনির্দেশনার দিকে। অধ্যায় ৭৯ আন নাজিয়াত, আয়াত ২৪:

"এবং বলল, "আমি তোমাদের সবচেয়ে মহান প্রতিপালক।"

এবং অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ৪৩-৪৪:

"তোমরা দুজনেই ফেরাউনের কাছে যাও। নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘন করেছে। আর তার সাথে নম্রভাবে কথা বলো, হয়তো সে স্মরণ করবে অথবা [আল্লাহকে] ভয় করবে।"

শিশুরা আর পশুরাও ভদ্রতার ভাষা বোঝে। তাহলে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যদি ইসলাম ও কল্যাণের দিকে দাওয়াত দেওয়ার সময় এই বৈশিষ্ট্যটি গ্রহণ করে, তাহলে কীভাবে তাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করা যাবে না? এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর উপর দরুদ বর্ষিত হোক, একবার একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে সহীহ মুসলিম, ৬৬০১ নম্বরে পাওয়া গেছে যে , আল্লাহ , তিনি তাঁর অসীম মর্যাদা অনুসারে দয়ালু এবং কোমল এবং সৃষ্টিকে একে অপরের সাথে নরম আচরণ করতে পছন্দ করেন। দুর্ভাগ্যবশত, যারা এই কথাটি ছড়িয়ে দেয় তাদের অনেকেই ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা এই ভুল বিশ্বাস গ্রহণ করেছেন যে, কোমল হওয়া

দুর্বলতার লক্ষণ। এটি শয়তানের একটি চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ সে মানবজাতিকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চায়।

মন্দের পরিণতি

মহানবী (সা.) মদিনায় হিজরতের ষষ্ঠ বছরে, তিনি কিছু দূত প্রেরণ করেন যারা মিশরের উত্তরাধিকারী, পারস্য সম্রাট খসরু এবং রোমান রাজা হেরাক্লিয়াসের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে তাঁর চিঠি পৌঁছে দিতেন। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার", পৃষ্ঠা ৩৫০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

পারস্য সম্রাট খসরুসকে পাঠানো চিঠিটি প্রথমে তার ডেপুটি, বাহরাইনের রাজার কাছে পাঠানো হয়েছিল। খসরুসের অহংকার তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং সে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রেরিত চিঠিটি ছিঁড়ে ফেলে এবং তার ইয়েমেনের গভর্নর বাজানকে নির্দেশ দেয় যে তারা পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে গ্রেপ্তার করে তার প্রাসাদে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠায়। এই লোকেরা যখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে পৌঁছায়, তখন তিনি তাদের জানান যে তাদের সম্রাট খসরুসকে তার নিজের পুত্র হত্যা করেছে। তিনি তাদের নতুন সম্রাটকে সতর্ক করতে বলেন যে ইসলাম সর্বত্র বিরাজ করবে এবং পারস্য সাম্রাজ্যকে ছাড়িয়ে যাবে। এই লোকেরা ইয়েমেনের গভর্নর বাজানের কাছে ফিরে আসে এবং তাকে ঘটনাটি জানায়। কিছুক্ষণ পরে, নতুন খসরুস, শেরওয়েহ, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে যা বলেছিলেন তা নিশ্চিত করে বাজানকে একটি চিঠি পাঠান। নতুন খসরুস বাজানকে মুসলিম সম্প্রদায়কে একা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। এর পরে, বাজান এবং ইয়েমেনের অনেক পারস্যবাসী ইসলাম গ্রহণ করে। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার", পৃষ্ঠা ৩৫৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য একটি সহজ কিন্তু গভীর শিক্ষা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা এই পৃথিবীতে বা পরকালে পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে

কখনও সফল হবে না। যুগের সূচনা থেকে এই যুগ পর্যন্ত এবং শেষ যুগ পর্যন্ত, কেউ কখনও মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে প্রকৃত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি এবং কখনও পাবেও না। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতএব, যখন একজন মুসলিম এমন পরিস্থিতিতে পড়ে যেখানে তারা ইতিবাচক এবং সফল ফলাফল অর্জন করতে চায়, তখন তাদের কখনই মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করা উচিত নয়, তা যতই প্রলোভনসঙ্কুল বা সহজ মনে হোক না কেন। এমনকি যদি তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনরা তাকে তা করার পরামর্শ দেয় কারণ সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই, যদি এর অর্থ স্রষ্টার অবাধ্যতা হয়। এবং প্রকৃতপক্ষে তারা কখনও তাদের মহান আল্লাহ এবং তাঁর শাস্তি থেকে এই পৃথিবীতে বা পরকালে রক্ষা করতে পারবে না। ঠিক যেমনভাবে মহান আল্লাহ তাঁর আনুগত্যকারীদের সাফল্য দান করেন, তিনি তাঁর অবাধ্যদের কাছ থেকে একটি সফল ফলাফল সরিয়ে দেন, এমনকি এই অপসারণ প্রত্যক্ষ করতে সময় লাগে। একজন মুসলিমের বোকা বানানো উচিত নয় কারণ এটি শীঘ্রই বা পরে ঘটবে। পবিত্র কুরআন অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছে যে একটি মন্দ পরিকল্পনা বা কর্ম কেবল সেই ব্যক্তিকেই ঘিরে রাখে যিনি শাস্তি বিলম্বিত হলেও। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ৪৩:

"...কিন্তু সেই মন্দ চক্রান্ত তার নিজস্ব লোকদের ছাড়া আর কাউকে ঘিরে রাখে না..."

অতএব, পরিস্থিতি এবং পছন্দ যতই কঠিন হোক না কেন, মুসলিমদের সর্বদা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্য বেছে নেওয়া উচিত কারণ এটিই উভয় জগতে প্রকৃত সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে, যদিও এই সাফল্য তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট নাও হতে পারে।

অভিবাসনের ৭ ম বছর

খায়বারের যুদ্ধ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভালোবাসা অর্জন

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের সপ্তম বছরে, তাকে মদিনার নিকটবর্তী খায়বারে বসবাসকারী একটি অমুসলিম গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মক্কার অমুসলিম নেতাদের সাথে তাঁর বিরুদ্ধে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র করে তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তাদের শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তাদের দুর্গে পৌঁছানোর পর, তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে পরের দিন তিনি এমন একজনকে তার পতাকা দেবেন যিনি আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে ভালোবাসেন এবং এই ব্যক্তিটিও আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রিয়জন। তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এই ব্যক্তি খায়বার বিজয়ের সূচনা করবেন। পরের দিন তিনি আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) কে ডেকে পাঠান, তাঁর পবিত্র লালা দিয়ে তাঁর আক্রান্ত চোখ নিরাময় করেন এবং তারপর তাকে পতাকাটি অর্পণ করেন এবং ফলস্বরূপ খায়বারের কিছু দুর্গ জয় করা হয়। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৫১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য আলী ইবনে আবু তালিব এবং অন্যান্য সাহাবীদের (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) পদাঙ্ক অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ, আন্তরিকভাবে আল্লাহ, মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য করে, যাতে তারাও আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে।

সহীহ বুখারী, ৬৫০২ নম্বরে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একটি ঐশী হাদিসে, আল্লাহ তাআলা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘোষণা করেছেন। প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাঁর কোন নেককার বন্ধুর সাথে শত্রুতা প্রদর্শন করে, তার বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলা যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

এটি ঘটে কারণ যে ব্যক্তি কারো বন্ধুর সাথে শত্রুতা দেখায় সে আসলে পরোক্ষভাবে সেই ব্যক্তির সাথে শত্রুতা দেখায়। এটি পরোক্ষভাবে মুসলমানদের সতর্ক করে যে তারা কেবল আল্লাহর, মহিমান্বিত, সৎকর্মশীল বান্দাদের সাথেই বন্ধুত্ব করে এবং তাদের প্রতি কখনও কোনও শত্রুতা বা বিদ্বেষ প্রকাশ করে না, কারণ এটিই আল্লাহর, মহিমান্বিত, শত্রুদের, যেমন শয়তানের মনোভাব। ৬০ সূরা আল মুমতাহানা, আয়াত ১:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার শত্রুদের এবং তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না..."

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর প্রতি যেকোনো ধরণের অবাধ্যতা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে। অতএব, একজন মুসলিমের সকল ধরণের অবাধ্যতা

এড়িয়ে চলা উচিত, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টাকারীদের অপছন্দ করা, কারণ এটি কেবল মহান আল্লাহর ক্রোধকে ডেকে আনে। উদাহরণস্বরূপ, জামে আত তিরমিযী, ৩৮৬২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, একজন ব্যক্তি কখনোই তাঁর সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, অপমান করা উচিত নয়, কারণ তাদের অপমান করা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অপমান করার মতো, এবং যে কেউ তাকে ক্ষতি করে, সে আল্লাহকে অপমান করেছে। এবং এই পাপী ব্যক্তি শীঘ্রই শাস্তি পাবে, যদি না তারা আন্তরিকভাবে তওবা করে।

অধিকন্তু, যেহেতু ধার্মিকতা, যা একজনের নিয়তের উপর ভিত্তি করে তৈরি, তা মানুষের কাছ থেকে গোপন থাকে, তাই মুসলমানদের অবশ্যই অন্য মুসলমানদের অপছন্দ করা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ তারা জানে না যে কে আল্লাহর নেককার বন্ধু। তাই মূল হাদিসের এই অংশটি সকল মুসলমানের সাথে ভালো আচরণ করার জন্য উৎসাহিত করে, তাদের সাথে এমন আচরণ করার মাধ্যমে যেভাবে মানুষ তাদের সাথে আচরণ করতে চায়।

আলোচ্য মূল ঐশী হাদিসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, একজন মুসলিম কেবল তাদের ফরজ কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে। এবং স্বেচ্ছায় সৎকর্মের মাধ্যমে তারা মহান আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করতে পারে।

এই বর্ণনাটি আল্লাহর বান্দাদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে। প্রথম দলটি আল্লাহর প্রতি তাদের বাধ্যতামূলক কর্তব্য, যেমন ফরজ নামাজ, এবং মানুষের প্রতি, যেমন ফরজ দান, পালন করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। এর সারসংক্ষেপ আল্লাহর আদেশ

পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের উপর ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ যারা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, তারা প্রথম শ্রেণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কারণ তারা কেবল তাদের ফরজ কর্তব্য পালন করে না বরং স্বেচ্ছায় সৎকর্মে প্রচেষ্টা চালায়। এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে এটিই মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের একমাত্র পথ। যে কেউ এটি ছাড়া অন্য কোন পথ গ্রহণ করে সে এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না। এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা না করে সৎকর্ম অর্জনের ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। যে ব্যক্তি এটি দাবি করে সে কেবল মিথ্যাবাদী। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নম্বর হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যখন আধ্যাত্মিক হৃদয় পবিত্র থাকে তখন শরীরের বাকি অংশও পবিত্র হয়ে যায়। এটি সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে। তাই যদি কেউ সৎকর্ম না করে, যেমন তাদের ফরজ কর্তব্য, তাহলে তার শরীর অপবিত্র, অর্থাৎ তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ও অপবিত্র। এই ব্যক্তি কখনও মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে না।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে যে নেক কাজ করা যায় তা হলো সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছাসেবী নেক কাজ। যে কেউ তার ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে নয় বরং স্বেচ্ছাসেবী নেক কাজ করতে পছন্দ করে, তাকে শয়তান বোকা বানিয়েছে, কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পথ এবং কর্ম ছাড়া আর কোন পথই আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পারে না। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"[নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

দ্বিতীয় উচ্চতর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ধার্মিক মুসলিমরা হলেন তারাও যারা এই বস্তুগত জগতের অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলেন। এই মনোভাব তাদের স্বেচ্ছাসেবী সৎকর্ম সম্পাদনের উপর তাদের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করতে সহায়তা করে। এই গোষ্ঠীটিই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা, ঘৃণা, দান এবং সবকিছু থেকে বিরত রেখে তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে। সুনান আবু দাউদের ৪৬৮১ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অধিকন্তু, এই উচ্চতর গোষ্ঠীর মুসলমানরা তাদের প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ, যেমন তাদের শক্তি এবং সময়, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা করে। তারা এমন উপায়ে ব্যবহার করা এড়িয়ে চলে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে না এবং আখেরাতে তাদের উপকার করবে না, এমনকি যদি এই উপায়গুলি অনুমোদিত হয়।

আলোচ্য মূল হাদিসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, যখন কেউ ফরজ কর্তব্য পালন এবং স্বেচ্ছামূলক নেক আমল করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, তখন মহান আল্লাহ তার পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে আশীর্বাদ করেন যাতে তারা তাঁর আনুগত্যে সেগুলো ব্যবহার করতে পারে। এই নেক বান্দা খুব কমই পাপ করবে। হেদায়াতের এই বৃদ্ধির কথা সূরা আল আনকাবুতের ৬৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"আর যারা আমার জন্য প্রচেষ্টা করে- আমি অবশ্যই তাদের আমার পথ দেখাব..."

এই মুসলিম শ্রেষ্ঠত্বের সেই স্তরে পৌঁছায় যা সহিহ মুসলিমের ৯৯ নম্বর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এটি তখনই ঘটে যখন একজন মুসলিম নামাযের মতো কাজ করে, যেন সে আল্লাহকে অনুসরণ করে। যে ব্যক্তি এই স্তরে পৌঁছায় সে তার মন ও শরীরকে পাপ থেকে রক্ষা করবে। এই সেই ব্যক্তি যিনি যখন কথা বলেন, তখন তিনি আল্লাহর জন্য কথা বলেন, যখন তারা নীরব থাকেন, তখন তিনি আল্লাহর জন্য নীরব থাকেন। যখন তারা কাজ করেন, তখন তিনি তাঁর জন্য কাজ করেন এবং যখন তারা স্থির থাকেন, তখন তিনি তাঁর জন্য। এটি একত্ববাদ এবং আল্লাহর একত্ববাদ বোঝার একটি দিক।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই ক্ষমতায়নের মধ্যে রয়েছে ধৈর্যের সাথে অসুবিধা মোকাবেলা করা এবং কৃতজ্ঞতার সাথে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় মোকাবেলা করা, যার মধ্যে রয়েছে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এই ক্ষমতায়নের মধ্যে রয়েছে মনের শান্তি অর্জন করা, কারণ যে ব্যক্তি ক্ষমতায়িত হয় তার মানসিক অবস্থা এই পৃথিবীতে বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারে তার দ্বারা সহজে বিচলিত বা ভেঙে পড়বে না।

আলোচ্য মূল হাদিসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, এই মুসলিমের প্রার্থনা পূর্ণ হবে এবং তাদেরকে মহান আল্লাহর আশ্রয় ও সুরক্ষা দেওয়া হবে। যারা বৈধ পার্থিব জিনিসপত্র কামনা করে তাদের জন্য এটি একটি স্পষ্ট শিক্ষা। তাদের উচিত আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে এগুলি অর্জনের চেষ্টা করা উচিত নয়। কোনও আধ্যাত্মিক শিক্ষক বা অন্য কেউ কোনও ব্যক্তিকে জিনিসপত্র দিতে সক্ষম হবে না যদি না ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করে এবং তাদের ভাগ্যে এই জিনিসগুলি পাওয়া যায়। উপরন্তু, কোনও

ব্যক্তি উভয় জগতে আল্লাহর শাস্তি থেকে অন্য কাউকে আশ্রয় এবং সুরক্ষা দিতে পারে না এবং দেবেও না। কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই এই সুরক্ষা পাওয়া সম্ভব। এটি এমন কিছু ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা দূর করে যারা বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকতে পারে এবং এখনও অন্য কারও সুপারিশের মাধ্যমে তাঁর শাস্তি থেকে সুরক্ষা পেতে পারে, বিশেষ করে পরকালে। যদিও বিচার দিবসে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুপারিশ একটি বাস্তবতা, তবুও এই উপহাসের সাথে আচরণ করলে তা নষ্ট হতে পারে।

উপসংহারে, এই হাদিসটি স্পষ্ট করে যে, মহান আল্লাহর নৈকট্য কেবলমাত্র তাঁর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। অন্যান্য সমস্ত নির্ধারিত পদ্ধতি মিথ্যা এবং কেবল ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা, যার ইসলামে কোন মূল্য বা ওজন নেই।

অন্যদের পথ দেখানো

খায়বার যুদ্ধের সময়, মহানবী (সাঃ) আলী বিন আবু তালিব (রাঃ)-কে তাঁর পতাকা অর্পণ করেন। তাঁকে তাদের দুর্গের কাছে আরোহণ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করার আগে ইসলামের দিকে আহ্বান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মহানবী (সাঃ) তখন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, যদি একজন ব্যক্তিও তাঁর মাধ্যমে হিদায়াত গ্রহণ করে, তাহলে তা আরবদের জানা সবচেয়ে দামি ও মূল্যবান উটের পালের চেয়েও উত্তম হবে। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ)-এর জীবনী", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৫১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, ২৬৭৪ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে ভালো কিছুর দিকে পরিচালিত করে, সে তাদের উপদেশ অনুসারে কাজ করা লোকদের সমান সওয়াব পাবে। আর যারা অন্যদের পাপের দিকে পরিচালিত করে, তাদের উপর এমনভাবে জবাবদিহি করা হবে যেন তারা পাপ করেছে।

অন্যদের উপদেশ ও নির্দেশনা দেওয়ার সময় মুসলমানদের সতর্ক থাকা গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুসলিমের উচিত কেবল ভালো কাজেই অন্যদের উপদেশ দেওয়া যাতে তারা এর প্রতিদান পায় এবং আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হওয়ার উপদেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকা। কেউ যদি কেবল এই দাবি করে যে সে অন্যদের পাপের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, এমনকি যদি সে নিজে পাপ নাও করে, তাহলেও বিচার দিবসে শাস্তি থেকে বাঁচবে না। মহান আল্লাহ, পথপ্রদর্শক এবং অনুসারী উভয়কেই তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করবেন। অতএব, মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে কেবল সেই কাজ করার পরামর্শ দেওয়া যা তারা নিজেরাই করত। যদি তারা তাদের আমলনামায় কোন কাজ লিপিবদ্ধ করা

অপছন্দ করে, তাহলে তাদের অন্যদের সেই কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়।

এই ইসলামী নীতির কারণে, মুসলমানদের উচিত অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা নিশ্চিত করা, কারণ অন্যদের ভুল উপদেশ দিলে তারা সহজেই তাদের পাপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

উপরন্তু, এই নীতিটি মুসলমানদের জন্য সম্পদের মতো সামর্থ্যের অভাবে নিজেরা যে কাজ করতে পারে না তার জন্য সওয়াব অর্জনের একটি অত্যন্ত সহজ উপায়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি আর্থিকভাবে দান করতে সক্ষম নয়, সে অন্যদেরকেও তা করতে উৎসাহিত করতে পারে এবং এর ফলে তারা দানকারীর মতোই সওয়াব পাবে।

অধিকন্তু, মৃত্যুর পরেও মানুষের সৎকর্মের বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য এই ইসলামী নীতি একটি চমৎকার উপায়। যত বেশি মানুষ অন্যদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত করবে, তত বেশি তাদের সৎকর্ম বৃদ্ধি পাবে। এই উত্তরাধিকার সম্পর্কে একজন মুসলিমকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে, কারণ সম্পত্তির সাম্রাজ্যের মতো অন্যান্য সমস্ত উত্তরাধিকার আসবে এবং যাবে, এবং মৃত্যুর পরে তা তাদের কোনও কাজে আসবে না। যদি কিছু থাকে, তবে তাদের সাম্রাজ্য উপার্জন এবং জমা করার জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে, যখন তাদের উত্তরাধিকারীরা মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সাম্রাজ্য উপভোগ করবে।

উদ্দেশ্যের প্রভাব

খায়বারের যুদ্ধের সময়, একজন মুনাফিক অমুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই করছিল। মহানবী (সাঃ) যখন তার বাহ্যিক সাহসিকতার কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি মন্তব্য করলেন যে লোকটি জাহান্নামে যাবে। সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তখন লক্ষ্য করলেন যে, যুদ্ধের সময় লোকটি আহত হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছে, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৫৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি হল তাদের নিয়ত। যদি কোন ভবনের ভিত্তি নষ্ট হয়, তাহলে তার উপর নির্মিত সবকিছুই নষ্ট হয়ে যাবে। একইভাবে, যখন কারো নিয়ত নষ্ট হয়, তখন তার সমস্ত কাজই নষ্ট হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে প্রত্যাখ্যাত হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কাজ করে, সে এই পৃথিবীতে বা পরকালেও তার কাছ থেকে কোন প্রতিদান পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। তাই, একজন ব্যক্তির জন্য সর্বদা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে তারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে, যাতে তারা উভয় জগতেই সওয়াব অর্জন করতে পারে। একটি ভালো নিয়তের একটি ইতিবাচক লক্ষণ হল যে একজন ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে কোনও প্রশংসা বা প্রতিদান কামনা করে না।

তুমি যা দাও, তাই পাও

খায়বারের যুদ্ধের সময়, একজন বেদুইন ইসলাম গ্রহণ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধের সময় তাকে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কিছু গনীমতের মাল অর্পণ করেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি ঘোষণা করেন যে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য হলো শাহাদাতের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করা। এমনকি তিনি তার গলার দিকে ইঙ্গিত করে ইঙ্গিত করেন যে তিনি সেখানে তীর ছুঁড়ে মারতে চান। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে বলেছিলেন যে যদি সে আল্লাহর সাথে তার চুক্তি পূরণ করে, তাহলে আল্লাহ (সাঃ) তার সাথে তার চুক্তি পূরণ করবেন। পরে যুদ্ধের সময়, লোকটির গলায় গুলি লাগে এবং তিনি শহীদ হন। যখন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানানো হয় যে, সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে তার চুক্তি পূরণ করেছে, তাই আল্লাহ (সাঃ) তার সাথে তার চুক্তি পূরণ করেছেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৫৯-২৬০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি ৪৭ তম অধ্যায় মুহাম্মদের ৭ম আয়াতের সাথে সম্পর্কিত :

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করবেন।"

এই আয়াতের অর্থ হলো, কেউ যদি ইসলামকে সাহায্য করে, তাহলে মহান আল্লাহ উভয় জগতেই তাদের সাহায্য করবেন। এটা আশ্চর্যজনক যে অসংখ্য মানুষ আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, কিন্তু আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে

বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, তার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এই আয়াতের প্রথম অংশটি পূরণ করে না। বেশিরভাগ মানুষ যে অজুহাত দেয় তা হল, তাদের সৎকর্ম করার সময় নেই। তারা আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, কিন্তু তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সময় বের করে না। এর কি কোন যুক্তি আছে? যারা বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালন করে না এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে আল্লাহর সাহায্যের আশা করে, তারা বেশ বোকা। আর যারা বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালন করে কিন্তু তার বাইরে যেতে অস্বীকার করে, তারা দেখতে পায় যে তারা যে সাহায্য পায় তা সীমিত। কেউ কীভাবে আচরণ করে তার সাথে কীভাবে আচরণ করা হয়। মহান আল্লাহর জন্য যত বেশি সময় এবং শক্তি নিবেদিত হয়, তারা তত বেশি সমর্থন পাবে। এটা সত্যিই এত সহজ।

একজন মুসলিমের বুঝতে হবে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মতো বেশিরভাগ ফরজ কাজই তার দিনের মধ্যে খুব অল্প সময়ের জন্য সম্পন্ন হয়। একজন মুসলিম কখনোই আশা করতে পারে না যে, প্রতিদিন মাত্র এক ঘন্টা ফরজ নামাজ আদায়ের জন্য সময় ব্যয় করবে এবং তারপর বাকি সময় আল্লাহকে অবহেলা করবে এবং সমস্ত অসুবিধার মধ্যেও তাঁর অবিরাম সহায়তা আশা করবে। একজন ব্যক্তি এমন বন্ধুকে অপছন্দ করবে যে তার সাথে এমন আচরণ করে। তাহলে কীভাবে একজন ব্যক্তি বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর সাথে এমন আচরণ করতে পারে?

কেউ কেউ পার্থিব কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে, তারপর স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করে তার সমাধানের জন্য তাঁর কাছে দাবি করে। এই বোকা মানসিকতা স্পষ্টতই আল্লাহর দাসত্বের পরিপন্থী। এটা আশ্চর্যজনক যে এই ধরণের ব্যক্তিরা তাদের অন্যান্য অবসর কাজ যেমন পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো, টিভি দেখা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য সময় বের করে কিন্তু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সময় বের করে না। তারা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং গ্রহণ করার জন্য সময় বের করে না। তারা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অধ্যয়ন এবং তার উপর আমল করার জন্য সময় বের করে না। এই লোকেরা কোনওভাবে তাদের অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা ব্যয় করার জন্য সম্পদ খুঁজে পায় কিন্তু স্বেচ্ছায় দান করার জন্য কোন সম্পদ খুঁজে পায় না।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিমের সাথে তার আচরণ অনুসারে আচরণ করা হবে। অর্থাৎ, যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য অতিরিক্ত সময় উৎসর্গ করে, তাহলে তারা সমস্ত অসুবিধার মধ্য দিয়ে নিরাপদে ভ্রমণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবে। কিন্তু যদি তারা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় অথবা শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য অন্য কোনও সময় উৎসর্গ না করেই তা পালন করে, তাহলে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে একই রকম প্রতিক্রিয়া পাবে। সহজ কথায়, যে যত বেশি দেবে, সে তত বেশি পাবে। যদি কেউ বেশি না দেয়, তবে তার বিনিময়ে খুব বেশি আশা করা উচিত নয়।

বিশ্বাসঘাতকতা এড়ানো

খায়বারের যুদ্ধের সময়, খায়বারের এক দাস, যে তার মালিকের জন্য ভেড়া চরাচ্ছিল, ইসলাম গ্রহণ করে। যখন সে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করল যে, ভেড়াগুলো নিয়ে কী করা উচিত, তখন তিনি তাকে ভেড়াগুলো মালিকের সম্পত্তির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এই অভিযানের সময় এই দাসটি পরে শহীদ হন এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তার জন্য জান্নাত নিশ্চিত করেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রঃ)-এর "নবী (সাঃ)-এর নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৯০-১৫৯১-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যুদ্ধের সময়ও মহানবী (সাঃ) এই সাহাবীকে, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাঁর আমানত পূরণ করতে এবং ভেড়াগুলিকে তাদের মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সহীহ বুখারীতে ২৭৪৯ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকির একটি দিক।

এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ এবং মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত সকল আমানত। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি আমানত তাদের উপর অর্পণ করেছেন। এই আমানত পূরণের একমাত্র উপায় হল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমানতগুলো ব্যবহার করা। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা এবং রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আমানত পাবে, কারণ এটিই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"আর [স্মরণ করো] যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের [নেয়ামত] বৃদ্ধি করব..."

মানুষের মধ্যে আমানতও পালন করা গুরুত্বপূর্ণ। যার উপর অন্য কারো জিনিসপত্রের আমানত রাখা হয়েছে, তার উচিত সেগুলোর অপব্যবহার করা নয় এবং কেবল মালিকের ইচ্ছানুযায়ী সেগুলো ব্যবহার করা। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আমানতের মধ্যে একটি হল কথোপকথন গোপন রাখা, যদি না অন্যদের জানানোর মাধ্যমে কিছু সুস্পষ্ট লাভ হয়। দুর্ভাগ্যবশত, মুসলমানদের মধ্যে এটি প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়। তাদের এবং মানুষের মধ্যে আমানতগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যেভাবে তারা চায় অন্যরা তাদের মধ্যে থাকা আমানতগুলির সাথে আচরণ করুক।

এছাড়াও, এই ট্রাস্টগুলির মধ্যে একজনের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যেমন নির্ভরশীল ব্যক্তিরা। একজন মুসলিমকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে এই ব্যক্তিদের অধিকার পূরণের মাধ্যমে এই ট্রাস্টগুলি পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতার উপর কর্তব্য হল তাদের সন্তানদের পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য শেখা, বোঝা এবং তার উপর আমল করতে উৎসাহিত করা।

ন্যায়বিচার ধরে রাখুন

খায়বারের যুদ্ধের সময়, খায়বারের অমুসলিমরা তাদের একটি দুর্গে আশ্রয় নেয় এবং মহানবী (সাঃ) তাদের কৃষিজমি দখল করে নেন। মহানবী (সাঃ) যখন তাদের তাঁর অঞ্চল থেকে বহিষ্কার করতে চান, তখন তারা তাঁর সাথে একটি চুক্তি করেন। তারা কৃষিজমির দেখাশোনা করবে এবং ফসলের অর্ধেক নবী (সাঃ) কে হস্তান্তর করবে, এই শর্তে যে তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে না। মহানবী (সাঃ) একমত হন কিন্তু এই শর্ত যোগ করেন যে ভবিষ্যতে যদি তারা ইচ্ছা করে তাহলে মুসলমানরা তাদের বহিষ্কার করতে পারে। এরপর তিনি একজন সাহাবী আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) কে প্রতি বছর তাদের সাথে দেখা করতে এবং তাদের পারিশ্রমিক গ্রহণের জন্য নিযুক্ত করেন। এই অমুসলিমরা আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) কে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করে যাতে তিনি তাদের অর্ধেকেরও বেশি রাখতে দেন যা চুক্তিতে ছিল। তিনি উত্তরে বলেন যে, যদিও পৃথিবীতে তাঁর কাছে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চেয়ে বেশি প্রিয় আর কেউ ছিল না এবং তারা, অমুসলিমরা, তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি অপছন্দের ছিল, তবুও তিনি মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ভালোবাসা বা তাদের প্রতি তাঁর অপছন্দকে তাদের সাথে ন্যায়বিচার ও ন্যায়বিচার করতে বাধা হতে দেবেন না। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ)-এর জীবনী", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৭০-২৭১-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৪৭২১ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করেছে তারা বিচারের দিন মহান আল্লাহর নিকটে নূরের সিংহাসনে বসে থাকবে। এর মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে, তাদের পরিবারবর্গের ক্ষেত্রে এবং তাদের তত্ত্বাবধান ও কর্তৃত্বাধীন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ।

মুসলমানদের জন্য সর্বদা সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের সাথে আচরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসারে। তাদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত সমস্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও বিশ্রামের অধিকার পূরণ করে এবং প্রতিটি অঙ্গকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুসারে ব্যবহার করে তাদের নিজের শরীর ও মনের প্রতি ন্যায়বিচার করা। ইসলাম মুসলমানদের তাদের সীমার বাইরে তাদের শরীর ও মনকে ঠেলে দিয়ে নিজেদের ক্ষতি করার শিক্ষা দেয় না।

মানুষের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা উচিত, অন্যদের কাছ থেকে যেরকম আচরণ চায়, সেরকম আচরণ করা উচিত। সম্পদ এবং কর্তৃত্বের মতো পার্থিব জিনিসপত্র অর্জনের জন্য মানুষের সাথে অবিচার করে ইসলামের শিক্ষার সাথে আপস করা উচিত নয়। এটি মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশের একটি প্রধান কারণ হবে এবং সহিহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

তাদের ন্যায়পরায়ণ থাকা উচিত, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রিয়জনদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। ৪র্থ অধ্যায় আন নিসা, আয়াত ১৩৫:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়বিচারের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদান করো, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। কেউ ধনী হোক বা দরিদ্র, আল্লাহ উভয়েরই অধিক

যোগ্য। অতএব, [ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির] অনুসরণ করো না, তাহলে তোমরা ন্যায়বিচার করতে পারবে না..."

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের উপর নির্ভরশীলদের অধিকার এবং প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করা উচিত। সুনানে আবু দাউদের ২৯২৮ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাদের উপর নির্ভরশীলদের ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের জীবনে এর শিক্ষা বাস্তবায়নের গুরুত্ব শেখানো। তাদের অবহেলা করা উচিত নয় বা অন্যদের, যেমন স্কুল এবং মসজিদের শিক্ষকদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত নয়। যদি কেউ তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে অলস হয়, তাহলে তাদের এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয়।

পরিশেষে, কোন ব্যক্তিই ন্যায়বিচারের সাথে আচরণ করার স্বাধীনতা রাখে না, কারণ সর্বনিম্ন শর্ত হলো মহান আল্লাহ এবং নিজের প্রতি ন্যায়বিচার করা।

খারাপ উপাদান অপসারণ

খায়বার যুদ্ধের সময়, মহানবী (সা.) অমুসলিমদের দেশ থেকে বহিষ্কার করার পরিবর্তে কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সেখানে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন, তবে এই ধারাটিও যুক্ত করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে যদি তারা ইচ্ছা করে, তাহলে মুসলমানরা তাদের বহিষ্কার করতে পারবে। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৭০-২৭১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

তাঁর খিলাফতের সময়, উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) ইসলামী ভূখণ্ডে বসবাসকারী অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিলেন কিন্তু তিনি কাউকে তাঁর সাথে তাদের চুক্তি ভঙ্গ করার অনুমতি দেননি। খায়বার ও নাজরানে বসবাসকারী অমুসলিমরা তাদের সম্মতিকৃত শর্ত মেনে চলেনি এবং তাদের অসৎ উদ্দেশ্যের কারণে উমর (রা.) তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) একবার খায়বারে তাঁর সম্পত্তি পরিদর্শন করার সময় আক্রমণের শিকার হন এবং গুরুতর আহত হন। বাকি অমুসলিমরা যারা তাদের পরিকল্পনায় অংশ নেয়নি তারা শান্তিতে ছিল। এমনকি যখন তিনি তাদের বহিষ্কার করেছিলেন, তখনও তিনি নিশ্চিত করেছিলেন যে তাদের সম্পদ এবং নতুন সম্পত্তি দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, তাঁর জীবন ও সময়, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২০৬-২০৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার জন্য সম্প্রদায় থেকে খারাপ উপাদান অপসারণ অপরিহার্য।

সহীহ বুখারীতে ২৬৮৬ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা বোঝা যায় এমন একটি নৌকার উদাহরণ দিয়ে যার দুটি স্তর মানুষে ভরা। নীচের স্তরের লোকেরা যখনই জল পেতে চায় তখন উপরের স্তরের লোকদের বিরক্ত করতে থাকে, তাই তারা নীচের স্তরে একটি গর্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে তারা সরাসরি জল পেতে পারে। যদি উপরের স্তরের লোকেরা তাদের থামাতে ব্যর্থ হয় তবে তারা নিশ্চিতভাবে ডুবে যাবে।

মুসলিমদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা কখনই ইসলামী জ্ঞান অনুসারে সৎকাজের আদেশ এবং মন্দকাজের নিষেধ করা ছেড়ে না দেয়, নম্রভাবে। একজন মুসলিমের কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে যতক্ষণ তারা আল্লাহর আনুগত্য করে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য বিপথগামী লোকেরা তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে না। একটি ভালো আপেল পচা আপেলের সাথে রাখলে অবশেষে তার ক্ষতি হবে। একইভাবে, যে মুসলিম অন্যদের ভালোকাজের আদেশ দিতে ব্যর্থ হয়, সে অবশেষে তাদের নেতিবাচক আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হবে, তা সে সূক্ষ্ম হোক বা দৃশ্যত। এমনকি যদি বৃহত্তর সমাজ গাফেল হয়ে পড়ে, তবুও তাদের উপর নির্ভরশীলদের, যেমন তাদের পরিবারকে উপদেশ দেওয়া কখনও ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাদের নেতিবাচক আচরণ কেবল তাদের উপরই বেশি প্রভাব ফেলবে না বরং এটি সকল মুসলমানের উপরও কর্তব্য, সুনান আবু দাউদের ২৯২৮ নম্বর হাদিস অনুসারে। এমনকি যদি একজন মুসলিমকে অন্যরা উপেক্ষা করে, তবুও তাদের কর্তব্য পালন করা উচিত, ক্রমাগত তাদেরকে নম্রভাবে উপদেশ দিয়ে যা শক্তিশালী প্রমাণ এবং জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত। অজ্ঞতা এবং খারাপ আচরণের সাথে সৎকাজের আদেশ এবং মন্দকাজের নিষেধ মানুষকে সত্য এবং সঠিক পথনির্দেশনা থেকে আরও দূরে ঠেলে দেবে, যা সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

যখন কেউ সৎকাজের আদেশ দেয় এবং মন্দকাজে নিষেধ করে, কেবল তখনই সে সমাজের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে এবং বিচারের দিন তাকে ক্ষমা করা হবে। ৭ম সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ১৬৪:

"আর যখন তাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় বলল, "কেন তোমরা এমন জাতিকে উপদেশ দাও, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করতে অথবা কঠোর শাস্তি দিতে যাচ্ছেন?" তারা বলল, "তোমাদের প্রতিপালকের সামনে ক্ষমা চাও এবং সম্ভবত তারা তাঁকে ভয় করবে।"

কিন্তু যদি তারা কেবল নিজেদের কথা চিন্তা করে এবং অন্যদের কাজ উপেক্ষা করে, তাহলে আশঙ্কা করা হয় যে অন্যদের নেতিবাচক প্রভাব তাদের শেষ পর্যন্ত বিপথগামী করে তুলতে পারে।

করুণাময় হওয়া

খায়বার বিজয়ের পর, একজন ইহুদি মহিলা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে বিষাক্ত খাবার পেশ করেছিলেন। এর কিছু অংশ খাওয়ার পর, তাকে ঐশীভাবে জানানো হয়েছিল যে খাবারে বিষাক্ত খাবার রয়েছে। তিনি যখন ইহুদি মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন, তখন সে উত্তর দিয়েছিল যে, যদি তিনি নবী হতেন, তাহলে আল্লাহ তাকে বিষ সম্পর্কে অবহিত করতেন, কিন্তু যদি তিনি একজন ভণ্ড হতেন, তাহলে তিনি তাকে হত্যা করে দুনিয়ার প্রতি অনুগ্রহ করতেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর স্ত্রীলোকটিকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং তাকে শাস্তি দেননি। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৮৩-২৮৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

তাকে মুক্তি দেওয়া হয় কারণ মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) নিজের জন্য তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চাননি।

সহীহ বুখারীতে ৬৮৫৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি বরং ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং উপেক্ষা করেছেন।

যখন অন্য কোন বিকল্প অবশিষ্ট থাকে না, তখন মুসলমানদেরকে আনুপাতিক এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে আত্মরক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের কখনই সীমা লঙ্ঘন করা উচিত নয় কারণ এটি একটি পাপ। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৯০:

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

যেহেতু চিহ্ন অতিক্রম করা এড়ানো কঠিন, তাই একজন মুসলিমের ধৈর্য ধারণ করা, অন্যদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা উচিত কারণ এটি কেবল নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যই নয়, বরং মহান আল্লাহ্‌র কাছেও পৌঁছে দেয়, যিনি তাদের পাপ ক্ষমা করে দেন। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ২২:

"...এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন..."

অন্যদের ক্ষমা করা অন্যদের চরিত্রকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রেও আরও কার্যকর, যা ইসলামের উদ্দেশ্য এবং মুসলমানদের উপর কর্তব্য, কারণ প্রতিশোধ নেওয়া কেবল জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও শত্রুতা এবং ক্রোধের জন্ম দেয়।

যাদের অন্যদের ক্ষমা না করার বদ অভ্যাস আছে এবং ছোটখাটো বিষয়েও সবসময় ক্ষোভ পোষণ করে, তারা হয়তো দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করেন না বরং তাদের প্রতিটি ছোট পাপ পরীক্ষা করেন। একজন মুসলিমের

উচিত সবকিছু ছেড়ে দেওয়া শেখা কারণ এর ফলে উভয় জগতেই ক্ষমা লাভ হয়। উপরন্তু, যখন কেউ তাদের বিরক্তিকর প্রতিটি ছোটখাটো বিষয় ধরে রাখার অভ্যাস গ্রহণ করে তখন মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। অতএব, অন্যদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা শেখা একজনকে ছোটখাটো বিষয়গুলি ছেড়ে দিতে সাহায্য করে, যা তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে সহায়তা করে।

পরিশেষে, মূল হাদিসটির অর্থ এই নয় যে অন্যরা যখন সীমা অতিক্রম করে, তখন আত্মরক্ষা করা উচিত নয়, কারণ ইসলাম দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতা শেখায়। উপরন্তু, যখন কেউ অন্যদের ক্ষমা করে, তার অর্থ এই নয় যে তাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত বা স্বাভাবিকভাবেই তাদের সাথে মেলামেশা চালিয়ে যাওয়া উচিত। এতে কেবল তাদের উপর আবার অন্যায় হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহর জন্য অন্যদের ক্ষমা করা উচিত, তাদের ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের অধিকার পূরণ করতে হবে এবং অতীতে যারা তাদের উপর অন্যায় করেছে তাদের সাথে আচরণ করার সময় সতর্কতার সাথে চলতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয় এবং তারা উভয় জগতেই আশীর্বাদ এবং প্রতিদান লাভ করে।

বেআইনি ব্যবহার

খায়বার যুদ্ধের পর মদিনায় ফিরে আসার সময়, একটি তীর মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধরত এক ব্যক্তিকে আঘাত করে এবং হত্যা করে। সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, ঘোষণা করেন যে তাকে জান্নাত লাভের অধিকারী করা হয়েছে। মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন যে, সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হবে কারণ সে খায়বারে যুদ্ধের গনীমত বিতরণের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির হাতে না দিয়ে অবৈধভাবে একটি চাদর তুলে নিয়েছিল। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীজীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৮৭-২৮৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

হারাম জিনিস অর্জন এবং ব্যবহার করা একটি মহাপাপ। এর মধ্যে রয়েছে হারাম সম্পদ ব্যবহার, হারাম জিনিস ব্যবহার এবং হারাম খাবার খাওয়া। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলাম কর্তৃক হারাম হিসেবে চিহ্নিত নির্দিষ্ট জিনিস যেমন মদই কেবল হারাম নয়। প্রকৃতপক্ষে, এমনকি হালাল জিনিসও হারাম হতে পারে যদি সেগুলি হারাম জিনিসের মাধ্যমে অর্জিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, হালাল খাবার যদি হারাম সম্পদ দিয়ে কেনা হয় তবে তা হারাম হতে পারে। অতএব, মুসলমানদের জন্য এটি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা কেবল হালাল জিনিসের সাথেই লেনদেন করে কারণ কাউকে ধ্বংস করার জন্য হারাম জিনিসের একটি উপাদানের প্রয়োজন হয়।

প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিমের ২৩৪৬ নম্বর হাদিসে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি হারাম জিনিস ব্যবহার করবে তার সকল দোয়া বাতিল করা হবে। যদি আল্লাহ তাআলা তাদের দোয়া বাতিল করে দেন, তাহলে কি কেউ তাদের কোন নেক আমল কবুল হওয়ার আশা করতে পারে? সহীহ

বুখারী, ১৪১০ নম্বর হাদিসে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা কেবল হালাল জিনিসই গ্রহণ করেন। অতএব, হারাম জিনিসের ভিত্তি যেমন হারাম জিনিস দিয়ে হজ্জ পালন করা, তা বাতিল করা হবে।

বস্তুত, সহীহ বুখারী শরীফের ৩১১৮ নম্বর হাদিসে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে বলেছেন যে, এই ধরণের ব্যক্তিকে বিচারের দিন জাহান্নামে পাঠানো হবে। দ্বিতীয় সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৮৮:

" আর তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং শাসকদের কাছে তা [ঘুষ হিসেবে] পাঠাও না যাতে তারা তোমাদেরকে [মানুষের সম্পদের] কিছু অংশ পাপের মাধ্যমে গ্রাস করতে সাহায্য করতে পারে, যদিও তোমরা জেনে থাকো [এটি অবৈধ]।"

তোমার উত্তরাধিকার

উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) খায়বার বিজয়ের পর যুদ্ধের গনীমতের অংশ হিসেবে কিছু জমি পেয়েছিলেন এবং মহানবী (সাঃ) এর কাছে এটি কীভাবে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি তাকে এটিকে দাতব্য দান হিসাবে স্থাপন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এরপর সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত ফলন দরিদ্রদের মধ্যে ক্রমাগত দান করা হত। সহীহ বুখারী, ২৭৭৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, পার্থিব উত্তরাধিকার আসে এবং যায় তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। কত ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন যাতে তাদের মৃত্যুর পরপরই সেগুলো ভেঙে ফেলা হয় এবং ভুলে যাওয়া হয়? এই উত্তরাধিকারগুলির কিছু থেকে যে কয়েকটি নিদর্শন রেখে গেছে তা কেবল মানুষকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করার জন্যই টিকে থাকে। এর একটি উদাহরণ হল ফেরাউনের মহান সাম্রাজ্য। ইসলাম মুসলমানদের কেবল সৎকর্মের মাধ্যমে পরকালের জন্য আশীর্বাদ পাঠাতে শেখায় না বরং এটি তাদের এমন একটি সুন্দর উত্তরাধিকার রেখে যেতেও শেখায় যা থেকে মানুষ উপকৃত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, যখন একজন মুসলিম মারা যায় এবং এমন কিছু রেখে যায় যা কার্যকর, যেমন চলমান দান, তখন তারা এর জন্য পুরস্কৃত হবে। সহিহ মুসলিমের ৪২২৩ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত সৎকর্ম করার এবং যতটা সম্ভব ভালো কাজ পাঠানোর চেষ্টা করা, তবে তাদের এমন একটি ভাল উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত যা তাদের মৃত্যুর পরে তাদের উপকার করবে।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম তাদের সম্পদ এবং সম্পত্তি নিয়ে এতটাই চিন্তিত যে তারা কেবল সেগুলো রেখে যায় যা তাদের মোটেও উপকারে আসে না। প্রতিটি মুসলিমের এই বোকা বানানো উচিত নয় যে তাদের নিজেদের জন্য একটি উত্তরাধিকার তৈরি করার জন্য প্রচুর সময় আছে, কারণ মৃত্যুর মুহূর্ত অজানা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আজ সেই দিন যখন একজন মুসলিমের তাদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার সম্পর্কে সত্যিকার অর্থে চিন্তা করা উচিত। যদি এই উত্তরাধিকার ভালো এবং কল্যাণকর হয় , তাহলে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করা যে তিনি তাদেরকে তা করার শক্তি দিয়েছেন। কিন্তু যদি এটি এমন কিছু হয় যা তাদের উপকারে আসবে না, তাহলে তাদের এমন কিছু প্রস্তুত করা উচিত যা তাদের পরকালের জন্য কেবল কল্যাণই প্রেরণ করবে না বরং কল্যাণও পিছনে রেখে যাবে। আশা করা যায় যে, যে ব্যক্তি এইভাবে কল্যাণ দ্বারা বেষ্টিত, তাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। তাই প্রতিটি মুসলিমের নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে তাদের উত্তরাধিকার কী?

সম্পর্ক উন্নত করা

খায়বার যুদ্ধের পর, একজন সাহাবীর পরামর্শে, মহানবী (সাঃ) খায়বারের নেতাদের একজন কন্যাকে মুক্ত করে দেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর তাকে বিয়ে করেন, সাফিয়া বিনতে হুয়াই, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তার পূর্ববর্তী সম্প্রদায়, ইহুদিদের মহানবী (সাঃ) এবং ইসলামের প্রতি যে তীব্র শত্রুতা এবং ঘৃণা ছিল তা নরম করা। মহানবী (সাঃ) এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে এটি করেছিলেন কিন্তু এই ক্ষেত্রে এটি তাঁর প্রতি ইহুদিদের অবস্থান পরিবর্তন করেনি। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রাঃ) এর "নবী (সাঃ) এর নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৯৯-১৬০১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বিদেশী গোত্রের মহিলাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, এই কারণেই, কিছু বিপথগামী লোকের দাবি অনুসারে তাঁর শারীরিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নয়। এর আরও সমর্থন এই সত্য দ্বারা পাওয়া যায় যে তাঁর সমগ্র যৌবনকালে, একজন ব্যক্তির শারীরিক আকাঙ্ক্ষার উচ্চতায়, তিনি খাদিজা (রাঃ) নামে এক অবিবাহিত মহিলার সাথে বিবাহিত ছিলেন, যদিও তিনি একাধিক মহিলাকে বিবাহ করার অবস্থানে ছিলেন।

অভিবাসীরা

খায়বার যুদ্ধের পর, একদল সাহাবী, যারা পূর্বে মক্কা থেকে ইথিওপিয়ায় হিজরত করেছিলেন, তারা মদিনায় হিজরত করেন। মহানবী (সা.) তাদের হিজরতে এতটাই খুশি হয়েছিলেন যে তিনি খায়বারের গনীমতের একটি অংশ তাদের জন্য বরাদ্দ করেছিলেন। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার", পৃষ্ঠা ৩৭৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

পরবর্তীতে, একবার উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) মন্তব্য করেছিলেন যে, যারা মক্কা থেকে সরাসরি মদিনায় হিজরত করেছিলেন এবং নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে বেশি সময় কাটাতেন, তারা ইথিওপিয়ার মুহাজিরদের চেয়ে তাঁর বেশি যোগ্য ছিলেন, যারা অনেক পরে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। যখন নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে এই কথা জানানো হয়েছিল, তখন তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, যারা মক্কা থেকে সরাসরি হিজরত করেছিলেন তারা তাঁর বেশি যোগ্য ছিলেন না কারণ ইথিওপিয়ার মুহাজিররা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুবার হিজরত করেছিলেন। সহীহ বুখারী, ৪২৩১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ মুসলিমদের কাছ থেকে সেইসব অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার দাবি করেন না যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রাঃ) সহ্য করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা হিজরত করে তাদের পরিবার, ঘরবাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে এক অপরিচিত দেশে চলে গিয়েছিল, সবকিছুই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

তুলনামূলকভাবে, মুসলিমরা বর্তমানে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে, তা পূর্বসূরীদের মতো কঠিন নয়। অতএব, মুসলমানদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে তাদের কেবল কয়েকটি ছোট ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, যেমন ফজরের ফরজ নামাজ আদায়ের জন্য কিছু ঘুম এবং ফরজ দান করার জন্য কিছু সম্পদ উৎসর্গ করতে হবে। মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ঘরবাড়ি ও পরিবার পরিজন ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন না। এই কৃতজ্ঞতা বাস্তবে দেখানো উচিত, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের আশীর্বাদ ব্যবহার করে।

এছাড়াও, যখন কোন মুসলিম সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন তাদের মনে রাখা উচিত যে, নবী-রাসূলগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং কীভাবে তারা আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে সেগুলো কাটিয়ে উঠেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এই জ্ঞান একজন মুসলিমকে তাদের সমস্যা কাটিয়ে ওঠার শক্তি প্রদান করতে পারে কারণ তারা জানে যে, নবী-রাসূলগণ আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন, তবুও তারা ধৈর্যের সাথে আরও কঠোর সমস্যা সহ্য করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে ইবনে মাজাহের ৪০২৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণ (সাঃ) সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা সহ্য করেছেন এবং নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

যদি কোন মুসলিম পূর্বসূরীদের ন্যায়পরায়ণ মনোভাব অনুসরণ করে, তাহলে আশা করা যায় যে পরকালে তারাও তাদের সাথেই থাকবে।

লিঙ্গ বৈষম্য নেই

নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় হিজরতের সপ্তম বছরে, আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) একবার নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে মন্তব্য করেন যে, নারীরা হতাশ, কারণ পবিত্র কুরআনে পুরুষদের মতো তাদের উল্লেখ করা হয়নি। এর জবাবে, মহান আল্লাহ সূরা আল আহযাবের ৩৫ নম্বর আয়াত নাজিল করেন:

"নিশ্চয়ই, মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোজাদার পুরুষ ও রোজাদার নারী, তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজতকারী পুরুষ ও হেফাজতকারী নারী, এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও হেফাজতকারী নারী - তাদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।"

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৩৩:৩৫, পৃষ্ঠা ১২৯-১৩০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে মহান আল্লাহ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ব্যাখ্যা করেছেন, অর্থাৎ, সবচেয়ে সম্মানিত এবং সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন সেই ব্যক্তি যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া রয়েছে। সূরা আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

" হে মানবজাতি... নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এটা তখনই ঘটে যখন কেউ মহান আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য প্রচেষ্টা করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। দুর্ভাগ্যবশত, শয়তান অনেক নারীকে পুরুষদের তুলনায় নারীর মর্যাদা নিয়ে বিতর্ক করতে প্ররোচিত করেছে। যদিও ইসলাম নারীদের এমন সম্মান দিয়েছে যা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান বা বিশ্বাস কখনও দেয়নি, যেমন জান্নাত, যা পরম আনন্দ, একজন নারীর পায়ের নীচে, অর্থাৎ একজনের মায়ের পায়ের নীচে স্থাপন করা। সুনানে আন নাসায়ী, ৩১০৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। জামে আত তিরমিযী, ৩৮৯৫ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে , মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ দিয়েছেন যে সর্বোত্তম পুরুষ হলেন তিনি যিনি তার স্ত্রীর সাথে সর্বোত্তম আচরণ করেন। আরও অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। তবে লক্ষণীয় বিষয় হল, নারীদের নিজেদের পুরুষদের সাথে তুলনা করার বিষয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয় কারণ এটি আল্লাহ, যা চান তা নয়। বরং, নারীদের উচিত তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করা এবং যদি তারা তা অর্জন করে, তাহলে তারা তাদের চেয়ে কম তাকওয়ার অধিকারী প্রতিটি পুরুষ বা মহিলার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে। এটিই হল সেই মানদণ্ড যা কে শ্রেষ্ঠ তা আলাদা করে। এবং এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে এটি কেবল পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখলে দেখা যাবে যে, মহান মুসলিম নারীরা পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করার পরিবর্তে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোনিবেশ

করেছিলেন। এবং ফলস্বরূপ তারা বেশিরভাগ পুরুষ ও নারীর চেয়ে উন্নত হয়ে ওঠেন। এমনকি যদি মুসলিম নারীদের সেই সময়েও তাদের স্বপ্নের সমস্ত অধিকার দেওয়া হয়, তবুও তারা ধর্মপরায়ণতা গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাদের অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া সম্ভব হবে না, কারণ সংবাদ এবং যারা তাদের ইচ্ছামত আচরণ করে, তারা তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। এবং এই বাস্তবতা পরকালে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অতএব, যদি কোন মুসলিম অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ হতে চায়, তাহলে তাদের তা তর্ক-বিতর্ক এবং বিতর্কের মাধ্যমে নয়, বরং তা তাকওয়ার মাধ্যমেই অনুসন্ধান করা উচিত।

ইতিবাচকভাবে বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের সপ্তম বছরে, তিনি এক শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। একজন শত্রু সৈনিক সাহাবীদের (রাঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, যতক্ষণ না তিনি পরাজিত হন। যখন সৈনিকটি নিহত হওয়ার উপক্রম হয়, তখন সে ইসলামী ঈমানের সাক্ষ্য ঘোষণা করে। এর ফলে কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তার কাছ থেকে সরে আসেন কিন্তু একজন সাহাবী, উসামা বিন যায়েদ, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, সেই ব্যক্তিকে হত্যা করেন এই বিশ্বাসে যে তিনি কেবল তার জীবন বাঁচানোর জন্য ইসলামে ঈমানের ঘোষণা করেছেন। যখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে এই খবর পৌঁছায়, তখন তিনি উসামা বিন যায়েদ, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন। তিনি উসামা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন, কেন তিনি এমন একজনকে হত্যা করেছেন যিনি উসামা (রাঃ) তার যুক্তি দেওয়ার পরেও ঈমানের ইসলামিক সাক্ষ্য ঘোষণা করেছিলেন। এটি ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 301-এ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই ঘটনাটি স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া অন্য মুসলমানদের উপর কুফরের অভিযোগ এড়ানোর গুরুত্ব নির্দেশ করে। দুঃখের বিষয়, কিছু মুসলিম যারা গৌণ ইসলামী বিষয়গুলিতে ভিন্নমত পোষণ করেন, তারা অন্য মুসলমানদের উপর কুফরের অভিযোগ আনার অভ্যাস গ্রহণ করেছেন, যদিও তাদের মতামত ইসলামের মৌলিক নীতি, যেমন আল্লাহর একত্ববাদ, মহিমান্বিত, এর উপর ভিত্তি করে নয়। যদি ইসলামী বিষয়গুলিতে অন্য মুসলমানদের সাথে বিতর্ক করতে হয়, তবে তা অবশ্যই সম্মান এবং শিষ্টাচারের সাথে করা উচিত।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, আলোচিত মূল ঘটনাটি অন্যদের সম্পর্কে ইতিবাচক চিন্তাভাবনার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। সুনানে আবু দাউদের ৪৯৯৩ নম্বর হাদিসে , মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষের সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা করা আল্লাহ তাআলার সঠিকভাবে ইবাদতের একটি দিক। অর্থাৎ, এটি আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের একটি দিক।

নেতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করা প্রায়শই পাপের দিকে পরিচালিত করে, যেমন গীবত এবং অপবাদ। একজন মুসলিমের উচিত যেখানেই সম্ভব ইতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করা যাতে অন্যদের সন্দেহের সুবিধা দেওয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশত, নেতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করা পরিবার থেকে শুরু করে জাতীয় স্তরের সকলের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একটি জাতি কতবার অনুমান এবং সন্দেহের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে? মিডিয়াতে পাওয়া বেশিরভাগ কেলেঙ্কারি অনুমানের উপর ভিত্তি করে। এমনকি আইন তৈরি করা হয়েছে যা অনুমান এবং সন্দেহের ব্যবহারকে সমর্থন করে। এটি প্রায়শই ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্ক তৈরি করে কারণ এই মানসিকতার লোকেরা সর্বদা বিশ্বাস করে যে অন্যরা তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে তাদের সমালোচনা করছে। এটি একজনকে অন্যদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে বাধা দেয়, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে পরামর্শদাতা কেবল তাদের উপহাস করছে এবং এটি একজনকে পরামর্শ দিতে বাধা দেয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে অন্য ব্যক্তি তাদের কথার প্রতি কোন মনোযোগ দেবে না। এবং একজন ব্যক্তি যার এই নেতিবাচক মানসিকতা আছে তাকে পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকবে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটি কেবল তর্কের দিকে পরিচালিত করবে। এর ফলে অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়, যেমন তিক্ততা।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ যদি তাদের সমালোচনা করে বলে ধরে নেয়, তবুও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত যদি তা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে হয়।

সবসময় নেতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করার ফলে এক ধরণের শক্তিশালী মানসিক অসুস্থতা দেখা দেয়, যার নাম প্যারানয়া। যে প্যারানয়া গ্রহণ করে সে সবসময় অন্যদের খারাপ জিনিসের ব্যাপারে সন্দেহ করবে। এটি বিবাহের মতো সম্পর্কের জন্য অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক হতে পারে।

সম্ভব হলে ইতিবাচক উপায়ে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত, যা ইতিবাচক মানসিকতার দিকে পরিচালিত করে। এবং একটি ইতিবাচক মানসিকতা সুস্থ সম্পর্ক, অনুভূতি এবং ঐক্যের দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, সর্বদা নেতিবাচক উপায়ে বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা একজনকে সর্বদা অন্যদের প্রতি নেতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং আচরণ করতে উৎসাহিত করে, এমনকি যখন তাদের আচরণ ভালো হয়। এটি কেবল অন্যদের অধিকার পূরণ করতে বাধা দেয়, যা মহান আল্লাহ কর্তৃক আদেশ করা হয়েছে। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১২:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক [নেতিবাচক] অনুমান থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই কিছু অনুমান পাপ..."

বিশ্বাসের উপর কাজ করা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের সপ্তম বছরে, তিনি এক শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার জন্য একটি বাহিনী পাঠান। এই অভিযানের সময়, সেনাবাহিনী এমন একজনের মুখোমুখি হয় যিনি তাদের ইসলামিক শান্তির শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি একজন মুসলিম বলে ইঙ্গিত করেছিলেন। একজন সৈন্য তার সাথে পূর্বের একটি অমীমাংসিত সমস্যার কারণে তাকে আক্রমণ করে হত্যা করে। যখন এই বিষয়টি মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে পৌঁছায়, তখন তিনি নিহতের পরিবারকে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে ক্ষতিপূরণ নিতে রাজি করান। তারা অবশেষে রাজি হন কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একজন মুসলিমকে হত্যা করার জন্য সৈনিকের তীব্র সমালোচনা করেন। কয়েকদিন পরে সৈনিকটি মারা যায় এবং যখন তাকে দাফন করা হয় তখন পৃথিবী তার মৃতদেহ বাইরে ফেলে দেয়। তার লোকেরা আবার তাকে দাফন করে কিন্তু পৃথিবী আবার তার মৃতদেহ বাইরে ফেলে দেয়। অবশেষে তারা তাকে কিছু পাথরের নীচে দাফন করে। যখন এই কথা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে পৌঁছায়, তখন তিনি মন্তব্য করেন যে পৃথিবী তার চেয়ে খারাপ লোকদের গ্রহণ করে কিন্তু এটি ঘটেছিল মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা আন-নিসের ৯৪ নম্বর আয়াত নাযিল করেছেন:

"হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য বের হও, তখন অনুসন্ধান করো; এবং যে তোমাদের সালাম দেয় তাকে বলো না যে, "তুমি মুমিন নও", পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ কামনা করে; কারণ আল্লাহর কাছে অনেক সম্পদ আছে। তোমরা (তোমাদের) পূর্বেও এমনই ছিলে; তারপর আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, অতএব অনুসন্ধান করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত।"

ইবনে কাথিরের "প্রভুর জীবন" বইয়ের ৩য় খণ্ডের ৩০৪-৩০৬ পৃষ্ঠায় এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি ইসলামের প্রতি বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। কেউ ইসলামকে এমন একটি পোশাকের মতো বিবেচনা করতে পারে না যেখানে তারা তাদের ইচ্ছা অনুসারে এটি পরিধান করে বা খুলে ফেলে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে কেবল তাদের ইচ্ছার পূজা করছে, যদিও তারা অন্যথা দাবি করে। অধ্যায় ২৫ আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

ইসলাম একটি সম্পূর্ণ আচরণবিধি যা একজন ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতি এবং প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ কীভাবে ব্যবহার করে তা প্রভাবিত করে। যে ব্যক্তি বেছে নেয় এবং বেছে নেয় সে একজন মুসলিমের মতো আচরণ করে এবং কখন না করে তার ঈমান হারানোর বড় ঝুঁকি থাকে। কারণ ঈমান একটি গাছের মতো যাকে বেড়ে ওঠা এবং বেঁচে থাকার জন্য আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ সূর্যালোকের মতো পুষ্টি না পেলে মারা যায়, তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও মারা যেতে পারে যদি তারা আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা।

সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের সপ্তম বছরে, তিনি একটি অভিযান প্রেরণ করেন এবং একজন সাহাবীকে (রাঃ) দায়িত্ব দেন এবং অন্যদের তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দেন। অভিযানের সময়, এই নেতা অন্যান্য সাহাবীদের (রাঃ) উপর ক্রুদ্ধ হন এবং তাদেরকে আগুন তৈরি করে তাতে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু তারা উত্তর দেন যে তারা আগুন এবং শাস্তি থেকে বাঁচতে ইসলাম এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর দিকে ফিরেছেন। এরপর নেতার ক্রোধ কমে যায় এবং আগুন নিভে যায়। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে যখন এই খবর পৌঁছায়, তখন তিনি তাদেরকে সতর্ক করে বলেন যে যদি তারা আগুনে প্রবেশ করতো তবে তারা সেখানেই থাকতো এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মানুষের আনুগত্য কেবল সেইসব জিনিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে যা ভালো অর্থ বহন করে, এমন জিনিসের ক্ষেত্রে যা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে না। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩০৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সকলের উচিত সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যকে অন্য সকল বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া। তাদের মনে রাখা উচিত যে, যদি তারা আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে অন্যদের আনুগত্য করে, তাহলে তারা আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না। আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা যে পার্থিব জিনিসই অর্জন করে এবং যাদের আনুগত্য করে, সেগুলো উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ এবং ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ভারসাম্যহীনতার দিকে পরিচালিত করে এবং তার জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল স্থানে ফেলে দেয়। অতএব, এই আচরণ সর্বদা একজনকে মনের শান্তি পেতে বাধা দেয়। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে আনুগত্য করে, সে অন্যদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে তাঁর সুরক্ষা পাবে, যদিও এই সুরক্ষা তার কাছে স্পষ্ট নয়। আল্লাহ মানুষকে যখন তাদের জন্য সর্বোত্তম হয় এবং এমনভাবে রক্ষা করেন যা তাদের

জন্য সর্বোত্তম হয়, তিনি তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসারে মানুষকে রক্ষা করেন না। যে ব্যক্তি আল্লাহকে আনুগত্য করে, সে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থান দেবে এবং বিচার দিবসের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করবে। অতএব, অন্যান্য সকল বিষয়ের উপর মহান আল্লাহর আনুগত্য উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে, এমনকি যদি তা তার আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন তিনিও ভালো থাকবেন। কারণ একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন এবং তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, যদিও সমস্ত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তার জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তাদের পরামর্শ সকল ধরণের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ তার জীবনের প্রতিটি জিনিস এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে না, কারণ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে। একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের হাদীসের আকারে মানবজাতিকে এটি দান করেছেন। এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে এবং যারা করে না। যদিও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝে না এবং তাই তাদের ডাক্তারকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ইসলামের শিক্ষাগুলি নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি

চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। কিন্তু এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

সফর (উমরা)

প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ত

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের পর সপ্তম বছরে, তিনি মক্কায় যিয়ারত (উমরা) করার জন্য রওনা হন, যেমনটি পূর্ববর্তী বছর মক্কার অমুসলিম নেতাদের সাথে একমত হয়েছিল। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ২০০০ সাহাবী (রাঃ)-কে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাদের সাথে অস্ত্র নিয়ে এসেছিলেন। প্রাথমিক চুক্তি ছিল যে তারা কেবল তাদের খাপযুক্ত তরবারি নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবে। মক্কার অমুসলিমরা যখন জানতে পারল যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কার বাইরে শিবির স্থাপন করেছেন এবং তাঁর সাথে অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে এসেছেন, তখন তারা মিকরাজ ইবনে হাফসকে তাঁর সাথে কথা বলার জন্য পাঠায়। মিকরাজ মন্তব্য করেছিলেন যে তারা কখনও নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে তাঁর যৌবনকালে বা তাঁর বৃদ্ধ বয়সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখেননি এবং তারপরে তাঁর সাথে আনা অস্ত্রগুলি নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। মহানবী (সা.) তাদেরকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে অস্ত্রশস্ত্র মক্কার বাইরে থাকবে এবং তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, কেবল তাদের খাপযুক্ত তরবারি নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবেন, যেমনটি তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, নবী (সা.)-এর নোবেল লাইফ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬২৯-১৬৩১-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ২৭৪৯ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মুনাফিকির একটি দিক।

একজন মুসলিমের সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি হলো মহান আল্লাহর সাথে, যা তখনই সম্মত হয়েছিল যখন কেউ তাকে তাদের প্রভু ও ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া।

মানুষের সাথে করা অন্যান্য সমস্ত প্রতিশ্রুতিও অবশ্যই পালন করতে হবে, যদি না কারো কাছে কোন বৈধ অজুহাত থাকে, বিশেষ করে যেগুলি একজন বাবা-মা সন্তানদের সাথে করেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা কেবল বাচ্চাদের খারাপ চরিত্র শেখায় এবং তাদের বিশ্বাস করতে উৎসাহিত করে যে প্রতারণা করা একটি গ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সহীহ বুখারীতে ২২২৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর নামে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বৈধ অজুহাত ছাড়াই তা ভঙ্গ করে, তিনি তার বিরুদ্ধে থাকবেন। বিচারের দিন যার বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলা থাকবেন, সে কীভাবে সফল হতে পারে? যেখানেই সম্ভব অন্যদের সাথে প্রতিশ্রুতি না দেওয়াই সর্বদা নিরাপদ। কিন্তু যখন একটি বৈধ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তখন তা পূরণ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে হবে।

এছাড়াও, আলোচিত মূল ঘটনাটি অন্যদের সাথে, বিশেষ করে যারা অতীতে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তাদের সাথে সতর্ক থাকার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে।

সহীহ বুখারীতে ৬১৩৩ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুমিন একই গর্ত থেকে দুবার দংশন করে না।

এর অর্থ হলো, একজন মুমিন কখনোই কোন কিছু বা কারো দ্বারা দুবার প্রতারিত হয় না। এর মধ্যে পাপ করাও অন্তর্ভুক্ত। একজন সত্যিকারের মুমিন পাপ করার হাত থেকে রেহাই পায় না। কিন্তু যখন তারা ভুল করে, তখন তারা তাদের ভুল পুনরাবৃত্তি করে না এবং পরিবর্তে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা অনুভব করা, মহান আল্লাহর কাছে এবং যাদের উপর অন্যায় করা হয়েছে তাদের ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার সৃষ্টি করে, একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকার পূরণ করে।

একজন সত্যিকারের মুমিন কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে না, যার ফলে তার উপর অন্যায়ের ঝুঁকি বেড়ে যায়। কিন্তু যদি কেউ তাকে বোকা বানায়, তাহলে তাকে উপেক্ষা করা উচিত এবং ক্ষমা করা উচিত, কারণ এটি তাকে ক্ষমা করে দেয়। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ২২:

"...এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন..."

কিন্তু ভবিষ্যতে এই ব্যক্তির সাথে আচরণ করার সময় তাদের আচরণও পরিবর্তন করা উচিত, যাতে তারা আবার বোকা না হয়। অন্যদের ক্ষমা করা এবং বিশেষ করে যখন তারা কারো সাথে অন্যায় করে, তখন তাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করার মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে।

অধিকন্তু, এই হাদিসটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কারণ একজন প্রকৃত মুমিন হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ক্রমাগত তাদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন যাতে তারা উন্নতির জন্য পরিবর্তন আনতে পারেন যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি করতে পারে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে।

পরিশেষে, মূল হাদিসটি ক্ষমা করা এবং ভুলে যাওয়ার ভুল ধারণাটি দূর করে। যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যদের ক্ষমা করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কিন্তু ভুলে যাওয়া কেবল মানুষের জন্য আবার তাদের উপর অন্যায় করার দরজা খুলে দেয়। মানুষ তাদের স্মৃতি মুছে ফেলতে পারে না এবং তাদেরও করা উচিত নয়। পরিবর্তে, অন্যদের ক্ষমা করা উচিত, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের অধিকার পূরণ করার চেষ্টা করা উচিত, তবে মানুষের সাথে আচরণ করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, বিশেষ করে যারা অতীতে তাদের উপর অন্যায় করেছে, যাতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয়।

দুর্বলতা ছাড়া নম্রতা

হুদাইবিয়া চুক্তির সময় সম্পাদিত ওমরা পালনের জন্য যখন মুসলিমরা মক্কায় প্রবেশ করে, তখন মহানবী (সা.)-এর কাছে খবর পৌঁছায় যে, মক্কার অমুসলিম নেতারা মিথ্যা সংবাদ প্রচার করছেন যে, মুসলমানরা অত্যন্ত কষ্ট ও দুর্দশার মধ্যে রয়েছে। অমুসলিমরা মহানবী (সা.)-এর কাবার কাছে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে মহানবী (সা.)-কে এবং তাঁর সাহাবীদের (সা.)-কে সাক্ষী রেখেছিলেন। মহানবী (সা.)-এর পর তিনি সেদিন শক্তি প্রদর্শনকারীদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করেন। তাদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য, তারা কাবা প্রদক্ষিণ করার সময় আংশিকভাবে আল্লাহর রহমত কামনা করেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩০৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম মুনজারীর "সচেতনতা ও আশঙ্কা", ২৫৫৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় যে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন যে কোন ত্রুটি, দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতা গ্রহণ করে। বিনয়ী ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের প্রতি আত্মসমর্পণ করে, গ্রহণ করে এবং তার উপর আমল করে, যার ফলে তার প্রতি তাদের দাসত্ব প্রমাণিত হয়। তাদের কাছে সত্য উপস্থাপন করা হলে তারা তা সহজেই গ্রহণ করে, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে এবং কে তা তাদের কাছে পৌঁছে দেয় তা নির্বিশেষে। অর্থাৎ, তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে না, তারা সবচেয়ে ভালোভাবে জানে বলে বিশ্বাস করে। তারা অন্যদেরকে ছোট করে দেখে না, বিশ্বাস করে যে তারা তাদের কাছে থাকা যেকোনো পার্থিব জিনিসের কারণে বা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যের কারণে তারা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তারা বোঝে যে তাদের কাছে থাকা সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দ্বারা সৃষ্ট এবং প্রদত্ত। অতএব, তাদের গর্ব করার কিছু নেই। অধিকন্তু, তারা বোঝে যে, সৎকর্ম করা কেবলমাত্র মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমেই সম্ভব, কারণ সৎকর্ম করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ, শক্তি এবং ক্ষমতা সবই মহান আল্লাহর কাছ থেকে

আসে। এছাড়াও, কেবল একজন বোকা ব্যক্তিই অহংকার গ্রহণ করে কারণ সে তার চূড়ান্ত পরিণতি বা অন্যদের চূড়ান্ত পরিণতি জানে না। অর্থাৎ, তারা মৃত্যুবরণ করতে পারে যখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট নন এবং এমনকি অবিশ্বাসের অবস্থায়ও। এই সত্যগুলি বোঝা একজন ব্যক্তিকে অহংকারের মতো মারাত্মক পাপ থেকে বিরত রাখবে। যার এক অণু পরিমাণও একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহিহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতার অর্থ হল একজন মুসলিম সর্বদা অন্যদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে কিন্তু প্রয়োজনে আত্মরক্ষা করতে এবং সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে ভয় পায় না এবং তাদের নম্রতা অন্যদের চোখে তাদের অপমানিত ও অপমানিত করে না।

দয়া পছন্দনীয়

হুদাইবিয়ার চুক্তির সময় যে ওমরা হয়েছিল, সেই ওমরা পালনের জন্য মুসলিমরা মক্কায় প্রবেশ করে। তিন দিনের নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর, মক্কার অমুসলিম নেতারা দাবি করেন যে, মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কা ত্যাগ করুন। মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন যে, তিনি মক্কায় মায়মুনা বিনতে হারিস (রা.)-এর সাথে বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন, তাই তিনি সেখানে বিবাহভোজ আয়োজন করতে চান এবং অমুসলিমরাও তাঁর সাথে এই ভোজে যোগদান করুক। কিন্তু তারা অভদ্রভাবে দাবি করেন যে, তিনি মক্কা ত্যাগ করুন। মহানবী (সা.) তাদের প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করেন এবং মক্কা ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩১০-৩১১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও মক্কার অমুসলিমরা মহানবী (সা.)-এর ক্ষতি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, তবুও তিনি ভদ্রতার মাধ্যমে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করেছিলেন এই আশায় যে এটি শান্তি ও ঐক্যের দিকে পরিচালিত করবে।

জামে আত তিরমিযী, ২৭০১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে কোমলতা পছন্দ করেন।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা সকল মুসলমানের গ্রহণ করা উচিত। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা উচিত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, নম্রতা অন্য যে কারো চেয়ে মুসলমানদের জন্য বেশি উপকারী। একজন ভদ্র ব্যক্তি যখন কথা ও

কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম রাখেন, তখন তারা কেবল মহান আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও প্রতিদানই পাবেন না এবং তাদের পাপের পরিমাণও কমিয়ে আনবেন না, কারণ একজন ভদ্র ব্যক্তি তার কথা ও কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম রাখেন, বরং এটি তাদের পার্থিব জীবনেও উপকৃত করবে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে কোমল আচরণ করে, সে তার স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণের চেয়ে বিনিময়ে বেশি ভালোবাসা এবং সম্মান পাবে। যখন তাদের সাথে কোমল আচরণ করা হয়, তখন সন্তানরা তাদের পিতামাতার বাধ্য হওয়ার এবং সম্মানের সাথে আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা তাদের সাথে কোমল আচরণকারীকে সাহায্য করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এর উদাহরণ অন্তহীন। খুব বিরল ক্ষেত্রেই কঠোর মনোভাব প্রয়োজন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, কঠোর মনোভাবের চেয়ে কোমল আচরণ অনেক বেশি কার্যকর হবে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অসংখ্য ভালো গুণাবলীর অধিকারী, তবুও মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর কোমলতা বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন, কারণ এটি অন্যদের ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯:

"অতএব আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের প্রতি কোমল ছিলে। আর যদি তুমি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতে, তাহলে তারা তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

একজন মুসলিমকে মনে রাখতে হবে যে তারা কখনই একজন নবীর চেয়ে ভালো হতে পারবে না, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, এবং যার সাথে তারা যোগাযোগ করবে সে ফেরাউনের চেয়ে খারাপও হতে পারবে না, তবুও, আল্লাহ, মহান নবী মুসা

এবং নবী হারুন, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, ফেরাউনের সাথে সদয় আচরণ করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ৪৪:

"আর তার সাথে নম্রভাবে কথা বলো, হয়তো সে স্মরণ করবে অথবা [আল্লাহকে] ভয় করবে।"

কঠোরতা কেবল মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং অন্যদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে এটি একটি কঠোর এবং অশোধিত ধর্ম। এইভাবে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা একটি গুরুতর অপরাধ যা সকল মুসলমানের এড়িয়ে চলা উচিত।

অতএব, একজন মুসলিমের সকল বিষয়ে কোমলতা অবলম্বন করা উচিত কারণ এটি প্রচুর সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদের, যেমন তার পরিবারকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে মূল হাদিসটি এই অর্থ বহন করে না যে অন্যরা যখন সীমা অতিক্রম করে তখন আত্মরক্ষা করা উচিত নয়, কারণ ইসলাম দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতা শেখায়। তবে এটি মুসলমানদেরকে সাধারণভাবে ভদ্রতাকে তাদের পথ হিসেবে গ্রহণ করতে শেখায়, অন্যদের সুযোগ না দিয়ে।

পরিশেষে, একজনকে সর্বদা একটি সহজ ইসলামী দর্শন মনে রাখতে হবে, যেভাবে অন্যদের সাথে আচরণ করা হয়, আল্লাহ তার সাথেও তেমনই আচরণ করবেন। যদি কেউ অন্যদের প্রতি তাদের কথাবার্তা এবং কাজে কঠোরতা প্রদর্শন করে, তাহলে মহান আল্লাহ তার সাথেও একই আচরণ করবেন। অন্যদিকে, যদি তারা অন্যদের সাথে নম্রতার সাথে আচরণ করে, অন্যদের জন্য জিনিসপত্র সহজ করে, ভালো কাজে সাহায্য করে এবং অন্যদের ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে, তাহলে মহান আল্লাহ তার সাথেও একই আচরণ করবেন।

নবীর বিবাহ

হুদাইবিয়ার চুক্তির সময় সম্পাদিত ওমরা পালনের জন্য মুসলিমরা মক্কায় প্রবেশ করেন। এই যাত্রায় মহানবী (সা.) মায়মুনা বিনতে হারিস (রা.)-কে বিবাহ করেন। এটি ছিল তাঁর শেষ বিবাহ। ইমাম ইবনে কাথিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩১০-৩১১-এ এই বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

এটি ৩৩ সূরা আল আহযাবের ৫০-৫২ আয়াতের সাথে সম্পর্কিত:

"হে নবী! আমরা তোমার জন্য তোমার স্ত্রীদের হালাল করেছি যাদের তুমি তাদের প্রাপ্য প্রতিদান দিয়েছ এবং তোমার ডান হাতের অধিকারভুক্তদেরকে, যা আল্লাহ তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তোমার চাচাতো ভাইদের কন্যাদের, তোমার মামাতো ভাইদের কন্যাদের, তোমার মামাতো ভাইদের কন্যাদের, তোমার সাথে হিজরতকারী ফুফুদের কন্যাদের এবং কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে [এবং] নবী যদি তাকে বিয়ে করতে চান; [এটি] কেবল তোমার জন্য, [অন্যান্য] মুমিনদের ব্যতীত। আমরা অবশ্যই জানি যে আমরা তাদের স্ত্রীদের এবং তাদের ডান হাতের অধিকারভুক্তদের ব্যাপারে তাদের উপর কী ফরজ করেছি, [কিন্তু এটি তোমার জন্য] যাতে তোমার উপর কোন অসুবিধা না হয়। এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। তুমি, [নবী মুহাম্মদ, সা.], তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারো[1] অথবা যাদেরকে ইচ্ছা নিজের কাছে রাখতে পারো। আর যাদের থেকে তুমি [সাময়িকভাবে] বিচ্ছিন্ন ছিলে তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তুমি [বিচ্ছিন্ন] করেছো, তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তুমি [প্রত্যাবর্তন করতে] তোমার কোন দোষ নেই। [তাঁর]। এটা তাদের জন্য অধিক উপযুক্ত যে তারা সন্তুষ্ট থাকুক এবং দুঃখ না করুক এবং তুমি

তাদেরকে যা দিয়েছো তাতেই সন্তুষ্ট থাকুক - তাদের সকলের জন্যই। আর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা জানেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সহনশীল। [নবী মুহাম্মদ, সা.], [এর পরে] [আর কোন] নারী তোমার জন্য বৈধ নয় এবং [এটাও বৈধ নয়] যে তুমি তাদের পরিবর্তে অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ করো, যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে, তবে তোমার ডান হাতের অধিকার ছাড়া। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে পর্যবেক্ষক।"

এই আয়াতগুলি ইঙ্গিত দেয় যে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে প্রথমে একসাথে চারজনের বেশি নারী বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যারা খোলা মনে এগুলো অধ্যয়ন করে তাদের জন্য এই আয়াতগুলি এর কারণটি বেশ স্পষ্ট করে তোলে। এই আয়াতগুলিতে উল্লেখিত অসুবিধাগুলি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং তাঁর ঐতিহ্যকে সমাজে এবং বিশ্বজুড়ে বিস্তৃতভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর লক্ষ্যকে নির্দেশ করে। এই শিক্ষাগুলিকে দুটি দিকে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটি হল তাঁর জনজীবন, যা সম্পর্কে জানার এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, দায়ী ছিলেন। দ্বিতীয়টি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, যা সম্পর্কে জানার এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর পরিবার, যেমন তাঁর স্ত্রীগণ, দায়ী ছিলেন। ইতিহাস থেকে স্পষ্ট যে, তাঁর জনজীবনের শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার জন্য হাজার হাজার সাহাবা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, প্রয়োজন ছিল, তাহলে কীভাবে চারজন স্ত্রী, ইসলাম কর্তৃক মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত সীমা, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সম্ভব হতে পারে? এই কারণেই তাঁর মিশনকে সহজ করার জন্য তাঁকে একসাথে চারজনের বেশি স্ত্রী রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতগুলিতে এটি নির্দেশিত হয়েছে। আলোচ্য মূল আয়াতগুলির শেষ অংশ দ্বারা এটি আরও সমর্থিত যেখানে মনে হয় যে আরও স্ত্রী বিবাহের অনুমতি বাতিল করা হয়েছিল কারণ তাঁর যথেষ্ট সংখ্যক স্ত্রী ছিলেন যারা নিখুঁত ছিলেন, কারণ তাদের বয়স এবং সামাজিক পটভূমি ভিন্ন ছিল, যাতে তারা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের শিক্ষা সমাজ এবং বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিতে পারতেন, যা তারা সর্বোচ্চ সম্ভাব্য মানদণ্ডে পালন করেছিলেন, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

এছাড়াও, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বিদেশী গোত্রের নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, যাতে তাঁর শত্রুদের হৃদয় নরম হয় এবং তারা খোলামেলা ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে ইসলামের শিক্ষা শুনতে পারে। কিছু বিপথগামী লোকের দাবি অনুসারে তাঁর বিবাহ তাঁর শারীরিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ছিল না। এর আরও সমর্থন এই যে, তাঁর সমগ্র যৌবনকালে, একজন ব্যক্তির শারীরিক আকাঙ্ক্ষার উচ্চতায়, তিনি খাদিজা (রাঃ) নামে এক অবিবাহিত মহিলার সাথে বিবাহিত ছিলেন, যদিও তিনি একাধিক মহিলাকে বিবাহ করার অবস্থানে ছিলেন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইসলাম পুরুষদের একসাথে সর্বোচ্চ চারজন নারীকে বিবাহ করার অনুমতি দেয়, যেখানে নারীরা যেকোনো সময়ে কেবল একজন স্বামী রাখতে পারে। এই পার্থক্যের অনেক কারণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের আবির্ভাবের সময় বেশিরভাগ নারীরই আজকের মতো কোনও পেশা ছিল না, তাই যখনই একজন নারী বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত হতেন তখন প্রায়শই তার নিজের বা তার সন্তানদের ভরণপোষণের কোনও উপায় থাকত না। এটি নারীদের অবৈধ কার্যকলাপে বাধ্য করত। এই বিপর্যয় দূর করার জন্য, পুরুষদের সর্বোচ্চ চারজন নারীকে বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

তাছাড়া, যখন একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রীর অধিকারী হন, তখনই একজন স্ত্রীর সন্তান জন্মদানের সময় তার বাবা-মা কে তা স্পষ্ট হয়। কিন্তু যদি একজন মহিলাকে একই সাথে একাধিক পুরুষকে বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে পিতা শনাক্ত করা কঠিন হত কারণ অনেক মানুষ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য অর্থ প্রদান করতে পারে না। যারা সামর্থ্য রাখে তাদের অনেকেই পিতৃত্বের বোঝা থেকে মুক্তি পেতে এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রদত্ত তথ্য প্রত্যাখ্যান করবে। এর ফলে ভাঙা

পরিবার এবং একক পিতামাতার ঘরবাড়ির মতো অসংখ্য সামাজিক সমস্যা দেখা দেবে। এই আইনে এই ভবিষ্যদ্বাণীও বিবেচনা করা হয়েছিল যে, সময়ের শেষের দিকে নারীর সংখ্যা এতটাই বৃদ্ধি পাবে যে প্রতি একজন পুরুষের জন্য পঞ্চাশজন নারী থাকবে। সুনান ইবনে মাজাহ, ৪০৪৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইসলামে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই, তাই একজন নারী কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন না। এছাড়াও, একজন পুরুষের সর্বদা তার সহ-স্ত্রীদের সাথে সমান ও সম্মানজনক আচরণ করার লক্ষ্য রাখা উচিত, যা ইসলাম নির্দেশ করেছে।

পরিশেষে, এটা খুবই অদ্ভুত যে, কেউ কেউ একাধিক স্ত্রীর বিরোধিতা করে, কিন্তু একাধিক সঙ্গীকে গ্রহণ করে, যদিও প্রথম স্ত্রী একজন পুরুষকে তার সমস্ত স্ত্রীর সাথে সমান আচরণ করতে বাধ্য করে এবং তাদের প্রত্যেকের অধিকার পূরণের বিষয়টি নিশ্চিত করে, যেখানে একাধিক সঙ্গী থাকলে এই ধরনের সদয় এবং ন্যায্য আচরণ করা হয় না। এটা অদ্ভুত যে এই লোকেরা ন্যায়বিচার এবং দয়া দ্বারা আবদ্ধ বিবাহের বিরোধিতা করে কিন্তু ব্যভিচারে খুশি থাকে। বিবাহ শিশুদের জন্য স্থিতিশীল এবং সহায়ক ঘরের জন্ম দেয়, অন্যদিকে, একাধিক সঙ্গী থাকার ফলে ভাঙা এবং অসহায় ঘর তৈরি হয়, যার ফলে সমাজের মধ্যে অপরাধ এবং পাপ বৃদ্ধি পায়।

নারীদের সম্মান জানানো

যিয়ারত শেষে মক্কা ত্যাগ করার সময়, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর চাচা হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)-এর কন্যার পিছু ধাওয়া করেন। তিনি মক্কা ছেড়ে মদিনায় মুসলমানদের মধ্যে বসবাস করতে চেয়েছিলেন। আলী ইবনে আবু তালিব তাকে নিয়ে যান এবং তাঁর স্ত্রী ফাতিমা (রাঃ)-কে বলেন যে তারা তাঁকে তাদের তত্ত্বাবধানে রাখবেন। জাফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ)-এর যুক্তি ছিল যে, তিনি তাঁর চাচার কন্যা এবং তাঁর খালা ছিলেন তাঁর স্ত্রী, তাই তাঁকে তাঁর তত্ত্বাবধানে রাখার অধিকার তাঁর বেশি। যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ)-এর যুক্তি ছিল যে, বহু বছর আগে মহানবী (সাঃ)-এর বিশ্বাসের বন্ধনের মাধ্যমে তাঁর পিতা তাঁর ভাই হওয়ায় তাঁকে তাঁর তত্ত্বাবধানে রাখার অধিকার তাঁর বেশি। নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পক্ষে রায় দেন এবং মন্তব্য করেন যে, খালা মর্যাদায় মায়ের মতোই। এরপর তিনি সকলকে সান্ত্বনা ও প্রশংসা করে মন্তব্য করেন যে আলী তাঁর থেকে এবং তিনি আলী (রাঃ) থেকে, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন। তিনি জাফর (রাঃ) কে বলেন যে, তিনি শারীরিক চেহারা এবং চরিত্রে তাঁর সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি যায়েদ (রাঃ) কে বলেন যে, তিনি তাঁর মুক্ত দাস এবং তাঁর ভাইয়ের মতো। সহীহ বুখারী, ৪২৫১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটি একটি অত্যন্ত অবিশ্বাস্য ঘটনা কারণ এর মাত্র কয়েক বছর আগে আরবরা মেয়েদের ঘৃণার চোখে দেখত এবং তাদের পরিবারের জন্য অভিশাপ হিসেবে দেখত। ফলস্বরূপ, অনেক আরব তাদের নবজাতক কন্যাদের জীবন্ত কবর দিত। ইসলামে এই মনোভাব অত্যন্ত সমালোচিত। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৫৮-৫৯:

"আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের খবর দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃখ চেপে রাখে। তাকে যে মন্দ সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তার কারণে সে লোকদের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। সে কি তাকে অপমানিত অবস্থায় রেখে দেবে, নাকি মাটিতে পুঁতে দেবে? নিঃসন্দেহে, তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা খুবই মন্দ।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইসলামের পূর্বে, নারীরা নিজেরাই অন্যদের দ্বারা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জিনিস হিসেবে গণ্য হত। ইসলাম এই অন্যায্য প্রথাটি বাতিল করে এবং তাদেরকে এমন অধিকার প্রদান করে যা অন্য যেকোনো সমাজের চেয়েও বেশি।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইসলামের পূর্বে, জাহেলিয়াতের যুগে, নারীদের গৃহস্থালির জিনিসপত্রের সাথে তুলনা করা প্রচলিত ছিল। এগুলো গরুর মতো কেনা-বেচা করা হত। বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর কোন অধিকার ছিল না। আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু অংশ পাওয়ার অধিকারী হওয়া তো দূরের কথা, তাকে অন্যান্য গৃহস্থালির জিনিসপত্রের মতো উত্তরাধিকারের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হত। তাকে পুরুষদের মালিকানাধীন জিনিস হিসেবে বিবেচনা করা হত, কিন্তু তার কিছুই করার অধিকার ছিল না। এবং তিনি কেবল একজন পুরুষের ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করতে পারতেন। অন্যদিকে, পুরুষ তার ইচ্ছানুযায়ী তার যে কোনও সম্পদ, যেমন মজুরি, ব্যয় করতে পারতেন। এই পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকারও তার ছিল না। ইউরোপের কিছু গোষ্ঠী এমনকি নারীদের মানুষ বলে মনে করত না এবং তাকে পশুর সাথে তুলনা করত। ধর্মে নারীদের কোন স্থান ছিল না। তাদেরকে উপাসনার অযোগ্য বলে মনে করা হত। এমনকি কেউ কেউ নারীদের আত্মার অধিকারী বলে ঘোষণা করত না। একজন পিতার পক্ষে তার নবজাতক বা ছোট মেয়েকে হত্যা করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হত কারণ এটি পরিবারের জন্য লজ্জাজনক বলে বিবেচিত হত। কেউ কেউ এমনকি বিশ্বাস করত যে যে ব্যক্তি একজন নারীকে হত্যা করেছে

তার বিরুদ্ধে কোনও ন্যায়বিচার করা হবে না। কিছু প্রথা এমনকি মৃত স্বামীর স্ত্রীকে হত্যা করত কারণ তাকে স্বামী ছাড়া বেঁচে থাকার যোগ্য মনে করা হত না। এমনকি কিছু প্রথা ঘোষণা করেছিল যে নারীর উদ্দেশ্য কেবল পুরুষদের সেবা করা।

কিন্তু মহান আল্লাহ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে, সকল মানুষকে সম্মান করতে শিক্ষা দিয়েছেন, ন্যায়বিচার ও ন্যায়বিচারকে আইনের আওতায় এনেছেন এবং পুরুষদেরকে নারীর উপর তাদের নিজস্ব অধিকারের সমান্তরালভাবে তাদের অধিকার পূরণের জন্য দায়ী করেছেন। নারীদের স্বাধীন ও স্বাধীন করা হয়েছে। পুরুষদের মতোই তিনিও তার নিজের জীবন ও সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠেছেন। কোনও পুরুষ কোনও নারীকে কাউকে বিয়ে করতে বাধ্য করতে পারে না। যদি তাকে তার সম্মতি ছাড়া বাধ্য করা হয়, তাহলে বিবাহ চালিয়ে যাওয়া বা বাতিল করা তার পছন্দ। কোনও পুরুষের অধিকার নেই যে তার সম্মতি এবং অনুমোদন ছাড়া তার সম্পত্তি থেকে কিছু ব্যয় করতে পারে। স্বামীর মৃত্যুর পর বা বিবাহ বিচ্ছেদের পর সে স্বাধীন হয়ে যায় এবং কেউ তাকে কিছু করতে বাধ্য করতে পারে না। আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব অনুসারে সে পুরুষদের মতো উত্তরাধিকারে অংশ পায়। নারীদের উপর ব্যয় করা এবং তাদের সাথে ভালো আচরণ করাকে আল্লাহ কর্তৃক ইবাদতের একটি কাজ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই সমস্ত অধিকার এবং আরও অনেক কিছু নারীদের আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ দেয়নি। এটা অদ্‌ভুত যে আজ যারা নারীর অধিকারের পক্ষে দাঁড়ায় তারা ইসলামের সমালোচনা করে, যদিও ইসলাম বহু শতাব্দী আগে নারীদের অধিকার দিয়েছিল।

অভিবাসনের পর ৮ ম বছর

জীবনে শূন্যতা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের অষ্টম বছরে, মক্কার একজন অমুসলিম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) মদিনায় ভ্রমণ করে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, এই সময়ে, মহান আল্লাহ তাঁর হৃদয়ে ইসলামের আকাঙ্ক্ষা স্থাপন করেছিলেন এবং তাকে তা নিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। এরপর তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি কীভাবে আরবের ভূখণ্ডে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে দেখেছিলেন, যদিও এই অমুসলিমরা তাদের ভূখণ্ডে যা করেছিল তা নিন্দনীয় ছিল এবং তিনি অনুভব করেছিলেন যেন তিনি আর তাদের মধ্যে নেই। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে তিনি জানতেন যে সত্য, ইসলাম, অবশেষে জয়লাভ করবে, তাই তিনি মদিনায় যাওয়ার এবং ইসলাম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩২৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলাম গ্রহণে তাকে আরও উৎসাহিত করার কারণ ছিল তার ভাই ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) এর কাছ থেকে পাওয়া চিঠি। চিঠিতে তার ভাই অবাক হয়েছিলেন যে খালিদের মতো একজন ব্যক্তি ইসলামের বিরোধিতা করে এত বুদ্ধিমান হয়েও এত অজ্ঞ হতে পারেন। তিনি আরও যোগ করেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে, তার মতো একজনের ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা উচিত নয় এবং যদি তিনি ইসলামের সাহায্যে তার প্রচেষ্টা চালান, তাহলে তা তার জন্য ভালো হবে এবং তাকে অন্যদের থেকে এগিয়ে

নিয়ে যাবে। তার ভাই তাকে এই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত না হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন কারণ তিনি এর আগেও অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রহঃ)-এর "দ্য নোবেল লাইফ অফ দ্য প্রফেট (সাঃ)", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৪২-১৬৪৩" -এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আহযাবের যুদ্ধের পর আমর বিন আস ইথিওপিয়ায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন, কারণ তিনি মনে করেন যে আরবে ইসলামের জয় হবে। তিনি মন্তব্য করেন যে, যদি আরবে ইসলামের জয় হয়, তাহলে তিনি ইথিওপিয়ার রাজার অধীনে থাকতে পছন্দ করবেন, যিনি তার বন্ধু ছিলেন, এবং যদি অমুসলিমরা ইসলামের উপর জয়লাভ করে, তাহলে তাদের সাথে তার ইতিমধ্যেই দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। ইথিওপিয়ায় পৌঁছানোর পর তিনি একজন সাহাবীকে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, বাদশাহর দরবার থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেন। এরপর তিনি বাদশাহর কাছে অনুরোধ করেন যে, এই ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডের জন্য তার হাতে তুলে দিন। বাদশাহ তার উপর ক্ষুব্ধ হন এবং মন্তব্য করেন যে, তিনি কীভাবে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দূতকে মৃত্যুদণ্ডের জন্য হস্তান্তর করতে পারেন। বাদশাহ তখন আমরকে ইসলাম গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেন কারণ এটি সত্য। আমর তখন বাদশাহর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি মদিনায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য। পথে তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদের সাথে ধাক্কা খান, যিনিও ইসলাম গ্রহণের জন্য মদিনায় যাচ্ছিলেন। তারা উভয়েই মহানবী (সাঃ)-এর কাছে প্রবেশ করেন এবং তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর (সাঃ) নোবেল জীবন", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৩৯-১৬৪১-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

খালিদ, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তার জীবনে যে শূন্যতা অনুভব করেছেন তা অনেক মানুষই অনুভব করেন। সকল বয়সের অনেক মানুষই তাদের জীবনের ভেতর থেকে এই ধরণের শূন্যতা অনুভব করেন। কেউ কেউ এই অনুভূতিকে মধ্য-

জীবনের সংকটের সাথেও যুক্ত করেন। যারা এই অনুভূতি অনুভব করেন তারা প্রায়শই তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং তাদের জীবনে এক বিশাল শূন্যতা অনুভব করেন, যদিও তারা অনেক কিছুর মালিক এবং অনেক পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছেন। প্রায়শই এটি ঘটে কারণ এই লোকেরা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করছে না, যা হল মহান আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা, যাতে তারা সঠিকভাবে তাঁর আনুগত্য এবং উপাসনা করতে পারে। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যার কাছে সর্বশেষ মোবাইল ফোন রয়েছে যার এখনও অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, একটি ত্রুটির কারণে এটি তার প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয় যা হল ফোন কল করা। এই অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি যতই ভালো হোক না কেন, মালিক সর্বদা এটির প্রতি শূন্যতা অনুভব করবেন কারণ ফোনটি তার অস্তিত্বের প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণ করে না। একইভাবে, একজন ব্যক্তি তাদের জীবনে একটি শূন্যতা অনুভব করবেন, এমনকি তাদের কাছে অনেক পার্থিব জিনিস থাকলেও। এই অনুভূতি মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়কেই প্রভাবিত করে। অমুসলিমরা কেন এমন বোধ করে তা স্পষ্ট, কারণ তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ থেকে বেশি দূরে থাকতে পারে না, তাই তারা যা-ই অর্জন করুক না কেন, তারা অবশেষে তাদের জীবনে এই শূন্যতা অনুভব করে। এটি সেইসব মুসলমানদের ক্ষেত্রে ঘটে যারা তাদের বাধ্যতামূলক কর্তব্যগুলিও পালন করতে পারে কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার চেষ্টা করতে ব্যর্থ হয়, তারা এই শূন্যতা অনুভব করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা আরবি ভাষাও বোঝে না, তাই ইবাদত করলে এই শূন্যতা পূরণ হয় না। কেউ এই শূন্যতা পূরণ করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করার চেষ্টা করে, অর্থাৎ মহান আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা, যাতে তারা তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত জুড়ে সঠিকভাবে তাঁর আনুগত্য এবং উপাসনা করতে পারে।

মুতার যুদ্ধ

সঠিক ধারণা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের পর অষ্টম বছরে, তিনি মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এই সেনাবাহিনীকে পাঠানো হয়েছিল, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর দূত হারিস বিন উমাইর (রাঃ) হিসেবে, যিনি বুসরার শাসকের কাছে একটি চিঠি পাঠাচ্ছিলেন, রোমান রাজার মিত্র বলকার গভর্নর তাকে ধরে নিয়ে হত্যা করেন। এটি ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, কারণ প্রতিটি যুগে একজন রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করা সর্বদা নিষিদ্ধ। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা 382-383 এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যথারীতি, যখন মহানবী (সা.) সেনাবাহিনী প্রেরণ করতেন, তখন তিনি তাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার, বিশ্বাসঘাতকতা এড়াতে, শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ ব্যক্তি বা আশ্রমে বিচ্ছিন্ন কাউকে হত্যা না করার, গাছ না কাটার বা ভবন ভাঙার পরামর্শ দিতেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন যে যখন তারা শত্রুর মুখোমুখি হবে তখন তাদের তিনটি বিকল্পের একটিতে আমন্ত্রণ জানানো উচিত: ইসলাম গ্রহণ করা, কর প্রদান করা অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (র.)-এর "দ্য নোবেল লাইফ অফ দ্য প্রফেট (সা.)-এর খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৫১"-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী (সাঃ) এই বাহিনীর একজন সেনাপতি এবং আরও দুজন উত্তরসূরী, একের পর এক, মনোনীত করেছিলেন। লোকেরা এ থেকে বুঝতে পেরেছিল যে এই নির্দিষ্ট সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, শহীদ করা হবে। এমনকি একজন ইহুদি ব্যক্তি পূর্ববর্তী ঐশী শিক্ষা থেকে নিশ্চিত করেছিলেন যে যখনই কোন নবী (সাঃ) একজন সেনাপতির উত্তরসূরী মনোনীত করতেন, তখন তাদের অবশ্যই শহীদ করা হত। প্রথম সেনাপতির উত্তরসূরী ছিলেন আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, লোকদের বিদায় জানাতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। যখন তাকে তার কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তার কান্না দুনিয়া বা মানুষের প্রতি ভালোবাসার কারণে নয় বরং তিনি আখেরাত এবং মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করেছিলেন যে প্রত্যেকেই জাহান্নামের মুখোমুখি হবে কিন্তু তিনি নিশ্চিত ছিলেন না যে তিনি কীভাবে এ থেকে মুক্তি পাবেন। অধ্যায় ১৯ মরিয়ম, আয়াত ৭১:

"আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে সেখানে [জাহান্নামে] আসবে না। এটা তোমার পালনকর্তার উপর এক অনিবার্য বিষয় নির্ধারিত।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩২৬-৩২৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যুদ্ধের নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম আছে যা অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করার দাবিদাররা যদি এই নিয়মগুলো মেনে না চলে, তাহলে তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য সমালোচনা করা উচিত, ইসলামের জন্য নয়।

এছাড়াও, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার আচরণ থেকে বোঝা যায় যে, সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, সর্বদা পরকালের উপর মনোযোগ দিতেন এবং বস্তুগত জগতের বিলাসিতা সংগ্রহ ও মজুদ করার চেয়ে এর জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দিতেন। মুসলিমদের জন্য এই পৃথিবী এবং পরকালের প্রকৃতি বোঝার মাধ্যমে এই সঠিক ধারণা এবং মনোভাব গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪১০৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, আখেরাতের তুলনায় বস্তুগত জগৎ সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতো।

বাস্তবে, এই উপমাটি দেওয়া হয়েছিল যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে বস্তুজগৎ পরকালের তুলনায় কতটা ছোট। কিন্তু বাস্তবে তাদের তুলনা করা যায় না, কারণ বস্তুজগৎ ক্ষণস্থায়ী আর পরকাল চিরস্থায়ী। অর্থাৎ, সীমিতকে অসীমের সাথে তুলনা করা যায় না। বস্তুজগৎকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তার পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব। এই গোষ্ঠীর মধ্যে যে পার্থিব আশীর্বাদই আসুক না কেন, তা সর্বদা অসম্পূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী হবে এবং মৃত্যু একজন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অন্যদিকে, পরকালের আশীর্বাদ স্থায়ী এবং নিখুঁত। তাই এই দিক থেকে বস্তুজগৎ একটি অসীম সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা ছাড়া আর কিছু নয়।

তাছাড়া, একজন ব্যক্তির এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবন লাভের নিশ্চয়তা নেই, কারণ মৃত্যুর সময় অজানা। অন্যদিকে, প্রত্যেকেরই মৃত্যু অনুভব করা এবং পরকালে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা রয়েছে। তাই, পরকালের জন্য প্রচেষ্টা করার চেয়ে, অবসরের মতো দিনের জন্য প্রচেষ্টা করা, যা তারা কখনও পৌঁছাতে পারে না, বোকামি।

এর অর্থ এই নয় যে, পৃথিবীকে ত্যাগ করা উচিত কারণ এটি একটি সেতু যা পার হয়ে নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে হবে। বরং, একজন মুসলিমের উচিত এই বস্তুগত পৃথিবী থেকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা, অপচয়, অতিরিক্ত ব্যয় বা অপচয় ছাড়াই। এবং তারপর তাদের বাকি প্রচেষ্টা আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে চিরন্তন পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য উৎসর্গ করা, তাঁর উপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য পাবে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অসীম সমুদ্রের চেয়ে এক ফোঁটা জলকেই প্রাধান্য দেবেন না এবং একজন বুদ্ধিমান মুসলিম চিরন্তন পরকালের চেয়ে পার্থিব বস্তুগত জগৎকে প্রাধান্য দেবেন না।

অনুসরণ করাই সেরা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের পর অষ্টম বছরে, তিনি মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনীর একজন সদস্য ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ)। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সেনাবাহিনীকে ভোরবেলা চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) তার যাত্রা বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত নেন যাতে তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর পিছনে নামাজ পড়তে পারেন এবং তারপর বাকি সেনাবাহিনীর সাথে দেখা করতে পারেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যখন তাকে মসজিদে নামাজের জন্য উপস্থিত থাকতে দেখেন, তখন তিনি তার কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি তাকে বলেন যে তাকে প্রদত্ত আদেশ অনুসরণ করা সমগ্র বিশ্বের চেয়েও উত্তম। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩২৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য মেনে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে, অন্যান্য শিক্ষা এবং কর্ম অনুসরণ করার পরিবর্তে, যদিও এগুলো ইসলামে ভালো বলে বিবেচিত হয়।

সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, ইসলামের ভিত্তিতে নয় এমন যেকোনো বিষয় প্রত্যাখ্যাত হবে।

যদি মুসলিমরা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই স্থায়ী সাফল্য চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্য কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যদিও, এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎস থেকে সরাসরি নেওয়া হয়নি এমন কিছু কাজকে এখনও সৎকর্ম হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, তবুও এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎসকে অন্য সকলের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎস থেকে নেওয়া নয় এমন জিনিসের উপর যত বেশি কেউ কাজ করবে, এমনকি যদি সেগুলি সৎকর্ম হয়, তবুও তারা এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎসের উপর তত কম কাজ করবে। এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ হল কত মুসলিম তাদের জীবনে এমন সাংস্কৃতিক রীতিনীতি গ্রহণ করেছে যার এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎসের ভিত্তি নেই। যদিও এই সাংস্কৃতিক রীতিনীতি পাপ নয়, তবুও তারা মুসলমানদের এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎস শেখা এবং সেগুলি অনুসরণ করা থেকে বিরত রেখেছে, কারণ তারা তাদের আচরণে সন্তুষ্ট বোধ করে। এর ফলে নির্দেশনার উৎস সম্পর্কে অজ্ঞতা দেখা দেয়, যা কেবল পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করে।

এই কারণেই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই দুটি পথনির্দেশনার উৎস শিখতে হবে এবং সেগুলোর উপর আমল করতে হবে, যা পথনির্দেশনার নেতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং তারপর যদি তাদের সময় এবং শক্তি থাকে তবেই অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সৎকর্মে আমল করতে হবে। কিন্তু যদি তারা অজ্ঞতা এবং বানোয়াট অভ্যাস বেছে নেয়, এমনকি যদি সেগুলি পাপ নাও হয়, তাহলে পথনির্দেশনার এই দুটি উৎস শেখা এবং সেগুলোর উপর আমল করার চেয়ে তারা সাফল্য অর্জন করতে পারবে না।

পরিশেষে, যখন কেউ অজ্ঞতার কারণে এই দুটি পথনির্দেশের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয় এমন কাজ করতে থাকে, তখন সে সহজেই এমন অভ্যাস এবং বিশ্বাসে পতিত হয় যা প্রতিষ্ঠিত ইসলামী জ্ঞানের পরিপন্থী। এটি মুসলিমকে পাপ এবং বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যায় যখন তারা মনে করে যে তারা সঠিক পথে আছে। যে

জানে যে তারা পথভ্রষ্ট, সে অন্যদের দ্বারা উপদেশ গ্রহণ এবং পরিবর্তন করার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু যে মনে করে যে তারা সঠিক পথে আছে তার পক্ষে তাদের পথ পরিবর্তন এবং সংশোধন করার সম্ভাবনা খুবই কম, এমনকি যখন জ্ঞান এবং স্পষ্ট প্রমাণের অধিকারী অন্যরা তাকে সতর্ক করে। এই পরিণতি এড়ানোর একমাত্র উপায় হল পথনির্দেশনার দুটি উৎসে পাওয়া জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর ভিত্তি করে কাজ করার চেষ্টা করা এবং অন্যান্য কাজ এড়িয়ে চলা, এমনকি যদি সেগুলি সৎকর্ম বলে মনে হয়।

বিশ্বাসে শক্তি

মুতার যুদ্ধের সময়, মুসলিম সেনাবাহিনী মুতার কাছে পৌঁছে শিবির স্থাপন করে যেখানে তাদের জানানো হয় যে শত্রু বাহিনীর সংখ্যা প্রায় ২০০,০০০। সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, বিতর্ক করেছিলেন যে অভিযান চালিয়ে যাওয়া উচিত নাকি মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে বার্তা পাঠানো উচিত, পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা এবং আরও আদেশের জন্য অনুরোধ করা উচিত। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন, উঠে দাঁড়ালেন এবং সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করলেন, তাদের মনে করিয়ে দিলেন যে তাদের শক্তি সংখ্যা বা অস্ত্রের উপর নয় বরং এটি এসেছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তাঁর আন্তরিক আনুগত্যে। তিনি সেনাবাহিনীকে শাহাদাত অথবা বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেনাবাহিনী একমত হয়ে অবিচল থেকে বেরিয়ে গেল। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩২৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি প্রতিটি পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ মুসলিমের ১৫৯ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে তাদের বিশ্বাস ঘোষণা করার এবং তারপরে তার উপর অবিচল থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হলো, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যে সংগ্রাম করা। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোজা এবং মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহ, মহানের মধ্যে এবং অন্যদের সাথে সম্পর্কিত। একজন মুসলিমকে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে, সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

পরিশেষে, এর মধ্যে রয়েছে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসারে এই দিকগুলি পূরণ করা। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

দৃঢ়তার মধ্যে উভয় ধরণের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান প্রকার হল যখন কেউ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা করে। গৌণ প্রকার হল

যখন কেউ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুর জন্য ভালো কাজ করে, যেমন লোক দেখানো। সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৮৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, দৃঢ়তার একটি দিক হল সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা এবং কখন এবং কোন ইসলামী শিক্ষা কেউ তার ইচ্ছানুযায়ী অনুসরণ করবে তা থেকে বিরত থাকা।

দৃঢ়তার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, নিজের বা অন্যদের আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পরিবর্তে। যদি কোন মুসলিম নিজেকে বা অন্যদের খুশি করে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়, তাহলে তার জানা উচিত যে তার ইচ্ছা বা মানুষ কেউই তাকে আল্লাহ তাআলার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল, সে যদি এই সুরক্ষা তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়, তবুও তিনি তাকে সবকিছু থেকে রক্ষা করবেন।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস দ্বারা নির্ধারিত পথ অনুসরণ করা এবং এমন পথ গ্রহণ না করা যা এই পথ থেকে বিচ্যুত হয়। যে ব্যক্তি এই পথ গ্রহণ করার চেষ্টা করবে তার আর কোনও কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটি তাদের ঈমানে অবিচল রাখার জন্য যথেষ্ট। ৪র্থ সূরা আন নিসা, আয়াত ৫৯:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী..."

মহানবী (সাঃ) এবং মহানবী (সাঃ) এর আন্তরিক আনুগত্যের উপর নিহিত।

যেহেতু মানুষ নিখুঁত নয়, তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। তাই ঈমানের ক্ষেত্রে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে, বরং এর অর্থ হল তাদের অবশ্যই পূর্বে বর্ণিত মহান আল্লাহর আনুগত্য কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে এবং পাপ করলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 সূরা ফুসসিলাতের 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"...তাই তোমরা তাঁর দিকে সোজা পথ অবলম্বন করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো..."

জামে আত তিরমিযী, ১৯৮৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থিত, যেখানে মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে সংঘটিত (ছোট) পাপ মোচন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই ২, হাদিস নম্বর ৩৭-এ প্রাপ্ত আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) মুসলমানদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা এটি নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবে না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল তাদের নিয়ত এবং শারীরিক কর্মের

মাধ্যমে প্রদত্ত সম্ভাবনাকে আল্লাহ, মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে পূরণ করা। তাদের পরিপূর্ণতা অর্জনের আদেশ দেওয়া হয়নি কারণ এটি সম্ভব নয়।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ তার আধ্যাত্মিক হৃদয়কে প্রথমে পবিত্র না করে শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৮৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কেবল তখনই বিশুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় পবিত্র থাকে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসের শিক্ষা অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই হৃদয়ের বিশুদ্ধতা অর্জন করা সম্ভব।

অবিচল আনুগত্যের জন্য জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করে। জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ না করে মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, ২৪০৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, যদি মহান আল্লাহর আনুগত্যে কোন ত্রুটি দেখা দেয়, তাহলে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তওবা করা উচিত এবং মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। সূরা আল আহকাফ, আয়াত ১৩:

"নিশ্চয়ই যারা বলেছে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ," অতঃপর সৎপথে অবিচল রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

ব্রিল্যান্ট টি অ্যাক্টিশিয়ান

মুতার যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে, মহানবী (সা.) এই বাহিনীর একজন সেনাপতি এবং আরও দুজন উত্তরসূরী, একের পর এক, নিযুক্ত করেন। লোকেরা এ থেকে বুঝতে পারে যে এই নির্দিষ্ট সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, শহীদ হবেন। প্রথম সেনাপতি, যায়েদ বিন হারিসা শহীদ হন, তার পরে জাফর ইবনে আবু তালিব এবং তারপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। এরপর সেনাবাহিনী খালিদ বিন ওয়ালিদ, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, কে সেনাপতি নিযুক্ত করে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া তার সৈন্যদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে, যা তিনি মেনে নিতে পারেননি। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে কৌশলগতভাবে পশ্চাদপসরণই সর্বোত্তম হবে কারণ রোমানদের হৃদয়ে ভয় এবং বিস্ময় সঞ্চার করার তাদের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছিল যখন তাদের ছোট সেনাবাহিনী তার 66 গুণ বড় একটি সেনাবাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। তিনি প্রথমে তার সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলিকে পুনর্বিন্যাস করেছিলেন যাতে ধারণা করা যায় যে শক্তিবৃদ্ধি এসেছে। এর ফলে যুদ্ধ আবার শুরু হওয়ার সাথে সাথে রোমান সৈন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হয়, কারণ মুসলমানরা শক্তিবৃদ্ধি পাবে এই চিন্তায় তারা হতাশ হয়ে পড়েছিল। এর ফলে মুসলিম সেনাবাহিনী কৌশলগতভাবে পিছু হটতে যথেষ্ট সময় পায়, যেখানে ন্যূনতম হতাহতের ঘটনা ঘটে, প্রায় ১০টি ক্ষয়ক্ষতি হয়। যেহেতু রোমান সেনাবাহিনীই প্রথম পশ্চাদপসরণ করে, তাই মুসলিমদের বিজয় লাভ হয়, যেমনটি নবী মুহাম্মদ (সা.) সহীহ বুখারীতে ১২৪৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "দ্য নোবেল লাইফ অফ দ্য প্রফেট (সা.উ.), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৫৬-১৬৫৮"-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই যুদ্ধ আরবের সকল পরাশক্তি এবং অমুসলিম গোত্রের কাছে স্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল যে ইসলাম এখানেই টিকে থাকবে। এই যুদ্ধ অনেক আরব গোত্রকে ইসলাম গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছিল এবং ইসলামের অনেক শত্রুকে

মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করেছিল কারণ তাদের হৃদয়ে বিস্ময় ও ভয়ের এক নতুন স্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সাধারণভাবে বলতে গেলে, যদি মুসলমানরা সাহাবীদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) মতো শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায় , তাহলে তাদের অবশ্যই তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণাকে আল্লাহর ব্যবহারিক আনুগত্যের সাথে সমর্থন করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। এই আনুগত্যের মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত সঠিক আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। সূরা ৩ আলী ইমরান, আয়াত ১৩৯:

"সুতরাং তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, যদি তোমরা [সত্যিকারের] মুমিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।"

যদি মুসলমানরা শ্রেষ্ঠ না হয়, তাহলে এটা প্রমাণ করে যে তারা প্রকৃত বিশ্বাসের শর্ত পূরণ করছে না।

অন্যদের সান্ত্বনা দেওয়া

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে মুতার যুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা অবহিত করেছিলেন, এমনকি সৈন্যরা মদিনায় ফিরে আসার আগেই। তিনি যখন জাফর বিন আবু তালিব (রাঃ)-এর পরিবারকে দেখতে যান এবং তাঁর শাহাদাতের খবর দেন, তখন তাঁর পরিবার শোকাহত হয়ে পড়ে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সান্ত্বনা প্রদানের পর, জাফর বিন আবু তালিবের স্ত্রী তাঁর এতিম সন্তানদের এবং তাদের প্রতি সহায়তার অভাব সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উত্তরে বলেন যে, তিনি যখন এই দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের রক্ষাকর্তা ছিলেন, তখন তিনি কীভাবে তার পরিবারের জন্য চিন্তা করতে পারেন। তাদের ঘর ছেড়ে যাওয়ার পর, তিনি লোকদের জাফর বিন আবু তালিবের পরিবারের প্রতি যত্নবান হতে এবং তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে তাদের খাবার সরবরাহ করতে বলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৩৯-৩৪১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, লক্ষণীয় বিষয় হল, মৃত ব্যক্তির পরিবারের শোকের সময় তাদের যত্ন নেওয়া উচিত অন্যান্য ব্যক্তিদের, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজনদের। এটা দুঃখজনক যে, অনেক মুসলিম এই ইসলামী ঐতিহ্যের বিরোধিতা করে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে তাদের কঠিন সময়ে তাদের দর্শনার্থীদের খাবার এবং আতিথেয়তা প্রদান করতে বাধ্য করে।

উপরন্তু, আলোচিত মূল ঘটনাটি অন্যদের সান্ত্বনা দেওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৬০১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ

(সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি শোকাহত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেয়, তাকে বিচারের দিন সম্মানের পোশাক পরানো হবে।

যেহেতু সকলের জন্যই অসুবিধার মুখোমুখি হওয়া নিশ্চিত, তাই এটি একটি মহান সওয়াব অর্জনের একটি অত্যন্ত সহজ উপায় যার জন্য খুব বেশি সময়, শক্তি বা অর্থের প্রয়োজন হয় না। এর মধ্যে রয়েছে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী, যেমন মানসিক, আর্থিক এবং শারীরিক সহায়তা, সমস্যার সম্মুখীন পরিবারকে সাহায্য করার চেষ্টা করা। একজন মুসলিমের উচিত কঠিন সময়ে ধৈর্য ধারণ করতে এবং পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদিস স্মরণ করিয়ে দেওয়া, যেখানে ধৈর্য ধরার গুরুত্ব এবং মহান প্রতিদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের ইতিবাচক কথা বলা উচিত, তাদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে জিনিসগুলি কেবল একটি ভাল কারণেই ঘটে, এমনকি যদি লোকেরা এর পিছনের প্রজ্ঞা বুঝতে ব্যর্থ হয়। বাস্তবে, এই সৎকর্মটি করার জন্য একজন ব্যক্তির পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অসুবিধার সম্মুখীন ব্যক্তিকে আরও ভালো বোধ করার জন্য কয়েকটি সদয় কথা যথেষ্ট। এবং কিছু ক্ষেত্রে কেবল শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকাই তাদের সমর্থনের অনুভূতি প্রদানের জন্য যথেষ্ট, এমনকি যদি কোনও শব্দ নাও বলা হয়।

এই মনোভাব সহজেই গৃহীত হয় যখন কেউ অন্যদের সাথে সেই আচরণ করে যা সে মানুষের কাছ থেকে চায়।

পরিশেষে, মুসলিমদের জন্য এই নেক আমল করার সময় তাদের নিয়ত সংশোধন করা গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ, এটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা উচিত, এবং অন্যদের, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে লোক দেখানোর জন্য করা উচিত নয়, অথবা

যদি তারা এটি করতে ব্যর্থ হয় তবে অন্যদের দ্বারা সমালোচিত হওয়ার ভয়ে এটি করা উচিত নয়। যারা অন্যদের জন্য কাজ করে, তাদের বিচারের দিন বলা হবে যে তারা তাদের সেই কাজের প্রতিদান পাবে যা তারা করতে পারে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

অন্যদের জন্য শোক

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে মুতার যুদ্ধের ঘটনাবলী আল্লাহ তাআলা মদিনায় ফিরে আসার আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। মদিনার কিছু লোক যখন শহীদদের কথা জানতে পেরেছিল, তখন তারা শোকে বিলাপ করতে শুরু করেছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে যখন এই কথা জানানো হয়েছিল, তখন তিনি লোকদেরকে তা করতে নিষেধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবনী", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদের ৩১২৭ নম্বর হাদিসে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানুষকে বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, প্রিয়জন হারানোর মতো কঠিন সময়ে কাঁদতে নিষেধ। এটি ভুল কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অনেক সময় কারো মৃত্যুতে কেঁদেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর পুত্র ইব্রাহিম (রাঃ) যখন মারা গিয়েছিলেন, তখন তিনি কেঁদেছিলেন। সুনানে আবু দাউদের ৩১২৬ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, কারো মৃত্যুতে কান্না করা হলো রহমতের একটি নিদর্শন যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে স্থাপন করেছেন। এবং যারা অন্যদের প্রতি করুণা করে, কেবল তাদেরই আল্লাহ দয়া করবেন। সহীহ বুখারীতে ১২৮৪ নম্বরে পাওয়া

একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাতির মৃত্যুতে কেঁদেছিলেন।

সহীহ মুসলিমের ২১৩৭ নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে যে, কারো মৃত্যুতে কান্নাকাটি করার জন্য অথবা তার অন্তরে শোকের জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না। তবে যদি সে এমন কথা বলে যা আল্লাহর পছন্দের প্রতি তার অধৈর্যতা প্রকাশ করে, তাহলে তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হতে পারে।

এটা স্পষ্ট যে, কারো অন্তরে শোক প্রকাশ করা বা চোখের জল ফেলা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। যেসব জিনিস নিষিদ্ধ তা হলো বিলাপ করা, কথা বা কাজের মাধ্যমে অধৈর্যতা প্রকাশ করা, যেমন শোকে কাপড় ছিঁড়ে ফেলা বা মাথা ন্যাড়া করা। যারা এই ধরণের কাজ করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কীকরণ রয়েছে। অতএব, যেকোনো মূল্যে এই ধরণের কাজ এড়িয়ে চলা উচিত। এই ধরণের কাজ করার জন্য একজন ব্যক্তিকে কেবল শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে না, বরং যদি মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর সময় অন্যদের এই ধরণের কাজ করতে ইচ্ছা করে এবং আদেশ দেয়, তাহলে তাকেও জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তি এটি না চায়, তাহলে তারা কোনও জবাবদিহি থেকে মুক্ত। জামে আত তিরমিযী, ১০০৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা বোঝা সাধারণ জ্ঞানের বিষয় যে, মহান আল্লাহ, অন্যের কাজের জন্য কাউকে শাস্তি দেবেন না, যখন পূর্ববর্তী ব্যক্তি তাকে সেইভাবে কাজ করার পরামর্শ দেননি। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ১৮:

"আর কোন বোঝা বহনকারী অন্য কারো বোঝা বহন করবে না..."

নেতাদের সম্মান করা

মুতার যুদ্ধের সময়, একজন মুসলিম সৈনিক একজন রোমান সৈনিককে হত্যা করে তার মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে যায়। একজন শত্রু সৈনিককে হত্যা করার পর, মুসলিম সৈনিকের জন্য শত্রু সৈনিকের বহনকারী জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া বৈধ ছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, মুসলিম সৈনিকের কাছ থেকে এই মূল্যবান জিনিসপত্রের কিছু নিয়ে নেন এবং যুদ্ধের গনীমতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন, যা ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিতরণ করা হয় এবং যুদ্ধে উপস্থিত সকল সৈন্যের মধ্যে একটি অংশ অন্তর্ভুক্ত করে। আরেকজন মুসলিম সৈনিক আউফ বিন মালিক, যিনি খালিদ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাকে সতর্ক করেন যে সমস্ত মূল্যবান গনীমতের মাল রোমান সৈনিককে ফিরিয়ে দিতে, কিন্তু খলীফা তা করতে অস্বীকৃতি জানান। যখন তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে আসেন, তখন আউফ, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাকে ঘটনাটি বর্ণনা করেন এবং তিনি খালিদ, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাকে মুসলিম সৈনিককে সমস্ত মূল্যবান গনীমতের মাল ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন। আউফ তখন প্রকাশ্যে খালিদের সমালোচনা করেন এবং তাকে অবজ্ঞা করেন। এতে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ক্রুদ্ধ হন, এবং তিনি খালিদ (রাঃ) কে মুসলিম সৈনিকের কাছ থেকে লুণ্ঠিত মূল্যবান সম্পদ ফেরত না দেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি মুসলিমদের সতর্ক করে দেন যে তারা যেন তার নিযুক্ত নেতাদের অবজ্ঞা ও অবমাননা না করে কারণ এটি কেবল অন্যদের তাদের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে উৎসাহিত করে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "দ্য নোবেল লাইফ অফ দ্য প্রফেট (সাঃ), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৬৩-১৬৬৫" বইয়ে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি নেতাদের সম্মান করার এবং তাদের বিরুদ্ধে নরম ও সদাচারীভাবে গঠনমূলক সমালোচনা করার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ মুসলিমের ১৯৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, ইসলাম হলো সমাজের নেতাদের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সদয়ভাবে তাদের সর্বোত্তম পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো যেকোনো প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়া। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, ৫৬ নম্বর বই এবং ২০ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। ৪র্থ অধ্যায় আন-নিসা, ৫৯ নম্বর আয়াত:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী..."

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত একটি কর্তব্য যতক্ষণ না কেউ মহান আল্লাহর অবাধ্যতা না করে। সৃষ্টির প্রতি আনুগত্য যদি স্রষ্টার অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে তবে তা নেই। এই ধরণের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এড়ানো উচিত কারণ এটি কেবল নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে নেতাদেরকে মৃদুভাবে ভালোর উপদেশ দেওয়া এবং মন্দের নিষেধ করা উচিত। অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা যদি সঠিক পথে থাকেন তবে সাধারণ মানুষও সঠিক থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভণ্ডামির লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলা উচিত। আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে সমাজকে কল্যাণের উপর ঐক্যবদ্ধ করে এমন বিষয়ে

তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী যেকোনো কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করা। ইসলামে নেতাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য নেই, কেবল এমন বিষয়ে তাদের আনুগত্য করা যা মহান আল্লাহকে খুশি করে।

রোমান সম্রাট

মিথ্যা বলতে লজ্জা লাগে

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের পর অষ্টম বছরে, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস একটি স্বপ্ন দেখেন যা ইঙ্গিত দেয় যে তার রাজ্য অবশেষে একটি বিদেশী জাতির দ্বারা পরাজিত হবে। তিনি যখন তদন্ত করেন, তখন তিনি সন্দেহ করেন যে এটি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ইঙ্গিত দেয়। সেই সময় তিনি জেরুজালেমে ছিলেন এবং তার লোকদের নির্দেশ দেন যে তাকে এমন একজন ব্যক্তিকে নিয়ে আসুন যিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর আত্মীয়, যাকে তিনি প্রশ্ন করতে পারেন। সেই সময়, মক্কার অমুসলিমদের একজন নেতা আবু সুফিয়ান একটি বাণিজ্য অভিযানে ছিলেন। তাকে এবং তার লোকদের খুঁজে বের করে হেরাক্লিয়াসের কাছে আনা হয়। হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে তার সামনে বসতে বলেন এবং আবু সুফিয়ানের সঙ্গীদেরকে তার পিছনে বসান এবং তাদের নির্দেশ দেন যে যদি আবু সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞাসা করা কোনও প্রশ্নের জবাবে মিথ্যা বলে, তাহলে তারা যেন তাদের প্রতিবাদ করে। আবু সুফিয়ান, যিনি পরে মুসলিম হয়েছিলেন, বর্ণনা করেন যে, তিনি মিথ্যা বললেও তার লোকেরা তাকে কখনোই অস্বীকার করত না, কিন্তু তিনি সত্য কথা বলতেন কারণ তিনি একজন মর্যাদাবান ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তাই তিনি মিথ্যা বলতে খুব লজ্জা পেতেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৫৪-৩৫৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সেই সময় আবু সুফিয়ান মুসলিম ছিলেন না, তবুও মিথ্যা বলা অপছন্দ করতেন। ছোট মিথ্যা, যাকে প্রায়শই সাদা মিথ্যা বলা হয়, অথবা রসিকতা হিসেবে মিথ্যা বলা হয়, তা সে মিথ্যা বলা অগ্রহণযোগ্য। এই সকল ধরণের

মিথ্যা নিষিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, তাই তাদের লক্ষ্য কাউকে ধোঁকা দেওয়া নয়, তাকে জামে আত তিরমিযী, ২৩১৫ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে তিনবার অভিশপ্ত করা হয়েছে।

আরেকটি জনপ্রিয় মিথ্যা কথা যা মানুষ প্রায়শই বলে যে এটি পাপ নয়, তা হল শিশুদের সাথে মিথ্যা বলা। সুনানে আবু দাউদের ৪৯৯১ নম্বরের হাদিস অনুসারে এটি নিঃসন্দেহে একটি পাপ। শিশুদের সাথে মিথ্যা বলা স্পষ্ট বোকামি কারণ তারা কেবল সেই বড়দের কাছ থেকে এই পাপপূর্ণ অভ্যাসটি গ্রহণ করবে যারা তাদের সাথে মিথ্যা বলে। এইভাবে আচরণ করা শিশুদের দেখায় যে মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য, যখন ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তা গ্রহণযোগ্য নয়। খুব বিরল এবং চরম ক্ষেত্রেই মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য, উদাহরণস্বরূপ, একজন নির্দোষ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করার জন্য মিথ্যা বলা।

জামে আত তিরমিযী, ১৯৭১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটি গীবত এবং মানুষের সাথে উপহাসের মতো অন্যান্য পাপের দিকে পরিচালিত করে। এই আচরণ মানুষকে জাহান্নামের দরজায় নিয়ে যায়। যখন একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে থাকে, তখন তাকে আল্লাহ তাআলা একজন মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন। যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা একজন মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছেন, বিচারের দিন তার কী হবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না।

সকল মুসলিমই ফেরেশতাদের সান্নিধ্য কামনা করে, কিন্তু যখন কেউ মিথ্যা বলে, তখন তাকে তাদের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়। বস্তুত, মিথ্যাবাদীর মুখ থেকে যে

দুর্গন্ধ বের হয়, তার কারণে ফেরেশতারা তাদের থেকে এক মাইল দূরে সরে যায়। জামে আত তিরমিযী, ১৯৭২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি প্রমাণিত হয়েছে।

মিথ্যা বলা যা সমাজের অন্যদের কাছে ছড়িয়ে পড়ে তা এতটাই গুরুতর পাপ যে সহীহ বুখারীতে ৭০৪৭ নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে, যদি কেউ এটি করে এবং তওবা না করে তবে তাকে মৃত্যুর পর এমন শাস্তি দেওয়া হবে যে তার মুখে লোহার হুক পরিয়ে দেওয়া হবে এবং তার মুখের চামড়া ছিঁড়ে ফেলা হবে। তার মুখ তাৎক্ষণিকভাবে পুনরুজ্জীবিত হবে এবং তারপর এই প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি হবে। কিয়ামত পর্যন্ত এটি ক্রমাগত ঘটবে।

পরিশেষে, সকল মুসলমানের উচিত সকল প্রকার মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা, তারা কার সাথেই কথা বলছে না কেন।

নবুওয়তের প্রমাণ

আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর, হেরাক্লিয়াস মন্তব্য করেন, “তুমি (অর্থাৎ আবু সুফিয়ান) বলো যে সে (অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ, সা.) তোমার সবচেয়ে পবিত্র বংশধর। আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, পবিত্র নবীদের, তাদের উপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, এভাবেই নির্বাচন করেন; তিনি কেবল তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র বংশধরদের কাছ থেকে মানুষকেই বেছে নেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে তার (অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ, সা.) পরিবারের অন্য কেউ কি একই রকম কথা বলছিলেন, অর্থাৎ তিনি কি তাদের অনুকরণ করছিলেন, তুমি (অর্থাৎ আবু সুফিয়ান) বললে না। আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে তার কি এমন কিছু সম্পত্তি ছিল যা তুমি হস্তগত করে থাকতে পারো এবং পরামর্শ দিয়েছিলে যে সে হয়তো তোমাকে তা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নবুয়তের দাবি করছে। কিন্তু তুমি বলেছিলে না। আমি তোমাকে তার অনুসারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি এবং তুমি বলে থাকো যে তারা তরুণ, শক্তিহীন এবং দরিদ্র। নবীদের, সা.-এর অনুসারীরা প্রত্যেক যুগেই এমনই। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি যারা তাকে অনুসরণ করে তারা কি তাকে পছন্দ করে এবং সম্মান করে, নাকি তাকে ঘৃণা করে এবং পরিত্যাগ করে। তুমি উত্তর দিয়েছিলে যে খুব কমই কেউ তাকে অনুসরণ করে এবং তাকে পরিত্যাগ করে। এই পরিস্থিতিতে ঈমানের মিষ্টতা মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে না এবং আবার চলে যায় না। আমি (অর্থাৎ হিরাক্লিয়াস) তোমাদের দুজনের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তুমি (অর্থাৎ আবু সুফিয়ান) উত্তর দিয়েছিলে যে কখনও কখনও এটি তোমাদের পক্ষে হয়, কখনও কখনও তাঁর (অর্থাৎ মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। পবিত্র নবীদের জন্য যুদ্ধ এমনই, তবুও তারা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে সে কি তার কথা ভঙ্গ করে এবং তুমি বলেছিলে যে সে তা করেনি। যদি তুমি যা বলেছ তা সত্য হয় তবে সে আমার এই পায়ের নীচের জমি জয় করবে।” ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৫৬-৩৫৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সাঃ) এর হাদীসে আলোচিত স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণ অধ্যয়ন করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা ইসলামের সত্যতা নির্দেশ করে। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জন করবে। দৃঢ় ঈমান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে, স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা কঠিন, সর্বত্রই আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়বে। এই ব্যক্তি যখনই তাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয় তখনই সহজেই আল্লাহকে অমান্য করবে কারণ তারা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে কীভাবে তাদের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে এবং পরিবর্তে আল্লাহকে আনুগত্য করলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। অতএব, ইসলামী জ্ঞান শেখার এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জন করতে হবে যাতে তারা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং তাদের জীবনের মধ্যে প্রত্যেককে এবং সবকিছুকে সঠিকভাবে স্থাপন করার মাধ্যমে।

সত্যের সাথে আপোষ করা

মক্কার অমুসলিমদের একজন নেতা আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর, হিরাক্লিয়াস মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর দাবির সত্যতা সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হয়ে যান। অবশেষে, হিরাক্লিয়াস মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছ থেকে একটি চিঠি পান, যেখানে তাকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। হিরাক্লিয়াস একজন খ্রিস্টান পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেন যিনি হিব্রু পড়তে পারতেন। পণ্ডিত হিরাক্লিয়াসকে বলেন যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) প্রকৃতপক্ষেই শেষ নবী, যার জন্য তারা অপেক্ষা করছিল। হিরাক্লিয়াস ইসলামের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং তারপর তাদের ভয়ে তার জাতির নেতাদের তার রাজধানী কক্ষে ডেকে পাঠান, যেখানে তিনি নিজেই একটি উঁচু কক্ষে বসে ছিলেন। তিনি তাদের বলেন যে তাদের সকলের উচিত মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসরণ করা, কারণ তিনিই শেষ নবী, যার কথা তাদের ঐশী গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। তিনি তাদেরকে তাকে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন যাতে তারা সকলেই এই দুনিয়া এবং পরকালে সফল হয়। কিন্তু সকল নেতা তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে কক্ষ ত্যাগ করতে শুরু করেন। তিনি তাদের আবার ডেকে পাঠান এবং তারপর ঘোষণা করেন যে তিনি কেবল তাদের বিশ্বাস এবং তার প্রতি তাদের আনুগত্য পরীক্ষা করছেন। এরপর তারা খুশিতে তার প্রতি সিজদায় পড়ে যান এবং চলে যান। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৫৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

হিরাক্লিয়াস অবিশ্বাসের উপরই অটল ছিলেন কারণ তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে যদি তিনি একা ইসলাম গ্রহণ করেন তবে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে তার মর্যাদা হারাতে হবে। তিনি আশা করেছিলেন যে যদি তার লোকেরা তার সাথে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তিনি তাদের নেতা হিসেবেই থাকতেন। এটি একটি যৌক্তিক পরিকল্পনা ছিল, কারণ মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) যখন কোন সমাজের নেতাকে ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি তাকে তাদের পদ থেকে বরখাস্ত করেননি যদি না কোন বৈধ কারণ থাকে। তাই

সম্পদ এবং নেতৃত্বের মতো পার্থিব জিনিসের প্রতি তার আকাঙ্ক্ষা তাকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করেছিল। অতএব, নেতৃত্বের মতো পার্থিব জিনিসের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি তাদের ঈমানের সাথে আপোষ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৩৭৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে নেতৃত্ব এবং সম্পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা একজন ব্যক্তির ঈমানের জন্য দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ভেড়ার পালের উপর ছেড়ে দেওয়া থেকেও বেশি ধ্বংসাত্মক। কারণ এই দুটি জিনিসের প্রতি অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা সহজেই কাউকে আল্লাহ, মহান আল্লাহর অবাধ্য হতে বাধ্য করতে পারে, যখন সেগুলি অর্জন করে, সেগুলি ধরে রাখে এবং বৃদ্ধি করে। নিজের চাহিদা এবং দায়িত্ব অনুযায়ী বৈধ জিনিসগুলি অনুসরণ করা সর্বদা অনেক বেশি নিরাপদ। এইভাবে আচরণ করা একজন ব্যক্তিকে উভয় জগতের চাপ এবং সম্ভাব্য শাস্তি থেকে রক্ষা করে।

শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত

এরপর, হিরাক্লিয়াস মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছ থেকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি চিঠি পান। তিনি দিহিয়া বিন খলিফা (রাঃ)-কে, যিনি মুসলিম রাষ্ট্রদূত ছিলেন যিনি মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চিঠি পৌঁছে দিয়েছিলেন, বলেন যে তিনি ইসলামে বিশ্বাসী কিন্তু তাঁর জীবনের জন্য তিনি ভীত। হিরাক্লিয়াস দিহিয়া (রাঃ)-কে একজন বিশিষ্ট বিশপ সাঘাতিরের সাথে দেখা করতে বলেন, যাকে লোকেরা অত্যন্ত সম্মান করত। সাঘাতিরকে চিঠিটি জানানো হলে, তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যতা নিশ্চিত করেন, কারণ তাদের পণ্ডিতদের কাছে তাদের ঐশী গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত নিদর্শন ছিল। এরপর সাঘাতির একটি গির্জায় যান যেখানে তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং সেখানকার লোকদের তাঁর অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানান কিন্তু তারা তাঁকে আক্রমণ করে হত্যা করে। ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৬২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাঘাতির তার বিশ্বাস গ্রহণ করেছিলেন, ঘোষণা করেছিলেন এবং তার উপর কাজ করেছিলেন, যদিও তিনি জানতেন যে এটি তার জন্য সমস্যা তৈরি করবে।

সহীহ মুসলিমের ৭৪০০ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ব্যাপক অস্থিরতা ও বিদ্রোহের সময়ও মহান আল্লাহর ইবাদত করে চলে, সে যেন সেই ব্যক্তির মতো যে তাঁর জীবদ্দশায় মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে হিজরত করেছে।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর দিকে হিজরত করার সওয়াব ছিল একটি মহান কাজ। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিমের ৩২১ নম্বর হাদিস অনুসারে, এটি পূর্ববর্তী সমস্ত পাপ মুছে ফেলত।

মহান আল্লাহর ইবাদতের অর্থ হলো মহান আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য অব্যাহত রাখা। এর ফলে একজন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করতে থাকে।

স্পষ্টতই, এই হাদিসে উল্লেখিত সময় এসে গেছে। মুসলিম জাতির জন্য পার্থিব কামনা-বাসনার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায় ইসলামের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হওয়া খুবই সহজ হয়ে পড়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির অগ্রগতির কারণে মুসলমানদের পক্ষে বিশ্বাস করা সহজ হয়ে পড়েছে যে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহারের মাধ্যমে মানসিক শান্তি নিহিত। সংখ্যাগরিষ্ঠদের অনুসরণ করার মানসিকতা গ্রহণ করা সহজ হয়ে গেছে, যারা বিশ্বাসকে খালি অভ্যাসে পরিণত করেছে যার ফলে তারা কীভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে তার উপর কোনও প্রভাব পড়ে না। মুসলিম জাতির মধ্যে মহান আল্লাহর প্রতি আকাঙ্ক্ষার ধারণা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যার ফলে তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে, তবুও উভয় জগতে শান্তি এবং মুক্তির আশা করে। যে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি যাকে বিচ্যুত আচরণ বলে মনে করত তা এমন কিছুতে পরিণত হয়েছে যা মানুষকে গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। এই সমস্ত বিচ্যুতি থেকে দূরে সরে যাওয়া কঠিন হবে এবং এমনকি একজনের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবও সংখ্যাগরিষ্ঠদের অনুসরণ না করে ইসলামের শিক্ষাকে ধরে রাখার জন্য তাদের সমালোচনা করবে। কিন্তু যদি কেউ অধ্যবসায় ধরে রাখে, তাহলে মহান আল্লাহ, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা হারানোর মতো যেকোনো

ক্ষতি পূরণ করবেন, যা তার চেয়েও উন্নততর কিছু, অর্থাৎ মানসিক ও শারীরিক শান্তি দিয়ে। ১৬তম অধ্যায় আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎ কর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

আর পরকালে আল্লাহ তাদের জন্য যা রেখেছেন তা অনেক বেশি। অন্যদিকে, যারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যার ফলে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তারা তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পর্ক এবং আশীর্বাদ এই পৃথিবীতে তাদের জন্য চাপ এবং অভিশাপের উৎস হয়ে ওঠে। এবং পরকালে তারা যা পাবে তা আরও খারাপ হবে। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

অতএব, মুসলিমদের উচিত পার্থিব কামনা-বাসনা দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে, যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এবং বিতর্কিত বিষয় এবং মানুষ এড়িয়ে চলা এবং পরিবর্তে,

যদি তারা এই হাদিসে উল্লিখিত সওয়াব পেতে চায়, তাহলে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা উচিত।

ধু আল সালালসিলের অভিযান

নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় হিজরতের পর অষ্টম বছরে, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুল সালালসিলে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি আমর বিন আস (রাঃ)-কে ডেকে বলেন যে তিনি তাকে এই অভিযানের দায়িত্বে নিযুক্ত করছেন এবং মহান আল্লাহ তাকে বিজয় এবং প্রচুর সম্পদ দান করবেন। আমর (রাঃ)-এর উত্তরে বলেন যে তিনি সম্পদ অর্জনের জন্য ইসলাম গ্রহণ করেননি, বরং এটি সত্য এবং নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে থাকার আকাঙ্ক্ষা থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বলেন যে, একজন ধার্মিক ব্যক্তির হাতে উত্তম ও বৈধ সম্পদ একটি ভালো জিনিস। ইমাম বুখারীর "আদাব আল মুফরাদ", ২৯৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের পার্থিব সংজ্ঞা অনুসারে কোনও পরিস্থিতিকে ভালো বা খারাপ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, পার্থিব সংজ্ঞা অনুসারে ধনী হওয়া ভালো এবং দরিদ্র হওয়া খারাপ। পরিবর্তে, মুসলমানদের ইসলামের শিক্ষা অনুসারে ঘটনা এবং জিনিসের সাথে ভালো এবং খারাপকে দায়ী করা উচিত। অর্থ, যা কিছু মানুষকে আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্যের কাছাকাছি নিয়ে যায়, তা পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে খারাপ দেখা গেলেও ভালো। এবং যা কিছু মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তা খারাপ, যদিও তা ভালো বলে মনে হয়।

ইসলামের শিক্ষা জুড়ে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যা এটি প্রমাণ করে। উদাহরণস্বরূপ, কারুন ছিলেন একজন অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি যিনি মহানবী মূসা আলাইহিস সালামের সময়ে বাস করতেন। তখন এবং বর্তমানে অনেকেই তার সম্পদকে ভালো জিনিস বলে মনে করতে পারে কিন্তু যেহেতু এটি তাকে অহংকারে ঠেলে দেয় তাই এটি তার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই তার ক্ষেত্রে ধনী হওয়া একটি খারাপ জিনিস ছিল। অধ্যায় ২৮ আল কাসাস, আয়াত ৭৯-৮১।

" অতঃপর সে তার জাতির সামনে তার সাজসজ্জায় বেরিয়ে এলো। যারা পার্থিব জীবন কামনা করেছিল তারা বললো, "হায়, আমাদেরও যদি কারুনের মতোই দেওয়া হতো! নিঃসন্দেহে সে একজন মহা ভাগ্যবান। কিন্তু যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বললো, "তোমাদের জন্য দুর্ভাগ্য! যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহর প্রতিদান উত্তম। আর ধৈর্যশীলদের ছাড়া আর কাউকে তা দেওয়া হয় না।" অতঃপর আমি তাকে এবং তার ঘরকে মাটিতে গ্রাস করে দিলাম। আল্লাহ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার জন্য তার কোন দল ছিল না, এবং সে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম ছিল না।"

অন্যদিকে, ইসলামের তৃতীয় সঠিক পথপ্রদর্শক খলিফা উসমান বিন আফফান (রা.)ও ধনী ছিলেন, তবুও তিনি তাঁর সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, একবার বিপুল পরিমাণ সম্পদ দান করার পর মহানবী (সা.) তাঁকে বলেছিলেন যে, সেদিনের পর আর কোনও কিছুই তাঁর ঈমানের ক্ষতি করতে পারবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩৭০১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং তাঁর ক্ষেত্রে সম্পদ ছিল একটি ভালো জিনিস।

পরিশেষে, একজন মুসলিমের মনে রাখা উচিত যে, তারা যে কোনও সমস্যার মুখোমুখি হয়, তার পিছনে রয়েছে প্রজ্ঞা, এমনকি যদি তারা তা পর্যবেক্ষণ নাও করে। তাই তাদের বিশ্বাস করা উচিত নয় যে, পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কিছু ভালো বা খারাপ। অর্থাৎ, যদি জিনিসটি তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে উৎসাহিত করে, তাহলে তা দেখতে খারাপ হলেও ভালো। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...*কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।*"

ঐক্য সন্ধান করুন

যখন আমর বিন আস (রাঃ) এবং তার সৈন্যরা যুল সালালসিলে পৌঁছালেন, তিনি শত্রুর সংখ্যা লক্ষ্য করলেন এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে একটি বার্তা পাঠালেন, যাতে তিনি আরও সৈন্য পাঠাতে অনুরোধ করলেন। তিনি আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রাঃ) এর নেতৃত্বে আরেকটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। দ্বিতীয় বাহিনী যুল সালালসিলে পৌঁছালে, উভয় বাহিনীর মধ্যে কে তাদের নেতৃত্ব দেবে তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং ঘোষণা করে যে প্রতিটি বাহিনীকে আলাদাভাবে নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। কিন্তু আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রাঃ) ছিলেন একজন সুন্দর স্বভাবের এবং সহজ-সরল প্রকৃতির মানুষ, তাই তিনি আমর বিন আস (রাঃ) কে উভয় বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে রাজি হন, কারণ তিনি লোকদের একত্রিত করতে এবং তর্ক এড়াতে চেয়েছিলেন। যখন এই খবর মহানবী (সাঃ) এর কাছে পৌঁছালো, তখন তিনি আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রাঃ) এর পক্ষ থেকে আল্লাহর রহমত কামনা করলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭০-৩৭২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি এমন একটি মানসিকতা গ্রহণের গুরুত্বকে নির্দেশ করে যেখানে একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্যে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্য রাখে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪১ নম্বর হাদিসে সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রথমে মুসলমানদের একে অপরকে হিংসা না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

যখন একজন ব্যক্তি অন্য কারোর অর্থপূর্ণ আশীর্বাদ পেতে চায়, তখন সে চায় মালিক যেন সেই আশীর্বাদ হারিয়ে ফেলুক। এবং এর সাথে এই বিষয়টিও জড়িত যে, মালিককে তার পরিবর্তে মহান আল্লাহ তাআলা আশীর্বাদ দিয়েছেন। কেউ কেউ কেবল এটি তাদের হৃদয়ে প্রকাশ করতে চান, তাদের কর্ম বা কথার মাধ্যমে তা প্রকাশ না করে। যদি তারা তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি অপছন্দ করে, তাহলে আশা করা যায় যে তাদের হিংসার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। কেউ কেউ তাদের কথা এবং কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে আশীর্বাদ কেড়ে নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, যা নিঃসন্দেহে একটি পাপ। সবচেয়ে খারাপ ধরণ হল যখন একজন ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, এমনকি ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি আশীর্বাদ না পেলেও।

হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তার অনুভূতির উপর নির্ভর করে না, তার অনুভূতি অপছন্দ করে এবং পরিবর্তে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে যাতে মালিক তার আশীর্বাদ হারাতে না পারে। যদিও এই ধরণের হিংসা পাপ নয় তবুও এটি অপছন্দনীয় যদি হিংসা পার্থিব আশীর্বাদের উপর হয় এবং কেবল ধর্মীয় আশীর্বাদের সাথে জড়িত থাকলে প্রশংসনীয় হয়। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিমের ১৮৯৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল যখন একজন ব্যক্তি এমন ব্যক্তির প্রতি হিংসা করে যে হালাল সম্পদ অর্জন করে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যয় করে। দ্বিতীয়টি হল যখন একজন ব্যক্তি এমন ব্যক্তির প্রতি হিংসা করে যে তার জ্ঞান এবং জ্ঞানকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করে এবং অন্যদের তা শিক্ষা দেয়।

পূর্বে উল্লেখিত খারাপ ধরণের হিংসা, সরাসরি আল্লাহর পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন আল্লাহ, তার পরিবর্তে অন্য কাউকে একটি

বিশেষ আশীর্বাদ প্রদান করে ভুল করেছেন। এই কারণেই এটি একটি মহাপাপ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক সতর্ক করা হয়েছে যে, সুনানে আবু দাউদের ৪৯০৩ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, হিংসা নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয় ঠিক যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

একজন ঈর্ষাপরায়ণ মুসলিমকে জামে আত তিরমিযী, ২৫১৫ নম্বরে বর্ণিত হাদিসের উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি পরামর্শ দেয় যে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অন্যদের জন্য তাই ভালোবাসে। তাই একজন ঈর্ষাপরায়ণ মুসলিমের উচিত, ঈর্ষা করা ব্যক্তির প্রতি ভালো চরিত্র এবং দয়া প্রদর্শন করে তার হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তার ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তার জন্য প্রার্থনা করা যতক্ষণ না তার ঈর্ষা তার জন্য ভালোবাসায় পরিণত হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, তাদের ঈর্ষা করা ব্যক্তির অধিকার পূরণ করা চালিয়ে যাওয়া উচিত। তাদের ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করা উচিত যাতে তারা বুঝতে পারে যে, মহান আল্লাহ প্রতিটি ব্যক্তিকে সর্বোত্তম জিনিস দান করেন এবং যদি তাদের কোন বিশেষ পার্থিব নিয়ামত না দেওয়া হয়, তাহলে এর অর্থ হল এটি না থাকাই তাদের জন্য ভালো। সূরা ২ আল বাকারাহ, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে আরেকটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলিমদের একে অপরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এর অর্থ হলো, আল্লাহ যদি কোন কিছু অপছন্দ

করেন, তবেই কেবল তা অপছন্দ করা উচিত। সুনানে আবু দাউদের ৪৬৮১ নম্বর হাদিসে ঈমান পূর্ণ করার একটি দিক হিসেবে এটি বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী জিনিস বা মানুষ অপছন্দ করা উচিত নয়। যদি কেউ অন্য কাউকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী অপছন্দ করে, তাহলে তাদের কথা বা কাজে কখনোই এর প্রভাব পড়তে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি পাপ। একজন মুসলিমের উচিত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, সম্মান ও সদয়তার সাথে অন্যের সাথে আচরণ করে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা। একজন মুসলিমের মনে রাখা উচিত যে, অন্যরা যেমন নিখুঁত নয়, তেমনই তারাও নিখুঁত নয়। এবং যদি অন্যদের মধ্যে খারাপ গুণাবলী থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে তাদেরও ভালো গুণাবলী থাকবে। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের তাদের খারাপ গুণাবলী ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত, কিন্তু তাদের ভালো গুণাবলীকে ভালোবাসতে হবে। একজন মুসলিমের অবশ্যই পাপ অপছন্দ করা উচিত, কিন্তু ব্যক্তিকে নয়, কারণ একজন ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহর কাছে তওবা করতে পারে। তাদের অবশ্যই ইসলামের সীমানার মধ্যে পাপের প্রতি তাদের অপছন্দ প্রদর্শন করতে হবে। তাদের উচিত মন্দ কাজের বিরুদ্ধে অন্যদেরকে নম্রভাবে উপদেশ দেওয়া, কারণ কঠোর আচরণ প্রায়শই মহান আল্লাহর দিকে ফিরে আসা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়।

এই বিষয়ে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। যে মুসলিম কোন নির্দিষ্ট আলেমকে অনুসরণ করে এবং একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের সমর্থক, তার উচিত একজন ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তার আলেম সর্বদা সঠিক, এবং সেই সাথে যারা তাদের আলেমের মতামতের বিরোধিতা করে তাদের ঘৃণা করা উচিত নয়। এই আচরণ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আলেমদের মধ্যে বৈধ মতপার্থক্য থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত একজন নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণকারী মুসলিমের উচিত এটিকে সম্মান করা এবং অন্যদের অপছন্দ করা নয় যারা তাদের অনুসরণকারী আলেমের বিশ্বাসের সাথে ভিন্ন।

আলোচ্য মূল হাদিসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, মুসলিমদের একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। এর অর্থ হলো, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের পার্থিব বিষয় নিয়ে অন্য মুসলিমদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় এবং তাদের সমর্থন করতে অস্বীকার করা উচিত নয়। সহিহ বুখারির ৬০৭৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, একজন মুসলিমের জন্য পার্থিব বিষয় নিয়ে অন্য মুসলিমের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা অবৈধ। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি পার্থিব বিষয় নিয়ে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকে সেই ব্যক্তির মতো বিবেচনা করা হয় যে অন্য মুসলিমকে হত্যা করেছে। সুনানে আবু দাউদের ৪৯১৫ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা কেবল ঈমানের ক্ষেত্রেই বৈধ। তবুও একজন মুসলিমের উচিত অন্য মুসলিমকে আন্তরিকভাবে তওবা করার পরামর্শ দেওয়া এবং কেবল তখনই তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা যদি তারা উন্নতির জন্য পরিবর্তন করতে অস্বীকৃতি জানায়। যখন তাদের অনুরোধ করা হয় তখন তাদের বৈধ বিষয়গুলিতে তাদের সমর্থন করা উচিত, কারণ এই দয়ার কাজ তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে তওবা করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আলোচ্য মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলিমদের একে অপরের ভাইয়ের মতো থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি কেবল তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন তারা এই হাদিসে দেওয়া পূর্ববর্তী উপদেশ মেনে চলে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্য মুসলিমদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করে, যেমন ভালো কাজে অন্যদের সাহায্য করা এবং মন্দ কাজ থেকে সতর্ক করা। ৫ম সূরা আল মায়িদা, আয়াত ২:

"...এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

সহীহ বুখারীতে ১২৪০ নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে যে, একজন মুসলিমের উচিত অন্য মুসলিমদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলো পূরণ করা: ইসলামিক সালামের জবাব দেওয়া, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তাদের জানাজায় অংশ নেওয়া এবং হাঁচি দেওয়া ব্যক্তিকে আল্লাহর প্রশংসা করার জবাব দেওয়া। একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যান্য মানুষের, বিশেষ করে অন্যান্য মুসলিমদের, তাদের উপর যে অধিকার রয়েছে তা শিখতে হবে এবং পূরণ করতে হবে, কারণ বিচারের দিন প্রতিটি ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তারা অন্য মানুষের অধিকার পূরণ করেছে কিনা। অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা মানুষের কাছ থেকে আচরণ পেতে চায়।

আলোচ্য মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুসলিমের অন্য মুসলিমের সাথে অন্যায় করা, তাকে ত্যাগ করা বা ঘৃণা করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি যে পাপ করে তা ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপীকে এমনভাবে ঘৃণা করা উচিত নয় যে তারা যেকোনো সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে।

সুনানে আবু দাউদের ৪৮৮৪ নম্বর হাদিসে মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্য মুসলিমকে অপমান করে, আল্লাহ তাকে অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে অপমান থেকে রক্ষা করবে, আল্লাহ তাকে হেফাজত করবেন।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে উল্লেখিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি যখন কেউ অহংকার গ্রহণ করে তখন বিকশিত হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিস অনুসারে, অহংকার হল যখন কেউ অন্যদের অবজ্ঞার চোখে দেখে। অহংকারী ব্যক্তি নিজেকে নিখুঁত মনে করে এবং অন্যদের অসম্পূর্ণ মনে করে। এটি তাকে অন্যদের অধিকার পূরণ করতে বাধা দেয় এবং অন্যদের অপছন্দ করতে উৎসাহিত করে। এবং অহংকার একজনকে সত্য উপস্থাপন করা হলে তা প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করে, কারণ এটি তাদের কাছ থেকে আসেনি এবং তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত আরেকটি বিষয় হলো, প্রকৃত তাকওয়া মানুষের শারীরিক চেহারা, যেমন ইসলামী পোশাক পরিধানের মধ্যে নয়, বরং এটি একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। এই অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বাহ্যিকভাবে আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এটি নিশ্চিত করে যে কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। এই কারণেই সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নম্বর হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, যখন আধ্যাত্মিক হৃদয় পবিত্র হয়, তখন পুরো শরীর পবিত্র হয়ে যায় কিন্তু যখন আধ্যাত্মিক হৃদয় কলুষিত হয়, তখন পুরো শরীর কলুষিত হয়ে যায়। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ বাহ্যিক চেহারা, যেমন সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের উদ্দেশ্য এবং কর্ম বিবেচনা করেন। সহীহ মুসলিমের ৬৫৪২ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, একজন মুসলিমকে ইসলামের শিক্ষা শেখার এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং সৃষ্টির সাথে তাদের যোগাযোগের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য মূল হাদিসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, একজন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমকে ঘৃণা করা পাপ। এই ঘৃণা পার্থিব জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের অপছন্দ না করা। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা এবং ঘৃণা করা, নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। সুনানে আবু দাউদের ৪৬৮১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তবুও, একজন মুসলিমকে অবশ্যই সকল ক্ষেত্রেই অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে এবং কেবল তাদের পাপকেই ঘৃণা করতে হবে, প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে। উপরন্তু, তাদের অপছন্দ কখনই তাদেরকে ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে না, কারণ এটি প্রমাণ করবে যে তাদের ঘৃণা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। পার্থিব কারণে অন্যদের ঘৃণা করার মূল কারণ হল অহংকার। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এক অণু পরিমাণ অহংকার একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহিহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মূল হাদিসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, একজন মুসলিমের জীবন, সম্পত্তি এবং সম্মান সবকিছুই পবিত্র। একজন মুসলিমের উচিত এই অধিকারগুলির কোনওটিই লঙ্ঘন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসায়ী, ৪৯৯৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুসলিম হতে পারে না যতক্ষণ না সে অমুসলিম সহ অন্যান্য মানুষকে তাদের ক্ষতিকর কথাবার্তা এবং কাজ থেকে রক্ষা করে। আর একজন প্রকৃত মুমিন হলেন সেই ব্যক্তি যিনি অন্যদের জীবন ও সম্পত্তি থেকে তাদের মন্দ কাজ দূরে রাখেন। যে ব্যক্তি এই অধিকার লঙ্ঘন করে তাকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তার শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেন। যদি তারা তা না করে, তাহলে বিচারের দিন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে অত্যাচারীর সৎকর্ম ভুক্তভোগীকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে ভুক্তভোগীর পাপ ভুক্তভোগীকে দেওয়া হবে। এর ফলে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে

পারে। সহিহ মুসলিমে, ৬৫৭৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই সতর্কীকরণ করা হয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের সাথে ঠিক সেই আচরণ করা যেমন সে চায় অন্যরা তার সাথে করুক। এটি একজন ব্যক্তির জন্য অনেক আশীর্বাদ বয়ে আনবে এবং তাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করবে।

সন্দেহের সুবিধা

মহানবী (সাঃ) আমর বিন আস (রাঃ)-এর নেতৃত্বে যুল সালালসিলে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। আবু বকর (রাঃ)-সহ অন্যান্য অনেক সিনিয়র সাহাবীকে সাধারণ সৈন্য হিসেবে অভিযানে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। ঠান্ডা রাতে, আমর (রাঃ)-এর সৈন্যদেরকে আগুন না জ্বালানোর নির্দেশ দেন কারণ তিনি চাননি শত্রুরা তাদের দেখতে পাক। এর ফলে শত্রুর অপ্রত্যাশিত আক্রমণ হতে পারত। কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাঁর আদেশের পিছনের জ্ঞান বুঝতে পারেননি এবং তাঁর উপর ক্রোধ প্রকাশ করেন, যেমন উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-ও। কিন্তু আবু বকর (রাঃ)-তাদের শান্ত করেন এবং তাদের মনে করিয়ে দেন যে, মহানবী (সাঃ)-তাদের নেতা হিসেবে আমর (রাঃ)-কে নিযুক্ত করেছিলেন, কারণ তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে জ্ঞানী ছিলেন। যখন সেনাবাহিনী ফিরে আসে, তখন মহানবী (সা.) আমরের কর্মকাণ্ডের প্রতি সন্তুষ্ট হন, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "আবু বকর আস সিদ্দীকের জীবনী", পৃষ্ঠা ১৩৬-১৩৭ এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর (সা.) নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৭১-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, লক্ষণীয় বিষয় হলো, অনেক সিনিয়র সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, এই অভিযানে সাধারণ সৈনিক হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন, যদিও তাদের নেতা আমর বিন আস, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন, সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, নিজের ইসলামী জ্ঞান এবং সামাজিক অবস্থানকে অহংকার গ্রহণের কারণ হতে না দেওয়ার গুরুত্ব। একজনকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, যাদের জ্ঞান তাদের মতো নাও হতে পারে তারা সমাজে বা কোনও সংগঠনের মধ্যে, যেমন একটি ইসলামী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, কিছু ভূমিকার জন্য আরও উপযুক্ত হতে পারে। এটা মেনে নেওয়া বিনয়ের অংশ যে, অন্য কেউ নির্দিষ্ট ভূমিকার জন্য আরও ভালভাবে প্রস্তুত হতে পারে, যদিও তাদের অন্যান্য মানুষের তুলনায় কম ইসলামী

জ্ঞান রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত সমাজের মধ্যে তাদের ভূমিকা পালনে মনোনিবেশ করা যাতে মানুষকে ভালোর দিকে ঐক্যবদ্ধ করা যায় এবং অন্যদের খারাপের বিরুদ্ধে সতর্ক করা যায়। অধ্যায় ৫ আল মায়িদা, আয়াত ২:

"...এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

এছাড়াও, আলোচিত মূল ঘটনাটি ইঙ্গিত করে যে যখনই সম্ভব অন্যদের সাথে দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলার গুরুত্ব। যখনই সম্ভব, তখনই যখন কেউ অন্যদের কথা এবং কাজকে ইতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করতে শেখে, তখনই এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা যায়। শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে যেখানে অন্যদের কাজকে ইতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, কেবল তখনই একজন ব্যক্তির কথা এবং কাজকে চ্যালেঞ্জ করা উচিত। কিন্তু তবুও, এটি করার সময় একজনকে অবশ্যই সম্মান এবং সদাচরণ প্রদর্শন করতে হবে, যাতে পরিস্থিতি থেকে সর্বোত্তম ফলাফল অর্জন করা যায়। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১২:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক [নেতিবাচক] অনুমান থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই কিছু অনুমান পাপ..."

মক্কা বিজয়

চুক্তি রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়া

মহানবী (সাঃ) মদিনায় হিজরতের অষ্টম বছরে, মক্কার অমুসলিমদের নেতারা হুদাইবিয়ায় সম্পাদিত শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে একটি গোত্রকে সমর্থন করে যারা অন্য একটি গোত্রকে আক্রমণ করেছিল যারা মহানবী (সাঃ) এর সাথে মিত্র ছিল। এই যুদ্ধবিরতি মাত্র ১৮ মাস স্থায়ী হয়েছিল। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ২৭৪৯ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মুনাফিকির একটি দিক।

একজন মুসলিমের সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি হলো মহান আল্লাহর সাথে, যা তখনই সম্মত হয়েছিল যখন কেউ তাকে তাদের প্রভু ও ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া।

মানুষের সাথে করা অন্যান্য সমস্ত প্রতিশ্রুতিও অবশ্যই পালন করতে হবে, যদি না কারো কাছে কোন বৈধ অজুহাত থাকে, বিশেষ করে যেগুলি একজন বাবা-মা

সন্তানদের সাথে করেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা কেবল বাচ্চাদের খারাপ চরিত্র শেখায় এবং তাদের বিশ্বাস করতে উৎসাহিত করে যে প্রতারণা করা একটি গ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সহীহ বুখারীতে ২২২৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর নামে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বৈধ অজুহাত ছাড়াই তা ভঙ্গ করে, তিনি তার বিরুদ্ধে থাকবেন। বিচারের দিন যার বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলা থাকবেন, সে কীভাবে সফল হতে পারে? যেখানেই সম্ভব অন্যদের সাথে প্রতিশ্রুতি না দেওয়াই সর্বদা নিরাপদ। কিন্তু যখন একটি বৈধ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তখন তা পূরণ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে হবে।

বিষয়গুলো নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা

মক্কার অমুসলিম নেতারা মহানবী (সাঃ)-এর সাথে তাদের শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করার পর, তারা তাদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি সম্পর্কে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং চুক্তি পুনর্ব্যক্ত ও সম্প্রসারিত করার জন্য তাদের একজন নেতা আবু সুফিয়ানকে মদিনায় প্রেরণ করেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদি তারা মহানবী (সাঃ) এর সাথে শান্তি চুক্তি ভঙ্গের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করত, তাহলে তাদের তা করা থেকে বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট হত।

জামে আত তিরমিযী, ২০১২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, চিন্তাভাবনা করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর তাড়াহুড়ো করা শয়তানের পক্ষ থেকে।

এটি বোঝা এবং আমল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা, কারণ মুসলমানরা যারা অনেক সৎকর্ম করে তারা প্রায়শই তাড়াহুড়ো করে তাদের ধ্বংস করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা রাগের বশে কিছু খারাপ কথা বলতে পারে যা তাদের বিচারের দিনে জাহান্নামে নিমজ্জিত করতে পারে। জামে আত তিরমিযী, ২৩১৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বেশিরভাগ পাপ এবং সমস্যা, যেমন তর্ক, এর কারণ হল মানুষ সবকিছু ঠিকঠাকভাবে চিন্তা করতে ব্যর্থ হয় এবং তাড়াহুড়ো করে কাজ করে। বুদ্ধিমানের লক্ষণ হল যখন কেউ কথা বলার বা কাজ করার আগে চিন্তা করে এবং কেবল তখনই তাড়াহুড়ো করে যখন সে জানে যে তার কথা বা কাজ পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়ে ভালো এবং উপকারী।

যদিও একজন মুসলিমের সৎকর্ম সম্পাদনে দেরি করা উচিত নয়, তবুও সেগুলি করার আগে তাদের অবশ্যই সবকিছু ভেবে দেখা উচিত। কারণ একজন ব্যক্তির তাড়াহুড়োর কারণে তার শর্তাবলী এবং শিষ্টাচার পূরণ না হওয়ার কারণে কোনও সৎকর্মের কোনও প্রতিদান নাও পেতে পারে। এই ক্ষেত্রে, যে কোনও বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার পরেই কেবল এগিয়ে যাওয়া উচিত।

যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে, সে কেবল তার পাপ কমাবে না এবং মহান আল্লাহর প্রতি তার আনুগত্য বৃদ্ধি করবে না, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তারা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হবে, যেমন তর্ক, অসুবিধা এবং মতবিরোধ, তাও কমাবে।

বাধ্যতা প্রথমে আসে

মক্কার অমুসলিমদের নেতারা মহানবী (সাঃ) এর সাথে তাদের শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করার পর, আবু সুফিয়ান চুক্তি পুনর্ব্যক্ত এবং সম্প্রসারিত করার জন্য মদীনা সফর করেন। আবু সুফিয়ান তার কন্যা উম্মে হাবিবা (রাঃ) এর সাথে দেখা করেন, যিনি মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রীও ছিলেন। মক্কার অমুসলিমদের হৃদয় তাঁর এবং ইসলামের প্রতি নরম করার জন্য তিনি তাকে বিয়ে করেন। উম্মে হাবিবা (রাঃ) তার বাবাকে একটি গালিচায় বসতে বাধা দেন এবং পরিবর্তে এটি ভাঁজ করে দেন। আবু সুফিয়ান মন্তব্য করেন যে তিনি জানেন না যে তিনি মনে করেন যে তিনি গালিচাটির জন্য খুব ভালো নাকি গালিচাটি তার জন্য খুব ভালো। তিনি উত্তর দেন যে মহানবী (সাঃ) সেই গালিচায় বসতেন এবং তাই তিনি কোনও মুশরিককে এটি ব্যবহার করতে দেবেন না। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭৯ এবং ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ৩৮৮-৩৮৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও তিনি তার বাবা ছিলেন, উম্মে হাবিবা (রাঃ) তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছিলেন, কারণ তার সমস্ত কর্মকাণ্ড ছিল মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে অমুসলিমদের প্রতি অসম্মান দেখানো উচিত কারণ তিনি তার বাবার প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছিলেন তাকে তার বাড়িতে আতিথ্য দিয়ে।

সুনানে আবু দাউদের ৪৬৮১ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুসলিমের ঈমানকে পরিপূর্ণ করে তোলার জন্য যেসব বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রথমটি হলো, মহান আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। এর মধ্যে রয়েছে পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই অন্যদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা। এটি অবশ্যই কার্যত তার কর্মের মাধ্যমে দেখানো উচিত, নিজের সামর্থ্যের মধ্যে অন্যদের আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিকভাবে সহায়তা করা। অন্যদের প্রতি অনুগ্রহ গণনা করা কেবল পুরস্কার বাতিল করে না বরং মহান আল্লাহর জন্য ভালোবাসার অভাবকেও প্রমাণ করে, কারণ এই ব্যক্তি কেবল মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা এবং অন্যান্য ধরণের প্রতিদান পেতে পছন্দ করে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৬৪:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের দান-খয়রাতকে স্মরণ করিয়ে অথবা কষ্ট দিয়ে নষ্ট করো না..."

পার্থিব কারণে অন্যদের প্রতি যেকোনো ধরণের নেতিবাচক অনুভূতি, যেমন হিংসা, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ভালোবাসার পরিপন্থী এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

এই মহৎ গুণের মধ্যে রয়েছে কেবল কথার মাধ্যমে নয়, বরং কাজের মাধ্যমে অন্যদের জন্য যা ভালোবাসে তা ভালোবাসা। জামে আত তিরমিযী, ২৫১৫ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি একজন প্রকৃত মুমিন হওয়ার একটি দিক।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর জন্য ভালোবাসার মধ্যে রয়েছে সেইসব জিনিসকে ভালোবাসা যা আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন, যেমন পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস। এই ভালোবাসা বাস্তবে দেখানো উচিত নির্দেশনার এই দুটি উৎস শেখার এবং সেগুলোর উপর আমল করার মাধ্যমে এবং মহান আল্লাহর প্রিয় অন্যান্য জিনিসের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করার মাধ্যমে, যেমন সৎকর্ম এবং মসজিদ।

আলোচ্য মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল, মহান আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা। এর অর্থ হল, মহান আল্লাহ যা অপছন্দ করেন, যেমন তাঁর অবাধ্যতা, তা অপছন্দ করা। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এর অর্থ এই নয় যে, অন্যদের ঘৃণা করা উচিত, কারণ মানুষ আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে তওবা করতে পারে। বরং একজন মুসলিমের উচিত সেই পাপকেই অপছন্দ করা যা তাদের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তা এড়িয়ে চলা এবং অন্যদেরকে এর বিরুদ্ধে সতর্ক করা। মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিবর্তে তাদের উপদেশ দেওয়া, কারণ এই দয়ার কাজটি তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে নিজের অনুভূতির উপর ভিত্তি করে জিনিসগুলিকে অপছন্দ না করা, যেমন কোনও কাজ, যা বৈধ। পরিশেষে, মহান আল্লাহর জন্য অপছন্দ করার প্রমাণ হল যে, যখন তারা তাদের কথা এবং কাজের মাধ্যমে তাদের অপছন্দ প্রদর্শন করে, তখন তা কখনই এমনভাবে হবে না যা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে। অর্থাত্, কোনও কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের কখনই পাপ করতে বাধ্য করবে না, কারণ এটি প্রমাণ করবে যে কোনও কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের নিজের জন্য।

আলোচ্য মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করা। এটি অন্যদের প্রতি দান করা যেতে পারে এমন প্রতিটি আশীর্বাদকে বোঝায়, যেমন শারীরিক ও মানসিক সহায়তা, কেবল সম্পদ নয়। যখন কেউ দান করে, তখন সে তা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে করবে, অর্থাৎ, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট

করার মতো বিষয়গুলিতে, যেমন আন্তরিক পরামর্শ দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে, এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক যা সুনান আন নাসায়ী, ৪২০৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নির্দেশিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নিজের অনুগ্রহ গণনা না করে অন্যদের সাথে এই আশীর্বাদগুলি দান করা এবং ভাগ করে নেওয়া, কারণ এটি প্রমাণ করে যে তারা অন্যদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার জন্য দান করেছিল। অধ্যায় ৭৬ আল ইনসান, আয়াত ৯:

"[বলে], "আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমাদের খাওয়াই। আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।"

আলোচ্য মূল হাদিসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য হলো, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু থেকে বিরত থাকা। এর মধ্যে রয়েছে, অন্যদের কাছ থেকে এমন কিছু থেকে বিরত থাকা যা আল্লাহর অসন্তুষ্ট করে। এই মুসলিম ব্যক্তি লক্ষ্য করবে না যে কে তাদের কাছ থেকে কিছু চাচ্ছে, বরং তারা কেবল অনুরোধের কারণ মূল্যায়ন করবে। যদি কারণটি ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে তারা আশীর্বাদ থেকে বিরত থাকবে এবং কার্যকলাপে অংশ নেবে না। অধ্যায় ৫ আল মায়িদা, আয়াত ২:

"...এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

এর মধ্যে রয়েছে এমন কিছু বিষয়ে নিজের কথা ও কাজ বন্ধ রাখা যা আল্লাহ তাআলার কাছে সন্তুষ্ট নয়, যেমন গীবত করা বা রাগ প্রকাশ করা। এই মুসলিম তাদের ইচ্ছানুযায়ী কথা বলবে না এবং কাজ করবে না এবং কেবলমাত্র এমন পরিস্থিতিতে অগ্রসর হবে যখন তা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করবে, অন্যথায়, তারা অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকবে এবং অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকবে।

পরিশেষে, এই বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করলে ঈমানের পরিপূর্ণতা লাভ হয়, কারণ এগুলো আবেগের উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং তাই নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন। এই নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে ভালোভাবে অর্জিত হয় যখন কেউ ঈমানের দৃঢ়তা অর্জন করে। এটি তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ ইসলামী জ্ঞান শেখে এবং তার উপর কাজ করে। ঈমানের দৃঢ়তা সর্বদা তার নিয়ত, মনোযোগ এবং কর্মকে মহান আল্লাহর দিকে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। এটি মূল হাদিসে উল্লিখিত চারটি দিক নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি এগুলো নিয়ন্ত্রণ করার সৌভাগ্য লাভ করবে সে ইসলামের অন্যান্য কর্তব্য পালন করা সহজ পাবে। এই কর্তব্যগুলির মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি নিশ্চিত করবে যে কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এটি উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্যের চাবিকাঠি। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

ইসলামের প্রতি আন্তরিকতা প্রথমে

মক্কার অমুসলিম নেতারা মহানবী (সাঃ)-এর সাথে তাদের শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করার পর, আবু সুফিয়ান চুক্তি পুনর্ব্যক্ত এবং সম্প্রসারিত করার জন্য মদীনা সফর করেন। আবু সুফিয়ান অনেক সিনিয়র সাহাবীর সাথে কথা বলেন, তাদেরকে মহানবী (সাঃ)-এর সাথে তার পক্ষে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি তাদের সাথে তার বিভিন্ন সম্পর্ক যেমন গোত্রীয় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক তালিকাভুক্ত করেন, কিন্তু তারা সকলেই একইভাবে উত্তর দেন। তারা তাঁকে খুশি করার জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে অস্বীকৃতি জানান এবং মহানবী (সাঃ)-কে চুক্তি নবায়ন করতে বা না করতে রাজি করাতে চাননি। পরিবর্তে তারা তাদের নেতার উপর তার ঐশ্বরিক নির্দেশিত পছন্দের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত ছেড়ে দেন। অবশেষে যখন তিনি মহানবী (সাঃ)-এর সাথে দেখা করেন, তখন সেই ব্যক্তি কেবল তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং চুক্তি নবায়ন করবেন কিনা তা নিয়ে আলোচনা করেননি। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৮১-৩৮২ এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর মহান জীবন", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৭৮-১৬৭৯ -এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি ইঙ্গিত দেয় যে, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের মতো অন্যান্য সকল সম্পর্ক এবং বন্ধনের উপরে মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যকে প্রাধান্য দেওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেবে, সে নিশ্চিত করবে যে সে তাঁর আনুগত্যের উপর অটল থাকবে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে একজন ব্যক্তি তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেয়। অতএব, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যকে অগ্রাধিকার

দেওয়া উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের চেয়ে মানুষের প্রতি আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেয়, সে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা পাবে না, তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল স্থানে রাখবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে ব্যর্থ হবে। অতএব, এই মনোভাব একজন ব্যক্তিকে মানসিক শান্তি পেতে বাধা দেয়, এমনকি যদি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে। সূরা তওবা, আয়াত ৮২:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে, এমনকি যদি তা তার আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতাও করে। কারণ, মনের ও শরীরের শান্তি অর্জনের জন্য নিজের আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই সামান্য মূল্য, ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি সুস্বাস্থ্য অর্জনের জন্য তার খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করলেও মানসিক শান্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তার জন্য জীবন একটি অন্ধকার কারাগারে পরিণত হয়। ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের দেখলে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের এমন একজন বিচক্ষণ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাস নির্ধারিত থাকে। এই বিচক্ষণ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, তিনিও তেমনই ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন। কারণ, একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন এবং তার জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, যদিও এত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তাদের পরামর্শ সকল ধরণের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ তাদের জীবনের প্রতিটি জিনিস এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দিতে পারে না, কারণ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে। একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং

তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের হাদীসের আকারে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে এবং যারা করে না। যদিও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝে না এবং তাই তাদের ডাক্তারকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ইসলামের শিক্ষাগুলি নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। কিন্তু এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষার কাছে যাওয়ার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

গোপন কথোপকথন

মক্কার অমুসলিম নেতারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে তাদের শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করার পর, মহান আল্লাহ তাঁকে মক্কার দিকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন। মদিনা শহর রক্ষার জন্য তিনি প্রায়শই জনসাধারণের কাছ থেকে সামরিক কৌশলগত তথ্য গোপন রাখতেন, তাই তিনি তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে তাঁর অভিযানের জন্য খাবার প্রস্তুত করতে বলতেন কিন্তু গোপন রাখতে বলতেন। যখন তাঁর পিতা আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সাথে দেখা করতে যেতেন, তখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাড়িতে ছিলেন না, তখন তিনি তাকে ভ্রমণের জন্য খাবার প্রস্তুত করতে দেখেন। তিনি তাকে তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন কিন্তু তিনি চুপ থাকেন। তিনি বারবার জিজ্ঞাসা করেন যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে অভিযানে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিনা এবং অনেক স্থানের তালিকাও দিয়েছেন। কিন্তু আয়েশা (রাঃ)-ও চুপ থাকেন। ইমাম ইবনে কাথিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৮২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আয়েশা (রাঃ) কথোপকথন গোপন রাখার গুরুত্ব বুঝতেন।

জামে আত তিরমিযী, ১৯৫৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) ইঙ্গিত করেছেন যে ব্যক্তিগত কথোপকথন একটি আমানত যা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেকেরই মানুষের ব্যক্তিগত কথোপকথন অন্যদের কাছে প্রকাশ করার খারাপ অভ্যাস থাকে। এটি একটি অবিশ্বাস্যরকম খারাপ বৈশিষ্ট্য কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলিমের মনোভাবের পরিপন্থী। অনেকে তাদের নিকটাত্মীয়দের সাথে এটি করে, যারা মনে করে এটি গ্রহণযোগ্য, যদিও এটি স্পষ্টতই গ্রহণযোগ্য নয়। একজন মুসলিমের উচিত সর্বদা কথোপকথনে বলা কথাগুলি গোপন রাখা, যদি না তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হন যে যার সাথে তারা কথা বলেছেন তিনি তৃতীয় পক্ষের কাছে তথ্য উল্লেখ করায় আপত্তি করবেন না। যদি তারা তা করে, তাহলে এটি তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং এটি তাদের প্রতি আন্তরিকতার পরিপন্থী। সুনানে আন নাসায়ী, ৪২০৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে অন্যদের প্রতি আন্তরিক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এমনকি যদি কেউ বিশ্বাস করে যে অন্য ব্যক্তি তাদের কথোপকথন অন্যদের কাছে প্রকাশ করায় আপত্তি করবে না, তবুও, তৃতীয় পক্ষের সাথে কথোপকথন ভাগ করে নেওয়া থেকে বিরত থাকা নিরাপদ এবং উত্তম।

মূল হাদিসের উপর আমল করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি গীবত এবং পরচর্চার মতো পাপ প্রতিরোধ করে এবং মানুষের মধ্যে নেতিবাচক অনুভূতি তৈরি হতে বাধা দেয়। এটি প্রায়শই ঘটে কারণ তৃতীয় পক্ষের সাথে কথোপকথন প্রায়শই ভুল ব্যাখ্যা এবং ভুল বোঝাবুঝির দিকে পরিচালিত করে। এই সবগুলি কেবল ভাঙা এবং সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার দিকে পরিচালিত করে। যদি কেউ সৎভাবে তাদের জীবন সম্পর্কে চিন্তা করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে যাদের প্রতি তারা নেতিবাচক অনুভূতি অনুভব করেছে তাদের বেশিরভাগই তাদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল তার কারণেই হয়েছিল, তাদের কাছ থেকে সরাসরি যা দেখেছিল তার কারণে নয়। ব্যক্তিগত কথোপকথন প্রকাশ করা মানুষের মধ্যে ঐক্যকে বাধা দেয়, বিশেষ করে আত্মীয়দের মধ্যে। এবং ইসলামের অনেক শিক্ষায় ঐক্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন সহিহ বুখারীতে পাওয়া হাদিস, সংখ্যা 6065। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 58:

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাদেরকে আমানতসমূহ তাদের প্রাপ্যদের হাতে অর্পণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন..."

অন্যদের কথাবার্তার সাথে ঠিক তেমনই আচরণ করা উচিত যেমন তারা চায় লোকেরা তাদের কথোপকথনের সাথে আচরণ করুক।

অন্যদের করুণার সাথে দেখা

মক্কার অমুসলিমদের নেতারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে তাদের শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করার পর, আল্লাহ তাআলা তাঁকে মক্কায় যাওয়ার নির্দেশ দেন। হাতেব ইবনে আবু বালতা (রাঃ)-এর মাধ্যমে তিনি একজন মহিলা দূতকে মক্কায় একটি চিঠি পাঠান যেখানে তিনি অমুসলিমদের জানিয়েছিলেন যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মক্কার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ঐশীভাবে এই চিঠি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ তিনি আলী ইবনে আবু তালিব, মিকদাদ ইবনে আমর এবং যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন যাতে তিনি চিঠিটি মক্কায় পৌঁছানোর আগেই ফিরিয়ে আনেন। পরিকল্পনা সফল হয় এবং চিঠিটি নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে ফেরত পাঠানো হয়, যিনি এরপর হাতেব (রাঃ)-কে ডেকে পাঠান এবং তার চিঠি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। হাতিব (রাঃ) ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ইসলাম ত্যাগ করেননি এবং ইসলামের চেয়ে কুফরী পছন্দ করেননি, বরং তিনি কেবল এই চিঠিটি লিখেছিলেন কারণ মক্কায় তাঁর পরিবার ও সম্পত্তি রক্ষা করার মতো কেউ ছিল না এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে চিঠির মাধ্যমে তিনি তাদের অনুগ্রহ লাভ করবেন এবং ফলস্বরূপ তারা তাঁর পরিবার ও সম্পত্তির ক্ষতি করবেন না। মহানবী (সাঃ) নিশ্চিত করেছিলেন যে তিনি সত্য কথা বলেছেন। উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বিশ্বাসঘাতকতার জন্য হাতিব (রাঃ)-কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন কিন্তু মহানবী (সাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং মহান আল্লাহ ইতিমধ্যেই বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ)-এর জীবনী", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭৯ এবং সহীহ বুখারী, সংখ্যা ৩০০৭-এ প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে। এই বিষয়ে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, ৬০ তম অধ্যায় মুমতাহানা, আয়াত ১ নাযিল করেছেন:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার শত্রুদের এবং তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করো না, অথচ তারা তোমাদের কাছে যা

এসেছে তা অস্বীকার করেছে, নবীকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে [শুধুমাত্র] কারণ তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখো। যদি তোমরা আমার পথে যুদ্ধ/সংগ্রাম করার জন্য এবং আমার সন্তুষ্টির উপায় খুঁজতে বেরিয়ে এসে থাকো, তাহলে [তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না]। তোমরা তাদের প্রতি ভালোবাসা [অর্থাৎ নির্দেশ] গোপন করে থাকো, কিন্তু আমি তোমাদের গোপন কথা এবং প্রকাশ্য কথা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেউ তা করে, সে অবশ্যই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।"

ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভু (সাঃ) এর নোবেল লাইফ" বইয়ের ১ম খণ্ড, ১৬৮৪-১৬৮৫ পৃষ্ঠায় এ বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও হাতিব (রাঃ) এর উদ্দেশ্য মন্দ ছিল না, কারণ তিনি তার পরিবার ও সম্পত্তি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি ভাল করেই জানতেন যে অমুসলিমদের কাছে লেখা তার চিঠি মক্কা বিজয়ের পরিকল্পিত পথে কোনও প্রভাব ফেলবে না, কারণ মক্কার অমুসলিমরা ইতিমধ্যেই এই ঘটনা ঘটছে বলে নিশ্চিত ছিল, তবুও তার উচিত ছিল মহানবী (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিক থাকা এবং তাঁর পরিবার ও সম্পদ আল্লাহর কাছে অর্পণ করা। এই একটি ভুলের জন্য তাকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে, মহানবী (সাঃ) তাঁর সমগ্র জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছিলেন এবং তাই এই একটি ভুলকে উপেক্ষা করেছিলেন।

প্রথমত, মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর আনুগত্যের উপর সর্বদা দৃঢ় থাকা উচিত, এমনকি যখন তাদের কিছু ক্ষতি হতে পারে, যেমন সম্পদের ক্ষতি। বাস্তবে, এই মুহূর্তগুলিই আল্লাহর প্রতি মানুষের বিশ্বাসের শক্তি নির্ধারণ করে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে

মহান আল্লাহর আনুগত্য করা কঠিন নয়। আসল পরীক্ষা হল যখন কেউ কঠিন এবং সম্ভাব্য ক্ষতির সময়ে তাঁর আনুগত্য করে। অতএব, স্বাচ্ছন্দ্য এবং অসুবিধা উভয় সময়েই আনুগত্য বজায় রেখে তাদের ঈমানের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করা উচিত। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। সকল পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর আনুগত্য বজায় রাখতে সাহায্য করার জন্য ঈমানের নিশ্চিততা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে প্রাপ্ত স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণগুলি শেখা এবং সেগুলি অনুসরণ করার মাধ্যমে দৃঢ় ঈমান অর্জন করা হয়, যা ব্যাখ্যা করে যে, আন্তরিকভাবে আল্লাহকে আনুগত্য করা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। এই ব্যক্তি যখনই তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে, তখন সহজেই আল্লাহকে অমান্য করবে কারণ তারা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে তাদের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে এবং পরিবর্তে আল্লাহকে আনুগত্য করলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। অতএব, ইসলামী জ্ঞান শেখার এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জন করতে হবে যাতে তারা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং তাদের জীবনের প্রতিটি জিনিসকে সঠিকভাবে স্থাপন করার মাধ্যমে।

এছাড়াও, আলোচ্য মূল ঘটনাটি মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে, একজন ব্যক্তির সৎকর্ম তাদের কৃত পাপের দ্বারা মুছে যায় না। দুঃখের বিষয়, মুসলিমরা প্রায়শই অন্যদের কাছ থেকে এমন নিখুঁত আচরণ আশা করে যেখানে তারা কোনও পাপ বা ভুল করে না এবং যদি কেউ এই মানদণ্ড মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা সহজেই তাদের নিন্দা করে এবং তাদের সমস্ত সৎকর্ম ভুলে যায়। এটি একটি অদ্ভুত মনোভাব কারণ মহান আল্লাহ মানুষের কাছ থেকে এটি আশা করেন না, এমনকি তিনি একজন ব্যক্তির সৎকর্মকেও উপেক্ষা করেন না, এমনকি যদি তারা পাপ করেও। যদিও পাপ একজন ব্যক্তির সৎকর্মকে ধ্বংস করতে পারে কিন্তু যেহেতু এটি মানুষের কাছ থেকে গোপন থাকে, তাই অন্যরা যে সৎকর্ম করেছে তা ভুলে যাওয়া

উচিত নয়, এমনকি যদি তারা পাপ করেও। একমাত্র আল্লাহই একজন ব্যক্তির ভালো-মন্দ কাজ এবং তাদের কর্মের পরিণতি জানেন এবং তিনিই কেবল এই পৃথিবীতে এবং পরকালে তাদের পরিণতি নির্ধারণ করবেন। একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের পাপ করলেই অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করা এবং আরও ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করা। এই পদ্ধতিতে আচরণ করা অন্যদের নিন্দা করার চেয়ে অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করা ভালো।

অন্যদের প্রতি করুণা দেখানো

মক্কার অমুসলিম নেতারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে তাদের শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করার পর, মহান আল্লাহ তাঁকে মক্কার দিকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন। মক্কা যাওয়ার পথে, মক্কার অমুসলিমদের মধ্য থেকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দুইজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং আত্মীয়, আবু সুফিয়ান বিন হারিস (যিনি আবু সুফিয়ান বিন হারব নন যিনি অমুসলিমদের নেতা ছিলেন) এবং আবদুল্লাহ বিন উমাইয়া, মুসলিম সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছান এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে দেখা করার অনুমতি চান। প্রথমে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানান, কারণ তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সবচেয়ে জঘন্যতম শত্রু ছিলেন। আবু সুফিয়ান বিন হারিস, তাঁর সাথে দেখা করার জন্য অনুরোধ করেন এবং মন্তব্য করেন যে, যদি নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে দেখা না হয়, তাহলে তিনি এবং তাঁর ছোট শিশুটি মরুভূমিতে চলে যাবেন যতক্ষণ না তারা অনাহারে মারা যাবেন। এতে মহানবী (সা.)-এর করুণা ও করুণা জাগ্রত হয় এবং তিনি তাদেরকে তাঁর সাথে দেখা করার অনুমতি দেন এবং উভয়কেই সম্মান করেন এবং ফলস্বরূপ, তারা উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর (সা.)-এর নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৯১-১৬৯২-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি অন্যদের ভুল উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সর্বদা মনে রাখা উচিত যে মানুষ যেহেতু ফেরেশতা নয়, তাই তারা ভুল করতে বাধ্য, ঠিক যেমন তারা নিজেরাই ভুল করে। এবং যেমন তারা চায় যে মহান আল্লাহ এবং

মানুষ তাদের ভুল ক্ষমা করুক, তেমনি তাদেরও অন্যদের ভুল ক্ষমা করতে শেখা উচিত। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ২২:

"...এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন..."

এটা বোধগম্য যে, একজন ব্যক্তি অন্যকে ক্ষমা করতে কষ্ট পেতে পারেন, যেমন সড়ক দুর্ঘটনার পর পঙ্গু হয়ে যাওয়া। যদি তারা এই ক্ষেত্রেও ক্ষমা করার চেষ্টা করতে পারে, তাহলে তাদের জন্য পুরস্কার আরও বেশি হবে। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে কারো সাথে করা অন্যায় চলমান নয়, সেখানে একজন ব্যক্তির উচিত অন্যদের ক্ষমা করার জন্য নিজেকে চাপ দেওয়া এবং ক্ষোভ পোষণ না করা। যে ব্যক্তি এই ধরণের ক্ষোভ পোষণ করে তার ভয় করা উচিত যে, আল্লাহ, কিয়ামতের দিন তাদের কর্মকাণ্ড পরীক্ষা করবেন, ঠিক যেমন তারা এই পৃথিবীতে মানুষের ভুল পরীক্ষা করে ধরে রেখেছিল। যার কর্মকাণ্ড বিচারের দিনে যাচাই করা হবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। সহিহ বুখারির ১০৩ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। পরিশেষে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, অন্যদের ক্ষমা করার অর্থ হল অন্যদের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া যাতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয়। ধৈর্য এবং অন্যদের ক্ষমা করার অর্থ এমন নিষ্ক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করা নয় যার মাধ্যমে কেউ অন্যদের তাদের উপর অন্যায় করতে দেয় এবং তারা আবার ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়। এই নিষ্ক্রিয় মনোভাবের সাথে ইসলামের শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই। উদাহরণস্বরূপ, একজন মহিলা যিনি তার স্বামীর দ্বারা শারীরিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন, তাকে অবশ্যই নিজেকে এবং তার সন্তানদের রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে, এমনকি যদি এর জন্য পুলিশকে ডেকে তাকে ছেড়ে দেওয়াও হয়। স্বামীর ক্ষতি থেকে নিজেকে এবং তার সন্তানদের রক্ষা করার এবং তার জীবন চালিয়ে যাওয়ার পরে, তিনি এই পৃথিবীতে, সরকারের মাধ্যমে এবং বিচারের দিনে মহান আল্লাহর কাছে ন্যায়বিচার চাইতে পারেন। কিন্তু যদি তিনি তার স্বামীর

অতীতের ভুলের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা করতে পারেন, তাহলে তাকে ক্ষমা করা হবে।

অনুসরণের মধ্যেই শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত

মক্কার অমুসলিমদের নেতারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে তাদের শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করার পর, মহান আল্লাহ তাঁকে মক্কার দিকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন। পবিত্র রমজান মাসে সেনাবাহিনী রওনা দেয়, তাই তারা সকলেই রোজা রাখে। যাত্রা দীর্ঘ এবং কঠিন হওয়ায়, নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জানানো হয় যে কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, রোজায় কষ্ট পাচ্ছেন কিন্তু তারা অপেক্ষা করছেন যে তিনি কী করেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর সন্তুষ্ট হোন, তিনি এক পাত্র পানি ডেকে তা পান করে প্রকাশ্যে রোজা ভাঙেন। কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসরণ করেন এবং তাদের রোজাও ভাঙেন, কিন্তু কেউ কেউ রোজা অব্যাহত রাখেন। যখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এই খবর জানানো হয়, তখন তিনি তাদের সমালোচনা করেন যারা রোজা অব্যাহত রেখেছেন কারণ তারা তাঁর কাজ অনুসরণ করেননি। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৮৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও রোজা ভঙ্গ করা বা রোজা অব্যাহত রাখা পাপ ছিল না, তবুও যারা রোজা রেখেছিল তাদের সমালোচনা করা হয়েছিল। কারণ শ্রেষ্ঠত্ব হল দুটি দিকনির্দেশনার উৎস: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সাঃ)-এর হাদীস কঠোরভাবে অনুসরণ করা। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি আমল করা হবে, এমনকি যদি তা সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে, তবুও তারা এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎসের উপর তত কম আমল করবে, যা পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে। এই কারণেই সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, যে বিষয় দুটি দিকনির্দেশনার উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করবেন। উপরন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি আমল করা হবে, তত বেশি তারা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলিতে কাজ করতে শুরু করবে। এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে বিপথগামী করে।

উদাহরণস্বরূপ, সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রাখে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পা দেবে এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করবে যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথেও সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান নির্দেশনার দুটি উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বিভ্রান্তিকর অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফর, যেমন কালো জাদু অনুশীলন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"... সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

সুতরাং একজন মুসলিম অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রয়েছে। এই কারণেই ধর্মীয় উদ্ভাবনগুলিতে কাজ করা যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

শ্রেষ্ঠত্ব চেহারায় নয়

মক্কার অমুসলিমদের নেতারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে তাদের শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করার পর, মহান আল্লাহ তাঁকে মক্কার দিকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন। মক্কায় পৌঁছানোর আগে সেনাবাহিনী বেশ কয়েকবার থেমেছিল এবং এই স্থানগুলির মধ্যে একটি ছিল আল আকাবা। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) স্থানীয় গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করার জন্য কিছু লোককে প্রেরণ করেছিলেন। একজন সাহাবী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) যখন ফল সংগ্রহ করার জন্য একটি গাছে উঠছিলেন, তখন কিছু লোক তাঁর ছোট এবং পাতলা পা দেখে তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মন্তব্য করেছিলেন যে, বিচারের দিনের পাল্লায় তাঁর পাতলা পা উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি ওজনের হবে। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৯০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটি ইঙ্গিত দেয় যে ইসলাম মানুষের মর্যাদাকে একটি একক মানদণ্ড অনুসারে বিচার করে: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে বর্ণিত যথাযথভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে তারা কতটা আন্তরিকভাবে আল্লাহ, মহিমান্বিত, তার আনুগত্য করে। সূরা ৪৯, আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

মানুষের মর্যাদা বিচারের অন্যান্য সকল মানদণ্ডের কোন মূল্য নেই, যেমন শারীরিক চেহারা, লিঙ্গ, জাতিগততা এবং সামাজিক শ্রেণী, এবং মুসলমানদের অবশ্যই এগুলি উপেক্ষা করতে হবে, অন্যথায় এটি মুসলিম জাতির মধ্যে বর্ণবাদ এবং অনৈক্যের জন্ম দেয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে যেহেতু একজনের উদ্দেশ্য অন্যদের থেকে গোপন থাকে, তাই তারা বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে অন্যদেরকে অন্যদের চেয়ে ভালো বলে বিচার করতে পারে না এবং তাই অন্যদের বা নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে দাবি করা থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ একমাত্র আল্লাহই সকল মানুষের উদ্দেশ্য, কথা এবং কর্মকাণ্ড জানেন। সূরা ৫৩ আন নাজম, আয়াত ৩২:

"...তাই তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবি করো না; তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কে তাঁকে ভয় করে।"

জনগণের প্রতি আন্তরিকতা

মক্কার অমুসলিমদের নেতারা মহানবী (সাঃ)-এর সাথে তাদের শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করার পর, মহান আল্লাহ তাঁকে মক্কার দিকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন। পথে মুসলিম সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের। তিনি মহানবী (সাঃ)-এর নির্দেশে মক্কার অমুসলিমদের উপর গোয়েন্দাগিরি করার জন্য এতদিন মক্কায় অবস্থান করেছিলেন। যখন আব্বাস (সাঃ)-এর নির্দেশে ১০,০০০ সৈন্যের বিশাল মুসলিম বাহিনী লক্ষ্য করেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে মক্কার অমুসলিমরা মহানবী (সাঃ)-এর মাধ্যমে তাদের নিজেদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়ার আগেই যদি তারা মক্কায় প্রবেশ করে, তাহলে সেনাবাহিনী তাদের সকলকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তিনি মক্কার অমুসলিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশায় মুসলিম বাহিনীর দিকে দ্রুত এগিয়ে যান। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভু (সাঃ) এর নোবেল লাইফ" বইয়ের ১ম খণ্ড, ১৬৯২-১৬৯৩ পৃষ্ঠায় এ বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও তারা অমুসলিম ছিলেন, তবুও আব্বাস (রাঃ) দেখিয়েছিলেন যে, ধর্মবিশ্বাস নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি আন্তরিকতা থাকা উচিত।

হাদিস অনুসারে, অন্যদের প্রতি এই ধরণের আন্তরিকতা গ্রহণ করা উচিত কারণ এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার একটি দিক হল আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিক সাহায্যের মতো নিজস্ব সামর্থ্য অনুসারে তাদের সাহায্য করা। নিজের কথা এবং কাজের মাধ্যমে তাকে অন্যদের মনের শান্তি এবং পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জনের জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং উৎসাহিত করতে হবে, যা মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে, যার মধ্যে ইসলামী শিক্ষায়

বর্ণিত সঠিকভাবে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। তাদের এমন স্বার্থপর মনোভাব গ্রহণ করা উচিত নয় যার মাধ্যমে তারা কেবল নিজের এবং তাদের পরিবারের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে। একজনের উচিত পশুর মানসিকতার ঊর্ধ্বে উঠে অন্যদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করা। এটি অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যা সে চায় অন্যরা তার সাথে আচরণ করুক। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে অন্যদের জন্য সেই আচরণ পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। সহিহ বুখারির ১৩ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রতিশোধ নয়, অভয়ারণ্য

মক্কার অমুসলিমদের নেতারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে তাদের শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করার পর, মহান আল্লাহ তাঁকে মক্কার দিকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন। সেনাবাহিনী মক্কায় পৌঁছানোর আগে বেশ কয়েকটি যাত্রাবিরতি করে এবং এর মধ্যে একটি ছিল মক্কার নিকটবর্তী মার আল জাহরান। মক্কার কিছু সিনিয়র সদস্য নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে যান এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। এই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন আবু সুফিয়ান বিন হারব (রাঃ)-এর উপর। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করেছিলেন যে, মক্কার যে কেউ অমুসলিমদের মধ্যে মক্কার এই সিনিয়র সদস্যদের ঘরে প্রবেশ করবে সে মুসলিম সেনাবাহিনী থেকে নিরাপদ থাকবে, যে কেউ তাদের ঘরে প্রবেশ করবে এবং দরজা বন্ধ করে দেবে সে নিরাপদ থাকবে এবং অবশেষে যে কেউ আল্লাহর ঘর কাবা শরীফে আশ্রয় নেবে, সে মুসলিম সেনাবাহিনী থেকে নিরাপদ থাকবে। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৯১-৩৯২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও মক্কার অনেক অমুসলিম মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল, তবুও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের জন্য সাফল্য, ঐক্য এবং শান্তি কামনা করেছিলেন। তাদেরকে আশ্রয় প্রদান করে, তিনি তাদেরকে খোলাখুলিভাবে ইসলামের শিক্ষা শোনার এবং শেখার সুযোগ দিয়েছিলেন যাতে তারা মুসলিম বা অমুসলিমদের কাছ থেকে কোনও বহিরাগত চাপ ছাড়াই এর সত্যতা বুঝতে পারে।

মুসলিমদের অবশ্যই অমুসলিমদের প্রতি এই ইতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করতে হবে যাতে তারা নিজেরাই ইসলামের শিক্ষা অধ্যয়ন করতে উৎসাহিত হয় যাতে তারা

বুঝতে পারে যে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য এর মধ্যেই নিহিত। এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ বাইরের বিশ্বের কাছে ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করে, ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচিত ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করে, যেমন উদারতা, ধৈর্য এবং সহনশীলতা, এবং ইসলামী শিক্ষা দ্বারা সমালোচিত খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন অহংকার, হিংসা এবং লোভ, এড়িয়ে চলে। বাইরের বিশ্বের কাছে ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য এবং তাই তারা এর জন্য দায়ী থাকবে।

ইসলাম হলো আন্তরিক আনুগত্য

মক্কার অমুসলিমদের নেতারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে তাদের শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করার পর, আল্লাহ তাআলা তাঁকে মক্কার দিকে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন। মক্কায় যাওয়ার পথে, মক্কার অমুসলিমদের নেতা আবু সুফিয়ান তাঁর সাথে দেখা করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পিছনে জামাতে নামাজে অংশ নিতে দেখেন। তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চাচা, আব্বাস বিন মুত্তালিব (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নির্দেশ অনুসারে যা কিছু করেন কি না। আব্বাস (রাঃ)-এর উত্তরে হ্যাঁ, বলেন এবং আরও বলেন যে, যদি তিনি তাদেরকে পানাহার ত্যাগ করার নির্দেশ দেন, তাহলে তারা তাঁর কথা মেনে চলবে। যখন মহানবী (সাঃ) ওযু করতেন, তখন সাহাবীগণ (রাঃ) ওযুর অবশিষ্ট পানি থেকে বরকত লাভের জন্য তাড়াহুড়ো করতেন। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে আবু সুফিয়ান (রাঃ) ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি এর আগে কখনও পারস্য বা রোমান রাজাদের প্রাসাদেও এমন কিছু দেখেননি। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৯৪-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি তাদের মৌখিক ঈমানের ঘোষণা তাঁর প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে পূর্ণ করেছিলেন।

সহীহ মুসলিমের ১৯৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, ইসলাম হলো মহানবী (সা.)-এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর ঐতিহ্যের উপর আমল করার জন্য জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টা। এই হাদিসগুলির মধ্যে রয়েছে ইবাদতের

মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কিত হাদীস এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর পবিত্র মহৎ চরিত্র। ৬৮ সূরা আল-কালাম, আয়াত ৪:

"আর সত্যিই, তুমি মহান নৈতিক চরিত্রের অধিকারী।"

এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়া। এটি মহান আল্লাহ তায়ালা একটি ফরজ কাজ করেছেন। সূরা আল হাশর, আয়াত ৭:

"... আর রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো; আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো..."

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কর্মের উপর তাঁর ঐতিহ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া, কারণ মহান আল্লাহর দিকে যাওয়ার সকল পথ বন্ধ, কেবল মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পথ ছাড়া। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"[নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..." "

তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পরে যারা তাঁকে সমর্থন করেছেন, আল্লাহ তাদের সকলকেই ভালোবাসা উচিত, হোক তারা তাঁর পরিবারের সদস্য অথবা তাঁর সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। যারা তাঁর পথে চলেন এবং তাঁর ঐতিহ্য শিক্ষা দেন তাদের সমর্থন করা তাদের উপর কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে যারা তাঁকে ভালোবাসেন তাদের ভালোবাসা এবং যারা তাঁর সমালোচনা করেন তাদের অপছন্দ করা, তাদের সাথে সম্পর্কের কথা বিবেচনা না করে। সহিহ বুখারির ১৬ নম্বর হাদিসে এই সবের সারসংক্ষেপ রয়েছে। এটি পরামর্শ দেয় যে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত ঈমান অর্জন করতে পারে না যতক্ষণ না সে আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-কে সমগ্র সৃষ্টির চেয়ে বেশি ভালোবাসে। এই ভালোবাসা কেবল কথার মাধ্যমে নয়, কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। তাঁকে শ্রদ্ধা করা, ভালোবাসা এবং কার্যত অনুসরণ করা তাঁর প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক। কিন্তু তাঁর পবিত্র জীবন এবং শিক্ষা সম্পর্কে না জেনে এটি করা সম্ভব নয়। কেউ কীভাবে এমন কাউকে সম্মান করতে, ভালোবাসতে এবং অনুসরণ করতে পারে যাকে তারা চেনে না? যে ব্যক্তি তাঁকে ভালোবাসতে এবং সম্মান করার দাবি করে কিন্তু কার্যত তাঁকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে তার দাবিতে অকৃতজ্ঞ।

অবাধ্যতা ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করে

মক্কার অমুসলিমদের নেতারা মহানবী (সাঃ)-এর সাথে তাদের শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করার পর, মহান আল্লাহ তাঁকে মক্কার দিকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন। মহানবী (সাঃ)-এর সাথে বিশাল মুসলিম সেনাবাহিনী যখন মক্কায় প্রবেশ করে, তখন আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর শক্তি এবং সংখ্যা দেখে অবাক হয়ে যান। তিনি মন্তব্য করেন যে তিনি এমন অনেক মুখ দেখেছেন যাদের তিনি চিনতে পারেননি যারা মক্কা জয় করতে এসেছিলেন। মহানবী (সাঃ)-এর উত্তরে তিনি বলেন যে এটি কেবল অমুসলিমদের কর্মকাণ্ডের ফল। মক্কার অমুসলিমরা যখন তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছিল তখন মুসলিম সেনাবাহিনী তাঁর উপর বিশ্বাস করেছিল এবং মক্কার অমুসলিমরা যখন তাঁকে নির্বাসিত করেছিল তখন তারা তাঁকে সহায়তা করেছিল। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৯৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য একটি সহজ কিন্তু গভীর শিক্ষা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তারা এই পৃথিবীতে বা পরকালে পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে কখনও সফল হবে না। যুগের সূচনা থেকে এই যুগ পর্যন্ত এবং শেষ যুগ পর্যন্ত, কেউ কখনও মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে প্রকৃত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি এবং কখনও পাবেও না। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতএব, যখন একজন মুসলিম এমন পরিস্থিতিতে পড়ে যেখানে তারা ইতিবাচক এবং সফল ফলাফল অর্জন করতে চায়, তখন তাদের কখনই মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করা উচিত নয়, তা যতই প্রলোভনসঙ্কুল বা সহজ মনে হোক না কেন। এমনকি যদি তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনরা তাকে তা করার পরামর্শ দেয় কারণ সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই, যদি এর অর্থ স্রষ্টার অবাধ্যতা হয়। এবং প্রকৃতপক্ষে তারা কখনও তাদের মহান আল্লাহ এবং তাঁর শাস্তি থেকে এই পৃথিবীতে বা পরকালে রক্ষা করতে পারবে না। ঠিক যেমনভাবে মহান আল্লাহ তাঁর আনুগত্যকারীদের সাফল্য দান করেন, তিনি তাঁর অবাধ্যদের কাছ থেকে একটি সফল ফলাফল সরিয়ে

দেন, এমনকি এই অপসারণ প্রত্যক্ষ করতে সময় লাগে। একজন মুসলিমের বোকা বানানো উচিত নয় কারণ এটি শীঘ্রই বা পরে ঘটবে। পবিত্র কুরআন অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছে যে একটি মন্দ পরিকল্পনা বা কর্ম কেবল সেই ব্যক্তিকেই ঘিরে রাখে যিনি শাস্তি বিলম্বিত হলেও। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ৪৩:

"...কিন্তু সেই মন্দ চক্রান্ত তার নিজস্ব লোকদের ছাড়া আর কাউকে ঘিরে রাখে না..."

অতএব, পরিস্থিতি এবং পছন্দ যতই কঠিন হোক না কেন, মুসলিমদের সর্বদা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্য বেছে নেওয়া উচিত কারণ এটিই উভয় জগতে প্রকৃত সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে, যদিও এই সাফল্য তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট নাও হতে পারে।

ঘর মুক্ত করা

যখন মহানবী (সাঃ) এর সাথে বিশাল মুসলিম সেনাবাহিনী মক্কায় প্রবেশ করে, তখন সকলের কাছে স্পষ্ট ছিল যে তারা সেদিন মক্কা জয় করবে। একজন সাহাবী, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, ঘোষণা করেন যে এই দিনটি ছিল একটি মহাযুদ্ধের দিন যেখানে তাদের শত্রুদের জন্য আশ্রয়স্থল নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। যখন মহানবী (সাঃ) কে এই কথা জানানো হয়, তখন তিনি তার কথা সংশোধন করে ঘোষণা করেন যে আজকের দিনটি আসলে সেই দিন যেদিন আল্লাহ, মহিমান্বিত, তাঁর ঘর, কাবাকে মহিমান্বিত করেন, যে দিনটি কাবাকে আল্লাহর আন্তরিক ইবাদতের মাধ্যমে সজ্জিত করা হবে। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৯৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, মহানবী (সা.)-এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল আল্লাহর ঘর কাবাকে মুক্ত করা, যাতে এটি আবারও আন্তরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতীক হয়ে ওঠে। অতএব, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যেমন তারা দিনে পাঁচবার নামাজের জন্য কাবার দিকে মুখ করে, তেমনি তাদের সারা দিন এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের দিকেও মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আশীর্বাদগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। এই আচরণই হল কাবার উদ্দেশ্য পূরণ করা এবং উভয় জগতেই তারা মানসিক ও শারীরিক অবস্থা বজায় রেখে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হয়ে মানসিক শান্তি অর্জন করা। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

কাবার এই উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যর্থতা হল একটি প্রধান কারণ যে মুসলিমরা, যারা পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের মতো মৌলিক ফরজ কর্তব্য পালন করে, তারা মানসিক শান্তি পেতে ব্যর্থ হয়, কারণ তারা তাদের দিনভর এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতেই মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে মনোনিবেশ করে না। ফলস্বরূপ, তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে। এটি তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনে বাধা দেয় এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় ফেলে দেয়। অতএব, তাদের আচরণ উভয় জগতেই কেবল চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে। সূরা তওবা, আয়াত 82:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি

আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

নম্রতার শিখর

যখন মহানবী (সাঃ) এর সাথে বিশাল মুসলিম সেনাবাহিনী মক্কায় প্রবেশ করে, তখন তিনি আল্লাহর ঘরের নিকটবর্তী স্থানে সওয়ার হয়ে প্রবেশ করেন, এবং আল্লাহর প্রতি বিনম্রভাবে এত নিচু হয়ে সিজদা করেন যে, তাঁর মুখমণ্ডল প্রায় তাঁর জিন স্পর্শ করে। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ)-এর জীবনী", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৯৭-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি ২৫ নম্বর সূরা আল ফুরকানের ৬৩ নম্বর আয়াতের সাথে সম্পর্কিত:

"আর দয়াময়ের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করে..."

আল্লাহর বান্দারা বুঝতে পেরেছেন যে, তাদের কাছে যা কিছু ভালো আছে তা কেবল আল্লাহ তাআলার দানেই। আর যে কোন মন্দ থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে তা হলো আল্লাহ তাআলা তাদের রক্ষা করেছেন। যা কারোর নয়, তা নিয়ে গর্ব করা কি বোকামি নয়? ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি স্পোর্টস কার নিয়ে গর্ব করে না যা মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে বাস্তবে কিছুই তাদের নয়। এই মনোভাব নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি সর্বদা বিনয়ী থাকে। আল্লাহর বিনীত বান্দারা সহীহ বুখারী, ৫৬৭৩ নম্বরে পাওয়া নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসে পূর্ণ বিশ্বাস করেন, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কোনও ব্যক্তির সৎকর্ম তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। কেবলমাত্র আল্লাহর রহমতই এটি ঘটাতে পারে। কারণ প্রতিটি সৎকর্ম তখনই সম্ভব যখন আল্লাহ তায়ালা তাকে জ্ঞান, শক্তি, সুযোগ এবং অনুপ্রেরণা প্রদান

করেন। এমনকি কাজের গ্রহণযোগ্যতাও নির্ভরশীল। মহান আল্লাহর রহমতের উপর । যখন কেউ এই কথাটি মনে রাখে, তখন এটি তাদের অহংকার থেকে রক্ষা করে এবং নম্রতা গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে। সর্বদা মনে রাখা উচিত যে নম্র হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ নয় কারণ ইসলাম প্রয়োজনে আত্মরক্ষা করার জন্য উৎসাহিত করেছে। অন্য কথায়, ইসলাম মুসলমানদের দুর্বলতা ছাড়াই নম্র হতে শেখায়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, ২০২৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যে কেউ মহান আল্লাহর সামনে নিজেকে বিনীত করে, তিনি তাকে উত্থিত করবেন। তাই বাস্তবে, নম্রতা উভয় জগতে সম্মানের দিকে পরিচালিত করে। এই সত্যটি বোঝার জন্য কেবল সৃষ্টির সবচেয়ে বিনয়ী ব্যক্তি, অর্থাৎ মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর চিন্তা করা প্রয়োজন। মহান আল্লাহ, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই গুরুত্বপূর্ণ গুণটি গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে মানুষকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা ২৬ আশ শু'আরা, আয়াত ২১৫:

"আর যারা তোমার অনুসরণকারী মুমিন, তাদের প্রতি তোমার ডানা নত করো [অর্থাৎ, দয়া দেখাও]।"

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিনয়ী জীবনযাপন করতেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি আনন্দের সাথে ঘরের কাজকর্ম সম্পাদন করতেন এবং প্রমাণ করতেন যে এই কাজগুলি পুরুষ-পুরুষের উপর নির্ভরশীল নয়। ইমাম বুখারীর "আদাব আল মুফরাদ", ৫৩৮ নম্বর গ্রন্থে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

২৫ নম্বর সূরা আল ফুরকানের ৬৩ নম্বর আয়াতে দেখানো হয়েছে যে, নম্রতা হলো একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য যা বাইরের দিকে প্রকাশিত হয়, যেমন একজন ব্যক্তি কীভাবে হাঁটেন। ৩১ নম্বর সূরা লুকমানের ১৮ নম্বর আয়াতে এটি আলোচনা করা হয়েছে:

"আর মানুষের প্রতি তোমার গাল [অপমানে] ঘুরিয়ে দিও না এবং পৃথিবীতে উল্লাস করে চলাফেরা করো না..."

মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, জান্নাত সেই বিনয়ী বান্দাদের জন্য যাদের মধ্যে অহংকার নেই। সূরা ২৮, আল-কাসাস, আয়াত ৮৩:

"যারা পৃথিবীতে মর্যাদা বা দুর্নীতি চায় না, তাদের জন্যই আমরা পরকালের সেই ঘর নির্ধারণ করি। আর [সর্বোত্তম] পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ১৯৯৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যার অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালারই গর্ব করার অধিকার রয়েছে কারণ তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং মালিক।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, অহংকার হলো যখন কেউ নিজেকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং যখন সত্য তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন তা প্রত্যাখ্যান করে কারণ তারা তাদের ব্যতীত অন্যদের কাছ থেকে আসা সত্য গ্রহণ করতে অপছন্দ করে। সুনানে আবু দাউদের ৪০৯২ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

জিনিস সহজ করুন

মুসলমানদের দ্বারা মক্কা বিজয়ের পর, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে মহানবী (সাঃ) এর কাছে নিয়ে যান, যাতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন। যখন মহানবী (সাঃ) তাদের আসতে দেখেন, তখন তিনি মন্তব্য করেন যে, তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে বাড়িতে রেখে তিনি নিজেই তাঁর সাথে দেখা করতে যেতেন, তাহলেই ভালো হত। আবু বকর (রাঃ) উত্তর দেন যে, তাঁর পিতার জন্য মহানবী (সাঃ) এর কাছে আসা অন্যথার চেয়ে বেশি উপযুক্ত ছিল। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ) এর জীবনী", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৯৮-৩৯৯-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও আবু বকর (রাঃ) সত্য কথা বলেছিলেন, তবুও মহানবী (সাঃ) অন্যদের জন্য সহজ করে দেওয়ার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা প্রায়শই মুসলমানরা উপেক্ষা করে।

দুঃখের বিষয় হল, কিছু মুসলিম সর্বদা তাদের পূর্ণ অধিকার এবং আরও অনেক কিছু অন্যদের কাছ থেকে আদায় করার চেষ্টা করে। অজ্ঞতার কারণে বর্তমান যুগে মানুষের, যেমন পিতামাতার অধিকার পূরণ করা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। যদিও একজন মুসলিমের কাছে তা পূরণ করার চেষ্টা করা ছাড়া আর কোন অজুহাত নেই, তবুও মুসলমানদের একে অপরের প্রতি দয়ালু হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। সহিহ বুখারির ৬৬৫৫ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপদেশ অনুসারে, যারা অন্যদের প্রতি দয়ালু, আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন।

এই করুণার একটি দিক হলো, একজন মুসলিম যেন অন্যদের কাছ থেকে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি না করে। বরং, তাদের উচিত নিজেদের সাহায্য করার জন্য এবং অন্যদের জন্য কাজ সহজ করার জন্য তাদের শারীরিক বা আর্থিক শক্তির মতো উপায় ব্যবহার করা। কিছু ক্ষেত্রে, যখন একজন মুসলিম অন্যদের কাছ থেকে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে এবং তারা তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তখন তাদের শাস্তির সম্মুখীন হতে হতে পারে। তাই অন্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের জন্য তাদের কেবল কিছু ক্ষেত্রেই তাদের অধিকার দাবি করা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলিমের অন্যদের অধিকার পূরণের চেষ্টা করা উচিত নয় বরং এর অর্থ হল তাদের উচিত যাদের উপর তাদের অধিকার আছে তাদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করার চেষ্টা করা। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতা তাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে একটি নির্দিষ্ট ঘরের কাজ থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন এবং যদি তাদের সামর্থ্য থাকে তবে তারা নিজেই তা করতে পারেন, বিশেষ করে যদি তাদের সন্তান কাজ থেকে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। এই নম্রতা এবং করুণা কেবল মহান আল্লাহকে তাদের প্রতি আরও দয়ালু করে তুলবে না বরং এটি তাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাও বৃদ্ধি করবে। যে ব্যক্তি সর্বদা তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে সে পাপী নয়, তবে যদি তারা এইভাবে আচরণ করে তবে তারা এই পুরস্কার এবং ফলাফল হারাবে।

মুসলমানদের উচিত অন্যদের জন্য সহজ করে দেওয়া এবং আশা করা উচিত যে মহান আল্লাহ তাদের জন্য এই দুনিয়া ও আখেরাতে সহজ করে দেবেন।

বিচারের মুখোমুখি

যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কার অমুসলিমদের জন্য আশ্রয় প্রদান করেছিলেন, তবুও তারা ছিল ব্যতিক্রম যাদের খুঁজে পেলে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হত। এই ব্যক্তিদের নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি কারণ তাদের অপরাধ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ, যেমন বিশ্বাসঘাতকতা, যা আজকের যুগেও মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। উদাহরণস্বরূপ, কয়েক বছর আগে, মিকিয়াস বিন সুবাবা ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় এসেছিলেন। তিনি তার মুসলিম ভাই হিশাম বিন সুবাবা (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ চেয়েছিলেন, যিনি যুদ্ধের সময় এক মুসলিম কর্তৃক দুর্ঘটনাক্রমে নিহত হয়েছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছ থেকে এই অর্থ পাওয়ার পর, তিনি সেই মুসলিম সৈনিককে হত্যা করেছিলেন যে দুর্ঘটনাক্রমে তার ভাইকে হত্যা করেছিল। এরপর মিকিয়াস মক্কায় পালিয়ে যান যেখানে তিনি ধর্মত্যাগ করেন। মক্কা বিজয়ের সময় নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দ্বারা মিকিয়াসকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল কারণ তিনি দুটি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিলেন, যার উভয়ের জন্যই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল। প্রথমটি ছিল আর্থিক ক্ষতিপূরণ নেওয়ার পরে মুসলিম সৈনিককে হত্যা করা এবং অন্যটি ছিল ইসলাম গ্রহণের পরে ধর্মত্যাগ করার জন্য। তাকে মক্কায় পাওয়া যায় এবং হত্যা করা হয়। তার সম্পর্কে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা নিসার ৪র্থ আয়াত, ৯৩ নাযিল করেন:

"কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, যেখানে সে চিরকাল থাকবে, এবং আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং তার জন্য মহা শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।"

আব্দুল উজা বিন খাতাল নামে আরেকজন ব্যক্তি প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং যখন তাকে একটি গ্রাম থেকে ফরজ সদকা আদায়ের জন্য পাঠানো হয়, তখন তাদের মধ্যে বিরোধের পর তিনি একজন মুসলিমকে হত্যা করেন। এরপর তিনি ধর্মত্যাগ করে অমুসলিমদের কাছে পালিয়ে যান এবং এমনকি মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সম্পর্কে অবমাননাকর কবিতা রচনা করার জন্য দুজন মহিলা গায়িকাকেও নিয়োগ করেন।

এছাড়াও, যখন মুসলিম সেনাবাহিনী মক্কায় প্রবেশ করে, তখন ইসলাম ত্যাগের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি, আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ, একজন সাহাবী, উসমান বিন আফফান, আল্লাহ তা'আলার কাছে পালিয়ে যান এবং তাঁর কাছে নিরাপত্তা ভিক্ষা করেন। তিনি সেই ব্যক্তিকে মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে নিয়ে যান এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রার্থনা করেন। যদিও তার অপরাধ গুরুতর ছিল, তবুও মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-তাকে ক্ষমা করে দেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২১২-২১৩ এবং ৪০২, ইমাম সাফি উর রহমানের, দ্য সিলড নেকটার, পৃষ্ঠা ৩৯৬-৩৯৭ এবং ইমাম ওয়াহিদীর, আসবাব আল নুযুল, ৪:৯৩, পৃষ্ঠা ৫৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৭৮-১৭৯:

" *...তোমাদের জন্য নিহতদের জন্য আইনগত প্রতিশোধ নির্ধারিত করা হয়েছে - স্বাধীনের জন্য স্বাধীন, দাসের জন্য দাস এবং নারীর জন্য নারী। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ভাই [হত্যাকারী] এর কাছ থেকে কিছু উপেক্ষা করে, তার জন্য উপযুক্ত অনুসরণ এবং তাকে [মৃতের উত্তরাধিকারী বা আইনগত প্রতিনিধি] সৎ আচরণের সাথে প্রদান করা উচিত। এটি তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি লাঘব এবং করুণা। কিন্তু*

যে এর পরে সীমালঙ্ঘন করে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এবং হে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ, তোমাদের জন্য আইনগত প্রতিশোধ [জীবন রক্ষা] রয়েছে..."

আইনি শাস্তির মধ্যে জীবন আছে, কারণ অনেক খুনি মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে কম শাস্তি দিয়ে এই আচরণ থেকে বিরত থাকে না। এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যেখানে একজন খুনি তার অপরাধের জন্য কয়েক বছর জেল খাটলেও মুক্তি পাওয়ার পর আবার খুন করে। তাই একজন ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ফলে অন্যদের জীবন রক্ষা পায়।

উপরন্তু, যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এই আইনি শাস্তি ভুক্তভোগীর আত্মীয়দের মানসিক অবস্থাকেও সাহায্য করে কারণ হত্যাকাণ্ডের ফলে তাদের অপরাধের মূল্য তাদের জীবন দিয়ে পরিশোধ করা হয়েছে তা জানা ভুক্তভোগীর আত্মীয়দের তাদের জীবন চালিয়ে যেতে সাহায্য করার একটি উপায়। কিন্তু যখন খুনিকে কেবল কারাগারে পাঠানো হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে অবশেষে মুক্তি দেওয়া হয়, তখন খুনির হাতে তাদের প্রিয়জন যে আঘাত ভোগ করেছেন তা মনে করার যন্ত্রণা ভুক্তভোগীর আত্মীয়দের তাদের জীবন চালিয়ে যেতে এবং শান্তিতে বসবাস করতে বাধা দিতে পারে। এই মানসিক নির্যাতন রোধ করা তাদের জীবনকে বাঁচাচ্ছে। একইভাবে, যখন সরকার কোনও অপরাধীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, তখন ভুক্তভোগীর আত্মীয়রা প্রায়শই মনে করে যে ন্যায়বিচার পাওয়া যায়নি। এটি একটি কারণ যার কারণে, ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে, ভুক্তভোগীর আত্মীয়দের হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া বা আর্থিক ক্ষতিপূরণ সহ বা ছাড়াই ক্ষমা করার বিকল্প দেওয়া হয়। যখন সিদ্ধান্তটি ভুক্তভোগীর আত্মীয়দের কাছে হস্তান্তর করা হয় তখন সরকার ফলাফল নির্ধারণ করলে যে মানসিক চাপ তৈরি হত তার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। এটি আবারও ভুক্তভোগীর আত্মীয়স্বজনদের তাদের জীবনযাপন চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়, বরং তারা ক্ষোভে ভরা জীবনযাপন করে, যা বাস্তবে মোটেও বেঁচে থাকার মতো নয়। এই ক্ষোভ এতটাই শক্তিশালী হতে পারে যে এটি ভুক্তভোগীর পরিবারের মধ্যেও

দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, যখন সদস্যদের তাদের জীবন কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতামত থাকে। এর ফলে সর্বদা পরিবার ভেঙে যায়, যেমন মৃত ব্যক্তির বাবা-মায়ের বিবাহবিচ্ছেদ। তাই পরিবারকে খুনির সাথে কী ঘটবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া, ভুক্তভোগীর পরিবারের ধ্বংস রোধ করে, যারা খুনির পরিণতি তাদের উপর ছেড়ে দিলে তাদের জীবনযাপন করার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে আইনি প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধ করে জীবন বাঁচানো হয়, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলতে পারে। অতএব, একজন খুনির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা অনেক হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধ করে। এছাড়াও, যখন একজন ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিকে প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ডের কারণে হত্যা করা হয়, তখন এটি তাদের উপর নির্ভরশীলদের, যেমন তাদের সন্তানদের জীবন ধ্বংস করে দেয়। এটি প্রতিরোধ করা যেতে পারে যখন হত্যাকারীর কী ঘটবে তা বেছে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়, কারণ এটি প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড এবং নিহত বা আহত সকলের উপর নির্ভরশীলদের ধ্বংসকে প্রতিরোধ করে। অতএব, আইনি প্রতিশোধ এই সমস্ত মানুষের জীবন বাঁচায়।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, আইনি মামলায় ইসলামী আইন সঠিকভাবে অনুসরণ এবং প্রয়োগ করা হলে এই সবই সত্য। কাউকে হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করার জন্য প্রকৃত এবং শক্তিশালী প্রমাণের প্রয়োজন হয়, যা অবশ্যই সকল যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে। ইসলামে, মামলার মধ্যে যেকোনো সন্দেহের জন্য মৃত্যুদণ্ডের মতো সম্পূর্ণ আইনি শাস্তি মওকুফ করা হয়। এছাড়াও, আজকের যুগে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া সহজ যেখানে সিসিটিভি ফুটেজ, ডিএনএ পরীক্ষা এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে যা অপরাধীদের সঠিকভাবে অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। এই সমস্ত কিছু একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। এমনকি যদি অ-ইসলামিক দেশগুলি

শুধুমাত্র এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই আইনি শাস্তি সঠিকভাবে প্রয়োগ করে তবে তা অপরাধ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে। এই ক্ষেত্রে, একজন নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার ভয়ে মৃত্যুদণ্ড এড়ানোর অজুহাত প্রযোজ্য হয় না কারণ সঠিক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

শাস্তির ব্যাপক সুবিধা বুঝতে পারবে যারা তাদের চিন্তাভাবনা সঠিকভাবে প্রয়োগ করে। উদাহরণস্বরূপ, যার বোধগম্যতার অভাব আছে সে তার জীবন বাঁচানোর জন্য শরীরের একটি অংশ কেটে ফেলতে অস্বীকার করবে, কারণ তারা এই বিবৃতির শুধুমাত্র একটি দিকের উপর মনোযোগ দেয়, অর্থাৎ, শরীরের একটি অংশ কেটে ফেলা। তারা বৃহত্তর চিত্রের অর্থ, তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য চিন্তা করে না এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য শরীরের একটি অংশ কেটে ফেলতে অস্বীকার করে। অন্যদিকে, যারা স্পষ্টভাবে চিন্তা করে তারা একমত হবে যে শরীরের একটি অংশ কেটে ফেলা খুবই গুরুতর কিন্তু এটি ত্যাগ করলে আরও খারাপ কিছু ঘটবে, যেমন মৃত্যু। তাই তারা বৃহত্তর চিত্রের উপর চিন্তা করে এবং তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য শরীরের একটি অংশ কেটে ফেলার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়। এটি আলোচ্য আয়াতগুলিতেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। সমাজের কোনও সদস্যকে হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা কঠোর শোনায়, কিন্তু যদি এর ফলে সমাজের বাকি অংশ, যার মধ্যে ভিকটিমের আত্মীয়স্বজনও অন্তর্ভুক্ত, অনেক সুবিধা পায়, তাহলে এটি করাই সঠিক কাজ, কারণ সরকারকে অবশ্যই বৃহত্তর চিত্রের অর্থ বিবেচনা করতে হবে, দোষী সাব্যস্ত খুনির জীবনের উপর সমগ্র সমাজের কল্যাণ, যিনি মানুষের মতো আচরণ বন্ধ করার পর তাদের মানবাধিকার ত্যাগ করেছেন, অথবা খুব বিরল ক্ষেত্রে, ভুলভাবে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির একক জীবন।

সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৭৯:

" আর তোমাদের জন্য আইনগত প্রতিশোধের মধ্যে রয়েছে [জীবন রক্ষার] ব্যবস্থা, হে জ্ঞানী ব্যক্তিরা, যাতে তোমরা ধার্মিক হতে পারো।"

এই আয়াতের শেষ অংশে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে আইনি প্রতিশোধও সাধারণ জনগণের জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। যখন তারা খুনিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে দেখে, তখন যারা কাউকে ক্ষতি করতে বা হত্যা করতে চায় তারা নিজের জীবন হারানোর ভয়ে হাত বন্ধ করে রাখতে পারবে না, যার ফলে তারা নিজের এবং অন্যদের জীবন দিতে পারবে। এটি সকল ধরণের অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। ধর্ষণের মতো অপরাধের শাস্তি যদি আরও গুরুতর হত, তাহলে এটি অনেক সম্ভাব্য অপরাধীকে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখত। সমাজের মধ্যে অপরাধের হার না কমার অন্যতম প্রধান কারণ হল নরম আইন থাকা।

আইনি শাস্তির একটি দিক হল খুনিকে ক্ষমা করা। এই দয়ার কাজ খুনিকে তার অপরাধমূলক জীবন থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করতে পারে, যা তাদের নিজের জীবন এবং অন্যদের রক্ষার দিকে পরিচালিত করে যাদের তারা তাদের মন্দ পথে চলতে থাকলে ক্ষতি করত। এছাড়াও, এটি অন্যান্য সম্ভাব্য ভুক্তভোগী এবং তাদের আত্মীয়দের তাদের অত্যাচারীদের ক্ষমা করতে উৎসাহিত করতে পারে, যা আবার অনেক জীবন রক্ষা করে এবং সমাজে শান্তি ও করুণা ছড়িয়ে দেয়।

ক্ষমা করা এবং এগিয়ে যাওয়া

মক্কা মুসলিমদের দ্বারা বিজিত হওয়ার পর, ইসলামের একজন কট্টর শত্রু, যে প্রথম দিন থেকেই মহানবী (সাঃ) এর ক্ষতি করার জন্য প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করেছিল, ইকরিমা বিন আবু জাহল মক্কা থেকে পালিয়ে যায়। তার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মহানবী (সাঃ) এর কাছ থেকে তার সুরক্ষার জন্য অনুরোধ করেন, যা তিনি মঞ্জুর করেন। তিনি ইকরিমাকে খুঁজে পান এবং তাকে ঘটনাটি জানান। যদিও তার বিশ্বাস করা কঠিন ছিল, তবুও তিনি মহানবী (সাঃ) এর কাছে ফিরে আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী (সাঃ) তার প্রতি তার অতীত আচরণ উপেক্ষা করেন এবং ক্ষমা করে দেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 403-404-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সকল মুসলিম আশা করে যে বিচারের দিনে আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপকে দূরে রাখবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, এই একই মুসলিমদের বেশিরভাগই যারা এই আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থাৎ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আঁকড়ে ধরে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলিকে বোঝাচ্ছে না যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তোলে এমন একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে ভুক্তভোগীকে প্রভাবিত করবে। এই ধরণের ভুলকে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা বোধগম্যভাবে কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলিম প্রায়শই অন্যদের ভুলগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকে যা ভবিষ্যতে কোনওভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি অদৃশ্য হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা সুযোগ পেলেই তা পুনরুজ্জীবিত করার এবং অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা ধারণ করা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে মানুষ

ফেরেশতা নয়। অন্তত একজন মুসলিম যিনি আশা করেন যে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুলগুলিকে উপেক্ষা করবেন, তার উচিত অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকৃতি জানায় তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্কই ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সর্বদা একটি মতবিরোধে লিপ্ত থাকবে যা প্রতিটি সম্পর্কের ক্ষেত্রেই ভুলের দিকে পরিচালিত করতে পারে। অতএব, যারা এইভাবে আচরণ করে তারা একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা অদ্ভুত যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে কিন্তু এমন মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ জীবিত থাকাকালীন এবং তাদের মৃত্যুর পরে ভালোবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাবের ফলে একেবারে বিপরীত ঘটে। তারা জীবিত থাকাকালীন মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়ে এবং যখন তারা মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ এবং ভালোবাসার সাথে স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের স্মরণ করে তবে এটি কেবল অভ্যাসের বাইরে।

অতীতকে ভুলে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে অন্যদের প্রতি অতিরিক্ত ভালো ব্যবহার করা উচিত, তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে একজন ব্যক্তি সর্বনিম্ন যা করতে পারে তা হল শ্রদ্ধাশীল হওয়া। এর জন্য কোনও মূল্য দিতে হয় না এবং খুব কম প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। অতএব, একজনের উচিত মানুষের অতীতের ভুলগুলিকে উপেক্ষা করা এবং ভুলে যাওয়া শেখা, সম্ভবত, মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলি উপেক্ষা করবেন। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ২২:

"... এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

পরিশেষে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন ব্যক্তির উচিত ভবিষ্যতে অন্যদের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া যাতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয় এবং তারপর তার উচিত যে তার উপর অন্যায় করেছে তাকে ক্ষমা করার চেষ্টা করা। অন্যের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ না নেওয়ার মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করা ধৈর্য বা ক্ষমার সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না এবং তাই ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাফল্য

মক্কা বিজয়ের দিন, আল্লাহর ঘর, মহিমান্বিত কাবা ঘরের চারপাশে ৩৬০টি পূজার মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর লাঠি দিয়ে প্রতিটি মূর্তিকে আঘাত করে ঘোষণা করেছিলেন যে সত্য এসেছে এবং মিথ্যা চলে গেছে। সত্য এসেছে এবং মিথ্যা শক্তিহীন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪০৮-৪০৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখলে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে যে, যারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা, যার মধ্যে অন্যায়কারী মানুষের সাথে জড়িত, অব্যাহত রেখেছিল, তারা অবশেষে কোন না কোনভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে, যারা ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিক আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে তাঁর আনুগত্যের উপর অটল ছিল, তারা অবশেষে মানসিক শান্তি, স্বস্তি এবং সাফল্য লাভ করেছিল। ৪৭ সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ১০:

"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি যে তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি কেমন হয়েছিল? আল্লাহ তাদের উপর থেকে [সবকিছু] ধ্বংস করে দিয়েছেন..."

এই দুটি ফলাফল উপলব্ধি করার জন্য মুসলিম হওয়ার প্রয়োজন নেই, তাদের কেবল ইতিহাস অধ্যয়ন করতে হবে। অতএব, তাদের কোন ফলাফলটি কামনা করা উচিত তা নির্ধারণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

ইসলাম হলো ভদ্রতা

মক্কা বিজয়ের দিন, আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে এসেছিলেন, কাবার চাবি নিয়ে, যিনি পূর্বে চাবির দায়িত্বে ছিলেন অমুসলিম উসমান বিন তালহার কাছ থেকে। আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) কাবার তাবৎ তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার জন্য চাবিগুলো নিজের কাছে রাখার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উসমান বিন তালহাকে ডেকে চাবিগুলো ফেরত দেন এবং বলেন যে এই দিনটি তাকওয়া ও সৎ বিশ্বাসের দিন। ইমাম ইবনে কাথিরের "নবীজীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪০৮-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৪:৫৮, পৃষ্ঠা ৫৪ অনুসারে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উসমানকে চাবি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কারণ মহান আল্লাহ, ৪র্থ সূরা আন নিসার ৫৮ নম্বর আয়াত নাযিল করেছিলেন:

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাদেরকে আমানতসমূহ তাদের ন্যায্য মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন; আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করবে। তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কতই না মহান আদেশ! নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

এর জবাবে, উসমান ইসলাম গ্রহণ করেন, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন।

জামে আত তিরমিযী, ২৭০১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে কোমলতা পছন্দ করেন।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা সকল মুসলমানের গ্রহণ করা উচিত। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা উচিত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, নম্রতা অন্য যে কারো চেয়ে মুসলমানদের জন্য বেশি উপকারী। একজন ভদ্র ব্যক্তি যখন কথা ও কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম রাখেন, তখন তারা কেবল মহান আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও প্রতিদানই পাবেন না এবং তাদের পাপের পরিমাণও কমিয়ে আনবেন না, কারণ একজন ভদ্র ব্যক্তি তার কথা ও কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম রাখেন, বরং এটি তাদের পার্থিব জীবনেও উপকৃত করবে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে কোমল আচরণ করে, সে তার স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণের চেয়ে বিনিময়ে বেশি ভালোবাসা এবং সম্মান পাবে। যখন তাদের সাথে কোমল আচরণ করা হয়, তখন সন্তানরা তাদের পিতামাতার বাধ্য হওয়ার এবং সম্মানের সাথে আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা তাদের সাথে কোমল আচরণকারীকে সাহায্য করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এর উদাহরণ অন্তহীন। খুব বিরল ক্ষেত্রেই কঠোর মনোভাব প্রয়োজন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, কঠোর মনোভাবের চেয়ে কোমল আচরণ অনেক বেশি কার্যকর হবে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অসংখ্য ভালো গুণাবলীর অধিকারী, তবুও মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর কোমলতা বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন, কারণ এটি অন্যদের ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯:

"অতএব আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের প্রতি কোমল ছিলে। আর যদি তুমি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতে, তাহলে তারা তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

একজন মুসলিমকে মনে রাখতে হবে যে তারা কখনই একজন নবীর চেয়ে ভালো হতে পারবে না, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, এবং যার সাথে তারা যোগাযোগ করবে সে ফেরাউনের চেয়ে খারাপও হতে পারবে না, তবুও, আল্লাহ, মহান নবী মুসা এবং নবী হারুন, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, ফেরাউনের সাথে সদয় আচরণ করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ৪৪:

"আর তার সাথে নম্রভাবে কথা বলো, হয়তো সে স্মরণ করবে অথবা [আল্লাহকে] ভয় করবে।"

কঠোরতা কেবল মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং অন্যদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে এটি একটি কঠোর এবং অশোধিত ধর্ম। এইভাবে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা একটি গুরুতর অপরাধ যা সকল মুসলমানের এড়িয়ে চলা উচিত।

অতএব, একজন মুসলিমের সকল বিষয়ে কোমলতা অবলম্বন করা উচিত কারণ এটি প্রচুর সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদের, যেমন তার পরিবারকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে মূল হাদিসটি এই অর্থ বহন করে না যে অন্যরা যখন সীমা অতিক্রম করে তখন আত্মরক্ষা করা উচিত নয়, কারণ ইসলাম দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতা শেখায়। তবে এটি মুসলমানদেরকে সাধারণভাবে ভদ্রতাকে তাদের পথ হিসেবে গ্রহণ করতে শেখায়, অন্যদের সুযোগ না দিয়ে।

পরিশেষে, একজনকে সর্বদা একটি সহজ ইসলামী দর্শন মনে রাখতে হবে, যেভাবে অন্যদের সাথে আচরণ করা হয়, আল্লাহ তার সাথেও তেমনই আচরণ করবেন। যদি কেউ অন্যদের প্রতি তাদের কথাবার্তা এবং কাজে কঠোরতা প্রদর্শন করে, তাহলে মহান আল্লাহ তার সাথেও একই আচরণ করবেন। অন্যদিকে, যদি তারা অন্যদের সাথে নম্রতার সাথে আচরণ করে, অন্যদের জন্য জিনিসপত্র সহজ করে, ভালো কাজে সাহায্য করে এবং অন্যদের ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে, তাহলে মহান আল্লাহ তার সাথেও একই আচরণ করবেন।

উপরন্তু, আলোচ্য মূল ঘটনাটিও একজনের আমানত পূরণের গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজনকে অবশ্যই তাদের এবং আল্লাহ, মহিমান্বিত, এবং তাদের এবং অন্যান্য মানুষের মধ্যে সেই আমানতগুলি পূরণ করতে হবে। আল্লাহ, মহিমান্বিত, একজন ব্যক্তিকে যে প্রতিটি আমানত দিয়েছেন তা হল একটি আমানত যা সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত এই আমানতগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। উপরন্তু, মানুষের মধ্যে আমানত উভয়ের মধ্যে সম্মত শর্ত অনুসারে পূরণ করতে হবে। এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন কেউ অন্যদের সাথে এমন আচরণ করে যা তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়। যেহেতু ইসলাম একটি সম্পূর্ণ আচরণবিধি, তাই যে আমানতগুলি পূরণ করতে হবে তার মধ্যে ধর্মীয় আমানত, যেমন তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদ, এবং পার্থিব আমানত, যেমন ব্যবসায়িক চুক্তি। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 34:

"...এবং [প্রত্যেক] অঙ্গীকার পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সর্বদা [যার বিষয়ে] জিজ্ঞাসা করা হবে।"

ইসলামী শিক্ষা মেনে চলুন

মক্কা বিজয়ের দিন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর ঘর কাবায় প্রবেশ করেন এবং ফেরেশতা ও মানুষের শারীরিক প্রতিকৃতি প্রত্যক্ষ করেন। তিনি দেখেন যে, নবী ইব্রাহিম (আঃ)-কে একটি ভাগ্য-নির্ধারক তীর ধরে টানা হয়েছে, যা বহুঈশ্বরবাদের সাথে সম্পর্কিত। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) রাগান্বিত হন এবং ঘোষণা করেন যে, নবী ইব্রাহিম (আঃ)-এর এসব বিষয়ের সাথে কোন সম্পর্ক নেই এবং তিনি খ্রিস্টানও নন, ইহুদিও নন। তিনি আরও বলেন যে, তিনি একজন খাঁটি মুসলিম এবং মুশরিকও নন। এরপর নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এই শারীরিক প্রতিকৃতি ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪০৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামী বিশ্বাস কলুষিত হওয়ার একটি প্রধান কারণ হল যখন মুসলমানরা বিদেশী জাতির রীতিনীতি এবং ঐতিহ্য গ্রহণ করে, তাদের এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে স্পষ্টভাবে পার্থক্য না করে। মুসলমানদের অমুসলিমদের প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ করা এবং গ্রহণ করা উচিত নয়। মুসলমানরা যত বেশি এটি করবে, ততই তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসরণ করবে। বর্তমান যুগে এটি বেশ স্পষ্ট কারণ অনেক মুসলিম অন্যান্য জাতির সাংস্কৃতিক রীতিনীতি গ্রহণ করেছে যার ফলে তারা ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক মুসলিম বিবাহ অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন যাতে দেখা যায় যে মুসলমানরা কত অমুসলিম সাংস্কৃতিক রীতিনীতি গ্রহণ করেছে। এর চেয়েও খারাপ বিষয় হল যে অনেক মুসলিম পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে ইসলামী রীতিনীতি এবং অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক রীতিনীতির মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। এই কারণে অমুসলিমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না যা ইসলামের জন্য বড় সমস্যা তৈরি করেছে। উদাহরণস্বরূপ, সম্মান রক্ষার্থে হত্যা একটি সাংস্কৃতিক প্রথা যার ইসলামের সাথে কোন সম্পর্ক নেই কারণ মুসলিমদের অজ্ঞতা এবং অমুসলিম সাংস্কৃতিক প্রথা গ্রহণের অভ্যাস রয়েছে। সমাজে যখনই

সম্মান রক্ষার্থে হত্যাকাণ্ড ঘটে তখনই ইসলামকে দোষারোপ করা হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য জাতিভেদ এবং ভ্রাতৃত্বের আকারে সামাজিক বাধা দূর করেছিলেন, কিন্তু অজ্ঞ মুসলমানরা অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক প্রথা গ্রহণ করে তাদের পুনরুজ্জীবিত করেছেন। সহজ কথায়, মুসলিমরা যত বেশি সাংস্কৃতিক প্রথা গ্রহণ করবে, তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্যের উপর তত কম আমল করবে।

প্রকৃত আভিজাত্য

মক্কা বিজয়ের দিন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, বংশগত সকল প্রকার পার্থিব আভিজাত্য এবং বংশগত অহংকার তার পায়ের তলায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। তিনি সূরা আল হুজুরাতের ১৩ নং আয়াতও পাঠ করেছিলেন:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪১১ এবং ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ৩৯৪-৩৯৫ -এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদের ৫১১৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, মর্যাদা কারো বংশের উপর নির্ভর করে না, কারণ সকল মানুষই হযরত আদম (আঃ)-এর বংশধর এবং তিনি মাটি দিয়ে তৈরি। তিনি উপসংহারে বলেছিলেন যে, মানুষের উচিত তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বংশ সম্পর্কে গর্ব করা ছেড়ে দেওয়া।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও কিছু অজ্ঞ মুসলিম জাতি ও সম্প্রদায় তৈরি করে অন্যান্য জাতির মনোভাব গ্রহণ করেছে, যার ফলে এই গোষ্ঠীর উপর ভিত্তি করে কিছু লোককে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করেছে, তবুও ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের

জন্য একটি সহজ মানদণ্ড ঘোষণা করেছে, তা হলো তাকওয়া। অর্থ, একজন মুসলিম যত বেশি আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে তাদের মর্যাদা তত বেশি হয়। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এই আয়াতটি অজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা তৈরি অন্যান্য সমস্ত মানদণ্ডকে ধ্বংস করে দেয়, যেমন কারো জাতি, জাতিগততা, সম্পদ, লিঙ্গ বা সামাজিক মর্যাদা।

অধিকন্তু, যদি কোন মুসলিম তার বংশের কোন ধার্মিক ব্যক্তির উপর গর্বিত হয়, তাহলে তাদের উচিত আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই বিশ্বাস সঠিকভাবে প্রদর্শন করা। অন্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে তাদের সম্পর্কে গর্ব করা এই দুনিয়া বা আখেরাতে কারোরই কোন উপকারে আসবে না। জামে আত তিরমিযী, ২৯৪৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি অন্যদের নিয়ে গর্ব করে কিন্তু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়, সে পরোক্ষভাবে তাদের অসম্মান করছে, কারণ বাইরের জগৎ তাদের খারাপ চরিত্র দেখবে এবং ধরে নেবে যে তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষও একইভাবে আচরণ করেছিলেন। অতএব, এই কারণেই এই লোকদের মহান আল্লাহর আনুগত্যে আরও বেশি প্রচেষ্টা করা উচিত। এরা সেই লোকদের মতো যারা মহানবী (সাঃ) এর বাহ্যিক ঐতিহ্য এবং উপদেশ গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি রাখা বা স্কার্ফ পরা,

কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ মহৎ চরিত্র গ্রহণ করে না। বাইরের জগৎ যখন এই মুসলমানদের খারাপ চরিত্র দেখবে, তখন তারা মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে কেবল নেতিবাচক চিন্তা করবে।

পরিশেষে, মানবজাতির উৎপত্তি স্মরণ করলে অহংকার থেকে বিরত থাকা যাবে, যার এক অণু পরিমাণও নরকে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহিহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অহংকার কেবল অন্যদের অবজ্ঞা করতে উৎসাহিত করে, যদিও তাদের কাছে থাকা সমস্ত ভালো জিনিসই মহান আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন এবং দান করেছেন। অহংকারও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করবে, যখন তা তাদের কাছ থেকে আসে না। অতএব, যেকোনো কিছুর প্রতি অহংকার, যেমন একজনের ধার্মিক পূর্বপুরুষ, যেকোনো মূল্যে এড়িয়ে চলতে হবে।

ইসলামে বর্ণবাদ নেই

মক্কা বিজয়ের দিন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিলাল বিন রাবাহ (রাঃ)-কে আল্লাহর ঘরের ছাদ থেকে আজান ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা তিনি ঘোষণা করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪১১-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, বিলাল (রাঃ) একজন ইথিওপীয় এবং প্রাক্তন দাস ছিলেন এবং তাই তৎকালীন সমাজে তাকে নীচু এবং তুচ্ছ মনে করা হত। মহানবী (সাঃ) সহজেই সেই সময়ের সমাজে সম্মানিত বিবেচিত কাউকে আজানের আদেশ দিতে পারতেন, তবুও তিনি বিশেষভাবে বিলাল (রাঃ) কে বেছে নিয়েছিলেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪৩ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক রূপ বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের অভ্যন্তরীণ নিয়ত এবং শারীরিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন।

প্রথমত, যে কোন কাজ করার সময় একজন মুসলিমের সর্বদা তাদের নিয়ত সংশোধন করা উচিত কারণ মহান আল্লাহ কেবল তখনই তাদের পুরষ্কৃত করবেন যখন তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎকর্ম করবে। যারা অন্য মানুষ এবং জিনিসের জন্য কাজ করবে, তাদেরকে বিচারের দিন তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার পেতে বলা হবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদিসটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। জাতিগত বা সম্পদের মতো পার্থিব বিষয়ের কারণে একজন ব্যক্তি অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। যদিও অনেক মুসলিম সামাজিক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মতো এই বাধাগুলি তৈরি করেছে, যার ফলে তারা বিশ্বাস করে যে কিছু লোক অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, ইসলাম স্পষ্টভাবে এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে, এই ক্ষেত্রে, ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। একমাত্র জিনিস যা একজন মুসলিমকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাদের ধার্মিকতা, তারা কতটা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

উপরন্তু, আলোচ্য মূল হাদিসটি এও নির্দেশ করে যে, নারীদের পুরুষদের তুলনায় পৃথিবীতে তাদের অবস্থান নিয়ে বিতর্ক এবং তর্ক-বিতর্ক করে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বরং, তাদের বুঝতে হবে যে শ্রেষ্ঠত্ব পুরুষদের অনুকরণ বা তাদের ছাড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে নিহিত নয়। এটি কেবল আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে নিহিত।

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর এবং মানুষের অধিকার পূরণে নিজেকে ব্যস্ত রাখা এবং এই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তাদের যা আছে বা যার মালিকানা আছে তা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা

করবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে মুসলিমের মধ্যে সৎকর্মের অভাব রয়েছে অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য নেই, তার বংশের কারণে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে না। বাস্তবে, এটি সম্পদ, জাতিগততা, লিঙ্গ বা সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং বর্ণের মতো সমস্ত পার্থিব জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পরিশেষে, ইসলাম যেমন মানুষকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে বিচার করে, তেমনি মানুষেরও উচিত। তাদের উচিত অন্যদেরকে তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করা বা পার্থিব মানদণ্ডের ভিত্তিতে অন্যদেরকে নিকৃষ্ট মনে করা নয়, কারণ এটি প্রায়শই অহংকার এবং অন্যদের অধিকার পূরণে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করে, যা উভয় জগতেই বিপর্যয়ের দিকে পরিচালিত করে।

একজন ব্যক্তির আসল মর্যাদা লুকানো থাকে, যেমন তার উদ্দেশ্য মানুষের কাছ থেকে লুকানো থাকে, এমনকি যদি তারা তাদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে পারে। অতএব, অন্যদের অবজ্ঞা করা বোকামি, কারণ তারা তাদের চেয়ে উচ্চতর হতে পারে।

অধিকন্তু, যেহেতু একজনের নিয়ত অন্যদের থেকে গোপন থাকে, তাই বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে তারা অন্যদেরকে অন্যদের চেয়ে ভালো বলে বিচার করতে পারে না এবং তাই অন্যদের বা নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে দাবি করা থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ একমাত্র আল্লাহই সকল মানুষের নিয়ত, কথা এবং কর্ম সম্পর্কে জানেন। ৫৩ সূরা আন নাজম, আয়াত ৩২:

"...তাই তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবি করো না; তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কে তাঁকে ভয় করে।"

ক্ষমাশীলতা উন্নতির দিকে নিয়ে যায়

মক্কা বিজয়ের দিন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কাবার দরজায় দাঁড়িয়ে মক্কার অমুসলিম নেতাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তারা তাঁর কাছ থেকে কী আশা করে। তারা উত্তর দিয়েছিলেন যে তারা তাঁর কাছ থেকে ভালো আচরণ আশা করেন কারণ তিনি তাদের সম্মানিত ভাই এবং একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করেছিলেন যে তারা অক্ষত অবস্থায় চলে যেতে পারেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীজীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪০৭-৪০৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি ১২ নম্বর অধ্যায় ইউসুফের ৯২ নম্বর আয়াতের সাথে সম্পর্কিত:

"তিনি বললেন, "আজ তোমাদের উপর কোন দোষ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন; এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু।"

এই আয়াতে একটি অবিশ্বাস্যরকম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা গ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করে মানুষের কাছ থেকে আসা অসুবিধার সম্মুখীন হলে ধৈর্যশীল হওয়া। কখনোই মন্দের উত্তর মন্দ দিয়ে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি একজন সফল মুসলিমের আচরণের পরিপন্থী। সূরা ফুসসিলাত, আয়াত 34:

"আর ভালো কাজ ও মন্দ সমান নয়। [মন্দ কাজ] প্রতিহত করো সেই [কাজ] দ্বারা যা উত্তম; তাহলে যার সাথে তোমার শত্রুতা আছে সে [একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হয়ে যাবে।"

ভালোর জবাব ভালো দিয়ে দয়া করা বিশেষ কিছু নয়, কারণ পশুরাও দয়ার বিনিময়ে দয়া করে। বিশেষ করে যখন একজন ব্যক্তি প্রতিশোধ নেওয়ার অবস্থানে থাকে, ঠিক যেমনটি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম করেছিলেন, তখন মন্দের জবাবে ভালো দেখানো বিশেষ কিছু নয়। বাস্তবে, এই ইতিবাচক আচরণ নিজের জন্যই উপকারী কারণ যে ব্যক্তি অন্যদের ক্ষমা করতে শেখে এবং অন্যদের ক্ষমা করতে শেখে, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। ২৪ নুর, আয়াত ২২:

"...এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন..."

প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, ২০২৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিস অনুসারে এই মহান ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ক্ষমা করে, তাকে আল্লাহ সম্মানিত করবেন।

উপরন্তু, এই আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে, একজন ব্যক্তির এমন বিশ্বাস করা উচিত নয় যে সে যাদের ক্ষমা করেছে তাদের চেয়ে সে শ্রেষ্ঠ। বাস্তবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। যে ব্যক্তি এই ধরণের অহংকার গ্রহণ করে এবং তওবা না করে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, সুনান ইবনে মাজাহ, ৪১৭৪ নম্বরে বর্ণিত একটি হাদিস অনুসারে।

পরিশেষে, এই আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে, একজন ব্যক্তির কখনোই মহান আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিম আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং আরও ভালো হওয়ার চেষ্টা করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ক্ষমার আশা করা উচিত। কিন্তু একজন মুসলিমের পরিবর্তনের চেষ্টা না করে এবং মহান আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার আশা না করে পাপ করে যাওয়া উচিত নয় কারণ এটি আশা নয়, বরং কেবল ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা।

আন্তরিক তওবার মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা অনুভব করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং প্রয়োজনে মানুষের কাছ থেকে, একই বা অনুরূপ পাপে ফিরে না যাওয়ার আন্তরিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকারের ক্ষতিপূরণ দেওয়া।

নারীর অঙ্গীকার

মক্কা বিজয়ের পর এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রকাশ্যে অমুসলিমদের ক্ষমা করে দেওয়ার পর, তারা সকলেই ইসলামে প্রবেশ করে। এমনকি মহিলারাও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে ইসলামের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে এসেছিলেন। এই মহিলাদের মধ্যে একজন ছিলেন আবু সুফিয়ান বিন হারব (রাঃ)-এর স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা। হিন্দই ছিলেন উহুদের যুদ্ধের পর হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)-এর দেহ বিকৃত করেছিলেন এবং এমনকি তাঁর কলিজা চিবিয়েছিলেন। তিনি প্রথমে লজ্জা ও ভয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছ থেকে তার পরিচয় গোপন করেছিলেন। কিন্তু বাইয়াতের সময়, তিনি কিছু বিষয় স্পষ্ট করার জন্য কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং এমনকি যখন মহিলাদের ব্যভিচার বা ব্যভিচার না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তখন মন্তব্য করেছিলেন যে একজন স্বাধীন মহিলা কখনও এমন কাজ করবেন না। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে কথোপকথনের সময়, তিনি তাকে চিনতে পেরেছিলেন এবং তিনি তার অতীত কর্মের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তার বাইয়াত গ্রহণ করলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর (সা.) নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭১৪-১৭১৫-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলাম গ্রহণের আগে হিন্দ একজন মুশরিক ছিলেন, তবুও তিনি সাহসের সাথে মন্তব্য করেছিলেন যে কোনও স্বাধীন মহিলা কখনও ব্যভিচার বা ব্যভিচার করবেন না কারণ এটি কেবল নির্লজ্জ মহিলারা করে বলে মনে করা হত। আজকের যুগে যারা নিজেদেরকে অগ্রগামী চিন্তাবিদ বলে দাবি করে, তারা কীভাবে এর বিপরীত বিশ্বাস করে তা লজ্জাজনক।

এটি আল ফুরকানের ২৫ নম্বর সূরার ৬৮ নম্বর আয়াতের সাথে সম্পর্কিত:

"...এবং অবৈধ যৌন মিলন করো না। আর যে কেউ তা করবে তাকে শাস্তি পেতে হবে।"

মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দারা সকল প্রকার অবৈধ সম্পর্ক এড়িয়ে চলে। এই আয়াতে ব্যভিচারকে শিরক এবং একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যার পাশে রাখা হয়েছে, যা এর তীব্রতা নির্দেশ করে।

অবৈধ সম্পর্কের প্রলোভন এড়াতে মুসলমানদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। প্রথমত, তাদের দৃষ্টি নিচু করতে শেখা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে সর্বদা তাদের জুতার দিকে তাকানো উচিত, বরং এর অর্থ হল তাদের অপ্রয়োজনীয়ভাবে চারপাশে তাকানো এড়ানো উচিত, বিশেষ করে জনসাধারণের জায়গায়। তাদের অন্যদের দিকে তাকানো এড়ানো উচিত এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখা উচিত। ঠিক যেমন একজন মুসলিম তার বোন বা মেয়ের দিকে কেউ তাকিয়ে থাকুক তা পছন্দ করে না, তেমনি অন্যের বোন এবং মেয়েদের দিকেও তাকানো উচিত নয়। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ৩০:

"মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিশক্তি কিছুটা কমিয়ে রাখে এবং তাদের গোপনাঙ্গের হেফাজত করে। এটি তাদের জন্য অধিক পবিত্র..."

যখনই সম্ভব, একজন মুসলিমের উচিত বিপরীত লিঙ্গের সাথে একা সময় কাটানো এড়িয়ে চলা, যদি না তারা এমনভাবে সম্পর্কিত হয় যা বিবাহকে নিষিদ্ধ

করে। সহীহ বুখারী, ১৮৬২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এই পরামর্শ দিয়েছেন।

মুসলমানদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আচরণ শালীনভাবে করা উচিত। শালীন পোশাক অপরিচিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এড়ায় এবং শালীন আচরণ করা প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত রাখে যা বিপরীত লিঙ্গের সাথে অপ্রয়োজনীয়ভাবে কথা বলার মতো অবৈধ সম্পর্কের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

অবৈধ সম্পর্ক এড়িয়ে চলার আশীর্বাদ বোঝা হল এগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করার আরেকটি উপায়। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার জিহ্বা এবং সতীত্ব রক্ষাকারী ব্যক্তির জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। জামে আত তিরমিযী, ২৪০৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

অবৈধ সম্পর্কে জড়িত থাকার শাস্তির ভয় একজন মুসলিমকে এগুলো এড়িয়ে চলতে সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ব্যভিচার করছে তার ঈমান চলে যাবে। সুনান আবু দাউদের ৪৬৯০ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

বাস্তবে, ইসলামে বিবাহের বিধান অনুসারে একজন মুসলিমের অবৈধ সম্পর্কের প্রয়োজন নেই। যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে না তাদের ঘন ঘন রোজা রাখা উচিত কারণ এটি তাদের ইচ্ছা এবং কর্ম নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। সহিহ মুসলিমের ৩৩৯৮ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ বিবাহকে উৎসাহিত করেন এবং অবৈধ সম্পর্ক নিষিদ্ধ করেন। যখন কোন দম্পতি বিবাহিত দম্পতির মতো একে অপরের প্রতি সত্যিকার অর্থে নিবেদিতপ্রাণ না থাকে, তখন তাদের মুখোমুখি হওয়া যেকোনো বাস্তব সমস্যার কারণে দম্পতির জন্য আরও মানসিক চাপ তৈরি হয়, কারণ তারা একে অপরকে সঠিকভাবে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়। জীবনে একাধিক সম্পর্কের আগমন এবং বিচ্ছেদ নিঃসন্দেহে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে যারা তাদের সঙ্গীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায় তারা প্রায়শই কাউন্সেলিংয়ে পড়ে। তারা এই সম্পর্কগুলি এড়িয়ে চলা লোকদের তুলনায় বিষণ্নতার মতো মানসিক ব্যাধিতে বেশি ভোগেন। এছাড়াও, যারা সমাজে একাধিক সঙ্গী থাকার জন্য পরিচিত, তারা তাদের অধিকার পূরণের জন্য উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এর কারণ হল যার জীবনে একাধিক সঙ্গী আছে সে একটি শিথিল এবং অবাঞ্ছিত চরিত্র গ্রহণ করবে, যা বিবাহের মতো গুরুতর প্রতিশ্রুতি খুঁজছেন এমন লোকেরা অপছন্দ করবে। এটি কেবল একাধিক সঙ্গী থাকা ব্যক্তির জন্য মানসিক চাপ বাড়িয়ে তুলবে। নৈমিত্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, দম্পতি প্রায়শই একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের হয় না। অর্থাত্‌, দুজনের মধ্যে একজন সবসময় সম্পর্কটিকে আরও গুরুত্ব সহকারে নেয়, যেমন তাদের সঙ্গীর সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চাওয়া। অন্যদিকে, অন্যজন তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একই রকম অনুভব করে না। যখন এই মনোভাবের পার্থক্য অবশেষে সামনে আসে, তখন এটি প্রায়শই সেই ব্যক্তির জন্য দীর্ঘস্থায়ী মানসিক আঘাতের দিকে পরিচালিত করে যারা সম্পর্কটিকে আরও গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিল। অন্যদিকে, প্রথম ধাপ থেকেই বিবাহিত দম্পতি একে অপরের প্রতি তাদের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে থাকে। বিবাহিত দম্পতি প্রতিটি পরিস্থিতিতে একে অপরের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ থাকে, তারা পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হোক, যেমন সন্তান ধারণ। এই মনোভাব সাধারণ দম্পতিদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। অন্যের সাথে সম্পর্ক থাকা একজন ব্যক্তিকে বোকা বানায় যে তারা তাদের সঙ্গীকে সম্পূর্ণরূপে চেনে এবং তাই যদি তারা বিয়ে করে তবে তারা প্রায়শই বিয়ের পরে তাদের সঙ্গীর পরিবর্তনের অভিযোগ করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা পরিবর্তন করেনি। পরিবর্তিত জিনিসগুলি ছিল তাদের সম্পর্কের দায়িত্ব এবং চাপ। এই সমস্যাটি প্রায়শই সেই দম্পতিদের জন্য বিবাহের সমস্যার দিকে পরিচালিত করে যারা তাদের বিয়ের আগে সম্পর্কে ছিলেন। এমনকি যদি তারা বিয়ের আগে একসাথে

থাকেন, তবুও একই সমস্যা দেখা দেবে। উপরন্তু, এটি কোনও গোপন বিষয় নয় যে যখনই কেউ তাদের সঙ্গীর সাথে সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন এটি তাদের জীবনের অন্যান্য প্রতিটি দিককে কতটা তীব্রভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক তরুণ-তরুণী কেবল এই কারণেই পড়াশোনা ছেড়ে দেয় যে তারা তাদের প্রাক্তন সঙ্গীকে প্রতিদিন দেখতে পারে না। যেহেতু বিবাহ দুটি মানুষের মধ্যে একটি গভীর সংযোগ এবং প্রতিশ্রুতি, তাই সাধারণ দম্পতিদের বিচ্ছেদের মতো একই ছোটখাটো বিষয়ে তাদের বিচ্ছেদের সম্ভাবনা কম থাকে।

এছাড়াও, একজন ব্যক্তিকে অবৈধ সম্পর্কের বাহ্যিক রূপ দেখে বোকা বানানো উচিত নয় যে এতে দম্পতি বা বৃহত্তর সমাজের জন্য কোনও ক্ষতি নেই। যেহেতু মানুষের জ্ঞান সীমিত, তারা অত্যন্ত অদূরদর্শী এবং প্রায়শই তাদের আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই তারা ভুলভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থাকা ক্ষতিকারক নয়, অন্যদিকে তারা লুকানো বিষ দেখতে ব্যর্থ হয় যা তাদের এবং অন্যদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে থাকা একজন মুসলিম সময়ের সাথে সাথে কেবল আরও পদক্ষেপ নিতে এবং তাদের সঙ্গীর সাথে পাপ করতে উৎসাহিত হবে। যেহেতু আবেগ এবং অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন এবং যেহেতু এই পাপগুলি, যেমন ব্যভিচার, বেশিরভাগ সমাজে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, তাই একজন অবিবাহিত দম্পতি সহজেই এই পাপে পতিত হতে পারে। এর ফলে তাদের এবং সমাজের জন্য অসংখ্য অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি হয়, যেমন অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ এবং এমনকি ইসলামের অন্যান্য বড় পাপকে ছোট করা। উপরন্তু, কেউ যদি তাদের অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে অন্য কোনও বড় পাপ, যেমন ব্যভিচার, না করেও, তবে তাদের অনুভূতি তাদের স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে বাধা দেবে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের সঙ্গীকে বিয়ে করতে পারে, বুঝতে না পেরে যে তারা উপযুক্ত জীবনসঙ্গী নয়, এমনকি যদি তারা একজন ভালো সঙ্গী বলে মনে হয়। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এর কারণ হল বিবাহের চাপ এবং দায়িত্ব, যেমন স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানদের অধিকার পূরণ, দম্পতির মধ্যে সম্পর্ক পরিবর্তন করে, যার ফলে প্রায়শই বিবাহের সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই কারণেই বিবাহিত দম্পতিরা যারা বিয়ের আগে একসাথে ছিলেন তারা প্রায়শই একে অপরকে বিয়ের পরে তাদের আচরণ পরিবর্তনের জন্য দোষারোপ করেন। উপরন্তু, কেউ তাদের সঙ্গীর সাথে যতই সময় কাটান না কেন,

তারা কখনই তাদের চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন না যেমন একজন বিবাহিত দম্পতি একে অপরকে চেনে। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে লুকানো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি বিয়ের পরে প্রকাশিত হবে, যা কেবল আরও বিবাহ সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে। অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে থাকা ব্যক্তিদের দ্বারা প্রায়শই উপেক্ষা করা একটি সত্য হল যে একজন ব্যক্তি যিনি একজন ভালো সঙ্গী তৈরি করেন তিনি একজন ভালো স্বামী/স্ত্রী বা ভালো পিতা/মাতা হওয়ার নিশ্চয়তা পান না। এর কারণ হল একজন ভালো সঙ্গী তৈরির তুলনায় একজন ভালো স্বামী/স্ত্রী এবং অভিভাবক হওয়ার জন্য বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হয়। তাদের সঙ্গীর প্রতি তাদের অনুভূতির কারণে, একজন ব্যক্তি প্রায়শই একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে বিয়ে করার গুরুত্ব উপেক্ষা করবেন, কারণ তারাই একমাত্র ব্যক্তি যারা তাদের স্ত্রী/স্ত্রী এবং সন্তানদের অধিকার পূরণ করবেন এবং তাদের ক্ষতি এড়াবেন, এমনকি যখন তারা রাগান্বিত হন। অন্যদিকে, যে ব্যক্তির মধ্যে ধার্মিকতা নেই, সে তার স্ত্রী বা সন্তানদের অধিকার পূরণ করবে না এবং তাদের উপর অন্যায় করবে, বিশেষ করে যখন তারা রাগান্বিত থাকে। যার সঙ্গী আছে সে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপেক্ষা করবে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের সঙ্গীর প্রতি তাদের অনুভূতির কারণে তাদের সাথে বিবাহ করবে, যদিও তাদের ধার্মিকতা নেই। ভালোবাসার মতো আবেগ একজন ব্যক্তিকে তার প্রিয়জনের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অন্ধ এবং বধির করে তোলে। সুনান আবু দাউদের ৫১৩০ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এছাড়াও, সম্পর্ক থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে জন্ম নেওয়া যেকোনো শিশু তাদের সম্পর্কের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করবে, যার ফলে প্রায়শই তাদের বিচ্ছেদের দিকে পরিচালিত হবে, কারণ তারা সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব ভাগাভাগি করতে চায় না। এর ফলে শিশুটি এমন একটি ভাঙা ঘর তৈরি করে যেখানে তাদের বাবা-মা উভয়ের সমর্থন এবং তত্ত্বাবধান থাকে না, যা প্রায়শই সকলের জন্যই সমস্যার সৃষ্টি করে। এটা স্পষ্ট যে অপরাধ, গ্যাং এবং যৌন শিকারিদের দ্বারা লালিত-পালিত এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার শিশুদের বেশিরভাগই ভাঙা পরিবার থেকে আসে। যখন কেউ সন্তান কামনা করে তখন সঠিকভাবে সন্তান লালন-পালন করা অত্যন্ত কঠিন, তাহলে কি কেউ কল্পনা করতে পারে যে যখন বাবা-মা প্রথমে সন্তান নিতে চাননি তখন সঠিকভাবে সন্তান লালন-পালনের

মানসিক চাপ কতটা? এটি শিশুর লালন-পালনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং প্রায়শই আগে উল্লেখিত সমস্যার সৃষ্টি করে। এই চাপ প্রায়শই একক পিতা-মাতাকে লালন-পালন বা দত্তক নেওয়ার জন্য সন্তানকে ছেড়ে দিতে বাধ্য করে, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিশুর উপর ক্ষতিকর নেতিবাচক এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে, যার মধ্যে কিছু আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি শিশুর বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে তোলে।

অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে এই সমস্ত এবং আরও নেতিবাচক বিষয়গুলি আবেগপ্রবণ বা অজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, এমনকি যদি অবৈধ সম্পর্কগুলি ক্ষতিকারক বলে মনে হয়। অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া ঠিক এমন খাবার খাওয়ার মতো যা সুস্বাদু দেখায় যখন এটি আসলে বিষাক্ত। যেহেতু এই বিষটি লুকানো থাকে, তাই এই বিষ সম্পর্কে সচেতন এমন ব্যক্তির উপর নির্ভর করা উচিত এবং তাদের পরামর্শে বিশ্বাস করা উচিত যাতে সুস্বাদু খাবার খাওয়া এড়ানো যায়, এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। যেহেতু মহান আল্লাহ, একমাত্র, সবকিছু জানেন, বিশেষ করে, কিছু কর্ম এবং সম্পর্কের মধ্যে লুকানো বিষ, তাই তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত এবং তার উপর কাজ করা উচিত, এমনকি যদি এটি ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। এটি একজন জ্ঞানী রোগীর মতো যিনি তার ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত থাকে। একইভাবে এই জ্ঞানী রোগী ভাল মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, একইভাবে যিনি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন। কারণ একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ, মহান আল্লাহ। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, যদিও এত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তার জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার কারণে সকল ধরণের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসের মাধ্যমে মানবজাতিকে তা দান

করেছেন। এই সত্যটি তখনই স্পষ্ট হয় যখন কেউ দেখে যে ইসলামী শিক্ষার উপর যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে কাজ করে এবং যারা করে না।

মহান আল্লাহ তাআলা মূল সমস্যার অর্থ সমাধান করে, অবৈধ সম্পর্ক নিষিদ্ধ করে এবং বিবাহকে উৎসাহিত করে এই অসংখ্য শাখা-প্রশাখাগত সমস্যা দূর করেছেন, যার মাধ্যমে একটি দম্পতি আন্তরিকভাবে একে অপরের এবং তাদের সন্তানদের প্রতি নিজেদের নিবেদিত করে।

অনেক চিন্তাবিদ এসেছেন এবং চলে গেছেন যারা মানুষ এবং সমাজের মুখোমুখি সমস্যাগুলি সমাধান করেছেন কিন্তু যেহেতু এই সমাধানগুলি শাখা সমস্যাগুলিকে লক্ষ্য করে, তাই এই সমাধানগুলির সুবিধা ন্যূনতম। অন্যদিকে, মহান আল্লাহ, এই মূল সমস্যাগুলি সমাধানের পদ্ধতির মাধ্যমে, যা একজন ব্যক্তি এবং সমাজকে প্রভাবিত করে, সবকিছু স্পষ্ট করে দিয়েছেন যাতে মানুষ উভয় জগতেই সাফল্য অর্জন করতে পারে। সূরা 16 আন নাহল, আয়াত 89:

"...এবং আমরা আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি সবকিছুর স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশনা ও রহমতস্বরূপ..."

অধিকন্তু, আলোচিত মূল ঘটনাটি এও ইঙ্গিত দেয় যে, তাদের কর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যই অনুতাপ এবং সংস্কার উপলব্ধ। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির আন্তরিকভাবে অনুতাপ করে এবং মৃত্যুর আগে তাদের আচরণ সংশোধন করার চেষ্টা করে এই সুযোগটি কাজে লাগাতে হবে। চতুর্থ অধ্যায় আন নিসা, আয়াত ১৭-১৮:

“ আল্লাহর কাছে কেবল তাদের জন্যই তওবা কবুল হয় যারা অজ্ঞতাবশত পাপ করে এবং অচিরেই তওবা করে। আল্লাহ তাদেরই ক্ষমা করেন, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। কিন্তু তাদের জন্য তওবা কবুল হয় না যারা মন্দ কাজ করতে থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, "আমি এখন তওবা করেছি", অথবা তাদের জন্যও নয় যারা কাফের অবস্থায় মারা যায়। তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।”

আন্তরিক তওবার মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ অনুভব করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার উপর অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকার পূরণ করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

নবুওয়তের বন্ধুরা

মক্কা বিজয়ের পর, মদীনার সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, দুঃখের সাথে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কি মক্কায় থাকবেন নাকি তাদের সাথে মদিনায় ফিরে যাবেন। যখন মহানবী (সাঃ) কে এই খবর জানানো হয়েছিল, তখন তিনি তাদের বলেছিলেন যে তিনি যেখানে বাস করতেন সেখানেই থাকবেন এবং যেখানে মৃত্যুবরণ করবেন সেখানেই মৃত্যুবরণ করবেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪১৫-৪১৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটি ছিল মদীনার সাহাবীদের প্রতি মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মহৎ ভালোবাসার একটি নিদর্শন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। তাঁর আত্মীয়স্বজনরা যখন তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, তখন তারা তাঁকে সাহায্য ও সহায়তা করেছিল। তাঁর নিজের লোকেরা যখন তাঁকে নির্বাসিত করেছিল, তখন তারা তাঁকে তাদের শহরে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান করেছিল। মুসলমানদের অবশ্যই এই মহান সাহাবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাইলে, মহানবী (সাঃ) তাঁর প্রিয় বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

জামে আত তিরমিযীতে ২৩৪৭ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, তাঁর প্রকৃত বন্ধু হলেন সেই ব্যক্তি যার মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, তারা তাদের এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য যা প্রয়োজন তা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করে এবং অতিরিক্ত ব্যয়, অপচয়

এবং অপচয় এড়িয়ে চলে। এই মনোভাব তখনই গ্রহণ করা যেতে পারে যখন তারা তাদের প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে যা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে এই বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লিখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল, নামাজে তাদের ভালো অংশগ্রহণ রয়েছে। এর অর্থ হল তারা তাদের ফরজ নামাজ যথাযথভাবে পালন করে, যথা সময়মতো আদায় করা। এর মধ্যে রয়েছে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে নফল নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, যেমন রাতের নামাজ। সুনানে আন নাসায়ী, ১৬১৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, ফরজ নামাজের পরে এটিই সর্বোত্তম নামাজ। নামাজের ভালো অংশগ্রহণের মধ্যে রয়েছে সম্ভব হলে মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ আদায় করা। এটা দেখে দুঃখ হয় যে কত মুসলিম মসজিদের কাছাকাছি থাকেন কিন্তু কাজ থেকে অবসর থাকা সত্ত্বেও জামাতে যোগ দেন না।

আলোচ্য মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল, এই মুসলিম প্রকাশ্যে এবং গোপনে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করবে। গোপনে এটি করা একজন ব্যক্তির আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা নির্দেশ করে, অর্থাৎ, তারা কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই সৎকর্ম করে। এই ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে মনে রাখে যে তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের সত্তার অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক দিকগুলি আল্লাহ তাআলা সর্বদা পর্যবেক্ষণ করছেন। যদি কেউ এই বিশ্বাসে অটল থাকে তবে তারা ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রহণ করবে, যা সহিহ মুসলিমের ৯৯ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হল তারা এমনভাবে কাজ করে, যেমন নামায আদায় করা, যেন তারা আল্লাহ

তাআলাকে দেখতে পাচ্ছে, তাদের দেখছে। এই মনোভাব সৎকর্মকে উৎসাহিত করে এবং পাপ থেকে বিরত রাখে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল, তারা যেকোনো ধরণের খ্যাতি বা সামাজিক সম্মান অর্জন থেকে বিরত থাকে। জামে আত তিরমিযী, ২৩৭৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই আকাঙ্ক্ষা একজন মুসলিমের ঈমানের জন্য দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে একটি ভেড়ার পালের ধ্বংসের চেয়েও বেশি ধ্বংসাত্মক। একজন ব্যক্তির খ্যাতি এবং মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা তার ঈমানের জন্য সম্পদের আকাঙ্ক্ষার চেয়েও বেশি ধ্বংসাত্মক। এমনকি একজন ব্যক্তি খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য তার প্রিয় সম্পদ ব্যয় করবে।

এমনটা বিরল যে কেউ মর্যাদা ও খ্যাতি অর্জন করেও সঠিক পথে অটল থাকে, যেখানে সে বস্তুগত জগতের আনন্দ উপভোগ করার চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেয়। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস, সংখ্যা 6723, সতর্ক করে যে যে ব্যক্তি সমাজে নেতৃত্বের মতো মর্যাদার সন্ধান করে, তাকে নিজেই তা মোকাবেলা করতে হবে কিন্তু যে ব্যক্তি তা না চেয়েই তা পায়, তাকে মহান আল্লাহ তাঁর আনুগত্য করতে সাহায্য করবেন। সহীহ বুখারীতে পাওয়া আরেকটি হাদিস, সংখ্যা 7148, সতর্ক করে যে মানুষ মর্যাদা এবং কর্তৃত্ব অর্জনের জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু কিয়ামতের দিন এটি তাদের জন্য একটি বড় অনুশোচনা হবে।

এটি একটি বিপজ্জনক আকাঙ্ক্ষা কারণ এটি একজনকে এটি অর্জনের জন্য তীব্র প্রচেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং তারপরে এটি ধরে রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টা করতে বাধ্য করে, এমনকি যদি এটি তাদের অত্যাচার এবং অন্যান্য পাপ করতে উৎসাহিত করে।

ধর্মের মাধ্যমে যখন কেউ মর্যাদা লাভ করে, তখন তার চেয়েও খারাপ ধরণের আকাঙ্ক্ষা হলো এই মর্যাদা। জামে আত তিরমিযীতে ২৬৫৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

খ্যাতি অর্জনের ফলে মানুষ আল্লাহকে খুশি করার পরিবর্তে মানুষকে খুশি করার জন্য কাজ করে। এই ব্যক্তিকে বলা হবে যে, বিচারের দিন সে তার কাজের প্রতিদান সেইসব লোকদের কাছ থেকে পাবে যাদের জন্য সে কাজ করেছে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

সুনাম অর্জনের চেষ্টাও একজনকে সকলকে খুশি করার জন্য দ্বিমুখী হওয়ার মতো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে বাধ্য করে। এর ফলে অনেক পাপ হয় এবং এই ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহর কাছে জনসমক্ষে অপমানিত হয়। যাদের খুশি করার লক্ষ্যে তারা কাজ করে তারাই তাদের সমালোচনা করবে এবং ঘৃণা করবে, এমনকি যদি তারা এটি তাদের কাছ থেকে গোপন করে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত সর্বশেষ কথা হলো, তাদের মৃত্যু দ্রুত আসে, তাদের শোক প্রকাশকারীর সংখ্যা কম এবং তারা যে উত্তরাধিকার রেখে যায় তাও কম।

তাদের মৃত্যু হঠাৎ আসে যাতে তারা দ্রুত আল্লাহর রহমতের দিকে চলে যায় এবং ধীর ও দীর্ঘস্থায়ী মৃত্যুর কষ্ট থেকে রক্ষা পায়।

তাদের শোক প্রকাশকারীদের সংখ্যা কম, কারণ তারা সামাজিক সম্মান অর্জন এড়িয়ে চলে এবং অন্যদের কাছে তাদের সৎকর্ম প্রদর্শন করতে ভয় পায় বলে তারা অজ্ঞাত থাকতে পছন্দ করে। কিন্তু তাদের যে অল্প সংখ্যক শোক প্রকাশক আছে তারা ধনী ও বিখ্যাতদের তুলনায় অনেক ভালো। তাদের শোক প্রকাশকারীদের সংখ্যা কম এবং তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, যেখানে ধনী ও বিখ্যাতদের জন্য শোক প্রকাশকারীরা এইভাবে আচরণ করে না।

তারা যে উত্তরাধিকার রেখে যায় তা খুবই কম, কারণ তারা তাদের বেশিরভাগ আশীর্বাদ পরকালের দিকে নিয়োজিত করেছিল, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য। তারা বুঝতে পেরেছিল যে তারা যা কিছু রেখে গেছে তা অন্যদের হাতে চলে যাবে যারা আশীর্বাদ উপভোগ করবে এবং মৃত ব্যক্তিকে তা পাওয়ার জন্য দায়ী করা হবে। এই কারণেই জামে আত তিরমিযীতে ২৩৭৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, একজন ব্যক্তির পরিবার এবং সম্পদ তাদের কবরে তাদের পরিত্যাগ করে এবং কেবল তাদের কর্মই তাদের একাকী কবরে তাদের সাথে থাকে। অতএব, তারা তাদের আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে সৎকর্ম অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করে এবং পাপের মাধ্যমে তাদের অপব্যবহার এড়িয়ে চলে। যদিও তারা উত্তরাধিকার হিসেবে খুব কমই রেখে যায়, তারা আসলে তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে নিজেদের ভরণপোষণের জন্য পরকালে অনেক কিছু নিয়ে যায়। অধ্যায় ৫৯ আল হাশর, আয়াত ১৮:

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেকের উচিত ভেবে দেখা যে সে আগামীকালের জন্য কী পাঠিয়েছে..."

পরিশেষে, তারা হয়তো অনেক পার্থিব জিনিসপত্র, যেমন সম্পদ এবং সম্পত্তি, রেখে নাও যেতে পারে, কিন্তু তারা কল্যাণের এক বিশাল উত্তরাধিকার রেখে যায়, যেমন চলমান দানশীলতা এবং দরকারী জ্ঞান, যা তাদের মৃত্যুর পরেও তাদের উপকার করে। জামে আত তিরমিযী, ১৩৭৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, যারা মহানবী (সাঃ) কে ভালোবাসার দাবি করেন, তাদের অবশ্যই এই মৌখিক দাবিকে কাজে সমর্থন করতে হবে। কর্ম ছাড়া দাবির পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই মূল্য নেই। এই প্রমাণগুলির মধ্যে একটি হল এই বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা যা তাঁর বন্ধুত্বের দিকে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি মহানবী (সাঃ) এর সাথে বন্ধুত্ব করে, তাকে পরকালে তাঁর সাহচর্য দেওয়া হবে। ৪র্থ সূরা আন-নিসা, আয়াত ৬৯:

"আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা তাদের সাথে থাকবে যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ নবী, সত্যবাদী, শহীদ এবং সৎকর্মশীল। আর সঙ্গী হিসেবে তারাই উত্তম।"

জনসাধারণের প্রতি আন্তরিকতা

মক্কা বিজয়ের পর, খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) কে বনু জুধাইমাহ গোত্রের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল। যদিও তারা ইতিমধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির কারণে তাদের কিছু লোক নিহত হয়েছিল। মহানবী (সাঃ) আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ)-কে গোত্রের ভুলের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি নিহতদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন এবং তাদের সম্পদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন, যার মধ্যে একটি কুকুরের পানির পাত্রও ছিল। এমনকি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি কোনও ভুল হয়ে থাকে, তাহলে তিনি তাদের কাছে থাকা অবশিষ্ট সম্পদও দিয়েছিলেন। মহানবী (সাঃ) তার এই কর্মকাণ্ডের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, আলী ইবনে আবি তালিব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ১৯৬ নম্বর হাদিসে নবী মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, ইসলাম হলো জনসাধারণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য মঙ্গল কামনা করা এবং নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা। এর মধ্যে রয়েছে অন্যদের ভালো কাজের পরামর্শ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, সর্বদা অন্যদের প্রতি করুণা ও সদয় হওয়া। সহীহ মুসলিমের ১৭০ নম্বর হাদিসে এর সারসংক্ষেপ পাওয়া যায়। এটি সতর্ক করে যে, কেউ যতক্ষণ না নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অন্যদের জন্য তাই পছন্দ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃত মুমিন হতে পারে না।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে সহীহ বুখারীর ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এই দায়িত্বকে ফরজ নামাজ

প্রতিষ্ঠা এবং ফরজ দান করার পরেই রেখেছেন। এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব বোঝা যায় কারণ এটিকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্বের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ হলো, যখন তারা সুখী হয় তখন খুশি হওয়া এবং যখন তারা দুঃখিত হয় তখন দুঃখিত হওয়া, যতক্ষণ না তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। উচ্চ স্তরের আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্যদের জীবনকে উন্নত করার জন্য চরম সীমা অতিক্রম করা, এমনকি যদি এটি তাদের নিজেদেরকে অসুবিধার মধ্যে ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ অভাবীদের জন্য সম্পদ দান করার জন্য কিছু জিনিসপত্র ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। সর্বদা কল্যাণের জন্য মানুষকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের একটি বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় ১৭ আল ইসরা, আয়াত ৫৩:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়..."

মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি উপায় হল অন্যদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং তাদের পাপের বিরুদ্ধে গোপনে উপদেশ দেওয়া। যে ব্যক্তি এইভাবে কাজ করে, আল্লাহ তার পাপ ঢেকে রাখবেন। জামে আত তিরমিযী, ১৪২৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব অন্যদের ধর্মের দিকগুলি এবং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া এবং শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে তাদের পার্থিব এবং ধর্মীয় জীবন উভয়ই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যদের অপবাদ থেকে তাদের সমর্থন করে। অন্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ প্রাণীই এইরকম আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজ পরিবর্তন করতে না পারে, তবুও তারা তাদের জীবনের

লোকদের, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, অন্যদের সাথে সেই আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় লোকেরা তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় ২৮ আল কাসাস, আয়াত ৭৭:

"... আর তুমিও ভালো কাজ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি ভালো করেছেন..."

অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক হল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য তাদের সাহায্য করা। মানুষের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা কামনা করা উচিত নয়, কারণ এটি তার সওয়াব নষ্ট করে এবং আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি স্পষ্ট অকৃতজ্ঞতা।

সবার জন্য ন্যায়বিচার

মক্কা বিজয়ের পর, মক্কায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক মহিলা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন, যা ইসলামের আইনগত শাস্তির জন্য যথেষ্ট গুরুতর ছিল। তার পরিবার একজন সাহাবী উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে তাকে তার পক্ষ থেকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করে। যখন এই ঘটনা ঘটে, তখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং আইনগত শাস্তি কমানোর চেষ্টা করার জন্য উসামা (রাঃ)-এর সমালোচনা করেন। এরপর নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং তাদের সতর্ক করে দেন যে পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে কারণ কর্তৃপক্ষ দুর্বলদের আইন ভঙ্গ করলে শাস্তি দিত কিন্তু ধনী ও প্রভাবশালীদের ক্ষমা করত। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঘোষণা ছিল যে, যদি তার নিজের মেয়ে কোন অপরাধ করে তবে তিনি তার উপর পূর্ণ আইনগত শাস্তি কার্যকর করবেন। তারপর তিনি মহিলাটিকে আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪৮-৩৪৯ এবং সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত ৬৭৮৭ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজ কেন বিপথগামী হচ্ছে তার একটি প্রধান কারণ হল মানুষ ন্যায়বিচার করা ছেড়ে দিয়েছে। যদিও সাধারণ জনগণ তাদের নেতাদের তাদের কর্মকাণ্ডে ন্যায়বিচার বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়ার অবস্থানে নাও থাকতে পারে, তবুও তারা তাদের সকল আচরণ এবং কাজে ন্যায়বিচার করে পরোক্ষভাবে তাদের প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিমকে তাদের উপর নির্ভরশীলদের, যেমন তাদের সন্তানদের, তাদের সাথে সমান আচরণ করে ন্যায়বিচার করতে হবে। সুনানে আবু দাউদের ৩৫৪৪ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে বিশেষভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তারা কার সাথেই আচরণ করুক না কেন, তাদের সকল ব্যবসায়িক লেনদেনে ন্যায়বিচার করা উচিত। যদি মানুষ ব্যক্তিগত পর্যায়ে ন্যায়বিচার করে আচরণ করে, তাহলে সম্প্রদায়গুলি আরও ভালোর জন্য

পরিবর্তিত হতে পারে এবং ফলস্বরূপ যারা প্রভাবশালী পদে আছেন, যেমন রাজনীতিবিদ, তারা ইচ্ছা করুক বা না করুক, ন্যায়বিচার করবে।

প্রচেষ্টা এবং সৎ উদ্দেশ্য

মক্কা বিজয়ের পর, মহানবী (সা.) ঘোষণা করেন যে মক্কা থেকে আর কোন হিজরত নেই। অর্থাৎ, সেখান থেকে হিজরত করা আর মুসলমানদের উপর কোন কর্তব্য ছিল না কারণ এটি এখন ইসলামের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সেখানে কেবল আল্লাহর পথে সংগ্রাম এবং একজন মুসলিমের নিয়তই কার্যকর ছিল। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৩৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটা মনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি হলো একজন ব্যক্তির নিয়ত। যদি কারো নিয়ত কলুষিত হয়, তাহলে তার সমস্ত কাজই কলুষিত হবে। অতএব, এটা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, তার নিয়ত সর্বদা সঠিক থাকে যাতে সে কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে। যে ব্যক্তি অন্য কোনও কারণে কাজ করে, সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে কোন প্রতিদান পাবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এছাড়াও, আলোচ্য মূল ঘটনাটি প্রতিটি পরিস্থিতিতে সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। অতএব, এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে।

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহর পথে সংগ্রামের অর্থ হলো কার্যত আল্লাহকে আনুগত্য করা, তাই একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই আনুগত্যের ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে তাদের ঈমানের মৌখিক ঘোষণা বাস্তবায়ন করতে হবে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ঈমান এমন একটি গাছের মতো যাকে বৃদ্ধি পেতে হলে আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। ঠিক যেমন একটি উদ্ভিদ যা সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, তা বৃদ্ধি পেতে ব্যর্থ হয় এবং এমনকি মারাও যেতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমানও বৃদ্ধি পাবে না এবং মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

শেষের ইঙ্গিত

মক্কা বিজয়ের পর, আরবদের বিশাল অংশ ইসলাম গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা ১১০, আন-নাসর, আয়াত ১-৩ নাযিল করেন:

"যখন আল্লাহর বিজয় এবং বিজয় আসবে। আর তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে, তখন তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।"

সহীহ বুখারী, ৪৪৩০ নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, উমর বিন খাত্তাব এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বিশ্বাস করতেন যে, মহান আল্লাহ এই আয়াতগুলিতে তাঁকে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর খবর জানিয়েছিলেন, যখন তাঁর মিশন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

এই আয়াতগুলি মৃত্যু পর্যন্ত মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য এবং স্মরণের উপর অবিচল থাকার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ বুখারী শরীফের ৬৪০৭ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যে ব্যক্তি স্মরণ করে না, তার মধ্যে পার্থক্য মৃত ব্যক্তির তুলনায় জীবিত ব্যক্তির মতো।

যে সকল মুসলিম এই দুনিয়া ও আখেরাতের সকল প্রতিকূলতা সফলভাবে কাটিয়ে উঠতে চান, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা যথাসম্ভব মহান আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করতে পারেন। সহজ কথায়, তারা যত বেশি তাঁকে স্মরণ করবেন, তত বেশি তারা এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন।

এটি অর্জন করা সম্ভব হয় আল্লাহর যিকিরের তিনটি স্তরে কার্যত কাজ করার মাধ্যমে। প্রথম স্তর হলো অন্তরে এবং নীরবে আল্লাহকে স্মরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে নিজের নিয়ত সংশোধন করা যাতে তারা কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে। দ্বিতীয় স্তর হলো জিহ্বার মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কথা বলা, অথবা নীরব থাকা। সহিহ মুসলিমের ১৭৬ নম্বর হাদিসে যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারো কাছে যখন ভালো কিছু বলার থাকে না, তখন নীরব থাকা, এটি একটি সৎ কাজ এবং তাই এটি আল্লাহকে স্মরণ করার অংশ।

মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার সর্বোচ্চ এবং কার্যকর উপায় হল কার্যত তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে তাঁকে স্মরণ করা। এটি অর্জন করা হয় তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। যে ব্যক্তি এটি করবে সে তার প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যা আল্লাহ, মহানকে সন্তুষ্ট করে। তবে এর জন্য প্রয়োজন ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা, যা উভয় জগতের সকল কল্যাণ এবং সাফল্যের মূল।

যারা প্রথম দুটি স্তরে থাকবে তারা তাদের নিয়তের উপর নির্ভর করে সওয়াব পাবে, কিন্তু তাদের ঈমান ও তাকওয়ার শক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম, যদি না তারা মহান আল্লাহর স্মরণের তৃতীয় এবং সর্বোচ্চ স্তরে চলে যায়।

যে ব্যক্তি তিনটি স্তরই পূরণ করে তাকে উভয় জগতেই মানসিক ও শারীরিক শান্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় ১৩ আর রা'দ, আয়াত ২৮:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম যারা তাদের ফরজ কর্তব্য পালন করে এবং স্বেচ্ছায় ইবাদত করে, তারা মহান আল্লাহকে স্মরণ করার এই স্তরগুলিকে উপেক্ষা করে এবং পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, যার ফলে তারা তাদের ইবাদত এবং সৎকর্ম সত্ত্বেও এই পৃথিবীতে শান্তি খুঁজে পায় না।

হুনাইনের যুদ্ধ

দুর্নীতি দূরীকরণ

মক্কা বিজয়ের পর, মহানবী (সাঃ) কে জানানো হয় যে, একটি অমুসলিম গোত্র, হাওয়াজিন, তাকে আক্রমণ করার জন্য জড়ো হয়েছে। এর ফলে শেষ পর্যন্ত হুনাইনের যুদ্ধ শুরু হয়। মহানবী (সাঃ) একজন অমুসলিম, সাফওয়ান বিন উমাইয়াকে মুসলিম সেনাবাহিনীর অস্ত্র ও বর্ম ধার দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সাফওয়ান জিজ্ঞাসা করেন যে, মহানবী (সাঃ) কি জোর করে সরঞ্জামাদি নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন কারণ মক্কার উপর তার নিয়ন্ত্রণ ছিল। কিন্তু মহানবী (সাঃ) তাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে এটি কেবল একটি ঋণ এবং তিনি সবকিছু তাকে ফিরিয়ে দেবেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তিনি তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়া (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৩৯-৪৪০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি ব্যবসায়িক প্রতিশ্রুতি এবং চুক্তি পূরণের গুরুত্ব নির্দেশ করে। সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪০১৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যখন সাধারণ জনগণ একে অপরকে আর্থিকভাবে প্রতারণা করে, তখন মহান আল্লাহ তাদের উপর অত্যাচারী নেতা নিয়োগ করে শাস্তি দেন। এই জুলুমের একটি দিক হল দুর্নীতি যা সাধারণ জনগণের জন্য বিরাট দুর্দশার কারণ হয়। একই হাদিস সতর্ক করে যে, যখন সাধারণ জনগণ আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তখন তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হবে যারা তাদের কাছ থেকে অবৈধভাবে তাদের সম্পদ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে। আবার, এটি দুর্নীতির একটি দিক যেখানে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা, যেমন সরকারি কর্মকর্তারা, পরিণতির ভয় ছাড়াই অন্যদের জিনিসপত্র স্বাধীনভাবে গ্রহণ করে। যখন সাধারণ জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন তাদের নেতারা এবং প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে

থাকা অন্যান্য ব্যক্তিরা একইভাবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হন এবং বিশ্বাস করেন যে এই আচরণ সাধারণ জনগণ গ্রহণ করেছে। এর ফলে জাতীয় পর্যায়ে দুর্নীতি হয়। কিন্তু যদি সাধারণ জনগণ আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করত এবং দুর্নীতির মাধ্যমে অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকত, তাহলে তাদের নেতারা এবং প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে থাকা ব্যক্তিরা দুর্নীতিগ্রস্তভাবে কাজ করার সাহস করত না, কারণ তারা জানত যে সাধারণ জনগণ এর পক্ষে দাঁড়াবে না। এবং পূর্বে উদ্‌ধৃত হাদিস অনুসারে, যদি সাধারণ জনগণ আল্লাহ তাআলার প্রতি আনুগত্যশীল থাকে, তাহলে তিনি তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের হাত থেকে রক্ষা করবেন, যারা তাদের কাজে ন্যায়পরায়ণ এবং প্রভাবশালী পদে নিযুক্ত থাকবেন।

বিশ্বে ব্যাপক দুর্নীতির জন্য অন্যদের দোষারোপ করার অপরিণত পথ গ্রহণ না করে মুসলমানদের উচিত তাদের নিজস্ব আচরণের প্রতি সত্যিকার অর্থে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তাদের মনোভাব সংশোধন করা। অন্যথায়, সময়ের সাথে সাথে সমাজে দুর্নীতি কেবল বৃদ্ধি পাবে। কারোরই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তারা প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে না থাকায় সমাজে ঘটে যাওয়া দুর্নীতির উপর তাদের কোনও প্রভাব নেই। এই আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে দুর্নীতি সাধারণ জনগণের নেতিবাচক আচরণের কারণে ঘটে এবং তাই এটি কেবল সাধারণ জনগণের ভালো আচরণের মাধ্যমেই দূর করা যেতে পারে। অধ্যায় ১৩ আর রা'দ, আয়াত ১১:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে..."

ইসলামের পবিত্রতা বজায় রাখুন

হুনাইনের পথে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে ছিলেন সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, যারা তাঁর সাথে মক্কা জয় করেছিলেন এবং সেই সাহাবীগণ, যারা মক্কা বিজয়ের পর সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন। এই নতুন ধর্মান্তরিতরা যাত আনওয়াত নামক একটি বিশাল গাছের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তারা প্রতি বছর সেখানে ভ্রমণ করতেন এবং সেখানে তাদের অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতেন, এর কাছে কুরবানী করতেন এবং সেখানে দিন কাটাতেন। হুনাইনের পথে যখন এই ধর্মান্তরিতরা একটি বড় গাছের পাশ দিয়ে যেতেন, তখন তারা যাত আনওয়াতের কথা স্মরণ করতেন এবং মহানবী (সাঃ) এর কাছে অনুরোধ করতেন যে, ইসলামে তাদের জন্য একটি গাছ প্রতিষ্ঠা করুন যা যাত আনওয়াতের মতো। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের সমালোচনা করেছিলেন এবং সতর্ক করেছিলেন যে এই প্রাচীন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির কোন মূল্য নেই। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 441-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, ইসলামের ভিত্তিতে নয় এমন যেকোনো বিষয় প্রত্যাখ্যাত হবে।

যদি মুসলিমরা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই স্থায়ী সাফল্য চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্য কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যদিও, এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎস থেকে সরাসরি নেওয়া হয়নি এমন কিছু কাজকে এখনও সৎকর্ম হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, তবুও এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎসকে অন্য সকলের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎস থেকে নেওয়া নয় এমন জিনিসের উপর যত বেশি কেউ কাজ করবে, এমনকি যদি সেগুলি সৎকর্ম হয়,

তবুও তারা এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎসের উপর তত কম কাজ করবে। এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ হল কত মুসলিম তাদের জীবনে এমন সাংস্কৃতিক রীতিনীতি গ্রহণ করেছে যার এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎসের ভিত্তি নেই। যদিও এই সাংস্কৃতিক রীতিনীতি পাপ নয়, তবুও তারা মুসলমানদের এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎস শেখা এবং সেগুলি অনুসরণ করা থেকে বিরত রেখেছে, কারণ তারা তাদের আচরণে সন্তুষ্ট বোধ করে। এর ফলে নির্দেশনার উৎস সম্পর্কে অজ্ঞতা দেখা দেয়, যা কেবল পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করে।

এই কারণেই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই দুটি পথনির্দেশনার উৎস শিখতে হবে এবং সেগুলোর উপর আমল করতে হবে, যা পথনির্দেশনার নেতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং তারপর যদি তাদের সময় এবং শক্তি থাকে তবেই অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সৎকর্মে আমল করতে হবে। কিন্তু যদি তারা অজ্ঞতা এবং বানোয়াট অভ্যাস বেছে নেয়, এমনকি যদি সেগুলি পাপ নাও হয়, তাহলে পথনির্দেশনার এই দুটি উৎস শেখা এবং সেগুলোর উপর আমল করার চেয়ে তারা সাফল্য অর্জন করতে পারবে না।

পরিশেষে, যখন কেউ অজ্ঞতার কারণে এই দুটি পথনির্দেশের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয় এমন কাজ করতে থাকে, তখন সে সহজেই এমন অভ্যাস এবং বিশ্বাসে পতিত হয় যা প্রতিষ্ঠিত ইসলামী জ্ঞানের পরিপন্থী। এটি মুসলিমকে পাপ এবং বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যায় যখন তারা মনে করে যে তারা সঠিক পথে আছে। যে জানে যে তারা পথভ্রষ্ট, সে অন্যদের দ্বারা উপদেশ গ্রহণ এবং পরিবর্তন করার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু যে মনে করে যে তারা সঠিক পথে আছে তার পক্ষে তাদের পথ পরিবর্তন এবং সংশোধন করার সম্ভাবনা খুবই কম, এমনকি যখন জ্ঞান এবং স্পষ্ট প্রমাণের অধিকারী অন্যরা তাকে সতর্ক করে। এই পরিণতি এড়ানোর একমাত্র উপায় হল পথনির্দেশনার দুটি উৎসে পাওয়া জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর ভিত্তি করে কাজ করার চেষ্টা করা এবং অন্যান্য কাজ এড়িয়ে চলা, এমনকি যদি সেগুলি সৎকর্ম বলে মনে হয়।

বাধ্যতায় বিজয়

হুনাইনের যুদ্ধের সময়, মুসলিম সেনাবাহিনী প্রথমে পরাজিত হয় এবং কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, সাময়িকভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটে যান। কিন্তু মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর নির্দেশে তাদের ডাকা হওয়ার পর, তারা সকলেই এগিয়ে যান যতক্ষণ না আল্লাহ তাদের বিজয় দান করেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৫১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রাথমিক অসুবিধাটি ঘটেছিল যখন কিছু তরুণ সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, যুদ্ধের আগে ঘোষণা করেছিলেন যে তাদের বিশাল সেনাবাহিনী পরাজিত হবে না। অধ্যায় ৯, তাওবার আয়াত ২৫-২৬:

"আল্লাহ তোমাদেরকে অনেক অঞ্চলে বিজয় দান করেছেন, এমনকি হুনাইনের দিনেও, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি, এবং পৃথিবী তার বিশালতা সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে পড়েছিল; তারপর তোমরা পলায়ন করতে করতে ফিরে গিয়েছিলে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের উপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং এমন সৈন্যদল (অর্থাৎ ফেরেশতা) নাযিল করলেন যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং যারা কাফের ছিল তাদের শাস্তি দিলেন। আর এটাই কাফেরদের প্রতিফল।"

এই ঘটনাটি এই বিষয়টি বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে, প্রকৃত সাফল্য কেবল তাদেরই লাভ হয় যারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অবিচল থাকে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা,

মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া । প্রকৃত সাফল্য পার্থিব সম্পদ, বিপুল সংখ্যা বা শারীরিক শক্তির সাথে সম্পর্কিত নয়। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৯:

"সুতরাং তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, যদি তোমরা [সত্যিকারের] মুমিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।"

উভয় জগতে শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাফল্য অর্জনের শর্ত হল প্রকৃত বিশ্বাস গ্রহণ করা। এর মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত সঠিক আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত, এবং তাই এটি মৌখিকভাবে ইসলামে বিশ্বাস দাবি করার চেয়ে অনেক বেশি। যদি আজ মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব না থাকে, তাহলে এর অর্থ হল তারা প্রকৃত বিশ্বাসী নয়। অতএব, প্রতিটি মুসলমানকে মূল্যায়ন করতে হবে যে তারা কর্মের মাধ্যমে ইসলামে বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করছে কিনা, এবং প্রয়োজনে তাদের আচরণ সংশোধন করতে হবে যদি তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে।

অধিকন্তু, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে তাকেই মানসিক প্রশান্তির আকারে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে, সে নিশ্চিত করবে যে সে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকবে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে তার জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। অতএব, এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক প্রশান্তির দিকে পরিচালিত করবে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

এবং অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ৫৫:

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে শাসক হিসেবে দান করবেন, যেমন তিনি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে শাসক হিসেবে দান করেছিলেন এবং অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের ভয় ও নিরাপত্তার পরিবর্তে তাদের জন্য পরিবর্তন করবেন, কারণ তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা কুফরী করবে, তারাই পাপাচারী।”

অন্যদিকে, আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়ে, প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার করলে, মুসলমানরা তাদের শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হবে এবং তাদের মানসিক শান্তি দেওয়া হবে না, কারণ তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা পাবে না এবং তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় স্থাপন করবে। ৯ম অধ্যায়, তাওবাহ, আয়াত ৮২:

"তাহলে তারা যেন অল্প হেসে ফেলে এবং [তারপর] অনেক কাঁদে, কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফলস্বরূপ।" তারা আগে আয় করত।”

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে, এমনকি যদি তা তার ইচ্ছার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন তিনিও ভালো থাকবেন। কারণ একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সুষম করতে এবং তার জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থাপন করতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার জ্ঞান কখনই এই ফলাফল অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে না, যদিও সমস্ত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তার জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তাদের পরামর্শ সকল ধরণের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের কারণে জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থাপন করতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান আছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এবং যারা করে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝে না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষা গ্রহণের সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

ন্যায্য হওয়া

হুনাইনের যুদ্ধের সময়, আবু কাতাদাহ (রাঃ) একজন শত্রু সৈনিককে হত্যা করেছিলেন। বিজয়ের পর, তাদের বলা হয়েছিল যে যে কেউ প্রমাণ করতে পারবে যে সে একজন শত্রু সৈনিককে হত্যা করেছে, তাকে তাদের সম্পদ, যেমন তাদের অস্ত্র, নিতে দেওয়া হবে। প্রাথমিকভাবে, কেউ আবু কাতাদাহ (রাঃ) এর ঘটনাটি যাচাই করেনি, যতক্ষণ না অন্য একজন নিশ্চিত করে যে তার নিহত শত্রু সৈনিকের সম্পদ তার কাছেই রয়েছে। এই ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে অনুরোধ করেছিলেন যে তিনি যেন আবু কাতাদাহ (রাঃ) এর কাছে হস্তান্তরের পরিবর্তে তাকে সম্পদ রাখার অনুমতি দেন। আবু বকর (রাঃ) এতে হস্তক্ষেপ করেন এবং মন্তব্য করেন যে, যখন এগুলো ন্যায্যভাবে আল্লাহর এক সিংহের, অর্থাৎ আবু কাতাদাহ (রাঃ) এর, তখন তাকে সম্পদ রাখার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এরপর সম্পদগুলো আবু কাতাদাহ (রাঃ) এর কাছে হস্তান্তর করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, ১৪২-১৪৩ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বকর (রাঃ) এর এই বাধা স্পষ্টভাবে তার ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায্যতার পরিচয় বহন করে।

সহীহ মুসলিমের ৪৭২১ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করেছে তারা বিচারের দিন মহান আল্লাহর নিকটে নূরের সিংহাসনে বসে থাকবে। এর মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে, তাদের পরিবারবর্গের ক্ষেত্রে এবং তাদের তত্ত্বাবধান ও কর্তৃত্বাধীন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ।

মুসলমানদের জন্য সর্বদা সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের সাথে আচরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসারে। তাদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত সমস্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও বিশ্রামের অধিকার পূরণ করে এবং প্রতিটি অঙ্গকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুসারে ব্যবহার করে তাদের নিজের শরীর ও মনের প্রতি ন্যায়বিচার করা। ইসলাম মুসলমানদের তাদের সীমার বাইরে তাদের শরীর ও মনকে ঠেলে দিয়ে নিজেদের ক্ষতি করার শিক্ষা দেয় না।

মানুষের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা উচিত, অন্যদের কাছ থেকে যেরকম আচরণ চায়, সেরকম আচরণ করা উচিত। সম্পদ এবং কর্তৃত্বের মতো পার্থিব জিনিসপত্র অর্জনের জন্য মানুষের সাথে অবিচার করে ইসলামের শিক্ষার সাথে আপস করা উচিত নয়। এটি মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশের একটি প্রধান কারণ হবে এবং সহিহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

তাদের ন্যায়পরায়ণ থাকা উচিত, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রিয়জনদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। ৪র্থ অধ্যায় আন নিসা, আয়াত ১৩৫:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়বিচারের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদান করো, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। কেউ ধনী হোক বা দরিদ্র, আল্লাহ উভয়েরই অধিক যোগ্য। অতএব, [ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির] অনুসরণ করো না, তাহলে তোমরা ন্যায়বিচার করতে পারবে না..."

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের উপর নির্ভরশীলদের অধিকার এবং প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করা উচিত। সুনানে আবু দাউদের ২৯২৮ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাদের উপর নির্ভরশীলদের ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের জীবনে এর শিক্ষা বাস্তবায়নের গুরুত্ব শেখানো। তাদের অবহেলা করা উচিত নয় বা অন্যদের, যেমন স্কুল এবং মসজিদের শিক্ষকদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত নয়। যদি কেউ তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে অলস হয়, তাহলে তাদের এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয়।

পরিশেষে, কোন ব্যক্তিই ন্যায়বিচারের সাথে আচরণ করার স্বাধীনতা রাখে না, কারণ সর্বনিম্ন শর্ত হলো মহান আল্লাহ এবং নিজের প্রতি ন্যায়বিচার করা।

তাইফ অবরোধ

অপমানজনক দাসত্ব থেকে মুক্তি

হুনাইনের যুদ্ধের পর, কিছু অমুসলিম শত্রু তায়েফ শহরে ফিরে যায়। এরপর মহানবী (সা.) তায়েফ অভিযান পরিচালনা করেন। মহানবী (সা.) শত্রুদের কাছে ঘোষণা করেন যে, যে সকল দাস শত্রুকে ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা হবে। কিছু শত্রু দাস তায়েফ ছেড়ে মহানবী (সা.) এর সাথে যোগ দেয় এবং তিনি তাদের মুক্ত করে দেন। দাসদের সাথে আচরণ করার সময় এটিই ছিল তাঁর স্বাভাবিক অভ্যাস। ইমাম ইবনে কাথিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৭১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষ বাস্তবে স্বীকার করুক বা না করুক, প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোন ব্যক্তির দাস। কেউ কেউ অন্যের দাস, যেমন হলিউডের নির্বাহীরা এবং তারা যা করতে আদেশ করে তাই করে, এমনকি যদি তা লজ্জা এবং বিনয়ের প্রতি চ্যালেঞ্জ করে। কেউ কেউ তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের দাস এবং তাদের খুশি করার জন্য যা কিছু করা দরকার তা করে। অন্যরা তাদের নিজস্ব কামনার দাস হয়ে আরও খারাপ, কারণ এটি এমন প্রাণীদের মনোভাব যারা সাধারণত নিজেদের খুশি করার জন্য কাজ করে। দাসত্বের সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ রূপ হল মহান আল্লাহর দাস হওয়া। ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখলে এটি স্পষ্ট হয় যা স্পষ্টভাবে দেখায় যে যারা মহান আল্লাহর দাস ছিলেন, যেমন পবিত্র নবীগণ, তাদের উপর তাদের উপর বর্ষিত হোক, তারা এই পৃথিবীতে সর্বোচ্চ সম্মান এবং সম্মান পেয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালেও তাদের এই সম্মান দেওয়া হবে। শতাব্দী এবং সহস্রাব্দ পেরিয়ে গেছে তবুও তাদের নাম ইতিহাসের স্তম্ভ এবং আলোকবর্তিকা হিসাবে স্মরণ করা হয়। যেখানে যারা বিশেষ করে অন্যদের দাস হয়েছিলেন, তাদের নিজস্ব কামনা অবশেষে এই পৃথিবীতে অপমানিত হয়েছিল, এমনকি তারা কিছু পার্থিব মর্যাদা

অর্জন করলেও এবং তারা ইতিহাসে কেবল পাদটীকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মিডিয়া মৃতদের খুব কমই মনে রাখে, পরবর্তী ব্যক্তির কাছে যাওয়ার আগে। তাদের জীবদ্দশায় এই লোকেরা অবশেষে দুঃখিত, একাকী, হতাশাগ্রস্ত এমনকি আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে পড়ে কারণ তাদের আত্মা এবং ভদ্রতা তাদের পার্থিব প্রভুদের কাছে বিক্রি করেও তারা যে তৃপ্তি খুঁজছিল তা পায়নি। এই স্পষ্ট সত্যটি বোঝার জন্য পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই যদি মানুষকে দাস হতেই হয় তবে তাদের আল্লাহর দাস হওয়া উচিত, কারণ স্থায়ী সম্মান, মহত্ত্ব এবং প্রকৃত সাফল্য কেবল এতেই নিহিত।

দ্বিমুখী হওয়ার বিপদ

তায়েফ অবরোধের সময়, একজন ব্যক্তি তায়েফের লোকদের ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতে অনুরোধ করে এবং তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। পরিবর্তে, এই ব্যক্তি তায়েফের লোকদেরকে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে দৃঢ় থাকার কথা বলে ইসলামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। যখন সে মুসলিমদের শিবিরে ফিরে আসে, তখন সে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে বলে যে, সে তায়েফের লোকদের ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়েছিল কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে তিরস্কার করেন এবং তার কথাগুলো বর্ণনা করেন। এই ব্যক্তি সত্য বুঝতে পেরেছিলেন এবং আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৭৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিমুখী হওয়া বলতে বোঝায় যখন একজন ব্যক্তি তার আচরণ পরিবর্তন করে কাদের সাথে যোগাযোগ করছে তাদের খুশি করার জন্য, যাতে সে সম্মান এবং খ্যাতির মতো পার্থিব জিনিসপত্র অর্জন করতে পারে। সুনানে আবু দাউদের ৪৮৭৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, যে কেউ দ্বিমুখী মানসিকতা গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের দুটি জিহ্বা থাকবে। একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো তাদের কথাবার্তা এবং কাজে সৎ এবং অবিচল থাকা এবং তাদের সকল কাজে কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে, তাকে আল্লাহ তাআলা দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন যা ধারাবাহিকভাবে সৎ থাকার ফলে হতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি মুনাফিকদের পথ অনুসরণ করবে, সে মহান আল্লাহর রহমত এবং সুরক্ষা হারাবে, যার ফলে তারা অন্ধভাবে বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়াবে। মহান আল্লাহ তাআলা নিশ্চিত করবেন যে, আজ হোক কাল হোক, তাদের মন্দ উদ্দেশ্য তাদের কাছে প্রকাশ পাবে যাদের তারা খুশি করতে চায়, যাতে তারা পার্থিব আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের সমাজের কাছে ঘৃণিত হয়। এই

পার্থিব শাস্তি পরকালে তাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তির তুলনায় খুবই সামান্য, যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

নমনীয়তা এবং দ্বিতীয় সুযোগ

তায়েফের অমুসলিমরা প্রায় ৩০ দিন ধরে অবরুদ্ধ ছিল কিন্তু তাদের পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। এরপর মহানবী (সা.) মুসলিম সেনাবাহিনীকে তায়েফ থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং তাদের হেদায়েতের জন্য প্রার্থনা করেন। সম্ভবত, মদিনায় হিজরতের আগে, যখন মহানবী (সা.) তায়েফবাসীদের উপর দুর্ব্যবহারের কারণে ধ্বংস করার বিকল্প পেয়েছিলেন, তখন আল্লাহ তায়েফ জয় করতে মুসলিমদের বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এই বিকল্পটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি আশা করেছিলেন যে তারা অবশেষে ইসলাম গ্রহণ করবে। সহিহ বুখারীতে ৩২৩১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে। সুরক্ষার এই পছন্দ অব্যাহত ছিল এবং মুসলমানদের তায়েফ জয় করতে বাধা দিয়েছিল।

তাছাড়া, তায়েফের লোকেরা অবশেষে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক দেওয়া দ্বিতীয় সুযোগটি গ্রহণ করে সত্য গ্রহণ করে। তারা মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য মদিনায় একটি প্রতিনিধিদল পাঠায়। ইমাম ইবনে কাথিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৭৬-এ এই বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তায়ালা, যিনি শাস্তির যোগ্য, তাকে ক্ষমা করে শাস্তি দিতে তাড়াহুড়ো করেন না। বরং তিনি তাদেরকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার এবং তাদের আচরণ সংশোধন করার সুযোগ দেন। যে মুসলিম এটি বোঝে সে কখনও আল্লাহর রহমতের উপর আশা ছেড়ে দেবে না, বরং সীমা অতিক্রম করবে না এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করবে না এই বিশ্বাসে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা কখনও তাদের শাস্তি দেবেন না। তারা বোঝে যে শাস্তি কেবল বিলম্বিত হয়, পরিত্যাগ করা হয় না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। তাই এই ঐশ্বরিক

নাম একজন মুসলিমের মধ্যে আশা এবং ভয় তৈরি করে। একজন মুসলিমের উচিত এই বিলম্বকে তওবা করার এবং সৎকর্মের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা।

একজন মুসলিমের উচিত এই ঐশ্বরিক গুণাবলীর উপর নির্ভর করে মানুষের প্রতি নম্র হওয়া, বিশেষ করে যখন তারা খারাপ চরিত্র প্রদর্শন করে। তাদের উচিত অন্যদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা, ঠিক যেমন তারা চায় যে মহান আল্লাহ তাদের গাফিলতির সময় তাদের প্রতি নম্র হন। কিন্তু একই সাথে তাদের নিজেদের খারাপ বৈশিষ্ট্যের প্রতিও নম্র হওয়া উচিত নয়, কারণ তারা জানে যে পাপের শাস্তি স্থায়ীভাবে পরিত্যাগ করা হয় যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। তাদের উচিত মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে মন্দের জবাব ভালো দিয়ে দিয়ে নম্রতা প্রদর্শন করা। সূরা ফুসসিলাত, আয়াত 34:

"আর ভালো কাজ ও মন্দ সমান নয়। [মন্দ কাজ] প্রতিহত করো সেই [কাজ] দ্বারা যা উত্তম; তাহলে যার সাথে তোমার শত্রুতা আছে সে [একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হয়ে যাবে।"

চরম দয়া

তায়েফ অবরোধের পর, এক ব্যক্তি জানান যে তিনি মহানবী (সাঃ)-এর পাশে ছিলেন, ভারী জুতা পরে। দুর্ঘটনাক্রমে তার উটটি মহানবী (সাঃ)-এর সাথে ধাক্কা খায় এবং তার পায়ের আঙুল নবী (সাঃ)-এর পায়ে আঘাত করে এবং আঘাত করে। মহানবী (সাঃ)-এর পায়ে চাবুক মারার ফলে ব্যথা হয়। পরের দিন, মহানবী (সাঃ)-তাকে ডেকে বললেন যে, সে চাবুক দিয়ে পা টিপে মারার ফলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরপর তিনি লোকটিকে ৮০টি ভেড়া উপহার দিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ)-এর জীবনী", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৮১-৪৮২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি অন্যদের প্রতি দয়া ও করুণা দেখানোর গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ বুখারীতে ৭৩৭৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, যে অন্যদের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন না।

ইসলাম খুবই সহজ একটি ধর্ম। এর মৌলিক শিক্ষাগুলির মধ্যে একটি হল, মানুষ অন্যদের সাথে কেমন আচরণ করে, তা হলো মহান আল্লাহ তাদের সাথে কেমন আচরণ করবেন। উদাহরণস্বরূপ, যারা অন্যদের ভুল উপেক্ষা করতে এবং ক্ষমা করতে শেখে, তারা মহান আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ২২:

"...এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন..."

যারা অন্যদের পার্থিব ও ধর্মীয় উপকারে যেমন মানসিক বা আর্থিক সাহায্যে সাহায্য করে, তাদের উভয় জগতেই মহান আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করবেন। সুনানে আবু দাউদের ৪৮৯৩ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একই হাদিসে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্যদের দোষ-ত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ তায়ালা তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।

সহজ কথায়, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, যদি কেউ অন্যদের সাথে সদয় ও শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করে, তাহলে মহান আল্লাহ তাদের সাথেও একই আচরণ করবেন। আর যারা অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তাদের সাথেও একই আচরণ করবেন, এমনকি যদি তারা তাঁর সাথে সম্পর্কিত ফরজ কর্তব্য, যেমন ফরজ নামাজ, পালন করে। কারণ একজন মুসলিমকে সাফল্য অর্জনের জন্য উভয় কর্তব্যই পালন করতে হবে, যথা: আল্লাহ, মহিমান্বিত, এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য।

ঐশ্বরিক করুণা অর্জনের একটি সহজ উপায় হল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যা মানুষ তার সাথে আচরণ করতে চায়। এটি সকল মানুষের জন্য সত্য, তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে, এবং প্রকৃতপক্ষে সমস্ত প্রাণীর জন্য প্রযোজ্য।

পরিশেষে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিম যদি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করে, তবেই কেবল আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সদয় আচরণ করবেন। যদি তারা অন্য কোনও কারণে তা করে, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা এই শিক্ষায় উল্লিখিত সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। সকল কর্মের

এবং ইসলামের ভিত্তি হলো ব্যক্তির নিয়ত। সহীহ বুখারী, ১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

হুনাইনের যুদ্ধের লুণ্ঠন

বেআইনি কাজ এড়িয়ে চলা

তায়েফকে অজেয় অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার পর, মহানবী (সা.) মক্কার দিকে ফিরে আসেন এবং হুনাইনের যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ বিতরণের আগে ঘোষণা করেন যে, কোন মুসলিম সৈনিকের যুদ্ধের সম্পদ ইসলামী আইন অনুসারে বিতরণ না করা পর্যন্ত গ্রহণ করা উচিত নয়, এমনকি তারা যে জিনিসটি নিয়েছিল তা যদি একটি সুতো বা সূঁচও হয়। তিনি আরও বলেন, এইভাবে আচরণ করা উভয় জগতেই অপমান, অগ্নি এবং লজ্জা। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রহ.)-এর "নবী (সা.)-এর নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৯০-১৭৯২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, হারাম ব্যবহার করা একটি মহাপাপ। এর মধ্যে রয়েছে হারাম সম্পদ ব্যবহার, হারাম জিনিস ব্যবহার এবং হারাম খাবার খাওয়া। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলাম যেসব নির্দিষ্ট জিনিসকে হারাম বলে ঘোষণা করেছে, যেমন মদ, সেগুলোই কেবল হারাম নয়। প্রকৃতপক্ষে, এমনকি হালাল জিনিসও হারাম হয়ে যেতে পারে যদি সেগুলি হারাম জিনিসের মাধ্যমে অর্জিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, হালাল খাবার যদি হারাম সম্পদ দিয়ে কেনা হয়, তাহলে তা হারাম হয়ে যেতে পারে। অতএব, মুসলমানদের জন্য এটি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা কেবল হালাল জিনিসের সাথেই লেনদেন করে কারণ কাউকে ধ্বংস করার জন্য হারাম জিনিসের একটি উপাদানের প্রয়োজন হয়।

প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিমের ২৩৪৬ নম্বর হাদিসে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি হারাম জিনিস ব্যবহার করবে তার সকল দোয়া বাতিল করা হবে। যদি আল্লাহ তাআলা তাদের দোয়া বাতিল করে দেন, তাহলে কি কেউ তাদের কোন নেক আমল কবুল হওয়ার আশা করতে পারে? সহীহ বুখারী, ১৪১০ নম্বর হাদিসে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা কেবল হালাল জিনিসই গ্রহণ করেন। অতএব, হারাম জিনিসের ভিত্তি যেমন হারাম জিনিস দিয়ে হজ্জ পালন করা, তা বাতিল করা হবে।

বস্তুত, সহীহ বুখারী শরীফের ৩১১৮ নম্বর হাদিসে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে বলেছেন যে, এই ধরণের ব্যক্তিকে বিচারের দিন জাহান্নামে পাঠানো হবে। দ্বিতীয় সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৮৮:

" আর তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং শাসকদের কাছে তা [ঘুষ হিসেবে] পাঠাও না যাতে তারা তোমাদেরকে [মানুষের সম্পদের একটি অংশ] পাপের মাধ্যমে গ্রাস করতে সাহায্য করতে পারে, যদিও তোমরা জেনে থাকো [এটি অবৈধ]।"

তুমি কি চাও?

তায়েফ অবরোধের পর, মহানবী (সাঃ) মক্কায় ফিরে আসেন। হুনাইনের যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত গনীমতের মাল বিতরণ করার সময়, মহানবী (সাঃ) নতুন ধর্মান্তরিত মুসলিমদের হৃদয়কে শক্তিশালী করার জন্য আরও কিছু দান করেছিলেন। মদীনার কিছু তরুণ সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, এই বিশেষ ক্ষেত্রে অবহেলিত বোধ করেছিলেন। মহানবী (সাঃ) এর কাছে এই খবর পৌঁছালে, তিনি তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করেন যে তারা কি এই বিষয়ে সন্তুষ্ট নন যে অন্যরা যুদ্ধের গনীমতের মাল নিয়ে গেলেও, তারা মহানবী (সাঃ) কে বাড়িতে নিয়ে যাবে। তারা একযোগে উত্তর দিয়েছিলেন যে তারা এতে সন্তুষ্ট। মহানবী (সাঃ) আরও বলেন যে, যদি তিনি মদিনায় হিজরত না করে তাকে হিজরত না করতেন, তাহলে তিনি মদীনার সাহাবীদের একজন হতেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। আর যদি পৃথিবী এক উপত্যকা দিয়ে ভ্রমণ করে এবং মদীনার সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, পৃথক উপত্যকা দিয়ে ভ্রমণ করেন, তাহলে তিনি অবশ্যই সেই উপত্যকা দিয়ে ভ্রমণ করবেন যেখানে মদীনার সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, ভ্রমণ করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৮৩ এবং সিরাত ইবনে হিশামের, পৃষ্ঠা ২৩৭-২৩৮ এবং পৃষ্ঠা ৪৮৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা কেন মহান আল্লাহর ইবাদত করে, কারণ এই কারণটি মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধির কারণ হতে পারে, অথবা কিছু ক্ষেত্রে এটি অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করতে পারে। যখন কেউ তাঁর কাছ থেকে বৈধ পার্থিব জিনিসপত্র অর্জনের জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করে, তখন তারা তাঁর অবাধ্য হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। পবিত্র কুরআনে এই ধরণের ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা ২২ আল হজ্জ, আয়াত ১১:

"আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে আল্লাহর ইবাদত করে এক প্রান্তে। যদি তাকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে, তবে সে তাতে আশ্বস্ত হয়; আর যদি কোন পরীক্ষা তাকে স্পর্শ করে, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই হারিয়ে ফেলেছে। এটাই স্পষ্ট ক্ষতি।"

যখন তারা পার্থিব আশীর্বাদ পেতে ব্যর্থ হয় অথবা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তখন তারা প্রায়শই রাগান্বিত হয়ে পড়ে যা তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত রাখে। এই লোকেরা প্রায়শই তাদের পরিস্থিতি অনুসারে আল্লাহকে আনুগত্য ও অবাধ্যতা করে, যা বাস্তবে আল্লাহর প্রকৃত দাসত্বের পরিপন্থী।

যদিও ইসলামে মহান আল্লাহর কাছ থেকে বৈধ পার্থিব জিনিসপত্র কামনা করা গ্রহণযোগ্য, তবুও কেউ যদি এই মনোভাব ধরে রাখে তবে সে এই আয়াতে উল্লেখিতদের মতো হয়ে যেতে পারে। পরকালে মুক্তি এবং জান্নাত লাভের জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করা অনেক ভালো। এই ব্যক্তির অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাদের আচরণ পরিবর্তন করার সম্ভাবনা কম। তবে সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম কারণ হল মহান আল্লাহকে মেনে চলা, কারণ তিনি তাদের প্রভু এবং বিশ্বজগতের প্রভু। এই মুসলিম, যদি আন্তরিক হয়, তাহলে সকল পরিস্থিতিতেই অবিচল থাকবে এবং এই আনুগত্যের মাধ্যমে তারা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ধরনের আশীর্বাদ লাভ করবে যা প্রথম ধরণের ব্যক্তির পার্থিব আশীর্বাদকে ছাড়িয়ে যাবে।

পরিশেষে, মুসলমানদের জন্য তাদের নিয়তের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তা সংশোধন করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়।

এছাড়াও, আলোচিত মূল ঘটনাটি মদীনার সাহাবীদের প্রতি এবং অন্যান্য সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মহৎ ভালোবাসার ইঙ্গিত দেয়।

মহান আল্লাহ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসার নিদর্শন, তাঁর উপর শান্তি ও সালাম বর্ষিত হোক। যারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ভালোবাসে, তাদের সকলকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, এমনকি যদি এটি তাদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত মতামতের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এই ভালোবাসায় তারাও অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের কথার মাধ্যমে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তাদের কাজের মাধ্যমে ভালোবাসা প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ, এটা সকলের কাছে স্পষ্ট যে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারের সকল সদস্য, সকল সাহাবী (রাঃ)-এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং নেক পূর্বসূরীরা এই প্রকৃত ভালোবাসার অধিকারী ছিলেন। তাই তাদের প্রত্যেককে ভালোবাসা তার উপর কর্তব্য, যে আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ভালোবাসার দাবি করে। সহিহ বুখারী, ১৭ নম্বর হাদিসের মতো অনেক হাদিস দ্বারা এটি প্রমাণিত হয়েছে। এটি পরামর্শ দেয় যে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহায্যকারীদের প্রতি ভালোবাসা, অর্থাৎ পবিত্র মদীনার বাসিন্দাদের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের অংশ এবং তাদের প্রতি ঘৃণা মুনাফিকির লক্ষণ। জামে আত তিরমিযী, ৩৮৬২ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্টভাবে মুসলমানদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে তারা যেন কোন সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাদের সমালোচনা না করে, কারণ তাদের ভালোবাসা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে ভালোবাসার লক্ষণ এবং তাদের প্রতি ঘৃণা করা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং মহান আল্লাহকে ঘৃণা করার লক্ষণ। এই ব্যক্তি সফল হবে না যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে তওবা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর পবিত্র পরিবার সম্পর্কে অনুরূপ একটি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, সুনান ইবনে মাজাহ, ১৪৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে।

যদি কোন মুসলিম অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমের সমালোচনা করে, যে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে, তাহলে তা প্রমাণ করে যে, তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার অভাব পোষণ করে। যদি কোন মুসলিম কোন পাপ করে, তাহলে অন্য মুসলিমদের সেই পাপকে ঘৃণা করা উচিত, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, পাপী মুসলিমের প্রতি ভালোবাসা থাকা উচিত কারণ তারা আল্লাহ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে। অন্যদের ভালোবাসার লক্ষণ হলো তাদের সাথে সদয় ও শ্রদ্ধাশীল আচরণ করা। সহজ কথায়, অন্যদের সাথে সেভাবেই আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় অন্যরা তাদের সাথে আচরণ করুক।

অধিকন্তু, একজন মুসলিমের উচিত তাদের সকলকে ঘৃণা করা যারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং নবী মুহাম্মদ, সা.-কে ভালোবাসেন তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে, সে ব্যক্তি আত্মীয় হোক বা অপরিচিত হোক। একজন মুসলিমের অনুভূতি কখনই আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং নবী মুহাম্মদ, সা.-এর প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসার এই নিদর্শন পূরণে বাধা সৃষ্টি করবে না। এর অর্থ এই নয় যে তাদের ক্ষতি করা উচিত, বরং তাদের স্পষ্ট করে বলা উচিত যে যারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং নবী মুহাম্মদ, সা.-কে ভালোবাসেন তাদের প্রতি ঘৃণা করা অগ্রহণযোগ্য। যদি তারা এই বিচ্যুতিপূর্ণ মনোভাব বজায় রাখে, তাহলে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া উচিত যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করুন

হুনাইনের যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত গনীমতের মাল বিতরণের সময়, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) নতুন ধর্মান্তরিত মুসলিমদের হৃদয়কে শক্তিশালী করার জন্য আরও বেশি দান করেছিলেন। কেউ কেউ এই বিষয়ে অভিযোগ করলে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি তাদের দান করেছিলেন যাদের তিনি ভয় করেছিলেন যে তারা অধৈর্য এবং বিরক্ত হবেন এবং তিনি তাদের দান করা থেকে বিরত ছিলেন যারা স্বাবলম্বী ছিলেন এবং যাদের কল্যাণ আল্লাহ তাদের প্রতি অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনি উপসংহারে পৌঁছেছিলেন যে পরবর্তী দলের একজন ছিলেন আমর বিন তাগলিব, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। ইবনে কাছীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 490-491 এবং সহীহ বুখারী, 3145 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি স্বাধীন থাকার প্রচেষ্টার গুরুত্ব নির্দেশ করে। সহীহ বুখারীতে ৬৪৭০ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদের কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাকে, তাকে স্বাধীনতা দান করা হবে। আর যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে ধৈর্য ধরার চেষ্টা করে, তাকে মহান আল্লাহ ধৈর্য দান করবেন। আর যে ব্যক্তি তার যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, তাকে স্বাবলম্বী করে তোলা হবে। তিনি উপসংহারে বলেছেন যে, ধৈর্যের চেয়ে বড় আর কোন দান নেই।

সহীহ বুখারীতে ৬৪৭০ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদের কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাকে, তাকে স্বাধীনতা দান করা হবে। আর যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে ধৈর্য ধরার চেষ্টা করে, তাকে মহান আল্লাহ ধৈর্য দান করবেন। আর যে ব্যক্তি তার যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, তাকে

স্বাবলম্বী করে তোলা হবে। তিনি উপসংহারে বলেছেন যে, ধৈর্যের চেয়ে বড় আর কোন দান নেই।

প্রয়োজনে অন্যের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ায় কোনও ক্ষতি নেই, তবে একজন মুসলিমের এই অভ্যাসে জড়িয়ে পড়া উচিত নয় কারণ এর ফলে আত্মসম্মান নষ্ট হতে পারে। এটি বিপজ্জনক হতে পারে কারণ যে ব্যক্তি আত্মসম্মান হারিয়ে ফেলে, সে পাপ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে কারণ সে আল্লাহ, মহান, এবং অন্যরা তাদের সম্পর্কে কী ভাববে তা পরোয়া করা বন্ধ করে দেয়। যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনে অন্যদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, সে আল্লাহ, মহান, তাদের সাহায্য করার জন্য বিশ্বাস করার পরিবর্তে অন্যদের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে শুরু করে। আল্লাহর উপর আস্থা রাখার অর্থ হল, তাকে যে উপায়ে সাহায্য করা হয়েছে তা বৈধভাবে ব্যবহার করা এবং তারপর বিশ্বাস করা, যা একমাত্র আল্লাহ, মহান, শুধুমাত্র পছন্দ করেন, তা সকলের জন্যই মঙ্গলজনক হবে। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের সাহায্যের জন্য আবেদন করার আগে তাকে যে সমস্ত উপায়ে সাহায্য দেওয়া হয়েছে তা কাজে লাগানো। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে, তাকে আল্লাহ, মহান, মানুষের স্বাধীনতা দান করবেন।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই নিজের উপর ধৈর্য ধরতে হবে, বিশেষ করে কঠিন সময়ে। এটি অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হল ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি জানে যে, মহান আল্লাহ তাআলা অগণিত প্রতিদান দেবেন, তার ধৈর্যশীল মুসলিমের ধৈর্য ধরার সম্ভাবনা বেশি, যে ব্যক্তি এই সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ, তার চেয়ে। সূরা আয-যুমার, আয়াত ১০:

"...নিশ্চয়ই, ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান বিনা হিসাব [অর্থাৎ, সীমা] দেওয়া হবে।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রকৃত ধৈর্য্য কোনও পরিস্থিতির শুরুতেই দেখানো হয়, পরে নয়। যখন কেউ পরে ধৈর্য প্রদর্শন করে, তখন এটি গ্রহণযোগ্যতা, যা সবচেয়ে অধৈর্য ব্যক্তিও অনুভব করে।

প্রকৃত ধনী ব্যক্তি হলেন তিনি, যিনি অভাবী এবং লোভী নন। এটি তখনই ঘটে যখন কেউ মহান আল্লাহ তায়ালা যা দান করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে। এটি তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ সঠিকভাবে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর অসীম জ্ঞান অনুসারে প্রতিটি ব্যক্তিকে যা সর্বোত্তম তা দান করেন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

এই ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে ধনী, অন্যদিকে যে ব্যক্তি সর্বদা লোভী এবং অভাবী, সে দরিদ্র, যদিও তার প্রচুর সম্পদ থাকে। সহীহ মুসলিমের ২৪২০ নম্বর হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে। অতএব, নিজের রিযিকে সন্তুষ্ট থাকাই প্রকৃত সম্পদ, অন্যদিকে আরও বেশি লাভের লোভ একজন অভাবীকে অর্থাত্ দরিদ্র করে তোলে।

পরিশেষে, ধৈর্য ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের প্রতিটি উপাদানের জন্য প্রয়োজনীয়। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। সহজ কথায়, ধৈর্য ছাড়া পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে সাফল্য সম্ভব নয়। অতএব, এটি মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত একটি দুর্দান্ত উপহার যারা এটি গ্রহণ করার চেষ্টা করে।

সমস্যাগুলো ছোট করো

হুনাইনের যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত গনীমতের মাল বণ্টন করার সময়, একজন অজ্ঞ ব্যক্তি মন্তব্য করেছিলেন যে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এই বণ্টনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র দাসত্ব করতে চাইছেন না। যখন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এই কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি রাগান্বিত হয়েছিলেন এবং মহানবী মুসা (সাঃ) এর জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে, তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আরও বেশি কষ্ট ভোগ করেছেন কিন্তু তবুও ধৈর্য ধরেছেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীজীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৯২ এবং সহীহ বুখারী, ৪৩৩৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

কষ্টের সময় ধৈর্য অর্জনের একটি উপায় হল নিজের কষ্টকে কঠিন এবং তীব্র কষ্টের সাথে তুলনা করা। যখন কেউ এটি করে তখন তার সমস্যাটি ছোট এবং তাৎপর্যহীন মনে হয়। মনোযোগের এই পরিবর্তন একজন মুসলিমকে ধৈর্য ধরতে এবং মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে। এটি একটি পার্থিব উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তীব্র মাইগ্রেনে আক্রান্ত ব্যক্তি এমনভাবে প্রভাবিত হতে পারে যে তাদের কাছে মনে হয় যে পৃথিবী তাদের চারপাশে ভেঙে পড়ছে। কিন্তু যদি এই একই ব্যক্তি এমন একটি জাহাজে থাকতেন যা একটি বরফখণ্ডের সাথে ধাক্কা খেয়ে হিমায়িত সমুদ্রের মাঝখানে ডুবে যাওয়ার পথে থাকে, তাহলে তাদের তীব্র মাইগ্রেনের বিষয়টি খুব একটা বড় মনে হবে না। প্রকৃতপক্ষে, তারা সম্ভবত এতে মোটেও প্রভাবিত হত না কারণ তাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ আসন্ন জীবন-হুমকির বিপদ অর্থাৎ ডুবন্ত জাহাজের দিকে চলে যেত। কষ্টের সময় একজন মুসলিমের এইরকম আচরণ করা উচিত। যখন তারা কোনও সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তাদের বুঝতে হবে যে এটি আরও খারাপ হতে পারত এবং তারা যে আরও বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে পারত তার দিকে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এটি তাদের চেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে থাকা অন্যদের পর্যবেক্ষণ করে অর্জন করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যিনি পিঠের ব্যথায় ভুগছেন তিনি শারীরিকভাবে

অক্ষম ব্যক্তির কথা চিন্তা করতে পারেন। অথবা তারা মৃত্যু এবং বিচার দিবসের মতো আরও বড় কঠিন বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে পারেন। এই তুলনা তাদের অসুবিধার তাৎপর্য এবং এর প্রভাবকে হ্রাস করবে, যা তাদেরকে ধৈর্যশীল এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকতে সাহায্য করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া।

ভবিষ্যতের বিদ্রোহীরা

হুনাইনের যুদ্ধ থেকে যুদ্ধের গনীমত বণ্টন করার সময়, যু আল খুওয়াইসিরা নামে এক মুনাফিক মন্তব্য করেছিল যে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) ন্যায়বিচার করছেন না। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং উত্তর দিয়েছিলেন যে, যদি তিনি ন্যায়বিচার না করেন, তাহলে কে করবে। যখন উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) এই স্পষ্ট ভণ্ডকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন, তখন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে, এই ব্যক্তি অবশেষে একটি বিদ্রোহী দলকে নেতৃত্ব দেবেন যারা ইসলামের ঈমানে প্রবেশ করবে এবং বেরিয়ে যাবে ঠিক যেমন একটি তীর তার লক্ষ্যবস্তু থেকে প্রবেশ করে এবং বেরিয়ে আসে। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে, যখন এই লোকেরা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে, তখন তা তাদের গলার বাইরে নেমে আসে না, অর্থাত এটি তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ে পৌঁছায় না। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৯২-৪৯৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ তা'আলা সূরা তওবার ৯ম সূরার ৫৮ নম্বর আয়াত নাযিল করেছেন:

"আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা দান-সদকা বণ্টনের ব্যাপারে তোমার সমালোচনা করে। যদি তাদের কাছ থেকে কিছু দেওয়া হয়, তাহলে তারা তাতে সাড়া দেয়; আর যদি তাদের কাছ থেকে কিছু না দেওয়া হয়, তাহলে তারা তৎক্ষণাৎ রেগে যায়।"

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৯:৫৮, পৃষ্ঠা ৮৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যেকোনো হাদিসে এই বিদ্রোহীদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই বিদ্রোহীরা ইসলামের চতুর্থ সঠিক নির্দেশিত খলিফা আলী বিন আবু তালিব (রা.)-এর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। অন্যান্য অনেক হাদিসের মতো এই হাদিসটিও ইঙ্গিত দেয় যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিদ্রোহীরা ছিল আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদতকারী, কিন্তু ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে তাদের বিচ্যুত করার কারণ ছিল তাদের অজ্ঞতা। তারা বোকামি করে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার চেয়ে ইবাদতকে বেশি মূল্য দিয়েছিল। তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা ইসলামের শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করেছিল যা তাদের জঘন্য পাপের দিকে পরিচালিত করেছিল। যদি তাদের প্রকৃত জ্ঞান থাকত তবে এমনটা ঘটত না।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে জ্ঞান কীভাবে অন্যদের প্রতি, বিশেষ করে পারিবারিক নির্যাতনের মতো পাপ প্রতিরোধ করতে পারে। কেউ কেবল তখনই অন্যদের প্রতি অন্যায় করা থেকে বিরত থাকে যখন সে তার কর্মের পরিণতি অর্থাৎ উভয় জগতেই মহান আল্লাহর দ্বারা জবাবদিহি এবং শাস্তির ভয় পায়। কিন্তু নিজের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে ভয়ের ভিত্তি এবং মূল হল জ্ঞান। জ্ঞান ছাড়া কেউ কখনও তার কর্মের পরিণতি সম্পর্কে ভয় পাবে না। এটি তাদের অজ্ঞতাকে পাপ করতে এবং অন্যদের প্রতি অন্যায় করার জন্য উৎসাহিত করবে।

যদি সমাজ পারিবারিক নির্যাতন এবং মানুষের বিরুদ্ধে অন্যান্য অপরাধের ঘটনা কমাতে চায়, তাহলে তাদের জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে কারণ কেবল ইবাদতই এটি ঘটবে না, ঠিক যেমন

বিদ্রোহীদের ইসলাম থেকে বিচ্যুত হওয়া এবং নিরপরাধ মানুষের জন্য চরম দুর্দশা সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখেনি। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ২৮:

"... আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, কেবল তারাই ভয় করে..."

আলোচিত মূল ঘটনাটিও ইঙ্গিত দেয় যে এই বিদ্রোহীরা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা সঠিকভাবে বুঝতে এবং তার উপর আমল করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

ইমাম মুনজারীর "সচেতনতা ও উপলব্ধি", ৩০ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, পবিত্র কুরআন বিচার দিবসে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে জীবদ্দশায় এটি অনুসরণ করবে তাদের বিচার দিবসে এটি জান্নাতে নিয়ে যাবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে জীবদ্দশায় এটিকে অবহেলা করবে তারা দেখবে যে এটি তাদেরকে বিচার দিবসে জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি পথনির্দেশনার গ্রন্থ। এটি কেবল তেলাওয়াতের গ্রন্থ নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সকল দিক পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে যাতে এটি উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম দিকটি হল এটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিতভাবে তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয় দিকটি হল একজন নির্ভরযোগ্য আলেমের মাধ্যমে এটি বোঝা। এবং শেষ দিকটি হল মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসারে এর শিক্ষার উপর আমল করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা পবিত্র কুরআনের উপর সঠিকভাবে আমল করবে, কারণ মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনই পবিত্র কুরআনের ব্যবহারিক বাস্তবায়ন। যারা এইভাবে আচরণ করে তারাই পৃথিবীর প্রতিটি কঠিন সময়ে

সঠিক পথনির্দেশনা এবং কিয়ামতের দিনে এর সুপারিশের সুসংবাদ পায়। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

কিন্তু মূল হাদিস অনুসারে, পবিত্র কুরআন কেবল তাদের জন্য পথনির্দেশনা এবং রহমত যারা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে এর দিকগুলি সঠিকভাবে পালন করে। কিন্তু যারা এটিকে বুঝতে এবং তার উপর আমল করতে অস্বীকৃতি জানায় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে এর ভুল ব্যাখ্যা করে এবং পরিবর্তে তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, তারা বিচারের দিনে এই সঠিক পথনির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। সূরা ত্বাহা, আয়াত ১২৪:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন] এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।"

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময়, একজন মুসলিমের কেবল এই উদ্দেশ্যেই এটি ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থাৎ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি তেলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে একটি হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, যা কোনও সমস্যার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং সমস্যা সমাধানের পরে আবার

একটি হাতিয়ার বাক্সে রাখা হয়। পবিত্র কুরআনের মূল কাজ হল পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য এই পৃথিবীর কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পথ দেখানো। পবিত্র কুরআন বোঝা এবং তার উপর আমল না করে এই উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব নয়। অন্ধ তেলাওয়াত যথেষ্ট নয়। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং কেবল নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলিমের আচরণের বিরোধিতা করে। এটি এমন ব্যক্তির মতো যে অনেক ধরণের জিনিসপত্র সহ একটি গাড়ি কিনে কিন্তু এটি চালানো যায় না, যা একটি গাড়ির মূল উদ্দেশ্য। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তি কেবল বোকা। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাজিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু এটি জালেমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।"

আত্মীয়স্বজনের প্রতি দয়া

হুনাইনের যুদ্ধে বন্দীদের মধ্যে ছিলেন মহানবী (সাঃ)-এর পালিত বোন শায়মা (রাঃ)। যখন তিনি মহানবী (সাঃ)-এর কাছে পৌঁছান, তখন তিনি তাঁর পিঠে কামড়ের দাগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করেন, যা নবী (সাঃ)-এর শিশু থাকাকালীন সময়ে হয়েছিল। এরপর তিনি তাঁর চাদরটি তার উপর বসার জন্য বিছিয়ে দেন এবং তার সাথে ভালো ব্যবহার করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি তাকে তাঁর সাথে থাকার বিকল্প দেন, যেখানে তিনি তাকে অত্যন্ত সম্মান করবেন, অথবা তিনি উপহার এবং খাবার নিয়ে তার লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারেন। তিনি দ্বিতীয় বিকল্পটি বেছে নেন এবং তাই সম্মান এবং উপহার সহ মুক্তি পান। ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 494-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা সাফল্য কামনা করলে পরিত্যাগ করা যাবে না। উভয় জগতেই। ঈমানের প্রকৃত নিদর্শন হলো সারাদিন মসজিদে আল্লাহর ইবাদত করা নয় বরং আল্লাহর হক আদায় করা এবং সৃষ্টির হক আদায় করা। সৃষ্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলির মধ্যে একটি হলো আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা। কেউ ইসলামী পোশাক পরে ধার্মিকতার ভান করতে পারে কিন্তু তারা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে পারে না। যখন কেউ ইতিহাসের পাতায় তারা সর্বদা লক্ষ্য করবে যে, মহান আল্লাহর ধার্মিক বান্দারা তাদের আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রেখেছিলেন। এমনকি যখন তাদের আত্মীয়রা তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করত, তখনও তারা সদয়ভাবে সাড়া দিয়েছিল। অধ্যায় ৪১ ফুসসিলাত, আয়াত ৩৪:

"আর ভালো কাজ ও মন্দ সমান নয়। [মন্দ কাজ] প্রতিহত করো সেই [কাজ] দ্বারা যা উত্তম; তাহলে যার সাথে তোমার শত্রুতা আছে সে [একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হয়ে যাবে।"

সহীহ মুসলিমের ৬৫২৫ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার জন্য প্রচেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে সর্বদা সাহায্য করবেন, এমনকি যদি তার আত্মীয়রা তাদের সাথে ঝামেলা করে। তাদের জন্য.

ভালোর জবাব ভালো দিয়ে দেওয়া বিশেষ কিছু নয়, বরং ভালোর জবাব মন্দ দিয়ে দেওয়া একজন আন্তরিক মুমিনের লক্ষণ। পূর্বের আচরণ এমনকি পশুদের মধ্যেও দেখা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, যখন কেউ কোন পশুর সাথে সদয় আচরণ করে, তখন সে তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে। সহীহ বুখারী, ৫৯৯১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, আত্মীয়স্বজন ছিন্ন করলেও যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে , সে ব্যক্তিই আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরেও সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। তার বেশিরভাগ আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে তিনি সবসময় তাদের প্রতি সদয় আচরণ করতেন।

এটা সর্বজনবিদিত যে, মহান আল্লাহর নৈকট্য ছাড়া কেউ সাফল্য অর্জন করতে পারে না । কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফের ৫৯৮৭ নম্বর হাদিসে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি পার্থিব কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। মনে রাখবেন, এটি সত্য যাই হোক না কেন। ফরজ নামাজের মতো ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর হক আদায়ের জন্য কত সংগ্রাম করতে হয়, তার চেয়েও বেশি কিছু । যদি মহান আল্লাহ একজন

মুসলিমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন, তাহলে তারা কীভাবে তাঁর নৈকট্য এবং চিরস্থায়ী সাফল্য অর্জন করতে পারবে?

অধিকন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আল্লাহ, মহিমান্বিত, শাস্তি বিলম্বিত করেন মানুষকে সুযোগ দেওয়ার জন্য পাপের তওবা করা। কিন্তু পার্থিব কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করলে দ্রুত শাস্তি দেওয়া হয়। সুনান ইবনে মাজাহ, ৪২১২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, আজকাল পৃথিবীতে সম্পর্ক ছিন্ন করা খুবই সাধারণ। মানুষ তুচ্ছ জাগতিক কারণে সহজেই আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে। তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে কোনও ক্ষতি বস্তুজগতে যা ঘটে তা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু যদি তারা মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে তারা উভয় জগতেই দীর্ঘস্থায়ী কষ্টের সম্মুখীন হবে।

ইসলামী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার একটি কারণ যখন কেউ তার পেশার মাধ্যমে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদায় পৌঁছায়। এটি তাদের আত্মীয়স্বজনদের ত্যাগ করতে অনুপ্রাণিত করে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা আর তাদের সাথে যোগাযোগ করার যোগ্য নয়। তাদের সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতি তাদের ভালোবাসা তাদেরকে ভৌতিকতার দরজায় ঠেলে দেয় যা তাদের বিশ্বাস করে যে তাদের আত্মীয়স্বজনরা কেবল তাদের সম্পদ কেড়ে নিতে চায়।

পবিত্র কুরআন ইঙ্গিত দেয় যে, কিয়ামতের দিন এই বন্ধন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সূরা ৪ আন নিসা, আয়াত ১:

"...আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে প্রার্থনা করো এবং গর্ভাশয়কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সর্বদাই পর্যবেক্ষক।"

এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে আত্মীয়তার বন্ধন বজায় না রেখে কেউ ধার্মিকতা অর্জন করতে পারে না। সুতরাং যারা বিশ্বাস করে অতিরিক্ত ইবাদতের মাধ্যমে তারা তা অর্জন করতে পারে এবং উপবাস ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং তাই তাদের আচরণ পরিবর্তন করতে হবে।

ইসলাম মুসলমানদেরকে তাদের আত্মীয়স্বজনদের সকল প্রকার আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার শিক্ষা দেয়, যখনই এবং যেখানেই সম্ভব ভালো বিষয়ে সহায়তা করার মাধ্যমে। তাদেরকে এমন একটি গঠনমূলক মানসিকতা গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যা আত্মীয়দের সমাজের কল্যাণের জন্য একত্রিত করে, বরং একটি ধ্বংসাত্মক মানসিকতা যা কেবল পরিবারের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। সুনানে আবু দাউদের ৪৯১৯ নম্বর হাদিস অনুসারে, মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে।

যারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে তাদের পবিত্র কুরআনে অভিশপ্ত করা হয়েছে। সূরা ৪৭ মুহাম্মদ, আয়াত ২২-২৩:

"তাহলে কি তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করবে? [যারা তা করে] তারাই হল সেইসব লোক যাদের উপর আল্লাহ অভিশপ্ত করেছেন..."

আল্লাহর অভিশাপে আচ্ছন্ন এবং তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত, তখন এই পৃথিবীতে বা পরকালে কেউ কীভাবে তাদের বৈধ কামনা-বাসনা পূরণ করতে পারে ?

ইসলাম আত্মীয়স্বজনদের সাহায্য করার জন্য তাদের সামর্থ্যের বাইরে যেতে আদেশ দেয় না এবং তাদের আত্মীয়স্বজনের জন্য মহান আল্লাহর সীমানা ত্যাগ করতেও বলে না কারণ সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই যদি এর অর্থ হয় স্রষ্টার অবাধ্যতা। সুনান আবু দাউদের ২৬২৫ নম্বর হাদিসে এটি প্রমাণিত হয়েছে। অতএব, কখনও তাদের আত্মীয়দের মন্দ কাজে শরিক করা উচিত নয়। এই ক্ষেত্রে , একজন মুসলিমের উচিত তাদের আত্মীয়স্বজনদের সৎকাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে তাদের নিষেধ করো, তাদের প্রতি সম্মান বজায় রেখে। ৫ম সূরা আল-মায়েদা, আয়াত ২:

" আর তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

অসংখ্য সুবিধা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী ব্যক্তিই লাভ করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি সম্পর্ক রক্ষা করে, তার রিজিক এবং জীবনে অতিরিক্ত রহমত বর্ষিত হবে। সুনানে আবু দাউদের ১৬৯৩ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এর অর্থ হল, তাদের রিজিক যত কমই হোক না কেন, তাদের জন্য যথেষ্ট হবে এবং

এটি তাদের মানসিক প্রশান্তি প্রদান করবে। এবং শরীর। জীবনে অনুগ্রহের অর্থ হল তারা তাদের সমস্ত ধর্মীয় এবং পার্থিব কর্তব্য পালনের জন্য সময় পাবে। এই দুটি আশীর্বাদ মুসলমানরা তাদের সমগ্র জীবন এবং সম্পদ অর্জনের চেষ্টায় ব্যয় করে কিন্তু অনেকেই বুঝতে পারে না যে, মহান আল্লাহ তাদের উভয়কেই আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার ক্ষেত্রে।

আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা এত গুরুত্বপূর্ণ যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদেরকে আদেশ করেছেন এমনকি তাদের অমুসলিম আত্মীয়দের সাথেও এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা। সহীহ মুসলিম, ২৩২৪ নম্বরে এই পরামর্শ দেওয়া একটি হাদিস পাওয়া যায়।

শয়তানের একটি ফাঁদ হলো, তার লক্ষ্য হলো আত্মীয়স্বজন এবং সমাজের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা, যা পরিবার ভেঙে যায়। এবং সামাজিক বিভাজন। তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো ইসলামকে জাতি হিসেবে দুর্বল করা। দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ দশকের পর দশক ধরে চলতে থাকা এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে আসা ক্ষোভ পোষণ করার জন্য কুখ্যাত হয়ে উঠেছে। একজন ব্যক্তি দশকের পর দশক ধরে তার আত্মীয়ের সাথে ভালো ব্যবহার করবে কিন্তু একটি ভুল এবং তর্কের কারণে সে আর কখনও তাদের সাথে কথা বলবে না বলে শপথ করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন। সহীহ মুসলিমের ৬৫২৬ নম্বরে পাওয়া গেছে যে, একজন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের সাথে পার্থিব কোন বিষয়ে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা অবৈধ। যদি এটিই হয় আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ, তাহলে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার গুরুত্ব কল্পনা করা যায় কি? এই প্রশ্নটি সহীহ বুখারী, ৫৯৮৪ নম্বরে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি পার্থিব কারণে আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে এমন আয়াত ও হাদিসগুলো নিয়ে চিন্তা করা উচিত এবং উপলব্ধি করা উচিত যে, দশকের পর দশক ধরে পাপ করার পরও যদি মহান আল্লাহ তাঁর দরজা বন্ধ না করেন অথবা মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন না করেন, তাহলে মানুষ কেন ছোটখাটো জাগতিক বিষয়ের জন্য তাদের আত্মীয়স্বজনদের থেকে এত সহজেই মুখ ফিরিয়ে নেয়? যদি কেউ আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে চায়, তাহলে এই পরিবর্তন অবশ্যই ঘটাতে হবে।

ভালো করছি

হুনাইনের যুদ্ধের গনীমত বণ্টনের পর, হাওয়াজিন গোত্র মহানবী (সাঃ)-এর কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠায়, তারা ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয় এবং তাদের কাছ থেকে নেওয়া যুদ্ধের গনীমতের কিছু ফেরত চেয়ে অনুরোধ করে। মহানবী (সাঃ) তাদের জিজ্ঞাসা করেন যে তারা কি তাদের সম্পদ ফেরত পেতে চান, নাকি তাদের বন্দী আত্মীয়দের ফেরত পেতে চান। হাওয়াজিন প্রতিনিধিদল উত্তর দেয় যে তারা তাদের আত্মীয়দের মুক্ত করতে চান। এরপর তিনি তাদেরকে জামাতের নামাজের পর উঠে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেন এবং তাকে এবং সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের বন্দী আত্মীয়দের তাদের কাছে ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রকাশ্যে অনুরোধ করেন। যখন তারা নির্দেশ অনুসারে কাজ করেন, তখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তৎক্ষণাৎ সাড়া দেন এবং ঘোষণা করেন যে যুদ্ধের গনীমত থেকে তার অংশে আসা যেকোনো বন্দীকে অবিলম্বে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। মক্কা ও মদীনার সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, অবিলম্বে তাদের বন্দীদের নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে অর্পণ করেন, যাতে তিনি তাদের সাথে যা ইচ্ছা তাই করেন। নতুন ধর্মান্তরিত মুসলিমদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের বন্দীদের হাওয়াজিন প্রতিনিধিদলের কাছে ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানান। এরপর মহানবী (সা.) তাদের সকলকে তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য অনুরোধ করেন এবং পরবর্তী যুদ্ধের গনীমতের মাল থেকে আরও বেশি অংশ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। অবশেষে, সমস্ত মুসলিম হাওয়াজিন প্রতিনিধিদলের কাছে বন্দীদের ফিরিয়ে দিতে সম্মত হন। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৯৩ এবং ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ৪১৪-৪১৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি সাড়া দেওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে, এমনকি যখন কারও আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করা হয়। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৯২:

"তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও কল্যাণ [প্রতিদান] পাবে না। আর তোমরা যা ব্যয় করো, আল্লাহ তা জানেন।"

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতে পারে না, অর্থাৎ, যতক্ষণ না তারা তাদের প্রিয় জিনিসগুলিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক হয়, ততক্ষণ তাদের ঈমানে ত্রুটি থাকবে। যদিও অনেকে বিশ্বাস করে যে এই আয়াতটি সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু বাস্তবে এর অর্থ আরও অনেক বেশি। এর মধ্যে প্রতিটি আশীর্বাদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা একজন মুসলিম পছন্দ করে এবং ভালোবাসে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানরা তাদের মূল্যবান সময়কে এমন জিনিসের জন্য উৎসর্গ করতে খুশি যা তাদের সন্তুষ্ট করে। কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সময় উৎসর্গ করতে অস্বীকার করে, ফরজ কর্তব্যের বাইরে যা দিনে মাত্র এক বা দুই ঘন্টা সময় নেয়। অগণিত মুসলমান তাদের শারীরিক শক্তি বিভিন্ন আনন্দদায়ক কাজে উৎসর্গ করতে খুশি, তবুও তাদের অনেকেই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য, যেমন স্বেচ্ছায় রোজা রাখার জন্য, তা উৎসর্গ করতে অস্বীকার করে। সাধারণত, মানুষ তাদের ইচ্ছামত জিনিসগুলিতে প্রচেষ্টা করতে খুশি হয় যেমন অতিরিক্ত সম্পদ অর্জন করা যা তাদের প্রয়োজন হয় না, এমনকি যদি এর অর্থ তাদের অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হয় এবং তাদের ঘুম ত্যাগ করতে হয়, তবুও কতজন এইভাবে আল্লাহর আনুগত্যে তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়? স্বেচ্ছায় প্রার্থনা করার জন্য কতজন তাদের মূল্যবান ঘুম ত্যাগ করে?

এটা অদ্ভুত যে মুসলমানরা বৈধ পার্থিব ও ধর্মীয় আশীর্বাদ কামনা করে, কিন্তু একটি সহজ সত্য উপেক্ষা করে। তারা কেবল তখনই এই জিনিসগুলি পাবে যখন তারা তাদের আশীর্বাদগুলি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করবে। তারা

কীভাবে তাঁর কাছে ন্যূনতম জিনিসগুলি উৎসর্গ করতে পারে এবং তবুও তাদের সমস্ত স্বপ্ন পূরণের আশা করতে পারে? এই মনোভাব সত্যিই অদ্ভুত।

মন্দের বিরুদ্ধে ভালো

একবার নবী মুহাম্মদ (সাঃ) হাঁটছিলেন, এমন সময় একজন বেদুইন তাঁর কাছে এসে তাঁর চাদর এত জোরে টেনে ধরল যে, তাঁর কাঁধে একটা দাগ পড়ে গেল। বেদুইন তখন অভদ্রভাবে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে দাবি করল যে, তাঁকে কিছু সম্পদ দিন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মুচকি হেসে বেদুইনকে কিছু সম্পদ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীজীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৮৯-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে দেওয়া সহজ। কিন্তু একজন মুসলিমকে যা বিশেষ করে তোলে তা হলো যখন তারা মন্দের জবাব ভালো দিয়ে দেয়। এটিই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এই ধরণের আচরণ কখনোই একজন ব্যক্তির মর্যাদা হ্রাস করবে না। অন্যথায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই ধরণের আচরণ করতেন না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, ২০২৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে যখন কেউ মন্দের জবাব ভালো দিয়ে দেয়, যেমন অন্যদের ক্ষমা করে দেয়, তখন মহান আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেন। তাই এই মনোভাব কেবল অন্যদের উপকার করে না বরং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে এটি মুসলিমদের নিজেদের উপকার করে। ৪১ ফুসসিলাত, আয়াত ৩৪:

" আর ভালো কাজ আর মন্দ সমান নয়। [মন্দ কাজ] প্রতিহত করো সেই [কাজ] দ্বারা যা উত্তম; তাহলে যার সাথে তোমার শত্রুতা আছে সে [একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হয়ে যাবে।"

উপরন্তু, এই আয়াতের পরামর্শ অনুযায়ী, যদি কেউ এই মনোভাব গ্রহণ করে, তাহলে সে দেখতে পাবে যে যারা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে না, তারা অবশেষে তাদের কর্মের জন্য লজ্জিত হবে এবং তাদের মনোভাব পরিবর্তন করবে। এমনকি সবচেয়ে কঠিন হৃদয়ও এইভাবে ব্যবহার করা হলে প্রভাবিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে, তখন তার জন্য নেতিবাচক উত্তরের ঊর্ধ্বে উঠে সুন্দরভাবে উত্তর দেওয়াই ভালো। এতে স্বামী তার স্ত্রীকে আরও সম্মান ও ভালোবাসা দেখাবে। যখন কর্মক্ষেত্রে একজন সহকর্মী খারাপ আচরণ দেখায়, তখন ভালো আচরণের মাধ্যমে তাদের একজন সত্যিকারের মুসলিমের গুণাবলী প্রদর্শন করা ভালো। যখন কেউ এইরকম আচরণ করে, তখন তার চারপাশের লোকেরা তাদের আরও বেশি সম্মান ও ভালোবাসা দেখাবে, যার ফলে তাদের জীবন সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু যখন কেউ খারাপের উত্তর মন্দ দিয়ে দেয়, তখন তারা সর্বদা অন্যদের কাছ থেকে আরও খারাপের মুখোমুখি হবে যা উভয় জগতেই তাদের জীবনকে আরও কঠিন করে তুলবে। এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করলে এটি বেশ স্পষ্ট। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যখন অন্যরা সীমা অতিক্রম করে, তখন নিজেকে রক্ষা করা উচিত এবং সেই ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খারাপ চরিত্রের উত্তর ভালো চরিত্র দিয়ে দেওয়া উচিত।

একটি সফল তীর্থযাত্রা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের অষ্টম বছরে তায়েফ অভিযানের পর, তিনি যিয়ারত (উমরা) করেন এবং তারপর মদিনায় ফিরে যান। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫০০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ১৭৭৩ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একটি গৃহীত পবিত্র হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

পবিত্র হজ্জের আসল উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের পরকালের শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা। যেভাবে একজন মুসলিম পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য তাদের ঘর, ব্যবসা, সম্পদ, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সামাজিক মর্যাদা ত্যাগ করে, ঠিক একইভাবে এটি তাদের মৃত্যুর সময় ঘটবে, যখন তারা পরকালের শেষ যাত্রায় যাবে। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযীর ২৩৭৯ নম্বর হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, একজন ব্যক্তির পরিবার এবং সম্পদ তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং কেবল তাদের ভালো-মন্দ কর্মই তাদের সাথে থাকে।

যখন একজন মুসলিম তাদের পবিত্র হজ্জের সময় এই কথাটি মনে রাখবেন, তখন তারা এই দায়িত্বের সমস্ত দিক সঠিকভাবে পালন করবেন। এই মুসলিম পরিবর্তিত ব্যক্তি হয়ে বাড়ি ফিরে আসবে, কারণ তারা এই বস্তুগত জগতের অতিরিক্ত জিনিসপত্র সংগ্রহের চেয়ে পরকালের চূড়ান্ত যাত্রার প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে। তারা মহান আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়ার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুসারে চেষ্টা করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের

এবং তাদের উপর আস্থাশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য এই পৃথিবী থেকে অর্থ গ্রহণ করা, অপচয়, অতিরিক্ত ব্যয় বা অপচয় ছাড়াই। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে।

মুসলমানদের পবিত্র হজ্জকে ছুটির দিন এবং কেনাকাটার ভ্রমণ হিসেবে দেখা উচিত নয় কারণ এই মনোভাব এর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে। এটি মুসলমানদের তাদের পরকালের শেষ যাত্রার কথা মনে করিয়ে দেবে, এমন একটি যাত্রা যার কোন প্রত্যাবর্তন নেই এবং দ্বিতীয় কোন সুযোগ নেই। কেবলমাত্র এটিই পবিত্র হজ্জ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে এবং পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে অনুপ্রাণিত করবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে তাকে তাদের পবিত্র হজ্জের মাধ্যমে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে।

বিপদের মুখোমুখি

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের পর অষ্টম বছরে তায়েফ অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর, তায়েফের কিছু বাসিন্দা আরব উপদ্বীপে ইসলামের প্রসারের ফলে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। এই বাসিন্দাদের মধ্যে একজন ছিলেন উরওয়া বিন মাসউদ (রাঃ), যিনি তায়েফের জনগণের নেতাদের একজন ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর, উরওয়া বিন মাসউদ (রাঃ) নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে তার গোত্র, বনু সাকিফকে ইসলামের দিকে আহ্বান করার অনুমতি চান। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তারা তাকে হত্যা করবে, কারণ তিনি জানতেন যে তার গোত্র কতটা একগুঁয়ে এবং বিপজ্জনক। কিন্তু তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তার গোত্র তাকে ভালোবাসে এবং তার কোন ক্ষতি করবে না। যখন তিনি বাড়ি ফিরে আসেন এবং প্রকাশ্যে তার গোত্রকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন, তখন তারা তাকে তীর দিয়ে আক্রমণ করে এবং তাকে শহীদ করে। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫০০ এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর মহান জীবন", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৭৭-১৭৭৮ -এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ মুসলিমদের কাছ থেকে সেইসব অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার দাবি করেন না যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রাঃ) সহ্য করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন যেখানে তারা তাদের পরিবার, ঘরবাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে এক অপরিচিত দেশে হিজরত করেছিলেন, সবকিছুই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

তুলনামূলকভাবে, মুসলিমরা বর্তমানে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে, তা পূর্বসূরীদের মতো কঠিন নয়। অতএব, মুসলমানদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে

তাদের কেবল কয়েকটি ছোট ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, যেমন ফজরের ফরজ নামাজ আদায়ের জন্য কিছু ঘুম এবং ফরজ দান করার জন্য কিছু সম্পদ উৎসর্গ করতে হবে। মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ঘরবাড়ি ও পরিবার পরিজন ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন না। এই কৃতজ্ঞতা বাস্তবে দেখানো উচিত, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের আশীর্বাদ ব্যবহার করে।

এছাড়াও, যখন কোন মুসলিম সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন তাদের মনে রাখা উচিত যে, নবী-রাসূলগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং কীভাবে তারা আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে সেগুলো কাটিয়ে উঠেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এই জ্ঞান একজন মুসলিমকে তাদের সমস্যা কাটিয়ে ওঠার শক্তি প্রদান করতে পারে কারণ তারা জানে যে, নবী-রাসূলগণ আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন, তবুও তারা ধৈর্যের সাথে আরও কঠোর সমস্যা সহ্য করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে ইবনে মাজাহের ৪০২৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণ (সাঃ) সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা সহ্য করেছেন এবং নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

যদি কোন মুসলিম পূর্বসূরীদের ন্যায়পরায়ণ মনোভাব অনুসরণ করে, তাহলে আশা করা যায় যে পরকালে তারাও তাদের সাথেই থাকবে।

একটি সরল জীবন

নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় হিজরতের অষ্টম বছরে মক্কা নগরী বিজিত হয়। মক্কা ত্যাগ করার সময়, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আত্তাব বিন আসীদ (রাঃ) কে মক্কার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন এবং তাকে প্রতিদিন এক রূপার মুদ্রা বেতন দেন। আত্তাব (রাঃ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন যে, যদি কোন ব্যক্তি প্রতিদিন এক রূপার মুদ্রায় সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে তাকে ক্ষুধার্ত ও লোভী রাখুন। তিনি উপসংহারে বলেন যে, ঐ দিনের পর অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে তার আর কারোর প্রয়োজন নেই। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫০০-৫০১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি সরল জীবনযাপনের গুরুত্ব নির্দেশ করে। সুনানে ইবনে মাজাহের ৪১১৮ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

ইসলাম মুসলমানদের তাদের সমস্ত সম্পদ এবং বৈধ কামনা-বাসনা ত্যাগ করতে শেখায় না বরং তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে, যেমন খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান এবং ব্যবসা, একটি সরল জীবনধারা গ্রহণ করতে শেখায়, যাতে তারা পরকালের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য অবসর সময় পায়। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এই সরল জীবনের মধ্যে রয়েছে নিজের এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য এই পৃথিবীতে প্রচেষ্টা করা, অতিরিক্ত ব্যয়, অপচয় বা অপচয় ছাড়াই। একজন ব্যক্তি যত বেশি সরল জীবনের দিকে মনোনিবেশ করেন, ততই তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহ, মহিমান্বিতকে সন্তুষ্ট করার

উপায়ে ব্যবহার করা সহজ হয়ে ওঠে। এর ফলে উভয় জগতেই শান্তি এবং সাফল্য আসে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎ কর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

এছাড়াও, একজন মুসলিমের বুঝতে হবে যে তারা যত সহজ জীবনযাপন করবে, পার্থিব বিষয়বস্তুর উপর তাদের চাপ তত কম হবে এবং এর ফলে তারা পরকালের জন্য তত বেশি প্রচেষ্টা করতে পারবে, মানসিক, শারীরিক ও আত্মার শান্তি পাবে। কিন্তু একজন ব্যক্তির জীবন যত জটিল হবে, তত বেশি তারা চাপের সম্মুখীন হবে, অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং তাদের পরকালের জন্য কম প্রচেষ্টা করবে, কারণ পার্থিব বিষয়বস্তুর প্রতি তাদের ব্যস্ততা কখনোই শেষ হবে না বলে মনে হবে। এই মনোভাব তাদের মানসিক, শারীরিক ও আত্মার শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সরলতা এই পৃথিবীতে আরামের জীবন এবং বিচারের দিনে সরাসরি হিসাব-নিকাশের দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, একটি জটিল এবং আনন্দময় জীবন কেবল চাপপূর্ণ জীবন এবং বিচারের দিনে কঠোর এবং কঠিন হিসাব-নিকাশের দিকে পরিচালিত করবে। যে ব্যক্তি যত কঠোর হিসাব-নিকাশ করবে, তাকে তত বেশি শাস্তি দেওয়া হবে। সহিহ বুখারীতে প্রাপ্ত ১০৩ নম্বর হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে।

অভিবাসনের পর নবম বছর

হালাল মেনে চলা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, তিনি ফরয দান আদায়ের জন্য কিছু লোককে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। এই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ফিরে এসে ফরয দান আদায়ের জন্য নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে কিছু সম্পদ জমা দেন, কিন্তু কিছু সম্পদ রেখে দেন এবং মন্তব্য করেন যে এটি তাকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এরপর একটি খুতবা দেন যেখানে তিনি লোকটির নাম উল্লেখ করেননি যাতে তাকে লজ্জা না দেওয়া যায় বরং তার কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি তার কাজের তীব্র সমালোচনা করেন এবং স্পষ্ট করেন যে, কেবল ফরয দান আদায়ের সময় তাকে এই উপহার দেওয়া হয়েছিল। তিনি স্পষ্ট করেন যে, নেতা কর্তৃক দান সংগ্রহকারীকে বরাদ্দকৃত সম্পদই তাদের জন্য বৈধ। সহীহ বুখারী, ৭১৭৪ নম্বর এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রহঃ)-এর, দ্য নোবেল লাইফ অফ দ্য প্রফেট (সাঃ), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৯৮-১৮০০-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে উপহার নেওয়াকে ঘুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

জামে আত তিরমিযীতে ১৩৩৭ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, ঘুষ প্রদানকারী এবং ঘুষ গ্রহণকারী উভয়ই অভিশপ্ত।

অভিশাপের অর্থ হলো মহান আল্লাহর রহমত প্রত্যাহার করা। যখন এটি ঘটে, তখন পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃত স্থায়ী শান্তি এবং সাফল্য সম্ভব হয় না। ঘুষের মাধ্যমে মানুষ যে পার্থিব সাফল্য, যেমন সম্পদ, অর্জন করে, তা উভয় জগতেই বিরাট অসুবিধা, চাপ এবং শাস্তির উৎস হয়ে দাঁড়াবে, যদি না সে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। যেহেতু ঘুষ অবৈধ, তাই এর জন্য ব্যবহৃত যেকোনো ভালো কাজ প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং পাপ হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হবে। এমনকি যদি ঘুষগ্রহীতা কোনোভাবে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হয়, তবুও মানুষের বিরুদ্ধে তাদের পাপ বিচারের দিনে তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। সহিহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

অধিকন্তু, মহান আল্লাহর রহমত ছাড়া ঈমানের তিনটি দিক সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব নয়, যথা: মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া।

দুর্ভাগ্যবশত, আজকের যুগে ঘুষের মতো মহাপাপ পৃথিবীর সকল প্রান্তেই খুবই সাধারণ হয়ে উঠেছে। একমাত্র পার্থক্য হলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এটি প্রকাশ্যে করা হয় এবং উন্নত দেশগুলিতে গোপনে করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, ঘুষের মধ্যে একজন ব্যক্তি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের, যেমন একজন বিচারককে, এমন কিছু পাওয়ার জন্য উপহার প্রদান করেন যা তাদের নিজস্ব নয়। শুধুমাত্র তখনই ঘুষকে পাপ হিসেবে গণ্য করা হবে না যখন কাউকে তাদের নিজস্ব সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য ঘুষ দিতে বাধ্য করা হয়। এই ক্ষেত্রে অভিশাপ সেই ব্যক্তির উপর যে ঘুষ নেয়।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি মুসলিমরা সামগ্রিকভাবে ঘুষ এবং অন্যান্য দুর্নীতিমূলক অভ্যাস নির্মূল করতে চায়, তাহলে তাদের নিজেদেরকেই এগুলি এড়িয়ে চলতে হবে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই সঠিক মনোভাব গ্রহণ করা হলেই এটি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের উপর প্রভাব ফেলবে। এই লোকেরা এইভাবে আচরণ করার কারণ হল তারা সমাজকে দুর্নীতিমূলক অভ্যাসের উপর পরিচালিত হতে দেখে। কিন্তু যদি সমাজ, ব্যক্তিগত পর্যায়ে, এই অভ্যাসগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তি এইভাবে কাজ করার সাহস করবে না, কারণ তারা জানে যে জনগণ এর পক্ষে দাঁড়াবে না।

তাবুকের যুদ্ধ

সহজে এবং অসুবিধায় আনুগত্য

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, মহান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে নির্দেশ দেন। যখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে খবর পৌঁছায় যে, তারা ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে অবগত হওয়ার সাথে সাথে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর ফলে তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, প্রচণ্ড গরম এবং অস্বস্তিকর সময়ে তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেন। উপরন্তু, যাত্রা দীর্ঘ এবং অত্যন্ত কঠিন হবে। এই অভিযানে মোট ৩০,০০০ সৈন্য তার সাথে যোগ দেয় কিন্তু কেউ কেউ অবহেলা বা ভণ্ডামি করে পিছু হটে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত নাজিল করেছেন, যেখানে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে, যেমন ৯ম সূরা তওবা, আয়াত ৩৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা মাটির সাথে আঁকড়ে থাকো? তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট? কিন্তু আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের ভোগবিলাস [খুবই সামান্য] ছাড়া আর কিছুই নয়।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১ এবং ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৯:৩৮, পৃষ্ঠা ৮৭ -এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জীবনে একজন মুসলিম সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অথবা কঠিন সময়ের মুখোমুখি হবে। কেউই কেবল কিছু অসুবিধা ছাড়াই স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে না। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, সংজ্ঞা অনুসারে, যদিও অসুবিধাগুলি মোকাবেলা করা কঠিন, তবুও তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতি তার প্রকৃত মহত্ত্ব এবং দাসত্ব অর্জন এবং প্রদর্শনের একটি উপায়। উপরন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ যখন অসুবিধার মুখোমুখি হয় তখন তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জীবনের পাঠ শেখে। এবং মানুষ প্রায়শই স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে কঠিন সময় অভিজ্ঞতার পরে উন্নতির জন্য পরিবর্তিত হয়। এই সত্যটি বোঝার জন্য কেবল এটি নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে তবে সে বুঝতে পারবে যে আলোচিত বেশিরভাগ ঘটনা, যেমন এই ঘটনা, অসুবিধার সাথে জড়িত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে প্রকৃত মহত্ত্ব সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অভিজ্ঞতা লাভের মধ্যেই নিহিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে অসুবিধার মুখোমুখি হওয়ার মধ্যেই নিহিত। এটি প্রমাণিত হয় যে ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত প্রতিটি বড় বড় সমস্যাই তাদের জন্য চূড়ান্ত সাফল্যের সাথে শেষ হয় যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করেছে। তাই একজন মুসলিমের অসুবিধার মুখোমুখি হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করা উচিত নয় কারণ এটি কেবল তাদের জন্য উজ্জ্বল হওয়ার মুহূর্ত, যখন তারা আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের প্রকৃত দাসত্ব স্বীকার করে। এটি উভয় জগতের চূড়ান্ত সাফল্যের চাবিকাঠি।

অধিকন্তু, যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলেন, তাদের থেকে যারা কেবল মুখেই তাঁর প্রতি ঈমানের দাবি করেন, তাদের মধ্যে অসুবিধার মুখোমুখি হওয়া আলাদা। যারা কঠিন সময়ে আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থাকেন, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তারা আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস প্রমাণ করেন যে, স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে আল্লাহকে মেনে চলা প্রায়শই সহজ। অধিকন্তু, একজন মুসলিমকে দৃঢ় ঈমান অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে কারণ এটি তাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্য এবং কঠিন উভয় সময়েই আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থাকতে সাহায্য করবে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর

হাদীসে প্রাপ্ত স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণগুলি শিখলে এবং তার উপর আমল করলে দৃঢ় ঈমান অর্জন করা হয়, যা ব্যাখ্যা করে যে, আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলা উভয় জগতেই মানসিক প্রশান্তি এনে দেয়। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়বে। এই ব্যক্তি যখনই তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে, তখন সহজেই আল্লাহকে অমান্য করবে কারণ তারা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে তাদের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে বরং মহান আল্লাহর আনুগত্য করলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি আসে। অতএব, ইসলামী জ্ঞান শেখার এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে ঈমানের দৃঢ়তা অর্জন করতে হবে যাতে তারা সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। এর মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং তাদের জীবনের প্রতিটি জিনিসকে সঠিকভাবে স্থাপন করার মাধ্যমে।

আশীর্বাদ ব্যবহার করা

তাবুক অভিযান অত্যন্ত কঠিন ছিল, তাই কেউ কেউ অবহেলা বা ভণ্ডামি বশতঃ যোগদান থেকে বিরত ছিলেন। কেউ কেউ তাদের পার্থিব ব্যস্ততা এবং অর্থের অভাবের কারণে অভিযানে যোগদান থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিলেন। ফলস্বরূপ, মহান আল্লাহ তা'আলা সূরা তওবার ৯ম সূরার ৪১ নম্বর আয়াত নাজিল করেন:

"তোমরা বের হয়ে পড়ো, হালকা হোক বা ভারী, এবং আল্লাহর পথে তোমাদের ধন-সম্পদ ও জান দিয়ে জেহাদ করো। যদি তোমরা জানতে, তাহলে এটাই তোমাদের জন্য উত্তম।"

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৯:৪১, পৃষ্ঠা ৮৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে, একজন ব্যক্তির সম্পদের অভাব নিয়ে চিন্তিত হওয়া উচিত নয় এবং তার যা কিছু আছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যবহার করা উচিত।

দুঃখের বিষয় হল, কিছু মুসলিম একটি দুর্বল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে যা তাদের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যথা, তারা তাদের পরিস্থিতি এবং পরিস্থিতিকে অন্যদের সাথে তুলনা করে যারা সহজ পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে এবং এটিকে

একটি অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে যাতে তারা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে। উদাহরণস্বরূপ , একজন পূর্ণকালীন কাজকারী ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যে তাদের প্রচেষ্টার অভাবকে অজুহাত হিসেবে উপস্থাপন করে, নিজেকে এমন একজনের সাথে তুলনা করে যে খণ্ডকালীন কাজ করে এবং কেবল দাবি করে যে তাদের কাছে বেশি অবসর সময় থাকায় আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি করা তাদের পক্ষে সহজ। অথবা একজন দরিদ্র মুসলিম ব্যক্তি যে কোনও ধরণের দান-খয়রাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যারা বেশি সম্পদের অধিকারী এবং দাবি করে যে ধনী ব্যক্তি তাদের চেয়ে সহজে দান-খয়রাত করতে পারে। তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে এই অজুহাতগুলি তাদের আত্মাকে ভালো বোধ করতে পারে কিন্তু এটি তাদের এই পৃথিবীতে বা পরকালে সাহায্য করে না। আল্লাহ তাআলা চান না যে মানুষ অন্যের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করুক, তিনি কেবল চান যে মানুষ তার নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁর আনুগত্যে কাজ করুক। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি পূর্ণকালীন কাজ করে, সে তার অবসর সময় আল্লাহর আনুগত্যে উৎসর্গ করতে পারে, এমনকি যদি তা খণ্ডকালীন কাজ করে তার তুলনায় কমও হয়। এই ক্ষেত্রে খণ্ডকালীন কাজ করে, তার উপর পূর্ণকালীন কাজ করা ব্যক্তির কোন প্রভাব পড়ে না, তাই তাদেরকে কঠোর পরিশ্রম না করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা কেবল একটি অজুহাত। দরিদ্র মুসলিমের উচিত কেবল তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা, যদিও তা ধনী ব্যক্তির তুলনায় অনেক কম হয়, কারণ আল্লাহ তাআলা তাদের কাজের বিচার করবেন এবং তিনি তাদের অন্য মুসলিমদের কাজের বিচার করবেন না।

মুসলমানদের উচিত এই অপ্রয়োজনীয় অজুহাত ত্যাগ করা এবং তাদের নিজস্ব সাধ্য অনুযায়ী কেবল মহান আল্লাহর আনুগত্য করা।

খারাপ অজুহাত

তাবুক অভিযান অত্যন্ত কঠিন ছিল বলে, কেউ কেউ অবহেলা বা ভণ্ডামি বশতঃ যোগদান থেকে বিরত ছিল। মুনাফিকরা এই কঠিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য অনেক বোকামি এবং তুচ্ছ অজুহাত দেখিয়েছিল, যদিও তাদের উপর সাড়া দেওয়া এবং অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে আবেদন করেছিলেন যে তিনি তাকে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখুন কারণ তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে তিনি ভ্রমণের সময় যে বাইজেন্টাইন নারীদের মুখোমুখি হবেন তাদের প্রতিরোধ করতে পারবেন না। যেহেতু এই ব্যক্তি স্পষ্টতই অভিযানের জন্য একটি সম্পদ নয় বরং একটি দায় হবে, তাই তাকে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। এই বিষয়ে, মহান আল্লাহ তা'আলা সূরা তওবার ৯ নং আয়াত নাজিল করেছেন:

"আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, "আমাকে [ঘরে থাকতে] অনুমতি দাও এবং আমাকে পরীক্ষায় ফেলো না।" নিঃসন্দেহে, তারা পরীক্ষায় পতিত হয়েছে। এবং অবশ্যই, জাহান্নাম কাফেরদের ঘিরে ফেলবে।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের পার্থিব জিনিসের জন্য কোনও কর্তব্যের সাথে আপস করা উচিত নয় কারণ এই জিনিসগুলি অবশেষে উভয় জগতে তাদের জন্য বোঝা এবং শাস্তি হয়ে উঠবে।

একজন মুসলিমকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে, যদি তারা তাদের ফরজ কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা কোন না কোনভাবে আল্লাহর বিচার ও শাস্তি থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাবে। কেবল নিজের অবাধ্যতা এবং বিচার দিবসের বাস্তবতা উপেক্ষা করলেই তা দূর হবে না। যখন কেউ ইসলামকে তাদের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে এবং মুসলিম হয়, তখন এর মধ্যে ইসলামের সাথে সম্পর্কিত কর্তব্যগুলি পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। যে ব্যক্তি সংজ্ঞা অনুসারে একটি চাকরি গ্রহণ করে, তার সাথে আসা কর্তব্যগুলি গ্রহণ করে। যদি তারা কেবল তাদের কর্তব্যগুলি পালন করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে নিঃসন্দেহে তাকে বরখাস্ত করা হবে। একইভাবে, যে ব্যক্তি ইসলামকে তাদের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করার পর তাদের ফরজ কর্তব্যগুলি পালন করতে অস্বীকৃতি জানায়, সে উভয় জগতেই শাস্তি এবং অসুবিধায় আচ্ছন্ন হতে পারে।

বাস্তবে, বাধ্যতামূলক কর্তব্যগুলি খুব বেশি নয় এবং এর জন্য খুব বেশি সময় বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তিনি কাউকে তার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি বোঝা দেন না। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৮৬:

"আল্লাহ কোন আত্মার উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন বোঝা চাপান না..."

তাই একজন ব্যক্তির উপর যে কোন কর্তব্যই তারা পালন করতে পারে। শুধুমাত্র তাদের চরম অলসতা এবং দুর্বল বিচারবুদ্ধিই তাদেরকে তা করতে বাধা দেয়। তাই মুসলমানদের তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসারে তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে।

অন্যদের বোকা বানানো

তাবুক অভিযান অত্যন্ত কঠিন ছিল, তাই কেউ কেউ অবহেলা বা ভণ্ডামি বশত যোগদান থেকে বিরত ছিল। মুনাফিকরা এমনকি অন্যদের এই অভিযানে যোগদান থেকে বিরত রেখে বিভ্রান্ত করার জন্য কঠোর চেষ্টা করেছিল। এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ তা'আলা সূরা তওবার ৯ম আয়াত, ৮১-৮২ নাযিল করেছেন:

"যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তারা আল্লাহর রাসূলের (প্রস্থানের) পর (ঘরে) থাকায় আনন্দিত হয়েছিল এবং আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জেহাদ করা অপছন্দ করেছিল এবং বলেছিল, "গরমের মধ্যে বের হও না।" বলো, "জাহান্নামের আগুন তাপের চেয়েও তীব্র" - যদি তারা বুঝতে পারত। তাই তারা তাদের উপার্জনের প্রতিদান হিসেবে অল্প হেসে ফেলুক এবং [তারপর] প্রচুর কাঁদুক।"

সিরাত ইবনে হিশামের ২৪১-২৪২ পৃষ্ঠায় এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ভণ্ডামির একটি অংশ হলো, একজন ব্যক্তি কেবল নিজে খারাপ কাজ করে না এবং সৎ কাজ থেকে বিরত থাকে না বরং অন্যদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করে। তারা চায় অন্যরাও তাদের মতো একই নৌকায় থাকুক যাতে তারা তাদের খারাপ চরিত্রে কিছুটা সান্ত্বনা পায়। তারা কেবল নিজেকে ডুবিয়ে দেয় না বরং তাদের সাথে অন্যদেরও ডুবিয়ে দেয়। মুসলমানদের জানা উচিত যে, একজন ব্যক্তি তার আহ্বানের কারণে পাপ করলে অন্য প্রতিটি ব্যক্তির জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এই ব্যক্তির সাথে এমন আচরণ করা হবে যেন সে পাপ

করেছে যদিও সে কেবল অন্যদেরকেই এর দিকে আহ্বান করেছিল। সুনানে ইবনে মাজাহ, ২০৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে । এই কারণেই কেউ কেউ বলেছেন যে, ধন্য সেই ব্যক্তি যার পাপ তাদের সাথে মারা যায় কারণ অন্যরা যদি তাদের খারাপ পরামর্শ অনুসারে কাজ করে তবে তাদের পাপ বৃদ্ধি পাবে যদিও তারা আর বেঁচে নেই।

এছাড়াও, আলোচিত মূল ঘটনাটি খারাপ সাহচর্যের বিরুদ্ধেও সতর্ক করে।

মুসলমানদের মনে রাখা উচিত যে, প্রকৃত ভালোবাসার একটি প্রধান লক্ষণ হলো যখন কেউ তার প্রিয়জনকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কারণ আনুগত্য ইহকাল ও পরকালে সাফল্য ও নিরাপত্তার দিকে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি কারো জন্য নিরাপত্তা ও সাফল্য কামনা করে না, সে কখনোই তাকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসতে পারে না, সে যাই দাবি করুক বা অন্য ব্যক্তির সাথে কেমন আচরণ করুক না কেন। একজন ব্যক্তি যখন তার প্রিয়জনকে চাকরির মতো পার্থিব সাফল্য লাভ করে, তখন ঠিক যেমন খুশি হয়, তেমনি সেও তার প্রিয়জনকে আখেরাতে সাফল্য লাভ করতে চায়। যদি একজন ব্যক্তি অন্যের নিরাপত্তা ও সাফল্য লাভের বিষয়ে চিন্তা না করে, বিশেষ করে পরকালে, তাহলে সে তাকে ভালোবাসে না।

একজন প্রকৃত প্রেমিক তার প্রিয়জনকে এই পৃথিবীতে বা পরকালে কষ্ট এবং শাস্তির সম্মুখীন হতে দেখা এবং জানা সহ্য করতে পারে না। এটি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই এড়ানো সম্ভব। অতএব, তারা সর্বদা তাদের প্রিয়জনকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করবে। যদি কেউ অন্যকে আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে নিজের স্বার্থ বা অন্যের স্বার্থের দিকে পরিচালিত করে, তাহলে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাকে সত্যিকার

অর্থে ভালোবাসে না। এটি বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়স্বজনের মতো সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত মূল্যায়ন করা যে তাদের জীবনের বিষয়গুলি তাদেরকে মহান আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে কিনা। যদি তারা তা করে তবে এটি তাদের প্রতি তাদের ভালোবাসার স্পষ্ট লক্ষণ। যদি তারা তা না করে তবে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাদেরকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে না। অধ্যায় ৪৩ আয যুখরুফ, আয়াত ৬৭:

"সেদিন ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হবে, কেবল সৎকর্মশীলরা ছাড়া।"

পরিশেষে, আলোচ্য মূল ঘটনাটি এও ইঙ্গিত দেয় যে, সহজ মনে হওয়া পথ বেছে নিলে তা মনের শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে না যদি তা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য থেকে বিরত থাকে। ঠিক যেমন পার্থিব সাফল্য অর্জনের জন্য, যেমন ডাক্তার হওয়ার জন্য, জীবনে কঠিন পথ বেছে নিতে হয়, একইভাবে, যে ব্যক্তি উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে চায় তাকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম এবং প্রচেষ্টার পথ বেছে নিতে হবে, এমন একটি পথ যা প্রায়শই তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। এই পথে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকবে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। অতএব এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি সহজ মনে হওয়া পথ বেছে নেয় এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করতে বাধ্য করে না, সে তাদের প্রদত্ত অনুগ্রহের অপব্যবহার করবে। এটি তাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন থেকে বিরত রাখবে

এবং এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল পথে পরিচালিত করবে। এর ফলে উভয় জগতেই চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধা দেখা দেবে, এমনকি যদি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে, এমনকি যদি তা তার আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। কারণ, মনের ও শরীরের শান্তি অর্জনের জন্য নিজের আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা একটি সামান্য মূল্য, ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি সুস্বাস্থ্য অর্জনের জন্য তার খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করলেও মনের শান্তি পেতে ব্যর্থ হয় তার জন্য জীবন একটি অন্ধকার কারাগারে পরিণত হয়। ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের দেখলে এটি বেশ স্পষ্ট হয়। অধ্যায় ৯ তওবার ৮২ নম্বর আয়াতে:

"তারা যা অর্জন করেছিল তার প্রতিদান হিসেবে তারা একটু হেসে ফেলুক এবং [তারপর] অনেক কাঁদুক।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

রাষ্ট্রদ্রোহের শাস্তি

তাবুক অভিযান অত্যন্ত কঠিন ছিল বলে, কেউ কেউ অবহেলা বা ভণ্ডামির কারণে যোগদান থেকে বিরত ছিল। এমনকি মুনাফিকরা অন্যদের এই অভিযানে যোগদান থেকে বিরত রেখে বিভ্রান্ত করার জন্য কঠোর চেষ্টা করেছিল। মুনাফিকরা তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য সুওয়াইলিম নামে একজন অমুসলিমের বাড়িতে একটি সভা আয়োজন করেছিল। তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কাজ যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছায়, তখন অংশগ্রহণকারীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পরিবর্তে তিনি সমস্ত মুনাফিকদের কাছে একটি বার্তা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং তাই সুওয়াইলিমের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাউকে পাঠান। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রহ.)-এর "প্রভুর (সা.)-এর নোবেল জীবন", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮২২-১৮২৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, যদি একজন ব্যক্তি অন্যদের ভালো কাজে সাহায্য করতে না পারেন, তাহলে তিনি অন্তত নিরপেক্ষ থাকতে পারেন।

মুসলমানরা প্রায়শই দাবি করে যে, যেহেতু তারা তাদের পার্থিব কাজে ব্যস্ত থাকে, তাই তাদের স্বেচ্ছাসেবী সৎকর্ম করা কঠিন হয়ে পড়ে, বিশেষ করে মানুষের সাথে সম্পর্কিত কাজ, যেমন কাউকে শারীরিকভাবে সাহায্য করা। যদিও মুসলমানদের যতটা সম্ভব স্বেচ্ছাসেবী সৎকর্ম করার চেষ্টা করা উচিত, যা তাদের উভয় জগতেই উপকৃত করবে, অন্যদিকে, তাদের পার্থিব কার্যকলাপ কেবল এই পৃথিবীতেই তাদের উপকৃত করবে, তবুও এই মুসলমানদের অন্তত অন্যদের প্রতি নিরপেক্ষ মনোভাব অবলম্বন করা উচিত। এর অর্থ হল, যদি একজন মুসলিম অন্যদের সাহায্য করতে না পারে, তাহলে তাদের বৈধ ও ভালো কাজে বাধা দেওয়া উচিত নয়। যদি তারা অন্যদের খুশি করতে না পারে, তাহলে তাদের দুঃখ দেওয়া উচিত

নয়। যদি তারা অন্যদের হাসাতে না পারে, তাহলে তাদের কাঁদানো উচিত নয়। এটি অসংখ্য পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক মুসলিম অন্যদের প্রতি ভালো করতে পারে, যেমন তাদের মানসিক সমর্থন প্রদান করা, কিন্তু একই সাথে তারা মানুষের প্রতি নেতিবাচক আচরণ করে তাদের ভালো কাজগুলিকে ধ্বংস করে। এটি লক্ষণীয় যে, যদি একজন মুসলিম অন্যদের প্রতি অতিরিক্ত নেতিবাচক আচরণ করে, তাহলে বিচারের দিনে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহিহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। নিরপেক্ষ মানসিকতা থাকা আসলে একটি ভালো কাজ, যখন তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। সহিহ মুসলিমের ২৫০ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, জামে আত তিরমিযী, ২৫১৫ নম্বরে বর্ণিত হাদিস অনুসারে, অন্যদের সাথে ইতিবাচক আচরণ করাই সর্বোত্তম, যা একজন প্রকৃত মুমিনের লক্ষণ। কিন্তু যদি তারা এটি করতে না পারে তবে তাদের অন্তত অন্যদের সাথে নিরপেক্ষ আচরণ করা উচিত। কারণ অন্যদের সাথে নেতিবাচক আচরণ করা একজনের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

দরকারী সম্পদ

তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষকে অভিযানে দান করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, তাদের শক্তি অনুসারে সাহায্য করেছিলেন এবং বিন্দুমাত্র পিছপা হননি। উদাহরণস্বরূপ, জামে আত তিরমিযী, ৩৭০১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে যে, উসমান বিন আফফান , আল্লাহ যখন তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে তিনি ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা দান করলেন। তিনি সেগুলো মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর কোলে ঢেলে দিলেন। তাঁর উপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক, যিনি মন্তব্য করেছিলেন যে এরপর থেকে আর কোনও কিছুই তাঁর বিশ্বাসের ক্ষতি করতে পারবে না। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তাঁর অর্ধেক সম্পদ দান করেছিলেন। অন্যদিকে, আবু বকর (রাঃ) তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করেছিলেন। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি তাঁর পরিবারের জন্য কী রেখে গেছেন, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি মহান আল্লাহ এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের জন্য রেখে গেছেন। জামে আত তিরমিযী, ৩৬৭৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আবদুর রহমান (রাঃ) চার হাজার রৌপ্য মুদ্রা দান করেছিলেন। মুনাফিকরা তাকে লোক দেখানোর জন্য অভিযুক্ত করেছিল এবং ফলস্বরূপ, মহান আল্লাহ তা'আলা সূরা তাওবার ৯ম সূরার ৭৯ নম্বর আয়াত নাজিল করেছিলেন:

"যারা মুমিনদের মধ্যে দানকারীদের দান সম্পর্কে সমালোচনা করে এবং যারা তাদের প্রচেষ্টা ছাড়া [ব্যয় করার মতো] কিছুই পায় না তাদের [সমালোচনা করে], তাই তারা তাদের সাথে উপহাস করে- আল্লাহ তাদের সাথে উপহাস করবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

আবু আকিল (রাঃ) সারা রাত পরিশ্রম করে অভিযানে অংশ নেন এবং ফলস্বরূপ অভিযানে এক মুঠো খেজুর দান করেন। মুনাফিকরা তার দানকে উপহাস করে এবং ফলস্বরূপ, মহান আল্লাহ তা'আলা সূরা তওবার ৯ম সূরার ৭৯ নম্বর আয়াত নাজিল করেন:

"যারা মুমিনদের মধ্যে দানকারীদের দান সম্পর্কে সমালোচনা করে এবং যারা তাদের প্রচেষ্টা ছাড়া [ব্যয় করার মতো] কিছুই পায় না তাদের [সমালোচনা করে], তাই তারা তাদের সাথে উপহাস করে- আল্লাহ তাদের সাথে উপহাস করবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

ইমাম মুহাম্মাদ কান্ধলভীর, হায়াতুস সাহাবাহ, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 191-192 এবং ইমাম ওয়াহিদীর, আসবাব আল নুজুল, 9:79, পৃষ্ঠা 91 এ আলোচনা করা হয়েছে।

এমনকি মহিলারাও এই অভিযানে যথাসাধ্য দান করেছিলেন, যেমন তাদের গয়না। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ৪২৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাগুলি পরিমাণের চেয়ে গুণমানের গুরুত্ব নির্দেশ করে। অর্থাৎ, একজন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্য অনুসারে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

সহীহ বুখারীতে ১৪১৭ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিমের উচিত অর্ধেক খেজুর দান করেও নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানো।

ইসলামের অন্যান্য অনেক শিক্ষার মতো এই হাদিসটিও পরিমাণের চেয়ে গুণমানের গুরুত্ব নির্দেশ করে। শয়তান প্রায়শই মুসলমানদের সৎকর্ম সম্পাদন থেকে বিরত রাখে, এই বিশ্বাস করিয়ে যে এই কাজটি খুবই ছোট এবং তাই মহান আল্লাহর কাছে তা তুচ্ছ। দুর্ভাগ্যবশত, এমনকি অন্যান্য অজ্ঞ মুসলিমরাও প্রায়শই অন্যদেরকে কিছু সৎকর্ম থেকে নিরুৎসাহিত করে দাবি করে যে সেগুলি তুচ্ছ এবং অপ্রয়োজনীয়।

একজন মুসলিমের জন্য এই ফাঁদে না পড়া এবং ছোট-বড় সকল সৎকর্ম সম্পাদনের চেষ্টা করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মহান আল্লাহ নিঃসন্দেহে একজন ব্যক্তির গুণাবলী পর্যবেক্ষণ করেন এবং এর ভিত্তিতেই মানুষকে বিচার করেন। এই গুণাবলীর একটি দিক হল ব্যক্তির নিয়ত, অর্থাৎ, কেউ তা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করছে কিনা, নাকি অন্য কোনও কারণে, যেমন লোক দেখানোর জন্য করছে কিনা।

একজন মুসলিমের প্রথমে তাদের সৎকর্মের গুণমান সংশোধন করার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত, যেমন একটি সৎ নিয়ত থাকা, এবং তারপর নিশ্চিত করা

উচিত যে সৎকর্মের উৎস, যেমন দান, একটি বৈধ উৎস থেকে, কারণ যে কোনও কাজ যার ভিত্তি হারাম তা গ্রহণ করা হবে না। জামে আত তিরমিযী, নম্বর 661-এ প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এরপর, একজন মুসলিমের উচিত তাদের সামর্থ্য এবং শক্তি অনুসারে সমস্ত স্বেচ্ছামূলক সৎকর্ম করা। সহীহ বুখারী, নম্বর 6465-এ প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্ট করে বলেছেন যে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হল নিয়মিত কাজ, এমনকি যদি তা ছোট বলেও মনে করা হয়।

তাছাড়া, নিয়মিতভাবে সৎকর্ম করলে একজন মুসলিমের জীবনে ভালো কিছু আসার সম্ভাবনা বেশি, যা কখনো কখনো কোনো বড় কাজ করার তুলনায় বেশি। স্বেচ্ছাসেবী দানের ক্ষেত্রে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিত দান করা, এমনকি যদি তা এক পাউন্ডও হয়, এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে, মহান আল্লাহ তা'আলা বিচারের দিন এটিকে পুরষ্কারের পাহাড়ে পরিণত করবেন। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, ৬৬২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলিমের উচিত পরিমাণের চেয়ে গুণমানের উপর মনোযোগ দেওয়া এবং তাদের সামর্থ্য ও শক্তি অনুসারে নিয়মিতভাবে সকল ধরণের সৎকর্ম করা।

সম্পদ এবং সুযোগ

কিছু দরিদ্র সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, তাবুকের দীর্ঘ ও কঠিন অভিযানে অংশগ্রহণ করার মতো সম্পদের অধিকারী ছিলেন না এবং কিছু ক্ষেত্রে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের সাহায্য করার মতো সম্পদের অধিকারী ছিলেন না। যদিও আল্লাহ, স্বয়ং, তাদের ক্ষমা করেছিলেন, তবুও তারা এতটাই শোকাহত ছিলেন যে তারা অভিযানে অংশগ্রহণ করতে না পারার জন্য কাঁদতেন। সূরা ৯, তাওবাহ, আয়াত ৯২:

“তাদের উপরও কোন দোষ নেই, যারা যখন তোমার কাছে এসেছিলো যাতে তুমি তাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাও, তখন তুমি বলেছিলে, “তোমাকে বহন করার জন্য আমি কিছুই পাচ্ছি না।” তারা ফিরে গেল, অথচ তাদের চোখ অশ্রুসজল ছিল এই দুঃখে যে তারা [আল্লাহর পথে] ব্যয় করার মতো কিছু পাচ্ছে না।”

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি একজন ব্যক্তিকে প্রদত্ত প্রতিটি সম্পদ এবং সুযোগ, যেমন সময় এবং সম্পদ, উপলব্ধি করা এবং সঠিকভাবে ব্যবহারের গুরুত্ব নির্দেশ করে। অতএব, মুসলিমদের অবশ্যই ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সমস্ত সম্পদ এবং সুযোগ সঠিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকবে। এই আচরণ উভয় জগতেই

মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত সম্পদ এবং সুযোগগুলি উপলব্ধি করতে এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয় সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করবে না এবং তাদের মৃত্যুর সময় এবং বিচারের দিন তাদের কাছে অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। সূরা ৮৯ আল-ফজর, আয়াত ২৩-২৪:

"এবং সেদিন জাহান্নামকে সামনে আনা হবে - সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু স্মরণ তার জন্য কেমন হবে? সে বলবে, "হায়, আমি যদি আমার জীবনের জন্য [কিছু কল্যাণ] আগে পাঠাতাম।"

পথনির্দেশনার পুরস্কার

কিছু দরিদ্র সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাবুকের দীর্ঘ ও কঠিন অভিযানে অংশগ্রহণ করার মতো সম্পদের অধিকারী ছিলেন না। এই দুই সাহাবীকে ইবনে ইয়ামিন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, কাঁদতে দেখেছিলেন। ইবনে ইয়ামিন, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তারপর তাদের উট দিয়েছিলেন এবং কিছু খেজুর দিয়েছিলেন যাতে তারা অভিযানে যোগ দিতে পারে। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, ২৬৭৪ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে ভালো কিছুর দিকে পরিচালিত করে, সে তাদের উপদেশ অনুসারে কাজ করা লোকদের সমান সওয়াব পাবে। আর যারা অন্যদের পাপের দিকে পরিচালিত করে, তাদের উপর এমনভাবে জবাবদিহি করা হবে যেন তারা পাপ করেছে।

অন্যদের উপদেশ ও নির্দেশনা দেওয়ার সময় মুসলমানদের সতর্ক থাকা গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুসলিমের উচিত কেবল ভালো কাজেই অন্যদের উপদেশ দেওয়া যাতে তারা এর প্রতিদান পায় এবং আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হওয়ার উপদেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকা। কেউ যদি কেবল এই দাবি করে যে সে অন্যদের পাপের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, এমনকি যদি সে নিজে পাপ নাও করে, তাহলেও বিচার দিবসে শাস্তি থেকে বাঁচবে না। মহান আল্লাহ, পথপ্রদর্শক এবং অনুসারী উভয়কেই তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করবেন। অতএব, মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে কেবল সেই কাজ করার পরামর্শ দেওয়া যা তারা নিজেরাই করত। যদি তারা তাদের আমলনামায় কোন কাজ লিপিবদ্ধ করা অপছন্দ করে, তাহলে তাদের অন্যদের সেই কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়।

এই ইসলামী নীতির কারণে, মুসলমানদের উচিত অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা নিশ্চিত করা, কারণ অন্যদের ভুল উপদেশ দিলে তারা সহজেই তাদের পাপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

উপরন্তু, এই নীতিটি মুসলমানদের জন্য সম্পদের মতো সামর্থ্যের অভাবে নিজেরা যে কাজ করতে পারে না তার জন্য সওয়াব অর্জনের একটি অত্যন্ত সহজ উপায়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি আর্থিকভাবে দান করতে সক্ষম নয়, সে অন্যদেরকেও তা করতে উৎসাহিত করতে পারে এবং এর ফলে তারা দানকারীর মতোই সওয়াব পাবে।

অধিকন্তু, মৃত্যুর পরেও মানুষের সৎকর্মের বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য এই ইসলামী নীতি একটি চমৎকার উপায়। যত বেশি মানুষ অন্যদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত করবে, তত বেশি তাদের সৎকর্ম বৃদ্ধি পাবে। এই উত্তরাধিকার সম্পর্কে একজন মুসলিমকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে, কারণ সম্পত্তির সাম্রাজ্যের মতো অন্যান্য সমস্ত উত্তরাধিকার আসবে এবং যাবে, এবং মৃত্যুর পরে তা তাদের কোনও কাজে আসবে না। যদি কিছু থাকে, তবে তাদের সাম্রাজ্য উপার্জন এবং জমা করার জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে, যখন তাদের উত্তরাধিকারীরা মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সাম্রাজ্য উপভোগ করবে।

উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ

কিছু দরিদ্র সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাবুকের দীর্ঘ ও কঠিন অভিযানে অংশগ্রহণ করার মতো সম্পদের অধিকারী ছিলেন না। ওয়াসিলা বিন আকসা, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, এই দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি যুদ্ধের গনীমতের অংশ যে কাউকে সেনাবাহিনীতে যোগদানে সাহায্য করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে দিতেন। একজন বৃদ্ধ সাহাবী, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তার সাথে তার ঘোড়ার পশু এবং খাবার ভাগ করে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন যাতে তিনি অভিযানে যোগ দিতে পারেন। পরবর্তী এক অভিযানে, ওয়াসিলা, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, যুদ্ধের কিছু গনীমতের মাল অর্জন করেন এবং বৃদ্ধ সাহাবী, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাকে দিতেন, যিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং মন্তব্য করেন যে তিনি কেবল আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান চান। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, নবী (সাঃ) এর নোবেল লাইফ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮১৮-১৮১৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক হওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

জামে আত তিরমিযীতে ৩১৫৪ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ না করে, বরং লোক দেখানোর জন্য কাজ করে, তাদেরকে বলা হবে যে, বিচারের দিন তারা তাদের সেইসব লোকদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান পাবে যারা তাদের জন্য কাজ করেছে, যা বাস্তবে করা সম্ভব নয়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সকল কাজের ভিত্তি, এমনকি ইসলামও, নিয়ত। এটিই সেই জিনিস যার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তাআলা মানুষের বিচার করেন। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত ১ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলিমের উচিত সকল ধর্মীয় ও পার্থিব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা, যাতে উভয় জগতেই তার কাছ থেকে প্রতিদান লাভ করা যায়। এই সঠিক মানসিকতার একটি লক্ষণ হল যে, এই ব্যক্তি তার কাজের জন্য মানুষ তার প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক, তা আশা করে না এবং চায় না। যদি কেউ এটি চায় তবে এটি তার ভুল উদ্দেশ্যকে নির্দেশ করে।

অধিকন্তু, সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করলে দুঃখ এবং তিক্ততা রোধ করা যায় কারণ যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করে, সে অবশেষে অকৃতজ্ঞ লোকদের মুখোমুখি হবে যারা তাদের বিরক্ত এবং তিক্ত করে তুলবে, কারণ তারা মনে করবে যে তারা তাদের প্রচেষ্টা এবং সময় নষ্ট করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি পিতামাতা এবং আত্মীয়দের মধ্যে দেখা যায় কারণ তারা প্রায়শই তাদের সন্তান এবং আত্মীয়দের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তাদের জন্য। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে, সে অন্যদের প্রতি, যেমন তাদের সন্তানদের প্রতি, তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবে এবং যখন তারা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয় তখন কখনও তিক্ত বা ক্রুদ্ধ হয় না। এই মনোভাব মনের শান্তি এবং সাধারণ সুখের দিকে পরিচালিত করে কারণ তারা জানে যে, মহান আল্লাহ তাদের সৎকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত এবং তাদের এর জন্য পুরস্কৃত করবেন। এইভাবেই সকল মুসলমানকে কাজ করতে হবে অন্যথায় বিচারের দিন তারা খালি হাতে থাকতে পারে। অধ্যায় ১৮ আল কাহফ, আয়াত ১১০:

"...অতএব যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।"

অনেক কথা, সামান্য কাজ

তাবুক অভিযানের সময়, মহানবী (সাঃ) থানিয়াতুল ওয়াদায় শিবির স্থাপন করেন। মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই এবং তার অনুসারীরা মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে ছিলেন কিন্তু মূল শিবির থেকে দূরে শিবির স্থাপন করেন। যখন মহানবী (সাঃ) আবার যাত্রা শুরু করেন, তখন আবদুল্লাহ বিন উবাই গোপনে মুনাফিকদের সাথেই থেকে যান এবং তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অভিযানে যোগ দেননি। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা অনেক আয়াত নাজিল করেছেন, যেমন সূরা সূরা তওবা, আয়াত ৪৭:

"যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো, তাহলে তারা তোমাদের মধ্যে কেবল বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করতো, এবং তারা তোমাদের মধ্যে ফিতনা [অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ সৃষ্টির] চেষ্টায় তৎপর থাকতো। আর তোমাদের মধ্যে তাদের কথা শুনতে আগ্রহী লোকও আছে। আর আল্লাহ জালেমদের সম্পর্কে জানেন।"

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৯:৪২-৪৭, পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ভণ্ডামির একটি দিক হলো যখন কেউ মৌখিকভাবে অন্যদের এবং তাদের ভালো প্রকল্পের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে, যেমন মসজিদ নির্মাণ, কিন্তু যখন সম্পদ দান করার মতো প্রকল্পে অংশ নেওয়ার সময় আসে, তখন মনে হয় যেন তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। একইভাবে, যখন মানুষ সুখের সময় পার করে, তখন তারা মৌখিকভাবে তাদের প্রতি তাদের আনুগত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু যখন মানুষ সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন এই ভণ্ডামিরা কোনও মানসিক বা শারীরিক সমর্থন দেয় না। বরং তারা তাদের সমালোচনা করে। মহানবী (সা.)-এর সময়ে মুনাফিকদের মনোভাব ছিল এটাই। সূরা ৪ আন-নিসা, আয়াত ৬২:

"তাহলে কেমন হবে যখন তাদের উপর তাদের কৃতকর্মের কারণে কোন বিপদ আসে এবং তারা তোমার কাছে আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, "আমরা কেবল সদাচরণ এবং আশ্রয়দানের ইচ্ছা করেছিলাম।"

এছাড়াও, আলোচ্য মূল আয়াতটি সমাজের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টির মন্দ বৈশিষ্ট্য এড়িয়ে চলার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। যদি কোন ব্যক্তি অন্যদেরকে ভালো কাজে সাহায্য করতে না পারে, তাহলে তাকে অবশ্যই নিরপেক্ষ থাকতে হবে এবং সমাজের মধ্যে দুর্নীতি ও সমস্যা ছড়াতে হবে না। এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়। এটি একজনের ইসলামের পরিপূর্ণতার দিকে পরিচালিত করে, যা জামে আত তিরমিযী, ২৩১৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, একজনকে হয় ভালো কথা বলতে হবে অথবা চুপ থাকতে হবে। এই দুটি জিনিস নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি কেবল সমাজের মধ্যে ভালোর প্রসার ঘটাবে।

এছাড়াও, আলোচ্য মূল আয়াতটি মুসলিমদের সতর্ক করে বলেছে যে, যারা সমাজের মধ্যে নেতিবাচকতা ছড়ায় তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলতে হবে। এই ধরণের লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করা বা কথা বলা উচিত নয়, কারণ এটি কেবল সমাজের

মধ্যে মন্দ ছড়াতে উৎসাহিত করে। এই ধরণের লোকদের ভদ্রভাবে এড়িয়ে চলা উচিত যতক্ষণ না তারা তাদের আচরণ পরিবর্তন করে।

ঝামেলা সৃষ্টিকারীরা

তাবুক অভিযানের সময়, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) আলী বিন আবু তালিব (রাঃ)-কে তার পরিবারের দেখাশোনার জন্য মদীনায় রেখে যান। মুনাফিকরা তার পিছনে থাকার কারণ সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করে এবং দাবি করে যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে অপছন্দ করার কারণে তিনি তাকে পিছনে রেখে গেছেন। আলী (রাঃ)-এর এই কথা শুনে তিনি এতটাই মর্মাহত হয়েছিলেন যে তিনি মদীনা ছেড়ে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য তাঁর সাথে দেখা করেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে তাঁর ইচ্ছার কথা আশ্বস্ত করেন এবং তাঁর পরিবারের দেখাশোনা করার জন্য মদীনায় ফিরে যেতে বলেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে আলী (রাঃ)-এর সাথে তাঁর ভাই হযরত মুসা (সাঃ)-এর দ্বারা নিযুক্ত হযরত হারুন (সাঃ)-এর মতোই ছিলেন। স্পষ্ট পার্থক্য ছিল যে, শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরে আর কোন নবী আসবে না। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৭-৮-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের অবশ্যই অন্যদের সম্পর্কে বিদ্বেষপূর্ণ গুজব ছড়ানো এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি ভণ্ডামির একটি বৈশিষ্ট্য।

সহীহ মুসলিমের ২৯০ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি বিদ্বেষপূর্ণ পরচর্চা ছড়ায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এই সেই ব্যক্তি যে গুজব ছড়ায়, তা সত্য হোক বা মিথ্যা, যা মানুষের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করে এবং সম্পর্ক ভাঙার দিকে পরিচালিত করে। এটি একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য এবং যারা এই ধরণের আচরণ করে তারা আসলে মানব শয়তান, কারণ এই

মানসিকতা অন্য কারও নয় বরং শয়তানের। সে সর্বদা মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এই ধরণের ব্যক্তির উপর অভিশাপ দিয়েছেন। সূরা ১০৪ আল হুমাযাহ, আয়াত ১:

"প্রত্যেক গীবতকারী ও নিন্দুকের জন্য দুর্ভোগ।"

যদি এই অভিশাপ তাদের ঘিরে ফেলে, তাহলে মহান আল্লাহ কীভাবে তাদের সমস্যার সমাধান করবেন এবং তাদের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করবেন বলে আশা করা যায়? যখন কেউ অন্যদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে, তখনই কেবল গল্প বলা গ্রহণযোগ্য।

একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো, কোন গুজবকারীর প্রতি মনোযোগ না দেওয়া, কারণ তারা দুষ্ট লোক যাদের বিশ্বাস করা উচিত নয়। ৪৯তম অধ্যায় আল হুজুরাত, আয়াত ৬:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তা পরীক্ষা করে দেখো, যাতে অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি না হয়..."

এবং ২৪ নুর অধ্যায়, ১২ নং আয়াত:

"তোমরা যখন এটা শুনলে, তখন কেন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা নিজেদের [অর্থাৎ একে অপরের] সম্পর্কে ভালো ধারণা করেনি এবং বলেনি যে, "এটা স্পষ্ট মিথ্যা"?"

একজন মুসলিমের উচিত অপবাদদাতাকে এই খারাপ চরিত্রের সাথে চলতে নিষেধ করা এবং তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করা। পবিত্র কুরআনে যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, একজন মুসলিমের উচিত তার বিরুদ্ধে কোনও বিদ্বেষ পোষণ করা উচিত নয় যে তার সম্পর্কে বা অন্যদের সম্পর্কে খারাপ কিছু বলেছে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক [নেতিবাচক] অনুমান থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই কিছু অনুমান পাপ..."

এই একই আয়াত মুসলমানদের শিক্ষা দেয় যে, অন্যদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করে গল্পকারকে প্রমাণ বা মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। অধ্যায় ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১২:

"...এবং গুপ্তচরবৃত্তি করো না..."

বরং গল্পকারীকে উপেক্ষা করা উচিত। একজন মুসলিমের গল্পকারীর দেওয়া তথ্য অন্য কাউকে বলা উচিত নয় অথবা গল্পকারীর নাম উল্লেখ করা উচিত নয় কারণ এতে সেও গল্পকারী হয়ে যাবে।

মুসলমানদের গল্প বলা এবং গল্প বলার লোকদের সাথে মেলামেশা করা এড়িয়ে চলা উচিত কারণ তারা কখনই বিশ্বাস বা সাহচর্যের যোগ্য হতে পারে না যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। মনে রাখা উচিত যে, যে ব্যক্তি অন্যের সাথে অন্যের সম্পর্কে কথা বলে, সে অন্যের সাথেও সেই ব্যক্তির সম্পর্কে কথা বলবে।

পরিশেষে, যেহেতু গল্পকারী মানুষের সাথে অন্যায় করেছে, তাই তাদের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা প্রথমে তাদের ক্ষমা না করা পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। যেহেতু মানুষ এতটা করুণাময় এবং ক্ষমাশীল নয়, এর ফলে গল্পকারী তাদের নেক আমল তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের কাছে দান করতে পারে এবং প্রয়োজনে, গল্পকারী তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের পাপ গ্রহণ করবে। এর ফলে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই সতর্কীকরণ করা হয়েছে। পরিশেষে, জান্নাত হারানোর মূল হাদিসে যে সতর্কীকরণ করা হয়েছে তা একজন গল্পকারীর জন্য সহজেই ঘটতে পারে, কারণ তারা যে বিদ্বেষপূর্ণ কথাবার্তা শুরু করেছে তা সহজেই সমাজে এমনকি সারা বিশ্বে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফলস্বরূপ, যে গল্পকারী এই গল্পটি শুরু করেছে সে এই গল্পটি নিয়ে আলোচনা করা প্রতিটি ব্যক্তির পাপের ভাগীদার হবে। এবং মৃত্যুর পরেও তাদের পাপ বাড়তে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের শুরু করা কথাটি নিয়ে আলোচনা চলতে থাকবে। জামে আত তিরমিযিতে ২৬৭৪ নম্বর হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে।

অতএব, এই বিপজ্জনক পরিণতি এড়াতে হবে, সর্বদা অন্যদের সম্পর্কে পরচর্চা এড়িয়ে চলতে হবে, ঠিক যেমন তারা অন্যদের সম্পর্কে পরচর্চা করা অপছন্দ

করে। যদি কাউকে অন্যদের সম্পর্কে কথা বলতেই হয়, তাহলে তাদের তা ইতিবাচকভাবে করা উচিত, অন্যথায় তাদের চুপ থাকা উচিত।

বিশ্বাসকে উপহাস করা

তাবুক অভিযানের সময়, এক মুনাফিক নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সমালোচনা করেছিল এবং সিরিয়া জয়ের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণের তার দাবি নিয়ে উপহাস করেছিল। মহান আল্লাহ তায়ালা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এ কথা জানিয়েছিলেন এবং যখন তিনি মুনাফিককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তারা কেবল অলস কথাবার্তা এবং রসিকতা করছিল। এই প্রসঙ্গে, আল্লাহ তায়ালা সূরা তওবার ৯ম সূরা, আয়াত ৬৫-৬৬ নাযিল করেছেন:

"আর যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করো, তারা অবশ্যই বলবে, "আমরা তো কেবল আলাপচারিতা এবং খেলা করছিলাম।" বলো, "তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে?" অজুহাত দিও না; তোমরা তোমাদের ঈমানের পর কুফরী করেছ। যদি আমরা তোমাদের একদলকে ক্ষমা করি, তবে অন্য দলকে শাস্তি দেব কারণ তারা অপরাধী ছিল।"

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৯:৬৫, পৃষ্ঠা ৮৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলিম যখন মৌখিকভাবে আল্লাহ, মহিমান্বিত, তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ, সা.-কে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা করার দাবি করে, কিন্তু পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ, সা.-এর ঐতিহ্য বুঝতে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয়, তখনও ইসলামকে উপহাস করতে পারে। এমনকি পূর্ববর্তী জাতিগুলিও আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং তাদের পবিত্র নবীগণকে বিশ্বাস ও ভালোবাসার দাবি করে, তবুও তাদের দাবি আল্লাহর কাছে অগ্রহণযোগ্য,

কারণ তারা তাদের মৌখিক দাবিকে আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সমর্থন করেনি। ইসলামে কর্মবিহীন কথার খুব কম মূল্য রয়েছে। অতএব, একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের মৌখিক বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করে ইসলামকে উপহাস করা থেকে বিরত থাকতে হবে, অন্যথায় তারা দেখতে পাবে যে তারা তাদের ঈমান ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে। কারণ ঈমান একটি গাছের মতো যাকে বেড়ে ওঠার এবং বেঁচে থাকার জন্য আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। যে গাছ সূর্যালোকের মতো পুষ্টি পায় না, সে মারা যাবে, ঠিক তেমনি একজন ব্যক্তির ঈমানও মারা যাবে যে আনুগত্যের কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

এছাড়াও, কেউ ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করে ইসলামকে উপহাস করতে পারে। ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা বলতে উভয় জগতে তাঁর রহমত ও ক্ষমার আশা করে আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকা বোঝায়। ইসলামে এই মনোভাবের কোনও মূল্য নেই। অন্যদিকে, প্রকৃত আশা বলতে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা বোঝায়, যার মধ্যে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং নিজের আচরণ সংশোধন করা এবং তারপর উভয় জগতে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করা জড়িত। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পার্থক্যটি আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, একজনকে অবশ্যই এই পার্থক্যটি উপলব্ধি করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে তারা মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার প্রতি প্রকৃত আশা গ্রহণ করবে এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ ইসলামে এর কোনও মূল্য নেই।

পরিপূর্ণতার কোন দাবি নেই

মহানবী (সাঃ) তাবুক অভিযানে যাওয়ার পর, কয়েকজন সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, অলসতার কারণে পিছনে থেকে যান। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আবু খাইসামা, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন। সেনাবাহিনী চলে যাওয়ার কয়েক দিন পর, তিনি বাড়িতে ফিরে এসে তার জন্য ঠান্ডা পানীয় এবং খাবার প্রস্তুত দেখতে পান। মহানবী (সাঃ) যখন বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন তিনি এই অভিযানে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা মনে করে নিজেকে তিরস্কার করলেন। তিনি তার পরিবারকে তার যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন এবং তাবুকে শিবির স্থাপনকারী অভিযানের সাথে তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে গেলেন। আবু খাইসামা, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, যখন তিনি মহানবী (সাঃ) কে খবরটি জানালেন, তখন তিনি তার পক্ষ থেকে দুআ করলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৮-৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যেহেতু মানুষ নিখুঁত নয়, তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। তাই ঈমানের ক্ষেত্রে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে। বরং এর অর্থ হল তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে এবং যদি তারা কোনও পাপ করে তবে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 সূরা ফুসসিলাতের 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"...তাই তোমরা তাঁর দিকে সোজা পথ অবলম্বন করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো..."

জামে আত তিরমিযী, ১৯৮৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থিত, যেখানে মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে সংঘটিত (ছোট) পাপ মোচন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই ২, হাদিস নম্বর ৩৭-এ প্রাপ্ত আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) মুসলমানদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা তা নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবে না। অতএব, একজন মুসলিমের কর্তব্য হল তাদের নিয়ত এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে প্রদত্ত সম্ভাবনাকে আল্লাহ, মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে পূরণ করা। তাদেরকে পরিপূর্ণতা অর্জনের আদেশ দেওয়া হয়নি কারণ এটি সম্ভব নয়।

ইসলামে শ্রেষ্ঠত্ব

তাবুক অভিযানের সময়, যখনই কেউ সেনাবাহিনী থেকে পিছিয়ে পড়ত, লোকেরা তাদের কথা নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জানাত। নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংবাদদাতাকে কেবল বলতেন যে, অনুপস্থিত ব্যক্তিকে একা ছেড়ে দাও এবং যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু থাকে, তাহলে মহান আল্লাহ তাদেরকে সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য অনুপ্রাণিত করতেন, অন্যথায় সেনাবাহিনী সেই ব্যক্তিকে সরিয়ে দিত। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, ২৩১৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম তার ইসলামকে উৎকৃষ্ট করতে পারে না যতক্ষণ না সে এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলে যা তার সাথে সম্পর্কিত নয়।

এই হাদিসে একটি সর্বব্যাপী উপদেশ রয়েছে যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত। এর মধ্যে একজন ব্যক্তির কথাবার্তার পাশাপাশি তার অন্যান্য শারীরিক কর্মকাণ্ডও অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ হল, যে মুসলিম তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে চায়, তাকে অবশ্যই সেইসব কথা এবং কাজের মাধ্যমে এড়িয়ে চলতে হবে যা তার সাথে সম্পর্কিত নয়। বরং তাকে সেইসব কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে যা তার সাথে সম্পর্কিত। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তার সাথে সম্পর্কিত দায়িত্বগুলি পালন করার জন্য একজনের উচিত, যা তার সাথে সম্পর্কিত, সেগুলিকে খুব গুরুত্ব সহকারে নেওয়া এবং তার সাথে থাকা দায়িত্বগুলি পালন করার চেষ্টা করা। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি সে তার নিজস্ব চিন্তাভাবনা বা ইচ্ছা অনুসারে জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে তবে সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে, সে সেইসব জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে যা ইসলাম এড়িয়ে চলার

পরামর্শ দিয়েছে। অর্থ, তার সমস্ত কর্তব্য পালন করার, সমস্ত পাপ এবং ইসলামে অপছন্দনীয় জিনিসগুলি এড়িয়ে চলা এবং এমনকি অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসের অতিরিক্ত ব্যবহার এড়িয়ে চলা উচিত। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা হল সহীহ মুসলিমের ৯৯ নম্বর হাদিসে বর্ণিত ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের একটি বৈশিষ্ট্য। এটি তখনই হয় যখন কেউ এমনভাবে কাজ করে এবং আল্লাহ তাআলার উপাসনা করে যেন সে তাঁকে দেখতে পারে অথবা অন্তত তারা তাদের প্রতিটি চিন্তাভাবনা এবং কর্ম পর্যবেক্ষণ করে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন হয়। এই ঐশ্বরিক নজরদারি সম্পর্কে সচেতন থাকা একজন মুসলিমকে সর্বদা পাপ থেকে বিরত থাকতে এবং সৎকর্মের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। যে ব্যক্তি এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলে না যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয় সে এই শ্রেষ্ঠত্বের স্তরে পৌঁছাতে পারবে না।

মানুষের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলার একটি প্রধান দিক হল কথার সাথে সম্পর্কিত। বেশিরভাগ পাপ তখনই ঘটে যখন কেউ এমন কথা বলে যা তার সাথে সম্পর্কিত নয়, যেমন গীবত এবং অপবাদ। অনর্থক কথার সংজ্ঞা হল যখন কেউ এমন কথা বলে যা পাপ নাও হতে পারে কিন্তু অকেজো এবং তাই তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়। সহীহ বুখারী, ২৪০৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে যেমন প্রমাণিত হয়েছে, অনর্থক কথা বলা আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন। অসংখ্য তর্ক, মারামারি এমনকি শারীরিক ক্ষতিও ঘটেছে কারণ কেউ এমন কিছু বলেছে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়। অনেক পরিবার বিভক্ত হয়ে গেছে; অনেক বিবাহ ভেঙে গেছে কারণ কেউ তাদের কাজে মনোযোগ দেয়নি। এই কারণেই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন ধরণের কার্যকর কথা বলার পরামর্শ দিয়েছেন যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত হওয়া উচিত। সূরা ৪ আন নিসা, আয়াত ১১৪:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনের বেশিরভাগের মধ্যেই কোন কল্যাণ নেই, তবে যারা দান-খয়রাতের নির্দেশ দেয়, সৎকর্মের নির্দেশ দেয় অথবা মানুষের মধ্যে

মীমাংসা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ কাজ করে, আমি তাকে বিরাট প্রতিদান দেব।"

প্রকৃতপক্ষে, এমন কথা বলা যা মানুষের জন্য উদ্বেগের বিষয় নয়, তা জাহান্নামে প্রবেশের প্রধান কারণ হবে। জামে আত তিরমিযী, ২৬১৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৪১২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, সকল কথাই একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে গণ্য হবে, যদি না তা সৎকাজের উপদেশ, মন্দকাজের নিষেধ বা মহান আল্লাহর স্মরণের সাথে সম্পর্কিত হয়। এর অর্থ হল, অন্য সকল ধরণের কথাবার্তা একজন ব্যক্তির উদ্বেগের বিষয় নয় কারণ এগুলি তার কোন উপকার করবে না। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সৎকাজের উপদেশ দেওয়ার মধ্যে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ব্যক্তির পার্থিব এবং ধর্মীয় জীবনে উপকারী, যেমন তার পেশা।

অতএব, মুসলমানদের উচিত কথা ও কাজের মাধ্যমে এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা যা তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করে। সহজ কথায়, যে ব্যক্তি এমন বিষয়গুলিতে সময় ব্যয় করে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়, সে সেই বিষয়গুলিতে ব্যর্থ হবে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত। আর যে ব্যক্তি এমন বিষয়গুলিতে নিজেকে ব্যস্ত রাখে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়, সে সেই বিষয়গুলিতে ব্যয় করার জন্য সময় পাবে না যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়। অর্থাৎ, তারা উভয় জগতেই মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করবে।

পরিশেষে, যে ব্যক্তি নিজেকে তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে ব্যস্ত রাখে, সে তার সমস্ত কার্যকর পার্থিব ও ধর্মীয় দায়িত্ব সম্পন্ন করবে এবং এর ফলে সে মানসিক শান্তি পাবে। মানসিক চাপের অন্যতম প্রধান উৎস হল যখন কেউ

নিজেকে এমন বিষয়গুলিতে ব্যস্ত রাখে যা তার সাথে সম্পর্কিত নয়, কারণ এটি তাকে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়। সঠিক পদ্ধতিতে আচরণ করলে একজন ব্যক্তি তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলি সম্পন্ন করতে পারবেন এবং একই সাথে বিশ্রাম নেওয়ার এবং উপভোগ করার জন্য প্রচুর অবসর সময় পাবেন।

একজন অপরিচিত ব্যক্তি

তাবুক অভিযানের সময়, আবু যার (রাঃ) তার ধীর গতির উটের কারণে সেনাবাহিনীর চেয়ে পিছিয়ে পড়েন। তিনি উটের উপর থেকে তার জিনিসপত্র খুলে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে ধরার জন্য হেঁটে যান। সেনাবাহিনী যখন শিবির স্থাপন করে, তখন লোকেরা আবু যার (রাঃ) কে একা শিবিরের দিকে হেঁটে যেতে দেখে। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) আবু যার (রাঃ) এর জন্য আল্লাহর রহমতের জন্য প্রার্থনা করেন এবং মন্তব্য করেন যে তিনি একা হেঁটেছেন, একা মারা যাবেন এবং একাই পুনরুত্থিত হবেন। বহু বছর পরে, উসমান ইবনে আফফানের খিলাফতের সময়, আবু যার (রাঃ) একটি দূরবর্তী স্থানে বসবাস করেছিলেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। সিরাত ইবনে হিশামের ২৪৫-২৪৬ পৃষ্ঠায় এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আবু যার (রাঃ) এই পৃথিবীতে একজন অপরিচিত এবং পথিকের মতো জীবনযাপন করেছিলেন।

সহীহ বুখারীতে ৬৪১৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একবার আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)-কে এই পৃথিবীতে একজন অপরিচিত অথবা মুসাফির হিসেবে জীবনযাপন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) উপদেশ দিতেন যে, যখন কেউ সন্ধ্যায় পৌঁছায়, তখন তার সকালে বেঁচে থাকার আশা করা উচিত নয়। আর যদি সে সকাল হয়, তাহলে তার সন্ধ্যায় বেঁচে থাকার আশা করা উচিত নয়। আর একজন মুসলিমের উচিত অসুস্থতার আগে তার সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করা এবং মৃত্যুর আগে তার জীবনকে সদ্ব্যবহার করা।

এই হাদিসটি মুসলমানদের দীর্ঘ জীবনের আশা সীমিত রাখতে শেখায়। দীর্ঘ জীবনের আশা পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ কারণ এটি একজনকে তাদের সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা বস্তুগত জগতের জন্য উৎসর্গ করতে উৎসাহিত করে, কারণ তারা নিশ্চিত যে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তাদের কাছে প্রচুর সময় আছে।

একজন মুসলিমের এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীকে তাদের স্থায়ী আবাস হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। বরং তাদের এমন আচরণ করা উচিত যে কেউ এখান থেকে চলে যাচ্ছে, আর কখনও ফিরে আসবে না। এটি তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টা তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য, অর্থাৎ পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য উৎসর্গ করতে এবং তাদের প্রচেষ্টা সীমিত করতে অনুপ্রাণিত করবে বস্তুগত জগৎ অর্জনের জন্য যা তাদের প্রয়োজন এবং দায়িত্বের বাইরে। এই ধারণাটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর হাদিস জুড়ে আলোচনা করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, সূরা গাফির, আয়াত ৩৯:

"...এই পার্থিব জীবন কেবল [ক্ষণস্থায়ী] ভোগ, এবং প্রকৃতপক্ষে, পরকাল - এটিই [স্থায়ী] আবাসস্থল।"

আলোচিত মূল হাদিসের অনুরূপ একটি হাদিসে, যা জামে আত তিরমিযী, ২৩৭৭ নম্বরে পাওয়া যায়, মহানবী (সাঃ) এই পৃথিবীতে নিজেকে একজন আরোহী হিসেবে বর্ণনা করেছেন যিনি একটি গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন এবং তারপর দ্রুত এগিয়ে যান। এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতি বোঝাতে নবী (সাঃ) একে ছায়ার সাথে তুলনা করেছেন, যা সকলেই জানেন, দীর্ঘস্থায়ী হয় না যদিও এটি স্থায়ী বলে মনে হয়। কিছু লোকের কাছে বস্তুগত জগৎ এভাবেই দেখা যেতে পারে। তারা এমন আচরণ করে যেন পৃথিবী চিরকাল স্থায়ী হবে, যেখানে বাস্তবে এটি দ্রুত বিলীন হয়ে যাবে।

এছাড়াও, এই হাদিসে একজন আরোহীর কথা বলা হয়েছে, হেঁটে যাওয়া ব্যক্তির কথা নয়। কারণ একজন আরোহী হেঁটে যাওয়া ব্যক্তির তুলনায় অনেক কম বিশ্রাম নেয়। এটি আরও ইঙ্গিত করে যে, এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তির অবস্থান খুবই ক্ষণস্থায়ী। এটি সকলের কাছেই স্পষ্ট। এমনকি যারা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছেছে তারাও স্বীকার করে যে তাদের জীবন এক মুহূর্তের মধ্যে কেটে গেছে। তাই বাস্তবে, কেউ বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছাক বা না পৌঁছাক, জীবন কেবল একটি মুহূর্ত। অধ্যায় ১০ ইউনুস, আয়াত ৪৫:

"আর যেদিন তিনি তাদেরকে একত্রিত করবেন, সেদিন মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্ত মাত্র [পৃথিবীতে] অবস্থান করেনি..."

বাস্তবে, বস্তুজগৎ হলো একটি সেতুর মতো যা অতিক্রম করতে হবে এবং স্থায়ী বাসস্থান হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি বাস স্টেশনকে নিজের বাড়ি হিসেবে গ্রহণ করেন না, কারণ তিনি জানেন যে সেখানে তার অবস্থান কেবল অল্প সময়ের জন্য হবে, ঠিক তেমনি, পৃথিবী হলো অনন্ত পরকালে পৌঁছানোর আগে একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি।

যখন কেউ জীবনে একবার ছুটি কাটাতে যায়, তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা বিলাসবহুল গৃহস্থালীর জিনিসপত্র, যেমন একটি প্রশস্ত পর্দার টেলিভিশন, খরচ সীমিত করে এবং পরিবর্তে তাদের হোটেলের যেকোনো পরিষেবা দিয়েই তাদের জীবনযাপন করে। তারা এইভাবে আচরণ করে কারণ তারা বুঝতে পারে যে হোটেলে তাদের থাকার সময় সংক্ষিপ্ত হবে এবং শীঘ্রই তারা চলে যাবে, আর কখনও ফিরে আসবে না। এই মানসিকতা তাদের ছুটির গন্তব্যকে তাদের স্থায়ী

বাড়ি হিসাবে গ্রহণ করতে বাধা দেয়। একইভাবে, মানুষকে পৃথিবীতে এমন একটি উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল যা অবশ্যই এটিকে তাদের স্থায়ী বাড়ি করার জন্য নয়। পরিবর্তে, তাদের সেখান থেকে খাবার গ্রহণ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল যাতে তারা নিরাপদে তাদের স্থায়ী বাড়ি অর্থাৎ পরকালে পৌঁছাতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরকে খুশি করার জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা।

যখনই কেউ ভ্রমণের ইচ্ছা করে, তখন সে প্রথমে ভ্রমণকে আরামদায়ক এবং সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করে। পবিত্র কুরআনে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, পরকালের জন্য সর্বোত্তম জিনিসপত্র হলো তাকওয়া। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ১৯৭:

"...নিশ্চয়ই, সর্বোত্তম উপায় হল আল্লাহর ভয়..."

এটি তখনই ঘটে যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, এই বিশ্বাসে যে তিনি কেবল তাঁর বান্দাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন। দুনিয়া থেকে আখেরাতের যাত্রা সম্পন্ন করার জন্য অন্যান্য রিজিক, যেমন খাবার, প্রয়োজন। তবে যে রিজিকটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত তা হল তাকওয়া কারণ এটিই একমাত্র রিজিক যা ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই কারো উপকার করবে। এটি ইহকাল ও পরকালে শান্তির দিকে পরিচালিত করে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

যেহেতু বস্তুজগৎ কোনও ব্যক্তির স্থায়ী বাসস্থান নয়, তাই তাদের আলোচ্য মূল হাদিসের উপর আমল করা উচিত এবং হয় একজন অপরিচিত অথবা একজন ভ্রমণকারীর মতো জীবনযাপন করা উচিত।

অপরিচিত হওয়ার প্রথম অবস্থা হলো এমন ব্যক্তি যিনি তাদের অস্থায়ী বাড়ির সাথে তাদের হৃদয় ও মনকে সংযুক্ত করেন না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল পর্যাপ্ত জিনিসপত্র সংগ্রহ করা যাতে তারা নিরাপদে তাদের স্থায়ী বাড়ি অর্থাৎ পরকালে ফিরে যেতে পারে। এটি এমন ব্যক্তির মতো যে কর্মক্ষেত্রে ভিসা নিয়ে বিদেশে থাকে। তাদের কর্মক্ষেত্র তাদের বাড়ি নয়; কেবল অর্থ উপার্জনের জায়গা যাতে তারা তা নিয়ে তাদের স্বদেশে ফিরে যেতে পারে। এই ব্যক্তি কখনই অপরিচিত দেশকে তাদের বাড়ি হিসাবে বিবেচনা করবে না। পরিবর্তে, তারা কেবল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য ব্যয় করবে এবং তাদের সম্পদ সঞ্চয় করার দিকে মনোনিবেশ করবে যাতে তারা যতটা সম্ভব সম্পদ তাদের আসল এবং স্থায়ী বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে পারে। যদি এই ব্যক্তি তাদের সমস্ত বা বেশিরভাগ সম্পদ বিদেশে ব্যয় করে এবং খালি হাতে তাদের স্বদেশে ফিরে আসে তবে নিঃসন্দেহে তাদের আত্মীয়দের দ্বারা দোষী বলে বিবেচিত হবে। এর কারণ হল তারা কর্ম ভিসায় অন্য দেশে বসবাসের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। একইভাবে, একজন মুসলিমের উচিত পরকালের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অর্জনে তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টা উৎসর্গ করা। তাদের অন্যদের সাথে বস্তুগত বিশ্বের বিলাসিতা অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতা করা উচিত নয়। বরং, তাদের অবশ্যই তাদের অনন্ত পরকালের জন্য রিযিক অর্জনের লক্ষ্যে মনোনিবেশ করতে হবে। যদি তারা তাদের অস্থায়ী ঘরকে সুন্দর করার জন্য খুব বেশি প্রচেষ্টা করে, তাহলে তারা পরকালে অপ্রস্তুত এবং খালি হাতে প্রবেশ করবে এবং অতএব, মহান আল্লাহ তাদের যে লক্ষ্যে অর্পণ করেছেন তাতে ব্যর্থ হবে। একজন মুসলিমের

নিজের সাথে সৎ থাকা উচিত এবং তারা দিনের কত ঘন্টা বস্তুগত জগতের জন্য এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য উৎসর্গ করে তা নিয়ে চিন্তা করা উচিত। এই আত্ম-প্রতিফলন তাদের দেখাবে যে তাদের সঠিক মানসিকতা আছে কিনা এবং পরকালের প্রতি তাদের বিশ্বাস আসলে কতটা দৃঢ়। সূরা ৮৭ আল আ'লা, আয়াত ১৬-১৭:

"কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ পরকাল উত্তম এবং স্থায়ী।"

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানবজাতির কাছে তখনই প্রেরিত হয়েছিলেন যখন তারা ছিল সবচেয়ে নীচ স্তরের মানুষ এবং তাদের অধিকাংশই পাপপূর্ণ জীবনযাপন করছিল যা তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাতে পারত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্ট প্রমাণ সহকারে তাদেরকে সত্যের পথে ডাকতেন। এই লোকদের অনেকেই তাঁর স্পষ্ট বার্তা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর অনুসরণ করেছিলেন। তিনি তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ইসলাম অনেক জাতিকে জয় করবে এবং মুসলমানরা প্রচুর সম্পদ অর্জন করবে। কিন্তু তিনি তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন যে তারা যেন বস্তুগত জগতের বিলাসিতা দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়। এই সতর্কীকরণের একটি উদাহরণ সুনান ইবনে মাজাহ, ৩৯৯৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছিলেন যে বস্তুগত জগতের অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতা মানুষকে ধ্বংস করবে। তাই, তিনি মুসলমানদের তাদের দায়িত্ব ও চাহিদা পূরণের জন্য মৌলিক চাহিদাগুলিতে সন্তুষ্ট থাকার এবং পরিবর্তে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদের কাছে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা সত্য হয়েছিল। যখন দুনিয়া মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল, তখন তাদের অধিকাংশই প্রতিযোগিতা, সংগ্রহ, মজুদ এবং বস্তুগত জগতের অতিরিক্ত উপভোগে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এভাবে, তারা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক বর্ণিত সঠিক উপায়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ছেড়ে দিল। মাত্র কয়েকজন তাঁর উপদেশ গ্রহণ করল এবং তাদের চাহিদা ও দায়িত্ব পূরণের জন্য বস্তুগত জগত থেকে যা

প্রয়োজন তা গ্রহণ করল এবং তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টা চিরন্তন পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য উৎসর্গ করল। এই ছোট দল, অর্থাৎ সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং ধার্মিক পূর্বসূরীরা, পরকালে মহানবী (সাঃ) এর সাথে মিলিত হল, কারণ তারা কার্যত তাঁর উপদেশ এবং পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। অন্যদিকে, সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাদের অযত্নে বস্তুগত জগতের পিছনে ছুটতে থাকে যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে দেয়।

আলোচ্য মূল হাদিসে বর্ণিত দ্বিতীয় মানসিকতা হলো একজন মুসাফিরের। এই ব্যক্তি এই জগতকে তাদের বাড়ি হিসেবে দেখে না বরং তাদের প্রকৃত আবাসস্থল, অর্থাৎ পরকালের দিকে যাত্রা করে। এই মানসিকতা একজন ব্যাকপ্যাকার এর মতো, যে হয়তো বিভিন্ন শহরে ঘুমাতে পারে কিন্তু কখনোই এটিকে তাদের বাড়ি হিসেবে দেখে না। তারা তাদের সাথে যা রাখে তা হল অর্থ বহন করতে পারে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। এর মধ্যে রয়েছে তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং নিরাপদে তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। একজন ব্যাকপ্যাকার কখনই অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্যাক করবে না, জেনে যে এই জিনিসগুলি তাদের জন্য কেবল বোঝা হবে। এবং তারা তাদের যাত্রা নিরাপদে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্যাক করতেও ব্যর্থ হবে না। একইভাবে, একজন বুদ্ধিমান মুসলিম কেবল এই জগতের কর্ম এবং কথার ক্ষেত্রেই কাজ সংগ্রহ করে, যা তাদের পরকালে নিরাপদে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। তারা এমন সমস্ত কাজ এবং কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে যা তাদের জন্য এই পৃথিবী এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই বোঝা হয়ে উঠবে। সুনান ইবনে মাজাহ, ৪১০৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীদের (রাঃ) এই মনোভাব অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আল-কাহফের ১৮ নম্বর আয়াত:

"নিশ্চয়ই, আমি পৃথিবীর উপর যা আছে তা তার জন্য শোভাকর করেছি যাতে আমরা তাদের পরীক্ষা করতে পারি যে তাদের মধ্যে কে কর্মে শ্রেষ্ঠ। এবং অবশ্যই, আমরা পৃথিবীর উপর যা আছে তা একটি পতিত ভূমিতে পরিণত করব।"

একজন মুসলিমের বুঝতে হবে যে দিন ও রাত্রি হলো সংক্ষিপ্ত পর্যায়, যেখানে মানুষ ধাপে ধাপে ভ্রমণ করে, যতক্ষণ না তারা পরকালে পৌঁছায়। অতএব, তাদের প্রতিটি ধাপকে কাজে লাগিয়ে নেক আমলের মাধ্যমে পরকালে আগাম রিযিক প্রেরণ করা উচিত। তাদের সর্বদা সচেতন থাকতে হবে যে তাদের যাত্রা খুব শীঘ্রই শেষ হবে এবং তারা পরকালে পৌঁছাবে। যাত্রা দীর্ঘ মনে হলেও এটি শেষ পর্যন্ত একটি মুহূর্ত বলে মনে হবে, তাই অপ্রস্তুত থাকা অবস্থায় এটি শেষ হওয়ার আগে এটিকে আনুগত্যের মুহূর্ত করে তোলা উচিত। অধ্যায় ১০ ইউনুস, আয়াত ৪৫:

"আর যেদিন তিনি তাদেরকে একত্রিত করবেন, সেদিন মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্ত মাত্র [পৃথিবীতে] অবস্থান করেনি..."

প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে সাথে, তারা পৃথিবীকে পিছনে ফেলে পরকালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যদিও কেউ গতিশীল বলে মনে হতে পারে না, কিন্তু বাস্তবে, দিন এবং রাত তাদের বাহন হিসেবে কাজ করে যা তাদেরকে দ্রুত, বিরতি ছাড়াই, পরবর্তী জগতে নিয়ে যায়।

মুসলমানদের বুঝতে হবে যে, যেহেতু তারা মহান আল্লাহর বান্দা, তাই শীঘ্রই এমন একটি দিন আসবে যখন তারা তাঁর কাছে ফিরে যাবে। যখন তারা ফিরে আসবে তখন তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থামানো হবে। অতএব, তাদের এই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভালো কিছু প্রস্তুত করা উচিত। তাদের উচিত এই পৃথিবীতে প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করে প্রস্তুতি নেওয়া যাতে তারা মহান আল্লাহকে খুশি করে। কিন্তু যদি তারা গাফিলতি করে এবং প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়,

তাহলে তাদের ইতিমধ্যে যা ঘটেছে এবং যা অবশিষ্ট আছে তার জন্য শাস্তি দেওয়া হবে।

আলোচ্য মূল হাদিসে উল্লেখিত সাহাবী আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)-এর উপদেশের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক। এর প্রথম অংশে এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের আশাকে সংক্ষিপ্ত করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। একজন মুসলিমের এই পৃথিবীতে দীর্ঘস্থায়ী হওয়াকে দীর্ঘ মনে করা উচিত নয়, কারণ যেকোনো মুহূর্তে তাদের মৃত্যু হতে পারে। এমনকি যদি কেউ অনেক বছর বেঁচে থাকে, তবুও জীবন এক মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হয়। আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) মুসলমানদের এই পরামর্শ দিয়ে ইঙ্গিত করেছেন যে, সন্ধ্যা হলে তারা সকালে বেঁচে থাকবেন বলে বিশ্বাস করবেন না। এই মানসিকতাই কেবল তাদের পার্থিব দায়িত্ব পালন এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বস্তুগত জগৎ থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণের মূল কারণ। অন্যদিকে, দীর্ঘ জীবনের আশা করা বিপরীত অর্থের মূল কারণ, এটি একজনকে সৎকর্ম সম্পাদন এবং পাপ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে বিলম্বিত করে এবং এটি তাদেরকে বস্তুগত জগৎ সংগ্রহ এবং জমা করতে উৎসাহিত করে, বিশ্বাস করে যে সেখানে তাদের অবস্থান অত্যন্ত দীর্ঘ হবে।

এছাড়াও, আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) মুসলমানদের অসুস্থতার সম্মুখীন হওয়ার আগেই তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, বেশিরভাগ মানুষই সুস্বাস্থ্যের মূল্য বুঝতে পারে যখন তারা তা হারায়, যা সহিহ বুখারির ৬৪১২ নম্বর হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে। সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহারের অর্থ হল, একজন মুসলিমের উচিত তাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যবহার করা, সৎকর্ম সম্পাদন করা এবং পাপ থেকে বিরত থাকা, এমন এক সময়ে পৌঁছানোর আগে যখন তারা ভালো কাজ করতে চাইতে পারে কিন্তু দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে আর তা করতে পারে না। যে ব্যক্তি তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করে, তাকে তাদের সুস্বাস্থ্যের সময় করা সৎকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে, এমনকি যখন তারা অসুস্থতার সম্মুখীন হয় এবং আর তা করতে পারে না।

সহিহ বুখারির ২৯৯৬ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করে না, সে অসুস্থ হয়ে পড়লে এই সম্ভাব্য সদ্ব্যবহার হারাবে। প্রকৃতপক্ষে, তাদের কাছে অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) এর উপদেশের শেষ অংশ হলো, একজন ব্যক্তির মৃত্যুর আগে তার জীবনকে সদ্ব্যবহার করা উচিত। এর মধ্যে রয়েছে সম্পদের মতো সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে এমন সমস্ত জিনিস ব্যবহার করা এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যস্ততার মতো সৎকর্ম থেকে বিরত থাকা সমস্ত জিনিস এড়িয়ে চলা। সময়ের সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই ঘটে যাওয়া দায়িত্ব, যেমন বিবাহ, এর দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার আগে মুসলমানদের জন্য তাদের সময়ের সদ্ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ। এবং আর্থিক দায়িত্ব বৃদ্ধির আগে তাদের সম্পদের সদ্ব্যবহার করা। সাফল্যের জন্য সময়ের সদ্ব্যবহার অপরিহার্য কারণ এটি একটি অদ্ভুত পার্থিব আশীর্বাদ, যা চলে যাওয়ার পরে আর ফিরে আসে না, অন্যান্য সমস্ত আশীর্বাদের মতো। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সঠিকভাবে তাদের কার্যকলাপকে অগ্রাধিকার দিয়ে সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে তার সমস্ত দায়িত্ব, কর্তব্য এবং প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে এবং ভারসাম্যপূর্ণভাবে বৈধ আনন্দ উপভোগ করার জন্য প্রচুর সময় পাবে।

জামে আত-তিরমিযী, ২৪০৩ নম্বর হাদিসে মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন, মৃত্যুর সময় সকল মানুষেরই অনুশোচনা থাকবে। সৎকর্মশীল ব্যক্তি অনুশোচনা করবে যে তারা মৃত্যুর আগে আরও ভালো কাজ করেনি। পাপী ব্যক্তি অনুশোচনা করবে যে তারা তাদের মৃত্যুর আগে আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করেনি। এই পৃথিবীতে প্রায়শই মানুষকে দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হয়, উদাহরণস্বরূপ, ড্রাইভিং পরীক্ষা পুনরায় করা, কিন্তু একজন ব্যক্তির মৃত্যুর পরে আর কোনও কাজ শেষ হয় না। অনুশোচনা তাদের কোনও সাহায্য করবে না। বরং, এটি কেবল তাদের যন্ত্রণা এবং কষ্ট বাড়িয়ে দেবে। তাই মুসলমানদের তাদের দেওয়া সময়কে আল্লাহর আনুগত্যে প্রচেষ্টা করার জন্য ব্যবহার করা উচিত, তাদের সময় শেষ

হওয়ার আগে, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। আগামীকাল পর্যন্ত জিনিস বিলম্বিত করার মানসিকতা ত্যাগ করা উচিত, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই আগামীকাল কখনও আসে না। একজন মুসলিমের উচিত আজকের দিনে মনোযোগ দেওয়া এবং সেইসব কাজ করা যা আল্লাহকে খুশি করে, কারণ আগামীকাল এই পৃথিবীতে আসতে পারে কিন্তু তারা তা দেখার জন্য বেঁচে নাও থাকতে পারে।

সত্যের প্রতি অন্ধ

তাবুক অভিযানের সময় সেনাবাহিনী প্রচণ্ড ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ভুগছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি তাঁর দুআ থেকে হাত নামানোর আগেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল এবং সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, লক্ষ্য করলেন যে কেবল তাদের শিবিরে বৃষ্টি হচ্ছে, এর বাইরে নয়। যখন একজন মুনাফিককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে এর পরেও সে কি ইসলামের আরও প্রমাণ চায়, তখন সে উত্তর দিল যে এটি কেবল একটি মেঘমালা। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১০-১১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন মানবজাতিকে শিক্ষা দেয় যে কিছু মানুষ বস্তুগত জগতে এতটাই ডুবে আছে যে তাদের অন্তরে কোন উপদেশ প্রবেশ করতে পারে না। পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে যে, এই দলের মানুষের হৃদয় পাথরের চেয়েও শক্ত। সূরা আল বাকারা, আয়াত ৭৪:

"তারপর তোমাদের হৃদয় পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেল, এমনকি আরও কঠিন..."

এই মুহুর্তে যারা ইসলামের বাণী প্রচার করতে চান তাদের উচিত এই ধরণের ব্যক্তি থেকে আলাদা হয়ে অন্যদের উপর মনোনিবেশ করা । তবে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে , এই ক্ষেত্রেও একজন মুসলিমের উচিত পাপীদের প্রতি সর্বদা ভালো চরিত্র প্রদর্শন করা কারণ তারা যেকোনো সময় তওবা করতে পারে। সূরা আল ফুরকান, আয়াত: ৬৩:

"... আর যখন অজ্ঞরা তাদের সাথে [কঠোরভাবে] কথা বলে, তখন তারা [শান্তির] কথা বলে।"

একইভাবে, পবিত্র কুরআনের অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ , মহিমান্বিত, পরামর্শ দেন যে যখন একটা সীমা অতিক্রম করা হয়, তখন একগুঁয়ে এবং বিপথগামী লোকদের আলাদা করে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। তাদের মিথ্যা বিশ্বাসের কাছে। নিঃসন্দেহে এমন একটি দিন আসবে যখন আল্লাহ , মহিমান্বিত, মানবজাতিকে অবহিত করবে কে সঠিক পথপ্রাপ্ত ছিল আর কে পথভ্রষ্ট ছিল অন্ধকারে। ২৮তম সূরা আল-কাসাস, আয়াত ৫৫:

"আর যখন তারা কোন অশ্লীল কথা শোনে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, "আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক; আমরা অজ্ঞদের খুঁজি না।"

মুসলমানদের কখনই হতাশ এবং বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয় যখন তাদের ভালো পরামর্শ অন্যদের উপর প্রভাব ফেলবে না। কিছু ক্ষেত্রে, এই লোকেরা পাপে ডুবে থাকা অবস্থায় তাদের হৃদয় এতটাই আবৃত হয়ে যায় যে, এই আবৃতি তাদের উপর সৎ উপদেশের প্রভাবকে বাধা দেয়। ইতিবাচকভাবে। একটি হাদিস পাওয়া গেছে সুনান ইবনে মাজাহ, ৪২৪৪ নম্বরে , ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে একটি পাপ আধ্যাত্মিক হৃদয়ে একটি কালো দাগ খোদাই করে। যত বেশি পাপ করে, তত বেশি তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় এই অন্ধকারে ডুবে যায়। অধ্যায় ৮৩ আল মুতাফিফিন, আয়াত ১৪:

" না! বরং, তারা যা অর্জন করেছিল তার কলঙ্ক তাদের হৃদয়কে ঢেকে দিয়েছে।"

এটি অন্য একটি আয়াতের অনুরূপ যেখানে আল্লাহ , মহিমান্বিত, ঘোষণা করেন যে তাদের কান, চোখ এবং হৃদয় সত্য থেকে আড়াল করা হয়েছে এবং তাই তাদেরকে সত্যের দিকে পরিচালিত করা যাবে না । সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ৭:

" আল্লাহ তাদের অন্তর ও শ্রবণশক্তির উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টিশক্তির উপর পর্দা চাপিয়ে দিয়েছেন..."

দোষ ইসলামের বাণীর নয়, বরং পথভ্রষ্টদের অন্তরের। ঠিক যেমন দোষ একজন অন্ধ ব্যক্তির চোখে থাকে, উজ্জ্বল সূর্যের চোখে নয়। দুর্ভাগ্যবশত, তার একগুঁয়ে মনোভাব একটি ব্যাপক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। সমাজের মধ্যে। এইসব লোকদের মধ্যে কিছু ইসলামে বিশ্বাস করে কিন্তু পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)- এর হাদিসের শিক্ষার প্রতি তাদের হৃদয় ও মন বন্ধ করে রেখেছে। এবং তার উপর রহমত বর্ষিত হোক। তারা এমন কোন ভালো উপদেশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে যা উভয় জগতেই তাদের উপকারে আসবে।

যারা ইসলামের বাণী প্রচার করতে চান তাদের বুঝতে হবে যে মানুষ দুই ধরণের মানসিকতা গ্রহণ করতে পারে। প্রথমটি হল যখন কেউ কোনও বিষয়ে আগে থেকেই তার মন তৈরি করে এবং তারপরে কেবল সেই বিষয়গুলি অনুসন্ধান করে এবং গ্রহণ করে যা তাদের পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসকে সমর্থন করে। অন্যদিকে ,

সঠিক মনোভাব হল বিভিন্ন বিষয়ে দৃঢ় প্রমাণ অনুসন্ধান এবং গ্রহণ করে খোলা মনে জীবনযাপন করা। প্রথম মানসিকতা কেবল ব্যক্তিগত স্তর থেকে শুরু করে জাতীয় স্তর পর্যন্ত সমস্যা তৈরি করবে। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু দিক এভাবেই মিডিয়ার কাজের পরিমাণ। তারা পূর্বনির্ধারিত করে তারা যে তথ্য প্রকাশ করতে চায়, দুর্বল সমর্থনকারী প্রমাণের কিছু অংশ খুঁজে বের করতে এবং তারপর তা বিশ্বের সামনে উড়িয়ে দেওয়া উচিত। যারা ইসলামের বাণী প্রচার করছেন তাদের উচিত প্রথম ধরণের লোকদের এড়িয়ে চলা এবং পরিবর্তে দ্বিতীয় দলকে সত্যের দিকে আহ্বান করার দিকে মনোনিবেশ করা।

ধৈর্য এবং সন্তুষ্টি

তাবুক অভিযানের সময় সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড ক্ষুধা ও তৃষ্ণার্ততা সহ্য করতে হয়েছিল। সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের জল পরিবহনকারী উট জবাই করে খাওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু তারা তা করার আগেই, উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এর ফলে পরিবহনের অভাব দেখা দেবে। তিনি মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে সমস্ত খাদ্য সংগ্রহ করার এবং তাতে বরকতের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) আবারও এই পরামর্শে সম্মত হন এবং অলৌকিকভাবে অল্প পরিমাণে খাবার তাদের সমস্ত পাত্রে ভরে যায় এবং তারা সকলেই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে ফেলে। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১১-১২-তে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহজেই তাদের উট জবাই করার পরিবর্তে দুআ করার পরামর্শ দিতে পারতেন। তাঁর আচরণের পেছনের একটি প্রজ্ঞা হলো মহান আল্লাহর পছন্দ এবং সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার গুরুত্ব শেখানো।

ধৈর্য এবং সন্তুষ্টির মধ্যে পার্থক্য হল, ধৈর্যশীল ব্যক্তি কোনও পরিস্থিতির জন্য অভিযোগ করেন না বরং পরিস্থিতির পরিবর্তন কামনা করেন এবং এমনকি পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনাও করেন। অন্যদিকে, যিনি সন্তুষ্ট তিনি নিজের পছন্দের চেয়ে মহান আল্লাহর ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার দেন এবং তাই পরিবর্তন চান না। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উট জবাই করার অনুমতি দেওয়ার পরিবর্তে সহজেই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি আল্লাহর ইচ্ছার বিরোধিতা করতে চাননি, যেমন আল্লাহ, মহান, তাকে সন্তুষ্ট থাকতে

চেয়েছিলেন। যদিও একটি প্রার্থনা বৈধ হত তবুও তিনি আল্লাহর দাসত্বকে নিখুঁত করতে চেয়েছিলেন, এবং তাই আল্লাহর পছন্দের উপর ভরসা করে নীরব ছিলেন। অনুরোধ করার পরেই তিনি প্রার্থনা করেছিলেন। শেখার বিষয় হল যে যদিও কিছু পরিস্থিতি দেখা দেয় এবং দীর্ঘমেয়াদে কষ্টদায়ক মনে হয়, তবুও যা ঘটে তা একজন মুসলিমের জন্য তাদের ইচ্ছার চেয়ে ভালো, এমনকি যদি তারা তাৎক্ষণিকভাবে এর পিছনের প্রজ্ঞাটি লক্ষ্য না করে। সম্ভবত কোন অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার কারণেই একজন মুসলিম জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। তাই যদি কেউ আল্লাহর তাকদীরে সন্তুষ্ট না থাকে, তাহলে অন্তত ধৈর্য ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তুমি কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমার জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তুমি কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমার জন্য অকল্যাণকর..."

একজন মুসলিমের এটাও মনে রাখা উচিত যে, যিনি তাদের জন্য এই পরিস্থিতি বেছে নিয়েছেন, অর্থাৎ মহান আল্লাহ, তিনিই একমাত্র তাদেরকে এ থেকে নিরাপদে বের করে আনতে পারেন। এটি কেবলমাত্র তাঁর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। অধ্যায় ৬৫ তালাক, আয়াত ২:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

পর্যবেক্ষক থাকা

তাবুক অভিযানের সময়, সেনাবাহিনী একটি অত্যন্ত শক্তিশালী প্রাচীন জাতি, সামুদের পুরানো জনশূন্য বাসস্থানের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। মহান আল্লাহর প্রতি তাদের অবিরাম অবাধ্যতা এবং চূড়ান্ত ধ্বংসের কথা ইসলামী শিক্ষা জুড়ে আলোচনা করা হয়েছে। মহানবী মুহাম্মদ (সা.) সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে তাদের জনশূন্য বাড়িতে প্রবেশ না করতে, যদি না তারা কাঁদতে কাঁদতে তা করে, অন্যথায় তাদের উপর সামুদের মতো শাস্তি আসতে পারে। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

একজন মুসলিমের জন্য তাদের দৈনন্দিন জীবনে সতর্ক থাকা এবং তাদের পার্থিব বিষয়গুলিতে অতিরিক্ত আত্মমগ্ন হওয়া এড়িয়ে চলা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা তাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া এবং ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ, কারণ এটি তাদের ঈমানকে শক্তিশালী করার একটি দুর্দান্ত উপায় যা সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন মুসলিম কোনও অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখেন, তখন তাদের কেবল তাদের কাছে থাকা যেকোনো উপায়েই তাকে সাহায্য করা উচিত নয়, এমনকি যদি তা কেবল একটি প্রার্থনাও হয়, বরং তাদের নিজের স্বাস্থ্যের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত এবং বুঝতে হবে যে তারাও অবশেষে অসুস্থতা, বার্ধক্য বা এমনকি মৃত্যুর কারণে তাদের সুস্বাস্থ্য হারাবে। এটি তাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞ হতে অনুপ্রাণিত করবে এবং তাদের কর্মের মাধ্যমে এটি প্রদর্শন করবে, তাদের সুস্বাস্থ্যের সুযোগ গ্রহণ করে, পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে।

যখন তারা কোন ধনী ব্যক্তির মৃত্যু দেখে, তখন তাদের কেবল মৃত ব্যক্তি এবং তার পরিবারের জন্য শোক করা উচিত নয়, বরং এটিও উপলব্ধি করা উচিত যে একদিন তাদেরও মৃত্যু হবে যা তাদের অজানা। তাদের বুঝতে হবে যে, ধনী ব্যক্তি যেমন তাদের সম্পদ, খ্যাতি এবং পরিবার দ্বারা কবরে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন, তেমনি তাদেরও কবরে কেবল তাদের কর্মকাণ্ডই অবশিষ্ট থাকবে। এটি তাদের কবর এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করবে।

এই মনোভাব সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং তা করা উচিত। একজন মুসলিমের উচিত তার চারপাশের সবকিছু থেকে শিক্ষা নেওয়া যা পবিত্র কুরআনে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯১:

"...আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির প্রতি চিন্তা করো, [বলে], "হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি এগুলোকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করোনি; তুমি [এরকম কিছুর উপরে] পবিত্র; তাহলে আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।"

যারা এইভাবে আচরণ করে তারা প্রতিদিন তাদের ঈমানকে শক্তিশালী করবে, অন্যদিকে যারা তাদের পার্থিব জীবনে খুব বেশি আত্মমগ্ন তারা গাফিল থাকবে যা তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

কালজয়ী অলৌকিক ঘটনা

তাবুক অভিযানের সময়, সেনাবাহিনী একটি অত্যন্ত শক্তিশালী প্রাচীন জাতি, সামুদের পুরানো জনশূন্য বাসস্থানের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মন্তব্য করেছিলেন যে, সামুদ জাতির মতো মানুষের নিদর্শন (অর্থাৎ অলৌকিক ঘটনা) চাওয়া উচিত নয়। নিদর্শন প্রদানের পর সামুদরা অবিশ্বাস করেছিল এবং এভাবে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ইমাম ইবনে কাথিরের "নবী জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কখনও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাঁর নবুওতের দাবির সমর্থনে কোনও অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করেননি। কারণ তারা ইসলামের প্রমাণ অনুসন্ধান করেছিলেন এবং পবিত্র কুরআনের কালজয়ী অলৌকিক ঘটনা এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে তাদের ঈমানকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছিলেন। যে ব্যক্তি খোলামেলা এবং নিরপেক্ষ মন নিয়ে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে, সে নিঃসন্দেহে পবিত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রদত্ত অন্যান্য সমস্ত অলৌকিক ঘটনার চেয়েও মহান অলৌকিক ঘটনাকে উপলব্ধি করবে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, পবিত্র কুরআনের বাক্যাংশগুলি অতুলনীয় এবং এর অর্থগুলি সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর শব্দ এবং আয়াতগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অন্য কোনও গ্রন্থ এটিকে অতিক্রম করতে পারে না। পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী জাতিগুলির ইতিহাস বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছে যদিও মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) ইতিহাসে শিক্ষিত ছিলেন না। এটি প্রতিটি সৎকাজের আদেশ দেয় এবং প্রতিটি মন্দকে নিষেধ করে। যা একজন ব্যক্তি এবং সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে, যাতে ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা এবং শান্তি প্রতিটি ঘর এবং সম্প্রদায়ে

ছড়িয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআন অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা যেকোনো মিথ্যা এড়িয়ে চলে, কবিতা, গল্প এবং উপকথার বিপরীতে। সমস্ত আয়াত উপকারী এবং ব্যবহারিকভাবে একজনের জীবনে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এমনকি যখন পবিত্র কুরআনে একই গল্প পুনরাবৃত্তি করা হয়, তখনও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরা হয়। অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থের বিপরীতে, পবিত্র কুরআন বারবার অধ্যয়ন করলে একজন ব্যক্তিকে বিরক্ত করে না। পবিত্র কুরআন প্রতিশ্রুতি এবং সতর্কীকরণ প্রদান করে এবং অনস্বীকার্য এবং স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে তাদের সমর্থন করে। পবিত্র কুরআন যখন এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে যা বিমূর্ত বলে মনে হতে পারে, যেমন ধৈর্য অবলম্বন করা, তখন এটি সর্বদা এটিকে তার জীবনে বাস্তবায়নের একটি সহজ এবং ব্যবহারিক উপায় প্রদান করে। এটি মানুষকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে উৎসাহিত করে, যার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে, যার ফলে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে। এটি উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং প্রকৃত সাফল্য কামনাকারী ব্যক্তির জন্য সরল পথকে স্পষ্ট এবং আকর্ষণীয় করে তোলে। পবিত্র কুরআনের জ্ঞান চিরন্তন কারণ এটি প্রতিটি সমাজ এবং যুগে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি প্রতিটি মানসিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক সমস্যার জন্য একটি নিরাময় যখন এটি সঠিকভাবে বোঝা এবং প্রয়োগ করা হয়। এটি একজন ব্যক্তি বা সমগ্র সমাজের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি সমস্যার সমাধান প্রদান করে। কেবল ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করা এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা বাস্তবায়নকারী সমাজগুলি কীভাবে এর সর্বব্যাপী এবং কালজয়ী শিক্ষা থেকে সঠিকভাবে উপকৃত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। শতাব্দী পেরিয়ে গেছে কিন্তু পবিত্র কুরআনের একটি অক্ষরও পরিবর্তন করা হয়নি, যেমনটি আল্লাহ তাআলা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ইতিহাসের অন্য কোনও গ্রন্থে এই গুণটি নেই। অধ্যায় ১৫ আল হিজর, আয়াত ৯:

"নিশ্চয়ই, আমরাই বাণী [অর্থাৎ, কুরআন] নাযিল করেছি এবং অবশ্যই, আমরাই এর রক্ষণাবেক্ষণকারী।"

মহান আল্লাহ তাআলা একটি সমাজের মূল সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সেগুলোর সকলের বাস্তব প্রতিকারের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। মূল সমস্যাগুলো সংশোধন করার মাধ্যমে, এগুলো থেকে উদ্‌ভূত অসংখ্য শাখা-প্রশাখার সমস্যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধন হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআন এভাবেই একজন ব্যক্তি এবং সমাজের উভয় জগতে সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ের সমাধান করেছে। সূরা আন নাহল, আয়াত ৮৯:

"...এবং আমরা আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি সবকিছুর স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ..."

এটি মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর দান করা সর্বশ্রেষ্ঠ কালজয়ী অলৌকিক ঘটনা। কিন্তু যারা সত্যের সন্ধান করে এবং তার উপর আমল করে, কেবল তারাই এর দ্বারা উপকৃত হবে, আর যারা তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং এর থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করে, তারা উভয় জগতেই কেবল ক্ষতির সম্মুখীন হবে। অধ্যায় ১৭ আল-ইসরা, আয়াত ৮২:

"আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাজিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু এটি জালেমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।"

আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালার) প্রতি রাগান্বিত

তাবুক অভিযানের সময়, একজন সাহাবী, উমারা ইবনে হাজম, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, অজান্তেই একজন মুনাফিক যায়েদ ইবনে লুসাইতের সাথে তার উটটি ভাগ করে নিচ্ছিলেন। সেনাবাহিনী যখন শিবির স্থাপন করেছিল, তখন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর উটটি হারিয়ে যায় এবং কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, এটির সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। তার শিবিরে বিশ্রাম নেওয়ার সময়, যায়েদ, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে উপহাস করে মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি আসমান থেকে খবর পেয়েছেন কিন্তু জানেন না যে তার উটটি কোথায়। একই সময়ে, উমারা, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে ছিলেন, যখন তাকে জায়েদের কথা সম্পর্কে ঐশ্বরিকভাবে অবহিত করা হয়েছিল। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি আসমান থেকে খবর পেয়েছেন, যার মধ্যে তার হারানো উটের অবস্থানও রয়েছে। এরপর তিনি সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, এটি উদ্ধার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেননি যে যায়েদ তার সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছিলেন। উমারা (রাঃ) যখন তার শিবিরে ফিরে আসেন, তখন তিনি যা ঘটেছিল তা উল্লেখ করেন এবং তাকে বলা হয় যে যায়েদই এই কথাগুলো বলেছেন। উমারা (রাঃ) যায়েদকে ধরে ফেলেন এবং তাকে তার শিবির থেকে বহিষ্কার করেন। সিরাত ইবনে হিশামের ২৪৪-২৪৫ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদের ৪৬৮১ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুসলিমের ঈমানকে পরিপূর্ণ করে এমন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল, মহান আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা। এর অর্থ হল, মহান আল্লাহ যা অপছন্দ করেন, যেমন তাঁর অবাধ্যতা, তা অপছন্দ করা উচিত। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এর অর্থ এই নয় যে, অন্যদের ঘৃণা করা উচিত, কারণ মানুষ আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে তওবা করতে পারে। বরং একজন মুসলিমের উচিত সেই পাপকেই অপছন্দ করা যা তাদের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তা এড়িয়ে চলা এবং অন্যদেরকে এর বিরুদ্ধে সতর্ক করা। মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিবর্তে তাদের উপদেশ দেওয়া, কারণ এই দয়ার কাজটি তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে নিজের অনুভূতির উপর ভিত্তি করে জিনিসগুলিকে অপছন্দ না করা, যেমন কোনও কাজ, যা বৈধ। পরিশেষে, মহান আল্লাহর জন্য অপছন্দ করার প্রমাণ হল, যখন তারা তাদের কথা এবং কাজের মাধ্যমে তাদের অপছন্দ প্রদর্শন করে তখন তা কখনই এমনভাবে হবে না যা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে। অর্থাত্, কোনও কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের কখনই পাপ করতে বাধ্য করবে না, কারণ এটি প্রমাণ করবে যে কোনও কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের নিজের জন্য।

তাবুকে নবীর খুতবা

যখন সেনাবাহিনী তাবুক যুদ্ধে পৌঁছালো, তখন মহানবী (সাঃ) নিম্নলিখিত ভাষণ দিলেন: "মানুষ, সবচেয়ে সত্য কথা হলো আল্লাহর কিতাবের কথা। সবচেয়ে দৃঢ় বন্ধন হলো কালাম (অর্থাৎ ঈমানের সাক্ষ্য)। সর্বোত্তম ধর্ম হলো মহানবী ইব্রাহিম (আঃ)-এর কথা। সর্বোত্তম জীবনযাপন হলো মহানবী (সাঃ)-এর ঐতিহ্য। সর্বোত্তম কথা হলো মহান আল্লাহর স্মরণ। সর্বোত্তম বর্ণনা হলো পবিত্র কুরআন। সর্বোত্তম আমল হলো আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত আমল। সবচেয়ে নিকৃষ্ট আমল হলো উদ্ভাবিত আমল। সর্বোত্তম নির্দেশনা হলো নবীগণ (সাঃ)-এর আমল। সর্বোত্তম মৃত্যু হলো শহীদ হয়ে নিহত হওয়া। সবচেয়ে অন্ধ হলো হিদায়াতের পরে পথভ্রষ্ট হওয়া। সর্বোত্তম আমল হলো সেইসব যা উপকারী। সর্বোত্তম আমল হলো সেইসব যা অনুসরণ করা হয় (এবং উদ্ভাবিত নয়)। সবচেয়ে নিকৃষ্ট অন্ধত্ব হলো (আধ্যাত্মিক) অন্তর। উপরের হাত (অর্থাৎ দান করা) নিচের হাতের (অর্থাৎ যে দান গ্রহণ করে) চেয়ে ভালো। যা অল্প হলেও যথেষ্ট, তা অনেক কিন্তু অপচয়কারীর চেয়ে ভালো। মৃত্যু যখন নিকটবর্তী হয় তখন সবচেয়ে খারাপ ক্ষমা চাওয়া হয়। সবচেয়ে খারাপ অনুতাপ হল বিচার দিবস। এমন কিছু লোক আছে যারা কেবল শুক্রবারের নামাজের শেষে উপস্থিত হয়। এমন কিছু লোক আছে যারা কেবল মহান আল্লাহকে অনর্থক স্মরণ করে। সবচেয়ে খারাপ পাপ হল মিথ্যাবাদী জিহ্বা। সর্বোত্তম সম্পদ হল আত্মার সম্পদ (অর্থাৎ সন্তুষ্টি)। সর্বোত্তম গুণ হল তাকওয়া। জ্ঞানের শীর্ষ হল মহান আল্লাহর ভয়। অন্তরের মধ্যে সর্বোত্তম গুণ হল নিশ্চিততা (ঈমানের)। সন্দেহ করা কুফর থেকে। শোকে বিলাপ করা অজ্ঞতার যুগের (অর্থাৎ প্রাক-ইসলামিক যুগের) একটি কাজ। প্রতারণা জাহান্নামের মাটি থেকে। (বেশিরভাগ) কবিতা শয়তান থেকে আসে। মদ পাপের সমষ্টি। নারী (পুরুষদের জন্য এবং পুরুষরা মহিলাদের জন্য) শয়তানের ফাঁদ। যৌবন হলো পাগলামির একটি শাখা (নিয়ন্ত্রণের অভাবের কারণে)। সবচেয়ে খারাপ আয় হলো আর্থিক সুদ থেকে। সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার হলো এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা। সুখী ব্যক্তি হলো সেই ব্যক্তি যাকে অন্যদের (কর্ম) দ্বারা সতর্ক করা হয়। তোমাদের মধ্যে একজনকে (অর্থাৎ মৃত্যু) আখেরাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মাত্র চার হাত দূরে সরে যেতে হয়। কোন কাজের মূল ভিত্তি তার

ফলাফল দ্বারা নির্ধারিত হয়। সবচেয়ে নিকৃষ্ট বর্ণনা হলো মিথ্যা। যা কিছু হবে তা নিকটবর্তী। কোন মুমিনের সাথে গালিগালাজ করা ক্রোধ। কোন মুমিনের সাথে যুদ্ধ করা কুফরী। তার মাংস খাওয়া (অর্থাৎ গীবত করা) আল্লাহর অবাধ্যতা। তার সম্পদের পবিত্রতা তার রক্তের পবিত্রতার সমান। যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে (মিথ্যা) শপথ করে, সে তাকে মিথ্যা বলে। যে ব্যক্তি তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাকে ক্ষমা করা হয়। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি রাগ দমন করে, আল্লাহ তাকে প্রতিদান দেবেন। যে ব্যক্তি বিপদের বিরুদ্ধে দৃঢ় থাকে, আল্লাহ তাকে প্রতিদান দেবেন। যে ব্যক্তি খ্যাতি কামনা করে, আল্লাহ তাকে অপমান করবেন। যে ব্যক্তি দৃঢ় থাকে, আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হয়, আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন। হে আল্লাহ, আমাকে এবং আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, আমাকে এবং আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, আমাকে এবং আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। আমি নিজের জন্য এবং আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৬-১৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

একটি পবিত্র কবর

তাবুক অভিযানের সময়, একজন সাহাবী, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, বর্ণনা করেছেন যে তিনি একবার মধ্যরাতে ঘুম থেকে উঠে একটি আলো দেখতে পান। যখন তিনি তদন্ত করার জন্য সেখানে যান, তখন তিনি নবী মুহাম্মদ, আবু বকর সিদ্দীক এবং উমর বিন খাত্তাব, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, একজন সাহাবী, যুল বিজাদায়েন, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, যিনি ইন্তেকাল করেছিলেন, তার জন্য একটি কবর খনন করতে দেখেন। নবী মুহাম্মদ, সা. কবরে ছিলেন, যখন আবু বকর এবং উমর যুল বিজাদায়েন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তার দেহকে কবরে নামিয়েছিলেন। নবী মুহাম্মদ, সা., তাঁর দেহকে সঠিকভাবে কবরে স্থাপন করার পর, তিনি মহান আল্লাহর কাছে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। এই ঘটনাটি দেখার পর, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, প্রায়শই বলতেন যে তিনি কামনা করেন যে এটিই তাঁর কবর হোক। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২-২৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ১৩৭২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কবরে আযাব নিশ্চিত করেছেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনেক আয়াত ও হাদিসে এই পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে যা সকল মানুষ কোন না কোন রূপে বা কোন রূপে সম্মুখীন হবে। যেহেতু এটি অনিবার্য, তাই মুসলমানদের এর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে কারণ কবরের আলো বা অন্ধকার কবর থেকে আসে না। এটি মানুষের কর্মকাণ্ড যা তাদের কবরকে অন্ধকার করে না আলোকিত করে। একইভাবে, এটি মানুষের কর্মকাণ্ড যা নির্ধারণ করবে যে তারা তাদের কবরে শাস্তি বা রহমতের মুখোমুখি হবে কিনা। এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার একমাত্র উপায় হল তাকওয়া যার মধ্যে

রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যা আল্লাহ, মহিমান্বিতকে সন্তুষ্ট করে। এই সৎকর্মগুলি আল্লাহর অনুমতি ও রহমত দ্বারা কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করবে।

এটা আশ্চর্যজনক যে একজন মুসলিম কীভাবে তাদের পার্থিব জীবনকে আরামদায়ক করে তোলার জন্য অনেক সময়, শক্তি এবং সম্পদ ব্যয় করবে, যদিও এই পৃথিবীতে তাদের অবস্থান স্বল্পস্থায়ী, অথচ তারা তাদের কবরকে আরামদায়ক করে তোলার দিকে খুব কম মনোযোগ দেয়, যদিও কবরে তাদের অবস্থান দীর্ঘ এবং আরও গুরুতর হবে।

মুসলমানরা প্রায়শই তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের দাফন করার জন্য কবরস্থানে যাতায়াত করে। কিন্তু খুব কম লোকই সত্যিই বুঝতে পারে যে একদিন, আজ হোক কাল, তাদের পালা আসবে। যদিও বেশিরভাগ মুসলমান তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টা তাদের পরিবারকে খুশি করার এবং সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চেয়ে সম্পদ অর্জনের জন্য উৎসর্গ করে, জামে আত তিরমিযী, ২৩৭৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, এই দুটি জিনিস, যাকে মুসলমানরা অগ্রাধিকার দেয়, তাদের কবরে তাদের পরিত্যাগ করবে এবং কেবল তাদের আমলই তাদের সাথে থাকবে। অতএব, একজন মুসলিমের জন্য তাদের পরিবারকে খুশি করার এবং অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের চেয়ে সৎকর্ম অর্জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। এর অর্থ এই নয় যে তাদের পরিবার এবং সম্পদ পরিত্যাগ করা উচিত। বরং এর অর্থ হল তাদের উচিত ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের পরিবারের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করা, মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য অবহেলা না করে, এবং কেবলমাত্র সেই সম্পদ অর্জন করা যা তাদের এটি অর্জনের জন্য প্রয়োজন। যখন এটি সঠিকভাবে করা হয় তখন এটিও একটি সৎকর্ম হয়ে ওঠে। সহীহ বুখারীতে ৪০০৬ নম্বরে পাওয়া একটি

হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। পরিবার বা সম্পদের জন্য কখনোই মহান আল্লাহর প্রতি কর্তব্য ত্যাগ করা উচিত নয় কারণ এটি কেবল বিচ্ছিন্ন, একাকী এবং অন্ধকার কবরের দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ৫৫:

"এ থেকেই [অর্থাৎ, পৃথিবী] আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি, এবং এতেই তোমাদের ফিরিয়ে দেবো, এবং এ থেকেই আমরা তোমাদেরকে আরেকবার বের করব।"

আনুগত্যেই বিজয়।

মুসলিম সেনাবাহিনী যখন তাবুকে পৌঁছায়, তখন বাইজেন্টাইন সেনাবাহিনী যুদ্ধ করতে ভয় পায় এবং তাদের অঞ্চলে আরও পশ্চাদপসরণ করে। মহানবী (সা.) কিছু দিন সেখানে অবস্থান করেন এবং তারপর মদিনায় ফিরে আসেন। যদিও কোনও যুদ্ধ হয়নি, তবুও এই ফলাফল মুসলমানদের ভয় এবং ভীতি তাদের শত্রুদের হৃদয়ে আরও দৃঢ় করে তোলে এবং অনেক অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে, কারণ তারা বুঝতে পারে যে এটি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সীমান্তে বসবাসকারী এবং তাদের সাথে মিত্রতা স্থাপনকারী অনেক গোত্র পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ৪২৯-৪৩০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও স্পষ্টতই মুসলমানদের শক্তি কেবল হ্রাস পেয়েছে। প্রতিটি মুসলমান তাদের ঈমানের শক্তি নির্বিশেষে পবিত্র কুরআনের সত্যতা বিশ্বাস করে কারণ সন্দেহ করলে তাদের ঈমান নষ্ট হবে। নিম্নলিখিত আয়াতে আল্লাহ, মহিমান্বিত, শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাফল্য অর্জনের চাবিকাঠি দিয়েছেন যা সারা বিশ্বে মুসলমানদের দুর্বলতা এবং দুঃখ দূর করবে। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৯:

" সুতরাং তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, যদি তোমরা [সত্যিকারের] বিশ্বাসী হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।"

মহান আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, উভয় জাহানে এই শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাফল্য অর্জনের জন্য মুসলমানদের কেবল প্রকৃত মুমিন হতে হবে। প্রকৃত ঈমানের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর প্রতি এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য, যেমন নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও ভালোবাসা, যা জামে আত তিরমিযী, ২৫১৫ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর জন্য একজনকে ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করতে হবে। এই মনোভাবের মাধ্যমে সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের সাফল্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছিল। এবং যদি মুসলমানরা তা অর্জন করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই এই সঠিক নির্দেশিত মনোভাবের দিকে ফিরে যেতে হবে। যেহেতু মুসলমানরা পবিত্র কুরআনে বিশ্বাস করে, তাদের এই সহজ শিক্ষাটি বোঝা উচিত এবং তার উপর আমল করা উচিত।

মন্দের বিরুদ্ধে ক্ষমা

তাবুক থেকে ফেরার সময়, একদল মুনাফিক মহানবী (সাঃ) কে হত্যার চেষ্টা করে। দুইজন সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে ছিলেন, যখন তারা একটি সংকীর্ণ খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়ে ভ্রমণ করছিলেন। মুনাফিকরা তাদের মুখ লুকিয়ে রেখে মহানবী (সাঃ) কে পাহাড় থেকে ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দুই সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মহানবী (সাঃ) তাদের মন্দ পরিকল্পনা এবং তাদের নাম সম্পর্কে ঐশ্বরিকভাবে অবহিত হয়েছিলেন। তিনি মুনাফিকদের শাস্তি দেননি বরং তাদের গুরুতর পাপ ঢেকে রাখেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৩-২৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ তা'আলা সূরা তওবার ৯ম সূরার ৭৪ নম্বর আয়াত নাযিল করেছেন:

"তারা আল্লাহর নামে শপথ করে যে তারা [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কিছু বলেনি], অথচ তারা কুফরের কথা বলেছিল এবং তাদের ইসলামের [ভান] করার পরে কুফরী করেছিল এবং এমন কিছু করার পরিকল্পনা করেছিল যা তারা অর্জন করতে পারেনি..."

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৯:৭৪, পৃষ্ঠা ৮৯-৯০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রের পেছনের লোকদের মুখোশ উন্মোচন করেননি, কারণ তিনি চেয়েছিলেন যে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হোক এবং ইসলাম গ্রহণ করুক।

সহীহ বুখারীতে ৬৮৫৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি বরং ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং উপেক্ষা করেছেন।

যখন অন্য কোন বিকল্প অবশিষ্ট থাকে না, তখন মুসলমানদেরকে আনুপাতিক এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে আত্মরক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের কখনই সীমা লঙ্ঘন করা উচিত নয় কারণ এটি একটি পাপ। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৯০:

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

যেহেতু চিহ্ন অতিক্রম করা এড়ানো কঠিন, তাই একজন মুসলিমের ধৈর্য ধারণ করা, অন্যদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা উচিত কারণ এটি কেবল নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যই নয়, বরং মহান আল্লাহ্‌র কাছেও পৌঁছে দেয়, যিনি তাদের পাপ ক্ষমা করে দেন। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ২২:

"...এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন..."

অন্যদের ক্ষমা করা অন্যদের চরিত্রকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রেও আরও কার্যকর, যা ইসলামের উদ্দেশ্য এবং মুসলমানদের উপর কর্তব্য, কারণ প্রতিশোধ নেওয়া কেবল জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও শত্রুতা এবং ক্রোধের জন্ম দেয়।

যাদের অন্যদের ক্ষমা না করার বদ অভ্যাস আছে এবং ছোটখাটো বিষয়েও সবসময় ক্ষোভ পোষণ করে, তারা হয়তো দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করেন না বরং তাদের প্রতিটি ছোট পাপ পরীক্ষা করেন। একজন মুসলিমের উচিত সবকিছু ছেড়ে দেওয়া শেখা কারণ এর ফলে উভয় জগতেই ক্ষমা লাভ হয়। উপরন্তু, যখন কেউ তাদের বিরক্তিকর প্রতিটি ছোটখাটো বিষয় ধরে রাখার অভ্যাস গ্রহণ করে তখন মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। অতএব, অন্যদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা শেখা একজনকে ছোটখাটো বিষয়গুলি ছেড়ে দিতে সাহায্য করে, যা তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে সহায়তা করে।

পরিশেষে, মূল হাদিসটির অর্থ এই নয় যে অন্যরা যখন সীমা অতিক্রম করে, তখন আত্মরক্ষা করা উচিত নয়, কারণ ইসলাম দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতা শেখায়। উপরন্তু, যখন কেউ অন্যদের ক্ষমা করে, তার অর্থ এই নয় যে তাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত বা স্বাভাবিকভাবেই তাদের সাথে মেলামেশা চালিয়ে যাওয়া উচিত। এতে কেবল তাদের উপর আবার অন্যায় হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহর জন্য অন্যদের ক্ষমা করা উচিত, তাদের ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের অধিকার পূরণ করতে হবে এবং অতীতে যারা তাদের উপর

অন্যায় করেছে তাদের সাথে আচরণ করার সময় সতর্কতার সাথে চলতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয় এবং তারা উভয় জগতেই আশীর্বাদ এবং প্রতিদান লাভ করে।

ক্ষতির জন্য মসজিদ

তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময়, মহান আল্লাহ তায়ালা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কুবার কাছে মুনাফিকরা যে ভবনটি তৈরি করেছিল তা ধ্বংস করে দিন। তারা এটিকে মসজিদ বলে অভিহিত করেছিল, যেখানে তাদের উদ্দেশ্য ছিল একটি ঘাঁটি তৈরি করা যেখানে তারা মিলিত হতে পারে এবং সাহাবীদের কাছ থেকে নিরাপদ বোধ করে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। তারা স্থানীয় মুসলমানদের ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য কুবার সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে চেয়েছিল। এই পরিকল্পনার নেতা ছিল আবু আমির নামে একজন দুষ্ট ব্যক্তি, যে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে মক্কায় হিজরত করে যেখানে সে তাদের যুদ্ধে উস্কে দেয়। যখন এটি ব্যর্থ হয়, তখন সে বাইজেন্টাইন রাজার কাছে যায় এবং তাকে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপরও আক্রমণ করতে উৎসাহিত করে। এই মুনাফিকরা চেয়েছিল যে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবনের ভেতরে নামাজ পড়ে বরকত বর্ষণ করুন। এই পদক্ষেপ সাহাবীদেরকেও এর ভেতরে নামাজ পড়তে উৎসাহিত করত, যার ফলে মুনাফিকরা তাদের বিভ্রান্ত করার সুযোগ পেত। আল্লাহ তাআলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এর ভেতরে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন এবং পরিবর্তে তাকে ভবনটি ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছেন। উপরন্তু, আল্লাহ তাআলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এবং পরোক্ষভাবে সকল মুসলমানকে আল্লাহর প্রকৃত ঘর, মসজিদ, যা তাকওয়ার অর্থ, আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, দখল করতে উৎসাহিত করেছেন। ৯ম সূরা তওবা, আয়াত ১০৭-১১০:

“আর [এমন কিছু] [মুনাফিক] যারা নিজেদের জন্য মসজিদ তৈরি করেছে ক্ষতি, কুফর এবং মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য এবং যারা পূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের জন্য একটি স্থান হিসেবে। এবং তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, "আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছিলাম।" আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। সেখানে কখনও দাঁড়াও না। প্রথম

দিন থেকেই তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি তোমার জন্য দাড়ানোর যোগ্য। সেখানে এমন লোক আছে যারা নিজেদের পবিত্র করতে পছন্দ করে; আর আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন যারা নিজেদের পবিত্র করে। তাহলে যে ব্যক্তি তার ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেছে তাকওয়ার উপর আল্লাহর ভয়ে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য, সে কি ভালো, নাকি সেই ব্যক্তি যে তার ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেছে একটি ভূমির ধারে যা ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, তারপর তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়েছিল? আর আল্লাহ জালেমদেরকে পথ দেখান না। তাদের নির্মিত ভবনটি তাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে যতক্ষণ না তাদের হৃদয় থেমে যায়। আর আল্লাহ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৬-২৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ভণ্ডামির লক্ষণ হলো, একজন ব্যক্তি সমাজে দুর্নীতি ছড়িয়ে দেয়। এই নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য পারিবারিক ইউনিট থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক স্তরে শেষ পর্যন্ত সকল সামাজিক স্তরকে প্রভাবিত করে। এই ধরণের ব্যক্তি ভালোর জন্য একত্রিত হতে দেখতে অপছন্দ করে কারণ এর ফলে অন্যদের পার্থিব মর্যাদা তাদের নিজেদের চেয়েও বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি তাদের গীবত এবং অপবাদের দিকে ঠেলে দেয় যাতে মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে চলে যায়। তাদের মন্দ মনোভাব তাদের নিজস্ব আত্মীয়তার বন্ধন ধ্বংস করে এবং যখন তারা অন্য পরিবারগুলিকে সুখী দেখতে পায় তখন তাদের সুখও নষ্ট করে। তারা দোষ খুঁজে বের করার লোক যারা তাদের সামাজিক মর্যাদাকে টেনে নামানোর জন্য অন্যদের ভুল উন্মোচন করার জন্য তাদের সময় ব্যয় করে। তারাই প্রথম ব্যক্তি যারা অন্যদের সম্পর্কে পরচর্চা শুরু করে এবং ভালো কথা বলা হলে বধির আচরণ করে। শান্তি ও নীরবতা তাদের বিরক্ত করে তাই তারা নিজেদের মনোরঞ্জনের জন্য সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করে। তারা সুনান ইবনে মাজাহ, ২৫৪৬ নম্বরে পাওয়া হাদিসটি মনে রাখতে ব্যর্থ হয়। এটি পরামর্শ দেয় যে যে কেউ অন্যের দোষ ঢেকে রাখে, আল্লাহ, তার দোষ ঢেকে রাখবেন। কিন্তু যারা অন্যদের দোষ খুঁজে বের করে এবং প্রকাশ করে,

আল্লাহ তাদের দোষ মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবেন। তাই বাস্তবে, এই ধরণের ব্যক্তি সমাজের কাছে কেবল তাদের নিজেদের দোষই প্রকাশ করছে, যদিও তারা বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের দোষই প্রকাশ করছে। উপরন্তু, উদ্ধৃত আয়াতগুলিতে সতর্ক করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সমাজে দুর্নীতি ছড়ায়, সে উভয় জগতেই তার পরিণতি ভোগ করবে। তাদের আচরণের মাধ্যমে তারা যে পার্থিব জিনিসগুলি অর্জন করে, যেমন সামাজিক প্রভাব, উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার উৎস হয়ে উঠবে। এটি অনিবার্য কারণ যারা সমাজের মধ্যে দুর্নীতি ছড়ায় তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। ফলস্বরূপ, তারা একটি ভারসাম্যহীন মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং তারা তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে ভুল জায়গায় স্থাপন করবে। তাই তাদের আচরণ তাদের উভয় জগতেই চাপ এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করবে। উপরন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ একাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয় সহ সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই কেবল যারা মনের শান্তি পান এবং যারা পান না তাদের হত্যা করেন। এবং যারা সমাজের মধ্যে দুর্নীতি ছড়ায় তাদের তিনি তা দেন না। ৫৩তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

উপরন্তু, আলোচিত মূল ঘটনাটি আল্লাহর ঘর, মসজিদ, প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ মুসলিমের ১৫২৮ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো মসজিদ এবং তাঁর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হলো বাজার।

ইসলাম মুসলমানদের মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও যেতে নিষেধ করে না, এমনকি তাদের সর্বদা মসজিদে বসবাস করার নির্দেশও দেয় না। তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা বাজার এবং অন্যান্য স্থানে অপ্রয়োজনীয়ভাবে যাওয়ার চেয়ে জামাতে নামাজ এবং ধর্মীয় সমাবেশে যোগদানের জন্য মসজিদে যাওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়।

যখন কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন অন্য জায়গায়, যেমন শপিং সেন্টারে যাওয়া কোন ক্ষতি নেই, তবে একজন মুসলিমের উচিত অপ্রয়োজনে সেখানে যাওয়া এড়িয়ে চলা, কারণ সেখানে পাপের ঘটনা বেশি ঘটে। যখনই তারা অন্য জায়গায় যায়, তখন তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা যেন মহান আল্লাহর অবাধ্যতা না করে, যার মধ্যে অন্যদের প্রতি অন্যায় করাও অন্তর্ভুক্ত। তাদের অতিরঞ্জিত মেলামেশা এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এটিই সমাজে সংঘটিত বেশিরভাগ পাপের কারণ।

মসজিদগুলিকে পাপ থেকে মুক্তির জন্য এবং মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের জন্য একটি আরামদায়ক স্থান হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। যেমন একজন ছাত্র একটি গ্রন্থাগার থেকে উপকৃত হয়, যেমন এটি অধ্যয়নের জন্য তৈরি একটি পরিবেশ, তেমনি মুসলমানরা মসজিদ থেকে উপকৃত হতে পারে, কারণ এর মূল উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে কার্যকর জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করতে উৎসাহিত করা যাতে তারা সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করতে পারে।

মসজিদগুলি তাদের উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যও একটি চমৎকার স্থান, যা হল মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে। মসজিদগুলি তাদের কার্যকলাপকে সঠিকভাবে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্যও উৎসাহিত করে, যাতে তারা তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং দায়িত্বগুলি পূরণ করতে পারে, পরকালের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে পারে এবং পরিমিতভাবে বৈধ আনন্দ উপভোগ করতে পারে। যে ব্যক্তি মসজিদ এড়িয়ে চলে সে প্রায়শই তাদের সময় এবং সম্পদকে নিরর্থক এবং অর্থহীন কাজে নষ্ট করে এবং ফলস্বরূপ তারা উভয় জগতেই লাভবান হতে হারাবে।

একজন মুসলিমের উচিত কেবল অন্যান্য স্থানের চেয়ে মসজিদকে অগ্রাধিকার দেওয়া নয়, বরং অন্যদের, যেমন তাদের সন্তানদেরকেও একই কাজ করতে উৎসাহিত করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, এটি যুবকদের জন্য পাপ, অপরাধ এবং খারাপ সঙ্গ এড়াতে একটি চমৎকার জায়গা, যা উভয় জগতে ঝামেলা এবং অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।

তোমার উপায় ব্যবহার করো

তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময়, মহানবী (সা.) ঘোষণা করেছিলেন যে, অভিযানের সময় মদিনায় অবস্থানকারী কিছু লোক সাহাবীদের সাথে ছিল, যারা সাহাবীদের সাথে ছিল, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, যারা অভিযানে অংশ নিয়েছিল কারণ তাদের যোগদান না করার জন্য বৈধ অজুহাত ছিল। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

দুঃখের বিষয় হল, কিছু মুসলিম একটি দুর্বল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে যা তাদের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যথা, তারা তাদের পরিস্থিতি এবং পরিস্থিতিকে অন্যদের সাথে তুলনা করে যারা সহজ পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে এবং এটিকে একটি অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে যাতে তারা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন পূর্ণকালীন কাজকারী ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যে তাদের প্রচেষ্টার অভাবকে অজুহাত হিসেবে উপস্থাপন করে, নিজেকে এমন একজনের সাথে তুলনা করে যে খণ্ডকালীন কাজ করে এবং কেবল দাবি করে যে তাদের কাছে বেশি অবসর সময় থাকায় তাদের জন্য আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি করা সহজ। অথবা একজন দরিদ্র মুসলিম ব্যক্তি যে কোনও ধরণের দান-খয়রাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যারা বেশি সম্পদের অধিকারী এবং দাবি করে যে ধনী ব্যক্তি তাদের চেয়ে সহজে দান-খয়রাত করতে পারে। তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে এই অজুহাতগুলি তাদের আত্মাকে ভালো বোধ করতে পারে কিন্তু এটি তাদের এই পৃথিবীতে বা পরকালে সাহায্য করে না। আল্লাহ তাআলা চান না যে মানুষ অন্যের সাধ্য অনুযায়ী কাজ করুক, তিনি কেবল চান যে মানুষ তার নিজস্ব সাধ্য অনুযায়ী তাঁর আনুগত্যে কাজ করুক। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি পূর্ণকালীন কাজ করে, সে তার অবসর সময় আল্লাহর আনুগত্যে উৎসর্গ করতে পারে, এমনকি যদি তা খণ্ডকালীন কাজ করে তার তুলনায় কমও হয়। এই ক্ষেত্রে খণ্ডকালীন কাজ করে, তার উপর পূর্ণকালীন কাজ করা ব্যক্তির কোন প্রভাব পড়ে না, তাই তাদেরকে

কঠোর পরিশ্রম না করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা কেবল একটি অজুহাত। দরিদ্র মুসলিমের উচিত কেবল তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা, যদিও তা ধনী ব্যক্তির তুলনায় অনেক কম হয় কারণ আল্লাহ তাআলা তাদের নিয়ত এবং তারা যা করে তার বিচার করবেন, তিনি তাদের অন্য মুসলিমদের কাজের বিচার করবেন না।

মুসলমানদের উচিত এই অপ্রয়োজনীয় অজুহাত ত্যাগ করা এবং তাদের নিজস্ব সাধ্য অনুযায়ী কেবল মহান আল্লাহর আনুগত্য করা।

ভদ্র আচরণই সবচেয়ে ভালো

তাবুক অভিযানের পর যখন মহানবী (সা.) মদিনায় ফিরে আসেন, তখন যারা অভিযানে অংশ নিতে ব্যর্থ হন তারা তাঁর কাছে এসে তাদের অজুহাত বারবার বলেন এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। তিনি তাদের সমস্ত অজুহাত গ্রহণ করেন এবং তাদের পক্ষ থেকে দুআ করেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুনাফিকদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের সাথে কোমল আচরণ করেছিলেন।

জামে আত তিরমিযী, ২৭০১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে কোমলতা পছন্দ করেন।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা সকল মুসলমানের গ্রহণ করা উচিত। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা উচিত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, নম্রতা অন্য যে কারো চেয়ে মুসলমানদের জন্য বেশি উপকারী। একজন ভদ্র ব্যক্তি যখন কথা ও কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম রাখেন, তখন তারা কেবল মহান আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও প্রতিদানই পাবেন না এবং তাদের পাপের পরিমাণও কমিয়ে আনবেন না, কারণ একজন ভদ্র ব্যক্তি তার কথা ও কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম রাখেন, বরং এটি তাদের পার্থিব জীবনেও উপকৃত করবে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে কোমল আচরণ করে, সে তার স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণের চেয়ে বিনিময়ে বেশি ভালোবাসা এবং সম্মান পাবে। যখন তাদের সাথে কোমল আচরণ করা হয়, তখন সন্তানরা তাদের

পিতামাতার বাধ্য হওয়ার এবং সম্মানের সাথে আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা তাদের সাথে কোমল আচরণকারীকে সাহায্য করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এর উদাহরণ অন্তহীন। খুব বিরল ক্ষেত্রেই কঠোর মনোভাব প্রয়োজন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, কঠোর মনোভাবের চেয়ে কোমল আচরণ অনেক বেশি কার্যকর হবে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অসংখ্য ভালো গুণাবলীর অধিকারী, তবুও মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর কোমলতা বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন, কারণ এটি অন্যদের ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯:

"অতএব আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের প্রতি কোমল ছিলে। আর যদি তুমি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতে, তাহলে তারা তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

একজন মুসলিমকে মনে রাখতে হবে যে তারা কখনই একজন নবীর চেয়ে ভালো হতে পারবে না, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, এবং যার সাথে তারা যোগাযোগ করবে সে ফেরাউনের চেয়ে খারাপও হতে পারবে না, তবুও, আল্লাহ, মহান নবী মুসা এবং নবী হারুন, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, ফেরাউনের সাথে সদয় আচরণ করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ৪৪:

"আর তার সাথে নম্রভাবে কথা বলো, হয়তো সে স্মরণ করবে অথবা [আল্লাহকে] ভয় করবে।"

কঠোরতা কেবল মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং অন্যদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে এটি একটি কঠোর এবং অশোধিত ধর্ম। এইভাবে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা একটি গুরুতর অপরাধ যা সকল মুসলমানের এড়িয়ে চলা উচিত।

অতএব, একজন মুসলিমের সকল বিষয়ে কোমলতা অবলম্বন করা উচিত কারণ এটি প্রচুর সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদের, যেমন তার পরিবারকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে মূল হাদিসটি এই অর্থ বহন করে না যে অন্যরা যখন সীমা অতিক্রম করে তখন আত্মরক্ষা করা উচিত নয়, কারণ ইসলাম দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতা শেখায়। তবে এটি মুসলমানদেরকে সাধারণভাবে ভদ্রতাকে তাদের পথ হিসেবে গ্রহণ করতে শেখায়, অন্যদের সুযোগ না দিয়ে।

পরিশেষে, একজনকে সর্বদা একটি সহজ ইসলামী দর্শন মনে রাখতে হবে, যেভাবে অন্যদের সাথে আচরণ করা হয়, আল্লাহ তার সাথেও তেমনই আচরণ করবেন। যদি কেউ অন্যদের প্রতি তাদের কথাবার্তা এবং কাজে কঠোরতা প্রদর্শন করে, তাহলে মহান আল্লাহ তার সাথেও একই আচরণ করবেন। অন্যদিকে, যদি তারা অন্যদের সাথে নম্রতার সাথে আচরণ করে, অন্যদের জন্য জিনিসপত্র সহজ করে, ভালো কাজে সাহায্য করে এবং অন্যদের ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে, তাহলে মহান আল্লাহ তার সাথেও একই আচরণ করবেন।

অধিকন্তু, আলোচিত মূল ঘটনাটি থেকে আরও জানা যায় যে, মহানবী (সা.) তাবুক যুদ্ধ থেকে পিছনে থাকা ব্যক্তিদের সন্দেহের সুযোগ দিয়েছিলেন কারণ তিনি তাদের উদ্দেশ্য বা অজুহাত নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি।

সুনানে আবু দাউদের ৪৯৯৩ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা আল্লাহর ইবাদতের একটি দিক, অর্থাৎ, এটি আল্লাহর আনুগত্যের একটি দিক।

নেতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করা প্রায়শই পাপের দিকে পরিচালিত করে, যেমন গীবত এবং অপবাদ। একজন মুসলিমের উচিত যেখানেই সম্ভব ইতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করা যাতে অন্যদের সন্দেহের সুবিধা দেওয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশত, নেতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করা পরিবার থেকে শুরু করে জাতীয় স্তরের সকলের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একটি জাতি কতবার অনুমান এবং সন্দেহের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে? মিডিয়াতে পাওয়া বেশিরভাগ কেলেঙ্কারি অনুমানের উপর ভিত্তি করে। এমনকি আইন তৈরি করা হয়েছে যা অনুমান এবং সন্দেহের ব্যবহারকে সমর্থন করে। এটি প্রায়শই ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্ক তৈরি করে কারণ এই মানসিকতার লোকেরা সর্বদা বিশ্বাস করে যে অন্যরা তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে তাদের সমালোচনা করছে। এটি একজনকে অন্যদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে বাধা দেয়, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে পরামর্শদাতা কেবল তাদের উপহাস করছে এবং এটি একজনকে পরামর্শ দিতে বাধা দেয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে অন্য ব্যক্তি তাদের কথার প্রতি কোন মনোযোগ দেবে না। এবং একজন ব্যক্তি যার এই নেতিবাচক মানসিকতা আছে তাকে পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকবে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটি কেবল তর্কের দিকে পরিচালিত করবে। এর ফলে অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়, যেমন তিক্ততা।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ যদি তাদের সমালোচনা করে বলে ধরে নেয়, তবুও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত যদি তা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে হয়।

সবসময় নেতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করার ফলে এক ধরণের শক্তিশালী মানসিক অসুস্থতা দেখা দেয়, যার নাম প্যারানয়া। যে প্যারানয়া গ্রহণ করে সে সবসময় অন্যদের খারাপ জিনিসের ব্যাপারে সন্দেহ করবে। এটি বিবাহের মতো সম্পর্কের জন্য অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক হতে পারে।

সম্ভব হলে ইতিবাচক উপায়ে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত, যা ইতিবাচক মানসিকতার দিকে পরিচালিত করে। এবং একটি ইতিবাচক মানসিকতা সুস্থ সম্পর্ক, অনুভূতি এবং ঐক্যের দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, সর্বদা নেতিবাচক উপায়ে বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা একজনকে সর্বদা অন্যদের প্রতি নেতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং আচরণ করতে উৎসাহিত করে, এমনকি যখন তাদের আচরণ ভালো হয়। এটি কেবল অন্যদের অধিকার পূরণ করতে বাধা দেয়, যা মহান আল্লাহ কর্তৃক আদেশ করা হয়েছে। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১২:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক [নেতিবাচক] অনুমান থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই কিছু অনুমান পাপ..."

রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্য

তাবুক অভিযানের পর যখন মহানবী (সাঃ) মদিনায় ফিরে আসেন, তখন যারা অভিযানে অংশ নিতে ব্যর্থ হন তারা তাঁর কাছে এসে তাদের অজুহাত বারবার বলেন এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তিনি তাদের সকল অজুহাত গ্রহণ করেন এবং তাদের পক্ষ থেকে দুআ করেন এবং তাদের গোপন উদ্দেশ্য তাদের এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে রেখে দেন। একজন সাহাবী, কা'ব বিন মালিক, আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, কেবল অবহেলা এবং অলসতার কারণেই পিছনে থেকে যান। যদিও তিনি অন্যদের অজুহাত দেখাতে এবং মহানবী (সাঃ) কর্তৃক ক্ষমা পেতে দেখেছিলেন, তবুও তিনি মহানবী (সাঃ) এর কাছে সত্য ঘোষণা করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে মিথ্যা বলার জন্য আল্লাহ্ তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হবেন, এমনকি যদি তিনি সাময়িকভাবে মহানবী (সাঃ) এর রাগ থেকে বেঁচে যান, মিথ্যা বলার মাধ্যমে। আরও দুই সাহাবী, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, তিনিও সত্য স্বীকার করেছিলেন। মহানবী (সাঃ) ঘোষণা করেছিলেন যে, মহান আল্লাহ্ তাদের পরিস্থিতির পরিণতি নির্ধারণ করবেন। মদীনার জনগণকে বলা হয়েছিল যে, তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত তারা যেন তিনজনকে সামাজিকভাবে বয়কট করে। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩১-৩২-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তিন ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে বয়কট করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তাদের প্রিয় বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের কেউই তাদের সাথে কথা বলেননি। কথাটি কঠোর শোনাতে পারে, তবুও সমস্ত মুসলমানদের কাছে আল্লাহর অবাধ্যতা এড়াতে একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠানো প্রয়োজন ছিল এবং এটি ছিল এই তিন সাহাবী (রাঃ)-কে যে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তারই একটি অংশ। এই আদেশের প্রতি জনগণের প্রতিক্রিয়া নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি তাদের মহৎ ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার পরিচয় দেয়।

অতএব, নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার তাদের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করা উচিত, তাঁর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং সে অনুযায়ী কাজ করার মাধ্যমে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এবং ৫৯তম অধ্যায় আল হাশর, ৭ম আয়াত:

"...আর রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো; আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো..."

এবং অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৮০:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

এবং অধ্যায় ৩৩ আল আহযাব, আয়াত ২১:

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে একটি চমৎকার আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"

তাঁর পবিত্র চরিত্রের অনুকরণে তাদের চরিত্রকে গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং উদারতার মতো ভালো গুণাবলী গ্রহণ করে এবং হিংসা, অহংকার এবং লোভের মতো নেতিবাচক গুণাবলী পরিত্যাগ করে। এটি তাদের মানসিক শান্তি নিশ্চিত করবে, কারণ ইতিবাচক গুণাবলী গ্রহণের ফলে ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে শেখা এবং তার উপর আমল করা, বহির্বিশ্বের কাছে তাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা নিশ্চিত করবে। যে ব্যক্তি এটি করতে ব্যর্থ হয় সে অনিবার্যভাবে তাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করবে এবং অমুসলিম এবং অন্যান্য মুসলিমদের ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করা থেকে বিরত রাখবে। তাঁর ভুল উপস্থাপনের ফলে বহির্বিশ্ব মুসলমানদের খারাপ আচরণ পর্যবেক্ষণ করলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমালোচনা করবে। এটি এমন একটি বিষয় যা প্রতিটি মুসলিমকে জবাবদিহি করতে হবে কারণ তাদের উপর কর্তব্য হলো আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে বহির্বিশ্বের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা।

উপরন্তু, পূর্ববর্তী জাতিগুলি যারা তাদের পবিত্র নবীদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভালোবাসার দাবি করে, তারা যেমন আখেরাতে তাদের সাথে মিলিত হবে না কারণ তারা কার্যত তাদের অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তেমনি যে মুসলিমরা কার্যত নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তারাও আখেরাতে তাঁর সাথে মিলিত হবে না। বরং, একজন ব্যক্তি তাদের সাথে মিলিত হবে যাদের তারা এই পৃথিবীতে কার্যত অনুকরণ করেছিল। সুনান আবু দাউদের ৪০৩১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রান্তে আনুগত্য

তাবুক অভিযান থেকে পিছিয়ে থাকা তিনজন সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়েছিল, যখন মুসলমানরা তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিল। এই সময়, একজন অমুসলিম শাসক এই সাহাবীদের একজন, কা'ব বিন মালিক, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, কে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, যাতে তাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে তার সাথে কঠোর আচরণ করা হচ্ছে এবং তার উচিত মদীনা ছেড়ে তার কাছে আসা যেখানে তার সাথে অত্যন্ত সম্মান ও সম্মানের সাথে আচরণ করা হবে। কা'ব, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, বুঝতে পেরেছিলেন যে এটি একটি পরীক্ষা এবং চিঠিটি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। এটি ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩১-৩২-এ আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি স্বাচ্ছন্দ্য এবং অসুবিধা উভয় সময়েই মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকার গুরুত্ব নির্দেশ করে। স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা প্রায়শই সহজ হয়, তাই, একজনের ঈমানের আসল পরীক্ষা হল যখন তারা কঠিন সময়েও মহান আল্লাহর আনুগত্য অব্যাহত রাখে। সূরা ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ২-৩:

"মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না? কিন্তু আমরা অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি, আর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা মিথ্যাবাদী।"

আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে সাহায্য করার জন্য, সর্বদা তাদের দৃঢ় ঈমান গ্রহণ করতে হবে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে প্রাপ্ত স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণগুলি শেখা এবং সেগুলি অনুসরণ করা হলে দৃঢ় ঈমান অর্জন করা সম্ভব হয়, যা ব্যাখ্যা করে যে, আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলা উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। এই ব্যক্তি যখনই তাদের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয় তখনই সহজেই আল্লাহকে অমান্য করবে কারণ তারা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে, তাদের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে আল্লাহর আনুগত্য করলে উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত হয়। অতএব, ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে ঈমানের নিশ্চয়তা অর্জন করতে হবে যাতে তারা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং তাদের জীবনের মধ্যে প্রত্যেককে এবং সবকিছুকে সঠিকভাবে স্থাপন করার মাধ্যমে।

সত্য সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়

তিনজন সাহাবী, যারা তাবুক অভিযান থেকে পিছিয়ে ছিলেন, তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়েছিল, যখন মুসলমানরা তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিল। ৫০টি কঠিন দিনের পর, আল্লাহ, পবিত্র কুরআনে তাদের ক্ষমা প্রকাশ করেছিলেন, বিশেষ করে সত্যের উপর আঁকড়ে থাকার জন্য তাদের জন্য একটি বিশেষ আশীর্বাদ। ৯ম অধ্যায়, আত-তাওবা, আয়াত ১১৮:

"আর তিনি ঐ তিনজনকে ক্ষমা করে দিলেন যারা একা ছিল [অর্থাৎ, বর্জিত, তাদের ভুলের জন্য অনুতপ্ত] এমনকি এতটাই বিস্তৃত ছিল যে পৃথিবী তাদের উপর চেপে ধরেছিল এবং তাদের আত্মা তাদের উপর চাপা পড়ে গিয়েছিল [অর্থাৎ, তাদের উপর চাপ পড়েছিল] এবং তারা নিশ্চিত ছিল যে, তিনি ছাড়া আল্লাহ থেকে কোন আশ্রয়স্থল নেই। তারপর তিনি তাদের প্রতি মনোযোগ দিলেন যাতে তারা তওবা করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩০-৩৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

তিনজন সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, এই সম্মান লাভ করেছিলেন কারণ তারা তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ না করার জন্য তাদের অজুহাত পেশ করার সময় মহানবী (সাঃ) এর প্রতি মিথ্যা বলার পরিবর্তে সত্যের উপর আঁকড়ে ধরেছিলেন।

জামে আত তিরমিযী, ১৯৭১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে যা জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। যখন একজন ব্যক্তি সত্যবাদিতায় অটল থাকে, তখন তাকে মহান আল্লাহ তাআলা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সত্যবাদিতা তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রথমটি হল যখন কেউ তার নিয়ত এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থাৎ, তারা কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো কোনও গোপন উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়। সহিহ বুখারির ১ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন ব্যক্তির আন্তরিকতার প্রমাণ হল যখন সে অন্যদের কৃতজ্ঞতা কামনা করে না বা আশা করে না।

পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা কেবল মিথ্যা নয়, সকল ধরণের মৌখিক পাপ থেকে বিরত থাকে। কারণ যে ব্যক্তি অন্যান্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি দুর্দান্ত উপায় হল জামে আত তিরমিযী, ২৩১৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসের উপর আমল করা, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উন্নত করতে পারে যখন সে এমন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া এড়িয়ে চলে যা তার সাথে সম্পর্কিত নয়। বেশিরভাগ মৌখিক পাপ ঘটে কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে যা তার সাথে সম্পর্কিত নয়। এর মধ্যে অনর্থক কথাবার্তা এড়ানোও অন্তর্ভুক্ত, কারণ এটি প্রায়শই পাপপূর্ণ কথাবার্তার দিকে পরিচালিত করে এবং একজনের মূল্যবান সময়ের অপচয় করে, যা বিচারের দিনে তাদের জন্য অনুশোচনা হবে। কেউ

কেবল ভালো কিছু বলার মাধ্যমে বা নীরব থাকার মাধ্যমে সত্যবাদিতার এই স্তরটি গ্রহণ করতে পারে।

চূড়ান্ত পর্যায় হলো কর্মে সত্যবাদিতা। এটি অর্জন করা সম্ভব হয় মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুসারে ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করে, নিজের ইচ্ছানুযায়ী ইসলামের শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা না করে। তাদের সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকার ক্রম মেনে চলতে হবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে আল্লাহ, মহিমান্বিতকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করবে।

আলোচ্য মূল হাদিস অনুসারে, সত্যবাদিতার এই স্তরগুলির বিপরীত, অর্থাৎ মিথ্যা বলার পরিণতি হল, এটি অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে যা পরবর্তীতে জাহান্নামের আগুনের দিকে পরিচালিত করে। যখন কেউ এই মনোভাব ধরে রাখে, তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে একজন মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হবে। পূর্বে আলোচিত তিনটি স্তর অনুসারে, নিয়তে মিথ্যা বলার অর্থ হল মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া এবং মানুষের জন্য সৎকর্ম করা। কথায় মিথ্যা বলার অর্থ হল সকল ধরণের পাপপূর্ণ কথা বলা। কাজে মিথ্যা বলার অর্থ হল পাপ করে যাওয়া, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তায়ালা এবং মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করা। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলার এই সমস্ত স্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে সে একজন মহান মিথ্যাবাদী এবং বিচারের দিন যে ব্যক্তিকে মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করবে তার কী হবে তা নির্ধারণ করার জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না।

গড় অনুযায়ী সুষম ব্যয়

তাবুক অভিযান থেকে পিছিয়ে থাকা তিনজন সাহাবীকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেওয়ার পর, তাদের একজন কা'ব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসেন, যিনি তাঁকে অভিনন্দন জানান। কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করে দেন। কিন্তু নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন যে, যদি তিনি কিছু দান করেন এবং বাকিটা রেখে দেন, তাহলেই ভালো। ইমাম ইবনে কাথিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩০-৩৩-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ২৩৭৬ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে, সে তার দান অনুসারে পুরস্কৃত হবে। এবং তিনি সতর্ক করে বলেছেন যে, মজুদ না করার জন্য, অন্যথায় আল্লাহ তাঁর নিয়ামত আটকে রাখবেন।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন ব্যক্তিকে কেবল হালাল সম্পদ অর্জন এবং ব্যয় করতে হবে, কারণ যে কোনও সৎকর্ম যার ভিত্তি হারাম, তা তার নিয়ত নির্বিশেষে মহান আল্লাহ তাআলা প্রত্যাখ্যান করবেন। সহীহ মুসলিমের ২৩৪২ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ঠিক যেমন ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি হল নিয়ত, তেমনি ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল সম্পদ অর্জন এবং ব্যবহার করা।

উপরন্তু, এই ব্যয় কেবল দান-খয়রাতের মাধ্যমেই নয় বরং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে নিজের এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটাতে ব্যয় করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এটি আসলে সহীহ বুখারী, ৪০০৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে একটি সৎকর্ম। একজন মুসলিমের উচিত ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে ব্যয় করা যাতে সে নিজে অভাবগ্রস্ত না হয়ে অন্যদের সাহায্য করে। অধ্যায় ১৭ আল-ইসরা, আয়াত ২৯:

"আর তোমার হাতকে তোমার গলায় শৃঙ্খলিত করো না অথবা সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত করো না, ফলে তুমি দোষী ও দেউলিয়া হয়ে পড়ো।"

একজন মুসলিমের উচিত নিয়মিতভাবে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা, যদিও তা সামান্যই হয়, কারণ মহান আল্লাহ তাআলা ব্যক্তির গুণগত অর্থ, তাদের আন্তরিকতা দেখেন, কোনও কাজের পরিমাণ দেখেন না। নিয়মিতভাবে অল্প পরিমাণে দান করা আল্লাহর কাছে মাঝে মাঝে বেশি পরিমাণে দান করার চেয়ে অনেক ভালো এবং প্রিয়। সহিহ বুখারীতে ৬৪৬৫ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য মূল হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন কেউ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করে, তখন মহান আল্লাহ তাকে তাঁর অসীম মর্যাদা অনুসারে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি সংযত থাকে, সে মহান আল্লাহর কাছ থেকেও একই রকম প্রতিদান পাবে। যদি কোন মুসলিম তাদের সম্পদ জমা করে রাখে, তবে তারা তা অন্যদের জন্য উপভোগ করার জন্য রেখে যায় এবং তাদের জবাবদিহি করতে হয়। যদি তারা তাদের সম্পদের অপব্যবহার করে তবে তা তাদের জন্য এই পৃথিবীতে অভিশাপ এবং বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং পরকালে শাস্তির কারণ হবে।

পরিশেষে, এই হাদিসটি কেবল সম্পদ নয়, বরং সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যখন কেউ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করে, তখন তারা মনের শান্তি, সাফল্য এবং আশীর্বাদের বৃদ্ধি পাবে, কারণ তারা মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"আর [স্মরণ করো] যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের [নেয়ামত] বৃদ্ধি করব..."

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উভয় জাহানে আশীর্বাদ, শান্তি এবং সাফল্য অর্জনের জন্য একজন মুসলিমের ধনী হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদেরকে কেবল প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, তা সে যতই কম হোক না কেন।

ক্ষমা লাভ করা

আরও সাতজন সাহাবী, যারা অবহেলার কারণে তাবুক অভিযান থেকে পিছিয়ে ছিলেন, তারা কোন অজুহাত দেখাননি এবং বরং তাওবার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে মহানবী (সা.)-এর মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে ফেলেন। মহানবী (সা.)-এর কৃতকর্ম দেখে তাদের সিদ্ধান্ত আল্লাহর উপর ছেড়ে দেন। অবশেষে, আল্লাহ তা'আলা ৯ম সূরা তওবার ১০২ নং আয়াত নাজিল করেন, যা তাদের তওবা কবুল হওয়ার ইঙ্গিত দেয়:

"আর কিছু লোক আছে যারা তাদের পাপ স্বীকার করেছে। তারা একটি সৎকর্মের সাথে আরেকটি মন্দকর্ম মিশিয়ে ফেলেছে। সম্ভবত আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযীতে ৩৫৪০ নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে মহান আল্লাহর ক্ষমার গুরুত্ব ও বিশালতা সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। হাদিসের প্রথম অংশে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিম আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে এবং তাঁর রহমতের আশা করে, তিনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

পবিত্র কুরআনে কেবল ক্ষমা প্রার্থনার জন্য নয়, বরং সকল বৈধ প্রার্থনার জন্যই এই জবাব নিশ্চিত করা হয়েছে। সূরা ৪০ গাফির, আয়াত ৬০:

"আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন, "তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।"..."

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই আয়াতটি উল্লেখ করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে প্রার্থনা একটি ইবাদত, যার অর্থ একটি সৎকর্ম। সুনানে আবু দাউদের ১৪৭৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জামে আত তিরমিযির ৩৬০৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে প্রতিটি প্রার্থনা বিভিন্নভাবে কবুল করা হয় যতক্ষণ না এটি বৈধ। ব্যক্তি যা প্রার্থনা করে তা হয় তা দেওয়া হয় অথবা পরকালে তার জন্য একটি সওয়াব সংরক্ষিত থাকবে অথবা তার সমতুল্য পাপ ক্ষমা করা হবে। তবে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইতিবাচক সাড়া পেতে হলে একজন মুসলিমকে প্রার্থনার শর্তাবলী এবং আদব পূরণ করতে হবে। ক্ষমা প্রার্থনার ক্ষেত্রে, এর মধ্যে রয়েছে পাপ এড়িয়ে চলার জন্য সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা করা এবং আন্তরিকভাবে আল্লাহকে আনুগত্য করা, কারণ পাপে লেগে থাকার সময় ক্ষমা প্রার্থনা করা সাধারণ জ্ঞানের পরিপন্থী।

একজন মুসলিমের সবচেয়ে বড় প্রার্থনা হল ক্ষমা প্রার্থনা, কারণ এটি আশীর্বাদ লাভের, এই পৃথিবীর কষ্ট এড়ানোর এবং পরকালের জান্নাত লাভের এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির একটি উপায়। সূরা ৭১ নূহ, আয়াত ১০-১২:

"আর বললেন, 'তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি সর্বদা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে অবিরাম বৃষ্টি বর্ষণ

করবেন। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান দান করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা দান করবেন।"

আলোচ্য মূল হাদিসে যেমনটি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, আল্লাহর অসীম রহমতের উপর আশা রাখা, যখন ক্ষমা প্রার্থনা করা একটি শর্ত। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, তাঁর সম্পর্কে তাঁর বান্দার ধারণা অনুসারে কাজ করেন, যা সহীহ বুখারী, ৭৪০৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি ঐশ্বরিক হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

ক্ষমার সবচেয়ে বড় কারণগুলির মধ্যে একটি হল যখন একজন মুসলিম কেবল মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা আশা করে, যদিও সে জানে যে মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদের ক্ষমা করতে বা শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

আলোচ্য মূল হাদিসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, একজন ব্যক্তি যত পাপই করুক না কেন, মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমাই বেশি। বস্তুত, তা সীমাহীন, তাই একজন ব্যক্তির সীমিত পাপ কখনোই তা অতিক্রম করতে পারবে না। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মুসলমানদেরকে তাদের প্রার্থনাকে বড় করে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন, কারণ মহান আল্লাহর কাছে কিছুই দান করা অসম্ভব নয়। সহীহ মুসলিমের ৬৮১২ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর ক্ষমা অসীম এই সত্যকে পাপে লেগে থাকার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা কেবল এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যকে উপহাস করার শামিল এবং যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে তার ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

আলোচ্য মূল হাদিসের পরবর্তী অংশে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করার গুরুত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, যা বহু আয়াত এবং অন্যান্য হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। ক্ষমা প্রার্থনার এই কাজটি আন্তরিক তওবার একটি অংশ। এটা বোঝা যায় যে ক্ষমা প্রার্থনা করা হল জিহ্বার একটি কাজ, আর বাকি আন্তরিক তওবার মধ্যে রয়েছে কর্মের মাধ্যমে পাপ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। আন্তরিক তওবার মধ্যে রয়েছে প্রকৃত অনুতাপ অনুভব করা, পাপ পুনরায় না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকারের ক্ষতিপূরণ। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একই পাপে অবিচল না থাকা তওবা কবুল হওয়ার শর্ত। সূরা ৩, আলে ইমরান, আয়াত ১৩৫:

"আর যারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে অথবা নিজেদের উপর জুলুম করে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে - আর আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? - এবং তারা জেনেশুনে তাদের কৃতকর্মে অটল থাকে না।"

একজন মুসলিমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনায় অবিচল থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি প্রতিটি উদ্বেগ থেকে মুক্তি, প্রতিটি অসুবিধা থেকে মুক্তির পথ এবং এমন জায়গা থেকে সহায়তা প্রদান করে যেখানে কেউ আশা করতে পারে না। সুনান আবু দাউদের ১৫১৮ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য মূল হাদিসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো ক্ষমার সবচেয়ে বড় কারণ, তা হলো, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা। মহান আল্লাহর সাথে শরীক করা দুই ধরণের: বড় শিরক এবং ছোট শিরক। প্রধান প্রকার হল যখন কেউ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য বা তাঁর অতিরিক্ত অন্য কিছুর উপাসনা করে। ছোট সংস্করণ হল যখন কেউ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে না, যেমন লোক দেখানো। সুনান ইবনে মাজাহ, ৩৯৮৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি

হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করে, তাকে বিচারের দিন আল্লাহ তাআলা তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইতে বলবেন, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এইভাবে কাজ করে, সে অবশেষে এই পৃথিবীতেই প্রকাশ পাবে এবং তারা যতই ভালো আচরণ করুক না কেন, তারা তাদের খারাপ উদ্দেশ্যের কারণে তাদের প্রকৃত ভালোবাসা বা সম্মান পাবে না। সহীহ মুসলিমের ৬৭০৫ নম্বর হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে।

যখন কেউ আল্লাহর একত্ব উপলব্ধি করে, তখন সে কেবল তাঁর প্রতি ভয় এবং ভালোবাসার কারণেই তার সন্তুষ্টির জন্য চিন্তা করে, কাজ করে এবং কথা বলে। এই আচরণ পাপ করার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয় এবং যে কোনও পাপই ঘটুক না কেন, আল্লাহ তায়ালা তা ক্ষমা করে দেন। এই কারণেই সুনানে ইবনে মাজাহের ৩৭৯৭ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাসনার যোগ্য নেই, এই কথাটি সমস্ত ভুল কাজকে মুছে দেয়।

এই আচরণটি সকল মুসলমানের অবশ্যই গ্রহণ করার চেষ্টা করা উচিত। এর ভিত্তি হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা। এটি নিশ্চিত করবে যে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য তিনি যে আশীর্বাদ পেয়েছেন তা তিনি ব্যবহার করছেন। এটি তার পাপ কমিয়ে আনবে এবং যখনই তারা পাপ করে তখনই আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করবে। এটি উভয় জগতে ক্ষমা, শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎ কর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

শোকাহত

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে তাঁর আঠারো মাস বয়সী পুত্র ইব্রাহিম (রাঃ) মারা যান। ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৩৬-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদের ৩১২৭ নম্বর হাদিসে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানুষকে বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, প্রিয়জন হারানোর মতো কঠিন সময়ে কাঁদতে নিষেধ। এটি ভুল কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অনেক সময় কারো মৃত্যুতে কেঁদেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর পুত্র ইব্রাহিম (রাঃ) যখন মারা গিয়েছিলেন, তখন তিনি কেঁদেছিলেন। সুনানে আবু দাউদের ৩১২৬ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, কারো মৃত্যুতে কান্না করা হলো রহমতের একটি নিদর্শন যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে স্থাপন করেছেন। এবং যারা অন্যদের প্রতি করুণা করে, কেবল তাদেরই আল্লাহ দয়া করবেন। সহীহ বুখারীতে ১২৮৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাতির মৃত্যুতে কেঁদেছিলেন।

সহীহ মুসলিমের ২১৩৭ নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে যে, কারো মৃত্যুতে কান্নাকাটি করার জন্য অথবা তার অন্তরে শোকের জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না। তবে যদি সে এমন কথা বলে যা আল্লাহর পছন্দের প্রতি তার অধৈর্যতা প্রকাশ করে, তাহলে তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হতে পারে।

এটা স্পষ্ট যে, কারো অন্তরে শোক প্রকাশ করা বা চোখের জল ফেলা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। যেসব জিনিস নিষিদ্ধ তা হলো বিলাপ করা, কথা বা কাজের মাধ্যমে অধৈর্যতা প্রকাশ করা, যেমন শোকে কাপড় ছিঁড়ে ফেলা বা মাথা ন্যাড়া করা। যারা এই ধরণের কাজ করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কীকরণ রয়েছে। অতএব, যেকোনো মূল্যে এই ধরণের কাজ এড়িয়ে চলা উচিত। এই ধরণের কাজ করার জন্য একজন ব্যক্তিকে কেবল শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে না, বরং যদি মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর সময় অন্যদের এই ধরণের কাজ করতে ইচ্ছা করে এবং আদেশ দেয়, তাহলে তাকেও জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তি এটি না চায়, তাহলে তারা কোনও জবাবদিহি থেকে মুক্ত। জামে আত তিরমিযী, ১০০৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা বোঝা সাধারণ জ্ঞানের বিষয় যে, মহান আল্লাহ, অন্যের কাজের জন্য কাউকে শাস্তি দেবেন না, যখন পূর্ববর্তী ব্যক্তি তাকে সেইভাবে কাজ করার পরামর্শ দেননি। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ১৮:

"আর কোন বোঝা বহনকারী অন্য কারো বোঝা বহন করবে না..."

থাকীফ উপজাতি

আপোষ ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, অমুসলিম সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধিত্বকারী একটি প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণের জন্য নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে দেখা করে। কিন্তু তাদের ইসলাম গ্রহণের সাথে কিছু শর্ত ছিল যা তারা আশা করেছিল যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মেনে নেবেন। এই শর্তগুলির মধ্যে একটি ছিল যে তারা তাদের উপাসনার একটি মূর্তি তাদের দেশে তিন বছর ধরে রাখতে চেয়েছিল। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এই শর্তটি স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যদিও তারা সময়কাল কমিয়ে আনে। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি প্রতিটি পরিস্থিতিতেই ইসলামের নীতির উপর অটল থাকা মুসলমানদের গুরুত্ব নির্দেশ করে। ইসলামকে কখনই এমন একটি পোশাকের মতো ব্যবহার করা উচিত নয় যা কারও ইচ্ছানুযায়ী পরা এবং খুলে ফেলা যায়। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে সে মহান আল্লাহকে মান্য করছে না, তারা কেবল তাদের নিজস্ব কামনা-বাসনার পূজা করছে। সূরা আল ফুরকান, আয়াত ৪৩:

"তুমি কি তাকে দেখেছো যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে?"

অতএব, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে, প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে এই মনোভাব এড়িয়ে চলতে হবে। এভাবেই কেউ ইসলামে বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করে। ইসলামে কর্ম ছাড়া কথার কোন মূল্য নেই। অতএব, যদি কেউ একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে তাদের জীবনের সাথে স্থাপন করে মানসিক শান্তি অর্জন করতে চায়, তাহলে তাকে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিতভাবে সঠিকভাবে আল্লাহ প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে সর্বদা আন্তরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে।

নামাজ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়

ইসলাম গ্রহণের সময়, সাকিফ গোত্র শর্ত আরোপ করার চেষ্টা করেছিল। এই শর্তগুলির মধ্যে একটি ছিল যে তাদের পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন যে, নামাজের অনুপস্থিতিতে ঈমানের কোন কল্যাণ নেই। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, ২৬১৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো ফরজ নামাজ ত্যাগ করা।

আজকের যুগে এটা খুবই সাধারণ হয়ে উঠেছে। অনেকেই তুচ্ছ কারণে তাদের ফরজ নামাজ ছেড়ে দেয়, যার সবগুলোই নিঃসন্দেহে বাতিল। যদি যুদ্ধে লিপ্ত ব্যক্তির উপর থেকে নামাজের ফরজ তুলে না নেওয়া হয়, তাহলে অন্য কারো উপর থেকে কিভাবে তা তুলে নেওয়া যাবে? ৪র্থ অধ্যায় আন নিসা, আয়াত ১০২:

"আর যখন তুমি [অর্থাৎ, সেনাবাহিনীর অধিনায়ক] তাদের মধ্যে থাকো এবং তাদের নামাজে ইমামতি করো, তখন তাদের একটি দল যেন তোমার সাথে [নামাজে] দাঁড়ায় এবং তারা যেন তাদের অস্ত্র বহন করে। আর যখন তারা সিজদা করে, তখন যেন তারা তোমার পিছনে থাকে এবং অন্য দল যারা [এখনও] নামাজ পড়েনি তাদের এগিয়ে নিয়ে আসে এবং তারা যেন তোমার সাথে নামাজ পড়ে, সাবধানতা অবলম্বন করে এবং তাদের অস্ত্র বহন করে..."

মুসাফির বা অসুস্থ উভয়কেই তাদের ফরজ নামাজ আদায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় না। মুসাফিরদের উপর বোঝা কমানোর জন্য কিছু ফরজ নামাজে চক্রের সংখ্যা কমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদেরকে তা আদায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। ৪র্থ সূরা আন-নিসা, আয়াত ১০১:

"আর যখন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো, তখন নামায সংক্ষিপ্ত করার ক্ষেত্রে তোমাদের কোন দোষ নেই.."

অসুস্থদের পানির সংস্পর্শে আসার ফলে যদি তাদের ক্ষতি হয়, তাহলে শুকনো অযু করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সূরা ৫, আল মায়িদা, আয়াত ৬:

"...কিন্তু যদি তোমরা অসুস্থ হও, অথবা সফরে থাকো, অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে, অথবা তোমরা নারীদের সাথে যোগাযোগ করে পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি ব্যবহার করো এবং তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মুছে ফেলো..."

এছাড়াও, অসুস্থ ব্যক্তিরা তাদের জন্য সহজে ফরজ নামাজ আদায় করতে পারেন। অর্থাৎ, যদি তারা দাঁড়াতে না পারে, তাহলে তাদের বসতে দেওয়া হবে এবং যদি তারা বসতে না পারে, তাহলে তারা শুয়ে ফরজ নামাজ আদায় করতে পারবে। জামে আত তিরমিযীর ৩৭২ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিন্তু আবারও, অসুস্থ ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়া হয় না যদি না তারা মানসিকভাবে অসুস্থ থাকে যা তাদের নামাজের ফরজ বুঝতে বাধা দেয়।

আরেকটি প্রধান সমস্যা হলো, কিছু মুসলিম তাদের ফরজ নামাজ বিলম্বিত করে এবং সঠিক সময়ের চেয়ে বেশি আদায় করে। এটি স্পষ্টতই পবিত্র কুরআনের বিরোধিতা করে, কারণ মুমিনদেরকে তারা বলে বর্ণনা করা হয়েছে যারা সময়মতো ফরজ নামাজ আদায় করে। ৪র্থ সূরা আন নিসা, আয়াত ১০৩:

"...নিশ্চয়ই, নামাজ মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফরজ করা হয়েছে।"

অনেকে বিশ্বাস করেন যে পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি তাদের কথা বলে যারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে তাদের ফরজ নামাজ বিলম্বিত করে। এটি তাফসীরে ইবনে কাসির, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৬০৩-৬০৪-এ আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় ১০৭ আল মা'উন, আয়াত ৪-৫:

"অতএব দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নামাজ পড়ে। [কিন্তু] যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে গাফিল।"

এখানে মহান আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে তাদের অভিশাপ দিয়েছেন যারা এই খারাপ স্বভাব গ্রহণ করেছে। যদি তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে, তাহলে কীভাবে তারা এই পৃথিবীতে বা পরকালে সাফল্য পাবে?

সুনানে আন নাসায়ীর ৫১২ নম্বর হাদিসে মহানবী (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, ফরজ নামাজ অকারণে বিলম্বিত করা মুনাফিকির লক্ষণ। পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে যে, মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করবে তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো ফরজ নামাজ কায়াম না করা। ৭৪ সূরা আল-মুদ্দাছ্‌সির, আয়াত ৪২-৪৩:

"[এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে], "কিসে তোমাদের সাকারে প্রবেশ করানো হয়েছিল?" তারা বলবে, "আমরা নামাজ পড়তাম না।"

ফরজ নামাজ ত্যাগ করা এতটাই গুরুতর পাপ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৬২১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, যে কেউ এই পাপ করবে সে ইসলামে কুফরী করল।

তাছাড়া, অন্য কোন নেক আমল একজন মুসলিমের জন্য উপকারী হবে না যতক্ষণ না তাদের ফরজ নামাজ কায়েম হয়। সহীহ বুখারীতে পাওয়া ৫৫৩ নম্বর হাদিসে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি কেউ দুপুরের ফরজ নামাজ ত্যাগ করে, তাহলে তার নেক আমল ধ্বংস হয়। যদি এই অবস্থায় একটি ফরজ নামাজ ত্যাগ করার হয়, তাহলে কি কেউ কল্পনা করতে পারে যে, সবগুলো ত্যাগ করার শাস্তি কী হতে পারে?

সহীহ মুসলিমের ২৫২ নম্বর হাদিসে সঠিক সময়ে ফরজ নামাজ আদায় করাকে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমলের মধ্যে একটি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ থেকে বোঝা যায় যে, ফরজ নামাজ সময়ের চেয়ে বিলম্বিত করা বা সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজগুলির মধ্যে একটি।

সকল বয়স্কদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য যে তারা তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা শিশুদের ছোটবেলা থেকেই ফরজ নামাজ পড়তে উৎসাহিত করে, যাতে তারা আইনত বাধ্যতামূলক হওয়ার আগেই তা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। যেসব প্রাপ্তবয়স্করা এটি বিলম্বিত করে এবং তাদের সন্তানদের বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তারা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে। যেসব শিশুদের উপর ফরজ নামাজ ফরজ হওয়ার পরই ফরজ নামাজ আদায় করতে উৎসাহিত করা হয়, তারা খুব কমই তা দ্রুত আদায় করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে তাদের বছরের পর বছর সময় লাগে। এবং এর জন্য দায় পরিবারের বয়স্কদের, বিশেষ করে পিতামাতার। এই কারণেই সুনানে আবু দাউদের ৪৯৫ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পরামর্শ দিয়েছেন যে, পরিবারগুলি তাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে ফরজ নামাজ পড়তে উৎসাহিত করে।

অনেক মুসলিমের আরেকটি প্রধান সমস্যা হলো, তারা হয়তো ফরজ নামাজ আদায় করে কিন্তু সঠিকভাবে আদায় করতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ, অনেকেই নামাজের ধাপগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করে না এবং তাড়াহুড়ো করে তা সম্পন্ন করে। বাস্তবে, সহীহ বুখারির ৭৫৭ নম্বর হাদিসে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এভাবে নামাজ পড়ে সে মোটেও নামাজ পড়েনি। অর্থাৎ, তাকে নামাজ পড়া ব্যক্তি হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি এবং তাই তার ফরজ আদায় করা হয়নি। জামে আত তিরমিযির ২৬৫ নম্বর হাদিসে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি নামাজের প্রতিটি অবস্থানে স্থির থাকে না তার নামাজ কবুল হয় না।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সালাতে সঠিকভাবে রুকু বা সিজদা না করা ব্যক্তিকে সবচেয়ে খারাপ চোর হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মুওয়াত্তা মালিকের বই নম্বর ৯, হাদিস নম্বর ৭৫-এ প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম যারা দশকের পর দশক ধরে এই ধরণের ফরজ এবং নফল নামাজ আদায় করে আসছেন, তারা দেখতে পাবেন যে তাদের কেউই তাদের ফরজ আদায় করেনি এবং তাই তাদের সাথে এমন আচরণ করা হবে যারা তাদের ফরজ আদায় করেনি। সুনান আন নাসায়ীর ১৩১৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে সাধারণত মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ আদায়ের গুরুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ৪৩:

"...এবং যারা [ইবাদত ও আনুগত্যে] রুকু করে তাদের সাথে রুকু করো।"

প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদিসের কারণে, কিছু নির্ভরযোগ্য আলেম মুসলিম পুরুষদের উপর এটিকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আবু দাউদের ৫৫০ নম্বর হাদিসে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, যারা মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ আদায় করবে না, তাদেরকে সাহাবাগণ (রাঃ) মুনাফিক বলে মনে করতেন। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এমনকি এমন লোকদের ঘর পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন যারা বৈধ ওজর ছাড়া জামাতের সাথে ফরজ নামাজ আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সহিহ মুসলিমের ১৪৮২ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যারা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার অবস্থানে আছেন তাদের তা করা উচিত। তাদের নিজেদেরকে বোকা বানানো উচিত নয় এই দাবি করে যে তারা অন্যান্য সৎকর্ম করছে, যেমন তাদের পরিবারের সাথে ঘরের কাজে সাহায্য করা। যদিও সহীহ বুখারী, ৬৭৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এটি

মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একটি ঐতিহ্য, কিন্তু নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর ঐতিহ্যের গুরুত্ব পুনর্বিন্যাস করা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে কেউ এটি করে সে তার ঐতিহ্য অনুসরণ করছে না, তারা কেবল তাদের নিজস্ব কামনা-বাসনা অনুসরণ করছে, এমনকি যদি তারা কোনও সৎকর্মও করে। প্রকৃতপক্ষে, এই একই হাদিসটি উপদেশ দিয়ে শেষ হয় যে, যখন ফরজ নামাজের সময় হত, তখন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) মসজিদের দিকে রওনা হতেন।

পরিশেষে, মূল হাদিসে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি ফরজ নামাজ ত্যাগ করতে থাকে, সে হয়তো এই পৃথিবী থেকে ঈমান ছাড়াই চলে যেতে পারে। বস্তুত, সে জীবদ্দশায় ঈমান হারাতে পারে, এমনকি অজান্তেই। কখনোই নিজেকে বোকা বানাতে হবে না যে, ফরজ নামাজের মতো কর্মের মাধ্যমে ঈমানের মৌখিক দাবি সমর্থন না করা গ্রহণযোগ্য। মনে রাখতে হবে যে, মুসলিমের সংজ্ঞা হলো সেই ব্যক্তি যিনি কার্যত এবং অভ্যন্তরীণভাবে মহান আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি ইসলাম পালন করে না, তার মুসলিম হওয়ার কোনও মানে নেই, কারণ এই মনোভাব একজন মুসলিমের সংজ্ঞার পরিপন্থী। যদি একজন ব্যক্তি একজন মুসলিমের সংজ্ঞা পূরণ না করে, তাহলে সে কীভাবে নিজেকে একজন হিসেবে বিবেচনা করবে?

পবিত্র কুরআনে ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার কথা প্রায়শই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে কারণ এটি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক প্রমাণ। এছাড়াও, যেহেতু প্রতিদিনের নামাজগুলি বিস্তৃত, তাই এগুলি বিচার দিনের ধ্রুবক স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এর জন্য ব্যবহারিকভাবে প্রস্তুতি নেয়, কারণ ফরজ নামাজের প্রতিটি স্তর বিচার দিনের সাথে সম্পর্কিত। যখন কেউ সঠিক পথে দাঁড়াবে, তখন বিচারের দিন সে এভাবেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। সূরা ৮৩ আল মুতাফিফিন, আয়াত ৪-৬:

"তারা কি ভাবে না যে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে? এক মহাদিনের জন্য, যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে?"

যখন তারা রুকু করে, তখন এটি তাদের সেই অনেক লোকের কথা মনে করিয়ে দেয় যারা পৃথিবীতে তাদের জীবদ্দশায় মহান আল্লাহর কাছে রুকু না করার জন্য বিচারের দিনে সমালোচিত হবে। সূরা ৭৭ আল মুরসালাত, আয়াত ৪৮:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'নামাজে রুকু করো', তখন তারা রুকু করে না।"

এই সমালোচনার মধ্যে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ না করাও অন্তর্ভুক্ত। যখন কেউ নামাজে সিজদা করে, তখন এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিচারের দিনে মানুষকে মহান আল্লাহর কাছে সিজদা করার জন্য কীভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য করার জন্য সঠিকভাবে সিজদা করেনি, তারা বিচারের দিনে এটি করতে সক্ষম হবে না। সূরা ৬৮ আল-কালাম, আয়াত ৪২-৪৩:

"যেদিন পরিস্থিতি কঠিন হবে, সেদিন তাদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের চোখ অবনত হবে, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। আর তাদেরকে সুস্থ অবস্থায় সিজদা করার জন্য ডাকা হত।"

যখন কেউ নামাযে হাঁটু গেড়ে বসে, তখন এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে কিয়ামতের দিন তারা কীভাবে তাদের চূড়ান্ত বিচারের ভয়ে আল্লাহর সামনে এই অবস্থানে বসে থাকবে। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২৮:

"আর তুমি প্রত্যেক জাতিকে [ভয়ে] নতজানু দেখবে। প্রত্যেক জাতিকে তার আমলনামার দিকে ডাকা হবে [এবং বলা হবে], "আজ তোমাদেরকে তোমাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।"

যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে নামাজ পড়বে, সে তার নামাজ সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবে। এর ফলে তারা নামাজের মাঝখানে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে। সূরা ২৯, আল আনকাবুত, আয়াত ৪৫:

"...প্রকৃতপক্ষে, নামাজ অশ্লীলতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা, যা তাঁর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

একটি নিরাপদ বাড়ি এবং সমাজ

ইসলাম গ্রহণের সময়, সাকিফ গোত্র শর্ত আরোপ করার চেষ্টা করেছিল। এই শর্তগুলির মধ্যে একটি ছিল যে তাদের ব্যভিচার করার অনুমতি দেওয়া হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন যে, ব্যভিচার এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তায়ালা নিষিদ্ধ করেছেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৯ এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, নবীর নোবেল জীবন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৯৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বিবাহকে উৎসাহিত করেন এবং অবৈধ সম্পর্ক নিষিদ্ধ করেন। যখন কোন দম্পতি বিবাহিত দম্পতির মতো একে অপরের প্রতি সত্যিকার অর্থে নিবেদিতপ্রাণ না থাকে, তখন তাদের মুখোমুখি হওয়া যেকোনো বাস্তব সমস্যার কারণে দম্পতির জন্য আরও মানসিক চাপ তৈরি হয়, কারণ তারা একে অপরকে সঠিকভাবে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়। জীবনে একাধিক সম্পর্কের আগমন এবং বিচ্ছেদ নিঃসন্দেহে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে যারা তাদের সঙ্গীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায় তারা প্রায়শই কাউন্সেলিংয়ে পড়ে। তারা এই সম্পর্কগুলি এড়িয়ে চলা লোকদের তুলনায় বিষণ্ণতার মতো মানসিক ব্যাধিতে বেশি ভোগেন। এছাড়াও, যারা সমাজে একাধিক সঙ্গী থাকার জন্য পরিচিত, তারা তাদের অধিকার পূরণের জন্য উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এর কারণ হল যার জীবনে একাধিক সঙ্গী আছে সে একটি শিথিল এবং অবাঞ্ছিত চরিত্র গ্রহণ করবে, যা বিবাহের মতো গুরুতর প্রতিশ্রুতি খুঁজছেন এমন লোকেরা অপছন্দ করবে। এটি কেবল একাধিক সঙ্গী থাকা ব্যক্তির জন্য মানসিক চাপ বাড়িয়ে তুলবে। নৈমিত্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, দম্পতি প্রায়শই একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের হয় না। অর্থাত্, দুজনের মধ্যে একজন সবসময় সম্পর্কটিকে আরও গুরুত্ব সহকারে নেয়, যেমন তাদের সঙ্গীর সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চাওয়া। অন্যদিকে, অন্যজন তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একই রকম অনুভব করে না। যখন এই মনোভাবের পার্থক্য অবশেষে সামনে আসে, তখন এটি প্রায়শই সেই ব্যক্তির জন্য দীর্ঘস্থায়ী মানসিক

আঘাতের দিকে পরিচালিত করে যারা সম্পর্কটিকে আরও গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিল। অন্যদিকে, প্রথম ধাপ থেকেই বিবাহিত দম্পতি একে অপরের প্রতি তাদের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে থাকে। বিবাহিত দম্পতি প্রতিটি পরিস্থিতিতে একে অপরের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ থাকে, তারা পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হোক, যেমন সন্তান ধারণ। এই মনোভাব সাধারণ দম্পতিদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। অন্যের সাথে সম্পর্ক থাকা একজন ব্যক্তিকে বোকা বানায় যে তারা তাদের সঙ্গীকে সম্পূর্ণরূপে চেনে এবং তাই যদি তারা বিয়ে করে তবে তারা প্রায়শই বিয়ের পরে তাদের সঙ্গীর পরিবর্তনের অভিযোগ করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা পরিবর্তন করেনি। পরিবর্তিত জিনিসগুলি ছিল তাদের সম্পর্কের দায়িত্ব এবং চাপ। এই সমস্যাটি প্রায়শই সেই দম্পতিদের জন্য বিবাহের সমস্যার দিকে পরিচালিত করে যারা তাদের বিয়ের আগে সম্পর্কে ছিলেন। এমনকি যদি তারা বিয়ের আগে একসাথে থাকেন, তবুও একই সমস্যা দেখা দেবে। উপরন্তু, এটি কোনও গোপন বিষয় নয় যে যখনই কেউ তাদের সঙ্গীর সাথে সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন এটি তাদের জীবনের অন্যান্য প্রতিটি দিককে কতটা তীব্রভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক তরুণ-তরুণী কেবল এই কারণেই পড়াশোনা ছেড়ে দেয় যে তারা তাদের প্রাক্তন সঙ্গীকে প্রতিদিন দেখতে পারে না। যেহেতু বিবাহ দুটি মানুষের মধ্যে একটি গভীর সংযোগ এবং প্রতিশ্রুতি, তাই সাধারণ দম্পতিদের বিচ্ছেদের মতো একই ছোটখাটো বিষয়ে তাদের বিচ্ছেদের সম্ভাবনা কম থাকে।

এছাড়াও, একজন ব্যক্তিকে অবৈধ সম্পর্কের বাহ্যিক রূপ দেখে বোকা বানানো উচিত নয় যে এতে দম্পতি বা বৃহত্তর সমাজের জন্য কোনও ক্ষতি নেই। যেহেতু মানুষের জ্ঞান সীমিত, তারা অত্যন্ত অদূরদর্শী এবং প্রায়শই তাদের আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই তারা ভুলভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থাকা ক্ষতিকারক নয়, অন্যদিকে তারা লুকানো বিষ দেখতে ব্যর্থ হয় যা তাদের এবং অন্যদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে থাকা একজন মুসলিম সময়ের সাথে সাথে কেবল আরও পদক্ষেপ নিতে এবং তাদের সঙ্গীর সাথে পাপ করতে উৎসাহিত হবে। যেহেতু আবেগ এবং অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন এবং যেহেতু এই পাপগুলি, যেমন ব্যভিচার, বেশিরভাগ সমাজে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, তাই একজন অবিবাহিত দম্পতি সহজেই এই পাপে

পতিত হতে পারে। এর ফলে তাদের এবং সমাজের জন্য অসংখ্য অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি হয়, যেমন অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ এবং এমনকি ইসলামের অন্যান্য বড় পাপকে ছোট করা। উপরন্তু, কেউ যদি তাদের অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে অন্য কোনও বড় পাপ, যেমন ব্যভিচার, না করেও, তবে তাদের অনুভূতি তাদের স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে বাধা দেবে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের সঙ্গীকে বিয়ে করতে পারে, বুঝতে না পেরে যে তারা উপযুক্ত জীবনসঙ্গী নয়, এমনকি যদি তারা একজন ভালো সঙ্গী বলে মনে হয়। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এর কারণ হল বিবাহের চাপ এবং দায়িত্ব, যেমন স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানদের অধিকার পূরণ, দম্পতির মধ্যে সম্পর্ক পরিবর্তন করে, যার ফলে প্রায়শই বিবাহের সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই কারণেই বিবাহিত দম্পতিরা যারা বিয়ের আগে একসাথে ছিলেন তারা প্রায়শই একে অপরকে বিয়ের পরে তাদের আচরণ পরিবর্তনের জন্য দোষারোপ করেন। উপরন্তু, কেউ তাদের সঙ্গীর সাথে যতই সময় কাটান না কেন, তারা কখনই তাদের চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন না যেমন একজন বিবাহিত দম্পতি একে অপরকে চেনে। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে লুকানো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি বিয়ের পরে প্রকাশিত হবে, যা কেবল আরও বিবাহ সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে। অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে থাকা ব্যক্তিদের দ্বারা প্রায়শই উপেক্ষা করা একটি সত্য হল যে একজন ব্যক্তি যিনি একজন ভালো সঙ্গী তৈরি করেন তিনি একজন ভালো স্বামী/স্ত্রী বা ভালো পিতা/মাতা হওয়ার নিশ্চয়তা পান না। এর কারণ হল একজন ভালো সঙ্গী তৈরির তুলনায় একজন ভালো স্বামী/স্ত্রী এবং অভিভাবক হওয়ার জন্য বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হয়। তাদের সঙ্গীর প্রতি তাদের অনুভূতির কারণে, একজন ব্যক্তি প্রায়শই একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে বিয়ে করার গুরুত্ব উপেক্ষা করবেন, কারণ তারাই একমাত্র ব্যক্তি যারা তাদের স্ত্রী/স্ত্রী এবং সন্তানদের অধিকার পূরণ করবেন এবং তাদের ক্ষতি এড়াবেন, এমনকি যখন তারা রাগান্বিত হন। অন্যদিকে, যে ব্যক্তির মধ্যে ধার্মিকতা নেই, সে তার স্ত্রী বা সন্তানদের অধিকার পূরণ করবে না এবং তাদের উপর অন্যায় করবে, বিশেষ করে যখন তারা রাগান্বিত থাকে। যার সঙ্গী আছে সে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপেক্ষা করবে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের সঙ্গীর প্রতি তাদের অনুভূতির কারণে তাদের সাথে বিবাহ করবে, যদিও তাদের ধার্মিকতা নেই। ভালোবাসার মতো আবেগ একজন ব্যক্তিকে তার প্রিয়জনের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অন্ধ এবং বধির করে তোলে। সুনান আবু দাউদের ৫১৩০ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এছাড়াও, সম্পর্ক থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে জন্ম নেওয়া যেকোনো শিশু তাদের সম্পর্কের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করবে, যার ফলে প্রায়শই তাদের বিচ্ছেদের দিকে পরিচালিত হবে, কারণ তারা সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব ভাগাভাগি করতে চায় না। এর ফলে শিশুটি এমন একটি ভাঙা ঘর তৈরি করে যেখানে তাদের বাবা-মা উভয়ের সমর্থন এবং তত্ত্বাবধান থাকে না, যা প্রায়শই সকলের জন্যই সমস্যার সৃষ্টি করে। এটা স্পষ্ট যে অপরাধ, গ্যাং এবং যৌন শিকারিদের দ্বারা লালিত-পালিত এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার শিশুদের বেশিরভাগই ভাঙা পরিবার থেকে আসে। যখন কেউ সন্তান কামনা করে তখন সঠিকভাবে সন্তান লালন-পালন করা অত্যন্ত কঠিন, তাহলে কি কেউ কল্পনা করতে পারে যে যখন বাবা-মা প্রথমে সন্তান নিতে চাননি তখন সঠিকভাবে সন্তান লালন-পালনের মানসিক চাপ কতটা? এটি শিশুর লালন-পালনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং প্রায়শই আগে উল্লেখিত সমস্যার সৃষ্টি করে। এই চাপ প্রায়শই একক পিতা-মাতাকে লালন-পালন বা দত্তক নেওয়ার জন্য সন্তানকে ছেড়ে দিতে বাধ্য করে, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিশুর উপর ক্ষতিকর নেতিবাচক এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে, যার মধ্যে কিছু আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি শিশুর বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে তোলে।

অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে এই সমস্ত এবং আরও নেতিবাচক বিষয়গুলি আবেগপ্রবণ বা অজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, এমনকি যদি অবৈধ সম্পর্কগুলি ক্ষতিকারক বলে মনে হয়। অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া ঠিক এমন খাবার খাওয়ার মতো যা সুস্বাদু দেখায় যখন এটি আসলে বিষাক্ত। যেহেতু এই বিষটি লুকানো থাকে, তাই এই বিষ সম্পর্কে সচেতন এমন ব্যক্তির উপর নির্ভর করা উচিত এবং তাদের পরামর্শে বিশ্বাস করা উচিত যাতে সুস্বাদু খাবার খাওয়া এড়ানো যায়, এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। যেহেতু মহান আল্লাহ, একমাত্র, সবকিছু জানেন, বিশেষ করে, কিছু কর্ম এবং সম্পর্কের মধ্যে লুকানো বিষ, তাই তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত এবং তার উপর কাজ করা উচিত, এমনকি যদি এটি ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। এটি একজন জ্ঞানী রোগীর মতো যিনি তার ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন, যদিও তাদের জন্য এটি সর্বোত্তম, যদিও তাদের জন্য তিক্ত

ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত থাকে। একইভাবে এই জ্ঞানী রোগী ভাল মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, একইভাবে যিনি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর কাজ করেন। কারণ একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ, মহান আল্লাহ। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান এই ফলাফল অর্জনের জন্য কখনই যথেষ্ট হবে না, যদিও এত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তার জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং তাদের পরামর্শ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার কারণে সকল ধরণের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালারই এই জ্ঞান রয়েছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসের মাধ্যমে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্যটি তখনই স্পষ্ট হয় যখন কেউ দেখে যে ইসলামী শিক্ষার উপর যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে কাজ করে এবং যারা করে না।

মহান আল্লাহ তাআলা মূল সমস্যার অর্থ সমাধান করে, অবৈধ সম্পর্ক নিষিদ্ধ করে এবং বিবাহকে উৎসাহিত করে এই অসংখ্য শাখা-প্রশাখাগত সমস্যা দূর করেছেন, যার মাধ্যমে একটি দম্পতি আন্তরিকভাবে একে অপরের এবং তাদের সন্তানদের প্রতি নিজেদের নিবেদিত করে।

অনেক চিন্তাবিদ এসেছেন এবং চলে গেছেন যারা মানুষ এবং সমাজের মুখোমুখি সমস্যাগুলি সমাধান করেছেন কিন্তু যেহেতু এই সমাধানগুলি শাখা সমস্যাগুলিকে লক্ষ্য করে, তাই এই সমাধানগুলির সুবিধা ন্যূনতম। অন্যদিকে, মহান আল্লাহ, এই মূল সমস্যাগুলি সমাধানের পদ্ধতির মাধ্যমে, যা একজন ব্যক্তি এবং সমাজকে প্রভাবিত করে, সবকিছু স্পষ্ট করে দিয়েছেন যাতে মানুষ উভয় জগতেই সাফল্য অর্জন করতে পারে। সূরা 16 আন নাহল, আয়াত 89:

"...এবং আমরা আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি সবকিছুর স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশনা ও রহমতস্বরূপ..."

সুদ এড়িয়ে চলা

ইসলাম গ্রহণের সময়, সাকিফ গোত্র শর্ত আরোপ করার চেষ্টা করেছিল। এই শর্তগুলির মধ্যে একটি ছিল যে তাদের সুদ (অর্থাৎ আর্থিক সুদ) অনুশীলন করার অনুমতি দেওয়া হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন যে সুদ অবৈধ। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৯ এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, নবীর নোবেল জীবন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৯৯-১৯০০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আর্থিক সুদ বলতে ঋণগ্রহীতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বোঝায়। পবিত্র কুরআন নাজিলের সময় অনেক ধরণের সুদের লেনদেন প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল বিক্রেতা একটি জিনিস বিক্রি করে মূল্য পরিশোধের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করেছিলেন, শর্ত ছিল যে ক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তারা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবেন কিন্তু পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেবেন। আরেকটি ছিল একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে কিছু টাকা ধার দিয়েছিলেন এবং শর্ত দিয়েছিলেন যে ঋণগ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঋণের পরিমাণের চেয়ে বেশি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফেরত দিতে হবে। সুদের লেনদেনের তৃতীয় রূপ ছিল যে ঋণগ্রহীতা এবং বিক্রেতা সম্মত হন যে ঋণগ্রহীতা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট হারে ঋণ পরিশোধ করবে এবং যদি তারা সীমার মধ্যে তা করতে ব্যর্থ হয় তবে ঋণদাতা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবে কিন্তু একই সাথে সুদের হারও বাড়িয়ে দেবে। এখানে উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞাগুলি এই ধরণের লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

যারা এই বিশ্বাস করেন তারা বৈধ বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা এবং আর্থিক সুদের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হন। এই বিভ্রান্তির ফলে কেউ কেউ যুক্তি দেন যে, যদি ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা অর্থের উপর লাভ বৈধ হয়, তাহলে ঋণ থেকে

অর্জিত মুনাফা কেন অবৈধ বলে গণ্য করা হবে? তারা যুক্তি দেন যে, একজন ব্যক্তি তাদের সম্পদ বিনিয়োগ করার পরিবর্তে, তারা এমন কাউকে ঋণ দেয় যে পালাক্রমে তা থেকে লাভ করে। এই পরিস্থিতিতে ঋণগ্রহীতা কেন ঋণদাতাকে লাভের একটি অংশ প্রদান করবেন না? তারা স্বীকার করতে ব্যর্থ হন যে কোনও ব্যবসায়িক উদ্যোগ ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয়। কোনও উদ্যোগই লাভের সম্পূর্ণ গ্যারান্টি বহন করে না। অতএব, এটি ন্যায়সঙ্গত নয় যে কেবলমাত্র অর্থদাতাকেই সকল পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফার অধিকারী বলে বিবেচনা করা উচিত এবং ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা উচিত। এটি ন্যায়বিচারের অংশ নয় যে যারা তাদের সম্পদ উৎসর্গ করে তাদের কোনও নির্দিষ্ট হারে মুনাফার নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, অন্যদিকে যারা তাদের সম্পদ ঋণ দেয় তারা ক্ষতির সমস্ত ঝুঁকি থেকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফার নিশ্চয়তা পায়।

একটি স্বাভাবিক বৈধ লেনদেনে, একজন ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রয় করা জিনিস থেকে লাভবান হন। বিক্রেতা জিনিসটি তৈরিতে ব্যয় করা প্রচেষ্টা এবং সময়ের জন্য ক্ষতিপূরণ পান। অন্যদিকে, সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনে, সুবিধার বিনিময় ন্যায্যভাবে হয় না। সুদ গ্রহণকারী পক্ষ তাদের প্রদত্ত ঋণের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে এবং এইভাবে তাদের লাভ সুরক্ষিত হয়। অন্য পক্ষ ঋণ নেওয়া তহবিল ব্যবহার করতে পারে তবে এটি সর্বদা লাভ নাও দিতে পারে। যদি এই ধরনের ব্যক্তি ঋণ নেওয়া তহবিল কোনও প্রয়োজনে ব্যয় করে তবে কোনও লাভ হবে না। তহবিল বিনিয়োগ করা হলেও, একজনের লাভ বা ক্ষতি উভয়ই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতএব, সুদ-সম্পর্কিত লেনদেন একদিকে ক্ষতি এবং অন্যদিকে লাভ বা একদিকে নিশ্চিত এবং স্থির মুনাফা এবং অন্যদিকে অনিশ্চিত লাভের কারণ হয়। অতএব, বৈধ বাণিজ্য আর্থিক সুদের সমান নয়।

এছাড়াও, সুদের বোঝা ঋণগ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধ করা অত্যন্ত কঠিন করে তোলে। এমনকি মূল ঋণ এবং সুদ পরিশোধের জন্য তাদের অন্য উৎস থেকে ঋণ নিতে হতে পারে। সুদের পদ্ধতির কারণে ঋণ পরিশোধের পরেও তাদের

বকেয়া অর্থ প্রায়শই থেকে যায়। এই আর্থিক চাপ মানুষকে নিজের এবং তাদের পরিবারের জন্য জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেতে বাধা দিতে পারে। এই চাপ অনেক শারীরিক এবং মানসিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

পরিশেষে, এই ধরণের ব্যবস্থায় কেবল ধনীরাই ধনী হয় এবং দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়।

যদিও আর্থিক স্বার্থের সাথে লেনদেন করা বাহ্যিকভাবে একজন ব্যক্তিকে সম্পদ অর্জনের মতো মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এটি তাদের সামগ্রিক ক্ষতির কারণ হয়। এই ক্ষতি বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এটি তাদের ভালো এবং বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন হারাতে পারে যা তারা আর্থিক স্বার্থের সাথে লেনদেন থেকে বিরত থাকলে অর্জন করতে পারত। মহান আল্লাহ তাদের সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করতে বাধ্য করতে পারেন যা তাদের সন্তুষ্ট করে না। উদাহরণস্বরূপ, তারা শারীরিক অসুস্থতার সম্মুখীন হতে পারে যার ফলে তারা তাদের মূল্যবান অবৈধ সম্পদ ব্যয় করে এবং তাদের পছন্দসই উপায়ে তা ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। সামগ্রিক ক্ষতির একটি আধ্যাত্মিক দিকও রয়েছে। তারা যত বেশি আর্থিক স্বার্থের সাথে লেনদেন করে তত বেশি তাদের লোভ অর্থবহ হয়ে ওঠে, পার্থিব জিনিসের প্রতি তাদের লোভ কখনই সন্তুষ্ট হয় না যা সংজ্ঞা অনুসারে তাদের প্রচুর সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাদের দরিদ্র করে তোলে। এই লোকেরা দিনভর এক পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য সমস্যায় পতিত হবে এবং সন্তুষ্টি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে কারণ তারা বৈধ ব্যবসা এবং সম্পদের সাথে যে অনুগ্রহ রয়েছে তা হারিয়ে ফেলবে। এটি তাদের আর্থিক স্বার্থ এবং অন্যান্য উপায়ে আরও অবৈধ সম্পদ অর্জনের দিকে ঠেলে দিতে পারে। পরকালে ক্ষতি আরও স্পষ্ট। কিয়ামতের দিন তারা খালি হাতে থাকবে কারণ হারাম কাজের সাথে জড়িত কোন সৎকর্ম, যেমন হারাম সম্পদ দিয়ে দান, মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কিয়ামতের দিন এই ব্যক্তির শেষ পরিণতি কোথায় হবে তা নির্ধারণ করার জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না।

বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন এবং সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটি সমাজে একটি উপকারী ভূমিকা পালন করে যেখানে দ্বিতীয়টি সমাজকে অধঃপতনের দিকে পরিচালিত করে। স্বভাবতই সুদ লোভ, স্বার্থপরতা, উদাসীনতা এবং অন্যদের প্রতি নিষ্ঠুরতা জন্মায়। এটি সম্পদের উপাসনার দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদের সাথে করুণা এবং ঐক্য নষ্ট করে। এভাবে এটি অর্থনৈতিক এবং নৈতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই সমাজকে ধ্বংস করতে পারে।

অন্যদিকে, দানশীলতা হলো উদারতা এবং করুণার ফল। পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সদিচ্ছার কারণে সমাজ ইতিবাচকভাবে বিকশিত হবে যা সকলের জন্য উপকারী হবে। এটা স্পষ্ট যে যদি এমন একটি সমাজ থাকে যেখানে ব্যক্তিরা একে অপরের সাথে স্বার্থপর আচরণ করে, যেখানে ধনীদের স্বার্থ সরাসরি সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিপরীত হয়, তাহলে সেই সমাজ স্থিতিশীল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই ধরনের সমাজে, প্রেম এবং করুণার পরিবর্তে, পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং তিক্ততা বৃদ্ধি পাবে।

পরিশেষে, যখন মানুষ তাদের নিজস্ব চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করে এবং তারপর তাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ দাতব্য উপায়ে ব্যয় করে অথবা পারস্পরিক বৈধ ব্যবসায়িক উদ্যোগে অংশ নেয়, তখন সেই সমাজের ব্যবসা, শিল্প এবং কৃষির উন্নতি হবে। সমাজের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদন সেই সমাজের তুলনায় অনেক বেশি হবে যেখানে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ আর্থিক স্বার্থ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

মন্দের মা

ইসলাম গ্রহণের সময়, সাকিফ গোত্র শর্ত আরোপ করার চেষ্টা করেছিল। এই শর্তগুলির মধ্যে একটি ছিল যে তাদের মদ পান করার অনুমতি দেওয়া হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন যে, মদ আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৯ এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, নবীর নোবেল জীবন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯০০-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ নং ৩৩৭১-এ প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, একজন মুসলিমের কখনই মদ পান করা উচিত নয়, কারণ এটি সকল মন্দের মূল চাবিকাঠি।

দুর্ভাগ্যবশত, সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের মধ্যে এই মহাপাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটিই সকল মন্দের মূল কারণ কারণ এটি অন্যান্য পাপের জন্ম দেয়। এটি বেশ স্পষ্ট যে একজন মাতাল ব্যক্তি তার জিহ্বা এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। মদ্যপানের কারণে কত অপরাধ সংঘটিত হয় তা দেখার জন্য কেবল সংবাদগুলি দেখে নেওয়া উচিত। যারা পরিমিত পরিমাণে মদ্যপান করে তারাও তাদের শরীরের ক্ষতি করে, যা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে। মদের সাথে সম্পর্কিত শারীরিক ও মানসিক রোগগুলি অসংখ্য এবং জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং করদাতাদের উপর ভারী বোঝা তৈরি করে। এটি সমস্ত মন্দের মূল চাবিকাঠি কারণ এটি একজন ব্যক্তির তিনটি দিককেই নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে: তাদের শরীর, মন এবং আত্মা। এটি মানুষের মধ্যে সম্পর্ক ধ্বংস করে, কারণ মদ্যপান একজনের আচরণকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, মদ্যপান এবং পারিবারিক সহিংসতার মধ্যে একটি স্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদা, আয়াত 90:

"হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, [আল্লাহ ব্যতীত] পাথরের বেদিতে বলিদান এবং ভাগ্য নির্ধারণকারী তীর শয়তানের কাজ থেকে অপবিত্রতা মাত্র, তাই তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাকো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

এই আয়াতে শিরকের সাথে সম্পর্কিত জিনিসগুলির পাশে মদ্যপানকে রাখা হয়েছে, এই বিষয়টি স্পষ্ট করে যে এটি এড়ানো কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

এটি এতটাই গুরুতর পাপ যে, সুনানে ইবনে মাজাহের ৩৩৭৬ নম্বর হাদিসে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি নিয়মিত মদ্যপান করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

সুনান ইবনে মাজাহ, ৬৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, শান্তির ইসলামিক অভিবাদন প্রচার করা জান্নাত লাভের একটি চাবিকাঠি। তবুও, ইমাম বুখারীর, আদাব আল মুফরাদ, ১০১৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মুসলিমদের নিয়মিত মদ্যপানকারী কাউকে অভিবাদন না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৩৮০ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মদকে দশটি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মদ নিজেই, যিনি এটি তৈরি করেন, যার জন্য এটি তৈরি করা হয়, যিনি এটি বিক্রি করেন, যিনি এটি কিনেন, যিনি এটি বহন করেন, যার কাছে এটি বহন করা হয়, যিনি এটি বিক্রি করে অর্জিত সম্পদ ব্যবহার করেন, যিনি এটি পান করেন এবং যিনি এটি ঢেলে

দেন। যে ব্যক্তি এই ধরণের অভিশপ্ত জিনিসের সাথে লেনদেন করে, সে যদি আন্তরিকভাবে তওবা না করে তবে প্রকৃত সাফল্য পাবে না।

যদিও মদ্যপানের নেশা ত্যাগ করা কঠিন, তবুও, খারাপ বন্ধুদের মতো সমস্ত জিনিস এড়িয়ে চলার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করা উচিত। তাদের অবশ্যই তাদের জন্য উপলব্ধ সমস্ত সাহায্য ব্যবহার করতে হবে, যেমন পরামর্শ অধিবেশন। তাদের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তিকে এমন দায়িত্ব দেন না যা সে পূরণ করতে পারে না। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮৬:

"আল্লাহ কোন আত্মার উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন বোঝা চাপান না..."

এই জিনিসগুলি তাদের এই মহাপাপ থেকে চিরতরে দূরে সরে যেতে সাহায্য করবে।

আপস ছাড়াই নমনীয়তা

ইসলাম গ্রহণের সময়, সাকিফ গোত্র শর্ত আরোপ করার চেষ্টা করেছিল। এর মধ্যে দুটি শর্ত ছিল যে তাদের গোত্রকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে না এবং কেবল তাদের গোত্রের একজন ব্যক্তিকে তাদের দায়িত্বে নিযুক্ত করা যেতে পারে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এই দুটি শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। তবে পরে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, তারা যখন প্রকৃত মুসলিম হয়ে উঠবে তখন তারা নিঃসন্দেহে তাদের নিজস্ব ইচ্ছায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই দুটি শর্ত মেনে নেওয়া হয়েছিল কারণ এগুলো তেমন তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষার প্রতি চ্যালেঞ্জও ছিল না। উপরন্তু, তাদের কিছু শর্ত মেনে নেওয়া ছিল ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করার সর্বোত্তম উপায়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি সকল ক্ষেত্রে একগুঁয়েমি না অবলম্বন করার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

কেউ কেউ পার্থিব বিষয়ে একগুঁয়েমি অবলম্বন করে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের চরিত্রের উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে না। বরং, তারা তাদের মনোভাবের উপর অবিচল থাকে এই বিশ্বাস করে যে এটি তাদের মহান শক্তি এবং প্রজ্ঞার লক্ষণ। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অবিচলতা একটি প্রশংসনীয় মনোভাব কিন্তু বেশিরভাগ পার্থিব বিষয়ে এটিকে কেবল একগুঁয়েমি বলা হয়, যা নিন্দনীয়।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে যদি তারা তাদের মনোভাব পরিবর্তন করে তবে এটি দুর্বলতা প্রদর্শন করে অথবা এটি দেখায় যে তারা তাদের দোষ

স্বীকার করছে এবং এই কারণে তারা একগুঁয়েভাবে উন্নতির জন্য পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়। প্রাপ্তবয়স্করা অপরিণত শিশুদের মতো আচরণ করে, তারা বিশ্বাস করে যে যদি তারা তাদের আচরণ পরিবর্তন করে তবে এর অর্থ হল তারা হেরে গেছে, অন্যদিকে যারা তাদের মনোভাবের উপর অটল থাকে তারা জিতেছে। এটি কেবল শিশুসুলভ।

বাস্তবে, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয়ে অবিচল থাকবেন কিন্তু পার্থিব বিষয়ে তারা তাদের জীবনকে সহজ করার জন্য যতক্ষণ না পাপ না হয় ততক্ষণ তাদের মনোভাব পরিবর্তন করবেন। তাই নিজের জীবনকে উন্নত করার জন্য পরিবর্তন করা দুর্বলতার লক্ষণ নয়, বরং এটি বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।

অনেক ক্ষেত্রেই, একজন ব্যক্তি তার মনোভাব পরিবর্তন করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তার জীবনের অন্যদের কাছ থেকে, যেমন তার আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে, তাদের পরিবর্তন আশা করে। কিন্তু প্রায়শই যা ঘটে তা হল একগুঁয়েমির কারণে সবাই একই অবস্থায় থাকে যা কেবল নিয়মিত মতবিরোধ এবং তর্কের দিকে পরিচালিত করে। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বোঝেন যে যদি তার চারপাশের লোকেরা তাদের উন্নতির জন্য পরিবর্তন না করে যা তাদের উচিত ছিল। এই পরিবর্তন তাদের জীবনের মান এবং অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্কের উন্নতি করবে যা মানুষের সাথে বৃত্তাকার তর্ক করার চেয়ে অনেক ভালো। এই ইতিবাচক মনোভাব অবশেষে অন্যদের তাদের সম্মান করতে বাধ্য করবে কারণ একজনের চরিত্রকে আরও ভালো করার জন্য প্রকৃত শক্তির প্রয়োজন হয়।

যারা একগুঁয়ে থাকে তারা সবসময় এমন কিছু খুঁজে পাবে যা তাদের জীবন থেকে শান্তি কেড়ে নেবে। এর ফলে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে, যেমন তাদের মানসিক স্বাস্থ্যে আরও সমস্যা দেখা দেবে। কিন্তু যারা মানিয়ে নেয় এবং উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে, তারা সর্বদা শান্তির এক স্তর থেকে অন্য স্তরে চলে যাবে।

যদি কেউ এই শান্তি অর্জন করে, তাহলে কি অন্যরা বিশ্বাস করে যে তারা কেবল ভুল ছিল বলেই তারা বদলেছে, তাতে কি সত্যিই কিছু আসে যায়?

পরিশেষে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীসের উপর অবিচল থাকা প্রশংসনীয়। কিন্তু পার্থিব বিষয়গুলিতে এবং যেখানে কোনও পাপ করা হয়নি, সেখানে একজন ব্যক্তির উচিত তাদের মনোভাব পরিবর্তন করা এবং মানিয়ে নেওয়া শেখা যাতে তারা এই পৃথিবীতে কিছুটা শান্তি খুঁজে পায়।

সত্যিকারের ভালো

সাকিফ গোত্র ইসলাম গ্রহণের পর, মহানবী (সা.) তাদের গোত্রের একজনকে, উসমান বিন আবুল আস (রা.)-কে, তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তিদের একজন হলেও এটি করেছিলেন, কারণ তিনি পবিত্র কুরআন বোঝার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। অবশেষে তিনি পবিত্র কুরআনে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন এবং মহানবী (সা.)-এর কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সা.)-এর জীবনী", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, ২৬৪৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তাআলা কাউকে কল্যাণ দান করতে চান, তখন তিনি তাদেরকে ইসলামী জ্ঞান দান করেন।

নিঃসন্দেহে, প্রতিটি মুসলিম তাদের ঈমানের শক্তি নির্বিশেষে উভয় জাহানের কল্যাণ কামনা করে। যদিও অনেক মুসলিম ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তারা যে কল্যাণ কামনা করে তা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব, সাহচর্য এবং তাদের কর্মজীবনের মধ্যে নিহিত, এই হাদিসটি স্পষ্ট করে দেয় যে প্রকৃত স্থায়ী কল্যাণ নিহিত রয়েছে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মধ্যে। এটি লক্ষণীয় যে, ধর্মীয় জ্ঞানের একটি শাখা হল কার্যকর পার্থিব জ্ঞান যার মাধ্যমে মানুষ তাদের এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য বৈধ রিযিক অর্জন করে। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ভালো কোথায় তা নির্দেশ করেছেন, তবুও এটি দুঃখের বিষয় যে অনেক মুসলিম এটিকে খুব বেশি মূল্য দেয় না। তারা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তাদের বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালনের জন্য কেবলমাত্র ন্যূনতম ইসলামী জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে এবং আরও বেশি অর্জন এবং তার উপর আমল করতে ব্যর্থ হয়, যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য। পরিবর্তে তারা তাদের

প্রচেষ্টাকে পার্থিব জিনিসের জন্য উৎসর্গ করে, বিশ্বাস করে যে প্রকৃত কল্যাণ সেখানেই পাওয়া যায়। অনেক মুসলিমই বুঝতে পারে না যে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একটি আয়াত বা হাদিস শেখার জন্য পূর্বসূরীদের সপ্তাহের পর সপ্তাহ ভ্রমণ করতে হতো, অথচ আজকাল কেউ ঘর থেকে বের না হয়েই ইসলামিক শিক্ষা অর্জন করতে পারে। তবুও, অনেকেই আধুনিক মুসলিমদের উপর প্রদত্ত এই আশীর্বাদ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম করুণার বশবর্তী হয়ে তাঁর নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে কেবল প্রকৃত ভালো কথাই তুলে ধরেননি, বরং তিনি এই ভালো কথাটিও মানুষের আঙুলের ডগায় স্থাপন করেছেন।

একজন মুসলিমকে এই বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে ইসলামী জ্ঞান কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান কীভাবে পালন করতে হয় এবং কোনটি অবৈধ ও হালাল তা ব্যাখ্যা করে। বাস্তবে, এটি মানুষকে সঠিক মনোভাব এবং আচরণ কীভাবে গ্রহণ করতে হয় তা শেখায় যাতে তারা তাদের প্রদত্ত সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে যাতে তারা উভয় জগতে নিজেদের এবং অন্যদের উপকার করতে পারে এবং উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে। মানবজাতিকে এই শিক্ষা একমাত্র তিনিই দিতে পারেন যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং জানেন, অর্থাৎ, মহান আল্লাহ। অতএব, ধর্মীয় জ্ঞানের চেয়ে পার্থিব জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

মহান আল্লাহ মানবজাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, একটি চিরস্থায়ী সমাহিত ধন কোথায় অবস্থিত, যা উভয় জগতে তাদের সম্মুখীন হতে পারে এমন সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা কেবল তখনই এই কল্যাণ লাভ করবে যখন তারা এটি অর্জন এবং তার উপর আমল করার জন্য সংগ্রাম করবে। এর ফলে উভয় জগতেই শান্তি এবং সাফল্য আসবে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

একজন ভালো নেতা

সাকিফ গোত্র ইসলাম গ্রহণের পর, মহানবী (সাঃ) তাদের গোত্রের একজনকে, উসমান বিন আবুল আস (রাঃ) কে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। মদীনা থেকে রওনা হওয়ার সময়, মহানবী (সাঃ) উসমান (রাঃ) কে বলেন, সালাতে সংক্ষিপ্ত হতে এবং দুর্বলতম সদস্যের ভিত্তিতে লোকদের মূল্যায়ন করতে, কারণ এতে বৃদ্ধ, তরুণ, দুর্বল এবং অভাবী সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ) এর জীবনী", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ২৪০৯ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি ব্যক্তি একজন অভিভাবক এবং তাই তার তত্ত্বাবধানে থাকা জিনিসপত্রের জন্য দায়ী।

একজন মুসলিমের সবচেয়ে বড় রক্ষাকর্তা হলো তার ঈমান। অতএব, তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে এর দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

এই অভিভাবকত্বের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ, যার মধ্যে রয়েছে বাহ্যিক জিনিস, যেমন সম্পদ, এবং অভ্যন্তরীণ জিনিস, যেমন দেহ। একজন মুসলিমকে ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতিতে এই জিনিসগুলি ব্যবহার করে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিমের উচিত কেবল হালাল জিনিস দেখার জন্য চোখ ব্যবহার করা, কেবল হালাল ও

কল্যাণকর কথা বলা এবং তাদের সম্পদ কল্যাণকর ও পুণ্যময় উপায়ে ব্যবহার করা।

এই অভিভাবকত্ব তার জীবনের অন্যান্যদের, যেমন আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একজন মুসলিমকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার পূরণ করে, যেমন তাদের ভরণপোষণ করা এবং সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশেষ করে পার্থিব বিষয়গুলিতে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের তাদের সাথে সদয় আচরণ করা উচিত এই আশায় যে তারা আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হবে। এই অভিভাবকত্বের মধ্যে একজনের সন্তানরাও অন্তর্ভুক্ত। একজন মুসলিমকে উদাহরণ দিয়ে তাদের নেতৃত্ব দিতে হবে, কারণ এটি শিশুদের পরিচালনার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তাদের অবশ্যই পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, কার্যত যেমন মহান আল্লাহকে মেনে চলতে হবে এবং তাদের সন্তানদেরও একই কাজ করতে শেখাতে হবে। এর মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা।

পরিশেষে, এই হাদিস অনুসারে, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু দায়িত্ব রয়েছে যা তাদের উপর অর্পিত হয়েছে। তাই তাদের উচিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান অর্জন করা এবং তা পালনের জন্য কাজ করা, কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ, এবং তাই বিচারের দিনে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৩৪:

"...এবং [প্রত্যেক] অঙ্গীকার পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সর্বদা [যার বিষয়ে] জিজ্ঞাসা করা হবে।"

জিনিসগুলি সহজ করুন

সাকিফ গোত্র যখন মদিনা থেকে রওনা হচ্ছিল, তখন মহানবী (সা.) তাদের নেতা উসমান বিন আবুল আস (রা.)-কে বললেন, মানুষের জন্য সহজ করার জন্য জামাতে নামাজের সময় পবিত্র কুরআনের ছোট ছোট সূরাগুলো তেলাওয়াত করো। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সা.)-এর জীবনী", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪০-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী শরীফের ৬১২৫ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অন্যদের জন্য কঠিন করার পরিবর্তে সহজ করে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন এবং অন্যদের ভয় না দেখিয়ে সুসংবাদ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

একজন মুসলিমের উচিত সর্বদা নিজেদের জন্য সবকিছু সহজ করে তোলা, প্রথমে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে, যাতে তারা তাদের বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালন করতে পারে, মহানবী (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য অনুসরণ করতে পারে এবং তাদের এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করতে পারে। এটি তাদের বৈধ জিনিসপত্র উপভোগ করার জন্য প্রচুর সময় দেবে, অপচয় বা অপচয় না করে। একজন মুসলিমের উচিত স্বেচ্ছাসেবী সৎকর্মের ক্ষেত্রে তাদের শক্তি অনুসারে কাজ করা এবং নিজেদের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো নয়, কারণ এটি ইসলামে অপছন্দনীয়। সহিহ বুখারী, ৬৪৬৫ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি সর্বদা সর্বোত্তম।

এছাড়াও, মুসলমানদের উচিত অন্যদের জন্য, বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়ে সহজ করে তোলা, যাতে মানুষ ইসলামের প্রতি বিতৃষ্ণা না পোষণ করে, বিশ্বাস করে যে এটি একটি বোঝাপড়াপূর্ণ ধর্ম, অথচ এটি একটি সহজ এবং সহজ ধর্ম। ইমাম বুখারীর "আদাব আল মুফরাদ", ২৮৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্যদের, বিশেষ করে শিশুদের শেখানো গুরুত্বপূর্ণ। যদি শিশুরা ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে ইসলাম একটি কঠিন ধর্ম, তারা বড় হওয়ার সাথে সাথে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। শিশুদের শেখানো উচিত যে ইসলামের কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে যা পালন করতে খুব বেশি সময় লাগে না এবং তাদের জন্য ভালো এবং স্বাস্থ্যকর উপায়ে আনন্দ করার জন্য প্রচুর সময় থাকে।

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ধর্মীয় বিষয়ে নিজের জন্য বা অন্যদের জন্য জিনিসপত্র সহজ করে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজন মুসলিম অলস থাকবে এবং অন্যদেরও অলস হতে শেখাবে, কারণ ন্যূনতম বাধ্যবাধকতাগুলি সর্বদা পালন করতে হবে, যদি না ইসলাম তাকে অব্যাহতি দেয়। যে ব্যক্তি অলসভাবে কাজ করে সে মহান আল্লাহকে মান্য করছে না, কেবল তার নিজস্ব ইচ্ছাকে মান্য করছে।

অন্যদের জন্য কাজ সহজ করার আরেকটি দিক হল একজন মুসলিম অন্যদের কাছ থেকে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি না করা। পরিবর্তে, তাদের প্রদত্ত উপায়গুলি, যেমন তাদের শারীরিক বা আর্থিক শক্তি, নিজেদের সাহায্য করার জন্য এবং অন্যদের জন্য কাজ সহজ করার জন্য ব্যবহার করা উচিত। কিছু ক্ষেত্রে, অন্যদের অধিকার পূরণে ব্যর্থতা শাস্তির কারণ হতে পারে। অন্যদের জন্য কাজ সহজ করার জন্য একজন মুসলিমের কেবল কিছু ক্ষেত্রেই তাদের অধিকার দাবি করা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলিমের অন্যদের অধিকার পূরণের চেষ্টা করা উচিত নয় বরং এর অর্থ হল তাদের উচিত যাদের উপর তাদের অধিকার আছে তাদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করার চেষ্টা করা। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতা তাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে একটি নির্দিষ্ট ঘরের কাজ থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন এবং যদি তাদের কাছে কোনও ঝামেলা

ছাড়াই তা করার সামর্থ্য থাকে, বিশেষ করে যদি তাদের সন্তান কাজ থেকে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। এই নম্রতা এবং করুণা কেবল মহান আল্লাহকে তাদের প্রতি আরও করুণা করবে না বরং এটি তাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাও বৃদ্ধি করবে। যে সর্বদা তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে সে পাপী নয় তবে তারা যদি এইভাবে আচরণ করে তবে তারা এই পুরস্কার এবং ফলাফল হারাবে।

মুসলমানদের উচিত অন্যদের জন্য সহজ করে দেওয়া এবং আশা করা উচিত যে মহান আল্লাহ তাদের জন্য এই দুনিয়া ও আখেরাতে সহজ করে দেবেন। কিন্তু যারা অন্যদের জন্য কঠিন করে তোলে তারা হয়তো দেখতে পাবে যে মহান আল্লাহ উভয় জগতেই তাদের জন্য কঠিন করে তোলেন।

একজন মুসলিমের উচিত নিজেকে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর অগণিত নেয়ামত এবং তিনি এই পৃথিবীতে এবং পরকালে মুসলিমদের উপর যে মহান প্রতিদান দান করেন, তার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া, যারা তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহান নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, এই পদ্ধতি মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে আরও কার্যকর। শুধুমাত্র কিছু ক্ষেত্রে যখন কেউ ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা করে এবং আল্লাহকে অমান্য করে, আশা করে যে তারা সফল হবে, তখন একজন মুসলিম তাদের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে, তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় জাগিয়ে তোলে।

ভারসাম্যই সর্বোত্তম, যেখানে কেউ আল্লাহর উপর আশা রেখে তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর প্রতি ভয়কে উৎসাহিত করে পাপ থেকে বিরত থাকে। আর যখনই কেউ ভারসাম্যহীন বোধ করে অথবা অন্যদের ভারসাম্যহীন হতে দেখে, তখন একজন

মুসলিমের উচিত নিজেকে এবং অন্যদের সঠিক মধ্যম পথে ফিরিয়ে আনার জন্য যথাযথভাবে কাজ করা।

করুণার আশায়

নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, অমুসলিম সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধিত্বকারী একটি প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণের জন্য নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে দেখা করতে আসে। উহুদের যুদ্ধে হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) কে হত্যাকারী ওয়াহশী, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাতে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য এই প্রতিনিধি দলের সাথে যোগ দেয়। যখন সে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে পৌঁছায়, তখন সে তাকে জিজ্ঞাসা করে যে, আল্লাহ কি তার তওবা কবুল করবেন, যদিও সে আল্লাহর সাথে শির্ক করেছে, অবৈধভাবে মানুষ হত্যা করেছে এবং ব্যভিচার করেছে। এর জবাবে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা আল ফুরকান, আয়াত 68-70 নাযিল করেন:

"আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে না এবং আল্লাহ যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন, তাকে হত্যা করে না, ন্যায়সঙ্গতভাবে ছাড়া এবং অবৈধ যৌন মিলন করে না। আর যে কেউ তা করবে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। কিয়ামতের দিন তার জন্য শাস্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং সে সেখানে অপমানিত অবস্থায় থাকবে। তবে যারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। আল্লাহ তাদের মন্দ কাজকে ভালো দিয়ে প্রতিস্থাপন করবেন। আর আল্লাহ সর্বদা ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

ওয়াহশী লক্ষ্য করেছিলেন যে, যদি সে সৎকর্ম অব্যাহত রাখে তবেই কেবল তওবা কবুল করা হবে। এর জবাবে, মহান আল্লাহ সূরা আন নিসার ৪৮ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না, তবে এর চেয়ে কম যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। এবং যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে অবশ্যই একটি মহাপাপ রচনা করেছে।"

ওয়াহশী মন্তব্য করেছেন যে এটি ক্ষমার শর্তকে আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, এবং যদি তাকে এ থেকে বাদ দেওয়া হয় তবে কী হবে। এর জবাবে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা আয-যুমার, আয়াত ৫৩ নাযিল করেন:

"বলুন, "হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনিই ক্ষমাশীল, করুণাময়।"

এই আয়াতটি শোনার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ২৫:৬৮-৭০, পৃষ্ঠা ১২২-১২৩ এবং সহীহ বুখারী, ৪০৭২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও মহান আল্লাহ এই পৃথিবীর সকল পাপ ক্ষমা করে দেন, তবুও ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলা উচিত কারণ ইসলামে এর কোন মূল্য নেই।

জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি প্রকৃত আশা এবং ইচ্ছাপূরণের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত আশা হলো যখন কেউ আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করে। অন্যদিকে, মূর্খ ইচ্ছাপূরণকারী ব্যক্তি তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করে এবং তারপর আশা করে যে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন।

মুসলমানদের জন্য এই দুটি মনোভাবকে গুলিয়ে ফেলা গুরুত্বপূর্ণ নয় যাতে তারা ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনাকারী হিসেবে বেঁচে থাকা এবং মরতে না পারে, কারণ এই ব্যক্তির এই পৃথিবীতে বা পরকালে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা হল একজন কৃষকের মতো যে জমি রোপণের জন্য প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়, বীজ রোপণ করতে ব্যর্থ হয়, জমিতে জল দিতে ব্যর্থ হয় এবং তারপর বিশাল ফসল কাটার আশা করে। এটি স্পষ্ট বোকামি এবং এই কৃষকের সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। অন্যদিকে, প্রকৃত আশা হল একজন কৃষকের মতো যে জমি প্রস্তুত করে, বীজ রোপণ করে, জমিতে জল দেয় এবং তারপর আশা করে যে মহান আল্লাহ তাদের প্রচুর ফসল দেবেন। মূল পার্থক্য হল যে যার প্রকৃত আশা থাকে সে মহানবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য অনুসারে তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে সক্রিয়ভাবে আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করে, তার উপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। এবং যখনই তারা ভুল করে তখন তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অন্যদিকে, ইচ্ছাকৃত চিন্তাকারী ব্যক্তি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা করবে না, বরং তাদের আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করবে এবং তবুও আশা করবে যে আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা করবেন এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন।

তাই মুসলমানদের অবশ্যই মূল পার্থক্যটি শিখতে হবে যাতে তারা ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা ত্যাগ করতে পারে এবং পরিবর্তে মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের আশা গ্রহণ করতে পারে, যা সর্বদা উভয় জগতে কল্যাণ এবং সাফল্য ছাড়া আর কিছুই নিয়ে যায় না। সহিহ বুখারীতে প্রাপ্ত ৭৪০৫ নম্বর হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে।

পূর্ববর্তী জাতিসমূহ এমনকি মুসলিম জাতিকেও এক ধরণের ইচ্ছাপূরণমূলক চিন্তাভাবনা প্রভাবিত করেছিল, যা তখনই ঘটে যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ উপেক্ষা করতে পারবে এবং কেয়ামতের দিন কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুপারিশ একটি সত্য এবং অনেক হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪৩০৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস, তবুও তার সুপারিশের মাধ্যমে কিছু মুসলিম, যাদের শাস্তি হ্রাস পাবে, তারা এখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। জাহান্নামে এক মুহূর্তও সত্যিই অসহনীয়। তাই ইচ্ছাপূরণমূলক চিন্তাভাবনা ত্যাগ করা উচিত এবং আল্লাহর আনুগত্যে কার্যত প্রচেষ্টা চালিয়ে সত্যিকারের আশা গ্রহণ করা উচিত।

যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, শয়তান তাদেরকে বিশ্বাস করায় যে, যদি তা ঘটেও, তবুও তারা সেদিন মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে এই দাবি করে যে, তারা হত্যার মতো বড় অপরাধ এড়িয়ে যাওয়ার কারণে এত খারাপ ছিল না। তারা নিজেদেরকে নিশ্চিত করেছে যে তাদের আবেদন গ্রহণ করা হবে এবং তাদেরকে জান্নাতে পাঠানো হবে, যদিও তারা পৃথিবীতে তাদের জীবদ্দশায় মহান আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছিল। এটি অবিশ্বাস্যরকম বোকামি কারণ মহান আল্লাহ, যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করে, তার সাথে সেই ব্যক্তির মতো আচরণ করবেন না যারা তাঁকে অবিশ্বাস করেছিল। একটি মাত্র আয়াত এই ধরণের ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা মুছে দিয়েছে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৮৫:

"আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম কামনা করে, তার কাছ থেকে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

পরিশেষে, একজন মুসলিমের এই বিশ্বাস করে ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করা উচিত নয় যে তারা একজন মুসলিম, তারা একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে, এমনকি তাদের পাপের ফলে প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হলেও। কেউই তাদের ঈমান নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে বলে নিশ্চিত নয়। যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ত্যাগ করে, তার ঈমান ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার বড় ঝুঁকি থাকে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে ঈমান একটি গাছের মতো যাকে লালন-পালন এবং যত্ন নিতে হবে, আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে। যখন ঈমানের চারা অবহেলা করা হয় তখন এটি মারা যেতে পারে, যার ফলে উভয় জগতে সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য তার কিছুই থাকে না।

ক্ষমা করো এবং ভুলে যাও

উহুদের যুদ্ধে হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিবকে হত্যাকারী ওয়াহশী যখন ইসলাম গ্রহণের জন্য মদীনা সফরে আসেন, তখন মহানবী (সা.) তাকে হামজা (রা.)-এর সাথে তার আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন এবং তার ঈমানের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। এরপর তিনি অনুরোধ করেন যে ভবিষ্যতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে তার সাথে দেখা করা এড়িয়ে চলতে পারেন, কারণ তাকে দেখলে তার চাচা হামজা (রা.)-এর হত্যা এবং অঙ্গহানির কথা মনে পড়ে। সহীহ বুখারী, ৪০৭২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে ওয়াহশির পাপ ক্ষমা করা হয়েছিল, তবুও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে তার সাথে দেখা করা থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। প্রথমত, এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মানবিক স্বভাবকে নির্দেশ করে। তিনি অন্য যেকোনো মানুষের মতো একই অনুভূতি অনুভব করতেন, যেমন রাগ এবং শোক। এটি সর্বদা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একজনকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে সাহায্য করে, যা তাদেরকে কার্যত তাঁর অনুসরণ করতে উৎসাহিত করে। দুঃখের বিষয় হল, কিছু পণ্ডিত কেবল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উচ্চ মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করেন, যার ফলে ধারণা করা হয় যে তাঁকে কার্যত অনুসরণ করা যাবে না। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সৃষ্টির সেরা, তবুও তিনি এমন একজন মানুষ যাকে কার্যত অনুসরণ করা যেতে পারে এবং অবশ্যই অনুসরণ করা উচিত।

উপরন্তু, এই অনুরোধ মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য এক বিরাট স্বস্তির কারণ এটি তাদের জন্য কাজ সহজ করে তুলেছিল। যদি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এমন আচরণ করতেন যেন ওয়াহশী কিছুই করেননি, তাহলে এটি সমস্ত মুসলিমকে

এই আচরণ করতে বাধ্য করত, কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ গ্রহণ করা ফরজ। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

" বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

মুসলমানদের বিশাল অংশ অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে সক্ষম হত না। অতএব, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুরোধ তাদের জন্য সবকিছু সহজ করে দিয়েছিল। এটি ক্ষমা করা এবং ভুলে যাওয়ার মিথ্যা ধারণাকে সংশোধন করে। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে মানুষ কম্পিউটার নয়, যারা তাদের মন থেকে স্মৃতি মুছে ফেলতে পারে। মানুষ অন্যদের কর্ম ভুলে যাবে বলে আশা করা হয় না, বরং তাদের অন্যদের ভবিষ্যতের ক্ষতি থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করা হয় যাতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয়, তারপর তাদের উচিত আল্লাহর জন্য অন্যদের ক্ষমা করা এবং অন্যদের অধিকার পূরণ করা। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ২২:

"...এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন..."

এই কারণেই সহীহ বুখারীতে ৬১৩৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুমিন একই গর্ত থেকে দুবার দংশন করে না। অর্থাৎ, একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের ক্ষমা করা এবং তাদের অধিকার পূরণ করা, কিন্তু তাদের অন্ধভাবে অন্যদের বিশ্বাস করা উচিত নয়, বিশেষ করে যখন অতীতে তারা তাদের দ্বারা অন্যায়ভাবে ভোগ করেছে। অন্যদের অতীত কর্মকাণ্ড

উপেক্ষা করা ভবিষ্যতেও তাদের একই আচরণ করতে উৎসাহিত করতে পারে। অতএব, মুসলমানদের এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত এবং অন্যদের ক্ষমা করা এবং তাদের অধিকার পূরণের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, তবে তাদের কাছ থেকে অন্যদের কর্মকাণ্ড ভুলে যাওয়া বা অন্ধভাবে বিশ্বাস করা আশা করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য তাদের পদক্ষেপ নিতে হবে।

জিনিসপত্র ছেড়ে যাওয়া

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, অমুসলিম বালি গোত্রের প্রতিনিধিত্বকারী একটি প্রতিনিধিদল মদীনা সফর করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের প্রধান আবু আদ দাবীব (রাঃ) নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে একাধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তাদের মধ্যে একটি ছিল, যদি কেউ হঠাৎ করে কোন উটের সন্ধান পায়, তাহলে তার কী করা উচিত। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উত্তর দেন যে, হারিয়ে যাওয়া উটের মালিকের কোন ব্যাপার নেই এবং মালিককে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে দেওয়া উচিত, বরং নিজের জন্য নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ৪৪৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি নিজের কাজে মনোযোগ দেওয়ার গুরুত্বকে নির্দেশ করে।

জামে আত তিরমিযী, ২৩১৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম তার ইসলামকে উৎকৃষ্ট করতে পারে না যতক্ষণ না সে এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলে যা তার সাথে সম্পর্কিত নয়।

এই হাদিসে একটি সর্বব্যাপী উপদেশ রয়েছে যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত। এর মধ্যে একজন ব্যক্তির কথাবার্তার পাশাপাশি তার অন্যান্য শারীরিক কর্মকাণ্ডও অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ হল, যে মুসলিম তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে চায়, তাকে অবশ্যই সেইসব কথা এবং কাজের মাধ্যমে এড়িয়ে চলতে হবে যা তার সাথে সম্পর্কিত নয়। বরং তাকে সেইসব কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে

হবে যা তার সাথে সম্পর্কিত। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তার সাথে সম্পর্কিত দায়িত্বগুলি পালন করার জন্য একজনের উচিত, যা তার সাথে সম্পর্কিত, সেগুলিকে খুব গুরুত্ব সহকারে নেওয়া এবং তার সাথে থাকা দায়িত্বগুলি পালন করার চেষ্টা করা। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি সে তার নিজস্ব চিন্তাভাবনা বা ইচ্ছা অনুসারে জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে তবে সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে, সে সেইসব জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে যা ইসলাম এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে। অর্থ, তার সমস্ত কর্তব্য পালন করার, সমস্ত পাপ এবং ইসলামে অপছন্দনীয় জিনিসগুলি এড়িয়ে চলা এবং এমনকি অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসের অতিরিক্ত ব্যবহার এড়িয়ে চলা উচিত। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা হল সহীহ মুসলিমের ৯৯ নম্বর হাদিসে বর্ণিত ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের একটি বৈশিষ্ট্য। এটি তখনই হয় যখন কেউ এমনভাবে কাজ করে এবং আল্লাহ তাআলার উপাসনা করে যেন সে তাঁকে দেখতে পারে অথবা অন্তত তারা তাদের প্রতিটি চিন্তাভাবনা এবং কর্ম পর্যবেক্ষণ করে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন হয়। এই ঐশ্বরিক নজরদারি সম্পর্কে সচেতন থাকা একজন মুসলিমকে সর্বদা পাপ থেকে বিরত থাকতে এবং সৎকর্মের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। যে ব্যক্তি এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলে না যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয় সে এই শ্রেষ্ঠত্বের স্তরে পৌঁছাতে পারবে না।

মানুষের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলার একটি প্রধান দিক হল কথার সাথে সম্পর্কিত। বেশিরভাগ পাপ তখনই ঘটে যখন কেউ এমন কথা বলে যা তার সাথে সম্পর্কিত নয়, যেমন গীবত এবং অপবাদ। অনর্থক কথার সংজ্ঞা হল যখন কেউ এমন কথা বলে যা পাপ নাও হতে পারে কিন্তু অকেজো এবং তাই তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়। সহীহ বুখারী, ২৪০৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে যেমন প্রমাণিত হয়েছে, অনর্থক কথা বলা আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন। অসংখ্য তর্ক, মারামারি এমনকি শারীরিক ক্ষতিও ঘটেছে কারণ কেউ এমন কিছু বলেছে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়। অনেক পরিবার বিভক্ত হয়ে গেছে; অনেক বিবাহ ভেঙে গেছে কারণ কেউ তাদের কাজে মনোযোগ দেয়নি। এই কারণেই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন ধরণের কার্যকর কথা বলার

পরামর্শ দিয়েছেন যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত হওয়া উচিত। সূরা ৪ আন নিসা, আয়াত ১১৪:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনের বেশিরভাগের মধ্যেই কোন কল্যাণ নেই, তবে যারা দান-খয়রাতের নির্দেশ দেয়, সৎকর্মের নির্দেশ দেয় অথবা মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ কাজ করে, আমি তাকে বিরাট প্রতিদান দেব।"

প্রকৃতপক্ষে, এমন কথা বলা যা মানুষের জন্য উদ্বেগের বিষয় নয়, তা জাহান্নামে প্রবেশের প্রধান কারণ হবে। জামে আত তিরমিযী, ২৬১৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৪১২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, সকল কথাই একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে গণ্য হবে, যদি না তা সৎকাজের উপদেশ, মন্দকাজের নিষেধ বা মহান আল্লাহর স্মরণের সাথে সম্পর্কিত হয়। এর অর্থ হল, অন্য সকল ধরণের কথাবার্তা একজন ব্যক্তির উদ্বেগের বিষয় নয় কারণ এগুলি তার কোন উপকার করবে না। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সৎকাজের উপদেশ দেওয়ার মধ্যে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ব্যক্তির পার্থিব এবং ধর্মীয় জীবনে উপকারী, যেমন তার পেশা।

অতএব, মুসলমানদের উচিত কথা ও কাজের মাধ্যমে এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা যা তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করে। সহজ কথায়, যে ব্যক্তি এমন বিষয়গুলিতে সময় ব্যয় করে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়, সে সেই বিষয়গুলিতে ব্যর্থ হবে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত। আর যে ব্যক্তি এমন বিষয়গুলিতে নিজেকে ব্যস্ত রাখে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়, সে সেই বিষয়গুলিতে ব্যয় করার জন্য সময় পাবে না যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়।

অর্থাৎ, তারা উভয় জগতেই মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করবে।

পরিশেষে, যে ব্যক্তি নিজেকে তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে ব্যস্ত রাখে, সে তার সমস্ত কার্যকর পার্থিব ও ধর্মীয় দায়িত্ব সম্পন্ন করবে এবং এর ফলে সে মানসিক শান্তি পাবে। মানসিক চাপের অন্যতম প্রধান উৎস হল যখন কেউ নিজেকে এমন বিষয়গুলিতে ব্যস্ত রাখে যা তার সাথে সম্পর্কিত নয়, কারণ এটি তাকে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়। সঠিক পদ্ধতিতে আচরণ করলে একজন ব্যক্তি তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলি সম্পন্ন করতে পারবেন এবং একই সাথে বিশ্রাম নেওয়ার এবং উপভোগ করার জন্য প্রচুর অবসর সময় পাবেন।

এছাড়াও, আলোচিত মূল ঘটনাটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ মুসলিমের ৩২৫৭ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অতিরিক্ত প্রশ্ন করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন, কারণ এর ফলে অতীতের জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বরং মুসলমানদের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যা আদেশ করা হয়েছে তা পালন করা এবং যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকা।

মুসলমানদের এই মানসিকতা গ্রহণ করা উচিত নয় কারণ যাদের অত্যধিক প্রশ্ন করার অভ্যাস আছে তারা প্রায়শই তাদের কর্তব্য পালনে এবং উপকারী জ্ঞান অর্জনে ব্যর্থ হয়, কারণ তারা কম গুরুত্বপূর্ণ এবং কখনও কখনও অপ্রাসঙ্গিক তথ্য জিজ্ঞাসা এবং গবেষণা করতে ব্যস্ত থাকে। এই মানসিকতা একজন ব্যক্তিকে

এই ধরণের বিষয়গুলি নিয়ে তর্ক এবং বিতর্ক করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, আজকের মুসলমানদের মধ্যে এই মনোভাব বেশ ব্যাপক, কারণ তারা প্রায়শই তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব এবং মহানবী (সাঃ) এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য সঠিকভাবে, অর্থ এবং পূর্ণ শিষ্টাচার এবং শর্তাবলীর সাথে পালন করার উপর মনোনিবেশ করার পরিবর্তে অ-অবৈধ এবং কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে তর্ক করে।

একজন মুসলিমের উচিত এমন বিষয় নিয়ে গবেষণা এবং জিজ্ঞাসা করা যা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় তারা এই হাদিসে উল্লেখিত ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে এবং কেবল তাদের নিজেদের জীবনকে আরও কঠিন করে তুলবে। কারও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করা হয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে যে কোনও কিছু শেখার ফলে তাদের মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে কিনা। যদি তা না হয়, তবে তাদের এই জ্ঞানের অংশটি গবেষণা এবং শেখার সময় নষ্ট করা উচিত নয়। কারও পার্থিব জীবনের ক্ষেত্রে, প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করা হয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে যে কোনও কিছু শেখা একজনকে তার পার্থিব কর্তব্য, যেমন কর্মক্ষেত্রে তাদের কর্তব্য পালনে সহায়তা করবে কিনা। যদি তা না হয়, তবে তাদের এই জ্ঞানের অংশটি গবেষণা এবং শেখার সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

পরিশেষে, মূল হাদিসে উল্লেখিত মানসিকতা এড়িয়ে চলা নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে যখন তারা ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করে, কারণ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে আল্লাহকে মেনে চলার উপায় হিসেবে যা থাকা উচিত তা সহজেই ইসলামের উপর একাডেমিক অধ্যয়নের দিকে পরিচালিত করতে পারে যার তাদের জীবন ও আচরণের উপর কোনও বাস্তব প্রভাব নেই। পরবর্তী মনোভাব সহজেই গ্রহণ করা যেতে পারে যখন কেউ এমন জ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা এবং শেখা চালিয়ে যায় যা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বৃদ্ধি করবে না। এটি সহজেই সেই জ্ঞান হিসাবে চিহ্নিত করা যায় যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেননি বা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর

হাদিসে যা আলোচনা করেছেন তাও উল্লেখ করেননি। এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎসে আলোচনা করা হয়নি এমন সমস্ত ধর্মীয় জ্ঞান অপ্রাসঙ্গিক এবং তাই উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করার জন্য এটির প্রয়োজন নেই। যদি এটির প্রয়োজন হত, তবে এটি এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎসে আলোচনা করা হত। অতএব, দিকনির্দেশনার উৎসের মধ্যে নিহিত যেকোনো ধর্মীয় জ্ঞান প্রাসঙ্গিক এবং গবেষণা এবং তার উপর কাজ করা আবশ্যক, অন্যান্য সমস্ত ধর্মীয় জ্ঞান এড়ানো উচিত।

মুনাফিকদের সর্দারের মৃত্যু

অধ্যবসায়

নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইন্তেকাল করেন। নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর শেষ অসুস্থতার সময় নিয়মিতভাবে তাঁর সাথে দেখা করতে যেতেন এই আশায় যে তিনি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবেন এবং একজন সত্যিকারের মুসলিম হবেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৫-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি ইসলামের বাণী প্রচার করতে চায়, তার উচিত অন্যদেরকে বারবার ভালোর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা। মানুষ দ্রুত গাফিল হয়ে যেতে পারে, তাই তাদের ধারাবাহিকভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। সূরা আল কাসাস, আয়াত ৫১:

" আর আমি তাদের কাছে বারবার বাণী [অর্থাৎ, কুরআন] পৌঁছে দিয়েছি যাতে তারা স্মরণ করিয়ে দেয়।"

ঠিক যেমন শিক্ষার্থীরা তাদের নোট বারবার সংশোধন করে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য তাদের মনে বারবার মনে করিয়ে দিলে উপকৃত হবেন ইসলামের সত্য বাণী সম্পর্কে। একবার ভালো উপদেশ দিয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। ভালো কথা

বারবার বলা অবিরাম পানির ফোঁটার মতো যা সময়ের সাথে সাথে পানিতে ভেসে যায়। সবচেয়ে শক্ত কাঠামো। এটি আল্লাহর রীতি , মহিমান্বিত, এবং সকল পবিত্র নবীগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ , মহিমান্বিত, কেবল একবারই মুসলমানদের ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার আদেশ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তিনি পবিত্র কুরআন জুড়ে বহুবার এটি করেছেন।

নবী নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে ঈমানের বাণী প্রচারের জন্য প্রায় ৯৫০ বছর অবিরামভাবে কাটিয়েছিলেন। ২৯ সূরা আল আনকাবুত, আয়াত ১৪:

" আর অবশ্যই আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম, আর সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ বছর কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিল..."

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক, তিনি প্রতিটি মুহূর্ত ইসলামের প্রচারের জন্য ব্যয় করেছিলেন এবং এমনকি তাঁর শেষ মুহূর্তগুলিতেও সাহাবীদের , আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন, ইসলামী শিক্ষা মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সুনানে ইবনে মাজাহ, ২৬৯৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি লিপিবদ্ধ আছে। অতএব, এই মনোভাব গ্রহণ করা উচিত এবং কয়েকবার উপদেশ দেওয়ার পরে শয়তানের কুমন্ত্রণার শিকার না হওয়া উচিত। যে মুসলিম অন্যদের ইসলামের দিকে আহ্বান করে তার কর্তব্য হল এটি ধারাবাহিকভাবে করা, তবে এটি মানুষের হৃদয়ে প্রভাব ফেলবে কিনা তা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

কিন্তু এটা জোর দিয়ে বলা গুরুত্বপূর্ণ যে নিয়মিত থাকা এবং অন্যদের উপর নির্যাতন করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একজন মুসলিমের উচিত অন্যদেরকে ক্রমাগত ভালো কাজের আদেশ দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি অন্যদের জন্য অতিরিক্ত চাপ এবং বোঝা হয়ে উঠতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব বেশি বক্তৃতা দেওয়া থেকে বিরত থাকতেন কারণ তিনি চাননি যে সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, একঘেয়ে এবং অতিরিক্ত বোঝা হয়ে যান। এই কারণেই সাহাবী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তিনি কেবল বৃহস্পতিবারে বক্তৃতা দিতেন যদিও তাকে আরও বেশি দিতে বলা হয়েছিল। সহীহ মুসলিমের ৭১২৭ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন

মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যুর পর, তার ছেলে আবদুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উবাই, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন, নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শার্টটি চেয়েছিলেন, যাতে তিনি তার বাবার দেহটি দিয়ে মুড়িয়ে দিতে পারেন। এছাড়াও, তিনি তাকে তার বাবার জানাজার নামাজ পড়ানোর জন্য অনুরোধ করেছিলেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তার শার্টটি দিয়েছিলেন এবং জানাজার নামাজ পড়ানোর জন্য উঠে দাঁড়ান। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কেবল তার পুত্র আবদুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের ইচ্ছাই পূরণ করেননি, যিনি একজন আন্তরিক সাহাবী ছিলেন, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন, বরং তিনি আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের অনুগ্রহের প্রতিদান দিয়েছিলেন যখন তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চাচা আব্বাস বিন মুত্তালিব (রাঃ)-কে তার শার্ট দিয়েছিলেন, যখন তিনি বদরের যুদ্ধে বন্দী হওয়ার পর, অন্য কোন শার্ট তার জন্য উপযুক্ত ছিল না। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, ১৯৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে কখনও মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না।

যদিও নিঃসন্দেহে সকল নিয়ামতের উৎস মহান আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ নন, তবুও মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কারণ, মহান আল্লাহ তাআলা মাঝে মাঝে একজন ব্যক্তিকে অন্যদের সাহায্য করার জন্য, যেমন তার পিতামাতাকে সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করেন। যেহেতু উপায় আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন এবং ব্যবহার করেছেন, তাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা আসলে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অতএব, মুসলমানদের উচিত উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা এবং অন্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত

যেকোনো সাহায্য বা সহায়তার জন্য সর্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তা যত বড়ই হোক না কেন। তাদের উচিত আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁর আদেশ অনুসারে আশীর্বাদ ব্যবহার করে, কারণ তিনিই আশীর্বাদের উৎস এবং তাদের উচিত সেই ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যিনি তাদের সাহায্য করেছেন, কারণ এটিই সেই মাধ্যম যা মহান আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন এবং নির্বাচিত করেছেন। একজন মুসলমানের উচিত মানুষের প্রতি মৌখিকভাবে এবং কার্যত তাদের সদয় আচরণের প্রতিদান তাদের সামর্থ্য অনুসারে প্রদান করা, এমনকি যদি তা কেবল তাদের পক্ষ থেকে একটি প্রার্থনাও হয়। ইমাম বুখারীর "আদাব আল মুফরাদ", ২১৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাহায্যের বাহ্যিক প্রকাশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, অর্থাৎ একজন ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে সরাসরি মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সম্ভাবনা কম।

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না, তাই তাদের নিয়ামত বৃদ্ধি করা হবে না। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"আর [স্মরণ করো] যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের [নেয়ামত] বৃদ্ধি করব..."

যদি কোন মুসলিম বরকত বৃদ্ধি করতে চায়, তাহলে তাকে কৃতজ্ঞতার উভয় দিকই পূরণ করতে হবে, যথা, মহান আল্লাহর প্রতি এবং মানুষের প্রতি।

করুণা সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উবাই (রাঃ)-এর অনুরোধে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর পিতা, মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের জানাজার নামাজ পড়ানোর জন্য রওনা হলেন। উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) তাঁর গাউন ধরে তাকে অনুরোধ করলেন যে, সেই ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়াবেন না যে ইসলাম এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ধ্বংস করার চেষ্টায় কোন প্রকার বাধা দেয়নি। উমর (রাঃ) এমনকি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সেই আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দিলেন যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তিনি সত্তর বারও মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। ৯ম সূরা তওবা, আয়াত ৮০:

"তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো অথবা না করো। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করো, তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না। এর কারণ হলো তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাস করেছে, আর আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উত্তরে বললেন যে, তিনি সত্তর বারেরও বেশি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। এরপর তিনি তার জানাজার নামাজ পড়ান। এরপর মহান আল্লাহ তাকে ভবিষ্যতে এটি করতে নিষেধ করেন। ৯ম অধ্যায়, তাওবাহ, আয়াত ৮৪:

"আর তাদের মধ্যে যে কেউ মারা গেছে, তার উপর কখনও নামায [অর্থাৎ জানাজার নামাজ] পড়ো না - এবং তার কবরে দাঁড়াও না। নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা নাফরমান অবস্থায় মারা গেছে।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জানাজার নামাজ পড়ান তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) কে খুশি করার জন্য, যিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ সাহাবী ছিলেন। উপরন্তু, এই দয়ার কাজটি অন্যান্য মুনাফিকদের আন্তরিকভাবে তওবা করতে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে আরও কার্যকর হত।

সহীহ বুখারীতে ৭৩৭৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, যে অন্যদের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন না।

ইসলাম খুবই সহজ একটি ধর্ম। এর মৌলিক শিক্ষাগুলির মধ্যে একটি হল, মানুষ অন্যদের সাথে কেমন আচরণ করে, তা হলো মহান আল্লাহ তাদের সাথে কেমন আচরণ করবেন। উদাহরণস্বরূপ, যারা অন্যদের ভুল উপেক্ষা করতে এবং ক্ষমা করতে শেখে, তারা মহান আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ২২:

"...এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন..."

যারা অন্যদের পার্থিব ও ধর্মীয় উপকারে যেমন মানসিক বা আর্থিক সাহায্যে সাহায্য করে, তাদের উভয় জগতেই মহান আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করবেন। সুনানে আবু দাউদের ৪৮৯৩ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একই হাদিসে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্যদের দোষ-ত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ তায়ালা তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।

সহজ কথায়, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, যদি কেউ অন্যদের সাথে সদয় ও শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করে, তাহলে মহান আল্লাহ তাদের সাথেও একই আচরণ করবেন। আর যারা অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তাদের সাথেও একই আচরণ করবেন, এমনকি যদি তারা তাঁর সাথে সম্পর্কিত ফরজ কর্তব্য, যেমন ফরজ নামাজ, পালন করে। কারণ একজন মুসলিমকে সাফল্য অর্জনের জন্য উভয় কর্তব্যই পালন করতে হবে, যথা: আল্লাহ, মহিমান্বিত, এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য।

ঐশ্বরিক করুণা অর্জনের একটি সহজ উপায় হল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যা মানুষ তার সাথে আচরণ করতে চায়। এটি সকল মানুষের জন্য সত্য, তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে, এবং প্রকৃতপক্ষে সমস্ত প্রাণীর জন্য প্রযোজ্য।

পরিশেষে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিম যদি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করে, তবেই কেবল আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সদয় আচরণ করবেন। যদি তারা অন্য কোনও কারণে তা করে, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা এই শিক্ষায় উল্লিখিত সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। সকল কর্মের

এবং ইসলামের ভিত্তি হলো ব্যক্তির নিয়ত। সহীহ বুখারী, ১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পবিত্র তীর্থযাত্রা পবিত্র করা

নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, মহান আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ঘোষণা করার নির্দেশ দেন যে, ঐ বছরের পর কেবল একজন মুসলিমই পবিত্র হজ্জে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এর আগে অমুসলিমরা পবিত্র হজ্জ পালন করতো কিন্তু তাদের নিজস্ব ভুল রীতিনীতি অনুসারে। এই ঘোষণার আগে এবং সেই বছরে, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বকর (রাঃ) কে পবিত্র হজ্জের দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯ এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রাঃ) এর "আবু বকর আস সিদ্দীকের জীবনী", পৃষ্ঠা ১৫০-১৫১ এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ)-কে এই ঘোষণাটি জনসমক্ষে প্রচার করার জন্য হাজীদের সাথে যোগ দিতে প্রেরণ করেন। আবু বকর (রাঃ)-এর সাথে দেখা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করেন যে, তাকে কি তার কাছ থেকে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য পাঠানো হয়েছে, নাকি বার্তা প্রদানের জন্য পাঠানো হয়েছে। আলী (রাঃ)-এর উত্তরে বলেন যে, তাকে কেবল একজন রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে। সুনানে আন নাসায়ী, ২৯৯৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বকর (রাঃ) এর বদলি হওয়া নিয়ে কোন আপত্তি ছিল না কারণ তিনি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক ছিলেন। অর্থাৎ, তিনি নেতৃত্বের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না, বরং তিনি কেবল আন্তরিকভাবে আল্লাহ এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আনুগত্য করতে চেয়েছিলেন।

সহীহ বুখারীতে ১৭৭৩ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একটি গৃহীত পবিত্র হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

পবিত্র হজ্জের আসল উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের পরকালের শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা। যেভাবে একজন মুসলিম পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য তাদের ঘর, ব্যবসা, সম্পদ, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সামাজিক মর্যাদা ত্যাগ করে, ঠিক একইভাবে এটি তাদের মৃত্যুর সময় ঘটবে, যখন তারা পরকালের শেষ যাত্রায় যাবে। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযীর ২৩৭৯ নম্বর হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, একজন ব্যক্তির পরিবার এবং সম্পদ তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং কেবল তাদের ভালো-মন্দ কর্মই তাদের সাথে থাকে।

যখন একজন মুসলিম তাদের পবিত্র হজ্জের সময় এই কথাটি মনে রাখবেন, তখন তারা এই দায়িত্বের সমস্ত দিক সঠিকভাবে পালন করবেন। এই মুসলিম পরিবর্তিত ব্যক্তি হয়ে বাড়ি ফিরে আসবে, কারণ তারা এই বস্তুগত জগতের অতিরিক্ত জিনিসপত্র সংগ্রহের চেয়ে পরকালের চূড়ান্ত যাত্রার প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে। তারা মহান আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়ার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুসারে চেষ্টা করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের এবং তাদের উপর আস্থাশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য এই পৃথিবী থেকে অর্থ গ্রহণ করা, অপচয়, অতিরিক্ত ব্যয় বা অপচয় ছাড়াই। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে।

মুসলমানদের পবিত্র হজ্জকে ছুটির দিন এবং কেনাকাটার ভ্রমণ হিসেবে দেখা উচিত নয় কারণ এই মনোভাব এর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে। এটি মুসলমানদের তাদের পরকালের শেষ যাত্রার কথা মনে করিয়ে দেবে, এমন একটি যাত্রা যার

কোন প্রত্যাবর্তন নেই এবং দ্বিতীয় কোন সুযোগ নেই। কেবলমাত্র এটিই পবিত্র হজ্জ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে এবং পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে অনুপ্রাণিত করবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে তাকে তাদের পবিত্র হজ্জের মাধ্যমে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে।

দারিদ্র্যকে ভয় পেও না

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ দেন যে, মুশরিকরা পবিত্র হজ্জের সময় বা অন্য কোন সময়ে মক্কায় অবস্থিত আল্লাহর ঘর কাবার আশেপাশের পবিত্র স্থানে প্রবেশ করবে না। মক্কার কিছু লোক হজ্জের সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মুসলিম ও অমুসলিম হজ্জযাত্রীদের উপর নির্ভর করায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা সকল পরিস্থিতিতে তাদের ভরণপোষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ৯ম অধ্যায় তওবা, আয়াত ২৮:

"হে ঈমানদারগণ, মুশরিকরা [আধ্যাত্মিকভাবে] অপবিত্র, তাই তারা যেন এই [শেষ] বছরের পরে মসজিদুল হারামের কাছে না যায়। আর যদি তোমরা অভাবের আশঙ্কা করো, তাহলে আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহে সমৃদ্ধ করবেন..."

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছরেরও বেশি আগে সমস্ত প্রাণীর জন্য রিযিকের মতো সবকিছু বরাদ্দ করেছিলেন।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সকল পরিস্থিতিতে দুটি দিক রয়েছে, যেমন রিজিক লাভ। প্রথম দিকটি হল মহান আল্লাহ যা অর্থ নির্ধারণ করেছেন, তা হল ভাগ্য; এটি ঘটবে এবং সৃষ্টির কোন কিছুই এটি ঘটতে বাধা দিতে পারবে না। যেহেতু এটি একজন ব্যক্তির হাতের বাইরে, তাই এই দিকটি নিয়ে জোর দেওয়ার কোন মানে হয় না কারণ তারা বা অন্য কেউ যাই করুক না কেন, ভাগ্যের উপর তাদের কোন প্রভাব নেই। উপরন্তু, এই বিধানে একজন ব্যক্তির এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জিনিসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ, যতক্ষণ তারা বেঁচে থাকবে, ততক্ষণ একজন ব্যক্তি তাদের রিজিক পেতে থাকবে এবং কেউই তাদের এটি গ্রহণ এবং ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে পারবে না, এমনকি তারা নিজেরাও না।

দ্বিতীয় দিকটি হলো নিজের প্রচেষ্টা। এই দিকের উপর একজন ব্যক্তির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং তাই তাদের এই দিকে মনোনিবেশ করা উচিত, যেমন তাদের দেওয়া উপায়গুলি ব্যবহার করে, যেমন আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, যার উপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে। এর মধ্যে রয়েছে অবৈধ, অতিরিক্ত, অপচয় এবং অপচয় এড়িয়ে তাদের এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য বৈধ রিযিক অর্জনের চেষ্টা করা।

পরিশেষে, একজন মুসলিমের কখনোই এমন জিনিসের উপর চাপ প্রয়োগ করে সময় নষ্ট করা উচিত নয় যার উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব নেই। বরং, তাদের উচিত তাদের নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করা এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা জিনিসগুলিতে কাজ করা। একজন মুসলিমের উচিত অলসতা অবলম্বন করে এবং তাদের রিজিক পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভাগ্যের উপর নির্ভর করে চরম মানসিকতা গ্রহণ করা এড়িয়ে চলা এবং তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা উচিত নয়। ভারসাম্য হল ইসলামের শিক্ষা অনুসারে হালাল সম্পদ অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং মহান আল্লাহর গ্যারান্টির উপর

নির্ভর করা, কারণ এই নির্ভরতা অধৈর্যতা এবং অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জনকে প্রতিরোধ করবে। মহান আল্লাহ এটাই নির্দেশ দিয়েছেন।

ভালো অতিথি হোন

নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, একটি প্রতিনিধি দল নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে দেখা করতে আসে। এই লোকেরা দ্রুত এগিয়ে আসে এবং তাঁর ঘরের পিছন থেকে তাঁকে উচ্চস্বরে এবং অভদ্রভাবে ডাকে। ফলস্বরূপ, মহান আল্লাহ সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ৪৯-৫ নাযিল করেন:

"নিশ্চয়ই, যারা তোমাকে ঘরের আড়াল থেকে ডাকে, তাদের অধিকাংশই বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে না। আর যদি তারা ধৈর্য ধরত যতক্ষণ না তুমি তাদের কাছে বেরিয়ে আসতে পারতে, তবে তাদের জন্য তা মঙ্গলজনক হত। কিন্তু আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

একজন মুসলিমের জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যদের সাথে দেখা করার শিষ্টাচার এবং শর্তাবলী পালন করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা তাদের সওয়াব লাভ করতে পারে। তাদের উচিত দীর্ঘক্ষণ থাকা উচিত নয়, যার ফলে অতিথি এবং তাদের আত্মীয়স্বজনদের সমস্যা হয়। বর্তমান যুগে অতিথি এবং তাদের পরিবারের সাথে আগে থেকেই যোগাযোগ করা সহজ, যাতে তারা উপযুক্ত সময়ে তাদের সাথে দেখা করতে পারে। তাদের উচিত তাদের কাজ এবং কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করা যাতে তারা সকল ধরণের পাপ যেমন পরচর্চা, গীবত এবং অন্যদের

অপবাদ দেওয়া এড়িয়ে চলে। তাদের উচিত দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য উপকারী বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা। কেউ যদি এইভাবে আচরণ করে তবেই তারা মহানবী (সা.)-এর হাদিসে বর্ণিত সওয়াব পাবে। যদি তারা এতে ব্যর্থ হয় তবে হয় তারা কোনও সওয়াব পাবে না অথবা তাদের আচরণের উপর নির্ভর করে তাদের পাপ থেকে যাবে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম এই সৎকর্মটি উপভোগ করে কিন্তু এর শর্তগুলি সঠিকভাবে পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। অধ্যায় ৪ আন-নিসা, আয়াত ১১৪:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনের বেশিরভাগের মধ্যেই কোন কল্যাণ নেই, তবে যারা দান-খয়রাতের নির্দেশ দেয়, সৎকর্মের নির্দেশ দেয় অথবা মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ কাজ করে, আমি তাকে বিরাট প্রতিদান দেব।"

দুটি ধন্য গুণ

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, একটি প্রতিনিধি দল নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে দেখা করতে আসে। এই প্রতিনিধি দলের সকলেই নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে ছুটে যায়, কেবল একজন ব্যক্তি, আশহাজ্জ মুনযির বিন আমির (রাঃ)-এর ব্যতীত। তিনি ধীরে ধীরে ঘোড়া থেকে নেমে তার উট বেঁধে ফেলেন। তারপর তিনি দুটি সাদা পোশাক বের করে পরলেন যা তিনি তার জিনিসপত্রে রেখেছিলেন। তারপর তিনি অন্যান্য প্রতিনিধিদের উট বেঁধে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে দেখা করার জন্য এগিয়ে যান। নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মন্তব্য ছিল যে, তাঁর দুটি গুণ ছিল যা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং তাঁর নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পছন্দ ছিল, যথা: বিচক্ষণতা এবং বিবেচনা। ইমাম ইবনে কাথিরের "নবী (সাঃ)-এর জীবনী", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

প্রকৃত বিচক্ষণতা কেবল ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের পার্থিব জ্ঞান তাদের ধর্মীয় জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়, তাদের যতই সম্পদ থাকুক না কেন। যদিও ইসলামের শিক্ষা অনুসারে কার্যকর পার্থিব জ্ঞান অর্জন প্রশংসনীয় কারণ এটি তাদের নিজের এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের জন্য বৈধ রিযিক অর্জনের জন্য একটি চমৎকার উপায়, তবুও তাদের ধর্মীয় জীবনে নিরাপদে পরিচালিত করার জন্য এটি যথেষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, পার্থিব জ্ঞান কাউকে শেখাবে না যে কীভাবে নিরাপদে কোনও অসুবিধা বা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এমনভাবে ভ্রমণ করতে হয় যা মহান আল্লাহকে খুশি করে, যাতে তারা উভয় জগতেই সওয়াব লাভ করে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বাধ্যতামূলক কর্তব্য এবং ঐতিহ্যগুলি এমন একজন মুসলিম দ্বারা পালন করা যায় না যার কাছে কেবল পার্থিব জ্ঞান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ধর্মীয় জ্ঞান উভয় জগতেই সাফল্যের দিকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে যেখানে পার্থিব জ্ঞান কেবল এই জগতেই কাউকে সাহায্য করবে। যার কাছে ধর্মীয় জ্ঞান আছে সে মহান আল্লাহর আনুগত্য মেনে চলবে, যার ফলে সে এমন আশীর্বাদ ও

অনুগ্রহ লাভ করবে যে সে উভয় জগতেই সাফল্য পাবে। অন্যদিকে, পার্থিব জ্ঞান তাকে সঠিক পথপ্রাপ্তদের, অর্থাৎ ধার্মিক পূর্বসূরীদের শিক্ষা অনুসারে কাজ করার পরিবর্তে ধর্মে নিজস্ব পথ নির্ধারণ করতে অনুপ্রাণিত করবে। ধর্ম কেবল নিজের পথ তৈরি করার জন্য নয়, বরং কেবল ইসলামী শিক্ষা মেনে চলার জন্য।

দুঃখের বিষয় হল, পার্থিব জ্ঞানের অধিকারী অনেক মুসলিম এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপলব্ধি করেন না যা উভয় জগতে তাদের সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনাকে হ্রাস করে। অতএব, মুসলমানদের উচিত উভয় জগতে সাফল্য কামনা করলে ধর্মীয় এবং কার্যকর পার্থিব জ্ঞান অর্জন এবং সে অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করা। এই কারণেই সুনান ইবনে মাজাহ, ২২৪ নম্বরে বর্ণিত একটি হাদিস অনুসারে, কার্যকর জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য।

উপরন্তু, চিন্তাভাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি পাপ থেকে বিরত রাখে। জামে আত তিরমিযী, ২০১২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, চিন্তাভাবনা করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর তাড়াহুড়ো করা শয়তানের পক্ষ থেকে।

এটি বোঝা এবং আমল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা, কারণ মুসলমানরা যারা অনেক সৎকর্ম করে তারা প্রায়শই তাড়াহুড়ো করে তাদের ধ্বংস করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা রাগের বশে কিছু খারাপ কথা বলতে পারে যা তাদের বিচারের দিনে জাহান্নামে নিমজ্জিত করতে পারে। জামে আত তিরমিযী, ২৩১৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বেশিরভাগ পাপ এবং সমস্যা, যেমন তর্ক, এর কারণ হল মানুষ সবকিছু ঠিকঠাকভাবে চিন্তা করতে ব্যর্থ হয় এবং তাড়াহুড়ো করে কাজ করে। বুদ্ধিমানের লক্ষণ হল যখন কেউ কথা বলার বা কাজ করার আগে চিন্তা করে এবং কেবল তখনই তাড়াহুড়ো করে যখন সে জানে যে তার কথা বা কাজ পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়ে ভালো এবং উপকারী।

যদিও একজন মুসলিমের সৎকর্ম সম্পাদনে দেরি করা উচিত নয়, তবুও সেগুলি করার আগে তাদের অবশ্যই সবকিছু ভেবে দেখা উচিত। কারণ একজন ব্যক্তির তাড়াহুড়োর কারণে তার শর্তাবলী এবং শিষ্টাচার পূরণ না হওয়ার কারণে কোনও সৎকর্মের কোনও প্রতিদান নাও পেতে পারে। এই ক্ষেত্রে, যে কোনও বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার পরেই কেবল এগিয়ে যাওয়া উচিত।

যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে, সে কেবল তার পাপ কমাবে না এবং মহান আল্লাহর প্রতি তার আনুগত্য বৃদ্ধি করবে না, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তারা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হবে, যেমন তর্ক, অসুবিধা এবং মতবিরোধ, তাও কমাবে।

মুসাইলিমা, মিথ্যাবাদী

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, একটি প্রতিনিধি দল নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে দেখা করতে আসে। তাদের মধ্যে ছিলেন মিথ্যাবাদী মুসাইলিমা, যিনি মদিনায় আসার পর বলেছিলেন যে তিনি কেবল নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসরণ করবেন, যদি তাকে তাঁর পরে ইসলামী জাতির নেতা নিযুক্ত করা হয়। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে স্বপ্নে সতর্ক করা হয়েছিল যে মিথ্যাবাদী মুসাইলিমা অবশেষে নবুয়তের মিথ্যা দাবি করবে। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে কঠোর সতর্কবাণী দিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীজীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যখন মিথ্যাবাদী মুসাইলিমা ইয়ামামায় ফিরে আসে, তখন সে অবশেষে নবুওয়াতের ঘোষণা দেয় এবং পার্থিব জিনিসপত্রের লোভে তার অনেক লোক তাকে গ্রহণ করে। এরপর সে মহানবী (সা.)-এর কাছে একটি চিঠি লিখে তার ঘোষণা সম্পর্কে অবহিত করে এবং তার সাথে আপোষ করার চেষ্টা করে। সে বলে যে তারা শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে অংশীদার হবে। মহানবী (সা.)-এর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে তিনি সূরা আল-আ'রাফের ১২৮ নম্বর আয়াত উদ্ধৃত করেন:

"...নিশ্চয়ই, পৃথিবী আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী করেন। এবং [সর্বোত্তম] পরিণতি মুত্তাকীদের জন্য।"

ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার" বইয়ের ৪৫২-৪৫৪ পৃষ্ঠায় এটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মিথ্যাবাদী মুসাইলিমা পবিত্র কুরআনের সাথে মিলে যাওয়া আয়াত রচনা করার চেষ্টা করেছিল, যার মাধ্যমে অন্যদেরকে বোকা বানাতে চেষ্টা করেছিল যে সেও ঐশ্বরিক ওহী পাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ সূরা আল-আন'আমের ৯৩ নম্বর আয়াত নাযিল করেন:

"আর তার চেয়ে বড় জালেম কে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে অথবা বলে, "আমার উপর ওহী করা হয়েছে," অথচ তার উপর কিছুই ওহী করা হয়নি, এবং যে বলে, "আমিও আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মতো কিছু নাযিল করব।" আর যদি তুমি দেখতে পেতে, যখন জালেমরা মৃত্যুর তীব্র যন্ত্রণায় ভোগে, আর ফেরেশতারা তাদের হাত প্রসারিত করে বলছে, "তোমাদের আত্মা বের করে দাও! আজ তোমাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হবে, কারণ তোমরা আল্লাহর উপর সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বলছো এবং তাঁর আয়াতের প্রতি অহংকার করেছো।"

যখন তিনি এই প্রচেষ্টা চালান, তখন তাঁর বোকামি সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ তাঁর রচিত কবিতাগুলি অর্থহীন জিনিসের উপর ভিত্তি করে তৈরি ছিল যা কারও উপকারে আসেনি। তিনি অন্ধ আনুগত্য এবং সম্পদ এবং কর্তৃত্বের মতো পার্থিব জিনিসের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনুসারী অর্জন করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "দ্য বায়োগ্রাফি অফ আবু বকর আস সিদ্দিক", পৃষ্ঠা ৪৮০ এবং ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৬:৯৩, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

তার খিলাফতের সময়, আবু বকর খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) কে মিথ্যাবাদী মুসাইলিমার মোকাবেলা করার জন্য প্রেরণ করেন। জুবাইর ইবনে মুত'আমের মুক্ত দাস ছিলেন ওয়াহশী। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের তৃতীয় বছরে সংঘটিত উহুদের যুদ্ধের সময়, ওয়াহশী নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) কে হত্যা করেন। বহু বছর পর, ওয়াহশী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মিথ্যাবাদী মুসাইলিমার বিরুদ্ধে অভিযানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তিকে হত্যা করার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। যুদ্ধের সময়, ওয়াহশী মিথ্যাবাদী মুসাইলিমার দিকে বর্শা ছুঁড়ে তাকে মারাত্মকভাবে আহত করেন। আরেক সাহাবী, আবু দুজানা (রাঃ) মিথ্যাবাদী মুসাইলিমাকে হত্যা করেন। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে, সংখ্যা 4072।

মিথ্যাবাদী মুসাইলিমা এবং তার অনুসারীদের মতো, যখন একজন ব্যক্তি সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতি চরম ভালোবাসা পোষণ করে, তখন তাকে সমস্ত বৈধ সীমা অতিক্রম করতে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

জামে আত তিরমিযীতে ২৩৭৬ নম্বর হাদিসে মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, সম্পদ ও মর্যাদার প্রতি আকুলতা ঈমানের জন্য দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ভেড়ার পালের উপর ছেড়ে দেওয়া ধ্বংসের চেয়েও বেশি ধ্বংসাত্মক।

এ থেকে বোঝা যায় যে, পৃথিবীতে সম্পদ ও খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা থাকলে খুব কমই কোন মুসলিমের ঈমান নিরাপদ থাকে, ঠিক যেমন দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ের হাত থেকে কোন ভেড়া রক্ষা পাবে। তাই এই মহান উপমায় পৃথিবীতে অতিরিক্ত সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার আকাঙ্ক্ষার মন্দের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কীকরণ রয়েছে।

প্রথম ধরণের সম্পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা হলো যখন কেউ সম্পদের প্রতি অত্যধিক ভালোবাসা পোষণ করে এবং বৈধ উপায়ে তা অর্জনের জন্য ক্লান্তিহীনভাবে চেষ্টা করে। এই ধরণের আচরণ করা একজন জ্ঞানী ব্যক্তির লক্ষণ নয়, কারণ একজন মুসলিমের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের রিজিক তাদের জন্য নিশ্চিত এবং এই বন্টন কখনও পরিবর্তন হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছরেরও বেশি আগে সৃষ্টির রিজিক বরাদ্দ করা হয়েছিল। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে তাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব অবহেলা করবে কারণ তারা সম্পদ অর্জনে অত্যধিক ব্যস্ত থাকে। যে ব্যক্তি সম্পদ অর্জনে অত্যধিক ব্যস্ত থাকে সে কখনই পরকালের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হবে না, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যক্তি আরও সম্পদ অর্জনের জন্য এত বেশি প্রচেষ্টা করবে যে তারা তা উপভোগ করার সুযোগও পাবে না। পরিবর্তে, তারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে এবং অন্যদের উপভোগ করার জন্য এটি রেখে যাবে, যদিও তাদের এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এই ব্যক্তি বৈধভাবে সম্পদ অর্জন করতে পারে কিন্তু তবুও তারা মানসিক শান্তি পাবে না কারণ তারা যতই সম্পদ অর্জন করুক না কেন, তারা কেবল আরও বেশি কামনা করবে। এই ব্যক্তি অভাবী এবং তাই, তাদের প্রচুর সম্পদ থাকলেও, তারা একজন প্রকৃত দরিদ্র। যেহেতু আরও সম্পদের জন্য প্রচেষ্টা করার অর্থ হল আরও বেশি পার্থিব দরজা এবং ব্যস্ততা খোলা, তারা যত বেশি তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করবে, ততই তারা মানসিক এবং শারীরিক শান্তি পাবে। এবং তারা তাদের ভাগ্য অর্জনের জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভুলে যায়, কেবল সেই আল্লাহর দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন] এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।"

একমাত্র উপকারী আকাঙ্ক্ষা হল প্রকৃত সম্পদ সঞ্চয় করার আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ পুনরাগমনের দিনের প্রস্তুতির জন্য সৎকর্মের আকাঙ্ক্ষা।

দ্বিতীয় ধরণের সম্পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রথম ধরণের অনুরূপ, তবে এর পাশাপাশি এই ধরণের ব্যক্তি অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করে এবং মানুষের অধিকার, যেমন ফরজ দান, পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অনেক হাদিসে এর বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৬ নম্বর হাদিসে তিনি সতর্ক করেছেন যে এই মনোভাব অতীতের জাতিগুলিকে ধ্বংস করেছে কারণ তারা অবৈধ জিনিসগুলিকে হালাল করেছে, অন্যদের অধিকার হরণ করেছে এবং অতিরিক্ত সম্পদের জন্য অন্যদের হত্যা করেছে। এই ব্যক্তি সেই সম্পদের জন্য প্রচেষ্টা করে যার অধিকার তাদের নেই যা অসংখ্য বড় পাপের দিকে পরিচালিত করে। যখন কেউ এই মনোভাব গ্রহণ করে তখন তারা তীব্র লোভী হয়ে ওঠে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক সতর্ক করা হয়েছে যে, জামে আত তিরমিযী, ১৯৬১ নম্বর হাদিসে লোভী ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসায়ীর ৩১১৪ নম্বর হাদিসে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, একজন প্রকৃত মুসলিমের অন্তরে চরম লোভ এবং প্রকৃত ঈমান কখনোই একত্রিত হতে পারে না।

যদি কোন মুসলিম এই ধরণের আকাঙ্ক্ষা গ্রহণ করে, তাহলে এর চরম বিপদ একজন অশিক্ষিত মুসলিমের কাছেও স্পষ্ট। এটি তাদের ঈমানকে ধ্বংস করে দেবে যতক্ষণ না সামান্য কিছু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আলোচ্য মূল হাদিসে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, তেমনি একজনের ঈমানের এই ধ্বংস দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ভেড়ার পালের উপর ছেড়ে দেওয়া ধ্বংসের চেয়েও ভয়াবহ। এই মুসলিম তাদের মৃত্যুর মুহূর্তে তাদের সামান্য ঈমান হারানোর ঝুঁকিতে থাকে, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

একজন ব্যক্তির খ্যাতি এবং মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা অতিরিক্ত সম্পদের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে তার বিশ্বাসের জন্য বেশি ধ্বংসাত্মক। একজন ব্যক্তি প্রায়শই খ্যাতি এবং সামাজিক মর্যাদা অর্জনের জন্য তার প্রিয় সম্পদ ব্যয় করে।

এমনটা বিরল যে কেউ মর্যাদা ও খ্যাতি অর্জন করে এবং তারপরও সঠিক পথে অটল থাকে, যার ফলে তারা বস্তুগত জগতের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেয়। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারীতে (৬৭২৩) একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সমাজে নেতৃত্বের মতো মর্যাদার সন্ধান করে, তাকে নিজেই তা মোকাবেলা করতে হবে, কিন্তু যদি কেউ তা না চেয়েই পায়, তাহলে মহান আল্লাহ তাকে তাঁর আনুগত্য করতে সাহায্য করবেন। এই কারণেই নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এমন কাউকে নিয়োগ করতেন না যে কর্তৃত্বের পদে নিযুক্ত হতে চেয়েছিল অথবা এমনকি এর জন্য আকাঙ্ক্ষাও দেখিয়েছিল। সহীহ বুখারীতে (৬৯২৩) একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সহীহ বুখারীতে (৭১৪৮) আরেকটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব অর্জনের জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু কিয়ামতের দিন এটি তাদের জন্য বিরাট অনুশোচনার বিষয় হবে। এটি একটি বিপজ্জনক আকাঙ্ক্ষা কারণ এটি একজনকে এটি অর্জনের জন্য তীব্র প্রচেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং তারপরে এটি ধরে রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টা করতে বাধ্য করে, এমনকি যদি এটি তাদের অত্যাচার এবং অন্যান্য পাপ করতে উৎসাহিত করে।

ধর্মের মাধ্যমে যখন কেউ মর্যাদা লাভ করে, তখনই সবচেয়ে খারাপ ধরণের মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৬৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করে বলেছেন যে, এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

অতএব, একজন মুসলিমের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা এড়িয়ে চলাই নিরাপদ। কারণ এই দুটি জিনিস তাদের ঈমানের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা তাদেরকে পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করা।

সত্যিকারের সৌন্দর্য

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, একটি প্রতিনিধি দল নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে দেখা করতে আসে। প্রতিনিধি দলের দুজন ব্যক্তি দামি এবং ব্যয়বহুল পোশাক পরে সোনার আংটিও পরেন। যখন তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে সালাম জানালেন, তিনি তাদের কোন উত্তর দেননি বা তাদের সাথে কথা বলেননি। এরপর প্রতিনিধিদল সাহাবীদের (রাঃ) জিজ্ঞাসাবাদ করে, তারা তাদেরকে তাদের ভ্রমণের পোশাক পরিবর্তন করে সোনার আংটি খুলে ফেলার পরামর্শ দেন। যখন তারা তা করে এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে ফিরে আসে, তখন তিনি তাদের সালামের উত্তর দেন এবং তাদের সাথে কথা বলেন। তিনি তাদের বলেন যে যখন তারা প্রথম তাদের ব্যয়বহুল পোশাক পরে তাঁর কাছে আসে, তখন শয়তান তাদের সাথে ছিল তাই সে তাদের উপেক্ষা করে। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৭২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও ইসলাম নিজেকে সুন্দর করার বিরুদ্ধে নয়, তবুও এটি অবশ্যই অপচয় এবং অপচয় ছাড়াই করতে হবে।

জামে আত তিরমিযী, ১৯৯৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সৌন্দর্য পছন্দ করেন।

ইসলাম একজন মুসলিমকে নিজেকে সুন্দর করার জন্য শক্তি, সময় এবং অর্থ ব্যয় করতে নিষেধ করে না, কারণ এটি তাদের শরীরের অধিকার পূরণের জন্য বিবেচিত হতে পারে। সহিহ বুখারির ৫১৯৯ নম্বর হাদিসে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে কাজ করা এবং অপছন্দনীয় বা এমনকি পাপপূর্ণ

আচরণের মধ্যে পার্থক্য করার মূল বিষয় হল যখন কেউ নিজেকে সুন্দর করার সময় অতিরিক্ত, অপচয় বা অপচয় করে। এটি নির্ধারণ করার একটি ভাল উপায় হল নিজেকে সুন্দর করার ফলে কখনই আল্লাহ, মহান আল্লাহ, অথবা মানুষের প্রতি কর্তব্য পালনে অবহেলা করা উচিত নয়, যা ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল না করে পূরণ করা সম্ভব নয়। নিজেকে সুন্দর করার ফলে তাদেরকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি আল্লাহ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখা উচিত নয়। এবং বাস্তবে নিজের শারীরিক চেহারা সংশোধন করা যাতে তারা পরিষ্কার এবং স্মার্ট দেখায় ব্যয়বহুল নয় এবং এতে খুব বেশি সময় বা প্রচেষ্টা লাগে না।

এই সৌন্দর্যবর্ধক মনোভাব সকল জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন নিজের ঘর। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ অপচয় ও অপচয় এড়িয়ে চলে এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের জন্য পরিমিতভাবে আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করতে স্বাধীন।

অধিকন্তু, এটা বোঝা আরও গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ তাআলা যে প্রকৃত সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন তা অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের সাথে সম্পর্কিত, অর্থাৎ চরিত্রের সাথে। এই সৌন্দর্য উভয় জগতেই স্থায়ী হবে, অন্যদিকে সময়ের সাথে সাথে বাহ্যিক সৌন্দর্য অবশেষে ম্লান হয়ে যাবে। অতএব, বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে এই প্রকৃত সৌন্দর্য অর্জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করে যাতে তারা তাদের চরিত্র থেকে হিংসার মতো যেকোনো খারাপ বৈশিষ্ট্য দূর করে এবং উদারতার মতো ভালো বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। এটি মহান আল্লাহর অধিকার পূরণে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয় এবং মানুষের অধিকার পূরণে সহায়তা করে, যার মধ্যে রয়েছে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যা মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক বলে আশা করে।

খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল মদিনা পরিদর্শন করেছে

সর্বোচ্চ মর্যাদা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, একটি খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে দেখা করতে আসে। তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে হযরত ঈসা (আঃ) এর খোদায়ীত্বের প্রতি তাদের বিশ্বাস নিয়ে বিতর্কে অনেক সময় ব্যয় করে। তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন যে তিনি নবী ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর বান্দা বলে অপমান করেছেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উত্তরে বলেন যে, আল্লাহর বান্দা হওয়া তার জন্য লজ্জাজনক নয়। এই প্রসঙ্গে, আল্লাহ, সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, সূরা, আন-নিসার ১৭২ নং আয়াত নাযিল করেন:

"আল্লাহর বান্দা হতে মসীহ কখনও লজ্জাবোধ করবেন না, আর তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতারাও কখনও লজ্জাবোধ করবেন না। আর যে কেউ তাঁর ইবাদতকে লজ্জাবোধ করবে এবং অহংকার করবে, তিনি তাদের সকলকে তাঁর কাছে একত্রিত করবেন।"

ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৪:১৭২, পৃষ্ঠা ৬৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটি ইঙ্গিত দেয় যে একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ মর্যাদায় পৌঁছাতে পারে, অর্থাৎ আল্লাহর একজন আন্তরিক বান্দা। যদি এর চেয়ে বড় মর্যাদা থাকত, তাহলে মহান আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে এর মাধ্যমে উল্লেখ করতেন। অনেক হাদিস দ্বারা এটি সমর্থিত, যেমন সহীহ মুসলিমের ৮৫১ নম্বর হাদিস, যেখানে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুয়ত ঘোষণার আগে নিজেকে আল্লাহর বান্দা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এটি সমস্ত মুসলমানদের জন্য একটি স্পষ্ট শিক্ষা যে, যদি তারা চূড়ান্ত সাফল্য এবং উভয় জগতের সর্বোচ্চ মর্যাদা চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হতে হবে। এটি কেবলমাত্র আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা, অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই অর্জন করা সম্ভব। অন্য কোন উপায়ে দাসত্ব অর্জন করা সম্ভব নয়। অধ্যায় ৩ আলী ইমরান, আয়াত ৩১:

"[নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

স্পষ্ট সত্য

একটি খ্রিস্টান প্রতিনিধি দল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ঐশ্বরিকতা সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে বিতর্কে অনেক সময় ব্যয় করেছিল। এই প্রসঙ্গে, আল্লাহ, মহিমান্বিত, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৫৯-৬১ নাযিল করেন:

"নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে ঈসার উদাহরণ আদমের মতো। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি তাকে বললেন, "হও", আর সে হয়ে গেল। সত্য তোমার প্রভুর কাছ থেকে এসেছে, তাই সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। [এই] জ্ঞান তোমার কাছে আসার পরেও যে কেউ তোমার সাথে এ বিষয়ে বিতর্ক করে, তাকে বলো, "এসো, আমরা আমাদের পুত্রদের, তোমাদের পুত্রদের, আমাদের নারীদের, তোমাদের নারীদের, আমাদের নিজেদের এবং তোমাদের নিজেদেরকে ডাকি, তারপর আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি এবং [আমাদের মধ্যে] মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ দেই।"

ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার" বইয়ের ৪৫০-৪৫২ পৃষ্ঠায় এটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার পরও নাজরানের খ্রিস্টান প্রতিনিধিদলটি সত্যকে একগুঁয়েভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের একগুঁয়েমির প্রতিক্রিয়া হিসেবে, আল্লাহ, তাদের বিশ্বাসকে আরও খণ্ডন করেছিলেন, তাদেরকে পারস্পরিক সমাবেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে যেখানে উভয় পক্ষই মিথ্যাবাদী দলের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষণ করবে। নবী মুহাম্মদ (সাঃ)

তাঁর পরিবার, আলী বিন আবু তালিব, তাঁর স্ত্রী এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কন্যা ফাতিমা এবং তাদের দুই পুত্র, হাসান ও হুসাইন (রাঃ) কে ডেকে পাঠান। এটি দেখার পর, খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল এই সমাবেশে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানায় কারণ তারা পুরোপুরি জানত যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সত্য কথা বলছেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মন্তব্য করেছিলেন যে যদি তারা পারস্পরিক অভিশাপে সম্মত হত তবে তাদের উপর আগুন বর্ষিত হত। ইমাম ওয়াহিদীর "আসবাব আল নুযুল", ৩:৬১, পৃষ্ঠা ৩৩-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাফসীর ইবনে কাসির, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭৯-১৮০-এ উদ্‌ধৃত আরেকটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি তারা সকলেই মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপের জন্য প্রার্থনা করত, তাহলে খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল বাড়ি ফিরে তাদের সম্পত্তি বা পরিবার খুঁজে পেত না।

যখন তারা এই পারস্পরিক অভিশাপে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানালো, তখন সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে নাজরানের খ্রিস্টধর্মের পুরোহিত এবং নেতারা, যাদের তাদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি নিষ্ঠা ছিল, তারা এমন বিশ্বাস অনুসরণ করতো যার উপর তারা নিজেরাই সম্পূর্ণরূপে আস্থাশীল ছিল না।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, পবিত্র কুরআন খ্রিস্টানদের কাছে প্রমাণ করেছে যে, নবী ঈসা (আঃ)-এর ঐশ্বরিকতায় বিশ্বাস স্থাপনের জন্য তাদের যে যুক্তিগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল, তার কোনওটিই বৈধ ছিল না। নবী ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ তাআলা বিশেষ ও অনন্যভাবে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁর নবুওয়ত প্রমাণের জন্য তাঁকে কিছু অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা নবী ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছিলেন। নবী ঈসা (আঃ)-কে যদি ঐশ্বরিক হতেন, তাহলে এটি করার কোন প্রয়োজন হত না কারণ একজন ঐশ্বরিক সত্তা মৃত্যু ভোগ করেন না। যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর বান্দাদের সাথে আচরণ করেন, তাই নবী ঈসা (আঃ)-এর সাথে এই অসাধারণ আচরণ কীভাবে এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে পারে যে তিনি ঐশ্বরিক?

অধিকন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আহ্বান সকল নবীর আহ্বানের অনুরূপ, যার মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ) ও সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

অবশেষে, পবিত্র কুরআন এমনকি প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, নবী ঈসা (আঃ)-এর স্বর্গারোহণের পর, তাঁর শিষ্যদের ধর্ম একই ছিল, অর্থাৎ ইসলাম, যা এখন পবিত্র কুরআন দ্বারা সমর্থিত এবং আরও স্পষ্ট। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে , খ্রিস্টানরা নবী ঈসা (আঃ)-এর শিক্ষা পরিত্যাগ করে এবং তার পরিবর্তে তাঁর আনা ধর্মে নতুন নতুন উদ্ভাবন প্রবর্তন করে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে প্রেরণ করেছিলেন যাতে তিনি পূর্ববর্তী নবীদের নির্দেশিত সরল পথে মানবতাকে পুনর্নির্মাণ করতে পারেন। পবিত্র কুরআন এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কথা তাদের ঐশী গ্রন্থে বর্ণিত হলেও তারা সম্পদের লোভ এবং তাদের ঈমানের সাথে আপোষ করে প্রাপ্ত সামাজিক মর্যাদার কারণে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। সূরা ৬ আল আন'আম, আয়াত ২০:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা জানে, [পবিত্র কুরআন] যেমন তারা তাদের [নিজের] পুত্রদের চিনতে পারে..."

এবং সূরা ২, আল বাকারাহ, আয়াত ১৪৬:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে [নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তেমনভাবে চেনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চেনে..."

হযরত ঈসা (আঃ)-এর সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রসারের কারণগুলির মধ্যে রয়েছে তাঁর অলৌকিক জন্ম, তাঁর জীবদ্দশায় সম্পাদিত অলৌকিক ঘটনা এবং তাঁর আসমানে আরোহণ। পবিত্র কুরআন হযরত ঈসা (আঃ)-এর অলৌকিক জন্মের সত্যতা নিশ্চিত করে এবং তাঁর পিতৃহীন জন্মকে মহান আল্লাহর অসীম শক্তির নিদর্শন হিসেবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪৭:

"তিনি [মারিয়াম, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট] বললেন, "হে আমার প্রতিপালক, আমার সন্তান কীভাবে হবে যখন কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি?" [ফেরেশতা] বললেন, "আল্লাহ এমনই; তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেন, তখন কেবল বলেন, 'হও', আর তা হয়ে যায়।"

মহান আল্লাহ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, ঠিক যেমন তিনি হযরত আদম আলাইহিস সালামকে পিতা বা মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। এই বাস্তবতার অর্থ এই নয় যে তারা ঐশ্বরিক। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৫৯:

"নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে ঈসার উদাহরণ আদমের মতো। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে বলেছেন, "হও", আর সে হয়ে গেল।"

এটা অদ্ভুত যে খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে হযরত ঈসা (আঃ) হলেন মহান আল্লাহর পুত্র, কারণ তিনি পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তারা হযরত আদম (আঃ)-কে মহান আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে না, যদিও তিনি পিতা বা মাতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মানসিকতা অনুসারে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর চেয়ে হযরত আদম (আঃ)-এর মহান আল্লাহর পুত্র বলে অভিহিত হওয়ার অধিকার বেশি, কিন্তু তারা তা দাবি করে না। হযরত আদম (আঃ)-এর ক্ষেত্রে তারা যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করে, কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রে যুক্তি বা সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করে না। এটা অদ্ভুত।

পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অলৌকিক ঘটনাগুলি যাচাই করা হয়েছে। তবে এটি স্পষ্ট করে যে, মহান আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি এবং আদেশে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এই অলৌকিক ঘটনাগুলি সম্পাদন করেছিলেন। যদি মহান আল্লাহর ইচ্ছা বা অনুমতির প্রয়োজন হত, তাহলে তাঁর জন্য মহান আল্লাহর ইচ্ছা বা অনুমতির প্রয়োজন হত না। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৪৯:

“আর [ঈসা আলাইহিস সালামকে] বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূল বানাও, [যিনি বলবেন], 'আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরি করি, অতঃপর আমি তাতে ফুঁ দেই, আল্লাহর নির্দেশে তা পাখি হয়ে যায়। আর আমি অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করি এবং আল্লাহর নির্দেশে মৃতকে জীবিত করি। আর আমি তোমাদেরকে তোমাদের খাবার এবং তোমাদের ঘরে যা জমা করে রাখি তা জানিয়ে দেই.."

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম জীবিত অবস্থায় আসমানে আরোহণ করা মহান আল্লাহর শক্তির আরও ইঙ্গিত দেয়, যখন তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে

এই যাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন। যদি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ঐশ্বরিক হতেন, তাহলে তিনি তাঁর নিজস্ব সহজাত শক্তি দিয়ে এই যাত্রা করতে পারতেন। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৫৫:

"[স্মরণ করো] যখন আল্লাহ বললেন, "হে ঈসা, আমি অবশ্যই তোমাকে গ্রহণ করব এবং আমার দিকে উঠিয়ে নেব এবং তোমাকে পবিত্র করব [অর্থাৎ, মুক্ত করব] যারা অবিশ্বাস করে...""

পবিত্র কুরআন খ্রিস্টানদের বলে যে, তাদের বিশ্বাসের বিপরীতে, নবী ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি। ক্রুশে যার ছবি দেখা গিয়েছিল তিনি নবী ঈসা (আঃ)-এর মতো দেখতে ছিলেন না, বরং তিনি এমন একজন ছিলেন যাকে তাঁর মতো করে তৈরি করা হয়েছিল। আল্লাহ, মহিমান্বিত, ইতিমধ্যেই নবী ঈসা (আঃ)-কে আকাশের দিকে তুলে নিয়েছিলেন। সূরা ৪ আন-নিসা, আয়াত ১৫৬-১৫৮:

"এবং তাদের অবিশ্বাস এবং মরিয়মের বিরুদ্ধে তাদের বিরাট অপবাদ বলার জন্য। এবং তাদের এই কথার জন্য যে, "আমরা আল্লাহর রাসূল মরিয়মের পুত্র মসীহ ঈসাকে হত্যা করেছি।" তারা তাকে হত্যা করেনি, ক্রুশেও চড়ায়নি; বরং তাদের কাছে তার অনুরূপ করা হয়েছিল... বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে তুলে নিয়েছেন।"

হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া মানে হত্যা করা, এই ভুল খ্রিস্টান বিশ্বাস নিজেই অদ্ভুত কারণ একজন প্রকৃত ঐশ্বরিক সত্তা মৃত্যু অনুভব করার চেয়ে অনেক বেশি দূরে। যদি কোন সত্তা মারা যেতে পারে, তবে তা ঐশ্বরিক হতে পারে

না। তাই বাস্তবে, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে তাদের ভুল বিশ্বাস তাঁর ঐশ্বরিকতা সম্পর্কে তাদের ভুল বিশ্বাসকে অস্বীকার করে।

স্বভাবতই একটি ঐশ্বরিক সত্তা এমন একটি জিনিস যা স্বয়ংসম্পূর্ণ, অর্থাৎ তাদের অন্য কারো দ্বারা তাদের প্রতিপালনের প্রয়োজন হয় না। যদি একটি সত্তা অন্য কারো দ্বারা প্রতিপালিত হয় তবে তারা ঐশ্বরিক হতে পারে না। নবী ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মা মরিয়ম (আঃ) উভয়ই ঐশ্বরিক সত্তা ছিলেন না কারণ তাদের মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুষ্টির প্রয়োজন ছিল, অর্থাৎ তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা ছিলেন না। ৫ম অধ্যায় আল মায়িদা, আয়াত ৭৫:

"মরিয়মপুত্র মসীহ একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না; তাঁর পূর্বে আরও রসূল গত হয়ে গেছেন। আর তাঁর মা ছিলেন সত্যবাদী। তাঁরা দুজনেই খাবার খেতেন। দেখো, আমি কীভাবে তাদের কাছে নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করি; তারপর দেখো, কীভাবে তারা বিভ্রান্ত হয়।"

তাছাড়া, কেউ দাবি করতে পারে না যে, যেহেতু ফেরেশতারা খায় না, তাই তাদেরকে ঈশ্বর হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বাস্তবে, তাদেরকেও আল্লাহ তাআলা ভিন্নভাবে রিযিক দান করেন, তাই তারাও স্বয়ংসম্পূর্ণ নন। অন্যান্য সৃষ্টির মতোই তাদেরকেও সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মৃত্যু ভোগ করতে হবে, এই সত্যই দেবত্বকে অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট।

একজন জৈবিক শিশু তার পিতামাতার সাথে সর্বদা কিছু বৈশিষ্ট্য ভাগ করে নেবে। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রে, তিনি মহান আল্লাহর সাথে কোন গুণাবলী ভাগ করে নিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে, তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য অন্যান্য মানুষের

সাথে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে খাদ্য ও জল দ্বারা লালন-পালন করা হয়েছে, সে মারা যাবে এবং পুনরুত্থিত হবে, ঠিক অন্যান্য সমস্ত মানুষের মতো। তার বৈশিষ্ট্যগুলি ঐশ্বরিকতাকে অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট।

খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারী রোমানরা তাদের ধর্মে নবী ঈসা (আঃ)-এর ঐশ্বরিক অস্তিত্বের ধারণা প্রবর্তন করে, যা তারা তাদের পূর্বের ধর্ম, পৌত্তলিকতা থেকে ধারণ করেছিল। তারা একজন মহান ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত নবী (সাঃ)-কে গ্রহণ করে জিউস, হারকিউলিস এবং ওডেনের মতো উপকথা এবং পৌরাণিক কাহিনীর সাথে যুক্ত করে। কেবলমাত্র সামান্য সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় এটি বোঝার জন্য যে, যে সত্তা অন্য কারো দ্বারা সৃষ্ট, প্রতিপালিত এবং মারা যেতে পারে, সে কখনও ঐশ্বরিক হতে পারে না, কারণ এই বিষয়গুলি ঐশ্বরিক সত্তার গুণাবলীর বিরোধিতা করে।

বিশ্বের দাসরা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে বিতর্ক করার পর, একটি খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণ করেনি বরং তার সাথে শান্তি চুক্তিতে সম্মত হয়েছিল। প্রতিনিধিদলটি যখন মদিনা ত্যাগ করে, তখন দুই ভাই, আবু হারিসা এবং কুরজ বিন আলকামা, একে অপরের কাছাকাছি চড়ে ছিলেন। আবু হারিসার খচ্চর হোঁচট খেয়ে পড়ে এবং কুরজ হতাশায় পরোক্ষভাবে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে তিরস্কার করে। জবাবে আবু হারিসা তাকে তিরস্কার করেন। কুরজ যখন তার উত্তর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন আবু হারিসা তাকে বলেন যে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-ই নিঃসন্দেহে শেষ নবী, যার জন্য তারা অপেক্ষা করছিলেন এবং যাঁর কথা তাদের ঐশী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কুরজ যখন তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কেন ইসলামকে সত্য বলে জানলেও প্রত্যাখ্যান করেন, তখন আবু হারিসা উত্তর দেন যে, তিনি তাদের সম্প্রদায় কর্তৃক প্রদত্ত সম্মান, সম্পদ এবং কর্তৃত্বের কারণে তা করেছেন এবং তিনি ভয় পান যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি সবকিছু হারাতে পারেন। আবু হারিসার কথা শুনে কুরজ অনেক চিন্তাভাবনা করেন এবং অবশেষে তিনি মদিনায় ফিরে আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৭৫-৭৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলাম মুসলমানদের শিক্ষা দেয় যে, বস্তুজগৎ থেকে কিছু লাভের জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে কখনও আপস করা উচিত নয়। অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ১৩৫:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদান করো, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়..."

যেহেতু বস্তুজগৎ ক্ষণস্থায়ী, তাই এখান থেকে যা কিছু লাভ হবে তা অবশেষে বিলীন হয়ে যাবে এবং পরকালে তাদের কর্ম ও মনোভাবের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে। অন্যদিকে, ঈমান হলো সেই মূল্যবান রত্ন যা একজন মুসলিমকে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নিরাপদে পরিচালিত করে। অতএব, ক্ষণস্থায়ী জিনিসের জন্য অধিকতর কল্যাণকর এবং স্থায়ী জিনিসের সাথে আপস করা স্পষ্ট বোকামি।

অনেক মানুষ, বিশেষ করে নারীরা, তাদের জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত দেখতে পাবেন যেখানে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপোষ করা উচিত কিনা তা বেছে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ক্ষেত্রে একজন মুসলিম মহিলা বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি যদি তার স্কার্ফ খুলে নির্দিষ্ট পোশাক পরেন তবে তিনি কর্মক্ষেত্রে আরও সম্মানিত হবেন এবং এমনকি আরও দ্রুত কর্পোরেট সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারবেন। একইভাবে, কর্পোরেট জগতে কাজের সময় পরে সহকর্মীদের সাথে মেলামেশা করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই একজন মুসলিম হয়তো কাজের পরে কোনও পাব বা ক্লাবে আমন্ত্রিত হতে পারেন।

এইরকম সময়ে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে চূড়ান্ত বিজয় এবং সাফল্য কেবল তাদেরই লাভ হবে যারা ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকবে। যারা এইভাবে কাজ করবে তাদের পার্থিব এবং ধর্মীয় সাফল্য দেওয়া হবে। তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাদের পার্থিব সাফল্য তাদের জন্য বোঝা হয়ে উঠবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি মহান আল্লাহর কাছে মানবজাতির মধ্যে তাদের মর্যাদা এবং স্মরণ বৃদ্ধির একটি উপায় হয়ে উঠবে। এর উদাহরণ হল ইসলামের সঠিক নির্দেশিত খলিফারা। তারা তাদের ঈমানের সাথে আপস করেননি এবং বরং তাদের জীবনকাল ধরে অবিচল ছিলেন এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদেরকে একটি পার্থিব এবং ধর্মীয় সাম্রাজ্য দান করেছিলেন।

সাফল্যের অন্য সকল রূপ খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং আজ হোক কাল হোক, এগুলো এর ধারকদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কেবল সেইসব সেলিব্রিটিদের লক্ষ্য করা উচিত যারা খ্যাতি এবং ভাগ্য অর্জনের জন্য তাদের আদর্শ এবং বিশ্বাসের সাথে আপোষ করেছিলেন, কারণ এই বিষয়গুলি তাদের দুঃখ, উদ্বেগ, বিষণ্নতা, মাদকাসক্তি এমনকি আত্মহত্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই দুটি পথের উপর একবার চিন্তা করুন এবং তারপর সিদ্ধান্ত নিন কোনটি পছন্দ করা উচিত এবং বেছে নেওয়া উচিত।

বিশ্বাসযোগ্য

নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, একটি প্রতিনিধি দল নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে দেখা করতে আসে। নাজরানের এই প্রতিনিধিদল নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অনুরোধ করে যে, তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে তাদের কাছে পাঠান। সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, এই ব্যক্তি হতে চেয়েছিলেন কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রাঃ)-কে বেছে নিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি তাঁর জাতির মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৭১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ২৭৪৯ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকির একটি দিক।

এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ এবং মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত সকল আমানত। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি আমানত তাদের উপর অর্পণ করেছেন। এই আমানত পূরণের একমাত্র উপায় হল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমানতগুলো ব্যবহার করা। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা এবং রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আমানত পাবে, কারণ এটিই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"আর [স্মরণ করো] যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের [নেয়ামত] বৃদ্ধি করব..."

মানুষের মধ্যে আমানতও পালন করা গুরুত্বপূর্ণ। যার উপর অন্য কারো জিনিসপত্রের আমানত রাখা হয়েছে, তার উচিত সেগুলোর অপব্যবহার করা নয় এবং কেবল মালিকের ইচ্ছানুযায়ী সেগুলো ব্যবহার করা। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আমানতের মধ্যে একটি হল কথোপকথন গোপন রাখা, যদি না অন্যদের জানানোর মাধ্যমে কিছু সুস্পষ্ট লাভ হয়। দুর্ভাগ্যবশত, মুসলমানদের মধ্যে এটি প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়। তাদের এবং মানুষের মধ্যে আমানতগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যেভাবে তারা চায় অন্যরা তাদের মধ্যে থাকা আমানতগুলির সাথে আচরণ করুক।

এছাড়াও, এই ট্রাস্টগুলির মধ্যে একজনের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যেমন নির্ভরশীল ব্যক্তিরা। একজন মুসলিমকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে এই ব্যক্তিদের অধিকার পূরণের মাধ্যমে এই ট্রাস্টগুলি পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতার উপর কর্তব্য হল তাদের সন্তানদের পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য শেখা, বোঝা এবং তার উপর আমল করতে উৎসাহিত করা।

অশুভ পরিকল্পনা উল্টোপাল্টা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, বনু আমিরের একটি প্রতিনিধিদল নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে দেখা করতে আসে। তিনজন ব্যক্তি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে এসেছিলেন, তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা এবং শহীদ করার উদ্দেশ্যে। আমির বিন তুফায়েল তার দুষ্ট বন্ধু আল আরবাদকে তাঁর উপর আক্রমণ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে বিভ্রান্ত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। আল আরবাদ আক্রমণ শুরু করতে ব্যর্থ হলে, আমির বিন তুফায়েল চক্রান্ত ছেড়ে দেন এবং পরিবর্তে মৌখিকভাবে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে হুমকি দেন, যিনি আল্লাহকে, পরাক্রমশালী, আমির বিন তুফায়েলের যত্ন নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। মদিনা ছেড়ে যাওয়ার পর, আমির আল আরবাদকে আক্রমণ না করার জন্য তিরস্কার করেন কিন্তু তিনি উত্তর দেন যে প্রতিবার আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তিনি কেবল আমিরকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতেন। এটি আসলে ঐশ্বরিক সুরক্ষা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বাড়ি ফেরার পথে, আমিরের ঘাড়ে সংক্রমণ হয় যা শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু ঘটায়। অবশেষে আল আরবাদ বজ্রপাতের শিকার হন এবং মারা যান। এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ ১৩ নম্বর সূরা আর রা'দের আয়াত ১৩ নাযিল করেন:

"আর বজ্র তাঁর প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে- এবং ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে- এবং তিনি বজ্রপাত প্রেরণ করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে আঘাত করেন, যখন তারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে; আর তিনি কঠোর শাস্তিদাতা।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৬-৮০-তে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

কখনোই খারাপ কাজ করার চক্রান্ত করা উচিত নয় কারণ এটি সর্বদা, এক বা অন্যভাবে, তাদের উপরই আঘাত হানবে। এমনকি যদি এই পরিণতিগুলি পরবর্তী জগতে বিলম্বিত হয় তবে তারা অবশেষে এর মুখোমুখি হবে। উদাহরণস্বরূপ, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন যেমন তারা তাদের পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং স্নেহ কামনা করেছিলেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তাদের চক্রান্ত তাদের তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১৮:

"এবং তারা তার জামার উপর মিথ্যা রক্ত আনল। [ইয়াকুব] বলল, "বরং তোমাদের আত্মা তোমাদেরকে কিছু একটার প্রতি প্ররোচিত করেছে, তাই ধৈর্যই সবচেয়ে উপযুক্ত..."

যে যত বেশি মন্দ চক্রান্ত করবে, আল্লাহ তাআলা তত বেশি তাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। এমনকি যদি তারা বাহ্যিকভাবে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে, তবুও আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য উভয় জগতে অভিশাপ হিসেবে তাদের আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটিকেই পরিণত করবেন, যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ৪৩:

"...কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজস্ব লোকদের ছাড়া আর কাউকে ঘিরে রাখে না। তাহলে তারা কি পূর্ববর্তী লোকদের পথ [অর্থাৎ, ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করছে?..."

মহৎ চরিত্র জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, একটি অমুসলিম গোত্রকে যুদ্ধবন্দী করে মদিনায় আনা হয়েছিল। তাদের মধ্যে হাতেম আল তাইয়ের কন্যাও ছিলেন। তিনি যখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে হেঁটে যেতে দেখলেন, তখন তিনি তাকে মুক্তি দিতে এবং আরব গোত্রগুলির বিদ্বেষপূর্ণ আনন্দ থেকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করলেন, কারণ তিনি ছিলেন তাদের জাতির নেতার কন্যা। এরপর তিনি তার পিতার কিছু গুণাবলীর কথা উল্লেখ করলেন: তিনি তাদের পবিত্র জিনিসপত্রের রক্ষক ছিলেন, তিনি দুস্থদের সাহায্য করতেন, ক্ষুধার্তদের খাওয়াতেন, উলঙ্গদের পোশাক পরাতেন, উদার আতিথেয়তা দিতেন, সর্বোত্তম খাবার সরবরাহ করতেন, শান্তি ছড়িয়ে দিতেন এবং অভাবীদের অনুরোধ কখনও প্রত্যাখ্যান করতেন না। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন যে এটিই একজন সত্যিকারের মুমিনের বর্ণনা, যদিও হাতেম আল তাই মুসলিম ছিলেন না। এরপর তিনি তার কন্যার মুক্তি ঘোষণা করেন এবং মন্তব্য করেন যে তার পিতা এমন একজন ব্যক্তি যিনি মহৎ চরিত্রের গুণাবলী পছন্দ করেন এবং মহান আল্লাহ মহৎ চরিত্রের গুণাবলী পছন্দ করেন। তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মহৎ চরিত্র ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৯২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, ২০০৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, বিচার দিবসের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে উত্তম চরিত্র। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এর ফলে একজন ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করতে পারবে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এর সারমর্ম হল ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করা।

মূল হাদিসটিতে মানুষের প্রতি ভালো চরিত্র প্রদর্শনের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম আল্লাহর প্রতি বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালনের চেষ্টা করে, কিন্তু অন্যদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে দ্বিতীয় দিকটি উপেক্ষা করে। তারা এর গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়। জামে আত তিরমিযী, ২৫১৫ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে পরামর্শ দেয় যে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে অন্যদের জন্য যা পছন্দ করে তা নিজের জন্য পছন্দ করে। অর্থাৎ, যেভাবে একজন ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে সদয় আচরণ পেতে চায়, তাকে অন্যদের সাথেও ভালো চরিত্রের সাথে আচরণ করতে হবে।

তাছাড়া, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন ও মুসলিম হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার ধর্ম নির্বিশেষে অন্যদের এবং তাদের সম্পদের উপর তার মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি থেকে দূরে থাকে। সুনানে আন নাসায়ীর ৪৯৯৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ৩৩১৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, একজন মহিলা জাহান্নামে প্রবেশ করবে কারণ সে একটি বিড়ালের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে যার ফলে বিড়ালটি মারা গেছে। সুনানে আবু দাউদের ২৫৫০ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, একজন পুরুষকে ক্ষমা করা হয়েছে কারণ সে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে খাওয়ায়। যদি এটি ভালো চরিত্র দেখানোর ফলাফল এবং পশুদের প্রতি খারাপ চরিত্র দেখানোর ফলাফল হয়, তাহলে কি কেউ কল্পনা করতে পারে যে, আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি ভালো চরিত্র দেখানোর গুরুত্ব কত? প্রকৃতপক্ষে, আলোচিত মূল হাদিসটি এই উপদেশ দিয়ে শেষ হয়েছে যে, যার ভালো চরিত্র আছে সে সেই মুসলিমের মতোই পুরস্কৃত হবে যে অবিরাম আল্লাহর ইবাদত করে এবং নিয়মিত রোজা রাখে।

পরিশেষে, মূল হাদিস অনুসারে, যদি ভালো চরিত্র একজন ব্যক্তির পক্ষে বিচার দিবসের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হয়, তাহলে এর অর্থ হল একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচার দিবসের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে খারাপ চরিত্র। মহান আল্লাহর প্রতি, তাঁর আন্তরিকভাবে আনুগত্য না করার মাধ্যমে, এবং সৃষ্টির প্রতি, অন্যদের দ্বারা যেভাবে আচরণ করা হোক তা না করার মাধ্যমে, খারাপ আচরণ করা।

নম্রতার মধ্যে প্রকৃত সম্মান

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, একজন সুপরিচিত খ্রিস্টান পণ্ডিত, যিনি অবশেষে মুসলিম হয়েছিলেন, আদি বিন হাতেম, ইসলাম গ্রহণের আগে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁর সাথে দেখা করার পর, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যান। পথে, একজন বৃদ্ধ প্রতিবন্ধী মহিলা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে থামিয়ে দেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ তার সাথে আলোচনা এবং তার সমস্যা সমাধানের জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই দীর্ঘ কথোপকথনের সময়, আদি বিন হাতেম, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, নিজেকে বলেছিলেন যে এটি কোনও পার্থিব রাজার আচরণ নয়। তাঁর বাড়িতে পৌঁছানোর পর, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) জোর দিয়েছিলেন যে আদি, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, যখন তিনি নিজেই মেঝেতে বসেছিলেন। আদি, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, আবার নিজেকে বলেছিলেন যে এটি কোনও পার্থিব রাজার আচরণ নয়। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটি ২৫ নম্বর সূরা আল ফুরকানের ৬৩ নম্বর আয়াতের সাথে সম্পর্কিত:

"আর দয়াময়ের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করে..."

আল্লাহর বান্দারা বুঝতে পেরেছেন যে, তাদের কাছে যা কিছু ভালো আছে তা কেবল আল্লাহ তাআলার দানেই। আর যে কোন মন্দ থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে তা হলো আল্লাহ তাআলা তাদের রক্ষা করেছেন। যা কারোর নয়, তা নিয়ে গর্ব করা কি বোকামি নয়? ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি স্পোর্টস কার নিয়ে গর্ব করে না যা

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে বাস্তবে কিছুই তাদের নয়। এই মনোভাব নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি সর্বদা বিনয়ী থাকে। আল্লাহর বিনীত বান্দারা সহীহ বুখারী, ৫৬৭৩ নম্বরে পাওয়া নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসে পূর্ণ বিশ্বাস করেন, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কোনও ব্যক্তির সৎকর্ম তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। কেবলমাত্র আল্লাহর রহমতই এটি ঘটাতে পারে। কারণ প্রতিটি সৎকর্ম তখনই সম্ভব যখন আল্লাহ তায়ালা তাকে জ্ঞান, শক্তি, সুযোগ এবং অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। এমনকি কাজের গ্রহণযোগ্যতাও নির্ভরশীল। মহান আল্লাহর রহমতের উপর। যখন কেউ এই কথাটি মনে রাখে, তখন এটি তাদের অহংকার থেকে রক্ষা করে এবং নম্রতা গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে। সর্বদা মনে রাখা উচিত যে নম্র হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ নয় কারণ ইসলাম প্রয়োজনে আত্মরক্ষা করার জন্য উৎসাহিত করেছে। অন্য কথায়, ইসলাম মুসলমানদের দুর্বলতা ছাড়াই নম্র হতে শেখায়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, ২০২৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যে কেউ মহান আল্লাহর সামনে নিজেকে বিনীত করে, তিনি তাকে উত্থিত করবেন। তাই বাস্তবে, নম্রতা উভয় জগতে সম্মানের দিকে পরিচালিত করে। এই সত্যটি বোঝার জন্য কেবল সৃষ্টির সবচেয়ে বিনয়ী ব্যক্তি, অর্থাৎ মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর চিন্তা করা প্রয়োজন। মহান আল্লাহ, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই গুরুত্বপূর্ণ গুণটি গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে মানুষকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা ২৬ আশ শু'আরা, আয়াত ২১৫:

"আর যারা তোমার অনুসরণকারী মুমিন, তাদের প্রতি তোমার ডানা নত করো [অর্থাৎ, দয়া দেখাও]।"

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিনয়ী জীবনযাপন করতেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি আনন্দের সাথে ঘরের কাজকর্ম সম্পাদন করতেন এবং প্রমাণ করতেন যে এই

কাজগুলি পুরুষ-পুরুষের উপর নির্ভরশীল নয়। ইমাম বুখারীর "আদাব আল মুফরাদ", ৫৩৮ নম্বর গ্রন্থে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

২৫ নম্বর সূরা আল ফুরকানের ৬৩ নম্বর আয়াতে দেখানো হয়েছে যে, নম্রতা হলো একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য যা বাইরের দিকে প্রকাশিত হয়, যেমন একজন ব্যক্তি কীভাবে হাঁটেন। ৩১ নম্বর সূরা লুকমানের ১৮ নম্বর আয়াতে এটি আলোচনা করা হয়েছে:

"আর মানুষের প্রতি তোমার গাল [অপমানে] ঘুরিয়ে দিও না এবং পৃথিবীতে উল্লাস করে চলাফেরা করো না..."

মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, জান্নাত সেই বিনয়ী বান্দাদের জন্য যাদের মধ্যে অহংকার নেই। সূরা ২৮, আল-কাসাস, আয়াত ৮৩:

"যারা পৃথিবীতে মর্যাদা বা দুর্নীতি চায় না, তাদের জন্যই আমরা পরকালের সেই ঘর নির্ধারণ করি। আর [সর্বোত্তম] পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ১৯৯৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যার অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালারই গর্ব করার অধিকার রয়েছে কারণ তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং মালিক।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, অহংকার হলো যখন কেউ নিজেকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং যখন সত্য তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন তা প্রত্যাখ্যান করে কারণ তারা তাদের ব্যতীত অন্যদের কাছ থেকে আসা সত্য গ্রহণ করতে অপছন্দ করে। সুনানে আবু দাউদের ৪০৯২ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মুসলমানদের অধিকার

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, জারির বিন আব্দুল্লাহ আল বাজালি নামে এক ব্যক্তি মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের সময়, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে ফরজ নামাজ আদায়, যাকাত প্রদান এবং সকল মুসলমানের প্রতি অনুগত থাকার অঙ্গীকার করতে বলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১০৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আজকের যুগে, মুসলমানরা প্রায়শই এই অঙ্গীকারে উল্লেখিত প্রথম দুটি বিষয়ের প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দেয়, যথা: ফরজ নামাজ এবং ফরজ যাকাত, কিন্তু তারা প্রায়শই সকল মুসলমানের প্রতি আন্তরিক এবং অনুগত থাকাকে উপেক্ষা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই দায়িত্বকে ইসলামের দুটি স্তম্ভের সাথে যুক্ত করেছেন, তা ইঙ্গিত দেয় যে এটি পালন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, মুসলমানদের সর্বদা অন্যান্য মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত। এটি সকল মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য, তারা আত্মীয় হোক বা না হোক, তারা একে অপরকে চেনে বা না জানুক। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসে মুসলমানদের অনেক অধিকার উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রতিটি মুসলমানের উচিত সেগুলি শেখা এবং পালন করার চেষ্টা করা। উদাহরণস্বরূপ, সহিহ বুখারীতে ১২৪০ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন মুসলমানের প্রতি অন্য মুসলমানের পাঁচটি অধিকারের তালিকা দিয়েছেন।

প্রথমত, তাদের শান্তির অভিবাদনের জবাব দিতে হবে, এমনকি যদি উত্তর দেওয়া তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, একজন মুসলিমকে তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্যদের প্রতি শান্তি ও দয়া প্রদর্শন করে কার্যত

শান্তির ইসলামী অভিবাদন পূরণ করতে হবে। এটাই হলো শান্তির ইসলামী অভিবাদনের প্রকৃত অর্থ।

একজন মুসলিমের উচিত অসুস্থ মুসলিমদের শারীরিক ও মানসিক সহায়তা প্রদানের জন্য তাদের দেখতে যাওয়া। সকল অসুস্থ মুসলিমদের দেখতে যাওয়া কঠিন হবে, কিন্তু যদি প্রতিটি মুসলিম অন্তত তাদের অসুস্থ আত্মীয়দের দেখতে যায়, তাহলে বেশিরভাগ অসুস্থ ব্যক্তিই এই সহায়তা পাবে। সকল ধরণের অনর্থক বা পাপপূর্ণ কথাবার্তা এবং কাজ যেমন পরচর্চা এড়িয়ে চলতে হবে, অন্যথায় একজন মুসলিম কেবল আশীর্বাদের পরিবর্তে পাপই অর্জন করবে।

একজন মুসলিমের যখনই সম্ভব হবে তখনই অন্য মুসলিমের জানাজায় অংশগ্রহণ করা উচিত, কারণ প্রত্যেকেই মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। অতএব, যত বেশি মুসলিম উপস্থিত থাকবেন ততই ভালো। ঠিক যেমন কেউ চায় যে অন্যরা তাদের জানাজায় অংশগ্রহণ করুক এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করুক, তেমনি তাদেরও অন্যদের জন্যও এটি করা উচিত। এই বিশেষ আমলটি একজন মুসলিমের জন্য একটি ভালো স্মারক যে তাদেরও অবশেষে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আশা করা যায়, এটি তাদের আচরণকে আরও ভালোভাবে পরিবর্তন করবে যাতে তারা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে তাদের নিজের মৃত্যুর জন্য আরও ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে।

আলোচ্য মূল হাদিসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, মুসলমানদের খাবার এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের দাওয়াত গ্রহণ করা উচিত যতক্ষণ না কোনও অবৈধ বা অপছন্দনীয় কার্যকলাপ সংঘটিত হয়, যা বর্তমান যুগে খুবই বিরল। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয় যে, কিছু মুসলিম এমন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন যেখানে অবৈধ বা অপছন্দনীয় ঘটনা ঘটে

এবং তাদের কর্মের সমর্থনে এই হাদিসটি উদ্‌ধৃত করেন। নিজেদের ইচ্ছা পূরণের জন্য ঐশী শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করা উচিত নয় কারণ এটি স্পষ্ট বিভ্রান্তি এবং ঐশী শাস্তির আমন্ত্রণ।

পরিশেষে, মূল হাদিসটি মুসলমানদেরকে হাঁচি দেওয়ার পর আল্লাহর প্রশংসাকারী মুসলমানের জন্য দো'আ করার পরামর্শ দিয়ে শেষ করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী শরীফের ২৭১৪ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্তব্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন, যা হল অন্যান্য মুসলমানদের সৎ ও আন্তরিক উপদেশ দেওয়া।

প্রথমত, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ধর্মবিশ্বাস নির্বিশেষে সকলকে সৎ উপদেশ দেওয়া উচিত। সুনানে আন নাসায়ী, ৪২০৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে স্পষ্টভাবে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে ঠিক সেইভাবে উপদেশ দেওয়া যেভাবে তারা চায় যে অন্যরা তাদের উপদেশ দিক। তাদের বিদ্বেষপূর্ণ অনুভূতি তাদের এই দায়িত্ব পালনে বাধা হতে দেওয়া উচিত নয় কারণ যারা ইচ্ছাকৃতভাবে খারাপ উপদেশ দেয় তারা দেখতে পাবে যে লোকেরা তাদেরকে ভুল উপদেশ দেবে। আন্তরিক উপদেশ দেওয়া এত গুরুত্বপূর্ণ যে, জামে আত তিরমিযী, ১৯২৫ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) নামাযের মতো ফরজ কর্তব্য পালনের সাথে সাথে এই দায়িত্ব পালনের জন্য মানুষের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিতেন। অন্যদেরকে আন্তরিকভাবে উপদেশ দেওয়াকে এই ফরজ কর্তব্যের সাথে যুক্ত করা হয়েছে, তা এর গুরুত্ব তুলে ধরে। তাই একজন মুসলিমের কখনোই এই সত্যটিকে উপেক্ষা করা উচিত নয়।

প্রত্যেক ব্যক্তি, বিশ্বাস যাই হোক না কেন, এমন জিনিস পেতে ভালোবাসে যা তাদের উপকার করে এবং ক্ষতিকর জিনিস থেকে রক্ষা করে। জামে আত তিরমিযী, ২৫১৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে অন্য মুসলমানদের জন্য সেই জিনিস পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। এটি তার কর্মের মাধ্যমে দেখানো উচিত, যাতে অন্যরা যে কোনও উপায়ে নিজের জন্য পছন্দ করে তা নিশ্চিত করে। একজন মুসলিমের কেবল তাদের কথার মাধ্যমে এটি দাবি করা উচিত নয়।

আরেকটি অধিকার হল তাদের জন্য আন্তরিকভাবে দুআ করা। এটি একে অপরের প্রতি করুণার একটি দিক যা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আল ফাতহ, আয়াত ২৯:

" মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; এবং তাঁর সাথে যারা আছেন তারা... নিজেদের মধ্যে দয়ালু..."

প্রকৃতপক্ষে, যখন একজন মুসলিম অন্যের জন্য দুআ করে, তখন তারা নিজেই এর দ্বারা উপকৃত হয়। সহীহ মুসলিমের ৬৯২৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, যখন একজন মুসলিম অন্য মুসলমানের জন্য গোপনে দুআ করে, তখন একজন ফেরেশতা তাদের জন্য দুআ করেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হল, একজন মুসলিমের উচিত অন্য মুসলিমদের জন্যও তাই ভালোবাসতে হবে যা সে নিজের জন্য ভালোবাসে এবং ঘৃণা করে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৫১৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে আন্তরিক বিশ্বাসের শর্ত হিসেবে এটিকে নির্ধারণ করেছেন।

একজন মুসলিমের উচিত অন্য মুসলিমের বৈধ আনন্দে খুশি হওয়া এবং আশা করা উচিত যে এটি তাদের জন্য স্থায়ী হবে। অন্য মুসলিম যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তাদের দুঃখিত হওয়া উচিত এবং তাদের পক্ষে কেবল একটি প্রার্থনা হলেও তা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করা উচিত। এই কারণেই সহিহ বুখারির ৬০১১ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মুসলিমরা একটি দেহের মতো। যদি শরীরের একটি অংশ অসুস্থ থাকে, তাহলে বাকি দেহও সেই যন্ত্রণার অংশীদার হয়।

একজন মুসলিমের কখনোই অন্য মুসলিম বা অমুসলিমকে তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে অযৌক্তিক ক্ষতি করা উচিত নয় কারণ এটিই একজন মুসলিমের সংজ্ঞা, যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৬২৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, মানুষকে নিজের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা একজন ব্যক্তি নিজের প্রতি করা দান। সহীহ মুসলিম, ২৫০ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি নিজের প্রতি দান কারণ এটি তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করে।

অন্যান্য মুসলমানদের অধিকারের মধ্যে রয়েছে তাদের পথ থেকে যেকোনো বাধা অপসারণ করা। এর মধ্যে রয়েছে শারীরিক বাধা এবং রূপক বাধা যা তাদের ক্ষতি করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, সহিহ মুসলিমের ৬৬৭০ নম্বর হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, একজন ব্যক্তিকে এমন একটি গাছ অপসারণের জন্য জান্নাত দেওয়া হবে যা সহ-মুসলিমদের পথ আটকে রেখেছিল।

একজন মুসলিমের অধিকার হলো অন্য মুসলিমরা যখন নির্যাতিত হয়, তখন তাদের সাহায্য করা, যেমন আর্থিক সাহায্য, এবং যারা নিপীড়ন করে তাদের এই আচরণের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে সাহায্য করা। সহীহ বুখারীতে ৬৯৫২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, উপদেশদাতা কেবল তখনই উপদেশ দেওয়া উচিত যদি উপদেষ্টা অত্যাচারীর ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকেন।

পার্থিব কারণে একজন মুসলিমের অন্য মুসলিমের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করার অনুমতি নেই। জামে আত তিরমিযী, ১৯৩২ নম্বরে পাওয়া হাদিসের মতো অনেক হাদিসে এটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এভাবে অন্য মুসলিমের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এতটাই গুরুতর বিষয় যে, সুনানে ইবনে মাজা, ১৭৪০ নম্বরে পাওয়া হাদিসে মহানবী (সা.) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার সকল মুসলিমকে ক্ষমা করেন, কেবল সেইসব মুসলিমদের ছাড়া যারা অন্য মুসলিমকে ত্যাগ করেছে যতক্ষণ না তারা পুনর্মিলন করে।

আরেকটি অধিকার হলো, একজন মুসলিমের অন্য মুসলিমদের সাথে অহংকারী আচরণ করা উচিত নয়। বরং, তাদের নম্রতা প্রদর্শন করা উচিত যা সর্বদা সমাজের মধ্যে স্নেহ এবং ভালোবাসার প্রসার ঘটায়। সুনানে আবু দাউদের ৪৮৯৫ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিপরীতে, অহংকার এবং অহংকার কেবল সামাজিক বাধা এবং সমাজের বিচ্ছিন্নতার দিকে পরিচালিত করে। যদি একজন মুসলিমের সাথে অহংকারপূর্ণ আচরণ করা হয়, তাহলে তাদের একইভাবে উত্তর দেওয়া উচিত নয় বরং তাদের ধৈর্য এবং ক্ষমা অবলম্বন করা উচিত।

প্রকৃতপক্ষে, অন্যদের সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে তাদের প্রতি বিনয়ী হওয়া মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একটি বৈশিষ্ট্য। সুনানে আন নাসায়ী, ১৪১৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি দরিদ্র ও অভাবীদের চাহিদা পূরণের জন্য তাদের সাথে হাঁটা কখনও অপছন্দ করতেন না।

একজন মুসলিমের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা অন্য মুসলিমদের সম্পর্কে গুজব বা পরচর্চায় কখনোই মনোযোগ না দেয় কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা অথবা কিছু তথ্যের সাথে মিশে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে, কারো মন্দ ইচ্ছা পূরণের জন্য সত্যকেও প্রেক্ষাপটের বাইরে বিকৃত করা হয়। একজন মুসলিমের উচিত যা বলা হয়েছে তা উপেক্ষা করা এবং পরচর্চাকারীকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া। তাদের কখনও অন্যদের কাছে পরচর্চার পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয় এবং পরচর্চাকারীর কথা অন্যদের কাছে উল্লেখ করা উচিত নয়। এটি গোপন করে তাদের আশা করা উচিত যে মহান আল্লাহ উভয় জগতেই তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। জামে আত তিরমিযী, ১৯৩০ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও, একজন মুসলিমের কখনোই অন্য মুসলিমদের গীবত করা বা অপবাদ দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি মহাপাপ। বাস্তবে, সহীহ মুসলিমের ২৯০ নম্বর হাদিসে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, গীবতকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো অন্য মুসলিমদের যেকোনো বিপদ থেকে সাহায্য করার জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করা। সুনানে ইবনে মাজাহের ২২৫ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, যে কেউ এটি করবে, কিয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর হবে। একই হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, যে কেউ অন্য

মুসলিমের আর্থিক বোঝা দূর করবে, আল্লাহ তাআলা উভয় জাহানেই তাকে কষ্ট দূর করবেন। তাই মুসলিমদের উচিত তাদের প্রতি সদয় হওয়া যারা তাদের কাছে ঋণী।

একজন মুসলিমের অন্য মুসলিমদের উপর আরেকটি অধিকার হল, যদি কোন মুসলিম অন্য মুসলিমের উপর অন্যায় করে এবং তারপর তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চায়, তাহলে ভুক্তভোগী ব্যক্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। এর ফলে আল্লাহ ভুক্তভোগী ব্যক্তিকে তাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন। সূরা ২৪ আন নূর, আয়াত ২২:

"... এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন..."

প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিমের ৬৫৯২ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ক্ষমা করে, সে অধিক সম্মানিত হবে।

এছাড়াও, একজন মুসলিমের উচিত অন্য মুসলিমদের সাথে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করা, যা জামে আত তিরমিযী, ১৯২১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থ, বড়দের সাথে সম্মানের সাথে এবং ছোটদের সাথে দয়ার সাথে আচরণ করা উচিত। এই হাদিসটি সতর্ক করে যে যারা এই ধরণের আচরণ করে না তারা মহানবী (সা.)-এর আদর্শের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে, ইমাম বুখারীর "আদাব আল মুফরাদ", ৩৫৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে, মহান আল্লাহকে সম্মান করার একটি অংশ হল বৃদ্ধদের

প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। সকল মানুষই মহান আল্লাহর সৃষ্টির অংশ, তাই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সম্মান করা আসলে স্রষ্টা, অর্থাৎ মহান আল্লাহকে সম্মান করা।

ইসলাম মুসলমানদের শিক্ষা দেয় যে তারা যা দান করে, তাই তারা পাবে। জামে আত তিরমিযী, ২০২২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যখন একজন যুবক কোন বয়স্ক ব্যক্তিকে তার বয়সের কারণে সম্মান ও সম্মান করে, তখন আল্লাহ, মহান, তাকে সম্মান করার জন্য কাউকে নিযুক্ত করবেন, যদি তারা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছায়।

একজন মুসলিমের অন্য মুসলিমদের প্রতি আরেকটি অধিকার হল, যতক্ষণ পর্যন্ত পাপ থেকে বিরত থাকা যায়, ততক্ষণ তাদের সাথে হাসিখুশি থাকা। প্রকৃতপক্ষে, অন্য মুসলিমকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য হাসিমুখে দেখাও একটি দান হিসেবে লিপিবদ্ধ। জামে আত তিরমিযী, ১৯৫৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, ২৪৮৮ নং হাদিসে যে ব্যক্তি সহজে ব্যবহারযোগ্য, অন্য মুসলমানদের প্রতি নরম এবং নম্র আচরণ করে, তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। হাসিখুশি থাকার একটি অংশ হলো অন্যদের সাথে সদয়ভাবে কথা বলা। এটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারী, ৭৫১২ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, এটি এমন একটি কাজ যা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি এই কাজটি করে তাকে জামে আত তিরমিযী, ১৯৮৪ নং হাদিসে জান্নাতে একটি সুন্দর কক্ষের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

মুসলমানদের উপর কর্তব্য হলো তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্য মুসলমানদের মধ্যে সমস্যা সমাধান করা। বস্তুত, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৫০৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, এটি করা নফল নামাজ, রোজা বা দান-খয়রাতের চেয়ে উত্তম।

অন্য মুসলমানদের উপর একজন মুসলিমের আরেকটি অধিকার হল তার দোষ গোপন করা। জামে আত তিরমিযী, ১৯৩০ নং হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের দোষ গোপন করে, আল্লাহ তার দোষ গোপন করবেন। সুনানে ইবনে মাজাহ, ২৫৪৬ নং হাদিসে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্যদের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ তার দোষ গোপন করবেন। এর অর্থ এই নয় যে, একজন মুসলিমের অন্যদের পাপ উপেক্ষা করা উচিত। বরং এর অর্থ হলো, তাদের উচিত পাপীকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে এবং অন্যদের কাছে তাদের পাপের কথা না বলার জন্য বিনীতভাবে এবং গোপনে উপদেশ দেওয়া। এমনকি যদি একজন মুসলিম অন্যদের অনুরূপ পাপ না করার শিক্ষা দিতে চান, তাহলেও তাদের উচিত নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করা এবং নাম উল্লেখ না করে অন্যদের উপদেশ দেওয়া। এর একটি উদাহরণ সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত ৬৯৭৯ নম্বর হাদিসে লিপিবদ্ধ আছে। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের ত্রুটি-বিচ্যুতি গোপন রাখা, ঠিক যেমন মহান আল্লাহ তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অন্য সকলের ভুল গোপন রাখেন।

একজন মুসলিমের সর্বদা এমন পরিস্থিতি এড়িয়ে চলা উচিত যা অন্য মুসলমানদের মনে সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি করে। এটি তাদেরকে এমন পাপ থেকে রক্ষা করার জন্য যা সন্দেহভাজন অন্যরা যেমন গীবত এবং অপবাদ দিতে পারে। অন্য মুসলমানদের প্রতি এই সুরক্ষা প্রদান করা তাদের জন্য কল্যাণকে ভালোবাসার একটি অংশ, ঠিক যেমন কেউ নিজের জন্য কল্যাণকে ভালোবাসে। সহীহ বুখারীতে ৩১০১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে বলা হয়েছে, একবার রাতে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর স্ত্রীর সাথে দেখা করেছিলেন। একই সময়ে দুই সাহাবী,

আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিলেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের ডেকে জানিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে দেখা করছেন, কোনও অপরিচিত মহিলার সাথে নয়। সাহাবীরা, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তাদের মনে কোনও ভুল ধারণাও আসেনি। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কেবলমাত্র এই পদ্ধতিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যাতে সমস্ত মুসলমানদের শিক্ষা দেওয়া যায় যে অন্য মুসলমানদের চিন্তাভাবনা রক্ষা করার জন্য সন্দেহজনক বলে মনে হতে পারে এমন যেকোনো কার্যকলাপ পরিষ্কার করা উচিত।

এটি আরেকটি ধার্মিক বৈশিষ্ট্যের সাথে যুক্ত। এটি হল যখন কেউ এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকে যা বৈধ যাতে অন্য মুসলমানরা খারাপ বোধ না করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন স্বামী অন্য মুসলমানদের সামনে, যেমন তার বোনের সামনে প্রকাশ্যে তার স্ত্রীর প্রতি স্নেহ প্রদর্শন না করে। যদিও এটি সম্পূর্ণরূপে বৈধ কিন্তু তার বোনের সামনে এটি করা তার স্ত্রীর খারাপ বোধ করতে পারে, বিশেষ করে যদি তার স্বামী তার সাথে এমন কিছু না করে। এটি একটি উচ্চ স্তরের মহৎ চরিত্র যা বাধ্যতামূলক নয় বরং একটি মহান পুণ্য।

অন্য মুসলিমদের উপর মুসলিমদের আরেকটি অধিকার হলো, তাদেরকে ইসলামিক সালামের মাধ্যমে সম্ভাষণ জানানো উচিত। এর মধ্যে সেইসব মুসলিমদেরও অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত যাদেরকে সে চেনে এবং যাদেরকে সে চেনে না। অনেক হাদিসে এই সৎকর্ম করার গুরুত্ব এবং ফজিলত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সুনানে ইবনে মাজাহের ৬৮ নম্বর আয়াতে পাওয়া একটি হাদিসে অন্য মুসলিমদের কাছে সালামের সম্ভাষণ ছড়িয়ে দেওয়াকে জান্নাতে প্রবেশের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। ৪র্থ অধ্যায় আন-নিসা, আয়াত ৮৬:

" আর যখন তোমাদেরকে কেউ সালাম দেয়, তখন তোমরাও তার চেয়ে উত্তম সালামের জবাব দাও অথবা [অন্তত] একইভাবে সালাম দাও।"

জামে আত তিরমিযীতে ২৭০৬ নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে যে, একজন মুসলিমের উচিত অন্য মুসলিমের সাথে দেখা করার সময় এবং তাদের কাছ থেকে চলে যাওয়ার সময় সালাম জানানো।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামিক শান্তির অভিবাদন এই ইঙ্গিত দেয় যে একজন মুসলিমের উচিত কেবল শান্তিপূর্ণ কথা দিয়েই একজন মুসলিমকে স্বাগত জানানো নয়, বরং প্রতিটি কথোপকথনে তাদের অবশ্যই সদয় কথা বলতে হবে। এছাড়াও, শান্তির এই বিস্তার কেবল কথার মাধ্যমে নয়, বরং একজন মুসলিমের কর্মের মাধ্যমেও প্রদর্শিত হওয়া উচিত। অন্যদের কাছে শান্তির ইসলামিক শুভেচ্ছা জানানোর আসল অর্থ এটি।

একজন মুসলিমের উচিত নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করে অন্য মুসলিমদের সাথে সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে করমর্দন করা। প্রকৃতপক্ষে, যে মুসলিমরা এটি করে এবং তাদের কথোপকথনের সময় কোনও পাপ থেকে বিরত থাকে, তাদের পৃথক হওয়ার আগে তাদের ছোট ছোট পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সুনান আবু দাউদের ৫২১২ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য হলো যতটা সম্ভব অন্য মুসলমানের অধিকার রক্ষা করা, পাপ না করে বা নিজেদের ক্ষতি না করে। উদাহরণস্বরূপ, তাদের উচিত অন্য মুসলমানদের সম্মান রক্ষা করা, যা প্রায়শই তাদের পিঠের পিছনে গীবত এবং অপবাদের আকারে লঙ্ঘিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত

মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ১৯৩১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্য মুসলমানের সম্মান রক্ষা করবে, সে বিচারের দিন জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে।

যদি অন্য কোন মুসলিম খারাপ আচরণ করে, তাহলে অন্য মুসলিমদের কর্তব্য হল তাদের সাথে ভালো আচরণ করা। উপরন্তু, তাদের উচিত তাদের ব্যক্তিগতভাবে তাদের চরিত্র পরিবর্তনের পরামর্শ দেওয়া যাতে তারা ভালোর জন্য কাজ করে। জনসমক্ষে এটি করলে তাদের লজ্জা পেতে পারে এবং একজন মুসলিমের কর্তব্য হল অন্য মুসলিমদের বিব্রত না করা। উপরন্তু, যে ব্যক্তি বিব্রত বোধ করে তার রাগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং তাই তারা তাদের দেওয়া ভালো উপদেশ গ্রহণ করার সম্ভাবনা কম থাকে।

সবকিছু ছেড়ে দাও

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, ইয়েমেনের হাদরামাওতের এক রাজপুত্র ওয়াইল বিন হুজর মদিনায় আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে হাদরামাওতের অন্যান্য রাজপুত্রদের সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের দায়িত্ব দেন। তিনি সাহাবী মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানকে ওয়াইলের সাথে বাড়িতে পাঠান, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। মুয়াবিয়া তার উটে চড়ার জন্য কোন উট ছিল না এবং তাকে ওয়াইলের সাথে হাঁটতে বাধ্য করা হয়েছিল, যখন তিনি তার উটে চড়েছিলেন। তিনি ওয়াইলের পিছনে চড়তে অনুরোধ করেছিলেন, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন, কিন্তু তিনি এই ঘোষণা দিতে অস্বীকৃতি জানান যে তিনি রাজাদের পিছনে চড়তে যথেষ্ট যোগ্য নন। বহু বছর পরে, মুয়াবিয়া ইসলামের খলিফা হন এবং যখন ওয়াইল (রাঃ) তার সাথে দেখা করতে আসেন, তখন তিনি তাকে অত্যন্ত সম্মান করেন এবং মজা করে সেই ভ্রমণের সময় তিনি তাকে যা বলেছিলেন তা স্মরণ করিয়ে দেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১০৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ঘটনাটি অন্যদের ভুল উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সকল মুসলিম আশা করে যে বিচারের দিনে আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপকে দূরে রাখবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, এই একই মুসলিমদের বেশিরভাগই যারা এই আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থাৎ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আঁকড়ে ধরে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলিকে বোঝাচ্ছে না যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা

অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তোলে এমন একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে ভুক্তভোগীকে প্রভাবিত করবে। এই ধরণের ভুলকে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা বোধগম্যভাবে কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলিম প্রায়শই অন্যদের ভুলগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকে যা ভবিষ্যতে কোনওভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি অদৃশ্য হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা সুযোগ পেলেই তা পুনরুজ্জীবিত করার এবং অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা ধারণ করা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে মানুষ ফেরেশতা নয়। অন্তত একজন মুসলিম যিনি আশা করেন যে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুলগুলিকে উপেক্ষা করবেন, তার উচিত অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকৃতি জানায় তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্কই ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সর্বদা একটি মতবিরোধে লিপ্ত থাকবে যা প্রতিটি সম্পর্কের ক্ষেত্রেই ভুলের দিকে পরিচালিত করতে পারে। অতএব, যারা এইভাবে আচরণ করে তারা একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা অদ্ভুত যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে কিন্তু এমন মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ জীবিত থাকাকালীন এবং তাদের মৃত্যুর পরে ভালোবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাবের ফলে একেবারে বিপরীত ঘটে। তারা জীবিত থাকাকালীন মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়ে এবং যখন তারা মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ এবং ভালোবাসার সাথে স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের স্মরণ করে তবে এটি কেবল অভ্যাসের বাইরে।

অতীতকে ভুলে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে অন্যদের প্রতি অতিরিক্ত ভালো ব্যবহার করা উচিত, তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে একজন ব্যক্তি সর্বনিম্ন যা করতে পারে তা হল শ্রদ্ধাশীল হওয়া। এর জন্য কোনও মূল্য দিতে হয় না এবং খুব কম প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। অতএব, একজনের উচিত মানুষের অতীতের ভুলগুলিকে উপেক্ষা করা এবং ভুলে যাওয়া শেখা, সম্ভবত, মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলি উপেক্ষা করবেন। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ২২:

"... এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, এক পরিবার নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে একজন গভর্নর নিযুক্ত করার অভিযোগ করে। তারা গভর্নরকে তাদের প্রতি নেতিবাচক আচরণ করার অভিযোগ করে কারণ ইসলামের আগমনের আগে তাদের একে অপরের সাথে সমস্যা ছিল। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তখন মন্তব্য করেন যে একজন সত্যিকারের মুমিনের জন্য আদেশ দেওয়ার মধ্যে কোন পার্থিব লাভ নেই। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ) এর জীবনী", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১১৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, একজন প্রকৃত মুমিন পার্থিব কারণে তাদের কর্তৃত্বের সুযোগ নেবে না।

সহীহ মুসলিমের ৪৭২১ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করেছে তারা বিচারের দিন মহান আল্লাহর নিকটে নূরের সিংহাসনে বসে থাকবে। এর মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে, তাদের পরিবারবর্গের ক্ষেত্রে এবং তাদের তত্ত্বাবধান ও কর্তৃত্বাধীন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ।

মুসলমানদের জন্য সর্বদা সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের সাথে আচরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসারে। তাদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত সমস্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার

করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও বিশ্রামের অধিকার পূরণ করে এবং প্রতিটি অঙ্গকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুসারে ব্যবহার করে তাদের নিজের শরীর ও মনের প্রতি ন্যায়বিচার করা। ইসলাম মুসলমানদের তাদের সীমার বাইরে তাদের শরীর ও মনকে ঠেলে দিয়ে নিজেদের ক্ষতি করার শিক্ষা দেয় না।

মানুষের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা উচিত, অন্যদের কাছ থেকে যেরকম আচরণ চায়, সেরকম আচরণ করা উচিত। সম্পদ এবং কর্তৃত্বের মতো পার্থিব জিনিসপত্র অর্জনের জন্য মানুষের সাথে অবিচার করে ইসলামের শিক্ষার সাথে আপস করা উচিত নয়। এটি মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশের একটি প্রধান কারণ হবে এবং সহিহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

তাদের ন্যায়পরায়ণ থাকা উচিত, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রিয়জনদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। ৪র্থ অধ্যায় আন নিসা, আয়াত ১৩৫:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়বিচারের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদান করো, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। কেউ ধনী হোক বা দরিদ্র, আল্লাহ উভয়েরই অধিক যোগ্য। অতএব, [ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির] অনুসরণ করো না, তাহলে তোমরা ন্যায়বিচার করতে পারবে না..."

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের উপর নির্ভরশীলদের অধিকার এবং প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করা উচিত। সুনানে আবু দাউদের ২৯২৮ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাদের উপর নির্ভরশীলদের ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের

জীবনে এর শিক্ষা বাস্তবায়নের গুরুত্ব শেখানো। তাদের অবহেলা করা উচিত নয় বা অন্যদের, যেমন স্কুল এবং মসজিদের শিক্ষকদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত নয়। যদি কেউ তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে অলস হয়, তাহলে তাদের এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয়।

পরিশেষে, কোন ব্যক্তিই ন্যায়বিচারের সাথে আচরণ করার স্বাধীনতা রাখে না, কারণ সর্বনিম্ন শর্ত হলো মহান আল্লাহ এবং নিজের প্রতি ন্যায়বিচার করা।

স্বাধীন

নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে অন্যদের কাছে ভিক্ষা করে, তারা মাথা ব্যথা এবং পেট ব্যথার মতো। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১১৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহিহ মুসলিমের ৭৪৩২ নম্বর হাদিসে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা সেই বান্দাকে ভালোবাসেন যে সৃষ্টি থেকে স্বাধীন। এর অর্থ হলো, একজন মুসলিমের উচিত তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত উপায়-উপকরণ, যেমন শারীরিক শক্তি, সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করা। তাদের অলস আচরণ করা উচিত নয় এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে মানুষের কাছ থেকে জিনিসপত্র চাওয়া উচিত নয়, কারণ এই অভ্যাস তাদের উপর নির্ভরশীলতার দিকে পরিচালিত করে এবং এটি আল্লাহর উপর আস্থা হ্রাস করে। একজন ব্যক্তির দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে যাই ঘটুক না কেন, তাদের জন্য যা কিছু নির্ধারিত ছিল তা আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। সহিহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন মুসলিমের উচিত তাদের সম্পদ, যেমন তাদের শারীরিক শক্তি, ব্যবহারের উপর মনোযোগ দেওয়া এবং বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা দান করবেন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, কেউ যখন বিশ্বাস করে যে একজন ব্যক্তি, যেমন একজন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষক, তাদের প্রার্থনা এবং সুপারিশের মাধ্যমে উভয় জগতে সাফল্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবেন, তখন অন্যদের উপর ভুলভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে। এই মনোভাব কেবল অলসতাকে উৎসাহিত করে, কারণ কেউ বিশ্বাস করে যে তারা যেভাবে ইচ্ছা আচরণ করতে স্বাধীন এবং তাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষকের মাধ্যমে উভয় জগতে সাফল্য অর্জন করবে। একজন মুসলিমকে এই বিভ্রান্তি এড়াতে হবে এবং পরিবর্তে সাহাবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, যারা

মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহচর্য পেয়েছিলেন, তবুও মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি আন্তরিকভাবে ব্যবহার করে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। এটিই সঠিক মনোভাব যা গ্রহণ করা উচিত।

(সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, একটি অমুসলিম প্রতিনিধিদল মদিনায় এসেছিল। তাদের মধ্যে একজন, আব্দুল রহমান বিন আবু আকিল, মন্তব্য করেছিলেন যে মদিনায় আসার আগে, তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ছাড়া আর কাউকেই বেশি ঘৃণা করত না, কিন্তু তাঁর সাথে দেখা করার পর, তারা তাঁকে যতটা ভালোবাসত তার চেয়ে বেশি আর কাউকে ভালোবাসত না। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১১৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহের ৪১০২ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানুষের ভালোবাসা অর্জনের উপদেশ দিয়েছেন।

একজন মুসলিম মানুষের পার্থিব সম্পদ এড়িয়ে চলার এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা করার মাধ্যমে মানুষের ভালোবাসা অর্জন করতে পারে। বাস্তবে, একজন ব্যক্তি কেবল তখনই অন্যদের প্রতি নেতিবাচক আচরণ করে যখন সে অনুভব করে যে অন্যরা তাদের সম্পদের জন্য সক্রিয়ভাবে আকাঙ্ক্ষা করছে অথবা যখন অন্যরা সক্রিয়ভাবে তাদের নিজস্ব পার্থিব জিনিসের জন্য প্রতিযোগিতা করছে। অর্থাৎ, নিজের কাছে যা আছে তা হারানোর এবং অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তার আকাঙ্ক্ষা হারানোর ভয় অন্যদের প্রতি নেতিবাচক অনুভূতির জন্ম দিতে পারে। যদি একজন মুসলিম এই হাদিসের প্রথম অংশ অনুসারে কাজ করার পরিবর্তে নিজেকে ব্যস্ত রাখে, তাহলে এটি তাকে অন্যদের আকাঙ্ক্ষার অতিরিক্ত পার্থিব জিনিসের জন্য প্রতিযোগিতা করা থেকে বিরত রাখবে, কারণ এই আকাঙ্ক্ষাগুলির বেশিরভাগই অপ্রয়োজনীয় পার্থিব জিনিসের জন্য। এবং যদি একজন মুসলিম অন্যদের আত্ম এবং সম্পদ থেকে তাদের ক্ষতি দূরে রাখে, যা সুনান আন নাসায়ীর ৪৯৯৮ নম্বর হাদিস অনুসারে, একজন সত্যিকারের মুমিনের লক্ষণ, তাহলে সে মানুষেরও ভালোবাসা অর্জন করবে।

মধ্যস্থতা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, ইসলাম গ্রহণের জন্য একটি প্রতিনিধি দল মদিনায় আসে। তাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করেন, কেন তিনি মহান আল্লাহর কাছে হযরত সুলাইমান (সাঃ) এর মতো একটি বাস্তব রাজ্য চাননি। সূরা ৩৮ সাদ, আয়াত ৩৫:

"সে বলল, "হে আমার পালনকর্তা, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কারো জন্য প্রযোজ্য হবে না। নিশ্চয়ই আপনিই দাতা।"

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হেসে উত্তর দিলেন যে, সম্ভবত আল্লাহ তাআলা তাঁকে এমন একটি মর্যাদা দিয়েছেন, যা হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর মর্যাদার চেয়েও উচ্চতর। তিনি আরও বলেন যে, মহান আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবীর জন্য একটি বিশেষ দোয়া করেছেন। পৃথিবীতে জীবদ্দশায় তাদের প্রত্যেকেই তাদের বিশেষ দোয়া ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর দোয়া কিয়ামতের দিনের জন্য সংরক্ষণ করেছিলেন, যখন তিনি তাঁর জাতির পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার জন্য প্রার্থনা করবেন।

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১১৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪৩০৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সুপারিশ করবেন এবং প্রথম ব্যক্তি যার সুপারিশ আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন।

তাই একজন মুসলিমের উচিত নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শাফায়াতের যোগ্য হওয়ার জন্য নিজেকে এমন কাজ করে তোলার চেষ্টা করা, যার ফলে আযান শোনার পর এর জন্য দোয়া করা। সুনানে আন নাসায়ী, ৬৭৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে এর জন্য ঘরে না পড়ার পরিবর্তে নিয়মিত মসজিদে নামাজ পড়তে হবে। শাফায়াতের জন্য যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হবে তা হলো নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য শেখা এবং তার উপর আমল করা। একজন মুসলিমের উচিত এই দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করে গাফিলতিতে বসবাস করা এবং বিচার দিবসে শাফায়াতের আশা করা উচিত নয় কারণ এটি ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার কাছাকাছি যা নিন্দনীয় এবং আল্লাহর রহমতের প্রতি প্রকৃত আশার তুলনায় এর কোন মূল্য নেই।

দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলিম যারা এই ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করেছে তারা এই সুপারিশের মাধ্যমে জান্নাত লাভের আশা করে, যদিও তারা মহান আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয় না। এই মুসলিমদের বুঝতে হবে যে সুপারিশ একটি বাস্তবতা হলেও কিছু মুসলিম যাদের সুপারিশের মাধ্যমে তাদের শাস্তি হ্রাস করা হবে তারা এখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এমনকি জাহান্নামে এক মুহূর্তও অসহনীয়। তাই ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা ত্যাগ করা উচিত এবং বরং মহান আল্লাহর আনুগত্যে কার্যত প্রচেষ্টা চালিয়ে সত্যিকারের আশা গ্রহণ করা উচিত।

জীবনের সকল ক্ষেত্রে সততা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, তারিক বিন আব্দুল্লাহ নামে এক ব্যক্তি এবং তার সাহাবীরা খেজুর কিনতে মদিনায় যান। তারা যখন মদিনায় পৌঁছান, তখন একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাদের অভ্যর্থনা জানান এবং তাদের যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। এরপর অপরিচিত ব্যক্তি খেজুরের বিনিময়ে তাদের উট কিনতে প্রস্তাব দেন। তারিক বিক্রিতে রাজি হন এবং অপরিচিত ব্যক্তি উটটি নিয়ে যান এবং তাদের বলেন যে তিনি শীঘ্রই তাদের কাছে খেজুর নিয়ে আসবেন। অপরিচিত ব্যক্তি তাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে, তারা সন্দেহ করতে শুরু করেন যে তাদের প্রতারিত করা হয়েছে। কিন্তু তাদের সাথে থাকা একজন মহিলা মন্তব্য করেন যে তাদের নিজেদের দোষ দেওয়া উচিত নয় কারণ অপরিচিত ব্যক্তির মুখ পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও সুন্দর এবং তিনি প্রতারকের মতো দেখতে নন। কিছুক্ষণ পরে, অপরিচিত ব্যক্তি পুনরায় আবির্ভূত হন এবং তাদের কাছে ঘোষণা করেন যে তিনিই নবী মুহাম্মদ (সাঃ)। এরপর তিনি তাদের যত ইচ্ছা খেজুর খেতে এবং তারা পূর্বে যে পরিমাণ পরিমাণ সম্মত হয়েছিল তা পূর্ণ পরিমাণে নিতে আমন্ত্রণ জানান। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১১৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহের ২১৪৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, কেয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে অনৈতিক লোক হিসেবে উত্থিত করা হবে, তবে তারা ব্যতীত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, সৎকর্ম করে এবং সত্য কথা বলে।

এই হাদিসটি ব্যবসায়িক লেনদেনে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য প্রযোজ্য। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে

আল্লাহকে ভয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, অন্যদের সাথে সেভাবেই আচরণ করা উচিত যেভাবে সে মানুষের কাছ থেকে আচরণ পেতে চায়।

ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের কথাবার্তায় সৎ থাকা এবং লেনদেনের সমস্ত বিবরণ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে প্রকাশ করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদিস, সংখ্যা ২০৭৯, সতর্ক করে যে, যখন মুসলিমরা আর্থিক লেনদেনে জিনিসপত্র, যেমন তাদের পণ্যের ত্রুটি, গোপন করে, তখন এর ফলে বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

সৎকর্ম করার মধ্যে রয়েছে অন্যদের সাথে প্রতারণা করা থেকে বিরত থাকা, যাতে তারা অতিরিক্ত মূল্যে জিনিসপত্র কিনে প্রতারণা না করে। একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের সাথে সেই আচরণ করা যা সে অর্থপূর্ণভাবে চায়, সততা এবং সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে। একজন মুসলিম যেমন আর্থিক বিষয়ে দুর্ব্যবহার পছন্দ করেন না, তেমনি তাদেরও অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করা উচিত নয়।

সৎকর্ম করার মধ্যে রয়েছে ইসলাম এবং দেশের আইনে আলোচিত অবৈধ অনুশীলন এড়িয়ে চলা। যদি কেউ তাদের দেশের ব্যবসায়িক আইন নিয়ে সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে তাদের সেখানে ব্যবসা করা উচিত নয়।

অধিকন্তু, সৎকর্ম করার মধ্যে রয়েছে নিজের ব্যবসায়িক সাফল্যকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তাদের

ব্যবসা এবং সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য আরাম এবং শান্তির উৎস হয়ে উঠবে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

কিন্তু যারা তাদের ব্যবসায়িক সাফল্যের অপব্যবহার করে তারা দেখতে পাবে যে এটি তাদের চাপ এবং দুর্দশার উৎস হয়ে ওঠে, কারণ তারা মহান আল্লাহকে ভুলে গেছে, যিনি তাদের সাফল্য দিয়েছেন। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন] এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।"

যারা ব্যবসা পরিচালনা করেন তাদের সর্বদা মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা উচিত কারণ এটি অনৈতিকতার দিকে পরিচালিত করে এবং অমরত্ব জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে এবং তার উপর কাজ করতে থাকবে যতক্ষণ না তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা একজন মহান মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন। জামে আত তিরমিযী, ১৯৭১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

খ্রীষ্ট-বিরোধীর গল্প

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, তামিম আল দারি (রাঃ) নামে একজন সাহাবী মদীনায় আসেন এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে তার অদ্ভুত ভ্রমণের কথা জানান। তামিম (রাঃ) একটি জাহাজে ভ্রমণ করছিলেন, যখন জাহাজটি তার গতিপথ পরিবর্তন করে। জাহাজের নাবিকদের একটি অজানা দ্বীপে ফেলে দেওয়া হয়। তারা পানীয় জলের সন্ধানে জাহাজ ছেড়ে চলে যায় এবং অবশেষে শিকল দিয়ে বাঁধা এক ব্যক্তির সাথে দেখা করে। বন্দী তাদের জিজ্ঞাসা করে যে তারা কে এবং তারা উত্তর দেয় যে তারা আরব। বন্দী তাদের জিজ্ঞাসা করে যে কোন ব্যক্তি কি নিজেকে শেষ নবী বলে ঘোষণা করে বেরিয়ে এসেছে? তারা উত্তর দেয় যে এটি ঘটেছে এবং লোকেরা তাকে বিশ্বাস করছে, তাকে অনুসরণ করছে এবং তাকে সত্যবাদী মনে করছে। বন্দী মন্তব্য করে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম। তারপর সে হিজাজে আইন যা'র অবস্থান সম্পর্কে খবর জানতে চাইল। লোকেরা তাকে বলল এবং বন্দী আনন্দিত হয়ে উঠল। বন্দী তখন জিজ্ঞাসা করে যে আল ইয়ামামায় অবস্থিত বাইসানের খেজুর গাছে ফল ধরেছে কিনা। লোকেরা উত্তর দিল যে তারা তাই করেছে এবং সে আবার আনন্দিত হয়ে উঠল। অবশেষে বন্দী মন্তব্য করল যে যদি তাকে অনুমতি দেওয়া হয় তবে সে তাইবার ভূমি ছাড়া অন্য কোথাও ভ্রমণ করবে। তামিম (রাঃ) এই গল্পটি বলার পর, মহানবী (সাঃ) মন্তব্য করলেন যে বন্দীটি ছিল খ্রীষ্ট-বিদ্বেষী এবং তাইবার ভূমি ছিল মদীনা। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১১৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪০৭৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) খ্রীষ্ট-শত্রুর বিচারকে পৃথিবীতে মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে বলে বর্ণনা করেছেন। অতএব, ভবিষ্যতের এই ঘটনা থেকে মুসলমানদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। প্রথমটি হল দৃঢ় ঈমানের গুরুত্ব। যাদের ঈমান দুর্বল তারাই কেবল তার দ্বারা বিপথগামী হবে। দৃঢ় ঈমান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি তাদের জীবনের প্রতিটি পরীক্ষা বা অসুবিধার

বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র। যার দৃঢ় ঈমানের অধিকারী সে সর্বদা, মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে, প্রতিটি অসুবিধাকে পুরষ্কার এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি দিয়ে অতিক্রম করবে, কারণ তারা বুঝতে পারে যে প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের কী আচরণ প্রদর্শন করতে হবে। অন্যদিকে, দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিরা তাদের জীবনে যে পরীক্ষা এবং পরীক্ষার মুখোমুখি হয় তার দ্বারা সহজেই বিভ্রান্ত হয় এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হয়, ঠিক যেমন দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তিরা খ্রীষ্ট-শত্রু দ্বারা বিপথগামী হয়। অধ্যায় ২২ আল-হাজ্জ, আয়াত ১১:

"আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে আল্লাহর ইবাদত করে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে। যদি তাকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে, তবে সে তাতে আশ্বস্ত হয়; আর যদি কোন পরীক্ষা তাকে স্পর্শ করে, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসের দিকে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটাই স্পষ্ট ক্ষতি।"

দৃঢ় ঈমান অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হল ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা। এটি একজন মুসলিমকে পরীক্ষা ও পরীক্ষার কারণ এবং প্রজ্ঞা বুঝতে সাহায্য করবে। এর ফলে তারা সফলভাবে সেগুলি কাটিয়ে উঠতে পারবে।

এই মহান ঘটনা থেকে আরেকটি শিক্ষা হল সন্দেহজনক বিষয় এড়িয়ে চলার গুরুত্ব। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি সীমান্তের কাছাকাছি ভ্রমণ করে, তার সীমান্ত অতিক্রম করার সম্ভাবনা বেশি, তেমনি একজন মুসলিম যিনি প্রলোভনে আচ্ছন্ন থাকেন, তার পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যে ব্যক্তি এমন স্থান এবং জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে যা তাদেরকে পাপের দিকে প্রলুব্ধ করে, সে তাদের ঈমান ও সম্মান রক্ষা করবে। জামে আত তিরমিযী, ১২০৫ নম্বর হাদিসে এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাই মুসলমানদের উচিত এমন জিনিস, স্থান এবং লোকদের এড়িয়ে চলা যা তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আহ্বান করে বা প্রলুব্ধ করে এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের, যেমন তাদের সন্তানদেরও, একই কাজ করতে বাধ্য করা।

নিজেকে পছন্দ করা

নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, বনু আসাদ নামে একটি প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণের জন্য মদিনায় এসেছিল। তাদের সেনাপতি একটি মন্তব্য করেছিলেন যা ইঙ্গিত দেয় যে তারা ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি অনুগ্রহ করছে। এরপর আল্লাহ তাআলা সূরা আল-হুজুরাতের ১৭ নং আয়াত নাযিল করেন:

"তারা ইসলাম গ্রহণ করাকে তোমার প্রতি অনুগ্রহ মনে করে। বলো, "তোমরা তোমাদের ইসলাম গ্রহণকে আমার প্রতি অনুগ্রহ মনে করো না। বরং আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে তিনি তোমাদেরকে ঈমানের দিকে পরিচালিত করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেন, যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে তাদের জীবনের মধ্যে স্থান দিতে পারে। অতএব, এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। মানুষের আনুগত্য থেকে আল্লাহ তাআলা কোন

উপকার লাভ করেন না এবং তাদের অবাধ্যতা আল্লাহ তাআলার কোন ক্ষতি করে না। ১৭তম সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৭:

"[এবং বললেন], "যদি তোমরা ভালো করো, তাহলে নিজেদের জন্যই ভালো করো; আর যদি মন্দ করো, তাহলে নিজেদের জন্যই করো।"..."

অতএব, এমন অহংকারী মনোভাব গ্রহণ করা এড়িয়ে চলা উচিত যেখানে তারা মনে করে যে তারা মহান আল্লাহকে আনুগত্য করে তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করছে। এই অহংকার কেবল তখনই তাদের পথভ্রষ্ট করবে যখন তাদের ইচ্ছা ইসলামী শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হবে। এই বোকা ঠিক সেই অজ্ঞ রোগীর মতো যে এমন আচরণ করে যেন তারা তাদের ডাক্তারের প্রতি অনুগ্রহ করছে, তাদের চিকিৎসা পরামর্শ শুনে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে। এই বোকা রোগী যখন তাদের ইচ্ছার সাথে সাংঘর্ষিক হবে তখনই তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ উপেক্ষা করবে, যা কেবল তাদের ক্ষতির দিকেই নিয়ে যাবে। বরং একজন জ্ঞানী রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি বোঝেন যে তাদের ডাক্তার তাদের সাহায্য করছেন এবং তাই তাদের নিজের স্বার্থে তাদের চিকিৎসা পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন।

যেখানে মহত্ত্ব নিহিত

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, একটি প্রতিনিধিদল মদিনায় আসে। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের বিশাল উপহার দিয়েছিলেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের মধ্যে একজন যুবককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে সে কী উপহার চায়। যুবকটি উত্তর দিয়েছিল যে সে চায় নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যেন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন, যেন তিনি তাকে ক্ষমা করেন, তাকে রহমত দান করেন এবং তার হৃদয়ে সম্পদ স্থাপন করেন, যার অর্থ হল সন্তুষ্টি। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তার অনুরোধ পূরণ করেন এবং যুবকটি সবচেয়ে ধার্মিক এবং তপস্বী হয়ে ওঠে। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহত্ত্ব এবং প্রকৃত সাফল্য পার্থিব জিনিসের সাথে সম্পর্কিত নয়, যেমন সম্পদ বা খ্যাতি। একজন ব্যক্তি এই জিনিসগুলির মাধ্যমে কিছু পার্থিব সাফল্য পেতে পারে তবে ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটা স্পষ্ট যে এই ধরণের সাফল্য খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং অবশেষে এটি একজন ব্যক্তির জন্য বোঝা এবং অনুশোচনায় পরিণত হয়। একজন মুসলিমের কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে এই জিনিসগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে এবং এর ফলে তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের কর্তব্যকে অবহেলা করে এগুলি অর্জনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে। এবং তাদের এমন লোকদেরও তুচ্ছ করা উচিত নয় যারা এই পার্থিব জিনিসগুলির অধিকারী নয় বলে মনে করে যে তাদের কোনও মূল্য বা তাৎপর্য নেই কারণ এই মনোভাব ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারীতে ৬০৭১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে জান্নাতীরা হলেন তারা যারা সমাজে তুচ্ছ বলে বিবেচিত হয় এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে যদি তারা কোনও কিছুর উপর শপথ করে তবে আল্লাহ, মহিমান্বিত, তাদের জন্য তা পূরণ করবেন।

ইহকাল ও পরকালে প্রকৃত সম্মান, সাফল্য এবং মহত্ত্ব কেবল তাকওয়ার মধ্যেই নিহিত। তাই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে যত বেশি আন্তরিকভাবে আল্লাহর আদেশ পালনের চেষ্টা করা হয়, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা হয় এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া যায়, সমাজের কাছে তা তুচ্ছ মনে হলেও তা ততই মহান হয়। সূরা ৪৯, আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

তাই একজন মুসলিমের উচিত এই ক্ষেত্রে প্রকৃত সাফল্যের সন্ধান করা এবং পার্থিব জিনিসপত্রের সন্ধানে তাদের সময় এবং প্রচেষ্টা নষ্ট করা নয়। এটি তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেবে। অতএব এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। মনের শান্তি অর্জনই প্রকৃত সাফল্য কারণ খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং ক্যারিয়ারের মতো অন্যান্য সমস্ত জিনিসের মূল্য তখনই থাকে যখন একজন ব্যক্তি মানসিক শান্তি লাভ করে। এটি স্পষ্ট যখন কেউ এমন লোকদের দেখে যারা পার্থিব জিনিসপত্রের অধিকারী কিন্তু এখনও দুঃখজনক জীবনযাপন করে, কারণ তাদের মানসিক শান্তি নেই। অতএব, একজনকে অবশ্যই প্রকৃত সাফল্যের সন্ধান করতে হবে, যা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে মানসিক শান্তি অর্জনের মধ্যে নিহিত, অন্যথায় তারা উভয় জগতেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এমনকি যদি তাদের কাছে অনেক পার্থিব জিনিস থাকে। অধ্যায় ১৮ আল কাহফ, আয়াত ১০৩-১০৪:

"বলুন, "আমরা কি তোমাদেরকে কর্মের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে অবহিত করব? [তারা] তারা যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে ব্যর্থ হয়েছে, অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে।"

সত্য ভক্তি

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, একটি অমুসলিম প্রতিনিধিদল মদিনায় আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের পূর্বের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে তাদের জন্য নির্দিষ্ট ধরণের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল যা ইসলামে বৈধ ছিল। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এই মাংস রান্না করে তাদের নেতার কাছে উপস্থাপন করেন এবং তাকে বলেন যে তিনি যতক্ষণ না খাবারটি খান ততক্ষণ তার ঈমান পূর্ণ হবে না। নেতা মাংস খেয়েছিলেন, যদিও তিনি কিছুটা দ্বিধা প্রকাশ করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি নির্দেশিকার দুটি উৎস: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য কঠোরভাবে মেনে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য সকল উৎস এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে, এমনকি যদি তা সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে।

সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, ইসলামের ভিত্তিতে নয় এমন যেকোনো বিষয় প্রত্যাখ্যাত হবে।

যদি মুসলিমরা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই স্থায়ী সাফল্য চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্য কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যদিও, এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎস থেকে সরাসরি নেওয়া হয়নি এমন কিছু কাজকে এখনও সৎকর্ম হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, তবুও এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎসকে অন্য সকলের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া

গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎস থেকে নেওয়া নয় এমন জিনিসের উপর যত বেশি কেউ কাজ করবে, এমনকি যদি সেগুলি সৎকর্ম হয়, তবুও তারা এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎসের উপর তত কম কাজ করবে। এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ হল কত মুসলিম তাদের জীবনে এমন সাংস্কৃতিক রীতিনীতি গ্রহণ করেছে যার এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎসের ভিত্তি নেই। যদিও এই সাংস্কৃতিক রীতিনীতি পাপ নয়, তবুও তারা মুসলমানদের এই দুটি দিকনির্দেশনার উৎস শেখা এবং সেগুলি অনুসরণ করা থেকে বিরত রেখেছে, কারণ তারা তাদের আচরণে সন্তুষ্ট বোধ করে। এর ফলে নির্দেশনার উৎস সম্পর্কে অজ্ঞতা দেখা দেয়, যা কেবল পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করে।

এই কারণেই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই দুটি পথনির্দেশনার উৎস শিখতে হবে এবং সেগুলোর উপর আমল করতে হবে, যা পথনির্দেশনার নেতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং তারপর যদি তাদের সময় এবং শক্তি থাকে তবেই অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সৎকর্মে আমল করতে হবে। কিন্তু যদি তারা অজ্ঞতা এবং বানোয়াট অভ্যাস বেছে নেয়, এমনকি যদি সেগুলি পাপ নাও হয়, তাহলে পথনির্দেশনার এই দুটি উৎস শেখা এবং সেগুলোর উপর আমল করার চেয়ে তারা সাফল্য অর্জন করতে পারবে না।

পরিশেষে, যখন কেউ অজ্ঞতার কারণে এই দুটি পথনির্দেশের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয় এমন কাজ করতে থাকে, তখন সে সহজেই এমন অভ্যাস এবং বিশ্বাসে পতিত হয় যা প্রতিষ্ঠিত ইসলামী জ্ঞানের পরিপন্থী। এটি মুসলিমকে পাপ এবং বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যায় যখন তারা মনে করে যে তারা সঠিক পথে আছে। যে জানে যে তারা পথভ্রষ্ট, সে অন্যদের দ্বারা উপদেশ গ্রহণ এবং পরিবর্তন করার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু যে মনে করে যে তারা সঠিক পথে আছে তার পক্ষে তাদের পথ পরিবর্তন এবং সংশোধন করার সম্ভাবনা খুবই কম, এমনকি যখন জ্ঞান এবং স্পষ্ট প্রমাণের অধিকারী অন্যরা তাকে সতর্ক করে। এই পরিণতি এড়ানোর একমাত্র উপায় হল পথনির্দেশনার দুটি উৎসে পাওয়া জ্ঞান অর্জন এবং তার

উপর ভিত্তি করে কাজ করার চেষ্টা করা এবং অন্যান্য কাজ এড়িয়ে চলা, এমনকি যদি সেগুলি সৎকর্ম বলে মনে হয়।

সত্য বিশ্বাস

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, ইসলাম গ্রহণের পর একটি প্রতিনিধিদল মদিনায় যান। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের জিজ্ঞাসা করেন যে তারা কী। তারা উত্তর দেন যে তারা ঈমানদার। তিনি উত্তর দেন যে প্রতিটি সত্য কথা প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত এবং তাই তাদের বক্তব্য এবং ঈমানের দাবির প্রমাণ কী? তারা উত্তর দেন যে পনেরোটি জিনিস ছিল যার উপর তারা আমল করেছিল। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতিনিধিরা তাদের পাঁচটি জিনিসের উপর ঈমান আনতে বলেছিলেন। পাঁচটি জিনিস যা তাদের আমল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং পাঁচটি জিনিস যা তারা ইসলাম গ্রহণের আগে নিজেরাও গড়ে তুলেছিল যা তারা কেবল তখনই ত্যাগ করত যদি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) আদেশ দিতেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের এই পনেরোটি জিনিসের নাম বলতে বলেছিলেন। তারা উত্তর দেন যে যে পাঁচটি জিনিসের উপর ঈমান আনতে তাদের আদেশ করা হয়েছিল তা হল আল্লাহ, মহিমান্বিত, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূলগণ, তাঁদের উপর ঈমান আনতে এবং কিয়ামতের দিনে। তাদেরকে যে পাঁচটি বিষয়ের উপর আমল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা হলো, মৌখিকভাবে ঘোষণা করা যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই, ফরজ নামাজ পড়া, ফরজ যাকাত দান করা, রমজান মাসে রোজা রাখা এবং যদি সম্ভব হয় তাহলে পবিত্র হজ্জ পালন করা। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তারা যে শেষ পাঁচটি বিষয় অর্জন করেছিল তা হলো, সমৃদ্ধির সময় কৃতজ্ঞ থাকা, কষ্টের মুখে ধৈর্যশীল হওয়া, ভাগ্য যা-ই আসুক তাতে সন্তুষ্ট থাকা, সামাজিক সমাবেশে সত্যবাদী থাকা এবং শত্রুদের অভিশাপ দেওয়া থেকে বিরত থাকা। মহানবী (সা.) এই কথা শোনার পর তাদের প্রশংসা করেন এবং তারপর তাদেরকে আরও পাঁচটি বিষয়ের উপর আমল করার নির্দেশ দেন যাতে তারা মোট বিশটি অর্জন করতে পারে। তিনি তাদেরকে এমন কিছু জমাতে বলেন না যা তারা নিজেরা ব্যবহার করবে না, এমন কিছু তৈরি না করে যা তারা বসবাস করবে না, এমন কিছুর জন্য প্রতিযোগিতা না করে যা তারা শীঘ্রই এই পৃথিবীতে রেখে যাবে, যাতে তারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, যার কাছে তারা পরকালে ফিরে যাবে এবং যার কাছে তারা উন্মুক্ত হওয়ার আগে ফিরে যাবে এবং যে স্থানের দিকে তারা যাচ্ছিল এবং চিরকাল থাকবে, অর্থাৎ পরকালে তা কামনা করে। এরপর প্রতিনিধিদলটি মদিনা ত্যাগ করে এবং এই পরামর্শ অনুসারে কাজ

করে তাদের বিশ্বাসকে কার্যত প্রমাণ করে। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

কিছু মানুষ দাবি করে যে তাদের আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং আনুগত্য তাদের হৃদয়ে রয়েছে এবং তাই তাদের এটি ব্যবহারিকভাবে প্রদর্শন করার প্রয়োজন নেই। দুর্ভাগ্যবশত, এই বোকা মানসিকতা অনেক মুসলমানকে সংক্রামিত করেছে যারা বিশ্বাস করে যে তাদের একটি বিশুদ্ধ বিশ্বস্ত হৃদয় রয়েছে যদিও তারা ইসলামের বাধ্যবাধকতা পালনে ব্যর্থ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৮৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যখন কারো হৃদয় পবিত্র থাকে তখন শরীর পবিত্র হয় যার অর্থ তাদের কর্ম সঠিক হয়ে যায়। কিন্তু যদি কারো হৃদয় কলুষিত হয় তবে শরীর কলুষিত হয় যার অর্থ তাদের কর্ম কলুষিত এবং ভুল হবে। অতএব, যে ব্যক্তি কার্যত তাদের কর্তব্য পালন করে মহান আল্লাহকে মান্য করে না, তার হৃদয় কখনও পবিত্র হতে পারে না।

অধিকন্তু, মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস প্রদর্শন করা কার্যত তাদের প্রমাণ এবং প্রমাণ যা বিচারের দিন জান্নাত লাভের জন্য প্রয়োজনীয়। এই বাস্তব প্রমাণ না থাকা ঠিক ততটাই বোকামি যতটা একজন ছাত্র তার শিক্ষকের কাছে একটি খালি পরীক্ষার খাতা ফেরত দিয়ে দাবি করে যে তার জ্ঞান তার মনে আছে তাই পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাকে তা লিখে রাখার প্রয়োজন নেই। ঠিক যেমন এই ছাত্র নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হবে, তেমনি যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি না হয়ে বিচারের দিনে পৌঁছাবে, তার হৃদয়ে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও।

পরিশেষে, এটা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ঈমান হলো এমন একটি উদ্ভিদের মতো যাকে বেড়ে ওঠা এবং বেঁচে থাকার জন্য বাধ্যতার কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে

হবে। যেভাবে একটি উদ্ভিদ সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, সে মারা যাবে, ঠিক তেমনিভাবে যে ব্যক্তি বাধ্যতার কাজ দিয়ে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয় তার ঈমানও মারা যেতে পারে। এটিই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

শান্তির শুভেচ্ছা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, আল সাদিফ থেকে একটি মুসলিম প্রতিনিধিদল মদীনা সফর করে। তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মসজিদে প্রবেশ করে, যখন তিনি তাঁর মিম্বরে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তারা ইসলামিক শান্তির শুভেচ্ছা না জানিয়ে বসে পড়ে। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের জিজ্ঞাসা করেন যে তারা কি মুসলিম, যার উত্তরে তারা হ্যাঁ বলে। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে তারা কি ইসলামিক শান্তির শুভেচ্ছা জানাবে। তারা দাঁড়িয়ে সকলকে শান্তির ইসলামিক শুভেচ্ছা জানান। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীর ১২ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলামের মধ্যে পাওয়া একটি ভালো গুণের পরামর্শ দিয়েছেন। তা হলো, পরিচিত এবং অপরিচিত সকলের মধ্যে শান্তির ইসলামিক শুভেচ্ছা ছড়িয়ে দেওয়া।

এই ভালো গুণটি কাজে লাগানো গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজকাল মুসলমানরা প্রায়শই কেবল তাদের পরিচিতদের কাছেই শান্তির ইসলামিক শুভেচ্ছা পৌঁছে দেয়। সকলের কাছে এটি ছড়িয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মানুষের মধ্যে ভালোবাসার জন্ম দেয় এবং ইসলামকে শক্তিশালী করে। সহীহ মুসলিমের ১৯৪ নম্বর হাদিস অনুসারে, এই বৈশিষ্ট্যটি জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। অন্য মুসলমানদের সাথে কেবল করমর্দনের বদ অভ্যাস এড়িয়ে চলতে হবে, তাদের সাথে শান্তির ইসলামিক শুভেচ্ছা না জানিয়ে। কেবল করমর্দনের চেয়ে মৌখিকভাবে শান্তির শুভেচ্ছা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

একজন মুসলিমের কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, অন্যদের প্রতি তাদের প্রতিটি সালামের জন্য তারা কমপক্ষে দশটি সওয়াব পাবে, এমনকি যদি অন্যরা তাদের সালামের উত্তর নাও দেয়। সুনানে আবু দাউদের ৫১৯৫ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলিমের উচিত শান্তির ইসলামিক অভিবাদন সঠিকভাবে পালন করা, অন্যদের প্রতি তাদের অন্যান্য কথাবার্তা এবং কাজে এই শান্তি প্রদর্শন করা, মানুষ এবং তাদের সম্পদ থেকে তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি দূরে রাখা। প্রকৃতপক্ষে, সুনান আন নাসায়ী, ৪৯৯৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিস অনুসারে এটিই একজন প্রকৃত মুসলিম এবং মুমিনের সংজ্ঞা। কারো প্রতি শান্তির শুভেচ্ছা জানানো এবং তারপর তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের ক্ষতি করা ভণ্ডামি। প্রকৃতপক্ষে এই মনোভাব অন্যদের প্রতি শান্তির শুভেচ্ছা জানানোর উদ্দেশ্যকে লঙ্ঘন করে।

নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর স্ত্রীদের উপর প্রদত্ত পছন্দ

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের নবম বছরে, কিছু ভূমি বিজয়ের পর ইসলামের জন্য পরিস্থিতি সহজ হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কিছু স্ত্রী তাঁর কাছে তাদের পার্থিব জীবনকে আরও আরামদায়ক করতে চেয়েছিলেন। তারা এইভাবে আচরণ করেছিলেন কারণ তারা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে আরামদায়ক জীবনযাপন করতে চেয়েছিলেন। তারা পৃথিবীর জাঁকজমক এবং জাঁকজমক কামনা করেননি কারণ তাদের কেউই আল্লাহ, সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, সূরা আল আহযাবের ২৮-২৯ আয়াতে যে প্রস্তাবটি অবতীর্ণ করেছেন তা গ্রহণ করেননি:

"হে নবী, তোমার স্ত্রীদের বলো, "যদি তোমরা পার্থিব জীবন এবং তার সাজসজ্জা কামনা করো, তাহলে এসো, আমি তোমাদের রিযিক দেব এবং তোমাদেরকে সদয়ভাবে বিদায় দেব। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আখেরাতের ঘর কামনা করো, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের মধ্যে সৎকর্মশীলদের জন্য মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"

এ বিষয়ে তাফসীরে ইবনে কাসির, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৬৭২-৬৭৫ এবং সহীহ মুসলিম, ৩৬৯০ নম্বর এবং জামে আত তিরমিযী, ৩২০৪ নম্বরে প্রাপ্ত হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে।

তাছাড়া, তারা কেবল কিছু আরাম-আয়েশ কামনা করতো কারণ তারা সকলেই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছিলো। উদাহরণস্বরূপ, প্রায় তিন মাস নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কোন বাড়ি ছাড়াই কেটে যেতো, খাবার রান্নার জন্য আগুন জ্বালানো

হতো। বরং তারা খেজুর এবং পানি দিয়ে বেঁচে থাকতো। সহিহ বুখারী, ৬৪৫৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

অতএব, মুসলমানদের তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে এবং বস্তুগত জগতের বিলাসিতা থেকে পরকাল এবং তার জন্য প্রস্তুতিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে কেবল একটি হৃদয় দিয়েছেন। অতএব, আগুন এবং বরফ একই সাথে এর মধ্যে দুটি বিপরীত জিনিসকে আটকে রাখা সম্ভব নয়, ঠিক যেমন আগুন এবং বরফ একই পাত্রে একত্রিত হতে পারে না। এটি পূর্ব দিকে অগ্রসর হওয়া একজন ভ্রমণকারীর অনিবার্যভাবে পশ্চিম থেকে আরও দূরে সরে যাওয়ার অনুরূপ। একইভাবে, পরকাল এবং বস্তুজগৎ দুটি বিপরীত। অতএব, একই সাথে একজন ব্যক্তির হৃদয়ে এগুলিকে আটকে রাখা সম্ভব নয়। কেউ যত বেশি বস্তুজগৎকে ভালোবাসবে এবং কার্যত তার জন্য প্রচেষ্টা করবে, তত কম সে পরকালের জন্য ভালোবাসা এবং কার্যত তার জন্য প্রচেষ্টা করবে। এটি একটি অনিবার্য বাস্তবতা। একজন মুসলিমের নিজেকে বোকা বানানো উচিত নয় যে এটি সম্ভব বলে বিশ্বাস করা সম্ভব। দুটি কখনও একক হৃদয়ে একত্রিত হতে পারে না। একজন সর্বদা অন্যটিকে পরাভূত করবে। এমনকি যদি কেউ বিশ্বাস করে যে তারা এই বস্তুজগৎকে বৈধ অতিরিক্ত উপভোগ করতে পারে তবে তাদের বুঝতে হবে যে প্রথমত, এটি তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করবে। দ্বিতীয়ত, এটি তাদের অবৈধের এত কাছাকাছি নিয়ে যাবে কারণ বৈধ জিনিসগুলিতে লিপ্ত হওয়া সাধারণত অবৈধ এবং পাপের দিকে প্রথম পদক্ষেপ। যে ব্যক্তি এই মানসিকতা এড়িয়ে চলবে, সে তার ঈমান ও সম্মান রক্ষা করবে। জামে আত তিরমিযী, ১২০৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে। ৮৭ সূরা আল আ'লা, আয়াত ১৬-১৭:

"কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ পরকাল উত্তম এবং স্থায়ী।"

এছাড়াও, একজনকে বুঝতে হবে যে, যখন তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করার চেষ্টা করে, তখন তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থান দেবে। অতএব, এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি নিরর্থক পার্থিব বিলাসিতায় লিপ্ত হয়, সে পাপ না করলেও, অনিবার্যভাবে তাদের প্রদত্ত অনুগ্রহের অপব্যবহার করবে। তাদের আচরণ তাদের একটি ভারসাম্যহীন মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের কারণ হবে, এটি তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল স্থানে ফেলবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে বাধা দেবে। অতএব, পার্থিব বিলাসিতায় লিপ্ত হওয়া উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে। যেহেতু মনের শান্তি সমস্ত পার্থিব জিনিস যেমন খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং ক্যারিয়ারকে মূল্য দেয়, তাই একজনের উচিত পার্থিব বিলাসিতায় লিপ্ত হওয়ার চেয়ে মানসিক শান্তি অর্জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া, এমনকি যদি তা বৈধও হয়। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে, এমনকি যদি তা তার ইচ্ছার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন তিনিও ভালো থাকবেন। কারণ একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সুষম করতে এবং তার জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থাপন করতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার। সমাজের মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার জ্ঞান কখনই এই ফলাফল অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে না, যদিও সমস্ত গবেষণা করা হয়েছে, কারণ তারা তার জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তাদের পরামর্শ সকল ধরণের মানসিক ও শারীরিক চাপ এড়াতে পারে না এবং

তাদের পরামর্শ সীমিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা এবং পক্ষপাতের কারণে জীবনের সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে স্থাপন করতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলারই এই জ্ঞান আছে এবং তিনি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে মানবজাতিকে তা দান করেছেন। এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে, যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে এবং যারা করে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝে না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে মানুষ ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষা গ্রহণের সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

অভিবাসনের পর দশম বছর

উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের দশম বছরে, ইসলাম গ্রহণের পর একটি প্রতিনিধিদল মদিনায় সফর করে। এই গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হজ্জের সময় নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে অত্যন্ত কঠোর এবং অভদ্র আচরণ করেছিল। মদিনায় হিজরতের পূর্বে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যে সকল ব্যক্তিদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন, তাদের মধ্যে একজনকে তিনি চিনতে পেরেছিলেন, কিন্তু তার সমালোচনা করেননি। ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২২-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ৬৮৫৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি বরং ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং উপেক্ষা করেছেন।

যখন অন্য কোন বিকল্প অবশিষ্ট থাকে না, তখন মুসলমানদেরকে আনুপাতিক এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে আত্মরক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের কখনই সীমা লঙ্ঘন করা উচিত নয় কারণ এটি একটি পাপ। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৯০:

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

যেহেতু চিহ্ন অতিক্রম করা এড়ানো কঠিন, তাই একজন মুসলিমের ধৈর্য ধারণ করা, অন্যদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা উচিত কারণ এটি কেবল নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যই নয়, বরং মহান আল্লাহ্‌র কাছেও পৌঁছে দেয়, যিনি তাদের পাপ ক্ষমা করে দেন। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ২২:

"...এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন..."

অন্যদের ক্ষমা করা অন্যদের চরিত্রকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রেও আরও কার্যকর, যা ইসলামের উদ্দেশ্য এবং মুসলমানদের উপর কর্তব্য, কারণ প্রতিশোধ নেওয়া কেবল জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও শত্রুতা এবং ক্রোধের জন্ম দেয়।

যাদের অন্যদের ক্ষমা না করার বদ অভ্যাস আছে এবং ছোটখাটো বিষয়েও সবসময় ক্ষোভ পোষণ করে, তারা হয়তো দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করেন না বরং তাদের প্রতিটি ছোট পাপ পরীক্ষা করেন। একজন মুসলিমের উচিত সবকিছু ছেড়ে দেওয়া শেখা কারণ এর ফলে উভয় জগতেই ক্ষমা লাভ হয়। উপরন্তু, যখন কেউ তাদের বিরক্তিকর প্রতিটি ছোটখাটো বিষয় ধরে রাখার অভ্যাস গ্রহণ করে তখন মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। অতএব,

অন্যদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা শেখা একজনকে ছোটখাটো বিষয়গুলি ছেড়ে দিতে সাহায্য করে, যা তাদের মানসিক শান্তি অর্জনে সহায়তা করে।

পরিশেষে, মূল হাদিসটির অর্থ এই নয় যে অন্যরা যখন সীমা অতিক্রম করে, তখন আত্মরক্ষা করা উচিত নয়, কারণ ইসলাম দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতা শেখায়। উপরন্তু, যখন কেউ অন্যদের ক্ষমা করে, তার অর্থ এই নয় যে তাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত বা স্বাভাবিকভাবেই তাদের সাথে মেলামেশা চালিয়ে যাওয়া উচিত। এতে কেবল তাদের উপর আবার অন্যায় হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহর জন্য অন্যদের ক্ষমা করা উচিত, তাদের ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের অধিকার পূরণ করতে হবে এবং অতীতে যারা তাদের উপর অন্যায় করেছে তাদের সাথে আচরণ করার সময় সতর্কতার সাথে চলতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয় এবং তারা উভয় জগতেই আশীর্বাদ এবং প্রতিদান লাভ করে।

শত্রুদের পরাস্ত করা

মদিনায় হিজরতের দশম বছরে, তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) এর নেতৃত্বে একটি দলকে অমুসলিম গোত্র বনু আল হারিস বিন কা'বকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাদের একটি প্রতিনিধিদল মদীনা সফর করে। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের জিজ্ঞাসা করেন যে ইসলাম গ্রহণের আগে তারা কীভাবে তাদের শত্রুদের উপর অবিচলভাবে জয়লাভ করেছিল। তারা উত্তর দেয় যে তারা ঐক্যবদ্ধ থেকে এবং কারও প্রতি অবিচার না করেই এটি অর্জন করেছে। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৩৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪১ নম্বর হাদিসে সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রথমে মুসলমানদের একে অপরকে হিংসা না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

যখন একজন ব্যক্তি অন্য কারোর অর্থপূর্ণ আশীর্বাদ পেতে চায়, তখন সে চায় মালিক যেন সেই আশীর্বাদ হারিয়ে ফেলুক। এবং এর সাথে এই বিষয়টিও জড়িত যে, মালিককে তার পরিবর্তে মহান আল্লাহ তাআলা আশীর্বাদ দিয়েছেন। কেউ কেউ কেবল এটি তাদের হৃদয়ে প্রকাশ করতে চান, তাদের কর্ম বা কথার মাধ্যমে তা প্রকাশ না করে। যদি তারা তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি অপছন্দ করে, তাহলে আশা করা যায় যে তাদের হিংসার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। কেউ কেউ তাদের কথা এবং কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে আশীর্বাদ কেড়ে নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, যা নিঃসন্দেহে একটি পাপ। সবচেয়ে খারাপ ধরণ হল যখন একজন ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, এমনকি ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি আশীর্বাদ না পেলেও।

হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তার অনুভূতির উপর নির্ভর করে না, তার অনুভূতি অপছন্দ করে এবং পরিবর্তে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে যাতে মালিক তার আশীর্বাদ হারাতে না পারে। যদিও এই ধরণের হিংসা পাপ নয় তবুও এটি অপছন্দনীয় যদি হিংসা পার্থিব আশীর্বাদের উপর হয় এবং কেবল ধর্মীয় আশীর্বাদের সাথে জড়িত থাকলে প্রশংসনীয় হয়। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিমের ১৮৯৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল যখন একজন ব্যক্তি এমন ব্যক্তির প্রতি হিংসা করে যে হালাল সম্পদ অর্জন করে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যয় করে। দ্বিতীয়টি হল যখন একজন ব্যক্তি এমন ব্যক্তির প্রতি হিংসা করে যে তার জ্ঞান এবং জ্ঞানকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করে এবং অন্যদের তা শিক্ষা দেয়।

পূর্বে উল্লেখিত খারাপ ধরণের হিংসা, সরাসরি আল্লাহর পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন আল্লাহ, তার পরিবর্তে অন্য কাউকে একটি বিশেষ আশীর্বাদ প্রদান করে ভুল করেছেন। এই কারণেই এটি একটি মহাপাপ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক সতর্ক করা হয়েছে যে, সুনানে আবু দাউদের ৪৯০৩ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, হিংসা নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয় ঠিক যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

একজন ঈর্ষাপরায়ণ মুসলিমকে জামে আত তিরমিযী, ২৫১৫ নম্বরে বর্ণিত হাদিসের উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি পরামর্শ দেয় যে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অন্যদের জন্য তাই ভালোবাসে। তাই একজন ঈর্ষাপরায়ণ মুসলিমের উচিত, ঈর্ষা করা ব্যক্তির প্রতি ভালো চরিত্র এবং দয়া প্রদর্শন করে তার হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তার ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং

তার জন্য প্রার্থনা করা যতক্ষণ না তার ঈর্ষা তার জন্য ভালোবাসায় পরিণত হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, তাদের ঈর্ষা করা ব্যক্তির অধিকার পূরণ করা চালিয়ে যাওয়া উচিত। তাদের ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করা উচিত যাতে তারা বুঝতে পারে যে, মহান আল্লাহ প্রতিটি ব্যক্তিকে সর্বোত্তম জিনিস দান করেন এবং যদি তাদের কোন বিশেষ পার্থিব নিয়ামত না দেওয়া হয়, তাহলে এর অর্থ হল এটি না থাকাই তাদের জন্য ভালো। সূরা ২ আল বাকারাহ, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে আরেকটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলিমদের একে অপরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এর অর্থ হলো, আল্লাহ যদি কোন কিছু অপছন্দ করেন, তবেই কেবল তা অপছন্দ করা উচিত। সুনানে আবু দাউদের ৪৬৮১ নম্বর হাদিসে ঈমান পূর্ণ করার একটি দিক হিসেবে এটি বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী জিনিস বা মানুষ অপছন্দ করা উচিত নয়। যদি কেউ অন্য কাউকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী অপছন্দ করে, তাহলে তাদের কথা বা কাজে কখনোই এর প্রভাব পড়তে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি পাপ। একজন মুসলিমের উচিত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, সম্মান ও সদয়তার সাথে অন্যের সাথে আচরণ করে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা। একজন মুসলিমের মনে রাখা উচিত যে, অন্যরা যেমন নিখুঁত নয়, তেমনই তারাও নিখুঁত নয়। এবং যদি অন্যদের মধ্যে খারাপ গুণাবলী থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে তাদেরও ভালো গুণাবলী থাকবে। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের তাদের খারাপ গুণাবলী ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত, কিন্তু তাদের ভালো গুণাবলীকে ভালোবাসতে হবে। একজন মুসলিমের অবশ্যই পাপ অপছন্দ করা উচিত, কিন্তু ব্যক্তিকে নয়, কারণ একজন ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহর কাছে তওবা করতে পারে। তাদের অবশ্যই ইসলামের সীমানার মধ্যে পাপের প্রতি তাদের অপছন্দ প্রদর্শন করতে হবে। তাদের উচিত মন্দ কাজের বিরুদ্ধে অন্যদেরকে

নম্রভাবে উপদেশ দেওয়া, কারণ কঠোর আচরণ প্রায়শই মহান আল্লাহর দিকে ফিরে আসা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়।

এই বিষয়ে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। যে মুসলিম কোন নির্দিষ্ট আলেমকে অনুসরণ করে এবং একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের সমর্থক, তার উচিত একজন ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তার আলেম সর্বদা সঠিক, এবং সেই সাথে যারা তাদের আলেমের মতামতের বিরোধিতা করে তাদের ঘৃণা করা উচিত নয়। এই আচরণ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আলেমদের মধ্যে বৈধ মতপার্থক্য থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত একজন নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণকারী মুসলিমের উচিত এটিকে সম্মান করা এবং অন্যদের অপছন্দ করা নয় যারা তাদের অনুসরণকারী আলেমের বিশ্বাসের সাথে ভিন্ন।

আলোচ্য মূল হাদিসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, মুসলিমদের একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। এর অর্থ হলো, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের পার্থিব বিষয় নিয়ে অন্য মুসলিমদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় এবং তাদের সমর্থন করতে অস্বীকার করা উচিত নয়। সহিহ বুখারির ৬০৭৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, একজন মুসলিমের জন্য পার্থিব বিষয় নিয়ে অন্য মুসলিমের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা অবৈধ। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি পার্থিব বিষয় নিয়ে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকে সেই ব্যক্তির মতো বিবেচনা করা হয় যে অন্য মুসলিমকে হত্যা করেছে। সুনানে আবু দাউদের ৪৯১৫ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা কেবল ঈমানের ক্ষেত্রেই বৈধ। তবুও একজন মুসলিমের উচিত অন্য মুসলিমকে আন্তরিকভাবে তওবা করার পরামর্শ দেওয়া এবং কেবল তখনই তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা যদি তারা উন্নতির জন্য পরিবর্তন করতে অস্বীকৃতি জানায়। যখন তাদের অনুরোধ করা হয় তখন তাদের বৈধ বিষয়গুলিতে তাদের সমর্থন করা উচিত, কারণ এই দয়ার কাজ তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে তওবা করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আলোচ্য মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলিমদের একে অপরের ভাইয়ের মতো থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি কেবল তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন তারা এই হাদিসে দেওয়া পূর্ববর্তী উপদেশ মেনে চলে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্য মুসলিমদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করে, যেমন ভালো কাজে অন্যদের সাহায্য করা এবং মন্দ কাজ থেকে সতর্ক করা। ৫ম সূরা আল মায়িদা, আয়াত ২:

"...এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

সহীহ বুখারীতে ১২৪০ নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে যে, একজন মুসলিমের উচিত অন্য মুসলিমদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলো পূরণ করা: ইসলামিক সালামের জবাব দেওয়া, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তাদের জানাজায় অংশ নেওয়া এবং হাঁচি দেওয়া ব্যক্তিকে আল্লাহর প্রশংসা করার জবাব দেওয়া। একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যান্য মানুষের, বিশেষ করে অন্যান্য মুসলিমদের, তাদের উপর যে অধিকার রয়েছে তা শিখতে হবে এবং পূরণ করতে হবে, কারণ বিচারের দিন প্রতিটি ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তারা অন্য মানুষের অধিকার পূরণ করেছে কিনা। অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা মানুষের কাছ থেকে আচরণ পেতে চায়।

আলোচ্য মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুসলিমের অন্য মুসলিমের সাথে অন্যায় করা, তাকে ত্যাগ করা বা ঘৃণা করা উচিত নয়।

একজন ব্যক্তি যে পাপ করে তা ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপীকে এমনভাবে ঘৃণা করা উচিত নয় যে তারা যেকোনো সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে।

সুনানে আবু দাউদের ৪৮৮৪ নম্বর হাদিসে মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্য মুসলিমকে অপমান করে, আল্লাহ তাকে অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে অপমান থেকে রক্ষা করবে, আল্লাহ তাকে হেফাজত করবেন।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে উল্লেখিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি যখন কেউ অহংকার গ্রহণ করে তখন বিকশিত হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিস অনুসারে, অহংকার হল যখন কেউ অন্যদের অবজ্ঞার চোখে দেখে। অহংকারী ব্যক্তি নিজেকে নিখুঁত মনে করে এবং অন্যদের অসম্পূর্ণ মনে করে। এটি তাকে অন্যদের অধিকার পূরণ করতে বাধা দেয় এবং অন্যদের অপছন্দ করতে উৎসাহিত করে। এবং অহংকার একজনকে সত্য উপস্থাপন করা হলে তা প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করে, কারণ এটি তাদের কাছ থেকে আসেনি এবং তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত আরেকটি বিষয় হলো, প্রকৃত তাকওয়া মানুষের শারীরিক চেহারা, যেমন ইসলামী পোশাক পরিধানের মধ্যে নয়, বরং এটি একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। এই অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বাহ্যিকভাবে আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এটি নিশ্চিত করে যে কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। এই কারণেই সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নম্বর হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, যখন আধ্যাত্মিক হৃদয় পবিত্র হয়, তখন পুরো শরীর পবিত্র হয়ে

যায় কিন্তু যখন আধ্যাত্মিক হৃদয় কলুষিত হয়, তখন পুরো শরীর কলুষিত হয়ে যায়। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ বাহ্যিক চেহারা, যেমন সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের উদ্দেশ্য এবং কর্ম বিবেচনা করেন। সহীহ মুসলিমের ৬৫৪২ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, একজন মুসলিমকে ইসলামের শিক্ষা শেখার এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং সৃষ্টির সাথে তাদের যোগাযোগের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য মূল হাদিসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, একজন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমকে ঘৃণা করা পাপ। এই ঘৃণা পার্থিব জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের অপছন্দ না করা। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা এবং ঘৃণা করা, নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। সুনানে আবু দাউদের ৪৬৮১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তবুও, একজন মুসলিমকে অবশ্যই সকল ক্ষেত্রেই অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে এবং কেবল তাদের পাপকেই ঘৃণা করতে হবে, প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে। উপরন্তু, তাদের অপছন্দ কখনই তাদেরকে ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে না, কারণ এটি প্রমাণ করবে যে তাদের ঘৃণা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। পার্থিব কারণে অন্যদের ঘৃণা করার মূল কারণ হল অহংকার। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এক অণু পরিমাণ অহংকার একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহিহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মূল হাদিসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, একজন মুসলিমের জীবন, সম্পত্তি এবং সম্মান সবকিছুই পবিত্র। একজন মুসলিমের উচিত এই অধিকারগুলির কোনওটিই লঙ্ঘন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসায়ী, ৪৯৯৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা

করেছেন যে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুসলিম হতে পারে না যতক্ষণ না সে অমুসলিম সহ অন্যদের ক্ষতিকর কথাবার্তা এবং কাজ থেকে রক্ষা করে। আর একজন প্রকৃত মুমিন হলেন সেই ব্যক্তি যিনি অন্যদের জীবন ও সম্পত্তি থেকে তাদের মন্দ কাজ দূরে রাখেন। যে ব্যক্তি এই অধিকার লঙ্ঘন করে তাকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তার শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেন। যদি তারা তা না করে, তাহলে বিচারের দিন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে অত্যাচারীর সৎকর্ম ভুক্তভোগীকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে ভুক্তভোগীর পাপ ভুক্তভোগীকে দেওয়া হবে। এর ফলে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহিহ মুসলিমে, ৬৫৭৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই সতর্কীকরণ করা হয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের সাথে ঠিক সেই আচরণ করা যেমন সে চায় অন্যরা তার সাথে করুক। এটি একজন ব্যক্তির জন্য অনেক আশীর্বাদ বয়ে আনবে এবং তাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করবে।

এছাড়াও, আলোচিত মূল ঘটনাটিতে শত্রুদের পরাস্ত করার বৈশিষ্ট্য হিসেবে কারও প্রতি অন্যায় শুরু না করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম মুনজারীর "সচেতনতা ও আশঙ্কা", ২৫৫৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় যে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ব্যক্তিকে সুসংবাদ দিয়েছেন যার মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা নেই। বিনয়ী ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের প্রতি আত্মসমর্পণ করে, গ্রহণ করে এবং তার উপর আমল করে, যার ফলে তার প্রতি তাদের দাসত্ব প্রমাণিত হয়। যখন সত্য তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয় তখন তারা তা সহজেই গ্রহণ করে, এমনকি যদি তা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে এবং কে তা তাদের কাছে পৌঁছে দেয় তা নির্বিশেষে। অর্থাৎ, তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে না এই বিশ্বাসে যে তারা সবচেয়ে ভালো জানে। তারা

অন্যদেরকে ছোট করে দেখে না, বিশ্বাস করে যে তারা তাদের কাছে থাকা যেকোনো পার্থিব জিনিসের কারণে বা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যের কারণে তারা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তারা বোঝে যে তাদের কাছে থাকা সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দ্বারা সৃষ্ট এবং তাদের জন্য প্রদত্ত। অতএব, তাদের গর্ব করার কিছু নেই। অধিকন্তু, তারা বোঝে যে, সৎকর্ম করা কেবলমাত্র মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমেই সম্ভব, কারণ সৎকর্ম করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ, শক্তি এবং ক্ষমতা সবই মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসে। এছাড়াও, কেবল একজন বোকা ব্যক্তিই অহংকার গ্রহণ করে কারণ সে তার চূড়ান্ত পরিণতি বা অন্যদের চূড়ান্ত পরিণতি জানে না। অর্থাৎ, তারা মৃত্যুবরণ করতে পারে যখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট নন এবং এমনকি অবিশ্বাসের অবস্থায়ও। এই সত্যগুলি বোঝা একজন ব্যক্তিকে অহংকারের মতো মারাত্মক পাপ থেকে বিরত রাখবে। যার এক অণু পরিমাণও একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহিহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতার অর্থ হল একজন মুসলিম সর্বদা অন্যদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে কিন্তু প্রয়োজনে আত্মরক্ষা করতে এবং সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে ভয় পায় না এবং তাদের নম্রতা অন্যদের চোখে তাদের অপমানিত ও অপমানিত করে না।

ইয়েমেনে গভর্নরদের প্রেরণ

আপনার কর্তৃত্বের অধীনে

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের দশম বছরে, তিনি আবু মুসা আল আশআরী এবং মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়েমেনের দুটি প্রদেশের শাসনভার পরিচালনার জন্য প্রেরণ করেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৩৫-১৩৬-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ২৪০৯ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি ব্যক্তি একজন অভিভাবক এবং তাই তার তত্ত্বাবধানে থাকা জিনিসপত্রের জন্য দায়ী।

একজন মুসলিমের সবচেয়ে বড় রক্ষাকর্তা হলো তার ঈমান। অতএব, তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে এর দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

এই অভিভাবকত্বের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ, যার মধ্যে রয়েছে বাহ্যিক জিনিস, যেমন সম্পদ, এবং অভ্যন্তরীণ জিনিস, যেমন দেহ। একজন মুসলিমকে ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতিতে এই জিনিসগুলি ব্যবহার করে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিমের

উচিত কেবল হালাল জিনিস দেখার জন্য চোখ ব্যবহার করা, কেবল হালাল ও কল্যাণকর কথা বলা এবং তাদের সম্পদ কল্যাণকর ও পুণ্যময় উপায়ে ব্যবহার করা।

এই অভিভাবকত্ব তার জীবনের অন্যান্যদের, যেমন আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একজন মুসলিমকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার পূরণ করে, যেমন তাদের ভরণপোষণ করা এবং সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশেষ করে পার্থিব বিষয়গুলিতে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের তাদের সাথে সদয় আচরণ করা উচিত এই আশায় যে তারা আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হবে। এই অভিভাবকত্বের মধ্যে একজনের সন্তানরাও অন্তর্ভুক্ত। একজন মুসলিমকে উদাহরণ দিয়ে তাদের নেতৃত্ব দিতে হবে, কারণ এটি শিশুদের পরিচালনার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তাদের অবশ্যই পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, কার্যত যেমন মহান আল্লাহকে মেনে চলতে হবে এবং তাদের সন্তানদেরও একই কাজ করতে শেখাতে হবে। এর মূলে রয়েছে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা।

পরিশেষে, এই হাদিস অনুসারে, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু দায়িত্ব রয়েছে যা তাদের উপর অর্পিত হয়েছে। তাই তাদের উচিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান অর্জন করা এবং তা পালনের জন্য কাজ করা, কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ, এবং তাই বিচারের দিনে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৩৪:

"...এবং [প্রত্যেক] অঙ্গীকার পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সর্বদা [যার বিষয়ে] জিজ্ঞাসা করা হবে।"

আরাম এবং সুখবর

আবু মুসা এবং মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) কে ইয়েমেনের দুটি প্রদেশের শাসনভার প্রদানের জন্য প্রেরণ করার সময়, মহানবী (সাঃ) তাদেরকে কঠোর নয় বরং নম্র হতে এবং সুসংবাদ প্রদান করতে এবং মানুষকে ভয় দেখানো থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৩৫-১৩৬-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজন মুসলিমের উচিত সর্বদা নিজেদের জন্য সবকিছু সহজ করে তোলা, প্রথমে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে, যাতে তারা তাদের বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালন করতে পারে, মহানবী (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য অনুসরণ করতে পারে এবং তাদের এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করতে পারে। এটি তাদের বৈধ জিনিসপত্র উপভোগ করার জন্য প্রচুর সময় দেবে, অপচয় বা অপচয় না করে। একজন মুসলিমের উচিত স্বেচ্ছাসেবী সৎকর্মের ক্ষেত্রে তাদের শক্তি অনুসারে কাজ করা এবং নিজেদের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো নয়, কারণ এটি ইসলামে অপছন্দনীয়। সহিহ বুখারী, ৬৪৬৫ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি সর্বদা সর্বোত্তম।

এছাড়াও, মুসলমানদের উচিত অন্যদের জন্য, বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়ে সহজ করে তোলা, যাতে মানুষ ইসলামের প্রতি বিতৃষ্ণা না পোষণ করে, বিশ্বাস করে যে এটি একটি বোঝাপড়াপূর্ণ ধর্ম, অথচ এটি একটি সহজ এবং সহজ ধর্ম। ইমাম বুখারীর "আদাব আল মুফরাদ", ২৮৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্যদের, বিশেষ করে শিশুদের শেখানো গুরুত্বপূর্ণ। যদি শিশুরা ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে ইসলাম একটি কঠিন ধর্ম, তারা বড় হওয়ার সাথে সাথে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। শিশুদের শেখানো উচিত যে ইসলামের কিছু

বাধ্যবাধকতা রয়েছে যা পালন করতে খুব বেশি সময় লাগে না এবং তাদের জন্য ভালো এবং স্বাস্থ্যকর উপায়ে আনন্দ করার জন্য প্রচুর সময় থাকে।

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ধর্মীয় বিষয়ে নিজের জন্য বা অন্যদের জন্য জিনিসপত্র সহজ করে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজন মুসলিম অলস থাকবে এবং অন্যদেরও অলস হতে শেখাবে, কারণ ন্যূনতম বাধ্যবাধকতাগুলি সর্বদা পালন করতে হবে, যদি না ইসলাম তাকে অব্যাহতি দেয়। যে ব্যক্তি অলসভাবে কাজ করে সে মহান আল্লাহকে মান্য করছে না, কেবল তার নিজস্ব ইচ্ছাকে মান্য করছে।

অন্যদের জন্য কাজ সহজ করার আরেকটি দিক হল একজন মুসলিম অন্যদের কাছ থেকে তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি না করা। পরিবর্তে, তাদের প্রদত্ত উপায়গুলি, যেমন তাদের শারীরিক বা আর্থিক শক্তি, নিজেদের সাহায্য করার জন্য এবং অন্যদের জন্য কাজ সহজ করার জন্য ব্যবহার করা উচিত। কিছু ক্ষেত্রে, অন্যদের অধিকার পূরণে ব্যর্থতা শাস্তির কারণ হতে পারে। অন্যদের জন্য কাজ সহজ করার জন্য একজন মুসলিমের কেবল কিছু ক্ষেত্রেই তাদের অধিকার দাবি করা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলিমের অন্যদের অধিকার পূরণের চেষ্টা করা উচিত নয় বরং এর অর্থ হল তাদের উচিত যাদের উপর তাদের অধিকার আছে তাদের উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করার চেষ্টা করা। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতা তাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে একটি নির্দিষ্ট ঘরের কাজ থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন এবং যদি তাদের কাছে কোনও ঝামেলা ছাড়াই তা করার সামর্থ্য থাকে, বিশেষ করে যদি তাদের সন্তান কাজ থেকে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। এই নম্রতা এবং করুণা কেবল মহান আল্লাহকে তাদের প্রতি আরও করুণা করবে না বরং এটি তাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাও বৃদ্ধি করবে। যে সর্বদা তাদের পূর্ণ অধিকার দাবি করে সে পাপী নয় তবে তারা যদি এইভাবে আচরণ করে তবে তারা এই পুরস্কার এবং ফলাফল হারাবে।

মুসলমানদের উচিত অন্যদের জন্য সহজ করে দেওয়া এবং আশা করা উচিত যে মহান আল্লাহ তাদের জন্য এই দুনিয়া ও আখেরাতে সহজ করে দেবেন। কিন্তু যারা অন্যদের জন্য কঠিন করে তোলে তারা হয়তো দেখতে পাবে যে মহান আল্লাহ উভয় জগতেই তাদের জন্য কঠিন করে তোলেন।

একজন মুসলিমের উচিত নিজেকে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর অগণিত নেয়ামত এবং তিনি এই পৃথিবীতে এবং পরকালে মুসলিমদের উপর যে মহান প্রতিদান দান করেন, তার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া, যারা তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহান নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, এই পদ্ধতি মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে আরও কার্যকর। শুধুমাত্র কিছু ক্ষেত্রে যখন কেউ ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা করে এবং আল্লাহকে অমান্য করে, আশা করে যে তারা সফল হবে, তখন একজন মুসলিম তাদের কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে, তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় জাগিয়ে তোলে।

ভারসাম্যই সর্বোত্তম, যেখানে কেউ আল্লাহর উপর আশা রেখে তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর প্রতি ভয়কে উৎসাহিত করে পাপ থেকে বিরত থাকে। আর যখনই কেউ ভারসাম্যহীন বোধ করে অথবা অন্যদের ভারসাম্যহীন হতে দেখে, তখন একজন মুসলিমের উচিত নিজেকে এবং অন্যদের সঠিক মধ্যম পথে ফিরিয়ে আনার জন্য যথাযথভাবে কাজ করা।

ভালো কাজে সাহায্য করুন

ইয়েমেনের দুটি প্রদেশের শাসনকর্তা হিসেবে আবু মুসা এবং মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) কে প্রেরণ করার সময়, মহানবী (সাঃ) তাদেরকে একে অপরের সাথে সহযোগিতা করার এবং একে অপরের সাথে বিরোধ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৩৫-১৩৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ধার্মিক পূর্বসূরীদের মৃত্যুর পর থেকে মুসলিম জাতির শক্তি নাটকীয়ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এটা যুক্তিসঙ্গত যে, একটি দলের লোক সংখ্যা যত বেশি হবে, সেই দল তত শক্তিশালী হবে, তবুও মুসলমানরা এই যুক্তিকে অস্বীকার করেছে। মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মুসলিম জাতির শক্তি কেবল হ্রাস পেয়েছে। এটি হওয়ার একটি প্রধান কারণ পবিত্র কুরআনের ৫ম সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ২ এর সাথে সম্পর্কিত:

"... আর সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

মহান আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন ভালো কাজে একে অপরকে সাহায্য করে এবং খারাপ কাজে একে অপরকে সাহায্য না করে। এই নির্দেশই নেককার পূর্বসূরীগণ পালন করেছিলেন কিন্তু অনেক মুসলিম তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অনেক মুসলিম এখন দেখেন কে কোন কাজ করছে, তারা কি করছে তা দেখার পরিবর্তে। যদি সেই ব্যক্তি তাদের সাথে সম্পর্কিত হয়, যেমন কোন আত্মীয়, তাহলে তারা তাকে

সমর্থন করে, এমনকি যদি জিনিসটি ভালো না হয়। একইভাবে, যদি সেই ব্যক্তির সাথে তাদের কোন সম্পর্ক না থাকে, তাহলে তারা তাকে সমর্থন করা থেকে বিরত থাকে, এমনকি যদি জিনিসটি ভালো হয়। এই মনোভাব নেককার পূর্বসূরীগণের ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে। তারা অন্যদের ভালো কাজে সাহায্য করত, তা নির্বিশেষে যারাই করুক না কেন। প্রকৃতপক্ষে, তারা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের উপর এতটাই নির্ভরশীল ছিল যে, তারা এমন কাউকেও সমর্থন করত যাদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল না যতক্ষণ না এটি একটি ভালো কাজ ছিল।

এর সাথে যুক্ত আরেকটি বিষয় হল, অনেক মুসলিম একে অপরকে ভালো কাজে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা যাকে সমর্থন করছে সে তাদের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে। এই অবস্থা এমনকি পণ্ডিত এবং ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও প্রভাবিত করেছে। তারা অন্যদের ভালো কাজে সাহায্য না করার জন্য নানা অজুহাত তৈরি করে কারণ তাদের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই এবং তারা ভয় পায় যে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ভুলে যাবে এবং তারা যাদের সাহায্য করে তারা সমাজে আরও সম্মান পাবে। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল কারণ সত্যটি পর্যবেক্ষণ করার জন্য কেবল ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কারো উদ্দেশ্য আল্লাহকে খুশি করা, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যদের ভালো কাজে সহায়তা করলে সমাজের মধ্যে তাদের সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ, মহান, মানুষের হৃদয় তাদের দিকে ফিরিয়ে দেবেন, এমনকি যদি তাদের সমর্থন অন্য কোনও সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির জন্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এই পৃথিবী থেকে চলে যান, তখন উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) সহজেই খিলাফতের জন্য চ্যালেঞ্জ জানাতে পারতেন এবং তার পক্ষে প্রচুর সমর্থন পেতেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে সঠিক কাজটি হল আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে মনোনীত করা। উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-কে, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন, অন্য কাউকে সমর্থন করলে সমাজ তাঁকে ভুলে যাবে বলে চিন্তিত ছিলেন না। বরং তিনি পূর্বে উল্লিখিত আয়াতের আদেশ পালন করেছিলেন এবং যা সঠিক তা সমর্থন করেছিলেন। সহীহ বুখারীতে ৩৬৬৭ এবং ৩৬৬৮ নম্বরে প্রাপ্ত হাদিসগুলিতে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এই কাজের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর সম্মান ও সম্মান বৃদ্ধি

পেয়েছে। যারা ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে অবগত আছেন তাদের কাছে এটি স্পষ্ট।

মুসলমানদের এই বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত, তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করা উচিত এবং অন্যদের কল্যাণে সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত, তা কে করছে তা বিবেচনা না করেই। তাদের সমর্থনের ফলে সমাজে তাদের ভুলে যাওয়া হবে এই ভয়ে পিছপা হওয়া উচিত নয়। যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তারা ইহকাল ও পরকাল উভয় জায়গাতেই কখনও ভুলে যাবে না। প্রকৃতপক্ষে, তাদের সম্মান ও সম্মান উভয় জায়গাতেই বৃদ্ধি পাবে।

অন্ধকার এড়িয়ে চলুন

আবু মুসা এবং মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) কে ইয়েমেনের দুটি প্রদেশের শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণের সময়, মহানবী (সাঃ) তাদেরকে মজলুমের অভিশাপকে ভয় করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কারণ তাদের এবং মহান আল্লাহর মধ্যে কোন বাধা নেই। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীজীর জীবনী", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৩৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ২৪৪৭ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, বিচারের দিন অত্যাচার অন্ধকারে পরিণত হবে।

এটি এড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ যারা নিজেদেরকে অন্ধকারে ডুবে থাকতে দেখেন তাদের জান্নাতে যাওয়ার পথ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। যাদেরকে পথপ্রদর্শক আলো দেওয়া হবে কেবল তারাই এটি সফলভাবে করতে পারবে। অতএব, নিপীড়ন করা একজনকে এই আলো পেতে বাধা দেবে।

নির্যাতন অনেক রূপ নিতে পারে। প্রথম প্রকার হল যখন কেউ আল্লাহর আদেশ পালন করতে ব্যর্থ হয় এবং তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে। যদিও এর ফলে আল্লাহর অসীম মর্যাদার উপর কোন প্রভাব পড়ে না, তবুও এটি তাকে উভয় জগতেই অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪২৪৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যখনই একজন ব্যক্তি পাপ করে, তখন তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে। তারা যত বেশি পাপ করবে, ততই তার হৃদয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। এটি তাদের এই পৃথিবীতে সত্য নির্দেশনা গ্রহণ এবং

অনুসরণ করতে বাধা দেবে। ফলস্বরূপ, এটি পরবর্তী জগতে অন্ধকারের দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় ৮৩ আল মুতাফিফিন, আয়াত ১৪:

"না! বরং, তারা যা অর্জন করেছিল তার কলঙ্ক তাদের হৃদয়কে ঢেকে দিয়েছে।"

পরবর্তী ধরণের জুলুম হল যখন কেউ নিজের উপর জুলুম করে, আল্লাহ তাআলার দেওয়া আমানত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়ে, যা তার দেহ ও সম্পদের মতো পার্থিব আমানতের আকারে তাকে দেওয়া হয়েছে। এই আমানত তখনই পূর্ণ হয় যখন কেউ তাকে প্রদত্ত প্রতিটি আমানতকে এমনভাবে ব্যবহার করে যা সর্বশক্তিমান, সকল আমানতের স্রষ্টা এবং মালিক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

এইসব আশীর্বাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ হলো ঈমান। ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে এটিকে সুরক্ষিত এবং শক্তিশালী করতে হবে। ঈমান হলো একটি উদ্ভিদের মতো যাকে ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং আমল করার মাধ্যমে ক্রমাগত যত্ন এবং লালন-পালন করতে হবে। এই উদ্ভিদের মৃত্যু মানুষের ঈমানের আলোকে নিভিয়ে দেবে, যার ফলে তারা উভয় জগতেই অন্ধকারে ডুবে যাবে।

চূড়ান্ত ধরণের অত্যাচার হলো যখন কেউ অন্যের সাথে দুর্ব্যবহার করে। মহান আল্লাহ তায়ালা এই পাপগুলো ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না অত্যাচারীর শিকার ব্যক্তি প্রথমে তাদের ক্ষমা করে। যেহেতু মানুষ এত করুণাময় নয়, তাই এটি হওয়ার সম্ভাবনা কম। তারপর বিচারের দিনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে অত্যাচারীর সৎকর্ম তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে শিকারের পাপের প্রতিদান অত্যাচারীকে দেওয়া হবে। এর ফলে অত্যাচারীকে জাহান্নামে

নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহিহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যদের সাথে সেভাবেই আচরণ করে এই পরিণতি এড়াতে হবে যেভাবে তারা মানুষের কাছ থেকে আচরণ পেতে চায়।

একজন মুসলিম যদি ইহকাল ও পরকালে পথপ্রদর্শক হতে চান, তাহলে তাকে সকল প্রকার নির্যাতন এড়িয়ে চলতে হবে।

নবীর সাহচর্য

মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়েমেনের একটি প্রদেশের শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণের সময়, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনা থেকে বেরিয়ে তাঁর বাহনের সাথে সাথে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাঁকে কিছু বিদায়ী উপদেশ দেওয়ার পর, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মন্তব্য করেছিলেন যে, সম্ভবত সেই বছরের পর তিনি আর তাঁর সাথে দেখা করবেন না এবং মুয়ায (রাঃ) পরের বার তাঁর কবরের পাশ দিয়ে যাবেন। তাঁর মন্তব্যের জবাবে, মুয়ায (রাঃ) নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ভালোবাসায় কেঁদে ফেলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ)-এর জীবনী", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৩৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মু'আয (রাঃ) উভয় জগতেই মহানবী (সাঃ) এর সঙ্গী হওয়ার ইচ্ছা বাস্তবে প্রমাণ করেছেন এবং যদি কেউ এই নবীর সাহচর্য কামনা করে, তাহলে তাদেরও একই কাজ করতে হবে।

প্রতিটি মুসলিম খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করে যে তারা পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), অন্যান্য নবীগণ, সাহাবীগণ এবং সাহাবীগণের সাহচর্য কামনা করে। তারা প্রায়শই সহীহ বুখারীতে ৩৬৮৮ নম্বর হাদিসটি উদ্‌ধৃত করে, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে একজন ব্যক্তি পরকালে যাদের ভালোবাসে তাদের সাথেই থাকবে। এবং এই কারণে তারা খোলাখুলিভাবে আল্লাহর এই নেক বান্দাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা ঘোষণা করে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তারা কীভাবে এই পরিণতি কামনা করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসার দাবি করে, অথচ তারা তাঁকে খুব কমই চেনে কারণ তারা তাঁর জীবন, চরিত্র এবং শিক্ষা অধ্যয়ন করতে ব্যস্ত। এটা বোকামি কারণ একজন ব্যক্তি কীভাবে সত্যিকার অর্থে এমন কাউকে ভালোবাসতে পারে যাকে তারা চেনেই না?

তাছাড়া, যখন এই লোকদের কাছে মহানবী (সাঃ) এর প্রতি তাদের ভালোবাসার প্রমাণ চাওয়া হবে, তখন বিচার দিবসে তারা কী বলবে? তারা কী উপস্থাপন করবে? এই ঘোষণার প্রমাণ হলো মহানবী (সাঃ) এর জীবন, চরিত্র এবং শিক্ষা অধ্যয়ন করা এবং তার উপর আমল করা। এই প্রমাণ ছাড়া কোন ঘোষণা মহান আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। এটি বেশ স্পষ্ট কারণ সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, তাদের চেয়ে ইসলামকে আর কেউ ভালোভাবে বুঝতে পারেনি এবং এটি তাদের মনোভাব ছিল না। তারা মহানবী (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা ঘোষণা করেছিলেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কর্মের মাধ্যমে তাদের দাবিকে সমর্থন করেছিলেন। এই কারণেই তারা পরকালে তাঁর সাথে থাকবেন।

যারা বিশ্বাস করে যে ভালোবাসা হৃদয়ে থাকে এবং কাজে তা প্রকাশের প্রয়োজন হয় না, তারা সেই ছাত্রের মতোই বোকা, যে তার শিক্ষকের কাছে খালি পরীক্ষার খাতা ফেরত দিয়ে দাবি করে যে জ্ঞান তার মনে আছে তাই তাকে বাস্তবে তা কাগজে লিখে রাখার প্রয়োজন নেই এবং তারপরও সে পাস করার আশা করে।

যে ব্যক্তি এমন আচরণ করে, সে আল্লাহর নেক বান্দাদের ভালোবাসে না, কেবল তাদের নিজেদের কামনা-বাসনাকেই ভালোবাসে এবং নিঃসন্দেহে শয়তান তাদের বোকা বানিয়েছে।

পরিশেষে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যান্য ধর্মের সদস্যরাও তাদের পবিত্র নবীদের প্রতি ভালোবাসার দাবি করে, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। কিন্তু যেহেতু তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে এবং তাদের শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই বিচারের দিনে তারা অবশ্যই তাদের সাথে থাকবে না। এই সত্যটি যদি কেউ একবার চিন্তা করে দেখে তবে এটি বেশ স্পষ্ট।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সবচেয়ে কাছের

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) কে মদীনা থেকে বের করে আনার সময়, মহানবী (সাঃ) মদীনার দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘোষণা করেন যে, তাঁর নিকটতম ব্যক্তিরা হলেন ধার্মিক, তারা যেই হোক না কেন এবং যেখানেই থাকুক না কেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৩৭-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদি কোন মুসলিম পরকালে মহানবী (সা.)-এর নৈকট্য কামনা করে, তাহলে তাকে অবশ্যই তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে। তাকওয়ার অর্থ হলো পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা, যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। অতএব, তাকওয়া একজন ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ভারসাম্য নিশ্চিত করে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তার জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেয়।

উপরন্তু, তাকওয়ার একটি দিক হল কিছু হালাল জিনিস এড়িয়ে চলা, কারণ এটি তাকে হারাম জিনিসের দিকে নিয়ে যাবে। সূরা ২, আল বাকারা, আয়াত ১৮৭:

"...এগুলো আল্লাহর [নির্ধারিত] সীমা, তাই এর কাছে যেও না..."

মহান আল্লাহ কখনও তাঁর সীমা লঙ্ঘন না করার কথা বলেননি, বরং তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে মানুষ যেন তাঁর সীমার কাছেও না যায়। পবিত্র কুরআন জুড়ে

এই উপদেশ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ হযরত আদম (আঃ)-কে জান্নাতের একটি গাছের ফল না খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু গাছের কাছেও না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যদিও এর কাছে যাওয়া বৈধ ছিল। ৭ম সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ১৯:

"আর" হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেখান থেকে ইচ্ছা খাও, কিন্তু এই গাছের কাছে যেও না, অন্যথায় তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"

অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যা ইঙ্গিত দেয় যে কেবল কিছু বৈধ বলেই তা করা উচিত নয়, কারণ মহান আল্লাহর সীমা অতিক্রম করা অবৈধ নয়, কেবল তা অতিক্রম করা অবৈধ। কিছু বৈধ জিনিস, যেমন অনর্থক জিনিস, এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি প্রায়শই অবৈধের দিকে পরিচালিত করে। উদাহরণস্বরূপ, অনর্থক কথাবার্তা, যা পাপ হিসাবে বিবেচিত হয় না, প্রায়শই পাপের দিকে পরিচালিত করে যেমন গীবত এবং মিথ্যা বলা। সম্পদের অনর্থক ব্যয় প্রায়শই অপব্যয় ব্যয়ের দিকে পরিচালিত করে, যা পাপ। অধ্যায় ১৭ আল ইসরা, আয়াত ২৭:

"নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই, আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।"

যারা বিপথগামী হয়ে পড়েছে তাদের অধিকাংশই ধাপে ধাপে এই পথে চলে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, তারা অবৈধ জিনিসগুলিতে অংশ না নিয়ে সেগুলিতে অংশ নিতে উৎসাহিত এবং প্রলুব্ধ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি মদ্যপানকারীদের সাথে থাকে, তার মদ্যপান করার সম্ভাবনা সেই ব্যক্তির তুলনায়

বেশি থাকে যারা মদ্যপানকারীদের সাথে থাকে না। কিছু হালাল জিনিস, বিশেষ করে অসার জিনিস, এড়িয়ে চলার এই মনোভাব এমনই, যা মহানবী (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৪৫১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, একজন ব্যক্তি ধার্মিক হতে পারে না, অর্থাৎ, ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করার উপর তারা অটল থাকতে পারে না, যতক্ষণ না তারা কিছু হালাল জিনিস ত্যাগ করে ভয়ে যে এটি তাদেরকে হারাম জিনিসের দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, কেবল হারাম জিনিস এড়িয়ে চলার দিকেই অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে হবে না, বরং কিছু হালাল জিনিস, বিশেষ করে অসার জিনিস এড়িয়ে চলার দিকেও অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে হবে, কারণ ভয়ে এটি তাদেরকে অবশেষে হারাম জিনিসের দিকে নিয়ে যাবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকবে, যার মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত, যা ন্যায়ের সারাংশ এবং উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১৮৭:

"... এভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ [অর্থাৎ, বিধান] স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।"

এবং ১৬ নং অধ্যায় আন নাহল, ৯৭ নং আয়াত:

"যে কেউ সৎ কর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অন্যদিকে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সীমারেখার কাছে না যাওয়ার গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়, সে হালাল জিনিসগুলিতে, বিশেষ করে অসার জিনিসগুলিতে অতিরিক্ত লিপ্ত হবে, যা তাদের অবৈধ জিনিসগুলিতে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে এবং তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধ্য করবে, যার ফলে উভয় জগতেই চাপ, অসুবিধা এবং ঝামেলার সৃষ্টি হবে, এমনকি তারা বিনোদনের মুহূর্তগুলিও উপভোগ করবে, কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতা থেকে বাঁচতে পারবে না। যারা এইভাবে আচরণ করে, যেমন ধনীদের, তাদের জীবন পর্যবেক্ষণ করলে এটি বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সূরা তওবার ৯, আয়াত ৮২:

"তাহলে তারা যেন অল্প হেসে ফেলে এবং [তারপর] অনেক কাঁদে, কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফলস্বরূপ।" তারা আগে আয় করত।"

অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

(সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) এবং মানুষের সাথে আচরণ

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়েমেনের একটি প্রদেশের শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণের সময়, মহানবী (সাঃ) তাকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছিলেন: সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভয় করা, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, পাপের পরে একটি সৎকর্ম করা যাতে পাপ মুছে যায় এবং অবশেষে মানুষের সাথে ভালো আচরণ করা। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীজীর জীবনী", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৩৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমটি হলো তাকওয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহকে ভয় করা। এটি তখনই অর্জন করা যায় যখন কেউ মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। এটি কেবল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জন করা যায়। এই উপদেশ ইসলামের সমস্ত শিক্ষা এবং কর্তব্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। যখন কেউ এইভাবে প্রচেষ্টা করে তখন তারা শেষ পর্যন্ত ঈমানের উচ্চ স্তরে পৌঁছাবে যাকে বলা হয় শ্রেষ্ঠত্ব। এটি তখনই হয় যখন কেউ এমনভাবে কাজ করে, যেমন নামায আদায় করা, যেন সে আল্লাহকে তা পালন করতে দেখছে। সহীহ মুসলিমের ৯৯ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি নিশ্চিত করে যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে। পরবর্তীটির মধ্যে রয়েছে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মানুষের অধিকার পূরণ করা। এটি সর্বোত্তমভাবে পূরণ করা হয় যখন মানুষ অন্যদের সাথে এমন আচরণ করে যেভাবে সে মানুষের সাথে আচরণ করতে চায়।

দ্বিতীয় উপদেশটি হলো, একজন মুসলিমের উচিত পাপের পর নেক আমল করা, যাতে পাপ মুছে যায়। এটি কেবল ছোট পাপের কথাই উল্লেখ করে কারণ বড়

পাপের জন্য আন্তরিক তওবা প্রয়োজন। যদি কেউ তাদের নেক আমলের সাথে আন্তরিক তওবা যোগ করে, তাহলে তা ছোট বা বড় যেকোনো পাপ মুছে ফেলবে। কিন্তু সৎকর্মের একটি অংশ হল পাপের পুনরাবৃত্তি না করার চেষ্টা করা, কারণ নেক আমলের পরে পাপ করার উদ্দেশ্যে পাপ করা একটি বিপজ্জনক বিভ্রান্তিকর মানসিকতা। পাপ না করার জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং যখন পাপ ঘটে, তখন তাকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। আন্তরিক তওবার মধ্যে অনুশোচনা করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার উপর অন্যায় করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া অন্তর্ভুক্ত, যতক্ষণ না এটি আরও ঝামেলার দিকে পরিচালিত করে, ততক্ষণ পর্যন্ত একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার এবং আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকার পূরণ করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

পরিশেষে, শেষ কথা হলো, মানুষের সাথে ভালো আচরণ করা। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভালো চরিত্রই হবে বিচার দিবসের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস। জামে আত তিরমিযী, ২০০৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে শেখানো মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর চরিত্র শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে এটি গ্রহণ করা উচিত। এর মাধ্যমে তাদের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভালো বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হবে। যারা অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, এমনকি যদি তারা আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে, তারা দেখতে পাবে যে বিচার দিবসে তাদের ভালো কাজগুলি তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপগুলি তাদের দেওয়া হবে। এর ফলে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহিহ মুসলিম, ৬৫৭৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বিলাসবহুল জীবন

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়েমেনের একটি প্রদেশের শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণ করার সময়, মহানবী (সাঃ) তাকে বিলাসিতা থেকে সাবধান থাকার জন্য সতর্ক করেছিলেন, কারণ মহান আল্লাহর বান্দারা বিলাসিতা খোঁজেন না। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৩৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহের ৪১১৮ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পরামর্শ দিয়েছেন যে, সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

ইসলাম মুসলমানদের তাদের সমস্ত সম্পদ এবং বৈধ কামনা-বাসনা ত্যাগ করতে শেখায় না বরং তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে, যেমন খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান এবং ব্যবসা, একটি সরল জীবনধারা গ্রহণ করতে শেখায়, যাতে তারা পরকালের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য অবসর সময় পায়। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এই সরল জীবনের মধ্যে রয়েছে নিজের এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য এই পৃথিবীতে প্রচেষ্টা করা, অতিরিক্ত ব্যয়, অপচয় বা অপচয় ছাড়াই। একজন ব্যক্তি যত বেশি সরল জীবনের দিকে মনোনিবেশ করেন, ততই তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহ, মহিমান্বিতকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা সহজ হয়ে ওঠে। এর ফলে উভয় জগতেই শান্তি এবং সাফল্য আসে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

এছাড়াও, একজন মুসলিমের বুঝতে হবে যে তারা যত সহজ জীবনযাপন করবে, পার্থিব বিষয়বস্তুর উপর তাদের চাপ তত কম হবে এবং এর ফলে তারা পরকালের জন্য তত বেশি প্রচেষ্টা করতে পারবে, মানসিক, শারীরিক ও আত্মার শান্তি পাবে। কিন্তু একজন ব্যক্তির জীবন যত জটিল হবে, তত বেশি তারা চাপের সম্মুখীন হবে, অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং তাদের পরকালের জন্য কম প্রচেষ্টা করবে, কারণ পার্থিব বিষয়বস্তুর প্রতি তাদের ব্যস্ততা কখনোই শেষ হবে না বলে মনে হবে। এই মনোভাব তাদের মানসিক, শারীরিক ও আত্মার শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সরলতা এই পৃথিবীতে আরামের জীবন এবং বিচারের দিনে সরাসরি হিসাব-নিকাশের দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, একটি জটিল এবং আনন্দময় জীবন কেবল চাপপূর্ণ জীবন এবং বিচারের দিনে কঠোর এবং কঠিন হিসাব-নিকাশের দিকে পরিচালিত করবে। যে ব্যক্তি যত কঠোর হিসাব-নিকাশ করবে, তাকে তত বেশি শাস্তি দেওয়া হবে। সহিহ বুখারীতে প্রাপ্ত ১০৩ নম্বর হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে।

জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার

মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়েমেনের একটি প্রদেশের শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণের সময়, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, যদি তাকে বিচারের জন্য আনা হয়, তাহলে তিনি কী করবেন। মুয়ায (রাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন যে, তিনি পবিত্র কুরআন অনুসারে বিচার করবেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন যে, যদি তিনি পবিত্র কুরআনে মামলা এবং তার রায় না পান। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, তিনি মহানবী (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে বিচার করবেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন যে, যদি তিনি তাঁর হাদীসে মামলা এবং তার রায় না পান। মুয়ায (রাঃ) অবশেষে উত্তর দিয়েছিলেন যে, তিনি স্বাধীন যুক্তির অর্থ ব্যবহার করবেন, এমন একটি রায় যা পবিত্র কুরআন এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে সন্তুষ্ট প্রতিনিধি প্রদানের জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করেছেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৪০-১৪১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যখনই কোন পণ্ডিত ইসলামের বিভিন্ন বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেন, তখন তিনি স্বাধীন যুক্তি নামক একটি স্তরে পৌঁছাতে পারেন। এর ফলে তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্য , তাদের পেশাদার নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে ইসলামের মধ্যে একটি রায় বের করতে পারেন। সহীহ মুসলিমের ৪৪৮৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, যখন এই পণ্ডিত ভুল রায় দেন, তখন তাদের প্রচেষ্টার জন্য তারা একবার পুরস্কৃত হবেন। যদি তারা সঠিক রায় দেন, তাহলে তারা দ্বিগুণ পুরস্কৃত হবেন।

সকল কিছু থেকে পুরষ্কার অর্জন

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের দশম বছরে, তিনি আবু মুসা এবং মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়েমেনের দুটি প্রদেশের শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণ করেন। একবার মুয়ায আবু মুসা (রাঃ)-এর সাথে দেখা করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, এবং তারা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মতো সৎকর্ম নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তাঁর রাতের রুটিনের কথা উল্লেখ করে, মুয়ায (রাঃ)-এর মন্তব্য, তিনি রাতের প্রথম অংশ ঘুমাতেন, তারপর জেগে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তিনি উপসংহারে বলেন যে এই রুটিন থেকে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে তার ঘুম এবং তেলাওয়াত উভয়ের জন্যই সওয়াব আশা করতেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৩৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি এই সওয়াব আশা করেছিলেন কারণ ঘুমানোর উদ্দেশ্য ছিল তার শরীরকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দেওয়া যাতে সে রাতের বেলা জেগে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে। এই সৎ নিয়তের কারণে তিনি ঘুম এবং তেলাওয়াত উভয়ের জন্যই সওয়াব অর্জন করতে পেরেছিলেন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ঘটনাটি স্বেচ্ছায় রাতের উপাসনার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ বুখারী শরীফের ১১৪৫ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর অসীম মহিমা অনুসারে প্রতি রাতে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন এবং মানুষকে তাদের

চাহিদা পূরণের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করার জন্য আহ্বান জানান যাতে তিনি তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারেন।

রাতের বেলায় স্বেচ্ছায় ইবাদত করা আল্লাহর প্রতি মানুষের আন্তরিকতার প্রমাণ দেয়, কারণ অন্য কোন চোখ তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখে না। এটি করা আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ কথোপকথনের একটি মাধ্যম এবং এটি তাঁর দাসত্বের একটি নিদর্শন। এর অসংখ্য ফজিলত রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আন নাসায়ী, ১৬১৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে এটি সর্বোত্তম স্বেচ্ছায় ইবাদত।

বিচার দিবসে বা জান্নাতে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চেয়ে উচ্চতর মর্যাদা আর কারো থাকবে না, তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। এবং এই মর্যাদা সরাসরি রাতের নফল নামাজের সাথে সম্পর্কিত। এটি দেখায় যে যারা রাতের নফল নামাজ প্রতিষ্ঠা করে তারা উভয় জগতের সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৭৯:

"আর রাতের [একাংশ] অংশে, এর সাথে সালাত (অর্থাৎ, কুরআন তেলাওয়াত) পাঠ করো, এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত [ইবাদত]; আশা করা যায় যে তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে উত্থিত করবেন।"

জামে আত তিরমিযীতে ৩৫৭৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, একজন মুসলিম রাতের শেষ অংশে আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হন। অতএব, এই সময়ে যদি তারা আল্লাহকে স্মরণ করে তবে তারা অসংখ্য বরকত লাভ করতে পারে।

সকল মুসলিমই চায় তাদের প্রার্থনা কবুল হোক এবং তাদের চাহিদা পূরণ হোক। অতএব, তাদের নফল রাতের নামাজ পড়ার চেষ্টা করা উচিত কারণ সহীহ মুসলিমের ১৭৭০ নম্বর হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, প্রতি রাতে একটি বিশেষ সময় থাকে যখন ভালো প্রার্থনার উত্তর সর্বদা দেওয়া হয়।

রাতের নফল নামাজ প্রতিষ্ঠা করা পাপ থেকে বিরত রাখার একটি চমৎকার উপায়, এটি একজন ব্যক্তিকে অর্থহীন সামাজিক সমাবেশ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে এবং এটি একজন ব্যক্তিকে অনেক শারীরিক অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে। জামে আত তিরমিযী, ৩৫৪৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ করে ঘুমানোর আগে অতিরিক্ত খাওয়া-দাওয়া না করে নফল ইশারার নামাজের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া উচিত, কারণ এটি অলসতা তৈরি করে। দিনের বেলায় অযথা ক্লান্তি সৃষ্টি করা উচিত নয়। দিনের বেলায় একটি ছোট ঘুম এতে সাহায্য করতে পারে। পরিশেষে, পাপ এড়িয়ে চলা উচিত এবং মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস অনুসারে তাঁর আনুগত্য করা উচিত, কারণ আনুগত্যশীলদের জন্য নফল ইশারার নামাজ পড়া সহজ হয়।

পরিশেষে, মূল হাদিসটি আশা ত্যাগ না করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে কারণ অনুতাপ এবং সাফল্যের দরজা সর্বদা খোলা থাকে। মানুষকে প্রতিদিন এবং রাতে আন্তরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসার সুযোগ দেওয়া হয়, যাতে তারা উভয় জগতেই শান্তি এবং সাফল্য পেতে পারে। মহান আল্লাহর মহান

করুণার প্রশংসা করা উচিত, কারণ তিনি সৃষ্টির প্রয়োজন করেন না বরং তাদেরকে নিজের দিকে আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা সফল হতে পারে। সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে এবং অনুশোচনা ছাড়া তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, এই সুযোগগুলি গ্রহণ করা উচিত।

ইয়েমেনে একটি অভিযান

ন্যায্য হও

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের দশম বছরে, তিনি আলী বিন আবু তালিব (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ইয়েমেনে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে উল্লেখ করেন যে, তিনি তরুণ ছিলেন এবং জ্ঞানের অভাব ছিল, তাই তিনি ইয়েমেনে তাঁর কাছে আনা মামলাগুলি কীভাবে সঠিকভাবে বিচার করবেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বুকে হাত রেখে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেন তাঁর জিহ্বাকে দৃঢ় করেন এবং তাঁর হৃদয়কে পথ প্রদর্শন করেন। এরপর তিনি তাকে উপদেশ দেন যে, যদি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর কাছে বিচারের জন্য আসে, তাহলে তিনি উভয় পক্ষের কথা না শুনে রায় দেবেন না। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, এইভাবে আচরণ করলে তাঁর কাছে বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৪৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি সর্বদা ন্যায়বিচার এবং সকল বিষয়ে সঠিক বিষয় মেনে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে। অন্যদের তাদের পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে কখনও সমালোচনা বা প্রশংসা করা উচিত নয়, বরং তাদের কর্মের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক সমালোচনা বা প্রশংসা করা উচিত। যদি ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে কাজ করে, তাহলে তারা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য, এমনকি যদি সেই ব্যক্তি অপরিচিত ব্যক্তি হন বা যার সাথে আপনি মিশতে পারেন না। যদি কোনও ব্যক্তি এমনভাবে আচরণ করেন যা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে, তাহলে তাদের গঠনমূলক এবং ভদ্রভাবে সমালোচনা করা উচিত, এমনকি যদি তারা প্রিয়জনও হয়। অতএব, একজন ব্যক্তির আনুগত্য সত্যের প্রতি হওয়া উচিত, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, মানুষের প্রতি নয়। ইসলামী শিক্ষা অনুসারে মানুষের

অধিকার পূরণ করা উচিত তবে তাদের আনুগত্য সর্বদা সত্যের প্রতি হওয়া উচিত অন্যথায় তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে।

সেরা হও

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের দশম বছরে, তিনি ইয়েমেনে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে একজন সাহাবী বুরাইদা (রাঃ) ছিলেন, যিনি স্বীকার করেন যে সেই সময় তার আরেক সাহাবী আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) এর প্রতি নেতিবাচক অনুভূতি ছিল। এই অভিযানের পর, যুদ্ধের গনীমতের মাল বিতরণ করা প্রয়োজন ছিল এবং তাই নবী মুহাম্মদ (সাঃ) আলী (রাঃ) কে এই কাজের জন্য প্রেরণ করেন। এই ঘটনার পর, বুরাইদা (রাঃ) নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে ফিরে আসেন এবং আলী (রাঃ) এর সমালোচনা করেন, যদিও তিনি কোনও ভুল করেননি। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বুরাইদাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি আলী (রাঃ) কে অপছন্দ করেন কিনা, যার উত্তরে তিনি হ্যাঁ বলেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে বলেন যে তাকে অপছন্দ না করতে এবং তার প্রতি তার ভালোবাসা বৃদ্ধি করতে, কারণ তিনি এর যোগ্য। এই মন্তব্যের পর, বুরাইদা (রাঃ) আন্তরিকভাবে ঘোষণা করেন যে, তিনি আলী (রাঃ)-কে যতটা ভালোবাসেন, তার চেয়ে বেশি কাউকে ভালোবাসেননি। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৪২-১৪৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, নবীগণের পর সর্বকালের সেরা দল। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবদ্দশায় তারা যে শারীরিকভাবে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তা অবশ্যই একটি কারণ। কিন্তু যারা তাদের জীবন এবং তাদের সৎকর্ম সম্পর্কে জানেন তারা বুঝতে পারেন যে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল এই অনন্য এবং মহান কাজের চেয়েও বেশি কিছুর কারণে।

তাদের শ্রেষ্ঠত্বের একটি প্রধান কারণ এই ঘটনায় এবং সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) সম্পর্কিত একটি হাদিসে দেখানো হয়েছে, যা সহীহ মুসলিম, ৬৫১৫ নম্বরে পাওয়া যায়। ইবনে উমর (রাঃ) একবার মরুভূমিতে তার বাহনে চড়ে

ছিলেন, এমন সময় তিনি এক বেদুইনের মুখোমুখি হন। ইবনে উমর (রাঃ) বেদুইনকে সালাম করেন, বেদুইনের মাথায় তার পাগড়ি রাখেন এবং জোর দেন যে বেদুইন তার বাহনে চড়ে। ইবনে উমর (রাঃ) কে বলা হয়েছিল যে তিনি বেদুইনকে যে অভিবাদন জানিয়েছেন তা যথেষ্ট কারণ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মহান সাহাবী তাকে সালাম জানালে বেদুইন অত্যন্ত খুশি হতেন। তবুও, ইবনে উমর (রাঃ) এর চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গিয়ে বেদুইনকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। ইবনে উমর (রাঃ) উত্তরে বলেন যে, তিনি এটা করেছেন কারণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, একজন ব্যক্তি তার পিতামাতাকে সম্মান করার সর্বোত্তম উপায়গুলির মধ্যে একটি হল তার পিতামাতার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। ইবনে উমর (রাঃ) আরও বলেন যে, বেদুইনের বাবা তার পিতা আমিরুল মুমিনীন উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) এর বন্ধু ছিলেন।

এই ঘটনাটি সাহাবীদের শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত দেয়, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। তারা ইসলামের শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তারা কেবল ফরজ কর্তব্য পালন করেননি এবং সমস্ত পাপ থেকে বিরত ছিলেন না বরং তাদের কাছে সুপারিশকৃত সমস্ত কাজ সর্বোচ্চ মাত্রায় সম্পূর্ণরূপে পালন করেছিলেন। তাদের আত্মসমর্পণ তাদেরকে তাদের নিজস্ব কামনা-বাসনাকে দূরে সরিয়ে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করতে পরিচালিত করেছিল। ইবনে উমর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি সহজেই বেদুইনদের উপেক্ষা করতে পারতেন কারণ তিনি যে কোনও কাজই তখন বাধ্যতামূলক ছিল না, অনেক মুসলমানের বিপরীতে যারা এই অজুহাত ব্যবহার করতেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার প্রতি আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং তিনি যেভাবে কাজ করতেন সেভাবেই কাজ করেছিলেন।

ইসলামের শিক্ষার প্রতি আনুগত্যের অভাবই মুসলমানদের ঈমানকে দুর্বল করে তুলেছে। কেউ কেউ কেবল বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালন করে এবং স্বেচ্ছায় দান-খয়রাতের মতো অন্যান্য সৎকর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যা তাদের ইচ্ছার

বিরোধিতা করে এবং দাবি করে যে কাজগুলি বাধ্যতামূলক নয়। সমস্ত মুসলমানই পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) সাথে মিলিত হতে চায়। কিন্তু যদি তারা তাদের পথ বা পথ অনুসরণ না করে তবে এটি কীভাবে সম্ভব? যদি কোনও মুসলিম তাদের পথ ছাড়া অন্য কোনও পথ অনুসরণ করে তবে কীভাবে তারা তাদের সাথে মিলিত হতে পারে? তাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তাদের পথ অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু এটি কেবল তখনই সম্ভব যখন কেউ তাদের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করার পরিবর্তে ইসলামের শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে কষ্ট দেওয়া

মদিনায় হিজরতের দশম বছরে, তিনি আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) এর নেতৃত্বে ইয়েমেনে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযানের অংশ ছিলেন একজন সাহাবী, আমর বিন শাস আল আসলামী, যিনি অনুভব করেছিলেন যে আলী (রাঃ) তার সাথে কঠোর আচরণ করেছেন। আমর মদিনায় ফিরে এসে বিভিন্ন সভায় এবং বিভিন্ন লোকের সাথে কথা বলে আলী (রাঃ) এর সমালোচনা করেন। একদিন, তিনি মসজিদে প্রবেশ করেন এবং নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেখতে পান, যিনি তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন যতক্ষণ না তিনি তার পাশে বসে পড়েন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তারপর আমর (রাঃ) কে বলেন যে তিনি তাকে ক্ষতি করেছেন। আমর (রাঃ) তাকে ক্ষতি করার জন্য অনুতপ্ত হন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) অবশেষে মন্তব্য করেন যে যে আলী (রাঃ) কে ক্ষতি করেছে, সে তার ক্ষতি করেছে। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৪৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, এই ঘটনাটি অন্যদের তুচ্ছ নেতিবাচক আচরণ উপেক্ষা করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। সর্বদা মনে রাখা উচিত যে মানুষ যেহেতু ফেরেশতা নয়, তাই তারা ভুল করতে বাধ্য, ঠিক যেমন তারা নিজেরাই ভুল করে। এবং যেমন তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত, এবং মানুষ তাদের ভুল ক্ষমা করুক তা কামনা করে, তাদের অন্যদের ভুলও ক্ষমা করতে শেখা উচিত। এটা বোধগম্য যে একজন ব্যক্তি অন্যকে ক্ষমা করার জন্য সংগ্রাম করতে পারে যা চলমান, যেমন ট্র্যাফিক দুর্ঘটনার পরে অক্ষম হয়ে যাওয়া। যদি তারা এই ক্ষেত্রেও ক্ষমা করার চেষ্টা করতে পারে তবে তার জন্য পুরষ্কার আরও বেশি হবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কারও প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে তা চলমান নয়, একজন ব্যক্তির উচিত অন্যদের ক্ষমা করা এবং ক্ষোভ পোষণ করা নয়। যে ব্যক্তি এই ধরণের ক্ষোভ পোষণ করে তার ভয় করা উচিত যে, আল্লাহ, কিয়ামতের দিন তাদের কর্ম পরীক্ষা করবেন, ঠিক যেমন তারা এই পৃথিবীতে মানুষের ভুল পরীক্ষা করে ধরে রেখেছে। যার কর্ম বিচারের দিন যাচাই করা হবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত ১০৩ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে । পরিশেষে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যদের ক্ষমা করার অর্থ

হল নিজেকে অন্যদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া যাতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয়। ধৈর্য এবং অন্যদের ক্ষমা করার অর্থ এমন নিষ্ক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করা নয় যার মাধ্যমে কেউ অন্যদের তাদের উপর অন্যায় করতে দেয় এবং তারা আবার ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়। এই নিষ্ক্রিয় মনোভাবের সাথে ইসলামের শিক্ষার কোনও সম্পর্ক নেই। উদাহরণস্বরূপ, একজন মহিলা যিনি তার স্বামীর দ্বারা শারীরিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন, তাকে নিজেকে এবং তার সন্তানদের রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে, এমনকি যদি এর জন্য পুলিশকে ডেকে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। নিজেকে এবং তার সন্তানদের তার ক্ষতি থেকে রক্ষা করার এবং তার জীবন চালিয়ে যাওয়ার পরে, সে এই পৃথিবীতে, সরকারের মাধ্যমে ন্যায়বিচার চাইতে পারে এবং বিচারের দিনে আল্লাহর কাছে ন্যায়বিচার চাইতে পারে। কিন্তু যদি সে তার বিরুদ্ধে করা অতীতের ভুলের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাকে ক্ষমা করতে পারে, তাহলে তার ক্ষমা হবে। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ২২:

"... এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

অধিকন্তু, আলোচ্য মূল ঘটনাটি এও ইঙ্গিত করে যে, মহান আল্লাহ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসার একটি নিদর্শন হলো, যারা মহান আল্লাহর জন্য আল্লাহ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে ভালোবাসে তাদের সকলকে ভালোবাসা, এমনকি যদি এটি তাদের ব্যক্তিগত মতামতের বিরোধিতা করে। এই ভালোবাসার মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের কথার মাধ্যমে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তাদের কাজের মাধ্যমে ভালোবাসা প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ, এটা সকলের কাছে স্পষ্ট যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সমস্ত পরিবার, সমস্ত সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন এবং নেক পূর্বসূরীগণ এই সত্যিকারের ভালোবাসার অধিকারী ছিলেন। তাই তাদের প্রত্যেককে ভালোবাসা তার উপর কর্তব্য, যারা আল্লাহ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে ভালোবাসার দাবি করে। সহীহ বুখারী, ১৭ নম্বরে পাওয়া অনেক

হাদিসের মাধ্যমে এটি প্রমাণিত। এটি পরামর্শ দেয় যে, মহানবী (সা.)-এর সাহায্যকারীদের প্রতি ভালোবাসা, অর্থাৎ পবিত্র মদীনার বাসিন্দাদের প্রতি ঘৃণা ঈমানের অংশ এবং তাদের প্রতি ঘৃণা মুনাফিকির লক্ষণ। জামে আত তিরমিযী, ৩৮৬২ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী (সা.) স্পষ্টভাবে মুসলমানদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তারা যেন কোন সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কারণ তাদের প্রতি ভালোবাসা নবী (সা.)-কে ভালোবাসার লক্ষণ এবং তাদের প্রতি ঘৃণা করা নবী (সা.)-কে এবং মহান আল্লাহকে ঘৃণা করার লক্ষণ। এই ব্যক্তি সফল হবে না যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে তওবা করে। মহানবী (সা.)-ও তাঁর পবিত্র পরিবার সম্পর্কে একই রকমের একটি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, সুনান ইবনে মাজাহ, ১৪৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে।

যদি কোন মুসলিম অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমের সমালোচনা করে, যে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে, তাহলে তা প্রমাণ করে যে, তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার অভাব পোষণ করে। যদি কোন মুসলিম কোন পাপ করে, তাহলে অন্য মুসলিমদের সেই পাপকে ঘৃণা করা উচিত, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, পাপী মুসলিমের প্রতি ভালোবাসা থাকা উচিত কারণ তারা আল্লাহ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে। অন্যদের ভালোবাসার লক্ষণ হলো তাদের সাথে সদয় ও শ্রদ্ধাশীল আচরণ করা। সহজ কথায়, অন্যদের সাথে সেভাবেই আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় অন্যরা তাদের সাথে আচরণ করুক।

সত্য হওয়া

ইয়েমেন অভিযানের সময়, আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন, দরিদ্রদের জন্য দাতব্য দান হিসেবে কিছু উট নির্বাচন করেছিলেন। তাঁর কিছু লোক জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তারা কি এই উটে চড়তে পারবেন যাতে তাদের নিজস্ব উট বিশ্রাম নিতে পারে। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে যেহেতু এগুলি দাতব্য দানের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল, কেবলমাত্র যোগ্য ব্যক্তিরা এগুলি ব্যবহার করতে পারবেন। এটি ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৪৪-এ আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি আলী (রাঃ) এর অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার ইঙ্গিত দেয়। যখন কেউ নিজের জন্য যা ভালোবাসে, অন্যদের জন্য তাই ভালোবাসলে এটি সবচেয়ে ভালোভাবে অর্জন করা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে, অন্যদের সাথে এইভাবে আচরণ না করা পর্যন্ত একজন প্রকৃত মুমিন হতে পারে না। সহীহ বুখারী, ১৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, একজন মুসলিম যদি এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় তবে তার ঈমান হারাবে। এর অর্থ হল, একজন মুসলিমের ঈমান পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না সে এই উপদেশ অনুসরণ করে। এই হাদিসটি আরও নির্দেশ করে যে, একজন মুসলিম তার ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ করতে পারবে না যতক্ষণ না সে অন্যদের জন্যও তা অপছন্দ করে যা সে নিজের জন্য অপছন্দ করে। সহীহ মুসলিম, ৬৫৮৬ নম্বরে প্রাপ্ত আরেকটি হাদিস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়। এটি পরামর্শ দেয় যে, মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের এক অংশ ব্যথা পেলে বাকি দেহও ব্যথার অংশীদার হয়। এই পারস্পরিক অনুভূতির মধ্যে রয়েছে অন্যদের জন্য ভালোবাসা এবং ঘৃণা করা, যা সে নিজের জন্য ভালোবাসে এবং ঘৃণা করে।

একজন মুসলিম কেবল তখনই এই মর্যাদা অর্জন করতে পারে যখন তার হৃদয় হিংসার মতো খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত থাকে। এই খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বদা একজনকে নিজের জন্য আরও ভালো কামনা করতে বাধ্য করবে। তাই বাস্তবে, এই হাদিসটি একটি ইঙ্গিত দেয় যে ক্ষমাশীল হওয়ার মতো ভালো বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে হৃদয়কে পবিত্র করা উচিত এবং হিংসার মতো খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি দূর করা উচিত। এটি কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই সম্ভব।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যদের জন্য ভালো কামনা করলে তারা ভালো জিনিস হারাতে পারবে না। মহান আল্লাহর ভান্ডারের কোন সীমা নেই, তাই স্বার্থপর ও লোভী মানসিকতা গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

অন্যদের জন্য মঙ্গল কামনা করার অর্থ হলো অন্যদেরকে যেকোনোভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করা, যেমন আর্থিক বা মানসিক সহায়তা, ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি তার প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্যদের সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা করে। অতএব, এই ভালোবাসা কেবল কথার মাধ্যমে নয়, বরং কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করা উচিত। এমনকি যখন একজন মুসলিম অন্যদের মন্দ কাজ নিষেধ করে এবং অন্যদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরামর্শ দেয়, তখনও তাদের তা নম্রভাবে করা উচিত, ঠিক যেমন তারা চায় অন্যরা তাদের সদয়ভাবে উপদেশ দিক।

যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, আলোচ্য মূল হাদিসটি পারস্পরিক ভালোবাসা এবং যত্নের পরিপন্থী সকল খারাপ বৈশিষ্ট্য, যেমন হিংসা, দূর করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। হিংসা হল যখন একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট আশীর্বাদ পেতে চায় যা কেবল তখনই পাওয়া যায় যখন এটি অন্য কারো কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। এই মনোভাব মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত আশীর্বাদ বিতরণের প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ। এই কারণেই এটি একটি মহাপাপ এবং হিংসুকের সৎকর্ম

ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে। সুনান আবু দাউদের ৪৯০৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। যদি একজন মুসলিম অন্যদের কাছে থাকা বৈধ জিনিসগুলি কামনা করে তবে তাদের উচিত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং একই বা অনুরূপ জিনিস দান করা যাতে অন্য ব্যক্তি তাদের আশীর্বাদ হারাতে না পারে। এই ধরণের হিংসা বৈধ এবং ধর্মের দিক থেকে প্রশংসনীয়। সহিহ মুসলিমের ১৮৯৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছিলেন যে মুসলমানদের কেবল সেই ধনী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা করা উচিত যিনি তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করেন। আর এমন একজন জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত হও যে তার জ্ঞানকে নিজের এবং অন্যদের উপকারের জন্য ব্যবহার করে।

একজন মুসলিমের উচিত কেবল অন্যদের জন্য বৈধ পার্থিব আশীর্বাদ লাভ করাই ভালো না, বরং উভয় জগতেই ধর্মীয় আশীর্বাদ লাভ করাও ভালো। প্রকৃতপক্ষে, যখন কেউ অন্যদের জন্য এটি কামনা করে, তখন এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে উৎসাহিত করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। ইসলামে এই ধরণের সুস্থ প্রতিযোগিতাকে স্বাগত জানানো হয়। সূরা ৮৩ আল মুতাফিফিন, আয়াত ২৬:

"... তাই এর জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করতে দিন।"

এই উৎসাহ একজন মুসলিমকে তাদের চরিত্রের ত্রুটি খুঁজে বের করার এবং দূর করার জন্য নিজেদের মূল্যায়ন করতে অনুপ্রাণিত করবে। যখন এই দুটি উপাদান অর্থপূর্ণভাবে একত্রিত হয়, মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং নিজের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করা, তখন এটি উভয় জগতেই সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে।

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত কেবল মুখেই অন্যদের জন্য যা চায় তা ভালোবাসার দাবি করা নয়, বরং তার কাজের মাধ্যমেও তা প্রকাশ করা। আশা করা যায় যে, যে ব্যক্তি এভাবে অন্যদের জন্য চিন্তা করে, সে উভয় জগতেই মহান আল্লাহর কাছ থেকে চিন্তা পাবে। জামে আত তিরমিযী, ১৯৩০ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আস্থা প্রদর্শন

ইয়েমেন অভিযানের সময়, আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) মহানবী (সাঃ)-এর কাছে এক টুকরো সোনা ফেরত পাঠিয়েছিলেন, যা তিনি চারজনের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। কেউ একজন মন্তব্য করেছিলেন যে, ঐ লোকদের চেয়ে তাদের সোনার উপর বেশি অধিকার রয়েছে। যখন এই কথাটি মহানবী (সাঃ)-এর কাছে পৌঁছালো, তখন তিনি প্রশ্ন করলেন যে, লোকেরা কি তাকে বিশ্বাস করে এবং আরও যোগ করলেন যে, যিনি সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর কাছে স্বর্গ থেকে সংবাদ পাঠান, তিনি তাঁর উপর বিশ্বাস রাখেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ)-এর জীবনী", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৪৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

একজন মুসলিমের উচিত মহানবী (সা.)-এর প্রতি আস্থা প্রদর্শন করা, আন্তরিকভাবে তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে, এমনকি যদি তাঁর ঐতিহ্যের পিছনের জ্ঞান তাদের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এবং ৫৯তম অধ্যায় আল হাশর, ৭ম আয়াত:

"... আর রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো; আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো..."

এবং অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৮০:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

এবং অধ্যায় ৩৩ আল আহযাব, আয়াত ২১:

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে একটি চমৎকার আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"

তাঁর পবিত্র চরিত্রের অনুকরণে তাদের চরিত্রকে গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং উদারতার মতো ভালো গুণাবলী গ্রহণ করে এবং হিংসা, অহংকার এবং লোভের মতো নেতিবাচক গুণাবলী পরিত্যাগ করে। এটি তাদের মানসিক শান্তি নিশ্চিত করবে, কারণ ইতিবাচক গুণাবলী গ্রহণের ফলে ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে শেখা এবং তার উপর আমল করা, বহির্বিশ্বের কাছে তাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা নিশ্চিত করবে। যে ব্যক্তি এটি করতে ব্যর্থ হয় সে অনিবার্যভাবে তাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করবে এবং অমুসলিম এবং অন্যান্য মুসলিমদের ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করা থেকে বিরত রাখবে। তাঁর ভুল উপস্থাপনের ফলে বহির্বিশ্ব মুসলমানদের খারাপ আচরণ পর্যবেক্ষণ করলে

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমালোচনা করবে। এটি এমন একটি বিষয় যা প্রতিটি মুসলিমকে জবাবদিহি করতে হবে কারণ তাদের উপর কর্তব্য হলো আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে বহির্বিশ্বের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা।

উপরন্তু, পূর্ববর্তী জাতিগুলি যারা তাদের পবিত্র নবীদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভালোবাসার দাবি করে, তারা যেমন আখেরাতে তাদের সাথে মিলিত হবে না কারণ তারা কার্যত তাদের অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তেমনি যে মুসলিমরা কার্যত নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তারাও আখেরাতে তাঁর সাথে মিলিত হবে না। বরং, একজন ব্যক্তি তাদের সাথে মিলিত হবে যাদের তারা এই পৃথিবীতে কার্যত অনুকরণ করেছিল। সুনান আবু দাউদের ৪০৩১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পদক্ষেপগুলিকে ইতিবাচকভাবে বিচার করা

এক টুকরো সোনা বিতরণ করার সময়, এক মুনাফিক নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সমালোচনা করে এবং আল্লাহকে ভয় করতে বলে। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে তিরস্কার করেন এবং মনে করিয়ে দেন যে তিনি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করেন। এরপর লোকটি চলে যান। খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) লোকটিকে তার ধর্ম অবমাননার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অনুমতি চান কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, লোকটি হয়তো ফরজ নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি। আলী (রাঃ) এরপর মন্তব্য করেন যে, তারা অনেকেই নামাজ পড়েও মুনাফিক ছিলেন কারণ তারা মৌখিকভাবে এমন কথা বলেন যা তাদের অন্তরের সাথে সাংঘর্ষিক। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তখন উত্তর দেন যে, তাকে মানুষের হৃদয় অনুসন্ধান করার বা তাদের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করার জন্য তাদের পেট কাটার আদেশ দেওয়া হয়নি। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীজীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৪৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদের ৪৯৯৩ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা আল্লাহর ইবাদতের একটি দিক, অর্থাৎ, এটি আল্লাহর আনুগত্যের একটি দিক।

নেতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করা প্রায়শই পাপের দিকে পরিচালিত করে, যেমন গীবত এবং অপবাদ। একজন মুসলিমের উচিত যেখানেই সম্ভব ইতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করা যাতে অন্যদের সন্দেহের সুবিধা দেওয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশত, নেতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করা পরিবার থেকে শুরু করে জাতীয় স্তরের সকলের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একটি জাতি কতবার অনুমান এবং সন্দেহের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে? মিডিয়াতে পাওয়া বেশিরভাগ কেলেঙ্কারি অনুমানের উপর ভিত্তি করে। এমনকি আইন তৈরি করা হয়েছে যা অনুমান এবং সন্দেহের

ব্যবহারকে সমর্থন করে। এটি প্রায়শই ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্ক তৈরি করে কারণ এই মানসিকতার লোকেরা সর্বদা বিশ্বাস করে যে অন্যরা তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে তাদের সমালোচনা করছে। এটি একজনকে অন্যদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে বাধা দেয়, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে পরামর্শদাতা কেবল তাদের উপহাস করছে এবং এটি একজনকে পরামর্শ দিতে বাধা দেয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে অন্য ব্যক্তি তাদের কথার প্রতি কোন মনোযোগ দেবে না। এবং একজন ব্যক্তি যার এই নেতিবাচক মানসিকতা আছে তাকে পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকবে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটি কেবল তর্কের দিকে পরিচালিত করবে। এর ফলে অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়, যেমন তিক্ততা।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ যদি তাদের সমালোচনা করে বলে ধরে নেয়, তবুও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত যদি তা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে হয়।

সবসময় নেতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করার ফলে এক ধরণের শক্তিশালী মানসিক অসুস্থতা দেখা দেয়, যার নাম প্যারানয়া। যে প্যারানয়া গ্রহণ করে সে সবসময় অন্যদের খারাপ জিনিসের ব্যাপারে সন্দেহ করবে। এটি বিবাহের মতো সম্পর্কের জন্য অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক হতে পারে।

সম্ভব হলে ইতিবাচক উপায়ে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত, যা ইতিবাচক মানসিকতার দিকে পরিচালিত করে। এবং একটি ইতিবাচক মানসিকতা সুস্থ সম্পর্ক, অনুভূতি এবং ঐক্যের দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, সর্বদা নেতিবাচক উপায়ে বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা একজনকে সর্বদা অন্যদের প্রতি নেতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং আচরণ করতে উৎসাহিত করে, এমনকি যখন তাদের আচরণ ভালো হয়। এটি কেবল অন্যদের অধিকার পূরণ

করতে বাধা দেয়, যা মহান আল্লাহ কর্তৃক আদেশ করা হয়েছে। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১২:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক [নেতিবাচক] অনুমান থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই কিছু অনুমান পাপ..."

বিদায়ী পবিত্র তীর্থযাত্রা

মহানবী (সা.) মদিনায় হিজরতের দশম বছরে, তিনি পবিত্র হজ্জ (হজ্জ) করার উদ্দেশ্যে মদিনা ত্যাগ করেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৫২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ১৭৭৩ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একটি গৃহীত পবিত্র হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

পবিত্র হজ্জের আসল উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের পরকালের শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা। যেভাবে একজন মুসলিম পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য তাদের ঘর, ব্যবসা, সম্পদ, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সামাজিক মর্যাদা ত্যাগ করে, ঠিক একইভাবে এটি তাদের মৃত্যুর সময় ঘটবে, যখন তারা পরকালের শেষ যাত্রায় যাবে। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযীর ২৩৭৯ নম্বর হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, একজন ব্যক্তির পরিবার এবং সম্পদ তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং কেবল তাদের ভালো-মন্দ কর্মই তাদের সাথে থাকে।

যখন একজন মুসলিম তাদের পবিত্র হজ্জের সময় এই কথাটি মনে রাখবেন, তখন তারা এই দায়িত্বের সমস্ত দিক সঠিকভাবে পালন করবেন। এই মুসলিম পরিবর্তিত ব্যক্তি হয়ে বাড়ি ফিরে আসবে, কারণ তারা এই বস্তুগত জগতের অতিরিক্ত জিনিসপত্র সংগ্রহের চেয়ে পরকালের চূড়ান্ত যাত্রার প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে। তারা মহান আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়ার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুসারে চেষ্টা করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের

এবং তাদের উপর আস্থাশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য এই পৃথিবী থেকে অর্থ গ্রহণ করা, অপচয়, অতিরিক্ত ব্যয় বা অপচয় ছাড়াই। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে।

মুসলমানদের পবিত্র হজ্জকে ছুটির দিন এবং কেনাকাটার ভ্রমণ হিসেবে দেখা উচিত নয় কারণ এই মনোভাব এর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে। এটি মুসলমানদের তাদের পরকালের শেষ যাত্রার কথা মনে করিয়ে দেবে, এমন একটি যাত্রা যার কোন প্রত্যাবর্তন নেই এবং দ্বিতীয় কোন সুযোগ নেই। কেবলমাত্র এটিই পবিত্র হজ্জ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে এবং পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে অনুপ্রাণিত করবে। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে তাকে তাদের পবিত্র হজ্জের মাধ্যমে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে।

কর্মে আন্তরিকতা

যখন মহানবী (সাঃ) পবিত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করেন, তখন তিনি একটি ছেঁড়া জিনের উপর আরোহণ করেন যার নীচে একটি সস্তা কাপড় ছিল। তাঁর সমস্ত জিনিসপত্র তাঁর সাথে আরোহণ করা হয়েছিল। এরপর তিনি মন্তব্য করেন যে পবিত্র হজ্জ প্রদর্শন এবং খ্যাতি অর্জনের জন্য নয়। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীজীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৫৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৮৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, সামান্যতম লোক দেখানোও শিরক।

এটি একটি ছোট ধরণের শিরক, যার ফলে ঈমান নষ্ট হয় না। বরং এটি সওয়াব নষ্ট করে, কারণ এই মুসলিম ব্যক্তি মানুষকে খুশি করার জন্য কাজ করেছে, অথচ তাদের উচিত ছিল আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা। প্রকৃতপক্ষে, এই লোকদেরকে বিচারের দিন বলা হবে যে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের সওয়াব চাও, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

যদি শয়তান কাউকে সৎকর্ম করা থেকে বিরত রাখতে না পারে, তাহলে সে তাদের নিয়তকে কলুষিত করার চেষ্টা করবে যার ফলে তাদের সওয়াব নষ্ট হবে। যদি সে তাদের নিয়তকে স্পষ্টভাবে কলুষিত করতে না পারে, তাহলে সে সূক্ষ্ম উপায়ে তা কলুষিত করার চেষ্টা করবে। এর মধ্যে রয়েছে যখন মানুষ সূক্ষ্মভাবে অন্যদের কাছে তাদের সৎকর্ম প্রদর্শন করে। কখনও কখনও এটি এত সূক্ষ্ম হয় যে ব্যক্তি নিজেই তাদের কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত থাকে না। সুনানে ইবনে

মাজাহ, ২২৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করা সকলের উপর কর্তব্য, যেখানে দাবি করা হয়েছে যে অজ্ঞতা বিচারের দিন মহান আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করবেন না।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং কথাবার্তার মাধ্যমে প্রায়শই সূক্ষ্মভাবে নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম হয়তো অন্যদের জানাতে পারেন যে তিনি রোজা রাখছেন, যদিও কেউ সরাসরি জিজ্ঞাসা করেনি যে তিনি রোজা রাখছেন কিনা। আরেকটি উদাহরণ হল, যখন কেউ প্রকাশ্যে অন্যদের সামনে মুখস্থ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে দেখায় যে তিনি পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেছেন। এমনকি প্রকাশ্যে নিজের সমালোচনা করাও অন্যদের প্রতি বিনয় প্রদর্শন বলে বিবেচিত হতে পারে।

পরিশেষে, সূক্ষ্মভাবে লোক দেখানো একজন মুসলিমের সওয়াব নষ্ট করে এবং তাদের সৎকর্ম রক্ষা করার জন্য অবশ্যই তা এড়িয়ে চলতে হবে। এটি কেবলমাত্র ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই সম্ভব, যেমন কীভাবে নিজের কথা ও কর্মকে রক্ষা করতে হয়।

পবিত্র কি?

পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে, যখন তিনি ওয়াদি আল আকিক নামক একটি উপত্যকায় পৌঁছান, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করেন যে, তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন আত্মার আশীর্বাদ পেয়েছেন, যার অর্থ একজন ফেরেশতা, যিনি তাকে এই পবিত্র উপত্যকায় প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৬২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

বেশিরভাগ মুসলমান পবিত্র স্থান এবং ইসলামী শিল্পকর্মের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে কিন্তু প্রায়শই মহান আল্লাহ যে অন্যান্য জিনিসগুলিকে পবিত্র করেছেন সেগুলিকে অবহেলা করে।

সহীহ বুখারীর ৬৭ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে, ইসলামে একজন মুসলিমের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান পবিত্র।

এই হাদিসটি, অন্যান্য অনেক হাদিসের মতো, মুসলমানদের শিক্ষা দেয় যে, কেবলমাত্র তখনই সাফল্য লাভ করা সম্ভব যখন কেউ আল্লাহর হক, যেমন ফরজ নামাজ এবং মানুষের হক পূরণ করবে। একটি ছাড়া অন্যটি যথেষ্ট নয়। বিচারের দিনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে একজন অত্যাচারীকে তার নেক আমলগুলি তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য করা হবে এবং প্রয়োজনে, অত্যাচারীকে তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের পাপের প্রতিদান দেওয়া হবে। এর ফলে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

একজন প্রকৃত মুমিন ও মুসলিম হলেন তিনি, যিনি অন্যদের জান ও সম্পদ থেকে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি থেকে দূরে থাকেন। সুনানে আন নাসায়ী, ৪৯৯৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, মুসলমানদের জন্য তাদের কাজ বা কথার মাধ্যমে অন্যদের ক্ষতি না করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একজন মুসলিমের উচিত অন্যের সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং অন্যায়ভাবে তা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত নয়, উদাহরণস্বরূপ, কোনও আইনি মামলায়। সহীহ মুসলিমের ৩৫৩ নম্বর হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, যে কেউ এটি করবে সে জাহান্নামে যাবে, এমনকি যদি তার অর্জিত জিনিসটি গাছের ডালের মতো তুচ্ছ হয়। মুসলমানদের উচিত অন্যের সম্পদ কেবল তাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা এবং মালিকের সন্তুষ্টির জন্য তা ফিরিয়ে দেওয়া। অন্যের সম্পদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের নিজস্ব সম্পদের সাথে আচরণ করুক।

কোনও মুসলিমের সম্মান ক্ষুণ্ন করা উচিত নয়, যেমন গীবত বা অপবাদ। বরং একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের সম্মান রক্ষা করা, তাদের উপস্থিতিতে হোক বা অনুপস্থিতিতে, কারণ এটি তাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। জামে আত তিরমিযী, ১৯৩১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অন্যদের সম্পর্কে কেবল সেইভাবে কথা বলা উচিত যেভাবে সে চায় অন্যরা তাদের সম্পর্কে কথা বলুক। অতএব, একজনের উচিত ভালো কথা বলা অথবা চুপ থাকা।

পরিশেষে, অন্যদের সাথে ঠিক যেভাবে আচরণ করা উচিত, অন্যদের সাথে ঠিক সেইভাবে আচরণ করে অন্যদের প্রতি অন্যায় করা থেকে বিরত থাকা উচিত। ঠিক যেমন কেউ নিজের জন্য এটি পছন্দ করে, তেমনি তার অন্যদের জন্যও এটি পছন্দ করা উচিত এবং তাদের কাজ ও কথার মাধ্যমে এটি প্রমাণ করা উচিত। জামে আত তিরমিযী, ২৫১৫ নম্বর হাদিস অনুসারে এটি একজন প্রকৃত মুমিনের লক্ষণ।

আরাফাতে খুতবা

সংস্কৃতির চেয়ে ধর্ম বেশি

তাঁর পবিত্র হজ্জের সময়, যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আরাফাতের ভূমিতে পৌঁছেছিলেন, তখন তিনি একটি খুতবা দিয়েছিলেন। তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল যে তিনি ইসলামের পূর্বে প্রচলিত অজ্ঞতাপূর্ণ অভ্যাসগুলির সাথে সম্পর্কিত সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছেন। এটি ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২১০-২১১-এ আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের অমুসলিমদের প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ করা এবং গ্রহণ করা উচিত নয়। মুসলমানরা যত বেশি এটি করবে, তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য তত কম অনুসরণ করবে। বর্তমান যুগে এটি বেশ স্পষ্ট কারণ অনেক মুসলিম অন্যান্য জাতির সাংস্কৃতিক রীতিনীতি গ্রহণ করেছে যার ফলে তারা ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক মুসলিম বিবাহ অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন, যাতে দেখা যায় যে মুসলমানরা কত অমুসলিম সাংস্কৃতিক রীতিনীতি গ্রহণ করেছে। এর চেয়েও খারাপ বিষয় হল, অনেক মুসলিম পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে ইসলামিক রীতিনীতি এবং অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক রীতিনীতির মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। এই কারণে অমুসলিমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না যা ইসলামের জন্য বড় সমস্যা তৈরি করেছে। উদাহরণস্বরূপ, সম্মান রক্ষার্থে হত্যা একটি সাংস্কৃতিক রীতি যার ইসলামের সাথে এখনও কোনও সম্পর্ক নেই কারণ মুসলমানদের অজ্ঞতা এবং অমুসলিম সাংস্কৃতিক রীতিনীতি গ্রহণের অভ্যাস সমাজে প্রতিবার সম্মান রক্ষার্থে হত্যার ঘটনা ঘটলে ইসলামকে দোষারোপ করা হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য জাতিভেদ ও ভ্রাতৃত্ববোধের মতো সামাজিক

বাধা দূর করেছিলেন, কিন্তু অজ্ঞ মুসলমানরা অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক রীতিনীতি গ্রহণ করে তাদের পুনরুজ্জীবিত করেছে। সহজ কথায়, মুসলমানরা যত বেশি সাংস্কৃতিক রীতিনীতি গ্রহণ করবে, তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্যের উপর তত কম আমল করবে।

আইনটি সকলের জন্য প্রযোজ্য

আরাফাতে তাঁর খুতবার সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ইসলামের পূর্বে লোকেরা যে সুদের উপর একমত ছিলেন তা বাতিল করে দিয়েছেন কারণ এটি অবৈধ ছিল। তিনি প্রথম যে সুদের চার্জ বাতিল ঘোষণা করেছিলেন তা ছিল তাঁর নিজের চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)-এর। এটি ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২১০-২১১-এ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, এই ঘটনাটি ইঙ্গিত দেয় যে ইসলামের আইন সকল মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

সমাজ বিচ্যুত হওয়ার একটি প্রধান কারণ হল মানুষ ন্যায়বিচার করা ছেড়ে দিয়েছে। সহীহ বুখারী, ৬৭৮৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে পূর্ববর্তী জাতিগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে কারণ কর্তৃপক্ষ আইন ভঙ্গ করলে দুর্বলদের শাস্তি দিত কিন্তু ধনী ও প্রভাবশালীদের ক্ষমা করত। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, যদি তার নিজের মেয়ে কোন অপরাধ করে তবে তিনি তার উপর পূর্ণ আইনি শাস্তি প্রয়োগ করবেন। যদিও সাধারণ জনগণ তাদের নেতাদের তাদের কর্মকাণ্ডে ন্যায়সঙ্গত থাকার পরামর্শ দেওয়ার অবস্থানে নাও থাকতে পারে, তবে তারা তাদের সকল আচরণ এবং কর্মকাণ্ডে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে পরোক্ষভাবে তাদের প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিমকে তাদের উপর নির্ভরশীলদের, যেমন তাদের সন্তানদের, সমান আচরণ করে তাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হবে। সুনানে আবু দাউদের ৩৫৪৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে বিশেষভাবে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তারা কার সাথেই আচরণ করুক না কেন, তাদের সকল ব্যবসায়িক লেনদেনে

ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা উচিত। যদি মানুষ ব্যক্তিগত পর্যায়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করে, তাহলে সম্প্রদায়গুলি আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হতে পারে এবং ফলস্বরূপ যারা প্রভাবশালী পদে আছেন, যেমন রাজনীতিবিদ, তারা ইচ্ছা করুক বা না করুক, ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করবেন।

উপরন্তু, আর্থিক সুদ বলতে ঋণগ্রহীতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বোঝায়। পবিত্র কুরআন নাজিলের সময় অনেক ধরণের সুদের লেনদেন প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল বিক্রেতা একটি জিনিস বিক্রি করে মূল্য পরিশোধের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করেছিলেন, শর্ত ছিল যে ক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তারা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবেন কিন্তু পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেবেন। আরেকটি ছিল, একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে কিছু টাকা ধার দিয়েছিলেন এবং শর্ত দিয়েছিলেন যে ঋণগ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঋণের পরিমাণের চেয়ে বেশি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফেরত দিতে হবে। সুদের লেনদেনের তৃতীয় রূপ ছিল যে ঋণগ্রহীতা এবং বিক্রেতা সম্মত হন যে ঋণগ্রহীতা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট হারে ঋণ পরিশোধ করবে এবং যদি তারা সীমার মধ্যে তা করতে ব্যর্থ হয় তবে ঋণদাতা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবে কিন্তু একই সাথে সুদের হারও বাড়িয়ে দেবে। এখানে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞাগুলি এই ধরণের লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

যারা এই বিশ্বাস করেন তারা বৈধ বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা এবং আর্থিক সুদের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হন। এই বিভ্রান্তির ফলে কেউ কেউ যুক্তি দেন যে, যদি ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা অর্থের উপর লাভ বৈধ হয়, তাহলে ঋণ থেকে অর্জিত মুনাফা কেন অবৈধ বলে গণ্য করা হবে? তারা যুক্তি দেন যে, একজন ব্যক্তি তাদের সম্পদ বিনিয়োগ করার পরিবর্তে, তারা এমন কাউকে ঋণ দেয় যে পালাক্রমে তা থেকে লাভ করে। এই পরিস্থিতিতে ঋণগ্রহীতা কেন ঋণদাতাকে লাভের একটি অংশ প্রদান করবেন না? তারা স্বীকার করতে ব্যর্থ হন যে কোনও ব্যবসায়িক উদ্যোগ ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয়। কোনও উদ্যোগই লাভের সম্পূর্ণ গ্যারান্টি বহন করে না। অতএব, এটি ন্যায়সঙ্গত নয় যে কেবলমাত্র অর্থদাতাকেই

সকল পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফার অধিকারী বলে বিবেচনা করা উচিত এবং ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা উচিত। এটি ন্যায়বিচারের অংশ নয় যে যারা তাদের সম্পদ উৎসর্গ করে তাদের কোনও নির্দিষ্ট হারে মুনাফার নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, অন্যদিকে যারা তাদের সম্পদ ঋণ দেয় তারা ক্ষতির সমস্ত ঝুঁকি থেকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফার নিশ্চয়তা পায়।

একটি স্বাভাবিক বৈধ লেনদেনে, একজন ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রয় করা জিনিস থেকে লাভবান হন। বিক্রেতা জিনিসটি তৈরিতে ব্যয় করা প্রচেষ্টা এবং সময়ের জন্য ক্ষতিপূরণ পান। অন্যদিকে, সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনে, সুবিধার বিনিময় ন্যায্যভাবে হয় না। সুদ গ্রহণকারী পক্ষ তাদের প্রদত্ত ঋণের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে এবং এইভাবে তাদের লাভ সুরক্ষিত হয়। অন্য পক্ষ ঋণ নেওয়া তহবিল ব্যবহার করতে পারে তবে এটি সর্বদা লাভ নাও দিতে পারে। যদি এই ধরনের ব্যক্তি ঋণ নেওয়া তহবিল কোনও প্রয়োজনে ব্যয় করে তবে কোনও লাভ হবে না। তহবিল বিনিয়োগ করা হলেও, একজনের লাভ বা ক্ষতি উভয়ই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতএব, সুদ-সম্পর্কিত লেনদেন একদিকে ক্ষতি এবং অন্যদিকে লাভ বা একদিকে নিশ্চিত এবং স্থির মুনাফা এবং অন্যদিকে অনিশ্চিত লাভের কারণ হয়। অতএব, বৈধ বাণিজ্য আর্থিক সুদের সমান নয়।

এছাড়াও, সুদের বোঝা ঋণগ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধ করা অত্যন্ত কঠিন করে তোলে। এমনকি মূল ঋণ এবং সুদ পরিশোধের জন্য তাদের অন্য উৎস থেকে ঋণ নিতে হতে পারে। সুদের পদ্ধতির কারণে ঋণ পরিশোধের পরেও তাদের বকেয়া অর্থ প্রায়শই থেকে যায়। এই আর্থিক চাপ মানুষকে নিজের এবং তাদের পরিবারের জন্য জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেতে বাধা দিতে পারে। এই চাপ অনেক শারীরিক এবং মানসিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

পরিশেষে, এই ধরণের ব্যবস্থায় কেবল ধনীরাই ধনী হয় এবং দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়।

যদিও আর্থিক স্বার্থের সাথে লেনদেন করা বাহ্যিকভাবে একজন ব্যক্তিকে সম্পদ অর্জনের মতো মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এটি তাদের সামগ্রিক ক্ষতির কারণ হয়। এই ক্ষতি বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এটি তাদের ভালো এবং বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন হারাতে পারে যা তারা আর্থিক স্বার্থের সাথে লেনদেন থেকে বিরত থাকলে অর্জন করতে পারত। মহান আল্লাহ তাদের সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করতে বাধ্য করতে পারেন যা তাদের সন্তুষ্ট করে না। উদাহরণস্বরূপ, তারা শারীরিক অসুস্থতার সম্মুখীন হতে পারে যার ফলে তারা তাদের মূল্যবান অবৈধ সম্পদ ব্যয় করে এবং তাদের পছন্দসই উপায়ে তা ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। সামগ্রিক ক্ষতির একটি আধ্যাত্মিক দিকও রয়েছে। তারা যত বেশি আর্থিক স্বার্থের সাথে লেনদেন করে তত বেশি তাদের লোভ অর্থবহ হয়ে ওঠে, পার্থিব জিনিসের প্রতি তাদের লোভ কখনই সন্তুষ্ট হয় না যা সংজ্ঞা অনুসারে তাদের প্রচুর সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাদের দরিদ্র করে তোলে। এই লোকেরা দিনভর এক পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য সমস্যায় পতিত হবে এবং সন্তুষ্টি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে কারণ তারা বৈধ ব্যবসা এবং সম্পদের সাথে যে অনুগ্রহ রয়েছে তা হারিয়ে ফেলবে। এটি তাদের আর্থিক স্বার্থ এবং অন্যান্য উপায়ে আরও অবৈধ সম্পদ অর্জনের দিকে ঠেলে দিতে পারে। পরকালে ক্ষতি আরও স্পষ্ট। কিয়ামতের দিন তারা খালি হাতে থাকবে কারণ হারাম কাজের সাথে জড়িত কোন সৎকর্ম, যেমন হারাম সম্পদ দিয়ে দান, মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কিয়ামতের দিন এই ব্যক্তির শেষ পরিণতি কোথায় হবে তা নির্ধারণ করার জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না।

বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন এবং সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটি সমাজে একটি উপকারী ভূমিকা পালন করে যেখানে দ্বিতীয়টি সমাজকে অধঃপতনের দিকে পরিচালিত করে। স্বভাবতই সুদ লোভ, স্বার্থপরতা, উদাসীনতা এবং অন্যদের প্রতি নিষ্ঠুরতা জন্মায়। এটি সম্পদের উপাসনার দিকে

পরিচালিত করে এবং অন্যদের সাথে করুণা এবং ঐক্য নষ্ট করে। এভাবে এটি অর্থনৈতিক এবং নৈতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই সমাজকে ধ্বংস করতে পারে।

অন্যদিকে, দানশীলতা হলো উদারতা এবং করুণার ফল। পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সদিচ্ছার কারণে সমাজ ইতিবাচকভাবে বিকশিত হবে যা সকলের জন্য উপকারী হবে। এটা স্পষ্ট যে যদি এমন একটি সমাজ থাকে যেখানে ব্যক্তিরা একে অপরের সাথে স্বার্থপর আচরণ করে, যেখানে ধনীদের স্বার্থ সরাসরি সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিপরীত হয়, তাহলে সেই সমাজ স্থিতিশীল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই ধরনের সমাজে, প্রেম এবং করুণার পরিবর্তে, পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং তিক্ততা বৃদ্ধি পাবে।

পরিশেষে, যখন মানুষ তাদের নিজস্ব চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করে এবং তারপর তাদের উদ্‌বৃত্ত সম্পদ দাতব্য উপায়ে ব্যয় করে অথবা পারস্পরিক বৈধ ব্যবসায়িক উদ্যোগে অংশ নেয়, তখন সেই সমাজের ব্যবসা, শিল্প এবং কৃষির উন্নতি হবে। সমাজের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদন সেই সমাজের তুলনায় অনেক বেশি হবে যেখানে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ আর্থিক স্বার্থ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

বিবাহে সম্প্রীতি

আরাফাতে তাঁর খুতবার সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদের তাদের স্ত্রীদের সাথে সর্বদা সদয় আচরণ করে মহান আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২১০-২১১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদি নারী এবং পুরুষ উভয়ই একটি সফল বিবাহিত জীবন উপভোগ করতে চান, তাহলে তাদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষার ভিত্তিতে একজন জীবনসঙ্গী খুঁজে বের করতে হবে।

সহীহ বুখারীতে ৫০৯০ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তিকে চারটি কারণে বিবাহ করা হয়: তার সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য অথবা তার ধার্মিকতার জন্য। তিনি এই সতর্কবাণী দিয়ে শেষ করেছেন যে, একজন ব্যক্তির উচিত ধার্মিকতার জন্য বিবাহ করা, অন্যথায় সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এই হাদিসে উল্লেখিত প্রথম তিনটি জিনিস খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং অসম্পূর্ণ। এগুলো হয়তো কাউকে ক্ষণস্থায়ী সুখ দিতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই জিনিসগুলো তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে কারণ এগুলো বস্তুগত জগতের সাথে যুক্ত, চূড়ান্ত এবং স্থায়ী সাফল্য প্রদানকারী জিনিসের সাথে নয়, অর্থাৎ বিশ্বাসের সাথে। সম্পদ সুখ বয়ে আনে না তা বোঝার জন্য কেবল ধনী এবং বিখ্যাতদের পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, ধনীরা পৃথিবীর সবচেয়ে অসন্তুষ্ট এবং অসুখী মানুষ। বংশের জন্য কাউকে বিয়ে করা বোকামি কারণ এটি নিশ্চিত করে না যে ব্যক্তিটি একজন ভালো জীবনসঙ্গী হবে।

প্রকৃতপক্ষে, যদি বিবাহ সফল না হয়, তবে এটি বিয়ের আগে দুটি পরিবারের মধ্যে যে পারিবারিক বন্ধন ছিল তা ধ্বংস করে দেয়। শুধুমাত্র সৌন্দর্যের জন্য , অর্থাৎ ভালোবাসার জন্য বিয়ে করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কারণ এটি একটি অস্থির আবেগ যা সময়ের সাথে সাথে এবং মেজাজের সাথে পরিবর্তিত হয়। প্রেমে ডুবে থাকা কত দম্পতি একে অপরকে ঘৃণা করতে শুরু করে?

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে একজন দরিদ্র জীবনসঙ্গী খুঁজে বের করা উচিত, যেমনটি এমন কাউকে বিয়ে করা গুরুত্বপূর্ণ যে আর্থিকভাবে পরিবারকে সাহায্য করতে পারে। এর অর্থ এইও নয় যে একজনের তার জীবনসঙ্গীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়, কারণ এটি একটি সুস্থ বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তবে এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে এই জিনিসগুলি কোনও ব্যক্তির বিবাহের প্রধান বা চূড়ান্ত কারণ হওয়া উচিত নয়। একজন মুসলিমের একজন স্ত্রীর মধ্যে যে প্রধান এবং চূড়ান্ত গুণটি সন্ধান করা উচিত তা হল ধার্মিকতা। এটি তখনই ঘটে যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। সহজ কথায়, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভয় করে, সে সুখ এবং অসুবিধা উভয় সময়েই তার স্ত্রীর সাথে ভাল আচরণ করবে। অন্যদিকে, যারা ধর্মহীন তারা যখনই মন খারাপ করবে তখনই তার স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মুসলমানদের মধ্যে পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ার এটি একটি প্রধান কারণ। এবং এমনকি যখন তারা তাদের স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তখনও তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে তাদের অধিকার পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, যা দূর করতে ধার্মিকতা সাহায্য করে। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ২৮:

"... আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল তারাই ভয় করে, যারা জ্ঞানী..."

অধিকন্তু, ধার্মিক ব্যক্তি সর্বদা অন্যদের অধিকার পূরণের ব্যাপারে বেশি চিন্তিত থাকে, যেমন তাদের স্ত্রী, তার চেয়ে তারা মানুষের অধিকার পূরণের ব্যাপারে বেশি চিন্তিত থাকে। কারণ তারা বোঝে যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে তারা মানুষের অধিকার পূরণ করেছে কিনা। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন না যে মানুষ তাদের অধিকার পূরণ করেছে কিনা, কারণ এটি তখনই মোকাবেলা করা হবে যখন আল্লাহ অন্যদের প্রশ্ন করবেন, যখন তিনি তাদের প্রশ্ন করবেন না। অন্যদিকে, দুষ্ট মুসলিমরা কেবল তাদের অধিকার সম্পর্কেই চিন্তিত থাকবে, সেই অধিকারগুলি যা তারা সমাজ, সংস্কৃতি, ফ্যাশন এবং তাদের কল্পনা থেকে নিয়েছে, ইসলাম থেকে নয়। ফলস্বরূপ, তারা কখনই তাদের স্ত্রীর প্রতি সত্যিকার অর্থে সন্তুষ্ট হবে না, এমনকি যদি তাদের স্ত্রী ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার পূরণ করে। এই কারণেই ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং বিবাহবিচ্ছেদ এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

পরিশেষে, যদি কোন মুসলিম বিয়ে করতে চায়, তাহলে তাকে প্রথমে এর সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যেমন তাদের স্ত্রীর উপর তাদের কী অধিকার, তাদের স্ত্রীর উপর তাদের কী অধিকার এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের স্ত্রীর সাথে কীভাবে সঠিকভাবে আচরণ করতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত, এই বিষয়ে অজ্ঞতা অনেক বিতর্ক এবং বিবাহবিচ্ছেদের দিকে পরিচালিত করে কারণ লোকেরা এমন কিছু দাবি করে যা তাদের স্ত্রী পূরণ করতে বাধ্য নয়। অতএব, জ্ঞান, যা ধার্মিকতার মূল, একটি সুস্থ ও সফল বিবাহের ভিত্তি।

এছাড়াও, আলোচিত মূল ঘটনাটি নারীর অধিকারের গুরুত্ব নির্দেশ করে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইসলামের পূর্বে, জাহেলিয়ার যুগে, নারীদের গৃহস্থালির জিনিসপত্রের সাথে তুলনা করা প্রচলিত ছিল। এগুলো গরুর মতো কেনা-বেচা করা হত। বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর কোন অধিকার ছিল না। আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু অংশ পাওয়ার অধিকারী হওয়া তো দূরের কথা, তাকে অন্যান্য গৃহস্থালির জিনিসপত্রের মতো উত্তরাধিকারের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হত। তাকে পুরুষদের মালিকানাধীন জিনিস হিসেবে বিবেচনা করা

হত, যেখানে তার কিছুই থাকার অনুমতি ছিল না। এবং সে কেবল একজন পুরুষের ইচ্ছানুযায়ী খরচ করতে পারত। অন্যদিকে, পুরুষ তার ইচ্ছানুযায়ী তার যেকোনো সম্পদ, যেমন মজুরি, ব্যয় করতে পারত। এই পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকারও তার ছিল না। ইউরোপের কিছু গোষ্ঠী এমনকি নারীদের মানুষ বলে মনে করত না এবং তাকে পশুর সাথে তুলনা করত। ধর্মে নারীদের কোন স্থান ছিল না। তাদের উপাসনার অযোগ্য বলে মনে করা হত। এমনকি কেউ কেউ নারীদের আত্মার অধিকারী বলেও ঘোষণা করেছিল। একজন পিতার পক্ষে তার নবজাতক বা ছোট মেয়েকে হত্যা করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হত কারণ এটি পরিবারের জন্য লজ্জাজনক বলে বিবেচিত হত। কেউ কেউ এমনকি বিশ্বাস করতেন যে, যে ব্যক্তি একজন নারীকে হত্যা করবে তার বিরুদ্ধে কোনও বিচার হবে না। কিছু প্রথা এমনকি মৃত স্বামীর স্ত্রীকেও হত্যা করত কারণ তাকে স্বামী ছাড়া বেঁচে থাকার যোগ্য মনে করা হত না। কেউ কেউ এমনকি ঘোষণা করত যে, নারীর উদ্দেশ্য কেবল পুরুষদের সেবা করা।

কিন্তু মহান আল্লাহ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে, সকল মানুষকে সম্মান করতে শিক্ষা দিয়েছেন, ন্যায়বিচার ও ন্যায়বিচারকে আইনের আওতায় এনেছেন এবং পুরুষদেরকে নারীর উপর তাদের নিজস্ব অধিকারের সমান্তরালভাবে তাদের অধিকার পূরণের জন্য দায়ী করেছেন। নারীদের স্বাধীন ও স্বাধীন করা হয়েছে। পুরুষদের মতোই তিনিও তার নিজের জীবন ও সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠেছেন। কোনও পুরুষ কোনও নারীকে কাউকে বিয়ে করতে বাধ্য করতে পারে না। যদি তাকে তার সম্মতি ছাড়া বাধ্য করা হয়, তাহলে বিবাহ চালিয়ে যাওয়া বা বাতিল করা তার পছন্দ। কোনও পুরুষের অধিকার নেই যে তার সম্মতি এবং অনুমোদন ছাড়া তার সম্পত্তি থেকে কিছু ব্যয় করতে পারে। স্বামীর মৃত্যুর পর বা বিবাহ বিচ্ছেদের পর সে স্বাধীন হয়ে যায় এবং কেউ তাকে কিছু করতে বাধ্য করতে পারে না। আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব অনুসারে সে পুরুষদের মতো উত্তরাধিকারে অংশ পায়। নারীদের উপর ব্যয় করা এবং তাদের সাথে ভালো আচরণ করাকে আল্লাহ কর্তৃক ইবাদতের একটি কাজ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই সমস্ত অধিকার এবং আরও অনেক কিছু নারীদের আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ দেয়নি। এটা অদ্ভুত যে আজ যারা নারীর অধিকারের পক্ষে দাঁড়ায় তারা

ইসলামের সমালোচনা করে, যদিও ইসলাম বহু শতাব্দী আগে নারীদের অধিকার দিয়েছিল।

ইসলামে শ্রেষ্ঠত্ব

আরাফাতে তাঁর খুতবার সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছিলেন যে, কোন আরবই বিদেশীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, এবং কোন বিদেশীও আরবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। একমাত্র গুণ যা যেকোনো ব্যক্তিকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাকওয়া। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "দ্য নোবেল লাইফ অফ দ্য প্রফেট (সা.উ.উ.), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯৫৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪৩ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক রূপ বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের অভ্যন্তরীণ নিয়ত এবং শারীরিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন।

প্রথমত, যে কোন কাজ করার সময় একজন মুসলিমের সর্বদা তাদের নিয়ত সংশোধন করা উচিত কারণ মহান আল্লাহ কেবল তখনই তাদের পুরষ্কৃত করবেন যখন তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎকর্ম করবে। যারা অন্য মানুষ এবং জিনিসের জন্য কাজ করবে, তাদেরকে বিচারের দিন তাদের কাছ থেকে তাদের পুরষ্কার পেতে বলা হবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদিসটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। জাতিগত বা সম্পদের মতো পার্থিব বিষয়ের কারণে একজন ব্যক্তি অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। যদিও অনেক মুসলিম সামাজিক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মতো এই বাধাগুলি তৈরি করেছে, যার ফলে তারা বিশ্বাস করে যে কিছু লোক অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ,

ইসলাম স্পষ্টভাবে এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে, এই ক্ষেত্রে, ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। একমাত্র জিনিস যা একজন মুসলিমকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাদের ধার্মিকতা, তারা কতটা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

উপরন্তু, আলোচ্য মূল হাদিসটি এও নির্দেশ করে যে, নারীদের পুরুষদের তুলনায় পৃথিবীতে তাদের অবস্থান নিয়ে বিতর্ক এবং তর্ক-বিতর্ক করে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বরং, তাদের বুঝতে হবে যে শ্রেষ্ঠত্ব পুরুষদের অনুকরণ বা তাদের ছাড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে নিহিত নয়। এটি কেবল আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে নিহিত।

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর এবং মানুষের অধিকার পূরণে নিজেকে ব্যস্ত রাখা এবং এই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তাদের যা আছে বা যার মালিকানা আছে তা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে মুসলিমের মধ্যে সৎকর্মের অভাব রয়েছে অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য নেই, তার বংশের কারণে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে না। বাস্তবে, এটি সম্পদ, জাতিগততা, লিঙ্গ বা সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং বর্ণের মতো সমস্ত পার্থিব জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পরিশেষে, ইসলাম যেমন মানুষকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে বিচার করে, তেমনি মানুষেরও উচিত। তাদের উচিত অন্যদেরকে তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করা বা পার্থিব মানদণ্ডের ভিত্তিতে অন্যদেরকে নিকৃষ্ট মনে করা নয়, কারণ এটি প্রায়শই অহংকার এবং অন্যদের অধিকার পূরণে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করে, যা উভয় জগতেই বিপর্যয়ের দিকে পরিচালিত করে।

একজন ব্যক্তির আসল মর্যাদা লুকানো থাকে, যেমন তার উদ্দেশ্য মানুষের কাছ থেকে লুকানো থাকে, এমনকি যদি তারা তাদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে পারে। অতএব, অন্যদের অবজ্ঞা করা বোকামি, কারণ তারা তাদের চেয়ে উচ্চতর হতে পারে।

সাফল্য ধরে রাখুন

আরাফাতে তাঁর খুতবার সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি মানুষের জন্য পবিত্র কুরআন এবং তাঁর ঐতিহ্য রেখে যাচ্ছেন, যা যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তা আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২১০-২১১ এবং ইমাম সাফি উর রহমানের, দ্য সিলড নেকটার, পৃষ্ঠা ৪৬৪-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এগুলো ধরে রাখার অর্থ হলো সর্বদা আন্তরিকভাবে সেগুলো মেনে চলা এবং অনুসরণ করা।

পবিত্র কুরআন থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য এর তিনটি দিক অবশ্যই পালন করতে হবে। প্রথমটি হল এটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিতভাবে তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয়টি হল এটি বোঝা এবং শেষটি হল এর উপর আমল করা। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে পবিত্র কুরআন একটি নির্দেশনার বই, তেলাওয়াতের বই নয়। নির্দেশনা তখনই পাওয়া যেতে পারে যখন কেউ এটি শিখে এবং তার উপর আমল করে।

অধিকন্তু, তাই, নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার তাদের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করা উচিত, তাঁর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং সে অনুযায়ী কাজ করার মাধ্যমে। ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এবং ৫৯তম অধ্যায় আল হাশর, ৭ম আয়াত:

"...আর রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো; আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো..."

এবং অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৮০:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

এবং অধ্যায় ৩৩ আল আহযাব, আয়াত ২১:

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে একটি চমৎকার আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"

তাঁর পবিত্র চরিত্রের অনুকরণে তাদের চরিত্রকে গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং উদারতার মতো ভালো গুণাবলী গ্রহণ করে এবং হিংসা, অহংকার এবং লোভের মতো নেতিবাচক গুণাবলী পরিত্যাগ করে। এটি তাদের মানসিক শান্তি নিশ্চিত করবে, কারণ ইতিবাচক গুণাবলী গ্রহণের ফলে ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে শেখা এবং তার উপর আমল করা, বহির্বিশ্বের কাছে তাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা নিশ্চিত করবে। যে ব্যক্তি এটি করতে ব্যর্থ হয় সে অনিবার্যভাবে তাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করবে এবং অমুসলিম এবং অন্যান্য মুসলিমদের ইসলামী শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করা থেকে বিরত রাখবে। তাঁর ভুল উপস্থাপনের ফলে বহির্বিশ্ব মুসলমানদের খারাপ আচরণ পর্যবেক্ষণ করলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমালোচনা করবে। এটি এমন একটি বিষয় যা প্রতিটি মুসলিমকে জবাবদিহি করতে হবে কারণ তাদের উপর কর্তব্য হলো আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে বহির্বিশ্বের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা।

উপরন্তু, পূর্ববর্তী জাতিগুলি যারা তাদের পবিত্র নবীদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভালোবাসার দাবি করে, তারা যেমন আখেরাতে তাদের সাথে মিলিত হবে না কারণ তারা কার্যত তাদের অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তেমনি যে মুসলিমরা কার্যত নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তারাও আখেরাতে তাঁর সাথে মিলিত হবে না। বরং, একজন ব্যক্তি তাদের সাথে মিলিত হবে যাদের তারা এই পৃথিবীতে কার্যত অনুকরণ করেছিল। সুনান আবু দাউদের ৪০৩১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্যের শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তার উপর আমল করে, তখন তারা নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করছে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং

বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। অতএব, এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের নিজস্ব সুবিধার জন্য ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং মেনে চলতে হবে, এমনকি যখন এই শিক্ষাগুলি ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাদের একজন জ্ঞানী রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের পরামর্শ অনুসরণ করেন, বুঝতে পারেন যে তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাসও তাদের সুস্থতার জন্য। ঠিক যেমন এই জ্ঞানী রোগী উন্নত মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করতে পারেন, তেমনি যে কেউ ইসলামী নীতিগুলি গ্রহণ করে এবং অনুসরণ করে। কারণ মন ও শরীরের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অর্জনের পাশাপাশি নিজের সম্পর্ক এবং দায়িত্বগুলি সঠিকভাবে সংগঠিত করার বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান কেবল মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করে। বিস্তৃত গবেষণা সত্ত্বেও, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সমাজের যে ধারণা রয়েছে তা প্রতিটি ব্যক্তির চ্যালেঞ্জ সমাধানের জন্য যথেষ্ট নয়। মানবিক নির্দেশনা সকল প্রকার চাপ থেকে রক্ষা করতে পারে না অথবা জীবনের প্রতিটি দিককে অগ্রাধিকার দিতে পারে না কারণ এর অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা এবং পক্ষপাত রয়েছে। কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার কাছেই প্রয়োজনীয় জ্ঞান রয়েছে, যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের শিক্ষার মাধ্যমে মানবজাতির কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কেউ দেখে যে, যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ইসলামী শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করে, যারা তা করে না তাদের তুলনায়। যদিও অনেক রোগী তাদের ওষুধের পিছনে বিজ্ঞান বুঝতে পারে না এবং তাদের ডাক্তারের উপর পরোক্ষভাবে বিশ্বাস করতে পারে না, তবুও আল্লাহ তায়ালা ব্যক্তিদের ইসলামী শিক্ষার জ্ঞান নিয়ে চিন্তা করতে উৎসাহিত করেন যাতে তারা তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনগুলি চিনতে পারে। তিনি অন্ধ বিশ্বাসের জন্য বলেন না; বরং তিনি চান যে মানুষ স্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে এর সত্যতা উপলব্ধি করুক। এটি অর্জনের জন্য ইসলামের শিক্ষা অন্বেষণ করার সময় একটি উন্মুক্ত এবং নিরপেক্ষ মানসিকতার প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন।

একটি মহৎ উদ্ঘাটন

ই জিলহজ্জ , আরাফাতের দিন , মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর নিম্নলিখিত ঐশ্বরিক ওহী নাজিল হয়েছিল: ৫ম সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ৩:

"...আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম..."

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৫৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা বলতে কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর প্রদত্ত সকল আদেশ ও নিষেধ পালন করাকে বোঝায়। সহীহ বুখারী, ১ নম্বর হাদিসে যেমনটি নিশ্চিত করা হয়েছে, সবকিছুর বিচার তাদের নিয়ত দ্বারা করা হবে। সুতরাং যদি কেউ সৎকর্ম করার সময় মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, তাহলে তারা এই পৃথিবীতে বা পরকালে কোন প্রতিদান পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নম্বর হাদিস অনুসারে, যারা অসাধু কাজ করেছে তাদের বিচারের দিন তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইতে বলা হবে যাদের জন্য তারা কাজ করেছে, যা সম্ভব হবে না। ৯৮ আল বাইয়্যিনাহ, আয়াত ৫।

"আর তাদেরকে কেবল আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তাঁর প্রতি খাঁটি মনোভাব পোষণ করে....."

যদি কেউ মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালনে শিথিলতা দেখায়, তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের উচিত আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া এবং সেগুলি পালনের জন্য সংগ্রাম করা। মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ কখনও কাউকে এমন কর্তব্যের বোঝা চাপান না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮৬।

"আল্লাহ কোন আত্মার উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন বোঝা চাপান না..."

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হলো, নিজের এবং অন্যদের সন্তুষ্টির চেয়ে তাঁর সন্তুষ্টিকে সর্বদা প্রাধান্য দেওয়া। একজন মুসলিমের উচিত সর্বদা সেইসব কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। অন্যদের ভালোবাসা এবং তাদের পাপকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা করা উচিত, নিজের ইচ্ছার জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে বা পাপে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তখন তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি এই মানসিকতা গ্রহণ করে সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে। সুনান আবু দাউদের ৪৬৮১ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক হল, এই বিশ্বাস রাখা যে তাঁর সিদ্ধান্ত এবং পছন্দগুলি সংশ্লিষ্ট মানুষের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি তাঁর

সিদ্ধান্তের পিছনের প্রজ্ঞা মানুষের কাছে স্পষ্ট নাও হয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হুকুমে সন্তুষ্ট থাকা এবং নিজের ইচ্ছার সাথে বিরোধী হুকুমে বিরক্ত হওয়া আল্লাহর প্রতি স্পষ্ট অকৃতজ্ঞতা। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে তার আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে, সে প্রকৃতই আন্তরিক।

পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা। পবিত্র কুরআনের তিনটি দিক পূরণ করলে এই আন্তরিকতা প্রমাণিত হয়। প্রথমটি হল এটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিতভাবে তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয়টি হল নির্ভরযোগ্য উৎস এবং শিক্ষকের মাধ্যমে এর শিক্ষা বোঝা। শেষ দিকটি হল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করা। একজন আন্তরিক মুসলিম পবিত্র কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর আমল করার চেয়ে এর শিক্ষার উপর আমল করাকে অগ্রাধিকার দেয়। পবিত্র কুরআনের উপর নিজের চরিত্র গঠন করা হল মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত আন্তরিকতার লক্ষণ। এটিই মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য, যা সুনানে আবু দাউদ, ১৩৪২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক হল এর সমস্ত বিষয় বোঝার এবং তার উপর আমল করার আন্তরিক ইচ্ছা নিয়ে এর কাছে যাওয়া, যদিও কারও ইচ্ছা পবিত্র কুরআন দ্বারা

বিরোধিতা করা হয়। যে ব্যক্তি তাদের ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে কোন আদেশ, নিষেধ এবং উপদেশ অনুসরণ করতে এবং উপেক্ষা করতে উৎসাহিত করে, সে এর প্রতি অকৃতজ্ঞতা অবলম্বন করেছে এবং তাই তারা এর নির্দেশনা থেকে প্রকৃত অর্থে উপকৃত হবে না। সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৮২:

"আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাজিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু এটি জালেমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।"

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময়, একজন মুসলমানের কেবল এই উদ্দেশ্যেই এটি ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থাৎ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি তেলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে এমন একটি হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা উচিত যা কোনও সমস্যার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারপর একটি টুলবক্সে রাখা হয়। পবিত্র কুরআনের মূল কাজ হল একজনকে পরকালের নিরাপদে পথ দেখানো। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং কেবল নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলিমের আচরণের পরিপন্থী। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যে অনেক ধরণের আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কিনেছে, তবে এর কোনও ইঞ্জিন নেই। এইভাবে আচরণ করা এর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করছে।

আলোচ্য মূল হাদিসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো মহানবী (সা.)-এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর ঐতিহ্যের উপর আমল করার জন্য জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টা। এই হাদীসগুলির মধ্যে রয়েছে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কিত হাদীস এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর পবিত্র মহৎ চরিত্র। সূরা ৬৮ আল-কালাম, আয়াত ৪:

"আর সত্যিই, তুমি মহান নৈতিক চরিত্রের অধিকারী।"

এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়া। এটি মহান আল্লাহ তায়ালা একটি ফরজ কাজ করেছেন। সূরা আল হাশর, আয়াত ৭:

"... আর রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো; আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো..."

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কর্মের উপর তাঁর ঐতিহ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া, কারণ মহান আল্লাহর দিকে যাওয়ার সকল পথ বন্ধ, কেবল মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পথ ছাড়া। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"[নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন...""

তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পরে যারা তাঁকে সমর্থন করেছেন, আল্লাহ তাদের সকলকেই ভালোবাসা উচিত, হোক তারা তাঁর পরিবারের সদস্য অথবা তাঁর সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। যারা তাঁর পথে

চলেন এবং তাঁর ঐতিহ্য শিক্ষা দেন তাদের সমর্থন করা তাদের উপর কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে যারা তাঁকে ভালোবাসেন তাদের ভালোবাসা এবং যারা তাঁর সমালোচনা করেন তাদের অপছন্দ করা, তাদের সাথে সম্পর্কের কথা বিবেচনা না করে। সহিহ বুখারির ১৬ নম্বর হাদিসে এই সবের সারসংক্ষেপ রয়েছে। এটি পরামর্শ দেয় যে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত ঈমান অর্জন করতে পারে না যতক্ষণ না সে আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-কে সমগ্র সৃষ্টির চেয়ে বেশি ভালোবাসে। এই ভালোবাসা কেবল কথার মাধ্যমে নয়, কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। তাঁকে শ্রদ্ধা করা, ভালোবাসা এবং কার্যত অনুসরণ করা তাঁর প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক। কিন্তু তাঁর পবিত্র জীবন এবং শিক্ষা সম্পর্কে না জেনে এটি করা সম্ভব নয়। কেউ কীভাবে এমন কাউকে সম্মান করতে, ভালোবাসতে এবং অনুসরণ করতে পারে যাকে তারা চেনে না? যে ব্যক্তি তাঁকে ভালোবাসতে এবং সম্মান করার দাবি করে কিন্তু কার্যত তাঁকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে তার দাবিতে অকৃতজ্ঞ।

আলোচ্য মূল হাদিসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো সমাজের নেতাদের প্রতি আন্তরিক হওয়া এবং এর মধ্যে ধর্মীয় নেতা এবং শিক্ষকদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে তাদেরকে সর্বোত্তম পরামর্শ প্রদান করা এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো প্রয়োজনীয় যেকোনো উপায়ে তাদের ভালো সিদ্ধান্তে সহায়তা করা। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই নম্বর ৫৬, হাদিস নম্বর ২০-এ পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে খুশি করে। অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৫৯:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী..."

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত একটি কর্তব্য যতক্ষণ না কেউ মহান আল্লাহর অবাধ্যতা না করে। সৃষ্টির প্রতি আনুগত্য যদি স্রষ্টার অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে তবে তা নেই। এই ধরণের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এড়ানো উচিত কারণ এটি কেবল নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে নেতাদেরকে মৃদুভাবে ভালোর উপদেশ দেওয়া এবং মন্দের নিষেধ করা উচিত। অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা যদি সঠিক পথে থাকেন তবে সাধারণ মানুষও সঠিক থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভণ্ডামির লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলা উচিত। আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে সমাজকে কল্যাণের উপর ঐক্যবদ্ধ করে এমন বিষয়ে তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী যেকোনো কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করা। ইসলামে নেতাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য নেই, কেবল এমন বিষয়ে তাদের আনুগত্য করা যা মহান আল্লাহকে খুশি করে।

আলোচ্য মূল হাদিসে উল্লেখিত সর্বশেষ বিষয় হলো সাধারণ মানুষের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য মঙ্গল কামনা করা এবং নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা। এর মধ্যে রয়েছে অন্যদের ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, সর্বদা অন্যদের প্রতি করুণা ও সদয় হওয়া। সহিহ মুসলিমের ১৭০ নম্বর হাদিসে এর সারসংক্ষেপ পাওয়া যায়। এটি সতর্ক করে যে, কেউ যতক্ষণ না নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অন্যদের জন্য তাই পছন্দ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃত মুমিন হতে পারে না।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে সহীহ বুখারীর ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এই দায়িত্বকে ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠা এবং ফরজ দান করার পরেই রেখেছেন। এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব বোঝা যায় কারণ এটিকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্বের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ হলো, যখন তারা সুখী হয় তখন খুশি হওয়া এবং যখন তারা দুঃখিত হয় তখন দুঃখিত হওয়া, যতক্ষণ না তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয়। উচ্চ স্তরের আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্যদের জীবনকে উন্নত করার জন্য চরম সীমা অতিক্রম করা, এমনকি যদি এটি তাদের নিজেদেরকে অসুবিধার মধ্যে ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ অভাবীদের জন্য সম্পদ দান করার জন্য কিছু জিনিসপত্র ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। সর্বদা কল্যাণের জন্য মানুষকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের একটি বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় ১৭ আল ইসরা, আয়াত ৫৩:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়..."

মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি উপায় হল অন্যদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং তাদের পাপের বিরুদ্ধে গোপনে উপদেশ দেওয়া। যে ব্যক্তি এইভাবে কাজ করে, আল্লাহ তার পাপ ঢেকে রাখবেন। জামে আত তিরমিযী, ১৪২৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব অন্যদের ধর্মের দিকগুলি এবং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া এবং শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে তাদের পার্থিব এবং ধর্মীয় জীবন উভয়ই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যদের অপবাদ থেকে তাদের সমর্থন করে। অন্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের

মনোভাব নয়। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ প্রাণীই এইরকম আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজ পরিবর্তন করতে না পারে, তবুও তারা তাদের জীবনের লোকদের, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, অন্যদের সাথে সেই আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় লোকেরা তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় ২৮ আল কাসাস, আয়াত ৭৭:

"... আর তুমিও ভালো কাজ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি ভালো করেছেন..."

অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক হল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য তাদের সাহায্য করা। মানুষের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা কামনা করা উচিত নয়, কারণ এটি তার সওয়াব নষ্ট করে এবং আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি স্পষ্ট অকৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করবে সে নিশ্চিত করবে যে সে তার প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে সে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তার জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে, এমনকি যদি তা তার আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে। মনের এবং শরীরের শান্তি অর্জনের জন্য নিজের আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা একটি ছোট মূল্য, ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি সুস্বাস্থ্য অর্জনের জন্য তার খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎ কর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

অন্যদিকে, জীবন তার জন্য অন্ধকার কারাগারে পরিণত হয় যে তার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করার পরেও মানসিক শান্তি লাভ করতে ব্যর্থ হয়। ধনী ও বিখ্যাতদের দেখলে এটি বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অধ্যায় ৯, তওবা, আয়াত ৮২:

"তাহলে তারা যেন অল্প হেসে ফেলে এবং [তারপর] অনেক কাঁদে, কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফলস্বরূপ।" তারা আগে আয় করত।"

এবং অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

বিশ্বাস ধরে রাখুন

ই জিলহজ্জ , আরাফাতের দিন , মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর নিম্নলিখিত ঐশ্বরিক ওহী নাজিল হয়েছিল: ৫ম সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ৩:

"...আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম..."

ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩০৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই কথা শোনার পর, উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) কেঁদে ফেললেন। যখন তাকে তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে পরিপূর্ণতার পরে কেবল পতনই হতে পারে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৯৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী (সা.) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তিনি মুসলিম জাতির জন্য দারিদ্র্যের ভয় করেন না। বরং তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে পার্থিব আশীর্বাদ তাদের জন্য সহজে প্রাপ্ত এবং প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করবে এবং ফলস্বরূপ, এটি তাদের ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করবে, যেমন এই প্রতিযোগিতা পূর্ববর্তী জাতিগুলিকে ধ্বংস করেছিল।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এটি কেবল সম্পদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। বরং এই সতর্কীকরণ মানুষের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার সকল দিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব এবং জীবনের সামাজিক দিক যেমন পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং ক্যারিয়ারের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে পারে। যখনই কেউ তাদের চাহিদার বাইরে এই জিনিসগুলি অনুসরণ করে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার লক্ষ্য রাখে, এমনকি যদি সেগুলি বৈধ হয়, তখন এটি তাদের আখেরাতের জন্য কার্যত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখবে, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। এটি তাদের খারাপ চরিত্রের দিকে পরিচালিত করবে, যেমন অপচয় এবং অপচয় করা, এমনকি এই জিনিসগুলি অর্জনের জন্য তাদের পাপের দিকেও নিয়ে যেতে পারে। এগুলি অর্জনে ব্যর্থতা অধৈর্যতা এবং মহান আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা এবং অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করতে পারে। অন্যদের সাথে পার্থিব আশীর্বাদের জন্য প্রতিযোগিতা তাদেরকে অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে পরিচালিত করবে, যেমন হিংসা, বিদ্বেষ এবং শত্রুতা, যা অনৈক্য, অকৃতজ্ঞতা এবং অন্যদের অধিকার পূরণে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করে। এই প্রতিযোগিতা এমনকি অন্যদের ক্ষতি করতে পারে। এটি উভয় জগতেই কেবল ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, এমনকি যদি এটি এই পৃথিবীর কোনও ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট নাও হয়।

এটা স্পষ্ট যে এই পার্থিব আকাঙ্ক্ষাগুলি অনেক মুসলমানের উপর কর্তৃত্ব করেছে কারণ তারা আনন্দের সাথে মধ্যরাতে ঘুম থেকে উঠে সম্পদের মতো পার্থিব আশীর্বাদ অর্জন করত, অথবা ছুটিতে যেত, কিন্তু যখন তাদেরকে নফল রাতের নামাজ পড়তে বা জামাতের সাথে মসজিদে সকালের ফরজ নামাজ পড়তে বলা হত, তখন তারা তা করতে ব্যর্থ হত।

এই জিনিসগুলি অর্জনে কোন ক্ষতি নেই যতক্ষণ না এগুলো বৈধ এবং মানুষের এবং তার উপর নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য আবশ্যক। কিন্তু যখন কেউ এর বাইরে যায়, তখন সে তার পরকালের ক্ষতির জন্য এগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কারণ এটি তাকে আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে। যত বেশি কেউ তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা অনুসরণ করবে, ততই সে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য কম চেষ্টা করবে, কারণ একজন ব্যক্তি তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে হয় আল্লাহ, মহিমান্বিতকে খুশি করার জন্য ব্যবহার করতে পারে, অথবা তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসারে। এটি আলোচিত মূল হাদিসে সতর্ক করা ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করবে। একটি ধ্বংস যা এই পৃথিবীতে চাপ এবং উদ্বেগ দিয়ে শুরু হয় এবং পরকালে চরম অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 20 ত্বাহা, আয়াত 124:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন] এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।"

তাকওয়া কী?

যখন মহানবী (সাঃ) আরাফাত থেকে রওনা হলেন, তখন লোকেরা তাঁর পিছনে ছুটে গেল। এরপর তিনি কাউকে লোকদের কাছে ঘোষণা করার নির্দেশ দিলেন যে তাকওয়া গতি দ্বারা পরিমাপ করা হয় না। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীজীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৫৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই তাকওয়া অর্জন করা হয় যাতে কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। ৩৫তম সূরা ফাতির, আয়াত ২৮:

"... আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, কেবল তারাই ভয় করে..."

জামে আত তিরমিযী, ২৪৫১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারে না যতক্ষণ না সে এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা তার ধর্মের জন্য ক্ষতিকর নয়, এই সতর্কতার সাথে যে এটি ক্ষতিকর কিছুর দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, ধার্মিকতার একটি দিক হল এমন জিনিস এড়িয়ে চলা যা কেবল অবৈধ নয়, সন্দেহজনক। কারণ সন্দেহজনক জিনিস একজন মুসলিমকে হারাম জিনিসের এক ধাপ কাছাকাছি নিয়ে যায় এবং হারাম জিনিস যত বেশি কাছাকাছি হয় ততই এতে পতিত হওয়া সহজ হয়। এই কারণেই জামে আত তিরমিযী, ১২০৫ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে, যে ব্যক্তি অবৈধ এবং সন্দেহজনক জিনিস এড়িয়ে চলে সে তার ধর্ম এবং সম্মান রক্ষা করবে। যদি কেউ সমাজে বিপথগামী ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি হঠাৎ করে ঘটেনি। অর্থাৎ, ব্যক্তি প্রথমে হারাম

জিনিসে লিপ্ত হওয়ার আগে সন্দেহজনক জিনিসে লিপ্ত হয় । এই কারণেই ইসলাম তার জীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিস এড়িয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় কারণ এটি তাকে হারাম জিনিসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলাম কর্তৃক পাপ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ নয় এমন অনর্থক এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা প্রায়শই মন্দ কথাবার্তার দিকে পরিচালিত করে, যেমন গীবত, মিথ্যা বলা এবং অপবাদ। যদি কোনও ব্যক্তি প্রথম পদক্ষেপটি অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত না হয়ে এড়িয়ে চলে, তবে নিঃসন্দেহে তারা মন্দ কথাবার্তা এড়িয়ে চলবে। এই প্রক্রিয়াটি অনর্থক, অপ্রয়োজনীয় এবং বিশেষ করে সন্দেহজনক সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সঠিক পথ

পবিত্র হজ্জের সময়, যখন তিনি ওয়াদি মুহাসিরে পৌঁছান, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করেন এবং লোকদেরও একই কাজ করার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি তাদেরকে উপদেশ দেন যে তারা যেন তাঁর কাছ থেকে তাদের রীতিনীতি গ্রহণ করে, কারণ সেই বছরের পর তারা তাঁকে আর দেখতে না পারে। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীজীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৬৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পবিত্র হজ্জের রীতিনীতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, তবুও তাঁর কথার পরোক্ষ অর্থ হল যে একজন মুসলিমকে তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার ঐতিহ্য অনুসরণ করতে হবে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস দ্বারা এটি স্পষ্টভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

এবং ৫৯তম অধ্যায় আল হাশর, আয়াত ৭:

"... আর রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো; আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো..."

এবং ৪র্থ অধ্যায় আন নিসা, আয়াত ৮০:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা নির্দেশনার দুটি উৎস: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস কঠোরভাবে মেনে চলে এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎস এড়িয়ে চলে। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করবে, এমনকি যদি তা সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে, তবুও তারা নির্দেশনার দুটি উৎসের উপর তত কম কাজ করবে, যা পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে। এই কারণেই মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করে বলেছেন যে, যে বিষয় দুটি নির্দেশনার উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করবেন। উপরন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করবে, তত বেশি তারা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে এমন বিষয়গুলিতে কাজ করতে শুরু করবে। এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে বিপথগামী করে। উদাহরণস্বরূপ, সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতা করে এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রাখে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পা দেবে এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করবে যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথেও সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান নির্দেশনার দুটি উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে

নেওয়া হয়েছে। এই বিভ্রান্তিকর অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফর, যেমন কালো জাদু অনুশীলন। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"...সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

সুতরাং একজন মুসলিম অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রয়েছে। এই কারণেই ধর্মীয় উদ্ভাবনগুলিতে কাজ করা যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

প্রলোভন নিয়ন্ত্রণ করা

পবিত্র হজ্জের সময়, যখন মহানবী (সাঃ) মিনায় পশু কোরবানির স্থানে পৌঁছান, তখন তিনি তাঁর ছোট চাচাতো ভাই ফজল ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে তাঁর উটের পিঠে বসিয়েছিলেন। এক যুবতী মহিলা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়, তিনি তাঁর চাচাতো ভাইয়ের মাথাটি যুবতী মহিলার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেন যাতে তিনি তাকে দেখতে না পান। যখন তাঁকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি উত্তর দেন যে তিনি একজন যুবক এবং মহিলাকে একে অপরের কাছাকাছি থাকতে দেখেছেন এবং তিনি শয়তানকে তাদের অর্থ দিয়ে বিশ্বাস করতে পারেননি, যা তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৬৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

অবৈধ সম্পর্কের প্রলোভন এড়াতে মুসলমানদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। প্রথমত, তাদের দৃষ্টি নিচু করতে শেখা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে সর্বদা তাদের জুতার দিকে তাকানো উচিত, বরং এর অর্থ হল তাদের অপ্রয়োজনীয়ভাবে চারপাশে তাকানো এড়ানো উচিত, বিশেষ করে জনসাধারণের জায়গায়। তাদের অন্যদের দিকে তাকানো এড়ানো উচিত এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখা উচিত। ঠিক যেমন একজন মুসলিম তার বোন বা মেয়ের দিকে কেউ তাকিয়ে থাকুক তা পছন্দ করে না, তেমনি অন্যের বোন এবং মেয়েদের দিকেও তাকানো উচিত নয়। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ৩০:

"মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিশক্তি কিছুটা কমিয়ে রাখে এবং তাদের গোপনাঙ্গের হেফাজত করে। এটি তাদের জন্য অধিক পবিত্র..."

যখনই সম্ভব, একজন মুসলিমের উচিত বিপরীত লিঙ্গের সাথে একা সময় কাটানো এড়িয়ে চলা, যদি না তারা এমনভাবে সম্পর্কিত হয় যা বিবাহকে নিষিদ্ধ করে। সহীহ বুখারী, ১৮৬২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এই পরামর্শ দিয়েছেন।

মুসলমানদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আচরণ শালীনভাবে করা উচিত। শালীন পোশাক অপরিচিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এড়ায় এবং শালীন আচরণ করা প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত রাখে যা বিপরীত লিঙ্গের সাথে অপ্রয়োজনীয়ভাবে কথা বলার মতো অবৈধ সম্পর্কের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

অবৈধ সম্পর্ক এড়িয়ে চলার আশীর্বাদ বোঝা হল এগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করার আরেকটি উপায়। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার জিহ্বা এবং সতীত্ব রক্ষাকারী ব্যক্তির জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। জামে আত তিরমিযী, ২৪০৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

অবৈধ সম্পর্কে জড়িত থাকার শাস্তির ভয় একজন মুসলিমকে এগুলো এড়িয়ে চলতে সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ব্যভিচার করছে তার ঈমান চলে যাবে। সুনান আবু দাউদের ৪৬৯০ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

বাস্তবে, ইসলামে বিবাহের বিধান অনুসারে একজন মুসলিমের অবৈধ সম্পর্কের প্রয়োজন নেই। যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে না তাদের ঘন ঘন রোজা রাখা উচিত

কারণ এটি তাদের ইচ্ছা এবং কর্ম নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। সহিহ মুসলিমের ৩৩৯৮ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সহজতার ধর্ম

কুরবানীর দিন সকালে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই ফজল ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে মিনায় জামারাতে পাথর ফেলার জন্য ব্যবহৃত কিছু নুড়ি সংগ্রহ করতে বললেন। ফজল (রাঃ) ছোট নুড়ি বেছে নিয়ে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে দিলেন, যিনি তাঁর পছন্দে সন্তুষ্ট ছিলেন। এরপর নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে পরামর্শ দিলেন যে, বাড়াবাড়ি থেকে সাবধান থাকা উচিত, কারণ ধর্মের বাড়াবাড়িই পূর্ববর্তী জাতিগুলিকে ধ্বংস করেছিল। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৬৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীর ৩৯ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, ধর্ম সহজ এবং সরল। এবং একজন মুসলিমের উচিত নিজের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো নয়, কারণ তারা এর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না।

এর অর্থ হলো, একজন মুসলিমের সর্বদা একটি সরল ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনযাপন করা উচিত। ইসলাম মুসলমানদেরকে সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য নিজেদের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার দাবি করে না। বরং এটি আসলে সরলতা শেখায়, যা ইমাম বুখারীর "আদাবুল মুফরাদ", ২৮৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ধর্ম। একজন মুসলিমের প্রথমে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, যা নিঃসন্দেহে তাদের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে কারণ আল্লাহ, একজন মুসলিমকে তার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি বোঝা দেন না। পবিত্র কুরআনের ২য় সূরা আল বাকারার ২৮৬ নম্বর আয়াতে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে:

"আল্লাহ কোন আত্মার উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন বোঝা চাপান না..."

এরপর, তাদের উচিত তাদের দিনের কিছুটা সময় ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়নের জন্য বের করা যাতে তারা তাদের শক্তি অনুসারে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের উপর আমল করতে পারে। সহিহ বুখারী, ৬৫০২ নম্বরে পাওয়া হাদিস অনুসারে, এটি আল্লাহর ভালোবাসা আকর্ষণ করে।

যদি কোন মুসলিম এই আচরণে অটল থাকে, তাহলে তাদের উপর এমন রহমত বর্ষিত হবে যে তারা আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবে এবং অতিরিক্ত, অপচয় বা অপচয় ছাড়াই এই পৃথিবীর বৈধ আনন্দ উপভোগ করার জন্য সময় বের করবে।

এভাবেই একজন মুসলিম নিজের জন্য সবকিছু সহজ করে তোলে। আর যদি তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি থাকে, যেমন সন্তান, তাহলে তাদেরও একই শিক্ষা দেওয়া উচিত, যার ফলে তাদের জন্যও সবকিছু সহজ হয়ে যায়। নিজের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করা জিনিসগুলিকে কঠিন করে তোলে এবং একজনকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে বাধ্য করতে পারে। আর অতিরিক্ত শিথিলতা জিনিসগুলিকে কঠিন করে তুলবে কারণ অলসতার কারণে উভয় জগতেই মহান আল্লাহর রহমত থেকে মানুষ বঞ্চিত হবে। অতএব, ভারসাম্য বজায় রাখা সর্বোত্তম, যা ইসলাম সর্বদা উৎসাহিত করে।

যেহেতু ইসলাম সহজ, তাই হালাল ও অবৈধ উভয়ই স্পষ্ট, বোধগম্য এবং মেনে চলা সহজ। অতএব, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীসের উপর ভিত্তি করে নয় এমন ধর্মীয় জ্ঞান গবেষণা এবং কাজ করে নিজের বা তাদের উপর

নির্ভরশীলদের জন্য বিষয়গুলিকে জটিল করা উচিত নয়। যখন কেউ এই দুটি উৎস কঠোরভাবে মেনে চলে, তখন তারা ইসলামকে বুঝতে এবং বাস্তবায়ন করতে সহজ পাবে।

পরিশেষে, সম্প্রসারিতভাবে, একজন ব্যক্তির উচিত তাদের পার্থিব জীবনকে সরল রাখার চেষ্টা করা। এটি তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ তার চাহিদা এবং দায়িত্ব অনুসারে বৈধ সম্পদের মতো বস্তুগত জগতের জন্য প্রচেষ্টা করে এবং অপচয় এবং অপচয় এড়িয়ে চলে। যত বেশি কেউ এটি মেনে চলবে, তার পার্থিব জীবন তত বেশি স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে। যখন এটি তাদের সরল ধর্মের সাথে মিলিত হবে, তখন এটি মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতেই সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে।

সত্যিকারের ত্যাগ

তাঁর পবিত্র হজ্জের সময়, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) মোট ১০০টি উট কুরবানী করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

কুরবানী হল হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর একটি ঐতিহ্য, যা মুসলমানরা পবিত্র হজ্জ (হজ্জ) মৌসুমে অনুকরণ করে। হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-কে তাঁর পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে কুরবানী করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সূরা ৩৭ আস সাফাত, আয়াত ১০২:

"অতঃপর যখন সে তার সাথে [যত্নের] বয়সে উপনীত হল, তখন সে বলল, "হে আমার পুত্র, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে কুরবানী করতে যাচ্ছি, তাই দেখো তোমার কি মত।" সে বলল, "হে আমার পিতা, তোমাকে যা আদেশ করা হয়েছে তাই করো। আল্লাহ চাইলে তুমি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবে।"

প্রথম শিক্ষা হলো পরীক্ষা ও পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার সময় ধৈর্যের গুরুত্ব বোঝা। একজন মুসলিমের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে তাদের চেয়ে যারা বেশি প্রিয়, অর্থাৎ নবী-রাসূলগণ, তাদের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত-তিরমিযী, ২৪৭২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিশ্চিত করেছেন যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর চেয়ে বেশি কেউ পরীক্ষায় পড়েননি।

মুসলমানদের এটাও মনে রাখা উচিত যে, তারা যে পরিস্থিতিতেই পড়ুক না কেন, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। সহীহ মুসলিমের ৭৫০০ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপদেশ অনুসারে, যদি কোন মুসলিম কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে তাকে তার জন্য পুরস্কৃত করা হবে। আর যদি সে স্বস্তির সময় অতিক্রম করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাহলে তাকে তার জন্য পুরস্কৃত করা হবে। সুতরাং এই হাদিস অনুসারে, একজন মুসলিম যে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তা কল্যাণকর, এমনকি যদি সে এর পিছনের জ্ঞান নাও দেখে। ২য় সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

মুসলমানদের এটাও বুঝতে হবে যে, তারা যেভাবেই প্রতিক্রিয়া দেখাক না কেন, মহান আল্লাহ তাদের জন্য এমন একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে যা তাদের জন্য নির্ধারিত। যদি তারা ধৈর্যের সাথে এটি মোকাবেলা করে তবে তারা এই দুনিয়া এবং আখেরাতে অগণিত পুরস্কার পাবে। সূরা আয-যুমার, আয়াত ১০:

"...নিশ্চয়ই, ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান বিনা হিসাব [অর্থাৎ, সীমা] দেওয়া হবে।"

কিন্তু যদি তারা অধৈর্য হয়ে এর মুখোমুখি হয়, তাহলে তাদের আরও সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। তাই যেভাবেই হোক তাদের এই অসুবিধার মুখোমুখি হতে হবে যাতে তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারে।

তাছাড়া, একজন মুসলিমের বোকামি করা উচিত নয় এবং এটা উপলব্ধি করা উচিত নয় যে এই পৃথিবী জান্নাত নয়। এটি এমন একটি পৃথিবী যা মানবজাতিকে পরীক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, তাই এটি কখনই পরীক্ষা ও পরীক্ষার বাইরে থাকতে পারে না। যখন একজন মুসলিম বুঝতে পারে যে তার সহজাত প্রকৃতির কারণেই তারা সমস্যা ও পরীক্ষার মুখোমুখি হচ্ছে, তখন তারা অবাক হয় না কারণ তারা পৃথিবী থেকে এটি আশা করে। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি বন্য প্রাণীর আক্রমণের শিকার হতে পারে বলে আশা করে, তেমনি তার এই পৃথিবীতেও পরীক্ষা ও পরীক্ষার আশা করা উচিত। এইভাবে মানসিকভাবে প্রস্তুতি একজন মুসলিমকে অজ্ঞতার শিকার হতে বাধা দেবে যা অধৈর্যতার কারণ।

এই মহান ঘটনা থেকে আরেকটি শিক্ষা হল, যেভাবে একজন ব্যক্তি এই বস্তুগত জগতে সম্পদের মতো জিনিস ত্যাগ ছাড়া অর্জন করতে পারে না, তেমনি একজন মুসলিমও ত্যাগ ছাড়া মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না। সূরা ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ২:

"মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না?"

মুসলমানদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে, মহান আল্লাহ তাদের কাছ থেকে মহান নবী ইব্রাহিম (আ.) এবং অন্যান্য নবীদের (সা.) মতো বড় বড় ত্যাগ দাবি করেন না। মহান আল্লাহও মুসলমানদের কাছ থেকে মহান নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবীদের মতো ত্যাগ দাবি করেন না। তারা তাদের সম্পদ, ঘরবাড়ি, পরিবার এবং জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বরং, মহান আল্লাহ মুসলমানদের উপর এমন কিছু বাধ্যতামূলক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যার জন্য তাদের সময়, শক্তি এবং সম্পদের খুব কম ত্যাগ প্রয়োজন। কেউ যদি জান্নাতের মাহাত্ম্য নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে তারা বুঝতে পারবে যে, তাদেরকে যে ত্যাগ স্বীকার করতে উৎসাহিত করা হয়েছে তা প্রতিশ্রুত পুরস্কারের তুলনায় খুবই নগণ্য। অতএব, মুসলমানদের এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের সাথে আত্মসমর্পণ করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে।

হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের কুরবানী এই ইঙ্গিত দেয় যে, একজন মুসলিমের সর্বদা আল্লাহর আদেশের জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা এবং আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকা উচিত। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুসলমানরা প্রতি বছর যে পশু কুরবানী করে, তা এরই প্রতীক। এটি কেবল একটি পশু কুরবানী নয় বরং আরও অনেক কিছু। সূরা আল হজ্জ, আয়াত ৩৭:

"তাদের গোশত আল্লাহর কাছে পৌঁছাবে না, রক্তও পৌঁছাবে না, বরং তাঁর কাছে যা পৌঁছাবে তা হলো তোমাদের তাকওয়া। এভাবেই আমরা তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা আল্লাহর প্রশংসা করো, তিনি তোমাদেরকে যে পথ দেখিয়েছেন তার জন্য;..."

মুসলমানদের উচিত সারা বছর ধরে এই আয়াতে উল্লেখিত তাকওয়া অবলম্বন করা এবং তাদের কামনা-বাসনার আগে আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে স্থান দেওয়া।

তবেই তারা সত্যিকার অর্থে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পদাঙ্ক সঠিকভাবে অনুসরণ করতে সক্ষম হবে।

এই মহান ঘটনা থেকে শেখার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা। এমনকি এই মহান ঘটনার মতো অনিবার্য এবং বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতেও, একজন মুসলিমের সর্বদা মহান আল্লাহর পছন্দের উপর ভরসা করা উচিত। মুসলমানদের বুঝতে হবে যে তাদের জ্ঞান খুবই সীমিত এবং তারা অত্যন্ত অদূরদর্শী। অর্থাৎ, তারা মহান আল্লাহর পছন্দের পিছনের প্রজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। অন্যদিকে, মহান আল্লাহর জ্ঞান এবং ঐশ্বরিক উপলব্ধি সীমাহীন। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত মহান আল্লাহর পছন্দের উপর আস্থা রাখা, ঠিক যেমন একজন অন্ধ ব্যক্তি তার শারীরিক পথপ্রদর্শকের নির্দেশনার উপর আস্থা রাখে। একজন মুসলিমের মনোভাব যাই হোক না কেন, মহান আল্লাহর পছন্দের ঘটনা ঘটবেই, তাই অধৈর্য না হয়ে তাঁর প্রজ্ঞার উপর আস্থা রাখাই উত্তম, যা কেবল আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে।

এছাড়াও, জীবনের অসংখ্য উদাহরণ মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, যখন একজন ব্যক্তি এমন কিছু কামনা করে যা পাওয়ার পর কেবল অনুশোচনা করে। এবং যখন তারা এমন কিছু ঘটতে অপছন্দ করে যা পরবর্তীতে কেবল তাদের মন পরিবর্তন করে। সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

যেহেতু ভাগ্য মানুষের হাতের বাইরে, তাই মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যদি সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চায়, তাহলে তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা জিনিসের উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত, অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। মহান আল্লাহ ইতিমধ্যেই গ্যারান্টি দিয়েছেন যে তিনি একজন মুসলিমকে উভয় জগতের সমস্ত সমস্যা থেকে রক্ষা করবেন। তাদের কেবল তাঁর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে হবে। অধ্যায় ৬৫ তালাক, আয়াত ২:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

যে জিনিসের অর্থ, ভাগ্য, তার উপর জোর দেওয়া এবং যে জিনিসের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আনুগত্য, সে সম্পর্কে গাফেল থাকা বোকামি।

ভালোবাসা কর্মের মধ্যেই থাকে

কুরবানী করার পর, মহানবী (সাঃ) একজন নাপিতকে তার মাথা কামানোর নির্দেশ দেন, ডান দিক থেকে শুরু করে। তারপর তিনি কামানো চুলগুলো লোকদের মধ্যে বিতরণ করার নির্দেশ দেন। তাঁর সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, তাঁর মাথা কামানোর সময় তাঁকে ঘিরে রেখেছিলেন যাতে তাঁর কোনও চুল মেঝেতে না পড়ে। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৭২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটা স্পষ্ট যে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা থেকে এই আচরণ করেছিল।

প্রতিটি মুসলিম খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করে যে তারা পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), অন্যান্য নবীগণ, সাহাবীগণ এবং সাহাবীগণের সাহচর্য কামনা করে। তারা প্রায়শই সহীহ বুখারীতে ৩৬৮৮ নম্বর হাদিসটি উদ্‌ধৃত করে, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে একজন ব্যক্তি পরকালে যাদের ভালোবাসে তাদের সাথেই থাকবে। এবং এই কারণে তারা খোলাখুলিভাবে আল্লাহর এই নেক বান্দাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা ঘোষণা করে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তারা কীভাবে এই পরিণতি কামনা করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসার দাবি করে, অথচ তারা তাঁকে খুব কমই চেনে কারণ তারা তাঁর জীবন, চরিত্র এবং শিক্ষা অধ্যয়ন করতে ব্যস্ত। এটা বোকামি কারণ একজন ব্যক্তি কীভাবে সত্যিকার অর্থে এমন কাউকে ভালোবাসতে পারে যাকে তারা চেনেই না?

তাছাড়া, যখন এই লোকদের কাছে মহানবী (সাঃ) এর প্রতি তাদের ভালোবাসার প্রমাণ চাওয়া হবে, তখন বিচার দিবসে তারা কী বলবে? তারা কী উপস্থাপন করবে? এই ঘোষণার প্রমাণ হলো মহানবী (সাঃ) এর জীবন, চরিত্র এবং শিক্ষা অধ্যয়ন করা এবং তার উপর আমল করা। এই প্রমাণ ছাড়া কোন ঘোষণা মহান আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। এটি বেশ স্পষ্ট কারণ সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, তাদের চেয়ে ইসলামকে আর কেউ ভালোভাবে বুঝতে পারেনি এবং এটি তাদের মনোভাব ছিল না। তারা মহানবী (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা ঘোষণা করেছিলেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কর্মের মাধ্যমে তাদের দাবিকে সমর্থন করেছিলেন। এই কারণেই তারা পরকালে তাঁর সাথে থাকবেন।

যারা বিশ্বাস করে যে ভালোবাসা হৃদয়ে থাকে এবং কাজে তা প্রকাশের প্রয়োজন হয় না, তারা সেই ছাত্রের মতোই বোকা, যে তার শিক্ষকের কাছে খালি পরীক্ষার খাতা ফেরত দিয়ে দাবি করে যে জ্ঞান তার মনে আছে তাই তাকে বাস্তবে তা কাগজে লিখে রাখার প্রয়োজন নেই এবং তারপরও সে পাস করার আশা করে।

যে ব্যক্তি এমন আচরণ করে, সে আল্লাহর নেক বান্দাদের ভালোবাসে না, কেবল তাদের নিজেদের কামনা-বাসনাকেই ভালোবাসে এবং নিঃসন্দেহে শয়তান তাদের বোকা বানিয়েছে।

পরিশেষে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যান্য ধর্মের সদস্যরাও তাদের পবিত্র নবীদের প্রতি ভালোবাসার দাবি করে, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। কিন্তু যেহেতু তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে এবং তাদের শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই বিচারের দিনে তারা অবশ্যই তাদের সাথে থাকবে না। এই সত্যটি যদি কেউ একবার চিন্তা করে দেখে তবে এটি বেশ স্পষ্ট।

কোন ক্ষতি করো না

পবিত্র হজ্জের একটি দিক হলো আল্লাহর ঘর কাবার সাথে সংযুক্ত কালো পাথর স্পর্শ করা এবং চুম্বন করা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) কে বলেছিলেন যে, তিনি একজন শক্তিশালী ব্যক্তি হলেও, তার কালো পাথরে পৌঁছানোর জন্য দৌড়ানো উচিত নয় কারণ এতে অন্যদের ক্ষতি হতে পারে। যদি তিনি মানুষের ভিড়ের কারণে কালো পাথরে পৌঁছানোর পথ খুঁজে না পান তবে তার উচিত দূর থেকে সালাম করা। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীজীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২৮-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও কালো পাথরে পৌঁছানো একটি ইবাদত, তবুও একজন মুসলিমের এই প্রক্রিয়ায় অন্যদের ক্ষতি করার অনুমতি নেই। এটি অন্যদের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সুনানে আন নাসায়ীর ৪৯৯৮ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সা.) একজন প্রকৃত মুসলিম এবং একজন প্রকৃত মুমিনের লক্ষণ সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন। একজন প্রকৃত মুসলিম হলেন তিনি যিনি অন্যদের থেকে তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি দূরে রাখেন। প্রকৃতপক্ষে, এটি তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর মধ্যে এমন সব ধরণের কথা এবং কাজ অন্তর্ভুক্ত যা অন্যের ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হতে পারে। এর মধ্যে অন্যদের সর্বোত্তম উপদেশ না দেওয়াও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, কারণ এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার পরিপন্থী। সুনানে আন নাসায়ীর ৪২০৪ নম্বর হাদিসে এটি নির্দেশ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অন্যদেরকে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়ার পরামর্শ দেওয়া, যার ফলে তাদের পাপের দিকে আহ্বান করা। একজন মুসলিমের এই আচরণ এড়ানো উচিত কারণ তাদের খারাপ পরামর্শ অনুসারে কাজ করা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে। সহিহ মুসলিমের ২৩৫১ নম্বর হাদিসে এটি সতর্ক করা

হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অন্যদের ব্যবসায় জড়িত না হওয়া, কারণ এটি প্রায়শই অন্যদের ক্ষতি করে। একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের উপস্থিতিতে এবং অনুপস্থিতিতে তাদের প্রতি ইতিবাচকভাবে কথা বলা , ঠিক যেমন সে চায় অন্যরা তাদের সম্পর্কে ইতিবাচকভাবে কথা বলুক।

শারীরিক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবিকার জন্য সমস্যা তৈরি করা, প্রতারণা করা, অন্যদের প্রতারণা করা এবং শারীরিক নির্যাতন করা। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং এগুলি এড়িয়ে চলতে হবে।

আলোচ্য মূল হাদিস অনুসারে, একজন প্রকৃত মুমিন হলেন তিনি যিনি অন্যের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি থেকে দূরে থাকেন। আবার, এটি তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এর মধ্যে অন্যের সম্পত্তি চুরি, অপব্যবহার বা ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত। যখনই কাউকে অন্যের সম্পত্তির দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা কেবল মালিকের অনুমতি নিয়ে এবং মালিকের সন্তুষ্টি এবং সম্মতিক্রমে তা ব্যবহার করছে। সুনানে আন নাসায়ী, ৫৪২১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কেউ মিথ্যা শপথের মাধ্যমে অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে গ্রহণ করে, এমনকি তা গাছের ডালের মতো ছোট হলেও, সে জাহান্নামে যাবে।

উপসংহারে, একজন মুসলিমকে অবশ্যই তার মৌখিক বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের মাধ্যমে সমর্থন করতে হবে, কারণ এটি তার বিশ্বাসের শারীরিক প্রমাণ যা উভয় জগতে সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয়। এছাড়াও, একজন মুসলিমের উচিত আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মানুষের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্যগুলি পূরণ করা। মানুষের প্রতি এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল অন্যদের সাথে কেবল সেই আচরণ করা যা তারা মানুষের কাছ থেকে তাদের সাথে আচরণ করতে চায়, যা শ্রদ্ধা ও শান্তির সাথে।

অন্যদের সাহায্য করা

তাঁর পবিত্র হজ্জের সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর ঘর কাবার কাছে জমজমের কূপের কাছে থামলেন। তিনি আব্দুল মুত্তালিব গোত্রকে বহু বছর ধরে যে কূপ থেকে হাজীদের পানি পান করানোর কাজ করে আসছিলেন, তা থেকে পানি পান করতে দেখলেন। তিনি তাদেরকে যথাযথ কাজ করে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। এরপর তিনি মন্তব্য করেন যে, যদি এমন কিছু লোক না থাকত যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুকরণে নিজেদের কূপ থেকে পানি তোলা থেকে তাদের বাধা দিত, তাহলে তিনি নিজেই কূপ থেকে পানি তুলতেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীজীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৭৭-২৭৮-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিমের ১৯৬ নম্বর হাদিস অনুসারে, অন্যদের প্রতি এইভাবে আন্তরিক হওয়া ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রকৃতপক্ষে, অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়া এত গুরুত্বপূর্ণ যে এটিকে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাধ্যতামূলক কর্তব্যের সাথে স্থান দেওয়া হয়েছে: ফরজ নামাজ এবং ফরজ দান করা, সহীহ বুখারীর ৫৭ নম্বর হাদিসে। অন্যদের তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করে তাদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন করতে হবে, যেমন আর্থিক, শারীরিক এবং মানসিক সাহায্য। অন্যদের এবং তাদের সম্পদ থেকে তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি দূরে রাখতে হবে। সুনান আন নাসায়ীর ৪৯৯৮ নম্বর হাদিস অনুসারে, একজন মুসলিম এবং মুমিনের সংজ্ঞা এটিই। অন্যদের সাথে সেভাবে আচরণ করে অন্যদের প্রতি আন্তরিকতা গ্রহণ করা যেতে পারে যেভাবে তারা নিজেরা মানুষের কাছ থেকে আচরণ পেতে চায়।

এছাড়াও, আলোচ্য মূল ঘটনাটি স্বাধীন থাকার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। সহিহ মুসলিমের ৭৪৩২ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ, মহান, সেই বান্দাকে ভালোবাসেন যে সৃষ্টি থেকে স্বাধীন। এর অর্থ হল, একজন মুসলিমের উচিত তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত উপায়, যেমন তাদের শারীরিক শক্তি, সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করা। তাদের অলস আচরণ করা উচিত নয় এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে মানুষের কাছ থেকে জিনিসপত্র চাওয়া উচিত নয়, কারণ এই অভ্যাস তাদের উপর নির্ভরশীলতার দিকে পরিচালিত করে এবং এটি মহান আল্লাহর উপর আস্থা হ্রাস করে। একজনের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে যাই ঘটুক না কেন, তাদের জন্য যা কিছু নির্ধারিত ছিল তা আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। সহিহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন মুসলিমের উচিত তাদের সম্পদ, যেমন তাদের শারীরিক শক্তি, ব্যবহারের উপর মনোযোগ দেওয়া এবং বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ, তাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা দান করবেন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, কেউ যখন বিশ্বাস করে যে একজন ব্যক্তি, যেমন একজন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষক, তাদের প্রার্থনা এবং সুপারিশের মাধ্যমে উভয় জগতে সাফল্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবেন, তখন অন্যদের উপর ভুলভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে। এই মনোভাব কেবল অলসতাকে উৎসাহিত করে, কারণ কেউ বিশ্বাস করে যে তারা যেভাবে ইচ্ছা আচরণ করতে স্বাধীন এবং তাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষকের মাধ্যমে উভয় জগতে সাফল্য অর্জন করবে। একজন মুসলিমকে এই বিভ্রান্তি এড়াতে হবে এবং পরিবর্তে সাহাবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, যারা মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহচর্য পেয়েছিলেন, তবুও মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি আন্তরিকভাবে ব্যবহার করে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। এটিই সঠিক মনোভাব যা গ্রহণ করা উচিত।

মিনায় খুতবা

সঠিক জ্ঞান বিতরণ করা

পবিত্র হজ্জের সময়, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মিনার দিনগুলিতে একটি খুতবা দিয়েছিলেন। তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল যে উপস্থিত এবং শ্রোতারা যেন অনুপস্থিতদের তা জানান। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৮০-তে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজের মধ্যে ইসলামের সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার সময় সঠিক জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায়, সুনান ইবনে মাজাহ, ২০৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন ব্যক্তি কেবল ভুল জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই শাস্তি পেতে পারেন না বরং কতজন মানুষ এটি অনুসরণ করে তার উপর নির্ভর করে শাস্তি বৃদ্ধি পাবে। দুর্ভাগ্যবশত, এই হাদিসটিকে প্রায়শই উপেক্ষা করা হয় যার ফলে অবিশ্বাস্য এবং ভুল জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে। সঠিক জ্ঞানের অভাব অবিশ্বাসের দরজা খুলে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু লোক যা বোঝে না তা বিদআত, শিরক বা অবৈধ বলে চিহ্নিত করে। এমনকি তারা সহিহ মুসলিম, ২১৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস না জেনেও আনন্দের সাথে মুসলমানদেরকে ধর্মত্যাগী বলে চিহ্নিত করে। এটি স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যদি কেউ একজন মুসলিমকে কুফরের মিথ্যা অভিযোগ করে তবে অভিযোগকারী তার ঈমান হারায়। অজ্ঞতা শয়তানের অন্যতম অস্ত্র এবং এই ফাঁদ থেকে কেবল একজন নির্ভরযোগ্য আলেমের কাছ থেকে সঠিক জ্ঞান অর্জন করেই তা ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। ৩৯ আয-যুমার, আয়াত ৯:

"... বলুন, "যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?"..."

ক্ষতি থেকে বিরত থাকুন

মিনার দিনগুলিতে তাঁর খুতবায়, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) যা বলেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল যে, একজন মুসলিমের রক্ত এবং সম্পদ পবিত্র। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৮০-তে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীর ৬৭ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে, ইসলামে একজন মুসলিমের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান পবিত্র।

এই হাদিসটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়: মুসলমানদের জন্য প্রকৃত সাফল্য আসে মহান আল্লাহর অধিকার, যেমন ফরজ নামাজ আদায় করা এবং সহ-মানুষের অধিকার উভয়ই পূরণ করার মাধ্যমে। একটির জন্য অন্যটিকে অবহেলা করা যথেষ্ট নয়। বিচারের দিনে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে অত্যাচারীরা তাদের সৎকর্মগুলি তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের কাছে স্থানান্তর করতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে, যাদের উপর তারা অত্যাচার করেছে তাদের পাপ বহন করতে বাধ্য হবে। এই ধরনের পরিণতি তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে, সহিহ মুসলিমের 6579 নম্বর হাদিসে এই সতর্কবাণী বর্ণিত হয়েছে।

একজন প্রকৃত মুমিন হলেন সেই ব্যক্তি যিনি অন্যদের এবং তাদের জিনিসপত্রের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকেন—মৌখিক এবং শারীরিক—উভয়ভাবেই। এই নীতিটি সুনানে আন নাসায়ী, ৪৯৯৮ নম্বরে বর্ণিত একটি হাদিস দ্বারা সমর্থিত। সুতরাং, কথা বা কাজের মাধ্যমে ক্ষতি করা এড়ানো মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যের সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মুসলমানদের কখনোই অন্যায়ভাবে এমন জিনিস অর্জনের চেষ্টা করা উচিত নয় যা তাদের নিজস্ব নয়। সহীহ মুসলিমের ৩৫৩ নম্বর হাদিসে, যারা মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে আইনি মামলায় অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করে, তাদের জাহান্নামের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, এমনকি যদি তারা একটি ডালের মতো ছোট জিনিসও গ্রহণ করে। মুসলমানদের অবশ্যই অন্যের সম্পত্তি এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে মালিকের ইচ্ছার প্রতি সম্মান থাকে। অন্যের সম্পত্তির সাথে একইভাবে আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা তাদের নিজস্ব সম্পত্তির সাথে আচরণ করতে চায়।

তাছাড়া, কোনও কাজ বা মন্তব্যের মাধ্যমে একজন মুসলিমের সম্মান ক্ষুণ্ন করা উচিত নয়, যেমন গীবত বা অপবাদ। বরং, তাদের উচিত অন্যদের সম্মান রক্ষা করা, তাদের উপস্থিতিতে এবং অনুপস্থিতিতে, কারণ এটি তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারে। জামে আত তিরমিযী, ১৯৩১ নম্বরের একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্যদের সম্পর্কে এমনভাবে কথা বলা অপরিহার্য যেভাবে সে অন্যদের সম্পর্কে কথা বলতে চায়। যদি কেউ অন্যদের সম্পর্কে সদয় কথা বলতে না পারে, তাহলে তাদের চুপ থাকা উচিত।

সংক্ষেপে, অন্যদের প্রতি অন্যায় করা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য, তা সে তাদের নিজের, তাদের সম্পত্তির, অথবা তাদের সম্মানের সাথে সম্পর্কিত হোক না কেন। অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেমন সে নিজে অন্যদের দ্বারা আচরণ পেতে চায়। এটি একজন প্রকৃত মুমিনের মর্ম প্রতিফলিত করে, যেমনটি জামে আত তিরমিযী, ২৫১৫ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে তুলে ধরা হয়েছে।

শুনুন এবং মান্য করুন

মিনার দিনগুলিতে তাঁর খুতবায়, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) মুসলমানদের তাদের নেতার কথা শুনতে এবং তাদের আনুগত্য করতে উৎসাহিত করেছিলেন যিনি তাদের সামাজিক অবস্থান, যেমন দাস হওয়া নির্বিশেষে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তাদের পথপ্রদর্শন করেছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৮২-২৮৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ১৯৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, ইসলাম হলো সমাজের নেতাদের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সদয়ভাবে তাদের সর্বোত্তম পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো যেকোনো প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়া। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, ৫৬ নম্বর বই এবং ২০ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। ৪র্থ অধ্যায় আন-নিসা, ৫৯ নম্বর আয়াত:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী..."

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত একটি কর্তব্য যতক্ষণ না কেউ মহান আল্লাহর অবাধ্যতা না করে। সৃষ্টির প্রতি আনুগত্য যদি স্রষ্টার অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে তবে তা নেই। এই ধরণের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এড়ানো উচিত কারণ এটি কেবল নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে নেতাদেরকে

মৃদুভাবে ভালোর উপদেশ দেওয়া এবং মন্দের নিষেধ করা উচিত। অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা যদি সঠিক পথে থাকেন তবে সাধারণ মানুষও সঠিক থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভণ্ডামির লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলা উচিত। আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে সমাজকে কল্যাণের উপর ঐক্যবদ্ধ করে এমন বিষয়ে তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী যেকোনো কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করা। ইসলামে নেতাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য নেই, কেবল এমন বিষয়ে তাদের আনুগত্য করা যা মহান আল্লাহকে খুশি করে।

পারিবারিক বন্ধন

মিনার দিনগুলিতে তাঁর খুতবায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদের তাদের আত্মীয়দের উপর যে অধিকার রয়েছে তা পূরণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন, বিশেষ করে তাদের মা, বাবা, বোন, ভাই এবং তারপর পরবর্তী নিকটতম আত্মীয়ের নাম উল্লেখ করে। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৮৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে সর্বব্যাপী উপদেশ আল্লাহ তাআলা সর্বদাই প্রদান করেছেন। এই ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ তাআলা প্রায়শই পবিত্র কুরআনে আত্মীয়স্বজনের সাথে সদয় আচরণ করার তাগিদ দেন, কারণ কেবলমাত্র এই উপদেশের উপর আমল করলেই সমাজে সমৃদ্ধি, শান্তি এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে। যদি প্রতিটি ব্যক্তি তাদের আত্মীয়স্বজনের সাথে সদয় আচরণ করে, তাহলে বাইরের কোন উৎস থেকে অন্য কোন সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। এর ফলে প্রতিটি পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সাথে সদয় আচরণ নিশ্চিত হবে, যা সমগ্র সমাজের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

ইসলামে প্রশংসনীয় যেকোনো কাজে আত্মীয়স্বজনদের সাহায্য করা উচিত এবং নিন্দনীয় যেকোনো বিষয়ে তাদের সতর্ক করা উচিত। ৫ম অধ্যায় আল মায়িদাহ, আয়াত ২:

"...এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

দুঃখের বিষয় হল, আজকাল অনেক মুসলিম এই উপদেশ উপেক্ষা করে এবং অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক অনুসারে সাহায্য করে, তারা যে জিনিসে তাদের সাহায্য করছে তা ভালো হোক বা খারাপ, তা নির্বিশেষে। একজন মুসলিমের উচিত নিম্নলিখিত আয়াতের ক্রম মেনে চলা এবং কেবলমাত্র তাদের আত্মীয়দের এমন কিছুতে সাহায্য করা যা সরাসরি আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের সাথে সম্পর্কিত। সূরা ২ আল বাকারা, ৮৩:

"... *আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত করো না; এবং পিতামাতা এবং আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করো...*"

আত্মীয়স্বজনদের তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক সহায়তা। এটি তখনই সবচেয়ে ভালোভাবে অর্জন করা যায় যখন কেউ অন্যদের সাথে সেই আচরণ করে যেভাবে সে অন্যদের সাথে আচরণ করতে চায়। মানুষের দ্বারা নির্ধারিত ভালো আত্মীয়ের মান এবং সংজ্ঞা সম্পর্কে খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাদের মান এবং সংজ্ঞা প্রায়শই ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত সংজ্ঞা এবং মানদণ্ডের বিপরীত। পরিবর্তে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুসারে আত্মীয়স্বজনের অধিকার পূরণ করতে হবে, তা নির্বিশেষে আত্মীয়স্বজনরা তাদের ভালো আত্মীয় বলে মনে করুক বা না করুক। পরিশেষে, একজন মুসলিমের কখনও পার্থিব কারণে তাদের আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয়, যেমনটি সহিহ বুখারির ৫৯৮৪ নম্বর হাদিসে হুঁশিয়ার করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি পার্থিব কারণে তাদের আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তাছাড়া, যদিও একজন মুসলিম ধর্মীয় কারণে তার আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে, তবুও তার আত্মীয়কে ভালো কাজে সাহায্য করে এবং খারাপ কাজে সতর্ক করে তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখাই উত্তম, কারণ এটি তার আত্মীয়কে তাদের ভুল পথে চালিত হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করতে পারে।

ভণ্ডামির একটি শাখা

মিনার দিনগুলিতে তাঁর খুতবায়, মহানবী (সাঃ) যা বলেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের ভুল ক্ষমা করতে পারেন, কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া যে ঋণ পরিশোধ না করার উদ্দেশ্যে কোন মুসলিমের কাছ থেকে সম্পদ ধার করে। এই ব্যক্তির একটি বিশাল সমস্যা রয়েছে এবং সে ধ্বংসপ্রাপ্ত। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৮৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ২৭৪৯ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মুনাফিকির একটি দিক।

একজন মুসলিমের সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি হলো মহান আল্লাহর সাথে, যা তখনই সম্মত হয়েছিল যখন কেউ তাকে তাদের প্রভু ও ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া।

মানুষের সাথে করা অন্যান্য সমস্ত প্রতিশ্রুতিও অবশ্যই পালন করতে হবে, যদি না কারো কাছে কোন বৈধ অজুহাত থাকে, বিশেষ করে যেগুলি একজন বাবা-মা সন্তানদের সাথে করেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা কেবল বাচ্চাদের খারাপ চরিত্র শেখায় এবং তাদের বিশ্বাস করতে উৎসাহিত করে যে প্রতারণা করা একটি গ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সহীহ বুখারীতে ২২২৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর নামে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বৈধ অজুহাত ছাড়াই তা ভঙ্গ করে, তিনি তার বিরুদ্ধে থাকবেন। বিচারের দিন যার বিরুদ্ধে

আল্লাহ তাআলা থাকবেন, সে কীভাবে সফল হতে পারে? যেখানেই সম্ভব অন্যদের সাথে প্রতিশ্রুতি না দেওয়াই সর্বদা নিরাপদ। কিন্তু যখন একটি বৈধ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তখন তা পূরণ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে হবে।

অধিকন্তু, একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, তারা অবৈধভাবে যে কোনও পার্থিব জিনিস অর্জন করবে তা উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা মহান আল্লাহর ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচতে পারবে না। সূরা ৫৩ আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

অধিকন্তু, যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে অনিবার্যভাবে আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হবে, প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে। এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখতে বাধা দেবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল পথে পরিচালিত করবে। এর ফলে উভয় জগতেই তাদের চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধা বৃদ্ধি পাবে। ফলস্বরূপ, তাদের জীবনের সবকিছু, যেমন তাদের পরিবার, বন্ধুবান্ধব, ক্যারিয়ার এবং সম্পদ, তাদের জন্য চাপের উৎস হয়ে উঠবে। যদি তারা আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, তাহলে তারা তাদের জীবনের ভুল জিনিস এবং মানুষদের, যেমন তাদের স্ত্রীকে, তাদের চাপের জন্য দোষারোপ করবে। যখন তারা এই ভালো মানুষদের তাদের জীবন থেকে বাদ দেয়, তখন এটি কেবল তাদের মানসিক ব্যাধি বৃদ্ধি করবে যতক্ষণ না তারা হতাশা, মাদকাসক্তি এবং এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতায় ডুবে যায়। যদি কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার অব্যাহত রাখে, তাহলে তারা বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত থাকবে না। পরকালে তাদের যে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে তা এই পৃথিবীতে তাদের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে অনেক খারাপ হবে।

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, অবৈধ উপায়ে অর্জিত যেকোনো সম্পদ বা পার্থিব জিনিসপত্র তার ধারকদের জন্য কেবল অভিশাপ হয়ে উঠবে কারণ অবৈধভাবে অর্জিত জিনিসপত্র দিয়ে তারা যে সমস্ত সৎকর্ম করে তা আল্লাহ তাআলা প্রত্যাখ্যান করবেন এবং যদি তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয় তবে উভয় জগতেই তাদের পাপ এবং শাস্তি বৃদ্ধি করবে। কারণ ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল উপার্জন এবং ব্যবহার, ঠিক যেমন ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি হল নিয়ত। যদি কারো ভিত্তি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তা থেকে যা কিছু আসে তা দুর্নীতিগ্রস্ত হবে এবং তাই আল্লাহ তাআলা তা প্রত্যাখ্যান করবেন, এমনকি যদি তা ভালো কাজও হয়। বিচারের দিনে যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে তার পরিণতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না।

সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর ভরসা করা

মিনার দিনগুলিতে তাঁর খুতবায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যা বলেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল যে, এমন কোন রোগ নেই যার জন্য আল্লাহ তায়ালা কোন নিরাময় ব্যবস্থা করেননি, কেবল বার্ধক্য ছাড়া। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৮৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ছোট্ট বক্তব্যটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ব্যাখ্যা করে, যথা, কীভাবে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা যায়। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার সঠিক পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত পার্থিব সম্পদ, যেমন বৈধ ঔষধ, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে বৈধ উপায়ে ব্যবহার করা এবং তারপর এই বিষয়টি মেনে নেওয়া যে, আল্লাহ, পরাক্রমশালী, তাদের জন্য যা কিছু বেছে নেন, যেমন রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা বা না করা, তাদের জন্য সর্বোত্তম এবং তাই তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতেই আল্লাহ, পরাক্রমশালীর আনুগত্য করে চলেছে। এটি ছিল মহানবী মুহাম্মদ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের পদ্ধতি। অতএব, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার অর্থ হল, আল্লাহ, পরাক্রমশালী, একজন ব্যক্তিকে যে সম্পদ, যেমন বৈধ ঔষধ, প্রদান করেছেন, তা ব্যবহার করা পরিত্যাগ করা নয়, কারণ এটি সম্পদকে অকেজো করে দেয় এবং আল্লাহ, পরাক্রমশালী, অকেজো জিনিস সৃষ্টি করেন না। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার অর্থ এই নয় যে, তিনি যে সম্পদ দিয়েছেন তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা এবং ভুলে যাওয়া যে, সবকিছুই কেবল মহান আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটে এবং তিনি সর্বদা মানুষের জন্য যা সর্বোত্তম তা বেছে নেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

যারা তাদের সম্পদের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করে তারা প্রায়শই আধ্যাত্মিক অনুশীলন এবং মনোমুগ্ধকর বিষয়গুলিতে বেশি আস্থা রাখে যা ইসলামী শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত নয়, যা তাদের বিশ্বাস এবং বিশ্বাসকে আরও দুর্বল করে তোলে যে একমাত্র মহান আল্লাহই বিশ্বজগতের বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করেন। এই মনোভাবের যত গভীরে কেউ ডুব দেবে, ততই তারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, যারা আধ্যাত্মিক নিরাময়কারী বলে ভান করে যারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পার্থিব সমস্যা সমাধানের দাবি করে কিন্তু আধ্যাত্মিক অনুশীলনের পরামর্শ দেয় যা প্রায়শই ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। এর ফলে কেবল তাদের বিশ্বাস কলুষিত হবে। অতএব, মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখার বাস্তবতা বুঝতে হবে এবং আলোচিত দুটি চরম মনোভাব এড়াতে সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

দুঃখের বিষয় হল, পবিত্র কুরআন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, ইসলামকে সহজ ও সরল করে তুলেছিলেন, কিন্তু তাদের পরে অনেক মুসলিম আল্লাহ, মহিমান্বিত আল্লাহর উপর ভরসা করার মতো বিষয়গুলি বিভ্রান্তিকর এবং বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে ইসলামকে জটিল করে তুলেছিলেন, যদিও ধারণাটি খুবই সহজ এবং সোজা। অতএব, মুসলমানদের জন্য নির্দেশনার দুটি উৎস: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য শেখা এবং তার উপর আমল করা কঠোরভাবে মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি ইসলামকে সহজ করে তোলে এবং প্রতিটি ব্যক্তির জন্য বিষয়গুলিকে সহজ করে তোলে। তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎস অধ্যয়ন এবং আমল করা এড়িয়ে চলতে হবে কারণ এটি কেবল একজন ব্যক্তির জন্য বিষয়গুলিকে জটিল করে তুলবে এবং তাদেরকে বোঝাবে যে মহান আল্লাহর নৈকট্যের পথ কেবল কয়েকজনের জন্য, যদিও তাঁর দরজা সকলের

জন্য উন্মুক্ত এবং সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য। ইসলামকে জটিল করে তোলার মাধ্যমে তারা একটি শ্রেণিবিন্যাস ব্যবস্থা তৈরি করতে সক্ষম হয় যেখানে তারা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে পারে যে, মহান আল্লাহর নৈকট্য তখনই অর্জিত হয় যখন তারা বিশেষ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের সেবা করে এবং অন্ধভাবে তাদের আনুগত্য করে, যারা মহান আল্লাহর নিকটবর্তী। এই আধ্যাত্মিক ব্যক্তিরা সাধারণ জনগণের জন্য ইসলামকে আরও জটিল করে তোলে যাতে তারা তাদের সেবা করে, তাদের উপহার দেয় এবং সর্বদা অন্ধভাবে তাদের আনুগত্য করে, যদিও সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, যারা ইসলামকে অন্য কারও চেয়ে ভালোভাবে বুঝতেন, তারা একে অপরের সাথে এইভাবে আচরণ করতেন না।

একে অপরের সাথে লড়াই করা

মিনার দিনগুলিতে তাঁর খুতবায়, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) যা বলেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল যে, তাঁর পরে মুসলমানরা একে অপরের ঘাড়ে আঘাত করে কুফরীতে ফিরে যাবে না। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৮৪-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ঐক্য তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন মুসলমানরা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্য আন্তরিকভাবে মেনে চলবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একই আচরণবিধি অনুসারে জীবনযাপন করবে এবং এর ফলে ঐক্যের দিকে পরিচালিত হবে। যখনই মানুষ পৃথক আচরণবিধি অনুসারে জীবনযাপন করবে, তখন তা সর্বদা সমাজের মধ্যে অনৈক্যের দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত একক ঐশ্বরিক আচরণবিধি মেনে চলতে হবে এবং ভিন্ন আচরণবিধির সমর্থকদের অনুসরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে। কিন্তু এটি তখনই অর্জন করা সম্ভব হবে যখন তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্য শিখবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করবে এবং অন্যদের অন্ধভাবে অনুসরণ করা এড়িয়ে চলবে। তাদের শিক্ষকদের সম্মান করা উচিত কিন্তু কখনও অন্ধভাবে তাদের অনুসরণ করা উচিত নয় কারণ এটি ইসলামের শেখানো আচরণের বিরোধিতা করে। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, "এটাই আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি..."

শিশুদের রক্ষা করা

মিনার দিনগুলিতে তাঁর খুতবায়, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) যা বলেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল যে, একজন মুসলিমের উচিত তার সন্তানের ক্ষতি করা উচিত নয়। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৮৪-২৮৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

একজন পিতামাতা কখনই তাদের সন্তানকে শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করবেন না কারণ এটি স্পষ্টতই ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। এছাড়াও, তাদের আধ্যাত্মিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করা এড়াতে হবে, তাদের শেখার এবং ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করার গুরুত্ব শেখানো উচিত কারণ এটিই তাদের উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন নিশ্চিত করবে। এই শিক্ষাগুলি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে তাদের জীবনের সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দেবে। অতএব এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। ইসলামিক শিক্ষা শিখতে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে সন্তানকে উৎসাহিত করার সর্বোত্তম উপায় হল উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেওয়া। অতএব, একজন পিতামাতার অবশ্যই ইসলামী শিক্ষা শিখতে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে যাতে তারা তাদের সন্তানদের অনুসরণ করার জন্য একটি বাস্তব উদাহরণ হয়ে ওঠে।

পাপের প্রকারভেদ

মিনার দিনগুলিতে তাঁর খুতবায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যা বলেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল যে শয়তান হতাশ হয়ে পড়েছে কারণ আরবে তার আর উপাসনা করা হবে না, তবে মুসলমানরা কিছু কাজে তার আনুগত্য করবে যা তাদের কাছে তুচ্ছ মনে হলেও এই কাজগুলি শয়তানকে খুশি করবে। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৮৪-২৮৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

পাপকে ছোট করা এড়ানোর একমাত্র উপায় হল ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করা যাতে তারা বিভিন্ন ধরণের পাপ সম্পর্কে বুঝতে পারে এবং কীভাবে সেগুলি এড়িয়ে চলতে হয় তা বুঝতে পারে।

পাপগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে ছোট এবং বড় হিসেবে। বড় এবং ছোট পাপের শ্রেণীবিভাগ করার জন্য অনেকগুলি ভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামী সরকার যে পাপের শাস্তি দেবে তাকে বড় পাপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এবং যে কোনও পাপ যা জাহান্নামের সাথে সম্পর্কিত, মহান আল্লাহর ক্রোধ বা অভিশাপ, তাকে বড় পাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়াও, ছোট পাপের উপর আস্থা রাখাও সেগুলিকে বড় পাপে পরিণত করতে পারে। বড় পাপ কেবল আন্তরিক তওবার মাধ্যমেই ক্ষমা করা হয়, অন্যদিকে ছোট পাপগুলি বড় পাপ এড়িয়ে চলা এবং সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে মুছে ফেলা যায়। অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৩১:

"যদি তোমরা সেইসব কবীরা পাপ থেকে বিরত থাকো যেগুলো তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমরা তোমাদের ছোট পাপগুলো ক্ষমা করে দেব..."

আন্তরিক তওবার মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ অনুভব করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একজনকে আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে সে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করবে না এবং আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকারের ক্ষতিপূরণ দেবে। ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত যথাযথভাবে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত অনুগ্রহগুলি ব্যবহার করে তাদের আন্তরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য অব্যাহত রাখতে হবে।

ইসলামি শিক্ষা ইচ্ছাকৃতভাবে বড় এবং ছোট পাপের তালিকা তৈরি করা এড়িয়ে গেছে, যাতে মুসলমানরা সতর্ক থাকে এবং ধরে নেয় যে তাদের করা যেকোনো পাপকে বড় পাপ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যদি মানুষের কাছে একটি তালিকা দেওয়া হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে অনেকেই ছোট পাপকে তুচ্ছ মনে করেই তা করে যাবে।

এছাড়াও, শয়তানকে খুশি করে এমন কাজ এড়িয়ে চলা যায়, এই দুটি পথনির্দেশনার উৎস: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর ঐতিহ্য কঠোরভাবে মেনে চলার মাধ্যমে এবং অন্যান্য সকল ধর্মীয় জ্ঞানের উৎস এড়িয়ে চলার মাধ্যমে। একজন ব্যক্তি যত বেশি ধর্মীয় জ্ঞানের বিকল্প উৎসের উপর নির্ভর করবে, এমনকি যদি এগুলো আপাতদৃষ্টিতে ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের দিকে পরিচালিত করে, তবুও সে পথনির্দেশের দুটি প্রধান উৎসের উপর তত কম নির্ভর করবে। নির্ভরতার এই পরিবর্তনের ফলে শেষ পর্যন্ত পথভ্রষ্টতা দেখা দিতে পারে। মহানবী (সা.) সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বরে লিপিবদ্ধ একটি হাদিসে এর বিরুদ্ধে সতর্ক করে বলেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন যে, পথনির্দেশের দুটি

নির্ভরযোগ্য উৎসের উপর ভিত্তি না থাকা যেকোনো বিষয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যাখ্যান করবেন। অধিকন্তু, এই বিকল্প উৎসের উপর কাজ করলে ব্যক্তিরা এমন অভ্যাস গ্রহণ করতে পারে যা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। এই ধীরে ধীরে বিচ্যুতি শয়তান কর্তৃক ব্যক্তিদের বিপথগামী করার জন্য ব্যবহৃত একটি কৌশল। উদাহরণস্বরূপ, কষ্টের সম্মুখীন কাউকে ইসলামী নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক আধ্যাত্মিক অনুশীলনে লিপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। যদি এই ব্যক্তি অজ্ঞ থাকে এবং প্রতিষ্ঠিত উৎসের বাইরে নির্দেশনা খোঁজার অভ্যাস করে, তাহলে তারা সহজেই এই ধরণের ফাঁদে পা দিতে পারে, ইসলামের মূল নীতিগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে এমন কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারে। ফলস্বরূপ, তারা এমন বিশ্বাস ধারণ করতে শুরু করতে পারে যা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষার বিরোধিতা করে। তারা ভুলভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে তাদের ভাগ্য অন্যান্য সত্তা বা অতিপ্রাকৃত সত্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যারা দুটি প্রধান নির্দেশনা ছাড়াও উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত। এই বিভ্রান্তিকর কর্ম এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু সম্পূর্ণ অবিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করতে পারে, যেমন কালো জাদুর মতো অনুশীলনে জড়িত হওয়া। অধ্যায় ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"...সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

তাই একজন মুসলিম অজান্তেই ধর্মীয় জ্ঞানের বিভিন্ন উৎসের উপর নির্ভর করে তাদের বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যেতে পারে। নির্দেশনার প্রাথমিক উৎসের ভিত্তিহীন ধর্মীয় অনুশীলনের উপর এই নির্ভরতা একজনকে বিভ্রান্তিকর পথে নিয়ে যেতে পারে, পরিণামে তাদের বিশ্বাসের জন্য অপরিহার্য নীতি ও শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হতে পারে। দ্বিতীয় অধ্যায় আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

এক দেহ

মিনার দিনগুলিতে তাঁর খুতবায়, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) যা বলেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল যে শয়তান মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে থাকবে। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৯০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

শয়তানের এই ফাঁদ এড়াতে হলে, মুসলমানদের অবশ্যই এক সত্তা হিসেবে আচরণ করতে হবে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে, মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের কোন অংশ যদি ব্যথা পায়, তাহলে বাকি অংশও তার ব্যথায় শরীক হয়।

এই হাদিসটি, অন্যান্য অনেক হাদিসের মতো, নিজের জীবনে এতটা মগ্ন না হয়ে এমন আচরণ করার গুরুত্ব নির্দেশ করে যেন মহাবিশ্ব তাদের এবং তাদের সমস্যাগুলির চারপাশে ঘোরে। শয়তান একজন মুসলিমকে তাদের নিজের জীবন এবং তাদের সমস্যাগুলির উপর এত বেশি মনোযোগ দিতে অনুপ্রাণিত করে যে তারা বৃহত্তর চিত্রের উপর মনোযোগ হারিয়ে ফেলে যা তাদের অধৈর্যের দিকে পরিচালিত করে এবং তাদের অন্যদের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের সামর্থ্য অনুসারে অন্যদের সহায়তা করার দায়িত্বে ব্যর্থ হয়। একজন মুসলিমের সর্বদা এটি মনে রাখা উচিত এবং যতটা সম্ভব অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত। এটি আর্থিক সাহায্যের বাইরেও বিস্তৃত এবং এর মধ্যে সমস্ত মৌখিক এবং শারীরিক সাহায্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন ভাল এবং আন্তরিক পরামর্শ।

মুসলিমদের উচিত নিয়মিত সংবাদ এবং বিশ্বজুড়ে যারা কঠিন পরিস্থিতিতে আছেন তাদের প্রতি নজর রাখা। এটি তাদেরকে আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্মমগ্ন না হয়ে অন্যদের সাহায্য করার জন্য অনুপ্রাণিত করবে। বাস্তবে, যে কেবল নিজের কথা চিন্তা করে সে পশুর চেয়েও নিম্ন স্তরের, কারণ সে তার সন্তানদেরও যত্ন করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলিমের উচিত তার নিজের পরিবারের বাইরে অন্যদের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে পশুর চেয়েও উত্তম হওয়া।

এই হাদিসটি ইসলামে ঐক্য ও সাম্যের গুরুত্বকেও নির্দেশ করে, কারণ একজনকে অবশ্যই অন্য মুসলমানদের তাদের সামর্থ্য অনুসারে সাহায্য করতে হবে, তাদের লিঙ্গ, জাতিগততা বা অন্য কিছু নির্বিশেষে।

যেভাবে একজন ব্যক্তি নিজের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে চান, ঠিক সেভাবেই অন্যদের সাথেও আচরণ করার চেষ্টা করতে হবে, কারণ মূল হাদিসটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, একজন মুসলিমের জন্য দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হওয়া বা অন্য কোন মুসলিমের দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হওয়া - এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটি একই রকম।

পরিশেষে, যদিও একজন মুসলিম পৃথিবীর সকল সমস্যা দূর করতে পারে না, তবুও তারা তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তাদের সামর্থ্য অনুসারে অন্যদের সাহায্য করতে পারে কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা এটাই আদেশ করেন এবং আশা করেন।

ভুল করো না

মিনার দিনগুলিতে তাঁর খুতবায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যা বলেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল যে, একজন মুসলিমের কোন অন্যায় করা উচিত নয় এবং তাই তাদের উপর কোন অন্যায় করা হবে না। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৮৪-২৮৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ২৪৪৭ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, বিচারের দিন অত্যাচার অন্ধকারে পরিণত হবে।

এটি এড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ যারা নিজেদেরকে অন্ধকারে ডুবে থাকতে দেখেন তাদের জান্নাতে যাওয়ার পথ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। যাদেরকে পথপ্রদর্শক আলো দেওয়া হবে কেবল তারাই এটি সফলভাবে করতে পারবে। অতএব, নিপীড়ন করা একজনকে এই আলো পেতে বাধা দেবে।

নির্যাতন অনেক রূপ নিতে পারে। প্রথম প্রকার হল যখন কেউ আল্লাহর আদেশ পালন করতে ব্যর্থ হয় এবং তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে। যদিও এর ফলে আল্লাহর অসীম মর্যাদার উপর কোন প্রভাব পড়ে না, তবুও এটি তাকে উভয় জগতেই অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪২৪৪ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যখনই একজন ব্যক্তি পাপ করে, তখন তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে। তারা যত বেশি পাপ করবে, ততই তার হৃদয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। এটি তাদের এই পৃথিবীতে সত্য নির্দেশনা গ্রহণ এবং অনুসরণ করতে বাধা দেবে। ফলস্বরূপ, এটি পরবর্তী জগতে অন্ধকারের দিকে পরিচালিত করবে। অধ্যায় ৮৩ আল মুতাফফিফিন, আয়াত ১৪:

"না! বরং, তারা যা অর্জন করেছিল তার কলঙ্ক তাদের হৃদয়কে ঢেকে দিয়েছে।"

পরবর্তী ধরণের জুলুম হল যখন কেউ নিজের উপর জুলুম করে, আল্লাহ তাআলার দেওয়া আমানত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়ে, যা তার দেহ ও সম্পদের মতো পার্থিব আমানতের আকারে তাকে দেওয়া হয়েছে। এই আমানত তখনই পূর্ণ হয় যখন কেউ তাকে প্রদত্ত প্রতিটি আমানতকে এমনভাবে ব্যবহার করে যা সর্বশক্তিমান, সকল আমানতের স্রষ্টা এবং মালিক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

এইসব আশীর্বাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ হলো ঈমান। ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে এটিকে সুরক্ষিত এবং শক্তিশালী করতে হবে। ঈমান হলো একটি উদ্ভিদের মতো যাকে ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং আমল করার মাধ্যমে ক্রমাগত যত্ন এবং লালন-পালন করতে হবে। এই উদ্ভিদের মৃত্যু মানুষের ঈমানের আলোকে নিভিয়ে দেবে, যার ফলে তারা উভয় জগতেই অন্ধকারে ডুবে যাবে।

চূড়ান্ত ধরণের অত্যাচার হলো যখন কেউ অন্যের সাথে দুর্ব্যবহার করে। মহান আল্লাহ তায়ালা এই পাপগুলো ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না অত্যাচারীর শিকার ব্যক্তি প্রথমে তাদের ক্ষমা করে। যেহেতু মানুষ এত করুণাময় নয়, তাই এটি হওয়ার সম্ভাবনা কম। তারপর বিচারের দিনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে অত্যাচারীর সৎকর্ম তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে শিকারের পাপের প্রতিদান অত্যাচারীকে দেওয়া হবে। এর ফলে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহিহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক

করা হয়েছে। অন্যদের সাথে সেভাবেই আচরণ করে এই পরিণতি এড়াতে হবে যেভাবে তারা মানুষের কাছ থেকে আচরণ পেতে চায়।

একজন মুসলিম যদি ইহকাল ও পরকালে পথপ্রদর্শক হতে চান, তাহলে তাকে সকল প্রকার নির্যাতন এড়িয়ে চলতে হবে।

ট্রাস্ট পরিশোধ করুন

মিনার দিনগুলিতে তাঁর খুতবায়, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) যা বলেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল যে মুসলমানদের তাদের আমানত পূরণ করা উচিত। এটি ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৯১-২৯২-এ আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ২৭৪৯ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকির একটি দিক।

এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ এবং মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত সকল আমানত। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি আমানত তাদের উপর অর্পণ করেছেন। এই আমানত পূরণের একমাত্র উপায় হল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমানতগুলো ব্যবহার করা। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা এবং রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আমানত পাবে, কারণ এটিই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় ১৪ ইব্রাহিম, আয়াত ৭:

"আর [স্মরণ করো] যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের [নেয়ামত] বৃদ্ধি করব..."

মানুষের মধ্যে আমানতও পালন করা গুরুত্বপূর্ণ। যার উপর অন্য কারো জিনিসপত্রের আমানত রাখা হয়েছে, তার উচিত সেগুলোর অপব্যবহার করা নয়

এবং কেবল মালিকের ইচ্ছানুযায়ী সেগুলো ব্যবহার করা। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আমানতের মধ্যে একটি হল কথোপকথন গোপন রাখা, যদি না অন্যদের জানানোর মাধ্যমে কিছু সুস্পষ্ট লাভ হয়। দুর্ভাগ্যবশত, মুসলমানদের মধ্যে এটি প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়। তাদের এবং মানুষের মধ্যে আমানতগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যেভাবে তারা চায় অন্যরা তাদের মধ্যে থাকা আমানতগুলির সাথে আচরণ করুক।

এছাড়াও, এই ট্রাস্টগুলির মধ্যে একজনের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যেমন নির্ভরশীল ব্যক্তিরা। একজন মুসলিমকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে এই ব্যক্তিদের অধিকার পূরণের মাধ্যমে এই ট্রাস্টগুলি পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতার উপর কর্তব্য হল তাদের সন্তানদের পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য শেখা, বোঝা এবং তার উপর আমল করতে উৎসাহিত করা।

গাদীরে খুমে খুতবা

পবিত্র হজ্জ্ব শেষ করে মদিনায় ফেরার পথে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) গাদীরে খুমে একটি খুতবা দিয়েছিলেন। তিনি মুসলমানদেরকে তাঁর রেখে যাওয়া দুটি সম্পদ, অর্থাৎ পবিত্র কুরআন এবং তাঁর পরিবার, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, আঁকড়ে থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, কিয়ামতের দিন তাঁর স্বর্গীয় পুকুরে পৌঁছানো পর্যন্ত এই দুটি একে অপরের থেকে পৃথক হবে না। ইমাম ইবনে কাথিরের "নবীজীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩০১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম মুনজারীর "সচেতনতা ও উপলব্ধি", ৩০ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, পবিত্র কুরআন বিচার দিবসে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে জীবদ্দশায় এটি অনুসরণ করবে তাদের বিচার দিবসে এটি জান্নাতে নিয়ে যাবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে জীবদ্দশায় এটিকে অবহেলা করবে তারা দেখবে যে এটি তাদেরকে বিচার দিবসে জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি পথনির্দেশনার গ্রন্থ। এটি কেবল তেলাওয়াতের গ্রন্থ নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সকল দিক পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে যাতে এটি উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম দিকটি হল এটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিতভাবে তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয় দিকটি হল একজন নির্ভরযোগ্য আলেমের মাধ্যমে এটি বোঝা। এবং শেষ দিকটি হল মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য অনুসারে এর শিক্ষার উপর আমল করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা পবিত্র কুরআনের উপর সঠিকভাবে আমল করবে, কারণ মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনই পবিত্র কুরআনের ব্যবহারিক বাস্তবায়ন। যারা এইভাবে আচরণ করে তারাই পৃথিবীর প্রতিটি কঠিন সময়ে

সঠিক পথনির্দেশনা এবং কিয়ামতের দিনে এর সুপারিশের সুসংবাদ পায়। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

কিন্তু মূল হাদিস অনুসারে, পবিত্র কুরআন কেবল তাদের জন্য পথনির্দেশনা এবং রহমত যারা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে এর দিকগুলি সঠিকভাবে পালন করে। কিন্তু যারা এটিকে বুঝতে এবং তার উপর আমল করতে অস্বীকৃতি জানায় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে এর ভুল ব্যাখ্যা করে এবং পরিবর্তে তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, তারা বিচারের দিনে এই সঠিক পথনির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। সূরা ত্বাহা, আয়াত ১২৪:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন] এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।"

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময়, একজন মুসলিমের কেবল এই উদ্দেশ্যেই এটি ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থাৎ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি তেলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে একটি হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, যা কোনও সমস্যার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং সমস্যা সমাধানের পরে আবার

একটি হাতিয়ার বাক্সে রাখা হয়। পবিত্র কুরআনের মূল কাজ হল পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য এই পৃথিবীর কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পথ দেখানো। পবিত্র কুরআন বোঝা এবং তার উপর আমল না করে এই উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব নয়। অন্ধ তেলাওয়াত যথেষ্ট নয়। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং কেবল নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলিমের আচরণের বিরোধিতা করে। এটি এমন ব্যক্তির মতো যে অনেক ধরণের জিনিসপত্র সহ একটি গাড়ি কিনে কিন্তু এটি চালানো যায় না, যা একটি গাড়ির মূল উদ্দেশ্য। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তি কেবল বোকা। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"আর আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাজিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু এটি জালেমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।"

এছাড়াও, আলোচিত মূল ঘটনাটি নবী (সাঃ)-এর পরিবারের উচ্চ মর্যাদার ইঙ্গিত দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

মহান আল্লাহ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসার নিদর্শন, তাঁর উপর শান্তি ও সালাম বর্ষিত হোক। যারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ভালোবাসে, তাদের সকলকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, এমনকি যদি এটি তাদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত মতামতের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এই ভালোবাসায় তারাও অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের কথার মাধ্যমে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তাদের কাজের মাধ্যমে ভালোবাসা প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ, এটা সকলের কাছে স্পষ্ট যে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারের সকল সদস্য, সকল সাহাবী (রাঃ)-এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং নেক পূর্বসূরীরা এই প্রকৃত ভালোবাসার অধিকারী ছিলেন। তাই তাদের প্রত্যেককে ভালোবাসা তার উপর কর্তব্য, যে

আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ভালোবাসার দাবি করে। সহিহ বুখারী, ১৭ নম্বর হাদিসের মতো অনেক হাদিস দ্বারা এটি প্রমাণিত হয়েছে। এটি পরামর্শ দেয় যে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহায্যকারীদের প্রতি ভালোবাসা, অর্থাৎ পবিত্র মদীনার বাসিন্দাদের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের অংশ এবং তাদের প্রতি ঘৃণা মুনাফিকির লক্ষণ। জামে আত তিরমিযী, ৩৮৬২ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে , মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্টভাবে মুসলমানদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে তারা যেন কোন সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাদের সমালোচনা না করে, কারণ তাদের ভালোবাসা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে ভালোবাসার লক্ষণ এবং তাদের প্রতি ঘৃণা করা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং মহান আল্লাহকে ঘৃণা করার লক্ষণ। এই ব্যক্তি সফল হবে না যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে তওবা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর পবিত্র পরিবার সম্পর্কে অনুরূপ একটি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, সুনান ইবনে মাজাহ, ১৪৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে।

যদি কোন মুসলিম অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমের সমালোচনা করে, যে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে, তাহলে তা প্রমাণ করে যে, তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার অভাব পোষণ করে। যদি কোন মুসলিম কোন পাপ করে, তাহলে অন্য মুসলিমদের সেই পাপকে ঘৃণা করা উচিত, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, পাপী মুসলিমের প্রতি ভালোবাসা থাকা উচিত কারণ তারা আল্লাহ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে। অন্যদের ভালোবাসার লক্ষণ হলো তাদের সাথে সদয় ও শ্রদ্ধাশীল আচরণ করা। সহজ কথায়, অন্যদের সাথে সেভাবেই আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় অন্যরা তাদের সাথে আচরণ করুক।

অধিকন্তু, একজন মুসলিমের উচিত তাদের সকলকে ঘৃণা করা যারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং নবী মুহাম্মদ, সা.-কে ভালোবাসেন তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে, সে ব্যক্তি আত্মীয় হোক বা অপরিচিত হোক। একজন মুসলিমের অনুভূতি কখনই আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং নবী মুহাম্মদ, সা.-এর প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসার এই

নিদর্শন পূরণে বাধা সৃষ্টি করবে না। এর অর্থ এই নয় যে তাদের ক্ষতি করা উচিত, বরং তাদের স্পষ্ট করে বলা উচিত যে যারা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং নবী মুহাম্মদ, সা.-কে ভালোবাসেন তাদের প্রতি ঘৃণা করা অগ্রহণযোগ্য। যদি তারা এই বিচ্যুতিপূর্ণ মনোভাব বজায় রাখে, তাহলে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া উচিত যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

বক্তৃতা রক্ষা করা

পবিত্র হজ্জ্ব সম্পন্ন করে মদিনায় ফিরে আসার পর, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর মিম্বরে আরোহণ করেন এবং একটি খুতবা দেন। তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল, কেউ যেন তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে মুসলমানদের ক্ষতি না করে এবং যদি কোন মুসলিম মারা যায়, তাহলে অন্যরা কেবল তাদের সম্পর্কে ভালো কথা বলে। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩০৮-৩০৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য তাদের কথা সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিচারের দিনে কেবল একটি শব্দই তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে বাধ্য করে। সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৭০ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন ব্যক্তির কথা বলার আগে চিন্তা করা গুরুত্বপূর্ণ এবং কেবল তখনই এগিয়ে যাওয়া উচিত যখন কথাগুলি পাপ বা নিরর্থক হবে না। এটি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির লক্ষণ। সহীহ মুসলিমের ১৭৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন মুসলিমকে জিহ্বার সমস্ত বিপদ থেকে বাঁচার জন্য উপদেশ দিয়েছেন, যথা, হয় ভালো কথা বলা, নয়তো চুপ থাকা। জিহ্বার বিপদ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এই শিক্ষাকে কার্যকর করবে। কিন্তু যদি একজন মুসলিম অজ্ঞ থাকে তবে তারা তাদের কথার মাধ্যমে অনেক পাপ করবে এমনকি তা না জেনেও। এই কারণেই জ্ঞান অর্জনকে সকল মুসলমানের উপর ফরজ করা হয়েছে যা সুনানে ইবনে মাজাহ, ২২৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

কথাবার্তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল মন্দ কথা যা যেকোনো মূল্যে এড়িয়ে চলা উচিত। দ্বিতীয়টি হল ভালো কথা যা উপযুক্ত সময়ে বলা উচিত। শেষ শ্রেণীর কথা হল অসার কথা। এই ধরণের কথাকে পাপ বা সৎ কাজ হিসেবে

বিবেচনা করা হয় না, তবে যেহেতু এই ধরণের কথা মন্দ কথার দিকে পরিচালিত করে, তাই এটি এড়িয়ে চলাই ভালো। তাছাড়া, অসার কথাবার্তা বিচারের দিন একজন ব্যক্তির জন্য অনুশোচনার কারণ হবে যখন সে অসার কথাবার্তায় তাদের সময় এবং সুযোগ নষ্ট করতে দেখবে। অতএব , একজন মুসলিমের উচিত হয় ভালো কথা বলা, নয়তো চুপ থাকা। সহিহ মুসলিমের ১৭৬ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও, আলোচিত মূল ঘটনাটি মৃতদের সম্পর্কে ভালো কথা বলার গুরুত্ব নির্দেশ করে। মৃতদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলা তাদের জীবিত আত্মীয়স্বজন এবং প্রিয়জনদের কেবল বিরক্ত করে এবং এই কথাটি, যদিও এটি সত্য, মৃতদের কোনও উপকার করে না কারণ তারা আর তাদের আচরণ সংশোধন করতে পারে না। যদি কেউ অন্যদের শিক্ষা দিতে চায়, তাহলে তারা নাম উল্লেখ না করেই তা করতে পারে।

অভিবাসনের পর ১১ তম বছর

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর শেষ অসুস্থতা

অন্যদের স্মরণ করা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের এগারোতম বছরে, তাঁর শেষ অসুস্থতার লক্ষণগুলি দেখা দিতে শুরু করে। যখন এটি ঘটে তখন তিনি মধ্যরাতে একটি কবরস্থান, বাকি আল-গারকাদে যান এবং সেখানে সমাহিতদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩২১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

অসুস্থতার মতো কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে অন্যদের ভুলে যাওয়া সহজ। তাই এই ঘটনাটি মুসলমানদেরকে অন্যদের প্রতি আন্তরিকতা বজায় রাখার কথা মনে করিয়ে দেয়, তারা স্বস্তির সময় হোক বা কঠিন সময়, যাই হোক না কেন।

সহীহ বুখারীর ১৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে অন্যদের জন্যও তাই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

এর অর্থ এই নয় যে, এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ না করলে একজন মুসলিম তার ঈমান হারিয়ে ফেলবে। এর অর্থ হল, একজন মুসলিমের ঈমান পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না তারা এই উপদেশ অনুসরণ করে। এই হাদিসটি আরও ইঙ্গিত করে যে, একজন মুসলিম তার ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ করতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও অপছন্দ করে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৮৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া আরেকটি হাদিস এটি সমর্থন করে। এটি পরামর্শ দেয় যে, মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। যদি শরীরের একটি অংশ ব্যথায় ভোগে, তাহলে শরীরের বাকি অংশও ব্যথার অংশীদার হয়। এই পারস্পরিক অনুভূতির মধ্যে রয়েছে অন্যদের জন্য ভালোবাসা এবং ঘৃণা করা, যা নিজের জন্য ভালোবাসে এবং যা ঘৃণা করে।

একজন মুসলিম কেবল তখনই এই মর্যাদা অর্জন করতে পারে যখন তার হৃদয় হিংসার মতো খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত থাকে। এই খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বদা একজনকে নিজের জন্য আরও ভালো কামনা করতে বাধ্য করবে। তাই বাস্তবে, এই হাদিসটি একটি ইঙ্গিত দেয় যে ক্ষমাশীল হওয়ার মতো ভালো বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে হৃদয়কে পবিত্র করা উচিত এবং হিংসার মতো খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি দূর করা উচিত। এটি কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই সম্ভব।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যদের জন্য ভালো কামনা করলে তারা ভালো জিনিস হারাতে পারবে না। মহান আল্লাহর ভান্ডারের কোন সীমা নেই, তাই স্বার্থপর ও লোভী মানসিকতা গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

অন্যদের জন্য মঙ্গল কামনা করার অর্থ হলো অন্যদেরকে যেকোনোভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করা, যেমন আর্থিক বা মানসিক সহায়তা, ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি তার প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্যদের সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা করে।

অতএব, এই ভালোবাসা কেবল কথার মাধ্যমে নয়, বরং কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করা উচিত। এমনকি যখন একজন মুসলিম অন্যদের মন্দ কাজ নিষেধ করে এবং অন্যদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরামর্শ দেয়, তখনও তাদের তা নম্রভাবে করা উচিত, ঠিক যেমন তারা চায় অন্যরা তাদের সদয়ভাবে উপদেশ দিক।

যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, আলোচ্য মূল হাদিসটি পারস্পরিক ভালোবাসা এবং যত্নের পরিপন্থী সকল খারাপ বৈশিষ্ট্য, যেমন হিংসা, দূর করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। হিংসা হল যখন একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট আশীর্বাদ পেতে চায় যা কেবল তখনই পাওয়া যায় যখন এটি অন্য কারো কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। এই মনোভাব মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত আশীর্বাদ বিতরণের প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ। এই কারণেই এটি একটি মহাপাপ এবং হিংসুকের সৎকর্ম ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে। সুনান আবু দাউদের ৪৯০৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। যদি একজন মুসলিম অন্যদের কাছে থাকা বৈধ জিনিসগুলি কামনা করে তবে তাদের উচিত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং একই বা অনুরূপ জিনিস দান করা যাতে অন্য ব্যক্তি তাদের আশীর্বাদ হারাতে না পারে। এই ধরণের হিংসা বৈধ এবং ধর্মের দিক থেকে প্রশংসনীয়। সহিহ মুসলিমের ১৮৯৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছিলেন যে মুসলমানদের কেবল সেই ধনী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা করা উচিত যিনি তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করেন। আর এমন একজন জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত হও যে তার জ্ঞানকে নিজের এবং অন্যদের উপকারের জন্য ব্যবহার করে।

একজন মুসলিমের উচিত কেবল অন্যদের জন্য বৈধ পার্থিব আশীর্বাদ লাভ করাই ভালো না, বরং উভয় জগতেই ধর্মীয় আশীর্বাদ লাভ করাও ভালো। প্রকৃতপক্ষে, যখন কেউ অন্যদের জন্য এটি কামনা করে, তখন এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে উৎসাহিত করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য

অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। ইসলামে এই ধরণের সুস্থ প্রতিযোগিতাকে স্বাগত জানানো হয়। সূরা ৮৩ আল মুতাফিফিন, আয়াত ২৬:

"... তাই এর জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করতে দিন।"

এই উৎসাহ একজন মুসলিমকে তাদের চরিত্রের ত্রুটি খুঁজে বের করার এবং দূর করার জন্য নিজেদের মূল্যায়ন করতে অনুপ্রাণিত করবে। যখন এই দুটি উপাদান অর্থপূর্ণভাবে একত্রিত হয়, মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং নিজের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করা, তখন এটি উভয় জগতেই সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে।

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত কেবল মুখেই অন্যদের জন্য যা চায় তা ভালোবাসার দাবি করা নয়, বরং তার কাজের মাধ্যমেও তা প্রকাশ করা। আশা করা যায় যে, যে ব্যক্তি এভাবে অন্যদের জন্য চিন্তা করে, সে উভয় জগতেই মহান আল্লাহর কাছ থেকে চিন্তা পাবে। জামে আত তিরমিযী, ১৯৩০ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরো

যখন তাঁর শেষ অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে, তখন মহানবী (সা.) মধ্যরাতে বাকী আল-গারকাদ কবরস্থানে যান এবং সেখানে সমাহিতদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এরপর তিনি মন্তব্য করেন যে, সেখানে সমাহিতদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত যে জীবিতরা যে সমস্যার মুখোমুখি হবে তা তারা অনুভব করবে না, যেমন রাতের অন্ধকার অংশের মতো সমস্যাগুলি যা পরপর একের পর এক আসবে, যার শেষটি প্রথমটির চেয়েও খারাপ হবে। ইমাম ইবনে কাথিরের "নবী (সা.)-এর জীবনী", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩২১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৭৪০০ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ব্যাপক অস্থিরতা ও বিদ্রোহের সময়ও মহান আল্লাহর ইবাদত করে চলে, সে যেন সেই ব্যক্তির মতো যে তাঁর জীবদ্দশায় মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে হিজরত করেছে।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর দিকে হিজরত করার সওয়াব ছিল একটি মহান কাজ। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিমের ৩২১ নম্বর হাদিস অনুসারে, এটি পূর্ববর্তী সমস্ত পাপ মুছে ফেলত।

মহান আল্লাহর ইবাদতের অর্থ হলো মহান আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য অব্যাহত রাখা। এর ফলে একজন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করতে থাকে।

স্পষ্টতই, এই হাদিসে উল্লেখিত সময় এসে গেছে। মুসলিম জাতির জন্য পার্থিব কামনা-বাসনার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায় ইসলামের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হওয়া খুবই সহজ হয়ে পড়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতির অগ্রগতির কারণে মুসলমানদের পক্ষে বিশ্বাস করা সহজ হয়ে পড়েছে যে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহারের মাধ্যমে মানসিক শান্তি নিহিত। সংখ্যাগরিষ্ঠদের অনুসরণ করার মানসিকতা গ্রহণ করা সহজ হয়ে গেছে, যারা বিশ্বাসকে খালি অভ্যাসে পরিণত করেছে যার ফলে তারা কীভাবে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে তার উপর কোনও প্রভাব পড়ে না। মুসলিম জাতির মধ্যে মহান আল্লাহর প্রতি আকাঙ্ক্ষার ধারণা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যার ফলে তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে, তবুও উভয় জগতে শান্তি এবং মুক্তির আশা করে। যে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি যাকে বিচ্যুত আচরণ বলে মনে করত তা এমন কিছুতে পরিণত হয়েছে যা মানুষকে গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। এই সমস্ত বিচ্যুতি থেকে দূরে সরে যাওয়া কঠিন হবে এবং এমনকি একজনের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবও সংখ্যাগরিষ্ঠদের অনুসরণ না করে ইসলামের শিক্ষাকে ধরে রাখার জন্য তাদের সমালোচনা করবে। কিন্তু যদি কেউ অধ্যবসায় ধরে রাখে, তাহলে মহান আল্লাহ, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা হারানোর মতো যেকোনো ক্ষতি পূরণ করবেন, যা তার চেয়েও উন্নততর কিছু, অর্থাৎ মানসিক ও শারীরিক শান্তি দিয়ে। ১৬তম অধ্যায় আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

আর পরকালে আল্লাহ তাদের জন্য যা রেখেছেন তা অনেক বেশি। অন্যদিকে, যারা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যার ফলে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, তারা তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পর্ক এবং আশীর্বাদ এই পৃথিবীতে তাদের জন্য চাপ এবং অভিশাপের উৎস হয়ে ওঠে। এবং পরকালে তারা যা পাবে তা আরও খারাপ হবে। অধ্যায় ২০ ত্বাহা, আয়াত ১২৪-১২৬:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন], আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি যখন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিলাম, তখন কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে?" [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবেই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে; আর আজ এভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।"

অতএব, মুসলিমদের উচিত পার্থিব কামনা-বাসনা দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে, যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এবং বিতর্কিত বিষয় এবং মানুষ এড়িয়ে চলা এবং পরিবর্তে, যদি তারা এই হাদিসে উল্লিখিত সওয়াব পেতে চায়, তাহলে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা উচিত।

চিরন্তনকে প্রাধান্য দেওয়া

যখন তাঁর শেষ অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে, তখন মহানবী (সাঃ) মধ্যরাতে বাকী আল-গারকাদ কবরস্থানে যান এবং সেখানে সমাহিতদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মহানবী (সাঃ) এরপর তাঁর সাথে থাকা সাহাবী আবু মুওয়াইহিবাহ (রাঃ) কে বলেন যে, তাঁকে দুনিয়ার ধন-সম্পদের চাবি রাখার এবং কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকার মধ্যে একটি পছন্দ দেওয়া হয়েছে, যার পরে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন অথবা তাঁর প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আবু মুওয়াইহিবাহ (রাঃ) তাকে প্রথম বিকল্পটি গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন কিন্তু মহানবী (সাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি দ্বিতীয় বিকল্পটি পছন্দ করেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩২১ এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, নবীর নোবেল জীবন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯৭৫-১৯৭৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরকালকে প্রাধান্য দিতেন কারণ তিনি এই পৃথিবী এবং পরকালের পার্থক্য স্পষ্টভাবে বুঝতেন।

সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪১০৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, আখেরাতের তুলনায় বস্তুগত জগৎ সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতো।

বাস্তবে, এই উপমাটি দেওয়া হয়েছিল যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে বস্তুজগৎ পরকালের তুলনায় কতটা ছোট। কিন্তু বাস্তবে তাদের তুলনা করা যায় না, কারণ বস্তুজগৎ ক্ষণস্থায়ী আর পরকাল চিরস্থায়ী। অর্থাৎ, সীমিতকে অসীমের সাথে

তুলনা করা যায় না। বস্তুজগৎকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তার পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব। এই গোষ্ঠীর মধ্যে যে পার্থিব আশীর্বাদই আসুক না কেন, তা সর্বদা অসম্পূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী হবে এবং মৃত্যু একজন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অন্যদিকে, পরকালের আশীর্বাদ স্থায়ী এবং নিখুঁত। তাই এই দিক থেকে বস্তুজগৎ একটি অসীম সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা ছাড়া আর কিছু নয়।

তাছাড়া, একজন ব্যক্তির এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবন লাভের নিশ্চয়তা নেই, কারণ মৃত্যুর সময় অজানা। অন্যদিকে, প্রত্যেকেরই মৃত্যু অনুভব করা এবং পরকালে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা রয়েছে। তাই, পরকালের জন্য প্রচেষ্টা করার চেয়ে, অবসরের মতো দিনের জন্য প্রচেষ্টা করা, যা তারা কখনও পৌঁছাতে পারে না, বোকামি।

এর অর্থ এই নয় যে, পৃথিবীকে ত্যাগ করা উচিত কারণ এটি একটি সেতু যা পার হয়ে নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে হবে। বরং, একজন মুসলিমের উচিত এই বস্তুগত পৃথিবী থেকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা, অপচয়, অতিরিক্ত ব্যয় বা অপচয় ছাড়াই। এবং তারপর তাদের বাকি প্রচেষ্টা আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে চিরন্তন পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য উৎসর্গ করা, তাঁর উপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। এটি নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য পাবে। অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অসীম সমুদ্রের চেয়ে এক ফোঁটা জলকেই প্রাধান্য দেবেন না এবং একজন বুদ্ধিমান মুসলিম চিরন্তন পরকালের চেয়ে পার্থিব বস্তুগত জগৎকে প্রাধান্য দেবেন না।

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অসীম সমুদ্রের চেয়ে এক ফোঁটা জলকে প্রাধান্য দেবেন না এবং একজন বুদ্ধিমান মুসলিম চিরন্তন পরকালের চেয়ে পার্থিব বস্তুগত জগৎকে প্রাধান্য দেবেন না।

অধিকন্তু, আলোচ্য মূল ঘটনাটি নির্দেশ করে যে, সর্বোপরি মহান আল্লাহর নৈকট্যকে প্রাধান্য দেওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার একটি উপায় হল, এটি উপলব্ধি করা যে এটি অর্জনই তাদের অস্তিত্বের মূল্য দেয়। যেমন একটি আবিষ্কারের মূল্য থাকে যখন এটি তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করে, তেমনি, একজন মানুষের মূল্য তখনই থাকে যখন তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করে, যা হল তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে উভয় জগতে মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। সূরা ৫১ আয ধরিয়াত, আয়াত ৫৬:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত (অর্থাৎ আনুগত্য) ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।"

এই আনুগত্যের মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা জড়িত। অতএব, একমাত্র উপায় হলো মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে এবং উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে, একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকার মাধ্যমে। খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং ক্যারিয়ারের মতো সমস্ত পার্থিব জিনিসের এই মানসিক শান্তি ছাড়া কোন মূল্য নেই। ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের এবং পার্থিব বিলাসিতা থাকা সত্ত্বেও তারা কীভাবে দুর্বিষহ জীবনযাপন করে তা পর্যবেক্ষণ করলে এটি স্পষ্ট হয়। অতএব, যদি কেউ এমন একটি অর্থপূর্ণ অস্তিত্ব কামনা করে যা মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে, তাহলে তাকে অবশ্যই তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্যে তা অনুসন্ধান করতে হবে। অধ্যায় ১৩ আর রা'দ, আয়াত ২৮:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

উহুদ যিয়ারত করা এবং খুতবা দেওয়া

একজন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সাক্ষী

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের এগারোতম বছরে তাঁর শেষ অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে। এরপর তিনি উহুদে যান এবং সেখানে সমাহিত শহীদদের জন্য বিদায়ী প্রার্থনা করেন। যদিও তিনি মৃত এবং জীবিত উভয়কেই বিদায় জানাচ্ছিলেন। এরপর তিনি তাঁর মিম্বরে উঠে খুতবা দেন। তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল যে তিনি তাদের আগে থাকবেন এবং তিনি তাদের উপর সাক্ষী থাকবেন। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ৪৭১-৪৭২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন সাক্ষী কারো পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারেন। একজন সাক্ষীর পক্ষে সাক্ষ্য পাওয়ার জন্য তাকে আন্তরিকভাবে এবং কার্যত পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্য এবং অনুসরণ করতে হবে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪৩০৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সুপারিশ করবেন এবং প্রথম ব্যক্তি যার সুপারিশ আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন।

তাই একজন মুসলিমের উচিত নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুপারিশের যোগ্য হওয়ার জন্য নিজেকে এমন কাজ করার চেষ্টা করা, যার ফলে আযান শোনার পর এর

জন্য দোয়া করা। সুনানে আন নাসায়ী, ৬৭৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে এর জন্য ঘরে বসে ফরজ নামাজ পড়ার পরিবর্তে নিয়মিত মসজিদে উপস্থিত হতে হবে। সুপারিশের জন্য যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজটি করা হবে তা হল নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য শেখা এবং তার উপর আমল করা। একজন মুসলিমের উচিত এই দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করে গাফিলতির মধ্যে বসবাস করা এবং বিচার দিবসে সুপারিশের আশা করা উচিত নয়, কারণ এটি ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার কাছাকাছি, যা নিন্দনীয় এবং আল্লাহর রহমতের প্রকৃত আশার তুলনায় মূল্যহীন।

দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলিম যারা এই ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করেছে তারা এই সুপারিশের মাধ্যমে জান্নাত লাভের আশা করে, যদিও তারা মহান আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয় না। এই মুসলিমদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে সুপারিশ একটি বাস্তবতা হলেও, কিছু মুসলিম যাদের সুপারিশের মাধ্যমে তাদের শাস্তি হ্রাস করা হবে, তারা এখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এমনকি জাহান্নামে এক মুহূর্তও অসহনীয়। তাই ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা ত্যাগ করা উচিত এবং বরং আল্লাহর আনুগত্যের জন্য বাস্তবিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে সত্যিকারের আশা গ্রহণ করা উচিত।

অধিকন্তু, যে মুসলিম আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকে এবং ধরে নেয় যে এই সুপারিশের মাধ্যমে তারা মুক্তি পাবে, তাকে অবশ্যই এই বাস্তবতা মেনে নিতে হবে যে, তাদের অবাধ্যতা এবং উপহাসের মনোভাবের কারণে, তারা তাদের ঈমান সহকারে এই পৃথিবী ত্যাগ করতেও পারবে না। অতএব, এই মুসলিমকে বিচারের দিনে এই সুপারিশ পাওয়ার চেয়ে মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করার বিষয়ে বেশি চিন্তিত থাকতে হবে, যা শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ

উহুদ পরিদর্শনের পর, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর মিম্বরে আরোহণ করেন এবং একটি খুতবা দেন। তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল যে তিনি তাদের আগে থাকবেন এবং তিনি তাদের উপর সাক্ষী থাকবেন এবং তারা খুব শীঘ্রই তাঁর স্বর্গীয় পুকুরে তাঁর সাথে দেখা করবেন। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেক্টার", পৃষ্ঠা ৪৭১-৪৭২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

স্বর্গীয় জলাশয় সম্পর্কে অনেক হাদিস আছে, যেমন সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস, ৬৫৭৯ নম্বরে। এতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, এর পুরো দৈর্ঘ্য অতিক্রম করতে এক মাস সময় লাগে, এর গন্ধ সুগন্ধির চেয়েও সুন্দর, এর পানি দুধের চেয়েও সাদা এবং যে কেউ এটি একবার পান করবে, সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। শেষ কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিচার দিবসে মানুষ তীব্র এবং অকল্পনীয় তৃষ্ণা অনুভব করবে। উদাহরণস্বরূপ, সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে আনা হবে যার ফলে মানুষ অতিরিক্ত ঘামবে। জামে আত তিরমিযীতে ২৪২১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে, প্রতিটি মুসলিম এই পুকুর থেকে পান করতে চায়, তার ঈমানের শক্তি যতই হোক না কেন। তবে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিমের উচিত কেবল এটি অর্জনের আশা না করে বরং নিজেকে এটি থেকে পান করার যোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা। এটি অর্জন করা হয় মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে।

এছাড়াও, মুসলমানদের অবশ্যই আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকতে হবে, বিশেষ করে এমন কাজ যা মানুষকে আসমানী জলাশয়ে পৌঁছাতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিমের ৫৯৯৬ নম্বর হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, ইসলামে মন্দ কাজ উদ্ভাবনকারী কিছু মুসলিমকে আটক করা হবে এবং আসমানী জলাশয়ে পৌঁছাতে বাধা দেওয়া হবে। সুনানে আন নাসায়ির ৪২১২ নম্বর হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, যারা অন্যায়কারী শাসকদের মিথ্যা ও অন্যায় কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে এবং বিশ্বাস করে, তারা আসমানী জলাশয়ে পৌঁছাতে পারবে না। তাই যেসব মুসলিম আসমানী জলাশয়ে পৌঁছাতে এবং সেখান থেকে পান করতে চান তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, তারা আল্লাহর অবাধ্যতা এড়ান এবং তাঁর আন্তরিক আনুগত্যে চেষ্টা করুন।

জনগণের জন্য ভয় পাওয়া

উহুদ পরিদর্শনের পর, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর মিম্বরে আরোহণ করেন এবং একটি খুতবা দেন। তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল যে তিনি ভয় পাননি যে লোকেরা তাঁর পরে মুশরিক হয়ে যাবে, বরং ভয় পান যে পার্থিব সম্পদ অর্জন তাদের একে অপরের সাথে লড়াই করতে প্ররোচিত করবে। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা 471-472-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৯৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী (সা.) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তিনি মুসলিম জাতির জন্য দারিদ্র্যের ভয় করেন না। বরং তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে পার্থিব আশীর্বাদ তাদের জন্য সহজে প্রাপ্ত এবং প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করবে এবং ফলস্বরূপ, এটি তাদের ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করবে, যেমন এই প্রতিযোগিতা পূর্ববর্তী জাতিগুলিকে ধ্বংস করেছিল।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এটি কেবল সম্পদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। বরং এই সতর্কীকরণ মানুষের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার সকল দিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব এবং জীবনের সামাজিক দিক যেমন পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং ক্যারিয়ারের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে পারে। যখনই কেউ তাদের চাহিদার বাইরে এই জিনিসগুলি অনুসরণ করে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার লক্ষ্য রাখে, এমনকি যদি সেগুলি বৈধ হয়, তখন এটি তাদের আখেরাতের জন্য কার্যত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখবে, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। এটি তাদের খারাপ চরিত্রের দিকে পরিচালিত করবে, যেমন অপচয় এবং অপচয় করা, এমনকি এই জিনিসগুলি অর্জনের জন্য তাদের পাপের দিকেও নিয়ে যেতে পারে। এগুলি অর্জনে ব্যর্থতা

অধৈর্যতা এবং মহান আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা এবং অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করতে পারে। অন্যদের সাথে পার্থিব আশীর্বাদের জন্য প্রতিযোগিতা তাদেরকে অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে পরিচালিত করবে, যেমন হিংসা, বিদ্বেষ এবং শত্রুতা, যা অনৈক্য, অকৃতজ্ঞতা এবং অন্যদের অধিকার পূরণে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করে। এই প্রতিযোগিতা এমনকি অন্যদের ক্ষতি করতে পারে। এটি উভয় জগতেই কেবল ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, এমনকি যদি এটি এই পৃথিবীর কোনও ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট নাও হয়।

এটা স্পষ্ট যে এই পার্থিব আকাঙ্ক্ষাগুলি অনেক মুসলমানের উপর কর্তৃত্ব করেছে কারণ তারা আনন্দের সাথে মধ্যরাতে ঘুম থেকে উঠে সম্পদের মতো পার্থিব আশীর্বাদ অর্জন করত, অথবা ছুটিতে যেত, কিন্তু যখন তাদেরকে নফল রাতের নামাজ পড়তে বা জামাতের সাথে মসজিদে সকালের ফরজ নামাজ পড়তে বলা হত, তখন তারা তা করতে ব্যর্থ হত।

এই জিনিসগুলি অর্জনে কোন ক্ষতি নেই যতক্ষণ না এগুলো বৈধ এবং মানুষের এবং তার উপর নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য আবশ্যক। কিন্তু যখন কেউ এর বাইরে যায়, তখন সে তার পরকালের ক্ষতির জন্য এগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কারণ এটি তাকে আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে। যত বেশি কেউ তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা অনুসরণ করবে, ততই সে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য কম চেষ্টা করবে, কারণ একজন ব্যক্তি তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে হয় আল্লাহ, মহিমান্বিতকে খুশি করার জন্য ব্যবহার করতে পারে, অথবা তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসারে। এটি আলোচিত মূল হাদিসে সতর্ক করা ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করবে। একটি ধ্বংস যা এই পৃথিবীতে চাপ এবং উদ্বেগ দিয়ে শুরু হয় এবং পরকালে চরম অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 20 ত্বাহা, আয়াত 124:

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে দুর্বিষহ [অর্থাৎ, কঠিন] এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করব।"

স্বাচ্ছন্দ্য ও কষ্টের মধ্যে অধিকার পূরণ করুন

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের এগারোতম বছরে তাঁর শেষ অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে। তিনি সর্বদা তাঁর স্ত্রীদের প্রতি সমান সময় এবং মনোযোগ দিতেন, কিন্তু যখন তিনি ব্যথায় কাতর হয়ে পড়তেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের ডেকে পাঠান এবং তাদের কাছ থেকে তাঁর স্ত্রী আয়েশা বিনতে আবু বকর (রাঃ)-এর বাড়িতে থাকার এবং সেবা করার অনুমতি চান। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীজীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩২৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, অন্যান্য সকল স্বামীর বিপরীতে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে সময় ভাগ করে নেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছিলেন। তবুও তিনি তাঁর সময়ের সাথে তাদের সমান আচরণ করতে থাকেন। সূরা আল আহযাব, আয়াত ৫১:

"তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারো অথবা যাকে ইচ্ছা নিজের কাছে রাখতে পারো। আর যাদের থেকে তুমি [সাময়িকভাবে] বিচ্ছিন্ন ছিলে, তাদের মধ্যে যাকে তুমি পছন্দ করো, তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তোমার কোন দোষ নেই।"

জামে আত তিরমিযী, ২৬১২ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যার পূর্ণ ঈমান আছে, সে ব্যক্তিই উত্তম আচরণকারী এবং পরিবারের প্রতি সবচেয়ে সদয়।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ আত্মীয়স্বজনবিহীনদের সাথে সদয় আচরণ করার খারাপ অভ্যাস গ্রহণ করেছে, অন্যদিকে তাদের নিজেদের পরিবারের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে। তারা এই আচরণ করে কারণ তারা নিজের পরিবারের সাথে সদয় আচরণ করার গুরুত্ব বোঝে না এবং তাদের পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। একজন মুসলিম কখনোই সফল হতে পারে না যতক্ষণ না তারা ঈমানের উভয় দিকই পূরণ করে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করা, তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত সমস্ত আশীর্বাদকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে।

দ্বিতীয়ত, মানুষের অধিকার পূরণ করা, যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। নিজের পরিবারের চেয়ে এই সদয় আচরণের অধিকার আর কারো নেই। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের পরিবারকে সকল ভালো বিষয়ে সাহায্য করা এবং মন্দ কাজ ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে ভদ্রভাবে সতর্ক করা। তাদের উচিত কেবল আত্মীয় বলে তাদের খারাপ কাজে অন্ধভাবে সমর্থন করা নয় এবং তাদের প্রতি কিছু খারাপ অনুভূতির কারণে তাদের ভালো বিষয়ে সাহায্য করতে ব্যর্থ হওয়া উচিত নয়, কারণ এটি ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। অধ্যায় ৫ আল মায়িদা, আয়াত ২:

"...এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

অন্যদের পথ দেখানোর সর্বোত্তম উপায় হল ব্যবহারিক উদাহরণের মাধ্যমে, কারণ এটিই মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য এবং এটি কেবল মৌখিক নির্দেশনার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর।

একজনকে অবশ্যই অন্যদের, বিশেষ করে তাদের আত্মীয়স্বজনের, প্রতি তাদের প্রাপ্য অধিকারগুলি শিখতে হবে যাতে তারা তা পূরণ করতে পারে। একজন মুসলিমকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবেন যে তারা অন্যদের অধিকার পূরণ করেছে কিনা, তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করবেন না যে লোকেরা তাদের অধিকার পূরণ করেছে কিনা। অতএব, একজনকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে তাদের কী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, অর্থাৎ অন্যদের অধিকার, এবং তাই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সেগুলি পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

পরিশেষে, সকল বিষয়ে, বিশেষ করে পরিবারের সাথে আচরণের সময়, একজনের উচিত সাধারণত নম্রতা বেছে নেওয়া। এমনকি যদি তারা পাপ করেও থাকে, তবুও তাদের ভদ্রভাবে সতর্ক করা উচিত এবং ভালো কাজে সহায়তা করা উচিত, কারণ এই দয়া তাদের সাথে কঠোর আচরণ করার চেয়ে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে আনতে বেশি কার্যকর।

আনুগত্যের মধ্যেই আভিজাত্য নিহিত

তাঁর শেষ অসুস্থতার সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কন্যা ফাতিমা (রাঃ) তাঁকে দেখতে আসেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বলেছিলেন যে তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে এবং তাঁর উচিত আল্লাহকে ভয় করা, ধৈর্য ধরা এবং তাঁর ঐতিহ্য অনুসরণ করা, কারণ তিনি তাঁর একজন যোগ্য পূর্বসূরী ছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীজীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩২৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও ফাতিমা (রাঃ) সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান, তবুও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে এবং তাঁর ঐতিহ্য অনুসরণ করতে সতর্ক করেছিলেন।

সুনানে আবু দাউদের ৫১১৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, মর্যাদা কারো বংশের উপর নির্ভর করে না, কারণ সকল মানুষই হযরত আদম (আঃ)-এর বংশধর এবং তিনি মাটি দিয়ে তৈরি। তিনি উপসংহারে বলেছিলেন যে, মানুষের উচিত তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বংশ সম্পর্কে গর্ব করা ছেড়ে দেওয়া।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও কিছু অজ্ঞ মুসলিম জাতি ও সম্প্রদায় তৈরি করে অন্যান্য জাতির মনোভাব গ্রহণ করেছে, যার ফলে এই গোষ্ঠীর উপর ভিত্তি করে কিছু লোককে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করেছে, তবুও ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের জন্য একটি সহজ মানদণ্ড ঘোষণা করেছে, তা হলো তাকওয়া। অর্থ, একজন মুসলিম যত বেশি আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে

এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে তাদের মর্যাদা তত বেশি হয়। সূরা ৪৯ আল হুজুরাত, আয়াত ১৩:

"...নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এই আয়াতটি অজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা তৈরি অন্যান্য সমস্ত মানদণ্ডকে ধ্বংস করে দেয়, যেমন কারো জাতি, জাতিগততা, সম্পদ, লিঙ্গ বা সামাজিক মর্যাদা।

অধিকন্তু, যদি কোন মুসলিম তার বংশের কোন ধার্মিক ব্যক্তির উপর গর্বিত হয়, তাহলে তাদের উচিত আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই বিশ্বাস সঠিকভাবে প্রদর্শন করা। অন্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে তাদের সম্পর্কে গর্ব করা এই দুনিয়া বা আখেরাতে কারোরই কোন উপকারে আসবে না। জামে আত তিরমিযী, ২৯৪৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি অন্যদের নিয়ে গর্ব করে কিন্তু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়, সে পরোক্ষভাবে তাদের অসম্মান করছে, কারণ বাইরের জগৎ তাদের খারাপ চরিত্র দেখবে এবং ধরে নেবে যে তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষও একইভাবে আচরণ করেছিলেন। অতএব, এই কারণেই এই লোকদের মহান আল্লাহর আনুগত্যে আরও বেশি প্রচেষ্টা করা উচিত। এরা সেই লোকদের মতো যারা মহানবী (সাঃ) এর বাহ্যিক ঐতিহ্য এবং উপদেশ গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি রাখা বা স্কার্ফ পরা, কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ মহৎ চরিত্র গ্রহণ করে না। বাইরের জগৎ যখন এই

মুসলমানদের খারাপ চরিত্র দেখবে, তখন তারা মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে কেবল নেতিবাচক চিন্তা করবে।

পরিশেষে, মানবজাতির উৎপত্তি স্মরণ করলে অহংকার থেকে বিরত থাকা যাবে, যার এক অণু পরিমাণও নরকে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহিহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অহংকার কেবল অন্যদের অবজ্ঞা করতে উৎসাহিত করে, যদিও তাদের কাছে থাকা সমস্ত ভালো জিনিসই মহান আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন এবং দান করেছেন। অহংকারও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করবে, যখন তা তাদের কাছ থেকে আসে না। অতএব, যেকোনো কিছুর প্রতি অহংকার, যেমন একজনের ধার্মিক পূর্বপুরুষ, যেকোনো মূল্যে এড়িয়ে চলতে হবে।

নেতৃত্ব দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা এড়িয়ে চলুন

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শেষ অসুস্থতার সময়, আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ)-কে পরোক্ষভাবে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, তাঁর পরে কে মুসলমানদের নেতৃত্ব দেবেন। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি এই বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন না এবং তিনি নেতা হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার জন্যও অনুরোধ করবেন না। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩২৬-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযীতে ২৩৭৬ নম্বর হাদিসে মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদার প্রতি আকুলতা ঈমানের জন্য দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ভেড়ার পালের উপর ছেড়ে দেওয়া ধ্বংসের চেয়েও বেশি ধ্বংসাত্মক।

একজন ব্যক্তির খ্যাতি এবং মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা অতিরিক্ত সম্পদের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে তার বিশ্বাসের জন্য বেশি ধ্বংসাত্মক। একজন ব্যক্তি প্রায়শই খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য তার প্রিয় সম্পদ ব্যয় করে।

এমনটা বিরল যে কেউ মর্যাদা ও খ্যাতি অর্জন করে এবং তারপরও সঠিক পথে অটল থাকে, যার ফলে তারা বস্তুগত জগতের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেয়। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারীতে (৬৭২৩) একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সমাজে নেতৃত্বের মতো মর্যাদার সন্ধান করে, তাকে নিজেই তা মোকাবেলা করতে হবে, কিন্তু যদি কেউ তা না চেয়েই পায়, তাহলে তাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর আনুগত্য বজায় রাখতে সাহায্য করবেন। এই কারণেই নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এমন কাউকে নিয়োগ করতেন না যে কর্তৃত্বের পদে নিযুক্ত হতে চেয়েছিল অথবা

এমনকি এর জন্য আকাঙ্ক্ষাও দেখিয়েছিল। সহীহ বুখারীতে (৬৯২৩) একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সহীহ বুখারীতে (৭১৪৮) আরেকটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব অর্জনের জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু কিয়ামতের দিন এটি তাদের জন্য বিরাট অনুশোচনার বিষয় হবে। এটি একটি বিপজ্জনক আকাঙ্ক্ষা কারণ এটি একজনকে এটি অর্জনের জন্য তীব্র প্রচেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং তারপরে এটি ধরে রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টা করতে বাধ্য করে, এমনকি যদি এটি তাদের অত্যাচার এবং অন্যান্য পাপ করতে উৎসাহিত করে।

ধর্মের মাধ্যমে যখন কেউ মর্যাদা লাভ করে, তখন তার চেয়েও খারাপ ধরণের মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৬৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করে বলেছেন যে, এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

অতএব, একজন মুসলিমের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা এড়িয়ে চলাই নিরাপদ কারণ এই দুটি জিনিস তাদের ঈমানের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং তাদেরকে পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখতে পারে।

শেষ ধর্মোপদেশ

ত্রুটি গোপন করা

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের পর এগারো বছরে তাঁর শেষ অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে। এই সময়কালে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একটি প্রকাশ্য খুতবা দেন যেখানে তিনি সাহাবীদের, বিশেষ করে মদীনার সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, প্রশংসা করেন। তিনি মক্কার সাহাবীদের সর্বদা মদীনার সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, সম্মান করার এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করার জন্য উৎসাহিত করেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩২৮-৩২৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সম্ভবত নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কার সাহাবীদেরকে মদীনার সাহাবীদের সাথে ভালো আচরণ করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, এভাবেই, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর পরে নেতৃত্ব মক্কার সাহাবীদের কাছে পৌঁছেছিল, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

এছাড়াও, সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে, মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ তাআলা ইহকাল ও পরকালে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। চিন্তা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যারা অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করতে অভ্যস্ত, আল্লাহ তাআলা তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করে, তাকে সমাজ এমন একজন হিসেবে বিবেচনা করে যার কোন স্পষ্ট দোষ-ত্রুটি নেই।

এই উপদেশের ক্ষেত্রে দুই ধরণের মানুষ আছে। প্রথমত, যাদের ভুল কাজ ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে করা হয়, এই ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপ করে না বা অন্যদের কাছে তাদের পাপ প্রকাশ করে না। যদি এই ব্যক্তি ভুল করে এমন কোনও পাপ করে যা অন্যদের কাছে জানাজানি হয়ে যায় তবে তা গোপন রাখা উচিত যতক্ষণ না এটি অন্যদের ক্ষতি করে। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ১৯:

"নিশ্চয়ই, যারা পছন্দ করে যে ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক [অথবা প্রচারিত হোক], তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে..."

প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আবু দাউদের ৪৩৭৫ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদেরকে তাদের ভুল উপেক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছেন যারা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করার চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় ধরণের ব্যক্তি হল সেই দুষ্ট ব্যক্তি যে প্রকাশ্যে পাপ করে এবং লোকে তাদের সম্পর্কে জানতে পারে কিনা সেদিকে তার কোন খেয়াল নেই। প্রকৃতপক্ষে, তারা প্রায়শই অন্যদের কাছে করা পাপ নিয়ে গর্ব করে। অন্যদের সতর্ক করার জন্য তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে অন্যদের খারাপ কাজ করতে উৎসাহিত করে, যা এই হাদিসের পরিপন্থী নয়। এই দুষ্ট ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করার বিনিময়ে, মহান আল্লাহ এই ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবেন না, যা সুনান ইবনে মাজাহ, ২৫৪৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা সঠিক কারণে অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে।

একটি চমৎকার পছন্দ

তাঁর শেষ জনসাধারণের খুতবায়, মহানবী (সা.) ঘোষণা করেছিলেন যে, আল্লাহর একজন বান্দাকে পৃথিবীতে যা আছে এবং মহান আল্লাহর কাছে যা আছে তার মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং বান্দা আল্লাহর কাছে যা আছে তা বেছে নিয়েছে। আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তখন কেঁদে ফেললেন কারণ তিনি জানতেন যে মহানবী (সা.) যে বান্দার কথা বলছেন তিনি নিজেই। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সা.)-এর জীবনী", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩২৮-৩২৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামের একটি মূল ধারণা মুসলমানদের জন্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। যথা, আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে বৈধ পার্থিব জিনিসপত্র কামনা করা কোনও ভুল নয়, তবে তা পাওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার উপাসনা ও আনুগত্য করা এড়িয়ে চলাই উত্তম। কারণ এই ধরণের মুসলমানরা প্রায়শই কেবল আল্লাহ তাআলার উপাসনা করে এবং পার্থিব জিনিসপত্রের আকাঙ্ক্ষার সময় মসজিদে বাস করে। কিন্তু যদি তারা তা না পায় তবে তারা অধৈর্য ও বিরক্ত হয়ে পড়ে যার ফলে তারা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য বন্ধ করে দেয়। অথবা যদি তারা তা পায় তবে এর আনন্দ প্রায়শই তাদেরকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা যা চেয়েছিল তা অর্জন করেছে তাই আর আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করার প্রয়োজন নেই। এই মুসলমানরা আল্লাহ তাআলার উপাসনা করে, অর্থাৎ, তারা কেবল তখনই আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে যখন এটি তাদের ইচ্ছার সাথে খাপ খায়। এবং এই মনোভাবের কারণে তারা বিভ্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। অধ্যায় ২২ আল হজ্জ, আয়াত ১১:

"আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে আল্লাহর ইবাদত করে এক প্রান্তে। যদি তাকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে, তবে সে তাতে আশ্বস্ত হয়; আর যদি কোন

পরীক্ষা তাকে স্পর্শ করে, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই হারিয়ে ফেলেছে। এটাই স্পষ্ট ক্ষতি।"

এই মুসলিমরা হয়তো দাবি করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর ইবাদত করছে, কিন্তু বাস্তবে তারা কেবল তাদের নিজস্ব কামনা-বাসনা এবং প্রাপ্ত উপহার ও আশীর্বাদেরই ইবাদত করছে।

জান্নাতের মতো ধর্মীয় আশীর্বাদ লাভের জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করা প্রশংসনীয়, কারণ ইসলামী শিক্ষা এটির সুপারিশ করেছে। কিন্তু মহান আল্লাহর ইবাদত করা অনেক বেশি উত্তম, কারণ তিনিই একমাত্র এর যোগ্য এবং কারণ সৃষ্টিকুল তাঁর বান্দা।

যদি একজন মুসলিমের অবশ্যই উপহার এবং আশীর্বাদ কামনা করা উচিত, তাহলে ধর্মীয় আশীর্বাদের দিকে লক্ষ্য রাখাই উত্তম কারণ পার্থিব আশীর্বাদের দিকে লক্ষ্য রাখা একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্যকে এমনভাবে পরিবর্তন করতে পারে যে তারা দাতার পরিবর্তে উপহারের উপাসনা করতে শুরু করে।

অধিকন্তু, আলোচ্য মূল ঘটনাটি সর্বোপরি মহান আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দেওয়ার গভীর তাৎপর্যকেও তুলে ধরে। এই সত্যকে স্বীকৃতি দেওয়া অপরিহার্য; এই ঘনিষ্ঠতা অর্জনই প্রকৃত অর্থে একজনের অস্তিত্বকে অর্থবহ করে। ঠিক যেমন একটি আবিষ্কার মূল্যবান যখন এটি তার উদ্দেশ্য পূরণ করে, তেমনি একজন ব্যক্তি তার প্রকৃত মূল্য তখনই খুঁজে পায় যখন তারা জীবনের তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করে - যা হল আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। অধ্যায় ৫১ আয ধরিয়াত, আয়াত ৫৬:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত (অর্থাৎ আনুগত্য) ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।"

মহান আল্লাহর আনুগত্যের অর্থ হলো ইসলামী শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করা। মহান আল্লাহর এই নৈকট্যের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে এবং ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনেই প্রকৃত মানসিক শান্তি পেতে পারে। এই শান্তি অর্জিত হয় একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত থাকার সময় সবকিছু এবং সকলকে সঠিকভাবে নিজের জীবনের মধ্যে স্থাপন করার মাধ্যমে। মহান আল্লাহ, মহান আল্লাহর এই নৈকট্য থেকে আসা প্রশান্তি ছাড়া, খ্যাতি, সম্পদ, ক্ষমতা, পরিবার, বন্ধুত্ব এবং ক্যারিয়ারের মতো পার্থিব সাধনাগুলির প্রকৃত মূল্য খুব কম। এই বাস্তবতা স্পষ্ট হয় যখন কেউ ধনী এবং বিখ্যাতদের জীবন দেখে, যাদের অনেকেই তাদের বস্তুগত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার সাথে লড়াই করে। প্রকৃত শান্তির দিকে পরিচালিত করে এমন অর্থপূর্ণ জীবন খুঁজছেন এমন যে কেউ, যাত্রা শুরু করতে হবে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে। অধ্যায় ১৩ আর রা'দ, আয়াত ২৮:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

ধার্মিকদের সাথে যোগদান

তাঁর শেষ জনসাধারণের খুতবার সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর প্রশংসা করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, আবু বকর (রাঃ) তাঁর বন্ধুত্ব এবং সম্পদের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি সবচেয়ে বিশ্বস্ত ছিলেন। আর যদি তিনি আল্লাহর পরে কাউকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি হবেন আবু বকর (রাঃ)। এরপর তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মসজিদে আবু বকর (রাঃ) এর দরজা ছাড়া আর কোনও দরজা খোলা রাখা যাবে না। জামাতের নামাজের ইমাম এই দরজা ব্যবহার করবেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ) এর জীবনী", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩২৯-৩৩০ এবং সহীহ বুখারী, ৩৬৫৪ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি স্পষ্ট করে যে, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) মহানবী (সাঃ) এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন।

অতএব, নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শনের তাদের মৌখিক ঘোষণাকেও সমর্থন করতে হবে, তাঁর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং সে অনুযায়ী কাজ করার মাধ্যমে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এবং ৫৯তম অধ্যায় আল হাশর, ৭ম আয়াত:

"... আর রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো; আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো..."

এবং অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৮০:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

এবং অধ্যায় ৩৩ আল আহযাব, আয়াত ২১:

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে একটি চমৎকার আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মহৎ চরিত্রকে ধারণ করার জন্য, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং উদারতার মতো গুণাবলী গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা করা উচিত, একই সাথে হিংসা, অহংকার এবং লোভের মতো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি ত্যাগ

করার চেষ্টা করা উচিত। এই সচেতন প্রচেষ্টা অভ্যন্তরীণ শান্তির অনুভূতির দিকে পরিচালিত করবে, কারণ ইতিবাচক গুণাবলী একটি সুস্থ মানসিকতা গড়ে তোলে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষা অধ্যয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে, ব্যক্তিরা তাঁর মূল্যবোধগুলিকে বিশ্ববাসীর কাছে খাঁটিভাবে উপস্থাপন করতে পারে। তা না করলে ভুল উপস্থাপনের ঝুঁকি থাকে, যা অমুসলিম এবং সহ-মুসলিম উভয়কেই ইসলামী নীতি গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে পারে। দুঃখজনকভাবে, বহির্বিশ্ব যখন মুসলমানদের নেতিবাচক আচরণ পর্যবেক্ষণ করে, তখন এই ধরনের ভুল উপস্থাপনা পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সমালোচনার দিকে পরিচালিত করতে পারে। প্রতিটি বিশ্বাসীর দায়িত্ব হল ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা যাতে তাদের কর্মকাণ্ড বৃহত্তর বিশ্বের কাছে ইসলামের প্রকৃত চেতনা প্রতিফলিত করে।

অধিকন্তু, পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মতো যারা তাদের পবিত্র নবীদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে, যারা মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শকে আন্তরিকভাবে অনুসরণ করে না, তারা পরকালে তাঁর সাথে একত্রিত হবে না। বরং, ব্যক্তিরা যাদেরকে তারা এই পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থে অনুকরণ করেছিল তাদের সাথে একত্রিত হবে। সুনান আবু দাউদের ৪০৩১ নম্বর হাদিসে এই ধারণাটি তুলে ধরা হয়েছে।

একটি পরিষ্কার হৃদয়

তাঁর শেষ জনসাধারণের খুতবার সময়, মহানবী (সা.) ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর অনুপস্থিতি (অর্থাৎ তাঁর মৃত্যু) নিকটবর্তী। এবং যদি এমন কেউ থাকে যার তিনি অন্যায়ভাবে শারীরিকভাবে ক্ষতি করেছেন, তাহলে তারা তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারে। এবং যদি এমন কেউ থাকে যার সম্পদ তিনি ফেরত না দিয়ে নিয়ে গেছেন, তাহলে তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য এগিয়ে আসা উচিত। এবং যদি এমন কেউ থাকে যার সম্মান তিনি লঙ্ঘন করেছেন, তাহলে তাদের তার সম্মানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন যে তাদের কারোরই ভয় করা উচিত নয় যে, নবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতি তার অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করবেন কারণ এটি তাঁর স্বভাব বা চরিত্রের মধ্যে নেই। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে তাঁর দৃষ্টিতে সর্বোত্তম মানুষ হলেন তারা যারা তাঁর কাছ থেকে প্রতিশোধ নেন অথবা তারা ক্ষমা করে দেন, কারণ তিনি সৃষ্টির বিরুদ্ধে কোনও অবিচার ছাড়াই মহান আল্লাহর সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৩১-৩৩২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও এটা স্পষ্ট যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কখনও কারো প্রতি অন্যায় করেননি, তবুও তিনি বিনয়ের সাথে এবং অন্যদের ক্ষতি না করার বিষয়ে মুসলমানদের সতর্ক করার জন্য এই খুতবা দিয়েছিলেন।

এই ঘটনাটি অন্যদের প্রতি নেতিবাচক অনুভূতি এড়ানোর গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সুনানে আবু দাউদের ৪৮৬০ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলার বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করেছেন, কারণ এটি মানুষের হৃদয়ে তাদের প্রতি বিদ্বেষের অনুভূতি তৈরি করে।

প্রায়শই দেখা যায় যে, পরিবারগুলো, বিশেষ করে এশীয় সম্প্রদায়ের পরিবারগুলো, সময়ের সাথে সাথে ভেঙে যায়। এটি পরিবারের সদস্যদের, যেমন বাবা-মায়ের, সবচেয়ে বড় অভিযোগ। তারা ভাবছেন যে, তাদের সন্তানরা কেন আলাদা হয়ে গেছে, যদিও তারা একসময় দৃঢ়ভাবে একসাথে ছিল।

আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সম্পর্ক ভাঙার অন্যতম প্রধান কারণ হল কেউ একজন ব্যক্তির আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলেছে। এটি প্রায়শই পরিবারের কোনও সদস্য করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মা তার অন্য সন্তানের সাথে তার ছেলে সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলবেন। এর ফলে দুই আত্মীয়ের মধ্যে শত্রুতা তৈরি হয় এবং সময়ের সাথে সাথে এটি দুজনের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে। যারা একসময় একই ব্যক্তির মতো ছিল তারা একে অপরের কাছে অপরিচিত হয়ে যায়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষ ফেরেশতা নয়। খুব কম সংখ্যক ব্যতীত, যখন একজন ব্যক্তির কাছে অন্য ব্যক্তির সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলা হয়, তখন তারা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়, এমনকি যদি তারা এটি ঘটতে না চায়। এই শত্রুতা তখনও ঘটে, এমনকি যদি প্রথম ব্যক্তিটি কারো আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলে, তার আত্মীয়দের মধ্যে ফাটল তৈরি করার ইচ্ছা না থাকে। কেউ কেউ প্রায়শই অভ্যাসের বাইরে এইভাবে কাজ করে এবং সম্পর্ক নষ্ট করার চেষ্টা করে না। উদাহরণস্বরূপ, বাবা-মা প্রায়শই এই অভ্যাসটি গ্রহণ করে এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে তারা তাদের সন্তানদের সম্পর্ক ভাঙতে বা ভেঙে যেতে চায় না।

এই মনোভাব মানুষের মানসিকতার উপর এতটাই মারাত্মক প্রভাব ফেলে যে, এটি সেই আত্মীয়দেরও প্রভাবিত করে যারা খুব কমই একে অপরের সাথে দেখা করে বা কথা বলে। উদাহরণস্বরূপ , একজন ব্যক্তি তার আত্মীয় সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলবে, যদিও তার আত্মীয় হয়তো তাদের দেশে বাস করে না। এই আচরণ তাদের হৃদয়ে শত্রুতা তৈরি করে এবং সময়ের সাথে সাথে তারা দেখতে পাবে যে তারা তাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়কে অপছন্দ করে, যদিও তারা তাদের খুব কমই চেনে।

এই সমস্যাটি প্রায়শই ঘটে যখন দুজন ব্যক্তি অন্যদের সামনে অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলে। উদাহরণস্বরূপ, বাবা-মা তাদের সন্তানদের সামনে তাদের আত্মীয়দের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলতে পারেন। যদিও তারা তাদের সন্তানদের সরাসরি কিছু বলছেন না, তবুও এটি তাদের হৃদয়কে প্রভাবিত করে। কেউ যদি সত্যিই এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে অন্যদের প্রতি তাদের বেশিরভাগ খারাপ অনুভূতি সেই ব্যক্তি সরাসরি যা করেছে বা বলেছে তার কারণে নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, এটি ঘটেছিল তৃতীয় পক্ষের কারণে, যারা তাদের কাছে সেই ব্যক্তির সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু উল্লেখ করেছিল।

যখন কেউ অন্য কাউকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করার চেষ্টা করছে, তখন অন্য ব্যক্তির নাম নেতিবাচকভাবে উল্লেখ করা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য। যদি কেউ অন্য কাউকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছে, তাহলে তাদের উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে নেতিবাচক বিষয় উল্লেখ করা। এই সুন্দর মানসিকতার একটি উদাহরণ সহিহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে, সংখ্যা ৬৯৭৯। ব্যক্তির

নাম উল্লেখ না করে নেতিবাচক বিষয় উল্লেখ করা কাউকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

পরিশেষে, মুসলিমদের তাদের আত্মীয়স্বজন বা অন্যদের সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রকাশ্যে নেতিবাচক কথা বলার আগে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। অন্যথায়, তারা সময়ের সাথে সাথে তাদের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের বিচ্ছিন্ন এবং মানসিকভাবে একে অপরের থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে।

যে ব্যক্তি অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা শোনে, তার উচিত বক্তাকে গীবত করা থেকে বিরত থাকতে এবং তাদের কর্মের পরিণতি ব্যাখ্যা করতে সতর্ক করা। তাদের অবশ্যই একজন ব্যক্তির সম্পর্কে বলা নেতিবাচক কথার উপর মনোযোগ দেওয়া এড়িয়ে চলতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে একটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য একজন ব্যক্তির সম্পূর্ণ চরিত্রকে সংজ্ঞায়িত করে না। তাদের অবশ্যই যার সম্পর্কে নেতিবাচক কথা শুনেছে তার প্রতি ভালো আচরণ প্রদর্শন করতে হবে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার পূরণ করতে হবে। সহজ কথায়, একজনের উচিত অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যাতে সে অন্যদের দ্বারা আচরণ পেতে চায়। এইভাবে আচরণ করলে অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলার ফলে তার হৃদয়ে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে তা কমবে।

এছাড়াও, আলোচিত মূল ঘটনাটি অন্যদের অন্যায় করার বিরুদ্ধেও সতর্ক করে কারণ এটি উভয় জগতেই, বিশেষ করে বিচার দিবসে, সমস্যা সৃষ্টি করে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, দেউলিয়া মুসলিম হলো সেই ব্যক্তি যে রোজা এবং নামাজের মতো অনেক

নেক আমল জমা করে, কিন্তু যেহেতু তারা মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে, তাই তাদের নেক আমল তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের পাপ বিচারের দিন তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। এর ফলে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিমকে সাফল্য অর্জনের জন্য ঈমানের উভয় দিকই পালন করতে হবে। প্রথম দিকটি হলো আল্লাহর প্রতি কর্তব্য, যেমন ফরজ নামাজ। দ্বিতীয় দিকটি হলো মানুষের অধিকার পূরণ করা, যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসায়ী, ৪৯৯৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুসলিম এবং মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতি একজন ব্যক্তি এবং তার সম্পদ থেকে দূরে রাখে, সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ অসীম ক্ষমাশীল, অর্থাৎ যারা তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়, তিনি তাদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু অন্যদের সাথে জড়িত পাপ তিনি ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না ভুক্তভোগী প্রথমে ক্ষমা করে। যেহেতু মানুষ এতটা ক্ষমাশীল নয়, তাই একজন মুসলিমের ভয় করা উচিত যে, যাদের সাথে তারা অন্যায় করেছে তারা বিচারের দিনে তাদের মূল্যবান সৎকর্ম কেড়ে নিয়ে তাদের উপর প্রতিশোধ নেবে। এমনকি যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহর অধিকার পূরণ করে, তবুও তারা কেবল অন্যদের সাথে অন্যায় করার কারণে জাহান্নামে যেতে পারে।

নামাজ ও রোজার মতো নেক আমল জমা করে কেবল বিচারের দিনে অন্যদের হাতে তুলে দেওয়ার কোন মানে হয় না। বরং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে আল্লাহ

ও মানুষের হক আদায় করে তাদের নেক আমল বৃদ্ধি এবং পাপ কমানোর চেষ্টা করতে হবে।

অনুশোচনার প্রকারভেদ

তাঁর শেষ জনসাধারণের খুতবায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছিলেন যে, পরকালের কলঙ্কের চেয়ে পৃথিবীতে কলঙ্ক সহ্য করা সহজ। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৩২-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

একটি কলঙ্ক যেকোনো ধরণের অনুশোচনা বা ব্যর্থতার ইঙ্গিত দিতে পারে। মুসলমানদের বুঝতে হবে যে অনুশোচনা দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটি হল বিবাহ না করা বা সন্তান না হওয়ার মতো পার্থিব বিষয়ের জন্য অনুশোচনা। দ্বিতীয়টি হল কবরে এবং বিচার দিবসে অনুশোচনা, যেমন মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের সময়ের আরও ভালভাবে ব্যবহার না করার জন্য। পার্থিব অনুশোচনা, সেগুলি যাই হোক না কেন, কখনও স্থায়ী হবে না কারণ হয় একজন ব্যক্তি যখন তার ইচ্ছা পূরণ করে, তার মন পরিবর্তন করে বা মারা যায় তখনই এগুলি শেষ হয়ে যায়। এগুলি প্রকৃতিতে ক্ষণস্থায়ী কারণ এই ধরণের অনুশোচনা সর্বাধিক সময় মৃত্যুর আগ পর্যন্ত থাকতে পারে। এবং এগুলি এত তাৎপর্যপূর্ণ নয় কারণ এই অনুশোচনাগুলি দুঃখের দিকে পরিচালিত করতে পারে কিন্তু কঠোর শাস্তি বা আযাবের দিকে নয়। উপরন্তু, এই অনুশোচনাগুলি শেষ হবে যদি একজন ব্যক্তি মহান আল্লাহর রহমতে জান্নাতে পৌঁছায়।

অন্যদিকে, পরকালের অনুশোচনা দীর্ঘস্থায়ী কারণ কবরে এবং বিচারের দিনের সময়কাল মানুষের এই পৃথিবীর জীবনের চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘ হবে। জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত এগুলো শেষ হবে না, যা হয়তো ঘটবে না অথবা অত্যন্ত দীর্ঘ সময় পরেও ঘটতে পারে কারণ পরকালের একটি দিন পৃথিবীর এক হাজার বছরের সমান। সূরা আল হজ্জ, আয়াত ৪৭:

"... আর নিশ্চয়ই, তোমার প্রভুর কাছে এক দিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান।"

পরিশেষে, এই অনুশোচনাগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এগুলি পরকালে কঠোর শাস্তি এবং আযাবের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা এবং নিজেদের প্রতি সদয় হওয়া, কবরে এবং বিচার দিবসে তাদের যে সম্ভাব্য অনুশোচনা থাকবে তা দূর করার চেষ্টা করা, এই পৃথিবীর অনুশোচনা দূর করার চেষ্টা করার আগে। সূরা ৮৯ আল ফজর, আয়াত ২৪:

"সে বলবে, "হায়, আমি যদি আমার জীবনের জন্য [কিছু ভালো] আগে পাঠিয়ে দিতাম।"

ছাঁচনির্মাণ জীবন

এক রাতে, যখন তাঁর শেষ অসুস্থতা তীব্র আকার ধারণ করে, তখন মহানবী (সা.) তাঁর আশেপাশের লোকদের জিজ্ঞাসা করেন যে লোকেরা কি নামাজ পড়েছে কিনা। কিন্তু তারা উত্তর দেয় যে তারা তাঁর জামাতের নামাজের জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি তাদের একটি পাত্রে কিছু পানি ঢালতে বলেন। এরপর তিনি নিজেকে গোসল করেন এবং জামাতের নামাজের জন্য উঠতে চেষ্টা করেন কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পান, তখন তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন যে লোকেরা নামাজ পড়েছে কিনা। কিন্তু তাঁর পরিবার, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, উত্তর দেন যে লোকেরা এখনও তাঁর জামাতের নামাজের জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি আবার গোসল করলেন এবং জামাতের নামাজের জন্য উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন। এই ঘটনার পর তিনি আবার আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে জামাতের নামাজের ইমামতি করার নির্দেশ দেন। ইমাম ইবনে কাসিরের, নবীর জীবনী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৩৪-৩৩৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই চরম সংকটের সময়ও মহানবী (সা.) ফরজ নামাজ আদায়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে উদ্বিগ্ন ছিলেন।

মুসলমানরা প্রায়শই প্রশ্ন তোলেন যে তারা কীভাবে তাদের জীবনকে তাদের ঈমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে পারেন, তাদের পার্থিব জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার পরিবর্তে। এটি অর্জনের একটি উপায় হল মহিলাদের জন্য ফরজ নামাজ পড়ার সাথে সাথেই তা আদায় করা এবং পুরুষদের জন্য ফরজ নামাজ মসজিদে আদায় করা। যেহেতু নামাজ প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের প্রধান স্তম্ভ,

যা জামে আত তিরমিযির ২৬১৬ নম্বর হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তাই যখন কেউ এটি বর্ণনা অনুসারে আদায় করে, তখন তাকে তাদের পার্থিব কার্যকলাপগুলিকে এমনভাবে সাজাতে বাধ্য করে যাতে তারা তাদের ফরজ নামাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। অন্যদিকে, যখন কেউ মসজিদের পরিবর্তে দেরিতে অথবা বাড়িতে ফরজ নামাজ আদায় করে, তখন ফরজ নামাজকে তার পার্থিব সময়সূচীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা সহজ হয়ে যায় যার ফলে তারা তাদের ঈমানকে তাদের পার্থিব জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে। সঠিক মনোভাব একজনকে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া থেকেও বিরত রাখবে, যেমন অপ্রয়োজনীয়ভাবে শপিং সেন্টারে যাওয়া, কারণ এটি প্রায়শই একজন মুসলিমকে সময়মতো বা মসজিদে তাদের ফরজ নামাজ আদায় করতে বাধা দেয়। এই অপ্রয়োজনীয় জিনিস এবং কার্যকলাপ এড়িয়ে চলা একজনকে তার জীবনকে তার ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে সাহায্য করে।

উপরন্তু, সুনানে আন নাসায়ীর ৬১১ নম্বর হাদিস অনুযায়ী, যেহেতু সময়মতো ফরজ নামাজ আদায় করা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলোর মধ্যে একটি, তাই একজন মুসলিমের উচিত এই অভ্যাসটি মেনে চলা এবং অত্যন্ত ভালো কারণ ছাড়া তাদের ফরজ নামাজ স্থগিত রাখা উচিত নয়, যা খুব কমই ঘটে। যদি কেউ তাদের জীবনকে তাদের ঈমানের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলতে চায়, তাহলে তাদের ফরজ নামাজ নারীদের জন্য নির্ধারিত সময়মতোই আদায় করতে হবে এবং পুরুষদের মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা এই বস্তুগত জগতের অতিরিক্ত আয়ের দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে।

অধিকন্তু, ফরজ নামাজ কায়েম করার মধ্যে রয়েছে সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ শর্তাবলী এবং আদব-কায়দা পূরণ করা, যেমন সময়মতো আদায় করা। পবিত্র কুরআনে ফরজ

নামাজ কায়েম করার কথা প্রায়শই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে কারণ এটি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক প্রমাণ। উপরন্তু, যেহেতু প্রতিদিনের নামাজগুলি বিস্তৃত, তাই এগুলি বিচার দিনের ধ্রুবক স্মারক এবং এর জন্য কার্যত প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করে, কারণ ফরজ নামাজের প্রতিটি স্তর বিচার দিনের সাথে সম্পর্কিত। যখন কেউ সঠিক পথে দাঁড়াবে, তখন বিচারের দিন সে এভাবেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। সূরা ৮৩ আল মুতাফিফিন, আয়াত ৪-৬:

" তারা কি ভাবে না যে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে? এক মহাদিনের জন্য, যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে?"

যখন তারা রুকু করে, তখন এটি তাদের সেই অনেক লোকের কথা মনে করিয়ে দেয় যারা পৃথিবীতে তাদের জীবদ্দশায় মহান আল্লাহর কাছে রুকু না করার জন্য বিচারের দিনে সমালোচিত হবে। সূরা ৭৭ আল মুরসালাত, আয়াত ৪৮:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'নামাজে রুকু করো', তখন তারা রুকু করে না।"

এই সমালোচনার মধ্যে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ না করাও অন্তর্ভুক্ত। যখন কেউ নামাজে সিজদা করে, তখন এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিচারের দিনে মানুষকে মহান আল্লাহর কাছে সিজদা করার জন্য কীভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের

জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য করার জন্য সঠিকভাবে সিজদা করেনি, তারা বিচারের দিনে এটি করতে সক্ষম হবে না। সূরা ৬৮ আল-কালাম, আয়াত ৪২-৪৩:

"যেদিন পরিস্থিতি কঠিন হবে, সেদিন তাদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের চোখ অবনত হবে, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। আর তাদেরকে সুস্থ অবস্থায় সিজদা করার জন্য ডাকা হত।"

যখন কেউ নামাযে হাঁটু গেড়ে বসে, তখন এটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে কিয়ামতের দিন তারা কীভাবে তাদের চূড়ান্ত বিচারের ভয়ে আল্লাহর সামনে এই অবস্থানে বসে থাকবে। সূরা ৪৫, আল জাসিয়াহ, আয়াত ২৮:

"আর তুমি প্রত্যেক জাতিকে [ভয়ে] নতজানু দেখবে। প্রত্যেক জাতিকে তার আমলনামার দিকে ডাকা হবে [এবং বলা হবে], "আজ তোমাদেরকে তোমাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।"

যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে নামাজ পড়বে, সে তার নামাজ সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবে। এর ফলে তারা নামাজের মাঝখানে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে। সূরা ২৯, আল আনকাবুত, আয়াত ৪৫:

"...প্রকৃতপক্ষে, নামাজ অশ্লীলতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা, যা তাঁর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

একজন ব্যবহারিক রোল মডেল

যখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর শেষ অসুস্থতা তীব্রতর হয়ে উঠল, তখন তিনি একজন সাহাবী আবদুল্লাহ বিন যাম'আকে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে জামাতের নামাজের ইমামতি করতে বলেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) মসজিদে প্রবেশ করলে আবু বকর (রাঃ)-কে না পেয়ে এবং সালাত বিলম্বিত না হওয়ার ইচ্ছা পোষণ না করে উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-কে সালাত পড়াতে বলেন। যখন উমর (রাঃ)-নামাজ শুরু করলেন, তখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং মুসলিমরা আবু বকর (রাঃ)-কে ছাড়া আর কাউকেই সালাত আদায় করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন। এরপর আবু বকর (রাঃ)-ও এসে লোকদের সাথে সালাত আদায় করলেন। পরবর্তীতে, উমর আবদুল্লাহ বিন যাম'আ-এর সমালোচনা করতেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন, অন্যথায় তিনি কখনও তা করতেন না। আবদুল্লাহ (রাঃ) ক্ষমা চাইবেন, কিন্তু যোগ করবেন যে, যেহেতু আবু বকর (রাঃ) সেই সময় মসজিদে অনুপস্থিত ছিলেন, তাই তিনি বিশ্বাস করতেন যে আবু বকরের পরে উমর (রাঃ) এর চেয়ে বেশি নামাজের ইমামতি করার যোগ্য আর কেউ নেই। ইমাম ইবনে কাসীরের "নবী (সাঃ)-এর জীবনী", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৩২-৩৩৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আরেকবার, যখন আবু বকর (রাঃ) সালাত আদায় করছিলেন, তখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) জামাতে প্রবেশ করলেন। আবু বকর (রাঃ) সালাত আদায় করা থেকে সরে আসতে শুরু করলেন, কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে যেখানে আছেন সেখানেই থাকতে বললেন এবং তার পরিবর্তে তার বাম পাশে বসে পড়লেন। অতএব, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) আবু বকর (রাঃ) কে ইমামতি করলেন, আর আবু বকর (রাঃ) বাকিদের সালাত আদায় করলেন। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ৪৭৬-৪৭৭-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, এই ঘটনাগুলি, অন্যান্য অনেক ঘটনার মতো, স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে আবু বকর (রাঃ) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা হওয়ার জন্য কাঙ্ক্ষিত পছন্দ। উপরন্তু, প্রথম ঘটনাটি এমনভাবে ঘটেছিল যে এটি ইঙ্গিত দেয় যে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হলেন উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই ধার্মিক ব্যক্তিদের নেতৃত্বের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল কারণ তাদের মধ্যে একজন ভালো নেতার গুণাবলী ছিল। যার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হলো উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেওয়া।

উদাহরণ হিসেবে নেতৃত্ব দেওয়ার অর্থ হল ইসলামের শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করা যাতে অন্যরা তাদের কাজ এবং কথার মাধ্যমে এর সত্যতা বুঝতে পারে। কেবলমাত্র তখনই মুসলিমরা পরবর্তী প্রজন্মকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য শিক্ষা দিতে পারে যাতে তারা অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা বুঝতে পারে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা সারা জীবন ইসলামের শিক্ষার উপর অটল থাকবে। দুঃখের বিষয় হল, বেশিরভাগ মুসলিম পিতামাতা পরবর্তী প্রজন্মকে পার্থিব জ্ঞান শেখানোর জন্য অত্যন্ত আগ্রহী যা পার্থিব সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে কিন্তু তারা তাদের ধর্মীয় শিক্ষাকে অবহেলা করে এবং পরিবর্তে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা অন্যদের কাছে হস্তান্তর করে, যদিও তাদের সন্তানদের সরাসরি ইসলামের ভিত্তি শেখানো তাদের কর্তব্য। যদিও পরবর্তী প্রজন্মকে পার্থিব জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করা প্রশংসনীয়, তবুও পিতামাতাদের ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষাকে অবহেলা করা উচিত নয়। না বুঝে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শেখার জন্য শিশুদের মসজিদে পাঠানো যথেষ্ট নয়। একজন কিশোর-কিশোরীর উচিত প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলাম গ্রহণ করা, অন্ধ অনুকরণ নয়। অন্যথায় সময়ের সাথে সাথে তারা কেবল ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে কারণ তারা ইসলামকে সংস্কৃতির একটি অংশ হিসেবে দেখবে যা সময়ের সাথে সাথে পরিত্যাগ করা যেতে পারে। যখন কেউ প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলাম গ্রহণ করবে তখন তারা বুঝতে পারবে যে ইসলাম একটি জীবনধারা, যা প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে হবে এবং যখন তারা তাদের প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদ

ব্যবহার করবে তখনই তা প্রয়োগ করতে হবে। এটি কেবল তখনই সম্ভব যখন তাদের পরিবারের প্রবীণরা তাদের ইসলামের সত্যতার স্পষ্ট প্রমাণ এবং প্রমাণ শেখাবেন। এবং এটি কেবল তখনই সম্ভব যখন এই প্রবীণরা, যেমন বাবা-মা, নিজেরাই ইসলামী শিক্ষা শিখে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেবেন।

সকল যন্ত্রণা

যখন মহানবী (সাঃ) এর শেষ অসুস্থতা তীব্র আকার ধারণ করে, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাকে দেখতে যান এবং সান্ত্বনামূলক ভঙ্গিতে তাকে স্পর্শ করেন। তিনি অনুভব করেন এবং তারপর মন্তব্য করেন যে মহানবী (সাঃ) খুব তীব্র জ্বরে ভুগছেন। মহানবী (সাঃ) উত্তরে বলেন যে তার জ্বর অন্যান্য মানুষের জ্বরের দ্বিগুণ। আব্দুল্লাহ (রাঃ) উত্তরে বলেন যে, সেক্ষেত্রে তাকে তার দ্বিগুণ পুরষ্কার দেওয়া উচিত, যা রাসূল (সাঃ) একমত হয়েছেন। এরপর মহানবী (সাঃ) ঘোষণা করেন যে, অসুস্থতায় ভোগা প্রতিটি মুসলিমের পাপ তাদের থেকে এমনভাবে ঝরে যাবে যেমন গাছের পাতা ঝরে পড়ে। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবী (সাঃ) এর জীবনী", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৪০-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম বুখারীর "আদাবুল মুফরাদ", ৪৯২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম কোন ধরণের শারীরিক অসুবিধার সম্মুখীন হয় না, তা সে যত বড়ই হোক না কেন, যেমন কাঁটা বিঁধলে, অথবা মানসিক চাপের মতো কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় না, তবে আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে তাদের পাপ মোচন করে দেন।

এটি ছোট পাপের কথা বলে, কারণ বড় পাপের জন্য আন্তরিক অনুতাপ প্রয়োজন। এই পরিণতি তখনই ঘটে যখন একজন মুসলিম কঠিন পরিস্থিতির শুরু থেকে জীবনের শেষ অবধি ধৈর্য ধরে থাকে। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনেকেই বিশ্বাস করেন যে তারা প্রথমে অভিযোগ করতে পারেন এবং পরে ধৈর্য প্রদর্শন করতে পারেন। এটি প্রকৃত ধৈর্য নয়, বরং এটি কেবল গ্রহণযোগ্যতা, যা স্বাভাবিকভাবেই সময়ের সাথে সাথে ঘটে। সুনানে আন নাসায়ী, ১৮৭০ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে। এছাড়াও, সারা জীবন ধৈর্য প্রদর্শন

করা প্রয়োজন, কারণ একজন ব্যক্তি অধৈর্য দেখিয়ে তার সওয়াব নষ্ট করতে পারে।

একজন মুসলিমের মনে রাখা উচিত যে, এই ছোট ছোট পাপগুলো কিয়ামতের দিন পর্যন্ত পৌঁছানোর চেয়ে এই কষ্টের মধ্য দিয়ে মুছে ফেলা অনেক ভালো। একজন মুসলিমের উচিত তাদের ছোট ছোট পাপগুলো মুছে ফেলার জন্য ক্রমাগত অনুতপ্ত হওয়া এবং সৎকর্ম সম্পাদনের চেষ্টা করা। এবং যদি তারা কোনও শারীরিক বা মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাহলে তাদের ধৈর্য ধরে তাদের ছোট ছোট পাপগুলো মুছে ফেলার এবং অগণিত প্রতিদান পাওয়ার আশা করা উচিত। সূরা আয-যুমার, আয়াত ১০:

"...নিশ্চয়ই, ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান বিনা হিসাব [অর্থাৎ, সীমা] দেওয়া হবে।"

যে ব্যক্তি ধৈর্যের সাথে প্রতিটি কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, যার মধ্যে রয়েছে কথা বা কাজের মাধ্যমে অভিযোগ করা বা আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়া থেকে বিরত থাকা এবং তার আচরণে আন্তরিক অনুতাপ যোগ করা, তার ছোট এবং বড় উভয় পাপই মুছে ফেলা হবে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা অনুভব করা, আল্লাহ্‌র কাছে এবং যাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে তাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে, একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার আন্তরিক প্রতিশ্রুতি দেয় এবং এর মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ্‌র এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘিত যেকোনো অধিকারের ক্ষতিপূরণ।

যারা এইভাবে সমস্যার মুখোমুখি হয় এবং কৃতজ্ঞতার সাথে স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলি মোকাবেলা করে, যার অর্থ হল যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা, তারা উভয় জগতের প্রতিটি পরিস্থিতিতে শান্তি এবং সাফল্য পাবে। সূরা 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে কেউ সৎ কর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা

তাঁর শেষ অসুস্থতার সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছিলেন যে মৃত্যুর সময় কেবল মহান আল্লাহ সম্পর্কে ইতিবাচক চিন্তা করা উচিত। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৪১-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ৭৪০৫ নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ ঐশী হাদিসে, আল্লাহ তাআলা উপদেশ দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর বান্দার প্রতি তাদের ধারণা অনুসারে কাজ করেন এবং তাদের সাথে আচরণ করেন। এর অর্থ হল, যদি কোন মুসলিমের মনে ভালো চিন্তাভাবনা থাকে এবং তিনি মহান আল্লাহর কাছ থেকে ভালো আশা করেন, তাহলে তিনিও তাদের হতাশ করবেন না। একইভাবে, যদি কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তাভাবনা পোষণ করে, যেমন বিশ্বাস করে যে তাকে ক্ষমা করা হবে না, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার বিশ্বাস অনুসারে কাজ করতে পারেন।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই হাদিসে উল্লেখিত মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আশা এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা হলো যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্যে প্রচেষ্টা চালাতে ব্যর্থ হয়, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, যার ফলে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করে এবং তারপরও আশা করে যে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং উভয় জগতে তাদের রহমত দান করবেন। এটি প্রকৃত আশা নয়, এটি কেবল ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা। এটি এমন একজন কৃষকের মতো যে কোন বীজ বপন করতে ব্যর্থ হয়, তাদের ফসলে জল দিতে ব্যর্থ হয় এবং তবুও প্রচুর ফসল কাটার আশা করে। প্রকৃত আশা হলো যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করে এবং যখনই তারা ভুল করে, তখনই তারা

আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং তারপর মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করে। এটি এমন একজন কৃষকের মতো যে বীজ বপন করে, তাদের ফসলে জল দেয়, ফসল সুস্থ রাখার জন্য প্রচেষ্টা করে এবং তারপর একটি বড় ফসল কাটার আশা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই ব্যাখ্যাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের জীবদ্দশায় আল্লাহকে আরও বেশি ভয় করা, কারণ এটি পাপ থেকে বিরত রাখা যা আশার চেয়েও উত্তম, যা একজনকে সৎকর্ম করতে অনুপ্রাণিত করে, বিশেষ করে স্বেচ্ছামূলকভাবে। কিন্তু অসুস্থতা এবং অসুবিধার সময় এবং বিশেষ করে মৃত্যুর সময়, একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহর রহমতের উপর আশা করা ছাড়া আর কিছুই না, এমনকি যদি তারা তাদের জীবন তাঁর অবাধ্যতা করে কাটিয়ে থাকে, যেমনটি সহিহ মুসলিমের ২৮৭৭ নম্বর হাদিসে পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

সহজভাবে জীবনযাপন করা

তাঁর মৃত্যুর রাতে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাড়িতে লণ্ঠন জ্বালানোর জন্য কোন তেল ছিল না এবং ফলস্বরূপ তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে তাদের প্রতিবেশীর কাছ থেকে কিছু তেল ধার করতে হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরিবারের কাছে খাবার না থাকায়, তিনি তাঁর বর্মটি একজন ইহুদি ব্যক্তির কাছে সামান্য কিছু টাকার জন্য বন্ধক রেখেছিলেন। ইমাম সাফি উর রহমানের "দ্য সিলড নেকটার", পৃষ্ঠা ৪৭৭-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহের ৪১১৮ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পরামর্শ দিয়েছেন যে, সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

ইসলাম মুসলমানদের তাদের সমস্ত সম্পদ এবং বৈধ কামনা-বাসনা ত্যাগ করতে শেখায় না বরং তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে, যেমন খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান এবং ব্যবসা, একটি সরল জীবনধারা গ্রহণ করতে শেখায়, যাতে তারা পরকালের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য অবসর সময় পায়। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এই সরল জীবনের মধ্যে রয়েছে নিজের এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য এই পৃথিবীতে প্রচেষ্টা করা, অতিরিক্ত ব্যয়, অপচয় বা অপচয় ছাড়াই। একজন ব্যক্তি যত বেশি সরল জীবনের দিকে মনোনিবেশ করেন, ততই তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহ, মহিমান্বিতকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা সহজ হয়ে ওঠে। এর ফলে উভয় জগতেই শান্তি এবং সাফল্য আসে। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎ কর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

এছাড়াও, একজন মুসলিমের বুঝতে হবে যে তারা যত সহজ জীবনযাপন করবে, পার্থিব বিষয়বস্তুর উপর তাদের চাপ তত কম হবে এবং এর ফলে তারা পরকালের জন্য তত বেশি প্রচেষ্টা করতে পারবে, মানসিক, শারীরিক ও আত্মার শান্তি পাবে। কিন্তু একজন ব্যক্তির জীবন যত জটিল হবে, তত বেশি তারা চাপের সম্মুখীন হবে, অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং তাদের পরকালের জন্য কম প্রচেষ্টা করবে, কারণ পার্থিব বিষয়বস্তুর প্রতি তাদের ব্যস্ততা কখনোই শেষ হবে না বলে মনে হবে। এই মনোভাব তাদের মানসিক, শারীরিক ও আত্মার শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সরলতা এই পৃথিবীতে আরামের জীবন এবং বিচারের দিনে সরাসরি হিসাব-নিকাশের দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, একটি জটিল এবং আনন্দময় জীবন কেবল চাপপূর্ণ জীবন এবং বিচারের দিনে কঠোর এবং কঠিন হিসাব-নিকাশের দিকে পরিচালিত করবে। যে ব্যক্তি যত কঠোর হিসাব-নিকাশ করবে, তাকে তত বেশি শাস্তি দেওয়া হবে। সহিহ বুখারীতে প্রাপ্ত ১০৩ নম্বর হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে।

সৌন্দর্যায়ন

তাঁর শেষ মুহূর্তে, মহানবী (সা.) একটি সাধারণ ও মোটা ইয়েমেনী মোড়ক এবং উপরের পোশাক পরেছিলেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৪৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, ১৯৯৯ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সৌন্দর্য পছন্দ করেন।

ইসলাম একজন মুসলিমকে নিজেকে সুন্দর করার জন্য শক্তি, সময় এবং অর্থ ব্যয় করতে নিষেধ করে না, কারণ এটি তাদের শরীরের অধিকার পূরণের জন্য বিবেচিত হতে পারে। সহিহ বুখারির ৫১৯৯ নম্বর হাদিসে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে কাজ করা এবং অপছন্দনীয় বা এমনকি পাপপূর্ণ আচরণের মধ্যে পার্থক্য করার মূল বিষয় হল যখন কেউ নিজেকে সুন্দর করার সময় অতিরিক্ত, অপচয় বা অপচয় করে। এটি নির্ধারণ করার একটি ভাল উপায় হল নিজেকে সুন্দর করার ফলে কখনই আল্লাহ, মহান আল্লাহ, অথবা মানুষের প্রতি কর্তব্য পালনে অবহেলা করা উচিত নয়, যা ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল না করে পূরণ করা সম্ভব নয়। নিজেকে সুন্দর করার ফলে তাদেরকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি আল্লাহ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখা উচিত নয়। এবং বাস্তবে নিজের শারীরিক চেহারা সংশোধন করা যাতে তারা পরিষ্কার এবং স্মার্ট দেখায় ব্যয়বহুল নয় এবং এতে খুব বেশি সময় বা প্রচেষ্টা লাগে না।

এই সৌন্দর্যবর্ধক মনোভাব সকল জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন নিজের ঘর। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ অপচয় ও অপচয় এড়িয়ে চলে এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের জন্য পরিমিতভাবে আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করতে স্বাধীন।

অধিকন্তু, এটা বোঝা আরও গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ তাআলা যে প্রকৃত সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন তা অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের সাথে সম্পর্কিত, অর্থাৎ চরিত্রের সাথে। এই সৌন্দর্য উভয় জগতেই স্থায়ী হবে, অন্যদিকে সময়ের সাথে সাথে বাহ্যিক সৌন্দর্য অবশেষে ম্লান হয়ে যাবে। অতএব, বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে এই প্রকৃত সৌন্দর্য অর্জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করে যাতে তারা তাদের চরিত্র থেকে হিংসার মতো যেকোনো খারাপ বৈশিষ্ট্য দূর করে এবং উদারতার মতো ভালো বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। এটি মহান আল্লাহর অধিকার পূরণে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয় এবং মানুষের অধিকার পূরণে সহায়তা করে, যার মধ্যে রয়েছে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যা মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক বলে আশা করে।

ঐশ্বরিক প্রেম

তাঁর শেষ মুহূর্তগুলিতে, ফেরেশতা জিবরাঈল (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আসেন এবং বাইরে অপেক্ষারত মৃত্যুদূতকে অনুমতি দিতে বলেন। তিনি মন্তব্য করেন যে মৃত্যুর ফেরেশতা এর আগে কখনও কারও ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাননি এবং পরেও চাইবেন না। নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে অনুমতি দিয়েছেন। মৃত্যুর ফেরেশতা মন্তব্য করেন যে, মহান আল্লাহ তাকে নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য করতে আদেশ করেছেন। মৃত্যুর ফেরেশতা এরপর নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে একটি বিকল্প প্রস্তাব দেন, হয় তাকে তার আত্মা হরণ করতে দিন, অথবা তিনি যদি আদেশ করেন তবে তাকে ছেড়ে দেবেন। নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফেরেশতা জিবরাঈলের দিকে তাকান, যিনি মন্তব্য করেন যে, আল্লাহ তাঁর সাথে দেখা করার জন্য আকুল। এরপর নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুদূতকে এগিয়ে গিয়ে তার আত্মা হরণ করতে বলেন। ইবনে কাথিরের "প্রভুর জীবন" বইয়ের ৪র্থ খণ্ডের ৩৯৪-৩৯৫ পৃষ্ঠায় এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের কারণে মহান আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন।

সহীহ মুসলিমের ৭৪৩২ নম্বর হাদিসে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা সেই বান্দাকে ভালোবাসেন যার মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো তাকওয়া। এর অর্থ হলো, তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালনের জন্য তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে। তারা মানুষের

প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে, যেমন এই পৃথিবীতে তাদের এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য প্রচেষ্টা করা, অপচয়, অতিরিক্ত ব্যয় বা অপচয় ছাড়াই। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যা মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত করে, যা উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। সুরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎ কর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

আলোচ্য মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল সৃষ্টি থেকে স্বাধীন থাকা। এর অর্থ হল, একজন মুসলিমের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত উপায়, যেমন শারীরিক শক্তি, সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করা উচিত। তাদের অলস আচরণ করা উচিত নয় এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে মানুষের কাছ থেকে জিনিস চাওয়া উচিত নয়, কারণ এই অভ্যাস তাদের উপর নির্ভরশীলতার দিকে পরিচালিত করে এবং এটি আল্লাহর উপর আস্থা হ্রাস করে। একজন ব্যক্তির দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে যাই ঘটুক না কেন, তাদের জন্য যা কিছু নির্ধারিত ছিল তা আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন মুসলিমের উচিত তাদের সম্পদ, যেমন তাদের শারীরিক শক্তি, ব্যবহারের উপর মনোনিবেশ করা এবং বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা দান করবেন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, কেউ যখন বিশ্বাস করে যে একজন ব্যক্তি, যেমন একজন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষক, তাদের প্রার্থনা এবং সুপারিশের মাধ্যমে উভয় জগতে সাফল্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবেন, তখন অন্যদের উপর ভুলভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে। এই মনোভাব কেবল অলসতাকেই উৎসাহিত করে, কারণ কেউ বিশ্বাস করে যে তারা তাদের ইচ্ছামত আচরণ করতে স্বাধীন এবং তাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষকের মাধ্যমে

উভয় জগতেই সাফল্য অর্জন করবে। একজন মুসলিমকে এই বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবর্তে সাহাবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে , যারা মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহচর্য পেয়েছিলেন, তবুও মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের জন্য আন্তরিকভাবে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি তাঁর পছন্দনীয় উপায়ে ব্যবহার করে। এটিই সঠিক মনোভাব যা গ্রহণ করা উচিত।

আলোচ্য মূল হাদিসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য হল গোপন থাকা। এর অর্থ হল একজন মুসলিমের খ্যাতি বা খ্যাতি অর্জনের জন্য পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে প্রচেষ্টা করা উচিত নয়। এই মনোভাব অনেক পাপের দিকে পরিচালিত করতে পারে, যেমন লোক দেখানো, যা ব্যক্তির সওয়াব নষ্ট করে। এই কারণেই জামে আত তিরমিযী, ২৩৭৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, খ্যাতি অর্জন করা তার ধর্মের জন্য ভেড়ার পালের উপর ছেড়ে দেওয়া দুটি নেকড়ের চেয়েও বেশি ধ্বংসাত্মক। পরিবর্তে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের কর্তব্য পালনের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং যদি তারা খ্যাতি অর্জন করে, তবে তাদের অবশ্যই মানুষকে খুশি করার জন্য তাঁর প্রতি তাদের আনুগত্য পরিবর্তন না করে, কারণ এটি উভয় জগতেই ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে।

চূড়ান্ত পরামর্শ

শেষ কথা – ১

মহানবী (সাঃ) এর কিছু শেষ কথা ছিল, যার মধ্যে কর্তৃত্বাধীন ব্যক্তিদের সাথে, যেমন দাসদের সাথে, ভালো আচরণ করার গুরুত্ব সম্পর্কে। সুনানে ইবনে মাজাহ, ২৬৯৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ৭৩৭৬ নম্বর হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে বলেছেন যে, যে অন্যদের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন না।

ইসলাম খুবই সহজ একটি ধর্ম। এর মৌলিক শিক্ষাগুলির মধ্যে একটি হল, মানুষ অন্যদের সাথে কেমন আচরণ করে, তা হলো মহান আল্লাহ তাদের সাথে কেমন আচরণ করবেন। উদাহরণস্বরূপ, যারা অন্যদের ভুল উপেক্ষা করতে এবং ক্ষমা করতে শেখে, তারা মহান আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। অধ্যায় ২৪ আন নূর, আয়াত ২২:

"...এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন..."

যারা অন্যদের পার্থিব ও ধর্মীয় উপকারে যেমন মানসিক বা আর্থিক সাহায্যে সাহায্য করে, তাদের উভয় জগতেই মহান আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করবেন। সুনানে আবু দাউদের ৪৮৯৩ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একই হাদিসে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্যদের দোষ-ত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ তায়ালা তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।

সহজ কথায়, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, যদি কেউ অন্যদের সাথে সদয় ও শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করে, তাহলে মহান আল্লাহ তাদের সাথেও একই আচরণ করবেন। আর যারা অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তাদের সাথেও একই আচরণ করবেন, এমনকি যদি তারা তাঁর সাথে সম্পর্কিত ফরজ কর্তব্য, যেমন ফরজ নামাজ, পালন করে। কারণ একজন মুসলিমকে সাফল্য অর্জনের জন্য উভয় কর্তব্যই পালন করতে হবে, যথা: আল্লাহ, মহিমান্বিত, এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য।

ঐশ্বরিক করুণা অর্জনের একটি সহজ উপায় হল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যা মানুষ তার সাথে আচরণ করতে চায়। এটি সকল মানুষের জন্য সত্য, তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে, এবং প্রকৃতপক্ষে সমস্ত প্রাণীর জন্য প্রযোজ্য।

পরিশেষে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিম যদি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করে, তবেই কেবল আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সদয় আচরণ করবেন। যদি তারা অন্য কোনও কারণে তা করে, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা এই শিক্ষায় উল্লিখিত সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। সকল কর্মের এবং ইসলামের ভিত্তি হলো ব্যক্তির নিয়ত। সহীহ বুখারী, ১ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

শেষ কথা – ২

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কিছু শেষ কথা ছিল ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে। সুনান ইবনে মাজাহ, ২৬৯৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি যতগুলো বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারতেন, তার মধ্যে তিনি ফরজ নামাজের কথা উল্লেখ করার সিদ্ধান্ত নেন। কেবল এই বাধাই ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বোঝাতে সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, ২৬১৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, নামাজ হল এমন একটি জিনিস যা কুফরকে ঈমান থেকে আলাদা করে। মুসলমানরা মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে বিচ্ছিন্ন বোধ করে, যদিও তারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তাঁকে ডাকে। কিন্তু যেহেতু তাদের অধিকাংশই তাদের ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই তারা মহান আল্লাহর রহমত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মুসলমানদের বুঝতে হবে যে ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠা করা হল প্রথম বাধা যা তাদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করে। তাদের পরিচিত লোকদের সম্পর্কে চিন্তা করা প্রয়োজন যারা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের পথভ্রষ্টতার প্রথম ধাপ ছিল ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার অর্থ, তাদের শিষ্টাচার এবং শর্ত অনুসারে তা পালন না করা। যখন এই বাধা ধ্বংস হয়ে যায় তখন পথভ্রষ্টতা এবং বড় পাপ করা সহজ হয়ে যায়। অধ্যায় ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত ৪৫:

"...প্রকৃতপক্ষে, নামাজ অশ্লীলতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

অতএব, মুসলমানদের উচিত নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শেষ বাণী অনুসারে কাজ করা, তাদের ফরজ নামাজ সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের, যেমন তাদের সন্তানদের, একই কাজ করতে উৎসাহিত করা। তাদের উপর ফরজ নামাজ ফরজ হওয়ার আগেই তাদের উৎসাহিত করা উত্তম, যাতে তারা এই বয়সে পৌঁছানোর আগেই এতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। সুনানে আবু দাউদের ৪৯৫ নম্বর হাদিসে এটি নির্দেশিত হয়েছে।

এই কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে মুসলমানদের অযৌক্তিক অজুহাত দেখানো উচিত নয় কারণ মহান আল্লাহ কাউকে এমন দায়িত্ব দেন না যা তারা পালন করতে পারে না। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২৮৬:

"আল্লাহ কোন আত্মার উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন বোঝা চাপান না..."

অধিকন্তু, ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠার অর্থ কেবল সেগুলো আদায় করা নয়, বরং সময়ানুবর্তিতা সহ যথাযথ শর্তাবলী এবং শিষ্টাচার অনুসারে তা করা। পবিত্র কুরআন জুড়ে এই নামাজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, কারণ এগুলি মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ হিসেবে কাজ করে। অধিকন্তু, দিনের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত দৈনিক নামাজগুলি মানুষকে ক্রমাগত বিচার দিবসের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং এর জন্য কার্যত প্রস্তুতি নেয়। ফরজ নামাজের প্রতিটি পদক্ষেপ বিচার দিবসের বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; উদাহরণস্বরূপ, নামাজে দাঁড়ানোর পদ্ধতি প্রতিফলিত করে যে তারা সেই গুরুত্বপূর্ণ দিনে মহান আল্লাহর সামনে কীভাবে দাঁড়াবে। সূরা ৮৩ আল মুতাফিফিন, আয়াত ৪-৬:

" তারা কি ভাবে না যে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে? এক মহাদিনের জন্য, যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে?"

যখন তারা নামাযে রুকু করে, তখন এটি তাদের মর্মস্পর্শী স্মরণ করিয়ে দেয় যারা পৃথিবীতে তাদের জীবন জুড়ে মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য বিচারের দিনে সমালোচনার মুখোমুখি হবে। সূরা ৭৭ আল মুরসালাত, আয়াত ৪৮:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'নামাজে রুকু করো', তখন তারা রুকু করে না।"

নামাজের সময়, যখন কেউ সিজদায় অবনত হয়, তখন তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে বিচারের দিনে যখন সকলকে মহান আল্লাহর সামনে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে। তবে, যারা তাদের জীবন জুড়ে - প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাঁর আদেশ মেনে চলার মাধ্যমে - সত্যিকার অর্থে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তারা সেই দিন তা করতে অক্ষম হবে। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 42-43:

"যেদিন পরিস্থিতি কঠিন হবে, সেদিন তাদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের চোখ অবনত হবে, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। আর তাদেরকে সুস্থ অবস্থায় সিজদা করার জন্য ডাকা হত।"

যখন কেউ নামাজে হাঁটু গেড়ে বসে, তখন এটি একটি মর্মস্পর্শী স্মারক হিসেবে কাজ করে যে, কেয়ামতের দিন তারা কীভাবে মহান আল্লাহর সামনে অবস্থান করবে, তাদের চূড়ান্ত পরিণতির কথা ভেবে কাঁপবে। সূরা ৪৫ আল জাসিয়াহ, আয়াত ২৮:

"আর তুমি প্রত্যেক জাতিকে [ভয়ে] নতজানু দেখবে। প্রত্যেক জাতিকে তার আমলনামার দিকে ডাকা হবে [এবং বলা হবে], "আজ তোমাদেরকে তোমাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।"

এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে চিন্তাভাবনা করে নামাজ আদায় করলে, মানুষ সঠিকভাবে নামাজ আদায় করতে পারবে। এর ফলে নামাজের মধ্যবর্তী মুহূর্তগুলোতে মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আনুগত্যের জন্ম হবে। সূরা ২৯, আল আনকাবুত, আয়াত ৪৫:

"...প্রকৃতপক্ষে, নামাজ অশ্লীলতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা, যা তাঁর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যু

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি ভক্তি

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরতের পর এগারো বছরে তাঁর শেষ অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে। অসুস্থতার আগে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একবার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, জান্নাতে তাঁর সমাধিস্থল না দেখা পর্যন্ত এবং জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার জন্য বলা না হওয়া পর্যন্ত কোনও নবীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না। সহীহ বুখারী, ৪৪২৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে বহু বছর আগে খায়বারে তাঁকে যে বিষ দেওয়া হয়েছিল তা তাঁকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল এবং অনুভব করছিল যে তিনি তা থেকে মারা যাবেন। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, মহান আল্লাহ তাঁকে শাহাদাতের সম্মান দান করেছিলেন।

তাঁর শেষ মুহূর্তে, তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলেছিলেন এবং সর্বোচ্চ সাহাবীর সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, অর্থাৎ মহান আল্লাহর কাছে। তিনি যখন ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৪৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তাআলা মহান নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ক্ষণস্থায়ী আবাসস্থল থেকে চিরস্থায়ী আরামে এক উচ্চ স্থানে, জান্নাতের সবচেয়ে উচ্চ ও মহিমান্বিত স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৭৯:

"... আশা করা যায় যে তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে পুনরুত্থিত করবেন।"

এবং অধ্যায় 93 আদ দুহা, আয়াত 4-5:

" আর পরকাল তোমার জন্য প্রথম [জীবন] অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার প্রভু তোমাকে দান করবেন, আর তুমি সন্তুষ্ট হবে।"

এটা ছিল তাঁর সেই মিশন সম্পন্ন করার পর যা আল্লাহ তাঁকে অর্পণ করেছিলেন। তিনি তাঁর জাতিকে আন্তরিক উপদেশ দিয়েছিলেন এবং উভয় জাহানের কল্যাণের দিকে পরিচালিত করেছিলেন। তিনি তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন এবং তাদেরকে এমন কিছু থেকে বিরত রেখেছিলেন যা তাদের পৃথিবীতে এবং আখেরাতে ক্ষতি করতে পারত। আল্লাহর শেষ রাসূল, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। তাঁর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

একটি ইতিবাচক মনোভাব

যেদিন মহানবী (সাঃ) ইন্তেকাল করেন, সেদিন সবকিছু অন্ধকার হয়ে যায়। এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি সত্ত্বেও, মহানবী (সাঃ) একবার এক দুর্যোগে জর্জরিত মুসলমানদের তাঁকে হারানোর দুর্দশা স্মরণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন কারণ এটি ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুর্দশা। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "প্রভুর (সাঃ) নোবেল লাইফ", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯৮৫- এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য ইতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি তাদের অসুবিধা মোকাবেলায় সাহায্য করার একটি দুর্দান্ত হাতিয়ার যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে পারে। যখনই কোনও ব্যক্তি সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তাদের সর্বদা একটি সত্য বুঝতে হবে যে অসুবিধাটি আরও খারাপ হতে পারত। যদি এটি একটি পার্থিব সমস্যা হত তবে তাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে এটি তাদের ঈমানকে প্রভাবিত করে এমন কোনও দুর্দশা ছিল না। অসুবিধার সাথে আসা তাৎক্ষণিক দুঃখের উপর চিন্তা করার পরিবর্তে, তাদের শেষ এবং সেই পুরস্কারের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য প্রদর্শনকারীদের জন্য অপেক্ষা করছে। যখন কোনও ব্যক্তি কিছু আশীর্বাদ হারায় তখন তাদের এখনও থাকা অগণিত আশীর্বাদগুলি স্মরণ করা উচিত। প্রতিটি আশীর্বাদের মধ্যে, একজন মুসলিমের পবিত্র কুরআনের আয়াতটি মনে রাখা উচিত যা মুসলমানদের মনে করিয়ে দেয় যে এমন অনেক গোপন জ্ঞান রয়েছে যা তারা পর্যবেক্ষণ করেনি এমন অসুবিধা এবং পরীক্ষাগুলির মধ্যে। অতএব, তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে তা তাদের কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির চেয়ে ভাল। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

পরিশেষে, একজন মুসলিমের উচিত এই তথ্য এবং অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করা যাতে তারা একটি ইতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করতে পারে যা এমনভাবে অসুবিধা মোকাবেলার একটি মূল উপাদান যা উভয় জগতেই অসংখ্য আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। মনে রাখবেন, পেয়ালাটি অর্ধেক খালি নয় বরং অর্ধেক পূর্ণ।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর আবু বকর (রাঃ) এর ভাষণ

বাধ্য থাকা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর মদীনার লোকেরা প্রচণ্ড উদ্বেগ ও বিভ্রান্তিতে পড়ে গেল। তীব্র শোকের কারণে, প্রতিটি ব্যক্তি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল। উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) প্রথমে তা বিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-ও মহান আল্লাহর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং ফিরে আসবেন, ঠিক যেমন হযরত মুসা (সাঃ)-এর আল্লাহর সাথে একটি নিয়োগ ছিল এবং ফলস্বরূপ চল্লিশ দিনের জন্য তাঁর লোকদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন মসজিদে পৌছালেন, তখন তিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মসজিদে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি সূরা আলে ইমরানের ৩ নং আয়াত ১৪৪ তেলাওয়াত করলেন:

"মুহাম্মদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর পূর্বেও [অন্যান্য] রাসূল গত হয়েছেন। যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা তোমাদের পায়ের পাতায় ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পায়ের পাতায় ফিরে যায় সে কখনও আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না; তবে আল্লাহ কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।"

তারপর বললেন: “মহান আল্লাহ, মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে জীবিত করেছেন, তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক, এবং তাঁকে জীবিত রেখেছেন যতক্ষণ না তিনি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেন, আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে স্পষ্ট করে তোলেন, তাঁর বার্তা পৌঁছে দেন এবং তাঁর পথে লড়াই করেন। এরপর আল্লাহ, মহান তাকে নিজের কাছে নিয়ে যান এবং তোমাদেরকে পথে রেখে যান। আর কেউ ধ্বংস হবে না, কেবল স্পষ্ট নিদর্শন এবং যন্ত্রণার পরে। যাদের পালনকর্তা আল্লাহ, মহান, তাদের জানা উচিত যে, আল্লাহ, মহান জীবিত এবং কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না। এবং যারা মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপাসনা করতেন, তাদের জানা উচিত যে, তিনি মারা গেছেন। আল্লাহ, মহান মানুষকে ভয় করো! তোমাদের ধর্মকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং তোমাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করো। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর বাণী পূর্ণ। আল্লাহ, মহান তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সমর্থন করে এবং তাঁর দ্বীনকে সম্মান করে। আল্লাহর কিতাব আমাদের মধ্যে রয়েছে। এটি উভয়ই আলো এবং নিরাময়। এর মাধ্যমে , মহান আল্লাহ, মহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে পথ দেখিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ কোনটি হালাল এবং কোনটি হারাম তা আমরা বিবেচনা করব না। সৃষ্টির মধ্যে কে আমাদের উপর অবতীর্ণ হয় (অর্থাৎ আমাদের আক্রমণ করার জন্য) তা আমাদের পরোয়া করবে না। যারা আমাদের বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধে আমরা তীব্র লড়াই করব ঠিক যেমন আমরা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে লড়াই করেছি। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৪৮-৩৪৯-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বকর (রাঃ) যখন লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, তখন তারা সকলেই সত্য গ্রহণ করল। উমর (রাঃ) মাথা ঘোরা অনুভব করলেন এবং মাটিতে পড়ে গেলেন এবং অবশেষে মেনে নিলেন যে মহানবী (সাঃ) আসলেই মারা গেছেন। ইমাম ইবনে কাসিরের "প্রভুর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৪৮-৩৪৯ এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর "উমর ইবনে আল খাত্তাব, তাঁর জীবন ও সময়", খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪১-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বকর (রাঃ) - প্রথম খলিফা

সত্যকে সমর্থন করা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর মদীনার লোকেরা চরম উদ্বেগ ও বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। এই সময়ে, সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, সর্বসম্মতিক্রমে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কে ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করার ব্যাপারে একমত হন। সহীহ বুখারী, ৩৬৬৭ এবং ৩৬৬৮ নম্বরে প্রাপ্ত হাদিসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনা থেকে শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল ভালো কাজে অন্যদের সমর্থন করার গুরুত্ব। এই ঘটনা এবং অন্যান্য হাদিস থেকে স্পষ্ট যে, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) জনগণকে অন্য কাউকে তাদের খলিফা হিসেবে বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এমনকি তিনি উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর নামও রেখেছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন। এটি ছিল উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর জন্য মহানবী (সাঃ)-এর প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের জন্য, কোনও তর্ক বা সমস্যা ছাড়াই, উপযুক্ত সুযোগ। কিন্তু উমর (রাঃ) সঠিক কাজটি করার এবং মুসলিম জাতিকে এই ভূমিকার জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তিকে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি এই বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন না যে তিনি যদি অন্য কাউকে সমর্থন করেন তবে তার পদমর্যাদা এবং সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পাবে অথবা তাকে ভুলে যাবে। প্রকৃতপক্ষে, এই সঠিক সিদ্ধান্তের পরেই তার সম্মান এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম এবং এমনকি ইসলামী প্রতিষ্ঠানও এইভাবে আচরণ করে না। তারা প্রায়শই কেবল তাদের সাথেই সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের সমর্থন করে, যারা ভালো কিছু করে তাদের সাহায্য করে না। তারা এমন আচরণ করে যেন অন্যদের ভালো কাজে সহায়তা করলে তাদের সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পাবে। কেউ কেউ আরও নিচে নেমে গেছে এবং খারাপ কাজে তাদের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের সমর্থন করে এবং ভালো কাজ করা অপরিচিতদের সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে ইসলামী সম্প্রদায় দুর্বল হয়ে পড়ার এটি একটি প্রধান কারণ। সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, সংখ্যায় কম ছিলেন কিন্তু অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা না করে সর্বদা ভালোর ক্ষেত্রে একে অপরকে সমর্থন করে তাদের কর্তব্য পালন করেছিলেন। মুসলিমদের উভয় জগতে শক্তি এবং সম্মান চাইলে তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। অধ্যায় ৫ আল মায়িদা, আয়াত ২:

"...এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

তাছাড়া, যদিও এটা স্পষ্ট ছিল যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন মহানবী (সাঃ) এর পছন্দের পছন্দ, তবুও তিনি তাকে স্পষ্টভাবে মনোনীত করেননি। এর একটি কারণ হলো, মহানবী (সাঃ) এর মৃত্যু এবং একজন নতুন নেতা মনোনীত করা ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, নেতৃত্বের জন্য তর্ক করবেন কিনা এবং লড়াই করবেন কিনা, নাকি মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে আত্মসমর্পণ করবেন এবং এই ভূমিকার জন্য সেরা ব্যক্তিকে মনোনীত করবেন কিনা তা দেখার জন্য এটি একটি পরীক্ষা। ইতিহাস স্পষ্টভাবে দেখায় যে, তারা এই পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। অতএব, এটি তাদের জন্য একটি পরীক্ষা ছিল এবং ভবিষ্যতের মুসলমানদের জন্য একটি শিক্ষা ছিল যে তারা সর্বদা অন্যদেরকে ভালো কাজে সাহায্য করার জন্য চেষ্টা করবেন।

অধিকন্তু, যদি তিনি মহানবী (সাঃ) কর্তৃক স্পষ্টভাবে নিযুক্ত হতেন, তাহলে ভবিষ্যতে কিছু লোক দাবি করত যে সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, কখনও তাঁর নিযুক্তিতে সর্বসম্মতভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং তারা কেবল এটি গ্রহণ করেছিলেন কারণ তাদের তা করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। অতএব, একটি স্পষ্ট আদেশ এড়িয়ে চলা এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে প্রতিরোধ করেছিল কারণ সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, তাদের নেতা নির্বাচন করার জন্য অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতের অধীনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল যে আবু বকর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন, ইসলামের প্রথম খলিফা হবেন। এটি আবু বকর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন, খলিফা হিসাবে তার অধিকারকে আরও বৃদ্ধি করে, যেমনটি তিনি পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্দেশিত হয়েছিলেন এবং সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, স্বাধীনভাবে নিযুক্ত করেছিলেন।

নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর দাফন

মহানবী (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর, সাহাবীগণ (রাঃ) তাকে কোথায় দাফন করবেন তা নিয়ে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেছিলেন। কেউ কেউ মদিনায় তাঁর মসজিদের পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং কেউ কেউ মদিনায় প্রধান কবরস্থানের পরামর্শ দিয়েছিলেন। আবু বকর (রাঃ) তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এই ঘোষণা দিয়ে যে তিনি মহানবী (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন যে, নবীগণ (সাঃ) যে স্থানে মৃত্যুবরণ করেছেন, সেখানেই তাদের দাফন করা হয়েছে। সাহাবীগণ (রাঃ) এটি গ্রহণ করেছিলেন এবং মহানবী (সাঃ) কে তাঁর মৃত্যুস্থলে দাফন করা হয়েছিল: তাঁর স্ত্রী, মুমিনদের মা আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহ। সুনান ইবনে মাজাহ, ১৬২৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কবর জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত। অতএব, কবরে নামার সময় তাদের জান্নাতের উদ্যানে রাখা হবে নাকি জাহান্নামের গর্তে, তা নিয়ে চিন্তা করা উচিত এবং তাই তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করা উচিত।

জামে আত তিরমিযী, ২৪৬০ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে, একটি কবর হয় জান্নাতের বাগান অথবা জাহান্নামের গর্ত। এই হাদিসটি আরও ব্যাখ্যা করে যে, যখন একজন সফল মুমিনকে তার কবরে রাখা হয় তখন তা তাদের জন্য প্রশস্ত এবং আরামদায়ক হয়ে ওঠে, অন্যদিকে, একজন পাপী ব্যক্তির কবর তাদের জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, বাস্তবে, প্রতিটি ব্যক্তি যখন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় তখন তাদের কর্মের আকারে জান্নাতের বাগান অথবা জাহান্নামের গর্ত তাদের সাথে নিয়ে যায়। যদি কোন মুসলিম মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, তাহলে এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের কবরকে জান্নাতের বাগানে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ামতগুলি প্রস্তুত করবে। কিন্তু যদি তারা তাদের প্রদত্ত নিয়ামতগুলির অপব্যবহার করে আল্লাহকে অমান্য করে, তাহলে তাদের পাপগুলি জাহান্নামের গর্ত তৈরি করবে যেখানে তারা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

অতএব, মুসলমানদের আজই কাজ করা উচিত এবং এই প্রস্তুতিতে বিলম্ব করা উচিত নয় কারণ মৃত্যুর সময় অজানা এবং প্রায়শই হঠাৎ করেই আসে। আগামীকালকে কেউ দেখতে না পারায় বিলম্ব করা বোকামি এবং এটি কেবল অনুশোচনার দিকে পরিচালিত করে। যেভাবে একজন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তার ঘরকে সুন্দর করার জন্য প্রচুর শক্তি এবং সময় ব্যয় করে, যে বাড়িতে সে কেবল অল্প সময়ের জন্য থাকবে, তাকে তার কবরকে সুন্দর করার জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, কারণ সেখানে যাত্রা অনিবার্য এবং সেখানে দীর্ঘ সময় কাটাতে হবে। এবং যদি কেউ তার কবরে কষ্ট পায় তবে পরবর্তী ঘটনাগুলি আরও খারাপ হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪২৬৭ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। কেউ কখনই ভুলে যাবে না যে মানুষ এবং পার্থিব জিনিসপত্র, যেমন তাদের ব্যবসা, যার জন্য তারা তাদের বেশিরভাগ শক্তি উৎসর্গ করে, তারা তাদের কবরে পৌঁছানোর সময় তাদের পরিত্যাগ করবে। কেবল তাদের আমলই তাদের সাথে থাকবে, সেই একই আমল যা নির্ধারণ করবে যে তারা জান্নাতের বাগানে থাকবে নাকি জাহান্নামের গর্তে।

পরিশেষে, একজন ব্যক্তিকে এই ভেবে বোকা বানানো উচিত নয় যে তার ঈমান তার জান্নাতের বাগান নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট। ঈমান হল একটি অভ্যন্তরীণ

অবস্থা যা তার কর্মের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে প্রতিফলিত হতে হবে। অন্তরের মধ্যে যা আছে তা জানেন এমনটাই তিনি আদেশ করেছেন। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়... আমরা অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব [পরকালে]।"

আর সত্য হলো, বিশ্বাস যেমন একটি গাছের মতো, তেমনি সৎকর্মের মাধ্যমে এটিকে জলসেচন এবং পুষ্ট করতে হবে। যদি কেউ তাদের বিশ্বাসের চারাটিকে লালন-পালন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা দেখতে পাবে যে তাদের কবরে পৌঁছানোর আগেই এটি শুকিয়ে যাবে।

ঐক্য

ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে নিযুক্ত হওয়ার পর, আবু বকর (রাঃ) পদত্যাগ করার চেষ্টা করেছিলেন কারণ তাঁর নেতৃত্বের কোনও ইচ্ছা ছিল না। তিনি প্রকাশ্যে এই আবেদন করেছিলেন এবং আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) এগিয়ে এসে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে কেউ তাঁর পদত্যাগ চান না এবং তারা তাঁর পদত্যাগ গ্রহণ করবেন না। তিনি পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন যে কীভাবে মহানবী (সাঃ) তাঁকে সকল পরিস্থিতিতে, যেমন মহানবী (সাঃ) এর শেষ অসুস্থতার সময় জামাতের নামাজের ইমামতিতে, সকলের চেয়ে এগিয়ে রেখেছিলেন। এটি অনেক হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, যেমন সহীহ বুখারী, ৬৮২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস। সমস্ত সাহাবী আলীর সাথে একমত হয়েছিলেন এবং আবু বকর (রাঃ) কে তাদের ইমামতি করার জন্য জোর দিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী (রাঃ) এর "আবু বকর আস সিদ্দীকের জীবনী", পৃষ্ঠা ২১২-তে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

বহু বছর পর, তাঁর খিলাফতের সময়, আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) বলতেন যে, মহানবী (সাঃ) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শেষ অসুস্থতার সময় জামাতে নামাজের ইমামতি করে সকলের ধর্মের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আবু বকর (রাঃ) কে মনোনীত করে সন্তুষ্ট ছিলেন, এবং তাই সমস্ত সাহাবী (রাঃ) তাদের পার্থিব বিষয়গুলিতেও তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। ইমাম সুয়ূতীর "তারিখ আল খুলাফা", পৃষ্ঠা ৫-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, এভাবেই আচরণ করেছিলেন যেমনটি তাদেরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক কল্যাণের বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। মুসলমানদের অবশ্যই এই

শিক্ষাগুলি গ্রহণ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে যাতে তারাও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির বিষয়গুলিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪১ নম্বর হাদিসে সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রথমে মুসলমানদের একে অপরকে হিংসা না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

যখন একজন ব্যক্তি অন্য কারোর অর্থপূর্ণ আশীর্বাদ পেতে চায়, তখন সে চায় মালিক যেন সেই আশীর্বাদ হারিয়ে ফেলুক। এবং এর সাথে এই বিষয়টিও জড়িত যে, মালিককে তার পরিবর্তে মহান আল্লাহ তাআলা আশীর্বাদ দিয়েছেন। কেউ কেউ কেবল এটি তাদের হৃদয়ে প্রকাশ করতে চান, তাদের কর্ম বা কথার মাধ্যমে তা প্রকাশ না করে। যদি তারা তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি অপছন্দ করে, তাহলে আশা করা যায় যে তাদের হিংসার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। কেউ কেউ তাদের কথা এবং কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে আশীর্বাদ কেড়ে নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, যা নিঃসন্দেহে একটি পাপ। সবচেয়ে খারাপ ধরণ হল যখন একজন ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, এমনকি ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি আশীর্বাদ না পেলেও।

হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তার অনুভূতির উপর নির্ভর করে না, তার অনুভূতি অপছন্দ করে এবং পরিবর্তে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে যাতে মালিক তার আশীর্বাদ হারাতে না পারে। যদিও এই ধরণের হিংসা পাপ নয় তবুও এটি অপছন্দনীয় যদি হিংসা পার্থিব আশীর্বাদের উপর হয় এবং কেবল ধর্মীয় আশীর্বাদের সাথে জড়িত থাকলে প্রশংসনীয় হয়। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিমের ১৮৯৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল যখন একজন ব্যক্তি এমন ব্যক্তির প্রতি হিংসা করে যে হালাল সম্পদ অর্জন করে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য

ব্যয় করে। দ্বিতীয়টি হল যখন একজন ব্যক্তি এমন ব্যক্তির প্রতি হিংসা করে যে তার জ্ঞান এবং জ্ঞানকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করে এবং অন্যদের তা শিক্ষা দেয়।

পূর্বে উল্লেখিত খারাপ ধরণের হিংসা, সরাসরি আল্লাহর পছন্দকে চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন আল্লাহ, তার পরিবর্তে অন্য কাউকে একটি বিশেষ আশীর্বাদ প্রদান করে ভুল করেছেন। এই কারণেই এটি একটি মহাপাপ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক সতর্ক করা হয়েছে যে, সুনানে আবু দাউদের ৪৯০৩ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, হিংসা নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয় ঠিক যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

একজন ঈর্ষাপরায়ণ মুসলিমকে জামে আত তিরমিযী, ২৫১৫ নম্বরে বর্ণিত হাদিসের উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি পরামর্শ দেয় যে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অন্যদের জন্য তাই ভালোবাসে। তাই একজন ঈর্ষাপরায়ণ মুসলিমের উচিত, ঈর্ষা করা ব্যক্তির প্রতি ভালো চরিত্র এবং দয়া প্রদর্শন করে তার হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তার ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তার জন্য প্রার্থনা করা যতক্ষণ না তার ঈর্ষা তার জন্য ভালোবাসায় পরিণত হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, তাদের ঈর্ষা করা ব্যক্তির অধিকার পূরণ করা চালিয়ে যাওয়া উচিত। তাদের ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করা উচিত যাতে তারা বুঝতে পারে যে, মহান আল্লাহ প্রতিটি ব্যক্তিকে সর্বোত্তম জিনিস দান করেন এবং যদি তাদের কোন বিশেষ পার্থিব নিয়ামত না দেওয়া হয়, তাহলে এর অর্থ হল এটি না থাকাই তাদের জন্য ভালো। সূরা ২ আল বাকারাহ, আয়াত ২১৬:

"...কিন্তু হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে আরেকটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলিমদের একে অপরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এর অর্থ হলো, আল্লাহ যদি কোন কিছু অপছন্দ করেন, তবেই কেবল তা অপছন্দ করা উচিত। সুনানে আবু দাউদের ৪৬৮১ নম্বর হাদিসে ঈমান পূর্ণ করার একটি দিক হিসেবে এটি বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী জিনিস বা মানুষ অপছন্দ করা উচিত নয়। যদি কেউ অন্য কাউকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী অপছন্দ করে, তাহলে তাদের কথা বা কাজে কখনোই এর প্রভাব পড়তে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি পাপ। একজন মুসলিমের উচিত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, সম্মান ও সদয়তার সাথে অন্যের সাথে আচরণ করে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা। একজন মুসলিমের মনে রাখা উচিত যে, অন্যরা যেমন নিখুঁত নয়, তেমনই তারাও নিখুঁত নয়। এবং যদি অন্যদের মধ্যে খারাপ গুণাবলী থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে তাদেরও ভালো গুণাবলী থাকবে। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের তাদের খারাপ গুণাবলী ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত, কিন্তু তাদের ভালো গুণাবলীকে ভালোবাসতে হবে। একজন মুসলিমের অবশ্যই পাপ অপছন্দ করা উচিত, কিন্তু ব্যক্তিকে নয়, কারণ একজন ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহর কাছে তওবা করতে পারে। তাদের অবশ্যই ইসলামের সীমানার মধ্যে পাপের প্রতি তাদের অপছন্দ প্রদর্শন করতে হবে। তাদের উচিত মন্দ কাজের বিরুদ্ধে অন্যদেরকে নম্রভাবে উপদেশ দেওয়া, কারণ কঠোর আচরণ প্রায়শই মহান আল্লাহর দিকে ফিরে আসা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়।

এই বিষয়ে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। যে মুসলিম কোন নির্দিষ্ট আলেমকে অনুসরণ করে এবং একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের সমর্থক, তার উচিত একজন ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তার আলেম সর্বদা সঠিক, এবং সেই সাথে যারা তাদের আলেমের মতামতের বিরোধিতা করে

তাদের ঘৃণা করা উচিত নয়। এই আচরণ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আলেমদের মধ্যে বৈধ মতপার্থক্য থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত একজন নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণকারী মুসলিমের উচিত এটিকে সম্মান করা এবং অন্যদের অপছন্দ করা নয় যারা তাদের অনুসরণকারী আলেমের বিশ্বাসের সাথে ভিন্ন।

আলোচ্য মূল হাদিসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, মুসলিমদের একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। এর অর্থ হলো, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের পার্থিব বিষয় নিয়ে অন্য মুসলিমদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় এবং তাদের সমর্থন করতে অস্বীকার করা উচিত নয়। সহিহ বুখারির ৬০৭৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, একজন মুসলিমের জন্য পার্থিব বিষয় নিয়ে অন্য মুসলিমের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা অবৈধ। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি পার্থিব বিষয় নিয়ে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকে সেই ব্যক্তির মতো বিবেচনা করা হয় যে অন্য মুসলিমকে হত্যা করেছে। সুনানে আবু দাউদের ৪৯১৫ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা কেবল ঈমানের ক্ষেত্রেই বৈধ। তবুও একজন মুসলিমের উচিত অন্য মুসলিমকে আন্তরিকভাবে তওবা করার পরামর্শ দেওয়া এবং কেবল তখনই তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা যদি তারা উন্নতির জন্য পরিবর্তন করতে অস্বীকৃতি জানায়। যখন তাদের অনুরোধ করা হয় তখন তাদের বৈধ বিষয়গুলিতে তাদের সমর্থন করা উচিত, কারণ এই দয়ার কাজ তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে তওবা করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আলোচ্য মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলিমদের একে অপরের ভাইয়ের মতো থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি কেবল তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন তারা এই হাদিসে দেওয়া পূর্ববর্তী উপদেশ মেনে চলে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্য মুসলিমদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করে, যেমন ভালো কাজে অন্যদের সাহায্য করা এবং মন্দ কাজ থেকে সতর্ক করা। ৫ম সূরা আল মায়িদা, আয়াত ২:

"...এবং সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না..."

সহীহ বুখারীতে ১২৪০ নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে যে, একজন মুসলিমের উচিত অন্য মুসলিমদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলো পূরণ করা: ইসলামিক সালামের জবাব দেওয়া, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তাদের জানাজায় অংশ নেওয়া এবং হাঁচি দেওয়া ব্যক্তিকে আল্লাহর প্রশংসা করার জবাব দেওয়া। একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যান্য মানুষের, বিশেষ করে অন্যান্য মুসলিমদের, তাদের উপর যে অধিকার রয়েছে তা শিখতে হবে এবং পূরণ করতে হবে, কারণ বিচারের দিন প্রতিটি ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তারা অন্য মানুষের অধিকার পূরণ করেছে কিনা। অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা মানুষের কাছ থেকে আচরণ পেতে চায়।

আলোচ্য মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুসলিমের অন্য মুসলিমের সাথে অন্যায় করা, তাকে ত্যাগ করা বা ঘৃণা করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি যে পাপ করে তা ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপীকে এমনভাবে ঘৃণা করা উচিত নয় যে তারা যেকোনো সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে।

সুনানে আবু দাউদের ৪৮৮৪ নম্বর হাদিসে মহানবী (সা.) সতর্ক করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্য মুসলিমকে অপমান করে, আল্লাহ তাকে অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে অপমান থেকে রক্ষা করবে, আল্লাহ তাকে হেফাজত করবেন।

শুরুতে উদ্ধৃত মূল হাদিসে উল্লেখিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি যখন কেউ অহংকার গ্রহণ করে তখন বিকশিত হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিস অনুসারে, অহংকার হল যখন কেউ অন্যদের অবজ্ঞার চোখে দেখে। অহংকারী ব্যক্তি নিজেকে নিখুঁত মনে করে এবং অন্যদের অসম্পূর্ণ মনে করে। এটি তাকে অন্যদের অধিকার পূরণ করতে বাধা দেয় এবং অন্যদের অপছন্দ করতে উৎসাহিত করে। এবং অহংকার একজনকে সত্য উপস্থাপন করা হলে তা প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করে, কারণ এটি তাদের কাছ থেকে আসেনি এবং তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত আরেকটি বিষয় হলো, প্রকৃত তাকওয়া মানুষের শারীরিক চেহারা, যেমন ইসলামী পোশাক পরিধানের মধ্যে নয়, বরং এটি একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। এই অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বাহ্যিকভাবে আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এটি নিশ্চিত করে যে কেউ তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। এই কারণেই সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নম্বর হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, যখন আধ্যাত্মিক হৃদয় পবিত্র হয়, তখন পুরো শরীর পবিত্র হয়ে যায় কিন্তু যখন আধ্যাত্মিক হৃদয় কলুষিত হয়, তখন পুরো শরীর কলুষিত হয়ে যায়। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ বাহ্যিক চেহারা, যেমন সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের উদ্দেশ্য এবং কর্ম বিবেচনা করেন। সহীহ মুসলিমের ৬৫৪২ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, একজন মুসলিমকে ইসলামের শিক্ষা শেখার এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তা আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং সৃষ্টির সাথে তাদের যোগাযোগের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য মূল হাদিসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, একজন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমকে ঘৃণা করা পাপ। এই ঘৃণা পার্থিব জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের অপছন্দ না করা। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা এবং ঘৃণা করা, নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। সুনানে আবু দাউদের ৪৬৮১ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তবুও, একজন মুসলিমকে অবশ্যই সকল ক্ষেত্রেই অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে এবং কেবল তাদের পাপকেই ঘৃণা করতে হবে, প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে। উপরন্তু, তাদের অপছন্দ কখনই তাদেরকে ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে না, কারণ এটি প্রমাণ করবে যে তাদের ঘৃণা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। পার্থিব কারণে অন্যদের ঘৃণা করার মূল কারণ হল অহংকার। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এক অণু পরিমাণ অহংকার একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহিহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মূল হাদিসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, একজন মুসলিমের জীবন, সম্পত্তি এবং সম্মান সবকিছুই পবিত্র। একজন মুসলিমের উচিত এই অধিকারগুলির কোনওটিই লঙ্ঘন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসায়ী, ৪৯৯৮ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুসলিম হতে পারে না যতক্ষণ না সে অমুসলিম সহ অন্যদের ক্ষতিকর কথাবার্তা এবং কাজ থেকে রক্ষা করে। আর একজন প্রকৃত মুমিন হলেন সেই ব্যক্তি যিনি অন্যদের জীবন ও সম্পত্তি থেকে তাদের মন্দ কাজ দূরে রাখেন। যে ব্যক্তি এই অধিকার লঙ্ঘন করে তাকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তার শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেন। যদি তারা তা না করে, তাহলে বিচারের দিন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে অত্যাচারীর সৎকর্ম ভুক্তভোগীকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে ভুক্তভোগীর পাপ ভুক্তভোগীকে দেওয়া হবে। এর ফলে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহিহ মুসলিমে, ৬৫৭৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই সতর্কীকরণ করা হয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের সাথে ঠিক সেই আচরণ করা যেমন সে চায় অন্যরা তার সাথে করুক। এটি একজন ব্যক্তির জন্য অনেক আশীর্বাদ বয়ে আনবে এবং তাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করবে।

আবু বকর (রাঃ) এর প্রথম খুতবা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর মদীনার লোকেরা চরম উদ্বেগ ও বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। এই সময়ে সাহাবাগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, সর্বসম্মতিক্রমে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কে ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করার ব্যাপারে একমত হন। সহীহ বুখারী, ৩৬৬৭ এবং ৩৬৬৮ নম্বরে প্রাপ্ত হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী (সাঃ) এর ইন্তেকালের পরের দিন, আবু বকর (রাঃ) মিম্বরে বসেছিলেন, আর উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) খুতবা দিচ্ছিলেন। উমর (রাঃ) বললেন, "হে মানুষ সকল, গতকাল আমি তোমাদের এমন কথা বলেছি যা যথাযথ ছিল না। আমি আল্লাহর কিতাবে তা পাইনি এবং মহানবী (সাঃ) আমাকে এমন কিছু বলেননি। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে মহানবী (সাঃ) আমাদের শেষ মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের নেতৃত্ব দিয়ে যাবেন। কিন্তু মহান আল্লাহ তোমাদের মধ্যে তাঁর কিতাব রেখে গেছেন, যাতে রয়েছে মহান আল্লাহ এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর নির্দেশনা। যদি তোমরা তা মেনে চলো, তাহলে মহান আল্লাহ তোমাদের সেই পথে পরিচালিত করবেন যে পথে তিনি তাঁকে পরিচালিত করেছিলেন। মহান আল্লাহ তোমাদের মধ্যে সেরা, মহানবী (সাঃ) এর সাহাবী, তাঁর উপর শান্তি ও শান্তি বর্ষিত হোক, যিনি দুজনের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন যখন তারা গুহায় ছিলেন, তার নেতৃত্বে তোমাদের একত্রিত করেছেন। তাই উঠে দাঁড়াও এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করো।"

উমর (রাঃ) মানুষকে উৎসাহিত করেছিলেন যে, যিনি তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সবচেয়ে যোগ্য, তার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হতে, কোনও হিংসার লক্ষণ না দেখিয়ে। তাঁর কর্মকাণ্ড জনগণের জন্য বিভেদ ও দুর্দশা এড়িয়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানদেরকে আসন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে শক্তিশালী করেছিল। ইমাম

মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, তাঁর জীবন ও সময়, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪৩-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বকর (রাঃ) তাঁর প্রথম খুতবায় বলেছিলেন: "হে মানুষ, আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম না হলেও কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছি। যদি আমি ভালো কাজ করি, তাহলে আমাকে সাহায্য করো। যদি আমি ভুল করি, তাহলে আমাকে সোজা করো। সততা হলো আনুগত্য; অসততা হলো প্রতারণা। তোমাদের মধ্যে দুর্বলরাই আমার দৃষ্টিতে শক্তিশালী, যতক্ষণ না আমি তাদের দুর্বলতা দূর করতে পারি। তোমাদের মধ্যে শক্তিশালীরাই দুর্বল, যতক্ষণ না আমি তাদের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে পারি, যদি আল্লাহ চান। কোন জাতি আল্লাহকে ছাড়া আল্লাহর পথে লড়াই ছেড়ে দেয় না, তাদেরকে অবনতিতে ভোগ করে। আল্লাহকে ছাড়া কোন জাতি কখনও পাপ ছড়িয়ে পড়ে না, যার ফলে তারা দুর্দশায় ভোগে। যতক্ষণ আমি আল্লাহকে এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদকে মেনে চলি, ততক্ষণ আমার আনুগত্য করো, তাঁর উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। যদি আমি আল্লাহকে এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদকে অমান্য করি, তাহলে তোমাদের কাছ থেকে আমার কোন আনুগত্য আশা করা উচিত নয়। ইমাম ইবনে কাসিরের "নবীর জীবন", খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৫৫-৩৫৬-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ, অর্থাৎ ইসলামের দূতদের কথা মনে করিয়ে দেয়। মুসলমানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এই দায়িত্ব পালন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হল মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং তাঁর পছন্দগুলির প্রতি ধৈর্য ধরা। ইসলাম সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে কারণ ধার্মিক পূর্বসূরীরা এই দায়িত্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছিলেন। যখন তারা উপকারী জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং তার উপর কাজ করেছিলেন, তখন বাইরের বিশ্ব তাদের আচরণের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা স্বীকৃতি দিয়েছিল। এর ফলে অসংখ্য মানুষ ইসলামের আওতায় প্রবেশ করেছিল। দুর্ভাগ্যবশত, আজ অনেক মুসলিম বিশ্বাস করে যে ইসলাম সম্পর্কে অন্যদের

জানানো কেবল নিজের চেহারা, যেমন দাড়ি রাখা বা স্কার্ফ পরা। এটি ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করার একটি দিক মাত্র। সবচেয়ে বড় অংশ হল পবিত্র কুরআন এবং তাঁর ঐতিহ্যে আলোচিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা। কেবলমাত্র এই মনোভাব দিয়েই বহির্বিশ্ব ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করবে। একজন মুসলমানের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতাকারী বৈশিষ্ট্য ধারণ করে ইসলামী চেহারা গ্রহণ করলে বহির্বিশ্ব কেবল ইসলামকে অসম্মান করে। এই অসম্মানের জন্য তারাই দায়ী থাকবে কারণ তারাই এর কারণ। তাই একজন মুসলিমের উচিত ইসলামের অভ্যন্তরীণ শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামের বাহ্যিক রূপ গ্রহণ করে ইসলামের একজন প্রকৃত দূত হিসেবে আচরণ করা।

অধিকন্তু, এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানটি মুসলমানদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে বিচারের দিন তাদের জবাবদিহি করা হবে এবং জিজ্ঞাসা করা হবে যে তারা এই ভূমিকা পালন করেছে কিনা। একজন রাজা যেমন তাদের কূটনীতিক এবং প্রতিনিধি তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে তাদের উপর ক্রুদ্ধ হবেন, তেমনি মহান আল্লাহও সেই মুসলিমের উপর ক্রুদ্ধ হবেন যারা ইসলামের দূত হিসেবে তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়।

আরও প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করা

ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে আবু বকর (রাঃ) এর মনোনীতকরণ সর্বদাই অনেক বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুন্নি ও শিয়া এই দুই দলকে সত্যের উপর ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সঠিক পথপ্রদর্শক পণ্ডিতরা প্রায়শই ইসলামের প্রথম খলিফা হওয়ার তার অধিকারের অপ্রতিরোধ্য প্রমাণ নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছেন। যদিও এটি একটি যোগ্য লক্ষ্য, তবুও, একজন সাধারণ মুসলিমের এই আলোচনা বা অন্যান্য অনুরূপ আলোচনায়, যেমন সাহাবীদের মধ্যে মতবিরোধ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, জড়িত হওয়া উচিত নয়, কারণ এগুলি এমন বিষয় যা আল্লাহ, কিয়ামতের দিন তাদের জিজ্ঞাসা করবেন না। এই বিষয়গুলি আল্লাহ, মহিমান্বিত এবং সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, মধ্যে। সূরা ২, আল বাক্বারাহ, আয়াত ১৪১:

"এটি এমন একটি জাতি যা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা অর্জন করেছে তার ফল তাদের জন্য এবং তোমরা যা অর্জন করেছো তা তোমাদের জন্য। এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না।"

একজন মুসলিমের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে, সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, সঠিক পথপ্রাপ্ত ছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস দ্বারা এটি প্রমাণিত। উদাহরণস্বরূপ, ৯ম সূরা আত-তাওবা, আয়াত ১০০:

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা সৎকর্মের সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, এবং তিনি তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহা সাফল্য।"

যেহেতু বিচার দিবসে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না, তাই একজন মুসলিমকে বরং বিচার দিবসে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে সেগুলিতে মনোনিবেশ করতে হবে। একজন মুসলিম পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসগুলি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে এবং তার উপর আমল করার পরেই কেবল অন্যান্য বিষয়গুলি সমাধান করার অধিকার রাখে। যেহেতু কার্যত কেউই এই স্তরে পৌঁছায়নি, তাই একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করবে, অর্থাৎ, যে বিষয়গুলি নির্ধারণ করবে যে তারা জান্নাতে যাবে নাকি জাহান্নামে যাবে।

অধিকন্তু, যে ব্যক্তি কোন সাহাবীকে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, অপছন্দ করে, তার কাফের হয়ে যাওয়ার ভয় করা উচিত, যেমন পবিত্র কুরআন অনুসারে, কাফেররা সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, অপছন্দ করে। সূরা আল ফাতহ, আয়াত ২৯:

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; এবং তাঁর সাথে যারা আছেন [সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন] তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে দয়ালু। তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদা করতে দেখবে, আল্লাহর অনুগ্রহ এবং [তাঁর] সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার প্রভাবের লক্ষণ রয়েছে। তাওরাতে তাদের বর্ণনা এটাই। এবং ইঞ্জিলের বর্ণনায় তাদের বর্ণনা এমন একটি উদ্ভিদের মতো যা তার শাখা-প্রশাখা উৎপন্ন করে এবং তাদের শক্তিশালী করে, যাতে তারা দৃঢ়ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, বীজ বপনকারীদের

আনন্দ দেয় - যাতে তিনি [সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন] কাফেরদের দ্বারা ক্রুদ্ধ হন..."

যে ব্যক্তি তাদেরকে অপছন্দ করে, সে পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত তিনটি সফল দলের বাইরে পড়ে যায় এবং তাই উভয় জগতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রথম দলটি হল সাহাবা যারা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। সূরা ৫৯ আল হাশর, আয়াত ৮:

"... দরিদ্র মুহাজির যারা তাদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে সহায়তা করার জন্য, [এছাড়াও একটি অংশ আছে]। তারাই সত্যবাদী।"

দ্বিতীয় দলটি হলো মদীনার সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। ৫৯তম সূরা আল হাশর, আয়াত ৯:

"... যারা তাদের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং ঈমান [গ্রহণ করেছিল]। যারা তাদের দিকে হিজরত করেছে তাদের তারা ভালোবাসে এবং তাদের [অর্থাৎ, হিজরতকারীদের] যা দেওয়া হয়েছে তা তাদের অন্তরে কোন অভাব খুঁজে পায় না বরং তারা নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা অভাবগ্রস্ত থাকে। আর যে ব্যক্তি তার আত্মার কৃপণতা থেকে রক্ষা পায়, তারাই সফলকাম হবে।"

চূড়ান্ত সফল দল হলো তারা যারা মক্কা বা মদীনার সাহাবীদের প্রতি কোন নেতিবাচক অনুভূতি পোষণ করে না, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, বরং তারা তাদের ইচ্ছাশক্তির সমর্থক। সূরা ৫৯ আল হাশর, আয়াত ১০:

"... যারা তাদের পরে আসবে এবং বলবে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের এবং আমাদের ভাইদের যারা ঈমানে আমাদের পূর্বে ছিলেন ক্ষমা করুন এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোন বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা, নিশ্চয়ই আপনি দয়ালু ও করুণাময়।"

যে কেউ সাহাবীদের, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, অপছন্দ করে এবং সমালোচনা করে, সে এই তিনটি সফল দলের বাইরে পড়ে এবং তাই উভয় জগতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর একটি সুন্দর বর্ণনা

নিম্নে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কিছু মহৎ গুণাবলী তুলে ধরা হলো, যা সকল মুসলমানের অনুকরণ করার চেষ্টা করা উচিত। সূরা আল আহযাব, আয়াত ২১:

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে একটি চমৎকার আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"

এবং অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ৩১:

"[নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন...""

শামা'ইলে তিরমিযীতে ২১৫ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বদা চিন্তিত থাকতেন কারণ তিনি তাঁর অনুসারীদের পরকাল এবং ভাগ্য নিয়ে অনেক সময় চিন্তা করতেন। তিনি সর্বদা গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। এই কারণে তিনি কখনই সম্পূর্ণরূপে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না। যখন তিনি কথা বলতেন তখন তিনি স্পষ্টভাবে এবং ধীরে ধীরে বলতেন যাতে সহজেই বোঝা যায়। তিনি সংক্ষিপ্ত অর্থে কথা বলতেন, তাঁর কয়েকটি শব্দে এক সমুদ্রের সমান জ্ঞান ছিল। প্রকৃতপক্ষে, এটি ছিল মহান

আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন এমন একটি অলৌকিক ঘটনা। সহিহ মুসলিমের ১১৬৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) রাগী ছিলেন না এবং অন্যদের অপমান বা অপমান করতেন না। তিনি সর্বদা আল্লাহর সমস্ত নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ থাকতেন, এমনকি যদি তা ছোট মনে হত। তিনি কখনও খাবারের সমালোচনা করতেন না। তিনি কখনও পার্থিব জিনিসের উপর রাগান্বিত হতেন না। কিন্তু যখন আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করা হয়েছিল তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি সর্বদা ন্যায়পরায়ণ ও করুণাময় ছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাসি ছিল হাসি।

পাওয়া একটি হাদিসে , মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) নিশ্চিত করেছেন যে তিনি মাঝে মাঝে রসিকতা করতেন কিন্তু সর্বদা সত্য কথা বলতেন। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলিম বিশ্বাস করে যে ছোট ছোট মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য, যাকে সাদা মিথ্যা বলা হয়। কিন্তু এটি সত্য নয়। সমস্ত মিথ্যা এড়িয়ে চলতে হবে কারণ পবিত্র কুরআন মিথ্যাবাদীদের অভিশাপ দিয়েছে। ৩য় সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬১:

"...এবং আমাদের মধ্যে মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষণ করো।"

প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, ২৩১৫ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) রসিকতা করার সময় মিথ্যা বলার জন্য তিনটি অভিশাপ ঘোষণা করেছেন। যদি রসিকতা করার সময় মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে এটি হয়, তাহলে কি কেউ কল্পনা করতে পারে যে মিথ্যা বলার সময় অন্যদের প্রতারণা করার পরিণতি কী হবে? যে ব্যক্তি রসিকতা করার সময়ও মিথ্যা বলে না, তাকে জান্নাতের মাঝখানে একটি দুর্গের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সুনান আবু দাউদে, ৪৮০০ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মহৎ চরিত্রের একটি অংশ ছিল মহান আল্লাহর ইবাদতের প্রতি তাঁর উৎসাহ। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিমের ৭১২৪ নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) রাতে এত বেশি নফল ইবাদত করতেন যে তাঁর পবিত্র পা ফুলে যেত। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কেবল উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হতে চান। যদিও, মুসলমানদের কাছ থেকে এই ধরনের উৎসাহী ইবাদত আশা করা যায় না, তবুও প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রমাণের জন্য তাদের নিজস্ব সামর্থ্য অনুসারে প্রচেষ্টা করা। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে শারীরিক শক্তির মতো প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করে এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা সম্ভব।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মহান বিনয় সকলেরই জানা। এটি প্রকৃত দাসত্বের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এর বিপরীত, অহংকার, একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হবে, এমনকি যদি তার কাছে অণু পরিমাণও থাকে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর পবিত্র জীবন জুড়ে বিনয় প্রদর্শন করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, শামা'ইলে তিরমিযির ৩১৫ নম্বর হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে তিনি অসুস্থদের দেখতে যেতেন, তারা দরিদ্র হোক বা না হোক। তিনি জানাজায় অংশ নিতেন এবং সকলের, বিশেষ করে দরিদ্রদের, দাওয়াত গ্রহণ করতেন। ইতিহাস জুড়ে এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে সর্বদা অহংকারকারীরা অবজ্ঞা করে দেখেছেন। কিন্তু ইসলাম মুসলমানদের এই দায়িত্বগুলি এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে শেখায় কারণ এগুলি তাদের জান্নাতে প্রবেশের কারণ হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ২৩৭৪ নম্বর হাদিসে এটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শামা'ইল ই তিরমিযীতে ৩১৯ নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে মহানবী (সা.)-এর বিনয় ও সরলতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। সুনান ইবনে মাজাহ, ৪১১৮ নম্বরে

পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, আমাদের মনে রাখা উচিত যে সরলতা ঈমানের অঙ্গ। মহানবী (সা.) যখন ঘরে থাকতেন, তখন তিনি তাঁর সময়কে তিন ভাগে ভাগ করতেন। প্রথম ভাগটি ছিল মহান আল্লাহর ইবাদতের জন্য। দ্বিতীয় ভাগটি ছিল তাঁর পরিবারের সদস্যদের অধিকার পূরণের জন্য। এবং শেষ ভাগটি ছিল নিজের জন্য, অর্থাৎ বিশ্রামের জন্য। এই শেষ ভাগটি তিনি দুই ভাগে ভাগ করে অর্ধেক জনসাধারণ এবং তাদের চাহিদার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। মহানবী (সা.) সর্বদা মানুষের চাহিদা পূরণ করতেন, এমনকি যদি তারা নিজেকে কষ্টে ফেলে। তিনি সর্বদা মানুষের সাথে তাদের জ্ঞানের স্তর অনুসারে কথা বলতেন এবং কেবল এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন যা মানুষের উপকারে আসে। যখনই মানুষ মহানবী (সা.)-এর সাথে সমবেত হত, তখন কেবল উপকারী বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হত এবং সকলেই অনর্থক কথাবার্তা এড়িয়ে চলতেন। মানুষ সর্বদা তাঁর মজলিস থেকে নতুন কিছু শিখতে শিখতে বেরিয়ে যেত যা তাদের জন্য উপকারী ছিল। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কেবল এমন কথা বলতেন যা দরকারী এবং প্রয়োজনীয় ছিল এবং অর্থহীন এবং অর্থহীন কথাবার্তা অপছন্দ করতেন। তাঁর কাছে যে কেউ আসত সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত এবং স্বাগত জানাত। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বদা সকলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন এবং সর্বদা অন্যদের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকতেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বদা অন্যদের বিষয় সম্পর্কে উদ্বিগ্ন থাকতেন এবং তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা করতেন। তিনি সৎকর্মের প্রশংসা করতেন এবং তাদের উৎসাহিত করতেন। তিনি খারাপ কাজের নেতিবাচক প্রভাব ব্যাখ্যা করতেন এবং সেগুলি দূর করার জন্য প্রচেষ্টা করতেন। মানবজাতির জন্য একটি নিখুঁত উদাহরণ স্থাপন করার জন্য তিনি অতিরিক্ত আচরণ এবং অলসতা এড়িয়ে মধ্যম পথ অনুসরণ করতেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর দৃষ্টিতে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি অন্যদের জন্য মঙ্গল কামনা করতেন এবং তাদের সাহায্য করার জন্য প্রচেষ্টা করতেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর কথোপকথন এবং সমাবেশ শুরু করতেন এবং শেষ করতেন আল্লাহকে স্মরণ করে। যখন তিনি কোন মজলিসে যোগ দিতেন, তখন যেখানেই জায়গা থাকত সেখানেই বসতেন এবং কখনও অন্যদের অসুবিধার কারণ হতেন না। কিন্তু তিনি যেখানেই বসতেন, সেটাই সমাবেশের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হত। তিনি সর্বদা যাদের সাথে দেখা করতেন এবং বসতেন তাদের অধিকার পূরণ করতেন। প্রত্যেক ব্যক্তি বিশ্বাস করতেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদেরকে সবচেয়ে বেশি সম্মান করতেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কেবল তখনই আলোচনা ছেড়ে দিতেন যখন অন্য ব্যক্তির অনুরোধ তাদের সন্তুষ্টির জন্য

পূরণ করা হত। তিনি সর্বদা অন্যদের চাহিদা পূরণ করতেন। তিনি সর্বদা মানুষের সাথে আনন্দের সাথে আচরণ করতেন। অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মানুষ তাঁর দৃষ্টিতে সমান ছিলেন, অর্থাৎ, তিনি পার্থিব কারণে কাউকে অন্যের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতেন না। তাঁর সমাবেশগুলি উপকারী জ্ঞান, বিনয়, ধৈর্য এবং সত্যবাদিতা সম্পর্কে হত। সকলকে সম্মানিত করা হত এবং এই সমাবেশগুলিতে কেউ লজ্জিত হত না। তিনি অন্যদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখতেন এবং সরাসরি কারো নাম উল্লেখ না করে ভুল-ত্রুটি তুলে ধরতেন। তাঁর সমাবেশে কেবল তখনই বেশি পুণ্যবান ব্যক্তি হিসেবে দেখা যেত যদি তারা অন্যদের চেয়ে মহান আল্লাহকে ভয় করত। তিনি তরুণদের প্রতি করুণা এবং ভালোবাসা প্রদর্শন করতেন। দরিদ্রদের সাথে সদয় আচরণ করা হত এবং তাদের চাহিদা পূরণ করা হত। অপরিচিত এবং ভ্রমণকারীদের তিনি সর্বদা যত্ন নিতেন।

জামে আত তিরমিযী, ২০১৫ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, সাহাবী আনাস বিন মালিক (রাঃ) দশ বছর ধরে মহানবী (সাঃ) এর খেদমত করেছিলেন এবং এই সময়ে মহানবী (সাঃ) তাঁর নির্ধারিত কোন কাজ না করলে কখনও তাঁর উপর রাগান্বিত হতেন না।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর স্ত্রী এবং মুমিনদের মা আয়েশা (রাঃ) উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কখনও অশ্লীল কথা বলতেন না, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতেন না এবং উচ্চস্বরে কথা বলতেন না। যখনই তিনি অন্যদের দ্বারা অসন্তুষ্ট হতেন, তখনই তিনি প্রতিশোধ নিতেন না বরং ক্ষমা করতেন এবং উপেক্ষা করতেন। শামা'ইলে তিরমিযী, ৩৩০ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কখনও কোন নারী, শিশু বা পুরুষকে আঘাত করেননি। তিনি কেবল পুরুষ সৈন্যদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহর

সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। সহীহ মুসলিমের ৬০৫০ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শামা'ইল ই তিরমিযীতে ৩৩৪ নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে মহানবী (সা.)-এর কিছু পবিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি সর্বদা মানুষের সাথে হাসিখুশি এবং সহজ-সরল আচরণ করতেন। তিনি প্রায়শই হাসতেন। তিনি অত্যন্ত নরম স্বভাবের ছিলেন। তিনি কখনও অন্যদের সাথে রূঢ়ভাবে কথা বলতেন না এবং তাঁর হৃদয়ও কঠোর ছিল না। তিনি কখনও অশ্লীল বা অসম্মানজনক কথা বলতেন না। তিনি কখনও অন্যদের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করতেন না। তিনি কখনও সমালোচনা করতেন না বা অতিরিক্ত প্রশংসা করতেন না। তিনি খুব কমই রসিকতা করতেন কিন্তু কখনও সীমা অতিক্রম করতেন না। তিনি কৃপণ ছিলেন না। যদি তিনি কারও ইচ্ছার সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন, তবে তাদের কাছে উত্তম পছন্দ ব্যাখ্যা করার সময় কখনও তাদের হতাশ করতেন না। তিনি তিনটি জিনিস থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকতেন: অন্যদের সাথে তর্ক করা, অহংকার এবং অনর্থক কথা বলা। তিনি অন্যদের অসম্মান বা অপমান করতেন না বা অন্যদের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করতেন না এবং কেবল উপকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে কথা বলতেন। মহানবী (সা.) সর্বদা অন্যদের নির্যাতন এবং কঠোরতার মুখে ধৈর্য ধারণ করতেন। লোকেরা যখন কথা বলত তখন তিনি তাদের বাধা দিতেন না।

শামা'ইলে তিরমিযীতে ৩৩৫ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী (সা.)-এর চরম উদার স্বভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যখনই কেউ মহানবী (সা.)-এর কাছে কোন কল্যাণকর জিনিস প্রার্থনা করতেন, তিনি কখনও তা অস্বীকার করতেন না।

তিনি এতটাই উদার ছিলেন যে, শামা'ইলে তিরমিযীর ৩৩৭ নম্বর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পরের দিনের জন্য নিজের জন্য কোনও খাবার জমা রাখতেন না, বরং তিনি সর্বদা তা দান করতেন।

তাঁর উদারতা এতটাই উচ্চতায় পৌঁছেছিল যে, যখন তাঁর কাছে অন্যদের দেওয়ার মতো কিছুই থাকত না, তখনও তিনি প্রশ্নকারীকে স্থানীয় বাজার থেকে কিছু নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিতেন এবং ব্যবসায়ীকে বলতেন যে, মহানবী (সাঃ) পরবর্তীতে এর মূল্য পরিশোধ করবেন। শামা'ইলে তিরমিযী, ৩৩৮ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বদা অন্যদের তাদের দয়া ও দানের প্রতিদান দিতেন। শামা'ইলে তিরমিযীতে ৩৩৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একবার মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে উপহার হিসেবে ফলের একটি ট্রে দেওয়া হয়েছিল। এর জবাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সেই ব্যক্তিকে এক মুঠো অলংকার দিয়েছিলেন।

জামে আত তিরমিযী, ২৪৭২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার ঘোষণা করেছিলেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর চেয়ে বেশি ভয় আর কেউ দেখেনি। তিনি এত কষ্টের মধ্যে ছিলেন যে ত্রিশ দিন ধরে তিনি কেবল কয়েক টুকরো খাবারই পেতেন। প্রকৃতপক্ষে, মাস কেটে যেত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঘরে কিছুই রান্না করা হত না। তিনি এবং তাঁর পরিবার পানি এবং খেজুর ফল খেয়ে বেঁচে থাকতেন। সহীহ বুখারী, ২৫৬৭ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, কেউ খাবে না। তবে মুসলমানদের প্রথমে তাদের যা আছে তা উপলব্ধি করা উচিত। দ্বিতীয়ত, তাদের উচিত অপচয়, অপচয় এবং অতিরিক্ত ব্যয় এড়িয়ে ইসলামের সীমার মধ্যে বস্তুগত জগৎ উপভোগ করা।

উপসংহার

যখন কেউ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র জীবন পর্যবেক্ষণ করে, তখন তারা স্পষ্ট দেখতে পাবে যে, তিনি আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে পরীক্ষিত হয়েছিলেন। অতএব, পরীক্ষা এবং কষ্ট কোন অভিশাপ বা দুর্বিষহ জীবনের লক্ষণ নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি একজন ব্যক্তির জন্য উজ্জ্বল হওয়ার এবং প্রচুর পুরষ্কার অর্জনের একটি সুযোগ। সূরা আয-যুমার, আয়াত ১০:

"...ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান বিনা হিসাব [অর্থাৎ, সীমা] দেওয়া হবে।"

যখনই তারা পরীক্ষা এবং সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখনই তাদের এই কথাটি মনে রাখা উচিত যাতে তারা তার মতো ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ থাকতে পারে।

অধিকন্তু, যদিও মহানবী (সাঃ) ক্রমাগত অসুবিধা এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তবুও প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর হৃদয় প্রশান্ত ছিল। এই শান্তি তিনি লাভ করেছিলেন কারণ তিনি তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করেছিলেন যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। সূরা ১৩ আর রা'দ, আয়াত ২৮:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

এবং অধ্যায় ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেব।"

কিন্তু যে ব্যক্তি তাকে অনুকরণ করতে ব্যর্থ হয়, সে কেবল অন্ধকার ও শ্বাসরুদ্ধকর জীবন পাবে, যদিও তার পায়ের কাছে পৃথিবী থাকে। অধ্যায় ২০ তাহা, আয়াত ১২৪:

" কিন্তু যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন অবশ্যই দুর্বিষহ হবে..."

অতএব, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা মানসিক শান্তি অর্জন এবং দুর্বিষহ জীবনের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে, এমনকি যদি কেউ অসুবিধা বা স্বাচ্ছন্দ্যের মুখোমুখি হয়।

অধিকন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানবজাতিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত করার জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মুসলমানদের জন্য তাঁর সাহাবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ, যারা তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর শিক্ষার

উপর অবিচল ছিলেন। সমস্ত মুসলিম পরকালে তাঁর সাহচর্য কামনা করে কিন্তু তারা কেবল তখনই তা পাবে যদি তারা তাঁর পথ অনুসরণ করে। কোনও ব্যক্তি যদি অন্য পথে যাত্রা করে তবে তাদের সঙ্গী হবে না যারা নির্দিষ্ট পথে যাত্রা করেছিল। একইভাবে, মুসলমানরা পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে যোগ দেবে না যদি তারা তাঁর পথ ব্যতীত অন্য পথে চলে। এটি কেবল তাঁর পবিত্র জীবন এবং শিক্ষা শেখা এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। এই কারণেই তাঁর কোনও সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, কেবল তাদের কথায় বিশ্বাস ঘোষণা করেননি এবং কার্যত তাঁকে অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকেননি, কারণ তারা জানতেন যে এই মনোভাব তাদের পরকালে তাঁর সাথে যোগদান থেকে বিরত রাখবে। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য জাতির মনোভাব ছিল যারা তাদের পবিত্র নবীদের, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, ভালোবাসার দাবি করে, কিন্তু কার্যত তাদের অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়। এই কারণেই তারা পরকালে তাদের পবিত্র নবীদের সাথে মিলিত হবে না, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

এছাড়াও, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র জীবন এবং তাঁর সাহাবীদের (রাঃ)-এর জীবন পর্যবেক্ষণ করলে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, বুঝতে পারবেন যে, একজন ব্যক্তির একমাত্র অর্থবহ, মূল্যবান এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ অস্তিত্ব লাভের উপায় হল তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করা। ৫১ আয ধরিয়াত, আয়াত ৫৬:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।"

এটি তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন কেউ কার্যত আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত তাঁর সন্তুষ্টি

অর্জনের উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করে। শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে বিশ্বাসকে সমর্থন না করে কেবল মৌখিকভাবে ঈমান ঘোষণা করা একটি ফুলদানির মতো যা বাহ্যিকভাবে সুন্দর দেখায় কিন্তু ভিতরে ফাঁপা থাকে। এটি এই জীবনে অর্থপূর্ণ অস্তিত্বের দিকে পরিচালিত করবে না, এমনকি যদি কেউ পরকালে জান্নাতে শেষ হয়। আত তাবারানির আল মু'জাম আল কাবীর, হাদিস ১৮২, খণ্ড ২০-এ পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেখানে সতর্ক করা হয়েছে যে জান্নাতে একজন ব্যক্তি কেবল সেই সময়গুলির জন্য অনুতপ্ত হবেন যখন তারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সময়গুলিতে মহান আল্লাহকে স্মরণ করেনি। অর্থাত্, তাদের জীবনের সময়গুলিতে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারেনি। এই কারণেই অনেক মুসলিম, যারা কেবল মৌলিক বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালন করে, তারা এখনও তাদের জীবনে একটি শূন্যতা অনুভব করে, এমন একটি শূন্যতা যা সম্পূর্ণরূপে এবং ব্যবহারিকভাবে গ্রহণ করা ছাড়া আর কিছুই পূরণ করতে পারে না।

এছাড়াও, সাধারণভাবে বলতে গেলে, মানুষ যখন পার্থিব জিনিসপত্র, যেমন অন্যদের কাছ থেকে সম্পদের উত্তরাধিকার লাভ করে, তখন তারা খুশি হয়। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষের জন্য উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ রেখে যাননি। তিনি অন্যান্য নবীদের মতো জ্ঞান রেখে গেছেন। সুনানে ইবনে মাজাহ, ২২৩ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, যদি তারা তাঁর প্রকৃত উত্তরাধিকারী হতে চায়, তাহলে মুসলমানদের অবশ্যই এই উত্তরাধিকারের অংশ গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন হলো একজন মুসলিমের আল্লাহ এবং সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য পালনের সর্বোত্তম উদাহরণ। তিনি হলেন পবিত্র কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

অতএব, মুসলমানদের তাদের কর্তব্য সঠিকভাবে পালনের জন্য তাঁর পবিত্র জীবন অধ্যয়ন এবং তার উপর আমল করা উচিত। এটি ছাড়া সাফল্য সম্ভব নয়। সূরা ৩৩ আল আহযাব, আয়াত ২১:

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে একটি চমৎকার আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"

এবং ৩য় অধ্যায় আলে ইমরান, ৩১ আয়াত:

"[নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন...""

এবং অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ৮০:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

এবং ৫৯তম অধ্যায় আল হাশর, ৭ম আয়াত:

"... আর রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করো; আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো..."

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ), তাঁর পরিবারবর্গ এবং সাহাবীদের উপর।

ইমেলের মাধ্যমে প্রতিদিনের ব্লগ এবং আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন: http://shaykhpod.com/subscribe